একসুর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীতিলক বন্দ্যোপাধ্যায়

'ভরত নাট্যম্' ভঙ্গিমায় শ্রীভাস্কর রায়চৌধুরী

একটি বিশিষ্ট নৃত্য-ভঙ্গিমায় শ্রীভাস্কর রায়চৌধুরী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫১শ ভাগ
১ম খণ্ড | বৈশাখ, ১৩৫৮ | ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পঞ্চাশ বৎসর

প্রবাসীর পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইল। বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে ইহা বিরল এবং মাসিকপত্রের মধ্যে বোধ হয় সমগ্র ভারতে পঞ্চাশ বৎসর নিয়মিত প্রকাশের এরূপ আর দৃষ্টান্ত নাই।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়া আনন্দের বিষয়। কিন্তু বাংলার তথা বাঙালীর এই দুর্দিনে আমরা উৎসবের জন্য কোনও প্রেরণা পাইতেছি না। অশেষ বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া প্রবাসী তাহার অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী শিল্প, সাহিত্য ও দেশ-সেবার চেষ্টা করিয়াছে এবং আশা আছে এখনও সে পূর্ব্ববৎ সেই পথেই চলিতে পারিবে। সে প্রচেষ্টায় যে অনেক ভ্রম ও দোষ থাকা সম্ভব তাহা জানিয়া, আমরা প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করি, কেননা তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এখনও প্রয়োজন, পার্থক্যের মধ্যে আরও পঁচিশ বৎসর অধিকতর ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়া কাটিয়া গিয়াছে :

সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নাম লইয়া ১৩০৮ সালের বৈশাখে প্রবাসী প্রথম প্রকাশিত করিয়াছিলাম। তাঁহার কৃপায় ইহার জীবনের প্রথম পঁচিশ বৎসর পূর্ণ ও অতীত হইল। দ্বিতীয় পঁচিশ বৎসরের প্রারম্ভে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার চরণে প্রণত হইতেছি।

বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রবাসীর যে-সকল প্রশংসা ছাপিয়াছি, তাহা অনেক দ্বিধার পর ছাপিয়াছি। প্রবাসীর প্রশংসা ছাপা অপেক্ষা আমার ব্যক্তিগত প্রশংসা ছাপিতে আমার অধিকতর সংকোচ বোধ হইয়াছে। কারণ, প্রবাসী যতটা উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহা কেবলমাত্র আমার চেষ্টায় হয় নাই। অন্য যাঁহাদের চেষ্টায় হইয়াছে, তাঁহারা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য, এবং সর্ব্বসাধারণের ও আমার কৃতজ্ঞতার পাত্র।

আমার ব্যক্তিগত যেরূপ প্রশংসা প্রবাসীর হিতৈষীগণ করিয়াছেন, তাঁহারা আমার সমুদয় দোষ-ত্রুটি ও দুর্ব্বলতা জানিলে সেরূপ প্রশংসা করিতেন না। কিন্তু সম্পাদক কিরূপ হইলে এবং নিজের কাজ কিভাবে করিলে তাঁহাদের প্রশংসার যোগ্য হন, তাঁহাদের প্রশংসা হইতে আমি তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি। তাঁহাদের লেখা হইতে সম্পাদকীয় আদর্শ সম্বন্ধে আমার ধারণা স্পষ্টতর ও উজ্জ্বলতর হওয়ায় আমি উপকৃত হইয়াছি এবং তাহার জন্য তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমার পার্থিব জীবন ও সম্পাদকীয় জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই কারণে, আমার হিতৈষীদিগের আদর্শের মত হইতে চেষ্টা করিবার জন্য আমি বেশী সময় পাইব না। যে-সকল সম্পাদকের বয়স আমা অপেক্ষা অনেক কম, উক্ত আদর্শ তাঁহাদের কোন কাজে লাগিলে সুখী হইব।

প্রবাসীর উন্নতির জন্য যিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমি শ্রদ্ধার সহিত মন দিয়া পড়িয়াছি ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করিয়াছি। উপদেশগুলি আমার নিজের ব্যবহারের জন্য বলিয়া মুদ্রিত করিলাম না। কিন্তু আমার বুদ্ধি বিবেচনা ও শক্তি অনুসারে আমি হিতৈষীদিগের উপদেশের অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিব।

সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য পালন আমি ভাল করিয়া করিতে পারি নাই। আমার যত দোষ-ত্রুটি ও ভ্রম হইয়াছে, তাহার জন্য আমি কুণ্ঠিত আছি।

বাঙালীর সমস্যা

১৩৫৭ সাল শেষ হইয়াছে, আবার নূতন বৎসর সমাগত। বর্ষশেষে ভাবিতেছি বাঙালী জাতি এই এক বৎসরে কি করিয়াছে? উন্নতির পথে একটি ধাপও অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, অথবা আরও পিছাইতে বাধ্য হইয়াছে? ১৯৪২ সাল হইতে বাঙালীর উপর যেন বিধাতার অভিশাপ বর্ষিত হইতেছে। মেদিনীপুরে বন্যা, মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, ভারত-বিভাগের অবশ্যম্ভাবী পরিণামজনিত বঙ্গবিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, অন্নসমস্যা, বস্ত্রসমস্যা, বেকারসমস্যা একের পর এক দেখা দিয়া বাঙালী জাতিকে যেন চতুর্দিক হইতে পিষিয়া ফেলিবার

উপক্রম করিতেছে। ঘরে দুর্দিন, বাহিরে লাঞ্ছনা—পথ দেখাইবার লোক নাই, ভাঙা ঘর গড়িয়া তুলিবার জন্ত সম্বল নাই, নাই বলিতে বাঙালীর আজ কিছু নাই। এই অবস্থার চাপে পড়িয়াও বাঙালী অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছে ইহাকেই আমরা বড় কথা বলিয়া মনে করিব এবং সেই সঙ্গে বার বার এই প্রার্থনা করিব যেন বিধাতার এই আঘাত আমাদের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করে, অন্তরে ঐক্যবোধ আনে, জাতিকে আত্মস্থ করে, কর্তব্যপালনে উদ্বুদ্ধ করে। জাতির জীবনে উত্থান-পতন ঐতিহাসিক নিয়ম। যে জাতি আঘাত পায় না সে কখনও শক্তিশালী হয় না। আঘাতকে যে জাতি বিধাতার আশীর্ব্বাদ রূপে গ্রহণ করে, সকল কালিমা মুছিয়া ফেলিয়া জাতিকে আবার নূতন করিয়া নূতন শক্তিতে গড়িয়া তোলে, সে জাতি অমর। বাঙালীর যে ইতিহাস আমরা প্রাচীন কাল হইতে পাই তাহাতে ইহাই আমরা দেখিতেছি যে, বাঙালী সংগ্রামশীল, বাঙালী আদর্শবাদী, পরম ও চরম বিপদের দিনেও বাঙালী আত্মরক্ষা ও আদর্শরক্ষা করিতে জানে। এই গুণেই বাঙালী অমর হইয়াছে। বাঙালীর এই গুণ যেদিন নষ্ট হইবে—বাঙালী মরিবে সেই দিন। আত্মচিন্তা ও আত্মশুদ্ধি বাঙালী যে দিন পরিত্যাগ করিবে সেদিন আর কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

বাঙালীর শিক্ষা

ইংরেজ গবর্মেণ্ট একটি বিষয়ে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল। সেটি বাঙালীর শিক্ষা। বাঙালী যাহাতে সুশিক্ষা না পায়, নিজের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য জানিতে ও বুঝিতে না পারে তার জন্ত সকল প্রকার সতর্কতা ইংরেজ অবলম্বন করিয়াছিল। পাঠ্য পুস্তক, পাঠপ্রণালী প্রভৃতি ইংরেজ এমন ভাবে তৈরি করিয়া দিয়াছিল, এমন ভাবে তাহা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল যাহাতে বাঙালী তরুণ মন ভুল শিক্ষা ও কু-শিক্ষা পাইয়া বিপথে চালিত হয়। সাধারণ ভাবে ইহা সফল হইয়াছিল, কিন্তু ইহারই মধ্যে এমন সমস্ত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যাঁহারা ইংরেজ-পরিচালিত শিক্ষা-ব্যবস্থার কুফল বুঝিতে পারিয়া উহার পরিবর্তন ও সংস্কারের জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। আজ সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে স্বাধীনতার পর সাড়ে তিন বৎসরাধিক কাল কাটিয়া যাওয়ার পরেও সেই পুরানো ধারায় ভিন্ন উদ্দেশ্যে রচিত পাঠ্য পুস্তক সামান্ত এদিক ওদিক করিয়া আজও চলিতেছে। জাতিকে উপযুক্ত রূপে গড়িয়া তুলিতে হইলে শিশুশিক্ষা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে এবং সর্ব্বাগ্রে পাঠ্য পুস্তক ও পাঠপ্রণালী ঢালিয়া সাজিয়া নূতন অবস্থার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে ইহা জানিয়া এবং বুঝিয়াও আমরা তাহা করিতেছি না। পাঠ্য পুস্তক রচনা এবং বিক্রয় একটি ব্যবসাদারীতে পরিণত হইয়াছে, তেল ঘির মত উহাতেও ভেজাল চলিতেছে এবং বিশ্ববিত্তালয় ও সরকারী শিক্ষাবিভাগের কর্তারা এই ব্যবসায়ে পরসার প্রতিযোগিতা করিতেছেন। পাঠ্য পুস্তক ধরানোর ভিয়ে শিক্ষকদেরও কলুষিত করা হইতেছে। "চন্দ্রগুপ্তের ছেলে অশোক" এই জাতীয় ইতিহাসের বই পড়ানো হইতেছে, উহার নয়টি সংস্করণ হইয়াছে, শিক্ষকেরা পড়াইতেছেন এবং পরীক্ষা লইতেছেন। ইহা একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। এইরূপ পাঠ্য পুস্তকের রচয়িতাদের মধ্যে সিনেটের সদস্য হইতে আরম্ভ করিয়া স্কুলমাষ্টার এবং ম্যাট্রিক পরীক্ষার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত পরীক্ষকেরাও আছেন। অথচ বাংলাভাষার ভাল বই নাই এমন নয়। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীদের লেখা স্কুলপাঠ্য পুস্তক আজও অনায়াসে পড়ানো যাইতে পারে। ভাল বই উপযুক্ত লোকদের দিয়া লেখানো যাইতে পারে। প্রয়োজনবোধে বিদেশের ভাল স্কুলপাঠ্য পুস্তক অনুবাদ করিয়াও লওয়া যায়। কিন্তু করিবে কে? যাঁহারা করিবেন তাঁহারাই পাঠ্যপুস্তক ব্যবসায়ের ব্যবসায়ী। কাজেই শিক্ষিত লোকদের সকলকে ইহার প্রতিবাদ করিতে হইবে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় ঘুণ ধরাইবার এই পাপ বন্ধ করিতে হইবে। কলেজের শিক্ষার অবস্থাও তথৈবচ। ইণ্টারমিডিয়েটের ছেলেদের দুই বৎসরের কোর্স, ক্লাস হয় বড় জোর দশ মাস। ইহার মধ্যে অন্ততঃ তিনটি নূতন বিষয় শিখিতে হয়। অধ্যাপনার মান এত নীচে নামিয়াছে যে, ক্লাসের আকর্ষণী শক্তি থাকে না, পাঠ্যবিষয়বস্ত ছেলেরা বোঝে না। পরীক্ষার আগে রাত জাগিয়া নোট গেলে, পরীক্ষার হলে অসাধু উপায় অবলম্বন করে, কেহ কেহ গুণ্ডামিতেও প্রবৃত্ত হয়। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং পাঠ্যবিষয় তিনটিই সমানভাবে উপেক্ষিত হইতেছে। ফলে বাঙালী ছেলেরা আজকাল আই-এ-এস্, আই-পি-এস্, কাইমাজ প্রভৃতি নিখিল ভারতীয় পরীক্ষায় দাঁড়াইতে পারিতেছে না। কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন অধ্যাপনা সম্বন্ধে একই ব্যাপার। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অবস্থা বরং আরও সঙ্গীন, অভিযোগ জানাইতে যাওয়া বিপজ্জনক। কারণ যিনি অধ্যাপক, তিনিই প্রশ্নকর্তা, তিনিই পরীক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নে ভুল আজকাল প্রায় নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরীক্ষকদের খাতা দেখার জন্ত ভুল নির্দ্দেশ দেওয়াও আরম্ভ হইয়াছে। প্রশ্নকর্তার সঙ্গে অধ্যাপকদের কোন যোগ নাই, কোন্ বিষয় কি ভাবে পড়ানো হইয়াছে তাহা না জানিয়া প্রশ্ন রচনা হইতেছে, ফলে পরীক্ষার হলে হৈ চৈ পড়িতেছে। এই সমস্ত অসুবিধা বিশ্ববিদ্যালয় দূর করিতে পারেন না এমন নয়। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম যাহা হইবার তাহাই হইতেছে। ছাত্রদের অধ্যয়নস্পৃহা কমিয়া যাইতেছে। বাঙালী জাতির কল্যাণকামী সকলকে এই দিকে অতি সতর্ক দৃষ্টি দিতে হইবে।

কাব্যবস্থায়, পাঠ্যপুস্তকে, পাঠপ্রণালীতে যেখানে যে গলদ
হ আন্তরিক আগ্রহের সহিত সে সমুদয় নিরাকৃত করিতে
হবে। তাহাতে কার স্বার্থ গেল তাহা দেখিতে গেলে
বে না। ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা যাহাতে সুশিক্ষা পায়, তাহাদের
জ্ঞানের সুযোগ এবং স্পৃহা যাহাতে বাড়ে আহার জন্য সকল
চেষ্টা করিতে হইবে। এজন্য একটি বৎসর সময় যথেষ্ট।
আগামী বৎসরে শিক্ষিত বাঙালীদের চেষ্টায় ও আগ্রহে এই
কাজও যদি হয় তবে বাঙালী আবার জয়যাত্রা করিতে
পারিবে।

বাঙালীর কৃষি

বাঙালী এত দিন ছিল কৃষির উপর নির্ভরশীল। এখন
বঙ্গদেশের যে অবস্থা হইয়াছে তাহাতে আর কৃষিসর্ব্বস্ব
হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। শিল্প-জীবন এখন
অর্জনের প্রধান উপায় করিতে হইবে। অন্নসমস্যা সমা-
ধানের জন্য কৃষি বিষয়ে যতটা সম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে
দিতে হইবে। বাঙালী কৃষকের উৎপাদন শক্তি ও উৎপন্ন
দ্রব্যের বৈচিত্র্যের ভূয়সী প্রশংসা অনেক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকও
করিয়া গিয়াছেন। উপযুক্ত বীজ, উপযুক্ত সার এবং রোপণ
কালে কিছু ঋণ এই তিনটি পাইলে কৃষিপণ্যের উৎপাদন
অনেক বাড়িতে পারে। ফসল বৃদ্ধি আন্দোলনে এই তিনটিই
সরবরাহ করিবার কথা ছিল, সেজন্য বহু কোটি টাকাও খরচ
হইয়াছে কিন্তু কাজ বিশেষ কিছু হয় নাই। অধিকাংশ অর্থই
অপচয় হইয়াছে। পাট ও তুলা পশ্চিমবঙ্গের অর্থকরী ফসল।
এই দুইটির চাষ বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে কিন্তু পরিচালন-ব্যবস্থার
দোষে উহাও কার্য্যকরী হইতেছে না। বরং বিপরীত ফলই
ফলিতেছে। বহু ধানজমিতে পাট বোনা হইয়াছিল কিন্তু
জল দোষে গাছ অল্প বড় হইয়াই থামিয়া যায়। কয়েক
হাজার বিঘা জমিতে এইভাবে ধানও হইল না, পাটও পচাইল
না। যে সব কর্ম্মচারী ইহার জন্য দায়ী তাহাদের দুই জনকে
সাসপেণ্ড করিয়া সমস্ত ব্যাপার অনুসন্ধান হইতেছে কিন্তু এই
ক অভিজ্ঞতা কর্ত্তৃপক্ষ কাজে লাগাইয়াছেন বলিয়া মনে
হইতেছে না। ভারতীয় কেন্দ্রীয় তুলা কমিটি পশ্চিমবঙ্গে তুলা-
চাষ বৃদ্ধির জন্য দেড় লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। পশ্চিম-
বঙ্গের কৃষিবিভাগ ২৫০০ একর জমিতে প্রথমী-আমেরিকান
জাতীয় তুলা চাষের জন্য কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয়
তুলা কমিটি ইহা অনুমোদন করিয়াছেন। পাট চাষের
ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা হইতে কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত
ছিল। প্রথমতঃ, যে তুলাচাষ হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিবার
পূর্ব্বে তুলাচাষ সম্বন্ধে পরামর্শদানের জন্য যে প্রাদেশিক কমিটি
হইয়াছে তাহার সহিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এই
পরামর্শদাতা কমিটিতে আছেন বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের ডাঃ
... দেব, খাদি বোর্ডের শ্রীপঞ্চানন বসু এবং ঢাকেশ্বরী মিলের
শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের মাটিতে তুলাচাষ বিষয়ে
ইঁহাদের তিন জনেরই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। আমরা
জানিতে পারিলাম যে ইঁহাদের কাহারও সহিত পরামর্শ না
করিয়াই পশ্চিমবঙ্গ কৃষিবিভাগ উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া-
ছেন। দ্বিতীয়তঃ, বাংলার মাটিতে যে সব তুলা জন্মাইবার
চেষ্টা হইবে তাহাদের বিঘাপ্রতি উৎপাদনের পরিমাণ, আঁশের
দৈর্ঘ্য, রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা প্রভৃতি সব বিষয় বিচার করিয়া
তবে কোন্ জাতীয় তুলার চাষ করা লাভজনক হইবে তাহা স্থির
করা উচিত ছিল। ইহা করা হয় নাই। তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রীয়
তুলা কমিটির সেক্রেটারী গত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায়
আসিলে তাঁহাকে তুলা উৎপাদনের সবগুলি কেন্দ্র দেখান
হইয়াছিল। পাটের ব্যাপারে যে ভুল হইয়াছে তুলার ব্যাপারে
যাহাতে সেরূপ না হয় তাহা দেখিবার যথেষ্ট সুযোগ তাঁহাকে
দেওয়া হইয়াছিল। দেখা যাইতেছে তিনি তাহা গ্রহণ করেন
নাই, নিজের খুসীমত একজাতীয় তুলার চাষ তিনি অনুমোদন
করিয়া গিয়াছেন। তুলা পরামর্শদাতা কমিটিকে অগ্রাহ্য
করিয়া তুলাচাষ বিষয়ে যাহা করা হইতেছে তাহা আমরা
অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া মনে করি। আমাদের চাষীদের সহজাত
বুদ্ধি ও পরিশ্রমের সহিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান মিলিত হইলে প্রচুর
উপকার হইবে। এই কলিকাতাতেই বসু-বিজ্ঞান-মন্দির এই
সমস্ত বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন এবং তাঁহাদের গবেষণালব্ধ
ফল দূরদূরান্তরের দেশসমূহ গ্রহণ করিতেছে। সম্প্রতি সুইডেন
হইতে ইহাদের সহকারিতা আহ্বান করা হইয়াছে।
আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইঁহাদের সাহায্য হাতের মধ্যে
পাইয়াও তাহা গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন না, ইঁহাদের পরামর্শ
উপেক্ষা করিয়া চলিতেছেন। সাড়ে তিন বৎসরে বাংলার কৃষির
যতটা উন্নতি আমরা করিতে পারিতাম তাহা আমরা করি
নাই। আগামী এক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিবিভাগ যদি
খানিকটাও করিতে পারে তাহাতেও লাভ হইবে। খাদ্যশস্য
এবং অর্থকরী ফসল উভয় দিকেই উন্নতির যথেষ্ট ক্ষেত্র
রহিয়াছে।

বাঙালীর শিল্প

পশ্চিমবঙ্গে ঘন বসতি এখন এত বেশী বাড়িয়া গিয়াছে যে,
কৃষিজীবী হইয়া আর আমাদের থাকা চলিবে না। শিল্পকে
প্রধান উপজীবিকারূপে আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।
পশ্চিমবঙ্গ এখন শহর প্রধান প্রদেশ, সুতরাং শিল্প সংগঠনের
জন্য যে ঘন বসতি লাভজনক তাহা গড়িয়া উঠিতেছে। বৃহৎ
শিল্প গঠন বহু অর্থ ও অন্যান্য জিনিষের উপর নির্ভর করে।
আমরা ছোট ছোট শিল্পের দিকে অনায়াসে মন দিতে পারি।
সুইজারল্যাণ্ড এবং জাপানের শিল্পজীবনের আদর্শে আমরা
আমাদের শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারি। ক্ষুদ্র শিল্পগঠনের জন্য
খুব বেশী টাকা লাগিবে না, ইহাতে কায়িক শ্রম এবং কর্ম্মে

নিষ্ঠা প্রধান মন্ত্র হইবে। কলিকাতা, আসানসোল প্রভৃতি স্থানে এখনই বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, এই দুটি শহরকে কেন্দ্র করিয়া উহাদের উপকণ্ঠে বহু ছোট শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে। দামোদরের বিদ্যুৎও শীঘ্রই আসিবে। তখন আরও সুবিধা হইবে। শিল্পোন্নতি করিতে গেলে সব কাঁচামাল এবং সব বিক্রয়কেন্দ্র দেশের মধ্যে থাকিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। ব্রিটিশ ও জাপানী বস্ত্র-শিল্প পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কিন্তু উভয়েই বিদেশের কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল। সুইজারল্যাণ্ডের কয়লাও নাই, লোহাও নাই, অথচ সেখানকার যন্ত্রশিল্প পৃথিবী বিখ্যাত। বাঙালী যদি শিল্পক্ষেত্রে নিষ্ঠার সহিত মনোযোগ দিয়া এমন ভাল জিনিষ তৈরি করে যাহা উৎকর্ষে জার্ম্মান বা সুইস-দ্রব্যের ন্যায় হইবে, তবে দেশে কেন, বিদেশেও বাঙালীর তৈরি জিনিষের আদর হইবে। এই ভেজাল ও ফাঁকিবাজীর যুগে যে দেশ উৎকৃষ্ট এবং খাঁটি জিনিষ দিবে ব্যবসাজগতে তাহার উন্নতি অপরিহার্য্য। যন্ত্রশিল্প, রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতিতে বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত বাঙালী অগ্রসর হইলে তাহাকে অপরে প্রতিযোগিতায় সহজে হটাইতে পারিবে না। বর্ত্তমান রাষ্ট্রে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা ভিন্ন শিল্পোন্নতি কঠিন—এই অভিযোগের মধ্যে সত্য আছে। বাঙালী ব্যবসায়ীদের নিকট তিনটি প্রধান অভিযোগ আমরা শুনিয়া থাকি—প্রথম, লাইসেন্স পারমিট ছাড়া ব্যবসা চালানো অসম্ভব কিন্তু বাঙালীর পক্ষে এগুলি সংগ্রহ করা খুব কঠিন। উপরের দিকে খুঁটির জোর না থাকিলে উহা পাওয়া যায় না। কেন্দ্রীয় সেক্রেটারীয়েটের এখন যে অবস্থা, তাহাতে বাঙালীর পক্ষে সাহায্য লাভ একরূপ অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, ট্যাক্স ব্যবস্থা এত খামখেয়ালী এবং বৈষম্যমূলক যে তাহাও বাঙালীর শিল্পোন্নতির পক্ষে একটি প্রধান বাধা। অবাঙালী বড় বড় ব্যবসায়ীরা ট্যাক্স ফাঁকি দিতে পারে, বাঙালীদের পিষিয়া ঐ ঘাটতি মিটানো হয়। সেল-ট্যাক্সের অত্যাচার বাঙালী শিল্পজীবী এবং ব্যবসায়ীদের উপর এত প্রচণ্ড হইয়াছে, উহা এত সাংঘাতিক ভাবে বাঙালী-দের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতেছে যে, অনেকে কারবার বন্ধ করিতে বাধ্য হইতেছে। ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতি হইতেছে সৎ ব্যবসায়ীদের। আমরা এরূপ দৃষ্টান্ত জানি। তৃতীয়তঃ, ছোট বাঙালী ব্যাঙ্কগুলি বাঙালী ব্যবসা ও শিল্পে অর্থ সাহায্য করিত। এগুলি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় এবং যেগুলি আছে সেগুলি বায়েল হওয়ায় বাঙালী ব্যবসায়ীদের অর্থসাহায্য লাভের পথ বন্ধ হইয়াছে। বড় ব্যাঙ্ক ছোট ব্যবসায়ীকে টাকা দেওয়ার ঝামেলা লইতে চাহে না। একটি প্রাদেশিক ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার দ্বারা ইহার প্রতিকার হইতে পারে। এরূপ কথাও উঠিয়াছে কিন্তু কাজ অগ্রসর হয় নাই। বাঙালী ব্যবসা ও শিল্প বাঁচাইতে হইলে এইরূপ ব্যাঙ্ক অবিলম্বে গঠন করা প্রয়োজন। বাংলার শিল্পবিভাগ বাঙালী শিল্পসংগঠনে কখনও সাহায্য করে নাই; এখনও করিতেছে না। অর্থ-সচিবের ভূতপূর্ব্ব লাইব্রেরিয়ানকে ঐ পদে বসাইয়া রাখা হইয়াছে; ইনি অনভিজ্ঞতার দরুন বিশেষ কোনরূপ সাহায্য বাঙালী শিল্পসমূহকে করিতে পারিতেছেন না। এই পদে এক জন উপযুক্ত লোক নিয়োগ করিলে বাঙালী শিল্পসংগঠনে অনেক সাহায্য হইবে। এই কাজ করিতে সময় লাগিবে কেন, এত দিন করাই বা হয় নাই কেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

বাংলার বাহিরে বাঙালী

বাংলার বাহিরে বাঙালীর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকেই চলিয়াছে। দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটে কেবিনেট মর্য্যাদাসম্পন্ন বাঙালী মন্ত্রী একজনও নাই। একজন ছাড়া গুরুদায়িত্বসম্পন্ন কোন বিভাগীয় সেক্রেটারীও নাই। দিল্লী সেক্রেটারিয়েটে বাঙালী কর্ম্মচারীর স্থান দ্রুত সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। বিহারে ও আসামে বাঙালী বিদ্বেষ কিছুমাত্র কমে নাই। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগঠনের জন্য বাংলার দাবিকে গলা টিপিয়া হত্যা করা হইয়াছে। নূতন রাষ্ট্রবিধিতে প্রাদেশিক সীমা পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে এত কঠিন বিধি আরোপিত হইয়াছে—যাহার ফলে ভবিষ্যতে বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলিকে বাংলায় ফিরাইয়া আনা দুঃসাধ্য হইবে। ঘাটশীলা প্রভৃতি স্থানে বাঙালী কলোনি স্থাপনে সরকারী মহল হইতে বাধা দেওয়া হইতেছে। বিহারে যে সমস্ত বাঙালী উদ্বাস্তু গিয়াছে তাহা-দিগকে বঙ্গভাষাভাষী জেলা মানভূমে বা অন্য বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলে বসবাস করিতে দেওয়া হইতেছে না। ভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা, সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে বিশ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙালী যে ভাবে যোগ দিত আজ তাহা পারে না। ইহার কারণ কতকটা বাহিরের চাপ, কতকটা বাঙালীদের নিজেদের সঙ্কোচ। অথচ দেখা গিয়াছে যে, সব প্রদেশেই কঠিন দায়িত্ব-পূর্ণ পদে এখনও বাঙালীই সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। বিহারেই ইহার প্রমাণ আছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ চোরাকারবারীকে রাষ্ট্রদ্রোহী কার্য্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত করিয়া কঠোর হস্তে উহা দমন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। দুর্নীতি দমন বিভাগের ভার এতদিন একজন বিহারী কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত ছিল। সম্প্রতি এই ব্যক্তির দুর্নীতিপরায়ণতা ধরা পড়িয়াছে এবং তৎস্থলে এক-জন বাঙালীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বাঙালীকে বাদ দিয়া চলা কাহারও পক্ষে যাহাতে লাভজনক না হয় এই ভাবে বাঙালীরা চলিতে আরম্ভ করিলে বাংলার বাহিরে বাঙালীর পুনঃপ্রতিষ্ঠালাভ হয়ত বেশী কঠিন হইবে না। মানভূম লোক-সেবক সঙ্ঘ নিষ্ঠার সহিত জনসেবা এবং তাহাদেরই সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হইয়া গণসেবায় আত্মনিয়োগের দ্বারা

যে নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিতেছেন তাহার ফল সুদূরপ্রসারী হইবে।

ডাকমাশুল বৃদ্ধি

ভারত-সরকারের সংযোগ-সচিব রফি আহমেদ কিদোয়াই মণিঅর্ডার, রেজেষ্ট্রী, ভি.পি. পার্শেল প্রভৃতির মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব পার্লামেণ্টে আনিয়াছেন। লোকাল চিঠিতে এক আনার খামের যে সুযোগ এক বৎসর আগে দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও প্রত্যাহার করা হইবে। মাশুল বৃদ্ধির কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছে এই বলিয়া যে পোষ্ট আপিসের কাজ বাড়িয়াছে, লোক বাড়াইতে হইয়াছে এবং অতিরিক্ত লোকের বেতন বাবদ ১,৩৫,০০,০০০ টাকা খরচ বাড়িয়াছে। এই অতিরিক্ত খরচটা তাঁহারা ডাকমাশুল বাড়াইয়া তুলিতে চান। তিনি পোষ্টকার্ডের দাম বাড়ানোর কথাও বলিয়াছিলেন; তার জন্ত এই যুক্তি দিয়াছিলেন যে, খামের দাম দুই আনা এবং পোষ্ট-কার্ড তিন পয়সা হওয়াতে লোকে খামের পরিবর্তে বেশী করিয়া কার্ড ব্যবহার করিতেছে। ইহাতে আয় যাহা হইতে পারিত তাহা হইতেছে না। সুতরাং খামের দাম কমাইতে হইবে। নচেৎ পোষ্টকার্ডের দাম বাড়াইতে হইবে। মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাবে দেখা গেল আপাতত: তিনি ইহা স্থগিত রাখিয়াছেন।

কিদোয়াই সাহেবের কোন যুক্তিই বিচারসহ নহে। ডাক, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন তিনটিই এখন একটি বিভাগের অন্তর্গত। এই তিনটির আয় একসঙ্গে ধরিয়া সেই ভাবে লাভ-লোকসান দেখা উচিত। তিনি তাহা করেন নাই। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনে প্রচুর লাভ হইতেছে, পোষ্টে হয়ত কিছুটা ঘাটতি পড়িতেছে। সমগ্র ডাক বিভাগের এই তিনটি শাখা মিলাইয়া সমস্ত হিসাব একত্র ধরিলে ঘাটতি হয় না, ডাকমাশুল বাড়াইলে যে লাভ হইবে তাহা কি হইবে? গবর্মেণ্টকে দেওয়া হইবে কিনা তাহা স্পষ্ট বলা হয় নাই। গবর্মেণ্ট রেল, পোষ্ট আপিস প্রভৃতিকে রাজস্ব আদায়ের উপায় হিসাবে ধরিতে আরম্ভ করিলে উহাদের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। অন্তত: পোষ্ট আপিসকে কিছুতেই আয়ের পথ হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়, ইহাতে ঘাটতি হইলে তাহা সাধারণ রাজস্ব হইতে দেওয়া উচিত। আধুনিক যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যে কাজ-কারবারে ডাকের গুরুত্ব খুব বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। ডাক সস্তা, নিয়মিত এবং দ্রুত না হইলে উহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। একেই তো রবিবারের ডেলিভারী বন্ধ করিয়া ডাকের নিয়মিত দিকটা নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সপ্তাহের শেষের দিকে শুক্র-শনিবারে কোন চিঠি ডাকে দিয়া তার জবাবের উপর নির্ভর করিয়া পরের সপ্তাহের গোড়ার দিকের কোন কাজে নির্ভর করা অসুবিধাজনক হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধ বাধিলে সপ্তাহে একদিন ডাক বন্ধ রাখিয়া এবং তার জন্ত সপ্তাহান্তিক ডাকে বিশৃঙ্খলা আনিয়া কিভাবে চলিবে আমরা তাহা বুঝিতেছি না।

কিদোয়াই সাহেব বলিয়াছেন যে, ট্রাফিক বাড়িয়াছে বলিয়া ১,৩৫,০০,০০০ টাকা খরচ করিয়া অতিরিক্ত লোক লইতে হইয়াছে। রবিবারে ডাক বিলি বন্ধ করায় কত টাকা বাঁচিয়াছে তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই। ট্রাফিক বৃদ্ধির পরিমাণও খুব বেশী নহে। ডাক বিভাগ পার্লামেণ্টে কয়েক-দিন আগে যে বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন তাহাতে ট্রাফিকের নিম্নোক্ত হিসাব দেখিতেছি:

	১৯৫০-৫১ আনুমানিক হিসাব	১৯৪৯-৫০ প্রকৃত হিসাব
রেজিষ্টার্ড পোষ্ট	৭ কোটি ১৮ লক্ষ	৭ কোটি ১০ লক্ষ
মণি-অর্ডার টাকা	১৭২ কোটি টাকা	১৬০ কোটি টাকা
মণি-অর্ডার সংখ্যা	৪ কোটি ৮৮ লক্ষ	৪ কোটি ৮০ লক্ষ
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব	১ কোটি ১৭ লক্ষ	১ কোটি ১০ লক্ষ
ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট	১৫ লক্ষ	৪২ লক্ষ
মোট ডাকের জিনিষ	২০৩ কোটি ৪০ লক্ষ	২১৬ কোটি ৬০ লক্ষ

মোট ২১৬ কোটি স্থলে ২০৩ কোটি ডাকের জিনিষ হওয়াকে ট্রাফিক বৃদ্ধি বলে এবং তার জন্য প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে নূতন লোক নিযুক্ত করিতে হয় ইহার তাৎপর্য্য আমরা বুঝিলাম না।

টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোনেও বিশেষ কিছু বৃদ্ধি হয় নাই, হইলেও তার খরচ ডাকের ঘাড়ে চাপিবে কেন? ঐ দুই শাখার আয়ের টাকা ডাকের ঘাটতি মিটাইতে দেওয়া হইবে না, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির খেসারৎ দিবে ডাক, ইহাই বা কেন হইবে? উহাদের ট্রাফিক বৃদ্ধি এইরূপ:

	১৯৫০-৫১ আনুমানিক হিসাব	১৯৪৯-৫০ প্রকৃত হিসাব
টেলিগ্রাম	২ কোটি ৬৮ লক্ষ	২ কোটি ৬২ লক্ষ
টেলিফোন কানেকসন	১,৩৮,৭৫৬	১,২৯,৫৭২
ট্রাঙ্ক কলের সংখ্যা	৫৭ লক্ষ	৫২ লক্ষ

ডাক বিভাগের চারিটি শাখা—পোষ্ট, টেলিগ্রাফ, টেলি-ফোন এবং রেডিওর হিসাব একত্রে বাজেটে ধরা হয়। তাহাতে প্রচুর উদ্বৃত্ত থাকে। এক একটি শাখাকে আলাদা ভাবে লাভজনক করিবার জন্ত মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব বোধ হয় এই প্রথম হইল। গত বৎসরেও পোষ্টের হিসাবে প্রচুর ঘাটতি ছিল, তৎসত্বেও ডা: মাথাই মাশুল বৃদ্ধি ত করেনই নাই, বরং লোকাল চিঠি, লেটার কার্ড প্রভৃতি প্রবর্তন করিয়া সুবিধাই দিয়াছিলেন। লাভ লোকসানের হিসাব এইরূপ:

	১৯৪৯-৫০ হাজার টাকা	১৯৫০-৫১ হাজার টাকা	১৯৫১-৫২ হাজার টাকা
ডাক	−৭৯,৩৭	−৪৫,০৩	−১,৩৯,৩১
টেলিগ্রাফ	+১,৩০,৫০	+১০,৯৯	−২,৩১
টেলিফোন	+২,০৩,৬২	+৩,৬২,০০	+৩,৬২,৫৩
রেডিও	−১৬,৮৭	−২০,৭২	−২১,১৯
মোট বিভাগ	+২,৩৭,৮৮	+৩,০৭,২৪	+১,৯৯,৭২

সমগ্র ডাক বিভাগের ব্যালান্স-সীটের এই অবস্থায় মাশুল বৃদ্ধির ক্ষেত্র কোথায় ?

আমাদের দেশের লোক গরীব এবং তাহাদের ক্রয়শক্তির তুলনায় ডাক মাশুল বেশী ইহারও প্রমাণ কিদোয়াই সাহেবই দিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন যে গত বৎসর টেলিগ্রামের মাশুল ১৩ আনা হইতে কমাইয়া ১২ আনা করাতেই ২ লক্ষ টেলিগ্রাম বেশী হইয়াছে এবং ট্রাঙ্ক কলের চার্জ্জও সামান্য কমানোতে ৫০ লক্ষ কল বেশী হইয়াছে। দুই আনার খাম লোকে কিনিতে পারে না, তিন পয়সায় পোষ্টকার্ডে অসুবিধা হইলেও কাজ সারে ইহাও তিনিই বলিতেছেন। এক দিকে বয়স্ক শিক্ষার জন্য বড় বড় কথা বলা হইতেছে, আর একদিকে রেজিষ্টার্ড পার্শেল ভি-পি প্রভৃতির মাশুল বৃদ্ধি করিয়া শিক্ষা বিস্তারের পথে কাঁটা দেওয়া হইতেছে। সারা ভারতে সংবাদ আদান-প্রদান ও যাতায়াত সস্তা ও আরামপ্রদ করিলে প্রদেশে প্রদেশে যোগাযোগ বাড়িয়া একজাতীয়তার মনোভাব বাড়িবে সেদিক দিয়া পোষ্ট আপিস ও রেলওয়ের যে কর্ত্তব্য ছিল তাহাও করা হইতেছে না।

মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব থাকিলে বাজেটে তাহা করা হয় ইহাই প্রচলিত নিয়ম। এবার ডাকমাশুল আলাদা ভাবে বাড়াইবার যে নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করা হইল তাহা নীতিবিরুদ্ধ। রেল বাজেট সাধারণ বাজেট হইতে আলাদা করার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন হইয়াছিল, এখন পোষ্টাল বাজেটও আলাদা হইতে চলিয়াছে। এই নূতন পদ্ধতি আমরা সমর্থন করিতে পারিতেছি না।

চা-শিল্পের ভবিষ্যৎ

এই শিরোনামায় করিমগঞ্জের (কাছাড়) গত ১৬ই ফাল্গুনের "পূর্ব্বাচল" পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বিলাতেই চা-এর প্রচলন বেশী; সেই দেশের নরনারীই চা বেশী পান করেন। সেইজন্য তাঁহাদের প্রয়োজন অনুসারে চা-এর দাম নির্দ্ধারিত হয় এবং এখন পর্য্যন্ত চা-শিল্প ইংরেজ পুঁজিপতির নিয়ন্ত্রণে আছে। এই সুযোগে তাঁহারা যাহা করিতেছে তাহাই, ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চা-উৎপাদনের কেন্দ্র হইতে আমাদের সহযোগী বর্ণনা করিতেছেন :

"স্বাধীনতা লাভের পর ইউরোপীয়ান পরিচালিত বাগানগুলির বিক্রয়সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তাহা খুব উচ্চ মূল্যেই ভারতবাসীরা ক্রয় করিতেছেন। চা-শিল্পে তাহাদের নিয়োজিত মূলধন এবং এই ব্যবসায়ে তাহাদের উদ্বৃত্ত লাভের অংশ তাহারা এমন কৌশলে সমুদ্রের পরপারে পাচার করিতেছে যে, সহজ দৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়ার কোন কথা নহে। ভারত ত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহারা ভারতীয় চা-শিল্পকে ধ্বংস করিবার যেমন সঙ্কল্প করিয়াছে, চা-ব্যবসায়ে লব্ধ টাকার মোটা অঙ্কও তেমনি নানা উপায়ে নিজ দেশে পার করার চেষ্টা করিতেছে। এই উপায়ে আমাদের গবর্ণমেণ্টের ইন্‌কাম ট্যাক্স বাবদ ন্যায্য প্রাপ্য টাকাও ফাঁকি তাহারা দিতে পারিতেছে। ইহা কিরূপে সম্ভব হইতেছে, তাহাই বলিতেছি। চা-বিক্রয়লব্ধ যে মোটা টাকা তাহাদের হস্তগত হইতেছে, তাহা কোন অবস্থায়ই গোপন করার উপায় নাই। কাজেই এই মোটা টাকার অধিকাংশই যদি কোন মূলধন খাতে (Capital Expenditure) ব্যয় দেখান যায়, তাহা হইলে সহজেই ইন্‌কাম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া চলে এবং টাকাটাও সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়া তাহাদের স্বগোষ্ঠীর সম্পদ বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে। একটু অনুসন্ধান করিলে সকলেরই চক্ষে ধরা পড়িবে যে, গত দুই-তিন বৎসর যাবৎ অনবরত ইউরোপীয়ান বাগানের মালিকগণ, প্রয়োজন না থাকিলেও, তাহাদের স্বদেশীয় বহু যন্ত্রপাতি এবং অসংখ্য মোটরযান ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বাগানের উপলক্ষে বিপুল পরিমাণে আমদানী করিতেছে। এই যন্ত্রপাতি ও মোটরের দর আজকাল খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে এই পন্থায় লাভের মোটা অঙ্কটা ব্যয়ের খাতে (Capital Expenditure) লিখিয়া ইন্‌কাম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া হইতেছে এবং টাকাও অক্ষত অবস্থায় দেশে গিয়া পৌঁছিতেছে। তাহারা ভাল রকমই জানে যে, চড়া দরে বর্ত্তমানে অহেতুকী যেসব যন্ত্রপাতি, গাড়ীঘোড়া তাহারা আমদানী করিতেছে, বাগান বিক্রয়কালে উহারও উপযুক্ত মূল্য তাহারা ভারতীয় ক্রেতাগণ হইতে আদায় করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে। ইহা হইল আমাদিগকে ঠকাইয়া টাকা স্বদেশে পার করার একটি মাত্র উপায়।"

কলিকাতা বন্দর ও জাহাজঘাটার সমৃদ্ধি এই চা-এর গতিবিধির উপর অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে। কলিকাতা হইতেই ভারতে উৎপাদিত চা-এর বেশীর ভাগ বিদেশে যায়। সেইজন্য উপরোক্ত অনাচার সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত। কারণ বাংলাভাষায় লিখিত মন্তব্য সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ বা কেন্দ্রীয় বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রীপ্রবরের গোচরে আসে না। আমরা এই অনাচারের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

উদ্বাস্তু উচ্ছেদ বিল

উদ্বাস্তু উচ্ছেদ বিল পাস হইয়াছে। এই বিলের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন হইয়াছে। এই আন্দোলনে কিছু অভিনবত্ব দেখা গিয়াছে। কৃষক-প্রজা পার্টি, সোস্যালিষ্ট পার্টি এবং কম্যুনিষ্ট পার্টি উদ্বাস্তু বিলের বিরোধিতা করিতেছিলেন। প্রথম তিন দল একত্র ছিলেন, কম্যুনিষ্টরা আলাদাভাবে আন্দোলন চালাইতেছিলেন। ফরোয়ার্ড ব্লকের এক অংশ ছিলেন প্রথম দলে, অপর অংশ দ্বিতীয় দলে। কৃষক-প্রজা দলের মধ্যেও এ বিষয়ে ঐক্য সব সময়ে রক্ষিত হয় নাই। শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় মুসলমানদের হইয়া অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে কম্যুনিষ্টদের সহিত সহযোগিতা করিয়াছেন। ব্যবস্থা-পরিষদের মধ্যে নিজের দলের নেতার সঙ্গেও তিনি যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা তাঁহার রাজনৈতিক কর্ম্মে যোগ্যতা সূচিত করে না। ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিলের যে-সব সংশোধন প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা গ্রহণ করিয়া ডাঃ রায় দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। যে সমস্ত প্রকৃত উদ্বাস্তু এখানে আসিয়া পরের জমিতে জোর করিয়া বসিয়া গিয়াছেন তাঁহারা এইরূপভাবে জমি দখলের ভুল নিজেরাই অনুভব করিতেছেন। এইরূপ জমিতে কখনো ড্রেন বা ইলেকট্রিক পাওয়া যাইবে না, ইহা উত্তরাধিকারসূত্রে পুত্রকন্যাকেও দেওয়া যাইবে না, ফলে দান-বিক্রয়ের অধিকারও ইহাতে থাকে না। তাঁহারা জমি না পাইয়া অগত্যা বসিয়া গিয়াছিলেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে জমি পাইলে তাহা গ্রহণ করিতে সর্ব্বদাই স্বীকৃতি জানাইয়াছেন। এখানে সর্ব্বপ্রধান লক্ষণীয় বিষয় তাঁহাদের জীবিকার স্থল। এতদিন যে জীবিকা তাঁহারা গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কাছাকাছি জমি দিলে ইঁহারা সামলাইয়া লইতে পারিবেন। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের বসতি স্থাপন করিতে হইবে এই প্রদেশের সকলেই ইহা অনুভব করেন। বসতি স্থাপন আপোষে এবং সুশৃঙ্খল ভাবে করিলেই তাহা সব দিক দিয়া ভাল হইবে। গবর্ণমেণ্ট এ দিকে এতদিন ভাল ভাবে মন না দেওয়াতেই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহাদের এখন সতর্ক হওয়া উচিত। কিন্তু যে সব নকল উদ্বাস্তু এই প্রদেশে দীর্ঘকাল আছেন, পরের জমি সস্তায় দখল করিয়া ভোগ করিবার চেষ্টা যাঁহারা করিতেছেন, গোলযোগ সৃষ্টি করিতেছেন তাঁহারাই। জমি বেদখলে যে সমস্ত টেকনিক এই শ্রেণীর লোকেরা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা মানিয়া লইলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোন অস্তিত্ব থাকিবে না, সমগ্র সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। আমাদের মনে হয় জমি দখলকারী প্রত্যেক উদ্বাস্তুর নাম, ঠিকানা ও পূর্ব্ব পরিচয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অবিলম্বে সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। এই তালিকা প্রকাশ হইলে জনসাধারণই উদ্বাস্তুর ছদ্মবেশধারী বাস্তুঘুঘুদের সায়েস্তা করিতে পারিবে। ইহারা সমগ্র বাঙালী জাতিকে এবং উদ্বাস্তুদেরও ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে এবং দেশে একটি অনাবশ্যক বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিতেছে। শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় মুসলমানদের জমিগুলি হইতে উদ্বাস্তুদের সরাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, হিন্দুর জমি ইহারা দখল করিলে তাঁহার আপত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। কম্যুনিষ্টরা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে বিশ্বাস করেন না, অথচ এই বিলে তাঁহারা মস্তবড় আন্দোলনকারী সাজিয়া বসিয়াছেন। সোস্যালিষ্ট নেতা শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্য্যকলাপেও সামঞ্জস্য এবং সদিচ্ছার পরিচয় সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। প্রধানমন্ত্রী উদ্বাস্তু বিলে বিরোধী দলের যুক্তিক্রম গ্রহণ করিয়া উহা বিলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া যে সদিচ্ছার পরিচয় দিয়াছেন আইনটি কার্য্যে পরিণত করিবার সময়েও সেইরূপ দূরদর্শিতা দেখিতে পাওয়া যাইবে বলিয়া আমরা আশা করি। এই আইন খুব গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করিতে হইবে। ইহা ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষায় সাহায্য করিবে, প্রকৃত উদ্বাস্তুর অভাব মোচন করিবে এবং প্রদেশের অধিবাসী ও উদ্বাস্তুদের মধ্যে যে মনোমালিন্য গড়িয়া উঠিতেছিল তাহা দূর করিবে। সুষ্ঠুভাবে আইনটি প্রযুক্ত হইলে ইহা আদৌ অসম্ভব হইবে না।

স্বয়ংসম্পূর্ণ উদ্বাস্তু বসতি

কলিকাতা হইতে মাত্র ৫৫ মাইল দূরে নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে প্রায় ২,৭০০ বিঘা জমির উপর সরকার কর্ত্তৃক এক স্বয়ং-সম্পূর্ণ বসতি স্থাপিত হইতেছে। এই গ্রামটি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান ছিল; বিগত ৬০·৭০ বৎসর ধরিয়া ম্যালেরিয়ার আক্রমণে তাহা লোক-বিরল ও স্বাস্থ্যহীন জনপদে পরিণত হয়। এই নূতন পরিকল্পনার প্রসাদে তাহা আবার কর্ম্মচঞ্চল, নূতন জীবনে স্পন্দিত হইতেছে। এই পরিকল্পনার নাম দেওয়া হইয়াছে—"নদীয়া পরিকল্পনা।" কেন্দ্রীয় সরকার ইহার ব্যয়-ভার বহন করিবেন এবং তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে এই কার্য্য পরিচালিত হইবে বলিয়া মনে হয়।

এই পরিকল্পনার একটি বিবরণ পাইয়াছি। নিম্নে তাহার সারাংশ দিলাম :

কৃষি, শিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য কলকারখানা প্রভৃতির সমন্বয়ে সমবায় প্রণালীতে সম্পূর্ণরূপে আত্মকর্ত্তৃত্বশীল ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ একটি আদর্শ শহর গড়িয়া তোলাই হইতেছে এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। পরিকল্পনাটির নাম দেওয়া হইয়াছে "নদীয়া পরিকল্পনা"।

১৯৫০ সালের জুন মাসে নদীয়া পরিকল্পনা অনুযায়ী সর্ব্বপ্রথম কাজে হাত দেওয়া হয়। ঐ বৎসরই আগষ্ট মাসের শেষাশেষি বিভিন্ন কারিগরী ও বৃত্তিকরী শিক্ষা সম্পর্কে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য মোট ১৩টি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। কারিগরী ও বৃত্তিকরী শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে মোট ২০০ শত ছাত্র লওয়া হইয়াছে; কৃষি শিক্ষা বিভাগে লওয়া হইয়াছে ৫০ জন। তাহা ছাড়া সূচীশিল্প, পশম, বেত ও বাঁশের কাজ এবং মৃৎশিল্প

বিভাগে ১৫০ জন নারী শিক্ষার্থীও গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন করিয়া অভিজ্ঞ শিক্ষক আছেন। এই সকল ছাত্রছাত্রীর সকলেই উদ্বাস্তু। শিক্ষকদের মধ্যেও অধিকাংশই বাস্তুহারা।

শিক্ষাকেন্দ্রগুলির গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইয়াছে। ইট ও 'হলোব্লকে'র দেওয়াল এবং এসবেষ্টসের ছাউনী দ্বারা গৃহগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে কৃষি, চিত্রকলা, যন্ত্রপাতির অংশবিশেষ নির্ম্মাণ (ফিটার্‌স শপ্‌), ছাপাখানা ও বই বাঁধাইয়ের কাজ, দর্জির কাজ, বয়নশিল্প, ওয়েল্ডিং, ঝুড়ি ও খেলনা তৈরি, কাঁসার বাসনপত্র তৈরি, বংশশিল্প, মন্ডা প্রস্তুত এবং কাঠের কাজও উল্লেখযোগ্য। এই সকল কেন্দ্রের মোট ৪০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে কৃষি বিভাগ ছাড়া অন্যান্য বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বর্ত্তমানে ২৬৫ জন।

কৃষি কার্য্যের জন্য দুইটি ট্রাক্টর ক্রয় করা হইয়াছে। এই ট্রাক্টর দ্বারা পতিত জমি উদ্ধারের কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

শিক্ষার্থীদের জন্য পরিকল্পিত শহর হইতে কিছু দূরে দুলিয়া ষ্টেশনের নিকট একটি অস্থায়ী হোষ্টেলের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। নারী শিক্ষার্থীরা এবং যে সামান্য কয়েক ঘর করিয়া চাষী, তাঁতি, কর্ম্মকার প্রভৃতি পরিবার বসান হইয়াছে তাহাদের জন্য আপাততঃ শহর এলাকার একপাশে অস্থায়ী ভাবে চালাঘর বা ছাউনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে বেশ একটা কাজের আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ হাতুড়ী পিটাইতেছে, কেহ করাত চালাইতেছে, কেহ তাঁত বুনিতেছে, কেহ বা ছবি আঁকিতেছে। কেহই বসিয়া নাই। তবে ছাত্রদের মধ্যে যাহাদের ভারি কাজে ব্যস্ত দেখা গেল তাহাদের মনে কাজের আনন্দ থাকিলেও অনেকের মুখে পুষ্টির ছাপের অভাব পরিলক্ষিত হয়। কারিগরী বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই ম্যাট্রিকুলেট। তাহাদের কয়েকজনকে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রশ্ন করিবার পর তাহারা সঙ্কোচের সহিত উত্তর দেয়। কেবলমাত্র হোষ্টেলে তাহাদের ঘর দেওয়া হইয়াছে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার মধ্যে সকালে কাজে বাহির হইবার পূর্ব্বে তাহাদের গুড়, মুড়ি দেওয়া হয়; দুপুরে ভাত ডাল ও একটি তরকারি বা ভাজা দেওয়া হয় এবং রাত্রে তাহারই পুনরাবৃত্তি করা হয়। কচিৎ-কদাচিৎ মৎস্যের ব্যবস্থা হয়। বৈকালে জলখাবারের কোন ব্যবস্থা না থাকায় কঠোর পরিশ্রমের পর ক্ষুধার তাড়নায় তাহাদের সময় সময় বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হয়।

নদীয়া পরিকল্পনা অনুসারে এই নূতন শহর নির্ম্মাণের কাজ ১৯৫১ সনের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা।...তবে যেভাবে কাজ চলিতেছে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিতে হইলে সমস্ত বিভাগেরই কাজকর্ম্ম অপেক্ষা আরও অনেক দ্রুত করিতে হইবে। এখন পর্য্যন্ত ৪০ হইতে ৪৫ খানির অধিক বাড়ী নির্ম্মিত হয় নাই। ঐ সমস্ত বাড়ীর কতকগুলির কাজও সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই। মোট গৃহ নির্ম্মাণ করা হইবে ১,০০০টি। প্রতি গৃহ গড়ে পাঁচ জনের এক একটি পরিবারকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। নূতন নগরীর অধিবাসীদের সকলকেই শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। প্রতি গৃহে একটি শয়নকক্ষ, একটি রান্নাঘর ও একটি পায়খানার ব্যবস্থা হইবে। একটি গৃহনির্ম্মাণে ব্যয় পড়িবে ১৪ শত টাকা। এই টাকা গৃহের বাসিন্দাদের নির্দিষ্ট কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

নদীয়া পরিকল্পনা অনুযায়ী শহর নির্ম্মাণের জন্য যে সকল শ্রমিক ও কর্ম্মীর প্রয়োজন পড়িবে তাহাদিগকে উদ্বাস্তুদের মধ্য হইতেই গ্রহণ করা হইবে। কৃষি, শাকসব্জীর চাষ এবং স্থানীয় শিল্প শিক্ষার উপরই বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হইবে। স্থানীয় চাহিদা মিটাইয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে সেগুলি বড় বড় শহরে চালান দেওয়া হইবে। খয়রাতি ও সাহায্য ব্যবস্থাকে এই পরিকল্পনায় একেবারেই স্থান দেওয়া হয় নাই। এই সমস্ত কার্য্য পরিচালনার ভার একটি পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে। বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সংস্থাগুলি হইতে পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইবে বলিয়া পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হইয়াছে:

(১) নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পঞ্চায়েৎ; (২) দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বণ্টনের জন্য কেন্দ্রীয় ক্রেতৃসঙ্ঘ; এবং (৩) উৎপাদনে নিযুক্ত কর্ম্মীদের সংস্থা, কেন্দ্রীয় উৎপাদক সঙ্ঘ।

ইহার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে সকল ব্যাপারে আত্মকর্ত্তৃত্বশীল স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ গঠন। তাহাদের কলকারখানায় যাহা উৎপন্ন হইবে না, এই ব্যবস্থায় স্থানীয় উৎপন্ন উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদির বিনিময়ে সেগুলি যোগাড় করা চলিবে।

আন্দামানে বাঙালী "উদ্বাস্তু"

"যুগান্তর" পত্রিকায় ২রা চৈত্র একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল আন্দামানে "নূতন প্রাণের স্পন্দন" সম্বন্ধে। পত্রিকার ষ্টাফ রিপোর্টার তার লেখক। তিনি বাঙালী উদ্বাস্তুদের নূতন জীবনের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করিয়া এইরূপ আশার চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন।

ভারতরাষ্ট্রের একটা বিরাট দায় এই উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান। নহিলে কোন কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সরকার শান্তিতে কাজ করিতে পারিবে না।

এই অবস্থায় আন্দামানে বাঙালী উদ্বাস্তু যাহা করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং যাহা করিতে পারিবেন তার বর্ণনা ভারতীয় রাজনীতির অঙ্গ।

"পূর্ব্ববঙ্গের যে সব উদ্বাস্তু আন্দামানে গিয়াছে তাহারা সেখানে আবার জীবনের সন্ধান পাইয়াছে। পুনরায় তাহারা সেখানে মাঠে মাঠে চাষ করে, ক্ষেতে ফসল ফলায়, ঘরে উঠায় সোনালী ধান আর প্রচুর তাজা শাকসব্জী। আন্দামান উদ্বাস্তুদের কাছে 'স্বর্গ' হয় নাই বটে; কিন্তু সেখানে তাহাদের জীবনের মন্থরগতি আবার প্রবাহিত হইবার পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে।

বিগত ১৯৪৯ সালে প্রথম এক দল উদ্বাস্তুকে পুনর্ব্বসতির জন্য সরকারী ব্যবস্থায় আন্দামানে প্রেরণ করা হয়। তার পর হইতে এ যাবৎ আরও অনেক উদ্বাস্তুকে তথায় প্রেরণ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে আন্দামানে প্রায় ২,০০০ উদ্বাস্তুর পুনর্ব্বসতি হইয়াছে। তাহাদের অধিকাংশই কৃষিজীবী। সরকার হইতে তাহাদের চাষের জমি দেওয়া হয় আর দেওয়া হয় প্রথম ৬ মাস করিয়া জীবনধারণের জন্য কিছু কিছু করিয়া ভাতা।

ঐসব কৃষিজীবী উদ্বাস্তু আন্দামানের অনেক অনাবাদী জমিতে চাষ করিয়া ফসল উৎপন্ন করিয়াছে। ১৯৪৯ সালে যে সব উদ্বাস্তু গিয়াছে তাহাদের প্রায় সকলেই একণে আত্মনির্ভরশীল হইয়াছে। ১৯৫০ সালে যাহারা গিয়াছে তাহারাও গত মরশুমে কিছু-না-কিছু ফসল ঘরে তুলিয়াছে; তবে এখনও আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠিতে পারে নাই। গবর্ণমেণ্ট হইতে ইহাদের অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ও কিছু কিছু কৃষিঋণ দিয়া আগামী ধানের মরশুম পর্য্যন্ত সাহায্য করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

১৯৫০ সালের উদ্বাস্তুদলের মধ্যে এগারটি পরিবার সম্প্রতি আন্দামান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহারাও কৃষিজীবী। কিন্তু গত মরশুমে ইহারা তথায় চাষে মোটেই সুবিধা করিতে পারে নাই। সেইজন্য ইহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট আরও এক বৎসর সাহায্য চাহিয়াছিল। কিন্তু সেইরূপ সাহায্য দিবার নিয়ম নাই বলিয়া এবং এই পরিবারগুলির সকলের ভার কাজ করার মনোবৃত্তি নাই এরূপ অভিযোগে গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহাদিগকে আর সাহায্য দিতে অস্বীকার করা হইয়াছে। ফলে এই পরিবারগুলি ফিরিয়া আসিয়াছে।

আন্দামানে গত দুই বৎসরে ঐ সকল কৃষিজীবী পরিবারের মধ্যে প্রায় ২০ ঘর দর্জ্জি, পরামাণিক ও ছোট ব্যবসায়ী পরিবারও গিয়াছিল। তাহারা ইতিমধ্যেই দর্জ্জির দোকান, চায়ের দোকান, হোটেল প্রভৃতি খুলিয়া ও জাতব্যবসায় করিয়া নিজ নিজ পরিবারের অন্ন সংস্থান করিতেছে। উচ্চবর্ণের কয়েক ঘর উদ্বাস্তুও গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন গ্র্যাজুয়েট ও কয়েকজন ম্যাট্রিক পাস ব্যক্তিও ছিলেন। গ্র্যাজুয়েট ভদ্রলোক একণে পোর্টব্লেয়ারে উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং ম্যাট্রিক পাস যুবকরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। যে সব অঞ্চলে উদ্বাস্তু উপনিবেশ স্থাপন করা হইয়াছে সেই সব এলাকায় মোট পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং উদ্বাস্তু পরিবারগুলির বালক-বালিকারা ঐ সব বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে।

সম্প্রতি প্রায় ৪০টি ব্যবসায়ী উদ্বাস্তু পরিবারকে আন্দামানে প্রেরণ করা হইয়াছে। তাহারা ইতিমধ্যেই নানারূপ ছোট ছোট ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। শুক্রবার ৩৬টি পরিবারের আরও এক দল উদ্বাস্তুকে আন্দামানে প্রেরণ করা হইতেছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে প্রায় ৫০ জন উদ্বাস্তু তরুণকে আন্দামানে জাহাজের মাল বোঝাই, মাল খালাস প্রভৃতি শ্রমকার্য্যের জন্য সংগ্রহ করিয়া আন্দামানে প্রেরণ করা হয়। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন পরিকল্পনাধীনে এই সকল উদ্বাস্তুকে আন্দামানে পাঠানো হয় নাই। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মারফত আন্দামানে ঐ সব কার্য্যের জন্য এক দল বাঙালী তরুণকে সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। শিক্ষিত উদ্বাস্তু তরুণরাও এই দলে যাইবার জন্য নিজেদের নাম লিখান। ঐ ৫০ জন তরুণের মধ্যে ইণ্টারমিডিয়েট পর্য্যন্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন এবং ম্যাট্রিক পাস কয়েকজন তরুণও আছেন। তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গে বেকার জীবনযাপন করিয়া অনাহারের সম্মুখীন হওয়া অপেক্ষা আন্দামানে গিয়া বন্দরে কুলির কাজ করিয়া জীবিকার্জ্জন করা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা কুলিরূপে আন্দামানে গিয়া পোর্ট ব্লেয়ারের বন্দরে প্রকৃতই কুলিরূপে কাজ করিতে থাকেন। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ তরুণদের এই অভূতপূর্ব্ব উদ্যম দেখিয়া আনন্দিত হন। তাঁহাদের চেষ্টায় ইতিমধ্যেই একজন ম্যাট্রিক পাস তরুণ একটি মোটরলঞ্চে কাজ পাইয়াছেন। অপর কয়েকজন শিক্ষিত যুবক অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কেউ কেউ বা চাপরাসী, পিয়ন প্রভৃতির কাজ পাইয়াছে। এই দলের প্রায় কুড়ি-পঁচিশ জন তরুণ এখনও জাহাজের মাল খালাস ও মাল বোঝাইয়ের কাজ করিতেছেন।

এই ভাবে আন্দামানে উদ্বাস্তুরা নূতন জীবন রচনা করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনাহারে মৃত্যুর বিভীষিকা অনেকখানি তিরোহিত হইয়াছে। শিবির-জীবনের গ্লানিকর পরিবেশ হইতে দূরে সরিয়া গিয়া তাঁহারা শ্রমলব্ধ ফলে কতকটা নির্ভরশীলতার জীবন ফিরিয়া পাইয়াছেন।"

এই বর্ণনা পাঠ করিয়া কোন্ বাঙালী নিজের জাতির শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে আর সন্দিহান হইবে? প্রাচীন সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার উদাহরণে ইতিহাস পূর্ণ হইয়া আছে। রাষ্ট্রীয় বিপ্লব বা ধর্ম্ম বিপ্লবের চাপটে আত্মসম্মানবোধ-সম্পন্ন নরনারী এই ভাবেই বিদেশে নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বাঙালী জাতির ইতিহাসেও সেইরূপ উদাহরণের অভাব নাই। খ্রীষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবার বাঙালী

সেই যাত্রাপথে অভিযান আরম্ভ করিল। তাহাদের দুঃখ-কষ্ট, অশ্রুজল জয়যুক্ত হউক। উদ্বাস্তুদিগের আন্দামান প্রেরণে কলিকাতার সংবাদপত্রগুলির একাংশ কটূক্তি ও ব্যঙ্গোক্তিতে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ফল অন্যরূপ হওয়ায় তাহাদেরই সুর বদলাইতেছে। ইহাও আশার কথা।

পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা

আজ বাঙালী ছত্রভঙ্গ; বাঙালী-জীবন বিখণ্ডিত—পূর্ব্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে। পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু সম্মানের সহিত বাস করিতে পারিতেছে না। তবুও প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ পূর্ব্ববঙ্গে নিজের কাজ চালাইয়া যাইতেছে। সেইজন্য পাকিস্তানের এই অংশের রাজনীতি, সংস্কৃতি নাগরিকের মান ও প্রাণের প্রশ্ন সম্বন্ধে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ আজ প্রায় ৪০ বৎসর হইতে জাতির নব সংগঠনের ব্রত গ্রহণ করিয়া চলিয়াছে। বিশেষতঃ বাঙালীকে আত্মস্থ ও আত্মসমাহিত করিবার দায় নিজের মাথার উপর তুলিয়া লইয়াছে। তাহার মুখপত্র 'নবসঙ্ঘে' ইহার এইরূপ আলোচনা দেখি:

"এই প্রসঙ্গে আমরা বাংলা বানান ও লিপির পরিবর্ত্তে আরবী অথবা উর্দ্দু বানান বা লিপি প্রবর্ত্তনের যে একটা গূঢ় অপপ্রয়াস চলিয়াছে, তাহারও দিকে মনীষিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি। আমরা জানি—ডাঃ শহীদুল্লা সাহেব এ বিষয়েও ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার সুস্পষ্ট অভিমত দিতে ত্রুটি করেন নাই এবং ইহাও সম্ভবতঃ সত্য যে, প্রধানতঃ তাঁহারই প্রতিকূলতায় রাজকর্ত্তৃপক্ষের এই অভিসন্ধি বেশী দূর কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। তবুও সে চেষ্টা তাঁহারা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াও কোন রাষ্ট্রীয় ঘোষণা এ পর্য্যন্ত শুনা যায় নাই। তাই পূর্ব্ববঙ্গের জন-মন এ সম্বন্ধে আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না, ইহাই আমাদের আশঙ্কা হয়। ডাঃ শহীদুল্লা পাকিস্তানী কর্ত্তাদের এই মনোভাব লক্ষ্য করিয়াই কুমিল্লার সম্মেলনে প্রয়োজন হইলে 'বিদ্রোহ' করিবেন, এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন কি না, জানি না; কিন্তু তিনি এ বিষয়ে স্থানীয় জনমত ও সমগ্র বাঙালী জাতির মনোভাব খুব ভাল করিয়াই অবগত আছেন, এ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। বাংলা ভাষার বানানকে উর্দ্দু ঢঙে ঢালাই করা বা বঙ্গ-লিপির পরিবর্ত্তে উর্দ্দু বা আরবী লিপির প্রচলনে উৎসাহ দেওয়া—বঙ্গভাষাভাষী ছাত্র ছাত্রীদের উপর ভিন্ন ভাষা চাপাইবারই একটা অপকৌশলমূলক অপচেষ্টা। এই অপকৌশল ও অপচেষ্টা অঙ্কুরেই যাহাতে বিনষ্ট হয়, সেই দিকে পূর্ব্ববঙ্গের মনীষিগণ নিশ্চয়ই অবহিত হইবেন, আমরা আশা করি। আমরা পত্রিকান্তরে এইমাত্র একখানি পত্রে পড়িলাম:

'এক দিকে ঐরূপ ব্যাপার (হিন্দু কন্যাকে শাসানি চিঠি), অন্য দিকে পূর্ব্ব বাংলার শিক্ষাবিভাগ প্রচারিত পাঠ্যতালিকাভুক্ত পুস্তকগুলি (বিশেষতঃ সাহিত্য ও ইতিহাস) হিন্দু ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের প্রকৃতই ভাবাইয়া তুলিয়াছে। পাকিস্তান যে কেবল মুসলমানদের নহে, হিন্দুগণও যে তথায় শান্তিসুখে বসবাস করিয়া পুত্রকন্যাদিগকে যথার্থ মানুষ করিতে স্বভাবতঃই ইচ্ছুক, পাকিস্তানের শিক্ষাবিভাগ সেই বিষয়ে আদৌ চিন্তা করেন নাই। নিরপেক্ষ হিন্দু বা মুসলমান প্রত্যেকেই স্বীকার করিবেন যে, পূর্ব্ব বাংলার শতকরা ৯৫টি মধ্য ও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হিন্দুদের স্থাপিত এবং দেশ বিভাগের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রধানতঃ হিন্দুদের অর্থে সুপরিচালিত হইয়া আসিয়াছে। তাহা ছাড়া, অনাবশ্যক আরবী, ফারসী, উর্দ্দু শব্দের গুরুভারে বাংলাভাষাকে যেরূপ পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে, তাহাতে অল্প কাল মধ্যে পশ্চিম ও পূর্ব্ব বাংলার জন্য বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র অভিধান নিশ্চিত আবশ্যক হইবে। অবস্থা এইরূপ চলিতে থাকিলে প্রকৃতই হিন্দুদের জন্য পাকিস্তান কোনও শান্তি-সুখপ্রদ স্থান হইতে পারে না।' পত্রলেখক একজন মুসলমান। তিনি পাকিস্তান-কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধপূর্ব্বক কহিয়াছেন—'যাহাতে হিন্দুদের মধ্যে কোনরূপ ব্যথা না লাগে ও সন্দেহ না জন্মে, সর্ব্বাগ্রে ও আশু তাহা করা কর্ত্তব্য। হিন্দুদেরও উচিত স্পষ্টাক্ষরে অভাব-অভিযোগ সরকারকে জানান।'"

পশ্চিমবঙ্গে "অধিক খাদ্য ফলাও" প্রচেষ্টা

পশ্চিমবঙ্গের সংসদে যে সব বক্তৃতা প্রদত্ত হয় তাহা হইতে মনে হইবে যে, পশ্চিমবঙ্গের কৃষক-সম্প্রদায় একেবারে নিষ্কর্ম্মা। কিন্তু বিগত ২২শে চৈত্রের সংবাদপত্রে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে মনে হয় একেবারে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। সেইজন্য এই বিবরণের একটি সারাংশ তুলিয়া দিলাম:

"দেশের খাদ্যসমস্যা সমাধানে সরকারী কৃষি বিভাগের সহিত জনসাধারণকে সহযোগিতা করিবার আবেদন জানাইয়া বুধবার খাদ্যসচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চলে 'অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলনে' কৃতী কর্ম্মীদের পুরস্কার বিতরণ করেন। টালীগঞ্জ সরকারী কৃষি গবেষণা ভবন প্রাঙ্গণের এই অনুষ্ঠানে কৃষি বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর শ্রীসুধীন রায় ঘোষণা করেন যে, হরিপাল থানার নালিকুল গ্রামে শ্রীগোবর্দ্ধন পাল এক একর জমিতে ৬২২ মণ আলু উৎপাদন করিয়া সর্ব্বভারতীয় রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বের রেকর্ড ছিল উত্তর প্রদেশের শ্রীগঙ্গাশরণজী কর্ত্তৃক এক একর জমিতে ৫২৮ মণ আলু উৎপাদন। ৮০ বৎসর বয়স্ক বরদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী (আন্দুল, হাওড়া) এক হাজার মণ কম্পোষ্ট সার তৈয়ার করিয়া পুরস্কার পাইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিলে, খাদ্যমন্ত্রী তাঁহাকে মাল্যভূষিত করিয়া বিশেষভাবে সম্মানিত করেন।"

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে খাদ্য-বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তার মধ্যেও ভরসার কথা আছে :

"পশ্চিম বাংলা যাহাতে আগামী ১৯৫২ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে খাদ্য সম্পর্কে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠে, তজ্জন্য মন্ত্রী-সভার একটি সাব-কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই সাব-কমিটি খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে নানা প্রকার পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিতেছেন। জনসাধারণও যদি গ্রামের আবর্জনা হইতে কচুরীপানা তুলিয়া সার প্রস্তুত করেন, তবে জমির উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া ফসল বৃদ্ধি হইবে।

শ্রীযুক্ত সেন বলেন যে, পশ্চিম বাংলায় বিঘা প্রতি গড়ে ধানের ফলন সাড়ে পাঁচ মণ। এই সাড়ে পাঁচ মণকে বিঘা প্রতি সাড়ে ছয় মণে দাঁড় করাইতে পারিলেও রাজ্য খাদ্য সম্পর্কে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে।

হাওড়া ও হুগলী জেলায় ধান উৎপাদন প্রতিযোগিতায় আটাশটি থানা হইতে আটাশ জনকে ২,৮০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। গ্রাম্য আবর্জনা হইতে সার প্রস্তুত প্রতিযোগিতায় ৬,৬৭৫৲ টাকা; কচুরীপানা হইতে সার প্রস্তুত প্রতিযোগিতায় ৯,১৫০৲ টাকা; হনুমান, বন্য শূকর বধ প্রতিযোগিতায় ৭,৭১৬৲ টাকা; আলু উৎপাদন প্রতিযোগিতায় ১,৫০০৲ টাকা এবং কৃষি বিভাগের বিভিন্ন কর্মচারীকে ১,৩৭৫৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়।

চব্বিশ পরগণায় ধান ফলন প্রতিযোগিতায় সাইত্রিশটি থানায় সাঁইত্রিশ জনকে ৩,৭০০৲ টাকা, কচুরীপানায় সার উৎপাদন প্রতিযোগিতায় ৯,০০০৲ টাকা, কৃষি বিভাগের কর্মচারীদের ৬০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়।

কেবল হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণার কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই নূতন জাগৃতি দেখা দেয় নাই। বর্দ্ধমান জেলার কৃষকও পশ্চাতে পড়িয়া নাই। আসানসোলের "বঙ্গবাণী" পত্রিকায় ১৩ই চৈত্রের সংখ্যায় একটি প্রদর্শনীর শেষে পারিতোষিক বিতরণের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি দেখিতে পাই :

"১৯৪৯-৫০ সালে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হারে (১ একর জমিতে, ৩ বিঘা) ৭৩ মণ ৩০ সের খাদ্য উৎপাদন করিয়া যিনি ভারত প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট ডা: রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্তৃক "কৃষি পণ্ডিত" উপাধি লাভ করিয়াছেন, মেদিনীপুর জেলা-নিবাসী সেই শ্রীযোগেশচন্দ্র পানি মহাশয় কৃষি সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তাঁহার বক্তৃতার শেষে মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহোদয় পানি মহাশয়কে স্বয়ং মাল্য ভূষিত করেন।...তৎপরে বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার মধ্যে যাঁহারা কৃষিকার্য্যে অধিক উৎপাদন দেখাইতে পারিয়াছেন মন্ত্রী মহোদয় তাঁহাদিগের পুরস্কার স্বরূপ অর্থ প্রদান করেন। এই অর্থের পরিমাণ ১,৫০০৲ হইতে ৫০ টাকা অবধি ছিল। মেদিনীপুর জেলার শ্রীরঘুনাথ মণ্ডল ও বর্দ্ধমান জেলার জনাব মতিয়ার রহমান প্রত্যেকে ১,৫০০৲ করিয়া পুরস্কার লাভ করেন। ইহা ছাড়া উল্লিখিত চারিটি জেলার বহু চাষী এবং কম্পোষ্ট ও আবর্জনা সার উৎপাদনকারী মন্ত্রী মহোদয়ের হস্ত হইতে বিভিন্ন পরিমাণের অর্থ পুরস্কার স্বরূপ লাভ করেন। ইহাতে চাষী-ভাইদিগের মনে বিপুল উৎসাহ ও আনন্দের সঞ্চার হয়।"

বাঁকুড়া জেলা—ভারতরাষ্ট্রের স্বরূপ ?

বাঁকুড়া জেলার "প্রচার" (সাপ্তাহিক) পত্রিকার গত ৫ই চৈত্রের সংখ্যায় বাঁকুড়ার অবস্থা বর্ণনা করিতে করিতে লেখক মনে হয় ভারতরাষ্ট্রের সর্ব্বাঙ্গীন দৈন্যের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

"বাঁকুড়া জেলার কথাই বলি। বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী-দের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের জন্য যাহা কিছু একান্ত আবশ্যক তাহার মধ্যে কোন্ জিনিষ বাঁকুড়া জেলায় উৎপন্ন হয়, তাহার বিচার করিতে হইবে। ডাল—মুগ, মুসুর, ছোলা এমন কি যে বিবিধ ডাল জেলার প্রধান খাদ্য তাহার কোনটিই জেলার লোকের চাহিদামত উৎপন্ন হয় না। সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গেও হয় না। একটা জেলার জন্য বাৎসরিক যে ডালের আবশ্যক হয় তাহা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন হয় না। ডাল হয় না, আটা হয় না।—দশ পনর বৎসর পূর্ব্বে বাঁকুড়া জেলায় যে পরিমাণ আটার আবশ্যক হইত বর্ত্তমানে তাহার পরিমাণ ৮।১০ গুণ হইয়াছে। জেলায় কতকগুলি তৈলের কল আছে কিন্তু সরিষা জেলার বাহির হইতে এমনকি পশ্চিম বাংলার বাহিরের রাজ্য হইতে আমদানী করিতে হয়। পল্লী-অঞ্চলের যাঁহারা বড় চাষী তাঁহারাও সরিষার তৈল টিন টিন শহর হইতে কিনিয়া লইয়া যান—চাষের জমিতে সরিষা উৎপন্ন জেলার চাষীরা করেন না। গম চাষ করেন না, সরিষা চাষ করেন না—কার্পাস চাষ বহুদিন উঠিয়া গিয়াছে—যদিও কৃষিবিদ্‌গণ বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের চাষের জমির মাটি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে চাষ করিলে এ জেলার জমিতে উন্নত ধরণের কার্পাস জন্মিতে পারে। জেলায় যে আখ জন্মে এবং তাহা হইতে যে গুড় উৎপন্ন হয় তাহাতে জেলাবাসীর সকলের চাহিদা এক মাসও মিটিবে কিনা সন্দেহ। চিনির কথা না হয় নাই ধরিলাম। একমাত্র জন্মে ধান তাও যদি সময়ে সুবৃষ্টি হয়। কিন্তু এই ধানজমির মালিক যাঁহারা তাঁহারা অনেকেই চাষে পরিশ্রম করেন না—সুতরাং অধি-কাংশ লোক জমিহীন, ধান চাল কিনিয়া সংসার-নির্ব্বাহ করে। জীবন-যাপনের ও আরাম-বিলাসের অপ্রয়োজনীয় সৌখীন দ্রব্যাদির চাহিদার কথা আলোচনা না করাই ভাল। এই সব জিনিষের চাহিদা আছে কিন্তু জেলায় কোনটাই উৎপন্ন

হয় না। এই একই অবস্থা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের এবং সেইরূপ অবস্থা সমগ্র ভারতরাষ্ট্রের।..."

ঝাড়গ্রাম কৃষি বিদ্যালয়

বিগত চৈত্র মাসের "প্রবাসী"র সম্পাদকীয় মন্তব্যে এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু লেখা হইয়াছিল। তাহার পরিপোষক হিসাবে এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ইংরেজী ভাষায় একখানি পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহার নাম সংশোধন করিয়া জানাইয়াছেন যে তাহা পবিত্রকুমার সেন—প্রশান্তকুমার নয়।

অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার পত্রে সংশোধনের কিছু দেখিলাম না। আমরা লিখিয়াছিলাম দমদমে কৃষি বিদ্যালয়ের গোড়া-পত্তন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; তাহা ব্যারাকপুর অঞ্চলে হইবে। তাহার পর কি অসুবিধায় পড়িয়া তাহা বন্ধ হইয়া-ছিল তাহার উত্তরে তিনি লিখিতেছেন যে, গত বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তাহা সরকারের অধীনে যায় এবং বিমানকেন্দ্রে পরিণত হয়।

এই অবস্থা হইতে রক্ষা করেন ঝাড়গ্রামরাজ শ্রীনরসিংহ মল্ল দেও মহাশয়। পশ্চিমবঙ্গে এই কৃষি বিদ্যালয়টি 'সবেধন নীলমণি।' এরূপ বহু বিদ্যালয়ের প্রয়োজন আছে। ঝাড়-গ্রামের বিদ্যালয় জলবিরল কৃষি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া নিজের কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। তাহার উদাহরণের অনু-প্রেরণায় অন্যান্য অঞ্চলে শ্রীনরসিংহ মল্ল দেওয়ের মত বদান্য ব্যক্তির আবির্ভাব হইবে। সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় আমরা আছি। তাহার আগমন নির্ভর করে ঝাড়গ্রাম কৃষিবিদ্যালয়ের সাফল্যের উপর। এই পরীক্ষা সার্থক হইলে অন্যান্য অঞ্চল আপনা হইতে তাহার অনুকরণ করিবে।

বর্দ্ধমানের মোহনপুর বাঁধের অবস্থা

বর্দ্ধমানের দামোদর পত্রিকায় গত ২৫শে ফাল্গুন সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে :

"পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচমন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদারের আগ্রহে সরকার বিখ্যাত মোহনপুর হানামুখে পাকা বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া দামোদরের দক্ষিণতীরস্থ শত শত গ্রামকে রক্ষা করিয়াছেন এবং এই বাঁধের ফলে সহস্র সহস্র বিঘা পতিত ও হাজা জমি উত্থিত হইয়া এই অঞ্চলের অন্নাভাব নিবারণ করিয়াছে। কিন্তু উক্ত হানা বাঁধের কয়েক শত গজ পশ্চিমে গ্রামরক্ষী বাঁধে যে দুইটি ভাঙন হই-য়াছে, তাহা আজ পর্য্যন্ত না বাঁধায় বন্যাপীড়িতদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে—যে মোহনপুর হানা বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া সরকার আজ পর্য্যন্ত প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া-ছেন, উক্ত ভাঙন দুইটি না বাঁধিলে মোহনপুর হানা বাঁধের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। ঐ ভাঙন না আটকাইলে আগামী বর্ষায় উহা বিরাট হানায় পরিণত হইয়া মোহনপুর খাতে মিশিয়া পূর্ব্বের ন্যায় এই অঞ্চলকে বিপদগ্রস্ত করিবে। দামোদর বন্যা প্রতিকার সমিতির তথ্য হইতে জানা গিয়াছে ঐ ভাঙন বন্ধ করিতে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। এই সামান্য অর্থ ব্যয়ে বাঁধ মেরামত না হইলে সরকারের তিন লক্ষাধিক টাকা জলে যাইবে।

"মোহনপুর হানা বাঁধের কয়েক শত গজ পশ্চিমে যে দুইটি ভাঙন হইয়াছে, দামোদর বন্যা প্রতিকার সমিতি হইতে তাহার পরিমাপ করা হইয়াছে। (ক) মোহনপুর ভাঙন—লম্বা ১৬০ ফুট, চওড়া ৩৬ ফুট, উচ্চতা ১৫ ফুট=৮৬,৪০০ ফুট। (খ) মজুর ভাঙন—লম্বা ৬৭ ফুট, চওড়া ৩৬ ফুট, উচ্চতা ১৫ ফুট=৩৬,১৮০ ফুট; মোট ১,২২,৫০০ ফুট। মাটি কাটার দর উচ্চতম হারে হাজার প্রতি ২৫৲ টাকা হইলে ৩০৬২।০ টাকা ব্যয় হয়। অন্যান্য খরচ-সহ ইহা মোটেই ৫০০০৲ টাকার অধিক হইবে না।"

আমরা আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছি যে, সামান্য অর্থের জন্য সরকারের কাছে দরবার করিতে হয়, কন্‌ফারেন্স করিতে হয়। এই উপায়েই কি কৃষক-মজদুর-রাজ গড়িয়া উঠিবে? সাধে কি আজ দেশের এই দুরবস্থা!

আঞ্চলিক সেনাবাহিনীর আদর্শ

"যোগাযোগ" রেলওয়ে কর্ম্মীদের "সেবার নিরত সাময়িক পত্রিকা।" ইহার মধ্যে পূর্ব্বাঞ্চলে রেলওয়ে ব্যবস্থার নানা খবর পাওয়া যায়। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে রেলওয়ে আঞ্চলিক বাহিনীর সাময়িক বিদ্যার বর্ণনা উপলক্ষে নিম্নলিখিত একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়। যে আগ্রহে রেলওয়ে কর্ম্মী এই নূতন বিদ্যা-অর্জ্জনে আগুয়ান হইয়াছেন, তার উদাহরণ সমাজের সকল স্তরে বিস্তৃত হউক :

"অনেকে হয়ত রেলওয়ে আঞ্চলিক সেনাবাহিনীতে দেশের সেবা করিবার বাসনা লইয়া যোগ দিয়াছেন, কেহ বা অর্থোপার্জ্জনের আশায়, আবার কাহারও বা হয়ত কাম্য শুধু যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করা, আবার চাকুরীতে উন্নতি এবং দেশ ভ্রমণও হয়ত কয়েকজনকে প্রেরণা দিয়াছে। যাঁহারা কেবলমাত্র অর্থোপার্জ্জন কিংবা চাকুরীর উন্নতির আশায় যোগ দিয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদের এই সকল কামনা পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। কিন্তু অন্য সকলের জন্য ইহা এক ভাল সুযোগ আনিয়া দিয়াছে এবং তাঁহাদের ইহার সদ্ব্যবহার করা উচিত।

জামালপুরে গত বার্ষিক ট্রেনিং ক্যাম্পে আমার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহা হইতে বলিতে পারি যে কেহ কেহ হয়ত উহা ঠিক পছন্দ করেন নাই। অপর কেহ বা আর্ম্মিতে যোগ দেওয়ার দরুন প্রয়োজন হিসাবে এই ক্যাম্প জীবনকে পুরুষোচিত ধৈর্য্যের সঙ্গে স্বীকার করিয়াছেন। অবশিষ্ট অধিকাংশের নিকট উদার উন্মুক্ত পরিবেশে খেলাধূলা ও সুশৃঙ্খলভাবে গোষ্ঠী জীবনযাপনের এই অবকাশ আদরণীয়

হইয়াছে। প্রথম ক্যাম্প হিসাবে এইবার ট্রেনিঙের কড়াকড়ি বিশেষ ছিল না এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের কাজ কাহাকেও এইবার করিতে হয় নাই। তথাপি যাঁহাদের শরীর তেমন মজবুত নয় তাঁহারা স্বভাবতই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন।

ক্যাম্পের শেষদিন, অর্থাৎ বিদায়ের ক্ষণে, শিক্ষার্থীদের ভিতর কেহ কেহ আরও অধিক দিন এই জীবনযাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন; আমি ইহাতে কম বিস্মিত হই নাই। তাঁহারা কয়েকটি প্রশ্নও করিয়াছেন এবং যথাযোগ্য উত্তর দিতে পারিয়া আমি খুসী হইয়াছি।

প্রশ্নগুলি আমার খুবই ভাল লাগিয়াছিল; কারণ তাহা হইতেই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম প্রশ্নকর্তারা (শিক্ষার্থিগণ) বিশেষ আগ্রহ ও আন্তরিকতা লইয়া এই বাহিনীতে যোগদান করিয়াছেন। ক্যাম্পজীবনের সারল্য, ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রীই তাঁহাদের ক্যাম্প জীবনযাপনে আকৃষ্ট করিয়াছে। অধিকাংশ সদস্যের মধ্যেই লক্ষ্য করিলাম, দেশকে সেবা করিবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা—যাহাতে জগৎসভায় আমাদের প্রজাতন্ত্রী ভারত গৌরবের আসন অধিকার করিতে পারে।"

খেজুর মাহাত্ম্য

সম্প্রতি ভারতরাষ্ট্রের রেশনের দোকান হইতে খাদ্য-দ্রব্যের পরিপূরক হিসাবে খেজুর বিক্রয় হইতেছে। সেইজন্য সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় খেজুরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হইতেছে। গত ১লা চৈত্র "আনন্দবাজার পত্রিকা" অধ্যাপক শচীন্দ্রকুমার দত্ত কর্ত্তৃক লিখিত খেজুরের গুণাগুণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। রাসায়নিকের বিশ্লেষণ-ভাতে খেজুরের নিম্নলিখিত গুণাগুণ ধরা পড়িয়াছে :

খেজুরের রাসায়নিক উপাদান

রাসায়নিক বিশ্লেষণে খেজুরের ভেতর যে সমস্ত জিনিসের সন্ধান পাওয়া গেছে, তা দেখে মনে হয় যে, খেজুরের খাদ্যগুণ নেহাৎ কম নয়। সমস্ত খেজুরটির শতকরা ৮৫ ভাগ শাঁস, আর বাকিটা শক্ত বীচি বা আঁটি।

ইরাকী খেজুর

শাঁসের উপাদান		শতাংশ
খাদ্যগুণ :	প্রোটিন	২.২
	স্নেহজাতীয় পদার্থ	.৬
	শ্বেতসার	৭৫.৪
খনিজ :	ক্যালসিয়াম	.০৭২
	পটাসিয়াম	.৬৭৫
	ফসফরাস	.০৬০
	গন্ধক	.০৬৫
	লৌহ	.০০২

ভিটামিন :	থায়ামিন	৬০—১০০ মাইক্রোগ্রাম
	রিবোফ্লেভিন	৪৫
	ভিটামিন এ	৬০—৩০০

(ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিট)

আফ্রিকার খেজুর-শাঁসে আছে, জল শতকরা ২৫ ভাগ, প্রোটিন ৭.৭ ভাগ, ফ্যাট .২১ ভাগ, গ্লুকোজ ও অন্যান্য চিনি ৪৯ ভাগ, খনিজ ১.৭ ভাগ, এবং সেলুলোজ ৩.৫৫ ভাগ।

ভারতীয় খেজুরের কেবল আঁটিই সার। অন্যান্য তথ্যও জ্ঞাতব্য।

ইরাকের লোকেরা যথেষ্ট খেজুর খেয়ে থাকে, গড়ে মাথাপিছু দৈনিক ৫ আউন্স। আমাদের প্রথমেই খুব বেশী খেজুর হজম হবে না, তবে বিভিন্ন খাদ্যে এর ব্যবহার হতে পারে, যেমন—পায়েস, হালুয়া, জ্যাম, জেলী, মালপো, খেজুরের সিরাপ ইত্যাদি। ইরাকে গরু-বাছুরকেও খেজুর খাওয়ানো হয়।

বিভিন্ন প্রয়োজনে খেজুর গাছ

খেজুর ও খেজুর গাছের আরও বহু ব্যবহার আছে। কচি খেজুর গাছের নরম শীর্ষভাগটি কেটে নিয়ে তার কোল রান্না করে খেতে নাকি খুবই ভাল লাগে। সম্রাট্ বাবরের নাকি এটা প্রিয় খাদ্য ছিল।

খেজুরের শক্ত আঁটি পানের সঙ্গে সুপারির কাজ দেয়, আঁটি পুড়িয়ে যে কয়লা হয়, সেই কয়লা রৌপ্যকারদের কাজে লাগে। আঁটি গুঁড়ো করে উটকে খাওয়ানো হয়, রং করে মালা তৈরী করা যায়। পাতা থেকে ঝুড়ি, আসন, পাটি, আঁশ থেকে দড়ি, দোলনা এবং কাঠ থেকে জালানী পাওয়া যায়।

পশ্চিম পঞ্জাবের নির্ব্বাচন

গত ২৫শে ফাল্গুন হইতে পশ্চিম পঞ্জাবের পরিষদের নির্ব্বাচনপর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছিল। ৪।৫ দিনের মধ্যে তাহা শেষ হয়। তাহার ফলাফল সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৭টি আসনের মধ্যে ১৪১টি মুসলিম লীগের প্রার্থীগণ অধিকার করিয়াছে, ৩২টি করিয়াছে জিন্না আওয়ামি লীগ, এবং বাকী ২৪টি করিয়াছে কয়েকটি দল যাদের প্রতিপত্তি নাই বলিলেই চলে। এই দলসমূহের মধ্যে একটি ছিল মৌলানা-মৌলবী শ্রেণীর, তাঁহারা ইসলামের নামে দাঁড়াইয়া মাত্র একটি আসন অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই পরাজয় কিন্তু চূড়ান্ত নয়। যেমন ইন্দোনেশিয়ায় "দারুল ইসলাম" নামে একটি দল আছে যারা মাতৃভূমি দল হইতে পৃথক হইয়া খুনজখম করিয়া রাষ্ট্রের গদি দখল করিতে চায়, যেমন মিশরে "ইসলাম ভ্রাতৃ সঙ্ঘ" নামে একটি দল আছে যাঁরা মন্ত্রীদের খুন করিয়া হাত পাকাইতেছে, সেইরূপ পাকিস্থানে মৌলানা-মৌলবী শ্রেণীর দল এক দিন প্রবল হইয়া উঠিবে।

জিন্না আওয়ামি দলের নেতা দুই জন ; এক জন আমাদের পুরাতন বন্ধু হুসেন শহিদ সোরাবর্দি, আর একজন মামদোতের নবাব ইফতিকার উদ্দিন—পশ্চিম পঞ্জাবের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী যিনি ঝগড়া করিয়া মুসলিম লীগ ছাড়িয়া নূতন দল গড়িয়াছেন।

আর দুইটি তথ্যের উল্লেখ প্রয়োজন। ৯০ লক্ষ নির্ব্বাচকের মধ্যে ৩০ লক্ষ নির্ব্বাচনে যোগদান করিয়াছে, এবং লীগ দল ও বিরোধী দলসমূহের প্রায় সমান ভাগে নির্ব্বাচকমণ্ডলী ভোট দিয়াছে। এই তথ্য নাকি ভবিষ্যৎ মুসলিম লীগের পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

ইরাণে খুনাখুনি

সম্প্রতি ইরাণের সম্রাট্ একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েকে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়াছেন। তাহার কয়েকদিন পরেই ইরাণের প্রধান মন্ত্রী আলি রাজমারাকে একজন গুলি করিয়া হত্যা করে। ভদ্রলোক সমবেত প্রার্থনায় যোগদান করিবার জন্ত মসজিদে যাইতেছিলেন ; সেই সময় উগ্র ইসলামপন্থী একজন তাঁহাকে হত্যা করে। আমরা জানিতাম যে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন উৎকট ইসলামপন্থী নয়। কিন্ত এই হত্যাকাণ্ডে আমাদের সে ভুল ভাঙিল।

এই হত্যার কারণ সম্বন্ধে জল্পনাকল্পনা চলিতেছে। পাশ্চাত্য শক্তিনিচয়ের—সোভিয়েট রাষ্ট্র, মার্কিন ও ব্রিটিশ গোষ্ঠীর—দ্বন্দ্বের সম্মুখে রাজমারা বলি পড়িলেন। পারস্যের কেরাসিন তেলের খনির উপর মালিকানা ও কর্ত্তৃত্ব এত দিন ব্রিটেনের ছিল। গত বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিনী ধনিক গোষ্ঠীকে ভার ভাগ দিতে হইয়াছে। এই প্রাধান্যের বিরুদ্ধে জারের আমলের রাশিয়ার আক্রোশ ছিল প্রবল। আজ কম্যুনিষ্ট আমলে তাহা হইয়াছে আরও প্রখর ও ব্যাপক।

ইরাণের শাসক-গোষ্ঠী চান এই সব তৈলের খনি তাঁহাদের রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে। ব্রিটেন বাধা দিতেছে, সেই কাজে পিছনে থাকিয়া মার্কিনীরা যোগান দিতেছে। কম্যুনিষ্টরা যে নির্ব্বিকার হইয়া বসিয়া আছে তাহা মনে করিবার কারণ নাই। সুতরাং "মধ্যপ্রাচ্য" বলিয়া পরিচিত অঞ্চলে কোরিয়ার মত অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে। রাজমারার হত্যা তাহার মুখবন্ধ বলিলে অন্যায় হইবে না।

কর্ম্মচ্যুত ম্যাকআর্থার

এত দিন পরে, প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্ব-এশিয়ায় কর্তৃত্বের পর এই মার্কিন সৈন্যাধ্যক্ষের সামরিক জীবনের এক পর্য্যায় শেষ হইল তাঁহার ৭১ বৎসর বয়সে। জাপানের দখলদার সৈন্যবাহিনীর সর্ব্বাধ্যক্ষ রূপে নিজের জ্ঞান বিশ্বাস মতে চলিতে গিয়া তিনি মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইলেন। বিলাতের শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের চাপে পড়িয়া ট্রুম্যানকে এই কাজ করিতে হইয়াছে।

তার ফলাফল বিচার করিবার সময় এখনও আসে নাই। অনেকে মনে করেন ম্যাকআর্থারের সামরিক নীতি যুক্তিসঙ্গত ; কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের শক্তিগোষ্ঠীর অগ্রগমন রোধ করিতে হইলে, এই নীতি ছাড়া গত্যন্তর নাই। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ভুল করিলেন। ইহাতে দুনিয়ার কম্যুনিষ্টগণ আনন্দিত হইবে।

ম্যাকআর্থারের পদচ্যুতির আর একটা শিক্ষা আছে। মার্কিন পররাষ্ট্রবিদ্ আওয়েন ল্যাটিমোর গত ১৪ই চৈত্র তারিখে এক বেতার-বক্তৃতা উপলক্ষে তৎসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার ফল সুদূরপ্রসারী। চীন পশ্চিমী গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির হাত হইতে একেবারেই খসিয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন। তাঁহার মতে ইহা এক নিদারুণ বিপর্য্যয় এবং অতি বড় বিয়োগান্ত নাটক।

"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ একটি শান্তিপূর্ণ ও গণতন্ত্রী রাষ্ট্ররূপে চীনকে গড়িয়া তোলার যে বিরাট আশা এক সময় পোষণ করা হইত, এখন হইতে আমাদিগকে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে।"—চীন সম্বন্ধে ইহাই মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গী।

চীনের মত ভারত, ব্রহ্ম ও এশিয়ার অপরাপর দেশও কয়েক বছরের মধ্যে হাতছাড়া হইয়া যায়, এইরূপ ভ্রান্তনীতি অনুসরণ করা হইতেছে কিনা, জিজ্ঞাসিত হইয়া মিঃ ল্যাটিমোর বলেন, "পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি বাহিরে কয়েকটি প্রধান ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া এশিয়ার উপর তাহা চাপানোর যে চেষ্টা করিতেছে, তাহার গোড়াতেই ভুল রহিয়াছে।

যে ভাবে ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ও ব্রহ্মদেশে কম্যুনিষ্ট সমস্যা আয়ত্তে আনয়ন করা হইয়াছে, এশিয়ার তাহা উৎসাহব্যঞ্জক। একমাত্র ভিতর হইতে চেষ্টা করিয়াই যে কম্যুনিষ্ট সমস্যার সমাধান সম্ভব, পাশ্চাত্য শক্তিগুলিকে এই শিক্ষালাভ করিতে হইবে। যদি কোন দেশ কম্যুনিজম দমন করার জন্য বাহিরের সাহায্য চায়, সেই দেশে যত কম্যুনিষ্ট উৎখাত হইবে, তাহার চেয়ে বেশী সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।"

মার্কিন চাহিয়াছিল অর্থ দিয়া চীনকে ভাসাইয়া দিবে, শিল্প-কৌশল ও অভিজ্ঞতা দিয়া ৪৫ কোটি নর-নারীকে পুনর্গঠিত করিবে, সে আশা পূর্ণ হইল না। আবার প্রমাণিত হইল যে টাকা দিয়া হৃদয় জয় করা যায় না। মার্কিন এই শিক্ষালাভ করিলে এখনও সকলের মঙ্গল হইবে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে নূতন কৃষি পরিকল্পনা

কিছুকাল পূর্ব্বে সোভিয়েট সরকার এইরূপ ঘোষণা করেন যে, আনুমানিক আড়াই লক্ষ যৌথ খামারকে একসঙ্গে মিলাইয়া অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক অতি বিরাট 'খামারে'

পরিণত করা হইবে এবং সেই মিলিত কেন্দ্র হইতে সেগুলি পরিচালিত হইবে। অর্থনৈতিক সুবিধাই ইহার কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল।

সম্প্রতি সোভিয়েট সরকার এক নূতন ঘোষণায় জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের পরিকল্পিত 'কৃষি নগরগুলি'তে রুশ কৃষকগণকে গিয়া বাস করিতে হইবে। পল্লী অঞ্চলে কৃষাণ-মজদুর সমাজ প্রতিষ্ঠাই ইহার উদ্দেশ্য।

এই বিরাট পরিকল্পনার ব্যাখ্যা করিয়া মার্কিন সংবাদপত্র যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা কৌতূহলোদ্দীপক। তাঁহারা দেখিতেছেন ইহাতে ভাবী কৃষক 'বিদ্রোহে'র বিরুদ্ধে ষ্টালিনের আয়োজন। এরূপ বিরূপ সমালোচনার সার্থকতা বেশী নাই। সোভিয়েট রাষ্ট্রের সংবাদপত্রসমূহে মার্কিনের বিরুদ্ধে দিনের পর দিন এরূপ বিরূপ আলোচনা চলে; তাহা আমরা পাঠ করি। কিন্তু তার ফলে আমাদের মনে কেবল বিতৃষ্ণা জাগ্রত হয়। মার্কিন সংবাদপত্র সম্বন্ধে এরূপ মনোভাবের সৃষ্টি অস্বাভাবিক হইবে না।

'মার্কিন বার্ত্তা' হইতে এরূপ অসুস্থ মনোভাবের পরিচয় কয়েকটি তুলিয়া দিতেছি :

'নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন' পত্রিকায় য়োড্নি গিল্বার্ট লিখিয়াছেন :

"মার্কসবাদের পুরাতন পথে সোভিয়েট রুশ ফিরিয়া চলিয়াছে। আত্মসচেতন কৃষক শ্রেণীর অবলুপ্তি ঘটাইবার উদ্যোগ সেখানে আরম্ভ হইয়াছে। জমির লাভ-ক্ষতির সহিত রুশ কৃষকের আর কোনও সম্পর্ক নাই, ভবিষ্যতে পুনরায় কোনও সম্পর্ক হইবার আশাও তাহাদের নাই। কৃষকেরা এখন ক্ষেতের জনমজুরের পর্য্যায়ে নামিয়া যাইবে এবং গ্রাম্য প্রজাতন্ত্রের এক একজন সদস্য হইয়া দাঁড়াইবে।

"ইহার বিরুদ্ধে যে প্রবল জনমত রহিয়াছে তাহার প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে—বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি সরকারের সাবধান-বাণী উচ্চারণের মধ্যে।'

প্যারী হইতে উইলিয়াম ষ্ট্রোন্‌ম্যান লিখিতেছেন :

"সোভিয়েট রুশ আবার এক বিরাট পরীক্ষামূলক কাজে হাত দিতেছেন। এই পরীক্ষার কাজে নির্দ্দয়ভাবে উৎসর্গ করা হইবে দরিদ্র রুশ কৃষককেই।

"ষ্টালিন এইরূপ আদেশ দিয়াছেন যে, যৌথ খামারের সমুদয় রুশ কৃষককেই যত শীঘ্র সম্ভব তাহাদের গ্রামাঞ্চল ছাড়িয়া নবগঠিত 'কৃষি নগরগুলি'তে গিয়া দলে দলে হাজির হইতে হইবে।

"বিশেষজ্ঞগণ ষ্টালিনের এই আচরণের নিহিত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, জনগণ যে শেষ পর্য্যন্ত এক দিন বর্ত্তমান সোভিয়েট শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে, এই আশঙ্কা ষ্টালিনের মনে বহুদিন যাবৎ রহিয়াছে। ষ্টালিনের মনে আছে যে, সোভিয়েট বিদ্রোহের সময়ে রাজধানীর শ্রমিক-মজদুর দল খাদ্যাভাবে ক্ষিপ্ত হইয়া প্রায় প্রতি-বিপ্লব ঘটাইতে বসিয়াছিল।

"প্রায় দুই কোটি কৃষক পরিবারকে এই ব্যবস্থার ফলে তাহাদের 'খামার' ও পল্লী ভবন ছাড়িয়া নূতন 'কৃষি নগরে' যাইতে হইবে। বিগত বিশ্বযুদ্ধে জার্ম্মান আক্রমণের পরে রুশ কৃষকের মনে ভবিষ্যতের আশা-ভরসা যেটুকু ফিরিয়া আসিয়াছিল ষ্ট্যালিনের বর্ত্তমান ব্যবস্থার ফলে তাহার চিহ্নমাত্রও তাহাদের মনে অবশিষ্ট থাকিবে না।"

যৌথ 'খামার' প্রতিষ্ঠায় সোভিয়েট রাশিয়ার পূর্ব্বেকার দুই বারের চেষ্টার এবং শেষে, ১৯৪০ সালের অভিযানের উল্লেখ করিয়া ষ্ট্রোন্‌ম্যান মন্তব্য করিয়াছেন যে, রুষ কৃষকের নিজস্ব ক্ষেতখামার বলিতে এখন আর কিছুই নাই। তিনি ইহাও উল্লেখ করেন যে দ্বিতীয় বারের অভিযানের (১৯৩৩) ফলে প্রায় ৪০ হইতে ৬০ লক্ষ রুশ কৃষক দুর্ভিক্ষে মারা যায়।

"কিন্তু রুষ কৃষকেরা যদিই কোনও কারণে তাহাদের যৌথ 'খামার' ছাড়িয়া যাইতে না চায় কিংবা তাহাদের প্রয়োজনীয় কাজ যদি আশপাশে না জোটে তবে কি হইবে?

"ষ্ট্যালিনের আদেশে তখন ইহাদের বেগার শ্রমিকরূপে হয়ত খাটানো হইবে। কারণ বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য যথেষ্ট শ্রমিকের প্রয়োজন সেখানে রহিয়াছে। একটা জিনিষ ইহাতে বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, সেটি হইল রুশ কৃষকদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি ষ্ট্যালিন সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার।"

ভারতরাষ্ট্রে সংস্কৃত ভাষার স্থান

অনেক পণ্ডিত ও বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রাপ্ত চিন্তানায়ক ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা একমাত্র সংস্কৃত ভাষারই আছে বলিয়া মনে করেন এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়নকালে এই প্রস্তাব কেহ কেহ সংবিধান পরিষদে পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। কেন তাহা গ্রহণ করা হয় নাই, তাহা জানা না থাকিলেও, কল্পনা করা কঠিন নয়। হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা হইয়াছে, এবং এখনও হিন্দি ও "হিন্দুস্থানী" এই দুই ভাষার ও লিপির তর্ক শুনা যায়।

তবুও সংস্কৃত ভাষার সপক্ষে যে সব তথ্য ও যুক্তি দেওয়া সম্ভব তাহা জানিয়া রাখা ভাল। বর্দ্ধমানের "শ্রী" (মাসিক) এই সম্বন্ধে গত মাঘ সংখ্যায় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। "শ্রী" প্রাচীন মতাবলম্বী; সেই জন্য তাহা তুলিয়া দিলাম :

"খণ্ডিত ভারতের রাষ্ট্রকর্ত্তৃপক্ষ বর্ত্তমান বৎসরের লোকগণনায় সংস্কৃত ভাষাকে মৃতভাষা (dead languge) বলিয়া গণ্য করিবার আদেশ দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। যে ভাষার অধ্যয়ন অধ্যাপনা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং যাহা নিত্যকার ব্যবহারিক জীবনে অপ্রচলিত তাহা অবশ্যই মৃতভাষা। এখন বিবেচ্য, সংস্কৃত কি এই পর্য্যায়ের মধ্যে পড়িতেছে? ভারতবর্ষীয় অধ্যাত্মবিদ্যা, দর্শন, কাব্য, সাহিত্য, পুরাণ-ইতিহাস, আয়ুর্ব্বেদ,

স্মৃতিশাস্ত্র যাবতীয় গ্রন্থ উক্ত দেবভাষায় লিখিত। যে ধর্মানুষ্ঠান, পূজা-পার্ব্বণ প্রভৃতি এবং উপনয়ন, বিবাহাদি সংস্কার, শ্রাদ্ধ-তর্পণ ভারতীয় রাষ্ট্রের অধিকাংশ প্রজা কর্ত্তৃক অঙ্গীকৃত ও অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে, তাহা সংস্কৃত শব্দ-সম্ভূত। যে প্রণব ও গায়ত্রী মন্ত্র ভারতীয় জনগণের নিত্য জাপ্য, তাহা বেদসম্ভূত; তদ্ব্যতীত আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে বহুসংখ্যক চতুষ্পাঠী রহিয়াছে, দেশের প্রধান প্রধান মঠ ও তীর্থক্ষেত্র-গুলিতে সংস্কৃতেরই প্রাধান্য এবং বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই দেবভাষায় অনর্গল কথা কহিতে ও বক্তৃতা দান করিতে সক্ষম। এমতাবস্থায় সংস্কৃত ভাষাকে মৃতভাষা বলিয়া গণ্য করা যে কেবল অর্ব্বাচীনতা এমনই নহে, উহা আত্মদ্রোহী বুদ্ধির পরিচায়ক। বর্ত্তমানে দেশ সর্ব্বতোভাবে স্বকীয়তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছে, ইহা তাহারই অন্যতর নিদর্শন। রাষ্ট্রকর্ত্তৃপক্ষের সুবুদ্ধি উদ্রেকের চেষ্টা করিয়া কোনও ফলোদয় হইবে না ইহা সুনিশ্চিত। আমাদের মনোভাব কতটা আত্ম-বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্যই বক্ষ্যমাণ আলোচনার অবতারণা। তবুও বলিতেছি—শ্রদ্ধৎস্ব—নিজ-স্বতার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও।"

দিনেমার বালক-বালিকার সৎ দৃষ্টান্ত

"কোপেনহেগেন রিভিউ" নামে একখানি অতি ক্ষুদ্র ছাপা প্রচারপত্র আমরা মাঝে মাঝে পাইয়া থাকি। সেই পত্রিকার ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় নিম্নে বর্ণিত সৎকর্ম্মটির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিষ্কাম বিশ্ব-সেবা বা লোক-সেবা বলিয়া সম্মানের যোগ্য।

"ব্রিক ষ্টাম্প" নামে এক প্রকার ডাক টিকিট দিনেমার দেশের বালক-বালিকা ক্রয় করিয়া গ্রীস দেশে একটি বিদ্যা-লয়ের গৃহ-নির্ম্মাণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছে। "ব্রিক" শব্দের অর্থ "ইট"; সেইজন্য এই নামকরণ ভাবোদ্দীপক। প্রায় ১,২৫,০০০ জন বালক-বালিকা এই বৈশাখ মাসের মধ্যে এই ডাক টিকিট ক্রয়ের অর্থে স্কুল-গৃহের ব্যয় সংগ্রহ করিবে বলিয়া ভরসা করে। এই ১,২৫,০০০ ক্রোনার (দিনেমার মুদ্রা) প্রায় ৮৪,০০০৲ টাকার সমান। দশ সপ্তাহে তার সংগ্রহের শেষ হইবে। অন্যান্য উপায়েও অর্থ সংগ্রহ করিয়া ৪২৫ জন ছাত্রছাত্রীর উপযোগী একটি বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মিত হইবে। একজন দিনেমার স্থপতি, মিঃ মুড ম্যাডসেন গত ছয় মাস হইতে গ্রীসে আছেন। তাঁহার পরিকল্পনানুযায়ী এই গৃহের নির্ম্মাণ আরম্ভ হইবে।

গ্রীস দেশের সরকার এই সৎকর্ম্মের প্রতিদানে দিনেমার বিদ্যালয়সমূহে গ্রীসদেশীয় কলা-শিল্পের ২০০ ছাপ পাঠাইতে-ছেন।

এই পত্রিকায় দেখা যায় যে এশিয়া মহাদেশের কয়েকটি রাষ্ট্র দিনেমার বিশেষজ্ঞ আনিয়া তাহাদের নানাবিধ পরি-কল্পনায় রূপদান করিতেছেন। সিংহল ও ইন্দোনেশিয়া লইয়াছে পশুবিদ্যাবিশারদকে; পাকিস্থান নিযুক্ত করিয়াছে এক জনকে তার কৃষির উন্নতিকল্পে। এই আমদানীর একটা গুণ আছে যে, দিনেমার দেশ কখনও বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে কোন রাজনীতিক সুবিধা আদায় করিতে চেষ্টা করিবে না।

নিখিল-ভারত বুনিয়াদি শিক্ষাসম্মেলন

গত ১৯ ও ২০শে ফাল্গুন সেবাগ্রামে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ভারতরাষ্ট্রের প্রত্যেক অঞ্চলের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

সেবাগ্রামের বাহির হইতে আগত ৬৩৪ জনের মধ্যে ৩৮৪ জন সরকারী ও বেসরকারী পরিচালকবর্গের নিযুক্ত প্রতিনিধি, ব্যক্তিগত দর্শক ৪৬ জন এবং 'নই তালিম'-এর শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় হইতে আগত ২০৪ জন ছাত্র দর্শক। রাজ্য হিসাবে ধরিলে উহা এইরূপ দাঁড়ায়:

আসাম—৫ হায়দারাবাদ—১৩ নেপাল—২
বাংলা—৪০ জম্মু-কাশ্মীর—১ উড়িষ্যা—১৪
বিহার—১৪৪ মধ্যভারত - ৭ পঞ্জাব—৩১
বোম্বাই—১৪৮ মধ্যপ্রদেশ—১২০ রাজস্থান—১
সৌরাষ্ট্র—৬ মাদ্রাজ—৭০ ত্রিবাঙ্কুর কোচিন—৭
কচ্ছ—১ মহীশূর—১৩ দিল্লী—৩৩
উত্তর প্রদেশ—১৭

২১শে ফাল্গুন তারিখে প্রতিনিধিদের এক সভায় অখিল ভারত "নই-তালিম" শিক্ষকসঙ্ঘ গঠিত হয় এবং শ্রীআর্য্যনায়কম্ সভাপতি, শ্রীধারিকাপ্রসাদ সিংহ সহ-সভাপতি ও শ্রীযোগেশ্বরা-নন্দ শর্ম্মা সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। একটি কর্ম্মপরিষদ নিয়োগ করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। ঠিক হয়, প্রথমবার সভাপতিই বিভিন্ন রাজ্য হইতে উহার সদস্য মনোনীত করিবেন। সঙ্ঘের গঠনমূলক নিয়মাবলীর খসড়া তৈরি করার জন্য একটি সাব-কমিটিও নিয়োগ করা হয়।

* ওয়ার্ধায় গঠনমূলক কর্ম্মী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ এই সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত।

ভাবীকালের ভারতীয় চিত্রের রূপ

অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

আজকের অপরাহ্নে আমরা সমবেত হয়েছি একজন চিত্র-শিল্পীর সাদর নিমন্ত্রণে। এই চিত্রের ভূরিভোজনে এসেছেন অনেক গণ্যমান্য নাগরিক ও রূপরসিক। তাঁদের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব করে বক্তাকে দেওয়া হয়েছে সম্মানিত অতিথির আসন। আজকালকার এই সম্মানিত 'অতিথি-চয়নে'র নূতন প্রথা আমার ভাল লাগে না। অন্য সভার কথা বলতে পারি না। শিল্পের জগৎ সাম্যতন্ত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত—এখানে অধিকারীভেদের সুযোগ নেই; জাতি, গুণ, ধনী-নির্ধন-নির্বিশেষে সকলেরই রসের পংক্তিভোজনে আসন গ্রহণ করবার সমান অধিকার, সমান দাবি আছে। এইরূপ নিমন্ত্রণ-সভায় সকলেই সম্মানিত অতিথি। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে একজনকে সম্মানের আসনে বসাবার কোনও অর্থ হয় না। অনেকে বলবেন, এই অতিথি-চয়নের পশ্চাতে একটা গূঢ় উদ্দেশ্য থাকে,—সম্মানিত অতিথির নিকট একটি ছোটখাটো বক্তৃতা আদায় করা। এই উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে। কারণ অতিথিকে গৃহস্বামী ভোজ্য, পেয় ইত্যাদি উপভোগ্য বস্তু দান করে আপ্যায়িত করবেন, অতিথির নিকট কিছু আদায় করা সমাজধর্মের ভিত্তিগত নীতিবিরুদ্ধ নিন্দনীয় প্রথা। আমার দ্বিতীয় আপত্তি হ'ল এই যে, ছবির শব্দহীন রাজ্যে কথা বলা অত্যন্ত অশোভন।

কথার কথা স্তব্ধ না হলে ছবির কথা শুনতে পাওয়া যায় না। রূপবিদ্যার দরবারে কারো কথা বলবার অধিকার নেই, মুখটি বন্ধ করে চোখ দুটি আকর্ণ বিস্তৃত করে ছবি দেখতে হবে, 'নিরক্ষরে'র ভাষায় লেখা ছবির কথা শুনতে হবে। ছবিকে তার কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই ছবিকে প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করা—ছবির সহিত মিতালি পাতাবার প্রকৃষ্ট পথ নয়। আতাউল্লার 'আ' বলবার আগেই যদি আপনারা বিনামা বর্ষণ করেন তা হলে রূপকার যে রস পরিবেশন করতে চান—তা থেকে আপনারা বঞ্চিত হবেন। রসের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাই ব্যর্থ হবে এবং রসের পরিবেশক গৃহস্বামীর অপমান করা হবে। আমাদের সমাজে প্রাচীনকালে সাধারণ ভোজনব্যাপারে কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল—তার নিশ্চয়ই একটা বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। চিত্রের নিমন্ত্রণ সভায় এই কথা না-বলার নিয়ম বিশেষ ভাবেই প্রযোজ্য।

কারণ রূপশিল্পী কথার অতীতকে, অনির্ব্বচনীয়কে '—যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে' সেই নিগূঢ় সত্যকে, সেই "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্"কে রূপের ভাষায়, নৈঃশব্দ্যের ভাষায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করেন। আমরা যদি গোড়া থেকেই কথা বলতে সুরু করি—তা হলে চিত্রকে তার বক্তব্য প্রকাশ করবার সুযোগ দেওয়া হবে না।

এই সম্বন্ধে আমার মত অর্ব্বাচীনের কথা আপ্তবাক্য বলে আপনাদের মেনে নিতে বলি না। কিন্তু আমার বড় নজির আছে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি-মনীষীর উক্তিতে। রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন—

> "অয়ি চিত্রলেখা দেবী, ক্ষম মোরে, তোমার মহিমা
> যদি খর্ব্ব করে থাকি দিতে গিয়ে বাক্যে ঘেরা সীমা,
> বাক্যের অতীত তুমি। আপন প্রকাশ আপনাতে
> নিয়ে সাথে নিজে দাও দেখা, বচনের মল্লিনাথে
> ভ্রূক্ষেপ কর না কভু।"

সুতরাং চিত্রশালা কথা কাটাকাটির ব্যায়ামশালা নয়। এখানে নির্ব্বিচারে একতরফা ছবির কথা মুখ বুজে শুনে যেতে হবে। কথার দৌরাত্ম্য এখানে চলবে না। জিহ্বার যথেচ্ছাচারের জন্য অনেক ক্ষেত্রই পড়ে আছে—যাঁরা কথা কাটাকাটি করে আনন্দ পান তাঁদের জন্য আছে ক্লাব, সভা ও সংবাদপত্রের স্তম্ভ।

এইজন্য এই সম্মানিত অতিথির আসন আমাকে বড় বিপদে ফেলেছে। আমার বিবেকবুদ্ধি বলছে, ছবির সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলা মহাপাপ, ছবি এবং ছবির স্রষ্টাকে অপমান করা। এই মহাপাতকের জন্য 'চিত্রলেখা দেবী' নিশ্চয়ই আমাকে অভিশাপ দেবেন এবং এই শাপ-মোচনের জন্য হয়ত আমাকে দীর্ঘকাল মৌনব্রত অবলম্বন করতে হবে। পাপ যখন করেইছি তখন আরও বেশী দুটো কথা বলে নি।

কথাটা হচ্ছে ভারতের ভারতীয় চিত্রকর কোন্ ভাষায় চিত্র রচনা করবেন—দেশের ভাষায় না বিদেশের ভাষায়? এই প্রশ্ন করেছিলেন প্রায় সত্তর বৎসর আগে একজন ফরাসী রূপরসিক—মরিস্ মেত্র্ :

"L' Art dans l'Inde sera indienne. ou il ne sera pas ?"

অর্থাৎ—ভারতের শিল্প ভারতীয় রূপ ও রীতি গ্রহণ করবে, না অন্য কোনও রীতি অনুসরণ করবে?

এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছেন আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ দেশীয় ভাষায়, দেশীয় পদ্ধতি ও রীতিতে চিত্র লিখে।

তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ভারতের একটি নিজস্ব চিত্রের ভাষা আছে এবং সেই ভাষা পৃথিবীর অন্য কোনও ভাষা অপেক্ষা হীন নয়, অধিকন্তু অনেক বিদেশী ভাষার চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ও শক্তিমান। সে ভাষার মর্য্যাদা রক্ষা করে তাকে আরও শক্তিমান এবং প্রকাশরীতিতে আরও বড় করে তোলা, আরও সমৃদ্ধ করে তোলা, প্রত্যেক ভারতীয় চিত্রশিল্পীর অবশ্যপালনীয় ধর্ম। জননী, জন্মভূমি ও জন্মভূমির ভাষাকে বর্জ্জন করে কোনও মানুষই মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে পারেন না।

ভারতীয় নিজস্ব চিত্রের ভাষাকে বর্জ্জন করা দেশপ্রীতির বিরুদ্ধে মহাপাপ, দেশের বিরুদ্ধে মহাপাপ। এই মহাপাপ থেকে আমাদের ভারতীয় রূপকারদের রক্ষা করুন ভারতের প্রাচীন শিল্পদেবতা।

রবীন্দ্রনাথ কখনও বিদেশী ভাষায় কাব্য রচনা করেন নি, বিদেশের নানা সাহিত্য থেকে বহুমূল্য উপকরণ আহরণ করে তাঁর নিজস্ব কাব্যলক্ষ্মীকে অলঙ্কৃত করেছেন, সমৃদ্ধ করেছেন, কিন্তু বাংলা ভাষা বর্জ্জন করে বিদেশী ভাষার আশ্রয় নেন্ নি, কিংবা বিদেশী ভাষার অনুকরণ করেন নি। তাঁর জন্মভূমির ভাষাকে, মাতৃভাষাকে পরিমার্জ্জিত ও পরিশুদ্ধ করে অলৌকিক রূপে ও শোভায় উজ্জ্বল করে রেখে গেছেন। মাতৃভাষাকে বর্জ্জন করে কোনও রূপ জাতীয় সাধনার প্রকাশ-চেষ্টা বাতুলতার নামান্তর।

বিদেশের কবিরা আপন আপন মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় কাব্য রচনা করেন না। আমাদের দেশে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় প্রধানতঃ দুই জন কবির রচনায়—তাঁদের এক জন তরু দত্ত এবং অন্য জন সরোজিনী নাইডু। সরোজিনী নাইডুকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কংগ্রেসে যোগ দেবার পর আর আপনি কবিতা লেখেন না কেন?'

উত্তরে তিনি তিরস্কার করে আমাকে বলেছিলেন, 'গাঙ্গুলী! তোমার মুখে এ প্রশ্ন সাজে না, কারণ আমি এখন কবিতা কেন লিখি না তার কারণ তুমি সকলের চেয়ে বেশী জান!'

তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, জাতীয়তার পতাকা বহন করে কেজো ব্যাপারে দায়ে ঠেকে ইংরেজী বলা যদিও সাজে, কবির মনের কথার প্রকাশ মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় হওয়া অত্যন্ত অশোভন এবং মানসিক বিকারগ্রস্ত বিজাতীয় বাতুলতা।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই মাতৃভাষার প্রতি একান্ত অনুরাগ ও নৈষ্ঠিক ভক্তি এখনকার কালের অতি-আধুনিক সাহিত্যসেবীরা স্বীকার করে নিয়েছেন—যদিও তাঁরা নূতনত্বে দাবি নিয়ে স্বকীয় পন্থা ও রীতিতে সাহিত্যের নব ন রূপসৃষ্টির পথে সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। আপনারা জানে যে, "রবীন্দ্রোত্তর যুগে" কতিপয় অতি-আধুনিক সাহিত্যিং রবীন্দ্রনাথের পথ ও প্রকাশভঙ্গী এবং রীতি বর্জ্জন করে নূতন নূতন পথে আত্মপ্রকাশ করতে চেষ্টা করছেন। তাঁরা ইউরোপের নবযুগের সাহিত্যের রীতি-পদ্ধতি ও প্রকাশভঙ্গী অনুকরণ করে সাহিত্য-সৃষ্টিতে মৌলিকত্বের আমদানী করবার নানা পরীক্ষা ও চেষ্টা করছেন, কিন্তু তথাপি এই মৌলিকত্বের প্রয়াস বাংলা ভাষা ত্যাগ করে কোনও সার্ব্বজনীন এস্‌পেরেন্টোর আশ্রয় নেয় নি।

চিত্ররচনার পথে এর ব্যতিক্রম কেন হবে তা বোঝা যায় না। কিন্তু আমরা দেখছি যে, কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের কয়েক জন প্রতিভাবান চিত্রকর ভারতের প্রাচীন ও শক্তিশালী চিত্রের ভাষা বর্জ্জনপূর্ব্বক মাতৃভূমি ও জাতীয়তাকে অপমান করে ইউরোপের অতি-আধুনিক চিত্রের ভাষার অন্ধ অনুকরণ করছেন মৌলিকত্ব ও উৎকট স্বাধীনতার ভ্রান্ত দাবি নিয়ে। সাহিত্যের ভাষার ন্যায় আমাদের দেশের চিত্রের ভাষাও যুগে যুগে নূতন রীতি ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। কেবলমাত্র অজন্তার পদ্ধতি বা মুঘল শৈলীর অন্ধ অনুসরণ করে বা প্রাচীনত্বের একই নির্দ্দিষ্ট পথে ভারতের নানামুখী চিত্রশিল্প একই পদ্ধতির রূপ সৃষ্টি করে নাই।

ভারতের চিত্রশিল্পের ইতিহাস যাঁরা অন্বেষণ ও আলোচনা করেছেন তাঁরা জানেন যে, সাত শতকের পর ভারতের চিত্রশিল্প নূতন নূতন রীতি-পদ্ধতি আবিষ্কার করে নূতন নূতন চিত্রশিল্পের শৈলীর জন্ম দিয়েছে—অজন্তার বা মুঘল শৈলীর অন্ধ অনুসরণ করে নি। কিন্তু এই নব নব রীতির প্রবর্ত্তনের পথে মূল ভারতীয় চিত্রশিল্পের ভিত্তিগত ভাষাকে বর্জ্জন করা হয় নি।

বর্ত্তমান যুগে ভারতের নিজস্ব জাতীয় চিত্রের মাতৃভাষাকে বর্জ্জন করবার কি যুক্তি আছে তা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। এক কথায় বলতে গেলে ভারতীয় চিত্রের মাতৃভাষার ভিত্তিগত প্রকৃতি হ'ল—আলো-ছায়া বিবর্জ্জিত, রেখা-প্রধান, প্রকাশরীতির ভাষা। চীন, জাপান ও ইরাণের চিত্রশিল্পেও এই ভিত্তিগত রীতির মিল পাওয়া যায়।

পক্ষান্তরে বাস্তবিকতার উৎকট আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ইউরোপের সাধারণ চিত্রপদ্ধতি চিত্রশিল্পে রেখার প্রাধান্য স্বীকার করে না, আলো ও ছায়া এবং বর্ণের গভীর প্রলেপ দ্বারা রূপের বিশিষ্ট আকৃতিকে আচ্ছন্ন করা হয় ইউ-

রোপের পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতি ভারতীয় চিত্রশিল্পের জাতিগত পদ্ধতির বিরোধী।

ভারতীয় চিত্রশিল্পের নানা শাখার মধ্যে মুঘল স্কুল বা শৈলী সর্ব্বাপেক্ষা বাস্তবধর্মী প্রকৃতিবাদী পদ্ধতি। কিন্তু মুঘল-শৈলীর 'বাস্তব' পন্থায় ভারতীয় চিত্রের বিশেষ লক্ষণ রেখার প্রাধান্যকে ক্ষুণ্ণ করা হয় নি। অর্থাৎ মুঘল শিল্পীরাও (যাঁরা ছিলেন বেশীর ভাগ ইরাণ থেকে আগত বিজাতীয়, বিধর্ম্মী শিল্পী) ভারতীয় চিত্রশিল্পের 'জাত' মারতে পারেন নি। পরন্তু ভারতীয় চিত্রশিল্পের ভিত্তিগত লক্ষণ রেখার প্রাধান্যকে স্বীকার করে নিয়ে ভারতের চিত্রশিল্পের মূল বৃক্ষের একটা নতুন শাখা রচনা করে গিয়েছেন, প্রাচীন বটবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করে তার স্থানে ইরাণী শিল্পতরু রোপণ করেন নি। অর্থাৎ ভারতের চিত্রশিল্পের মাতৃভাষাকে বর্জ্জন করে একটা নূতন বিজাতীয় ভাষা সৃষ্টি করেন নি।

এমন কি সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুঘল যুগের নূতন উর্দ্দু ভাষা নিছক ফার্সী ভাষার অন্ধ অনুসরণ নয়। পরন্তু এই নূতন ভাষা ভারতীয় ভাষার সঙ্গে ভিত্তিগত সমন্বয় করে ভারতীয় ভাষাকে এক অভিনব রূপ ও প্রকাশ-শক্তি দান করেছে।

বিদেশের চিত্রশিল্প থেকে নব নব রীতি ও প্রকাশভঙ্গীর শক্তি আহরণ করবার স্বাধীনতা প্রত্যেক ভারতীয় শিল্পীর অবশ্যই আছে, কিন্তু এই তথাকথিত নূতন আমদানী ভারতের মূল চিত্রের ভাষাকে বিপর্য্যস্ত করলে কিনা তার নিগূঢ় বিচার করে নূতন আমদানীর মূল্য নির্দ্ধারণ করতে হবে।

আমাদের নব স্বাধীনতার পরিবেশে জাতীয় ঐক্য-সাধনার উদ্দেশ্যে বিদেশের দাসত্বের চিহ্ন ইংরেজী ভাষাকে বর্জ্জন করে একটা সার্ব্বজনীন ভারতীয় ভাষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা চলছে। ইংরেজী ভাষার দাসত্ব স্বাধীন ভারত আজ আর স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নয়। জাতীয় চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে বিদেশের দাসত্ব স্বীকার করা সমীচীন কিনা সেটাও ভেবে দেখবার সময় উপস্থিত হয়েছে।

কথায় কথায় অনেক কথা বেড়ে গেল। 'সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।' আজ আমরা শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশ মহাশয়ের চিত্রমালার প্রদর্শনী দেখতে এসেছি। তাঁর চিত্র ভাল কি মন্দ তার বিচারের পূর্বে এই প্রশ্নই সকলের আগে করবার আমাদের অধিকার আছে—ভারতের চিত্রশিল্পের ভাষাকে তিনি অস্বীকার করেছেন কিংবা সসম্মানে স্বীকার করে নিয়ে ভারতের রূপের ভাষাকে নূতন সম্পদে, অভিনব কল্পনায় সুসজ্জিত ও ঐশ্বর্য্যশালী করে তুলেছেন?

এই প্রশ্নের সদুত্তরের উপর তাঁর রূপসৃষ্টির সাফল্য নির্ভর করবে। আশা করি, তিনি এই অগ্নিপরীক্ষা মাথা পেতে নেবেন এবং এই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে, নূতন ভারতীয় চিত্রকে পুরাতনের প্রসিদ্ধি এবং গৌরব দিয়ে ভারতীয় চিত্রশৈলীর গৌরব বৃদ্ধি করবেন; ভাবীকালের ভারতীয় চিত্র কোন্ দিকে যাবে তার পথনির্দ্দেশ করবেন।*

---

* শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশের প্রদর্শনীর উদ্বোধনে প্রদত্ত অভিভাষণ।

শুভ বৈশাখ। ১৩৫৮

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

জ্যোতির্ম্ময় যে এসেছে মোদের এসেছে রাজাধিরাজ,
অভিষেক তার দশ সহস্র হেম চম্পকে আভা।
কমল বিদল,
হইয়াছে চঞ্চল,
লাগে হিল্লোল কল-কল্লোল সপ্ত-সাগর মাঝ।

পোহালো ক্লৈব্য-কলুষ-লিপ্ত কলঙ্কময় রাত,
এলো সহস্র বৎসর পর শুভ্র সুপ্রভাত।
পরাধীনতার গ্লানি
আজ মুছে গেল জানি
হে দেব রজত-গিরি-সন্নিভ, লও লও প্রণিপাত।

তব আগমনে বিশাল ভারত উর্জ্জস্বল হোক
ধ্বনিত হউক সর্ব্বাপরাধ-ভঞ্জন-করা শ্লোক।
পরমানন্দে নাচি
নূতন করিয়া বাঁচি
পার্থিব রজঃ হলো মধুময়—অমৃতময় লোক।

রাণী রাসমণি ও নবদ্বীপের পণ্ডিত

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ঠিক এক শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশে অতি বিস্ময়কর এক সামাজিক ঘটনা হইয়াছিল, বাঙ্গলার সমাজবিবর্ত্তনের ইতিহাসে যাহার গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নহে। অথচ ঘটনাটি এখন বিস্মৃতির অন্ধকারে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ১২৫৭ সনের মাঘ মাসে (অর্থাৎ ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে) চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল—তদুপলক্ষ্যে দক্ষিণেশ্বর তীর্থের প্রতিষ্ঠাত্রী সুপ্রসিদ্ধ রাণী রাসমণি চৌধুরাণী (১২০০—৬৭ সন) বহু দানধর্ম্ম করিয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীরাম শিরোমণি প্রমুখ নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিতগণ প্রত্যেকে তাঁহার নিকট একখণ্ড বনাত ও নগদ ৫০ পঞ্চাশ টাকা পাইয়াছিলেন। এই দানগ্রহণব্যাপার দেশে কিরূপ বিপুল আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল তদানীন্তন "সংবাদভাস্কর" পত্রে তাহা রসাল করিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ সনের ভাস্কর আমরা দেখি নাই। সৌভাগ্যবশতঃ "সমাচার-দর্পণে"র ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখের সংখ্যায় "অন্য পত্র হইতে গৃহীত" বলিয়া "নবদ্বীপের পণ্ডিত" শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল (পৃ. ১৫৮৯)। তৎকালে সমাচারদর্পণ ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষায় প্রকাশিত হইত এবং উক্ত সংবাদের একটি কৌতুকজনক ইংরেজী অনুবাদও মুদ্রিত হইয়াছিল। মূল সংবাদটি অবিকল উদ্ধৃত হইল :

নবদ্বীপের পণ্ডিত

সমাজ নবদ্বীপের মান্যবর অধ্যাপক মহাশয়েরা বুঝি ধর্ম্মঘট* করিয়া আপনারদিগের ব্যবসায় ধর্ম্মকে ঘটের মধ্যেই দিলেন, গত মাঘ মাসে চন্দ্রগ্রহণ সময়ে তাঁহারা জানবাজারনিবাসিনী শ্রীমতী রাসমণী চৌধুরাণীর দান গ্রহণ করেন তৎকালেই নবদ্বীপ হইতে ডাকযোগে আমারদিগের নিকট এক প্রেরিত পত্র আইসে আমরা ২০ মাঘের ভাস্করে তাহা প্রকাশ করিয়াছি, পত্র প্রেরক মহাশয় তাহাতে লেখেন "প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুত শ্রীরাম শিরোমণি ও মাধব তর্কসিদ্ধান্ত ও গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন ও লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ ও ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও কৃষ্ণচন্দ্র চূড়ামণি প্রভৃতিকে ৫০ পঞ্চাশ পঞ্চাশ তঙ্কা নগদ ও একখান ২ বনাত প্রদান করিয়াছেন তৎপরে কিছুকাল আর উচ্চবাচ্য ছিল না, অনন্তর নবদ্বীপাধিরাজ শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুর স্বীয় দৌহিত্রের অন্নপ্রাশনে ঐ দান গ্রহণে পতিত বলিয়া অধ্যাপক মহাশয়দিগের নিমন্ত্রণ রহিত করেন তাহাতেই রাগান্ধ হইয়া অধ্যাপকেরা ২ ভাদ্র তারিখে ধর্ম্ম ঘট করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন রাজবাটীতে আর যাইবেন না, শ্রীযুত মহারাজ বাহাদুরকেই একঘরীয়া করিবেন, এবং শ্রীমতী রাসমণী চৌধুরাণীর†... লইয়া ব্যবসায় চালাইবেন, আমারদিগের কোন সমাচারদাতা দুই পত্রে এই বিষয়ের প্রসঙ্গ লিখিয়াছিলেন আমরা ভাস্কে তাহার কিয়দংশ প্রকাশ করিয়াছি ইহাতেই আকুণ্ডকুণ্ড হইয়া উঠিয়াছে, কলিকাতা প্রদেশীয় ধার্ম্মিকবর হিন্দুদলপতি মহাশয়গণ বিশেষতঃ শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, শ্রীযুত রাজা শিবকৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীযুত বাবু শিব নারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুত বাবু দেবনারায়ণ দেব, শ্রীযুত বাবু জগচ্চন্দ্র মুখো শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ দত্ত, শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব, শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, শ্রীযুত বাবু জয়চন্দ্র মিত্র ইত্যাদি সকলে ঐক্যবাক্য হইয়াছেন নবদ্বীপের অধ্যাপকগণকে নিমন্ত্রণ করিবেন না আর দোলদুর্গোৎসবাদিতে বার্ষিক দিবেন না এবং এই সকল দলপতি মহাশয়গণের আত্মীয় লোক যাঁহারা বিদেশে আছেন তাঁহারদিগের নিকটেও পত্র প্রেরণ হইতেছে, সে সকল স্থলেতেও পূর্ব্বোক্ত অধ্যাপক মহাশয়দিগের নিমন্ত্রণ ও বার্ষিক বন্ধ হইবে, তবে যদি অধ্যাপকেরা যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইয়া নবদ্বীপাধিপতির মোহরাঙ্কিত ছাড়পত্র দেখাইতে পারেন তখন নিগ্রহ পরিবর্ত্তে অনুগ্রহ প্রকাশ দলপতি মহাশয়গণের ইচ্ছার অধীন, অনুগ্রহ করিলেও করিতে পারেন, যাহা হউক, আপাতত দুর্গোৎসব নিকট হইল, অধ্যাপকেরা ইহাতে অনেকস্থলে বার্ষিক পাইয়া থাকেন তাহা গেল।

বাবু দেবনারায়ণ দেব ও বাবু আশুতোষ দেব পূজার পূর্ব্বে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিবেন না তাহাতেও অধ্যাপক মহাশয়দিগের বিস্তর ক্ষতি হইবে, তবে ধর্ম্ম ঘট করিয়া কি ব্যবসায় ধর্ম্মকে ঘটের মধ্যে দিলেন, কলিকাতা নগরে অধ্যাপকগণের বিষয়ে যখন এই গোলযোগ হইতেছিল এমন সময়ে তাঁহারদিগের ছাত্রেরা আসিয়া কহিলেন এ বৎসর নবদ্বীপে শাস্ত্রব্যবসায় হয় নাই, ছাত্রেরা অধ্যাপকদিগকে পতিত বলিয়া তাঁহারদিগের নিকট অধ্যয়ন করেন নাই, বরং অধ্যাপকেরা ছাত্রেরদের গৃহপ্রবিষ্ট হইলে ছাত্রগণ তাঁহারদিগের সাক্ষাতেই পাকের হাঁড়ী ও জলের কলসী ফেলিয়া দিয়াছেন, তবেই অনুমান করিতে হইল নবদ্বীপ আর সে নবদ্বীপ নাই মরিচ উপদ্বীপের ন্যায় নবদ্বীপ হইয়াছে, ইহাতে কি নবদ্বীপে আর উচ্চ বিদায় হইবেক, অধ্যাপকেরা প্রকাশ্যে হবিষ্য থাকিয়া মৎস্যের উপর লোভ করেন চুণা পুটী পর্য্যন্তও বাছেন না, এরূপ হইলে কি সম্মান থাকে, এইক্ষণে তাঁহারদিগের উপায় কি ; শ্রীমতী রাসমণী চৌধুরাণী দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে দেবালয় নির্ম্মাণাদি বৃহৎ কাণ্ড করিতেছেন সেই স্থানে এক শত ঘর বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে বাসস্থান দিবেন, নবদ্বীপের অধ্যাপকেরা যদ্যপি তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া দক্ষিণেশ্বর আসিয়া বসতি করেন তবে দক্ষিণেশ্বরকে নবদ্বীপ করিয়া তুলিতে পারেন, পণ্ডিতেরা যদি বনে থাকেন, তবে বনভূমিও বিবিধ বিদ্যাভূমি হয়, কালিদাস এই সাহসে অনেকবার মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এইক্ষণে নবদ্বীপে মথুরানাথ, জগদীশ, গদাধর ভট্টাচার্য্য, মধুসূদন, মহিষারাম, হরিরাম, শঙ্কর পর্য্যন্ত থাকিলেও এইরূপ করিতেন, সে নবদ্বীপচন্দ্রও নাই, সে সকল পণ্ডিতেরাও লীলা সম্বরণ করিয়াছেন, শ্মশানভূমিতে খদ্যোতকতেজাখ্য মহাশয়গণ অহঙ্কারের প্রজা হই(য়াছেন) "নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ।" ভাস্কর। ৪ সেপ্টেম্বর।

(লক্ষ্য করা আবশ্যক যে দুইটি অণুচ্ছেদের মধ্যে 'কমা' ভিন্ন কোন বিরামচিহ্ন নাই, কেবল সর্ব্বশেষে দাঁড়ি আছে)।

* ইংরেজী অনুবাদে আছে—have held a synod.

† দুই অক্ষর এখানে ত্রুটিত, শব্দটি বোধ হয় 'দান' (ইংরেজী অনুবাদ assistance)।

* ইংরেজী অনুবাদ they have produced no end of s row.

সমাচারটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনার পূর্ব্বে নামনির্দ্দিষ্ট পণ্ডিতদের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিত হইল। শেষাংশে নবদ্বীপের সাত জন প্রাচীন মহাপণ্ডিতের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে—"নবদ্বীপমহিমা" নামক গ্রন্থে তাঁহাদের প্রবাদমূলক বিবরণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রায় সকলেরই জীবনী ও কীর্ত্তিকাহিনী বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে অদ্যাপি অনালোচিত রহিয়াছে। সদ্যপ্রকাশিত পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩৫৭ সনের শেষ সংখ্যায়) আমরা "মথুরানাথ তর্কবাগীশে"র প্রকৃত পরিচয়াদি দিতে চেষ্টা করিয়াছি। জগদীশ, গদাধর, হরিরাম ও সুবিখ্যাত শঙ্কর তর্কবাগীশের পরিচয় নবদ্বীপমহিমা গ্রন্থেই আপাততঃ দ্রষ্টব্য। দুইটি নাম সম্পূর্ণ নূতন—মধুসূদন ও মহিষারাম। উভয়েই নবদ্বীপের অপর একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের সন্তান ছিলেন (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৫ ভাগ, পৃ. ৬০-৬২)।

এক শত বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিতদের মধ্যে ছয় জনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। (১) শ্রীরাম শিরোমণি (১২০০—৬৫ সন) বিখ্যাত গ্রন্থকার গদাধর ভট্টাচার্য্যের বৃদ্ধপ্রপৌত্র। ১২২৬ সনে পিতা কৃষ্ণকান্ত বিদ্যালঙ্কারের স্বর্গারোহণের পর মাত্র তিন জন ছাত্র লইয়া তিনি অধ্যাপনা আরম্ভ করেন এবং অত্যল্পকালমধ্যেই নবদ্বীপসমাজের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তৎকালে নবদ্বীপে নব্যন্যায়চর্চ্চার দুইটি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, এক সম্প্রদায়ের সমস্ত প্রতিভা কেবল অনুমানখণ্ডের আলোচনায় নিবদ্ধ ছিল। শঙ্কর তর্কবাগীশের সম্প্রদায়ে নব্যন্যায়ের সকল প্রচলিত গ্রন্থই অধীত হইত। শ্রীরাম প্রথম সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন—অনুমানখণ্ডের হেত্বাভাসপ্রকরণে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রচারলাভ করে। ১২৩২ সনে কাশীনাথ তর্কচূড়ামণির স্বর্গারোহণের পর শ্রীরাম শিরোমণি নবদ্বীপের "প্রধান নৈয়ায়িকে"র পদে অধিষ্ঠিত হন* এবং দীর্ঘ ৩০ বৎসরের পর ১২৬১ সনে পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত হইয়া ঐ পদ পরিত্যাগ করেন। ১২৬৫ সনের ৪ আষাঢ় জামাই-ষষ্ঠী দিন তিনি স্বর্গত হন। ঐ সনের "সংবাদপ্রভাকর" পত্রের ১৮ আষাঢ় সংখ্যায় তাঁহার মৃত্যুসংবাদ ঘোষিত হইয়াছিল:—

"আমরা সীমাশূন্য শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি। নবদ্বীপনিবাসী সুবিখ্যাত পূজ্যবর ৺শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয় এতন্মায়াময় সংসার বিনিময়করত যোগ্যধামে যাত্রা করিয়াছেন, এই মহাশয় যদিও বহু শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু ইদানীং এতদ্দেশে তাঁহাকে সকলে তর্কশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া পরিগণ্য করিতেন। অতএব তন্মহাত্মার লোকান্তরগমন সংবাদ শ্রবণমাত্রেই তাবতে ক্ষুব্ধ হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?"

(২) মাধব তর্কসিদ্ধান্ত সুপ্রসিদ্ধ শঙ্কর তর্কবাগীশের পুত্র শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতির ছাত্র ছিলেন এবং শ্রীরাম শিরোমণির বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ১২৬১ সনে শ্রীরাম রোগগ্রস্ত হইলে "প্রধান রীতি যে সভারূঢ় হইয়া সমস্ত শাস্ত্রীয় পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্তদ্বারা সভ্যজনান্তঃকরণকে সন্তোষিত করণ তৎপক্ষে অক্ষম হইয়াছেন, এই সকল হেতূপন্যাসপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে (রাজা শ্রীশচন্দ্র) তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ কল্পিত নিয়মানুসারে সকল পণ্ডিতাভিপ্রায় গ্রহণক্রমে ১৯ আশ্বিন তারিখে প্রাধান্যপদে নিযুক্ত করিয়াছেন" (সংবাদ ভাস্কর, ১৭।১০।১৮৫৪ ইং, পৃ. ৩১৭)। ১০ বৎসর প্রাধান্য পদে অধিষ্ঠান করিয়া ১২৭২ সনের বৈশাখী শুক্লাদশমীতে মাধবচন্দ্র ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। মাধবচন্দ্র একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার ছিলেন। নব্যন্যায়ের কোন কোন প্রকরণে "মাধবী" পত্রিকা পাওয়া যায় এবং নানা শাস্ত্রে তদ্রচিত বহু গ্রন্থ এক সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কারকচক্রের ও শক্তিবাদের টীকা মুদ্রিত হইয়াছে।

(৩) গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন (১২১৩—৬১ সন) পূর্ব্বোক্ত শ্রীরাম শিরোমণির প্রধান ছাত্র। শ্রীমাধব ভট্টাচার্য্য রচিত "চরিতচতুষ্টয়" গ্রন্থে (১২৮১ সনে প্রকাশিত, পৃ. ৩৪-৬২) তাঁহার প্রামাণিক জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল। নব্যন্যায়ের বহুপ্রকরণের উপর তদ্রচিত অতি সূক্ষ্ম বিচারপূর্ণ "টিপ্পনী" ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার লাভ করে—নবদ্বীপে নব্যন্যায়চর্চ্চার ইহাই সর্ব্বশেষ পরিণতি। তাঁহার অকালমৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে তাঁহার চতুষ্পাঠীতে ছাত্রসংখ্যা হইয়াছিল প্রায় ২০০। নবদ্বীপের ৫০০ বৎসরের সারস্বত ইতিহাসে কেবল শঙ্কর তর্কবাগীশ ব্যতীত এই ছাত্রসম্পদের সীমা কেহ অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি।

(৪-৫) লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ ও তৎপুত্র ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত্তপণ্ডিত ছিলেন। ন্যায়ভূষণ ১২৬১ সনে পরলোক গমন করেন (সংবাদপত্রে সেকালের কথা,

---

* নবদ্বীপ-মহিমার মতে (১ম সং, পৃ. ১০৪; ২য় সং, পৃ. ৩২৩) কাশীনাথের পর "দণ্ডী" প্রধান নৈয়ায়িকের পদ প্রাপ্ত হন। ইহা ঠিক নহে, শঙ্কর-পুত্র শিবনাথের পরেই রাজা গিরীশচন্দ্র বিদেশী দণ্ডীকে ঐ পদে বৃত করিয়াছিলেন (সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ৪২), কিন্তু তাঁহার প্রাধান্য পণ্ডিতসমাজে স্বীকৃত হয় নাই। এই দণ্ডী গোস্বামীর নাম ছিল "স্বয়ম্প্রকাশ" এবং তিনি ও তদীয় পদাধিকারী দণ্ডী গোস্বামী "ঈশ্বর ব্রহ্মাশ্রম" সুদীর্ঘকাল "দণ্ডীর টোলে" সুখ্যাতির সহিত ন্যায়শাস্ত্র পড়াইয়াছেন।

১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৪৭৭), তৎকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ আছে। বিদ্যাভূষণ ১২৯১ সনের ২১ চৈত্র ৮২ বৎসর ৭ মাস বয়সে ওলাউঠা রোগে পরলোক গমন করেন।

(৬) কৃষ্ণচন্দ্র চূড়ামণির নাম নবদ্বীপে সম্পূর্ণ অপরিচিত। ঐ সময়ে শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতির কনিষ্ঠ পুত্র "কৃষ্ণনাথ" চূড়ামণি লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহারই নাম অশুদ্ধাকারে উল্লিখিত হইয়াছে।

এক শত বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপের শীর্ষস্থানীয় এই সকল পণ্ডিতের শুধু নিমন্ত্রণে ও বার্ষিকেই এত প্রচুর আয় হইত যে এক খণ্ড বনাত ও ৫০ নগদ তাঁহাদের নিকট লোভনীয় হইতে পারে না, ইহা সর্ব্বাগ্রে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্ব ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাসমাজ নবদ্বীপের যাবতীয় অধ্যাপকের সহিত স্বয়ং নবদ্বীপাধিপতির এই বিস্ময়কর সংঘর্ষ, যাহাতে পণ্ডিতেরা হইলেন "পতিত" এবং তাঁহারা ধর্ম্মঘট করিয়া রাজাকে করিলেন "একঘরীয়া", বর্ত্তমান পরিস্থিতির ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া লিখিলে হয় এইরূপ —বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষমণ্ডলী ধর্ম্মঘট করিয়া চ্যান্সেলার প্রদেশপালকে বর্জ্জন করিলেন এবং প্রদেশপালও অস্পৃশ্য বলিয়া অধ্যক্ষমণ্ডলীর নাম কাটিয়া দিলেন !! এই অভাবনীয় ঘটনা ভারতেতিহাসের হিন্দুযুগে ও মুসলমান আমলে কুত্রাপি কখনও ঘটে নাই, ইহা জোর করিয়াই বলা চলে। ইংরেজ আমলে বিদ্যাসমাজের এই শোচনীয় পরিণতি কি করিয়া ঘটিতে পারিল তাহা বিশেষ গবেষণা ও আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত। বাঙ্গলার সারস্বত ইতিহাসের উপকরণরাজি বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের অনাদর হেতু যেভাবে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে তাহাতে আশঙ্কা হয় নবদ্বীপ বিদ্যাপীঠের অস্তিত্বই হয়ত কালে প্রমাণাভাবে সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিবে। আমরা কতিপয় বিষয় বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্ররূপে উল্লেখ করিতেছি। পলাশীর যুদ্ধের ফলে মুসলমান আমলের অবসান ঘটিলে বণিক্‌প্রধান ইংরেজ জাতির হস্তে বঙ্গদেশের শাসনভার ক্রমশঃ পতিত হয়। পাঠান ও মুঘল শাসনকালে ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবহারকাণ্ড বহুলাংশে অচল হইয়া গেলেও শাস্ত্রশাসিত হিন্দুসমাজের সংহতি, শৃঙ্খলা ও শক্তি অনেকটা অব্যাহত ছিল। সমগ্র বাঙ্গলাদেশ ঐ সময়ে বহুসংখ্যক সীমানির্দ্দিষ্ট "বিদ্যাসমাজে" বিভক্ত ছিল, বাঙ্গলার প্রত্যেকটি গ্রাম কোন-না-কোন সমাজের অন্তর্গত ছিল এবং প্রত্যেকটি হিন্দুর শাসনবিধান তত্তৎ সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। তৎকালে সমাজের শীর্ষস্থানে স্বভাবতই শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁহারা প্রায় সকলেই নিঃস্বার্থ, ধর্ম্মভীরু, বিষয়পরাঙ্মুখ ও তেজস্বী ছিলেন। বর্ত্তমানে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে, অধ্যয়ন-অধ্যাপন মাত্র প্রধানতঃ যাঁহাদের ব্যবসায় ছিল তাঁহাদের মধ্যে গুরুতা ও যাজকতা ব্যবসায় প্রায়শঃ ছিল না এবং কচিৎ থাকিলেও অতীব গৌণভাবে। অর্থাৎ গুরুতা ও যাজকতা ব্যবসায়ীদের শিষ্য ও যজমানসম্পদ্ অত্যুচ্চ সামাজিক মর্য্যাদার নিদান হইলেও তাঁহাদের মধ্যে শাস্ত্রকার ও শাস্ত্রব্যাখ্যাকার প্রায় ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, রঘুনন্দনের স্মৃতি বাঙ্গলাদেশ শাসন করিত, ইহা বস্তুতঃ এক ভ্রমাত্মক উক্তি। কোন কোন সমাজে পৃথক্ শাস্ত্রগ্রন্থ প্রমাণরূপে গণ্য হইত —উলার রঘুনাথ সার্ব্বভৌম, ত্রিবেণীর চন্দ্রশেখর বাচস্পতি, খানাকুল-কৃষ্ণনগরের নারায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থকার নিজ নিজ সমাজে রঘুনন্দনের উপরও লেখনী চালনা করিয়াছেন এবং প্রত্যেক সমাজে শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতের ব্যবস্থাপত্রই জজ কোর্টের সিদ্ধান্তের ন্যায় কার্য্যকরী হইত—রঘুনন্দনের মূল সন্দর্ভ নহে। যেস্থলে প্রবল পক্ষ ঐরূপ ব্যবস্থাপত্রের বিচার কামনা করিত সে স্থলে নবদ্বীপসমাজের অভিমত চরম সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হইত—অর্থাৎ নবদ্বীপের যিনি "প্রধান" স্মার্ত্ত হইতেন তাঁহার মর্য্যাদা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। তৃতীয়তঃ, এই সকল সামাজিক ব্যবস্থা সমাজের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত শ্রেণী ও সম্প্রদায় কর্ত্তৃক শ্রদ্ধা ও শৃঙ্খলার সহিত পালিত হইত এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে, ব্রাহ্মণ হইতে অন্ত্যজ কিংবা ম্লেচ্ছ পর্য্যন্ত, পরস্পর হৃদ্যতা ও সহানুভূতির অভাব পরিলক্ষিত হইত না।

সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া দেশকালভেদে আবশ্যক পরিবর্ত্তনসহ যে শাসনপদ্ধতি ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র বিপুল বিপ্লব ও বিঘ্নের মধ্যেও সাধারণ জনগণের সুখশান্তি বিধানে বহুলাংশে সমর্থ হইয়াছিল, সুচতুর ইংরেজ বণিক মূলতঃ দুইটি মাত্র অস্ত্রের সুনিপুণ পরিচালনা দ্বারা তাহা চুরমার করিয়া দিল—ভেদনীতি ও দুর্নীতি। বাঙ্গলাদেশই এই ধ্বংসলীলার প্রধান রঙ্গভূমি—দুর্নীতির রাজধানীস্বরূপ কলিকাতা নগরী হইল ইংরেজ শাসকের ভিত্তিস্থানীয় দুর্নীতিপরায়ণ ধনিকশ্রেণীর আবাসস্থল। হিন্দু সভ্যতার উপর এই মারাত্মক আঘাতের প্রথম ও প্রধান ফল হইল বিদ্যাসমাজসমূহের বিলোপসাধন এবং ইংরেজ ও ইংরেজীনবীশ বাঙ্গালীকর্ত্তৃক সমাজের শীর্ষস্থানীয় শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতদের দলন, লাঞ্ছনা ও বিনাশ, যাহা অদ্যাপি ছলে বলে চলিতেছে। এই আঘাত গুরু ও যাজকশ্রেণীর উপর ততটা মারাত্মক হয় নাই। শাসন ক্ষমতার অধিকাংশই ইংরেজ স্বদেশের বিজাতীয়

আদর্শে নানাবিধ প্রতিষ্ঠান ও বিভাগ সৃষ্টি করিয়া স্বহস্তে কাড়িয়া লইলেন এবং অবশিষ্ট সামান্যাংশ ক্রমশঃ কলিকাতার ধনিকশ্রেণীর হস্তে চলিয়া আসিতে লাগিল। বিলুপ্ত বিদ্যাসমাজসমূহের ইতিহাস ও বিবরণ উদ্ধার করা ক্রমশঃই উপকরণাভাবে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িতেছে। অথচ তদ্ব্যতিরেকে বাঙ্গলার সামাজিক বিবর্ত্তনের ইতিহাস বিকলাঙ্গ ও অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে।

নবদ্বীপের পণ্ডিতদের একটি আচরণকে উপলক্ষ্য করিয়া কলিকাতার পরস্পর বিবদমান "দল"পতিদের ও তাঁহাদের আশ্রিত পণ্ডিতদের এই বিস্ময়জনক আন্দোলন ইংরেজ-প্রবর্ত্তিত ভেদনীতির এক চরম অভিব্যক্তি বলিয়াই আমরা মনে করি। ইহার পরিণাম কি হইয়াছিল আমরা অবগত নহি। ভাস্কর-সম্পাদক নবদ্বীপের ছাত্র ছিলেন না, নবদ্বীপের মর্য্যাদাহানিতে তাঁহার গূঢ় উল্লাস অনুমান করা যায়। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। দেখা যায়, রাধাকান্ত দেব "পতিতোদ্ধারিণী সভা" প্রতিষ্ঠা করিয়া পতিতোদ্ধার বিষয়ক এক ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করেন। ১৭৭৫ শকে তাহা মুদ্রিত হইয়াছিল—তাহাতে ৬০ জন পণ্ডিতের স্বাক্ষর আছে এবং ১৯ জনই হইল নবদ্বীপের। আমরা মূল ব্যবস্থাপত্রটি চুঁচুড়ার এক ব্রাহ্মণগৃহে দেখিয়াছি। ইহা সময়োপযোগী এবং ভাস্কর-প্রবর্ত্তিত উক্ত আন্দোলনের সাফল্য সূচনা করে না। পক্ষান্তরে নবদ্বীপাধিপতিও পরে বাৎসরিক "ইচ্ছাভোজনে" নবদ্বীপের যাবতীয় পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন এইরূপ প্রমাণ আছে। একটি কথা আমরা উপসংহারে উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। রাজা রাধাকান্ত দেব সেকালের অতুলনীয় পণ্ডিতসেবী ছিলেন, কিন্তু শব্দকল্পদ্রুম মহাভিধান কোন্ কোন্ বিশিষ্ট পণ্ডিতের সাহায্যে রচনা করিয়াছিলেন তাহা ঘৃণাক্ষরেও কুত্রাপি উল্লেখ করেন নাই। ইহার হেতু বুঝা কঠিন নয়!

পুনর্নবা

শ্রীমহাদেব রায়

হিম-স্পর্শ মরণের কোলে
বিশ্ব রহে সুপ্ত-নিস্পন্দন,
মাধবীর কোমল পরশে
জাগি লভে বর্ণ-সুশোভন,
বক্ষোবাস-কিসলয়-তলে
প্রাণ-ছন্দ, আনন্দ অপার,
অঙ্গে অঙ্গে বর্ণ-আভরণ
—অন্তরালে কোরক-সম্ভার।
কনক-কুসুম রাশি রাশি
গর্ভবাসে বহে দীপ্তি-ভার,
উপচিত কাঞ্চনের আভা—
বক্ষে বহে সুরভি-বিথার।
নিখিলের অঙ্গে অঙ্গে জাগে
মাধবীর মধুর পরশ,
সোহাগে-আদরে-হর্ষ-ভরে
করে তার বিহ্বল-বিবশ।
আজি নবজাগরণে জাগে
পুনর্নব লাবণ্য-মুরতি,
কক্ষে-কক্ষে, বক্ষে-বক্ষে তার
মধু-মাধবীর নব-দ্যুতি।
নবরাগে নবীন সুরভি
জাগে মাধবীর শুভক্ষণে,
রসে-রূপে বিপুল-সম্ভারে
ছন্দে-গন্ধে মুক্ত বাতায়নে।
নবাংশুক পলাশ-কিংশুকে
কাণ্ডয়ার টুটিলে আগল,
শোনে কবি—মহুয়ার বনে
বাজি উঠে হিন্দোলে মাদল

একাঙ্ক নাটিকা

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

পাত্রপাত্রী

কমল—যুবক, একদা ধনী ছিল, এখন নিঃস্ব

কপোতী—কমলের স্ত্রী

ধরণী—কমলের ব্যবসায়ী বন্ধু

স্বর্ণ—ধরণীর স্ত্রী

নরেন—কমলের উকিল বন্ধু

সমীর—কমলের শিল্পী বন্ধু

প্রকাণ্ড হল, বড়লোকের রুচি ও আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো। দেয়ালে বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবি। ধরণী ও তার স্ত্রী প্রবেশ করে অতি সন্তর্পণে বসে।

ধরণী—(চাপা গলায়) ঘরে যেন একটা বিষাদের ছায়া পড়েছে।

স্বর্ণ—(ধরা গলায়) আছে সব অথচ কিছুই যেন নেই।

ধরণী—সত্যিই কিছু নেই, সব গেছে। অতবড় কারবার, রাজপ্রাসাদের মত বাড়ী, দাসদাসী, আসবাবপত্র কিছু নেই, সব গেছে।

(স্বর্ণ চোখে রুমাল দেয়)

ধরণী—(ধরা গলায়) কোন দিন ভাবতে পেরেছ এমন হবে?

স্বর্ণ—স্বপ্নেও যে ভাবতে পারা যায় না।

ধরণী—ব্যাঙ্ক ফেল পড়ল, কারবার নষ্ট হ'ল, দেনায় বাড়ী, গাড়ী বিক্রী হয়ে গেল, কিছু রইল না।

স্বর্ণ—হায়, যাকে বলে পথের ভিখারী।

ধরণী—কমলের মনে যে কতবড় আঘাত লেগেছে তা আমি কল্পনাও করতে পারছি নে।

স্বর্ণ—আর কপোতী! বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বউ, সে কি এ আঘাত সহ্য করতে পারবে?

ধরণী—(চিন্তিত ভাবে) বিশেষ সন্দেহ আছে।

স্বর্ণ—কি বলে সান্ত্বনা দেব ওদের, কি বলে বোঝাব।

(চোখে রুমাল দেয়)

(নিঃশব্দে নরেন প্রবেশ করে)

নরেন—(চাপা গলায়) ওরা কোথায়?

ধরণী—ভিতরে।

নরেন—দেখা হয় নি?

ধরণী—না, খবর পাঠাই নি।

স্বর্ণ—সাহস হচ্ছে না।

নরেন—আমাদের এত বিকল হলে চলবে কেন, একটা কিছু করতে হবে ত।

ধরণী—সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া আর কিছু করবার আছে নাকি?

নরেন—করবার অনেক আছে, অন্ততঃ একটা পরামর্শ ত দেওয়া যেতে পারে।

ধরণী—(ব্যগ্রভাবে) আছে নাকি কোন উপায়? তুমি ত নামকরা উকিল, ফাঁক কিছু আবিষ্কার করতে পারলে?

নরেন—করেছি বৈ কি, যথেষ্ট ফাঁক রেখেই আইন তৈরি হয়।

স্বর্ণ—তাই ত বলি, আদালত থাকতে দেনার দায়ে কারু সর্ব্বস্ব বিকোয়।

ধরণী—খুব ভাল পরামর্শ, মোকদ্দমা চালিয়ে দিক। এ সব ব্যাপারে কিছু পরিশ্রম করতে হবে বৈ কি।

নরেন—বিশেষ পরিশ্রম করতে হবে না, গোটাকয়েক মিছে কথা বলতে হবে মাত্র।

ধরণী—গোটাকয়েক কেন, দরকার হলে ঝুড়ি ঝুড়ি মিছে কথা বলবে।

স্বর্ণ—বল কি—এত সহজে হবে ?

নরেন—মিছে কথা সহজভাবে বললেই তা সত্যি বলে মনে হবে।

ধরণী—(উৎসাহিত হয়ে) আমি ভার নিচ্ছি, কমলকে আমি দু'দিনে শিখিয়ে তৈরি করে দেব।

স্বর্ণ—ভগবান করুন—ওদের এ বিপদ কেটে যায়।

নরেন—কিন্তু ওদের কোন সাড়া নেই কেন ?

স্বর্ণ—আহা, আর সাড়া আসবে কোত্থেকে ! অথচ এ বাড়ীতে যেন চব্বিশ ঘণ্টা উৎসব লেগে থাকত।

নরেন—আমরা এসেছি এ খবরটা ত দেওয়া দরকার।

ধরণী—তুমি একবার ভিতরে যাও স্বর্ণ।

স্বর্ণ—না, না—তা আমি পারব না। কেমন যেন সব চুপচাপ, ভিতরে গিয়ে কি জানি কি দেখব।

ধরণী—এতক্ষণ একটা চাকরেরও দেখা পেলাম না। ডজনখানেক চাকর ছিল, ইতিমধ্যে সবগুলোকেই বিদেয় করেছে নাকি ?

স্বর্ণ—অমন কথা বল না তুমি। (চোখে রুমাল দেয়)

ধরণী—আসবার সময় ফটকে দারোয়ানটাকে দেখেছি বলে ত মনে হচ্ছে না।

নরেন—লক্ষণ ভাল নয়।

(স্বর্ণর চোখ সজল হয়ে আসে, ধরণী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে)

(সমীরের প্রবেশ)

নরেন—এস সমীর।

সমীর—(এগিয়ে এসে) এই যে তোমরা এসেছ, আমি ভাবছিলাম একলা গিয়ে কি দেখব আর কি বলব।

নরেন—সে সমস্তা এখনও রয়েছে, ওদের সঙ্গে আমাদের এখন পর্য্যন্ত দেখা হয় নি।

ধরণী—ভিতরে খবর পাঠাবার মত সাহসও আমাদের হচ্ছে না।

সমীর—(বসে) বাড়ীটাও বিক্রী হয়ে গেছে ?

(ধরণী নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ে)

সমীর—আসবাবপত্র, পিয়ানো, ছবি—সব ?

নরেন—দেয়ালের টিকটিকিটা পর্য্যন্ত।

(স্বর্ণ চোখে রুমাল দেয়)

সমীর—কেবল ছবিগুলোর শোকেই কমল পাগল হয়ে যাবে, এক-একখানা ছবি কিনতে ওর হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে।

ধরণী—ওর সৌন্দর্য্যবোধ ছিল।

সমীর—অসুন্দর পরিবেশে কমল থাকতে পারত না।

নরেন—কল্পনা কর, কমল দত্ত বেলেঘাটার কোন ভাড়া-বাড়ীর এক সাধারণ ফ্ল্যাটে বাস করছে।

সমীর—কল্পনা করতে পারছি না। কমল বললেই মনে হয়, মার্ব্বেল পাথরের মেঝের উপর বড় বড় গালিচা, দেয়ালে আধুনিক ফরাসী শিল্পীর দামী দামী ছবি, ঘরে নতুন রোলস্ রয়েস্।

নরেন—আর কিছুদিন পরে কমল বললে মনে হবে মেটে দাওয়ার উপর ময়লা মাদুর, জানালায় ছেঁড়া চটের পর্দা, দেয়ালে কালিঘাটের পট।

সমীর—দারিদ্র্যের দুঃখের চেয়ে লজ্জা আরো বেশী, লজ্জায় কমল মরে যাবে।

স্বর্ণ—আহা কপোতী, ওর হৃদ্‌রোগটা এখনও সম্পূর্ণ ভাল হয় নি।

নরেন—রোগ আগে না থাকলেও এবার হবে।

স্বর্ণ—আমি বুঝতে পারছি কপোতীও বাঁচবে না।

ধরণী—হয় বাঁচবে না, না হয় পাগল হয়ে যাবে।

সমীর—(উদ্বিগ্নভাবে) এতক্ষণ ওদের কোন সাড়া নেই কেন ?

নরেন—অনেক কিছু সন্দেহ হচ্ছে।

সমীর—ধরণী ভাই, তুমিই ভিতরে যাও।

ধরণী—(সভয়ে) জান তো তোমরা আমি ভারি দুর্ব্বলচিত্ত। আর একটু অপেক্ষা করা যাক, ওরা এখানে এলে আমরা সবাই মিলে বোঝাতে পারব।

সমীর—তুমি প্রথমে আশ্বাস দেবে।

ধরণী—স্বর্ণ, তুমি কপোতীর কাছে বসবে।

সমীর—তার পরে ধীরে ধীরে কথা সুরু করবে।

নরেন—নার্ভাস হলে চলবে না।

স্বর্ণ—কপোতী যদি হঠাৎ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে তা হলে ?

ধরণী—সে সম্ভাবনা ষোল আনাই আছে।

সমীর—আমার মনে হয় এখানে একজন ডাক্তারের উপস্থিত থাকা উচিত।

নরেন—দরকার হলে চট্ করে ফোন করে দেওয়া যাবে।

ধরণী—(চিন্তিতভাবে) ওরা করছে কি ?

সমীর—ইতিমধ্যে কিছু একটা করে বসে নি তো ?

স্বর্ণ—হয়তো কপোতী বিছানা নিয়েছে।

ধরণী—আর কমল তেতলার ছাদে পায়চারি করছে।

স্বর্ণ—আমার বড্ড ভয় হচ্ছে।

(হঠাৎ ভিতর থেকে গানের আওয়াজ আসে—পুরুষ-কণ্ঠের গান)

শালবনের ঐ আঁচল ব্যেপে
যে দিন হাওয়া উঠতো ক্ষেপে

(একটু পরে নারী-কণ্ঠ গানে যোগ দেয়)

ধরণী—(চমকে উঠে দাঁড়িয়ে) ওরা দু'জনে গান গাইছে।

নরেন—(চাপা গলায়) মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

সমীর—নার্ভাস্ ব্রেকডাউন।

স্বর্ণ—কি হবে ? (চোখে আঁচল দেয়)

(কমল ও কপোতী প্রবেশ করে, কমলের হাতে একটা সুটকেস্, কপোতীর হাতে একটা পোঁটলা)

কমল—(বন্ধুদের দেখে সোৎসাহে) আরে, তোমরা কখন এলে ? এতক্ষণ খবর দাও নি কেন ?

(ধরণী মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট শব্দ বার করে, নরেন উঠে দাঁড়ায় আবার বসে পড়ে, সমীর চোখ থেকে চশমা খুলে মুছতে থাকে, স্বর্ণ বিবর্ণ হয়ে ওঠে সোফায় কাত হয়ে পড়ে)।

কপোতী—দেখ, দেখ, স্বর্ণদির কি হ'ল ? বোধ হয় ওঁর সেই পুরোনো ফিটের ব্যারামটা (ছুটে গিয়ে কাছে বসে স্বর্ণকে ধরে)

কমল—(ব্যস্ত হয়ে) তাই তো ! আমি এক্ষুনি ডাক্তারকে ফোন করছি (ফোনের দিকে এগিয়ে যায়)।

(স্বর্ণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে বসে)

কপোতী—একটু ভাল বোধ করছেন কি স্বর্ণদি ?

(স্বর্ণ নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ে)

কপোতী—আমি ত খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

কমল—(ফোন ছেড়ে দিয়ে ফিরে এসে) ধরণীদাকেও বড্ড শুকনো দেখাচ্ছে।

সমীর—তোমরা ভাল আছ ত ?

কমল—(হাসতে হাসতে) চমৎকার আছি। ভাল কথা তোমরা জান না বোধ হয় ?

(নরেন কিছু বলতে গিয়ে থেমে যায়)

কমল—সে এমন বিশেষ কিছু নয়, বলব কপোতী ?

কপোতী—যা বলবে শিগ্‌গীর বলে দাও, আর বেশী দেরী করা চলবে না।

কমল—তোমরা জান না বোধ হয় আমাদের টাকাকড়ি বাড়ীঘর যথাসর্ব্বস্ব গেছে—

(ধরণী মুখ দিয়ে আবার একটা অস্পষ্ট শব্দ বার করে, নরেন উঠে দাঁড়ায় আবার বসে পড়ে, স্বর্ণ চোখে আঁচল দেয়)

কমল—তাই আমরা দু'জনে নৈহাটি যাচ্ছি।

সমীর—নৈহাটি ?

কমল—হঁ্যা, নৈহাটি। সেখানে ছোট্ট একখানি মাটির ঘর কিনেছি।

কপোতী—ঘরের সামনে ছোট্ট আঙিনা আছে।

কমল—সেই ছোট্ট মাটির ঘরটিতে আমরা ছোট্ট একটি সংসার পাতবো।

কপোতী—আমি তার দেয়ালে আলপনা দেব।

কমল—আমি তার খড়ের চালে একটা মাধবীলতা চড়িয়ে দেব।

কপোতী—আমি আঙিনাতে ছোট্ট একটি বাগান করব।

কমল—আমি সেই বাগানে সকাল-বিকাল মাটি কোপাব।

কপোতী—দুপুরবেলা ঘরে বসে আমি কাঁথা সেলাই করব।

কমল—আমি সন্ধ্যাবেলায় দাওয়ায় চুপ করে বসে থাকব।

কপোতী—ওগো চল, আর দেরী কর না।

কমল—না, আর দেরী করা চলবে না। আচ্ছা, আমরা তা হলে আসি, তোমরা এক দিন আমাদের কুঁড়েঘরে বেড়াতে যেয়ো ভাই।

(কমল ও কপোতী প্রস্থান করে, মিলিত কণ্ঠের গান ভেসে আসে)

যাই ফিরে যাই মাটির বুকে,
যাই চলে যাই মুক্তি-সুখে।

(পটক্ষেপ)
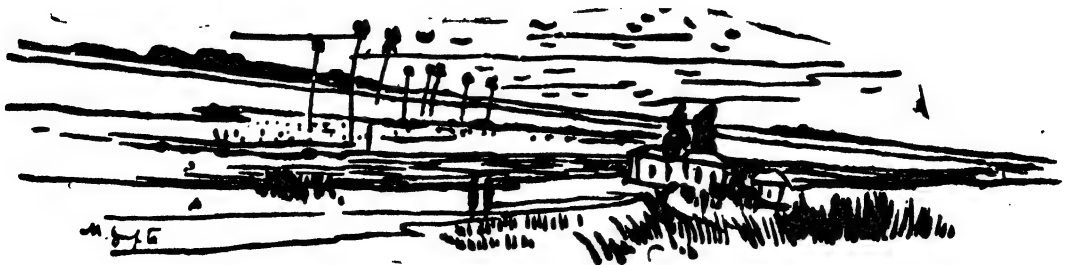
আমাদের কালিম্পং

শ্রীদাশরথি রায়

পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং শহরটি আজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অনধিক পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও এই কালিম্পংকে একটি গ্রাম বলে উল্লেখ করা হ'ত। কালিম্পঙের খ্যাতি যে কেবল তার অতুলনীয় প্রাকৃতিক শোভার জন্য, তা নয়। কালিম্পঙের অবস্থান এমন একটি রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে যার জন্য সৌন্দর্য্যপিপাসু পর্য্যটকদলের নিকট তার যেমন মর্য্যাদা, অ-রসিক কঠোর রাজনীতি-পর্য্যবেক্ষকদের নিকটও তার তেমনি গুরুত্ব। শুভ্র তুষারকিরীটী নগাধিরাজ হিমালয়ের ক্রোড়ে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় চার হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত শৈলাবাস কালিম্পং কুহেলি-অবগুণ্ঠনে কি রহস্য ঢেকে রেখেছে তা জানবার জন্য পৃথিবীর দূর দূরান্তর হতে কত পর্য্যটক, কত পণ্ডিত, কত গবেষক, কত কূটনীতিবিদ্,

কালিম্পঙের একাংশ

কত সাংবাদিক যে এই ছোট শহরটিতে ভিড় করেন তার ইয়ত্তা নাই। অথচ বাংলাদেশের এই গুরুত্বপূর্ণ শহরটি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কত কম!

পশ্চিমবাংলার দার্জ্জিলিং জেলার উত্তর দিকের শেষ শহর কালিম্পং। "কালোন্" ও "পং" এই দুটি তিব্বতী শব্দের একত্রীকরণে কালিম্পং নামের উৎপত্তি হয়েছে। তিব্বতী ভাষায় "কালোন্" মানে মন্ত্রী এবং "পং" মানে সংসদ। অর্থাৎ, তিব্বতী ভাষায় কালিম্পংকে মন্ত্রীসংসদ নাম দেওয়া হয়েছিল। ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায়, পূর্ব্বে আজকের কালিম্পং মহকুমার সমগ্রটাই ছিল সিকিমের অন্তর্গত এবং তখন এখানকার অধিবাসী ছিল শুধু লেপ্‌চা। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভুটানের রাজা লেপচাদের কাছ থেকে কালিম্পং মহকুমা দখল করে নেন এবং ১৮৬৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত সমগ্র মহকুমাটি ভোটদের রাজত্বেই ছিল। ভোটরা কালিম্পঙের নাম দিয়েছিল "কাপলি কোপ্", অর্থাৎ 'উপুড় করে রাখা মড়ার মাথার খুলি।' ভোটদের উক্ত নাম দেবার কারণ এই হতে পারে যে, এখানে বহু তান্ত্রিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন যাঁরা নরকপাল নিয়ে তন্ত্রসাধনা করতেন। অথবা এও হতে পারে যে, শহরের

কালিম্পঙের সাধারণ বাজার এলাকা

উত্তর দিকে দেওলো পাহাড়টি দেখতে উল্টানো নরকপালের মত আকৃতিবিশিষ্ট বলেই ভোটরা এ নাম দিয়েছিল। যাই হোক, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশের সঙ্গে ভুটানের যে সিঞ্চুলা সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হয় তার ফলে কালিম্পং ও ডুয়ার্স ভারতবর্ষের

শহরের একটি চৌরাস্তা

অন্তর্ভুক্ত হয়। কালিম্পং শহর থেকে ১২ মাইল দূরে পেডং নামক স্থানের ভুটিয়া দুর্গটি কালিম্পং মহকুমায় এককালীন ভুটিয়া প্রভুত্বের নিদর্শন রূপে আজও দাঁড়িয়ে আছে।

১৮৬৬ খ্রীঃ থেকে কালিম্পঙের দ্রুত উন্নতি হতে আরম্ভ হয়। নেপাল থেকে বহু শ্রমজীবী, সিকিম থেকে লেপচা, ভোট এবং সমতলভূমি থেকে এখানে ভাগ্যান্বেষী

মাড়োয়ারী ব্যবসাদার, বিহারী ভঁড়ি, মুচি, ধোপা, নাপিত এবং কিছু বাঙালী ভদ্রলোকের আগমন হ'ল। যে কালিম্পং জঙ্গলসমাকীর্ণ নেকড়ে-শৃগাল অধ্যুষিত ছিল তা রূপান্তরিত হতে লাগল জনপদে। কালিম্পঙের জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এখানকার জনসংখ্যা ছিল মাত্র এক হাজার, কিন্তু গত আদমসুমারীতে এখানে প্রায় বার হাজার লোক গণনা করা হয়েছে। এবারের লোক-গণনায় শহরের লোকসংখ্যা চৌদ্দ হাজারের কম হবে না বলে মনে হয়।
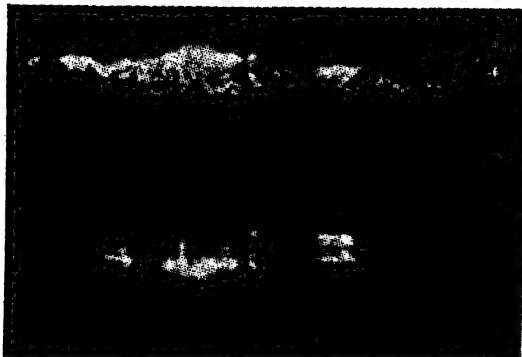
দেওলো চূড়া হইতে তুষারমণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য

কালিম্পংকে একটি শ্রেষ্ঠ পার্ব্বত্য-নগরী বলা যেতে পারে। বহু ইউরোপীয় পর্য্যটক একে "Queen of the Hill Stations" এই আখ্যা দিয়েছেন। বিখ্যাত ভারতীয় পরিব্রাজক পণ্ডিতপ্রবর রাহুল সাংকৃত্যায়ন গত বৎসর কালিম্পঙে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জার্ম্মানীতে নেতাজীর সহকর্ম্মী ডক্টর অনন্তরাম ভট্ট। তাঁদের উভয়ের কাছ থেকে শুনেছি, কালিম্পংকে শ্রেষ্ঠ দেশী বিদেশী বহু শৈলাবাসের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ৩৯৩৩ ফুট থেকে ৪৬৫০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত কালিম্পং শহরটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যানুরাগীদের অফুরন্ত আনন্দ দিতে পারে। শহরের উত্তর দিকে দেওলো (৫৫৯০ ফুট) এবং দক্ষিণে দুরবিন দাঁড়া (৪৫০০ ফুট)। এই দুই স্থানে দাঁড়ালে দর্শকের চোখের সামনে ভেসে উঠে পর্ব্বতের মহামহিমান্বিত অপরূপ রূপ। শুভ্র তুষারমণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা (২৮১৪৬ ফুট), সিমবু (২২৩৮১ ফুট), সিনলচু (২২৬০০ ফুট), কাবরু (২৪০০২ ফুট), লামা আনদেন (১৯২৫০ ফুট), কালা পাহাড় (১৭৫০০ ফুট), সাঁড়াক ফু (১১৯১১ ফুট), কালতু (১১৭৯০ ফুট), নাথু (১৪৪০০ ফুট) এবং জেলেপ্ (১৪৩৯০ ফুট)। এতগুলি গিরিচূড়া কালিম্পঙের এই দুই স্থান থেকে পরিষ্কার লক্ষ্য করা যায়। মেঘনির্মুক্ত দিনে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সময় কাঞ্চনজঙ্ঘার যে অপরূপ বর্ণমাধুরী পরিলক্ষিত হয় তার তুলনা নাই। গিরিরাজের বুক বেয়ে চলেছে তিস্তা, রঙ্গীত আর রিলী নদী—আর তাদের কূলে কূলে তামশোভায় সমারোহ, গিরিরাজ্যকে শোভিত করে আছে নানা রঙের বনফুল—এ দৃশ্যও দর্শকের মন ভুলায়।

কালিম্পং শহরটিতে বসতি খুব ঘন নয়। পরস্পর থেকে খানিকটা ব্যবধানে বাড়ীগুলি তৈয়ারী। কেবল বড়পরিসর বাজার এলাকায় কিছু ঘন বসতি আছে। শহরের উত্তরে ডাঃ গ্রেহাম হোমস্ কালিম্পঙের একটি প্রসিদ্ধ দর্শনীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯০০ খ্রীঃ স্কটলণ্ডের মিশনরী ডক্টর জে.এ. গ্রেহাম এটি এখানে প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে শক্তিশালী করবার

কালিম্পঙের একটি বাঙালী পরিবার

জন্য বহুসংখ্যক এংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইংরেজ ছেলেমেয়ের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই এ প্রতিষ্ঠানটির স্থাপনা হয়। প্রতিষ্ঠানটির জন্য তৎকালীন ভারত-সরকার কালিম্পঙের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থানে প্রায় দুই হাজার বিঘা জমি দান করেন। এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটি ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য যা করেছে ও করছে তা আমাদের অনুকরণের যোগ্য। এখানে ১৬টি বিরাট "কটেজে" কিণ্ডারগার্টেন হতে আরম্ভ করে সিনিয়র কেম্ব্রিজ পর্য্যন্ত পড়াবার আধুনিক ব্যবস্থাসম্বলিত বিদ্যালয়, মেয়েদের নার্সিং শিখাবার স্কুল, হাসপাতাল, গীর্জ্জা, সিনেমা, সুবিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র, ডেয়ারী ফার্ম, পুষ্করিণী, কর্ম্মীদের জন্য ক্লাব, কারিগরী শিক্ষার কারখানা, কাউট গার্লগাইড্ কেন্দ্র প্রভৃতি আছে। এতে পূর্ব্বে এংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয় বালক-বালিকারাই শিক্ষালাভের সুযোগ পেত, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর প্রতিষ্ঠানটির নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন হয়েছে এবং ছাত্র-সংখ্যায় শতকরা চল্লিশ জন ভারতীয় ছেলেমেয়ে হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

ডাঃ গ্রেহাম্ হোমসের এলাকা পার হয়ে কিছু নীচে এলেই কালিম্পঙের পশম-ব্যবসায়ের কেন্দ্র। তিব্বতী পশমের একমাত্র ব্যবসায়কেন্দ্র কালিম্পং এবং কালিম্পং বাজারে প্রতি বৎসর কমপক্ষে এক লক্ষ মণ পশম তিব্বত থেকে আমদানী হয়। বহু ভাগ্যান্বেষী মাড়োয়ারী বণিক নিঃস্ব অবস্থায় কালিম্পঙে এসে অধ্যবসায় সহকারে পশম-ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে বহু বিত্ত অর্জ্জন করেছেন। বর্ত্তমান লেখক এক স্থানীয় মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর নিকট শুনেছেন যে, তিনি প্রথম জীবনে এই কালিম্পং শহরেই কোন ব্যবসাদারের "পেটভেতো" কর্ম্মচারী ছিলেন এবং চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে ২০৲ টাকা মাত্র মূলধন নিয়ে পশম-ব্যবসায় আরম্ভ ক'রে আজ কোটি কোটি টাকার মালিক। পশমের ব্যবসায়ে এখানে মাড়োয়ারী, তিব্বতী, নেপালী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির ব্যবসায়ীরা লিপ্ত আছেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এখানে একজনও বাঙালী পশম-ব্যবসায়ী নাই। বড় বড় পশমের গুদামগুলির বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করে বহু জিনিষ শিখবার আছে। বাংলা দেশের বাঙালীবিহীন এই ব্যবসায়-কেন্দ্রটি দেখলে একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে প্রতিবৎসর বহু ধনী বাঙালী তো এই কালিম্পঙে "হাওয়া

ডাঃ গ্রেহাম প্রতিষ্ঠিত "হোমস্"

খেতে" এসে এখানকার অনেক কিছু দেখে যান, কিন্তু কালিম্পঙের এত বড় জিনিষটি তাঁদের দৃষ্টিপথ এড়িয়ে যায় কি ক'রে? আজকাল অবশ্য ২০০৲ টাকা মূলধন নিয়ে পশম-ব্যবসায় সুরু করা যায় না, কিন্তু বেশী টাকা মূলধন নিয়োগ করে নূতন ব্যবসা পত্তন করবার সুযোগ এখনও আছে বলেই মনে হয়।

কালিম্পঙের পশম-ব্যবসায় কেন্দ্রের পরই শহরের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র দশ মাইল। 'দশ মাইল' নামে দশ মাইলব্যাপী স্থান নয় বা শহর থেকে দশ মাইল দূরের জায়গা নয়। তিস্তা থেকে কালিম্পং শহরের যে জায়গায় যতটা দূরত্ব, সেই দূরত্ব হিসাবে ৬ মাইল, ৭ মাইল, ৮ মাইল, ৯ মাইল, ১০ মাইল, ১১ মাইল, ১২ মাইল ইত্যাদি নামে শহরের কতকগুলি জায়গা আছে। কালিম্পঙের জায়গাগুলিই যে "মাইল" নামে পরিচিত তাই নয়, এখানকার অনেক ব্যক্তিও এই মাইল পরিচয়ে পরিচিতি লাভ করেছেন, যেমন "৯ মাইল মাসীমা", "১১ মাইল বাবে" (দাদা মশায়) ইত্যাদি। যাই হোক, দশ মাইল জায়গাটি এখানকার প্রধান প্রাণচঞ্চল স্থান। দশ মাইলের রাস্তার দু'পাশে মাড়োয়ারী, চীনা,

ডাঃ গ্রেহাম হোমসের একটি কটেজে সমবেত ছাত্রছাত্রী

তিব্বতী, বিহারী প্রভৃতি নানা জাতির নানা বর্ণের লোকের দোকানপাট। এখানেও সেই বাঙালী-বিহীনতা। কালিম্পঙে সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে এবং হাটের দিনে দশ মাইল তথা সমগ্র শহরটিকে অন্যান্য দিনের তুলনায় অতিরিক্ত কর্ম্মব্যস্ত

কালিম্পঙের বিচিত্র অলঙ্কারশোভিতা নেপালী রমণী

দেখা যায়। স্কটলণ্ডের খ্রীষ্টান মিশনরীরা দশ মাইলের অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, সাধারণের জন্য হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন ক'রে স্থানীয় অধিবাসীদের বহু

উপকার করেছেন এবং তার ফলে এখানে খ্রীষ্টধর্মের বিশেষ প্রচার ও প্রসার হয়েছে। মিশনের হাসপাতালটির নাম চার্টারিস হাসপাতাল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই হাসপাতালটিতে দু'জন সরকারী ডাক্তার নিযুক্ত করেছেন এবং ঔষধপত্রাদি কিনবার জন্য বাৎসরিক মোটা টাকা দিয়ে সাহায্যও করে থাকেন।

দশ মাইল পার হয়ে এলেই সাধারণ বাজার এলাকা—এখানে ডাক ও তার আপিস, থানা, কয়েকটি ডাক্তারখানা, বিভিন্ন দোকানপাট, মহকুমা কাছারী, বন বিভাগের কার্য্যালয় ইত্যাদি আছে। কয়েকটি হোটেলও এই অঞ্চলে অবস্থিত।

তিব্বতী নববর্ষ উৎসবে কালিম্পঙে তিব্বতী নৃত্য

তারপর সুরু হ'ল "ডেভেলপমেণ্ট এরিয়া"। শহরের দক্ষিণ দিকে সাড়ে পাঁচ লক্ষ বিঘা বিস্তৃত এই ডেভেলপমেণ্ট এরিয়া কালিম্পংকে আদর্শ শৈলাবাসে পরিণত করবার জন্য সরকার পৃথক করে রেখে দিয়েছিলেন। তাঁহারা ১৯২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে এই এলাকার জমি জরিপ করিয়ে ১ নং ও ২ নং নামে দুইটি ভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রতি ভাগের জমি প্লট হিসাবে ভাগ করে জনসাধারণের নিকট জমি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দেন। জনসাধারণের মধ্যে এই সকল জমির চাহিদা এত বেশী হয় যে, ১ নং বিভাগের সমস্ত প্লট অচিরেই বিক্রী হয়ে যায়। এখন জমি কিনতে হলে ২ নং বিভাগ থেকে নির্ব্বাচন করতে হবে। ডেভেলপমেণ্ট এরিয়াতে বাড়ি নির্ম্মাণ করবার নিয়ম-কানুন এমন কড়া ভাবে তৈরি করা হয়েছে, যে এখানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কোনও বাড়ি নির্ম্মাণ করা চলবে না। যুদ্ধনিবন্ধন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবে এ অঞ্চলে ঘরবাড়ী বিশেষ গড়ে ওঠে নি এবং অধিকাংশ জমিই খালি পড়ে আছে। কয়েকজন প্রখ্যাতনামা বাঙালী ও অবাঙালী ডেভেলপমেণ্ট এরিয়াতে বাড়ী করেছেন। রবীন্দ্রনাথ দু'বার কালিম্পং এসে এই ডেভেলপমেণ্ট এরিয়াতে অবস্থান করে-ছিলেন। এই অঞ্চলের উত্তর সীমায় রামকৃষ্ণ মিশনের একটি নিজস্ব বাড়ী আছে। রামকৃষ্ণ মিশন এখনও এখানে গঠনমূলক কোন কর্ম্ম সুরু করতে পারেন নি। আশ্রমটিতে মিশনের বিভিন্ন শাখা হতে সন্ন্যাসীগণ মধ্যে মধ্যে আগমন করে থাকেন।

কালিম্পঙের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেণ্ট জোসেফস্ কনভেণ্ট, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জুবিলী স্কুল, পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কৃষি-বাগ, মেরী স্কটের অন্ধ বিদ্যালয়, পৃথিবীর একমাত্র তিব্বতী সংবাদপত্র কার্য্যালয়, ইনষ্টিটিউট অব কালচার, সরকারী সেরিকালচার কেন্দ্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইনষ্টিটিউটের নিজস্ব ঘরবাড়ী এখনও হয় নি, কিন্তু জনপ্রিয়তা ও উপযোগিতায় এটিকে এখানকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর. কে. প্রীল, লণ্ডনের "দি ডেলী মেলে"র ডিরেক্টর ও সাংবাদিক জি. ওয়ার্ড প্রাইস, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, নৃতত্ত্ববিদ গ্রীসদেশের প্রিন্স পীটার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর এস. কে. সিংহ, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভিক্ষু কশ্যপ প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা করেছেন এবং এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

কালিম্পঙের তিব্বতী বৌদ্ধবিহার "থারপা চোলিং"

কালিম্পঙের আবহাওয়া অনেক পার্ব্বত্য নগরের চেয়ে ঢের ভাল বলা চলে এই হিসাবে যে, এখানে শীত খুব প্রবল নয় এবং বর্ষাও খুব বেশী নয়। কাজেই বাংলাদেশের সমতল ভূমির লোকেদের এখানে বাস করতে অসুবিধা হয় না।

কালিম্পঙের রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেকটা তার ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য। এই কালিম্পঙের মধ্য দিয়া সিকিম, ভুটান, তিব্বত এবং মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে যাওয়া যায়। এই জন্যই কালিম্পংকে 'Gateway to Central Asia' বা মধ্য-এশিয়ার তোরণ-দ্বার বলা হয়। যে কোন লোকও যদি এই শহরটির রাস্তাঘাট ও হাটবাজারের দিকে একটু নজর দেন তা হলে তিনি বুঝতে পারবেন যে কালিম্পং বহু গোষ্ঠীর লোকেদের অধ্যুষিত একটি সুন্দর আন্তর্জাতিক শহর।

কিন্তু লেপচা, তিব্বতী, ভোট, নেপালী, চীনা, মোঙ্গোলীয়, বিহারী, মাড়োয়ারী, বাঙালী প্রভৃতি নানা জাতির নানা বর্ণের লোক এখানে বাস করেন। শহরটিকে তাই বলা হয় ক্ষুদ্র এশিয়া (Little Asia)।

মধ্য-এশিয়ার মিলনকেন্দ্র এই শহরটিতে রাশিয়ান পণ্ডিত ও শিল্পী ডক্টর জর্জ রোএরিক, প্রিন্স পীটার ও তৎপত্নী আইরীন অব্ গ্রীস, মার্কিনী পণ্ডিত ডক্টর রক প্রভৃতি প্রখ্যাতনামা ব্যক্তিগণ এসে তিব্বত সম্বন্ধে গবেষণা করছেন। এখানে ভারত-সরকারের Tibet Liaison Office আছে এবং ভুটান রাজ্যের ভারতস্থ প্রতিনিধি এখানে বাস করেন। বর্ত্তমান রাজনৈতিক কারণে তিব্বতের অতি উচ্চপদস্থ বহু রাজকর্ম্মচারী তিব্বত থেকে পলায়ন করে কালিম্পঙে আশ্রয় নিয়েছেন। নেপাল, ভুটান, সিকিম, তিব্বত, চীন, মোঙ্গোলিয়া, প্রভৃতি দেশের অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে যাঁরা জানতে ইচ্ছুক অথচ ঐ সকল দেশে যাবার সামর্থ্য ও সময় নেই তাঁরা কালিম্পঙে এসে কিছু দিন অবস্থান করলে এ বিষয়ে তাঁদের কৌতূহল অনেকটা নিবৃত্ত হবে। শহরের "ত্রিপাই" নামক স্থানে "থারপাছোলিং" তিব্বতী বৌদ্ধ মঠ দর্শন করলে তিব্বতী লামাদের ধর্ম্মজীবন ও তিব্বতী বৌদ্ধ মঠের একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। থারপা ছোলিং মঠে ৩০ জন বৌদ্ধসন্ন্যাসী বাস করেন। মঠের প্রবেশদ্বারের বহির্ভাগে ১০৮ প্রার্থনাচক্র প্রথমেই দর্শকের মনে বিস্ময় জাগায়। মঠকে দক্ষিণে রেখে প্রার্থনা চক্রগুলি পরিক্রমা করতে হয়। এই মঠে অতি প্রসিদ্ধ তিব্বতী "থাংকা" বা ধর্ম্মচিত্র শিল্পে ধুয়লো বিশেষ দর্শনীয় জিনিষ। তিব্বতী থাংকা শিল্পে ধুয়লোতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, নরকে জীবন যাপনের বিভিন্ন চিত্র অঙ্কিত আছে। মঠের বেদীতে প্রভু বুদ্ধের বিরাট মূর্ত্তি ও উক্ত মূর্ত্তির সামনে অনির্ব্বাণ অসংখ্য ঘৃত প্রদীপ দর্শকের মনে ভক্তির উদ্রেক করে। মঠের উপরতলায় এক সহস্র বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। এই মঠের সন্নিকট এক বস্তীতে একজন দৈবশক্তিসম্পন্ন তিব্বতী লামা বাস করেন। কিছু দক্ষিণা পেলে এই তিব্বতী লামা অতি বিচিত্র ও জমকালো পোশাক পরে তাঁর মাধ্যমে যে দৈববাণী হয় তার প্রমাণ দিতে পারেন।

কালিম্পঙের দৈবশক্তিসম্পন্ন তিব্বতী লামা

এখানে লক্ষ্য করবার অন্যতম বিষয় হচ্ছে, কালিম্পঙের মহকুমা শাসক, সেকেণ্ড অফিসার, ছোটবড় পুলিসের কর্ম্মচারী প্রত্যেকেই দার্জ্জিলিং জেলার পার্ব্বত্য লোক। মহকুমা শাসকদের কাছারিতে একটিও বাঙালী কেরাণী নাই। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ এই সীমান্ত শহরটির প্রতি আমাদের সরকারের সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য।

অভিসারিকা

শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী

যৌবন চঞ্চলা অয়ি গিরীন্দ্র-নন্দিনী,
প্রেমের শৃঙ্খলে তুমি নহ গো বন্দিনী।
যে প্রেম চলার গানে গতি নিয়ে আসে
মুগ্ধ হ'য়ে তারই সুরে রাত্রি দিনমানে
চলিয়াছ শ্রান্তিহারা গান গেয়ে গেয়ে
অন্তহীন পথে একা পাগলিনী মেয়ে।
দুঃখে সুখে সে-চলায় নাহিক বিরতি,
যতো চলো, অঙ্গে অঙ্গে ফিরে পাও গতি।

প্রেমের আনন্দ মাঝে প্রাণের চেতনা
হারায়ে ফেলেছ, তাই বাজে না বেদনা।
যেতে যেতে পথ মাঝে যাহা কিছু পাও
কিছু তার রাখো, কিছু ফেলে দিয়ে যাও।
যতো যাও কাণে তব বাজে দিনযামী—
'ছুটে এসো, ছুটে এসো, আরো দূরে আমি'।

সাংবাদিক ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত বিদ্যারত্ন

১৮৪৬-১৯১৮

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংসারে মাঝে মাঝে আমরা এমন এক-একজন কর্ম্মীর সন্ধান পাই, যিনি কালে কোলে অখনে সর্ব্বত্র আছেন, যাঁহাকে না হইলে আমাদের এক দণ্ড চলে না, অথচ শেষাশেষি খতিয়ান জ্ঞাপনের বেলায় যাঁহাকে আমাদের মনে থাকে না। বাংলা সাময়িকপত্র-সংসারে ক্ষেত্রমোহন এমনই একজন একান্ত প্রয়োজনীয় কর্ম্মী এবং শেষাশেষি সম্পূর্ণ বিস্মৃত ব্যক্তি।

ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত বিদ্যারত্ন

জীবনের শেষ বিয়াল্লিশ বৎসর তিনি বাংলা দেশের সংবাদপত্র-গুলির সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন এবং এই কার্য্যে এত অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থীর গুরুগিরি করিয়াছিলেন যে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায়ে দেশীয় সংবাদ-পত্রগুলি ছাইয়া গিয়াছিল। তিনি সংবাদবিষয়ক কাজে এতই অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে চলন্ত অভিধান আখ্যা দেওয়া হইত; বিশেষ করিয়া রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক সংবাদ ও মন্তব্য সরবরাহে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার সাহিত্য-কীর্ত্তি কালের কোনো হাওয়ায় দৈনিক পত্রের সঙ্গেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া হারাইয়া গিয়াছে। মুদ্রিত যে তিন-চার-খানি মাত্র পুস্তক তাঁহার কীর্ত্তির খাতে জমা আছে তাহাতে তাঁহার আংশিক পরিচয় মাত্র আছে, সম্যক্ পরিচয় নাই। ইহা তাঁহারও দুর্ভাগ্য, আমাদেরও দুর্ভাগ্য। শুধু কৃতী শিষ্যদের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া আমরা আজ সেই অক্লান্তকর্ম্মী সাধককে স্মরণ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছি।

জন্ম: বংশ-পরিচয়।—১৮৪৬ সনে বঙ্গের পবিত্র তীর্থ ত্রিবেণীর বৈকুণ্ঠপুর পল্লীতে এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য-বংশে ক্ষেত্র-মোহনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা—পীতাম্বর সেনগুপ্ত প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন না বটে, কিন্তু পিতামহ রামমোহন সেনগুপ্ত বিচক্ষণ কবিরাজ বলিয়া তৎকালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাশিক্ষা: বিবাহ।—গ্রাম্য পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করিয়া সাত বৎসর বয়সের পর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ক্ষেত্র-মোহন কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি "পৌষ মাসে সপ্তমের অতিক্রম করিয়া, মাঘে অষ্টমে প্রবৃত্ত হইয়া, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঘ মাসে চতুর্থ দিবসে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন।" কৃতী ছাত্র হিসাবে বিদ্যালয়ে তাঁহার বিলক্ষণ সুনাম হইয়াছিল। তিনি যথারীতি ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি দর্শনাদি অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত কলেজে ক্ষেত্রমোহনের স্থিতিকাল ১৪ বৎসর, ইহার মধ্যে ৯ বৎসর বৃত্তি ভোগ করিয়াছেন, কলেজের সকল বৃত্তিই তাঁহার ভাগ্যে জুটিয়াছিল। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, তিনি এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িয়াছিলেন।

পঠদ্দশায় ১৮৬৫ সনে বারাসত মহকুমার বারাসাত শহর নিবাসী রামরতন রায়ের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

সাময়িকপত্র সম্পাদন।—কলেজ হইতে বহির্গত হইয়া ক্ষেত্রমোহন ১৮৬৯ সনে মেদিনীপুরে ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টরের পদ লাভ করেন। কিছু দিন পরে—১৮৭০ সনে তিনি সরকারী চাকরির মোহ কাটাইয়া সাংবাদিকের জীবন বরণ করিয়াছিলেন।

১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে (ইং ১৮৭৪) যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ 'আর্য্যদর্শন' মাসিকপত্র বাহির করিলে ক্ষেত্রমোহন কিছু দিন তাঁহার সহকারিতা করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদক, বন্ধুবর দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় 'প্রভাত সমীর' নামে একখানি দৈনিকপত্র প্রকাশ

করেন; ইহার ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৫ মাঘ ১২৮১ (জানুয়ারি ১৮৭৫)। অর্থাভাবহেতু পত্রিকাখানি মাস-চারেক পরেই রহিত হয়।

"এই 'প্রভাত সমীরে'ই ক্ষেত্রমোহন সংবাদপত্রের ভাষায় যে প্রাঞ্জলতা, ওজস্বিতা এবং বাগ্মীসুলভ বর্ণনাপ্রবাহ প্রবর্ত্তিত করেন, তাহাই পরে সকল সংবাদপত্রে পরিগৃহীত হয়। 'প্রভাত সমীরে'র অন্তর্ধান হইবার পর ক্ষেত্রমোহন সংবাদপত্র-পরিচালনেই জীবিকার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হন। তৎকালে অনেকের পক্ষে যাহা সখের কার্য্য বলিয়া পরিচিত ছিল, ক্ষেত্রমোহনের পক্ষে তাহাই জীবিকানির্ব্বাহের কার্য্য হইয়া উঠিল। এই জন্যই অনেক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রই ক্ষেত্রমোহনের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। নববিভাকর, সহচর, সাধারণী, সাপ্তাহিক সমাচার, প্রভাতী, সমাচার চন্দ্রিকা প্রভৃতি পত্রের সহিত ক্ষেত্রমোহনের সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। নববিভাকর ও সহচরের সম্পাদন-ভারই কার্য্যতঃ বহুকাল যাবৎ ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্নকে লইয়া থাকিতে হইয়াছিল। প্রভাতী, সমাচার চন্দ্রিকা প্রভৃতির সহিতও তাঁহার সম্পাদকীয় সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। দৈনিকবার্ত্তা, প্রজাবন্ধু প্রভৃতি পত্রেও ক্ষেত্রমোহনের হাত পড়িয়াছিল। ফলতঃ এক সময়ে ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্তের সম্বন্ধ না থাকিলে যেন সংবাদপত্রই চলিত না। বঙ্গবাসীর বয়স যখন প্রায় এক বৎসর [১২৮৯] সেই সময়ে ক্ষেত্রমোহনের সহিত বঙ্গবাসীর ঘনিষ্ঠতা ঘটে। সেই ঘনিষ্ঠতা ক্রমে পুষ্টি-লাভ করিয়া, প্রায় ২১ বৎসর বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বঙ্গবাসীর দৈনিক প্রায় আদ্যন্ত কালই ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্তের হস্তে ছিল। অল্প দিন অন্য হস্তে থাকিয়া দৈনিক প্রায় ১৪ বৎসর ক্ষেত্রমোহনের সম্পাদকীয় হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল।

"এখন [ইং ১৯০৪] বঙ্গবাসীর সহিত ক্ষেত্রমোহনের সম্বন্ধ নাই, তিনি বসুমতী পত্রের সম্পাদন পক্ষে সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার সাহায্যে যে বঙ্গবাসী অনেক দিন অনেক উপকার পাইয়াছে, ক্ষেত্রমোহনের নানাবিধ প্রবন্ধে যে কিছুকাল বঙ্গবাসী অনেক গৌরবলাভ করিয়াছে, এ কথা বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী মহাশয় এখনও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। রাজনীতি এবং অর্থনীতির আলোচনায় ক্ষেত্র-মোহনের সমকক্ষ পাওয়া দুর্ল্লভ।...সংবাদপত্র-সম্পাদনেই তিনি জীবন অতিবাহিত করিলেন। এ কার্য্যে তাঁহার শিষ্য-সংখ্যাও কম নহে। এ পক্ষে তিনি অনেকেরই গুরুস্থানীয়।" ('বঙ্গ-ভাষার লেখক', পৃ. ৯১৩-১৪)।

রচনাবলী।—ক্ষেত্রমোহন আমরণ সংবাদপত্রেরই সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ রচনাই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। মাসিকপত্রেও মাঝে মাঝে তাঁহার গল্প-উপন্যাস প্রবন্ধাদি সাদরে স্থান লাভ করিয়াছে; দৃষ্টান্ত-স্বরূপ 'প্রদীপে'র (১৩০৮-১০ সাল) উল্লেখ করা যাইতে পারে। ক্ষেত্রমোহন পুস্তকাকারে বিশেষ কিছুই রাখিয়া যান নাই। আমরা তাঁহার মাত্র চারিখানি পুস্তকের কথাই জানি; সেগুলি—

১। নীতিপাঠ (পাঠ্য)। (২০-২-১৮৯০)। পৃ. ১১৪।

২। 'মদনমোহন' (উপন্যাসে প্রকৃত ঘটনা)। ১২৯৬ সাল (২৫-২-১৮৯০)। পৃ. ১১৯।

"মদনমোহন দৈনিকের জন্য দিন দিন লিখিত হইয়াছিল; দিন দিন দৈনিকে প্রকাশিত হইয়াছিল।"

৩। 'শিক্ষা এবং উপদেশ'। (১০ এপ্রিল ১৮৯৬)। পৃ. ১৫২।

'দৈনিকে' প্রকাশিত প্রবন্ধ-সমষ্টি। ইহা বিদ্যালয়ের বৃত্তি-পরীক্ষায় পাঠ্য হইয়াছিল।

৪। 'সচিত্র বয়ন-বিদ্যা বা তাঁত-শিক্ষা'। ১৩১৩ সাল (২১ আগষ্ট ১৯০৬)। পৃ. ৭২।

বয়নশিল্পের ইতিহাস অল্প কথায় সহজবোধ্য ভাষায় লিখিত।

মৃত্যু।—২৩ মে ১৯১৮ তারিখে ক্ষেত্রমোহন পরলোক-গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে জলধর সেন তৎসম্পাদিত 'ভারতবর্ষে' যে শোক-সংবাদ লেখেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"৺ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত, আমাদের পূজনীয় দাদা মহাশয়, গত ২৩শে মে রাত্রিতে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি সংবাদপত্র-লেখকগণের সকলেরই দাদা মহাশয় ছিলেন। আমরা তাঁহারই চরণ-তলে বসিয়া সংবাদপত্র সম্পাদনের প্রথম পাঠ লইয়াছি। তিনি প্রথমে স্কুলের ডিপুটি ইন্‌স্পেক্টর হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন; তাহার পর সে কার্য্য ত্যাগ করিয়া সংবাদপত্রে যোগদান করেন। প্রভাতী, দৈনিক-চন্দ্রিকা ও দৈনিক-বঙ্গবাসীর তিনি সম্পাদক ছিলেন; এতদ্ভিন্ন সহচর, নববিভাকর, সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী, বসুমতী, হিতবাদী প্রভৃতি পত্রের তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। বঙ্গবাসী-কার্য্যালয়েই দাদা মহাশয়ের সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় হয়। দাদা মহাশয়কে আমরা Ency-clopaedia বলিতাম; ইংরাজ-রাজত্বের আরম্ভ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এমন কোন ঘটনা নাই, যাহার সঠিক বিবরণ, মায় সন তারিখ তিনি মুখে মুখে বলিয়া দিতে না পারিতেন। সংবাদপত্র-সম্পাদনকালে তাঁহাকে, যত বড় কঠিন বিষয়ই হউক না কেন, প্রবন্ধ লিখিতে বলিলে, পুঁথিপত্র না দেখিয়া তখন-তখন এমন প্রবন্ধ লিখিয়া দিতেন যে, আর কেহ মাসাধিক কাল পরিশ্রম করিয়াও তত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। অমন জলদ্ লিখিয়ে আমরা দেখি নাই, অমন বহুদর্শী সম্পাদকও আর ছিল না।" (আষাঢ় ১৩২৫)

রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রেমের প্রগতি

শ্রীগোপাললাল দে

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রেমের স্বরূপ সম্পর্কে 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থে বলিয়াছেন :

'অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাব-কুটিলা ভবেৎ।'

প্রেমের গতি অহির গতির মতই স্বভাব-কুটিল।

বাংলা-সাহিত্যের গোড়ার দিকে এই স্বভাব-কুটিল প্রেমের সরলতম রূপটিই কিন্তু স্থান লাভ করিয়াছে। সে রূপটি হইতেছে একটি বিশেষ নারীর প্রতি কোনও ব্যক্তির, অথবা একটি বিশেষ নরের প্রতি কোনও একটি নারীর একনিষ্ঠ প্রেম। 'মনসামঙ্গল.' কাব্যে বেহুলার প্রেম, 'চণ্ডীমঙ্গলে' ফুল্লরা-কালকেতুর প্রেম, 'ধর্ম্মমঙ্গলে' নায়ক-নায়িকাদের প্রেম এই সরল পর্য্যায়ের। রাম-সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর প্রেম ইহাদের আদর্শ। এক পুরুষের বহুপত্নীকতা সমাজে তখন প্রচলিত ছিল; তাই দুই সতীনের মধ্যে যে ঈর্ষ্যা-কলহ সাহিত্যে মাঝে মাঝে দেখা দিয়াছে, তাহা এই ধরণের প্রেমকে সামান্য পরিমাণ বৈচিত্র্যযুক্ত করিয়াছে মাত্র, কিন্তু প্রেমের পর্য্যায়ান্তর সম্পাদন করিতে পারে নাই। এই পর্য্যায়ের এক প্রান্তে সর্ব্বজয়ী নিষ্ঠা, অপর প্রান্তে প্রতারণা, বঞ্চনা, ব্যভিচার, কুলত্যাগ ইত্যাদি। নারীর চিত্তেই সর্ব্বকালে প্রেম অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, নারীই যেন প্রেমের প্রকৃত ধারক, তাই তাহার প্রেমের দৃষ্টান্ত দিয়া ব্যাপারটি বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভালবাসা দিয়া এবং ভালবাসা পাইয়া নারী ধন্য হইয়াছে, প্রেমের বেদীতে সর্ব্ব স্বার্থ ত্যাগ এমন কি আত্মত্যাগও করিয়াছে এবং তাহারই বিপরীতক্রমে নারী ভ্রষ্টচরিত্রা হইয়া একেবারে কুল ও সমাজগণ্ডীর বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। যে একবার গেল, সে একেবারেই গেল আর সে পতন ঘটিতে অধিক ব্যাপারের প্রয়োজন হয় নাই। স্বেচ্ছায় নারী ব্যভিচার করিলে ত তাহা ঘটিয়াছেই, আবার কোন প্রকারে নারীর দেহ অপর পুরুষ দ্বারা স্পৃষ্ট হইলেও তাহা ঘটিয়াছে। প্রথম পর্য্যায়ের এই বিপরীত ক্রম 'মঙ্গলকাব্য' প্রভৃতিতে দেখানো হয় নাই। আলঙ্কারিক বলিয়াছেন, 'রামাদিবৎপ্রবর্ত্তিতব্যং নতু রাবণাদিবৎ।' হয়ত সেই উপদেশ মানিয়াই কাব্য-কর্ত্তৃগণ ভ্রষ্টচরিত্রা নায়িকার চিত্র অঙ্কন করেন নাই অথবা সেই অধঃপতিতার জীবনে হয়ত তাঁহারা বর্ণনার যোগ্য বিষয়বস্তু খুঁজিয়া পান নাই।

সাহিত্যে এই দিকটির পরিচয় অত্যন্ত স্থূল ভাবে মিলিতেছে বাংলা গদ্যের গোড়াকার দিকে 'মডেল ভগিনী' জাতীয় নানা পুস্তকে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ উপন্যাসে এই প্রথম পর্য্যায়ের একনিষ্ঠ প্রেমের আশ্চর্য্য সুন্দর রূপ দেখা যায়—দুর্গেশনন্দিনী, আয়েষা, মৃণালিনী, সূর্য্যমুখী-ভ্রমরের প্রেমে। কুন্দ পূর্ব্ব-স্বামীকে দেখে নাই বলা চলে, সে প্রথম এবং একবার মাত্র ভালবাসিয়াছে নগেন্দ্রকে এবং তাহারই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ প্রাণ দিয়াছে সমাজের দাবিতে। এই পর্য্যায়ের বিপরীত ক্রমটি বঙ্কিম পরিস্ফুট ভাবে অঙ্কন করেন নাই; জীবন ব্যাপারে যে তাহা ঘটিতে পারে তাহা আমরা ইঙ্গিতে বুঝিয়া লই রোহিণী, হীরা প্রভৃতির জীবন হইতে। 'চন্দ্রশেখরে' শৈবলিনী চরিত্রে যাহা পাই তাহা এই পর্য্যায়ের নয়। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে তাহা আমরা দেখিব।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টিতে কিন্তু আমরা এই পর্য্যায়ের দুই প্রান্তেরই কয়েকটি অনবদ্য উদাহরণ পাইতেছি। 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' বিভার প্রেম, 'বিসর্জ্জন-রাজর্ষি'তে অপর্ণার প্রেম, 'প্রতিহিংসা' গল্পে ইন্দ্রাণীর প্রেম, 'উদ্ধার' গল্পে গৌরীর প্রেম, 'ত্যাগে' হেমন্তর প্রেম, 'দুরাশা'য় নবাবপুত্রীর প্রেম এবং গল্পগুচ্ছে বর্ণিত অসংখ্য নারীর প্রেম এই পর্য্যায়ের। 'নৌকাডুবি'তে কমলার প্রেম এই পর্য্যায়ের হইয়াও একটু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কমলা স্বামী নামধেয় 'সংস্কার-বিগ্রহ'কে ভালবাসিয়াছে, যত দিন জানিত রমেশ সেই 'সংস্কার-বিগ্রহ' অথবা 'ভাব-বিগ্রহে'র দেহীরূপ, তত দিন রমেশকে একনিষ্ঠভাবে ভালবাসিয়াছে, যে মুহূর্ত্তে জানিল নলিনাক্ষ সেই ভাবময় চিন্ময় সত্তার প্রতীক, সেই মুহূর্ত্তেই কমলার একনিষ্ঠ প্রেমে রমেশের আর কোন দাবি রহিল না এবং সে তাহার একনিষ্ঠ প্রেম পরিপূর্ণ ভাবে নলিনকে দিতে দ্বিধা করিল না। বাংলা সাহিত্যে এ ধরণের বৈচিত্র্য বিরল। এই সকল নায়ক-নায়িকার প্রেমে অন্য নানা দিকের বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। আমাদের সূত্রটি ধরিয়া আমরা চলি।

এই পর্য্যায়ের এই প্রান্তেই 'গল্পগুচ্ছে' আমরা পাই 'পুত্রযজ্ঞ' গল্পের অভাগিনী 'মন্দা'কে। তুচ্ছ এবং অতর্কিত এক ঘটনাচক্রে সে গৃহচ্যুত হইয়াছে। 'কঙ্কাল' গল্পের নায়িকা বিধবা, কিন্তু সে এই একনিষ্ঠ প্রেমের বেদীতে

'বলি'। 'একরাত্রি' গল্পে সুরবালার প্রেমিক মাষ্টার মহাশয় পুরুষজাতির পক্ষ হইতে প্রথম পর্য্যায়ের প্রেমের প্রতিভূ হইয়া আছেন।

এই পর্য্যায়ের অপর প্রান্তের সরল ঋজুরূপ রবীন্দ্র-সাহিত্যে মেলে না, একথা বলিতে পারা যায়। নারী-চরিত্রের বহুবিচিত্র দীনতা ও হীনতা রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন, কিন্তু নারীর সতীত্ব এবং শুচিতায় কবির গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি কদাচ দেখান নাই যে, কোনও নারী ঘটনাবর্ত্তের দ্বারা বাধ্য না হইয়া কেবল স্বেচ্ছায় ব্যভিচারিণীর জীবন গ্রহণ করিয়াছে। তাই মন্দাকে তিনি ভিখারিণীরূপে দেখাইয়াছেন, কিন্তু ব্যভিচারিণী হিসাবে দেখান নাই, 'কঙ্কালে'র নায়িকাকে আত্মঘাতিনী করিয়াছেন। অনুরূপ ক্ষেত্রে বঙ্কিমের কুন্দও আত্মহত্যা করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'মানভঞ্জন' গল্পের 'গিরিবালা' স্বামী কর্ত্তৃক অনাদৃতা হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে এবং অভিনেত্রীর বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে; সে ব্যভিচারিণী, এরূপ কোন ইঙ্গিত নাই।

তাহার পরে আসিয়া পড়ে দ্বিতীয় পর্য্যায়। এই পর্য্যায়ের প্রেমে জাগে অন্তর্দ্বন্দ্ব। প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়ায় তৃতীয় এক পুরুষ বা নারী, প্রতিযোগী-রূপে, আরম্ভ হইয়া যায় "Eternal triangle" বা প্রেম-ত্রিকোণ, নায়ক অথবা নায়িকা অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত হয়, কারণ তাহার সরল প্রেমসাধনার পথ দ্বিধাবিভক্ত হইতে চাহে। প্রেমের এই ত্র্যহস্পর্শ ঘটিয়াছে 'চোখের বালি'তে। মহেন্দ্র-আশার প্রেমের পথের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়ায় বিনোদিনী, আবার বিনোদিনী-মহেন্দ্রের পথে দাঁড়ায় বিহারী। গল্পগুচ্ছে 'মধ্যবর্ত্তিনী' গল্পে হরসুন্দরীর সতীন আসায় তাহার জাগিয়াছে অন্তর্দ্বন্দ্ব, তৃতীয়ার আগমন-আশঙ্কায় 'দৃষ্টিদানে' কুমুর সুরু হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। 'নষ্টনীড়' নামক গল্পে চারু ও ভূপতির পথে আসিয়া পড়ে অমল এবং চারুর মনে জাগে অন্তর্দ্বন্দ্ব। চারুর বেলায় আরও বৈশিষ্ট্য আছে। চারুর মনের যে ভাবটি তাহা অমলের প্রতি প্রেমজ আকর্ষণ, অথবা স্নেহ সখ্য বাৎসল্য অথবা ভূপতির অবহেলার প্রত্যুত্তর-স্বরূপ একটা প্রতিক্রিয়া সংগঠন (reaction formation), অথবা সকল কিছুর সংমিশ্রণে এক অনির্দ্দেশ্য জটিল মনোভাব (complex) তাহা বলা কঠিন।

প্রথম পর্য্যায়ের সহিত ইহার পার্থক্য শুধু তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাবে। এই দুই পর্য্যায়েই শরীর, মন ও শাস্ত্র-বিধানকে অবিচ্ছেদ্য ধরা হইয়াছে। তাই সামাজিক বিধানে একজনকে কায়মনোবাক্যে ভালবাসিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া, কি ভাবে 'মনপ্রাণ যাহাকে চায়' তাহাকে ভালবাসা যায় ইহা ভাবিয়া নায়ক-নায়িকা অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। তাহাদের শ্রেয়োবোধ ও প্রেয়-বোধে দ্বন্দ্ব। এই শ্রেয়োবোধ প্রচলিত সংস্কারদ্বারা শাসিত। এই তথাকথিত শ্রেয়োবোধ জয়লাভ করিলে নায়ক বা নায়িকা হইয়াছে 'ভালো', এবং প্রেয়বোধের জয় হইলে নায়ক-নায়িকা হইয়াছে 'মন্দ'। এই দুই স্তরেই 'ভাল' বা 'মন্দ' ব্যতীত আর কোন আখ্যায় অভিহিত হইবার সুযোগ নাই।

তৃতীয় পর্য্যায়ে আসিয়া নায়ক-নায়িকার অন্তর্দ্বন্দ্ব যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রেয়ঃ সম্পর্কে ধারণা এ স্তরে রূপান্তর লাভ করিয়াছে। কর্ত্তব্য সম্পর্কে নায়ক-নায়িকার আর কোন দ্বিধা নাই; প্রেম এখন ভালোমন্দর গণ্ডীরেখা অতিক্রম করিয়া যেন মহীয়ান হইয়া উঠিয়াছে। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে গিরিবালা অপরের বিবাহিতা স্ত্রী এবং পরে নিষ্ঠাবতী বিধবা হইয়াও শশিভূষণের প্রতি তাহার প্রেমকে অভিব্যক্ত হইতে দিতে দ্বিধা করে না। তাহার দেহের উপর শশীর অধিকার নাই, কিন্তু তাহার মনে তাহারই প্রতি আছে উজ্জ্বল অনুরাগ; এজন্য গিরিবালা অনুতাপের কারণ দেখে না। 'মহামায়া' গল্পের মহামায়া এই পর্য্যায়ে পড়ে। নারীর সতীত্ব এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে আন্তরিক নিষ্ঠায়। এ পর্য্যায়ে নায়িকাকে অদৃষ্টতাড়িত হইয়া অপরের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইয়াছে, কিন্তু প্রেমিকের প্রতি শাশ্বত প্রেমকে সে মনের মণিমন্দিরে চির অম্লান রাখিয়াছে। সে ভর্ত্তাকে দিয়াছে দেহ কিন্তু প্রেমিককে দিয়াছে হৃদয়। অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে, তবে আছে মাত্র এই ব্যাপারে। এখানে যদি সে ভাল না হয়, তবে মন্দও নয়। সে কেবল অদৃষ্টের হাতে ক্রীড়াপুত্তল। পাঠকের হৃদয় হইতে শ্রদ্ধা বা ঘৃণার পরিবর্ত্তে সে লাভ করে সহানুভূতি ও অশ্রু।

এই পর্য্যায়েরই এক স্তরে পাই 'বিচারক' গল্পের মোক্ষদাকে। হতভাগিনী কলঙ্কিত জীবন যাপন করিয়াও তাহার প্রথম প্রণয়ী নীতিপরায়ণ 'জজ' মোহিতমোহনের স্মৃতি ও প্রেমকে অম্লান রাখিয়াছে। এই নারীর সতীত্ব এইখানে যে সে দৈনন্দিন শত ক্লিন্নতার মাঝখানেও তাহার একনিষ্ঠ প্রেমের স্মৃতিকে উজ্জ্বল রাখিয়াছে।

'রজনী' উপন্যাসে শচীন্দ্রের প্রতি প্রেমের পরিচয় দিতে গিয়া রজনী লবঙ্গকে বলিয়াছে, 'ঠাকুরাণী, তোমাদের চক্ষু আছে—চক্ষু থাকিলেও এত ভালবাসা বাসিতে পার কি?' এদিকে অমরনাথ তাহার পৈতৃক বিষয়ের উদ্ধার-কর্ত্তা; তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব উঠিলে রজনী

বলিয়াছে, 'তিনি (অমরনাথ) যখন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দাসী করিতে চাহিয়াছেন তখন আমি তাঁহারই দাসী হইব, আর কাহারও নহে।' অন্তরে শচীন্দ্রের প্রতি ভালবাসা রক্ষা করিয়াও রজনী অমরনাথকে বরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। লবঙ্গলতার চরিত্র বিচিত্র। সে একদা অত্যুৎসাহে গৃহাগত অমরনাথের পৃষ্ঠে চিরস্থায়ী কলঙ্কলাঞ্ছন আঁকিয়া দিয়াছিল। যথাকালে প্রৌঢ় স্বামীকে বিবাহ করিয়া সে পূর্ণ উৎসাহে সংসার ও স্বামিসেবা করিতেছিল, কিন্তু একদা প্রকাশ পাইল তাহার অন্তরের গোপনতম কন্দরে অমরনাথের প্রতি প্রেম অম্লান আছে। শরৎ চন্দ্রের বহু উপন্যাসে প্রেমের এই রূপটি প্রদর্শিত হইয়াছে। চঞ্চলের মাঝে অচঞ্চলের প্রতিষ্ঠা শরৎ চন্দ্রের বহু গ্রন্থের উপজীব্য।

এই প্রেমবৈচিত্র্য অবশেষে পূর্ণতা লাভ করিল রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে। অমিত এবং লাবণ্যর প্রেম সত্যই বিস্ময়কর। প্লেটো যে প্রেমের কথা বলিয়াছেন, তাহাই যেন সহজ স্বাভাবিক পথে অমিত-লাবণ্যের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়াছে। বাংলা-সাহিত্যে ইহা অদ্বিতীয়। প্রেমের অভিনয় করিতে এবং দেখিতে যাহারা চির-অভ্যস্ত, তাহারা এক দিন নিজেদের অন্তরে অতনু মনোভাবের মূর্ত্ত বিকাশ দেখিয়া বিস্মিত হইল। কিন্তু হায়, অল্পদিনের মধ্যে উভয়েই বুঝিল যে, তাহাদের প্রকৃতি যে উপাদানে গঠিত তাহাতে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলে তাহারা আকাঙ্ক্ষিত ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারিবে না। আর এত বড় মহান্ তাহাদের প্রেমকে বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষুদ্র আধারে ত ধরিয়া রাখা যায় না। সেখানে যে আছে অতি-পরিচয়ের তুচ্ছতা, জীবনের ধূলিলিপ্ত দারিদ্র্য, প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্রতা ও গ্লানি। তাহাদের মহান্ প্রেম ত চিরাভ্যস্ত সংসারের গতানুগতিক ব্যাপারমাত্র নয়; ইহাকে কি বাস্তবের তুচ্ছতার স্পর্শে মলিন করা যায়?

তাই তাহারা মিলন নহে, চিরবিচ্ছেদকেই তাহাদের অমূল্য প্রেমের আধার রূপে গ্রহণ করিল। কিন্তু প্রাত্যহিক, সাংসারিক জীবনেও ত সঙ্গী চাই; সেই সামান্য, সাধারণ প্রয়োজনের সম্পর্কের জন্য অমিত কলাবিলাসিনী ধনীকন্যা 'কেটি'কে এবং লাবণ্য পিতৃ-নির্ব্বাচিত শোভনলালকে বিবাহ করিতে দ্বিধা করিল না। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অমিত-লাবণ্যর প্রেম চির-অম্লান আনন্দময় অনুভূতিতে পরিণত হইল।

ইহার পরেও রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রেম অতি আধুনিক রূপ লইয়া আরও অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। এই পর্য্যায়কে আমরা প্রেমের চতুর্থ পর্য্যায় বলিতে পারি। এই প্রেমের পরিপূর্ণ রূপ দেখিতে পাই আমরা 'ল্যাবরেটরি' নামক গল্পটিতে। এই গল্পের প্রধানা নায়িকা সোহিনী সুন্দরী পঞ্জাবী মহিলা। সে এক আত্মভোলা বাঙালী বৈজ্ঞানিক নন্দকিশোরকে বিবাহ করিয়াছিল। ল্যাবরেটরিটি ছিল নন্দকিশোরের জীবনের পরম সাধনা। সোহিনী তাহার প্রিয়তমের জীবন-সাধনাকে নিজের জীবনের সাধনা রূপে গ্রহণ করিয়া, নিজের সমস্ত শরীর মন দিয়া তাহার উন্নতিসাধন করিল। এদিকে ল্যাবরেটরিতে নন্দকিশোর এমনি ডুবিয়া গেলেন যে স্বচ্ছন্দে স্ত্রী সোহিনীর কথা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার কাছে যে সোহিনীর কিছু দাবি আছে, প্রাপ্য আছে, তাহাও তিনি বিস্মৃত হইলেন। সোহিনী স্বামীকে ভালবাসে, তাই সে তাঁহাকে তাঁহার সাধনার ভূমি হইতে অপসারিত করিতে চেষ্টামাত্রও করিল না। কিন্তু পাঞ্চভৌতিক দেহেরও ত একটা ক্ষুধা, একটা দাবি আছে; সেই দুর্নিবার দাবি সোহিনীকে মিটাইতে হইল ল্যাবরেটরির এক সহকারীর সাহায্যে। কন্যা নীলিমার জন্মকাহিনীতে আছে এই রহস্য। যখন দীর্ঘ প্রেমাভিনয়ের পর রেবতী নীলিমার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিল, তখন সোহিনী সহজে অসঙ্কোচে এই রহস্য প্রকাশ করিল। বিবাহ ভাঙিয়া গেল।

আমাদের দৃষ্টি হইতে কন্যা সরিয়া গেলে, সেখানে দেখা গেল সোহিনীকে। স্বামী দীর্ঘকাল পূর্ব্বে মারা গিয়াছেন, সোহিনী স্বামীর জীবন-সাধনাকে নিজের জীবনের সাধনা রূপে গ্রহণ করিয়া তাহার একনিষ্ঠ প্রেমের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছে। দেহকে স্বামী বা সে কেহই বড় করিয়া দেখে নাই, তাই সে বিষয়ে নীতিবাগীশদের অনুশাসনকেও তাহারা কেহই কোন মূল্য দেয় নাই। এইখানে এই প্রেমের বৈশিষ্ট্য। তাহার পাতিব্রত্য—পতির জীবন-সাধনার অনুসরণে।

ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন বলিয়াছেন, "দেহের সতীত্ববোধ শিক্ষা-সংস্কার সাপেক্ষ। ইহার অভাবে দৈহিক শুদ্ধি যে হারাইয়াছে সেও মনের জোর থাকিলে ভালবাসার পাত্রের উপর নিষ্ঠা রাখিয়া সতীত্বের উচ্চতর আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। ইহাই সোহিনী চরিত্রের এবং 'ল্যাবরেটরি' গল্পের মূল কথা।"

মনে হয়, এই প্রেম 'ল্যাবরেটরি'তে পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে।

বর-কর্ত্তা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তা কোট করে বসে আছেন—নগদ বারো শ', তারপর বরাভরণ, দানসামগ্রী, নমস্কারী—ফিরিস্তি ক'রে তারও হিসাব ধরেছেন আড়াই হাজার; সোনা একুশ ভরি, বাজিদর ধরে মূল্য হয় দু' হাজার চার শ', একুনে এই ছ'হাজার এক শ' এক। এর এক পয়সা কম নয়। আর সমস্তটুকুই নেবেন নগদ। জিনিষ যখন তাঁরই ঘরে উঠবে তখন তিনি নিজে দেখে শুনে যাচাই করে কিনতে চান, নিজের পছন্দমত। নইলে মেয়ের বাপ তো এও বললেই পারে—"মশাই, আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমরাই আপনার ছেলের বউ পছন্দ করে দিয়ে আসছি।"

গণিতের একজন নামকরা অধ্যাপক, কিন্তু হিসাবে চিরদিনই অত্যন্ত কাঁচা। হিসাব অর্থে শুধু যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগই নয়, ক্লাস-রুমের বাইরে জীবনযাত্রার যে প্রতিদিনের ব্যাপার—তা নিয়ে ভুল তো প্রতিপদে করছেনই, তা ভিন্ন সেই হিসাবেরও একেবারেই অভাব যাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান—দুনিয়াটাকে এখনও ভাল করে, প্রচুর পরিমাণে দেখা হয় নি, বোঝা হয় নি বলে শিশুর মধ্যে যেটার দেখা পাওয়া যায় না, আর দুনিয়াটাকে প্রচুর পরিমাণে দেখবার সুযোগ হওয়া সত্ত্বেও বোঝবার অবসর হয় নি বলে হরনাথের মত মানুষদের মধ্যে যা অপরিস্ফুট। হরনাথ একজন বয়স্থ শিশু; শোনা যায় এক সময় তের গজে ওঁর পাঞ্জাবী হ'ত একটা। অবশ্য অনেক দিন আগেকার কথা, তবে এখন যে সে-হিসাবে বয়সের অনুপাতে তেরর জায়গায় একুশ গজ লাগে না তার কারণ এ নয় যে হরনাথ গণিতের জগতে কোন নূতন তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন; কারণটা মাত্র এই যে খরচপত্রের যা কিছু ব্যাপার—ব্যক্তিগতই হোক বা সাংসারিকই হোক—সব ওঁর হাত থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সেও অনেকদিনই হ'ল পত্নী আনন্দময়ী যেদিন থেকে সংসারে এসেছেন—অবশ্য চিনে নিতে, জলতে পুড়তে যে ক'টা দিন দেরি হয় সে ক'টা দিন বাদ দেওয়া যায়।

বাধ্য হয়েই হোক বা যে ভাবেই হোক, ব্যবস্থাটা হরনাথ মেনে নিয়েছেন। একটা সুবিধা তো আছেই—নির্ঝঞ্ঝাট থাকা, তাতে নিজের ওদিককার কাজে সময় ঢের বেশী দেওয়া যায়। মেনে নিলেও কিন্তু অন্তর থেকে মানতে পারেন নি, একটা হার মেনে নেওয়াই তো। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ডক্টর, তিনি হিসাবের কিছু বোঝেন না, যত কিছু বোঝেন উনি—পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, প্রাইমারি ছাড়িয়ে মিডলের ক্লাসে ওঠবারও অবসর হয় নি, তার আগেই বিয়ে হয়ে ঘোমটা টেনে ঘর-সংসার করতে চলে এসেছেন।

গোল হয়েছে এইখানে, এই যে অন্তর থেকে মেনে নিতে না পারায়। নিজের কাজেই থাকেন ডুবে, সেইজন্যে ক্ষতি হয় না, তবে থেকে থেকে মনটা এক এক সময় বিদ্রোহ করে ওঠে। ছোটখাটো যে-কোন একটা ব্যাপার উপলক্ষ্য করে সংসারের হিসাবপত্রের মাঝখানে এসে দাঁড়ান; ছেলেরা বড় হয়েছে, বাপের এই খামখেয়ালিপনায় বিশেষ বাধা দিতে চায় না, গৃহিণীরও খানিকটা অনুকম্পার ভাব এসেছে, একটু ঢিলে দেন; খানিকটা ক্ষতি-লোকসান ঘটিয়ে হরনাথ আবার কোন এক সময় নিজের গণিতের অরণ্যে অন্তর্হিত হয়ে যান। এই গার্হস্থ্য থেকে বানপ্রস্থ অবলম্বনের মাঝখানের সময়টা কমিয়ে আনতে পারা যায়, সুযোগমত আকার-ইঙ্গিতে জানিয়ে দেওয়া যে, হরনাথ একটু মনোযোগ দেওয়ায় চারদিক দিয়েই সংসারের সুবিধা হয়েছে। হরনাথ বলেন—"এই করে একটু চোখ চেয়ে চলবে; সংসার করা এমন কিছু হাতী-ঘোড়া ব্যাপার নয়; শুধু একটু হিসেবের দিকটা নজর রেখে যাওয়া। এক সময় করেছি।" আনন্দময়ী আর আজকাল সে সময়ের কথা তোলেন না।

এই করে চলে আসছিল; এমন কি আদর্শ সংসারযাত্রার উদাহরণগুলোও আসছিল কমে; তারপর বহুদিন পরে এই আবার একটা ঝোঁক হয়েছে।

সবাই বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

প্রথমত এ তো আর একটা ছোটখাটো হিসাবপত্রের ব্যাপার নয়, একটা বিবাহের সমস্ত ঝক্কি কর্ত্তা নিজের কাঁধে তুলে নিতে চাইছেন। পরিণাম যে কি হবে সেটা বেশ বোঝা যায়। তাও না হয় মেনে নেওয়া যেতে পারে, উচিতও তো; বুড়ো মানুষ, নিজে উদ্যোগী হয়ে ছেলের বিয়ে দিতে চাইছেন, এই শেষ কাজও, খরচপত্রের একটু বিশৃঙ্খলা ঘটে ঘটুক না। একটু চিন্তার বিষয় হলেও বড়ছেলে অন্তরায় হতে চায় না। গৃহিণীও নয়—একে বয়সের সঙ্গে ভোলানাথ স্বামীর প্রতি একটু বেশিই অনুকম্পাপরায়ণা হয়ে পড়েছেন, তার ওপর বড়ছেলের বিয়েটা তিনি নিজের হাতেই রেখেছিলেন একচেটে করে; তার দর্প বলেও তো একটা বস্তু আছে।

আসল চিন্তার কারণ ঘটেছে অন্য দিক দিয়ে। কর্ত্তা যা কোট করে বসেছেন তাতে বিয়েটাই বুঝি পণ্ড হয়ে যায়, আর সেটা শুধু চিন্তার হেতু নয়, অপরিসীম একটা দুঃখের বিষয়, সবার মনেই যে একটা দাগ থেকে যাবে তা আর ইহজন্মে উঠবার নয়।

বিয়ের কথা এক রকম পাকাই। পাত্রী ওপাড়ার বিনোদের মেয়ে অচলা। ওপাড়া বলতে দূর নয় এমন কিছু, খানদশেক বাড়ী-বাগানের পরেই একটা খাল, সেটা পেরুলেই বিনোদের বাড়ী, আধ মাইল পথ। বিনোদ হরনাথের প্রিয় ছাত্র, কিছু করতে পারলে না, অনার্সে বি-এ দেবার পরই বাপ মারা যেতে গ্রামের স্কুলের হেড মাষ্টারি নিয়ে বসতে হয়েছিল। এখনও তাই।

বাপের পরে শিক্ষকের শূন্য আসনটা দখল করলে অচলা। ফুটফুটে মেয়েটি এতটুকু থেকেই ন্যাওটো হয়ে পড়েছিল হরনাথের; প্রিয় শিষ্যের কথা মনে জাগিয়ে রাখে বলে হরনাথেরও একটা মায়া জন্মে গিয়েছিল। একটু বড় হয়ে উঠলে তার বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে তিনি তাকে পড়াতে লাগলেন। একেবারে এই বাড়ীরই মেয়ে হয়ে উঠেছিল অচলা, এই বাড়ীর বউও হবে এটাও জানত। যত দিন সেটুকু জানার মধ্যে লজ্জার তেমন কিছু পায় নি তত দিন মুক্ত গতিতে যাওয়া-আসা করেছে; তার পর আসা ক্রমে ক্রমে এসেছিল কমে; শেষে একদিন বৈঠকখানায় পুরুতঠাকুরের সঙ্গে দুখানা লম্বা কাগজ সামনে বিছিয়ে হরনাথ আর বিনোদবিহারীকে দেখে ফেলবার পর থেকে একেবারেই আসা বন্ধ করে দিয়েছে।

এতটা পাকাপাকির মধ্যে হরনাথের এক দিন হঠাৎ আবার মনে পড়ে গেল আদর্শ গৃহস্থালীতে হিসাবটাই সবচেয়ে বড় কথা। বিনোদবিহারীকে ডেকে বললেন, "ওহে বিনু, তা তো হ'ল, কিন্তু আসল কথাটারই এখনও বসে একটা ঠিক করে ফেলা হয় নি যে।"

মাঘ মাসের তেসরা কি বারোই দিন স্থির হবে সেই নিয়ে একটা আলোচনা চলছিল, বিনোদবিহারী বললে, "ওটা ঠিক করে ফেলেছি কাকা, পুরুতমশাই বিচার করে দেখলেন এদের যেমন কোষ্ঠী তাতে তেসরাটাই..."

"সে আমি জানি। অচু আর আসে না কেন খোঁজ নিতে গিয়ে কাল দেখলাম বাড়িতে চুণ ফেরানো আরম্ভ করে দিয়েছে বিনু, বউমা বললেনও দিন হয়েছে তেসরা। আসতে আসতে মনে পড়ে গেল, বিনোদ সব তো ঠিক করছে, দিনও এসে গেল, কিন্তু আসল কথা এখনও পাকাপাকি করলে কৈ?"

—খুব অভিজ্ঞ বিজ্ঞ গৃহস্থের মত ঠোঁটের কোণে একটু হাসলেন।

বিনোদবিহারী একটু বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করলে, "কি আসল কথা কাকা? আমার তো..."

এবার বেশ একটু স্পষ্টভাবেই হেসে উঠলেন হরনাথ, এমন অবস্থায় একজন বিষয়ী বরের বাপের যেমন হাসা উচিত, কন্যাপক্ষকে মূল প্রশ্নের বেলাতেই ন্যাকা সাজতে দেখলে। বললেন, "আসল কথা মানে—দেনাপাওনার কথা, সেটা সম্বন্ধে যে কিছুই স্থির হ'ল না আমাদের এখনও।"

বিনোদবিহারীর মুখখানা ছাইপানা হয়ে গেল।

কিন্তু কি কথা শুনে কন্যাপক্ষের মুখের ভাব কি রকম দাঁড়াল অত ভাবতে গেলে নিজের দিকে দেখে নিয়ে সংসার করা চলে না; হরনাথ সেই রকম সপ্রতিভ ভাবেই ফতুয়ার পকেটের মধ্যে থেকে একটা চিরকুট বের করে বিনোদবিহারীর সামনে ফেলে দিলেন, বললেন, "আর সময় নেই বলে কাল রাত্তিরেই আমি একটা খসড়া করে ফেললাম, বসন্ত যেমন ছেলে সে হিসেবে তো তোমার আপত্তির কিছু হওয়া উচিত নয়—তবুও দেখ, জোর তো নেই কিছু..."

বরপণ—	১২০১৲
বরাভরণ—	৮০০৲
দান সামগ্রী—(খাটপালং সমেত)	১৩৫০৲
নমস্কারী—	৩৫০৲
অলঙ্কার (২১ ভরি স্বর্ণ) ঐ বাদে—	২৪০০৲
	৬১০১৲

ঘরটা একেবারে নিস্তব্ধ, বিনোদবিহারী শূন্য দৃষ্টিতে ফিরিস্তিটার দিকে চেয়ে বসে আছে, হরনাথ তার পানে তাকিয়ে গড়গড়া টানছেন, ঠোঁটের কোণে সামান্য একটু হাসি, যে মানুষকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয় তার মত।

একটু পরে বিনোদবিহারী শুষ্ক আর কতকটা অস্পষ্ট স্বরেই বললে, "এ তো আমার ভদ্রাসনটুকু বেচলেও হবে না কাকা।...অবশ্য বসন্তকে জামাই করতে যতটা সম্ভব করব, কিন্তু সেও ত আমার পক্ষে যতটা সম্ভব..."

"ওর কমে হবে না বিনোদ, হবার কিনা তুমিই বিচার করে দেখ। সম্বন্ধ যা সব আসছে কয়েকটা তো দেখেছই তুমি। এ শুধু তোমার মুখ চেয়ে ধরেছি, আর অচুকে ঘরে আনতে চাই বলেই।"

একটা অতিরিক্ত বড় উচ্চাশার মুখে ধাবা খেয়ে লজ্জায়, নিরাশায় বিনোদবিহারী যেন একেবারে কি রকম হয়ে গেছে, চোখ দুটো একটু সজলও হয়ে এসেছে, কিন্তু প্রাণপণে রয়েছে চেপে। বললে, "আমার তো ঐটুকুই ভরসা কাকা, স্নেহ করেন...অচলাকেও সেই চোখেই দেখেন...তবুও, মা-ই তোলেন কথাটা আপনার বৌমার কাছে, আমাদের অত সাহস কোথায় যে অত উঁচুতে মুখ তুলে চাইব?...তারপর যখন শুনলাম আপনারও মত আছে—মা বললেন আপনিই পেড়েছেন কথাটা—তখন..."

"আমার তো অমত নেই বিনু; ঐ ছেলের জন্যে এই ফিরিস্তি, এতে অমতের ভাব কিছু দেখতে পাওয়া যায়?"

"না কাকা, এও যথেষ্ট দয়াই; তবে আমি যে এতেও থই পাব না; জানেনই তো সব অবস্থা..."

"না, এর কমে আমি পারব না বিনু; জানই তো রিটায়ার

করবার বয়স হয়ে আসছে, ছেলের বিয়ে দিয়ে ঋণগ্রস্ত হব—সেটা আমার পছন্দ নয়। ওটুকুর ব্যবস্থা তোমার করতেই হবে। ভেবে দেখো, না হয় তেসরাটা এখন থাক, একটু সময়ই নাও হাতে।"

বিনোদবিহারী চলে যেতে গৃহিণী এসে প্রবেশ করলেন, একটু হন্তদন্ত ভাব, প্রশ্ন করলেন—"হ্যাগা, বিনু অমন করে চলে গেল কেন?"

"কেমন করে?"

"এসেছে দেখে এই দিকে আসছিলাম, দেখি মুখটা নীচু করে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে যাচ্ছে।"

হরনাথ আবার সেই রকম একটু হাসলেন, বললেন—"ও একেবারে বিনি পয়সায় মেয়ে পার করতে চায়।"

স্বামীকে চেনেন, এই ধরণের কিছু বোধ হয় আন্দাজ করেছিলেন আনন্দময়ী, একটু চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলেন—"তাই নিয়ে তুমি কিছু বললে নাকি ওকে?"

"না বললে কারুর আক্কেল হয় আজকালকার দুনিয়ায়? আঙুল একটু না বেঁকালে বেরোয় ঘি? তুমিই বল না।"

"তাই কড়া করে বললে?"

"মোটেই নয়; তবে এ ধরণের কথা ত মধু বর্ষায় না কারুর কানে।...দিনটিন সব ঠিক করে ফেলেছেন, কিন্তু দেনা-পাওনা যে একটা ঠিক করতে হবে সেদিকে হুঁস নেই। তাই ডেকে ঐ ফিরিস্তিটুকু সামনে ধরে দিয়েছিলাম। দেখ না, অন্যায় হয়েছে কিনা।"

গৃহিণী এগিয়ে এসে চিরকুটটা তুলে নিলেন।

আগাগোড়া পড়ে গিয়ে তাঁর অবস্থাটাও প্রায় বিনোদবিহারীর মতই হয়ে উঠল, প্রশ্ন করলেন—"এইটে তাকে দিতে হবে!"

"অবরদস্তি ত নেই কিছু।"

"ও পাবে কোথায় সেটা ভেবে দেখেছ?"

"আমার মেয়ের বিয়ের সময় আমার বেহাই সেটা ভেবে দেখেছিলেন? ও যার ভাববার তাকেই ভাবতে হবে, এই হচ্ছে সংসারের নিয়ম।"

আনন্দময়ী অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ; তার পর তর্কের দিকে না গিয়ে অনুরোধ করলেন—"না, কথা শোন, ডেকে পাঠাও বিনোদকে, চোখের জল ফেলতে ফেলতে গেল—একেবারে ছেলের মতন করে চিরকালটা দেখে এলাম—বুঝলেই..."

"ছেলের মতনই থাক্ না; বেহাই হতে গেলে তার এই ব্যবস্থাই। এ জগতে লোক চিনতে দেরি হয় গিন্নি; ছেলের মতন ভাব দেখিয়ে ও যে ভেতরে ভেতরে এই রকম একটা মতলব পাকা করছিল, সেটা কি তুমিই আন্দাজ করতে পেরেছিলে? আমি তো পারি নি—তা বোকাশোকা মানুষ বলে তোমাদের কাছে একটা বদনাম তো আছেই।

পুত্রবধূ সরোজিনীও হার মানলে, তবে সে আজকালকার নভেল নাটক পড়া মেয়ে। দেবরকে টোকা মেরে দেখলে একবার। এতদিনের দেখাশোনা, এতদিনের কথাবার্তা, সে যদি অন্তত একবার এইটুকুও জানায় যে মেয়েটি তার পছন্দ, তো সেইটুকুকে শাখা-পল্লবিত করে শ্বশুরের কাছে আর একবার চেষ্টা করে।

বসন্ত গণিতে বাপকেও ছাড়িয়ে যাবে সবাই এই রকম আশা করে; এরই মধ্যেই ডক্টরেটের জন্যে একটা থিসিস্ লিখতে আরম্ভ করেছে, রাত্রিদিন তাই নিয়েই থাকে মেতে।

গণিতগত এই রকম উগ্র সাদৃশ্য থাকায় ছেলেটি আবার বাপের বিশেষ প্রিয়; সে দিক দিয়েও একটা আশা ছিল সরোজিনীর।

ভাজের কাছে সবটুকু শুনে বসন্ত বললে—"না হয় নাই হল। বাবা যা করছেন করতে দাও না।"

"তার মানে অচলা আর এ বাড়ীতে এল না। বিয়ের বয়েস উৎরে যাচ্ছে এক হিসাবে, তার বাপ তো আর রাখতে পারে না।"

"তা হলে তো অন্য জায়গায় দিতেই হবে বিয়ে।"—খুব বিজ্ঞের মত ভাব করে কথাটা বললে বসন্ত; এদিকে বিশেষ কিছু বুঝে না বলে বাপের মত ওর এ ঝোঁকটাও হয় মাঝে মাঝে বিজ্ঞ সাজবার।

সরোজিনী কতকটা ধিক্কার দিয়েই বললে, "হ্যাঁ ঠাকুরপো, এতদিন ধরে মেয়েটা আসছে যাচ্ছে, বিয়ের কথাও হয়ে আছে জান। তাও যে বলব হাবা-কুচ্ছিৎ তাও নয়; এততেও মনে তোমার একটু দাগ পড়ে নি? কলমটা রেখে একবার বলোই না মুখ ফুটে, বাবাকে আমরা গিয়ে বলি।...ভালবাসা বলে যে একটা জিনিষ সব মানুষের মনেই কম-বেশী করে দিয়েছেন ভগবান তার এক কোঁটাও কি তোমার ভাগে পড়ে নি?"

ডক্টরেটের জন্য সেই থিসিস্‌টাই লিখছিল বসন্ত, এমন ক্যালক্যাল করে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল যে মনে হ'ল জিনিসটা ট্রিগনোমেট্রির মধ্যে আছে কি মেনসুরেশনের পাতায় কোন মতেই যেন খুঁজে বের করতে পারছে না।

নিরাশ হয়ে সবাই হাল ছেড়ে দিলে।

সবাই মানে অবশ্য বসন্তর বড় ভাই হেমন্ত ছাড়া। সে আবার বিনোদবিহারীর বাল্যবন্ধু, বিনোদের সময়ের অভাব বলে সে তারই হয়ে কলকাতায় বিয়ের কেনা-কাটা করতে

গিয়েছিল। একসঙ্গে বধূ আর বন্ধুর জরুরী চিঠি পেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এল। অল্প কিছু হয়েই গেছে কেনা, বাসনপত্র-জাতীয়, সেইগুলো সঙ্গে করে একেবারে বিনোদের বাড়ীতেই উঠল। চিঠি দুটোই ছিল সংক্ষিপ্ত, সবিস্তারে সব শুনে বললে, "বাবার সেই হিসাব-রোগ একটু চাড়া দিয়ে উঠেছে, আর সবাই হেদিয়ে উঠেছিস ?...বাড়ীর চুণ কেরানও বন্ধ করে দিয়েছিস দেখছি যে! আর সময় কোথায় তোর হাতে ?"

রোগের ওষুধটা আনন্দময়ীরও জানা ছিল, এই তো প্রথম বার নয়। তবে এবার আর সেই ছোটখাটো হিসাবপত্রের ব্যাপার নয়, দু'দিনের জন্য এল, সবাই ঢিলে দিলেন একটু, দেখালেন লাভ হচ্ছে, সংসারে হিসাব জিনিসটা যে কি সবাই বুঝতে পারছেন ; তারপর আবার কখন কেটে গেল ঝোঁকটা। এবার একটা গোটা বিবাহেরই ব্যাপার, প্রায় বধূজ্ঞানেই যে মেয়েটিকে এতদিন দেখে এসেছেন, লালন-পালন করেছেন, তাকে হারাতে হবে, আনন্দময়ী যেন দিশাহারা হয়ে আর কোন রাস্তাই খুঁজে বের করতে পারছিলেন না স্থির মনে।

হেমন্ত আহারাদি সেরে পথের ক্লান্তিটা এখানেই ভাল করে কাটিয়ে মিটিয়ে নিলে ; চিন্তাও যা করবার তাও করে নিয়ে একাই একবার বাজারটা ঘুরে প্রায় সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

সন্ধ্যার পর হরনাথের সঙ্গে কথাবার্তা হ'ল—

"আজ্ঞে হ্যাঁ, কলকাতায়ই গিয়েছিলাম, বিনোদ বললে, আমি একলা পেরে উঠব না ; এদিকটা সামলাচ্ছি। তুই বাজারটা সেরে নিয়ে আয়।"

"তা হ'ল সারা ?" তাকিয়ায় হেলান দিয়ে গড়গড়া টানছিলেন হরনাথ ; প্রশ্ন করলেন।

"কেনা মানে খালি পছন্দ দেওয়া তো, আজকাল কলকাতার যা বাজার যেন আরও থৈ পাওয়া যায় না। এই-খানেই ফিরে আসব কিনা ভাবছি—সব জিনিস পছন্দমত না পেলেও জানাশুনা দোকান, একটু খাতির পাওয়া যায়—এমন সময় বিনোদের চিঠি গিয়ে হাজির, আপনি নিজের হাতেই সব কিনবেন বলেছেন। তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম ; শুধু যা বাসন ক'টা হয়েছে কেনা।"

এতগুলোর মধ্যে শুধু একটা কথাই ধরে মন্তব্য করলেন হরনাথ, বললেন, "খাতির কেউ করে না হিমু, ব্যবসাদারের কাছে খাতির নেই, বাজার ঘুরে দর করে কিনতে জানতে হয়।"

ছেলে মেনে নিলে—"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বৈ কি।"

"আসল কথা—বিয়ে পাওনাগণ্ডার কথাটা স্বীকার করে নিলে ? তারপর ত কেনাকাটার কথা। আমি ওর জন্যে রাজী হতে পারব না। তোমার গর্ভধারিণীরও পছন্দ নয়—সব দরাজ মনের মানুষ!—আমি কিন্তু অত দরাজ হতে পারব না।"

"মার সঙ্গে কথা হয়েছে, বুঝেছেন তিনি যে ওর জন্যে হয় না। বিনোদকেও হতে হবে রাজী, একরকম নিমরাজী হয়েছেই। নমস্কারীর ৩৫০টা টাকা নিয়ে এসেছি বাবা। কাল যদি আপনি বাজারে যান—মাল ওরই মধ্যে সদাশিবের দোকানে একটু ভাল আছে—সূতী গরদ—সব রকম। মানে, আর সময় নেই কিনা..."

একটু হেসে বললে, "আপনি আবার সব ঝক্কিটা নিজের ঘাড়ে তুলে নিলেন, বিনোদের দায়িত্বটা এসে পড়ল আমাদেরই উপর।"

"তা যাক, নিতে হয় দায়িত্ব বাবা ; দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে কি সংসার চলে ? এই দেখ না, একটু এলাকারি দিয়েছিলাম—ভেবেছিলাম সবারই একটা চক্ষুলজ্জা আছে, তা কেমন ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ঐ বিনোদই তো, না, অন্য কেউ ?"

এবারও হেমন্ত একটু হেসে সায় দিলে—"আজ্ঞে হ্যাঁ, লোক চেনা যে কত শক্ত!"

পরদিন সকালে বসন্তের বিবাহের নমস্কারী কাপড় সব যখন কিনে আনা হ'ল তখন বাড়ী থেকে আরম্ভ করে সমস্ত পাড়ায় একটা সাড়া পড়ে গেল ; যেমন পছন্দসই, তেমনি দরে সস্তা। বাড়ীতে হেমন্ত যে শাড়ি সাড়ে পঁয়ত্রিশ টাকায় নিয়ে এসেছে—দিন দশও হয় নি—হরনাথ সেটা এনেছেন সাতাশ টাকায়, পাড়ায় মাসখানেক আগে মিত্তির-গিন্নির জন্যে যে গরদ এসেছে পঞ্চাশ টাকায়, বসন্তের মায়ের নমস্কারী হিসাবে সেই শাড়ি এসেছে তেতাল্লিশ টাকায়। এই হিসাবে নমস্কারীর সব ধুতি-শাড়ি। তিন শ' পঞ্চাশের জায়গায় মাত্র দু' শ সাতাশীটি টাকা দোকানীকে দিয়ে বাজারের সেরা মাল বাড়ীতে এনে তুলেছেন হরনাথ।

প্রশংসায় যেন কান পাতা যায় না। বিয়ের বাড়ীতে আত্মীয় কুটুম্বের ভিড় বাড়ছে, তা সবার মুখে ঐ কথা ; সন্ধ্যার পূর্বে একটু বেড়াতে গিয়েছিলেন, পীতাম্বর চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা, সমবয়স্ক এবং বাল্যবন্ধু, বললেন—"কি এমন গণ্ড করে নিয়ে এসেছ হরনাথ, সকাল থেকে গিন্নী আমার অযোগ্যতার কথা বলে অতিষ্ঠ করে তুলেছেন একেবারে।"

ফিরলেন যখন স্নেহে প্রীতিতে আত্মপ্রসাদে মনটি ছলছল করছে। তাঁর আসার সঙ্গেই বোধ হয় আবার নমস্কারীর কথা উঠতে যাচ্ছিল, হরনাথ উঠানে দাঁড়িয়ে ডাকলেন—"ওগো শুনছ ?"

আনন্দময়ী বেরিয়ে এলেন।

"বলছিলাম তা যেন হ'ল ; কিন্তু একটা কথা তো ভেবে দেখতে হবে···হিমু গেল কোথায় ?"

হেমন্তও এই সময়টার জন্ত অপেক্ষা করেছিল, বেরিয়ে এসে বললে—"এই যে বাবা আমি ; কিছু বলবেন ?"

"বলাবলি মানে—একটা কথা তো কেউ ভেবে দেখছ না তোমরা—একটা কিস্তিতে দেওয়ার নিয়ম আমি দিয়েছি ; কিন্তু তোমরা দেখছি সেইটে ধরে বসে আছ—তোমার গর্ভধারিণীও, তুমিও—বললেই তো তখন বিনুকে হতে হবে রাজী—বোধ হয় চাপ দিয়েই নমস্কারীর টাকাটা বের করেও নিয়ে এসেছিলে। কিন্তু রাজী যে হবে, ঐ অতগুলো টাকা পাবে কোথায় তা একবার ভেবে দেখেছ কি কেউ ?—সম্বল তো ঐ পৈতৃক ভদ্রাসনটুকু—সেটুকু যদি বিক্রী করতে হয় মেয়ের বিয়েতে, তা হলে বউ তো আমার খুব পছন্দ হ'ল ! সে তো এল না একবার—ছিল ছাত্র, হতে যাচ্ছে বেহাই, মান খোয়াবে ! তার চেয়ে বাড়ী খোয়ানো ভাল।···আমি গিয়েছিলাম বাপু, মনে করলাম আমিই না হয় একটু নিচু হই হবু বেহাইয়ের কাছে। নমস্কারীর ও টাকাটা দিয়ে এলাম—যেটা বাঁচাতে পারলাম···তোমরা হলে সেটাকে চার শ' করে তুলতে। কিন্তু কথা হচ্ছে এখন ঐ ছ'টি হাজার টাকা বের করে কোথা থেকে বেচারি ?"

বাড়ী নিস্তব্ধ হয়ে রইল, সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, এক একটা জায়গা নিয়ে আছে দাঁড়িয়ে।

উত্তরের একটু সময় দিয়ে আবার নিজেই বললেন—"আমি বাপু, কিন্তু বিনুকে কিছু বলে আসি নি—তা যেন ভেব না। তবে আমার মত যদি জিগ্যেস করো তো বলি···"

চুপ করেই রইলেন ছেলে আর গৃহিণী।

"আমার মত ও বারো শ' চোদ্দ শ' পারবে না ; বরপণটা দু শ' থাক, দু শ' এক।"

হেমন্ত বললে—"বিনোদ ওটা পাঁচ শ' এক ধরেছিল বাবা।"

—বোধ হয় তার বন্ধুর যে একটা কাণ্ডজ্ঞান আছে এটা জানাবার জন্তেই বলা। হরনাথ একটু বিরক্তভাবেই বললেন, "টাকা বেশী হয়ে থাকে দিক, বরের বাপ, সে তো না বলবে না ; তবে আমার ঐ মত। আর ইয়ে···তোমার গিয়ে সোনা থাকুক দশ ভরি। আর খাট-পালঙের বখেরা···

হেমন্ত বললে—"ওটাকে ও ধরেছিল পনের ভরি।"

—একই উদ্দেশ্যে বলা।

হরনাথ আর একটু বিরক্ত হলেন, বললেন—"তবে বাড়ীই বেচুক সে।···কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখো দিকিন—পনের ভরি সোনা দিয়ে ওই যদি মেয়েকে মুড়ে দেয় তো আমরা যে এক-আধখানা দোব তা সে পরবে কোথায় ? পনের ভরি সোনা যে কতটা তা বোধ হয় তোমাদের হিসেবেই নেই।···তোমার গর্ভধারিণী যে বড় কথা কইছেন না—বরের মা, ওঁর বোধ হয় ইচ্ছে যতটা পারি মেয়ের বাপের কাছ থেকে নি আদায় করে, তাতে সে বাঁচুক বা মরুক, আমার বয়েটা গেল···

হেমন্ত নেমে এসে পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াল, বললে—"আপনি যেমন বলছেন ঠিক তাই হবে বাবা, আমি যাচ্ছি এখুনি বিনোদের কাছে, তাকে বরং ডেকেই নিয়ে আসছি।"

প্রয়োজন ছিল পায়ের ধুলা নেবার।···দেবতুল্য পিতা, বরং ভোলানাথই। ভোলানাথ বলেই তাঁকে ভুলিয়ে রাখতে ছেলেকে প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিতে হয়, দোকানীর সঙ্গে গোপনে ব্যবস্থা করে আসতে হয়, ভোলানাথ যাতে একটু আত্মপ্রসাদ পান, আত্মভোলা হয়ে যে ভুলটুকু করতে যাচ্ছেন সেটা যায় সামলে। নয় তো তাঁরই যে কলঙ্ক।

একটু করতে হয়েছিল প্রবঞ্চনা, তাই একটা ছুতো করে পায়ের ধুলা নিয়ে নিষ্পাপ পিতার পুত্র আবার নিষ্পাপ হয়ে দাঁড়া'ল।

নৃত্যশিল্পী ভাস্কর রায়চৌধুরী

শ্রীঅমল ঘোষ
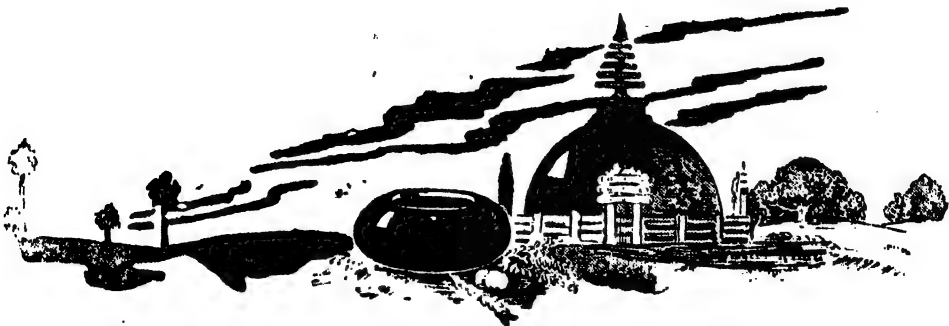
মানব-সভ্যতার যথার্থ রূপ দেখা যায় তার সাংস্কৃতিক জয়-যাত্রায়। সেই সংস্কৃতির বিচিত্র রূপ ফুটে ওঠে শিল্পীর তুলির ডগায়, কবি-সাহিত্যিকের লেখনীমুখে অথবা নৃত্যশিল্পীর চরণ-ছন্দে—এমনিতর কত রূপে, কত ভঙ্গীতে।

নৃত্যশিল্পী শ্রীভাস্কর রায়চৌধুরী

বসন্ত জীবনের জয়যাত্রার প্রতীক। মানব-সমাজকে বাঁচতে হলে বসন্তের সৌন্দর্য্যসম্ভার চাই। জীবন-বিকাশের উন্নত স্তরে নৃত্যের নব নব পদ্ধতির আবির্ভাবকে তাই মানুষ স্মরণাতীত কাল থেকে সাদরে অভিনন্দিত করে আসছে।

কিন্তু নৃত্যশিল্পের যে আদর্শ-বিকৃতি সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশে বহুক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হচ্ছে তা নৈরাশ্যজনক। নিকৃষ্ট নৃত্যের বন্যায় দেশ আজ ভেসে যেতে বসেছে। এই শিল্পের ভাগ্যে ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসছে গভীর অন্ধকার।

এর মূল কারণ হচ্ছে দুটি। প্রকৃত রসজ্ঞ ব্যক্তিরা এক দিকে যেমন অক্ষম নাচিয়েকে শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পীর তকমা পরিয়ে দিচ্ছেন অন্য দিকে তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত নৃত্য-শিল্পীর প্রতিভাকে লোকচক্ষুর সম্মুখে পরিস্ফুট করা বিষয়ে নীরব। তা ছাড়া এদেশে বিশেষ করে যে কয়েক জন নৃত্যশিল্পী অতীতে একাগ্র নিষ্ঠায় নৃত্যকলার সাধনায় রত হয়েছিলেন, আজ সস্তা হাততালির মোহে তাঁরা রসজ্ঞ দর্শকদের রুচিকে অবহেলা করতে সুরু করেছেন। এই সমস্ত কারণে নৃত্যশিল্প ক্রমশঃ অবনতির পথে এগিয়ে চলেছে।

ভারতীয় নৃত্যশিল্পের এই সঙ্কট-সময়ে আশার সঞ্চার হয় তরুণ নৃত্যশিল্পী ভাস্কর রায়চৌধুরীর নৃত্য-রূপায়ণ দেখে। নৃত্যশিল্পী ভাস্কর রায়চৌধুরী যশস্বী ভাস্কর ও শিল্পী দেবী-প্রসাদ রায়চৌধুরীর একমাত্র পুত্র। পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি লাভ করেছেন সহজাত শিল্প-প্রতিভা। পাথরে কোঁদা মূর্ত্তির মত তার সুগঠিত দেহ ভারতীয় নৃত্যের রূপায়ণে বিশেষ উপযোগী। তদুপরি সুশিক্ষিতা মায়ের শিক্ষায় এবং শিল্পলোকের সৌন্দর্য্য ও রসের পরিবেশে ভাস্কর রায়-চৌধুরীর শিল্পীমনের যথোচিত বিকাশসাধন হয়েছে। ভারতের ক্লাসিক্যাল নৃত্য ভরত নাট্যমের রূপদানে এই তরুণ শিল্পী অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই ভরত নাট্যমের সর্ব্বজনস্বীকৃত শ্রেষ্ঠ আচার্য্যেরাও স্বীকার করেছেন যে ভরত নাট্যমে পারদর্শী ভাস্করের কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ।

নৃত্যশিল্পী ভাস্কর রায়চৌধুরী নব নব নৃত্য-পরিকল্পনা নিয়ে মেতে আছেন, কিন্তু তিনি কোন নৃত্যই ঘুরে ফিরে বার বার দেশবাসীর সমক্ষে প্রদর্শনের পক্ষপাতী নন্—তাঁর মতে এটা হচ্ছে রসজ্ঞ দর্শকের উপর রীতিমত অত্যাচার। তাঁর নিজের পরিকল্পিত "নাগনৃত্য" দক্ষিণ-ভারতের অধিবাসী-দের প্রচুর আনন্দ দান করেছে। শ্রেষ্ঠ দক্ষিণী নৃত্য-সমালোচক শ্রীকৃষ্ণ আয়ার এই 'নাগনৃত্য' প্রত্যক্ষ করে লিখেছেন... "...Rare art reached its peak of perfection and excellence in his Naga-Nritya.'...'দি হিন্দু'র কলা-সমালোচক এই নৃত্য সম্পর্কেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছেন, "...he showed real sparkle and talent and, most important of all, the creative genius he has undoubtedly inherited from his father." অর্থাৎ, "তিনি শক্তির স্ফুলিঙ্গ, গুণপনা এবং সর্ব্বোপরি পিতার নিকট থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে লব্ধ সৃজনী-প্রতিভার পরিচয় প্রদান করে ছিলেন।"

কেবলমাত্র ভারতীয় নৃত্যে নয়, পাশ্চাত্য "ব্যালে" নৃত্য-পরিকল্পনায়ও ভাস্কর রায়চৌধুরী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রথমে তাঁর আশঙ্কা ছিল, তিনি হয়ত পাশ্চাত্য "পোজে"

সুরিয়া নৃত্যভঙ্গিতে শ্রীভাস্কর রায়চৌধুরী

নাগনৃত্য ভঙ্গিমায় শ্রীভাস্কর রায়চৌধুরী

সাফল্যলাভ করতে পারবেন না। কিন্তু তাঁর কঠোর সাধনা সার্থক হয়েছে।

তাঁর দেহের নমনীয়তা সম্বন্ধে একজন শ্রেষ্ঠ নৃত্য-সমালোচক বলেছেন—

"...Every bit of his body and limbs bent itself as pliably as India rubber and as if it had no bones."

অর্থাৎ, "তাঁর দেহের প্রত্যেকটি অংশ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রবারের মত বেঁকে যায়, মনে হয় যেন তাতে অস্থি নেই।" প্রাচ্যের এই নৃত্যশিল্পী আজ পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ ব্যালে নৃত্যশিল্পীদের সমকক্ষ হতে চলেছেন। ভাস্করের বয়স বর্তমানে একুশ বৎসর মাত্র, এই অল্প বয়সে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় নৃত্যকলায় এতটা সাফল্য অর্জন বাস্তবিকই বিস্ময়কর। কয়েক দিন আগে রুশদেশের বিশ্ববিখ্যাত চিত্র-পরিচালক মঃ পুডভকিন্ ভাস্করের বিভিন্ন নৃত্য-ভঙ্গিমার আলোকচিত্র রাশিয়ায় নিয়ে গেছেন। সেখানকার নৃত্য-শিল্পীরা যাতে এই সকল ভঙ্গিমার নব রূপ দান করতে উদ্বুদ্ধ হন সেজন্যে তিনি নাকি বিশেষ ভাবে চেষ্টা করবেন। নৃত্যে রাশিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব সমগ্র পৃথিবীতে স্বীকৃত। ভাস্করের নৃত্য-প্রতিভার এ স্বীকৃতি তাই শুধু শিল্পীর পক্ষেই নয়, ভারতবর্ষের পক্ষেও বিশেষ গৌরবের।
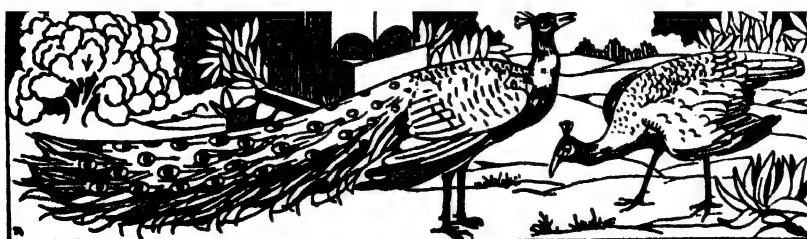
মিশরের কৃষি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

আমাদের দেশের মতই মিশর কৃষি-প্রধান দেশ। সেখানকার এক কোটি দশ লক্ষ লোকের মধ্যে কুড়ি লক্ষ পুরুষ ('ফেলাহিন' সম্প্রদায়ভুক্ত) প্রকৃত কৃষক। সমগ্র অধিবাসীদিগের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ জীবিকার জন্য কৃষির উপরে নির্ভর করিয়া থাকে।

মিশরকে প্রধানতঃ দুই অংশে ভাগ করা যাইতে পারে: (১) কৃষি-প্রধান অংশ; ইহা মুখ্যতঃ নীল নদের উপত্যকা ও বদ্বীপ এবং পশ্চিমের মরুভূমিসমূহের মধ্যস্থিত উর্ব্বর শ্যামল স্থানসমূহ; (২) কৃষিহীন অংশ; ইহার মধ্যে আছে মরুভূমি, অধিত্যকা এবং পর্ব্বতসঙ্কুল পূর্ব্ব এবং উত্তর-পূর্ব্ব ভূভাগ। এই দুই অংশের মধ্যে কৃষির দিক হইতে নীল নদের উপত্যকা এবং বদ্বীপ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। নীল নদের বদ্বীপের দক্ষিণাংশই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উর্ব্বর অঞ্চল। এই অঞ্চল উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১০০ মাইল লম্বা এবং প্রস্থে প্রায় ১৫৫ মাইল। ধূসর রঙের বালুকাই বদ্বীপের মাটি এবং বালুকার কণাগুলি এত সূক্ষ্ম যে, প্রথম দেখিলেই শক্ত কাদামাটি বলিয়া মনে হয়। এই পলিমাটির স্থানে স্থানে ঘনতার খুবই তারতম্য আছে। ৫৫ ফুট হইতে ৭০ ফুট পর্য্যন্ত ইহার গভীরতার তারতম্য দেখা যায়। কোন কোন অংশে ইহা ৬ হইতে ৮ গুণ পর্য্যন্ত ঘন হয়। সমগ্র বদ্বীপকে একটি বিস্তৃত পলিমাটি-পূর্ণ সমতল ক্ষেত্র বলা যায়।

জুন মাসে নীল নদের জল খুবই পরিষ্কার থাকে এবং তখন এই জলে পলিমাটি আদৌ থাকে না। কিন্তু ইহার পর জুলাই মাসে নদের জল যখন বাড়ে তখন হইতে (বিশেষতঃ আগষ্ট মাসে) ইহার জল আগ্নেয়গিরিনিঃসৃত পদার্থসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এই সকল পদার্থ আবিসিনিয়া দেশের পর্ব্বতমালা হইতেই আসে। সেপ্টেম্বর মাস হইতে এই সকল 'তলানি'র (sediment) পরিমাণ হ্রাস পাইয়া প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া যায়; ইহার পর নদের জল পুনরায় পরিষ্কার হয়। নীল নদের এই পলিমাটি উহার উপত্যকা ও বদ্বীপকে শস্য-শ্যামলা করিয়াছে। কিন্তু পশ্চিমের মরুভূমিসমূহের মধ্যস্থিত শস্যশ্যামল স্থানসকলের উর্ব্বরতাশক্তি আসে ৩০০ শত হইতে ৫০০ শত ফুট নিম্নে অবস্থিত নদীগর্ভের জল-সরবরাহ হইতে। মাটির স্বাভাবিক ফাটল দিয়া প্রচুর পরিমাণ জল উপরে উঠে; ইহা ছাড়া কূপ খনন করিয়াও জল উঠানো হয়।

মিশরকে বৃষ্টিহীন দেশ বলা যায়। সাগরতীরবর্ত্তী স্থানসমূহে খুবই অল্প পরিমাণ বৃষ্টি হইয়া থাকে--ইহা সাধারণতঃ শীতকালেই হয়, এবং ইহার পরিমাণ সুয়েজ অঞ্চলে এক ইঞ্চি ও আলেকজান্দ্রিয়াতে ৮ ইঞ্চি মাত্র। এই ৮ ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টিপাতও কৃষির পক্ষে খুবই অল্প বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং এই দেশের কৃষি সম্পূর্ণরূপে নদী হইতে এবং কূপের সাহায্যে জলসরবরাহের উপরই নির্ভর করে।

মিশরের আয়তন প্রায় ৪০০,০০০ বর্গমাইল। আবাদ-যোগ্য জমির পরিমাণ মোটামুটি ৭০ লক্ষ একর। পতিত জমিকে ক্রমশঃ চাষের উপযুক্ত করা হইতেছে। ৭০ লক্ষ একর জমির মধ্যে ২৫ লক্ষ একরে দুইটি ফসল উৎপাদিত হয়। কোন কোন অংশে তিনটি ফসলও পাওয়া যায়। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, বৎসরে প্রায় ৯০ লক্ষ একর জমিতে কোন না কোন রকমের ফসল জন্মে।

এই দেশের কৃষি-বৎসরকে (agricultural year) তিন ভাগে ভাগ করা যায়: (১) ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত "গ্রীষ্ম-ঋতু"—অর্থাৎ এই সময়ে গ্রীষ্মকালীন শস্যাদি রোপণ ও কর্ত্তন করা হয়; (২) ১লা আগষ্ট হইতে ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত "বন্যা-ঋতু' (Flood season); এবং (৩) ১লা ডিসেম্বর হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত "শীত-ঋতু"। এই তিন ঋতুতে যথাক্রমে ২২½ লক্ষ একর, ১৫ লক্ষ একর, এবং ৪৫ লক্ষ একর জমিতে চাষ হইয়া থাকে। এই সকল জমির মধ্যে এমন অনেক জমি আছে যাহাতে বৎসরে দুই-তিনটি ফসল উৎপাদন করা যায়। "গ্রীষ্ম-ঋতু"র প্রধান ফসল হইতেছে—তুলা, ইক্ষু, ভুট্টা এবং "মিলেট"; "বন্যা-ঋতুতে" খেজুর (বিশেষতঃ মধ্য-মিশরে), ভুট্টা, মিলেট (জোয়ার জাতীয় শস্য), ধান উৎপাদন করা হয়; এবং "শীত-ঋতু"তে গম, যব, ক্লোভার, সিম, মুসুর, খেসারী জাতীয় শস্য এবং নানাবিধ শাক-সব্জী উৎপাদিত হয়। সকল স্থানেই জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত এবং প্রত্যেক খণ্ডই প্রায়শঃ এক পরিবারের সকল লোকের অধিকারভুক্ত। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার এইরূপ খণ্ডগুলি ক্ষুদ্রতর খণ্ডে বিভক্ত। এই সকল ক্ষুদ্রতর খণ্ডের মালিক হইতেছে একই পরিবারের বিভিন্ন লোক।

মিশরের কৃষির দুইটি প্রধান বিশেষত্ব আছে—প্রথমতঃ, পশ্চিম অঞ্চলের মরুভূমিসমূহের শস্যশ্যামল স্থানগুলি ব্যতীত সমগ্র দেশের কৃষি নীল নদের জলের দ্বারাই পরিচালিত এবং সমৃদ্ধ—বৃষ্টিপাতের দ্বারা নহে; এবং দ্বিতীয়তঃ, নীল নদ কেবল যে জল সরবরাহ করে তাহা নহে, বালুকাময় জমিকে পলিমাটির দ্বারা উর্ব্বরাও করে। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই নীল নদের জল বর্দ্ধিত হইয়া দুই কূল ছাপাইয়া যায়; কোন কোন

স্থানে বাঁধ বাঁধিয়া এই জলকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সাধারণতঃ নদীর জল ২৫ ফুট উচ্চ হয়। পূর্ব্বকালে নীল নদের জলের এইরূপ বার্ষিক বৃদ্ধি ও উচ্চতার উপরেই কৃষি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিত। বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া সমগ্র উপত্যকাটিতে ছোট ছোট জলকুণ্ডে (catchment areas) বিভক্ত করা হইত। এই সকল জলকুণ্ডের তলদেশে পলিমাটি সঞ্চিত হইত। খাল কাটিয়া নদী হইতে জলকুণ্ডে জল আনা হইত। আবার এইরূপ ব্যবস্থাও ছিল যাহার সাহায্যে জলকুণ্ডের জল নিষ্কাশিত করিয়া পুনরায় নদীতে পরিচালিত করা যায়। জলকুণ্ডে নদীর জল ৬।৭ সপ্তাহ ধরিয়া রাখা হইত। এই সময়ের মধ্যেই উহার গর্ভে প্রচুর পরিমাণে পলিমাটি সঞ্চিত হইত। জলকুণ্ডের সকর্দ্দম মাটিতেই বীজ বপন করা হইত এবং মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে ফসল উঠানো হইত। ইহার পর জমি "পতিত" পড়িয়া থাকিত। পুনরায় সেপ্টেম্বর মাসে উহা নদীর জলে পূর্ণ করা হইত। এইরূপ পুরাতন রীতি এখনও স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। কিন্তু এই রীতির সাহায্যে বৎসরে একটিমাত্র ফসল পাওয়া যায়। তুলা ও ইক্ষুর পক্ষে এই রীতি খুবই অনুকূল। তুলা আট মাসের ফসল, ইক্ষু জল সেচনের সাহায্যে সারা বৎসর উৎপন্ন হয়।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সেচ-ব্যবস্থার ফলে মিশরের কৃষির প্রভূত উন্নতি আরম্ভ হয়। এই সেচ-ব্যবস্থার বিশেষত্ব এই যে, সুচিন্তিত প্রণালীতে খাল এবং সহায়ক খাল (subsidiary channels) খনন করিয়া সমগ্র দেশের কৃষির উন্নতিকল্পে সারা বৎসর সময়মত প্রয়োজন অনুযায়ী জল সরবরাহ করা হয়। জল সরবরাহ এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত যে, অত্যধিক জলের বা জলাভাবের জন্য কোন শস্যের কোনপ্রকার ক্ষতি হয় না। বর্ত্তমানে এই সেচ-ব্যবস্থার অধিকতর উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

এই দেশের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান ফসল হইতেছে—তুলা, ইক্ষু, ভুট্টা, মিলেট, খেজুর, ধান ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কোন কোন ফসল পাকিতে দীর্ঘ সময় লাগে; সুতরাং ইহাদের বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য সারা বৎসর প্রয়োজনমত জল সরবরাহ আবশ্যক। নীল এবং তামাকের চাষ বেশী ব্যাপক নহে। বিদেশ হইতে তামাক আমদানী করিয়া মিশরের 'সিগারেট-শিল্প' গড়িয়া উঠিয়াছে। উপরোক্ত ফসলগুলির মধ্যে তুলাই অধিকতর মূল্যবান। মার্চ্চ হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত তুলার চাষ হয়। তুলা উঠাইয়া তুলার জমিতে 'ক্লোভার' বপন করা হয়। ক্লোভার-চাষের ফলেই জমির উর্ব্বরতা রক্ষা হয় এবং বাড়ে। ক্লোভার সাত বার কাটা হয়। জুলাই মাসে ক্লোভার সর্ব্বশেষ কাটা হয়। ইহার পর জুলাই মাস হইতে পরবর্ত্তী কুড়ি মাসের মধ্যে ভুট্টার দুইটি ফসল এবং গমের একটি ফসল উৎপাদন করা হয়। গম শীতকালে কিংবা বসন্তকালেও রোপণ করা যায়। তিন বৎসরের শস্য-পর্য্যায় মোটামুটি এইরূপ :

	ফসল	প্রথম বৎসর	দ্বিতীয় বৎসর	তৃতীয় বৎসর
১।	তুলা	মার্চ্চ হইতে অক্টোবর		
২।	ক্লোভার		অক্টোবর—জুলাই	
৩।	ভুট্টা (২টি ফসল) এবং			
৪।	গম (কিংবা ক্লোভার)			জুলাই—ফেব্রুয়ারি

একর প্রতি তুলার ফলন ৫০০ পাউণ্ড। সার-প্রয়োগের সাহায্যে একরপ্রতি ৭০০ পাউণ্ড ফলনও হইয়া থাকে। এখানকার তুলা বিখ্যাত। ১৯০৬ সালে ৩,১৫,০০০ টন তুলা এই দেশে উৎপন্ন হইয়াছিল।

তণ্ডুল-জাতীয় শস্যের মধ্যে গমই প্রধান। ইহা ছাড়া যব, ভুট্টা, জোয়ার জাতীয় শস্য, শিম জাতীয় শস্য, মুসুর প্রভৃতির চাষও হইয়া থাকে। এই সকল ফসলের চাষে বিশেষ যত্ন লওয়া হয় না, কেবল সুচিন্তিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত জল-সেচনই প্রধান কাজ। এই দেশের জলবায়ু ভারতীয় গমের চাষের পক্ষে বিশেষ অনুকূল।

গবাদি পশুর বিভিন্ন মিশ্র জাতি দেখা যায়। ভারতীয় মহিষ লাঙ্গল টানায় এবং যানবাহনের কাজে লাগে। ইহাদের সংখ্যাও বেশী। দুগ্ধের জন্য ভারতীয় মহিষ পালন করা হয়। মিশ্র জাতির ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি প্রত্যেক গ্রামেই বিপুল সংখ্যায় দেখা যায়। গর্দ্দভের সংখ্যাও অত্যধিক। উষ্ট্রও ভাড়া খাটাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। চাষবাসের কাজ প্রধানতঃ ষাঁড় বলদের দ্বারাই হয়। গোচারণ-ভূমির অভাবের জন্য ভাল গরু বলদের সংখ্যা খুবই কম।

আমাদের দেশেও প্রয়োজন অনুযায়ী সময়মত জল সরবরাহের এইরূপ সুচিন্তিত ব্যবস্থা করিলে দেশ যে অচিরেই 'ভিক্ষার্থী'র আসন পরিত্যাগ করিয়া 'দাতার' আসনে বসিতে পারে সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। সুখের বিষয়, এ বিষয়ে সরকার মনোযোগী হইয়াছেন। পল্লী অঞ্চলের পুরাতন খাল, নালা, দীঘি প্রভৃতির সংস্কার অল্পস্বল্প হইতেছে; কিন্তু অধিকতর দ্রুত গতিতে হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং ভিন্ন ভিন্ন এলাকার জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করাও প্রয়োজন।*

---

* *The Standard Cyclopedia of Modern Agriculture* হইতে তথ্যাদি গৃহীত।

বন-বিষ্ণুপুর

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত

বিষ্ণুপুর বর্ত্তমানে বাঁকুড়ার একটি নগর। দেশাবলী-বিবৃতিতে আমরা পাইয়াছি—"বিষ্ণুপুরের মহারাজা তথায় প্রস্তরমন্দির ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশীয় দুর্জ্জনসিংহ বিষ্ণুপুর নগরী স্থাপন করেন।" অভয়বাবুর বিষ্ণুপুররাজগণের ইতিহাসে দুর্জ্জন সিংহের কাল ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দ। দুর্জ্জনসিংহ বীরসিংহের (১৬৫৬) পুত্র। বীরসিংহ লালজীর মন্দির নির্ম্মাণ করেন। অভয়বাবুর ইতিহাসে আছে—আনুমানিক ৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরের ১৯শ রাজা জগতমল্ল প্রদ্যুম্নপুর হইতে বিষ্ণুপুরে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে—এখন হইতে এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে বিষ্ণুপুর বলিতে কোনও বিশেষ নগর বুঝাইত না, একটা অঞ্চল বুঝাইত। সে অঞ্চল বর্ত্তমান তমলুক হইতে ছোটনাগপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সে অঞ্চলের নাম ছিল বন-বিষ্ণুপুর। তাম্রলিপ্তি সে অঞ্চলের মধ্যে ছিল।

বর্ত্তমান বাঁকুড়া হইতে বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত ভূমি বন-বিষ্ণুপুরের মধ্যে পড়ে। ১৩৫৬ সালের চৈত্র-সংখ্যা প্রবাসীতে এই ভূমির দিকে ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। এই ভূমির এক্তেশ্বরের মন্দির, সোনাতাপলের মন্দির, বাহুলাড়ার মন্দির-গুলিকে কেন্দ্র করিয়াই যে বন-বিষ্ণুপুর অঞ্চলের সৃষ্টি হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই মন্দিরগুলি অপেক্ষা অধিক-তর প্রাচীন মন্দির বঙ্গদেশে নাই। অথচ এই ভূমির কোনও ঐতিহাসিক মূল্য নাই এমন হইতে পারে না। এক্তেশ্বরের মন্দিরকে লোকে বিরূপাক্ষের মন্দিরও বলিয়া থাকে। বিরূপাক্ষ—অসুর। কালিকা-পুরাণে—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে নরকভবনে বিরূপাক্ষ অসুরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এক্তে-শ্বরের শিবের সঙ্গে নাকি কামাখ্যার শিবের সাদৃশ্য আছে।

কিন্তু কোন্ সে অনার্য্য হিন্দুরাজা সোনাতাপলের মন্দিরে—স্বর্ণে বিষ্ণু-দর্শন করিতেন?

শুশুনিয়া শিলালিপির মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মার কথাই মনে পড়ে। শুশুনিয়ার অতি সন্নিকটে এক্তেশ্বরের ন্যায় তীর্থ থাকিতে, এক্তেশ্বরসংলগ্ন সোনাতাপলের মন্দিরের ন্যায় প্রাচীন বিষ্ণুগৃহ থাকিতে চন্দ্রবর্ম্মা পষ্করণার রাজা কেমন করিয়া হইলেন বুঝি না।

মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে সুহ্ম, প্রসুহ্ম দুইটি জনপদের নাম আছে। রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায় (৮৯০-৯১০) সুহ্ম ও তাম্রলিপ্তক এই দুইটি জনপদের উল্লেখ আছে। দিগ্বিজয়প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভূগোল গ্রন্থে আছে—"দামোদরোত্তরে ভাগে সুহ্মদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।" সুতরাং দেখা যাইতেছে—হাজার বৎসর পূর্ব্বে দামোদরের দক্ষিণ হইতে বর্ত্তমান তমলুক পর্য্যন্ত ভূমি তাম্রলিপ্ত নামে কথিত হইত। গুজরাটের রাজা কুমার পালের (১১৪৩-৭৪) গুরু জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র তাঁহার 'অভিধান চিন্তামণি' গ্রন্থে তাম্র-লিপ্তকে 'বিষ্ণুগৃহ' বলিয়াছেন। এই 'বিষ্ণুগৃহ'ই বন-বিষ্ণুপুর।

হেমচন্দ্রের প্রায় সমসাময়িক, লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোয়ীর পবনদূত কাব্যে তাম্রলিপ্তির উল্লেখ নাই। তিনি প্রসুহ্মকে সুহ্মই ধরিয়াছেন। তাঁহার—"দেবঃ সুহ্মে বসতি কমলা কেলিকারো মুরারিঃ"ই বন-বিষ্ণুপুর। অতঃপর ধোয়ী শিব-মন্দিরবিশিষ্ট একটি নগরের কথাও বলিয়াছেন—"নগরমমরৎর চারুচন্দ্রার্দ্ধমৌলেঃ।"—সে শিবমন্দির—বন-বিষ্ণুপুরের এক্তে-শ্বরের মন্দির। এক্তেশ্বরের মন্দির এবং বর্ত্তমান বাঁকুড়া নগরের মধ্যবর্ত্তী—বর্ত্তমান এক্তেশ্বর মৌজায় সে নগর অবস্থিত ছিল।

এক্তেশ্বর এখনও তীর্থস্থান। কতকাল পূর্ব্বে এক্তে-শ্বরের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল; কতকাল ধরিয়া এই মন্দির ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কত যোগী, কত সন্ন্যাসী, কত গৃহীকে আকর্ষণ করিয়াছে; কত বৌদ্ধ, কত জৈন, কত বৈষ্ণব, কত রামানন্দী, কত আচার্য্য এই ক্ষেত্রে আশ্রয়লাভ করিয়া জীবন কাটাইয়াছে—মানুষ ধারণা করিতে পারে নাই বলিয়াই কি এই মন্দির সন্নিহিত গড়ের নাম 'ভুদিমন্তরীর রাজার গড়' হইয়াছে?

সোনাতাপলের, বাহুলাড়ার মন্দির দুইটিতে এখন চাম-চিকা, বাদুড়, পেচকেরা বাস করে। জনমানবের সমাগম সেখানে হয় না। পাগল বাতাস মন্দিরগুলির চারিপাশে কাঁদিয়া বেড়ায়। এই মন্দিরগুলির আশে-পাশে, দ্বারকেশ্বর নদের তীরে তীরে, দিনের পর দিন ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিলে, হাজার বৎসর পূর্ব্বে বন-বিষ্ণুপুরের এই অংশ কিরূপ জনবহুল ছিল তাহার কিছু আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

বন-বিষ্ণুপুর ক্রমবর্দ্ধমান ছিল বলিয়া হয়ত চন্দ্রবর্ম্মার (৪র্থ শতক) পরবর্ত্তী কোনও কালে ইহা বর্দ্ধমান নামে আখ্যাত হইয়াছিল। বৃহৎ সংহিতায় (৬ষ্ঠ শতক) তাম্রলিপ্ত ও বর্দ্ধমান দুইটি জনপদের উল্লেখ আছে। নবম শতকে হরিকেল মণ্ডলের বৌদ্ধ রাজা কান্তিদেব দামোদরের উত্তর ভাগে বর্দ্ধমান নগরী স্থাপন করেন। দশম শতাব্দীর শেষের দিকে বৌদ্ধ-রাজা চন্দ্রদেব, কান্তিদেবের রাজ্য বিক্রমদ্বারা লাভ করেন। সম্ভবতঃ এই সময় হরিকেল মণ্ডল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। দামোদরের দক্ষিণ হইতে বর্ত্তমান তমলুক পর্য্যন্ত তাম্রলিপ্ত প্রদেশ বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের অধিকারে আসে।

"জাতীয় গ্রন্থাগারে"র তৃতীয় পর্ব

১৮৬১-৮৫

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

আমরা এ পর্য্যন্ত যতটুকু আলোচনা করিয়াছি তাহাতে দেখিয়াছি—জাতীয় গ্রন্থাগার জ্ঞান-বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তকেরই আগার হইয়া উঠে নাই, ইহা জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনারও একটি কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গ-মনীষিগণ এখান হইতে আহৃত বিদ্যা জনসমাজে বিতরণ করিতেও তৎপর হন। গ্রন্থাগারের আদর্শে কলিকাতার চতুর্দ্দিকে বাংলা ও ইংরেজী পুস্তকের ছোট বড় বহু গ্রন্থাগার এই সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপ শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে, 'জাতীয় গ্রন্থাগার'-প্রবর্ত্তিত আন্দোলনের ফলে সরকার ১৮৬০ সনের একুশ আইন নামে একটি আইনও বিধিবদ্ধ করেন। এই সকল কারণে বাংলা-দেশে, এমন কি ভারতবর্ষেও ইহার মর্য্যাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গ্রন্থাগার-কর্ত্তৃপক্ষ শুধু প্রতিষ্ঠানটির উন্নতিতেই পরিতৃপ্ত ছিলেন না, অনুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহকে উদ্বৃত্ত পুস্তকাদি দিয়া পরিপুষ্ট করিতেও তৎপর হইলেন।

আলোচনার সুবিধার জন্ত এই পর্ব্বকে আমরা মোটামুটি চার ভাগে বিভক্ত করিব। ১৮৬১-৬৬ সন পর্য্যন্ত গ্রন্থাগারের নানা বিষয়েই উন্নতি পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। এই সময়ে অধ্যক্ষগণ পূর্ব্ববৎ এই তিন জন ছিলেন—আলেকজাণ্ডার চার্লস ম্যাক্রি, চার্লস বিনি ট্রেভর এবং আর্থার ক্রম। বহু গণ্য-মান্ত ইংরেজ ও বাঙালী নূতন অংশীদার হন। শিবচন্দ্র দেব, মহেশচন্দ্র চৌধুরী (১৮৬১), 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া'-সম্পাদক জর্জ স্মিথ (১৮৬২), ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার (১৮৬৫) ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন। গ্রন্থাগারের বান্ধব (patron) রূপে যথারীতি বড়লাট লর্ড ক্যানিং ও বড়লাট লর্ড এলগিনকে দেখিতে পাই।

গ্রন্থাগারিক প্যারীচাঁদ মিত্র সকল দিকেই সজাগ-দৃষ্টি। গ্রন্থাগারের শ্রীবৃদ্ধিসাধন তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র হইয়া উঠিয়াছিল। উপন্যাস, কাব্য ব্যতিরেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পুস্তকাদি এবং সাময়িক পত্রিকাও এখানে প্রচুর ক্রীত ও সংগৃহীত হইতে লাগিল। পাঠক-সংখ্যা ও চাঁদাদাতা সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল। চাঁদাদাতাদের চারি শ্রেণী। ১৮৬৩ সনে গড়ে মাসিক চাঁদাদাতাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৭৮ জন। ঐ বৎসর গচ্ছিত তহবিলও দাঁড়ায় ১৮,০০০ টাকায়। এই দুইটি বিষয়ে গ্রন্থাগারের এতাদৃশ উন্নতি ইহার পূর্ব্বে বা পরে আর কখনও দেখা যায় নাই।

ক্রয় ব্যতিরেকে অন্ত উপায়েও এখানকার পুস্তক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৮৬২ সনে স্কুল-বুক সোসাইটি এবং ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটি বা অনুবাদক-সমাজ সম্মিলিত হইলে উক্ত সমাজের পক্ষে সম্পাদক গ্রন্থাগার-কর্ত্তৃপক্ষকে ৯ই মে তারিখে জানাইলেন যে, তাঁহারা উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত সমুদয় বাংলা পুস্তক তাঁহাদিগকে দিবার বাসনা করিয়াছেন। গ্রন্থাগার-কর্ত্তৃপক্ষ সাদরে এই দান গ্রহণ করিলেন। বলা বাহুল্য, গ্রন্থাগারিক প্যারীচাঁদ মিত্রের চেষ্টাতেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভ্য ছিলেন।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার

প্রচলিত আইন অনুসারে কোম্পানীর কাগজের উপরও আয়কর ধার্য্য করা হইত। কিন্তু বাংলা-সরকার গ্রন্থাগারের গচ্ছিত তহবিলের উপর আয়কর ধার্য্য করা হইবে না, এই মর্ম্মে ইহার কর্ত্তৃপক্ষকে ১৮৬২ সনের ১৮ই এপ্রিল একখানি পত্র লিখেন। এ বৎসরের জানুয়ারী মাসে সরকারের পক্ষে একাউণ্টাণ্ট-জেনারেলও তাঁহাদিগকে জানান যে, অতঃপর কোম্পানীর কাগজ ভাঙাইতে তাঁহাদের আর কোন বাধা থাকিবে না। যে-কোন দুই জন কিউরেটর বা অধ্যক্ষের সহি-যুক্ত পত্র পাঠাইলে ইহা ভাঙানো যাইবে। এই সুবিধার জন্ত

গ্রন্থাগার দীর্ঘকাল যাবৎ আন্দোলন পরিচালনা করিয়া আসিয়াছিলেন।

গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষ ১৮৬৫ সনে ক্রেতব্য পুস্তক নির্ব্বাচন সম্পর্কে অধিকতর সতর্ক হইলেন। সর্ব্বদা পাঠকবর্গের অভিরুচিমত পুস্তকাদি ক্রয় না করিয়া তাঁহাদের রুচি নিয়ন্ত্রণ করাও প্রত্যেক গ্রন্থাগারের কর্ত্তব্য। আর এইজন্ত গ্রন্থাগারিকের বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে। উপন্যাস বা হাল্কা সাহিত্য পাঠের প্রতি সাধারণের আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনন-সাহিত্যের অধ্যয়ন এবং অনুশীলনেও যাহাতে পাঠকবর্গ তৎপর হন তাহারও আয়োজন করা প্রয়োজন। 'কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরি' বা আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগার এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেন। তাই দেখি, ১৮৬৫ সনে তাঁহারা লিটন, ডিকেন্স, আলেকজাণ্ডার ডুমা প্রমুখ খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকদের পুস্তকাদির সঙ্গে ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ক পুস্তক এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ইহার শিক্ষা সংস্কৃতি ঐতিহ্যের উপর আলোকপাত করিতে পারে এরূপ গ্রন্থ ও সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা-সংক্রান্ত বিবিধ পুস্তক, পুস্তিকা, রিপোর্ট প্রভৃতি প্রেরণের জন্ত লণ্ডনস্থ এজেণ্টকে নির্দ্দেশ দিতেছেন। তাঁহারা এবারকার রিপোর্টে এ সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন :

"Although Prose Works of Imagination form a large proportion, other departments have not been neglected, the great object being to make this Library the depository of useful standard works."

গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংগ্রহের একটি বৃহৎ অংশ উপন্যাস সাহিত্য হইলেও, প্রয়োজনীয় মনন-সাহিত্যেও ইহা কম সমৃদ্ধ হয় নাই। এখানে যে সব নূতন পুস্তক আমদানী হইত, এই সন হইতে প্রতি পনর দিন অন্তর 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার স্তম্ভে তাহার তালিকা মুদ্রিত হইত। পর বৎসর, ১৮৬৬ সনে ডক্টর জর্জ স্মিথও 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র এইরূপ তালিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন।

এই বৎসরে গ্রন্থাগার-সংক্রান্ত দুইটি বিষয় খুবই উল্লেখযোগ্য। সুযোগ্য গ্রন্থাগারিক প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৬৬ সনে অবসর গ্রহণ করেন। ইহার উন্নতি সাধনে তাঁহার কৃতিত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত। কিউরেটরগণ তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া মন্তব্য লিখিলেন। তাঁহার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা হইতে গ্রন্থাগার যাহাতে বঞ্চিত না হয় সেজন্ত তাঁহাকে 'অনারারি কিউরেটার' বা 'সম্মানিত অধ্যক্ষ' পদে নিয়োগের জন্ত সাধারণ সভার নিকট তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে সুপারিশ করেন। প্যারীচাঁদও পদত্যাগ-পত্র প্রেরণকালে অবৈতনিক ভাবে কার্য্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৬৭ সন হইতে 'Honorary Curator and Secretary' পদে তাঁহাকে কার্য্য করিতে দেখি।

১৮৬৬ সনের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কার্য্য—গ্রন্থাগারের উন্নতির উপায় ও পরিচালনা সম্পর্কে সাধারণ সভা কর্তৃক ২৬শে জানুয়ারী একটি সাবকমিটি নিয়োগ। কমিটির পাঁচ জন সদস্যের মধ্যে ছিলেন ডক্টর জর্জ স্মিথ ও একমাত্র বাঙালী রমানাথ ঠাকুর। ৩১শে ডিসেম্বর (১৮৬৬) তারিখে কতকগুলি সুপারিশ সহ তাঁহারা রিপোর্ট পেশ করেন। ইহার কতকগুলি ছিল গ্রন্থাগারের পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা ক্রয়, এইগুলি পাঠকদের আদান-প্রদান এবং অতিরিক্ত পুস্তক বাতিল করা সম্পর্কে। আর্থিক ব্যাপারের সুপারিশগুলির একটি ছিল পরবর্তী ১লা মার্চ্চ হইতে গ্রন্থাগারের পাঁচ জন কর্ম্মচারীর পরিবর্ত্তে তিন জন নিয়োগ সম্বন্ধে। গ্রন্থাগারে যে সকল অংশ বা 'শেয়ার' ফিরিয়া আসিয়া ইহার স্বত্ব হইয়াছে তাহার প্রতিটি সাড়ে তিন শত টাকায় বিক্রয় করারও প্রস্তাব করা হইল।

২

পর বৎসর উপরি-উক্ত সুপারিশগুলি অনুসারে কার্য্যও আরম্ভ হইল। ডেপুটি সেক্রেটারী এবং লাইব্রেরিয়ান পদে নিযুক্ত হইলেন ১৮৬৭, ১লা জুন হইতে কলিকাতার হিন্দু স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক, গ্রন্থাগারের অন্ততম প্রোপ্রাইটর গোপীকৃষ্ণ মিত্র। প্যারীচাঁদের নির্দ্দেশে ও সহায়তায় তিনিও ইহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। বৎসর শেষে কিউরেটরগণ এবং প্যারীচাঁদ মিত্রও তাঁহার এইরূপ প্রশংসা করেন :

"The ability and zeal with which he has performed his duties have afforded great satisfaction to the Committee."

ছোটলাট গ্রে এ বৎসর গ্রন্থাগারের অন্ততর 'বান্ধব' হইলেন। নূতন বাঙালী প্রোপ্রাইটরদের মধ্যে ঈশানচন্দ্র বসু ও জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নাম পাইতেছি। ঈশানচন্দ্র সে-যুগের একজন সাহিত্যিক বলিয়া খ্যাত ছিলেন। জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নাম প্রিন্স অব্ ওয়েলস রূপে সপ্তম এডওয়ার্ডের অভ্যর্থনা-প্রসঙ্গে জড়িত হইয়া আছে। এ বৎসরে গ্রন্থাগারের আর একটি উল্লেখযোগ্য কার্য্য—১৮৬১ সন হইতে ১৮৬৬ সন পর্য্যন্ত যে সকল নূতন পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে তাহার একটি অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ। এইরূপ অতিরিক্ত তালিকা এই দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হইল।

১৮৬৭ সনে ডাঃ আলেকজাণ্ডার চার্লস ম্যাক্রির স্থলে চার্লস সুইণ্টন হগ অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি ঐ বৎসর নবেম্বর মাসে পদত্যাগ করেন। চার্লস বিনি ট্রেভরও এই সনের মার্চ্চ মাসে অধ্যক্ষ পদে ইস্তফা দিয়াছিলেন। সুতরাং ১৮৬৮ সনে পুরাতন অধ্যক্ষ আর্থার জন ব্যতীত ডক্টর জে, ফকাস ও জেম্স এ. ক্রফোর্ড এই পদে নিযুক্ত হইলেন। এবারকার নূতন প্রোপ্রাইটরদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের

(পরে মহারাজা) নাম উল্লেখযোগ্য। এ বৎসরে পঠিত পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা অন্ত সকল বৎসরকেই ছাপাইয়া যায়। মোট ৬১,০৪৮খানা পঠিত হইয়াছিল। সাময়িক পত্রিকা—সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্পর্কিত সমসাময়িক চিন্তাধারার মুকুর-স্বরূপ। শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বিষয়াদিসমূহের ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য উপাদান প্রায়শ: ইহার মধ্যে সংগৃহীত থাকে। এই সময় দেখা যায়, পাঠক-সাধারণ সাময়িক পত্রিকা পাঠে বিশেষ তৎপর হইয়াছেন। এ বৎসরের পঠিত সাময়িক পত্রের সংখ্যা ১৫,৬৯৫।

পর বৎসর, ১৮৬৯ সনে বড়লাট লর্ড মেও গ্রন্থাগারের 'বান্ধব' ও অংশীদার হইলেন। এবারকার নূতন অংশীদারদের মধ্যে ছিলেন বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিতের স্থলে তদীয় পুত্র প্রাণনাথ পণ্ডিত এবং পরবর্ত্তী কালের বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র। পুস্তক-নির্ব্বাচন কমিটিতে এশ্‌লি ইডেন (পরে, ছোটলাট) স্থানলাভ করেন। প্রথম শ্রেণীর ইউরোপীয় গ্রন্থকার ও ঔপন্যাসিকদের পুস্তকসমূহ দুই প্রস্থ করিয়া ক্রয়ের ব্যবস্থা হইল। নূতন করিয়া যে আয়কর আইন বিধিবদ্ধ হয় তদনুযায়ী গ্রন্থাগারের উপরে আয়কর আদায় হইলেও তাহা ফেরত পাওয়া যায়।

বৈতনিক পদ ত্যাগ করার কিছু পরে গ্রন্থাগারের অংশও প্যারীচাঁদ ছাড়িয়া দেন। ১৮৭০ সনে দেখিতেছি, তাঁহার স্থলে বেণীমাধব সেন গ্রন্থাগারের প্রোপ্রাইটর বা অংশীদার হইয়াছেন। প্যারীচাঁদের নামের সঙ্গে লেখা থাকিত, "Merchant and Agent, Calcutta"। তিনি ব্যবসা-কার্য্যেও লিপ্ত ছিলেন। এই সময় গ্রন্থাগার একটি সংস্কৃতি-কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৮৬৭ সনের ২২শে জানুয়ারী প্রতিষ্ঠিত "Social Science Association" বা সমাজ-বিজ্ঞান সভা মেট্‌কাফ হলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্যারীচাঁদ এই সভার অন্যতর সম্পাদক ছিলেন। স্বতন্ত্র আবাসস্থল না থাকায় এখানে প্রায়ই ইহার অধিবেশন হইত।

এই বৎসরে জয়গোবিন্দ লাহা, জগন্নাথ মিত্র এবং ভূকৈলাসের জমিদার সত্যানন্দ ঘোষালও নূতন অংশীদার হইয়াছিলেন। বিলাত হইতে পুস্তকাদি ক্রয় সম্পর্কে নিউম্যান এণ্ড কোং-এর পরিবর্ত্তে থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোং নামক বিখ্যাত পুস্তক-বিক্রেতা কোম্পানীর সঙ্গে নূতন বন্দোবস্ত হইল। দ্বিতীয় অতিরিক্ত পুস্তক-তালিকাও দ্বিতীয় বার মুদ্রিত করিতে হয়।

গ্রন্থাগারের পক্ষে ১৮৭১ সনটি কয়েকটি কারণে স্মরণীয়। এবারে কিউরেটর বা অধ্যক্ষ কমিটিতে প্রথম একজন বাঙালী নিযুক্ত হইলেন। ইনি পূর্ব্বোক্ত ভূকৈলাসের জমিদার সত্যানন্দ ঘোষাল। ক্রফোর্ড এবং ঘোষাল এই দুই জন মাত্র অধ্যক্ষ-সভার কার্য্য পরিচালনা করেন। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল ১৮৭১, ২৩শে আগষ্ট তারিখে, ১৮৬০ সনের ২১শ আইন অনুযায়ী গ্রন্থাগারটি জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীস-এর রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃক রেজিষ্ট্রীকৃত হওয়া। এই আইনবিষয়ক আন্দোলনের মূলে গ্রন্থাগারের বিশেষ কৃতিত্ব থাকিলেও এত দিন পরে ইহাকে পুরাপুরি রেজিষ্ট্রী করিয়া লওয়া হইল। তৃতীয় স্মরণীয় ঘটনা—এতদিন গবর্ণমেণ্ট কোর্ট উইলিয়ম কলেজের যে পুস্তক সংগ্রহ (৪,৭৫০) গ্রন্থাগারের ব্যবহারের জন্ত ধার দিয়াছিলেন, বড়লাট লর্ড মেও তাহা হইতে তিন শত খানা বাদে বাকী সমুদয়ই ইহাকে দান করিলেন।

এ বৎসর বাংলার ছোটলাট স্তর জর্জ্জ ক্যাম্বেল গ্রন্থাগারের নূতন বান্ধব হন। নূতন অংশীদারদের মধ্যে শীলস ফ্রি কলেজের প্রিন্সিপাল যদুনাথ ঘোষের নাম লক্ষণীয়। চাঁদাদাতাদের নিকট হইতে আগাম চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা হওয়ায় তাঁহাদের সংখ্যা এবার বিশেষ হ্রাস পাইল।

১৮৭২ সনে অধ্যক্ষ-সভায় নূতন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন সি. সি. ম্যাক্রি। নূতন অংশীদার হইলেন শোভাবাজারের রাজপরিবারভুক্ত কমলকৃষ্ণ দেব ও নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব। লর্ড মেওর মৃত্যুর পরে ইহার বান্ধব হইলেন বড়লাট নর্থব্রুক। অধ্যক্ষগণ এবারে প্রস্তাব করিলেন যে, প্যারীচাঁদ মিত্রকে ডা: ফ্রেডারিক পেম্বল ট্রেভের মত 'অনারারি প্রোপ্রাইটর' করা হউক। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে এ সম্মান দেওয়া হয় নাই! এবারেও অধ্যক্ষগণ গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংগ্রহ সম্পর্কে এই মন্তব্য করিলেন যে, ইহাকে সর্ব্ববিদ্যার আগার করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্ত, আর এই উদ্দেশ্ত সম্মুখে রাখিয়া সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগীয় গ্রন্থাদি ক্রীত ও সংগ্রহীত হইয়া আসিতেছে। তাঁহাদের এই কার্য্যে প্যারীচাঁদ মিত্র যে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন তাহাও তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। ডেপুটি লাইব্রেরিয়ানের কাজে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া প্যারীচাঁদ স্বয়ং লেখেন:

"The Honorary Curator expresses his indebtedness to him, for his close and unwearied attention to all matters of detail, resulting in important advantages to the Institution."

৩

প্রতিষ্ঠাবধি গ্রন্থাগারের পরিচালনা-ভার তিন জন কিউরেটর বা অধ্যক্ষের হস্তে স্তস্ত ছিল। সময়ে সময়ে মৃত্যু বা পদত্যাগ জনিত শূন্য পদে অংশীদার-সভা নূতন অধ্যক্ষ নিয়োগ করিয়া লইতেন। কিন্তু ১৮৭৩ সন নাগাদ জনমতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং ইহার সুপরিচালনার নিমিত্ত ইহাকে আরও গণতন্ত্রমূলক করিয়া লওয়া হইল। এই বৎসর ১০ই ফেব্রুয়ারী অংশীদার বা প্রোপ্রাইটরদের বার্ষিক সভায় একটি কমিটি গঠিত হইল। ইহার প্রদত্ত রিপোর্ট পরবর্ত্তী ১২ই মে-র

সাধারণ সভায় বিবেচিত হইয়া একটি কাউন্সিল বা অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হয়। বৎসরের অবশিষ্ট কাল এই সভাই গ্রন্থাগারের কার্য্য পরিচালনা করেন। প্রথমে মাসে একবার, পরে দুই মাসে একবার ইহার অধিবেশন হইতে থাকে। প্রথম অধ্যক্ষ-সভা একজন সভাপতি, দুই জন সহঃ সভাপতি এবং এগার জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। সভাপতি হইলেন, জেম্স এ. ক্রফোর্ড, অন্যতর সহঃ সভাপতি হন রমানাথ ঠাকুর। এগার জন সদস্যের মধ্যে বাঙালী তিন জন—জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, জয়গোপাল সেন ও যদুনাথ ঘোষ। পুস্তক-নির্ব্বাচন কমিটি এবং আয়ব্যয় ও গৃহ-পর্য্যবেক্ষণ কমিটির প্রত্যেকটিতে ছয় জন সদস্য ছিলেন। বলা বাহুল্য, ইহাতেও এদেশীয়েরা স্থান পাইলেন।

এ বৎসর বাংলা-সরকার মেট্কাফ হল সংস্কারের জন্য গ্রন্থাগার ও কৃষি-সমাজকে পাঁচ হাজার টাকা দান করেন। আরও উল্লেখযোগ্য ঘটনা—যে-সব অংশ গ্রন্থাগারের সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছিল, এ বৎসরে জানা গেল ১৮৬৭ সন হইতে ১৮৭৩ সনের মধ্যে তাহার অনেকগুলি বিক্রয় হইয়া ইহার হাতে ৫,২৫০৲ টাকা আসিয়াছে। গৃহ-সংস্কার ও ব্যয়-সঙ্কুলানের জন্য সঞ্চিত তহবিল হ্রাস পাইয়া ষোল হাজার টাকায় দাঁড়াইল। উক্ত অর্থ হইতে দেড় হাজার টাকা সঞ্চিত তহবিলে জমা দেওয়া হয়। এবারে আরও দেখিতেছি, প্যারীচাঁদ মিত্র রাধানাথ শিকদারের অংশ ক্রয় করিয়া অংশীদার হইয়াছেন। তাঁহাকে 'অনারারী প্রোপ্রাইটর' করা হয় নাই।

পর বৎসর, ১৮৭৪ সনে বাংলার ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল গ্রন্থাগারের অন্যতর বান্ধব হইলেন। কাউন্সিল বা অধ্যক্ষ-সভার সভাপতি হন ব্যারিষ্টার চার্লস কলিন ম্যাক্রি। সহকারী সভাপতি দুই জনই বাঙালী—রাজা রমানাথ ঠাকুর এবং রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর। এগার জন সদস্যের মধ্যে ছয় জন এদেশীয়, তন্মধ্যে তিন জন নূতন—প্যারীচাঁদ মিত্র, রমেশ-চন্দ্র মিত্র এবং মানকজী রুস্তমজী। গ্রন্থ-নির্ব্বাচন কমিটিতেও প্যারীচাঁদ মিত্র স্থান পাইলেন। এ বৎসরের নূতন সদস্যদের মধ্যে রামবাগানের যোগেশচন্দ্র দত্ত এবং কিশোরীচাঁদ মিত্রের স্থলে নীলমণি দের নাম পাইতেছি।

গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ-সভা ১৮৭৫ সনে সর্ব্বসাকুল্যে পনর জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। নূতন সদস্যদের মধ্যে সুবিখ্যাত ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার হইলেন একজন। শুধু চিকিৎসক রূপেই নহে, ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁহার অদম্য প্রয়াস তাঁহাকে তখন দেশ-বিদেশে পরিচিত করিয়া তুলিয়াছে। পুস্তক-নির্ব্বাচন কমিটিতেও ডাঃ সরকার স্থান লাভ করেন। এ বৎসর তিনি ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অংশও কিনিয়া লন। এযাবৎ গ্রন্থাগার গবর্ণমেণ্ট হইতে কখনও মাসিক বা বার্ষিক কোনরূপ সাহায্য পায় নাই। অথচ এশিয়াটিক সোসাইটি, কৃষিসমাজ প্রভৃতি সংস্কৃতিমূলক ও জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহ বরাবর সরকারী সাহায্যে পুষ্ট হইয়াছে আর এ সময় নানাকারণে গ্রন্থাগারের আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখা, ব্যয়-সংকোচ করা সত্ত্বেও, কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। একারণ এ বৎসর গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষ বাংলা-সরকারের নিকট অর্থসাহায্য চাহিয়া আবেদন করিলেন। গ্রন্থাগারের বান্ধব ছোটলাট স্যর রিচার্ড টেম্প্ল গ্রন্থাগার পরিদর্শনও করিয়া গেলেন, কিন্তু পরবর্তী বিবরণ হইতে জানা যায়, ইহাতে কোনও ফলোদয় হয় নাই।

১৮৭৬ সনে অধ্যক্ষ-সভায় ছিলেন মোট তের জন সভ্য। সহকারী সভাপতি—রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ ও ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। বড়লাট লর্ড লিটন গ্রন্থাগারের নূতন বান্ধব হইলেন। ডাঃ সূর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্ত্তীর স্থলে নবকৃষ্ণ ঘোষ নূতন অংশী হন। ক'বৎসর যাবৎ থ্যাকার স্পিঙ্ক কোম্পানীর উপরে পুস্তক ক্রয়ের ভার ছিল। ১৮৭৬, ১১ই জুলাই হইতে লণ্ডনের মাডিস্ লাইব্রেরির সঙ্গে এ সম্বন্ধে নূতন বন্দোবস্ত হয়। কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী গ্রন্থাগার-ভাণ্ডারে দুই শত টাকা দান করেন। ইহার ব্যয়-সঙ্কোচের জন্য গোপীকৃষ্ণ মিত্র এ বৎসর একাদিক্রমে আট মাস যাবৎ অবেতনে কাজ করিয়াছিলেন। অধ্যক্ষ-সভার পক্ষে সভাপতির পরিবর্ত্তে অন্যতর সহঃ সভাপতি মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ এ বৎসরের রিপোর্টে স্বাক্ষর করেন।

১৮৭৭ সনে গ্রন্থাগারের অন্যতর বান্ধব হইলেন বঙ্গের ছোটলাট স্যর এশ্লী ইডেন। অধ্যক্ষ-সভার সভাপতি হন মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ। এবার একজন মাত্র সহকারী সভাপতি ছিলেন—ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। এ ছাড়া সদস্য ছিলেন মাত্র সাত জন, তন্মধ্যে চার জনই বাঙালী। মেট্কাফ হল মেরামতের জন্য গ্রন্থাগার দেনা পুরাপুরি শোধ করিলেন। এই দেনা শোধ এবং দৈনন্দিন ব্যয় মিটাইতে গিয়া গ্রন্থাগারের সঞ্চিত তহবিল হ্রাস পাইয়া এ বৎসর বার হাজার টাকায় দাঁড়াইল।

গ্রন্থাগার-পরিচালনায় ক্রমশঃ এদেশীয়দের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল। এ বৎসরে অংশীদার ছিলেন সর্ব্বসমেত ৮৬ জন, তন্মধ্যে ৪১ জনই ছিলেন ভারতীয়। ইউরোপীয়গণ ধীরে ধীরে অন্তরালে যাইতে থাকেন। ভারতবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতাও এতদুভয়ের কারণ হইতে পারে। যাহা হউক, এতদিন অধ্যক্ষ-সভার সদস্য-সংখ্যা এগার হইতে পনর'র মধ্যে থাকিতে দেখিয়াছি। এবারে নিয়ম হইল যে, বার জন সদস্য লইয়া অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হইবে, তন্মধ্যে আট জন হইবেন অংশীদার পক্ষে এবং চার জন চাঁদাদাতা পক্ষে। তিন জনে 'কোরাম' হইবে, স্থির হয়। ১৮৭৭ সনের জানুয়ারী মাস হইতে গ্রন্থাগারিক গোপীকৃষ্ণকে

পুনরায় বেতন দেওয়া সাব্যস্ত হয়। তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত ত্যাগের জন্ত তাঁহাকে ধন্তবাদ প্রদান করা হইল।

অধ্যক্ষ-সভা সম্পর্কিত উক্ত নিয়ম বিধিবদ্ধ হইলেও, পর বৎসরে (১৮৭৮) দেখিতেছি মাত্র দশ জন সদস্ত লইয়া ইহা গঠিত হইয়াছে। পুস্তক-তালিকা খণ্ডে খণ্ডে মুদ্রণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এ বৎসরে উপন্তাস-খণ্ড প্রকাশিত হইল, ইতিহাস-খণ্ড মুদ্রণও প্রায় শেষ হইয়াছে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয়। এবারে গ্রন্থাগারের অবস্থা সন্তোষজনক বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। অধ্যক্ষ-সভা সেক্রেটারী ও লাইব্রেরিয়ান গোপীকৃষ্ণের কর্ম্মনৈপুণ্যেরও বিশেষ প্রশংসা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে গ্রন্থাগারের চাঁদাদাতা-সংখ্যা খুবই হ্রাস পাইয়াছিল। ১৮৭৮ সনে ইহা কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইয়া ১৯৮-এ দাঁড়ায়। পর বৎসর এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯২টিতে। এ বৎসরও গ্রন্থাগারের কার্য্য যথাপূর্ব্বং চলিয়াছিল।

৪

দেখিতে দেখিতে আমরা তৃতীয় পর্ব্বের শেষ অধ্যায়ে আসিয়া পৌঁছিতেছি। গ্রন্থাগারে বাঙালী-প্রাধান্ত যে ক্রমশ: প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল সে বিষয়ে একটু পূর্ব্বেই আভাস পাইয়াছি। ১৮৮০ সনে এদেশীয় অংশীদার-সংখ্যা আরও বাড়িয়া ৪৩ জন হইল। সভাপতি ও সহকারী সভাপতি পদে পূর্ব্বের স্তায় মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ এবং ডা: মহেন্দ্রলাল সরকার যথাক্রমে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইঁহারা বাদে এ বৎসরের অধ্যক্ষ-সভার সদস্ত ছিলেন ৯ জন। পাঁচ শত টাকা দিয়া নূতন অংশীদার (আজীবন) হইলেন—বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ আফতাব চাঁদ মহতাব, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংহ ও বঙ্গের অন্ততম প্রসিদ্ধ জমিদার কালীকৃষ্ণ ঠাকুর। কানাইলাল শীল, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এবং সত্যানন্দ ঘোষালও এবার হইতে অংশী হন। গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষ এ বৎসর বাংলা-সরকারের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পুনশ্চ আবেদন করিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে সর্ত্তে সাহায্য দানে সম্মত হন তাহা গ্রন্থাগারের নিয়মতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া এ বিষয় আর বেশীদূর অগ্রসর হওয়া কর্তৃপক্ষ সমীচীন বোধ করিলেন না। পুস্তক-তালিকার উপন্তাস, ইতিহাস ও জীবনী অংশ পুরাপুরি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। এ বৎসর লর্ড রিপণ নূতন বড়লাট হইয়া আসেন। তিনি যথারীতি গ্রন্থাগারের অন্ততর বান্ধব হইলেন। ইহার গচ্ছিত তহবিল পুনরায় কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইয়া ১৮৮০ সনে তের হাজার টাকা হইল।

পরবর্ত্তী দুই বৎসরে (১৮৮১ ও ১৮৮২) গ্রন্থাগারের বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না। সভাপতি ও সহকারী সভাপতি পূর্ব্ববৎ ছিলেন। উক্ত দুই জন বাদে ১৮৮২ সনে অধ্যক্ষ-সভার সদস্ত সংখ্যা দশ জন হইল। এই সনে বঙ্গের নূতন ছোটলাট অগষ্টাস রিভার্স টমসন অন্ততর বান্ধব হন। নূতন প্রোপ্রাইটর বা অংশীদের মধ্যে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা শ্রীরাম-বর্ম্মার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থাগারের অবস্থার বিষয় বিবেচনা এবং ইহার উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণের জন্ত ১৮৮২ সনের সাধারণ সভায় নূতন করিয়া একটি কমিটি গঠিত হইল। মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ সভাপতি এবং দশ জন অংশী ইহার সভ্য ছিলেন। ডা: মহেন্দ্রলাল সরকারও ইহার সভ্যশ্রেণী-ভুক্ত হন। কমিটির রিপোর্ট পরবর্ত্তী ২১শে জুলাইয়ের সাধারণ সভায় বিবেচিত হয়। ইহার সুপারিশ অনুযায়ী গ্রন্থাগারের পুস্তকাদির হিসাব করিবার জন্ত অধ্যক্ষ-সভা টি. এইচ. মেলসন নামে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কার্য্য বেশীদূর অগ্রসর না হইতেই তিনি চলিয়া যান।

১৮৮৩ সনের সর্ব্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা—গ্রন্থাগারের প্রাচীনতম কর্ম্মী ও অধ্যক্ষ-সভার প্রভাবশালী সদস্ত প্যারীচাঁদ মিত্রের মৃত্যু। গ্রন্থাগার-কক্ষে তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব করা হইল। গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষের শোক প্রস্তাবটি এই :

"That the Council deeply deplore the great loss sustained by the Library in the death of their worthy and valued colleague Babu Peary Chand Mittra, and record in this Resolution their sense of the eminent services rendered by him to the Institution in various capacities since its establishment, embracing a period of forty-eight years."

এবারকার অধ্যক্ষ-সভার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। সহকারী সভাপতি হন সত্যানন্দ ঘোষাল। ডা: মহেন্দ্রলাল সরকার এ বৎসর অন্ততম অধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত হইলেন। গ্রন্থাগারের পুস্তকাদি পাঠে জনসাধারণের আগ্রহ বর্দ্ধনের জন্ত এবার একটি অভিনব উপায় অবলম্বিত হইল। ইহার গ্রন্থ-সম্পদ, চাঁদাদানের নিয়ম, গ্রন্থাদির আদান-প্রদানের ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে লাগিলেন।

আমরা বর্ত্তমান আলোচনার শেষ দুই বৎসরের (১৮৮৪ ও ১৮৮৫) কথা এখন বলিব। সভাপতি ও সহকারী সভাপতি বাদে অধ্যক্ষ-সভার দশ জন সদস্ত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে পাঁচ জন বাঙালী। সুতরাং অধ্যক্ষ-সভায় বাঙালীদের প্রাধান্তই সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু এই প্রাধান্ত সরকারের চক্ষে কি ভাবে প্রতীয়মান হইল এবং তাহাতে ইহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষে কিরূপ বাধার সৃষ্টি হইল তাহা পরে আমরা দেখিতে পাইব। এবারেও ডা: মহেন্দ্রলাল সরকার অধ্যক্ষ-সভার সদস্ত ছিলেন। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সাহায্য না পাওয়ায় আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষার্থ গ্রন্থাগারের গচ্ছিত তহবিলের উপর টান পড়িল।

গোপীকৃষ্ণ মিত্র গ্রন্থাগারের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পত্র দিলে ১৮৮৪ সনের ১লা অক্টোবর অধ্যক্ষ-সভা তাহা গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে থোক দুই শত

টাকা 'বোনাস' দেন। ১৮৮৪, ২২ ডিসেম্বর বিশেষ সাধারণ সভায় তাঁহার স্থলে ম্যাথু গ্রেগরী পরীক্ষামূলক ভাবে ছয় মাসের জন্ত নিযুক্ত হইলেন। কি ভিত্তিতে বাংলা-সরকারের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা নির্ণয়ের জন্ত একটি সাব-কমিটিও এই সময় গঠিত হইল। ১৮৮৫ সনে সরকারের সঙ্গে পত্রালাপ চলিল। সরকার প্রস্তাব করিলেন, গ্রন্থাগারটিকে একটি 'ফ্রি পাবলিক লাইব্রেরি'তে পরিণত করিতে স্বীকৃত হইলে অধ্যক্ষ-সভায় আবেদন বিবেচিত হইবে ১৮৮৬ সনের ৩০শে জানুয়ারী সাধারণ সভায় এ বিষয় বিবেচি হইবে বলিয়া স্থির হয়। এই বৎসর অধ্যক্ষ-সভায় মো সদস্য ছিলেন ১৩ জন; সহকারী সভাপতি সত্যান ঘোষালের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পদ শূন্য ছিল। ১৮৬১-৮ সন পর্য্যন্ত নিম্নের পরিসংখ্যান হইতে গ্রন্থাগারের কার্য্যকলা সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা করিয়া লওয়া যায়:

	পুস্তক: গ্রন্থাগারের বাহিরে পঠিত				অংশী	চাঁদাদাতা	গচ্ছিত তহবিল
সন	মনন-সাহিত্য	উপন্যাস	সাময়িক পত্র	মোট			
১৮৬৫	৪,২৪৯	১০,৩৮৭	৮,৭৫১	২৬,৩৮৭	৭৯	৩১০	১৭,০০০
১৮৭০	৬,৫৮৬	১০,০৫২	৯,৫৪৫	২৬,১৮৩	৮৫	২৩৩	১৬,০০০
১৮৭৫	৪,৮৭৯	৮,১৮৩	৯,৮৩৬	২২,৮৯৮	৮৭	১৫৮	১৫,৫০০
১৮৮০	৩,৬২০	১২,৯৯৪	১৩,৭৬৩	৩০,৩৭৭	৮৯	১৮০	১৩,০০০
১৮৮৫	৪,৮০০	৯,২৭৫	১১,৪৫৫	২৫,৫৩০	৮৪	১৬৭	১১,০০০

রাজর্ষি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

আবার এসেছে ফিরে সেই জন্মদিন,
ললাটে অঙ্কিত তার মৃত্যুঞ্জয়ী কালের স্বাক্ষর।
সূর্য্যের প্রখর দীপ্তি মেঘপুঞ্জে লীন।
কাল-বৈশাখীর কণ্ঠে নামাঙ্কিত রুদ্রাক্ষের মালা।
একদা মৃত্তিকা যারে শ্যামৈশ্বর্য্যে সর্বস্ব ভুলায়ে;
ব্যগ্র বাহু-আলিঙ্গনে করেছিল হৃদয়ে ধারণ;
পার্থিব এ জন্মদিন নয় নাই বিস্মৃত সে
মুহূর্ত্তে ক্ষণ,
মাটিতে আকীর্ণ তার জন্মাবধি সঞ্চয়ের রত্নকোষ
বাহুল্যবিহীন।
রাজর্ষিরে বক্ষে ধরি স্মরণীয় এই জন্মদিন,
সেই ত রাজর্ষি যে ঐশ্বর্য্যের পদ্মপুটে রহি অচঞ্চল,
নিষ্কলুষ প্রেম-মন্ত্রে উজ্জীবিত করে পৃথ্বীতল।
সাধন-আশ্রমে তার বিশ্বের সৌন্দর্য্য-তৃষা সঙ্গীতের
সঙ্গমে বিলীন।
ধরিত্রীর হৃৎপিণ্ডে কণ্টকিত সমৃণাল রক্ত-শতদল,
সেই ত মর্ত্ত্যের তীর্থে সিদ্ধ ঋষি চির নিঃসম্বল।
তাই ত এ জন্মদিন বৈশাখের মেঘমন্দ্রে বাণীময়
অবিস্মরণীয়।
প্রথম সে পৃথিবীর অন্তহীন সূর্য্যোদয়,
প্রসন্ন পরমতম অনির্বচনীয়।

সন্ধ্যা

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

মুখর দিনের শত কল্লোল সমাধি লভিছে ধীরে,
মরণ-পথের যাত্রীর যেন থেমে আসে স্পন্দন;
ওপারে নামিছে সন্ধ্যার ছায়া দিনের সাগর-তীরে,
অস্ত আকাশে তখনো থামে নি আলোকের ক্রন্দন।
দূর প্রান্তরে, বিজন কাননে, নীরব আকাশ ছেয়ে,
ধীরে ধীরে নামে কাজল রাতের সুনিবিড় যবনিকা,
আকাশে বাতাসে পূরবীর সুরে কে যেন চলিছে গেয়ে,
নয়নে বুলায় জানি না সে কোন্ সন্ধ্যার স্বপনিকা।
ঝিল্লীর রবে ঘন হ'য়ে আসে আরো যেন নীরবতা,
জোনাকি আলোয় কথা কয় যেন অতীতের শত স্মৃতি;
উদাসিনী রাজকন্যার যেন কত গীতি কত কথা,
ভুলে-যাওয়া কোন্ ইতিহাসে তোলে নূতন জীবন-গীতি।
সুদূর অতীত কাছে আসে যেন চেয়ে থাকি অনিমিখ,
কত চেনা মুখ হাতছানি দেয় হৃদয়ের কিনারাতে;
আজ দেখি হায় তামসী ছায়ায় ভ'রে গেছে সবি দিক,
আগামী দিনের পরিচয়হীন অজানার ইসারাতে।
মৌন অতীত মুখর হয়েছে সন্ধ্যার ছায়া লভি',
নিষ্প্রাণ জড়ে জাগিল যে প্রাণ অযাচিত করুণায়,
নীরব, নিথর হৃদয়ে আমার চঞ্চল আজি সবি,
ভুলে-যাওয়া যত অশ্রু-হাসির মিলনের মোহানায়।
জীবন ভরিয়া এসো তুমি আজ সুন্দরী বিভাবরী,
তোমার রূপের কাজল-মাধুরী ছড়াক তড়িৎ-শিখা,
কত না শান্তি, কত না বিরতি এনেছ আঁখিতে ভরি'
অনাগত আর অতীতের পাতে তাই তুমি সমাপিকা।

বন্দী যারা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

রাত্রিতে শোবার সময় প্রভাত মাকে ডেকে বললে, মা, কাল আমার নেমন্তন্ন আছে—সন্ধ্যের।

কোথায় রে? মা আগ্রহভরে শুধালেন।

অনিমেষদের বাড়ীতে।

কেন রে?

প্রভাত হাসল, বা রে—জান না? তবে আজ সকালে সিদ্ধেশ্বরীর পুজো দিয়ে এলে কেন—আসছে পূর্ণিমায় সত্য-নারায়ণ মানত করলে কেন?

ও—অনিমেষও বুঝি পাস করেছে? তা তোর চেয়েও ভাল করে পাস করেছে বুঝি—তাই এত ধুমধাম!

প্রভাত হাসির জের টানলে, আমি যদি ওর চেয়েও ভাল করে পাস করতে পারি ত কত ধুমধাম করতে পার তুমি? কত লোক খাওয়াবে—ক'দল বাজনা বায়না দেবে?

এই পরিহাসে মায়ের মুখ অবশ্য ম্লান হ'ল না। উজ্জ্বল মুখেই বললেন, 'ভগবান দিন দিলে মানুষের সাধ-আহ্লাদ কি মেটে না রে—খুব ভাল ভাবেই মেটে। আর চিরদিন সকলের সমান যায় না।" শেষের কথাটি মায়ের মুখে মিলিয়ে গেল। প্রভাতের মনে হ'ল—অত্যন্ত সন্তর্পণে একটি নিঃশ্বাসও ওই সঙ্গে বুকের মাঝে টেনে নিলেন তিনি।

মা চলে গেলে প্রভাত আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। ছোট ঘর—একরাশ বই আর একরাশ নিত্য প্রয়োজনীয় সাংসারিক জিনিষে ভর্ত্তি। খোয়া-উঠা মেঝে—নোনা-ধরা দেওয়াল—জানলার কবাট অক্ষত নয়—চৌকাঠ নড়বড় করছে। জীর্ণ কড়িকাঠে আটকানো অনাবৃত টালিগুলির কাটা স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু অন্ধকারের একটা সুবিধা এই—সব জিনিষের উপর আবরণ বিছিয়ে রাখে। যা মনকে টানে—যা চোখে জ্বালা ধরায়—দু'য়ের উপর ওর সমান দাক্ষিণ্য। দৃশ্যের ক্ষত ঢেকে কল্পনার উজ্জ্বল রঙে সব কিছুকেই ও চিত্তরোচক করে তোলে। এই আবরণের মধ্যে প্রতি রাত্রিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলে প্রভাত। সঙ্কীর্ণ ঘরের পরিধি ঘুচিয়ে সীমাহীন পৃথিবী কখন ওকে কোলে তুলে নেয়। সেই পৃথিবীতে যাঁরা প্রাণ-লীলায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেন—তাঁরা ওরই মত বিত্তহীন ঘরের মানুষ—অথচ পৃথিবীর ইতিহাসে মৃত্যুহীন মহিমায় ভাস্বর হয়ে রয়েছেন। ওঁদের সুকঠোর তপস্যাকাহিনী ওকে লুব্ধ করে ব্রতকামী সাধক-গোষ্ঠীতে তুলে ধরবার জন্য।

ও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে—যে পথে জানাশুনা আত্মীয়-পরিজন চলেছেন—চলেছেন নামহীন ধূলিকণার মত, দারিদ্র্য-কষাহত ভারবাহী পশুর মত, সংসারে গ্লানির বোঝা জমিয়ে—ভীরুর মত আত্মসমর্পণের কালিমায় মাথা নীচু করে চলতে চলতে চরম বিলুপ্তির অন্ধকারে প্রতিদণ্ডে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন—সে পথ ও নেবে না। ওই পরাজয় থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য অন্ততঃ চেষ্টা করবে। ও চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করবে—জীবনকে রক্ষা করবার জন্য অত্যন্ত সুলভ মূল্যে নিজেকে বিকিয়ে দেবে না। না, চাকরি ও করবে না। অন্ততঃ বাপের মত চাকরি—যা সংসারের আর্ত্তি ঘোচাতে আর্ত্তনাদকেই করে প্রবলতর। যে জীবন যাপনের মধ্যে কোলাহল প্রচুর—অসম্মান প্রভূত এবং শুধু বেঁচে থাকার গ্লানিতে সংসার ও জীবন হয়ে ওঠে কুৎসিত।

কিন্তু এই ঘরে অন্ধকারের আস্তরণ একটু পরেই পাতলা হয়ে ওঠে। জানালার বাইরেকার সরকারী আলো ও অদূর-বর্ত্তী সৌধের আলো দিগ্বিজয়ের বার্ত্তা পাঠিয়ে ওকে চঞ্চল করে তোলে। ওই অপ্রশস্ত পথের ঠিক দক্ষিণে ঝকঝকে তিনতলা বাড়ীখানা বিস্তীর্ণ পৃথিবীর আভাস এনে দেয়। সে পৃথিবীকে কল্পনায় ও সৃষ্টি করে চলেছে—অবসরক্ষণে।

ওই বাড়ীটাই অনিমেষদের। ওর সঙ্গে বন্ধুত্বও কয়েক বছরের। ওরা আসার দিনকয়েক পরেই অনিমেষ ভর্ত্তি হ'ল প্রভাতদের শ্রেণীতে। পাশাপাশি বসে···ওদের ভাব জমে গেল এবং সে ভাব খাঁটি বন্ধুত্বে পরিণত হ'ল। পদ-মর্য্যাদার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় নি বলেই হয়ত এই অন্তরঙ্গতা। ক্রমে স্কুল সীমানা ছাড়িয়ে কলেজে এল ওরা। কলেজে এসে একজন নিল সায়ান্স—একজন আর্টস্।

প্রভাত বললে, আমার দৃষ্টিকে যা ভোলায়—তাতেই আমার আনন্দ। পাপড়ি, রং, গন্ধ আর সজ্জা সব মিলিয়ে ফুলের এই রূপটিই আমার কাছে সার্থক।

অনিমেষ বললে, কিন্তু বিজ্ঞানীর দৃষ্টি না হলে সত্যকারের রূপে পৃথিবীকে পাবে না। চোখের মোহ জীবনকে প্রতি পদে ঠকায়।

বেশ ত—বিজ্ঞানের সাধনায় তুমি হয়ে ওঠ অমর—আর আমি নাম কিনব কাব্যের সাধনায়।

'কাব্য'! অনিমেষ শব্দ করে হেসে উঠল, পৃথিবীতে গুণ-গ্রাহী রাজার সংখ্যা কমে আসছে; কাব্য শোনার অবসরও মানুষের কম। তোমার জন্য দুঃখ হয় প্রভাত।

প্রভাত দুঃখিত হয় নি। ও বেশ বুঝেছে—বিজ্ঞানের সাধনায় দেশ-দেশান্তর ভ্রমণের রসদ সংগ্রহ করার সাধ্য ওর নেই—দেশ-বিদেশের মনীষীদের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য ওর ঘটবে না, কিন্তু পৃথিবীকে অক্ষরের ছাঁদে বন্দী

করে, আর মনীষীদের চিন্তাসম্পদকে সেই পাত্রে আস্বাদ করে ও বড় হয়ে যেতে পারবে। দূরকে অন্তরে বসাবার এমন সহজ উপায় বুঝি আর নেই।

কিন্তু নোনাধরা দেওয়ালের মাঝে যাঁরা বাস করেন, তাঁদের মনের একটি দুয়ার ছাড়া আর সব যে অর্গলাবদ্ধ—এ তথ্য ও ভালমতেই জানে। বাবাকে ও মনে মনে যথেষ্ট ভয় করে।

ঘুম ভোরে বাবার মুখ ধোয়ার শব্দে ওর ঘুম ভেঙে যায়। শুধু বাড়ীটা নয়—সে শব্দে পাড়াটা পর্য্যন্ত উচ্চকিত হয়ে উঠে। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে ওর বাবার প্রতিটি কাজ যেন বাঁধা। প্রাতঃকালীন চা তামাক খাওয়ার পর—সাতটা পঁয়ত্রিশে বাজার যাওয়া—আটটা এগারোয় ফিরে আসা; বাজারের থলিটা রান্নাঘরে আছড়ে ফেলে তেলের বাটিটা টেনে নেওয়া ও অশ্বত্থামাকে তিন বার তেলের ছিটা দিয়ে তৃপ্ত করে নবগ্রহের স্তোত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে কলতলায় নেমে কয়েক বালতি জল মাথায় ঢালা—কোন দিনই এর ব্যতিক্রম দেখে নি। হ্যাঁ—ব্যতিক্রম হয় রবিবারে আর ছুটির দিনে। সে সব দিন নিয়ম-লঙ্ঘনের পালা। অন্ত বারে পৌনে ন'টায় খেতে বসে ন'টায় খাওয়া শেষ করার জায়গায়—ছুটির দিনে বেলা দুটোয় খেতে বসে তিনটের আঁচানো বড় রকমের ব্যতিক্রম। অন্ত দিনের তুলনায় পূজাপাঠ, জপ-ধ্যানের ঘটা ও স্থিতিকাল লক্ষণীয়। কিন্তু মাসের পর মাস—বছরের পর বছর এই ব্যতিক্রমগুলিও বাঁধা নিয়মের মত বৈচিত্র্যহীন। তেমনি বৈচিত্র্যহীন আহার; বৈচিত্র্যহীন একই লেপ, তোষক, বালিশ, মশারির আশ্রয়ে নিদ্রার আরাধনা। এই সময়েই বাড়ীর লোকগুলি কে কেমন আছে—কার কিছু প্রার্থনীয় আছে কিনা—সংসারে কোন্ জিনিসের অনটন—এই সব সংক্ষিপ্ত সমাচার সংগ্রহ করা। এর মধ্যে বৈচিত্র্য আছে—যেদিন ঘুমাতে ঘুমাতে হঠাৎ উঠে বসে জ্ঞানের রাজত্বে ফিরে আসার আকুল চেষ্টা এবং নিদ্রার ফলে বিচিত্র সব দৃশ্য দেখে বিচিত্র স্মৃতির স্ফুরণে মনে হয় অনাস্বাদিতপূর্ব্ব পুলক-সঞ্চার। কে জানে সেই স্বপ্ন-দৃষ্ট কল্পলোক মনের অবচেতন অংশের ক্রিয়া কিনা। তারা প্রায়ই আসে এবং গতানুগতিকতার মাঝে বিপ্লব বাধিয়ে প্রভাতকে অধীর করে তোলে।

বি-এ'র ফলাফল জানবার জন্ত এই ক'দিন বাবার আগ্রহ ওকে কম বিস্মিত করে নি। কিন্তু পরশু রাত্রিতে পাশের ঘরে শুয়ে ওঁরা যে সুখচিত্র আঁকছিলেন—তা প্রভাতের বিস্ময়কে রূপান্তরিত করেছিল প্রতিবাদে। ও সজোরে দৃঢ় হয়ে উত্তেজনায় উঠে বসেছিল বিছানায়—আপন মনে বার বার ঘোষণা করেছিল, না, না, না।

কেন ও চাকরি নেবে? দাসত্বরা জীবনের প্রাত্যহিক ব্যর্থতা সে কি প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ করছে না? এই কোলাহল—এই হাহাকার—এই অশান্তি এরই মধ্যে নির্ব্বিচারে করবে আত্মসমর্পণ? কোনমতেই নয়।

২

সকালে অবশ্য বাবা কিছু বলবার অবসর পেলেন না ভাগ্যিস ওঁর রুটিন-বাঁধা কাজের চাপে নিশ্বাস ফেলবার সুযোগ নেই।

লক্ষ্মী বললে, দাদা—বেরুবে কি?

কেন?

আমার দুটো ক্লিপ এনে দেবে?

আচ্ছা।

কালও তো বলেছিলে দেব—তারপর ভুলে গেলে।

আজ ভুলব না।

আচ্ছা বড়দা—। লক্ষ্মীর আগ্রহ-আকুল কণ্ঠ শুনে প্রভাত ভাল করে চাইলে ওর দিকে। চোখে মুখে লক্ষ্মীর অপূর্ব্ব প্রসন্নতা—একটা ছেলেমানুষি ভাব—কেমন নোতীর মত আবদারের আলো ওর মুখখানিকে মেদুর করেছে। কিন্তু কতই বা বয়স লক্ষ্মীর—ও ছেলে মানুষই তো। সংসারের কাজের চাপ ওকেও কম ক্লিষ্ট করে না। ওর বাপের ফরমায়েসের অন্ত নেই—প্রভাতও কি কম জুলুম করে। কাপড় জামা কেচে গুছিয়ে রাখা, পান সাজা, বাসন ধোয়া, চায়ের ল্যাঠা চোকানো, জুতোয় কালি মাখানো—এসব করেও রান্নার কাজে মায়ের সাহায্য করে। আর ছোট ভাই-বোনের আব্দার সামলানো। একখানি আধময়লা সেলাই-কণ্টকিত কাপড় পরে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বড়দের হুকুম তামিল ও ছোটদের সেবা করেই চলেছে, কোন দিন বলে নি—পারব না। ওর মুখে হাসির অভাব নেই তবু আর পাঁচটি মেয়ের মত ও প্রাণ-চঞ্চল নয়। আর পাঁচটা মেয়ে যেমন গল্প পেলে কাজ ভুলে যায়—কাজের কথা ডিঙিয়ে অবান্তর বিষয় নিয়ে মেতে ওঠে—বার বার আরশির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়—শাড়ীর ভঙ্গিমায় দেহের ভঙ্গিমাকে ফুটিয়ে তোলার জন্ত প্রাণান্ত পরিশ্রম করে—অর্থাৎ নিজের সম্বন্ধে একটা সদা-সতর্ক ভাব এ যেন লক্ষ্মীর স্বভাবে নেই। এইজন্ত যৌবনের জোয়ার নামলেও কলধ্বনি জাগে নি সেখানে।

একটু থেমে লক্ষ্মী বললে, আচ্ছা বড়দা—চাকরি পেলে আমার একটা জিনিস দেবে?

চাকরি!

বা: রে—পাস করলে চাকরি পাবে না?

প্রভাত হেসে বললে, যদি না পাই?

যাও—আমাকে রাগিও না বলছি! কৃত্রিম কোপে লক্ষ্মী মুখ ফেরালে।

শোন্—শোন্—প্রভাত অনুনয় করলে। আর যদি চাকরি না করি!

লক্ষ্মী অবাক হয়ে প্রভাতের পানে তাকালে। প্রভাত মিটমিট হাসছে। দুষ্টুমি সুরু করেছে আবার।

ও মায়ের কাছে ছুটে চলে গেল। প্রভাত শুনলে—লক্ষ্মী মাকে বলছে, মা, দাদার চাকরি হলে আমি কি নেব—জান?

মায়ের স্বর (সে স্বরেও খুশীর আমেজ) শুনলে প্রভাত, দাঁড়া বাপু—আগে হোকই চাকরি। তোদের তো গাছে না উঠতেই এক কাঁদি!

—লক্ষ্মী বললে, কেন হবে না চাকরি—দাদা কম বিদ্বান নাকি?

আহা, তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। উনি আর কত দিক দেখবেন, প্রভাতের চাকরি হলে তবু—

প্রভাত সরে গেল সেখান থেকে। ও জানে সংসারকে কেন্দ্র করে মায়ের কল্পনাজাল বোনার বিরাম নেই। পড়শীদের সুখসমৃদ্ধির অংশগুলি নিয়ে নিজেদের পরিপূর্ণ করার বাসনা শুধু কি সুনয়নীরই একা? এই পৃথিবীতে ভালবাসা আর হিংসা একই জিনিসের এপিঠ ওপিঠ বললেও অত্যুক্তি হয় না। নিকটতম প্রতিবেশীকে নিয়ে আলোচনা উত্তাল হয়—ওই দুটি বৃত্তির প্রকাশও উগ্র হয়ে ওঠে। তা তো হবেই। প্রতিবেশীরা তো শুধু প্রাণীই নয়—বস্তু-প্রকাশের পটভূমিও যে। সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার রঙে রঙে তাদের মনের মত করে গড়ে নিতে হয়। তাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে ছেলেদের উচ্চাভিলাষের সীমাকে খণ্ডিত করতে হয়—তাদের দৃষ্টান্তে ইহলোক ও পরলোকের নীতিধর্ম নিয়ন্ত্রিত করা সহজ।

এমন কথা ভূভারতে কেউ শোনে নি। দেখ দেখি চার দিকে চেয়ে—কোন্ ছেলেটা না কাজ করছে। কথায় বলে না—নির্ধনের আদর নেই—চাকরি না করলে কেউ শুধোবে না, কেমন আছ?

এমনি সব কথা বহুবার শুনেছে প্রভাত—যখন আই-এ পাস করার পর চাকরি নেবার তাগিদ এসেছিল ওঁদের তরফ থেকে।

বাবা বলেছিলেন, আমাদের ঘরে এই যথেষ্ট—আর পড়ে কি লাভ?

প্রভাতের সম্বন্ধে (ওঁদের মতে একগুঁয়েমি) ওঁরা যথেষ্ট মনঃপীড়া লাভ করেছিলেন।

কি বলব দিদি বল—উপযুক্ত ছেলে—ও যদি না সংসারের দুঃখু কষ্ট বোঝে—

প্রভাতের ইচ্ছা হয়েছিল প্রতিবাদ করে বলে, দুঃখকষ্ট বোঝাবার জন্যই কি তোমরা স্নেহ দিয়ে, আদর দিয়ে আমায় বড় করে তুলেছ? যে সমুদ্রে তোমরা পেতেছ শয্যা—তারই তরঙ্গ-বাহু দিয়ে আমাকেও টেনে নিতে চাইছ তার গভীরে? এরই নাম সংসার-ধর্ম? উত্তরাধিকারসূত্রে আমার ঘাড়ে দারিদ্র্য চাপিয়ে দিয়ে কি লাভ তোমাদের। হাসি পায় প্রভাতের যখন ওঁরা বলেন, দারিদ্র্যের মধ্যে মহত্ত্ব আছে—এ কথা তুই মানিস নে? আমরা হিন্দুরা অন্ততঃ মানি দারিদ্র্যে অসম্মান নেই।

কেন নেই? কি সে বস্তু যা দিয়ে সম্মানের মানদণ্ড নির্ণীত হয়?

হয়ত বহুযুগ আগে—আর্য্যভারতে বেদ-উপনিষদের যুগেই হবে—যখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য মানুষ সংসারপ্রান্তে আশ্রমের সৃষ্টি করেছিল।

পরাবিদ্যা অর্জ্জনকে তারা তখন মনে করত জীবনের সর্ব্বোত্তম সঞ্চয়। অগ্নি, বায়ু, জল, মৃত্তিকা, ব্যোম এই পঞ্চভূতের আধারভূত বস্তু থেকে স্রষ্টার স্বরূপ নির্ণয়ে—স্বাধ্যায় পূজা ধ্যান ধারণা জপে মনঃসংযোগ করেছিল অসীম নিষ্ঠায়। কিন্তু জীবনযাপনের ধারা সেদিন ত জটিল ছিল না। ক্ষত্রিয়ের বীর্য্য পৃথিবী-শাসনের দায়িত্ব নিয়েছিল, বৈশ্যের বুদ্ধিবৃত্তি জন ও জনপদের সমৃদ্ধিসাধনায় ছিল নিয়োজিত আর শূদ্রের সেবা ও সততায় বসুন্ধরা হয়েছিলেন শস্যপূর্ণা। গুণ কর্ম্ম জ্ঞান অনুসারে এক একটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। আর এই সমস্ত শ্রেণীর একত্রীভূত নিষ্ঠা ও সেবা হয়েছিল সমাজ-গঠনের সহায়ক। সে বহু শতাব্দী পারের কথা। জীবন-ধারণের পথে এর পর যত বৈচিত্র্য জমতে লাগল—সমস্যাও হতে লাগল তত জটিল। যেন একটি সোজা দড়িতে গ্রন্থির পর গ্রন্থি পড়তে লাগল। সে গ্রন্থি যতই উন্মোচিত হয় ততই সৃষ্টি হয় নূতন গ্রন্থির। সমাজগত আচার-আচরণের সাদৃশ্যে জমাট বাঁধতে লাগল এক-একটি জাতি। জাতির মানদণ্ড তুলে ধরলে সভ্যতা। এই সভ্যতা থেকে গৌরববোধ—আভিজাত্য জাত্যাভিমান। এল রাজ্যলিপ্সা—প্রভুত্ব—প্রভুত্ব থেকে দ্বন্দ্ব; দ্বন্দ্বের উপকরণ তরবারি—শৃঙ্খল—বশ্যতা স্বীকার করানো। এরা বহন করে আনলে ঘৃণা—বিদ্বেষ—অশান্তি। শোণিত-পাতের নিষ্ঠুরতা সৃষ্টির সর্ব্বাঙ্গে ছিটিয়ে দিলে কাদা আর কালি। এমনি করে কালের তরঙ্গ এসে পড়ল বর্ত্তমানের কূলে। ঊর্ম্মিমুখরিত এই বর্ত্তমান…

দেশে স্বাধীনতার আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছে। এর বর্দ্ধিত বেগকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়—ইংরেজ স্বাধীনতা দেবার আয়োজন করছে। চলছে নানান টালবাহানা। গেল বারে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম-দিবসে যে আগুন জ্বলেছিল তা তুষের আগুনের মত এখনও জ্বলছে দেশের সর্ব্বত্র। নোয়াখালি, বিহার, কলিকাতা—সারা ভারতবর্ষে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়েছে—গৃহবিচ্ছেদ আসন্ন। সুখের চেয়ে শান্তি ভাল এই নীতি কন্যাকুমারিকার অগ্রবিন্দু থেকে হিমালয়ের শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত। হয়ত ঘর ভাঙবে এবং স্বাধীনতাও আসবে, আর সেদিন ভারতের যুবশক্তির দায়িত্ব বহু গুণ বেড়ে যাবে।…

'আরে প্রভাত যে—চলেছিস কোথায় ?' অমলেন্দু দ্রুত এসে ওর কাঁধে হাত রাখলে। 'দু-তিন বার ডাকলাম—শুনতে পেলি নে। চল—গোলদীঘিতে গিয়ে বসি।'

দু'জনে গোলদীঘির বেঞ্চে বসে স্বাধীনতা-প্রাপ্তির আলোচনায় মেতে উঠল।

প্রভাত বললে, স্বাধীনতার দিনে এমন একটা সঙ্কল্প নেব আমরা যাতে জাতির সম্মান বাড়ে।

অমলেন্দু বললে, কি সঙ্কল্প ?

প্রভাত বললে, তার আগে স্বীকার কর কি না আমাদের যথেষ্ট নৈতিক অধঃপতন আরম্ভ হয়েছে ?

যথা ?

এই কালোবাজারের কথাই ধরা যাক।···মানুষের সঙ্গে মানুষ সহযোগিতা করতে ভুলে যাচ্ছে। তুমি মরবে জেনেও আমি ব্যাঙ্কের খাতার মোটা অঙ্ক তুলবার চেষ্টা ছাড়ছি না। পঞ্চাশের মন্বন্তর থেকে এর সুরু হয়েছে—

সে ছিল বিদেশী গবর্ণমেন্ট।

আমাদেরও বিশ্বাস নেই। ডেলফির মন্দিরে একটি প্রবাদবাক্য আছে জানো ত, মানুষকে যদি সত্যি করে জানতে চাও ত তার হাতে আগে দাও ক্ষমতা।

এ সন্দেহ হবার কারণ ?

কারণ মহাত্মা গান্ধীর মত—রাষ্ট্র স্বাধীন হলে কংগ্রেস লোপ করতে হবে। দলনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়ে না উঠলে দেশের মঙ্গল নেই।

তাই কি বলেছেন উনি ?

সমাজকল্যাণ নিয়ে থাকার অর্থই তো হ'ল রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান। ক্ষমতার বিষ মানুষকে যখন আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন—

অমলেন্দু বললে, ও সব বড় বড় কথা থাক—আমরা এ বিষয়ে কি করতে পারি ? ধর কংগ্রেস রইল—রাষ্ট্রের সঙ্গে রইল তার অখণ্ড যোগ—আমরা পারব কি তাকে সমাজের দুর্নীতি দূর করবার কাজে সচেতন করতে ?

জানি না—কি আমরা পারব—সারা ভারতবর্ষের কথাও ভাবছি না—কিন্তু নিজের এলাকায়—আমরা যদি ইচ্ছা করি তো দূর করতে পারি না কি এ সব অনাচার ? ধর—কালোবাজারের কাপড়—ধর চিনি—কেরোসিন তেল—লোহা-লক্কড় —আহারের—বাসের নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিস—এ সব বিষয়ে কিছু সুবিধাও কি করতে পারব না ?

অমলেন্দু উৎসাহিত হয়ে বললে···তা যদি করতে পারি তো স্বাধীনতালাভের অর্থ কিছু হয়। বেশ, কাল দুপুরেই আমার বাড়ীতে সবাই মিলব। সুবোধ—অনিল—শশাঙ্ক—সবাইকে খবর পাঠাব।

হাঁ—স্বাধীনতা-দিবসে এমনধারা একটি পন্থা বেছে নিতে হবে যাতে করে দেশের গৌরব দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে শুধু সম্মান পেয়েই নিশ্চিন্ত হলে তো চলবে না—সে সম্মানকে ভালবাসতে হবে সর্বান্তঃকরণে। ভিতরে বাইরে—ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ—সমস্ত আচার-আচরণে—সব সময়ে—রক্ষা করতে হবে জাতির গৌরবকে—

গাছের ছায়া সরে গেছে কখন। রৌদ্রের প্রখর তাপ অঙ্গ স্পর্শ করতেই অমলেন্দু বললে, আর নয় ওঠা যাক।

প্রভাত বললে, আমাদের সমিতিটাকে ভাল করে গড়তে হবে।

নিশ্চয়।

একজন ভিখারী এসে হাত পাতল। পকেটে হাত দিয়ে প্রভাত একটু চমকে উঠল—শূন্য পকেট। তার নিজের সামর্থ্য কতটুকু—দয়াবৃত্তির অনুশীলন বা স্নেহপ্রকাশ কোনটারই সুযোগ তার ঘটবে না। সত্য—উপার্জন না করলে নিজের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়া সম্ভব নয়। তবে কি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে সে ? বিবমিষার একটা উত্তাল তরঙ্গ শরীরের শোণিতস্রোতে দ্রুত প্রবাহিত হ'ল।

অমলেন্দুকে বললে, আনা চারেক পয়সা হবে তোর কাছে ?···ধার চাইছি।

অমলেন্দু একটা সিকি তার হাতে দিয়ে বললে, সুদ লাগবে মনে থাকে যেন।

৩

বাড়ি পৌঁছতেই মা বললেন, ওরে একখানা চিঠি এসেছে বলাগড় থেকে—শোভার শ্বশুর দিয়েছেন।

কি লিখেছেন ?

কি জানি বাপু। হেঁসেলের পাট সারতে পারি নি তা চিঠি দেখব কখন। মেয়েকে কখন থেকে বলছি—ওরে চিঠিখানা পড়ে শোনা—পড়ে শোনা—তা মেয়ে সেই যে সাবান নিয়ে ঢুকেছেন কলতলায়।

একখানা পিঁড়ির ওপর একরাশ কাচা কাপড় নিয়ে লক্ষ্মী কলতলা থেকে উঠে এল। এখনও ওর স্নান সারা হয় নি। মুখখানি ঘামে তেলে চটচট করছে—কয়েকগাছি চুল কপালে ও গালে লেপ্টে রয়েছে। পরনের কাপড় ময়লা ও আধভিজা —সমস্ত ভঙ্গীতে ক্লান্তি মাখানো। বাইরে এসে ও হাসিমুখে বললে, দিদি—কেমন আছে মা ?

মা মুখঝামটা দিয়ে উঠলেন,—দিদির খবর নেবার জন্য তোমার ত আহার-নিদ্রে ত্যাগ হয়েছে বাছা ! যাও—কাপড়গুলো ছাদে মেলে দিয়ে কলতলাটা খালি করে দাও। আমার কাপড় কাচতে হবে না ?

ভিজা কাপড়সুদ্ধ পিঁড়িখানা দু'হাতে কোলের কাছে সাপটে ধরে লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে রইল। প্রভাত তখন চিঠিখানা পড়ছে :

বকারো 'পাওয়ার হাউসে'র মেঝের নির্ম্মাণ-কার্য্য

জমির ক্ষয় প্রতিরোধ এবং জলসেচের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত "আদিবাসী বাঁধ"

উত্তর দামোদর-উপত্যকায় জমির ক্ষয়

দামোদর-উপত্যকায় আবহাওয়ার দরুন সৃষ্ট খোয়াই

'বেয়াই মশাই, বহুকাল যাবৎ আপনাদের কোন সংবাদ না পাইয়া যারপরনাই ভাবিত আছি। পত্রপাঠ আপনাদের কুশল দানে চিন্তা দূর করিবেন। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে এ বাটির প্রাণগতিক সব কুশল। পত্রোত্তরে জানাইতেছি যে, কল্যাণীয়া বধূমাতাকে এই মাসে পাঠাইবার ইচ্ছা থাকিলেও উপায় নাই। আপনার বেয়ানঠাকুরাণী বলিতেছেন, লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় বধূমাতা সন্তান-সম্ভবা। এটি জোড়া মাস বলিয়া পাঠাইতে বাধা আছে। আর একটি কথা, এবার জামাইষষ্ঠীতে সতু যাইতে পারিবে কিনা জানি না। আপনার বেয়ানঠাকুরাণী বলিতেছেন, জামাই না থাকিলেও তত্ত্বটা আশা করি বেয়াই মহাশয় যথাসময়ে পাঠাইয়া দিবেন। গেল দোলে তত্ত্ব করেন নাই, সেজন্য পাড়ায় মুখ দেখানো ভার হইয়াছে। তিনি বলেন, এ তো আর পরকে দেওয়া নয়, নিজের মেয়ে-জামাইকে দিবেন —যত দিবেন—

লক্ষ্মী অধৈর্য্য হয়ে বললে, বাবা—বাবা—খালি তত্ত্বের কথা সাত সুতি। দিদি কেমন আছে—

প্রভাত হেসে বললে, ওই তো লিখেছেন—ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে এ বাটির প্রাণগতিক সব কুশল। শোভা কি 'এ বাটি' ছাড়া ?

মা বললেন, যাই বল বাপু ওদের কেবল দেহি দেহি রব। বিয়ে হয়ে ইস্তক এটা দাও ওটা দাও—কোন জিনিস যেন পছন্দই হয় না।

প্রভাত বললে, তবু বিয়ে না দিয়ে তো উপায় নেই।

থাম বাপু—তোদের এক কথা। বিয়ে দেবে না তো আইবুড়ো মেয়ে ঘরে পুষে রাখবে নাকি ! আমাদের কালে যা হয়ে গেল—ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোক-লৌকুতো, আচার-ব্রত, পাল-পার্ব্বণ, মান-সম্ভ্রম বজায় রাখার চেষ্টা—তোরা বোধ করি ওসব উঠিয়ে দিবি ?

প্রভাত বললে, কি আর হ'ল মা—ধর্ম্মকর্ম্ম লোক-লৌকিকতা বজায় রাখবার চেষ্টা করছ বটে—মান-সম্ভ্রমটা ঠিক থাকছে কি ? এ যেন ন' হাত কাপড়ে ঘোমটা টানার ব্যাপার। মুখ ঢাকছ তো পিঠ বেরিয়ে পড়ছে।

তা তোরা কি করবি শুনি ?

আমরা ! হুঁ—বলি, আর তুমি বকতে থাক শুনে। হো হো করে হেসে উঠল প্রভাত।—হাসি থামলে বললে, তা যাই কর শোন, আমরা ওসব কিছুই করব না। বিয়ে নয়, তত্ত্ব নয়, কোন সাধ-আহ্লাদও নয়।

বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়াবি ! তা তোদের গুণে ঘাট নেই ! কথায় বলে ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়—তোদের হয়েছে তাই—সংসার তো নেই। কিন্তু সমাজে বাস করে আমাদের ও কথা বলা সাজবে কেন ?

সাজালেই সাজে। যা করতার কুলোয় তাই করবে—যা না কুলোয় তা করবে না।

লোকে ছি ছি করবে না ?

করুক না—কত করবে। দু'চার দিন ছি ছি করে তারাও হাঁপিয়ে উঠবে।

যা যা বকিস নে। মা রেগে উঠলেন। তোর যদি দায়িত্ব-জ্ঞান থাকবে তো উনি খেটে খেটে দেহ ক্ষয় করবেন কেন !

লক্ষ্মী কাপড় মেলে দিয়ে তড়কণে নেমে এসেছে। দেখলে বড়দাদা মুখ ভার করে ঘরে ঢুকছে। বুঝলে, মায়ের রুক্ষ মেজাজের তাপ ওখানে পৌঁছেছে। সে তাড়াতাড়ি কলতলায় চলে গেল।

শোভার শ্বশুরবাড়ীর কথা প্রায়ই আলোচিত হয়। বিয়ের আগে পণের টাকা নিয়ে রীতিমত দরকষাকষি করেছিলেন ওঁরা। বিয়ে মিটল—পাওনা নিয়ে মুখে এবং পত্রে অনেক কথা শুনিয়ে দিয়েছেন। মা বলেন, আমাদের মেয়ে আমাদের তো শুনতেই হবে কথা—পান থেকে চুণ খসলে। প্রভাত বুঝতে পারে না—প্রীতির সম্পর্ক পাতিয়ে মানুষ কি করে এমন হৃদয়হীন হতে পারে। বিয়েটা বাংলাদেশের একটা মঙ্গল-অনুষ্ঠান—না অভিশাপ ! কন্যাদায়ের মত সামাজিক ব্যাধি বুঝি আর নেই ! এ নিয়ে সব কালেই হৈ চৈ হয়েছে, কিন্তু তাতে কোলাহল সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু হয় নি। পণের পীড়নে মেয়েরা আত্মঘাতিনী হয়—অসম্মানের ভারও চাপিয়ে যায় বংশের উপর, ভাবপ্রবণ ছেলেরা মহত্ত্ব দেখায়—সভা করে কাগজে চালায় আন্দোলন। ক্রমে এককালের শাসনভীত বধূদের হাতে আসে সংসারের নিরঙ্কুশ কর্ত্তৃত্বভার—এক কালের ভাবাবেগ-বিচলিত যুবকেরা হয় দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন প্রৌঢ় অভিভাবক। কিন্তু তাদের মধ্যেকার অনুভূতিপ্রবণ তরুণ-তরুণীরা তখন কোথায় ? সমুদ্রের উপকূলে ফেণার কঠিন ঢেলা দেখে কেউ কি ধারণা করতে পারে—তরল জলের সংঘাতে সৃষ্টি হতে পারে অমন কঠিন প্রস্তরখণ্ড ? কিন্তু তা হয়। জলবায়ুর প্রলেপে প্রকৃতির ভিয়ানশালায় এই ভাবের বস্তু-রূপান্তর অহরহ ঘটছে। মানুষের কোমলবৃত্তির দেহে বস্তুজগতের আঘাতের পারণামও এমনি মর্ম্মন্তুদ। বধূ-নির্যাতনের ইতিহাস তাই অবিকৃত রয়ে গেছে—পণ-সমস্যাও মিটছে না। সামাজিক প্রথা নিয়ে বড় রকমের বিপ্লব কি বাধে নি ? রামমোহন, বিদ্যাসাগরের স্বাক্ষরে ইতিহাসের পাতা কি ঝল মল করছে না ? তবু বহু আবর্জ্জনা জমছে—জ্বালার নিবৃত্তি ঘটছে না। কেন ? কেন ?

বার বার প্রশ্ন করে প্রভাত।

সন্ধ্যাবেলায় চিঠিটা নিয়ে আর এক প্রস্থ তর্ক বাধল।

অনন্ত চীৎকার করে বললেন, হুঁ—আমার তালুকমুলুক জমিদারি আছে কি না—তাই ঘটা করে তত্ত্ব পাঠাব !

কিন্তু মেয়ের কষ্ট হবে। সুনয়নী প্রতিবাদ করলেন।

হোক গে—তাদের বউ তারা বুঝুক গে—তোমার আমার কি ?

আমাদের মেয়ে নয় ? সুনয়নী দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করেন।

তা হলে তত্ত্ব পাঠাতেই হবে···কি বল ? বিয়ে করে আমি শালাই যেন চোরদায়ে ধরা পড়েছি ! ধুত্তোরি সংসার। রাগ করে চায়ের কাপটা অমনি ছুড়ে ফেললেন। সশব্দে কাপটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

প্রভাত আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে। এখনই ঝড় উঠবে। রুচি শালীনতা সম্ভ্রমবোধ ওই ভঙ্গুর চায়ের পেয়ালার মতই শত টুকরো হয়ে যাবে। এই ভাবে মধ্যবিত্ত সংসারের অভাব দৈন্য গ্লানি হ্যাংলামি নির্লজ্জ ভাবেই উদ্‌ঘাটিত হয় আর মধ্যবিত্তেরা পরম কৌতুকে সেই অসম্মানকর মুহূর্তগুলি উপভোগ করে।

৪

এখন কোথায় যাবে প্রভাত ? গোলদীঘিতে গিয়ে বসবে ? কিন্তু সন্ধ্যাবেলার গোলদীঘির কথা মনে হলেই হৃৎকম্প হয়। সেখানেও একটি বড় রকমের মেলা বসে। শহরের পৌর-উদ্যান স্বচ্ছন্দ-ভ্রমণের জায়গা নয়। এখানে ভ্রমণার্থীর চেয়ে অর্থসংগ্রহকারীর সংখ্যা বেশী। বেঞ্চিতে বসে দু'দণ্ড যে বিশ্রাম করবে—সে সুযোগ কৈ ! ছেলেমেয়েদের দৌড়ঝাঁপ—লাফা-লাফি ও চীৎকারে কোলাহলের যে অংশটি অসম্পূর্ণ থাকে—ফিরিওয়ালার বিচিত্র ঘোষণায় ও নানা শ্রেণীর ভিক্ষুকের প্রার্থনায় তা সম্পূর্ণ হয়। দুঃস্থ ভিখারীরা এখানে মিছিল সাজায়। কন্যাদায় পিতৃদায় বাস্তুদায় এ সব বড় বড় দায়ের কথা ছেড়ে দিলেও—'বাবা দয়া করে এই অন্ধ ভিখারীর হাতে একটা পয়সা দিয়ে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করুন।' 'অন্ধকে যে এক গুণ দেবে সে চার গুণ পাবে', ইত্যাদি প্রলোভনবাক্যে দয়াবৃত্তি উদ্রেকের চেষ্টাও কম নয়। এরই মধ্যে কচি ছেলে-মেয়ে শুকনো মুখে হাত পাতছে—লালপাড় শাড়ীর ঘোমটা দেওয়া সলজ্জ বধূ সামনে দাঁড়াচ্ছে—পৈতার গোছা হাতে জড়িয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদের ভঙ্গীতে হাত ঊর্দ্ধে তুলছে। দীঘির বেঞ্চিতে বসলে একটি ঘণ্টায় বোঝা যাবে বাংলাদেশের বর্ত্তমান অবস্থাটা কি। সুতরাং রাজপথে ঘুরে ঘুরে খুব ক্লান্ত না হলে প্রভাত পৌর-উদ্যানে পদার্পণ করে না। ঘুরে ক্লান্ত হয়ে বসার সুবিধা এই—চোখের সামনে মিছিল সাজিয়ে যারা যায় তাদের বিচিত্র ধ্বনি অর্থময় হয় না। সব রকম চিন্তার দায় থেকে নিষ্কৃতি দেয় বলে ক্লান্তিকর মুহূর্ত্ত মিছিলের বিরাম-হীন চীৎকারে বিঘ্নিত হয় না, ক্লান্তির বোঝায় এগুলি সামান্য-মাত্র ভার সংযোগ করে।

পাশে একখানা মোটর থামতে অন্যমনস্ক প্রভাত চমকে উঠল।

মোটরের গর্ভ থেকে মিহি হাসির সঙ্গে ধ্বনিত হ'ল, ভয় নেই, চাপা দিচ্ছি না।

প্রভাত মুখ ফিরিয়ে হাসল, চাপা পড়ায় সৌভাগ্য ঘটে বলেই—আমাদের চাপা পড়ার ভয়টাও বেশী।

আসুন। মোটরের দুয়ার খুলে অভ্যর্থনা করলে মিহি-হাসি।

এতক্ষণে প্রভাত স্বক্ষেত্রে ফিরে এল। দুঃস্বপ্নের মত যে জগৎ ওর পিছু নিয়েছিল—তা রাজপথের ধূলিতে রইল পড়ে—সহজে নিঃশ্বাস নেবার ভূমিতে সে আশ্রয় পেলে।

কোথায় চলেছ—একলা যে ?

মিহিহাসি বললে, ছোড়দা এল না—ওকে নিয়েই ব্যাপারটা বলে ওর লজ্জাটা বেড়ে গেল। মিহিহাসি নিঃশব্দে ওষ্ঠপ্রান্তে রেখা টানলে—গণ্ড পর্য্যন্ত প্রসারিত হ'ল রেখা।

পাঁচ জন আসবেন বাড়ীতে—একটু সাজিয়ে গুছিয়ে না রাখলে···ফুল আনতে যাচ্ছি নিউ মার্কেটে।

আমি তো ফুলের বড় সমঝদার।

দু'জনে ঠকবার ভয় থাকবে না। আর একজন পুরুষ-সঙ্গীর মূল্যও কম নয়।

তোমার মুখে এ কথা মানায় না দীপা—কলেজে পড়ছ না ?

সেইজন্যই তো অভিজ্ঞতাটা মর্ম্মান্তিক। কলেজ যাওয়ার পথ দীর্ঘ না হলেও—নিরুপদ্রব নয়।

সে কি ?

না—না—ভয় পাবেন না। ভীরুরা ইঙ্গিতে ইসারায় অভদ্রতা করে—সামনে এসে দাঁড়ানোর সাহস তাদের কম। তাই ও নিয়ে বিশেষ ভাবি না। তা আপনাকে টেনে এনে বিপদে ফেললাম না তো ?

না—বিপদটা এখন ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে ফিরতি মুখে তোমাদের বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছানোর অনুরোধ যেন করো না, তা হলে সত্যিই বিপদে পড়ব।

কেন ?

আরে নিমন্ত্রণ বলে একটা ব্যাপার আছে তো। চায়ের বেলা যে বেশে দেখছ—তাতে তোমার চোখে দর্শনীয় কিছু না পড়াই স্বাভাবিক। যাঁরা সেজেগুজে আসবেন নিমন্ত্রণ সভায়—তাঁরা কি ক্ষমা করবেন ?

আচ্ছা—আচ্ছা—আপনাকে নামিয়ে দেব—অপ্রতিভ মুখে দীপা বললে।

প্রভাত চুপ করে রইল। ওর দু'পাশে দ্রুত অপস্রিয়মাণ দৃশ্যগুলি মনে বিচিত্র অনুভূতি জাগাচ্ছে। এমনি করেই চলে সংসার—জীবন বায়ুযানের দু' পাশ কাটিয়ে। কখনও কুটীর—কখনও হর্ম্ম্য—কখনও আলোকমালাসজ্জিত বিজলী—কখনও বা টেমি-জ্বালানো মুড়িওয়ালার দোকান। এরা চলে যায় দ্রুত

—দৃষ্টি থেকে—চিত্ত থেকে। না হলে জীবনের ভার বহন করা দুঃসাধ্য হ'ত না কি!

আচ্ছা আপনার কি মনে হয় বলুন ত—আমরা স্বাধীনতা পাব? হঠাৎ প্রশ্ন করে দীপা।

অসম্ভব কি। প্রভাত অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দেয়।

কিন্তু বিনা যুদ্ধে দখল ছাড়ার কথা শুনেছেন কি কোথাও?

যুদ্ধটা কোথায় বাধে—তাই যে আমরা খবর রাখি না! ট্যাঙ্ক—কামান—বোমারু-ডেস্ট্রয়ার—সাবমেরিন ছাড়া আর এক রকমের যুদ্ধ চলছে—সেই সাংঘাতিক যুদ্ধের খতিয়ান ত আমরা রাখি না দীপা—

ইকনমিক ওয়ারফেয়ার—

যাক—ফুলের কথা বল। ফুল কিনতে যাচ্ছি আমরা—বারুদের আলোচনা নাই বা করলাম।...প্রভাত হাসল।

দীপাও হেসে বললে, কানু ছাড়া যেমন গীত নেই বৈষ্ণব কবিতায়—তেমনি আজকের দিনে—

বেশ ত—অন্য কথা হোক।

দীপা একটু মনঃক্ষুন্ন হ'ল হয় ত। খানিক চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলে, নতুন কি লিখছেন?

কলেজের নোট লেখা শেষ করে—ভাবছি বাড়ীর হিসাবের খাতাটা—

মাথা দুলিয়ে দীপা বললে, আমি বুঝি জানি না—আপনি—

আমরা এসে পড়েছি।...প্রসঙ্গটা চাপা দিলে প্রভাত।

ফুলের রাজ্যে গন্ধ আর শোভা। প্রভাত অভিভূত হয়ে গেল। এই পরিবেশ যদি জীবনে স্থায়ী হ'ত!

ফিরতি-পথে প্রভাতই সাহিত্যের প্রসঙ্গ তুলল। স্নিগ্ধ আলোকিত মোটরের নরম আসনে অর্দ্ধশায়িত প্রভাতের হাতে রজনীগন্ধার ঝাড়, দীপার হাতে গোলাপের তোড়া। মিশ্র গন্ধে মোটরের ক্ষুদ্র কক্ষ ভরপুর। চোখে নেশার মত লাগছে সুন্দরের ঘোর। প্রভাত বলে চলেছে—রবীন্দ্রনাথের কথা—রল্যাঁর কথা—টলষ্টয়ের কথা—

বাড়ীর কাছে পৌঁছে দীপা বললে, আপনি আধুনিক সাহিত্যিকদের কথা কিছু বললেন না ত?

'এই ফুলের তোড়া বুকের কাছে নিয়ে?' প্রভাত হাসল, 'আধুনিকদের কথা বলব—শক্ত সিমেন্ট-বাঁধান ফুটপাথে চলতে চলতে কিংবা খোয়া-ওঠা পলস্তরা-খসা স্যাঁতসেঁতে ঘরে বসে। এই ফুলের জগতে এলে বাস্তব জগৎকে আমি ভুলে যাই। যাঁরা জীবনকে সব দিক দিয়ে আস্বাদ করতে পেরেছেন—তাঁদের অভিজ্ঞতার রসসমৃদ্ধ কাহিনী বইয়ের পাতায় ছড়িয়ে দিয়েছেন—তাঁদের ছাড়া কি নিয়ে আলোচনা করব! অন্য আলোচনা আমার সাধ্যে কুলোয় না।

দরজা খুলে পথে নামল প্রভাত। ফুলের ঝাড়টা দীপার হাতে দিয়ে বললে, যদি মোটর ভাড় করাও ত আধুনিক সাহিত্যের কথা কিছু শোনাতে পারি।

শুনব আর এক সময়ে। মোটর অন্তর্হিত হ'ল।

প্রভাতদের বাড়ীটার ঘন ধোঁয়া গলিতে ছড়িয়ে পড়ছে—মা উনুনে আগুন দিয়েছেন। এই ঘন ধোঁয়ায় কিছুক্ষণের জন্য বাড়ীটা আত্মগোপন করে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হলেও প্রভাতের ভাল লাগে এই ক্ষণটিকে। সব রকম একঘেয়েমি থেকে ও যেন মুক্তি দেয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত বাড়ীটাকে।

ফুলের জগৎ থেকে ধোঁয়ার জগতে প্রবেশ করতে ওর একটুও কষ্ট হ'ল না। (ক্রমশঃ)

মীরা

শ্রীবিভা সরকার

বরষ বরষ দীর্ঘ রাত্রিদিনে
পল গনি গনি খুঁজেছি তোমায় প্রভু,
উদয় অচলে দেখিতে উদিত ভানু
আশা-নিরাশায় দিন কেটে যায় তবু।
যায় নি তোমায় পরশমণিকে খোঁজা—
ঘন অরণ্যে গহন বিজনে কাটে;
তীর্থে তীর্থে জনতার মাঝখানে
একা আনমনা অচেনায় হাটে হাটে।

প্রিয়তম লাগি কাঁদিয়া কাঁদায়ে কেরো
ভুবনে গগনে ছড়ায়ে বিরহী সুর,
কঙ্কর কাঁটা বিঁধেছিল পায় পায়,
আনমনা পথে যেথানে চলো প্রভুর।
গানে গানে হারা বাজে একতারা ওই,
কোথা প্রিয়তম হে মীরার গিরিধারী!
নয়নের জল হয়েছে উছল তব
জীর্ণ বসনে উদাসিনী বনচারী।

শাসন বারণ কিছুই না মানে মীরা,
হ'ল রাজরাণী পথ-ভিখারিণী মেয়ে,
রাজার দুলালী পাগল কাহার প্রেমে
ফেরে পথে পথে আনমনা গান গেয়ে।
নয়নে নয়নে কিছু না নেহা'র আর
প্রকৃতি পুরুষ কেবা নর কেবা নারী,
হ'ল একাকার ভুবন আমার আজি
যেদিকে তাকাই জাগে মোর গিরিধারী।
আমার হৃদয়-মুরলীতে বাজে ওই
রহি রহি আজ কিশোরী রাধার নাম,
তুমি আমি তাই এক হয়ে যাই প্রভু,
যুগল-মিলনে অনন্ত রাধাশ্যাম।

উবেল হিয়া পথে পথে ঘুরে মরি।
ঘাটে ঘাটে কত কিশোর-কিশোরী রূপ,
একি কৌতুক তব কৌতুকময়,
সকল কিশোর সেজেছে মোর অরূপ।
ওগো মহাশিশু, তোমার এ খেলাঘরে
মনে নাই কবে সেই শৈশবে মোর
মনে মনে হ'ল মন দেয়া-নেয়া খেলা
স্বপনে তোমায় যৌবন হ'ল ভোর।
হৃদয়ে গোপনে কি রূপ উজলি ওঠে,
বাতাসে বাতাসে কোন্ বাণী কানাকানি,
মানস মর্ম্ম-মুকুলে গেঁথেছি মালা
প্রিয় রূপ ধরি নাও প্রভু মালাখানি।

কোথা মনচোর নওল কিশোর মোর,
নববেশ ধরি বাজাও মোহন বেণু,
নাহি দুখলেশ এস হে প্রাণেশ মম,
সোনা হতে সোনা ব্রজের পথের রেণু।
হৃদয়ে গোপনে বাজাও মুরলী প্রভু
অনন্ত সুরে কয়হে বিধুর ধরা,
হৃদয়-রাধিকা হয়েছে সাধিকা তাঁর,
এই ত্রিভুবন ভুবন-মোহনে ভরা।
সখি, আমি তাঁর, আমি তাঁর কিঙ্করী
প্রিয়তম মোর রাধিকা-রমণ একা,
ঘন ঘোর ঘটা গহন আঁধার মাঝে
একেলা তিনিই বিজলীঝলক রেখা।
গহনে বিজনে আকাশে বাতাসে ভরি
ঐ শুনি আমি বাঁশরী তাঁহার বাজে,
জীবনে জীবনে নব নবনামে জাগে
মুরতি মোহন জন-অরণ্য-মাঝে।
তব মহিমার গরলে অমৃত বারি
সাপ হ'ল ফুল সরমে ব্যাকুল রাজা,
আহা ওই প্রিয় নাম কিবা অভিরাম
আয় আয় তোরা ভুবনে ভুবনে বাজা।

ওগো সুচতুর ছলনা ক'র না আর,
ওই রহস্য-কৌতুক রাখ কালা,
মণিমাণিক্য কিছু নাই মোর প্রভু,
গানে গানে শুধু ভরেছি বরণ-ডালা।
রচেছি তোমার কণ্ঠের হার প্রিয়,
এ হৃদয়-ছেঁচা অশ্রু-মুকুতা দিয়ে,
নয়নের মণি উপাড়িয়া দিব মোর
হৃদয়-পদ্ম মধুর গন্ধ নিয়ে।
দোলাবো সে মণি তোমার বক্ষমাঝে,
রব পায় পায় ধূলির মতন মিশি,
পথ-কঙ্কর হয়েছে কুসুম সখা,
আলোকে ভরিল আঁধার এ দশদিশি।
"এসেছে এসেছে" বলিছে বাতাস ওই,
"এসেছে এসেছে" গেয়েছে বনের প্রাণী,
"এল এল" রব উঠিল ভুবনময়
"এসেছে এসেছে" জল-কল্লোল-বাণী।
মানস-কুম্ভ উছলিছে রসভারে,
হৃদয়-যমুনা দুকূল প্লাবিয়া ছোটে,
তোমার প্রেমের মোহন পরশ পেয়ে
মানস-কমল শত দল মেলি ফোটে।

বস্ত্র-সঙ্কট

শ্রীশিবব্রত ঘোষ

স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিম বাংলায় নানারূপ সমস্যার উদ্ভব হওয়ায় কিছুকাল পূর্ব্বে কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি পশ্চিম বাংলাকে সমস্যাসঙ্কুল প্রদেশ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, পশ্চিম বাংলা অপেক্ষা ভারতকে বহু গুরুতর সমস্যা ঘিরিয়া রহিয়াছে এবং ভারতে নিত্য নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে। এই কারণে পশ্চিম বাংলার স্থলে ভারতকে সমস্যাসঙ্কুল রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

ভারতের প্রধান সমস্যা খাদ্যসমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য পরিকল্পনাদি গ্রহণ করিতে করিতে আবার এক নূতন সমস্যা দেখা দিল। আজ খাদ্যসমস্যার সহিত বস্ত্র-সঙ্কট অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। বস্ত্রের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতার ফলে ভারতের জনসাধারণের আজ দুঃখ-দুর্দ্দশা অবর্ণনীয় হইয়া উঠিয়াছে। লজ্জা নিবারণের মত বস্ত্র যোগাড় করা জনসাধারণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। দেশের চতুর্দ্দিকে বস্ত্রের জন্য হাহাকার উঠিয়াছে। কোথাও মোটেই বস্ত্রাদি পাওয়া যাইতেছে না, আবার কোথাও অল্পবস্ত্র পাওয়া গেলেও মূল্য এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সাধারণের উহা ক্রয় করিবার সামর্থ্য নাই। কলিকাতায় মত স্থানে প্রকাশ্যেই সামান্য মিলের ধুতি ২২৲ টাকা হইতে ২৬৲ টাকার জোড়া বিক্রয় হইতেছে।

মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও বস্ত্রবিষয়ে ভারতের অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল বলা যায়। সুতরাং প্রশ্ন জাগে হঠাৎ বস্ত্রের এইরূপ সঙ্কট বা 'দুর্ভিক্ষে'র কারণ কি? দেশের জনসাধারণের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যে পরিমাণ বস্ত্রাদি আবশ্যক, কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতের উৎপাদন তাহা অপেক্ষা অনেক পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে, অর্থাৎ উৎপাদন চাহিদা মিটাইতে অক্ষম, ফলে বস্ত্রের অভাব দেখা দিয়াছে। কোন বস্তুর উৎপাদন হ্রাস বা বৃদ্ধি নির্ভর করে উৎপাদনের উপাদান-গুলির হ্রাস-বৃদ্ধির উপর। ভারতের বস্ত্রাদির উৎপাদন হ্রাসের প্রথম কারণ হইল কাঁচামালের অভাব। বস্ত্র-শিল্পের কাঁচামাল তুলা ও সূতা। ভারতের বস্ত্রশিল্পগুলির জন্য বাৎসরিক প্রায় ৪২ লক্ষ গাঁইট তুলার প্রয়োজন। কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মোট উৎপাদিত তুলার পরিমাণ প্রায় ২০ লক্ষ গাঁইট; ফলে অবশিষ্ট ২০-২২ লক্ষ গাঁইট তুলার জন্য ভারত পরমুখাপেক্ষী।

তুলার আমদানীর উপর বস্ত্রের উৎপাদন নির্ভর করিতেছে। উপযুক্ত পরিমাণ তুলা পাইলে তাহা হইতে উপযুক্ত পরিমাণ সূতা প্রস্তুত করিয়া বস্ত্রাদি উৎপাদন করা সম্ভব হয়। কিন্তু তুলার পরিমাণ চাহিদা অপেক্ষা অল্প থাকায় সূতার পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে; ইহাতে বস্ত্রাদি উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। ১৯৪৬ সালে ভারতরাষ্ট্রে প্রতিমাসে গড়ে ১১ কোটি ৩৯ লক্ষ পাউণ্ড সূতা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১২ কোটি ৪ লক্ষ পাউণ্ড ও ১১ কোটি ৩২ লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু ১৯৫০ সালে সূতার পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ৯ কোটি ৭৭ লক্ষ পাউণ্ড। ফলে কাঁচামালের বিশেষ অভাব হইয়া পড়ে। উৎপাদন হ্রাসের দ্বিতীয় কারণ ভারতের বস্ত্রশিল্প-শ্রমিকগণের ধর্ম্মঘট। শ্রমিক ও মালিকগণের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হওয়ায় গত বৎসর ও উহার পূর্ব্বে কয়েকবার শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছিলেন এবং ইহার জন্য বস্ত্রের উৎপাদন অত্যন্ত ব্যাহত হইয়াছে। কাপড়ের কলের শ্রমিক-ধর্ম্মঘটের ফলে কেবলমাত্র গত বৎসরেই ২০ কোটি ৩০ লক্ষ গজ বস্ত্র ও ৫ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা হ্রাস পাইয়াছে। তৃতীয় কারণ হইল—বস্ত্র উৎপাদনে মিল-মালিকগণের কতকটা অসহযোগিতা ও পাকিস্তান। মিল-মালিকেরা বস্ত্রের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া মুনাফার হার বাড়াইতে অত্যন্ত আগ্রহশীল হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ভারত-সরকারের অঙ্গীকার-স্বরূপ মুনাফার একাংশ শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করিতে বিমুখ। ফলে শ্রমিক-মালিক বিরোধ সৃষ্টি হইয়া উৎপাদনে বিঘ্ন জন্মিতেছে। ইহা ছাড়া মিলমালিকগণের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও কার্য্যকরী মূলধনের অভাবে কতকগুলি কাপড়ের মিল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মোটামুটি এই সকল কারণের জন্যই ভারতে মিলে প্রস্তুত কাপড়ের উৎপাদন বিশেষভাবে হ্রাস পাইতেছে। আমাদের দেশে বিগত কয়েক বৎসর প্রতি মাসে গড়ে কি পরিমাণ বস্ত্রাদি উৎপাদিত হইয়াছে তাহার একটি হিসাব নীচে দেওয়া গেল। উহা লক্ষ্য করিলে দেশের উৎপাদন ক্রমশ: কিরূপ হ্রাস পাইতেছে তাহা বুঝা যাইবে:

সাল	প্রতি মাসের গড় উৎপাদন
১৯৪৬	৩২ কোটি ৫৭ লক্ষ গজ
১৯৪৮	৩৫ ,, ৯৯ ,, ,,
১৯৪৯	৩২ ,, ৫৩ ,, ,,
১৯৫০	৩০ ,, ৫৬ ,, ,,

সম্প্রতি বস্ত্রসমস্যার প্রতি ভারত-সরকার দৃষ্টিপাত করিয়া-ছেন এবং ইহার মীমাংসাকল্পে নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত

হইতেছে। বর্ত্তমান বস্ত্র-সঙ্কটের জন্ত বস্ত্রের উৎপাদন হ্রাসই একমাত্র কারণ বলিয়া সরকার স্থির করিয়াছেন এবং উৎপাদনবৃদ্ধির জন্ত বিশেষ তৎপর হইয়াছেন। কাঁচামালের অতিরিক্ত যোগানের জন্ত ও সুতার পরিমাণ বৃদ্ধিকল্পে ভারত-রাষ্ট্রে অধিক পরিমাণ তুলা উৎপাদন ও আমদানীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এদেশের তুলা যাহাতে অন্ত দেশে যাইতে না পারে তাহার জন্ত তুলার রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সুতা আমদানীর জন্ত লাইসেন্স প্রথা তুলিয়া দিয়া এবং রপ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়া বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি দ্বারা সঙ্কট হইতে পরিত্রাণলাভের চেষ্টা সরকার করিতেছেন। এই সকল ব্যবস্থা যথাযথভাবে অবলম্বন করিলে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা দ্বারা বস্ত্রসমস্তার সম্পূর্ণ সমাধান হইবে বলিয়া আশা হয় না।

ভারতে বস্ত্রের উৎপাদন হ্রাসই যে বর্ত্তমান বস্ত্র-সঙ্কটের একমাত্র কারণ তাহা অকপটে স্বীকার করা যায় না। বস্ত্রের উৎপাদন হ্রাস ব্যতীত আরও কতকগুলি উল্লেখযোগ্য কারণ রহিয়াছে যাহার জন্ত বস্ত্রসমস্তা এইরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। এই কারণগুলির মধ্যে অত্যধিক পরিমাণ ভারতীয় সুতা ও বস্ত্রাদি রপ্তানী অন্ততম। ভারত বিভক্ত হইবার ফলে ভারত যেরূপ পাকিস্থানের তুলার একচেটিয়া ক্রেতা হইয়া গিয়াছে, সেইরূপ পাকিস্থানও ভারতীয় বস্ত্রাদি ও সুতার প্রধান ক্রেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা ছাড়া দেশ-বিভাগের পূর্ব্ব হইতেই প্রতিবেশী কতকগুলি রাষ্ট্রে ভারত কার্পাস-বস্ত্রাদি রপ্তানী করিত। বিভক্ত হইবার ফলে কাঁচা-মালের অপ্রাচুর্য্য হেতু উৎপাদন হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও দেশের জনসাধারণের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনের অভিপ্রায়ে ভারতের মিলে প্রস্তুত কার্পাস-বস্ত্র ও সুতার একটা মোটা অংশ রপ্তানী করা হইতেছে। অবশিষ্টাংশ দ্বারা আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটান সম্ভব হইতেছে না। সুতরাং বস্ত্রসমস্তার সমাধান করিতে হইলে ভারত হইতে অন্তদেশে বস্ত্র-রপ্তানীর উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের জন্ত নির্দ্দিষ্ট অংশ মজুত রাখিয়া তার পর রপ্তানী করা প্রয়োজন।

বস্ত্র-সঙ্কটের জন্ত উৎপাদন হ্রাস, অতিরিক্ত রপ্তানী প্রভৃতি কারণ থাকিলেও, বস্ত্র-বণ্টন-ব্যবস্থা ও এ বিষয়ে সরকারী গাফিলতীই বোধ হয় আজিকার যে ঘোরতর বস্ত্র-সঙ্কট দেখা দিয়াছে তাহার মুখ্য কারণ। উৎপাদন হ্রাস ও অতিরিক্ত পরিমাণ সুতা এবং বস্ত্রাদি রপ্তানী ইত্যাদি ভারত বিভাগের পর হইতেই আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু বর্ত্তমানের স্তায় গুরুতর সমস্তার উদ্ভব ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে এ পর্য্যন্ত হয় নাই। ইহার কারণ এতদিন বস্ত্র-বণ্টন ও নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা মোটামুটি ভালভাবে কার্য্যকরী ছিল। দেশে বস্ত্রের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে এবং তাহার ফলে জনসাধারণ উপযুক্ত পরিমাণে বস্ত্রাদি পাইতেছে না সত্য, কিন্তু দেখা যায় অতিরিক্ত মূল্য প্রদান করিলে জনসাধারণকে বস্ত্রাভাবের সম্মুখীন হইতে হয় না; চোরাবাজার হইতে যথেচ্ছপরিমাণ বস্ত্রাদি পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয়, বর্ত্তমানে উৎপাদিত বস্ত্রের একটি বিরাট অংশ চোরা-কারবারীদের হস্তে মজুত হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহার জন্ত জনসাধারণ বিশেষভাবে দুর্দশা ভোগ করিতেছে। বর্ত্তমান বস্ত্রবণ্টন-ব্যবস্থার গলদের ফলে বিভিন্ন রাজ্যে প্রেরিত বস্ত্রাদি জনসাধারণের হাতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই উধাও হইয়া চোরা-কারবারীদের হস্তে আসিয়া পড়িতেছে; এ কারণ বর্ত্তমান বস্ত্র-বিভ্রাটের জন্ত সরকারী বণ্টন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে দায়ী না করিয়া পারা যায় না। অবশ্য, বস্ত্রের চোরাবাজারের জন্ত মিল-মালিকগণকেও অনেকাংশে দায়ী করা যাইতে পারে। অনেক মালিক দেশের স্বার্থের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাহাদের উৎপাদিত বস্ত্র চোরাবাজারে বিক্রয় অথবা মজুত করিয়া পরে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া দেশে বস্ত্র-সঙ্কট সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন।

এই কারণে দেখা যাইতেছে, অল্প সময়ের মধ্যে বস্ত্রসমস্তার সমাধান করিতে হইলে সরকারকে সর্ব্বাগ্রে বস্ত্র-বণ্টন-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিতে হইবে। স্থায়ী ভাবে বস্ত্র-সমস্তার সমাধান করিতে হইলে বস্ত্রশিল্পকে জাতীয়করণ দ্বারা উৎপাদন, বণ্টন, রপ্তানী প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে বিশেষ সুফল পাওয়া যাইবে আশা করা যায়।

কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্ত্তমান সরকারের যেরূপ কর্ম্মতৎপরতা ও দক্ষতার (?) পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাতে বোধ হয়, সরকারের হস্তে বস্ত্রশিল্পের ভার পুরাপুরি ন্যস্ত হইলে বস্ত্রের সমস্তার সমাধান না হইয়া উহা আরও জটিল হইয়া উঠিবে। সুতরাং অন্তান্ত উপায় দ্বারা এই সমস্তার সমাধান করিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে সরকারের কর্ত্তব্যই সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথমেই, কাপড়ের কলগুলির উপর সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কলগুলিকে উপযুক্ত কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া সরকারকে উহাদের উৎপাদনের পরিমাণ ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে এবং উহাদিগকে ঐ পরিমাণ বস্ত্রাদি উৎপাদন করিতে বাধ্য করিতে হইবে। উহাদের প্রতিমাসের উৎপাদন সরকার-পক্ষ হইতে ক্রয় করিয়া জনসাধারণের নিকট পৌঁছিবার জন্ত উপযুক্ত উন্নত ধরণের বণ্টন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা যুক্তিযুক্ত হইবে। এতদ্ব্যতীত চোরাকারবারীদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিতে হইবে যাহাতে ভবিষ্যতে কেহ এরূপ ব্যবসা করিতে সাহসী না হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত

চোরাকারবারীদিগের দমনের পক্ষে সরকারী কোন ব্যবস্থাই উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

যাহা হউক, বর্ত্তমান বস্ত্রসমস্যা বলিতে কেবলমাত্র বস্ত্রের দুষ্প্রাপ্যতা মনে করিলে ভুল হইবে। বস্ত্রাদির অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিও বর্ত্তমান সঙ্কটের প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বস্ত্রের দুর্ম্মূল্যতা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। ভারতের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান ও ক্রয়শক্তির তুলনায় বস্ত্রের মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে দেশের লোকের পক্ষে বস্ত্র ক্রয় করিয়া সঙ্কটের হাত হইতে মুক্ত হইবার আশা সুদূরপরাহত। এক প্রকার মিল-মালিকগণের নির্দ্দেশেই ভারত-সরকার কিছুদিন পূর্ব্বে বস্ত্র ও সূতার মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন; কিন্তু দেখা যাইতেছে উক্ত বর্দ্ধিত মূল্যও মিল-মালিকগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই—তাঁহারা পুনরায় মূল্যবৃদ্ধির অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। বস্ত্রের বর্ত্তমান মূল্য হ্রাসের চেষ্টা না করিয়া পুনরায় বৃদ্ধি করিলে ভারতের বস্ত্রসমস্যা কিরূপ চরমে উঠিবে তাহা ভাবিতেও আতঙ্ক হয়। যদি বস্ত্র-সঙ্কটের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হয় তাহা হইলে অচিরে মূল্য হ্রাস করিবারও যে প্রয়োজন তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

গুরুদক্ষিণা

শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর

১৯২৯ সালের শেষে শান্তিনিকেতন থেকে ছাত্রাবস্থা কাটিয়ে বার হয়ে পড়ি। শ্রদ্ধেয় আচার্য্য শ্রীনন্দলাল বসুর কাছে ছাত্রাবস্থায় যা শিখেছিলাম কেবলমাত্র সেটুকুই আমার সম্বল ছিল। তারপর ভারতবর্ষ ও সিংহলের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। আমার উপর আদেশ ছিল ভারতবর্ষের শিল্প ও শিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় স্থাপন করা ও মনে প্রাণে ভারতের শিল্পের রস উপলব্ধি করা। বিদেশের শিল্প ও শিল্পপদ্ধতি আয়ত্ত করবার আগে নিজের দেশের শিল্প ও শিল্পপদ্ধতির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বুঝতে পেরেছিলাম। ছাত্রাবস্থায় শান্তিনিকেতনকে যে চোখে দেখেছিলাম—প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে সেই শান্তিনিকেতনের আর এক রূপ চোখে পড়েছিল। শান্তিনিকেতনের মন্দির, মাধবীবিতান, ছাতিমতলা ও অন্যান্য নানা জায়গার সঙ্গে আমাদের নিবিড়তম একটা যোগ আছে, সে যোগসূত্র ছিন্ন করা সহজ নয়। পুরাতন অধ্যাপক অনেকেই সেখানে নেই, অল্প কয়েকজন আছেন, তাঁদের সঙ্গে ত যোগ আছেই। ছাত্ররূপে নন্দলালকে এক রকম ভাবে জেনেছিলাম—প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে জানলাম আর এক রকম ভাবে। আমাদের ছাত্রাবস্থায় শেখাবার সময় তিনি নানা প্রণালীতে শিখিয়েছেন। শিল্প সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলেছেন—একসঙ্গে বেড়াতে গিয়েছি, প্রকৃতি ও বাস্তবের সঙ্গে পরিচিত হবার পদ্ধতি তিনি আমাদের শিখিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশকে ভালবাসবার, দেশের শিল্পকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করবার স্পৃহা জাগিয়েছেন। শান্তিনিকেতন থেকে বার হয়ে যখন মাদ্রাজ অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, সেই সময় তিনি আমায় একটি চিঠিতে গুরুদক্ষিণা ভিক্ষা করেছিলেন। তাঁর সেই গুরুদক্ষিণার মর্ম্ম তখন সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারি নি। কিন্তু আজকে প্রায় কুড়ি বছর পর তার মর্ম্ম বুঝবার সামর্থ্য জন্মেছে। তাঁর সেই চিঠির কয়েকটি ছত্র এখানে তুলে দিচ্ছি:

আচার্য্য শ্রীনন্দলাল বসু

"আমার ত' কাজ করবার ইচ্ছা এখন বাড়িয়া যাচ্ছে এ জীবনে ও শক্তিতে কুলাবে না, যা' হউক তোমরা আছ দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। তবে আর্টিষ্ট-বন্ধুদের সকলকে কখনও তাচ্ছিল্য করিও না, আমার এই অনুরোধটি রাখিও আর তাহাই আমার (গুরুদক্ষিণা) বলে লইব জানিও।"

তাঁর চিঠির এই কয়েকটি ছত্র থেকে বুঝা যায়, নিজের ছাত্রদের ও দেশের শিল্পীদের উপর তাঁর কি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। তিনি মনে প্রাণে জানেন, দেশের শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে, নিজেদের মধ্যে দলাদলি করলে চলবে না। হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা আমাদের বোধ করি মজ্জাগত ব্যাধি। এই ব্যাধির হাত থেকে নিস্তার না পেলে নিজেকে উন্নত করা সম্ভব নয়। নিজেদের প্রাণপণ পরিশ্রম করতে হবে। সবার কাছ থেকে যা কিছু শেখবার জানবার তা গ্রহণ করতে হবে। নিজের পুঁজি যদি কিছু থাকে তাতে কৃপণতা করলে চলবে না, তা সবাইকে বিলিয়ে দিতে হবে। শিল্পের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা কিছু নেই। মনে প্রাণে শিল্পী হওয়া চাই—ব্যবসাদারী বুদ্ধি মনের ভিতর স্থান পেলেই সঙ্কীর্ণতার জালে জড়িয়ে পড়তে হবে সন্দেহ নেই।

১৯৩৭ সনের পর বহুদিন শান্তিনিকেতনে যাবার সুযোগ-সুবিধা হয় নি। বাংলাদেশের বাইরেই আমার কর্মক্ষেত্র। কাজকর্মে বারো বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল। বারো বছর রামচন্দ্র বনে কাটিয়াছিলেন, কত কিছুই না করেছিলেন, তার কাহিনী আমরা ত সবাই পড়েছি। আমরা কেউ আর রামচন্দ্র নই, কিন্তু তবু নানা রকম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদেরও পথ চলতে হচ্ছে সে বিষয় সন্দেহ নেই।...

কিছুদিন আগে আবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে থাকবার অবকাশ পেয়েছিলাম। প্রায়ই আচার্য্য নন্দলালের কাছে নানা রকম শিল্প বিষয়ে কথাবার্ত্তা শুনবার সুযোগ পেতাম।

এক দিন বললেন, "আমার যা বলবার সব 'শিল্পকথা'র মধ্যে পাবে।" 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে'র বই। বইখানি একাধিক বার পাঠ করেছি। ছোট্ট বইখানির মধ্যে প্রায় সব কথাই খুব সোজা ভাষায় লেখা—পড়তে বেশীক্ষণ লাগে না, কিন্তু ভাববার খোরাক পাওয়া যায় অনেক। তারপর খানিক থেমে বললেন, 'এবারকার বিশ্বভারতী পত্রিকায় যে "রসের প্রেরণা" বলে লেখাটা দিয়েছি, ওটা পড়েছ কি?—ওটাতে সংক্ষেপে অনেক কথা বলেছি।' তারপর বললেন, "শ্রীযুক্ত—বললেন ওটা পড়ে—'কি যে লিখেছেন অল্প একটুখানি—পড়া আরম্ভ করতে না করতেই ফুরিয়ে গেল'—ওঁরা চান—গুচ্ছেরখানেক লম্বাচওড়া কথা। সোজা ভাষায় অল্প কথায় যা বলা যায়—তাকে বাড়িয়ে বড় বড় নাম ধাম দিয়ে না বললে ওঁদের মনে ধরে না।"

পরের দিন মাষ্টার মশায়ের বাসায় যেতেই বিশ্বভারতী পত্রিকাটা দিয়ে বললেন—'পড় ত রসের প্রেরণা প্রবন্ধটি—আমিও শুনি।' শান্তিনিকেতনের ডাক্তারবাবুও বসেছিলেন – বললেন, 'আপনিও শুনুন, ডাক্তার বাবু।' জোরে জোরে প্রবন্ধটি পড়লাম। —"সুখ ও দুঃখের সাগর মন্থন ক'রে যে আনন্দরূপ অমৃত হ'য়ে ওঠে তার অর্ঘ্য নিবেদন করাই শিল্পীর কাজ।"...

"...চীন দেশীয়েরা বলেছেন, টেকনিকই সব, আবার প্রেরণাই সব। কেউ যদি বলে টেকনিকের আদৌ দরকার নেই, ও কিছু না; আবার যদি কেউ বলে রসের ইনস্পিরেশনের দরকার নেই, ও কিছু না—দু'দিকেই ভুল হবে। সার্থক সৃষ্টিতে আঙ্গিক ও প্রেরণা অবিচ্ছিন্ন এক হয়ে উঠেছে। আঙ্গিক থেকেও নেই।" আশিসপ্রার্থী শিল্পশিক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রবন্ধটি লেখা। মাষ্টার মশায়ের আশীর্ব্বাদ তাঁর সকল ছাত্র-ছাত্রীর উপর সব সময়েই বর্ষিত হচ্ছে। মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতেই হবে—পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে অনেক, শিখেছি অনেক—এখনো তাঁর সঙ্গে কথা বলে কাজের প্রেরণা পাচ্ছি অনবরত। কিন্তু "গুরুদক্ষিণা" দেবার কথা আমাদের সবার মনের মধ্যে জেগেছে কি? আমরা আর্টিষ্ট বন্ধুদের সকলকে সমাদর সব সময়ে করি কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

অনেকেই বলে থাকেন "Art is universal"—'শিল্প-সর্ব্বজনীন।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিল্পীর কাছে—Art is individual—'শিল্প স্বকীয়'—এ কথাই সত্য। মাষ্টার মশায় আমাদের এ কথা শিখিয়েছেন। কিন্তু সে কথা ভুলে গিয়ে আমাদের আচরণ যদি নিকৃষ্ট হয়ে পড়ে তবে তার জন্য দায়ী গুরু নন, আমরা নিজেরাই। "আর্টিষ্ট বন্ধুদের কখনো তাচ্ছিল্য করিও না"—এই গুরুদক্ষিণা তিনি আমার কাছে চেয়েছিলেন বলেই জানতে পেরেছি অপরের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলে তাতে নিজেকে বড় করা হয় না। অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে তাঁদের মধ্যেকার ভালটুকুর সন্ধান পাওয়া কঠিন হয়। বিশ্বের যেখানে যা-কিছু—সে সকলের মধ্যে সত্যের সন্ধান তখনই পাওয়া সম্ভব হয় যখন সশ্রদ্ধ ভাবে তাঁদের দিকে চোখ মেলে দেখি। এই দৃষ্টিই প্রকৃত শিল্পীর দৃষ্টি—এই কথাটাই নানা ভাবে নন্দলাল আমাদের বারবার বলেছেন।

রাজনগর

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

এই কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে রাজধানী হইতে দূরে, পল্লী বাংলার ক্রোড়ে অবস্থিত প্রাচীন রাজনগরকে লইয়া ; অগ্রসর হইয়াছে রাজনগরের দুইটি পরিবারের কয়েক পুরুষের ভাগ্য-বিবর্ত্তনের ইতিহাসের সূত্র ধরিয়া। দুইটির একটি বাংলার প্রাচীন ভূস্বামী গোষ্ঠীর পরিবার, অন্যটি এই ভূস্বামী-বংশের আশ্রিত কুলপুরোহিত-পরিবার। একটি পরিবার বাংলার প্রাচীন পল্লীসমাজ-ব্যবস্থার মেরুদণ্ড, অন্যটি তাহার মস্তিষ্ক।

কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের কোন এক সময় হইতে। তখন প্রাচীন পল্লীসমাজ-ব্যবস্থা দ্রুত পরিবর্ত্তনের মুখে অগ্রসর হইতেছিল দেশে ইংরেজী-শিক্ষা প্রসারের দূর-প্রসারী ফলে। পরিবর্ত্তনের প্রথম বাহ্য-প্রকাশ দেখা দিল বৃত্তি-বিপর্য্যয়ে। প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার মস্তিষ্ক গুরুবংশের পণ্ডিত শ্যামানন্দ বিদ্যারত্নের পুত্র জীবানন্দ কুলগত পুরাতন বৃত্তি ত্যাগ করিয়া অর্থকরী ইংরেজী বিদ্যা শিখিয়া সরকারী কার্য্য লইলেন। উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত দুই পরিবারের কাহিনী রাজনগরের পল্লী-ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

উনবিংশ শতাব্দী বিগত হইল। কয়েক বৎসরের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বাংলার শহরে শহরে, পল্লীতে পল্লীতে ছড়াইয়া পড়িয়া দেশে নূতন জাগরণের জোয়ার আনিল। জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে বিদেশী ভাব-পুষ্ট, ইংরেজী শিক্ষিত দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মসচেতন কর্ম্মপ্রচেষ্টার নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। এই জোয়ার আসিয়া আঘাত করিল প্রাচীন রাজনগরকে। জোয়ারের বেগ প্রথমে আকর্ষণ করিল রাজনগরের গুরুবংশের বৃত্তিত্যাগী, সরকারী চাকুরিয়া জীবানন্দের পুত্র দেবানন্দকে ; তাহাকে অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিল রাজনগরের প্রাচীন ভূস্বামী পরিবারের সন্তান ইন্দ্রনারায়ণ। ইহার পর হইতে রাজনগরের দুই পরিবারের পারিবারিক ইতিহাস জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হইল।

রাজনগরের পারিবারিক ইতিহাসের এই জাতীয়-আন্দোলন-সংশ্লিষ্ট অধ্যায় কাহিনীর বিষয়বস্তু। সেই অধ্যায়ের কথা বলিবার আগে তাহার পটভূমিকা হিসাবে পারিবারিক ইতিহাসের সামান্য পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

১

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের যে সময়ের কথা বলা হইতেছে তখন বংশবৃদ্ধি, বাঁটোয়ারা, সূর্য্যাস্ত আইন, মামলা-মোকদ্দমা ও বদখেয়ালে এবং কালের পরিবর্ত্তনে রাজনগরের প্রাচীন আমলের সামন্ততান্ত্রিক ঠাটঠমক প্রায় সবই অন্তর্হিত হইয়াছিল, মাত্র ছিটে-ফোঁটা অবশিষ্ট ছিল। সামন্ততান্ত্রিক ঠাট-ঠমক গেলেও পুরাতন সমাজব্যবস্থা একেবারে ভাঙিয়া পড়ে নাই। রাজনগরে তখন অন্নবস্ত্রের স্বাচ্ছন্দ্য ছিল, জীবনের ছোট-খাটো সাধ-আহ্লাদ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিবার অবসর ও মেজাজ লোকের ছিল ; আর ছিল সমাজের সকলের সঙ্গে প্রাণের বন্ধন, সমাজের সকল স্তরের মানুষের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য-পালনে নিষ্ঠা, সাধারণ মানুষের অকপটতা, নির্লোভতা, দয়ামায়া ও প্রাণের প্রাচুর্য্য।

চল্লিশ বৎসর বয়সে একটার পর একটা দাঙ্গা, মোকদ্দমা ও বদখেয়ালে পৈতৃক সম্পত্তির অর্দ্ধেক উড়াইয়া দিয়া রুদ্রনারায়ণ যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন তাঁহার একমাত্র পুত্র হরি-নারায়ণ পনর বৎসরের বালক। রুদ্রনারায়ণের স্ত্রী তাঁহার আগে লোকান্তরিতা হইয়াছিলেন। হরিনারায়ণ রাজনগরে থাকিত না, মাতার মৃত্যুর পর সে মাতুলালয় ত্রৈলোক্যপুরে আসিয়া লেখাপড়া করিত। বর্ত্তমান ত্রৈলোক্যপুর গ্রামটি বেশী প্রাচীন নহে। এখন যাহা ত্রৈলোক্যপুর নামে পরিচিত সে জায়গাটার আগের নাম ছিল তাজুর। মাত্র দশ-বিশ ঘর লোকের বাস ছিল। দুরন্ত নদী প্রাচীন ত্রৈলোক্যপুর গ্রামটিকে ভাঙিয়া লইতেছিল। বাগ-বাগিচা, দালানকোঠা, মঠ-মন্দির, শস্যক্ষেত্র নির্ম্মম বাহু বিস্তার করিয়া উপড়াইয়া আনিয়া নদী নিজের গর্ভে পুরিতেছিল, ক্রূর সরীসৃপের মত আঁকিয়া-বাঁকিয়া অগ্রসর হইতে হইতে নদী যখন তাঁহাদের পৈতৃক ভিটাগুলির দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিল, ত্রৈলোক্যপুরের বাবুরা তখন চারদিকে ছড়াইয়া পড়িলেন। কয়েকটি পরিবার আট-দশ মাইল দূরে সরিয়া তাজুরে নূতন বাড়ী করিলেন। তখন হইতে তাজুরের নাম হইল ত্রৈলোক্যপুর। আদি ত্রৈলোক্যপুর এখন নদীর গর্ভে।

বহুবর্ষ পরে যখন প্রাচীন ত্রৈলোক্যপুর কোথায় ছিল লোকে ভুলিয়া যাইবে তখন যেখানে ত্রৈলোক্যপুর ছিল সেখানে নূতন চর জাগিবে। চরের উপর কুমীর রোদে পিঠ দিয়া ঘুমাইবে, কাছিম বালি খুঁড়িয়া ডিম পাড়িবে, কাঁকড়া ঘুরিয়া বেড়াইবে, চখাচখি, কাদাখোঁচা, বেলে হাঁস চরের কাছে জলে সাঁতার কাটিবে আর মাঝে মাঝে ডাঙায় উঠিয়া পাখা ঝাড়িবে, লম্বা ঠোঁট দিয়া গা খুঁটিবে। তারপর নলখাগড়া, বনঝাউ, কেঁদাই-লতা নেড়া চরকে সবুজ রঙে ঢাকিয়া দিবে। তারপর আসিবে চাষীর দল নৌকায় চড়িয়া। খুঁটে বাঁধিয়া তাহারা লাঙ্গল

চালাইবে, ধানের বীজ ছড়াইবে, পাকা ধান কাটিয়া ঘরে তুলিবে। কুমড়ার বীজ, ফুটি, তরমুজের বীজ বুনিবে। তাহারা গরু, মহিষ, ছাগল, হাঁস, মুরগী কিনিবে, ছেলের বৌ ঘরে আনিবে। যেখানে ছিল ত্রৈলোক্যপুর সেখানে কায়েম হইবে চর বরকত আলি।

যে কয়টি পরিবার তাজুরে নূতন বাড়ী করিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাড়ীতে প্রবীণদের রাখিয়া নিজেরা অধ্যাপক, উকিল, ডাক্তার, ডেপুটি, দারোগা হইয়া শহরে চলিয়া গেলেন ও সেখানে স্থায়ী বাসাবাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন। নূতন ত্রৈলোক্যপুর গড়িয়া উঠিতে না উঠিতে আবার এইভাবে ভাঙন ধরিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইংরেজী শিক্ষার অর্থকরী দিকটা মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করিয়া, শুধু ত্রৈলোক্যপুর কেন বাংলার গ্রাম্য সমাজের পুরনো বনিয়াদকে নড়াইয়া দিল। পুরাতন ভূস্বামী সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাদের উৎসাহ, সাধ ও উচ্চাশা ছিল অথবা ভূ-সম্পত্তির আয়ে যাহাদের ভালভাবে চলিত না তাহারা ভাগ্য পরীক্ষা করিতে গ্রাম হইতে ধীরে ধীরে স্থানান্তরে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। সারা দেশের শত-সহস্র গ্রাম হইতে আগত এই সকল ভাগ্যান্বেষীকে লইয়া নূতন একটা শ্রেণী দেশে গড়িয়া উঠিল।

ত্রৈলোক্যপুর ও অন্যান্য গ্রামের যে সকল লোক ভাগ্যান্বেষণে বাহিরে গিয়াছিল তাহাদের অনেকে ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে বা অবকাশ পাইলে গ্রামে আসিত। তাহাদের উপার্জ্জনের কিছু অংশ গ্রামে ব্যয়িত হইত। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ গ্রামে নূতন করিয়া বাড়ী-ঘর নির্ম্মাণ করিল এবং ভূসম্পত্তি ক্রয়ও করিল।

ত্রৈলোক্যপুরের অর্দ্ধেক গ্রাম্য ও অর্দ্ধেক শহরে একটি পরিবারে রুদ্রনারায়ণের বিবাহ হইয়াছিল। সেই পরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান উপায় ছিল ভূসম্পত্তি। পরিবারের কেহ কেহ উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া জীবিকার জন্য নূতন বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। রুদ্রনারায়ণের বিবাহের কয়েক বৎসর পরে তাঁহার এক জ্যেঠতুতো শ্যালক ব্যারিষ্টার হইয়া বসিলেন। সামাজিক হিসাবে তিনি 'একঘরে' হইয়াছিলেন, কিন্তু পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হয় নাই। মাতুলালয়ে থাকিয়া হরিনারায়ণ রাজনগরের আবহাওয়া হইতে অনেকখানি ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে মানুষ হইতেছিল।

ম' তরফের কর্ত্তা রামলোচন ছিলেন রুদ্রনারায়ণের শনি-গ্রহ। বয়সে রুদ্রনারায়ণের অনেক বড় হইলেও বুদ্ধি-কৌশলে তিনি রুদ্রনারায়ণের অন্তরঙ্গ বন্ধুর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মত কুচক্রী, কৌশলী লোক রাজনগরে তখন আর দ্বিতীয়টি ছিল না। রুদ্রনারায়ণের স্ত্রী দীর্ঘকাল রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন, তাহা সত্ত্বেও কিন্তু যত দিন তিনি জীবিত ছিলেন রামলোচন অতি সাবধানে চলিতেন। গোপনে গোপনে তাঁহার কূটচক্রজাল বিস্তারের কথা ঐ মহিলাটির অজ্ঞাত ছিল না। বহুদিন রোগশয্যায় অক্ষম হইয়া পড়িয়া থাকায় দুর্দ্দান্ত স্বামী সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হাতে বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন। স্বামী-স্ত্রীতে দেখা-সাক্ষাৎ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ছেলে শিশু মাত্র। পিতার অবহেলায় তাহার ভবিষ্যৎ নষ্ট না হয় এজন্য রুদ্রনারায়ণের স্ত্রী নিজের পিত্রালয়ে রাখিয়া তাহার পড়াশুনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হরিনারায়ণ বাড়ীতে না থাকায় নিষ্কণ্টক হইয়া রামলোচন রুদ্রনারায়ণের গৃহে ভৈরবীচক্র বসাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

রুদ্রনারায়ণের স্ত্রী মৃত্যুর পূর্ব্বে শ্যামানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং স্বামীর জন্য একটি সুপাত্রী দেখিয়া তাঁহার বিবাহের ব্যবস্থা করিবার অনুরোধ করিলেন। বলিলেন—এমন মেয়ে দেখে বিবাহ দিন যে ওঁকে ঐ শকুনির কবল থেকে মুক্ত করতে পারে। বিষয়-সম্পত্তি সব ঐ শকুনি খাবে আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি ঠাকুর মশাই। আমার ছেলেটা পথে বসবে। খুব দজ্জাল কিন্তু পরীর মত সুন্দরী এমন একটা মেয়ে দেখে আজই বিয়ের ব্যবস্থা করুন, আমি আর কয়দিন।

তিনি থামিয়া দম লইলেন। চোখে জলের ধারা নামিল। আবার বলিলেন—ঠাকুরমশাই, আমার ছেলেটাকে একটু দেখবেন। ঐ বুড়ো রাক্ষস সব গিলবে বলে হাঁ করে আছে।

শ্যামানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় হরিনারায়ণদের অর্থাৎ মধ্যম তরফের কুলপুরোহিত। যজমানপ্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর ও কিছু জোত-জমি আছে। যজমানবাড়ীর সকল ক্রিয়াকর্ম্মের ভার তাঁহার উপর। এই সূত্রেও একটা বাঁধা আয় হয়। ইহা ছাড়া মহেশপুর, ত্রিলোকপুর, সানের, শেওড়াখোল, পঞ্চক্রোশী প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহার অনেক অবস্থাপন্ন শিষ্য আছে। অনেক শিষ্যের বাড়ী হইতে বার্ষিক বন্দোবস্ত আছে। পঞ্চক্রোশীর প্রসিদ্ধ জমিদার-পরিবার হইতে ব্রহ্মোত্তর দেওয়া আছে। দূরবর্ত্তী জায়গা, ব্রহ্মোত্তরের শস্য ভোগ করিতে পারেন না, শস্য উঠিলে বিক্রয় করিয়া জমিদার-সরকার হইতে টাকা পাঠাইয়া দেওয়া হয়। স্ত্রী সর্ব্বমঙ্গলা, একটি বালক-পুত্র, বিধবা ভগ্নী ও তাহার একটি কন্যা, এই কয়টি পোষ্য। সচ্ছল না হইলেও মোটামুটি চলিয়া যায়। এই অল্প আয় হইতে দান-ধ্যান বাবদ কিছু খরচ হয়।

বিদ্যারত্ন মহাশয় সুপণ্ডিত লোক। পিতা জীবিত থাকিতে প্রথম যৌবনে কয়েক বৎসর নবদ্বীপে ও পরে কোটালীপাড়ার প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের কাছে বহু আয়াস স্বীকার করিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার বড় সাধ রাজনগরে নিজ গৃহে একটি টোল খুলিয়া ছাত্র রাখিয়া বহু পরিশ্রমে

অধীত বিদ্যা তাহাদের শিখান। কিন্তু এতগুলি পোষ্য, মধ্যম তরফের কাজ ছাড়েন কি করিয়া? কাজ ছাড়িয়া দিলে যজমানের ব্রহ্মোত্তর ভোগ করিবেন কোন্ দাবিতে? উলিপুরের কুড়ি বিঘা উৎকৃষ্ট আউয়াল জমি তাঁহারা ব্রহ্মোত্তর দিয়াছেন। বছরে তিনটি করিয়া ফসল ঘরে আসে এই জমি হইতে। বছরে পাঁচ-ছয় মাসের খোরাকীর ধান, খেসারি, রাই, মটর, গম, কোন কোন বার চিনা পান। গাড়ী বোঝাই দিয়া বর্গাদার মেরুমোল্লা যখন উলিপুরের জমির ধান বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেয় তখন সে ধান দেখিয়া তাঁহার বুকে কত বল আসে। মেরুর মত বর্গাদার হয় না। মেরু সচ্ছল চাষী, অনায়াসে একটা চাকর সঙ্গে দিয়া গাড়ীগুলি পাঠাইতে পারে। তাহা সে করিবে না। বলে, ঠাকুর মশাইর বেন্মত্তুরের ধান, এক দানা ধান খোয়া গেলি আমার কলজ্যায় নাগে। নিজি হাতে যার জিনিশ তারে বুঝ দিয়্যা আসি। বুঝ দিলি আমিও খালাস, তিনিও খালাস।—যেবার ধানের ফলন কম হয়, ধান পৌঁছাইয়া দিয়া মেরু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দাড়ি চুলকায়। বলে—মাটি এবার বড় কন্নামো করছে ঠাকুরমশায়। তা একটা কথা আপুনারে কই। আপুনিও ছাওয়ালপুত নিয়্যা ঘর করেন, আমিও করি। খাতি বইসা তাগরে এক গেরাস ভাত কম হলি সেডা কলজ্যায় ছুরির ফলার মতন নাগে, কন কি না দেহি? আমি কই কি দরকার হলি আমারে বুলব্যাম। আল্লার দোয়ায় মেরুর চলে ব্যাকমতে। পাঁচ-দশ মোণ ধান আমি আপুনিরে খাতি দিয়া যামু। নতুন ফসল ভালমত হলি শোধ দিব্যাম নয় দিব্যাম না। না হলি আর দিব্যাম ক্যামনে?"—বেশ একটা রসিকতা করিয়াছে ভাবিয়া মেরু হাসিয়া উঠে।

ব্রহ্মোত্তর ছাড়িয়া দিলে তাঁহার চলে না, আবার ব্রহ্মোত্তর ভোগ করিয়া যজমানের ক্রিয়াকর্ম ছাড়িতে পারেন না। ক্রিয়াকর্ম না ছাড়িলে টোলে অধ্যাপনা করিবার সময় পাইবেন কখন? কাজেই বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মনের সাধ মনেই রহিয়া গিয়াছে।

রুদ্রনারায়ণ অতিশয় দুর্দান্ত, বদখেয়ালী ও বদমেজাজী লোক হইলেও ধর্মপ্রাণ, নিষ্ঠাবান ও সুপণ্ডিত বলিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়কে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। কোনও সূত্রে তাঁহার টোল খুলিবার আকাঙ্ক্ষার কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন—ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। কিন্তু ন'তরফের কর্তা রামলোচন দুষ্টগ্রহের মত রুদ্রনারায়ণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার বদখেয়ালে ক্রমাগত ইন্ধন যোগাইয়া, একটার পর একটা বৈষয়িক গোলযোগের মধ্যে ফেলিয়া মাকড়সার জালের মধ্যে মাছির মত তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন।

বিদ্যারত্ন মহাশয় কেন, গ্রামের অনেকেই জানিতেন ধূর্ত রামলোচন কি উদ্দেশ্যে জাল বিস্তার করিতেছেন। কিন্তু রাজনগরে তাঁহাকে কে ঘাঁটাইবে? কৌশলী ও দাঙ্গাবাজ বলিয়া সকলে তাঁহাকে ভয় করে। রুদ্রনারায়ণের সরিকদের মধ্যে যাঁহারা প্রবল, এক সরিকের হাত হইতে অন্য সরিককে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের কোন আগ্রহ ছিল না। দাঙ্গা বাধিলে এক পক্ষে দাঁড়ান যাইতে পারে। কিন্তু এ রকম ক্ষেত্রে তাঁহারা কি করিতে পারেন? তাহা ছাড়া হিংস্র ব্যাঘ্রের মত দুর্দান্ত রুদ্রনারায়ণকে যিনি বশ করিয়াছেন তিনি ত সহজ পাত্র নহেন। সমস্ত ব্যাপারটার পরিণতি দেখিবার জন্য তাঁহারা সকৌতূহলে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

রুদ্রনারায়ণের স্ত্রী-বিয়োগের পর রামলোচন ও রুদ্রনারায়ণের তাণ্ডব বৃদ্ধি পাইল। রুদ্রনারায়ণের স্ত্রীর অনুরোধের কথা বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মনে পড়িল। রামলোচনের অনুপস্থিতিকালে রুদ্রনারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কথাটা পাড়িলেন। রুদ্রনারায়ণ তাঁহার বক্তব্য ধীরভাবে শুনিলেন। বলিলেন, ছেলেও একটা আছে ঠাকুরমশাই, আবার বিবাহ কেন?

বিদ্যারত্ন মহাশয় সব কথা খুলিয়া বলিতে পারিলেন না। শুধু বলিলেন তাঁহার স্বর্গতা স্ত্রী তাঁহাকে এ বিষয়ে চেষ্টা করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন গৃহিণীশূন্য গৃহ তাঁহার হিতৈষী যজমান-বংশের এবং রুদ্রনারায়ণের নিজের পক্ষে অমঙ্গলজনক। অনুমতি পাইলে তিনি সদ্বংশজাতা, সুন্দরী কন্যার অনুসন্ধান করিতে পারেন।

রুদ্রনারায়ণ একটু হাসিলেন। বলিলেন, ঠাকুরমশাই, আমার কোষ্ঠীতে একটা ফাঁড়া আছে এক বৎসরের মধ্যে। বছরটা যাক, তারপর আপনি অনুসন্ধান করবেন।

চিন্তিতভাবে বিদ্যারত্ন মহাশয় বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন বাড়ীর ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রামলোচন দুই আঙুলে গুম্ফপ্রান্ত পাকাইতেছেন, মুখে একটু অমায়িক হাসি। বলিলেন, কি হে বিদ্যারত্ন, এদিকে কি মনে করে?

বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিলেন, কর্তার কাছে কিছু প্রয়োজন ছিল।

—তা ত বটেই। প্রয়োজন না থাকলে বিদ্যারত্ন আসে না, আমি জানি। প্রয়োজনটা কি বল দেখি।

বিদ্যারত্ন মহাশয় ভাবিলেন গোপন করিবার চেষ্টা অনাবশ্যক। সত্য কথা বলা ভাল। বলিলেন, কর্তা দ্বিতীয় বার বিবাহ করবেন কিনা জানতে এসেছিলাম।

শুনিয়া রামলোচন উৎসাহ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, আরে প্রস্তাবটা আমিই তোমার কাছে করব ভেবেছিলাম, ভাল কথা বলেছ বিদ্যারত্ন। তুমি পাত্রীর খোঁজ কর।

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মনে হইল রামলোচনের পাকা,

মোটা গোঁফের নীচে একটু বাঁকা হাসি দেখা দিয়া মিলাইয়া গেল। তিনি গমনোদ্যত হইয়া বলিলেন, আমি অনুসন্ধান করে ফলাফল আপনাকে জানাব।

রুদ্রনারায়ণের মুখে কাঁতার কথা শুনিয়া বিভারত্ন মহাশয় ভাবিলেন অপেক্ষা করা যাক। তিনি জানিতেন রুদ্রনারায়ণ মিথ্যা কথা বলেন না।

এইভাবে কিছুদিন চলিল। রুদ্রনারায়ণের শ্রী বাঁচিয়া থাকিতে দুই-একটি করিয়া মৌজা খসিতেছিল। এইবার খসিবার প্রক্রিয়া দ্রুত হইল। অতিরিক্ত পানাসক্তির ফলে রুদ্রনারায়ণ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। ধূর্ত শকুনি তাড়াতাড়ি জাল গুটাইতে লাগিল। বিভারত্ন মহাশয় দেখিলেন রুদ্রনারায়ণের সাধ্বী পত্নীর আশঙ্কা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইতে চলিয়াছে। তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, রক্ষার কোন উপায় করা যায় কিনা। উপায় কি করিবেন? রামলোচনকে অতিক্রম করিয়া রুদ্রনারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা পর্য্যন্ত অসম্ভব। তিনি রুদ্রনারায়ণের শ্বশুরালয় ত্রৈলোক্যপুরে গেলেন। সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া অনুরোধ করিলেন, তাহার মাতুলদের মধ্যে কেহ যেন হরিনারায়ণকে লইয়া রাজনগরে কিছু দিনের জন্ত যান। অবশেষে তাঁহারা রাজী হইলেন। বিভারত্ন মহাশয় রাজনগরে ফিরিয়া গেলেন।

হরিনারায়ণের পরীক্ষা শেষ হইলে যখন তাহার দ্বিতীয় মাতুল তাহাকে সঙ্গে লইয়া রাজনগরে পৌঁছিলেন তখন রুদ্রনারায়ণ মৃত্যুশয্যায়। হরিনারায়ণের সঙ্গে তাহার মাতুলকে দেখিয়া রামলোচন ঈষৎ বক্র হাস্যের সঙ্গে বিভারত্ন মহাশয়ের দিকে চাহিলেন। রুদ্রনারায়ণ মৃত্যুশয্যায় এ খবর ত তাঁহার শ্বশুরালয়ে পাঠানো হয় নাই।

তিন দিন পরে রুদ্রনারায়ণ মারা গেলেন। মাতুলের বয়স বেশী নয়, কিন্তু জমিদারীর কাজে তিনি সুদক্ষ ছিলেন। দুই চারি দিনের মধ্যে তিনি বুঝিতে পারিলেন, সেরেস্তার বারো আনার বেশী কর্ম্মচারী রামলোচনের লোক। ইহাদের হাতেই আদায় তহশীল ও মামলা মোকদ্দমার ভার। বাকী লোকগুলি কেবল দাঙ্গা-হাঙ্গামা বুঝে, জমিদারীর কাগজপত্র, মারপ্যাঁচের ব্যাপার তাহাদের মাথায় ঢোকে না। রামলোচনের সঙ্গে দুই একবার বৈষয়িক আলাপ করিবার চেষ্টা করিয়া মাতুল দেখিলেন তিনি শোকে এমন ভাঙিয়া পড়িয়াছেন যে বিষয়-সম্পত্তির মত তুচ্ছ ব্যাপারের কথা কানে লইতে পারেন না। সেরেস্তার কাগজপত্র যাহাদের হাতে তাহাদের কেহ স্ত্রী বিয়োগের, কেহ মাতৃবিয়োগের, কেহ পুত্রের গুরুতর অসুখের সংবাদ পাইয়া রাজনগর হইতে সরিয়া পড়িল।

মাতুল আসল ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া বিভারত্ন মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করিলেন। তারপর কোর্টে অভিভাবক নিযুক্ত সেরেস্তার কয়েকজন কর্ম্মচারীকে আনাইলেন। গ্রামের অন্যান্য সরিকদের বাড়ীতে যাতায়াত করিয়া রামলোচনের প্রতি তাঁহাদের মনোভাব বুঝিবার চেষ্টা করিলেন। দুর্দ্দান্ত কিন্তু সরলস্বভাব রুদ্রনারায়ণকে অভিভূত করিয়া রামলোচন তাঁহাকে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যাইতেছিলেন, তাঁহারা উদাসীনভাবে দেখিতেছিলেন। নিজেরা অগ্রসর হইয়া রুদ্রনারায়ণকে সৎপরামর্শ দিবার সাহস তাঁহাদের ছিল না, আগ্রহও ছিল না। রুদ্রনারায়ণের শ্যালকের আগমনে রামলোচনের চক্রান্তজাল ছিন্ন হওয়াতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

রামলোচন সরিকদের পরিবর্ত্তিত মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি আরও বুঝিতে পারিলেন, হরিনারায়ণের মাতুলের কাছ হইতে সরিয়া থাকিলে তাঁহার শত্রুপক্ষ প্রবল হইয়া তাঁহাকে বিপদে ফেলিতে পারে। শ্রাদ্ধ মিটিয়া গেলে শোক ত্যাগ করিয়া তিনি মাতুলের গললগ্ন হইলেন। বৈষয়িক কাজে পরামর্শ দিয়া, ঘন ঘন বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া সর্ব্বদা ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তিনি মাতুলের মন পাইতে সচেষ্ট হইলেন, কিছু কৃতকার্য্যও হইলেন।

হরিনারায়ণ পড়াশুনা করিবার জন্ত চলিয়া গেল। কোর্ট হইতে অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াও নিজের লোককে সেরেস্তায় বসাইয়া মাতুল রামলোচনকে বলিলেন যে তিনিই হরিনারায়ণের স্থানীয় অভিভাবক থাকিবেন, তবে কাজকর্ম্ম সদরের উকিল তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নির্দ্দেশমতে চলিবে। তিনি ত্রৈলোক্যপুরে ফিরিয়া গেলেন।

মোটা রকমের দাঁও মারিবার লোভ সংযত করিয়া রামলোচন ছোটখাটো ব্যাপারে মন দিলেন। বাগানটা, বাঁশঝাড়টা, পতিত ভিটা, এজমালী জলার বন্দোবস্ত, উঞ্ছবৃত্তি করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ভাবিয়া স্থির করিলেন, হরিনারায়ণ ছুটিতে রাজনগরে আসিলে সে যাহাতে পিতার পথ ধরিতে পারে সে বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না।

হরিনারায়ণ বাড়ী আসিলে তাহাকে বুকে ধরিয়া একবার কাঁদেন। পরের দিন হইতে পরলোকগত রুদ্রনারায়ণের নাম করিয়া তিন বার করিয়া প্রত্যহ চোখের জল ফেলেন। পাখী শিকার করিবার জন্ত হরিনারায়ণকে মুরলী বিলে পাঠান। অন্ত কোন সরিক তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে গোপনীয় বৈষয়িক পরামর্শের কথা তুলিয়া তাহাকে সরাইয়া লইয়া যান। দামী নূতন জামা, কাপড়, জুতা আনিয়া তাহার বাক্স ভরিয়া দেন; খরচের জন্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা তাহার হাতে দেন। হরিনারায়ণ তাঁহার আত্মীয়তায় মুগ্ধ

এই ভাবে বছর দুই চলিল। হরিনারায়ণের ইচ্ছা কলিকাতায় গিয়া পড়াশুনা করিবে। সেই কথাবার্তা চলিতেছে এমন সময় তাহার যে মাতুল রাজনগরে গিয়াছিলেন ঘোড়া হইতে পড়িয়া তিনি আহত হইলেন এবং কয়েক দিনের মধ্যে মারা গেলেন। জ্যেষ্ঠ মাতুল হরিনারায়ণকে উপদেশ দিলেন রাজনগরে ফিরিয়া বিষয়সম্পত্তি বুঝিয়া লও। বলিলেন, এখন বুঝিয়া না লইলে কিছু রাখিতে পারিবে না। ত্রৈলোক্যপুরের আমলাদের কয়েক জনের রাজনগর হইতে এখানে ফিরিয়া আসা আবশ্যক। তোমাকে কাজকর্ম বুঝাইয়া দিয়া তাহারা আসিবে। হরিনারায়ণ অত্যন্ত হতাশ হইল। সে মনে মনে স্থির করিয়াছিল কলেজে গোটা কয়েক পাশ দিয়া সে বিলাত যাইবে ব্যারিষ্টার হইবার জন্ত। মাতুলের আদেশে বাধ্য হইয়া পড়াশুনা বন্ধ করিয়া তাহাকে রাজনগরে ফিরিতে হইল।

রামলোচন ভাবিলেন এইবার যে সুযোগ আসিয়াছে তাহা অবহেলা করা উচিত হইবে না। সম্পর্কে ভ্রাতুষ্পুত্র ভিন্ন পৌত্রের বয়সী হরিনারায়ণকে পিতার পথ ধরাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে তিনি ছিন্ন চক্রান্ত-জালে তালি দিয়া আবার কর্মতৎপর হইলেন।

হরিনারায়ণের ইয়ার বন্ধু জুটিতে লাগিল একে একে। রামলোচন এবার আড়ালে থাকিয়া দাবার ঘুঁটি চালিতে লাগিলেন। হরিনারায়ণ অন্ত আবহাওয়ায় মানুষ হইয়াছিল। রাজনগরের তরুণ বকাটে সম্প্রদায়ের হালচাল ধরিতে সময় লাগিল। বিদ্যারত্ন মহাশয় রামলোচনের এই নূতন চালের সংবাদ শীঘ্রই জানিতে পারিলেন। তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। কুসঙ্গে পড়িয়া এই বয়সে হরিনারায়ণ যদি বিগড়াইয়া যায় তো বর্ত্তমান বংশের মঙ্গলের জন্ত তিনি এ পর্য্যন্ত যে ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন তাহা পণ্ড হইয়া যাইবে। কয়েক দিন চিন্তা করিয়া তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। এই সম্পর্কে তাঁহাকে একবার অসময়ে পঞ্চক্রোশী গ্রামে তাঁহার শিষ্য কালীনাথের গৃহে যাইতে হইল। কয়েক দিন সেখানে থাকিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। ভাবিলেন এবার হরিনারায়ণের সঙ্গে আলোচনা করিয়া তাহার মনোভাব অবগত হওয়া প্রয়োজন।

হরিনারায়ণ শিকারচর্চা লইয়া এমন মাতিয়া ছিলেন যে অন্ত আমোদের পথে তাহাকে টানিবার চেষ্টা সফল হয় নাই। বৃদ্ধ রামলোচন এ সংবাদ পাইলেন।

সেদিন রাত্রে শয়ন করিতে গিয়া হরিনারায়ণ দেখিলেন তাঁহার পিতার আমলের পরিচারক মদনের পরিবর্ত্তে একটি মেয়ে তাহার খাটের পাশে ছোট চৌকিতে জলের গ্লাস ও পানের ডিবা রাখিতেছে। হরিনারায়ণ দরজার কাছে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পায়ের শব্দ পাইয়া চকিতে একবার সেদিকে চাহিয়া মেয়েটি ঘরের এক কোণে গিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল।

মেয়েটি কৈবর্ত্তপাড়ার বিধবা। বয়স অল্প, রং ময়লা, দেখিতে সুশ্রী। মাথার কাপড় খানিকটা টানিয়া দিয়া সে ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া রহিল। হরিনারায়ণ ঘরে ঢুকিয়া একবার তাহার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, বলিল, তুমি যাও, মদনকে ডেকে দাও।

মেয়েটি দরজা পর্য্যন্ত যাইতে হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিল, শোন, তোমাকে কে বহাল করেছে? কত দিন কাজ করছ এ বাড়ীতে?

মেয়েটি মাথা নামাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া হরিনারায়ণ বলিলেন, আচ্ছা তুমি যাও, মদনকে ডেকে দাও।

মদন আসিলে তাহার কাছে হরিনারায়ণ শুনিল যে ম' তরফের বুড়া কর্ত্তা মেয়েটিকে আজ কাজে বহাল করিয়াছেন। তাহাকে বলিয়া দিয়াছেন বাবুর কাজ এখন হইতে ও করিবে। একটু হাসিয়া মদন বলিল, কর্ত্তা বলেন এখন নতুন বন্দবস্ত দরকার।

মদন এই ব্যবস্থায় আপত্তি করিবার কিছু দেখিল না। ইহাতে অন্তায় বা আশ্চর্য্যের কথা কি আছে? রাজনগরের বাবুদের ঘরে ঘরে তো এই ব্যবস্থা।

হরিনারায়ণ কোন উত্তর না দিয়া মদনকে বিদায় দিল। সে শুইয়া পড়িল, কিন্তু ঘুম আসিতে চাহিল না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এক কোণে জড়সড় হইয়া দাঁড়ানো মেয়েটার মূর্ত্তি চোখের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল।

ভাল ঘুম না হওয়াতে খুব সকালে বিছানা হইতে উঠিয়া হরিনারায়ণ বেড়াইতে বাহির হইল। ভাবিল মুরলী বিলের মাঠে যাইবে, খোলা হাওয়া লাগিয়া শরীরটা সুস্থ হইতে পারে। বাড়ীর সম্মুখের পথ ধরিয়া রায়বাগানের পাশ দিয়া অগ্রসর হইল। বনদুর্গাতলার কাছে আসিতে দেখিল জ্ঞানানন্দ বিদ্যারত্ন আসিতেছেন। হরিনারায়ণ তাঁহাকে প্রণাম করিল। বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিলেন, তোমার কাছে আমার কিছু প্রয়োজন আছে বাবা। আজ তোমার বাড়ী যাব স্থির করেছিলাম। এত সকালে বের হয়েছ, শরীর মন ভাল আছে ত?

হরিনারায়ণ বলিল, সকালে ঘুম ভেঙে গেল, তাই বেরিয়ে পড়লাম। আপনার কি কাজ আছে এখন বলবেন?

বিদ্যারত্ন মহাশয় একটু চিন্তা করিলেন। বলিলেন, এখনই বলব? সেই ভাল, একটু সময় লাগবে। তুমি কি আমার সঙ্গে আসবে?

—চলুন।

বিদ্যারত্ন মহাশয় তাহাকে লইয়া নিজ গৃহের দিকে চলিলেন

বাড়ীর বাহিরের উঠানে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের আট বৎসরের পুত্র খেলা করিতেছিল। পিতার সঙ্গে হরিনারায়ণকে দেখিয়া খেলা ফেলিয়া দৌড়াইয়া সে মাতাকে সংবাদ দিবার জন্ত ভিতরে চলিয়া গেল।

হরিনারায়ণকে কাছে বসাইয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় অনেক কথা বলিলেন। শেষে বলিলেন, আমরা বংশানুক্রমে তোমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তোমার স্বর্গীয়া সাধ্বী মাতা অনুরোধ করেছিলেন তোমার যাতে কোন অনিষ্ট না হয় সেদিকে যেন লক্ষ্য রাখি। তোমার পিতা যখন মৃত্যুশয্যায় তখন তোমার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তোমার মাতুলদের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম। তাঁদের হস্তক্ষেপের ফলে তোমার পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি গুরুতর ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। তুমি বালক, নিজের অনিষ্টকারীদের স্বরূপ বুঝতে অক্ষম। এখন তোমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করবার কথা আমাকে ভাবতে হচ্ছে। আমার উপদেশ অনুসারে চললে তোমাদের বংশের মঙ্গল হবে আশা করছি। আর যদি সঙ্গীদের ইচ্ছায় চলতে চাও তবে শীঘ্রই রাজনগর ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাব। চোখের সম্মুখে একটার পর একটা অমঙ্গল ঘটতে দেখতে পারব না।

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া হরিনারায়ণ একটু আশ্চর্য্য হইল। অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে তিনি শেষের কথাগুলি বলিলেন। হরিনারায়ণ জানিত বিদ্যারত্ন মহাশয় বয়সে অপ্রবীণ হইলেও তাহার স্বর্গতা জননী তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। এই কারণে সেও তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত। সে বলিল, আপনার উপদেশ কি বলুন।

বিদ্যারত্ন মহাশয় একটু আশ্বস্ত হইলেন। বলিলেন, আমি একটি সুলক্ষণা, সুন্দরী পাত্রী দেখেছি তোমার জন্ত। পাত্রীর পিতামহ দেশবিখ্যাত প্রবল পরাক্রান্ত ভূস্বামী ছিলেন। পাত্রীর পিতৃবংশ মর্য্যাদায় তোমাদের তুল্য। তোমার জ্যেষ্ঠ মাতুল রাজনগরের অবস্থা বিশেষ জানেন না, তাঁর সময়াভাবও বটে। এখানে বিবাহ করলে তুমি এক জন প্রবল সহায় পাবে। যদি তুমি মত কর আমি তাঁর নিকট গিয়ে সকল বিষয় স্থির করে আসব।

প্রস্তাব শুনিয়া হরিনারায়ণ মাথা নীচু করিয়াছিল। বিদ্যারত্ন মহাশয় উত্তরের জন্ত অপেক্ষা করিয়া আছেন দেখিয়া বলিলেন, বড় মামার সঙ্গে পরামর্শ করে আপনি যেমন ভাল বুঝেন করুন।

বিদ্যারত্ন মহাশয় আসন ছাড়িয়া উঠিয়া হরিনারায়ণের মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলিলেন, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

ক্রমশঃ

নিরুপমা দেবী

শ্রীসুষমা সিংহ

নিরুপমা দেবীর সহিত আমি বিশেষ ভাবে বহুদিন ধরিয়া পরিচিত ছিলাম। তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা ছাড়া ব্যক্তিগত জীবনের কথাও কিছু জানিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল। ইনি বয়স্কদের বড়দি ও কিশোরকিশোরীদের 'মা-মণি' নামেই বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁর ছাঁটা চুলে ও শুভ্র বস্ত্রেই তিনি সকলের নমস্যা ছিলেন। বড়দি নিজে কোন স্কুল-কলেজে পড়িবার সুযোগ বা অবসর পান নাই, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। বহরমপুর বালিকা বিদ্যালয় (অধুনা কাশীশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়) স্থাপনে তাঁর উৎসাহ ও সচেষ্টতা যথেষ্ট ছিল। নানা স্থানে তিনি সভানেত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। আমাদের সহিত প্রত্যহ স্কুলের কাজ করিয়াছেন, নানা রকম বারব্রত, উপবাস সত্ত্বেও কাজের উন্মাদনায় মাতিয়াছেন, কখনও না বলেন নাই। মহিলা-সমিতিতে তিনি সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন ও নানা যুক্তি-পরামর্শ দিতেন। আজ সে সব মনে পড়ে।

তিনি যে কত উচ্চশ্রেণীর লেখিকা ছিলেন তাহা তাঁহার 'দিদি', 'শ্যামলী' ও 'অন্নপূর্ণার মন্দির' পাঠেই বুঝা যায়। 'অন্নপূর্ণার মন্দির' চলচ্চিত্রে দেখিয়া ব্যথিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "একি করেছে এরা? মূল বইটার সকল মাধুর্য্য নষ্ট হয়ে গেল?" এক দিন প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলাম, "বড়দি, সকলে বলে যে 'দিদি' নাকি আপনার জীবনের ঘটনা।" তিনি বিষণ্ণ ভাবে বলিলেন, "সে সুযোগ হ'ল কোথায় ভাই? নয় বছরে বিয়ে হয়ে চোদ্দ বছরে বৈধব্য লাভ।" তিনি সকল লেখাই সরল ও অনাড়ম্বর ভাষায় জোরালো ভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। বহুস্থানে তাঁহার সুললিত কণ্ঠস্বরে মূল রামায়ণ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত আবৃত্তি শুনিয়াছি, সে যেন কণ্ঠ হইতে অমিয়ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। আজও তাঁহার উপন্যাসের চরিত্রাবলী মনে জলজল করিয়া উঠে। সহজ ও সরল ভাষায় রচিত, কি সুন্দর লেখার ভঙ্গী! তাই এখনও দুঃখবিড়ম্বিতা 'সতী'র চরিত্র মনকে ব্যথিত করিয়া তুলে। বোবা মেয়ে শ্যামলী ছাদের প্রাচীরে চুল এলাইয়া সন্ধ্যাকালের রঙীন গোলাপী রঙের খেলা দেখিতেছিল। তার এবং সুরমার তার মেয়ে দীপ্ত সতেজ ভঙ্গী লইয়া দৃঢ় চরণে অকুণ্ঠ গতিতে ঘরে ঘরে আসুক। বারবার পড়িলেও এ সকল কখনও পুরানো হইবে না।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

কথিত আছে, মা যশোদা শিশু শ্রীকৃষ্ণকে সংযত করিবার জন্য তাঁহাকে কোমরে দড়ি (দাম-রজ্জু) দিয়া বাঁধিয়াছিলেন। দুরন্ত দেবশিশু তাহা ছিন্নভিন্ন করিয়া, দামরাজি উদরস্থ করিয়া "দামোদর" হওয়ায় সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

সার্থক নাম দামোদর নদের। শত শত বর্ষব্যাপী প্লাবন ও বন্যার ফলে পশ্চিমবঙ্গে দামোদরের সর্ব্বগ্রাসী কুখ্যাতি সর্ব্বজনবিদিত হইয়া আছে। এই দুর্দ্দান্ত নদকে বাঁধনের মধ্যে আনিবার জন্য কতবার বাঁধ দেওয়া হইয়াছে, এবং বর্ত্তমানেও শতাধিক মাইলব্যাপী বাঁধ, বর্দ্ধমান হইতে প্রায় গঙ্গাসঙ্গম পর্য্যন্ত, নদের পূর্ব্বকূল বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এ সকল বন্ধন ভাঙিয়া-ছিঁড়িয়া দামোদর দেশ ভাসাইয়া দুঃখের প্লাবন বৎসরের পর বৎসর চালাইয়াছে।

ইংরেজ আমলের নথীপত্রে দেখা যায় যে, ১৮২৩, ১৮৪৮, ১৮৫৬, ১৮৫৯, ১৮৬৩, ১৮৮২, ১৮৯০, ১৮৯৮, ১৯০১, ১৯০৫, ১৯০৭, ১৯১৩, ১৯১৬, ১৯২৩, ১৯৩৫ এবং ১৯৪৩ সালে দামোদরের বিস্তৃত প্লাবনে দেশের বিষম দুর্দ্দশা হইয়াছিল। ঐ সকল বন্যায় কত শত কোটি টাকার সম্পত্তি, কত শতসহস্র হতভাগ্য লোকের জীবন, কত শত গ্রাম এই সর্ব্বগ্রাসী নদের উদরস্থ হইয়াছে তাহার হিসাব নাই।

অথচ ঐ নদেরই বর্ষা-প্রবাহের জল, যাহা শুধু ধ্বংসলীলায় মাতিয়া সাগরের দিকে ছুটিয়া যায়, যদি আংশিকভাবেও বাঁধিয়া ধরিয়া রাখা যাইত, তবে বাংলার প্রায় ত্রিশ লক্ষ বিঘা জমিতে সোনার ফসল ফলিত। বহু বার বহু বিচক্ষণ সেচতত্ত্ববিদ্ সেকথা বলিয়াছেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাহাতে কর্ণপাতও করেন নাই, কেননা বাঙালীর, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর, সর্ব্বনাশই ছিল তাহার মনের কামনা। শেষে দামোদর নদই বাধ্য করিল ব্রিটিশ সরকারকে এদিকে নজর দিতে।

১৯৪৩ সালে, যখন মিত্রশক্তিপুঞ্জ জাপানের সঙ্গে মরণ-বাঁচনের যুদ্ধে ব্যস্ত, সেই সময় দামোদর বাঁধ ভাঙিয়া, রেলপথ, রাজপথ, নদীনালা ভাসাইয়া প্রলয়-তাণ্ডবে মাতিয়া উঠে। ১৮ই জুলাই হইতে ৮ই অক্টোবর পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের উপরের ষ্টেশনগুলির সঙ্গে বৃহত্তর কলিকাতার নৌবন্দর ও বিশাল কলকারখানার যোগাযোগের একমাত্র পথ ছিল বহু ঘুরাইয়া বেঙ্গল-নাগপুর রেলের পথে। মার্কিন, ইংরেজ ও দেশী ইঞ্জিনীয়ারদিগের প্রাণপণ অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সরকারী কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে পথঘাট ও রেলবর্ত্ম মেরামত হয়। সেই নিদারুণ শিক্ষার ফলে ব্রিটিশ সরকার আমেরিকা হইতে বিশেষজ্ঞ আনাইয়া দামোদরের বন্যারোধের একটা সমুচিত ব্যবস্থার এবং সেই সঙ্গে সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ব্যাপক পরিকল্পনা করাইয়াছিলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টেনেসী নদীর ইতিহাসও অনেকটা দামোদরের ন্যায়। সেখানকার রাষ্ট্রকর্তারা নদীতে বাঁধ দিয়া এবং ভূমি-সংরক্ষণের ব্যাপক ব্যবস্থা করিয়া টেনেসী উপত্যকার শ্রী ফিরাইয়া আনিয়াছেন। বিরাট বিদ্যুৎ-উৎপাদনশালা, বিস্তৃত নৌচালনপথ নির্ম্মাণ—এই সকল ছিল ঐ ব্যবস্থার অঙ্গ। ব্রিটিশ সরকার ঐ টেনেসী উপত্যকা পরিকল্পনাকারী বিশেষজ্ঞদেরই ধার করিয়া আনাইলেন যুক্তরাষ্ট্র সরকার হইতে। এদেশে আগত এই বিশেষজ্ঞদিগের প্রধান ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন মিঃ ভর্ডুইন (Mr. Voorduin)। দামোদর-উপত্যকা-পরিকল্পনা প্রধানতঃ ইঁহারই রচিত, যদিও পরে নানা নূতন তথ্যের বলে সেই মূল পরিকল্পনার অনেক অদল-বদল ও বৃদ্ধি হইয়াছে। মূলতঃ এই পরিকল্পনার চারিটি অঙ্গ—যথা, বন্যারোধ, সেচব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন এবং নৌচালনের ব্যবস্থা।

দামোদরের উৎপত্তিস্থল ছোটনাগপুরের পর্ব্বতমালা। আজও সেখানকার প্রাকৃতিক শোভা মানুষের অশেষ অত্যাচার সত্ত্বেও অতি সুন্দর। আগেকার দিনের শ্যামল বনরাজি আজ প্রায় উজাড় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও গিরি, অধিত্যকা, উপত্যকা, নির্ঝর ও প্রপাতের দৃশ্য আজও মনোহর। এখানে সমুদ্র-পৃষ্ঠতল হইতে প্রায় ২০০০ ফুট উচ্চে নদের উৎস-স্থল। ক্রমে নীচে নামিয়া আশপাশের ছোট-বড় পার্ব্বত্য নদী-নালার সঙ্গে মিলিয়া, দামোদর রামগড় উপত্যকার মধ্যদিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব মুখে চলিয়াছে। রামগড় উপত্যকায়, বিশেষতঃ রাজরপ্পায় যেখানে দামোদর পর্ব্বতবক্ষ ভেদ করিয়া গিরিকন্দর সৃষ্টি করিয়াছে, সেখানে শরৎকালের পর দামোদরের রূপ অতি মনোরম। এ যেন গিরিনির্ঝর। কবিগুরুর ভাষায়:

"রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া, দিবরে পরান ঢালি।
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল, গেয়ে কলকল, তালে তালে দিব তালি।"

ছোটনাগপুর পার হইয়া মানভূমের ভিতর দিয়া নদ

চলিয়াছে, পশ্চিম বাংলার সমতলভূমির দিকে। নদের গতিবেগ প্রথমে দ্রুত, কেননা প্রথম ১৫০ মাইলে স্রোতধারা প্রায় ১৫০০ ফুট নামিয়া আসে, তারপর ক্রমে গতি কিছু মন্দীভূত হয়, নদবক্ষও ক্রমে প্রসারিত হইয়া আসে। এই ভাবে বিহারের ১৮০ মাইল অতিক্রম করিয়া দামোদর পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে এবং এখানেই বরাকর নদী আসিয়া তার সঙ্গে মিলিয়া যায়। নদবক্ষ এখানে বেশ প্রশস্ত, কেননা

"ক্ষুদে মুনে বরাকর
খেয়ে মোটা দামোদর।"

প্রথমে এক দিকে মানভুম অন্য দিকে বাঁকুড়া তার পরে এক পারে বাঁকুড়া ও অন্য দিকে বর্দ্ধমান জেলা—এই ভাবে নদ চলে বর্দ্ধমানের দিকে। আরও ৭০ মাইল যাইবার পর, বর্দ্ধমানের রাঙামাটি যেখানে সমতলভূমির ধূসর ধূলার সঙ্গে মিলিয়াছে, সেখানে নদ হঠাৎ ঘুরিয়া সোজা দক্ষিণ মুখে চলে সাগরের দিকে। নদের গতি এখানে মন্থর, কেননা শেষ ৯০ মাইলে নদ নামিয়াছে মাত্র ৮০-৯০ ফুট। অবশ্য এই গতিবেগ শরৎকালের শেষ হইতে গ্রীষ্মের শেষ পর্য্যন্ত। সমুদ্রযাত্রার পথে, নদের পূর্ব্বতট বর্দ্ধমান হইতে গঙ্গাসঙ্গম পর্য্যন্ত প্রায় সমস্তটাই বাঁধ দেওয়া। আরও নিম্নে নদের সঙ্গে যোগ দেয় দ্বারকেশ্বর, গন্ধেশ্বরী, শিলাই, শেষে মিলিত হয় রূপনারায়ণ। তারপর কলিকাতার প্রায় ত্রিশ মাইল নীচে দামোদরের গঙ্গাসঙ্গম হয়। নদের আকৃতি-প্রকৃতি শরৎ হইতে গ্রীষ্ম ঋতুর শেষ পর্য্যন্ত অতি সুন্দর। স্বচ্ছ সলিলের ক্ষীণ ধারা শুভ্র বালুরাজির উপর রূপালী রেখা টানিয়া চলিয়াছে, নিরীহ, শান্ত স্রোতস্বতীর মত। ক্রমে ইহা পরিণত হয় ঘুমন্ত নদীতে।

কিন্তু বর্ষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নদ নিজ রূপ ধারণ করে। সেই সুন্দর পার্ব্বত্য স্রোতস্বতীর কুলু কুলু গানের সুরের পরিবর্ত্তন হইয়া ক্রমে দাঁড়ায় উদাত্ত স্বরের অট্টহাস্যে; পরে নদের ভৈরব নিনাদে সমস্ত উপত্যকা আলোড়িত হইতে থাকে। তারপর বরাকরের ফেনিল জলরাশি আসিয়া যোগ দেওয়ায় দামোদর উন্মত্ত দানবের মত গর্জ্জিয়া ছুটিয়া চলে পশ্চিম বাংলার সমতলের উপর দিয়া। উপত্যকার অববাহিকা অঞ্চলে, যদি অকস্মাৎ প্রবল বারিপাত হয় তাহা হইলে আর দামোদরকে রোখে কে? নদ যেন ক্ষিপ্ত হইয়া প্রলয়-তাণ্ডবের রুদ্রতালে দুই ধারের বাঁধ ও তটের উপর প্রচণ্ড আছাড় খাইতে থাকে। বন্যার জলে দিগ-দিগন্ত প্লাবিত হইয়া যায়, আর যদি বাঁধ ভাঙে তবে দেশব্যাপী হাহাকার পড়িয়া যায়।

এখন এই রকমটা হয় কেন তাহাও দেখা প্রয়োজন। এই দামোদর উপত্যকায় বৃষ্টিপাত হয় গড়ে বৎসরে ৪৬·৫ ইঞ্চি। কিন্তু কোনও বৎসর হয় অল্প, মাত্র ৩০·৬ ইঞ্চি, আবার কোনও বৎসর হয় প্রায় ৬৫ ইঞ্চি। এই বৃষ্টির শতকরা ৯০ ভাগ পড়ে আষাঢ় হইতে আশ্বিনের শেষ পর্য্যন্ত চার মাসে আর বাকি দশ ভাগ পড়ে কার্ত্তিক হইতে জ্যৈষ্ঠের শেষ পর্য্যন্ত। কাজেই নদের প্রবাহ বৎসরের ছয় মাস থাকে ক্ষীণ ও শীর্ণ, দুই মাস থাকে পূর্ণ ও প্রবল আর চার মাস থাকে উদ্দাম, প্রচণ্ড এবং ভয়ঙ্কর। এই একই কারণে দামোদরের উপত্যকায় কৃষিও দুর্দ্দশাগ্রস্ত, কেননা কোনও বৎসর অনাবৃষ্টিতে শস্য শুকাইয়া যায় আবার অন্য বৎসর বন্যার জল আসিয়া ক্ষেত ডুবাইয়া ফসল ভাসাইয়া দেয়। রবিশস্যের সময় জলাভাবে চাষ হয় না।

আসলে দামোদর উপত্যকার উত্তর অঞ্চলের বনানী কাটিয়া নির্ম্মূল করায় অববাহিকা অঞ্চল বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিতে পারে না, পাহাড়ের কুক্ষিতে জল জমে না, সুতরাং উৎসগুলিতে সারা বৎসর জলের ধারা থাকে না। মানুষের অপরিণামদর্শিতার ফলে দামোদর এইরূপ সর্ব্বনাশা দানবে পরিণত হইয়া আছে।

বর্ষার চার মাসের জলের একটা অংশমাত্রও যদি ধরিয়া রাখা যাইত তবে নদের ঐ সংহার-মূর্ত্তিরও পরিবর্ত্তন হইত এবং দেশও সুজলা সুফলা হইয়া ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইত। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার উদ্দেশ্যই তাই। দামোদর ও তাহার শাখা-প্রশাখা নদীগুলিতে আটটি বাঁধ বাঁধিয়া বিরাট বিরাট কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি করা হইবে, যাহাতে বর্ষার জলের বেশ কিছু অংশ সঞ্চিত করিয়া রাখা হইবে সারা বৎসরের জন্য। এই বাঁধ দেওয়ার ফলে জলের তোড় ও প্রবাহের বিস্তার কমিয়া গেলে বন্যার ভয় হইতে দেশ রক্ষা পাইবে এবং ঐ সঞ্চিত জল ধীরে ধীরে ছাড়িয়া সারা বৎসর সেচের কাজ চলিবে। ১৫৫০ মাইল সেচখাল কাটা পরিকল্পনায় আছে, যাহাতে প্রায় ত্রিশ লক্ষাধিক বিঘা ক্ষেতে সম্বৎসর সেচ চলিবে। সেই সঙ্গে বাঁধের কৃত্রিম জলপ্রপাতের সাহায্যে প্রায় ২৪০,০০০ কিলোওয়াট্ বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হইবে এবং উহার সঙ্গে বাষ্প-জনিত ২০০,০০০ কিলোওয়াট্ বৈদ্যুতিক শক্তি যোগ করিয়া দেওয়া হইবে, যাহাতে জলের স্রোত কমিলেও বিদ্যুৎ সরবরাহের কোনও ইতরবিশেষ না হয়। এই বিদ্যুৎ সরবরাহ ৪৭৫ মাইল দীর্ঘ তারের লাইনের গ্রিডে চালানো হইবে। দুর্গাপুরের কাছে সেচবাঁধ ও সেচখালগুলির মুখ বসিবে এবং সেখান হইতে কলিকাতার উত্তরে, গঙ্গায় কাঁচড়াপাড়ার অপর পার পর্য্যন্ত, ৯০ মাইল দীর্ঘ নৌ-চলাচলের খাল কাটা হইবে।

ঐ পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হইলে দেশে কমপক্ষে

প্রায় এক কোটি মণ খাদ্যশস্য বাড়িবে, বন্যার ভয় দূর হইবে এবং দেশের আয় মুখ্যভাবে ২৫ কোটি টাকার মত বৃদ্ধি পাইবে। অন্য দিকে ছোটবড় অসংখ্য কলকারখানা সস্তায় বিদ্যুৎশক্তি পাওয়ায় লক্ষ লক্ষ লোকের অন্নসংস্থানে সাহায্য করিবে। কিন্তু এ সবই সময় ও বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঠিক এইমত অবস্থায় টেনেসী উপত্যকা পরিকল্পনার উদ্ভব হয়। এখন তাহা সম্পূর্ণভাবে বাস্তব রূপ ধারণ করিয়াছে এবং সকল দিকেই পরিকল্পনাকারীদিগের অভিপ্রেত ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হইয়াছে। সে দেশের আয় বহু গুণ বাড়িয়াছে এবং ক্ষয়িষ্ণু দেশের শ্রী একেবারে ফিরিয়া গিয়াছে। সুতরাং এইরূপ পরিকল্পনা আকাশকুসুম নহে।

বকারো থারমেল 'পাওয়ার ষ্টেশনে'র ইস্পাতের কাঠামো

কিন্তু দেশ দরিদ্র এবং এইরূপ ব্যবস্থাকে বাস্তব রূপ দিতে হইলে জলস্রোতের ন্যায় অর্থব্যয় করিতে হয়। সে কথা বিচার করিয়া পরিকল্পনাটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ১৯৪৮ সালে 'দামোদর ভ্যালি করপোরেশন' নামক একটি পরিচালক সমিতি গঠন করিয়া তাহার হাতে পরিকল্পনার ভার দেওয়া হয়। এই সমিতি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন, কেবলমাত্র আয়ব্যয়ের হিসাব ভারত-সরকারের নিকট দাখিল করিতে হয়।
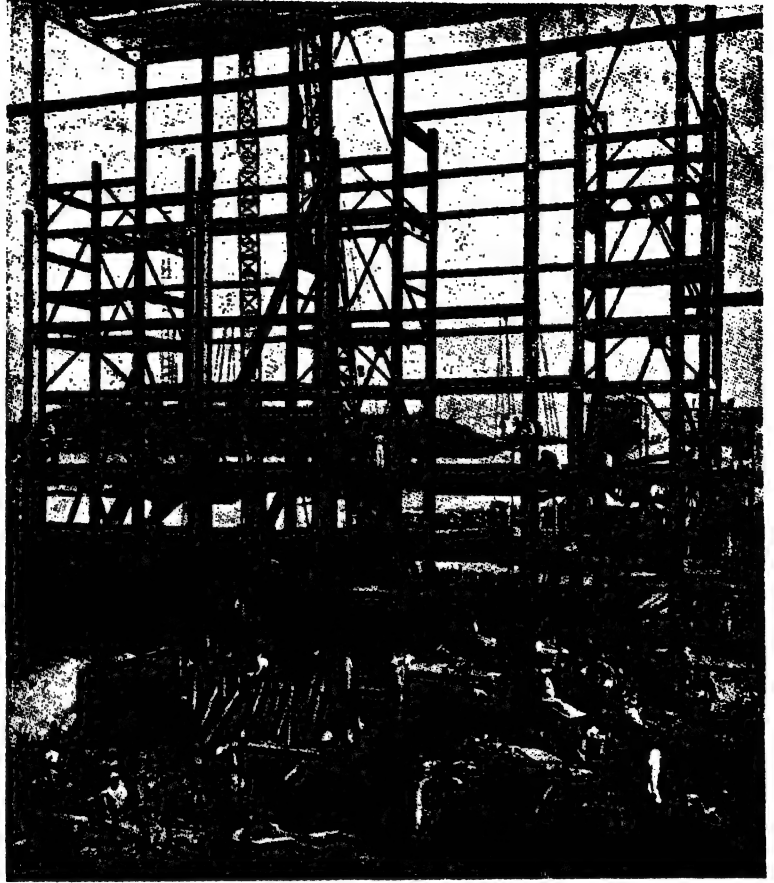
যে দুই ভাগে পরিকল্পনা বিভক্ত করা হয় তাহার প্রথম অংশে টিলাইয়া, কোণার, মাইথন ও পাঁচেট (পঞ্চকোট) পাহাড়ে চারিটি বড় বাঁধ ও হ্রদ নির্ম্মিত হইবে, সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাপুরের উপরে সেচবাঁধটি এবং সেখান হইতে মূল সেচখালগুলি কাটা হইবে। জলীয় বৈদ্যুতিক শক্তিকেন্দ্রগুলি ঐ বাঁধগুলিতে গঠিত হইবে এবং বকারোতে বিরাট বাষ্পজনিত বিদ্যুৎশালাও স্থাপিত হইবে। নৌচালন খালও দুর্গাপুর হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত কাটিবার আয়োজন চলিতেছে। দামোদর ভ্যালি করপোরেশন ক্ষমতা-প্রাপ্তির পরের আড়াই বৎসরে প্রথম তিনটি বাঁধ ও বাষ্প-জনিত বিদ্যুৎশালা নির্ম্মাণের কাজে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, পাঁচেট পাহাড়ের বাঁধ ও খাল কাটার ব্যাপার এখনও আয়োজনের পর্য্যায়ে আছে।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, এই বিরাট পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে অসংখ্য নানাবিধ খুঁটিনাটি ছোটবড় ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যে সকল জায়গায় বাঁধ দেওয়া হইবে সেখানে কয়েক হাজার ঘর অতি দরিদ্র লোকের বসতি ও ক্ষেত-কৃষি আছে, যাহাদের অধিকাংশই আদিবাসী। তাহাদের সরাইয়া লইয়া নূতন ক্ষেতের ব্যবস্থা করিয়া ও নূতন গ্রাম পত্তন করিয়া দিতে হইবে। অনেক অঞ্চল ম্যালেরিয়ায় জর্জ্জরিত, সেখানে শ্রমিক-মজুরের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ম্যালেরিয়া বিতাড়ন, চিকিৎসা ও হাসপাতালের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। তাহার পর ভূমি-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা সর্ব্বপ্রথমেই প্রয়োজন, কেননা আবহাওয়ার প্রকোপে ও জলস্রোতের দাপটে বৃক্ষলতাহীন গিরিপ্রান্তর ও উর্ব্বর ধানক্ষেত-

সকল কাটিয়া ও ধুইয়া শস্যহীন খোয়াই-নালা ও উঁচুনীচু মুরুমের ঢিপিতে পরিণত হইতেছে। ইহাতে নদীবক্ষে বালুপ্রস্তর ও পলিমাটি পড়িয়া তাহার প্রবাহপথ সঙ্কীর্ণ ও উঁচু হইতেছে, যাহার ফলে নদীবক্ষে বন্যার জলের স্থানাভাব হওয়াতে উহা তট ছাপাইয়া দেশ প্লাবিত করিতেছে।

এরূপ অবস্থায় বাঁধ দিয়া হ্রদ সৃষ্টি করা কাজের কথা নহে। কেননা হ্রদ যদি দশ-বিশ বৎসরে বালি, পাথর ও মাটিতে ভরিয়া যায়, তবে তাহাতে জল ধরিবে কোথায়? ক্ষেত্রের মাটি যদি গলিয়া-ধুইয়া নদীতে পড়ে তবে উষর কাঁকরে জলসেচ দিয়া শস্যলাভের আশা কোথায়? আবার দামোদরের অববাহিকার উপরের পাহাড়ী অঞ্চলের, গিরি-অধিত্যকা-পর্ব্বতমূলের, কর্ত্তিত ও লুপ্ত বনরাজি পুনর্ব্বার না জন্মাইলে সেখানে প্রবল বারিপাত হইলেই বাঁধের গায়ে দামোদরের "হড়পার" প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলিতে থাকিবে। সুতরাং বাঁধের স্থিতি ও আয়ু নিশ্চিত রাখিবার জন্য সেখানকার বনানীর পুনরাবির্ভাব নিতান্তই প্রয়োজন। এ সকলেরই ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক এবং এ কাজ এখন সমানে চলিতেছে। জরীপ ও এরোপ্লেনে গৃহীত ফোটোর সাহায্যে সমস্ত দামোদর উপত্যকার নক্সা তৈয়ারী চলিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ভূমি-সংরক্ষণ, স্বাস্থ্যরক্ষা, বৃক্ষরোপণ, খোয়াই বাঁধা, নূতন আবাদ সবই সমানে অগ্রসর হইতেছে।

আড়াই বৎসর পূর্ব্বে "দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন" প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমেই বিভিন্ন বিভাগ গঠন, কার্য্যোপকরণ সংগ্রহ, কার্য্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা—এইরূপ প্রাথমিক আয়োজন ইহাকে করিতে হয়। তাহার পর কার্য্যের ধারা ও ক্রম নির্ণয় করিয়া সেগুলি সুষ্ঠুভাবে চালাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহাতে অনেক সময় ও অর্থ গিয়াছে সত্য, কিন্তু তবে সবটাই বৃথা নয়, কেননা কার্য্যারম্ভ যদি ঠিকমত না হইত তবে কাজ সুসংবদ্ধভাবে চলিতে পারিত না। এখন প্রাথমিক পর্য্যায় শেষ হইয়া আসিতেছে, মূল নির্ম্মাণ ও গঠনের কাজ ক্রমেই দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে। যদি এই ভাবে কাজ চলে তবে ১৯৫৩ সালে, অর্থাৎ আর তিন বৎসরের মধ্যে দেশের লোক বন্যাভয় হইতে উদ্ধার পাইবে, বাংলার শস্যক্ষেত্রের রূপান্তর আরম্ভ হইবে, ছোট বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান জেলায় জেলায় বসিতে সুরু করিবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া কাজের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৪৫ সালের প্রথম ভাগে যখন মার্কিন এঞ্জিনিয়র ভরডুইন এই পরিকল্পনার প্রস্তাবনা করেন, তখন ঐ প্রথম অংশের খরচ ধরা হয় আনুমানিক ৩৫.৯৯ কোটি টাকা এবং নৌচালন খালের ধরা হয় ২·১৩ কোটি টাকা, অর্থাৎ সর্ব্বসাকুল্যে ৩৮·১২ কোটি টাকা। ভরডুইন সাহেবের সম্মুখে যে সকল হিসাব ও তথ্যাদি রাখা হয়, যাহার উপর নির্ভর করিয়া তিনি ঐ খরচের আন্দাজ ধরেন, সে সবই ছিল অসম্পূর্ণ এবং ভুলভ্রান্তিপূর্ণ। তিনি নিজেই অল্পদিন পরে ঐ বরাদ্দ আংশিকভাবে শোধন করিয়া দেখান যে, কয়েক স্থলে খরচ দেড়গুণ বা দ্বিগুণ বাড়িতে পারে। তাহার পর তিনি এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যান এবং দেশবিভাগ ও রাষ্ট্রাধিকার পরিবর্ত্তন ইত্যাদিতে সমস্ত ব্যাপারটি চাপা পড়ে। ১৯৪৭ সালের শেষে এ সকল দিকে নূতন ভারত-সরকার দৃষ্টি দেন এবং ১৯৪৮ সালে উপরোক্ত দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের হস্তে ইহা সমর্পিত হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠান কার্য্যারম্ভের পর বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে ঐ খরচের আনুমানিক হিসাব আমূল পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। এইরূপ পরিবর্ত্তনের ফলে খরচের আনুমানিক হিসাব ৭৫·৭৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ দাঁড়ায়।

এইখানে বলা প্রয়োজন যে, এই হিসাবে কোনার বাঁধের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতা সবই বাড়াইয়া মূল পরিকল্পনায় কোনার ১, কোনার ২ ও কোনার ৩—যাহার মধ্যে ২নং ও ৩নং বাঁধ প্রথম অংশে ছিল না—এই তিনটির সমষ্টির সমান কার্যকরী হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়েও প্রথম অংশ বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়াছে, যথা—বকারো বাষ্প-জনিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ১,৫০,০০০ কিলোওয়াটের বদলে ২,০০,০০০ কিলো-ওয়াট শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; বিদ্যুৎ সর-বরাহ লাইন ১৭৫ মাইলের বদলে ৪৭০ মাইল, সেচবাঁধ ও সেচখাল বাড়াইয়া ২২,৮০,০০০ বিঘার বদলে ৩০,০০,০০০ বিঘায় সেচব্যবস্থা এবং নৌচালন খাল আরও কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মোটামুটি এই হিসাব পরীক্ষা করিলে বুঝা যায় জগদ্ব্যাপী মূল্যবৃদ্ধির কারণে খরচ শতকরা ৫০ ভাগ বাড়িয়াছে। এই মূল্যবৃদ্ধির অঙ্ক, বিশেষতঃ ইঞ্জিনীয়ারীং ব্যাপারে, ১৯৪৫ থেকে ১৯৫০ পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে বাড়িয়াছে ৩০২ থেকে ৫২০·৬, অন্য দেশে আরও কিছু বেশী এবং ভারতে দ্বিগুণেরও অধিক। তাহার উপর টাকার দাম কমাইয়া দেওয়ায় বিদেশী যন্ত্রপাতি ও মালপত্র কেনায় আরও ৪ কোটি টাকা খরচ লাগিতেছে এবং পরিকল্পনার ক্ষেত্র উপরোক্ত ভাবে বিস্তৃত করায় ১৫·৩ কোটি টাকা খরচ বাড়িবে। এই ক্ষেত্র-বিস্তৃতির ফলে সেচের পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ বাড়িতেছে, বিদ্যুৎ উৎপাদনও এক-তৃতীয়াংশ বাড়িতেছে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্র তিন গুণ বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং ইহাতে দেশের লোকে অনেক বেশী উপকার পাইবে।

১৯৪৫ সালের মধ্য হইতে ১৯৫০ সালের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত জিনিষপত্র ও সকল কাজের মূল্য যে কত বাড়িয়াছে সে কথা ভারতের প্রত্যেকটি লোকই হাড়ে হাড়ে টের পাইয়াছে। টাকার মূল্য কমায় বাহিরের আমদানী জিনিষের দাম যে চড়িয়াছে তাহাও কে না জানে? পরিকল্পনার বিস্তৃতি বাড়াইতে গেলে যে খরচ বেশী করিতে হইবে তাহাও তো স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার।

কিন্তু সে সব বিচার কে করে? খরচ দ্বিগুণ হইবে! অমনি চতুর্দ্দিকে চীৎকার "দেশ ডুবিল ঋণে, চুরিতে সব গেল, বন্ধ কর, বন্ধ কর!" অবশ্য এই কোলাহল প্রায় সবটাই করিয়াছে অবাঙালীরা, কেননা বাঙালীর উপকার হয় এটা কে চায়? বাঙালী নিজেও চায় না, নতুবা এইরূপ অবস্থায় বাঙালী বোবা-কালা মূঢ়ের মত চুপ করিয়া আছে কেন? বাংলার দৈনিক ও সাময়িকপত্রে এ বিষয়ে এক ছত্রও লেখা বাহির হয় না কেন?

টিলাইয়া বাঁধ নির্ম্মাণ। নদীবক্ষে কনক্রীট ঢালাই

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষ ও কর্ম্মচারী-বৃন্দের যোগ্যতা বা অযোগ্যতা সম্বন্ধে যদি কোনও বাস্তব বিচার হয় ত তাহা আমরা বুঝিতে পারি। খরচ অযথা হইতেছে ইহাও যদি হাতেকলমে সঠিক যুক্তিতে প্রমাণিত হয় তাহাও আমরা বুঝিতে পারি। খরচ যদি কমাইবার কোনও যুক্তিযুক্ত প্রস্তাব হয় তো তাহাও আমরা মানিতে রাজী আছি। কিন্তু সে সবের কোনও বালাই নাই, কেবল আন্দোলন "বন্ধ কর, বন্ধ কর"! একটা কথা খুবই প্রচার হইয়াছে যে কর্পোরেশনের যাবতীয় খরচের মধ্যে শুধু তত্ত্বাবধান ও আপিসের খরচ, যাহাকে ইংরেজীতে বলে "Over-head charges", তাহাই দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৬১ ভাগ। কিন্তু সরকারী হিসাব-পরীক্ষক, যাঁহার রিপোর্টের বশে এই সমালোচনা চলিতেছে, নিজেই বলিতেছেন যে, বাস্তব পক্ষে যে সকল খরচের অঙ্ক এই পর্য্যায়ে ফেলা হইয়াছে, যথা, কাঠ ও ধাতুর নির্ম্মাণশালা প্রতিষ্ঠা, ষ্টোর রক্ষা, যন্ত্রপাতি মেরামত, ভূতত্ত্ববিদ্‌দ্বারা জমি পরীক্ষা, বনরাজি গঠন, বাঁধের অঞ্চলের গ্রাম সরাইয়া পুনর্বসতি, স্বাস্থ্যরক্ষা ও হাসপাতাল স্থাপন, এগুলি বাস্তবিক ক্যাপিটাল খরচ, কিন্তু কর্পোরেশনের যেরূপ অদ্ভুত ভাবে নিয়ম বাঁধা হইয়াছে তাহাতে এগুলি পড়িয়াছে উল্টা জায়গায়। প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বাবধানের খরচ দাঁড়াইয়াছে শতকরা ১১ ভাগ এবং একথাও তিনি বলিয়াছেন যে, কাজ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে—উপরোক্ত হিসাব কর্পোরেশনের অস্তিত্বের প্রথম ২১ মাসের দরুন—ঐ অঙ্ক কমিয়া অর্দ্ধেক, এমন কি এক-তৃতীয়াংশেও দাঁড়াইবে মনে হয়।
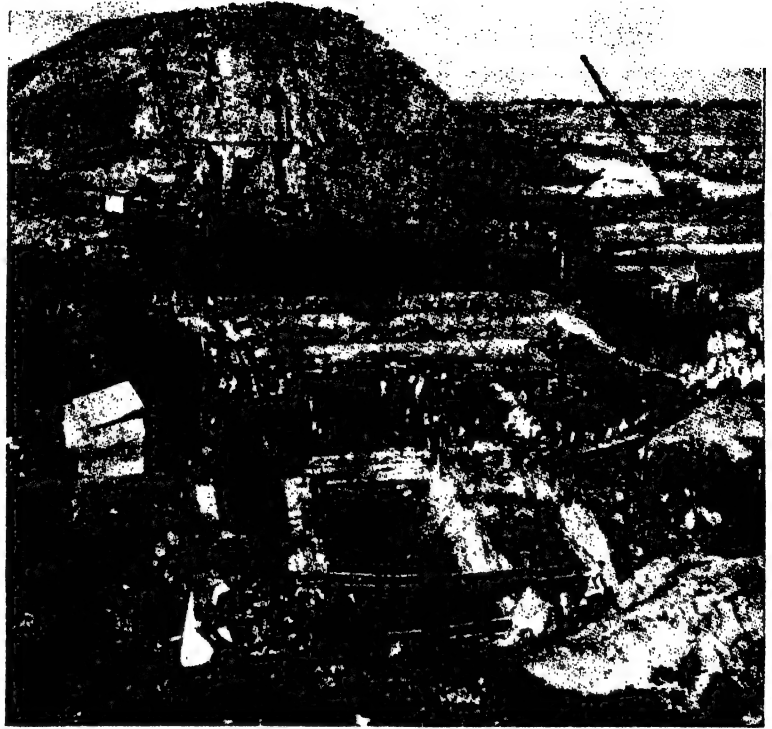
সরকারী হিসাবপরীক্ষক অযথা খরচের বিষয়ে কিছুই বলেন নাই, রিপোর্টে কোনও দোষারোপও নাই। অবশ্য হিসাব দেখিলে বুঝা যায় যে আরও কড়া তত্ত্বাবধান প্রয়োজন এবং কাজের গতিও আরও সরল হওয়া প্রয়োজন।

এ সকল কথা এখন চাপা দিয়া কলরব উঠিয়াছে "হয় বন্ধ কর নয় সমস্তটা সরকারী আয়ত্তের মধ্যে আন নচেৎ

দেশের লোকের টাকা জলে যাইবে"। যেন সরকারী বিভাগের খরচে দেশের লোকের টাকার অপচয় কিছু কম হইতেছে বা চুরিই কিছু কম চলে। দামোদর উপত্যকা বাদে আরও অনেকগুলি পরিকল্পনা বাংলার বাহিরে চলিতেছে। সে সবই কেন্দ্রীয় সরকারের C.W.I.N.C. এবং সেন্ট্রাল পাওয়ার বোর্ডের অধীনে। সেগুলির হিসাব কেহ চায়ও না দেখেও না, সরকারী দপ্তরেই তাহা রাখা-ঢাকা আছে। সেগুলির সঙ্গে বাস্তব ভাবে মিলাইয়া যদি দেখা যায় টাকার অপব্যয় হইতেছে তবে এ গোরগোলের সমর্থ করা যায়।

দামোদরের বন্যাসমস্যা আজও সেই ভয়ঙ্কর অবস্থায় আছে। যদি ১৯১৩ সালের মত আবার বাঁধ ভাঙিয়া মহাপ্রলয়ের সৃষ্টি হয় তবে বর্দ্ধমান শহর ধ্বংস হইবে, সঙ্গে শত শত গ্রাম ও ছোট-বড় শহরও বিনষ্ট হইবে এমন কি কলিকাতাও বিপদ্‌গ্রস্ত হইবে, কেননা বন্যার প্রবাহ ও বেগ প্রতি বৎসরই বাড়িয়া চলিয়াছে নানা কারণে। এল্‌মহার্ষ্ট ১৯৪৯ সালে লিখিয়া গিয়াছেন, ঐরূপ ভয়ের কথা এবং ভর্‌ডুইনও সেকথা জানিতেন। এরূপ দুর্ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের রেলরাস্তা, পথঘাট, সাঁকো-পুল, টেলিগ্রাফ-টেলিফোন ইত্যাদির মেরামতের ধাক্কায় অন্ততঃ বিশ কোটি টাকা খরচ হইবে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। অথচ কলরব চলিতেছে "বন্ধ কর, বন্ধ কর"।

পশ্চিমবাংলার বাঙালী স্বাধীনতার যুদ্ধে যাহা পোয়াইয়াছে তাহার তুলনা সমগ্র ভারতে নাই। বিত্তহানি, প্রাণদান, কারাবরণ ত ছিলই উপরন্তু তাহার অঙ্গ হইতে মানভূম, সিংভূম কাটিয়া দেওয়া হইল বিহারকে, সাঁওতাল পরগণার যাহা কিছু উন্নতি তাহা করিল পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী, তাহাও গেল বিহারে। এখন পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র ভরসা এই দুইটি উপত্যকা পরিকল্পনা। তাহার মধ্যে প্রথমটির—অর্থাৎ ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার—কথা বলিয়াছি চৈত্রের "প্রবাসী"তে এবং এইটির কথা এখন বলিলাম।

এই পরিকল্পনায় বাধা দিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া যাহারা লাগিয়াছে তাহাদের উদ্দেশ্য তিন প্রকার। প্রথম একদল অ-বাঙালী সরকারী অধিকারী আছেন, যাঁহারা দেখিতেছেন কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে অথচ তাঁহাদের নিজের বা তাঁহাদের আত্মীয় বা অনুরক্তজনের কুক্ষিতে কিছুই আসিতেছে না। সুতরাং তাঁহারা চাহেন ইহা সম্পূর্ণ ভাবে নিজেদের আয়ত্তে আনিতে। তাঁহারা বলিতেছেন, "আমরা হাতে না লইলে খরচ বাড়িয়াই যাইবে এবং এ ঋণ বাঙালী শোধ দিতে পারিবে না। অতএব ইহার ভার আমাদের হাতে দেওয়া হউক এবং আমাদের অনুমতি দেওয়া হউক পশ্চিমবাংলাকে দাসত্বে বাঁধিতে।"

দ্বিতীয় দলও ভিন্ন প্রদেশীয়। তাঁহাদের মত—দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা বন্ধ করিয়া তাঁহাদের প্রদেশে নানাকাজে ঐ টাকা দেওয়া উচিত। কেননা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী ত অবজ্ঞার পাত্র, সে মরে মরুক। তৃতীয় দল ইংরেজের কৃপায় বাঙালীর নিকট হইতে লওয়া চোরাইমালের অধিকারী, তাহারা চাহে না পশ্চিমবাংলার বাঙালী আবার সবল সক্ষম হয়। সুতরাং তাহারা নিজের নাক কাটিয়াও পরের যাত্রাভঙ্গ করিতে উদ্যত।

এখন প্রশ্ন এই, পশ্চিমবাংলার এই শেষ ভরসা যদি এভাবে বানচাল হয় তবে বাংলার পরিণাম কি হইবে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই উচিত এ বিষয়ে একান্ত অবহিত হওয়া।

আঁদ্রে জিদ্

শ্রীত্রিযুগ বাগচী

বিরাশী বছরের আঁদ্রে জিদ্-এর বিদ্রোহী জীবনে মহাকাল যবনিকা টেনে দিলে। কিন্তু বিদ্রোহী জিদ্-এর জীবনে শেষ পর্যন্ত মহাকাল জয়ী হলেও সাহিত্য-পথিক জিদ্-এর কাছে তাকে পরাজয় স্বীকার করতেই হবে। সাহিত্য-পথিক জিদ্ অপরাজেয় ও অমর। মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি যত দিন বেঁচে থাকবে মানুষের মনে জিদ্‌ও তত দিন বেঁচে থাকবেন।

"বিংশ শতকের ইউরোপীয় কথাসাহিত্যে যত রকমের মতবাদ গড়ে উঠবে তার প্রত্যেকটার প্রেরণার একমাত্র উৎসমূল হবে আঁদ্রে জিদ্-এর সৃষ্ট সাহিত্য"—একথা বলেছিলেন শ। আধুনিক কালের ইউরোপীয় কথাসাহিত্য পর্যালোচনা করলেই আমরা এই উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করতে পারব। বিষয়বস্তুর কথা বাদ দিলে জিদ্-এর চিন্তাধারাকে অতিক্রম করে এগিয়ে আসতে পেরেছে এমন একটিও উপন্যাস আমরা আজকের দিনে পাব কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই বিপ্লবী সাহিত্য-নায়ক আজ পর্যন্ত এদেশে প্রায় অনালোচিতই রয়ে গেছেন। জিদ্ সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের ত নয়ই চিন্তাশীল পাঠকদেরও খুব বেশী কৌতূহল পরিলক্ষিত হয় না। আমরা প্রায় সকলেই জিদ্‌কে জানি শুধু এই সেদিনকার নোবেল-জয়িরূপে বলেই।

এর অবশ্য কারণ আছে। ইংরেজী-সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা-সাহিত্যের যে ঘনিষ্ঠতা বা সোভিয়েট রাশিয়ার বর্তমান সাহিত্যের প্রতি যে সম্প্রীতি, ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বাংলা সাহিত্যের গড়ে উঠে নি। পণ্ডিচেরী বা তার একটু উপরে উঠতে পারলে রুশো, ভলটেয়ার,

আঁদ্রে জিদ

রোলাঁর মারফত ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে খানিকটা যোগাযোগ আমরা স্থাপন করে নিয়েছি। আর নেহাত যাঁদের সাহিত্যগত-প্রাণ বালজাক, প্রুস্ত, আনাতোল ফ্রাঁস ও মোপাসাঁ-র খানিকটা বাদ না দিয়ে হয়তো তাঁরা থাকেন না। সুতরাং জিদ্‌কে ভালো করে না জানা আমাদের পক্ষে খুব আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদ থেকে আজ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় সাহিত্যের যে ইতিহাস, তার বিভিন্ন পর্ব্বে একাধিক বিরাট প্রতিভাশালী ব্যক্তি, একাধিক চিন্তানায়কের সাক্ষাৎ আমরা পাই এবং তাঁদের প্রত্যেকেই সমসাময়িক সাহিত্যে অতুলনীয় প্রভাব বিস্তার করেছেন—ইব্‌সেন, শ, জয়েস্, এলিয়ট ও লরেন্স—প্রত্যেকেই এক একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কস্বরূপ এবং এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে ভাস্বর দ্যুতিতে দীপ্যমান আঁদ্রে জিদ্।

"To cultivate the art of being disagreeable—unpalatable to the reader, to disturb that is my role"—সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভে যখন জিদ্ একথা ঘোষণা করেন, তখনই বুঝা গিয়েছিল—চিন্তার জগতে এক পরম দুঃসাহসিকের আবির্ভাব হয়েছে। কথা-সাহিত্যে তিনি যে নির্ম্মম সত্যের সন্ধান দিয়েছেন, তা ছিল চিরদিন উপেক্ষিত ও অসমালোচিত। সর্ব্বগ্রাসী ব্যক্তিবাদের মাধ্যমে মানুষকে তার পরিপূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে তিনি আন্দোলন তুলেছিলেন। তিনি জানতেন, নিছক বিদ্রোহই জীবনের সবটুকু নয়; জীবনকে উপলব্ধি করতে হবে সমগ্রতার মধ্য দিয়ে। পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা—এই সবের ভিতর দিয়ে মানুষের জীবনস্রোত প্রবাহিত, এ সকলের মধ্যে আত্মার যে প্রকাশ সেইখানেই মানুষের সার্থকতা। মানুষ হয়তো অবস্থাবিশেষে নামবে অধঃপতনের অতল পাতালে, তা হলে সেখানেই তার জীবনের পূর্ণচ্ছেদ নয়, ঘাত-প্রতিঘাতে ঊর্দ্ধে আলোর দিকে প্রসারিত হবে তার দৃষ্টি, হবেই তো সে মানুষ। এমন মানুষের সন্ধান আমরা পাই জিদ্-সৃষ্ট প্রতিটি চরিত্রে।

জিদ্-এর সাহিত্য-সৃষ্টির মর্ম্মমূলে প্রবেশ করতে হলে একটু মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন। গভীর বিষয় অনুধাবন করবার উপযুক্ত মানসিক গঠন যাঁদের নয় তেমন পাঠকদের পক্ষে সেখানে প্রবেশের আশা সুদূরপরাহত। শাখা-প্রশাখার ভিড়ে পাঠক নিজেকেই হারিয়ে ফেলবে। তা ছাড়া যদি নীতিগত কোন সংস্কারও থাকে তবে জিদ্‌কে বুঝবার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাঁর সাহিত্য-জগতের কুশীলবেরা কেউ কোন রকম নীতির ধার ধারে না, এমন কি তাদের কাছে পাপ-পুণ্য, ধর্ম্ম-অধর্ম্মেরও কোন বালাই নেই। পৃথিবীতে এমন কোন অপরাধ নেই যা তারা নিঃসঙ্কোচে করতে না পারে। অথচ এদেরই মধ্যে জিদ্ আবিষ্কার করেছেন দুর্লভ মহত্ত্ব।

সমালোচকেরা এক কথায় জিদ্-এর প্রথম দিককার উপন্যাসকে 'unreadable' অর্থাৎ অপাঠ্য বলে অপাংক্তেয় করে রেখেছেন। একথা জিদ্ নিজেও পরে স্বীকার করেন। তখন জিদ্ দুর্ব্বোধ্য মনস্তাত্ত্বিকতা, সমাজের বিবিধ সমস্যা রোমান্টিসিজমের মুখোস পরিয়ে পাঠকদের সম্মুখে হাজির করতেন। তাঁর *Les Caves du Vatican* বইখানি সম্বন্ধে সার্ত্র তো সোজাসুজি বলেই দিলেন:

"The fantastic tale, there is a moral, or rather an immoral theory: how splendid not to exist, how fine to do things without reason."

নৈরাজ্যবাদের সমর্থনে জিদ্-এর আচার্য্যসুলভ উপদেশকে কোন সমালোচকই আমল দেন নি। কিন্তু একমাত্র আন্তরিকতার বলেই জিদ্ প্রতিভার স্থায়ী আসন অধিকার করলেন।

সমালোচকেরা একবাক্যে তাঁর প্রতিভাকে স্বীকৃতি জানালেন : 'Gide has over-reached himself'.

Les Faux monnayeur জিদ্-এর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ঘটনা-সজ্জাতে তরুণ-মানসের উত্থান-পতনকে কেন্দ্র করেই তিনি এই বইখানি লেখেন। এডওয়ার্ড এর নায়ক। শৈশব থেকে যৌবন, যৌবন থেকে বয়:প্রাপ্তি পর্যন্ত তার জীবনের পরিক্রমা মানসমুকুরে প্রতিফলিত করে সে দেখছে। তার শৈশবের কচি মন, যৌবনের স্বপ্ন, প্রেম, অনাচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং মনের স্থবিরতার কামনা, শ্রান্তি, ক্লান্তি—এ সকলের মধ্য দিয়ে সে সন্ধান করে তার জীবন-সত্যকে। সে বুঝতে পারে রুচি ও প্রগতির নামে মানুষের সভ্যতা আজ উন্মার্গগামী। আমাদের শিক্ষা ও সমাজ দিগ্‌ভ্রান্ত। এগুলির বিরুদ্ধে যার বিদ্রোহ, তার মধ্যেই আছে প্রকৃত মনুষ্যত্বের উপাদান।—বইখানি সম্বন্ধে Denis Saurt বলেন,

"The masterpiece of Andre Gide was to be Les faux-monnayeurs, his only *roman* the only work he puts before the public as a finished art."

La Porte Etraite জিদ্-এর একখানি প্রেমের উপন্যাস। নি:সংশয়েই এই উপন্যাসকে সুন্দর ও শাশ্বত প্রেমের প্রতীক বলা যায়। এর নায়ক জেরোমি ছোটবেলা থেকেই ভালবাসে এলিসাকে। এলিসাও জেরোমিকে ভালবাসে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রণয় কোন রকম প্রতিবন্ধক না মেনে ক্রমবর্দ্ধমান হতে থাকে। এই ঊর্দ্ধমুখী অভীপ্সার মত তাদের প্রেম—যা বুদ্ধির অতীত, অন্তরের অন্তরতম অনুভূতি, জীবনের চরম সত্য; সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে তার পরিণতি হয় শোচনীয় ব্যর্থতায়, কেউই কাউকে পায় না। সমাজের প্রতি অবরুদ্ধ অভিমানে নিজের প্রতি অত্যাচার করে এলিসা পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় তার অম্লান ও অটুট প্রেমকে সঙ্গে করে। জেরোমি অবসর-মুহূর্তগুলি মৃত্যুকালে প্রেরিত এলিসার রোজনামচা পড়ে কাটাতে থাকে। দুটি হৃদয়ের চিরন্তন প্রেম ও পরস্পরকে না পাওয়ার বেদনার করুণ সুর পাঠক-চিত্তে যে অনুরণন তোলে, তা ফরাসী সাহিত্যেও অতুলনীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এ ছাড়া *La Symphonie Pastorala, L' Acte gratitute, Les Nourritures terrestres* ও *Les caves* প্রভৃতি বইগুলিও বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে।

Voyage of Congo এবং *Retour du Tchad* বই-দুখানি ফরাসী সাহিত্যে এক তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করে। দুখানি পুস্তকই খুব সুন্দর, সরল ও মনোজ্ঞ ভাষায় লেখা। জিদ্ এই পুস্তকদ্বয়ে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের তীব্র নিন্দা করেন। প্রধানত: মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে এই বইখানিকে ভিত্তি করে এক তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। সমালোচক ক্লাউচম্যান বলেন :

"Writing these books a queer thing happened to Gide, and perhaps posterity will decide there were two writers of the name of Andre Gide. I think these are the books that are most likely to be read for generations . . ."

Si le grain ne merut জিদ্-এর আত্মজীবনী। কিন্তু তাঁর জীবনের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত Le Journal নামক বিরাট্ গ্রন্থে। এখানি এক অসাধারণ সৃষ্টি।

মানুষ নিজে কি তা সে জানতে ভয় পায়। কিন্তু শিল্পী-মন তাতে পশ্চাৎপদ হয় না, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আত্মবিশ্লেষণের চেষ্টা করে। নিজের ব্যক্তিসত্তাকে ঘিরে জিদ্ যে সুখ-দুঃখ, ব্যথা, লজ্জা, নৈরাশ্য ভোগ করেছেন জার্নালে তাই তিনি বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে লক্ষ্য করবার বিষয়—জিদ্-এর রূঢ়তা, চিকিৎসকের রূঢ়তা—যার পরিণতি নির্ম্মল স্বাস্থ্য। উগ্র সমাজবাদীরা তাঁকে বলতেন, অসামাজিক ও অহঙ্কারী—কিন্তু জার্নাল পড়ে বোঝা যায়, জিদ্ অহঙ্কারী নন্—অহং-এর কারিগর। হোমর থেকে ককনর পর্য্যন্ত দুশো জন লেখকের সাহিত্যসৃষ্টির সুনিপুণ ও নিরপেক্ষ সমালোচনা 'জার্নাল'-এর এক বিশিষ্ট অধ্যায়। এ বইয়ের তুলনা সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে বিরল। মনে হয়, রুশো-ভল্টেয়ারকে পর্য্যন্ত জিদ্ এতে অতিক্রম করে গেছেন।

জিদ্ গীতাঞ্জলির ফরাসী অনুবাদ করেন। তাঁর অনূদিত গীতাঞ্জলি ফরাসী সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেছে। এর মুখবন্ধে জিদ্ এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা আজকের দিনের মানুষকে পঙ্গু করে রেখেছে, ক্লীবে পরিণত করেছে তার থেকে বেরিয়ে এসে মুক্ত জীবনের স্বাদ পেয়ে মানুষ কি ভাবে তার মহত্ত্বকে আবিষ্কার করে সার্থক হতে পারে, তারই বাণী এই পৃথিবীতে বহন করে এনেছেন আঁদ্রে জিদ্। তাঁর সাহিত্য বিরাট্ আলোকস্তম্ভের মত এ যুগের বিভ্রান্ত নরনারীকে কল্যাণের পথ নির্দ্দেশ করবে।

আমাদের ছেলেরা

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

ক'দিন থেকে একটা ময়না পাখী আমাদের বাড়ীতে উড়ে এসেছে। ছেলেরা নতুন খাঁচা কিনে, ঘি দিয়ে ছাতু মেখে খাইয়ে, দেখলুম খুব তার তোয়াজ করছে। পাখীটা কিছু পড়ে না, অথচ সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি নানান রকমের আওয়াজ করতে থাকে। কোনো বুলি কপ্‌চাচ্ছে মনে করে পাখীটাকে পড়াতে আরম্ভ করে দিলুম।

সকালবেলা নিষ্ঠার সঙ্গে খাঁচার সামনে বসে বারবার আওড়াতে লাগলুম—ময়না পড় বাবা—রাধা-কৃষ্ণ-শ্যাম।

একমনে পাখী পড়াচ্ছি পাখীটাও নানান রকম চীৎকার করে যাচ্ছে, এমন সময় আশুদার গলা কানে এল—কি ভায়া, পাখী পড়াচ্ছ নাকি?

মুখ তুলে চেয়ে দেখি, লুঙ্গিপরা আশুদা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। চাকরি থেকে পেন্‌সন নেবার পর আশুদা আর কাছা দিতেন না। তিনি বলতেন—মাইনেও যেমন অর্ধেক হয়ে গেল, ধুতিও তেমনি অর্ধেক হওয়াই ভাল। বেকার লোকেদের কাছা-কোঁচার বাহুল্য শোভা পায় না। বছরকয়েকের মধ্যেই ধুতিগুলো ছিঁড়ে যাবার পর অধুনা তিনি লুঙ্গি পরতে সুরু করেছেন। সম্প্রতি পাড়ায় প্রকাশ করেছেন যে, তিনি পাকিস্তানে গিয়ে বসবাস করবেন।

এমন রামরাজ্য ছেড়ে যে পাষণ্ড লুঙ্গি পরে পাকিস্তানে যেতে চায়, তার প্রতি পাড়ার লোকেরা যে বিরূপ হবে, তাতে আর সন্দেহ কি?

পাখীটাকে পড়াতে আরম্ভ করলুম—পড় বেটা, রাধা-কৃষ্ণ-শ্যাম।

আশুদা দাঁড়িয়েই ছিলেন, হঠাৎ একটা বেদনাসূচক চুক্ চুক্ আওয়াজ শুনতে পেয়ে মুখ তুলে চেয়ে দেখি, কিসের একটা ব্যথার ছায়া তাঁর মুখে পরিস্ফুট হয়েছে।

বললুম—কি হয়েছে দাদা?

আশুদা গম্ভীর ভাবে ঘাড় নেড়ে সেই রকম চুক্‌চুক্ আওয়াজ করতে করতে বললেন—শেষ কালে তোমার এই হ'ল?

—কি হ'ল?

—ভীমরতি হ'ল। বাড়ির ছেলেগুলো পড়ে না—যাদের চোদ্দ পুরুষ লেখাপড়া শিখেছে, আর তুমি বনের পাখীকে পড়াবার চেষ্টা করছ? যাও দিনকয়েক পাকিস্তানে থাক গিয়ে, কিছুদিন ভাল খেলে-দেলেই সুস্থ হয়ে উঠবে।

আশুদা গজগজ করতে করতে চলে গেলেন, তাঁকে আমরা চিরকাল পাগলাভোলা লোক বলেই জানি, কিন্তু জগতের এই পাগলাভোলা লোকেরাই অনেক সময় মোক্ষম সত্য কথা বলে থাকে। আশুদার কথাগুলো আমাকে ভাবিয়ে তুললে।

মানসপটে চলচ্চিত্রের মত একটার পর একটা ছবি ভেসে উঠতে লাগল।

আমার বাড়ীর সামনেই একটা পার্ক আছে। বারো-চৌদ্দ ফুট একটা চওড়া রাস্তা পার্কের চারদিক ঘিরে আছে। পার্কটাকে পাড়ার কেল্লা বললেও চলে, বড় রাস্তা থেকে টেরই পাওয়া যায় না যে, এই সরু গলি ও পাড়ার মধ্যে এত বড় একটা পার্ক রয়েছে।

গত বৎসর সারা শীতকালটা আমায় রোগশয্যায় পড়ে থাকতে হয়েছিল। ভোর হতে না হতে দেখতুম, পার্কে ছেলের দলের আমদানি হচ্ছে। ছেলে বললে ভুল হবে, পাঁচ বছরের শিশু থেকে আরম্ভ করে পঁচিশ-তিরিশ বছরের বেকার যুবা অবধি—নানান্ বয়সী মনুষ্যপুত্র নানা-দলে বিভক্ত হয়ে খেলা সুরু করত। কোন দল বা ডিউকের বল, ভাল ব্যাট ও ক্রিকেট নিয়ে, কোনো দল বা ফাঁপা টেনিস বল ও রদ্দিমার্কা কাঠের ক্রিকেট ব্যাট নিয়ে—যে দলের যেমন জুটেছে তাই দিয়েই খেলা সুরু করত। এমন কি কখনো কখনো দেখেছি, কোনো কোনো দল বাঁশের ব্যাট, ইটের বল ও কঞ্চির ক্রিকেট পুঁতে মহা আনন্দে খেলছে। যে বয়সে কল্পনার জোরে বাপের পিঠকে ঘোড়া বলে মনে হয়, সে বয়স তাদের বহুদিন কেটে গেলেও সেই ইটের বলকে তিন আঙুলে ধরে হাত ঘুরিয়ে কল্পনার জোরে স্পিন দেওয়া হচ্ছে। বাড়ীতে যাবার তাড়া নেই। আশ্চর্য, তাদের বাড়ী থেকেও কেউ ডাকে না। বেলা বাড়তে থাকে, চড়্‌চড়িয়ে রোদ ওঠে—শিশু কিশোর যুবা সকলেই নিরঙ্কুশ আনন্দে পার্কে কেলি করতে থাকে।

যারা ইস্কুলে পড়ে, তাদেরও দেখতুম সাড়ে দশটা কিংবা পৌনে এগারোটা অবধি খেলা করছে। তারপরে টুক্ করে একবার বাড়ী ঢুকে ঐটুকু সময়ের মধ্যেই স্নান আহার সেরে বই বগলে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে। এদের মধ্যে অনেকেরই এমন পরিপাটি করে চুল আঁচড়ানো যে দেখলে মনে হয় অন্ততঃ দশ মিনিট লেগেছে শুধু ঐ কাজেই। কাপড়-চোপড় পরবার বালাই নেই, কোয়ার্টার

প্যাণ্ট—যাকে এখনো সম্মানার্থে হাফ প্যাণ্ট বলা হয়—পা গলিয়ে দিলেই হ'ল। হাফ-হাতা সার্ট কোমর অবধি—চটি চ্যাটাং চ্যাটাং করতে করতে ইস্কুলে চলে গেল।

দুপুরে আর এক দল এল, তাদের ম্যাচ। সে কি প্রতিযোগিতা, কি উৎসাহ, কি উত্তেজনা! প্যাকাটির ক্রিকেট পুঁতে ফাঁপা বল দিয়ে কেউ বা 'নাইডু' কেউ বা 'মুস্তাক আলি'—বেলা চারটে-পাঁচটা অবধি টেস্ট ম্যাচ চলল। যেমন চীৎকার করলে দর্শকের দল, তেমনি চীৎকার করলে খেলোয়াড়ের দল। মাঝে মাঝে এমন হট্টগোল হতে লাগল যে কারা খেলোয়াড় আর কারা দর্শক তা নিরূপণ করাই মুশকিল।

বিকেলবেলা পার্কের বাহার অন্য রকম। তখন ড্যাংগুলি, মার্বেল, ক্রিকেট তিনটে চলতে লাগল সমান তালে। সন্ধ্যার পর মাঠে বসে খানিকক্ষণ আড্ডা দিয়ে যে যার বাড়ী ফিরে গেল—সারাদিন পরিশ্রমের পর বই পড়তে নয়, নিশ্চয়ই শুয়ে পড়তে।

ছেলেরা পড়বে কখন! চব্বিশ ঘণ্টা খেলার পর বেচারিরা সময় কোথায় পায়! যেটুকু বা সময় থাকে সেটুকু টেস্ট ম্যাচ, রঞ্জি ক্রিকেট, ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া—এই উত্তেজনাতেই কেটে যায়, ফলে প্রতি বৎসর শতকরা পনেরোটি ছেলেও সব বিষয়ে পাস করে ক্লাস-প্রোমোশন পায় না। কাজেই পরীক্ষার সময় বই বেধে টুকতে হয় এবং ইস্কুলে কপি করে করে সেই অভ্যাস বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষামন্দিরে প্রকাশ পায়।

শীতকাল পেরিয়ে গ্রীষ্মকাল পড়ল। মাঠের রঙ গেল বদলে। ক্রিকেটে এক দল খেলে এবং আর এক দল বসে থাকে, কিন্তু ফুটবলে বাইশ জনকেই মাঠে নামতে হয়। কাজেই অনেক দল মাঠে আঁটে না বলে ছেলের পাল মাঠ উপচে রাস্তায় পড়ল।

দক্ষিণ কলকাতার কথা বলতে পারি নে, কিন্তু উত্তর কলকাতার প্রায় সমস্ত গলিই সে-সময় ফুটবল গ্রাউণ্ডে পরিণত হয়। রাস্তায় লোক-চলা দুর্ঘট হয়ে ওঠে। খেলোয়াড়দের ভেতর দিয়ে পথ-চলা মুশকিল, কারণ গোল-গাল নিটোল বলটি হঠাৎ খেলোয়াড়দের পদতাড়িত হয়ে কখন যে পথিকের অঙ্গে কর্দমাক্ত চুম্বন দিয়ে সচকিত ও কণ্টকিত করে তুলবে তার ঠিকানা কি? ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন এ রকম ঘটনা ঘটলে ছেলেরা অপ্রস্তুত হওয়া দূরের কথা বরং উৎসাহিতই হয়ে ওঠে। কারণ সঙ্গে সঙ্গেই তাদের উচ্চ হাস্যরোলে পাড়া মুখরিত হয়ে ওঠে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় পথিক—"অমৃতং বালহসিতম্" ভেবে সরে পড়তে পথ পায় না।

অবিশ্যি সমস্ত ব্যাপারটা তাদের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে মন্দ লাগে না, যদি জানতুম এদের মধ্যে অন্ততঃ দুই জন ভালো আর চার জন মাঝারি লেখাপড়া করে।

ছুটির দিনে অনেক সময় দেখেছি রাস্তায় গোলপোষ্ট পোঁতা হয়েছে, রাস্তার মধ্যিখানে খড়ি দিয়ে ফুটবল গ্রাউণ্ডের মত দাগ লাগানো হয়েছে। সকালবেলাতেই চলেছে ভীষণ খেলা—কারণ বিকেলে বে-পাড়ার দল আসবে ম্যাচ খেলতে তারই প্র্যাকটিস্ চলেছে। খেলার সময় রিক্সা বন্ধ, লোক চলাচল বন্ধ (সাময়িক ভাবে), একমাত্র মোটর গাড়ি ও গরুর গাড়ি কারো কথা শোনে না, চলে যায় মাঝখান দিয়ে।

সেদিন একজন বলছিলেন, ছেলেদের যদি খেলবার জায়গা না থাকে তবে তারা যায় কোথায়?

ছেলেদের প্রতি এই মনোভাব প্রশংসনীয়—তাতে আর সন্দেহ কি? তা হলে কলকাতা শহরের সমস্ত বাড়ী ভেঙে মাঠে পরিণত করতে হয়। উদ্বাস্তুদের জন্যে ফাঁকা জায়গায় বাড়ী উঠল, এবার ছেলেদের আবদারে তা হলে বাড়ীর জায়গা ফাঁকা হোক। ছেলেরা যদি একটু চেষ্টা করে তবে তাদের পো ধরবার লোকের অভাব হবে না। চাই কি তাদের জন্যে কাউন্সিলেও লড়ালড়ি চলতে পারে।

ফুটবল-ক্রিকেটের ওপর রাস্তায় ড্যাং-গুলি আছে, মার্বেল আছে, আজকাল দেখছি রাস্তায় স্কেটিং ছোটাও সুরু হয়েছে। ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট চলে যাওয়াতে হরতাল কমেছে বটে, কিন্তু থেকে থেকে ট্রামবাজি ও ইস্কুলের ধর্মঘট, এগুলোও নেহাৎ ফেল্না যায় না।

এ ছাড়া গড়ের মাঠ আছে, ইষ্টবেঙ্গল-মোহনবাগান আছে—যারা মাঠে যেতে পারে না, দোকানে দোকানে তাদের জন্য রেডিওর ব্যবস্থা হয়েছে, সার্বজনীন ও সরস্বতী-পুজো তো লেগেই আছে।

দিনরাত তাদের মস্তিষ্ক যদি এই সব উত্তেজনায় পূর্ণ থাকে, তা হলে লেখাপড়ায় একাগ্র হবে কি করে? বর্তমানে অধিকাংশ ছেলেই লেখাপড়া তো করেই না, তা ছাড়াও যদি কেউ লক্ষ্য করে থাকেন, তা হলে দেখবেন, তারা আগের চেয়ে কতটা দুর্বিনীত ও দুঃশীল হয়ে পড়েছে।

এই যে আমাদের ছেলেরা বিপথগামী হয়ে চলেছে, এর কারণ কি? আমার মনে হয় এর জন্য সাধারণভাবে আমাদের সমাজ ও বিশেষভাবে প্রত্যেক পরিবারই দায়ী।

ছেলেরা খেলবে না—এমন কথা কেউই বলবে না, কিন্তু খেলাটাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠলে চলবে কি করে? কারণ দু'দিন বাদেই তাদের জীবনযুদ্ধে নামতে হবে।

বাড়ীর ছেলেরা লেখাপড়া শিখুক এবং তারা শিষ্টাচারী হোক, তা সকল অভিভাবকেরই কাম্য। কিন্তু শুধু কামনা থাকলেই চলবে না, সেজন্য তাঁদের তৎপর হওয়া দরকার। আজকের দিনে অভিভাবকেরা জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য এত ব্যস্ত থাকেন যে, ছেলেদের প্রতি তাঁরা উদাসীন হয়ে পড়েছেন এবং এইটিই আমাদের ছেলেদের বিপথগামী হওয়ার প্রধান কারণ। এই ঔদাসীন্যের কারণ আমাদের জীবন থেকে, ব্যক্তিগত দিক দিয়েই হোক আর জাতিগত দিক দিয়েই হোক—আদর্শ চলে গেছে। জীবন-যুদ্ধ আগেও ছিল, কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের জীবনের একটা আদর্শও ছিল, আর সে আদর্শ প্রধান হয়েই ছিল বলে তখনকার দিনের ছেলেরা সহজে বিগড়ে যেতে পারত না।

মাথার মধ্যে নানান চিন্তা তালগোল পাকাচ্ছিল এমন সময় হঠাৎ আশুদার কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙল—কি ভায়া শূন্য খাঁচার সামনে চুপ করে বসে আছ কেন? চেয়ে দেখি দরজা খোলা পেয়ে পাখীটা কখন উড়ে গেছে।

হিন্দীগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কবিতা

শ্রীজগদীশচন্দ্র দে, সাহিত্যরত্ন

প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডা: রামকুমার বর্ম্মা, এম্‌-এ, পিএইচ-ডি "কবীর কা রহস্যবাদ" (কবীরকে দার্শনিক বিচারোঁ কা গংভীর বিবেচন) নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। পরিচয়, রহস্যবাদ, আধ্যাত্মিক বিবাহ, আনন্দ, গুরু, হঠযোগ, সুফীমত, অনন্ত সংযোগ এবং পরিশিষ্ট, পুস্তকের এই নয়টি বিভাগে লেখক প্রচুর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। সুপণ্ডিত গ্রন্থকার কবীর সম্বন্ধে নানা কথা জানিবার জন্য বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস হইতে প্রকাশিত রায়বাহাদুর লালা সীতারাম-রচিত—কবীর, রেণাল্ড এ নিকলসন রচিত *The Idea of Personality in Sufism*, Underhill প্রণীত *Mysticism*, শ্রীশচন্দ্র বসু অনূদিত ঘেরণ্ড সংহিতা ও শিবসংহিতা, পতঞ্জলি যোগদর্শন, এ. ই. ওয়েট-রচিত *Studies in Mysticism*, পুলেন-লিখিত *The Graces of Interior prayer*, *Personal Idealism and Mysticism*, স্বামী যুগলানন্দ-কৃত—কবীর চরিত্রবোধ, পিল্লাই-রচিত *Indian Chronology*, মোহন সিং প্রণীত *Kabir—His Biography*, জন ব্রিগ-রচিত *History of Mohamedan Power in India*, ওয়েষ্টকট-রচিত *Kabir and the Kabirpanth*, জালালুদ্দীন রুমী-কৃত—মসনবী প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ তাঁহার পুস্তকের নানা স্থানে পাদটীকায় দেখিতেছি।

গ্রন্থকার হিন্দী ভাষাভাষী হইলেও বঙ্গভাষার সহিত যে তাঁহার পরিচয় আছে, তাহা শ্রীশচন্দ্র বসু-অনূদিত শিব-সংহিতা ও ঘেরণ্ড-সংহিতার উল্লেখে জানা যাইতেছে। কিন্তু পুস্তকের একটি স্থানে বঙ্গভাষা সম্বন্ধে যে অজ্ঞতার প্রমাণ তিনি দিয়াছেন, তাহা মর্ম্মপীড়াদায়ক। 'অনন্ত সংযোগ' নামক অধ্যায়ে আত্মা ও পরমাত্মার মিলন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথের "আবর্ত্তন" শীর্ষক কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া, উক্ত কবিতার হিন্দী অনুবাদ দিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন, "বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নে তো আত্মা ঔর পরমাত্মা কে মিলন মেঁ দোনোঁ কো উৎসুক বতলায়া হৈ।" কিন্তু সুপণ্ডিত লেখকের হাতে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির—কি দুর্গতি হইয়াছে দেখুন:

ধুপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধো সে চাহে ধুপেরে রোহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধোরা দিতে চাহে ছোংদে,
ছোংদ ফিরিয়া ছুটে জেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপেরে মাঝারে অংগো,
রূপো পেতে চায় ভাবেরে মাঝারে ছাড়া।
ওসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সংগো,
সীমা চায় হোতে ওসীমেরে মাঝে হারা।
প্রোলয়ে সৃজনে না জানি এ কারে যুক্তি,
ভাব হোতে রূপে ওবিরাম জাওয়া আসা।
বংধ ফিরিছে খুজিয়া আপোন মুক্তি,
মুক্তি মাংগিছে বাংধোনের মাঝে বাসা।

কবিতাটির অর্থ গ্রন্থকার হিন্দীতে নিম্নলিখিতরূপ করিয়াছেন :

ধূপ অপনে কো সুগংধিকে সাথ মিলা দেনা চাহতে হৈ,
গংধ ভী অপনে কো ধূপকে সাথ সংবদ্ধ কর দেনা চাহতী হৈ।
স্বর অপনে কো ছংদ মে সমর্পিত কর দেনা চাহতা হৈ,
ছংদ লৌটকর স্বরকে সমীপ দৌড় জানা চাহতা হৈ।
ভাব সৌংদর্য কা অংগ বননা চাহতা হৈ,
সৌংদর্য ভী অপনে কো ভাবকী অন্তরাত্মা মেঁ
মুক্ত করনা চাহতা হৈ।
অসীম সসীম কা গাঢ়ালিংগন করনা চাহতা হৈ,
সসীম অসীম মেঁ অপনে কো বিখরা দেনা চাহতা হৈ।
মৈঁ নহীঁ জানতা কি প্রলয় ঔর সৃষ্টি কিসকা
রচনা বৈচিত্র্য হৈ,
ভাব ঔর সৌংদর্য মেঁ অবিরাম বিনিময় হোতা হৈ।
বন্ধ অপনী মুক্তি খোজতা ফিরতা হৈ,
মুক্ত বংধন মেঁ অপনে আবাস কী ভিক্ষা মাংগতা হৈ।

বাংলা কবিতাটির উদ্ধৃতিকালে তিনি লিখিয়াছেন—সুর, ছোংদ, অংগো, সীমা, সংগো, ওসীম, প্রোলয়ে, সৃজনে ওবিরাম—তিনি নিজের ভাষায় অনুবাদ করিতে গিয়া কিন্তু লিখিয়াছেন—স্বর (সুর), ছংদ, অংগ, সীমা, সাথ, অসীম, প্রলয়, সৃষ্টি, অবিরাম। অন্য ভুলগুলির কথা ছাড়িয়াই দিলাম। তিনি নিজে যদি বাংলা জানেন, তবে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি বই দেখিয়া দেবনাগরী হরফে অবিকল নকল করিয়া দিতে পারিতেন। তাহা না করিয়া এরূপ বিকৃত রূপে কবিতাটি তিনি কি করিয়া উদ্ধৃত করিয়া দিলেন ?

আলোচ্য গ্রন্থখানির পঞ্চম সংস্করণ লইয়া আলোচনা করিতেছি। উহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে, ২য় সংস্করণ ১৯৩৭ সালে, ৩য় সংস্করণ ১৯৩৮ সালে, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৪১ সালে এবং ৫ম সংস্করণ ১৯৪৪ সালে। এত দিনে আরও দুই একটি সংস্করণ যে হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে ? ১৯৩১ হইতে ১৯৪৪ সাল পর্য্যন্ত গ্রন্থখানির পাঁচটি সংস্করণ হইল, অথচ একজন বাঙালী পাঠকেরও চোখে এই মারাত্মক ভুলটি পড়িল না, ইহাই আশ্চর্য্য। যাহা হইবার হইয়াছে ; ভবিষ্যৎ সংস্করণেও যাহাতে গ্রন্থখানির বুকে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিকে এমনিতর বিকৃত রূপ পরিগ্রহ করিতে না হয়, সে বিষয়ে আমাদের এখনই অবহিত হওয়া উচিত। এলাহাবাদ প্রবাসী কোন বাঙালী শিক্ষাব্রতী "কবীর কা রহস্যবাদ" গ্রন্থের লেখক ডাঃ রামকুমার বর্ম্মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কবিতাটি যাহাতে সংশোধিত আকারে ভাবী সংস্করণে স্থান পায়, সেই ব্যবস্থা সহজেই করিতে পারেন।

নব বর্ষ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সীমাহীন পথ—চলেছে জগৎ কোন্ অনন্ত অন্বেষণে,
আরেক চিহ্ন আঁকা রয়ে গেল কালচক্রের আবর্ত্তনে।
স্বপ্ন যা-কিছু স্বপ্নে মিলাক—ভেবে কাজ নাই তার অভাব,
চিরপরিচিত পরিবেশে হ'ল চিরনূতনের আবির্ভাব।

স্মৃতি আর আশা, মাঝখানে সেতু, সে সেতু রচিল বর্ত্তমান,
সেইখানে তাই ধ্বনিয়া সদাই উঠিছে যাওয়া ও আসার গান।
দেখেছি দেখেছি তমসার পারে জ্যোতির ঝরণা পড়িছে ঝরি,
ঊর্দ্ধে তোমার বিজয়-কেতন, সূর্য্য তোমার প্রণাম করি।

হে জ্যোতির্ম্ময়, দিগ্‌দিগন্তে বাজুক তোমার বিজয়-ভেরী,
দেশে দেশে আজ জাগুক মানব, ঘুচুক শঙ্কা তোমায় হেরি।
জাতির জীবনে আলোর প্লাবনে আসুক দিব্য নির্ম্মলতা,
বার্ত্তা তাহার পেয়েছি আভাসে, আমি কবি কহি তাহারি কথা।

জাগরণ-গান গাহি আমি আজ, আকাশে উঠুক তাহার সুর,
যুগে যুগান্তে দেশ-দেশান্তে ছড়ায়ে পড়ুক দূর-সুদূর,
জেগেছে ভারত, জেগেছে এসিয়া, জেগেছে মানব জগৎময়,
পূর্ব্ব গগনে নবদ্যুতি সে—নবজীবনের সূর্য্যোদয়।

এসেছে বারতা, যুগের জড়তা ভেঙেছে মূর্চ্ছা, ভেঙেছে মোহ,
অন্ধকারের বিরুদ্ধে আজ সূর্য্যালোকের সে বিদ্রোহ।
নব পন্থার সন্ধান দাও পূর্ব্বাকাশের নূতন আলো,
তিমিত জীবন উছসি উঠুক, যুক্ত মানসে দীপ্তি জ্বালো।

আজি জাগ্রত মানুষ ঊর্দ্ধে আকাশের পানে চাহিয়া আছে,
'আলো দাও' বলি বদ্ধাঞ্জলি যাচে আলো আজ কাহার কাছে ?
নব বর্ষের আলোর স্পর্শে, হে মোর সবিতা তোমায় বরি,
জগতে জাগাও নূতন জীবন, সূর্য্য তোমায় প্রণাম করি।

মন মোহন ব্রজকে রসিয়ঁা...

শ্রীওঁকারনাথ চট্টোপাধ্যায়

ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, রাগ পরজ

অস্থায়ী—মন মোহন ব্রজকে রসিয়ঁা, যাতে হোতী মৈতো ব্রিজকী গলিয়ঁা।
মুরলী বাজায় মেরো মন মোহ লেত॥
অন্তরা—দেখি, দেখি, দরর্দেকি, দরদী সাঁবরী সুরত
ললচ রহো হৈ মেরো জিয়া
শুনা ধুন দিল বিচ লাগে রহি বেকলিয়ঁা, কলিয়ঁা॥

রাগ পরজ

আরোহণ—নি় সা গা, হ্ম দা নি র্সা
অবরোহণ—র্সা নি দা পা, হ্ম প দা পা, গ ম গ, হ্ম গ ঋ সা
মুখ্য অঙ্গ—র্সা নি দা পা, হ্ম প দা প, গ ম গ

আরোহণে রিখব বর্জ্জিত, ঋ দা কোমল, দুই মধ্যম (ম হ্ম) অন্য স্বর শুদ্ধ বাদী স, সংবাদী পা॥ নিখাদ গান্ধার স্বরের উপর জোর দেওয়া হয় এবং হ্ম পা দা পা, ও গ ম গ, এই বিন্যাস বহু বার পরিলক্ষিত হয়।

(পরজ—তেতালা)

0	১	+	৩
গা । ঋ সা	সা । । সানসা	দা পা । দা	হ্মপা । ম গা ‖
এ ০ র সি	য়ঁা ০ ০ ০০০	০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০ ০
গা মা গা ।	ঃগাঃ মা গম পপ	ঃমঃ গ । ঋ	সা । । দা ‖*
র সি য়ঁা ০	০ ০ ০০ ০০	০ ০ ০ সি	য়ঁা ০ ০ ম
পদা দা পা পা	পা হ্ম পা হ্মগা	গা মা গা ।	ঃহ্মঃ । দা নর্সা ‖
ন মো হ ন	ব্র জ কো ০	র সি য়ঁা ০	আ ০ ম নে
না দা পা পা	পা হ্ম পা হ্মগা	গা মা গা ।	। । । ।
০ মো হ ন	ব্র জ কো ০	র সি য়ঁা ০	০ ০ ০ ০
। সান্সা গা গা	ঃহ্মঃ দা হ্ম দা	র্সনা র্সা র্সা ঋ´	না র্সা ।
০ যা তে হো	তি ০ মৈ তো	ব্রি জ কি গ	লি য়ঁা ০ ০

* প্রথমে 'এ রসিয়ঁা' এই কথাটি দিয়া রাগবাচক একটু বিস্তাসের পরে তারকা-চিহ্নিত স্থান হইতে অস্থায়ী সুরু হইয়াছে

\+ ৩ 0 ১

গা মা গা । | র্গা ঋ´ র্সা ঋ´ | ঋ না সাঋ´ র্সা | র্সা নদা পক্ষ পা |

র সি য়াঁ ০ হাঁ রে মো হে নে মো হন কো মো হন ব্রজ কো

\+ ৩ 0 ১

গা মা গা । | । ক্ষ দা র্সা | না দা পা দা | পা ক্ষ পা ক্ষগা |

র সি য়াঁ ০ ০ হাঁ ম ন মো ০ হ ন ব্র জ কো ০০

\+ ৩ 0 ১

গা মা গা । | । ক্ষ । দা | না । র্সা । | র্সা র্সা র্সা র্সা |

র সি য়াঁ ০ ০ এ ০ র সি ০ হি ০ ০ ০ ০ ০

ঋ´ র্সা । । | ঋ´ স´নর্সা দপা ক্ষপা | পাক্ষ গমা ক্ষগা ঋসা | । । । । |

হি ই ০ ০ র সি আঁআঁ আঁআঁ আঁআঁ আঁআঁ আঁআঁ আঁআঁ ০ ০ ০ ০

\+ ৩ 0

সাসা গগা ক্ষক্ষ দদা | ক্ষক্ষ দদা নানা র্সার্সা | দনা র্সাঋ´ র্সানা দপা |

আ০ ০০ ০০ ০০ আ০ ০০ ০০ ০০ আ০ ০০ ০০ ০০

১ +

নর্সা নদা পক্ষ পা | গা মা গা । |

মো হন ব্রজ কো র সি য়াঁ ০

(এই স্বরলিপির স্বত্ব স্বরলিপিকার কর্তৃক সংরক্ষিত)

তুমি আর আমি

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

তুমি আর আমি চলি পথ :
অবিরাম আনন্দের ছন্দিত দ্বৈরথ
সে গতির কে জানে সন্ধান !
আমি স্থাণু, তুমি মোর অফুরন্ত প্রাণ
পলে পলে ধমনীতে করিলে সঞ্চার,
মহারুদ্র ভৈরবের তাণ্ডব দুর্ব্বার !
তুমি গৌরী, উন্মাদিনী ভৈরবী রূপসী,
অকস্মাৎ পৃথিবীর দ্বার-প্রান্তে বসি
রচিলে আপন মনে সে কি স্বপ্নজাল,
আপন তরঙ্গস্রোতে আপনারে করিয়া উত্তাল।
সেই স্রোত-মন্দাকিনী-ধারা
দিকে দিকে দেবতারে করে আত্মহারা।
নিতল সে স্নেহরাশি করিয়া মন্থন,
অমৃতের সুধাস্বাদ লভে দেবগণ।
হেথা বিশ্বতল—
প্লাবিত করিল ক্ষণে বাসুকীর তীব্র হলাহল।
হাসিল দেবতা স্বর্গে বিজয়-উল্লাসে ;
কাঁদিল মানুষ বিশ্বে মরণের ভয়াল সন্ত্রাসে।
আমি শিব, মানুষের অমূর্ত্ত প্রতীক,
সে গরল কণ্ঠে ধরি মানুষেরে করেছি নির্ভীক।

আমি সৃষ্টিদাতা !
সৃষ্টির দুরন্ত নেশা কাঁদে আত্মহারা
প্রতি লোমকূপে মোর সীমাহীন কাল ;
মৃত্যুক্লিষ্ট ধরণীর ধূসর ধূলায়, মৃত্যুঞ্জয় আমি মহাকাল !
মৃত্তিকার প্রাণহীন বুকে,
ডম্বরু ডমরু তালে স্মিত পঞ্চমুখে
গাহিয়া চলেছি মর্ত্ত্যে অমৃতের গান,
ফেনিল মরণ-নীল বিষ করি পান।
আমি শান্ত অনাদি শঙ্কর ;
ধ্যানমৌন মহাশূন্যে প্রলয়ের আমি ভয়ঙ্কর !
আমি নটরাজ, নৃত্যছন্দে করে টলমল
এ বিশ্বভুবন। কালস্রোত এ চিরচঞ্চল
কুন্তল এলায়ে দোলে মোর বক্ষ 'পরে ;
অশান্ত দুর্মদ মৃত্যু জীবন-তরঙ্গে ডুবে মরে।

আমি স্থাণু, স্থবির উন্মাদ :
পাংশুল শিথিল অঙ্গে ধুতুরায় স্তব্ধ অবসাদ।
অঙ্গে অঙ্গে কেঁদে মরে যৌবনের মত্ত মাদকতা,
তারি ব্যাকুলতা
দিকে দিকে হানে করাঘাত ;
ভিখারিণী, তুমি সেথা বারংবার বাড়াইয়া হাত
মাগো সৃষ্টি মোর পাশে,
নব বিশ্ব রচিবার অসহ উল্লাসে।
অনঙ্গের খর অঙ্গ থর থর কাঁপে মোর ডরে,
সে নব সৃষ্টির মাঝে সৃষ্টির দেবতা পুড়ে মরে।
অবলুপ্ত চেতনার মাঝে,
কান পেতে শুনি শুধু, রয়ে রয়ে বাজে
মহাশঙ্খে জীবনের অকল্যাণ-বাণী,
অনন্ত শয়ান-সুপ্ত বিধাতার ব্যর্থতার গ্লানি !
আমি শিব, অশিবেরে করিয়াছি জয় ;
আমারই ইঙ্গিতে বিশ্ব আপনারে নিত্য করি ক্ষয়,
মিটায় প্রাণের লিপ্সা তৃষ্ণা অনির্ব্বাণ,
পীযূষ-বঞ্চিত জীবে করি প্রাণদান।
ভিক্ষা মাগি দেবতার দ্বারে,
লাঞ্ছিত হয়েছে যারা অবিরত সহস্র ধিক্কারে ;
অঞ্জলি ভরিয়া শুধু লভিয়াছে অপের গরল
অমৃত মন্থন-শেষে জীবনের তীব্র হলাহল।
তৃষাতুর সে মানুষ রিক্ত সর্ব্বহারা,
লভিল প্রাণের স্পর্শ। অমৃতের মন্দাকিনীধারা
নামিল তৃষিত বিশ্বে অফুরন্ত স্রোতে,
দীর্ণ করি জটাজাল, মহাশূন্য হ'তে,
নামিয়া আসিল বিশ্বে ত্রিদিবের মঙ্গল আশীষ !
আমি শিব, আকণ্ঠ ভরিয়া শুধু বিষ
করিলাম পান হেথা, রুদ্ধ করি শ্মশানের দ্বার।
তুমি গৌরী, নিত্য বারংবার,
ধরিত্রীর ক্লিষ্ট বুকে বিছাইয়া তোমার অঞ্চল,
মুছে দিলে মানুষের তপ্ত অশ্রুজল।
পীযূষ-বঞ্চিত জীবে অন্নপূর্ণা, তুমি দিলে প্রাণ ;
তোমার অমৃত স্পর্শে মৃত্যুহীন উন্মাদ ঈশান।

সংযোজন ও সংশোধন

"জাতীয় গ্রন্থাগারের তৃতীয় পর্ব্ব" প্রবন্ধ (পৃ. ৪৭-৫২)। ১৮৭৩ সনে গোপীকৃষ্ণ মিত্র গ্রন্থাগারের 'লাইব্রেরিয়ান' বা গ্রন্থাগারিক হন। ১৮৭৪ সন হইতে তাঁহার পদের নাম হয় 'Secretary and Librarian'।

উক্ত প্রবন্ধে পৃ. ৫১, পাট ১, পংক্তি নিম্ন হইতে ১৬ : "এবং সত্যানন্দ ঘোষালও" বর্জ্জনীয়।

দৃশ্যকাব্য-পরিচয়—শ্রীসত্যজীবন মুখোপাধ্যায়। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, কলিকাতা। পৃ. ৫০২+২+২৯। মূল্য দশ টাকা।

এই বিরাট্ গ্রন্থে বাংলা দৃশ্যকাব্যগুলির ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে; কেবল জীবিত লেখকগণকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে গ্রন্থকার উপক্রমণিকায় এইরূপ আভাস দিয়াছেন:

"বাঙ্গালা দৃশ্যকাব্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে জন্মলাভ করিয়াছে। ...কিরূপে এবং কোন্ অবস্থায় দৃশ্যকাব্যের গর্ভবাস হইতে তাহার জন্ম ও পরিণতিলাভ ঘটিল, এ বিষয়ের একটি ধারাবাহিক অনুসন্ধান গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তবে ইহার ঐতিহাসিক গবেষণা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। ...ইতিহাসের খোসা বাদ দিয়া তাহার ভিতরকার রসাল অংশই এ গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। সন, তারিখ ও পরম্পরার দিকে নজর রাখিলেও সকল স্থলে যথানিয়মে উহা রক্ষিত হয় নাই। কোন্ কালে বাঙ্গালীর চিন্তাস্রোত কোন্ পথে ধাবিত হইয়া নাট্যসাহিত্যের কোন কোন্ অঙ্গ কিরূপভাবে পুষ্ট করিয়াছে, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে তাহারই আলোচনা আছে।... এ গ্রন্থের আরও এক বিশেষত্ব এই যে বিশ্লেষণপূর্ব্বক অনুশীলনক্রমে (analytical study) প্রতি দৃশ্যকাব্যের ইতিহাসের অবতারণা ইহাতে আছে। এ প্রণালী বঙ্গ-সাহিত্যে একেবারেই নূতন বলিতে হইবে।"

গ্রন্থের বিষয়বস্তুর দ্বারা গ্রন্থকারের অহমিকা সমর্থিত হয় নাই। শেষ তিন পংক্তিতে তিনি যে মৌলিকতার দাবী করিয়াছেন তাহা ঠিক নয়। তিনি বোধ হয় জানেন না যে, ডঃ সুশীলকুমার দে এবং আরও কেহ কেহ এই প্রণালীতে ইতিপূর্ব্বেই অনেকগুলি বাংলা দৃশ্যকাব্যের আলোচনা করিয়াছেন, তবে সেগুলি প্রধানতঃ সাময়িকপত্রেই সীমাবদ্ধ। সত্যজীবন বাবুর পক্ষে শ্লাঘার বিষয় এই যে, তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অভিনীত দৃশ্যকাব্যগুলির সমালোচনা একত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

গ্রন্থের কতকগুলি ত্রুটিবিচ্যুতি আমাদের নজরে পড়িয়াছে। যাহাতে পরবর্ত্তী সংস্করণটি যথাসম্ভব নির্ভুল হয়, এই বিশ্বাসে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি, স্বল্প পরিসরে সকল কথা বলা সম্ভব হইবে না:—

পৃ. ৩০: গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "ডাঃ দুর্গাদাস কর "স্বর্ণ-শৃঙ্খল নাটক ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বরিশালে বসিয়া রচনা করিয়াছিলেন এবং ১৮৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বরিশালেই ইহা পাণ্ডুলিপির আকারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। গ্রন্থের ভূমিকায় উক্ত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে।" পড়িয়া মনে হইতেছে, লেখক 'স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক' চোখে দেখেন নাই; উহাতে "গ্রন্থকারের ভূমিকা" নাই, আছে কেবল প্রকাশকের "বিজ্ঞাপন"। প্রকাশকের বিজ্ঞাপনে আছে:— "প্রায় আট বৎসর অতীত হইল কতিপয় সহৃদয় বন্ধুর অনুরোধে অভিনয় করিবার নিমিত্ত বরিশালে এই নাটক লিখিত হয়।" কিন্তু নাটকখান যে "পাণ্ডুলিপির আকারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল" এরূপ কোন কথাই নাই। প্রকৃতপক্ষে নাটকখানি বরিশালে প্রথম অভিনীত হয় পুস্তকাকারে প্রকাশের ছয় বৎসর পরে—১৮৬৯ সনের জুলাই মাসে। প্রমাণস্বরূপ ৮ আগষ্ট ১৮৬৯ তারিখের 'ঢাকাপ্রকাশ' নামক সাপ্তাহিক পত্রে মুদ্রিত একখানি পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—"এই ক্ষুদ্র নগর বরিশালে যে নাটকাভিনয় হইবে ইহা আমরা এক দিনের জন্যও মনে করি নাই।...বরিশালে অভিনয় করিবার প্রত্যাশায় যে স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক রচিত হইয়াছিল, এত দিনে গ্রন্থকর্ত্তার সেই সংকল্প সুসিদ্ধ হইল।" ('বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস.' ৩য় সং. পৃ. ১১৯ দ্রষ্টব্য)

পৃ. ৬১: লেখকের মতে, দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী'র "রচনাকাল ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ।" কিন্তু তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই যে তাঁহার প্রদত্ত "রচনাকালে"র দুই বৎসর পূর্ব্বেই নাটকখানি প্রকাশিত হইয়াছিল।

পৃ. ৭১: গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'বোধেন্দু বিকাশ' নাটকের "আখ্যাপত্রে কোন তারিখ নাই।" আমরা কিন্তু দেখিতেছি, আখ্যাপত্রে "১২৭০" সাল মুদ্রিত আছে।

পৃ. ৮০: মনোমোহন বসুর 'আনন্দময় নাটক' সম্বন্ধে লেখক লিখিতেছেন:—"এই নাটকের অভিনয় তারিখ পাওয়া যায় নাই।" নাটকখানি 'কিরণশশী' নামে ১৮৮৯ সনের অক্টোবর মাসে এমারেল্ড থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হয়,—'সাহিত্য-কল্পদ্রুম,' কার্ত্তিক ১২৯৬ দ্রঃ।

পৃ. ৮৯: গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "বীরনারী—এই ঐতিহাসিক নাটকখানি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল, আখ্যাপত্রে নাটককারের নাম নাই।" প্রকৃতপক্ষে নাটকখানির প্রকাশকাল মার্চ্চ ১৮৭৫, ইহার লেখক অবলাবান্ধব দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে ১৩০৪ সালের পৌষ-সংখ্যা 'জন্মভূমি'তে মুদ্রিত দ্বারকানাথের পত্র দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৯৩, ৯৫: ১৮৭৪ সনে প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' নাটক সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিতেছেন, "উদাসিনী গায়িকার চারণ-গীতি নাট্যসাহিত্যে এই প্রথম রচিত হইল:—মিলে সব ভারত সন্তান...।" গানটির রচয়িতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নহেন, তাঁহার মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ উহা ১৮৬৭, ১২ই এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত চৈত্রমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী নাটকে'র আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার "সংগীত-বিভাগে নাট্যকারের বিশেষ পারদর্শিতার" নিদর্শনস্বরূপ যে তিনটি গান উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার প্রথমটি "গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে" রবীন্দ্রনাথের রচনা,—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নহে।

পৃ. ৩৫৭: অমৃতলাল বসুর 'বাবু'কবী' "১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর...ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইল।" সালটি ১৮৯৯ না হইয়া ১৯০০ হইবে। পুস্তকের আখ্যাপত্রেই প্রথম অভিনয়কাল দেওয়া আছে।

পৃ. ৩৮০: গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯১১ খৃষ্টাব্দে অতুলকৃষ্ণ মিত্রের মৃত্যু ঘটে।" ইহা একটি প্রচলিত ভুলের পুনরাবৃত্তি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে অতুলকৃষ্ণের মৃত্যু হয়—৭ অক্টোবর ১৯১২ তারিখে, 'নাট্য-মন্দির,' মাঘ-ফাল্গুন ১৩১৯ দ্রষ্টব্য।

এই মূল্যবান বইখানিকে নির্ভুল করিয়া তুলিবার সাহায্যের জন্যই এই ইঙ্গিতগুলি করা হইল। 'দৃশ্যকাব্য-পরিচয়' বাস্তবিকই আমাদের একটা বহু দিনের অভাব বিদূরিত করিয়াছে। এজন্য লেখক সাহিত্যামোদীগণের কৃতজ্ঞতা দাবী করিতে পারেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্যা—শ্রীসীতা দেবী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। দাম চার টাকা।

উপন্যাসখানি বহুকাল পূর্ব্বে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উপন্যাস-বর্ণিত ঘটনা বা স্থান কাল পাত্রেরা তাহারও পূর্ব্বেকার অর্থাৎ সেই যুগের যখন রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত ছিল। এমনই একটি সম্ভ্রান্ত বংশের অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা সুবর্ণের বিবাহ লইয়া কাহিনীর সূত্রপাত। সুবর্ণের পিতার মনে ছিল উচ্চশিক্ষার আলো, মায়ের মনে ছিল সমাজ-

বিধি পালনের তৎপরতা। ফলে প্রবাসী স্বামীর অগোচরে অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দিয়া সুবর্ণের মা সমস্যার সৃষ্টি করিলেন। এই বিবাহের কুফলে সংসারের সুখশান্তি নষ্ট হইল। সুবর্ণের শ্বশুরালয়ে উদার শিক্ষার অভাব ছিল—তাই কলহপরায়ণা শাশুড়ী ও সঙ্কীর্ণমনা স্বামীর সাহচর্য্য বালিকার কিশোর জীবনে পাষাণভারের মতই চাপিয়া বসিল। মেয়ের দুঃখ-বেদনার বোঝা বহিয়া মা মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করিলেন এবং শ্বশুরবাড়ীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাকে দেখিতে আসিয়া সুবর্ণ হইল স্বামী-গৃহচ্যুত। পিতার আশ্রয়ে আসিতেই তিনি কন্যাকে পুরাতন জীবনের গ্লানি আবর্জ্জনা হইতে মুক্ত করিয়া নূতন জীবন প্রতিষ্ঠার আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন। নূতন জীবনের প্রবেশমুখে সুবর্ণ হইল সুপর্ণা। অতঃপর আত্মনির্ভরশীল জীবনযাপনের আবহাওয়ায় তাহার ব্যক্তিসত্তাও বিকশিত হইয়া উঠিল। এই নূতন জীবনপথে দেখা দিল চরিত্রবান যুবক সুদর্শন। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া নারীর নীড়-রচনার চিরন্তন কল্পনা-জাল বোনা হইতে লাগিল। কিন্তু পুরাতন জীবনের গ্লানি সুপর্ণা নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিতে পারিল কি? পূর্বসম্পর্কের দাবিতে স্বামী শ্রীবিলাস দুঃস্বপ্নের মত আবির্ভূত হইল তাহার জীবনে। সুবর্ণ আর সুপর্ণার বাধিল দ্বন্দ্ব।

এই দ্বন্দ্বসঞ্জাত বিচিত্র কাহিনীই বইয়ার বিষয়বস্তু। যদিও অর্থনৈতিক চাপে ও পারিপার্শ্বিকের পরিবর্ত্তনে আজিকার সমাজ হইতে বাল্য বিবাহের প্রথা একরূপ উঠিয়াই গিয়াছে—তবু বিগত যুগের সমস্যার উপর লেখিকা যে আলোকপাত করিয়াছেন তাহা এক হিসাবে সার্থক হইয়াছে। লেখিকা দেখাইয়াছেন—পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে মানুষের জীবনে কখনও ভাটার টান, কখনও বা শক্তির বিকাশ ঘটে। শিক্ষার আলোকে—আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি অর্জ্জন করিয়া সে দুঃখ-বিপদকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া যায়। সেবা ও ভালবাসার সম্পদ লইয়াই জীবনের পূর্ণতা।…তাই কাহিনীগত সমস্যা চরিত্র বা সময় যুগের পিছনে পড়িয়া থাকিলেও মানুষের হৃদয়দ্বন্দ্ব ও আশা-বেদনার রহস্য পাঠকমনে যথেষ্ট কৌতূহল সঞ্চার করে। সাবলীল ঘটনাপ্রবাহ ও স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গিমার গুণে উপন্যাসখানি সমাদর লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

স্বদেশ-প্রেমিক রমাকান্ত রায়—সম্পাদক শ্রীহরিদাস নামানন্দ। চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড, ১৫নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। ২০৫ পৃষ্ঠা। মূল্য ২৷৹ টাকা।

স্মৃতি-পূজা গ্রন্থমালা—(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রীহরিদাস নামানন্দ। সুধাময়ী ললিতা সাহিত্য-ভবন, আশিস কুটির, শিলং। ১২৮ পৃষ্ঠা।

প্রথম পুস্তকখানি স্বদেশী যুগের একজন দেশহিতে উৎসর্গীতপ্রাণ কর্ম্মী-শ্রেষ্ঠের জীবনচরিত। তাঁর জন্ম শ্রীহট্ট জেলায়; তাঁর শিক্ষাসমাপ্ত হয় জাপানে। খনি-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তিনি যখন দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন উপার্জ্জনের পথ তাঁর সম্মুখে প্রসারিত। তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বরিয়া অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতন চাকুরী লইলেন—উদ্দেশ্য বাঙালী-সমাজের সেবা করিবেন। সেই অনুপ্রেরণাই তাঁহাকে "স্বদেশী" আন্দোলনের মধ্যে টানিয়া আনিল। "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায়" করিয়া কলিকাতার অলি-গলিতে তিনি অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন।

কিন্তু মৃত্যু তাঁহাকে দুই বৎসরের মধ্যে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে চিরতরে অপসারিত করিল। বরিশাল কনফারেন্সের অপমানে তাঁর শরীর মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেই সব কথাই এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থপ্রণেতা

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় রামানন্দ আসামের শিক্ষা-বিভাগের অধিকর্তা ছিলেন। তিনি রমাকান্ত রায়ের দৌহিত্র। এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া তিনি একটা ঋণ পরিশোধ করিলেন। সেই যুগের লোকের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে বলিয়াই রমাকান্তের পরিচয় ম্লান হইয়া যাইতেছে। এই পুস্তক তাহা লোকচক্ষে উজ্জ্বল করিয়া ধরিবে।

দ্বিতীয় পুস্তকখানি গ্রন্থকারের নিজের বক্তৃতার সমষ্টি। তাঁহার ধর্ম্মগুরু শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নানা বক্তৃতা এই গ্রন্থের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছে। আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে বিবিধ আলোচনার মধ্যে গ্রন্থকারের অন্তর্দৃষ্টি ও বৈদগ্ধ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। একটা অসাম্প্রদায়িক মনোভাব আলোচিত বিষয়কে উচ্চ স্তরে লইয়া গিয়াছে। পাঠকবর্গ তাহা অনুভব করিবেন। সুরমা-উপত্যকা সাহিত্য-সম্মেলন ও প্রবাসী বাঙালী সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি রূপে লেখকের বক্তৃতা রবীন্দ্র-সাহিত্যের উপর নূতন আলোকপাত করে।

এই গ্রন্থমালার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

ভবানীমঙ্গল—রামনারায়ণ-বিরচিত। শ্রীঅজয়কুমার চক্রবর্ত্তী, বি-এ, সাহিত্যবিশারদ ভক্তিতত্ত্ব সম্পাদিত। সুকুমারী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ধুবড়ী, আসাম। মূল্য তিন টাকা।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত বহুল সমাদৃত দেবীমাহাত্ম্য অবলম্বনে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রাচীনকাল হইতে অনেক কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহাদের অন্যতম। গ্রন্থমধ্যে ইহা কোথাও ভবানীমঙ্গল কোথাও বা চণ্ডীমঙ্গল নামে উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের নামেরও দুইটি রূপ গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে পাওয়া যাইতেছে—কোন স্থানে রামনারায়ণ, কোন স্থানে রামদাস। সম্পাদক গ্রন্থের একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি তাঁহার সংগৃহীত গ্রন্থের দুইখানি পুঁথি ও তাহাদের ভাষার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থকারকে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে তিনি মাঝে মাঝে দুই একটি শব্দের শুদ্ধ রূপ বা অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভূমিকা ও অর্থনির্দ্দেশ বাদে এই সংস্করণখানি মূল পুঁথির নকল ছাড়া আর কিছু নয়। সম্পাদক মহাশয় পুঁথির বানান অবিকৃত রাখিয়াছেন—সর্ব্বসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া তৎসম শব্দগুলিরও বর্ণাশুদ্ধি শোধন করেন নাই—'মাহাৎম' [মাহাত্ম্য] প্রভৃতি স্থলে অধুনা-অপ্রচলিত বর্ণবিন্যাস রীতিরও কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই—তাহা ছাড়া অধ্যায় ভাগ করিয়া অধ্যায়ের প্রথমে উহার বিষয়বস্তুর উল্লেখ করেন নাই। ফলে প্রাচীন পুঁথির মতই আলোচ্য সংস্করণখানি পাঠ করা কষ্টসাধ্য। ছাপা ও কাগজ নিকৃষ্ট। বড়ই দুঃখের বিষয়, পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃত প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অতি অল্প বাংলা গ্রন্থেই অনুসৃত হইতে দেখা যায়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

রাধাকান্ত দেব—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ। ২৪৩১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—৬। মূল্য আট আনা।

এখানি সাহিত্যসাধক-চরিতমালার ২০-সংখ্যক গ্রন্থ। স্বল্প পরিসরের মধ্যে বহু তথ্যের সমাবেশ সাহিত্য-সাধক চরিতমালার বৈশিষ্ট্য। সমালোচ্য গ্রন্থখানিতেও এই বিশেষত্ব প্রকটিত।

রাধাকান্ত দেব ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের একজন দিকপাল পুরুষ। বাংলাদেশে যাঁহারা ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশক হইতে খ্রীষ্টধর্ম্মের গতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন রাধাকান্ত দেব তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুদের পুনরায় স্বধর্ম্মে ফিরাইয়া আনিবার

জন্ত পত্রিকোভার সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে স্বধর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাও অতুলনীয়। সে যুগের বিভিন্ন প্রগতিমূলক আন্দোলনের সহিত রাধাকান্তের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তিনি হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি, কলিকাতা স্কুল সোসাইটি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মারফত জনশিক্ষা প্রচারেও ছিল তাঁহার সক্রিয় সহযোগিতা স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারেও তিনি ছিলেন বিশেষ উৎসাহী এবং সমাজ-সেবা ও জনহিতকর কার্যে অগ্রণী। অকৃত্রিম দেশানুরাগের অধিকারী রাধাকান্ত এদেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতিসাধনকল্পে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়া নানা ব্যাপারে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করেন। কর্মবীর রাধাকান্ত ছিলেন একজন আদর্শ জ্ঞান-তপস্বী। তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্কৃত অভিধান "শব্দকল্পদ্রুম" তাঁহার স্মৃতিকে অমর করিয়া রাখিবে। মাতৃভাষার প্রতি সুগভীর প্রীতিবশতঃ তিনি বাঙালী ছাত্রদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন এবং বাংলাভাষা শিক্ষার পথ যাহাতে সুগম হয় সেই উদ্দেশ্যে নিজে বাংলা পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

যোগেশবাবু হিন্দুকলেজের কার্যবিবরণ, বিভিন্ন ব্যক্তিকে লিখিত রাধাকান্তের পত্রাবলী, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া এবং সমসাময়িক অন্যান্য ইংরেজী ও বাংলা সংবাদপত্র হইতে বহু আয়াসে তথ্য সংগ্রহ করিয়া রাধাকান্ত দেবের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করিয়াছেন তাহা শুধু যে এই বিরাট পুরুষের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিবার পক্ষে সহায়ক হইয়াছে তেমন নয়, এই পুস্তকে ঊনবিংশ শতাব্দীর নব জাগ্রত বাংলাদেশের হৃৎস্পন্দন-শব্দও আমরা শুনিতে পাইতেছি।

জ্যোতিষীর দৃষ্টিতে নেতাজী—শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস। (জ্যোতির্বিদ শ্রীতিলক)। প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস। ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

গ্রন্থকার একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ এবং সুলেখক। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের রাশিচক্র বিচার করিয়াছেন। গ্রহগুলি নেতাজীর জীবন, কর্ম ও চরিত্রের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাঁহার কোষ্ঠীতে কোন্ কোন্ রাজযোগ ঘটিয়াছে এ সকল বিষয়ের আলোচনায় লেখক জ্যোতিষশাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিয়াছেন। এই পুস্তকে প্রধানতঃ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নেতাজীর আয়ুবিচারই করা হইয়াছে। বিবিধ শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া লেখক বলিতেছেন যে, নেতাজীর কোষ্ঠীতে আছে সুস্পষ্ট গণ্ডমৃত্যু যোগ। তাঁহার পরমায়ু সত্তর বৎসরের অধিক। তিনি পুনরায় ভারতে প্রত্যাগমন করিবেন এবং তার "সূচনা সুরু হবে ১৯৫১ সালের কয়েক মাস পূর্ব্বেই"। "১৯৫১" সালের কয়েক মাস পূর্ব্বে তো দূরের কথা, উক্ত বর্ষের তিন মাস অতীত হওয়ার পরেও এই ভবিষ্যদ্বাণী ফলিবার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। এই ধরণের ভবিষ্যৎ-কথন সাধারণ লোককে বিভ্রান্ত করিতেছে মাত্র। বইখানি জ্যোতিষবিদ্যা বিষয়ক প্রচলিত গ্রন্থসমূহ অপেক্ষা স্বতন্ত্র ধরণের। ইহাতে লেখকের সাহিত্যিক-কল্পনা প্রকাশ পাইয়াছে। স্থানে স্থানে নেতাজীর চরিত্র-বিশ্লেষণে গ্রন্থকার বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

ক্ষয় (প্রথম খণ্ড)—অনুবাদক শ্রীশীতাংশু মৈত্র। ভারতী লাইব্রেরী। ১৪৫, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ২॥০ টাকা।

ইহা ম্যাক্সিম গোর্কির "আরটামোনভস্" নামক উপন্যাসের অনুবাদ। সমাজের নীচের তলার লোকেদের বিচিত্র চরিত্র অঙ্কনে গোর্কি যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। "আরটামোনভস্" গোর্কির একখানি বিখ্যাত উপন্যাস। অনুবাদের মারফত এই শ্রেণীর উপন্যাসের সহিত সাধারণ বাঙালী পাঠকের পরিচয় সাধনের প্রয়াস প্রশংসনীয়।

লেখক পুস্তকখানিকে যথাসম্ভব সহজ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। স্থানে স্থানে ভাষাগত অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হইলেও মোটামুটি অনুবাদ ভালই হইয়াছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

কাকলী—শ্রীরাধিকারঞ্জন ঘটক। রিভলভার পাব্লিশিং কোং। ৭০-এ, সুরেন্দ্র ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা। মূল্য—২৲।

ঘটক মহাশয় অঘটন ঘটাইয়াছেন। একে কবিতার বইয়ের চমক-লাগানো নাম-ওয়ালা প্রকাশনী, তার পরে যখন পড়ি,

"তোমার দাড়ি ধরছি,
দেখ,
আমার হাত কত সাফ্।
দেখ,
আমার পাও কত সাফ্,
আমার পা
তোমার মাথায় রাখছি।"

তখন কি বলিব, ভাবিয়া পাই না। আবার,

"পেনিসিলিন?
ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন?
সেই
তবে কি ক'রে সারলাম?"

কি সারিলেন? নিজে সারিয়া উঠিয়াছেন তো?

উৎসর্গপত্রে গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের কবিতার পংক্তি তুলিয়া দিয়াছেন,

"সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে'
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।"

কিন্তু, পুচ্ছটি না নাচাইলেই কি ভাল হইত না?

অভিশাপ—নীলাম্বর। হিন্দুস্থান বুক ডিপো। ১২, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা লইয়া লেখা কবিতা। স্বাধীনতালাভের পরেও দুর্ভাগ্যের অবসান হয় নাই, এজন্য কবি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ছন্দ ও ভাষা স্থানে স্থানে দুর্ব্বল।

কয়েকটি কবিতা—চিত্রভানু। ৮৬, দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৷৵০ আনা।

গদ্য ও পদ্য ছন্দে লেখা কয়েকটি উপভোগ্য কবিতা। স্বচ্ছন্দ কল্পনার সাবলীল প্রকাশ।

শাহানা—শ্রীপ্রভাতকুমার বাগচী। ভারতী বুকষ্টল, ৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

আজিকার বেসুরা কবিতার দিনে এমন সুরেলা কবিতার সন্ধান পাইলে মন খুশী না হইয়া যায় না। ভাব, ভাষা ও ছন্দে চমৎকার সঙ্গতি আছে। কবির কল্পনা সহজে মনকে স্পর্শ করে।

পূজার ফুল—শ্রীক্ষিতীশ নাগ। ৩০ বি, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

কবিতার ফুলগুলি এখনও ভাল করিয়া ফোটে নাই, বর্ণে গন্ধে উপভোগ্য হয় নাই।

কৃষ্ণ ভগবান্—শ্রীঅভয় দাশগুপ্ত। ডি, এম্, লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ১৷০।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবন-লীলা লেখক সরস ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। কিশোর-কিশোরীদের জন্য রচিত হইলেও সকলেই পড়িয়া আনন্দ পাইবেন এবং উপকৃত হইবেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মৃত্যুরহস্য—লেখক—'ভাই'। সত্যব্রত লাইব্রেরী। ১২৭, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ১৪৪। মূল্য ১'০।

আলোচ্য গ্রন্থখানি 'ভাই' ছদ্মনামধারী জনৈক সাধকের 'নিভৃত সাধনার বহিঃপ্রকাশ'। ইহার এগারোটি অধ্যায়ের ভিতর পরলোক-বিশ্বাসী তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের পক্ষে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। মৃত্যু ও মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ চিরকালই মানুষের মধ্যে দেখা যায়। এ বিষয়ে বহু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মনীষী নানাপ্রকার আলোচনা করিয়াছেন, এখন পর্য্যন্ত আলোচনা ও গবেষণার বিরতি ঘটে নাই। আমাদের শাস্ত্রেও স্বর্গ-নরকের বর্ণনাপ্রাচুর্য্য আছে। আলোচ্য গ্রন্থে বহুল স্বীকৃত পরলোকতত্ত্ব ও তথ্যের সহিত গ্রন্থকারের কোথাও মত-বিরোধ দেখা গেল না, বরং তিনি অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের আনুকূল্যে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বের ও পরের অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশ ভুবনের এবং পৃথিবী হইতে প্রত্যাগত সূক্ষ্মদেহীদের সেই সেই স্থানে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ সংবাদ দিয়াছেন। আমাদের স্থূল ভোগরাজ্যের ঊর্দ্ধে, যে সব সূক্ষ্ম রাজ্যের পরিচয় আলোচ্য গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহা চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলোদ্দীপক। গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং দর্শনোপলব্ধির বিবৃতিরূপে এই গ্রন্থের মূল্য আছে।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

চশমা-বুড়ো (কিশোর নাটক)—শ্রীসব্যসাচী রায়। দি রিডার্স ফ্রেণ্ড, মোরাদপুর, পাটনা—৪। মূল্য এক টাকা।

আজকাল বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্য বললেই বুঝায় হয় ভূতুড়ে আজগুবি গল্প, নতুবা সস্তা এ্যাডভেঞ্চার, আর নাটক মানেই দেশপ্রেমের একঘেয়ে উচ্ছ্বাস। কিন্তু এর মাঝেও দু'একটি রচনা হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠে—শ্রীসব্যসাচী রায়ের লেখা 'চশমা বুড়ো'ও তেমনি একখানি নতুন বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে রচিত কিশোর-নাটিকা। চশমা-বুড়োর তৈরী মায়া-চশমা দিয়ে দেখলে পৃথিবীর সবকিছুই সুন্দর দেখায়। কিন্তু চশমা-বুড়োর মন তাতে ভরল না। সে এক দিন আবিষ্কার করল সত্য-চশমা। সে চশমায় ধরা পড়ল মানুষের সত্যিকার রূপ। অনেকের মুখোস গেল টুটে, আবার অনেকের মুখশ্রী উঠল ফুটে। কঠিন সত্য আবিষ্কারের জন্য দেশের রাজা চশমা-বুড়োর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। শেষ মুহূর্ত্তে গুরু প্রজ্ঞানন্দের হস্তক্ষেপের ফলে তা রদ হ'ল। একটি নূতন ধরণের চিত্তাকর্ষক কাহিনী নিয়ে নাটকখানি রচিত। এর সরস সংলাপও

উপভোগ্য। রবীন্দ্রনাথের গানগুলিও সুপ্রযুক্ত হয়েছে। কিশোর ক্লাব-গুলিতে এই নাটকের অভিনয় হওয়া উচিত।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, প্রথম খণ্ড—ডক্টর শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস, ৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

বাংলার বিপ্লববাদ সম্পর্কে বিস্তর বই বাহির হইয়াছে। বিভিন্ন সাময়িক পত্রেও ইহার বিবরণ লিখিত হইয়েছে। রৌলট কমিটির রিপোর্ট হইতেও আমরা নানা তথ্য জানিতে পারি। তথাপি বাংলার বিপ্লবকার্য্য সম্বন্ধে সব কথা বলা হইয়াছে মনে হয় না। তবে যাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি তাহা দিয়া এ সম্বন্ধে বেশ কিছু আঁচ করিয়া লওয়া যায়।

গ্রন্থকার প্রায় প্রথম হইতেই বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিজের অভিজ্ঞতাপ্রসূত এবং প্রত্যক্ষীভূত বিভিন্ন বিষয় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া "অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস" নামে এই পুস্তক তিনি ১৯২৬ সনে প্রথম প্রকাশিত করেন। ১৯৩০ সনে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইলে সরকার কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। "স্বাধীনতা" লাভের পর সম্প্রতি উক্ত নামে পুস্তকখানির তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে। পূর্ব্ব পুস্তক হইতে ইহার আকার প্রায় তিন গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এ কারণ এখানিকে প্রথম সংস্করণের মর্য্যাদাও দেওয়া চলে। এতদিন যে সব কথা বলা বেআইনী ছিল বা নানা কারণে অসঙ্গত মনে হইত, বর্ত্তমানে সে বাধা আর নাই। কাজেই পুস্তকের বিভিন্ন স্থলে 'ইঙ্গিত' মাত্রে কথিত বিষয় পরিশিষ্ট পাদটীকাকারে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষদর্শী ও বিপ্লব-কর্ম্মে লিপ্ত কয়েকজনের বিবৃতিও ইহাতে লেখক দিয়াছেন। এই সকল কারণে পুস্তকখানি বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টার একখানি আকর-গ্রন্থের গৌরব পাইবার যোগ্য।

বাংলার বিপ্লববাদের উৎপত্তি, বিপ্লবকর্ম্মের প্রসার ও ইহার পরিণতি সম্পর্কে নানারূপ তথ্যসম্বলিত আলোচনা এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। যে-সকল বিষয়ে আমাদের জ্ঞান ভাসা ভাসা ছিল বা আত্মপ্রচারমূলক পুস্তকাদিতে যে-সব বিষয়ের অতিরঞ্জন বা অপব্যাখ্যা বা উক্তই থাকার দরুন বাস্তব চিত্র আমাদের চোখে ধরা পড়িত না, বর্ত্তমান পুস্তকখানি পাঠে সে সকল বিষয়ে পাঠকের মনে পরিষ্কার ধারণা জন্মিবে। বাংলার বিপ্লববাদের প্রকৃত ইতিহাস-পদবাচ্য পুস্তক এখনও রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কাজেই ভাবী ঐতিহাসিকের পক্ষে এরূপ পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। পুস্তকখানির বহুল প্রচার হইবে নিশ্চয়।

স্বাধীনতা-দিনের উপহার—কাজী আবদুল ওদুদ। প্রাপ্তিস্থান—ভারত সাহিত্য ভবন, ২০৩।২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ আনা।

এই পুস্তিকায় 'জয়তু মহাত্মা', 'মহৎ সংবাদ' 'উর্দু-বাংলা', 'কাব্য-পাঠ' 'শতবর্ষ পরে রামমোহন', 'গ্যেটের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী' এই ছয়টি নিবন্ধিকা এবং 'সুভাষচন্দ্র' শীর্ষক একটি গদ্য-কবিতা স্থান পাইয়াছে। বাংলা ভাষা সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায় বিশেষের সম্পদ নয়, ইহা সমগ্র বাংলা ও বাঙালী জাতির শাশ্বত সম্পদ। আলোচ্য পুস্তকের নিবন্ধিকা কয়টি পাঠ করিয়া এই কথাই বার বার আমাদের মনে হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ভারতের ঐক্যাদর্শের মূর্ত্ত প্রতীক। সুভাষ-চন্দ্রের স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা স্বাধীনতার দ্বারে উপনীত হই। রামমোহন বর্ত্তমান যুগের উদ্গাতা। অন্য নিবন্ধগুলিতেও আমাদের মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি নবরূপে দেখা দিয়াছে। গ্যেটের আলোচনা লেখক জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। গ্যেটের মানবপ্রীতি লেখকের ভূমিকায় এই অল্প পরিসরেও ধরা দিয়াছে। সহজ কথায় এমন সুন্দর করিয়া বলায় বিষয়গুলি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা লেখককে অভিনন্দন জানাই।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বাঁকুড়া জেলার পুরাকৃতি রক্ষা

বাঁকুড়া জেলার মূল্যবান পুরনো পুঁথি, শিলামূর্ত্তি, ধাতুমূর্ত্তি ইত্যাদি পুরাকৃতিগুলিকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ১৩৪১ সালে বাঁকুড়া সহরে একটি পুরাকৃতি ভবন নির্ম্মাণের প্রস্তাব হয়। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি উক্ত সালের প্রবাসীতে এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। স্থির হইয়াছিল যে, বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের নামানুসারে ঐ ভবনটির নাম রাখা হইবে চণ্ডীদাস স্মৃতিমন্দির।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, দীর্ঘ আট বৎসরের মধ্যেও এই প্রয়োজনীয় প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এই ঔদাসীন্যের দরুন ইতিমধ্যেই বহু মূল্যবান পুঁথি, শিলামূর্ত্তি ইত্যাদি স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং অনেক প্রত্নদ্রব্য রৌদ্র-ঝড়-বৃষ্টিতে ক্রমশ: ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। এই সমস্ত অমূল্য সম্পদ যাহাতে বিনষ্টির হাত হইতে রক্ষা পায় সে বিষয়ে বাঁকুড়ার শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের অবিলম্বে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

হেমচন্দ্র দাস কানুনগো

সম্প্রতি মেদিনীপুরের এই বিপ্লবী "সন্ত্রাসবাদী" নায়কের ৮১ বৎসর বয়সে তিরোধান হইয়াছে। অরবিন্দ-যুগে তিনি এই পথে আসেন। তখন তিনি যুবক। যুবকের উৎসাহ ও সাহস তিনি লইয়া বিপ্লবস্রোতে গা ঢালিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। অনেকটা সেই কারণেই, মনে হয়, তাঁহাকে মাতাকোলের রাজা নরেন্দ্রনাথ বোমা প্রস্তুত করিবার কৌশল শিক্ষার জন্য ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস নগরীতে প্রেরণ করেন। সেই বয়সেই চিত্রাঙ্কণে নৈপুণ্য ছিল, প্যারীতে ইহা ছিল তাহার প্রকাশ্য জীবনের অবলম্বন। প্রায় সমসময়ে উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ অনেকে বোমা প্রস্তুতের নানাবিধ পরীক্ষা করিতেছিলেন। কলিকাতার কালীঘাটে তাহার একটা কেন্দ্র ছিল—প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য ও হরিদাস হালদার তাহার সঙ্গে অন্নবিস্তর লিপ্ত ছিলেন।

হেমচন্দ্র যে কৌশল শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে "বোমা-বিশারদ" বলিয়া পরিচিত করিয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট ফরমুলা অনুযায়ী যে বোমা প্রস্তুত হইয়াছিল, ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে—পঞ্জাব হইতে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত ব্যাপকভাবে অনুকরণ হয়। বোমার সন্ধানে পুলিস এই বিস্তৃত অঞ্চলে খানাতল্লাসী করিয়া যে তথ্য আবিষ্কার করে তাহার উপর নির্ভর করিয়া তাহারা একটি মানচিত্র প্রস্তুত করে। সেই মানচিত্র "রাউল্যাট" রিপোর্টে আছে বলিয়া মনে হয়।

আন্দামান হইতে ফিরিয়া আসিয়া হেমচন্দ্র সন্ত্রাসবাদের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবন-স্মৃতিতে ও অন্যান্য লেখাতে তাহা পাঠ করিয়া সন্ত্রাসবাদের পরিবর্ত্তিত, গান্ধীবাদের নিকট তাহার পরাজয়ের একটা অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। উত্তর জীবনে হেমচন্দ্র মুখ্যত: চিত্রাঙ্কণে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। তিনি কংগ্রেসী আন্দোলনে মন খুলিয়া যোগদান করিতে পারিলেন না, অথচ বৈষয়িক জীবনেও মন দিতে পারেন নাই, তদুপরি দেশসেবার আগ্রহ প্রবল—এই অবস্থায়, প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে তাঁহার শেষ জীবন কাটিয়াছে। তাঁহার আত্মার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

রামকমল সিংহ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একনিষ্ঠ কর্ম্মী রামকমল সিংহ গত ১৫ই চৈত্র সত্তর বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী শহরে এক বিশিষ্ট কায়স্থ পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। বহরমপুর কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে কেরাণীর কাজে নিযুক্ত হন। ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে তিনি সরকারী চাকুরিতে ইস্তফা দেন এবং আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আগ্রহে ও চেষ্টায় সাহিত্য পরিষদের কাজে সামান্য কেরাণীরূপে যোগ দেন, পরে নিজের কর্ম্মক্ষমতায় তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ম্মচারীর পদ লাভ করেন। দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বৎসর একটানা পরিষদের সেবা করিয়া গত বৎসর অসুস্থতার জন্য তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। রামকমল বাবু ছিলেন সাহিত্য পরিষদের প্রাণস্বরূপ। পরিষদের সেবায় তিনি যে ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহার তুলনা বিরল। অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি পরিষদের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাঁহার সাহিত্যসেবী ও সাহিত্য পরিষদ-প্রীতি ছিল অসাধারণ।

হরিপদ সেন-শাস্ত্রী

কবিরাজ পণ্ডিতশিরোমণি হরিপদ সেন-শাস্ত্রী গত ১৮ই ফাল্গুন দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি শুধু কবিরাজই ছিলেন না, সাংবাদিক হিসাবেও তাঁহার এক কালে প্রতিষ্ঠা ছিল। একাধিক সাময়িক পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। সেকালের সাপ্তাহিক 'হিতবাদী'রও তিনি কিছুদিন সম্পাদনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তাঁহারই চেষ্টায় এবং সহায়তায় বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ঔষধ ব্যবসায়ী নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোম্পানীর তিনি ছিলেন প্রধান ব্যবস্থাপক এবং অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি গোপাল বাবু নাম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশ একজন গুণী ব্যক্তিকে হারাইল।

এইচ. পি. ব্যানার্জ্জি

ফাল্গুনের মাঝামাঝি উক্ত বাঙালী কয়লা-খনি ও ব্যবসায়ের নেতা পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল। বাঁকুড়া জেলায় এক সম্পন্ন পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রথম জীবনে এঞ্জিনীয়ার রূপে তিনি কয়লাখনি অঞ্চলে গমন করেন। তারপর তাঁহার আর্থিক উন্নতি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। লক্ষ লক্ষ টাকা তিনি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; লক্ষ লক্ষ টাকা তিনি নীরবে দান করিয়াছেন। বিদ্যালয়, হাসপাতাল, রামকৃষ্ণ মিশন, হিন্দু মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান তাঁহার দানে পুষ্ট হইয়াছিল। এই বাঙালী-প্রধানের তিরোধানে আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

রাখহরি মজুমদার

রাখহরি মজুমদার গত ১০ই চৈত্র পরলোকগমন করিয়াছেন। দীর্ঘ ২৫ বৎসরকাল তিনি বিভিন্ন পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতার কার্য্য করিয়া বহরমপুরের প্রাচীনতম সাংবাদিক হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিলেন। রাখহরির মত নিরপেক্ষ সংবাদদাতা বিরল। সকল সংবাদ তিনি সমভাবে পরিবেশন করিতেন। মফস্বলের সংবাদদাতাদের মধ্যে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সাংবাদিক একনিষ্ঠতা প্রশংসনীয় ছিল।

মানুষ হিসাবে রাখহরি ছিলেন আরও বড়। স্পষ্ট কথা মুখের উপর বলিবার সাহস তিনি রাখিতেন এবং নিজের অবস্থার না কুলাইলেও পরের উপকার সাধ্যমত করিতে কখনও বিরত হইতেন না। পৈতৃক সম্পত্তি পাকিস্থানে পড়িয়া যাওয়ায়, অভাব অনটনের মধ্যে সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করিতে হইলেও, রাখহরি বরাবর মাথা উঁচু করিয়া চলিয়াছেন। মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মিয়া সাংসারিক বিত্ত হারাইলেও তিনি মনের সম্পদ হারান নাই।

শ্রীমনোজিৎ ঘোষাল

বিহারের বিখ্যাত প্রবাসী-বাঙালী পরলোকগত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট অজিতকুমার ঘোষালের পুত্র শ্রীমনোজিৎ ঘোষাল গত বৎসর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়নশাস্ত্রে বি এসসি অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি আই-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ইনি একজন সুলেখকও বটেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া ইনি অনেকগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক পাইয়াছেন।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

পোষ্য

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

দুই প্রতিদ্বন্দ্বী

নূতন চীনের অধিনায়ক মাও-সে তুং

লে: জেনারেল রিজওয়ে (বাঁয়ে) ও জেনারেল ম্যাকআর্থার

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫১শ ভাগ ১ম খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮ | ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ঐক্যের চেষ্টা

কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্যের চেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থই হইয়াছে। ডেমোক্রাটিক ফ্রণ্টের নেতারা বিনাসর্ত্তে ফ্রণ্ট ভাঙিয়া দিয়া কংগ্রেস পক্ষকে দস্তুরমত অসুবিধায় ফেলিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা নেহরু এবং মৌলানা আজাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু টণ্ডন, নেহরু এবং আজাদ ডেমোক্রাটিক ফ্রণ্ট নেতাদের অনুরোধ রাখিতে পারেন নাই, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি ও জেনারেল সেক্রেটারী পদের যে পরিবর্ত্তন তাঁহারা চাহিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা আনিতে পারেন নাই। শেষ পর্য্যন্ত বিচ্ছেদের সম্ভাবনাই প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

কংগ্রেস-ত্যাগ এখন নিছক অন্যায় মনে হইতে পারে না। গান্ধীজী মৃত্যুর আগে কংগ্রেস ভাঙিয়া দেওয়ারই পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস ছাড়িয়া যাঁহারা নূতন দল গড়িবেন এবং গান্ধীজীর আদর্শের কথা প্রচার করিবেন তাঁহাদের সঙ্গে কংগ্রেস-নেতাদের পার্থক্য যদি জনসাধারণের চক্ষে সুস্পষ্ট না হয়, কংগ্রেসত্যাগীদের আদর্শপরায়ণতা এবং দুর্নীতি ও স্বার্থপরাঙমুখ মনোভাব কাচবৎ স্বচ্ছ না হয় তবে জনসাধারণ ইঁহাদিগকেও বিশ্বাস করিবে না। দলগঠন আজ আসল কথা নহে, আজিকার মূল সমস্যা বর্ত্তমান কলুষিত আবহাওয়া দূরীকরণ। দল গড়িয়া গবর্মেণ্ট দখল করিয়া এই আবহাওয়া দূর করা যাইতে পারে যদি সেই দলে উপযুক্ত লোক ছাড়া অযোগ্য বা স্বার্থপর একটিও লোক না থাকে। যদি এরূপ লোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয় হয় তবে দল গড়িয়া গবর্মেণ্ট দখলের চেষ্টা না করিয়া তাঁহারা বিরোধী সদস্যরূপে পার্লামেণ্টে ও ব্যবস্থা-পরিষদে থাকিয়াই দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে পারেন। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আছে। এই সেদিনও ব্রিটিশ শ্রমিক দল হইতে আনুরিন বেভন পদত্যাগ করিয়া একাকী বিরোধিতার দ্বারা গবর্মেণ্টকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছেন কারণ তাঁহার বক্তব্য, তাঁহার আদর্শ অত্যন্ত পরিষ্কার, উহার মধ্যে কোনরূপ ঘোরপ্যাঁচ নাই। সন্দেহজনক লোক লইয়া দল গঠন অপেক্ষা সন্দেহাতীত লোকেরা বিরোধী দলে সমবেত হইলে অনেক বেশী কাজ হইবে।

একটি প্রবল শক্তিশালী কায়েমী স্বার্থ গবর্মেণ্টের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে, উহা ভাঙিবার জন্য কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আর একটি কায়েমী স্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলে পরিণাম একই হইবে, গবর্মেণ্টে লোক বদল হইবে কিন্তু দেশের অবস্থা যাহা ছিল তাহাই থাকিবে।

আচার্য্য কৃপালনী নূতন দলে সর্ব্বোদয়ের নীতি গ্রহণের কথা বলিয়াছেন। সর্ব্বোদয় কঠোর শুদ্ধাচার ভিন্ন সম্ভব নহে, তাহা হরিজন পত্রিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত আংশিক বিবরণ পাঠে বুঝা যায়। দল গঠনে শুদ্ধাচার ব্যতীত সর্ব্বোদয়ের আদর্শ রক্ষা সম্ভবপর হইবে না :

হায়দরাবাদ রাজ্যের শিবরাম পল্লীতে "সর্ব্বোদয়" সম্মেলনে আচার্য্য বিনোবা ভাবে "সর্ব্বোদয়ের" কর্ম্মনীতি বিবৃত করেন।

অন্তঃশুদ্ধি: বহিঃশুদ্ধি: শ্রম: শান্তি: সমর্পণম্

১। অন্তঃশুদ্ধি হইল শুদ্ধ ব্যবহার-আন্দোলনের আসল কথা। লোকে যাহাতে অন্যায়ের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন এবং সামগ্রী ও সুখ আহরণের পন্থা পরিত্যাগ করে তাহার জন্য একযোগে কাজ করিবার আহ্বান রহিয়াছে এই অন্তঃশুদ্ধির মধ্যে। ..জীবনযাত্রার সংস্কারের প্রতি আমাদিগকে চেষ্টা করিয়া ফিরিতেই হইবে। সে চেষ্টা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয়ই হওয়া চাই।

২। বহিঃশুদ্ধি হইল সর্ব্বোদয়ে পরিচ্ছন্নতার কর্ম্মসূচী। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার বোধ আমাদের ভাল, এই সুখ্যাতি আমাদের আছে। কিন্তু ইহা কোনমতেই আমাদের সর্ব্বজনগত নয় এবং ইহার বিকাশও মাত্র একটা সীমার মধ্যে আছে। আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার জন্য যাহাদের সুনাম আছে, সামূহিক স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে তাহাদেরও বোধ বড় জোর এই জাগিতেছে মাত্র। সাধারণ লোকের মধ্যে

এই বোধ অত্যন্ত ক্ষীণ। সুতীব্র চেষ্টা হইল সর্ব্বোদয় সৃষ্টির অপর একটি প্রয়োজন।

৩। শ্রম হইল সর্ব্বোদয় সাধনের তৃতীয় প্রধান সাধন। ...বহু শতাব্দী ধরিয়া আমরা শ্রমের মর্য্যাদা ও মূল্যের বিনাশের জন্য সব কিছু করিয়াছি এবং যাহারা বংশের পর বংশ ধরিয়া আমাদিগের অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, গৃহসজ্জা, অলঙ্কারাদি এবং সুখবিধানের অন্যান্য সামগ্রী যোগাইয়া আসিয়াছে, আমরা তাহাদিগকে শুধু অবহেলা করি নাই, তাহাদিগকে দমিত ও অপমানিত করিয়া আসিয়াছি। ফলে উৎপাদন কমিয়া গিয়াছে, বিলাস ও আত্মসুখপূর্ণ জীবনযাত্রার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু কঠিন শ্রম ছাড়া সুখ অপর কোন পথে ত সম্ভব নয়। আমরা শুধু নিজ হাতেই শ্রম করি অথবা যন্ত্রের সাহায্যে শ্রম করি, শ্রম ত আমাদের করিতেই হইবে।

৪। শান্তি হইল সর্ব্বোদয়ের চতুর্থ অঙ্গ। শান্তির সীমাবদ্ধ অর্থ ধরিয়া শুধু যুদ্ধের উচ্ছেদ বুঝিলে চলিবে না। যুদ্ধের উচ্ছেদ ত বটেই, কিন্তু যুদ্ধ ত ছোট ছোট দলের মধ্যে নিরত ছোট ছোট বিরোধের বৃহৎ সংস্করণ মাত্র। সদ্ভাবে কি করিয়া থাকিতে হয়, ছোটখাট বিরোধের মীমাংসা কি করিয়া করিতে হয়, নিজেদের ক্ষুদ্র জগৎ হইতে কি করিয়া ভয় ও ঈর্ষা দূর করিতে হয়—ছোট ছোট দলগুলি যদি এই সব বুঝিয়া চলে, তবে বৃহত্তর জগতে যুদ্ধের মূল কাটা পড়ে।

৫। সর্ব্বোদয় সাধনের শেষ অঙ্গ হইল সমর্পণ অর্থাৎ গান্ধী বার্ষিকী দিবসে নিজ হাতে কাটা এক লাছি সূতা দান।

রাষ্ট্রবিধি পরিবর্ত্তন

ভারতীয় রাষ্ট্রবিধির অনেকগুলি ধারা পরিবর্ত্তনের জন্য পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু পার্লামেন্টে বিল আনিয়াছেন। এত বড় গুরুত্বপূর্ণ বিলের খসড়া অতিশয় গোপনে করা হইয়াছে; বিল উত্থাপনের দুই দিন পূর্ব্বেও কানাঘুষা ছাড়া আর বিশেষ কিছু শোনা যায় নাই, কোন সঠিক সংবাদ জানিতে দেওয়া হয় নাই। রাষ্ট্রবিধি পরিবর্ত্তনের কথাটা কিছুদিন আগে উঠিয়াছিল, কিন্তু তখন এরূপ একটা কথা উঠিয়াছিল যে, জমিদারী উচ্ছেদে বাধা পড়িতেছে বলিয়া কেবলমাত্র ৩১ ধারাটি বদলানো হইবে, ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কিত ১৯ ধারা পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহা হয়ত পরিত্যক্ত হইবে। অবশেষে দেখা গেল, শুধু ৩১ ধারা নহে, অনেকগুলি ধারা বদলানো হইবে এবং ১৯ ধারার পরিবর্ত্তনই সর্ব্বপ্রধান বস্তু হইবে।

রাষ্ট্রবিধির ১৫, ১৯, ৩১, ৮৫, ৮৭, ১৭৪, ১৭৬, ৩৪১, ৩৪২, ৩৭২ এবং ৩৭৬ মোট ১১টি ধারা পরিবর্ত্তনের জন্য বিল আনা হইয়াছে। ১৯ ধারার যে পরিবর্ত্তন প্রস্তাবিত হইয়াছে তাহা পাস হইলে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাও সঙ্কুচিত হইতে পারে। প্রায় সকল সংবাদপত্রই একবাক্যে বর্ত্তমান গবর্মেণ্টের সর্ব্বকার্য্য সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন। এই বিল দেখিয়া তাঁহারাও সচকিত হইয়াছেন। নিখিল-ভারত সংবাদপত্র সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির জরুরী অধিবেশন আহ্বানের আয়োজন হইতেছে। ১৯ ধারা বর্ত্তমানে যে আকারে আছে তাহাতে কেহ কেহ উহার সুযোগ লইয়া অপপ্রয়োগ করিয়াছে এবং কোন কোন হাইকোর্ট এই স্বাধীনতার অসম ব্যাখ্যা করিয়াছেন এই কারণে সমগ্র ধারাটি বদল করা হইতেছে।

জমিদারী উচ্ছেদের বিরুদ্ধে পাটনা হাইকোর্ট রায় দিয়াছেন, আবার এলাহাবাদ হাইকোর্ট পক্ষে রায় দিয়াছেন। বিষয়টি এখন সুপ্রীম কোর্টের বিচারাধীন। এই অবস্থায় সুপ্রীম কোর্টের রায় বাহির হওয়ার আগে ৩১ ধারা পরিবর্ত্তন যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

রাষ্ট্রবিধি পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বিরোধী পক্ষের অনেক আপত্তি আছে। প্রথমতঃ ১৫ মাস এই রাষ্ট্রবিধি অনুসারে দেশ চলিতেছে। ভুলচুক যাহাই হইয়া থাকুক, আর ছয় মাসের মধ্যে নির্ব্বাচন আসিতেছে, এই অল্প সময়ের জন্য ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া ১৯ ধারাটি আমূল বদলাইয়া ফেলিবার প্রস্তাব তাঁহারা ভাল চোখে দেখিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন, এত অশোভন ব্যস্ততার সঙ্গে উহা পাস করাইয়া লওয়ার চেষ্টা নির্ব্বাচনের সময় বিরোধীদলের কণ্ঠরোধ করিয়া দলের প্রাধান্য রক্ষারই চেষ্টা।

দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা রাষ্ট্রবিধি পরিবর্ত্তন করিতেছেন এই কার্য্যে তাঁহাদের অধিকার নাই। সাম্প্রদায়িক পৃথক নির্ব্বাচন পদ্ধতিতে অতিশয় সঙ্কীর্ণ নির্ব্বাচকমণ্ডলী কর্ত্তৃক ইঁহারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে গণপরিষদ গঠনের দাবি প্রথমেই উঠিয়াছিল, উহাতে রাষ্ট্রবিধি প্রণয়নে দেরী হইবে বলিয়া ব্যবস্থাপরিষদগুলিকে নির্ব্বাচকমণ্ডলী করিয়া গণপরিষদ গঠিত হয়। আর ছয় মাস পরে যখন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে পার্লামেণ্ট নির্ব্বাচিত হইবে তখন তাঁহাদেরই হাতে রাষ্ট্রবিধি পরিবর্ত্তনের ভার ছাড়িয়া দেওয়া উচিত ছিল। তৃতীয়তঃ, পার্লামেণ্টের এক অংশ মাত্র এখন কাজ করিতেছে। কাউন্সিল অব ষ্টেট এখনও গঠিত হয় নাই। দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের কোন প্রতিনিধি পার্লামেণ্টে নাই। নূতন নির্ব্বাচনের পর যে পার্লামেণ্ট গঠিত হইবে তাহাতে ইঁহাদেরও প্রতিনিধিরা থাকিবেন। রাষ্ট্রবিধি—প্রাক্তন দেশীয় রাজ্য বর্ত্তমানে পার্ট-বি ও পার্ট-সি ষ্টেট—সকলের উপর সমান ভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং উহার এত বড় গুরুতর পরিবর্ত্তনের সময় তাহাদেরও মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকা উচিত। ভারতীয় পার্লামেণ্টে দুইটি অংশ থাকিবে—হাউস অব পিপল এবং কাউন্সিল অব ষ্টেট। এই দুই কক্ষে উপযুক্ত ভাবে আলোচনার পর গৃহীত পরিবর্ত্তন অধিকতর মূল্যবান হইবে ইহাই বিরোধী পক্ষের বক্তব্য।

অন্ত দিকে বলা হইতেছে যে, রাষ্ট্র ধ্বংসকারী ও সাংস্কৃতায়বাদীদিগের সংযত করার উপায় মূল রাষ্ট্রবিধিতে ছিল না। দেশের রক্ষার জন্ত সেরূপ ব্যবস্থা করা অবিলম্বে প্রয়োজন। উপরন্ত যদি পরিবর্তিত ধারাগুলির অপপ্রয়োগ হয় তবে আগামী নির্ব্বাচনের পর তাহারও পরিবর্ত্তন সম্ভব হইবে। সুতরাং বর্ত্তমানের দায়িত্ব যাঁহাদের উপর আছে তাঁহারা এরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক মনে করিতেছেন।

পার্লামেন্টের প্রতিনিধিদের যোগ্যতা

ডাঃ আম্বেদকর পার্লামেন্টের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন বিল উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে আমাদের পার্লামেন্ট এবং নির্ব্বাচনী আইন এমন হওয়া উচিত যাহাতে উহার সদস্যেরা গবর্মেণ্টের প্রভাবমুক্ত থাকিতে পারেন। এই মূলনীতি আমরা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি। ভারতীয় পার্লামেণ্টে কোন বিরোধী দল নাই; আগামী নির্ব্বাচনের পরেও সুগঠিত কোন বিরোধী দলের উদ্ভবের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। একদলীয় শাসন যে দেশে চলে সে দেশে পার্লামেন্টের সদস্যদের অন্ততঃ গবর্মেণ্টের প্রভাবমুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে পার্লামেন্ট জনস্বার্থ দেখিবে না, সদস্যেরা নিজেদের স্বার্থোদ্ধার লইয়াই ব্যস্ত থাকিবেন। বর্ত্তমানে ঠিক ইহাই ঘটিতেছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

গত বাজেট অধিবেশনে ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রেলের ভাড়া বৃদ্ধি, ডাকমাশুল বৃদ্ধি এবং তামাক-নস্তির ট্যাক্স প্রভৃতি প্রস্তাব উত্থাপনের সময় সদস্যেরা প্রচুর পরিমাণে কোলাহল করিয়াছেন, কিন্তু ভোটের সময় মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া গিয়াছেন।

পার্লামেণ্টে যাহাতে স্বাধীনচেতা লোকেরা যাইতে পারেন এবং সেখানে গিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারেন তার জন্য কতকগুলি বিধিনিষেধের যে প্রস্তাব ডাঃ আম্বেদকর করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, "সমাজের প্রত্যেক স্তরের লোকের পার্লামেণ্টে আসিবার, দেশের রাজনীতিতে যোগ দিবার এবং আইন বদলাইবার সুযোগ থাকা উচিত। পার্লামেন্ট কোন শ্রেণী, দল বা সম্প্রদায়বিশেষের তর্কসভায় পরিণত হওয়া অত্যন্ত অন্যায়। এরূপ ঘটিলে পার্লামেন্টেরই অনিষ্ট করা হইবে। ব্যবসায়ীদের পার্লামেণ্টে আসিবার সুযোগ থাকা উচিত, কিন্তু তাই বলিয়া পার্লামেন্টকে ঠিক এক্সচেঞ্জে পরিণত হইতে দেওয়া যায় না। আমরা যদি এমন প্রথা প্রবর্ত্তন করি যার ফলে গবর্মেণ্ট রাজনৈতিক চাকরি বা অন্তরূপ সুযোগ-সুবিধা দিয়া পার্লামেন্টের সদস্যদের দুর্নীতিপরায়ণ করিয়া তুলিতে পারে তবে সেই পার্লামেন্টের কোন সার্থকতা থাকে না। এইজন্য এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার যাহাতে সর্ব্বশ্রেণীর লোক পার্লামেণ্টে আসিতে পারে অথচ গবর্মেণ্ট যেন সদস্যগণকে হাত করিয়া গবর্মেণ্টের অন্ধ সমর্থক 'কোরাস গার্ল-এ' পরিণত করিতে না পারে।"

ডাঃ আম্বেদকর বলেন যে, দুইটি সীমার মধ্যে বিলটিকে রাখিলে এই ভয় দূর হইবে। প্রথম, আমাদের নির্ব্বাচনী আইন এমন হওয়া উচিত যাহাতে কোন শ্রেণীর লোক নির্ব্বাচিত হইবার সুযোগ হইতে বাদ না পড়ে, দ্বিতীয়, এই আইন যেন পার্লামেণ্টের সদস্যদের স্বাধীনতা রক্ষায় সাহায্য করে। বিলের প্রথম খসড়ায় নির্ব্বাচনপ্রার্থী হওয়ার চারিটি অযোগ্যতা নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল—(১) নির্ব্বাচনী অপরাধে দণ্ড, (২) পিনাল কোডের অপরাধে দণ্ড, (৩) নির্ব্বাচনের সময় কারাবাস এবং (৪) নির্ব্বাচনের খরচের হিসাব দাখিলের অক্ষমতা। বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে গেলে কমিটি চারিটি নূতন অযোগ্যতা যোগ করিয়া দেন—(১) সরকারী কণ্ট্রাক্ট গ্রহণ, (২) কণ্ট্রোলের মাল চালানের লাইসেন্স ও পারমিট গ্রহণ, (৩) যে কোম্পানীতে গবর্মেণ্টের শেয়ার বা স্বার্থ আছে তাহার ডিরেক্টরের কার্য্য গ্রহণ এবং (৪) দুর্নীতির অপরাধে সরকারী চাকুরী হইতে অপসারণ।

বিল সম্পর্কে চারি দিবসব্যাপী বিতর্ক হয়। পারমিট ও লাইসেন্সধারীরা পার্লামেন্টের এবং ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য হইতে পারিবেন না—অধিকাংশ সদস্য ইহাতে তীব্র আপত্তি করেন। সরকারী কণ্ট্রাক্টধারীদের অযোগ্যতা সম্বন্ধেও আপত্তি হইয়াছিল, তবে শেষ পর্য্যন্ত অধিকাংশ সদস্য এই মত দেন যে, ইঁহাদিগকে বাতিল করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে রাজ্যশাসন পারমিট লাইসেন্সের ঘুষের দ্বারা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। ব্যবস্থা-পরিষদে প্রবেশের অনেক ক্ষেত্রে ইহাই প্রথম ও প্রধান আকর্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বনামে ও বেনামে পার্লামেন্টের বা ব্যবস্থা-পরিষদের কোন সদস্য শুধু কণ্ট্রোলের মাল চালানী লাইসেন্স নহে, কোনরূপ সরকারী অনুগ্রহ লইলে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইতে পারিবেন না এরূপ কঠোর বিধি প্রবর্ত্তিত না হইলে পার্লামেন্ট ও ব্যবস্থা-পরিষদের বর্ত্তমান কলুষিত আবহাওয়া দূর হইবে না। অন্ততঃপক্ষে সিলেক্ট কমিটির সুপারিশ সম্পূর্ণ রূপে গৃহীত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

প্রেস আইন তদন্ত কমিটি রিপোর্ট

প্রেস আইন তদন্ত কমিটির সুপারিশক্রমে ভারত-সরকার শীঘ্রই প্রেস আইনসমূহের পরিবর্ত্তন করিবেন বলিয়া শ্রীরাজাগোপালাচারী পার্লামেন্টকে জানাইয়াছেন। কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ প্রাদেশিক গবর্মেণ্টসমূহের সহিত পরামর্শ করিয়া যে সমস্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা পার্লামেন্টের নিকট পেশ করা হইয়াছে। গৃহীত সুপারিশগুলি এইরূপ:

(১) ভারতীয় অফিসিয়েল সিক্রেট আইন পরিবর্ত্তিত হইবে। পুলিশ বা সেনা বিভাগ কোন প্রকাশিত তথ্য সম্পর্কে

সংবাদ চাহিলে বা সাক্ষ্য দিতে বলিলে তাহা দিতে হইবে। না দিলে দণ্ড হইবে। বলা হইয়াছে যে, ইহাতে ব্রিটিশ আইনের অনুকরণ করা হইতেছে। বৃটেনে সরকারী কর্মচারীদের যে নৈতিক মেরুদণ্ড আছে আমাদের দেশে তাহা গড়িয়া উঠিতে এখনও বহু দেরী আছে। পার্লামেণ্টে এবং ব্যবস্থা-পরিষদসমূহে এমন অনেক সরকারী গোপন তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে যাহাতে দেখা গিয়াছে যে, সরকারী কার্য্যের গোপনতার সুযোগে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করা হইতেছিল এবং ঐরূপ সংবাদ প্রকাশ পাওয়াতেই রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষিত হইয়াছে। অফিসিয়েল সিক্রেট আইনের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা; রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণকারী কতকগুলি দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রী বা কর্মচারীকে দুষ্কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হইতে রক্ষা করা উহার উদ্দেশ্য হইতে পারে না। দেশের নৈতিক মেরুদণ্ড ইংরেজ সরকার প্রায় ভাঙিয়া দিয়া গিয়াছে। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহা কংগ্রেস শেষ করিয়াছে, জাগ্রত ও সক্রিয় জনমত বলিয়া কিছু নাই, বড় সংবাদপত্রগুলি প্রায়শঃই বিজ্ঞাপনের এবং অন্যান্য লোভে সরকারের পক্ষসমর্থক, এই অবস্থায় যে দুই-চারিটি সাহসী পত্রিকা গবর্মেণ্টকে সতর্ক থাকিতে বাধ্য করিত, এই ধারা পাস হইলে তাহা বন্ধ হইবে। অফিসিয়েল সিক্রেট আইন তখন দুর্নীতি সংরক্ষণ আইনে পরিণত হইতে পারে, একথাও ভাবা দরকার।

(২) দেশীয় রাজ্যের রাজাদের বিরূপ সমালোচনা বন্ধ করিয়া যে দুইটি আইন করা হইয়াছিল তাহা বাতিল হইয়া যাইবে।

(৩) প্রেস এবং পুস্তক রেজিষ্ট্রেশন আইনের বিধান মতে প্রত্যেক পত্রিকাকে স্থান পরিবর্তন করিতে হইলে নূতন ডিক্লারেশন লইতে হইত। অতঃপর অস্থায়ী স্থান পরিবর্তনের বিষয় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইলেই চলিবে। একই ব্যক্তি প্রকাশক থাকিলে নূতন ডিক্লারেশন লাগিবে না। এই নিয়ম আরও একটু উদার করিয়া স্থায়ী স্থান-পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হওয়া উচিত।

(৪) প্রচলিত আইনে মুদ্রাকর বা প্রকাশক ভারতের বাহিরে গেলেই নূতন ডিক্লারেশন প্রয়োজন হয়। তাঁহারা ৩০ দিনের অধিক কাল বাহিরে থাকিলে তবেই নূতন ডিক্লারেশন লাগিবে।

(৫) ডিক্লারেশন লওয়ার তিন মাসের মধ্যে পত্রিকা প্রকাশিত না হইলে উহা বাতিল হইয়া যাইবে।

(৬) কোন পত্রিকা ১২ মাসের বেশী বন্ধ থাকিলে ডিক্লারেশন বাতিল হইয়া যাইবে।

কমিটি বলিয়াছিলেন যে, জরুরী প্রেস আইনে কোন সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইলে প্রেস এডভাইসরি কমিটির সহিত পরামর্শ সরকারের পক্ষে বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। উহা বদলাইয়া বলা হইয়াছে যে, যেখানে সম্ভব সেখানে পরামর্শ করা হইবে এবং পরামর্শের সময় নাই বলিয়া যে সমস্ত ব্যবস্থা গবর্মেণ্ট সরাসরি অবলম্বন করিবেন তাহা পরে প্রথম সুযোগে কমিটিকে জানানো হইবে।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারাকে (সিডিশন) ব্রিটিশ আইনের সমপর্য্যায়ে আনিবার জন্য এন. ডি. মজুমদার মামলার ফেডারেল কোর্টের রায় অনুসারে উহার পরিবর্তনের জন্য কমিটি সুপারিশ করিয়াছিলেন। এই মামলায় ফেডারেল কোর্ট রায় দিয়াছিলেন যে, কোন কথা বা লেখার দ্বারা যদি প্রকৃতপক্ষে বিশৃঙ্খলা আসে অথবা যুক্তিপরায়ণ লোকেরা যদি মনে করেন যে উহা দ্বারা বিশৃঙ্খলা আসিবার সঙ্গত কারণ আছে তবেই ১২৪ (ক) ধারা প্রযুক্ত হইবে। প্রিভি কাউন্সিল এই রায় পাল্টাইয়া দিয়াছিলেন। ভারত-সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ এই সুপারিশ কেন গ্রহণ করিতে পারিলেন না আমরা বুঝিলাম না। ১৫৩ (ক) (জাতি-বিদ্বেষ প্রচার) ধারা বিষয়ে কমিটি বলিয়াছেন যে, বিনা বলপ্রয়োগে সামাজিক বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের কথা বলিলে তাহা ঐ ধারার আমলে আসিবে না এরূপ একটি ব্যাখ্যা উহার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া উচিত। গবর্মেণ্ট ইহাও গ্রহণ করেন নাই। সংবাদপত্রের উপর ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা প্রয়োগ নিষিদ্ধ করিবার জন্য কমিটি সুপারিশ করিয়াছিলেন। ইহাও গৃহীত হয় নাই। স্বরাষ্ট্র-সচিব বলিয়াছেন যে, অত্যন্ত জরুরী অবস্থা না হইলে যেন ঐ ধারা প্রয়োগ না করা হয় জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে প্রাদেশিক সরকারেরা এরূপ নির্দ্দেশ দিবেন।

ভারতীয় ডাক ও টেলিগ্রাফ আইন অনুসারে গবর্মেণ্ট সংবাদপত্রে প্রেরিত সংবাদ সেন্সর করাইতে বা হস্তগত করিতে পারেন। কমিটি বলিয়াছিলেন যে, কর্মচারীদের এই কাজ মন্ত্রীদের জানাইতে হইবে এবং মন্ত্রীরা তাহা পুনঃপরীক্ষা করিবেন এরূপ বিধান ঐ সঙ্গে থাকা উচিত। ইহাও অগ্রাহ্য হইয়াছে।

কমিটি বলিয়াছেন যে, ১৯৩১ সালের ভারতীয় জরুরী প্রেস আইন বাতিল করিয়া উহার মধ্যে যে সব ধারা এখনও রাখা দরকার বলিয়া মনে হইবে সেগুলি পীনাল কোড, ফৌজদারী কার্য্যবিধি, প্রেস ও পুস্তক রেজিষ্ট্রেশন আইন, পোষ্ট অফিস আইন, কাষ্টমস্ আইন প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। ইহাতে জরুরী আইনের অধিকাংশ ধারা বাদ পড়িয়া যাইবে বলিয়া গবর্মেণ্ট উহাতে রাজী হন নাই।

কমিটি বলিয়াছিলেন যে, Foreign Relations Act বদলাইয়া এমন ব্যবস্থা করা হউক যাহাতে উহা পারস্পরিক ভিত্তিতে (reciprocal basis) প্রযোজ্য হইতে পারে। গবর্মেণ্ট ইহাতে সম্মত হন নাই।

দেখা যাইতেছে যে, প্রেস কমিটি সংবাদপত্রের সুবিধাজনক যে কয়টি সুপারিশ করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমাদের প্রধান বক্তব্য এই যে, প্রেস আইনের এত গুরুতর এবং দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন এখনই করা উচিত নহে। পার্লামেন্টের বর্তমান প্রতিনিধিদের এই কার্য্যে যোগ্যতা নাই, তাঁহারা জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধি নহেন একথা বিরোধী পক্ষ আগেই বলিয়াছেন।

কুচবিহার

কুচবিহারে যাহা ঘটিয়া গিয়াছে বিভাগীয় কমিশনারের তদন্তের পর তাহাকে অতি শোচনীয় ব্যাপার বলিয়া আমরা বুঝিতেছি। ঘটনাটি সম্পর্কে এত ব্যাপক আলোচনা হইয়াছে যে, তার পুনরাবৃত্তি আমরা করিলাম না। একটি বালক, দুইটি বালিকা ও দুইটি তরুণ যুবক গুলির আঘাতে প্রাণ হারাইয়াছে। বিভাগীয় কমিশনার বলিতেছেন, গুলি চালাইবার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না এবং গুলি চালনা আইনানুসারে নিয়ন্ত্রিতও হয় নাই; ১৪৪ ধারা জারী করিবারও কারণ ছিল না এবং জারী করিলে অত কম পুলিস লইয়া উহা প্রয়োগ করা যাইবে না, ইহাও বুঝা উচিত ছিল। গুলি চালনার সমস্ত দায়িত্ব আসিয়া পড়িতেছে সরকারী অদূরদর্শিতার উপর।

কুচবিহারের এই ব্যাপারে শাসনকার্য্যের চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা দেখা গিয়াছে। চাউলের মূল্য ক্রমেই চড়িতেছে ইহা দেখিয়াও গবর্ন্মেণ্ট সতর্ক হন নাই, প্রতিকারের চেষ্টাও করেন নাই। স্থানীয় ডেপুটি কমিশনার চাউল চাহিয়া পান নাই, নিজ দায়িত্বে নেপালের চাউল কিনিবার অনুমতি চাহিলে তাহাও পান নাই। অধিকাংশ চাষী ছিল মুসলমান, তাহারা অনেকে পাকিস্থানে চলিয়া গিয়াছে। হিন্দু উদ্বাস্তু যাহারা আসিয়াছে তাহারা পর্য্যাপ্ত উৎপাদন করিতে পারে নাই। তার উপর গবর্ন্মেণ্ট পাট চাষে উৎসাহ দিয়াছেন, বহু জমিতে ধানের বদলে পাট বোনা হইয়াছে। প্রয়োজন অপেক্ষা ফসল কম হইয়াছে, ওদিকে প্রোকিউরমেণ্টও চলিয়াছে। এই সমস্ত কারণে চাউলের দাম ধীরে ধীরে চড়িয়াছে, এক দিনে চড়ে নাই। মূল্যবৃদ্ধির ক্রমবর্দ্ধমান গতি দেখিয়া সতর্ক হইবার যথেষ্ট সুযোগ সরকারী কর্তারা পাইয়াছিলেন। সরকারী গেজেটের গত সপ্তাহের হিসাবে প্রকাশ—কুচবিহারের কোন কোন স্থানে চাউলের দর টাকায় ১১ ছটাক অর্থাৎ ৫৮ টাকা মণেরও বেশী। অথচ খাদ্যসচিব শ্রীপ্রফুল্ল সেন বলিতেছেন যে, চাউলের দাম কমিতেছে। চাউলের মূল্যের ব্যাপারে যাহাকে 'bungling' বলা হয় তার চূড়ান্ত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। এখন অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, মডিফায়েড রেশনিংও চালু রাখা যাইতেছে না।

এইরূপ প্রতিকূল অবস্থায় সুযোগ যে রাষ্ট্রশত্রুর দল লইবেই একথা কর্তৃপক্ষের মাথায় প্রবেশ করা উচিত ছিল। যে ভাবে শিশু, তরুণ ও তরুণীদিগকে আগে রাখিয়া "অন্নাভাব অভিযান" চালিত হইয়াছিল তাহাতে তাহাদের পিছনে কাহাদের ষড়যন্ত্র ছিল তাহা বুঝিতে এক মুহূর্তও লাগে না। এ সবের প্রতিষেধক ব্যবস্থা পূর্ব্বাহ্নেই করা হয় নাই কেন তাহা জানিবার দাবি জনসাধারণ করিতে পারে।

সোমনাথ মন্দিরের পুনরুদ্ধার

সোমনাথ মন্দির পুনরুদ্ধার করিয়া একটা ঐতিহাসিক ঘটনার পটপরিবর্তন করা হইল। মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণে সৌরাষ্ট্রের সমুদ্রকূলে অবস্থিত এই মন্দিরের শিবলিঙ্গ ধ্বংস হয়। তদবধি ঐ অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায় নিজেদের শক্তিহীনতার ম্রিয়মাণ ছিলেন। মুসলমানরা ছিলেন উৎফুল্ল; যখন তখন ভ্রূকুটি করিতেন এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া। আজ পটপরিবর্তন হইয়াছে। হিন্দুরা আনুষ্ঠানিকভাবে শিবলিঙ্গ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। করাচির মুসলিম পত্রিকাগুলি গর্জ্জন করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া ঐতিহাসিক তাগাগড়ার মর্ম্মকথা উপলব্ধি করিতে পারিলে, সমাজের ও রাষ্ট্রের কল্যাণ হইবে। শ্বেতপাথরের মন্দির, স্বর্ণচূড় মন্দিরও চিরন্তন নয়।

ইরাণ ও মধ্যপ্রাচ্যের তৈল

পাশ্চাত্য ভৌগোলিকগণের অভিধানে তুরস্ক, আরব দেশ, সিরিয়া, লেবানন, ইরাক "মধ্য প্রাচ্য" নামে পরিচিত। এই দেশগুলি আমাদের পশ্চিমে অবস্থিত। তাহাদের তৈল-সম্পদ প্রায় অফুরন্ত। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে তার ব্যবহার অপরিহার্য্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়েই এই সম্পদ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলি অত্যন্ত সজাগ হইয়া পড়ে। কারণ তৈল না হইলে যুদ্ধ চালানো একপ্রকার অসম্ভব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও সেই মতের সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। এই কথার মধ্যেই ইরাণ দেশ ও ব্রিটেনের মধ্যে সাম্প্রতিক বিরোধের রহস্য বিদ্যমান। মধ্যপ্রাচ্যের তৈল-সম্পদ পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের অধিকারে আছে। এই অঞ্চলের সদ্য জাগ্রত জাতীয়তা তার ফলে ক্ষুব্ধ হইতেছে। সেই বিরূপ ভাব সোভিয়েট রাষ্ট্র নিজের প্রয়োজনে জাগাইয়া রাখিতেছে এবং দুই ভাবের চাপে পড়িয়া পাশ্চাত্য পুঁজিপতিগণ নিজেদের স্বার্থ বিপন্ন মনে করিতেছে। এই সমস্যা বুঝিবার জন্য মধ্যপ্রাচ্যের তৈল-সম্পদ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা থাকা প্রয়োজন।

ইরাকের তেলের খনিগুলির মালিক হইতেছে 'ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানী'—সংক্ষেপে আই. পি. সি.। এই

কোম্পানীর অংশীদারদের মধ্যে 'ব্রিটিশ শেল অয়েল কোম্পানী', 'এ্যাংলো-ইরাণ কোম্পানী' ও একটি ফরাসী কোম্পানী প্রত্যেকে ২৩.৭৫ ভাগে মোট ৭১.২৫ ভাগের মালিক। মিউ জার্সির 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী' ও 'সোকোনী ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানী' প্রত্যেকে ১১.৮৭৫ ভাগে মোট ২৩.৭৫০ ভাগের মালিক এবং অবশিষ্ট ৫ ভাগের মালিক সি এস. গুলবেনকিয়ান নামে একজন আর্মানি ধনপতি।

ইরাকের তৈল উৎপাদন গত ১৯৫০ সালে হইয়াছে দৈনিক গড়ে ১২৪,০০০ ব্যারেল; অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যের সর্ব্বমোট তৈল উৎপাদনের সাত শতাংশ।

তৈল অভিজ্ঞেরা বলেন, আই. পি. সি. ৩২ ইঞ্চি নল বসাইয়া আগামী ১৯৫৩ সালের মধ্যে শেষ করিবার জন্ত যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা শেষ হইলে এই উৎপাদন দৈনিক দ্বিগুণ হইবে। ১৫০,০০০,০০০ ডলারের এই পরিকল্পনাটি তৈরির ভার লইয়াছেন সানফ্রান্সিস্কোর বেচটেল কোম্পানী। এই পরিকল্পনার কাজ শেষ হইলে ইরাণের সীমান্তবর্ত্তী কিরকুক হইতে ৫৮০ মাইল দূরে অবস্থিত ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী বানিয়াসে দৈনিক ৩০০,০০০ ব্যারেল তৈল প্রেরণ করা চলিবে।

আই. পি. সি. ইরাক সরকারকে প্রতি ব্যারেল পিছু আনুমানিক ২২ যুক্তরাষ্ট্রীয় সেণ্ট কর হিসাবে দেয়। ঐ কর বাড়াইয়া ৩২ সেণ্ট করিবার একটি চুক্তি গত আগষ্ট মাসে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু উহা নানা কারণে শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হয় নাই।

ইরাণ ও সৌদী আরবে ১৯৫০ সনে দৈনিক গড়ে যথাক্রমে ৬৩৬,০০০ ও ৫৪০,০০০ ব্যারেল তৈল নিকাসিত হইয়াছিল। ইরাণে এই তৈল উৎপাদনের পরিচালনা করে "এ্যাংলো ইরাণীয়ান অয়েল কোম্পানী" এবং তাহারা এইজন্ত ইরাণকে অন্তান্ত অনুমোদিত দেয় কর ছাড়াও প্রতি ব্যারেলে ২৪ সেণ্ট কর দিয়া থাকে। গত ১৯৪৯ সনে উহা বাড়াইয়া ৩৬ সেণ্ট করিতে কোম্পানী স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু ইরাণ পরিষদ (মজলিস) দীর্ঘ আলোচনার পর ১৯৫০ সালে তাহা বাতিল করেন।

ইরাকের প্রধান মন্ত্রী নুরী আস্ সৈয়দ পাশা এই সব তৈলশিল্পের মালিকদের সতর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন যে, পার্শ্ববর্ত্তী দেশ ইরাণ ও সৌদী আরবের তৈল উৎপাদনে যে 'রয়ালটি' বা কর দেওয়া হয়, তাঁহারা সেই তুলনায় ইরাকের দাবী যদি পরিপূরণ না করেন তবে বিদেশী তৈল কোম্পানীগুলিকে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। গত ১৯৫০ সনের ডিসেম্বর মাসে সৌদী আরব 'আরব আমেরিকা তৈল প্রতিষ্ঠানে'র সঙ্গে (ARAMCO) যে নূতন চুক্তি করিয়াছে তাহাতে দুই দেশই ৫০-৫০ করিয়া লভ্যাংশ পাইবে। গত সপ্তাহে বাগদাদে ব্রিটিশ তৈলপতিদের সঙ্গে ইরাকের সরকারী কর্মচারীদের ভবিষ্যতে কি হারে ইরাক টাকা পাইবে তাহা স্থির করিবার জন্য একটি আলোচনা হইবার কথা শিয়াছে। জানা গিয়াছে যে, আই. পি. সি. ইরাকের পার্শ্ববর্ত্তী দেশগুলিতে যে ব্যবস্থায় তৈল নিকাসনের কাজ চালাইয়া যাইতেছে, ইরাকের ক্ষেত্রেও তৈলের উপর প্রদত্ত রাজস্ব হইতে সেই কাজ চালাইয়া যাইতে স্বীকৃত আছে। তৈলশিল্পপতি মহলের ধারণা ইরাক ARAMCOর মতই একটা চুক্তি করিবে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আই. পি. সি. ৭৫ বৎসরের এক চুক্তির বলেই ইরাকের তৈল নিকাসনের কাজ চালাইতেছে। ঐ চুক্তির মেয়াদ আগামী ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আছে।

কোরিয়ার যুদ্ধ

কোরিয়ার কম্যুনিষ্ট আক্রমণ আরম্ভ হয় গত ২৫শে জুন তারিখে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষ হইতে প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ হয় ২৬শে তারিখে। সেই হইতে কত কোরিয়ান, কত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৈন্ত হত-নিহত হইয়াছে তার একটা হিসাব জুন মাসের "মডার্ণ-রিভিউ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। আর আহত হইয়াছে মার্কিণ সামরিক গর্ব্ব। তার শেষ পরিণতি দেখিতে পাই মার্কিণ সেনাপতি সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সমরবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক জেনারেল ম্যাকআর্থারের পদচ্যুতির মধ্যে।

এই ব্যাপার লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তুমুল বিতণ্ডা লাগিয়া গিয়াছে। একপক্ষ রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানকে সমর্থন করিতেছেন; অন্ত পক্ষ জেনারেল ম্যাকআর্থারকে।

মার্কিণী দুই-একখানি সাপ্তাহিক পাঠ করিয়া যে-সব তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিলাম তাহা আমাদের পাঠকবর্গকে জানাইতেছি। এই বিতণ্ডা সম্পর্কে কিছু বলিবার পূর্ব্বে একটা তথ্য দিলাম, যার ইঙ্গিত গুরুত্বপূর্ণ। এই তথ্য কম্যুনিষ্ট জয়ের রহস্ত উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছে। "নিউজ-উইক্" নামক মার্কিণী সাপ্তাহিকের ২৩শে এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত বিবরণটি এই সম্পর্কে স্মরণ রাখা উচিত।

সম্প্রতি কম্যুনিষ্টদের জঙ্গী জেট-বিমান এম্-আই-জি—১৫ দুইটি বি—২৯ বোমারু বিমানকে ঘায়েল করিয়াছে; আরও কয়েকটিকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। জেট-বিমানের এই কীর্ত্তি মার্কিণী সামরিক বিভাগকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে; তাঁহাদের আত্মবিশ্বাসে আঘাত করিয়াছে। ব্রিটিশ সংবাদসংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানের মতে এই কম্যুনিষ্ট বিমানবাহিনী সর্ব্ব এশিয়ার বিমানচালক কর্ত্তৃক চালিত; তাঁহাদের মধ্যে আছেন চীনের, কোরিয়ার, বর্ম্মার, ভারতবর্ষের, জাপানের লোক; কয়েকজন রাশিয়ার অধিবাসীও আছেন। এই বাহিনীর

পরিচালক একজন সোভিয়েট সেনাপতি; জভিয়েভ তাঁহার নাম। এই বাহিনীর কেন্দ্রস্থল মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী মুকডেন নগরীতে অবস্থিত; তার শাখা আছে সাংহাই, নানকিন, পিকিং নগরীতে।

এখন বাদ-বিতণ্ডায় ফিরিয়া যাওয়া হউক। ঐ পত্রিকার এই সংখ্যা নানা বিশেষজ্ঞগণের মতামতে পূর্ণ। আরনেষ্ট লিন্ডলে বলিতেছেন: "জেনারেল ম্যাকআর্থার যে সব প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের মধ্যে আমাদিগকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইবে হয়ত (inescapable) কিন্তু এই প্রস্তাব আমাদের সহযোগী রাষ্ট্রবর্গ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার প্রয়োজন অতি আবশ্যক।" ট্রুম্যানের স্বপক্ষের লোক বলিতেছেন: "ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ভাঙার পথে চলিতেছে। পূর্ব্ব-এশিয়ার কি নীতি অবলম্বন করা হইবে তাহা লইয়াই মতভেদ। সেই মতভেদ ম্যাক্‌আর্থারের পদচ্যুতিতে দূর হইবে না।" পত্রিকার লণ্ডন আপিসের কর্তা ফ্রেড ভেনডারস্মিড্ বলিতেছেন: "নূতন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী হার্ব্বার্ট মরিসন সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিতেছেন পশ্চিম ইউরোপে ও পূর্ব্ব-এশিয়ায় ব্রিটেনের পূর্ব্বের প্রভাব-প্রতিপত্তি ফিরাইয়া আনিতে।"

ইহা হইল কূটনীতির খেলা। জনসাধারণ কিন্তু ম্যাক্‌আর্থারের পদচ্যুতি হৃষ্টমনে গ্রহণ করে নাই। জাপানের গণমত ম্যাক্‌আর্থার "যুগের" (jidai) অবসানে ক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাহারা মনে করে যে ট্রুম্যানের ঘোষণার ভাষা (wording) আপত্তিজনক; তাহা "সুপরিকল্পিত হিংসায় পূর্ণ" (calculated and malicious)। লণ্ডন নগরীর বিশেষজ্ঞগণের কেহ কেহ মনে করেন যে, ম্যাক্‌আর্থারকে যে সব নির্দ্দেশ পাঠান হইয়াছিল তাহা "অস্পষ্ট ও ভ্রান্তিজনক" (vague and confusing)।

ফরাসী দেশে প্রায় সকলেই খুশী। ম্যাক্‌আর্থারের যে "প্রথম এশিয়া-খণ্ড, পরে ইউরোপ-খণ্ড"—এই নীতির শেষ হইল মনে করিয়া রাষ্ট্রনায়কেরা আনন্দিত। রাষ্ট্রের ব্যাপারের মধ্যে সেনানী হাত দিবে জনসাধারণ এই কথা সহ্য করিতে পারে না। নেপোলিয়ান দাগা দিয়াছিলেন, সেই কথা ফরাসীরা ভুলিতে পারেন না। সবচেয়ে বড় কথা আইসেনহাওয়ারের নীতি মার্কিণ রাষ্ট্রের গ্রাহ্য হইল।

ভারতরাষ্ট্রে লোকগণনা

নয়াদিল্লী হইতে ১৯৫১ সালের লোক-গণনার প্রাথমিক হিসাবে প্রকাশ—এই বৎসরের ১লা মার্চ্চ ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ৯১ হাজার ৬২৪; ইহার মধ্যে ১৮ কোটি ৩৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮০৭ জন পুরুষ এবং ১৭ কোটি ৩৫ লক্ষ ৬ হাজার ৮১৭ জন নারী। ইহার সহিত ভারতান্তর্গত জম্মু ও কাশ্মীরের আনুমানিক লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষ ৩৭ হাজার এবং সে এলাকাভুক্ত ও উপজাতিদের অধ্যুষিত এলাকায় আনুমানিক ৫৬ লক্ষ অধিবাসীর সংখ্যা যুক্ত করিয়া মোট জনসংখ্যা ৩৬ কোটি ১৮ লক্ষ ৩০ হাজার হইবে।

পূর্ব্বাপর সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায়—১৯০১ হইতে ১৯১১, এই দশ বৎসরে জনসংখ্যা ১ কোটি ৩৫ লক্ষ অর্থাৎ শতকরা ৫'৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছিল ২৪ কোটি ৯০।০ লক্ষ। ১৯১১ হইতে ১৯২১, এই দশ বৎসরে উহা শতকরা ৩ দশমিক ভাগ কমিয়া হয় ২৪ কোটি ৮১ লক্ষ ৮০ হাজার। ১৯২১ হইতে ১৯৩১-এ উহা আবার শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া পরিণত হয় ২৭ কোটি ৫৫ লক্ষ ২০ হাজারে। ১৯৪১ সালে জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৩১ কোটি ৪৮ লক্ষ ৩০ হাজার অর্থাৎ বর্দ্ধনহার এই দশ বৎসরে শতকরা ১৪'৩। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ১৯৪১ হইতে ১৯৫১ এই শেষ দশ বৎসরে ভারতের জনবৃদ্ধি হইয়াছে ৪ কোটি ২০ লক্ষ ৬১ হাজার ৬২৪ জন অর্থাৎ শতকরা ১৩'৪ ভাগ।

তুলনায় বলা যাইতে পারে—আণবিক বোমাহত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে, জাপানের অত্যন্ত বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে তাহার যে জননাশ হয় তাহা পূরণ করিয়া মাত্র এক বৎসরের মধ্যে সে দেশে আবার জনবৃদ্ধি ঘটে প্রায় দুই কোটি। ভারতের শেষ দশ বৎসরের মধ্যে স্বাভাবিক মৃত্যুসংখ্যা বাদে যুদ্ধে এবং তত্তোধিক যুদ্ধের পরোক্ষ পরিণামস্বরূপ মানবসৃষ্ট বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরের ফলে প্রায় অর্দ্ধকোটি নরনারী কালগ্রাসে নিপতিত হয়। তাহাতে ভারতের জনবৃদ্ধি ৪ কোটি ২০ লক্ষ ৬১ হাজার ৬২৪ জন যাহা দশ বৎসরে দেখা গেল, তাহা জাপানের অনুপাতে বেশী নয়, বরং খুব কমই।

জনসংখ্যায় ভারতীয় বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে উত্তর প্রদেশ ৬,৩২,৫৪,১১৮ নরনারী লইয়া সর্ব্বপ্রথম, তৎপরে মাদ্রাজ তাহার ৫,৬৯,৫২,৩৩২ অধিবাসী লইয়া দ্বিতীয়, ৪,০২,১৮,৯১৩, সন্তানজননী বিহার তৃতীয়; ৩,৫৯,৪৩,৫৫৯ সংখ্যায় বোম্বাই চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে। দ্বিখণ্ডিত বঙ্গের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার অঙ্ক ২,৪৭,৮৬,৬৮৩ হওয়ায়, তাহার স্থান ভারত ইউনিয়নে পঞ্চমে দাঁড়াইয়াছে।

উদ্বাস্তু জনসংখ্যার প্রাথমিক হিসাব

ভারতে মোট ৭৪,৭৯,২৭৮ জন উদ্বাস্তু নরনারী বর্ত্তমানে বাস করিতেছে। তন্মধ্যে পঞ্জাবে ২৪,৬৮,৪৯১, পশ্চিমবঙ্গে ২১,১৭,৮৯৬, উত্তর প্রদেশে ৪,৭৫,৮২২, বোম্বাই-এ ৩,৪১,০৮১, আসামে ২,৭৬,৮২৪, মধ্য প্রদেশে ১,২০,৮৮৬, উড়িষ্যায় ২০,৯২৬, হায়দ্রাবাদে ৪,০৩৫। নবগঠিত রাজ্য ইউনিয়নে সংযুক্ত দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে পাতিয়ালা ও পূর্ব্ব পঞ্জাব রাজ্যসঙ্ঘে ৩,৮০,১৫৯, রাজস্থান ৩,১২,৭৪২, ত্রিপুরা ১০০,২৫১, আজমীঢ়, ৭১,৮২৪, মধ্যভারত ৬৮,৪৫৭, সৌরাষ্ট্র ৬০,৫২৫, ভূপাল ১৭,৯৩০, বিন্ধ্য প্রদেশ ১৪,৬২৬,

কচ্ছ ১২,৯৯১, হিমাচল প্রদেশ ৫,২৪৮, মণিপুর ১,২০০, আন্দামান ও নিকোবর ১,৫৫৫, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ৩৫৪, বিলাসপুর ১৮৭, সিকিম ৩৯ ও কুর্গ ১১ জন উদ্বাস্তুকে স্থান দিয়াছে।

ভারতরাষ্ট্রের জাতীয় আয়

দিল্লী হইতে ২১শে বৈশাখে প্রেরিত এক সংবাদে জানিতে পারিলাম যে, ১৯৪৮-৪৯ সালে আমাদের জাতীয় আয় ছিল ৮,৭১০ কোটি টাকা। জাতীয় "আয় কমিটি"র বিবরণীতে এই তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের জনসংখ্যা ৩৪ কোটি ১০ লক্ষ ৪০ হাজার নরনারী শিশু ধরিয়া ঐ বৎসর প্রতি জনের আয় ছিল ২৫৫ টাকা। অর্থসচিব শ্রীচিন্তামন দেশমুখ সংসদে এক বিবৃতি প্রদান করেন।

এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি জ্ঞাতব্য :

১৯৪৯ সালে এই কমিটি গঠিত হইয়াছিল। কমিটিকে জাতীয় আয় এবং এতৎসম্পর্কিত অন্যান্য হিসাবাদি প্রণয়নের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং প্রাপ্তিযোগ্য তথ্যাদি কি ভাবে আরও নির্ভুল হইতে পারে, তৎসম্পর্কে সুপারিশ করিতে বলা হইয়াছিল।

১৯৫১ সালের শেষ ভাগে অথবা ১৯৫২ সালের গোড়ায় কমিটির চূড়ান্ত বিবরণ দাখিল করার সম্ভাবনা আছে। এই রিপোর্টে ১৯৪৮-৪৯ ও ১৯৪৯-৫০ সালের হিসাব থাকিবে। কমিটি বিভিন্ন শ্রেণীর বৃত্তিজীবীদের আয় নিম্নোক্ত রূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন :

পশুপালন ও কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত ৯,০৫,৩৭,০০০ হাজার লোক ও তাহাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের ধরিয়া মোট জনসংখ্যার ৬৮·২ ভাগ। শিল্পকর্ম্মে নিযুক্ত ১,৮০,১৯,০০০ লোক ও তাহাদের উপর নির্ভরশীলদের লইয়া জনসংখ্যার মোট ১৩·৬ ভাগ। অন্যান্য কর্ম্মে নিযুক্ত ও তাহাদের উপর নির্ভরশীলদের মোট অনুপাত এইরূপ :—খনির কাজে—৬,৩৩,০০০ জন, শতকরা ০·৫ ভাগ ; যানবাহন—২৪,৪৮,০০০ জন, ১·৮ ভাগ ; ব্যবসা-বাণিজ্য—৮২,৫০,০০০, ৬·২ ভাগ ; সরকারী বাহিনী —১৯,০৯,০০০। সরকারী শাসন-বিভাগ—১৬,৯৭,০০০ জন, ১·৩ ; পেশা ও শিল্পকলা—৫০,৪৪,০০০ জন ; ৩·৮ এবং বি-চাকরের কাজ—৪১,৯৪,০০০ জন ; ৩·২ ভাগ।

কমিটির মতে, উৎপাদনের বিভিন্ন অঙ্গ ; যথা, শ্রমিক, মূলধনী প্রভৃতির আয় বিদেশ হইতে লব্ধ মোট আয়ের অঙ্ক হইতে বাদ দিয়া কমিটি জাতীয় আয়ের পরিমাণ ৮,৭১০ কোটি টাকা রূপে ধার্য্য করিয়াছেন।

শিল্প-সম্পর্কিত মোট জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ হইতে দেখা যায় যে, কৃষি, পশুপালন এবং এতৎসংক্রান্ত কাজকর্ম্মে (চাষী নিজের ফসল বহনের জন্য যে যানবাহন নিয়োগ করে এবং বিক্রয়-ব্যবস্থার জন্য শ্রম নিয়োজিত হয়) বাবদে জাতীয় আয়ের শতকরা ৪৮ ভাগ আয় হয়। বাণিজ্য, যানবাহন ও যোগাযোগ বাবদে আয় হয় শতকরা ১৯·৫ ভাগ।

অন্য দিক হইতে দেখিতে গেলে, কৃষি, খনি এবং অন্যান্য কলকারখানা ও কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য হইতে আয় হয় ৫,৬৫০ কোটি টাকা, অথবা মোট আয়ের দুই-তৃতীয়াংশ।

ভারতীয় কাপড়ের কলে তুলার ব্যবহার

নিম্নোদ্ধৃত বিবরণটি জানিয়া রাখার প্রয়োজন আছে। এই হিসাবে ৩৯২ পাউণ্ড ওজনের হাজার গাঁট তুলা এক ইউনিট ধরা হইয়াছে।

তুলা বৎসর	ভারতীয়	পাকিস্থানী	বিদেশী	মোট
১৯৪১-৪২	২৮,৬৩	১০,০৬	৫,৬৭	৪৪,৩৬
১৯৪২-৪৩	৩০,৩০	১৩,৬১	৪,৬৪	৪৮,৫৫
১৯৪৩-৪৪	২৮,৫৪	১৩,৪৪	৬,৩৪	৪৮,৩২
১৯৪৪-৪৫	২৯,৯২	১২,৫৩	৬,৪৪	৪৮,৮৮
১৯৪৫-৪৬	২৬,৯৭	১২,৬১	৬,০৫	৪৫,৬৩
১৯৪৬-৪৭	২১,৪৪	১০,১৭	৬,৯৬	৩৮,৫৭
১৯৪৭-৪৮	২৮,৬০	৭,২৩	৬,২৪	৪২,১০
১৯৪৮-৪৯	৩১,২৪	৪,১১	৭,২০	৪২,৫৫
১৯৪৯-৫০	২৫,৪৪	২,০৩	৯,৩৭	৩৬,৮৪

এশিয়াখণ্ডে চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি

"মার্কিন বার্ত্তা" পত্রিকার ৩রা এপ্রিল সংখ্যায় নিম্ন-লিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে : "আগামী ৯ হইতে ১৯শে এপ্রিলের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত বোগোর নামক স্থানে দুইটি বিশেষজ্ঞ বৈঠক হইবে ; ঐ বৈঠকের সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রায় এক শত কোটি লোকের, এক কথায় বিশ্বের প্রায় অর্দ্ধেক সংখ্যক মনুষ্য সমাজের কল্যাণ অকল্যাণ প্রভাবিত হইবে।

বৈঠক দুইটির একটি হইতেছে চাউল উৎপাদন সংক্রান্ত, অপরটি হইতেছে সার সংক্রান্ত। বিশ্বের চাউল উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তৎসংক্রান্ত কৃষিকার্য্যের উন্নতিবিধানই উহার লক্ষ্য।

ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, মিশর, ফ্রান্স ও চীন সরকার উক্ত বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য স্ব স্ব বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন। প্রথম পাঁচ দিন চাউল উৎপাদন সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ বৈঠক হইবে, সার সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ বৈঠক বসিবে পরবর্ত্তী পাঁচ দিন।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে রেঙ্গুনে চাউল উৎপাদন সংক্রান্ত প্রথম বৈঠক হইয়া গিয়াছে।

ফেব্রুয়ারী মাসের বৈঠকে ভারতীয় ও জাপানী ধান্যের সংমিশ্রণে এক প্রকার সঙ্কর ধান্য উৎপাদন করিবার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। বর্ত্তমানে কটকে কেন্দ্রীয় চাউল গবেষণা কেন্দ্রে

(Central Rice Research Institute) উক্ত সহর চাউল উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে।

আন্তর্জাতিক চাউল কমিশনের সহিত সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উন্নত ধরণের বীজ, অধিকতর পরিমাণে সার, উন্নত প্রকারের জলসেচ ব্যবস্থা এবং উদ্ভিদ্‌রোগ ও পতঙ্গ নিরোধের কার্য্যকরী ব্যবস্থা—এই সকল উপায়ে চাউলের অভাব নিবারণ করা যায়। ফসল কাটা, শস্য সংরক্ষণ এবং যানবাহনের উন্নততর ব্যবস্থাও শস্যাভাব নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া কমিশন মনে করেন।"

কাশিয়াড় খাল পরিকল্পনা

"কাশিয়াড় খাল পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমার অধীনে একটি বিরাট সম্ভাবনা পূর্ণ খাল। বর্ষাকালে যখন সর্ব্বপ্রকার যান চলাচল বন্ধ হয়, তখন এই কাশিয়াড় খাল পথেই নৌকাযোগে ভারতরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যোগাযোগ-ব্যবস্থা রক্ষিত হয়। গত বৎসরও এই পথে হাজার হাজার মণ চাউল মালদহ ও মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইয়াছে।

কাশিয়াড় খালটি মাত্র ২৭।২৮ মাইল দীর্ঘ। এই খালটি বালুরঘাটে আত্রেয়ী নদীতে পড়িয়াছে এবং গঙ্গারামপুরের পুনর্ভবা নদীর সহিত যুক্ত। তবে গঙ্গারামপুরের অংশে খরার সময় জল থাকে না।

খালটি একটু গভীর করিলে বার মাস নৌকা চলাচল করিতে এবং প্রচুর পরিমাণে মৎস্য শিকার করা যাইতে পারে। মাঝে মাঝে জল রক্ষার (Water Reservoir) ব্যবস্থা করিতে পারিলে পাম্পের সাহায্যে ক্ষেতে জল সেচন করিয়া বৎসরে দুই তিনটি ফসল উৎপাদন করা যাইতে পারে। এই ব্যবস্থায় প্রায় ১৪ হাজার একর জমিতে কৃষিকার্য্যের সুবিধা হইবে এবং বৎসরে ৪॥ লক্ষ মণ ফসল বেশী উৎপাদিত হইবে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে পারিলে রাষ্ট্রীয় সরকারের খাদ্য ঘাটতি অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। বিশেষজ্ঞ পাঠাইয়া এই অংশটি পরীক্ষা করিয়া পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী করিবার জন্য আমরা সরকারের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।"

পশ্চিম-দিনাজপুরের মুখপত্র "আত্রেয়ী" (মাসিক) পত্রিকায় চৈত্র সংখ্যায় উপরোক্ত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে। বক্তব্য পাঠ করিয়া মনে হয় স্থানীয় নাগরিকবৃন্দ রাষ্ট্রের দিকে তাকাইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন।

সরকারী সেচ-পরিকল্পনা

বাঁকুড়ার নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক "প্রচার" পত্রিকার ২৬শে চৈত্র সংখ্যায় নিম্নলিখিত তথ্যপূর্ণ সম্পাদকীয় মন্তব্যটি প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরেজ রাজত্বের দুই শত বৎসরের অবহেলা বাঁকুড়ার বাঁধ, জলাধার প্রভৃতি একেবারে ধ্বংস করিয়াছে বলিলে হয়। সেই অবহেলার ক্ষতিপূরণ করিতে কত বৎসর লাগিবে তাহার হিসাব করা সহজ। তবুও যদি সেচ-মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদারের বিভাগ ও স্থানীয় নাগরিকগণ কৃতসঙ্কল্প হন, তবে অসাধ্যসাধন করিতে পারেন।

"কথায় আছে—'বিধবার কপালে হাটেও সিঁদুর মিলে না'—বাঁকুড়া জেলার অবস্থাও বিধবার ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে—সরকারী উপেক্ষা, অনাদর, হতাদর, অবজ্ঞা বাঁকুড়া জেলায় সহজ-প্রাপ্য হইতেছে। কেন এরূপ হইতেছে তাহা সাহস করিয়া বলিবার বা প্রতিবিধান করিবার উপযুক্ত প্রতিনিধির অভাব জেলায় রহিয়াছে—বলিতে হইবে।"

"পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত ১৯৪৯ সাল হইতে রাজ্যে 'শস্য উৎপাদনের আশু সমাধান কল্পে' যে সব ক্ষুদ্র সেচ ও জলনিকাশী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিয়াছেন তাহার এক বিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উক্ত বিবরণীতে ১৯৫০-৫১ সালে বিভিন্ন জেলায় কৃষি-বিভাগ হইতে যে সব সেচ উন্নয়ন কার্য্য আরম্ভ করা হইবে তাহাও প্রচার করা হইয়াছে। বিবরণীতে দেখিতেছি, বাঁকুড়া জেলার ভাগ্যে যাহা মিলিয়াছে তাহা না মিলিলেই যেন ভাল হইত—এবং আগামী ১৯৫০-৫১ সালে যাহা মিলিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা কার্য্যে কতদূর অগ্রসর হইবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, কেবলমাত্র যে সব সেচ-পরিকল্পনা দশ হাজার টাকার অনূর্দ্ধ ব্যয়ে সরকারী কৃষি-বিভাগ কর্ত্তৃক কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে বা হইবে, সেই সব পরিকল্পনার বিষয়েই আমরা আলোচনা করিতেছি।"

"বাঁকুড়া জেলায় বহু জমি পতিত পড়িয়া আছে, চাষের উপযুক্ত প্রায় দুই লক্ষ একর জমি পতিত আছে। সেই সব জমি উদ্ধার করিয়া জল সেচের সুবন্দোবস্ত করা হইলে বৎসরে যথেষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইতে পারে। বাঁকুড়া জেলা চিরদরিদ্র—দুর্ভিক্ষ এ জেলার নিত্য সহচর। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। চাষের উপযুক্ত জমিতেও জলের অভাবে ফসল আশানুরূপ ফলিতেছে না। সেচ-ব্যবস্থার উন্নতি না হইলে জেলায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়িবে না। ১৯৫০-৫১ সালে রাজ্য কৃষি-বিভাগ যে সব সেচ-পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যাইতেছে বাঁকুড়া জেলার সদর মহকুমায় ৮২টি ও বিষ্ণুপুর মহকুমায় ৫৪টি পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা হইবে। ইতিমধ্যে অনেকগুলির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, এই কার্য্যে সদর মহকুমায় ব্যয় হইবে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা, এবং বিষ্ণুপুর মহকুমায় হইবে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। উভয় মহকুমায় পরিকল্পনাগুলি কার্য্যে পরিণত হইলে জেলাবাসীর প্রভূত কল্যাণ হইবে, বলা যাইতে পারে।"

এই সঙ্গে একথাও বলা উচিত ছিল যে, যে জেলার লোক এরূপ উন্নয়ন কার্য্যে অপ্রসন্ন ও তৎপর হইয়া সহযোগিতা না করে তাহাদের দুর্দশা কেহই ঠেকাইতে পারে না। এই বিষয়ে গত দুই বৎসরের হিসাবে বাঁকুড়াবাসীর কার্য্যকলাপ অতি দুঃখের বিষয়। "প্রচার" যদি নিজ দেশের লোকের এই অলস ও নিশ্চেষ্ট অবস্থার প্রতিকারে ব্রতী হইতে পারেন তবে আমরা আনন্দিত হইব।

হীরাকুণ্ড বাঁধ ও উড়িষ্যার উন্নয়ন

হীরাকুণ্ড বাঁধের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভারতরাষ্ট্রের সকল নাগরিক উৎফুল্ল হইবেন।

হীরাকুণ্ড বাঁধের নির্মাণকার্য্য দ্রুত সমাপ্তির পথে চলিয়াছে। ১৯৫২-৫৩ সালেই প্রথম দফায় এই বাঁধ হইতে ২৪ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উড়িষ্যার বিস্তৃত অঞ্চলে সরবরাহ করা সম্ভব হইবে। পরবর্ত্তী বৎসরে এই বাঁধের জল দিয়া প্রায় এক লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা যাইবে।

কিন্তু বাঁধের কাজ সম্পূর্ণ হইয়া গেলে এখান হইতে মোট ৩ লক্ষ ২১ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যাইবে এবং ১০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা যাইবে। ইহা ছাড়া, বিপুল জলরাশি সঞ্চয়ের সুবিধা থাকায় মহানদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত সহজসাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে।

সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অত্যন্ত ব্যাপকভাবে এই পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে। এই বাঁধ নির্মাণ শেষ হইলে উড়িষ্যার অর্থনৈতিক অবস্থায় যে বিপ্লব সাধিত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেন্দ্রীয় জলশক্তি, সেচ ও নৌ কমিশন হীরাকুণ্ড বাঁধ নামে একটি সচিত্র পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

গত বৎসর মহানদীর উপর প্রকাণ্ড এক সেতু নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করিয়া বাঁধের বড় একটা অংশের কাজ সম্পন্ন করা হইয়াছে। এই সেতুর উপর দিয়া রেলপথ ও সাধারণ রাস্তা দুই-ই রহিয়াছে। বড় বড় কল ও যন্ত্রপাতি এই সেতুর উপর দিয়া লইয়া আসা সম্ভব হওয়ায় বাঁধের কাজ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করা অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

কংক্রিট ও মাটির প্রধান বাঁধ নির্ম্মাণের কার্য্যে সম্প্রতি হাত দেওয়া হইয়াছে। মাটি তুলিবার উপযোগী ১ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি কিনিয়া কাজে লাগান হইয়াছে।

সরবরাহ-বিভাগের আলস্য অবসর

"মহকুমা এবং জিলা সরবরাহ আপিসগুলিতে একটা কর্ম্মহীন নৈরাশ্য ও অসহায় অবস্থা কর্ম্মচারীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যাইতেছে। কন্ট্রোলে চাল নাই, আটা নাই, বৎসরে মাত্র পাঁচ গজ অগ্নিমূল্যের কাপড় একবার মাত্র পাওয়া যায়। টিন, করগেট, সিমেন্টের দরখাস্ত করিয়া বৎসরাধিক কাল ধরিয়া তাহার শুভ আগমনের জন্য দরখাস্তকারী অপেক্ষা করিয়া থাকে তবু দর্শন মিলে না। আপিসে গেলে শুনিতে পায় তা করোয়ার্ড করা হইয়াছে, নয়তো ফাইলের নীচে চাপ পড়িয়া আছে। অতএব এই বিভাগের কর্ম্মচারীদের কর্ম্মের মধ্যে চেয়ারের শোভাবর্দ্ধন, নয়তো দিনান্তে একবার ফাইল ওল্টানো, নয়তো বড় আপিসে রিমাইণ্ডার লেখা। সরকারী ব্যয় সংকোচ সমিতির এই দিকে লক্ষ্য দিলে ভাল হয়। যে বিভাগের কাজের চাপ নাই আমরা মনে করি সে বিভাগের সংকোচই যুক্তিযুক্ত, প্রসারণ নয়। অথচ এখন আবার শোনা যায় মহকুমাগুলি একজন কণ্ট্রোলারে চলিতেছে না, আর একজন সাপ্লাই কণ্ট্রোলার অতিরিক্ত রাখার ব্যবস্থা হইতেছে। এখন হইতে একজন হইবেন 'ফুড', অপর জন সাপ্লাই। আরও পাঁচ হ'শো টাকা খরচ বাড়িল।"

"সংগঠনী" পত্রিকায় ১লা বৈশাখ তারিখের এই সম্পাদকীয় মন্তব্য খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে আশা করি।

বিশাখাপত্তন জাহাজঘাট

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই জাহাজ-ঘাটের পত্তন হয়। তৎপূর্ব্বে পর্ব্বতমালাবেষ্টিত এই জাহাজ-ঘাটটি স্থানীয় বণিকগণ ও নাবিক তাঁহাদের নিজ নিজ ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ব্যবহার করিত।

ইংরেজ যখন অনুভব করিল যে, তাহাদের নিজেদের স্বার্থে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-উপকূলে একটি জাহাজ-ঘাটের প্রয়োজন তখন সেই ভাবে আইন প্রণয়ন করিয়া তার ব্যবস্থা আরম্ভ করে। দূর সমুদ্রগামী জাহাজের ব্যবসা আরম্ভ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয় ১৯৩৩ সালে। সেই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া সিন্ধিয়া জাহাজ কোম্পানী প্রায় ১৪ বৎসর পূর্ব্বে বিশাখাপত্তনে জাহাজ নির্ম্মাণের একটি নৌশালা প্রতিষ্ঠা করে। রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে তাহাদের অনেক সুবিধাদি দেওয়া হয়।

ফলে কলিকাতা ও মাদ্রাজ বন্দরের মধ্যে একটি নূতন বাণিজ্যের জাহাজ-ঘাটের পত্তন হয়। এই জাহাজ-ঘাট নির্ম্মাণ ১৯২৮ হইতে ১৯৩৩ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়। ব্যয় পড়ে প্রায় ৩৭৭ লক্ষ টাকা। যে জাহাজে ২৮ ফুট ৬ ইঞ্চি জল ভাঙে তাহাই এই জাহাজ-ঘাটে চলাফেরা করিবার অনুমতি লাভ করে; ১৯৫০ সালে মাত্র "রেমো" নামক জাহাজ এই জাহাজ-ঘাটে প্রবেশ করে, দৈর্ঘ্যে তাহা ৪১৫ ফুট ৬ ইঞ্চি; "ভারসিলিয়া" নামক জাহাজ ২৮ ফুট ৬ ইঞ্চি জল ভাঙে। ইংরেজের যুদ্ধ-জাহাজ "বার্ম্মিংহাম" ও ভারতরাষ্ট্রের যুদ্ধ-জাহাজ "দিল্লী"—এই দুইটি জাহাজ কয়েকবার এই পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করে।

বিশাখাপত্তন আবার নৌবাহিনীর পোতাশ্রয় রূপে বাড়িয়া

উঠিতেছে। সুন্দরবন হইতে সিংহল দ্বীপের উপকূল প্রায় ১৫ শত মাইল। তার মধ্যে নৌবাহিনীর একটি পোতাশ্রয় থাকা প্রয়োজন, যেমন আছে পশ্চিম উপকূলে জাহাজঘাটা ও পোতাশ্রয়ের কোচিন বন্দর। কোচিনেই ভারতরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর শিক্ষা আরম্ভ হয়, প্রথম দুই বৎসর। শুনিয়াছি এই পোতাশ্রয়ের পরিধির মধ্যে এই শিক্ষাকে কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে। বর্তমানে বিশাখাপত্তমে প্রায় ৬০০ শত শিক্ষার্থী আছে, তাহা ছাড়া ৬০ জন অফিসার ও ৬৪ জন রেটিং-ইন্‌ষ্ট্রাক্টর আছেন। প্রতি তিন মাস অন্তর ১৫। হইতে ১৬। বৎসর বয়স্ক বালকদের শিক্ষার্থী হিসাবে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ৯০ জন শিক্ষার্থী লইয়া এক-একটি দল গঠন করা হয় এবং ৬০ সপ্তাহ ধরিয়া শিক্ষাদান করা হয়।

এই বর্ণনা হইতে বিশাখাপত্তম জাহাজঘাট ও পোতাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। ভারতরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর গুরুত্ব যত বর্দ্ধিত হইবে, এই দুইটি পোতাশ্রয় ছাড়া অন্যান্য রাজ্যেও অনুরূপ চেষ্টা চলিবে। বোম্বাই-গুজরাটের "কাণ্ডলা" জাহাজঘাটের গঠনকার্য্য আরম্ভ হইয়া তথায় পোতাশ্রয়ও গড়িয়া উঠিবে। উৎকল রাজ্যের নৌ-বাণিজ্যের ইতিহাস আছে। তাহা পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা অদূর ভবিষ্যতে দেখিতে পাইব আশা করি।

ভাগচাষ অর্ডিনান্সের ফলাফল

কাঁথি সুতাহাটা খাদি কেন্দ্রের মুখপত্র 'গ্রামসেবা' পত্রিকায় ২১শে চৈত্র সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি :

"প্রথমে ভাগচাষীরা এই অর্ডিনান্সের বলে ভাগচাষ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড হইতে অনেক স্থলে সুফল পাইয়াছে। আবার অনেক স্থলে চাষীদিগকে মালিকগণ অযথা হায়রাণী দিয়া নাজেহাল করিয়াছে। তাহাতে মালিকগণ ভাগচাষ-নিয়ন্ত্রণ-বোর্ডের রায়ে সন্তুষ্ট না হইয়া আবার মহকুমা কোর্টে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে ও চাষীকে বহুদূরে কোর্টে যাতায়াতের খরচ, হোটেলের অতিরিক্ত খরচ, মোক্তার ও উকিলের খরচ প্রভৃতি বৃথা ব্যয় করাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত করাইয়াছে। এই ভাবে হয়রান দিয়া কত চাষীকে ন্যায়বিচার পাইবার পূর্ব্বেই মালিকের ইচ্ছাতেই সায় দিতে হইয়াছে ও জমি ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে।

তারপর জমিদার মালিকগণ আর এক অভিনব উপায় স্থির করিয়াছে। ভাগচাষ-অর্ডিনান্সের এক ধারায় আছে যে জমিদার নিজ হাতে চাষ করিতে চাহিলে জমি হইতে ভাগচাষীকে বরখাস্ত করা যাইবে। এখন এই সুযোগ লইয়া চাষ করিবার অজুহাতে মালিকগণ চাষীদের নিকট হইতে জমি ছাড়াইয়াই লইতেছে। চাষীরা এখন নিরুপায়। এইভাবে জমি ছাড়াইয়া লইলে কৃষকেরা নিরুপায় হইয়া মালিকের বাড়ীতে বর্ণা দিবে। তখন ইচ্ছামত শর্তানুসারে জমি চাষ করাইতে পারিবে বা মজুরী দিয়া জমি চাষ করিবে। এই অর্ডিনান্সে কৃষকগণ পুষ্ট না হইয়া বণিকগণ পুষ্ট হইলে অর্ডিনান্সকারী গবর্ণমেণ্ট দুই দিক হইতে বিপর্য্যস্ত হইতে থাকিবে। এইজন্য অর্ডিনান্স সংশোধন করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। ভাগচাষীদের জন্য এই অর্ডিনান্স এখন মালিক মহাজনদের হইয়া পড়িয়াছে। এই দিকে শীঘ্রই গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়া একান্ত দরকার।"

মানব-বুদ্ধির উদ্‌ভাবিত কোন উপায়ই কেবল শুভ ফল প্রসব করে না। ভাগচাষী অর্ডিনান্স তাহার একটা উদাহরণ। রাষ্ট্র ও চাষীর মধ্যে কোন শ্রেণী মধ্যস্বত্ব উপভোগ করিলে, এইরূপ অবিচার ও অনাচার নিঃশেষ করা এক প্রকার দুঃসাধ্য।

নদী-নালায় মৎস্য-চাষের শিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গ প্রচার বিভাগের নিকট হইতে অবগত হইলাম যে, কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্যে যে নদী-নালার মৎস্য-চাষের শিক্ষালয় কলিকাতার সন্নিকটে বারাকপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তার মধ্যে দশ মাস ব্যাপী একটা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কেবল যে পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইবে তা নয়, ভারতরাষ্ট্রের অন্যান্য রাজ্যে ও নিকটস্থ অন্যান্য দেশে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শিক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইবে। ত্রিশ বৎসরের অনূর্দ্ধ বয়সে যিনি প্রাণীবিদ্যায় "গ্রাজুয়েট" উপাধি লাভ করিয়াছেন তিনি এই শিক্ষালাভের অধিকারী। মনোনীত শিক্ষার্থীকে ১,৯৫০ টাকা জমা দিতে হইবে। তার মধ্যে ২০০৲ শিক্ষার ব্যয়; ৭৫০৲ ভ্রমণের ব্যয়, ১৫০৲ টাকা থাকিবার স্থানের ভাড়া বাবদ, ৭৫০৲ খাওয়া-খরচা; এবং ১০০৲ গচ্ছিত রাখিতে হইবে গৃহ-সরঞ্জামের যন্ত্রের মূল্যাদি বাবদ। এই শেষোক্ত অর্থ শিক্ষান্তে ফেরত দিবার নিয়ম আছে। মৎস্যজীবী পরিবারের শিক্ষার্থী অল্প কয়জনকে শিক্ষার ব্যয় দিতে হইবে না। অবৈতনিক বৃত্তির ব্যবস্থাও আছে দেখিয়া সুখী হইলাম।

আমের আঁঠির খাদ্য-মূল্য

"আম ভারতের একটি বিশেষ জনপ্রিয় ফল। শীঘ্রই ভারতের সর্ব্বত্র হাটে বাজারে প্রচুর পরিমাণে আম কিনিতে পাওয়া যাইবে। আম ভালবাসেন না এমন ভারতীয়দের সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ লোকই আমের আঁঠি ফেলিয়া দেন। অবশ্য ভারতের কয়েকটি অংশে স্থানীয় লোকেরা বহুকাল যাবৎ উহাকে খাদ্যরূপে ব্যবহারও করিতেছেন। আমের আঁঠির রুটি বা তরকারি তাহাদের নিকট অন্যান্য খাদ্যের মতই গ্রহণীয়।

সম্প্রতি ভারতের কৃষি-গবেষণাগারে আমের আঁঠির খাদ্য-

মূল্য সম্পর্কে গবেষণা চালান হইয়াছিল। দেখা গিয়াছে যে, উহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শর্করা ও ভাতের সমান প্রোটিন রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন প্রক্রিয়ার আমের আঁটির কটু স্বাদ দূর করা চলে ; উহাকে বিশেষভাবে গুঁড়া করিয়া ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া লইলে উহার কটু স্বাদ নষ্ট হইয়া যায়। আত আমের আঁটি সিদ্ধ করিলেও উহার কটু স্বাদ আর থাকে না।

তেঁতুলের বীচির মত আমের আঁটিতেও প্রচুর শ্বেতসার আছে। এই সকল কারণে খাদ্যরূপে আমের আঁটির ব্যাপক ব্যবহারের বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে।"

বর্ত্তমান খাদ্য-শস্যের অভাবের সময়। "বাঁকুড়া দর্পণ" (সাপ্তাহিক) পত্রিকার ৬ই বৈশাখ তারিখের উক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য লক্ষণীয়। কোন কোন সহযোগী আমের আঁটি ও তেঁতুলের বীচি লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছেন। আপদ্‌ধর্ম্মরূপে ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট দ্রব্যও খাইতে হয়। পৌরাণিক যুগে বশিষ্ঠ ঋষি অখাদ্য ভক্ষণ করিয়াছিলেন।

কাঁথিতে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা

কাঁথির "দেশপ্রাণ" পত্রিকার ১২ই বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম। এ যেন কচলাইয়া লেবুকে তিক্ত করা। হিন্দু ও মুসলমানের এই অভ্যাস দূর হইবে কবে ?

"এগরা থানার ভবানীচকের নিকট প্রথমে এবং পানি-পারুলে মাসখানিক পরে অনেকটা এক রকমেরি ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। প্রথমে মুসলমান দ্বারা গরু কাটা বা গরুকে আহত করা এবং পরে মুসলমানের গৃহদাহ, তারপর মুসলমান কর্ত্তৃক কতকগুলি হিন্দুর নামে অভিযোগ এবং ইহাকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়া পুলিসে ডায়রী করণ ও তাহার পর ব্যাপকভাবে হিন্দু গ্রেপ্তার, জামিন দানে কঠোরতা অবলম্বন ইত্যাদি, এবং হিন্দুদের বহু অর্থ ব্যয়ে অবশেষে জেলা জজ মহোদয়ের নিকট হইতে জামিন গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্য চলিতেছে। ইহার ফলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে সম্প্রীতি ছিল তাহাতে ফাটল ধরিয়াছে এবং দিল্লীচুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য পণ্ড হইতেছে। ইতি-পূর্ব্বে গরু কাটা ও গৃহদাহ অনেক হইয়াছে এবং তাহা লইয়া যে মোকদ্দমাদি হইয়াছে তাহাকে কখনও সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়া হয় নাই, সাধারণ ভাবে মোকদ্দমা পরিচালিত হইয়াছে। বর্ত্তমান স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ইহাকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়া এই অবস্থাকে এত জটিল করিয়া তুলিতেছেন কেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

বাটা কোম্পানীর মুসলিম কর্ম্মী

....কোম্পানীর মুসলিম কর্ম্মী ও কর্ম্মচারিবৃন্দ নোয়াখালি তাণ্ডবে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। কলিকাতা "কায়ার ব্রিগেডের" কর্ম্মচারীরাও সেই পাপে পাপী ছিল। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গে তাহাদের রোজগারের পথ এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে বলা চলে। পথভ্রষ্ট অনেকে তাহাদের মধ্যে অনেকে তরকারি ইত্যাদি বাড়ী বাড়ী ফেরি করিয়া দিন কাটাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাটা কোম্পানীতে আবার ঢুকিতে চেষ্টা করিতেছে নানাবিধ কৌশলের উপর পূর্ব্ব-পাকিস্থানে বাটা কোম্পানীর "জুতা বয়কটে"র ভয়ও দেখান হইতেছে। ঢাকার "আজাদ" পত্রিকার ৫ই বৈশাখ সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

আমরা আশা করি বাটা কোম্পানী এই শাসানিতে দমিবেন না। তাহাতে অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। এই বিষয়ে তাঁহারা ভারতরাষ্ট্রের ন্যায়নিষ্ঠার উপর ভরসা করিয়া চলিতে পারেন।

জামসেদপুরে শ্রমিক আন্দোলন

জামসেদপুরের "নব-জাগরণ" পত্রিকার ২৫শে চৈত্র সংখ্যার নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠ করিয়া দেশের হিতকামী সকলেই দুঃখ অনুভব করিবেন :

"জামসেদপুরের শ্রমিক আন্দোলনের কাহিনী এ যুগের ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের এক মহান্ অধ্যায়। মদগর্ব্বে গর্ব্বিত শাসক ইংরেজের উচ্ছিষ্টে পুষ্ট ভারতীয় পুঁজিপতিবর্গের সমুন্নত মস্তক এই যুক্তশক্তির নিকট নতিস্বীকার করিল। আর্থিক স্বার্থের জন্য আন্দোলন করা ছাড়া জামসেদপুরের শ্রমিকগণ যে কোন দিন দেশমাতৃকার বন্ধন ডোর ছিন্ন করিবার সংগ্রামের পাঞ্চজন্যের আহ্বানে সাড়া দিবে ইহা ছিল আদর্শ-বাদীর কল্পনা বিলাস। কিন্তু আমেদাবাদের মত জামসেদ-পুরেও সে স্বপ্ন সফল হইল। অসহযোগ, আইন অমান্য, একক সত্যাগ্রহ, জাতির ললাটের রক্ত তিলক আগষ্ট আন্দোলন—সর্ব্বক্ষেত্রেই জামসেদপুর এবং তাহার শ্রমিক কর্ম্মীর দল সংগ্রামের পুরোভাগে।

আজ সেই গৌরবস্রোতে ছেদ পড়িবার সূচনা দেখা দিয়াছে। অধিকাংশ কংগ্রেস কর্ম্মীর দল জামসেদপুরের শ্রমিকসঙ্ঘ পরিচালকবর্গের নেতৃত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত এই বিজয়োল্লাসের মধ্যে আজ বিয়োগের করুণ রাগিণী কেন শ্রুতিগোচর হইতেছে ? কাহার ভুলে এ বিদায় বাঁশরী বাজিয়া উঠিয়াছে ? তাহা নিরূপণ করিবার দিন আসিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। শ্রমিকসঙ্ঘের বর্ত্তমান নেতৃত্বের বিরোধীরা অবশ্য অনেক অভিযোগ করেন। ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য প্রাদেশিকতা-আদি যাবতীয় সংকীর্ণতার আশ্রয় লওয়া, বিরোধী পক্ষকে দমনের জন্য যতদূর সম্ভব অসৎ ও অন্যায় উপায় অবলম্বন করা, শক্তি আহরণের জন্য দলাদলি ও কাহারও সহিত সামান্য মাত্র মতানৈক্য হওয়ামাত্র তাহার প্রতি অশ্রাব্য গালিগালাজ প্রয়োগ করা নাকি তাঁহাদের নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকে বলেন যে কর্ম্মী এবং সেবকোচিত

বিনয় ও নিষ্ঠা তাঁহাদের ভিতর হইতে লোপ পাইয়া এখন তাঁহারা দম্ভ ও অহংকারের ক্রীতদাসে পরিণত হইয়াছেন এবং নিজ দুর্ব্বলতা ও নিষ্ক্রিয়তাকে ঢাকিবার জন্য মেকী পাণ্ডিত্য ও নকল গাম্ভীর্য্যের মুখোস পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আজ তাঁহাদের বহু পূর্ব্বতন শুভার্থীও বলিয়া বেড়াইতেছেন যে, অমর শহীদ আবদুল বারীর পরিচালনাধীনে যে নেতৃত্বের জন্ম হইয়াছিল এবং বিরোধিতা ও বিপদের ঝড়ঝঞ্ঝায় যাহা ভাঙিয়া পড়ে নাই, মারপিট, জুলুম ও শত অত্যাচার যে শিখাকে বিন্দুমাত্র ম্লান করিতে পারে নাই, প্রশংসার পুষ্পজাল আজ তাহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছে।"

এই "ছিন্নবস্তা" প্রবৃত্তি কখন আমরা সংযত করিতে পারিব?

কৃষ্ণনগরে সাহিত্য সম্মেলন

বিগত চৈত্র মাসে কৃষ্ণনগরবাসী আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে কাটাইয়াছেন। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে প্রথম অনুষ্ঠিত হইল রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" কাব্যের প্রশস্তি গান। সেই কাব্যের ১২০৪ বঙ্গাব্দের পাণ্ডুলিপি পুষ্পচন্দন দ্বারা পূজিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কবি কালিদাস রায় এবং উৎসবের মাহাত্ম্য বর্ণন করেন কলিকাতার সাহিত্যসেবী দু'চার জন। এই পাণ্ডুলিপিখানি অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় "অন্নদামঙ্গল" কাব্যের প্রথম সংস্করণ ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেন।

অতঃপর কৃষ্ণনগর "বাণী পরিষদের" উদ্যোগে নদীয়া জেলা সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সমবেত প্রতিনিধিবর্গকে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। বাংলার প্রথিতনামা সাহিত্যরথী, বাংলা সাহিত্যের ব্যাখ্যাতা শ্রীমোহিতলাল মজুমদার মহাশয় এই সম্মেলনের পৌরোহিত্য করেন। তাঁহার অভিভাষণ ব্যথিত মনোভাবের প্রকাশক, "পরাজিত জাতি" নীতিকথায় পূর্ণ। এই নৈরাশ্যপূর্ণ বাখ্যা ক্যাসনে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মোহিতলালের লেখনী হইতে আমরা ইহা প্রত্যাশা করি নাই।

তিনি বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যকে, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের উত্তরকালে রচিত সাহিত্যকে, "অধোগতির" প্রকাশক আখ্যা দিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে "বাংলা সাহিত্যেরও সম্মানলাভ" সহজ মনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি ঠিক করিতে পারেন নাই ইহা "আশীর্ব্বাদ না অভিশাপ।" এইরূপ মনোভাবের আবেশে তিনি যে মনে করিবেন বাঙালী জাতি প্রায় নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ দেখি না।

অথচ মোহিতলালই তাঁর অভিভাষণের শেষাংশে এক প্রবীণ পণ্ডিত ও তত্ত্বসাধক বাঙালীর কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন: "বাঙালী মরিতে পারে না, তাহার কারণ, বাংলার মাটিতে যে বস্তু নিহিত আছে" সেই পরম বস্তুতে ভারতেরও প্রয়োজন আছে, বাঙালী ধ্বংস হইবে না। ইহাই যদি তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস হয়, তবে তিনি কেন স্বাধীন ভারতরাষ্ট্র স্থাপনের কথা শ্লেষের সঙ্গে উচ্চারণ করিয়াছেন? তাঁহার এই অভিভাষণ এত পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবে ও কথায় পূর্ণ যে, তাহার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। তিনি যদি যান্ত্রিক সভ্যতার দাপটে পৃথিবীব্যাপী ভাঙনের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিতেন তবে রেলপথ বিস্তার ও বিদেশী বণিকরাজের ধন শোষণ লইয়া এরূপ ভাবে হাহুতাশ করিতেন না। এই শাসন ও শোষণের আমলেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শরৎ চন্দ্র আবির্ভূত হন। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, নেতাজী জন্মগ্রহণ করেন এই সময়েই। ইহাই বাঙালীর জীবনীশক্তির অকাট্য পরিচয়।

"বাস্তুহারার চিঠি"

২৬ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাখানিতে গ্রন্থকার কয়েকটি পত্র সংগ্রহ করিয়া ছাপাইয়াছেন। গ্রন্থকারের নাম—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সেন, এম্-এস্‌সি, এম্-এ (লীডস্)।

পুস্তিকাখানিতে পূর্ব্ববঙ্গে বাস্তুহারা নর-নারী, বালক-বালিকাকে অবলম্বন করিয়া যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম পত্রখানির লেখকের ১০ বৎসর বয়স, তিনি বাস্তুত্যাগ ইতিহাসের অঙ্গ বলিয়া আমাদের সকলকে সান্ত্বনা দিয়াছেন। "যেদিন মধ্য-এশিয়া থেকে মানুষ তার প্রথম আবাস ত্যাগ করে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল তখনও ঠিক তাহাদের এমনি কষ্ট হইয়াছিল প্রিয় বাসভূমি ছেড়ে যাবার প্রাকালে। কিন্তু উপায় ছিল না।"

৫ম পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই এই কথা: "প্রায় সাত শত বৎসর আগে রাজা শ্রীহর্ষ বাস করতেন মানভূম, এর কয়েক পুরুষ পর তাদের ভিতর কেউ কেউ চলে এল যশোর জেলার ইতনা গ্রামে। সেখান থেকে কয়েকজন চলে গেল সে সময়ের বিক্রমপুরের অন্তর্গত একটি গ্রামে। এই গ্রামের নামকরণ করা হ'ল—'রাজনগর'। ভেঙ্গে গেল সেই স্বর্ণময় রাজনগর পদ্মার উন্মাদনায়। ছড়িয়ে পড়ল সে বংশের লোক চারিদিকে আবার। আমরা এসে পড়লাম এই গ্রামে (পালং)। এই ত আমাদের সাত শত বৎসরের চলার ইতিহাস। আবার চলছি...।"

১১শ পৃষ্ঠায় এই অভিযাত্রী দলের বলিষ্ঠ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়: "এ অবস্থায় এইটুকু শিখেছি যে অভাব-অনটন নহে।...

"আমার যে আত্ম-বিশ্বাস তাই আমাকে জীইয়ে রেখেছে, আমি কখনও কারও কাছে হাত পাতি নি। কর্জ্জ? না, এমন কি সরকারের কাছ থেকে এক কপর্দকও কর্জ্জ নিই নি।" এই মনোবলের প্রসাদেই বাস্তুহারাগণ স্ব-প্রতিষ্ঠ হইবেন পশ্চিমবঙ্গে।

২১শ পৃষ্ঠায় তাঁহাদের কর্তব্যের নির্দেশ আছে : "পুরুষানুক্রমে এই দেড় শত বৎসরের অলস অভিমান ত্যাগ করতেই হবে। হাতের কাজ আমাদের আবার ফিরিয়ে আনতে হবে।"

পত্র লেখকগণ সকলেই দৃঢ়মনা, তাঁহারা কাহারও উপর ভার বহন থাকিতে চান না। তাঁহাদের এই আকাঙ্ক্ষা, এই সাধনা সার্থক হউক।

মারাঠা সাহিত্যের গতি-পরিণতি

বোম্বাই নগরীর "ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফরমার" পত্রিকা প্রায় ৫০ বৎসর হইতে ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনে নানা বিভেদ ও নানা আচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে, যাহার অত্যাচারে মানুষের জীবন সঙ্কুচিত, মানুষের মন সঙ্কীর্ণ, অদ্ভুতমার্গের ফলে সমস্ত সমাজ-জীবন বিষাক্ত।

এই অস্বাভাবিক অবস্থার ধারক ব্রাহ্মণ শ্রেণী হিন্দুদের মধ্যে। সেইজন্যই এই শ্রেণী সকল প্রকার আক্রমণের পাত্র হইয়াছে শত শত বৎসর হইতে। সংস্কৃত ভাষা এই শ্রেণী প্রাধান্যের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া একটা ধারণা প্রবল। উপরোক্ত পত্রিকায় এই বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাদের লেখক শ্রীপ্রভাকর পাধ্য। তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই ধর্মের ও সংস্কৃতির বন্ধন আমাদের জাতীয় জীবনকে নানাভাবে পঙ্গু করিয়াছে। মহারাষ্ট্রেও তাহার প্রভাব ছিল বলিয়াই তিনি দুই জন সংস্কারকের নাম করিয়াছেন যাঁহারা এই দুই বন্ধন মোচনে পথিকৃৎ ছিলেন। তাঁহাদের নাম চক্রধর ও জ্ঞানদেব।

সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্যের বিরুদ্ধে যে মনোভাব সৃষ্ট হয় তাহার প্রকাশ পায় একটি প্রবাদবাক্যে : "যদি সংস্কৃত ভাষা দেবগণের সৃষ্ট হয়, তবে প্রাকৃত ভাষাসমূহ কি চোর ও ডাকাতের সৃষ্ট ?" এই বিরূপ ভাব ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক হইতে শক্তিলাভ করে। তখন বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপলুনকর ও মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের যুগ। কিন্তু তাহার আরম্ভ দেখিতে পাওয়া যায় শিবাজীর সময়ে তুকারামের 'অভঙ্গে' ও সন্ত রামদাসের 'দাসবোধে'। জ্ঞানেশ্বর কর্তৃক যে জ্ঞান ও ভক্তি মিশ্রিত দর্শনের সৃষ্টি হয় তাহার মধ্যে কথ্য ভাষার মাহাত্ম্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের মহারাষ্ট্রীর জাতির জাগৃতির ইতিহাসে এই ঋণ স্বীকার করা হইয়াছে। প্রভাকর পাধ্যের প্রবন্ধে সেইজন্য দাবি করা হইয়াছে যে, স্বাধীনতার বাণী মরাঠা সমাজের প্রাণের ভাব প্রকাশ করে। ইংরেজ আমলে তাহা নবরূপ ধারণ করিয়াছে।

এই ব্যাখ্যা অনুসরণ করিলে ভারতবর্ষের নানা ভাষার মাধ্যমে যে সব জাগৃতির প্রকাশ দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে সত্য পদার্থ আছে। অন্যান্য ভাষার মাধ্যমেও সেই ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই নবজাগরণ সর্ব্ব-ভারতীয় রূপ গ্রহণ করিয়া দেশকে আত্মবিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাহার ফলে ইংরেজ শাসনের অবসান।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য কংগ্রেস কমিটির মুখপত্র দেশসেবক পত্রিকায় ২৯শে চৈত্র সংখ্যায় নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় আছে :

"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের এক সংবাদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলিকে সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে ৭৬ হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। ১৫০টি গ্রন্থাগার এই সম্পর্কে নির্ব্বাচন করা হইয়াছে।...বেসরকারী প্রচেষ্টায় রাজ্যের বহুস্থানে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইলেও প্রয়োজনের তুলনায় গ্রন্থাগারের সংখ্যা অত্যন্ত অপর্য্যাপ্ত। তদুপরি অধিকাংশ গ্রন্থাগারেরই আর্থিক অসচ্ছলতা এইরূপ গভীর যে ইচ্ছা থাকিলেও গ্রন্থাগারটিকে মনোমত ও প্রয়োজনোপযোগী করিয়া তুলিবার উপায় নাই। রাজ্য সরকার এই অত্যাবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তদনুযায়ীই সরকারের এই সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা। আমরা অবশ্য কখনও মনে করি না যে, সরকারের সাহায্যে দেশের সমুদয় গ্রন্থাগার পুষ্ট হইবে। রাজ্য সরকারের বর্ত্তমান প্রয়াসকে প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রন্থাগার পরিচালনা ও বৃহত্তর ভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি শুভেচ্ছা প্রদর্শনের নিদর্শনরূপেই গণ্য করা বিধেয়।"

প্রাচীন সংস্থিতি আবিষ্কার

ভারত-বিভাগের পরে মহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পা পাকিস্থানের ভাগে পড়ে। প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধানকারী ও গবেষকের পক্ষে তাহা অত্যন্ত ক্ষতিকর ছিল। সেই অভাব আজ মিটিল।

ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের উদ্যোগে সম্প্রতি রাজস্থান ইউনিয়নের বিকানীর রাজ্য ও বিভাগের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত প্রাচীন সরস্বতী নদীর শুষ্ক গর্ভ ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলসমূহ অনুসন্ধানের কার্য্য দুই মাসকাল চলিয়াছে। এই অনুসন্ধানের ফলে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের প্রায় ৭০টি সংস্থিতি পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সেইগুলি মহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পা নামক ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরগুলির সমসাময়িক। এই সকল স্থানেও হরাপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির ন্যায় প্রাচীন দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে। হরাপ্পা ও মহেঞ্জোদারো এখন পাকিস্থানের অন্তর্গত। নূতন আবিষ্কারের ফলে প্রাচীনতম ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা নিরসন হইবে।

এই অনুসন্ধানের ফলে কতকগুলি ধূসর পাত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে। গাঙ্গেয় উপত্যকা ও পূর্ব্ব পঞ্জাব অঞ্চলেও এই ধরণের পাত্র ব্যবহৃত হইত, কাজেই এই আবিষ্কারের ফলে উক্ত অঞ্চলের সংস্কৃতির পরিধি যে আরও বিস্তৃত ছিল তাহা প্রমাণিত হয়।

এই আবিষ্কারের ফল খুবই উৎসাহজনক হইয়াছে। আগামীবারেও সন্নিকটবর্তী উপত্যকায় এই অনুসন্ধান-কার্য্য চালান হইবে।

আদিম জাতিসমূহের সমস্যা

ভারতরাষ্ট্রের আদিম জাতিসমূহের সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের দেশপ্রেমিক ব্যক্তিগণ নূতন ভাবে সজাগ হইয়া উঠিয়াছেন। সাধারণ শিক্ষিত লোক এই বিষয়ে মাথা ঘামান না, সে চেষ্টা করেনও না। গতানুগতিক ভাবে চলিয়া গেলে চিন্তার যে পরিশ্রম তা তাঁহারা করিতে চান না। কিন্তু ভারতবর্ষের ৩ কোটি আদিম জাতির লোক, ভারতের আড়াই কোটি স্ত্রীপুরুষ, বালক বালিকার সমস্যা রাষ্ট্রের অন্যান্য সমস্যার অন্তর্ভুক্ত। সেইজন্যই এই সমস্যাবলীর প্রকৃতি জানিয়া রাখা ভাল।

এই সম্বন্ধে "হরিজন" পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় শ্রী ভি. রাঘবিয়া আলোচনা করিয়াছেন। বাংলা "হরিজন" পত্রিকায় তাহা ভাষান্তরিত হইয়াছে। গত ১০ই ফাল্গুন সংখ্যায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে নিয়ে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিলাম :

"আদিবাসীদের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক সমস্যা নাই। শিক্ষার প্রসার হইলে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হইতে পারে এই আশঙ্কা অহেতুক। ঐরূপ আশঙ্কার কথা বলিলে চলিবে না। রাজনৈতিক চেতনা জাগরিত হইলে আদিবাসীদের সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া দল উপদল সৃষ্টি হইতে পারে এ কথা সত্য, কিন্তু যত দিন গণতন্ত্র ও নির্ব্বাচন প্রথা চালু থাকে তত দিন উহা সম্পূর্ণ এড়াইবার উপায় নাই। আদিবাসীদের মধ্যে, বিশেষতঃ আসাম প্রদেশের আদিবাসীদের মধ্যে, পঞ্চায়েৎ শাসন বলবৎ রহিয়াছে।

শিক্ষার বিস্তার হইলে আদিবাসিগণ শোষণকারী হইয়া উঠিবে এরূপ চিন্তা ঠিক নয়। সংশিক্ষার প্রসার সাধিত হইলে বরং তাহাদের শোষণ হইতে আত্মরক্ষায় সাহায্য হইবে। শান্দি নামে আদিবাসীদের যে সাপ্তাহিক বাজার বসে, সেখানে আদিবাসীরা আসিয়া তাহাদের বন হইতে আহরিত ও উৎপন্ন সামান্য পণ্যাদি বিক্রয় করে এবং কাপড়, তৈজসপত্র ও অন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ক্রয় করে। ঐ সব শান্দি বাজারে লোভী সাহুকার এবং শঠ পসারীরা গিয়া আজকাল আদিবাসীদের কিরূপ ঠকায় তাহা সর্ব্বজনবিদিত। এই লেনদেনে আদিবাসীরা নিরত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সমতলের লোকেরা সাদাসিধা ও অজ্ঞ আদিবাসীদের সকল রকমে শোষণ করিয়া তাহাদের নিঃশেষ করিতেছে। অন্ধ্র এজেন্সীতে ভ্রমণকালে আমরা সেদিন লক্ষ্য করিলাম যে, কোয়াদের নিকট হইতে গুজরাটি ও মাড়োয়ারী বণিকেরা এক প্রকার বনদ্রব্য ২৫৲ মণ দরে কিনিয়া উহা ১২৫৲ টাকা মণ দরে বোম্বাইতে চালান দিতেছে। গুজরাটেও আদিবাসীদের উপর অনুরূপ শোষণ চলিতেছে দেখা যায়। তবে সৌভাগ্যক্রমে ঠোহাদ-এর ভীল সেবামণ্ডল আদিবাসীদের মধ্যে অনেকগুলি বন-সমবায়-সমিতি সংগঠিত করিতে পারিয়াছেন। ঐ সমিতিগুলির মাধ্যমে এইরূপ শোষণ বহুল পরিমাণে নিবারিত হইয়াছে।

"বিজ্ঞান ও টেক্‌নলজি"

এই মাসের একখানি হস্তলিখিত পত্রিকায় ১৩৫৭ সালের আষাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। সম্পাদক-মণ্ডলী ও পরিচালকবর্গ সকলেরই বাঙালী নাম দেখিলাম। এই সংখ্যাখানি প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা। মার্কিণ নিউইয়র্কের ওয়েষ্ট ৯৯ ষ্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক—২৫ পত্রিকার ঠিকানা।

প্রবন্ধের শিরোনামাগুলি দেখিয়া মনে হয় যে, সজাগ মন লইয়া এই বাঙালী শিক্ষার্থিগণ বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য সম্বন্ধে উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহারা বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া পত্রিকার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সাহসী হইয়াছেন। তার জন্য তাঁহারা মার্কিণ প্রবাসী বাঙালী সমাজ হইতে প্রায় ৫০০৲ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন।

ভবিষ্যৎ জীবনে এই সব বাঙালী যুবক দেশের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে আত্মনিয়োগ করুন, এই আশা পোষণ করিতেছি।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময়ের ব্যবস্থা

"মার্কিন বার্ত্তার" ২রা বৈশাখ সংখ্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা বিরাট পরিকল্পনার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র মুক্ত হস্তে কোটি কোটি টাকা এতদর্থে ব্যয় করিতেছে।

১৮৯৯-১৯০০ সালে চীন দেশে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। সকল পাশ্চাত্য রাষ্ট্র—রাশিয়া ও জাপান, অতি নিষ্ঠুরভাবে এই বিদ্রোহ দমন করে। পিকিঙের রাজপ্রাসাদ হইতে শিল্প-কলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন সব লুণ্ঠিত হয়। কোটি কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয় চীনাদের নিকট হইতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাগে পড়ে প্রায় ৫.৬ কোটি টাকা। অল্পকালের মধ্যে এই অর্থের উপস্বত্ব চীনাদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হইবে এই সঙ্কল্পের ঘোষণা করা হয়। চারি দিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া যায়।

তদবধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চীনের ছাত্রবর্গের শিক্ষার ব্যবস্থায় অর্থব্যয় করিতে কোন কার্পণ্য দেখা যায় নাই। জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের প্রায় সকলেই মার্কিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন। চীন দেশে মার্কিনী অর্থে অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। ফল কি হইয়াছে? কোনও স্বার্থবুদ্ধির প্রেরণায় যদি যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব্ব-এশিয়ার উন্নতিকল্পে অর্থ ব্যয় করে, তবে তাহা ব্যর্থ হইবে।

ইতিহাসের বিকৃতি

সুদূর কালের ঘটনা নানা কারণে লোকের মানস-পটে অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। কল্পনা বা অত্যুক্তির জালে, তার সত্য মূর্ত্তি দেখা কঠিন হইয়া উঠে। এই বিকৃতি অনেকটা গা-সহা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন দেখি অদূর অতীতের ঘটনাবলী

লইয়া এরূপ বিকৃতির খেলা চলিতেছে তখন মানুষের উপর শ্রদ্ধা রাখা কঠিন হইয়া পড়ে।

ইহার একটি উদাহরণের প্রতি একজন পাঠক আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। কলিকাতার একখানি মাসিক পত্রিকা গত ২।৩ মাস হইতে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিকথা প্রকাশ করিতেছে। ১৩৫৭ সালের চৈত্র সংখ্যার বাগবাজারের এক "বৈঠকখানা" ঘরে স্বামিজী বিরাজিত, তিনি তখন ধর্মের রাজ্যে দিগ্‌বিজয়ী বেশে দেশে ফিরিয়াছেন। লোকে তাঁহাকে শান্তিতে থাকিতে দিতেছে না—নানা প্রশ্ন, নানা সমস্যার উত্তর চাহিয়া। এক দিনের ঘটনা, "ইণ্ডিয়ান মিরর" সম্পাদক ৺নরেন্দ্রনাথ সেন, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ও বলরাম বসু প্রভৃতি পরমহংস দেবের অনেক ভক্ত স্বামিজীকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন এমন সময়ে "লাটিহস্তে" ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় আগমন করিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে সহাস্তে অভ্যর্থনা করিলেন: "আরে (?) ভবানী ভাইয়ে (?), আয় কাছে বস।" উপাধ্যায় ছিলেন স্বামীজীর কলেজের সতীর্থ। সেইজন্ত এরূপ সম্ভাষণ। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন: "কেমন আছিস?" তিনি উত্তর করিলেন: "আছি আর কই দাদা।...তুমি ত ফিরিঙ্গী দেশটাকে তাতিয়ে এলে।...আর আমাদের এই মরার দেশটা কি চিরকাল ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে বসে থাকবে?"

এই কথার উত্তরে স্বামিজী বলিলেন: "কেন, তুই ত ভাই বেশ কাজ চালাচ্ছিস। তোর 'সন্ধ্যা' কাগজে কলমের খোঁচায় কর্তারা বেসামাল হয়ে পড়ছে।..." ইহা সুবিদিত যে স্বামিজী ১৯০২ সালে দেহত্যাগ করেন। "সন্ধ্যা" পত্রিকা প্রথম দেখা দেয় ১৯০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে।

বৰ্দ্ধমান জেলার ইতিহাস

বর্দ্ধমান জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়কে সভাপতি ও 'বর্দ্ধমান' পত্রের সম্পাদক শ্রীনারায়ণ চৌধুরীকে অস্থায়ী সম্পাদক এবং জেলার কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সভ্য করিয়া লইয়া বর্দ্ধমান জেলার ইতিহাস প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। আমরা এই সাধু প্রচেষ্টার পূর্ণ সমর্থন জানাইতেছি। বাংলার বহু জেলার ইতিহাস ইহার পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছে, কিন্তু রাঢ় বঙ্গের প্রাণকেন্দ্র বর্দ্ধমান জেলার ইতিহাস প্রণয়নের এই নূতন প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

এই সম্বন্ধে আসানসোলের 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় ৩রা বৈশাখ সংখ্যায় কতকগুলি তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহা তুলিয়া দিলাম:

"'পল্লীবাসী'র প্রবীণ সম্পাদক পণ্ডিত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় বহুদিন পূর্ব্বে এ বিষয়ে কতকটা চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎকালীন বর্দ্ধমান জেলাবোর্ড এই উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান কার্য্যাদির জন্য কিছু অর্থ সাহায্যও করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু নানাকারণে সে কার্য্য আর অগ্রসর হয় নাই।

"'বঙ্গবাণী' প্রকাশ হওয়ার পর 'মহকুমার কাহিনী' নামে আমরাও আসানসোল মহকুমার খণ্ড খণ্ড ইতিহাস সংগ্রহে চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং তাহার দুই-একটি কাহিনী 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিতও হইয়াছিল। 'মহকুমার কাহিনী'র ভূমিকারূপে আমরা লিখিয়াছিলাম, আসানসোল মহকুমার প্রসিদ্ধ গ্রাম, প্রাচীন দেবস্থান, তীর্থস্থান, মন্দির, মসজিদ, গির্জ্জা প্রভৃতির ইতিহাস ও এই মহকুমার প্রসিদ্ধ বংশাবলী এবং স্বনামধন্য ও কৃতী ব্যক্তি, লেখক, কবি, দেশহিতৈষী ও ব্যবসায়ীদের জীবনী ইত্যাদি থাকিবে।"

শিক্ষা-বিভাগের ত্রুটি

শিউড়ীর (বীরভূম) "শিক্ষা ও কৃষি" পত্রিকায় ৩রা বৈশাখ সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শিক্ষা-বিভাগের একটি বিরাট ত্রুটি উদ্ঘাটিত করিয়াছে। তার প্রতিকারের দাবি ন্যায্য:

"বিভ্রান্তিপূর্ণ নির্দেশের ফলে বুনিয়াদী শিক্ষার্থী শিক্ষকদের দুরবস্থার কথা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি।

বর্ত্তমানে মেদিনীপুরের শিক্ষা-কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশের ফলে সেখানকার প্রাথমিক শিক্ষকদের এক বিরাট অংশ কিরূপ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন তাহার আলোচনা প্রয়োজন হইয়াছে।

জেলার শিক্ষা-বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশানুযায়ী প্রত্যেক মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় প্রাথমিক বিভাগকে পৃথকীকৃত করিয়া পৃথক অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে চালাইতে বাধ্য হন। স্কুলবোর্ড হইতে বেতন পাইবার আশায় এই সকল বিদ্যালয়ের প্রা: শিক্ষকগণ সারা বৎসর বিনা পারিশ্রমিকে কার্য্য করিয়াছেন। এখন স্কুলবোর্ড হইতেও বেতন পাইতেছেন না, আর বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিও বলিতেছেন যে ছাত্রদত্ত বেতন আদায় না হওয়ায় এবং শিক্ষাসেস ও শিক্ষাকর আদায় হওয়ায়, কোনও প্রকার গ্রাম্য চাঁদা বা সাহায্য আদায় না হওয়ায় তাঁহারাই বা বেতন দিবেন কোথা হইতে? স্কুলবোর্ডও হয়ত বলিবেন যে শিক্ষা-বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে প্রাথমিক বিভাগ পৃথকীকৃত হইয়া থাকিলেও তাঁহারা ত শিক্ষকদের বরাবর বেতন দিবেন এ কথা বলেন নাই। যদিও পূর্ব্ব বৎসরে হয়ত কিছু দিয়াছিলেন।

কূটতর্কের দিক দিয়া কে এই পরিস্থিতির জন্ত বা প্রা: শিক্ষকদের এইরূপ দুর্দ্দশায় জেলার জন্ত দায়ী, তাহা স্থির করা আমাদের সম্ভব নয় বা উদ্দেশ্যও নয়। কিন্তু মানবতার দিক দিয়া যাহাতে এই শিক্ষকগণ এইরূপ দুর্দ্দশায় না পড়েন এবং ইহার উপযুক্ত প্রতিকার হয় তাহা দেখার দায়িত্ব শিক্ষা-বিভাগীয় সকল কর্ত্তৃপক্ষ, স্কুলবোর্ড বা কমিটি কেহই এড়াইতে পারেন বলিয়া মনে হয় না।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আমাদের গ্রাহকবর্গ সর্ব্বদা মনে রাখিবেন যে, ডাকঘরের বর্ত্তমান নিয়মানুসারে ভি: পি:তে পুস্তকাদি পাঠান অধিকতর ব্যয়সাধ্য। তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক মণিঅর্ডার করিয়া পুস্তকাদি লইলে বা প্রবাসীর গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইলে অধিক ব্যয় হইতে অব্যাহতি পাইবেন। ইতি —প্রবাসীর কার্য্যাধ্যক্ষ

রামায়ণে বসন্ত ও তুলসীদাসের রাম-চরিত

শ্রীমহাদেব রায়

বিশ্ব-প্রকৃতির নিত্য-নবীন রূপশ্রী কবি-মানসে নব নব রূপ-রাগের আকর হইয়া ধরা দেয়। দেখা গিয়াছে, বিভিন্ন ঋতুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সর্বদেশের, সর্বযুগের কবির মানসপটে নব নব প্রতিচ্ছবি রচনা করিয়াছে। নিদাঘের রুদ্র-দীপ্তি, বর্ষার প্রাণদ মহিমা, শরতের স্নিগ্ধতা—বিচিত্র রস-সৃষ্টিতে কত যে উপাদান যোগাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

শীতাত্যয়ে বসন্তের আবির্ভাব। এই বসন্তে প্রকৃতির জড় দেহে যেন নব জীবনের সঞ্চার হয়। আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি এই বসন্তের চিত্রকে রামায়ণে অপরূপ ভাবে রূপায়িত করিয়া রাখিয়াছেন—বিভিন্ন ক্ষেত্রে বসন্তকালেরই সমধিক সার্থকতা প্রকটিত করিয়াছেন। বলিতে কি, প্রশস্ত কাল হিসাবে বসন্তের মহিমায়ই রামায়ণের আদ্যন্ত পরি-কীর্তিত হইয়াছে।

অপুত্রক নৃপতি দশরথ পুত্রেষ্টির সঙ্কল্প করেন বসন্ত-কালে। "ততঃ কালে বহুতিথে কস্মিংশ্চিৎ সুমনোহরে। বসন্তে সমনুপ্রাপ্তে রাজ্ঞো যষ্টুং মনোঽভবৎ ॥" অর্থাৎ, বহু দিন অতীত হওয়ার পর মনোহর বসন্তকালে রাজা যজ্ঞ সম্পাদন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। "পুনঃ প্রাপ্তে বসন্তে তু পূর্ণঃ সংবৎসরোঽভবৎ। প্রসবার্থং গতো যষ্টুং হয়মেধেন বীর্যবান্ ॥" অর্থাৎ, বর্ষকাল পরে বসন্ত-সমাগমে বীর্যবান্ নরপতি পুত্রলাভার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকল্পে বশিষ্ঠের নিকট গমন করিলেন।

পুনরায় এক বর্ষ অতীত হইলে উন্মোচিত অশ্ব ফিরিয়া আসিল। সরযুর তীরে আর এক বসন্তে রাজার যজ্ঞ সুরু হইল। "অথ সংবৎসরে পূর্ণে তস্মিন্ প্রাপ্তে তুরঙ্গমে। সরয্বাশ্চোত্তরে তীরে রাজ্ঞো যজ্ঞোঽভ্যবর্তত ॥"

যজ্ঞ সমাপ্ত হওয়ার পর বর্ষকাল কাটিয়া গেল। "ততো যজ্ঞে সমাপ্তে তু ঋতূনাং ষট্ সমত্যযুঃ।" দ্বাদশ মাসে চৈত্রের শুক্লা নবমীতে কৌসল্যার গর্ভে দিব্য লক্ষণসম্পন্ন শ্রীরামচন্দ্র জন্মলাভ করিলেন। "ততশ্চ দ্বাদশে মাসে চৈত্রে নাবমিকে তিথৌ।...কৌসল্যাজনয়দ্রামং দিব্য-লক্ষণ সংযুতম্ ॥"

স্বয়ং বিষ্ণু চারি অংশে নরদেহ ধারণ করিলেন; তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ রূপে ইন্দ্রাদি দেবতা বালি প্রভৃতিকে বানর-দেহে প্রেরণ করিলেন। সাধুগণের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতকারি-গণের বিনাশ-সাধনের নিমিত্ত কত বার ভগবান্ এইরূপে সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রামাবতারের ধরায় আগমনের এই চিত্র বাল্মীকির রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ সর্গে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, স্বয়ং ভগবান্ বসন্ত ঋতুকেই ভূমিষ্ঠ হওয়ার যোগ্য কাল ভাবিয়াছিলেন। কবি-মানসে এক্ষেত্রে একমাত্র বসন্ত-ঋতুই ভগবানের আবির্ভাবকাল রূপে স্ব-মহিমায় মণ্ডিত হইয়াছে।

যে রামচন্দ্রের বনগমনের সহিত মহতী সম্ভাবনার কথা নির্ধারিত ছিল, দেবগণ আত্মত্রাণকল্পে যে বনগমনের কর্মপন্থা সুনির্দিষ্ট ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, রামচন্দ্রের সেই বনগমনও বসন্তকালে।

রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য দিনক্ষণ নির্ধারণ করিয়াছেন। সেই শুভক্ষণের প্রাক্কালেই তাঁহার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল—রামচন্দ্রের বনগমন অনিবার্য হইয়া উঠিল। চৈত্র মাস, কানন পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে—সমগ্র প্রকৃতি শোভা-সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ—এই ত রামচন্দ্রের যথাযোগ্য অভিষেককাল। রাজা দশরথ বলিলেন—"চৈত্রঃ শ্রীমানয়ং মাসঃ পুণ্যঃ পুষ্পিত কাননঃ। যৌবরাজ্যায় রামস্য সর্বমেবোপকল্প্যতাম্ ॥" বশিষ্ঠ, বামদেব প্রভৃতি ঋষিকে দশরথ রামচন্দ্রের অভিষেকের সর্ববিধ আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে বলিতেছেন। এদিকে এই পুণ্য-মাসই দেবকার্যে শুভযাত্রার জন্য যেন সুনির্দিষ্ট হইয়াছিল। রামচন্দ্র সীতা-লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে যথাযোগ্য কালে বনযাত্রা সুরু করিলেন। এক বসন্তকালে বনযাত্রা—চতুর্দশ বর্ষ অন্তে পুনরায় আর এক বসন্তেই পুনরাগমনও সুনিশ্চিত। সুতরাং রাম-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাও এই বসন্তকালেই। বলা বাহুল্য, বসন্তকালকেই প্রাচীনেরা বর্ষারম্ভ রূপেও পরিকীর্তিত করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতির ক্রোড়ে সদ্যোজাত নববর্ষের সৌন্দর্য বসন্তের আভরণে ঝলমল করিতে থাকে। সাধারণ ভাবে বসন্তের যে ব্যাপক মনোহর চিত্র বাল্মীকি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা ছাড়াও ইহার বিশেষ সৌন্দর্য এবং অবতার-পুরুষের লৌকিক, অলৌকিক চরিত্রের স্বাভাবিক রূপ ও মহিমা দেখানো হইয়াছে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের আদি সর্গে।

বনযাত্রার প্রারম্ভে নিষাদ-পতির আতিথ্য গ্রহণ করিয়া রামচন্দ্র রথ হইতে অবতরণ করিতেছেন। পুষ্পিত ইঙ্গুদী-

বৃক্ষ দেখাইয়া নিষাদ-পতি সারথি সুমন্ত্রকে বলিতেছেন— "অবিদূরাদয়ং নভা বহু পুষ্প প্রবালবান্। সুমহানিঙ্গুদী বৃক্ষো বসামোঽত্রৈব সারথে ॥" "এই (গঙ্গা) নদীর অদূরেই প্রবাল-সদৃশ বহু পুষ্পে শোভিত মহান্ ইঙ্গুদীবৃক্ষ— হে সারথি, তাহারই সন্নিধানে আমাদের বাস।" রামচন্দ্র সেই বৃক্ষের মূলে "উপতস্থে কৃতাঞ্জলিঃ"—কৃতাঞ্জলি হইয়া উপস্থিত হইলেন। নিষাদের গৃহে রাত্রিবাসের অন্তে প্রভাতকালে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—"অসৌ সুকৃষ্ণো বিহগঃ কোকিলস্তাত কূজতি।" বসন্তের প্রভাতে কোকিলের কূজন রামচন্দ্রের শ্রুতিপথে মধু-ধারার সঞ্চার করিতেছে। সদা-হৃষ্ট রামচন্দ্র সহর্ষে উহা উপভোগ করিতেছেন—কবির ইহাই বলিবার তাৎপর্য। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্র "যথা ক্ষেমেণ সংপশ্যন্ পুষ্পিতান্ বিবিধান্ দ্রুমান্"—বসিয়া-দাঁড়াইয়া বিবিধ পুষ্পিত বৃক্ষের শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন। এ চিত্র চিত্রিত হইয়াছে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে। ইহার পর সুবিস্তৃত আরণ্য-মহিমা অরণ্যকাণ্ডে। অরণ্যকাণ্ডের অন্তে শবরীর মুক্তি-চিত্র অঙ্কন করিয়া কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের আদিতেই মহাকবি বসন্তে পম্পা-সরোবরের মনোহর আলেখ্য রচনা করিয়াছেন। অতি-'রুচির' শোভা-সৌন্দর্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় মহাকবির লেখনী যেন 'রুচিরে'র আগার সৃষ্টি করিয়াছে। শবরীকে উদ্ধার করিয়া রামচন্দ্র শবরীর নির্দেশ অনুসারেই পম্পা-তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। "ভরতের দুঃখে এবং বৈদেহী-হরণে ব্যাকুলহৃদয়" হইয়াও তিনি পম্পার বসন্ত-শোভা নিরীক্ষণ করিয়া মুগ্ধ হইলেন। "শোকার্তস্যাপি মে পম্পা শোভতে চিত্র-কাননা। ব্যবকীর্ণা বহুবিধৈঃ পুষ্পৈঃ শীতোদকা শিবা ॥" শোকার্ত হইলেও তাঁহার নিকট চিত্র-কাননা পম্পা বহুপুষ্পে সমাচ্ছাদিত হইয়া, সুশীতল জল লইয়া কল্যাণীর রূপেই শোভা পাইতেছে। সুন্দরের শোভা যেন শিবরূপে প্রকটিত।

বসন্তে পুষ্পিত বৃক্ষের একটি পরিপূর্ণ তালিকা মহাকবির এই বসন্তবর্ণনায় দেখিতে পাই। মালতী, মল্লিকা, পদ্ম, করবী, কেতকী, সিন্ধুবার, বাসন্তী, মাতুলিঙ্গ, পূর্ণ, কুন্দ, চিরিবিল্ব, মধুক, বকুল, চম্পক, তিলক, নাগবৃক্ষ, পদ্মক, নীলাশোক, লোধ্র, অঙ্কোল, কুরণ্ট, চূর্ণক, পারিভদ্রক, চূত, পাটলি, কোবিদার, মুচুকুন্দ, কেতক, উদ্দালক, শিরীষ, কিংশপা, শাল্মলি, কিংশুক, রক্তকুরুবক, তিনিশ, নক্তমাল, চন্দন, স্যন্দন, হিন্তাল, তিলক, নাগ প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষ-লতা বসন্তে সুপুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে—মহাকাব্যের নায়ক উহা নিরীক্ষণ করিয়া বিমুগ্ধ। এই সব বৃক্ষে কতক পুষ্প লাগিয়া আছে, কতক ঝরিয়া পড়িয়াছে, কতক পড়িতেছে—ইহাদিগকে লইয়া মলয়ানিলের যেন চতুর্দিকে ক্রীড়া চলিয়াছে। "পতিতৈঃ পতমানৈশ্চ পাদপস্থৈশ্চ মারুতঃ। কুসুমৈঃ পশ্য সৌমিত্রে ক্রীড়তীব সমন্ততঃ ॥" পুণ্য গন্ধ লইয়া যে মলয়ানিল বহিতেছে, তাহাতে সমস্ত শ্রম অপনোদিত হয়। "স এব সুখ-সংস্পর্শো বাতি চন্দন-শীতলঃ। গন্ধমভ্যবহন্ পুণ্যং শ্রমাপনয়নোঽনিলঃ।" এই বর্ণনাপ্রসঙ্গে প্রধানতঃ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মহাকবির এই মহাকাব্যের 'ধীরোদাত্ত' নায়ক রামচন্দ্র বসন্তের শোভা-সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হইয়াছেন, ক্রমশ বসন্ত-সখা কন্দর্পের প্রভাবে অতিমাত্রায় প্রভাবিতও হইয়া পড়িতেছেন। বসন্তের শোভা দেখিয়া রামচন্দ্রের সীতা-শোক বর্ধিত হইতেছে, তিনি ধৈর্য অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না। "অয়ং বসন্তঃ সৌমিত্রে নানা-বিহগ-নাদিতঃ। সীতয়া বিপ্রহীনস্য শোক সন্দীপনো মম ॥" লক্ষ্মণ! নানা পক্ষীর কূজনে এই বসন্ত আমার সীতা-বিরহিত অবস্থায় কেবল শোকের মাত্রাই বৃদ্ধি করিতেছে। "দাত্যুহরতি বিক্রন্দৈঃ পুংস্কোকিল-রুতৈরপি। স্বনন্তি পাদপাশ্চেমে সমানঙ্গ-প্রদীপকাঃ ॥" দাত্যুহের (ডাকপাখীর) কন্দর্প-কূজনে, আর পুংস্কোকিলের কামনা-উদ্দীপক রবে এই সমস্ত বৃক্ষ শব্দায়মান অবস্থায় আমার কন্দর্প-পীড়াই বৃদ্ধি করিতেছে। "অয়ং হি রুচিরস্তস্যাঃ কালো রুচির-কাননঃ"—রুচির কানন লইয়া বসন্ত-কাল সীতার নিকট অতি-মনোহর হইয়া দেখা দিত। এখন "মন্মথায়াস-সম্ভূতো বসন্ত-গুণ-বর্ধিতঃ। অয়ং মাং ধক্ষ্যতি ক্ষিপ্রং শোকাগ্নি র্ন চিরাদিব ॥"—এই বসন্ত-কাল মন্মথ-পীড়া-সম্ভূত বসন্ত-গুণে (মন্দানিল, পুষ্পিত কানন প্রভৃতির সহায়তায়) আমাকে শোকানলেই দগ্ধ করিবে। সমগ্র বনভাগে পশু-পক্ষী যুগলে ক্রীড়া করিতেছে। রামচন্দ্রের নিকট এ দৃশ্য "সীতা-শোকের উদ্দীপক" হইয়া উঠিয়াছে। পুষ্পভার-সমৃদ্ধ বৃক্ষাবলীর পুষ্পরাজি তাঁহার নিকট পীড়াদায়ক—সুখস্পর্শ, হিমাবহ মলয়ানিল সীতার চিন্তায় আকুল রামচন্দ্রের নিকট পাবক-সদৃশ। "এষ পুষ্পবহো বায়ুঃ সুখস্পর্শো হিমাবহঃ। তাং বিচিন্তয়তঃ কান্তাং পাবক-প্রতিমো মম ॥" ময়ূর-ময়ূরীর নৃত্য দেখিয়া তিনি বলিতেছেন—"ময়ূরস্য বনে নূনং রক্ষসা ন হৃতা প্রিয়া। তস্মান্নৃত্যতি রম্যেষু বনেষু সহ কান্তয়া ॥" প্রিয়তমা ময়ূরীকে রাক্ষস হরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে নাই বলিয়াই তো আজ ময়ূর ময়ূরীর সঙ্গে নৃত্য করিতেছে। শেষে বলিতেছেন—"অপশ্যতো মে বৈদেহীং জীবিতং নাভি রোচতে।" বৈদেহীকে দেখিতে না পাইয়া আমার বাঁচিতে ইচ্ছা হইতেছে না। "কারণুব

পক্ষী কান্তার সহিত সুখ-সম্ভোগ সহকারে সলিলে অবগাহন করিতেছে দেখিয়া আমার কামনাই বর্ধিত হইতেছে।" "যদি দৃশ্যেত সা সাধ্বী যদি চেহ বসেমহি। স্পৃহয়েয়ং ন শক্রায় নাযোধ্যায়ৈ রঘূত্তম।।" হে লক্ষ্মণ! এই মনোহর মন্দাকিনীর তীরে এখন যদি সীতার সহিত বাস করিতে পাইতাম তাহা হইলে অযোধ্যার সুখও কামনা করিতাম না, ইন্দ্রত্বও চাহিতাম না।

এইরূপে মহাকবি বাল্মীকি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বসন্তের দুর্নিবার প্রভাবে রামচন্দ্র দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী চিত্রেই দেখি, তিনি এই কাতর অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া অতি-মানবোচিত ধৈর্যবলে বলীয়ান্। তাঁহার শোক-সমাচ্ছন্ন কামনা-কাতর অবস্থা দেখিয়া লক্ষ্মণ তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেছেন—"সংস্তম্ভ রাম ভদ্রং তে মা শুচঃ পুরুষোত্তম"—হে পুরুষোত্তম, ধৈর্য ধারণ করুন, শোক করিবেন না। "নে দৃশানাং মতির্মন্দা ভবত্য কলুষাত্মনাম্"—ভবাদৃশ অকলুষিত চিত্তের এরূপ চিত্ত-বিকৃতি তো ঘটে না। রামায়ণে লক্ষ্মণ জিতেন্দ্রিয় মূর্তিতে রামচন্দ্রের বন-সহচর—দুর্জয় শক্তিতেই তিনি কান্তাসঙ্গ-বিবর্জিত হইয়া কাননে যৌবনকাল যাপন করিতেছেন। তাই অগ্রজ 'পুরুষোত্তমে'র এতাদৃশ কাতর অবস্থা দেখিয়া তিনি স্বভাববশেই ঐ কথা বলিতে পারিতেছেন। বলিতে গেলে, ব্রহ্মচারী লক্ষ্মণের মুখের ঐ কথা মৃদু ভর্ৎসনার রূপেই মহাকবির লেখনীর সার্থকতা সপ্রমাণ করিতেছে। রামচন্দ্রের বুদ্ধি-বৈক্লব্য দূর করিবার জন্য লক্ষ্মণ বলিতেছেন—"স্বাস্থ্যং ভদ্রং ভজস্বার্য ত্যজ্যতাং কৃপণা মতিঃ"—হে আর্য, সুস্থ (অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ) হউন, মতি-কার্পণ্য পরিহার করুন। পরিশেষে লক্ষ্মণ অগ্রজকে এই পরামর্শ দিতেছেন: "ত্যজ্যতাং কামবৃত্তত্বং শোকং সংন্যস্য পৃষ্ঠতঃ। মহাত্মানং কৃতাত্মানমাত্মানং নাববুধ্যসে।।" হে আর্য! শোক পশ্চাতে রাখিয়া কামবৃত্তত্ব পরিহার করুন। রজস্তমের মলিনতা ত আপনাকে স্পর্শ করে না। শৌর্য-ধৈর্যে আপনি মহাত্মা—শ্রুতি-স্মৃতিতে আপনি কৃতাত্মা। পরিশুদ্ধাত্মা হইয়া আপনি প্রকৃত স্বরূপ কিরূপে পরিহার করিতেছেন? "এবং সম্বোধিতস্তেন শোকোপহত চেতসঃ। ত্যজ্য শোকঞ্চ মোহঞ্চ রামো ধৈর্যমুপাগমৎ।।" লক্ষ্মণের এই কয়টি বাক্যে সঙ্গে সঙ্গেই শুদ্ধসত্ত্ব রাম তাঁহার শুদ্ধ চিত্তে আরোপিত শোক-মোহাদি পরিহার করিয়া ধৈর্য অবলম্বন করিলেন। দুর্জয় শক্তিসম্পন্ন অবতার-পুরুষ যেন লৌকিক লীলাতেই আত্মশক্তি বিস্মৃত হইয়াছিলেন—আত্মবিস্মৃতির মূলে মৃদু আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন। স্বশক্তি ভুলিয়া বলহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন লৌকিক মায়ায়, সঙ্গে সঙ্গেই অলৌকিক শক্তিবলে কাতরভাবকে অতিক্রম করিলেন। অনন্তর সেই 'অচিন্ত্যপরাক্রম' রামচন্দ্র 'অব্যগ্রচিত্তে' পম্পা-সরোবর অতিক্রম করিলেন।

অবতার-পুরুষ যেন ভ্রান্তির বশেই স্ব-প্রকৃতিকে—পুরুষোত্তমের প্রকৃতিকে হারাইয়াছিলেন। অথবা তাঁহার যে ইচ্ছার শক্তিতে নর-লীলা, তাহার প্রভাবেই অলৌকিক শক্তি লৌকিকতার আবরণে লুকাইয়া গিয়াছিল। ভক্ত-কবি তুলসীদাস তাঁহার এই লৌকিক আচরণকে স্বেচ্ছা-মোহরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। শবরীর নির্দেশ অনুসারেই রামচন্দ্র পম্পা সরোবরে গিয়া উপস্থিত হইলেন—সীতার সন্ধান মিলিবে এই আশা। সেখানে 'বিরহী ইব প্রভু করত বিষাদা'—বিরহীর ন্যায় তিনি বিষাদে অভিভূত। লক্ষ্মণকে দেখাইয়া বলিতেছেন—'দেখ লক্ষ্মণ, খগ-মৃগ সব যুগলে বিহার করিতে করিতে যেন আমারই নিন্দা করিতেছে।' জড় পশু তাঁহার কিসের নিন্দা করিতেছে? নিন্দা করিতেছে—তাঁহার ঐ একক অবস্থার। তাঁহাকে যেন তাহারা দুর্ভাগা বলিয়া কৃপার পাত্র জ্ঞান করিতেছে। রামচন্দ্র বলিতেছেন—আমাকে দেখিয়া মৃগ-নিকর পলাইয়া যাইতেছে—'হমাহি দেখি মৃগ-নিকর পরাহী।' মৃগীরা কিন্তু সাহস দিয়া বলিতেছে—তোমাদের মারিবে না, ভয় নাই—"মৃগী কহহি তুমহ কহঁ ভয় নাহী"—তোমরা আনন্দ কর গিয়া—'তুমহ আনন্দ করহু মৃগজায়ে।' ও সোনার-হরিণ মারিতে আসিয়াছে—'কাঞ্চন-মৃগ খোজন এ আয়ে।' কি অপরূপ বক্রোক্তির অনুপম রস-মাধুর্য। ঐ যে রামচন্দ্র সীতার কথায় মোহাচ্ছন্ন হইয়া সোনার হরিণ মারিতে গিয়াছিলেন; এ যে তাঁহার উপরই কবির বক্র কটাক্ষ।

রামচন্দ্র স্ব-রূপের কথা বিস্মৃত না হইয়াই যেন বলিতেছেন—আমাকে নারী-বিরহে বিকল জানিয়াই কন্দর্প সমগ্র বনভাগে আপনার সেনা সন্নিবেশ করিয়াছে। স্বকীয় রূপকের বৈশিষ্ট্য কবি বসন্তের পুষ্পিত বৃক্ষাবলী, কোকিল, ভ্রমর প্রভৃতিকে কন্দর্পের সেনা-সজ্জা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রামচন্দ্র বলিতেছেন—হস্তী হস্তিনীর সঙ্গে বিহার করিতে করিতে যেন আমাকে এই শিক্ষাই দিতেছে যে নারী, শাস্ত্র আর ভূপতির যথাযোগ্য সেবা করিলেও তাহারা যেন কিছুতেই আয়ত্তে থাকিতে চাহে না। রামচন্দ্রের মুখ দিয়া লৌকিক বাস্তব সত্যই প্রকাশ পাইতেছে। পরক্ষণেই তিনি বলিতেছেন—লক্ষ্মণ, প্রিয়াহীন অবস্থাতেই আমার এই বিকলতা। অর্থাৎ মোহের ক্ষেত্রে মোহই স্বাভাবিক। তিনি বলিতেছেন—অবস্থা-বৈগুণ্যেই তাঁহার নিকট অতি-অপরূপ বসন্তের শোভাও অর্থহীন হইয়াছে।

বাল্মীকির রামচন্দ্র বসন্তের প্রভাবে এবং লক্ষ্মণের উৎসাহ-বাক্যে পুনরায় চেতনা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু তুলসীদাসের রামচন্দ্র যেন কন্দর্পের প্রভাবে অভিভূত হইবার পাত্রই নহেন—স্বেচ্ছায়ই যেন লৌকিক লীলাকে তিনি বরণ করিয়া লইয়াছেন। তুলসীদাসের লক্ষ্মণও বাল্মীকির লক্ষ্মণ অপেক্ষা কম উজ্জ্বল নহেন, কিন্তু ভক্তকবি তাঁহাকে দিয়া রামচন্দ্রের চৈতন্য-সম্পাদনের ক্ষেত্র রচনা করেন নাই। রামচন্দ্র সীতা-বিরহের অবস্থায়ও নিজ-মুখেই পুরুষোচিত ধৈর্যের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন—"লছিমন দেখত কাম অনীকা। রহহি ধীর তিন্হকে জগ লীকা॥" হে লক্ষ্মণ! কন্দর্পের সৈন্য-সজ্জা দেখিয়াও যে স্থির থাকে, সংসারে তাহারই মর্যাদা। আবার বলিতেছেন—"এহি কে এক পরম বলু নারী। তেহি তে উবর সুভট সোই ভারী॥" কন্দর্পের একমাত্র বল হইল স্ত্রীলোক। উহার প্রভাব হইতে যে বাঁচিয়া যায়, সে-ই বড় যোদ্ধা।

তুলসীদাস অভীষ্ট দেবতা মহাদেবের মুখ দিয়া পার্বতীকে রাম চরিত শুনাইতেছেন। পম্পা-সরোবরের তীরে রামচন্দ্র উপস্থিত—সীতার বিরহে তিনি বিষণ্ণ—অথচ বসন্তের অপরূপ সৌন্দর্য চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত-মহাদেব এই প্রসঙ্গে পার্বতীকে বলিতেছেন—পার্বতি! শ্রীরামচন্দ্র কি কন্দর্পের প্রভাবে প্রভাবিত হইবার পাত্র? যিনি চর-অচর সকলের স্বামী—সকলের অন্তর্যামী, কাম-ক্রোধাদি তাঁহারই কৃপায় মনুষ্য-মন হইতে দূরে পলায়ন করে। তুলসীদাসের রামচন্দ্র তাই লৌকিক মায়ায় বিরহাতুর অবস্থা দেখাইয়াও অবিকৃত রূপেই বসন্তের সুষমা উপভোগ করিতেছেন।

তিনি দেখিতেছেন পম্পাসরোবরের জল সাধু-হৃদয়ের ন্যায় নির্মল। ভক্তকবির অতুলনীয় উপমা-গৌরবে বসন্তের বর্ণনা যতখানি সার্থক হইয়াছে, ততোধিক সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে কবিত্ব-রসের চরম ও পরম উৎকর্ষ-সূচক অধ্যাত্মদৃষ্টিতে। ঐ দিক দিয়াই তুলসীদাসের এই কাব্য এতখানি উচ্চাঙ্গের। পম্পাসরোবরে—"জহঁ তহঁ পিয়হিঁ বিবিধ মৃগ নীরা। জনু উদার-গৃহ জাচক-ভীরা॥" উদার মনুষ্যের গৃহদ্বারে যেমন যাচকের ভিড় হয়, পম্পা-সরোবরের ঘাটে ঘাটে তেমনই বিবিধ পশু জল পান করিতেছে। অবশ্য বাল্মীকিও এক স্থানে সাধু মনুষ্যের মনকে নির্মল জলের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন। "সন্মনুষ্য মনো যথা" বলিয়া মহর্ষি বাল্মীকি শিষ্য ভরদ্বাজকে তীর্থোদকের নির্মলতার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তুলসীদাসের রচনায় সন্মনুষ্যের নির্মলতা সর্বত্র উচ্চতর আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত—প্রকৃতির নির্মলতা তাহার নিম্নে। রামচন্দ্র পম্পাসরোবরে আসিয়াছেন দেখিয়া জল-কুক্কুট, জল হংস প্রভৃতি যেন তাঁহার অভ্যর্থনাকল্পেই স্তুতি-গীতির কলনাদ তুলিয়াছে। স্বভাবোক্তিতেও কবি বসন্তের অতুলনীয় সুষমার অনুপমত্বই প্রদর্শন করিয়াছেন। কবি বলিতেছেন—চক্রবাক, বক প্রভৃতি দেখিতে যে কত সুন্দর, তাহা কি বর্ণনায় যথাযথ প্রকাশ করা সম্ভব? আবার বলিতেছেন—সুন্দর পক্ষীর সুমিষ্ট কূজন পান্থদের কানে এতই মধুর শুনাইতেছে যে, মনে হয় ঐ সব সুন্দর পক্ষী যেন পথিকদের অভ্যর্থনা করিয়া বলিতেছে, 'এস এস, অভ্যর্থনা গ্রহণ কর।' চম্পক, বকুল, কদম্ব, তমাল, পাটল (গোলাপ), পনস (কাঁটাল), পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষ বিচিত্র শোভায় শোভান্বিত। তাহাতে নূতন পুষ্প, নবীন পল্লব এবং পুষ্পে পুষ্পে গুঞ্জনশীল ভ্রমরের বিহার-বিলাস। এই স্বভাবোক্তির পরই কবি সর্বদা শীতল মন্দ-সুগন্ধ মনোহর বসন্ত-বায়ুর কথা বলিয়াছেন।

অবশেষে অবতার-পুরুষের অলৌকিকত্ব প্রতিপাদন করিয়া নারদ ও শ্রীরামচন্দ্রের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে কবি প্রেম-ভক্তির চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিতেছেন—দেবর্ষি নারদের এক সময়ে মনে মনে অহঙ্কার হয় যে তিনি জিতেন্দ্রিয়, কামনা তাঁহাকে গ্রাস করিতে পারিবে না। ভগবান এ ক্ষেত্রে তাঁহার পরীক্ষা না করিলে তাঁহার পবিত্রতাই যে ক্ষুণ্ণ হয়! ভগবান্ তাঁহার দম্ভ নষ্ট করিবার জন্য অপরূপ সুন্দরী এক নারী সৃষ্টি করিয়া প্রেরণ করেন। নারদ তাহার রূপে বিমোহিত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন—শেষ পর্যন্ত ভগবানকেই ধরিয়া বসেন। ভগবান যখন তাঁহাকে ছলনা করিলেন, তখন নারদও তাঁহাকে অভিশাপ দিয়া বসিলেন, নারী-বিরহে যেন তাঁহারও অনুরূপ অবস্থা ঘটে। ভগবানকে ভক্তের অভিশাপ মাথা পাতিয়া লইতে হইল। আজ ভগবান রামচন্দ্র যখন বনবাসে নারী-বিরহে কাতর, তখন নারদ ভাবিলেন, ভগবান স্বেচ্ছায় আমার অভিশাপ অঙ্গীকার করিয়া লইয়া প্রিয়তমার বিরহ সহ্য করিতেছেন—একবার দেখিয়া আসি। এমন সময় ত আর পাইব না। ভক্ত ভগবানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে আসিতেছেন। এ অবস্থায় যদি তাঁহার মায়াচ্ছন্ন কাতর মূর্তিই ভক্তের দৃষ্টিপথে পতিত হইল, তবে আর সে কবিত্বের কি সার্থকতা, কবির সে চিত্রের কি দীপ্তি? তুলসীদাস এখানে তাই রামচন্দ্রকে মোহাচ্ছন্ন রূপে চিত্রিত করেন নাই।

নারদ আসিয়া তাঁহার নিকট এ অবস্থায়ও জ্ঞান-উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই রাম-লক্ষ্মণ ভক্তি-প্রণতি নিবেদন করিলেন। আলিঙ্গনাদির পর নারদ রামচন্দ্রের নিকট ভক্তির প্রতীক নাম (রামনাম)

প্রার্থনা করিয়া লইতেছেন, এ যেন মন্ত্রগ্রহণ। ভগবানকে স্বরূপে অবস্থিত দেখিয়া তিনি তখন প্রশ্ন করিতে চাহিতে-ছেন, অথবা আরও অনেক ঊর্ধ্বে উঠিয়া—যেন সত্যদর্শী হইয়াই নারদ ভগবানের মুখ দিয়া সত্যের যাচাই করিয়া লইতেছেন। কিন্তু তাহারও আগে তিনি ভগবানের নিকট প্রথমে অভয় যাচ্ঞা করিলেন এবং তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবান! আমাকে পরীক্ষা করি-বার জন্য মায়ারূপী নারীকেও প্রেরণ করিলেন, আবার যখন তাহাকে বিবাহ করিবার অভিলাষী হইলাম, তখন তাহা হইতে নিবৃত্তও করিলেন। এ আপনার কি রীতি? রাম-চন্দ্র উত্তর করিলেন, জননী শিশুসন্তানকে রক্ষা করেন, গাভী বৎসকে রক্ষা করে। অগ্নি কিংবা সর্পকে দেখিয়া মানব-শিশু অথবা গো-বৎস ছুটিয়া যায়, মাতাকেই দৌড়াইয়া গিয়া রক্ষা করিতে হয়। ঐ শিশু অথবা গো-বৎস বড় হইলে এরূপ করিয়া আর রক্ষার প্রযত্ন করিতে হয় না, কিন্তু মাতার স্নেহ সমানই থাকে। হে নারদ! যে ভক্তিতে আমাকে পাইতে চায়, সে ঐরূপ শিশু বা গো-বৎসের তুল্য, তাহাকে সর্বপ্রকারেই রক্ষা করিতে হয়। যে জ্ঞানমার্গের সাধক সে হইল আমার প্রৌঢ় তনয়ের সমান। আর যে ভক্তি-পথের পথিক সে আমার নিকট ঐ নবশিশুর তুল্য। তুমি প্রৌঢ় তনয়ের ভ্রান্ত পথ ধরিয়া মনে মনে অভিমানী হইয়াছিলে, তাই পরীক্ষা করিয়াছিলাম, আবার ভক্তি বুঝিয়া তোমাকে নারীর মোহ হইতে বিমুক্ত করিয়া বিমল বৈরাগ্য দান করিয়াছিলাম। "বহু বিচারি পণ্ডিত মোহি ভজহীঁ। পায়েহু গ্যান ভগতি নহীঁ তজহীঁ ॥" ইহা বিশেষ বিবেচনা করিয়াই জ্ঞানিগণও আমার ভজনা করিতে গিয়া কোন ক্রমেই অচলা ভক্তিকে—ধ্রুব বিশ্বাসকে পরিহার করেন না।

অনন্তর রামচন্দ্র নারদের প্রশ্নের সূত্র ধরিয়াই যেন নারীর প্রতি মোহের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলেন। ভক্তকবির এই অংশের রূপক-ভক্তি আধুনিকের রস-বিচারে রসাপকর্ষ কিনা জানি না, কিন্তু যথার্থ কাব্যরসিকের নিকট ভাব-গাম্ভীর্যে অতুলনীয়। বসন্তকাল সম্বন্ধে এই সঙ্গে উপমাও রূপক প্রয়োগ করিয়া কবি রামচন্দ্রের মুখ দিয়া বলাইতেছেন —হে নারদ! মোহকে যদি বিপিনের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তবে বসন্তকালই হইল সেখানে নারী। "শ্রুতি মুনি কহ পুরান শ্রুতি সন্তা। মোহ বিপিন কহু নারী বসন্তা॥" হে নারদ! শুন, বেদ ও পুরাণে এইরূপই কথিত হইয়াছে যে মোহ-বিপিনের নারী হইল বসন্ত। অর্থাৎ মোহের আবাসস্থল নারী। বিস্তারিত রূপকের মধ্য দিয়া কবি নারীর প্রতি মোহের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

ভক্তকবি তুলসীদাস কলি-কলুষের ধ্বংসসাধনে এবং বিমল জ্ঞান-বৈরাগ্যের বিকাশের পরিপন্থী রূপে যে কামজ মোহের নিন্দা করিয়াছেন, তাহা যথাযথ রূপকেই ব্যক্ত করিয়াছেন। নতুবা নারীই যে আদ্যাশক্তি এবং সেই আদ্যা শক্তির মধ্যেই যে সমস্ত মঙ্গলের বীজ নিহিত, তাহাও এই কবিই অন্যত্র সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রধান বক্তব্য এই যে, বাল্মীকির রামচন্দ্র লৌকিক মায়ায় অভিভূত ভাব ধারণ করিলেও লক্ষ্মণের উক্তির সঙ্গে সঙ্গে অলৌকিক বলেই সে মোহকে পরাস্ত করিয়াছেন, তুলসী-দাসের রামচন্দ্র বসন্তের কামনাসঞ্জাত মোহের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করিয়া তাহা হইতে বিমুক্তির পথও ভক্তের নিকট নির্দেশ করিয়াছেন। অরণ্যকাণ্ডের উপসংহারে ভক্তকবি অবতার-পুরুষের বসন্ত-কালীন বিরহ-দশার লীলা-রহস্যের ভিতর দিয়া বিমল জ্ঞান-বৈরাগ্যের অপরূপ কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আদিকবিও বসন্ত-সহচর কন্দর্পের নিকট প্রথমে রামচন্দ্রের পরাভব দেখাইয়া শেষে তাঁহার অলৌকিক শক্তিকেই জয়ী করিয়াছেন। লোকোত্তর পুরুষের লৌকিক লীলার মধ্যেও যে অতিমহৎ একটি অলৌকিকত্ব প্রকট হইয়া উঠে, দুইটি কাব্যেই অপূর্ব-মনোহর বসন্তের সৌন্দর্য-লীলার মধ্যে সেই সত্য সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।
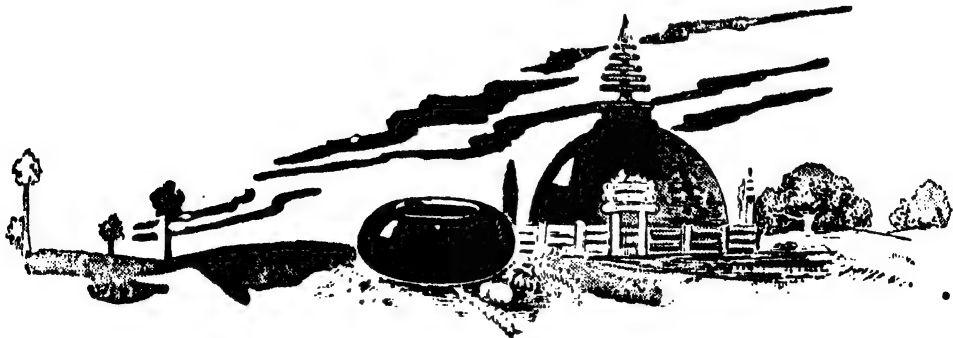
সংস্কৃত কাব্যে সহধর্ম্মিণী

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

প্রাচীন যুগে নারীর উচ্চ ও সম্মাননীয় স্থানের প্রমাণ আমরা পাই প্রধানতঃ সংস্কৃত সাহিত্য থেকেই। বিশেষ ভাবে, সংস্কৃত সাহিত্যের সর্ব্বত্রই বিবাহিতা নারীর গৌরব বিঘোষিত হয়েছে। স্ত্রী ছিলেন সর্ব্বপ্রকারেই স্বামীর সহধর্ম্মিণী, বা 'পত্নী'। সুবিখ্যাত বৈয়াকরণ পাণিনির মতে, 'পত্নী' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ: "পত্যুর্নো যজ্ঞ-সংযোগে" (পাণিনি সূত্র)। অর্থাৎ, স্ত্রী স্বামীর যজ্ঞসহকারিণী, ধর্ম্মসঙ্গিনী, আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপানস্বরূপা। বৈদিক যুগে, যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্ম-কার্য্যের আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত পত্নী পতির সঙ্গে সমান অংশ গ্রহণ করতেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১·৪৩) পত্নীকে "অর্দ্ধবিদল" বা একটি বিদুকের অর্দ্ধাংশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দুইটি অংশই যেমন একটি বিদুকের পক্ষে সমান প্রয়োজনীয়, তেমনি পতি-পত্নী সত্যই একজন অপরের অর্দ্ধাংশ অথবা পরিপূরক, সহায়ক, শক্তিদায়ক।

আমাদের বিবাহের মন্ত্রগুলিতে স্ত্রী যে সত্যই স্বামীর সহধর্ম্মিণী তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সব মন্ত্র বেদ, ব্রাহ্মণ, গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি সুপ্রাচীন গ্রন্থসমূহ থেকে গৃহীত, এবং জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদের মন্ত্রও এর মধ্যে বহু আছে। সুতরাং মানব-সভ্যতার প্রথম অরুণোদয়-মুহূর্ত্ত থেকেই যে ভারতে নর-নারীর, বিশেষ করে, স্বামী-স্ত্রীর সর্ব্ববিষয়ে সমান অধিকার সগৌরবে স্বীকৃত হ'ত তা নিঃসন্দেহ। যথা, বিবাহের সপ্তপদী অনুষ্ঠান-কালে, বর বধূকে বলেন:

"ওঁ সখা সপ্তপদী ভব সখ্যন্তে গমেয়ং সখ্যন্তে মা যোষাঃ
সখ্যন্তে মা য়োষ্ঠাঃ।" (আপস্তম্ব—গৃহ্যসূত্র, ২-৪-১৭,)

"আমার সঙ্গে সপ্তপদ গমন করে আমার সখা হও। আমি যেন তোমার সঙ্গে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হই, আমাকে তোমার সখ্য প্রদান কর।"

পরে বধূকে উদ্দেশ করে বর যে সুন্দর মন্ত্রগুলি পাঠ করেন, তার মধ্যে কয়েকটি এইরূপ:

"ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।"

(ঋগ্বেদ ১০-৮৫-৪৭)

"সকল দেবতা আমাদের উভয়ের হৃদয় সম্মিলিত করুন।"

"বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে।"

(সাম-মন্ত্র—ব্রাহ্মণ ১-৩-৮)

সত্য-গ্রন্থি দ্বারা তোমার মন ও হৃদয় আমি বন্ধন করি।"

"ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু।
মমচিত্তমনু চিত্তং তে অস্তু।"

সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্র ২-৪-১, মানবগৃহ্যসূত্র ১-১০-১৩, পারস্কর-গৃহ্যসূত্র ১-৮-৮)

"আমার ব্রতে তোমার হৃদয় দান কর। আমার চিত্ত তোমার চিত্তেরই অনুগামী হোক্।"

"ওঁ যদেতদ্ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।"

(সাম-মন্ত্র—ব্রাহ্মণ ১-৩-৯)

"তোমার যে হৃদয় তা আমার হৃদয় হোক্। আমার যে হৃদয় তা তোমার হৃদয় হোক্।"

"ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু।"

(ঋগ্বেদ ১০-৮৫-৪৬)

"শ্বশুরের সম্রাজ্ঞী হও, শ্বশ্রূর সম্রাজ্ঞী হও, ননন্দার সম্রাজ্ঞী হও, দেবরগণের সম্রাজ্ঞী হও।"

এরূপ বহু সুন্দর মন্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকেই স্ত্রী স্বামীর সখা, সহায়ক, সহকর্ম্মিণী, সহধর্ম্মিণী রূপে শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারিণী ছিলেন।

স্মৃতির যুগে অবশ্য নারীদের সম্মান ও অধিকার বহুলাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। তথাপি নারী-সমাজের সেই দুর্দ্দিনেও সহধর্ম্মিণীর সম্মান অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ ছিল। স্মৃতিকারেরাই বলেছেন: "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।" আর একটি বিখ্যাত শ্লোকে মনু বলেছেন: "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।" (৩-৫৪)। যে স্থানে নারীরা পূজিতা হন সে স্থানে দেবতা-গণও প্রসন্ন হন, কিন্তু যে স্থানে নারীরা পূজিতা হন না, সে স্থানে সকল ক্রিয়াকলাপই নিষ্ফল হয়। যে পরিবারে নারীরা দুঃখক্লিষ্টা থাকেন, সেই কুল বিনষ্ট হয়। যে পরিবারে তাঁরা দুঃখক্লিষ্টা নন, সেই কুলের শ্রীবৃদ্ধি হয়। যে গৃহে পতি পত্নীতে এবং পত্নী পতিতে সন্তুষ্ট থাকেন সেই কুলে কল্যাণ চিরবিরাজ করে। এটি মনুস্মৃতির একটি বিখ্যাত শ্লোক।

(মনুস্মৃতি—৩-৫৪-৬০)

নারীদের, বিশেষ করে সহধর্ম্মিণীর, যে গৌরবময় স্থানের নিদর্শন আমরা প্রাচীন সাহিত্যে, এমন কি স্মৃতিগ্রন্থেও পাই, সেই চিত্রটিই আবার নূতন করে ফুটে উঠেছে পরবর্তী সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে। অসংখ্য বিভাগসম্বলিত, সুবিশাল সংস্কৃত-কাব্যে সহধর্ম্মিণীর স্থান কিরূপ, স্বল্প পরিসরে তার আলোচনা সম্ভব নয় বলে, কেবল কয়েকখানি প্রখ্যাত নাটক-নাটিকার কথা সংক্ষেপে বলছি।

প্রারম্ভেই অবশ্য স্বীকার করতে হয় যে, সংস্কৃত নাটক-নাটিকা প্রেমমূলক বলে সহধর্ম্মিণীর প্রধান বা গুরুত্বপূর্ণ স্থান তাতে নেই। অবশ্য "অভিজ্ঞান-শকুন্তল", "উত্তর-রামচরিত" "বেণীসংহার" প্রভৃতি প্রখ্যাত নাটকগুলি এই পর্য্যায়ে পড়ে

না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহুক্ষেত্রে সংস্কৃত নাটক-নাটিকাগুলির বিষয়বস্তু একই। অর্থাৎ, বিবাহিত রাজা বা নায়ক অন্য নারীর প্রেমাসক্ত হন, পরে বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে তাঁরই সঙ্গে নায়কের বিবাহ হয় এবং সেইখানেই হয় নাটকের পরিসমাপ্তি। স্বভাবতঃই, এরূপ পরিবেশের মধ্যে প্রথমা স্ত্রী থাকেন প্রায়ই অন্তরালে, এবং পাঠক বা দর্শকচিত্তের ঔৎসুক্য ও করুণায় প্রায় সবটুকু থেকেই তিনি বঞ্চিতা থাকেন। তথাপি এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও, সহধর্ম্মিণীর শাশ্বত মহিমময় স্থান ও আদর্শের আভাস আমরা পাই।

প্রথমেই কবি কালিদাস-রচিত "অভিজ্ঞান-শকুন্তল" নাটকের কথা ধরা যাক। এই নাটকে চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলার পতিগৃহ-যাত্রায় যে সকরুণ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা সত্যই অপূর্ব্ব। মহামুনি কণ্ব দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার গান্ধর্ব্ব-বিবাহের কথা জেনে তাঁকে বলছেন :

"বৎসে! সুশিষ্যপরিদত্তা ইব বিদ্যা অশোচনীয়াসি।"

(চতুর্থ অঙ্ক)

"বৎসে, সুশিষ্য-গৃহীতা বিদ্যার ন্যায় তোমার জন্য শোকের কিছু নেই।"

কণ্ব পুনরায় বলছেন : "তোমাকে যোগ্যপাত্রে সম্প্রদান করা আমার সঙ্কল্প ছিল, তুমি নিজ পুণ্যবলে সেই পতি প্রাপ্ত হয়েছ। এই নবমালিকা লতাটিও আম্রবৃক্ষের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তোমাদের উভয়েরই জন্য আজ আমি নিশ্চিন্ত।"

(চতুর্থ অঙ্ক)

এস্থলে পতি-পত্নীর মিলনকে উপযুক্ত ছাত্রের সঙ্গে বিদ্যার এবং বৃক্ষের সঙ্গে লতার মিলনের অনুরূপ বলে চমৎকার ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিদ্যাহীন ছাত্রের জীবন নিষ্ফল ; আবার, বিদ্যার সার্থকতা ছাত্রের মধ্যেই তার প্রকাশে। লতাবিহীন বৃক্ষ সৌন্দর্য্যশূন্য, আবার লতা বৃক্ষের আশ্রয়েই বর্দ্ধিত। অনুরূপ ভাবে পতি-পত্নী একজন অন্যের মধ্যে খুঁজে পান মানব-জীবনের প্রকৃত সার্থকতা, পূর্ণতা, আনন্দ। এইরূপে সহধর্ম্মিণী সত্যই পতির অর্দ্ধাঙ্গিনী।

পতিগৃহে গমনোদ্যতা শকুন্তলার প্রতি কণ্বের উপদেশ-বাণীও পরিবারে সহধর্ম্মিণীর গৌরববিমণ্ডিত স্থানের জাজ্বল্যমান প্রমাণ :

"শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখী বৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণ তয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামা কুলস্যাধয়ঃ॥"

(চতুর্থ অঙ্ক)

"পতিগৃহে গিয়ে গুরুজনদের শুশ্রূষা করো, সপত্নীগণের সঙ্গে সখীর মত আচরণ করো। পতিকর্তৃক অপমানিতা হলেও ক্রোধবশে তাঁর প্রতিকূলাচরণ করো না। পরিজনবর্গের সঙ্গে অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করো। যাঁরা এরূপ আচরণ করেন তাঁরাই গৃহিণীপদ লাভ করেন, অন্যেরা কুলের মনঃপীড়ার কারণ মাত্র।"

এই কবিতাটিতে আমরা ভারতীয় সহধর্ম্মিণীর আদর্শের উজ্জ্বল চিত্র পাই। প্রকৃত সহধর্ম্মিণী বা গৃহিণীই পরিবারের কেন্দ্রস্বরূপা—তাঁকে আশ্রয় করেই সমগ্র পরিবার সুখ, শান্তি, সার্থকতার পথে অগ্রসর হয়। সেবা, সখ্য, ক্ষমা, ঔদার্য্য, গর্ব্বশূন্যতা ও ভোগবিমুখতা দ্বারা তিনি স্বামী-পুত্র, অন্যান্য গুরুজন ও পরিজনের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবেন—এই তাঁর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ও চরম সার্থকতা।

এই কবিতায় আর একটি সুন্দর কথা বলা হয়েছে। সহধর্ম্মিণী রূপে অবশ্য পত্নী সর্ব্বপ্রকারে পতির সঙ্গে সমানাধিকার দাবি করবেন। কিন্তু পতির দোষ-ত্রুটি সস্নেহে সযত্নে ক্ষমা করাও পত্নীর অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য। সংসারের কলহ-বিবাদে শান্তিবারি সিঞ্চন, তাপ-ক্ষতে অমৃত-প্রলেপ লেপন, ভেদের মধ্যে মিলনগ্রন্থি বন্ধন—বিশেষভাবে নারীরই কাজ, পুরুষের নয়। সেজন্য ক্রোধকে ক্ষমা, অপমানকে সহিষ্ণুতা, অন্যায়কে ন্যায় দ্বারা জয় করাই মঙ্গলস্বরূপিণী সহধর্ম্মিণীর কাজ। ঋগ্বেদে একটি সুন্দর মন্ত্র আছে, এটি বিবাহকালে বর বধূর উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করেন :

"দশাস্যাং পুত্রানাধেহি, পতিমেকাদশং কৃধি।"

(ঋগ্বেদ ১০-৮৫-৪৫)

"একে দশটি পুত্র দান কর, পতিকে একাদশ কর।"

অর্থাৎ, সন্তানদের সঙ্গে পতিকেও পত্নী পরম স্নেহ, যত্ন, ধৈর্য্য ও ক্ষমার সঙ্গেই লালন করবেন, দুর্গম সংসারপথে সব ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষা করবেন তিনিই তাঁর প্রেমাঞ্চল বিস্তারে—প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর আদর্শ এই।

অত্যাচারী, বিপথগামী পতির প্রতিও পত্নীর এরূপ প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, প্রেম, ক্ষমা, সমানুভূতি ভারতীয় নারীরই বৈশিষ্ট্য। এই ভারতীয় আদর্শেরই প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে। প্রাণ-প্রতিম পতিকে স্বেচ্ছায়, সহাস্যমুখে অপর নারীর হস্তে সমর্পণ করা পত্নীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। কিন্তু স্বামীর সুখ ও কল্যাণের জন্য ভারতীয় নারী অনায়াসে এই দুঃসাধ্য ব্রতও পালন করেছেন। সংস্কৃত নাটক-নাটিকায় সহধর্ম্মিণীর এই নীরব আত্মদান স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। প্রায় সব সংস্কৃত নাটক-নাটিকাতেই দেখতে পাই যে, প্রথমে স্বভাবতঃই আপত্তি করলেও মহারাণী বা নায়কের পত্নী যে মুহূর্ত্তে জানতে পারেন যে, সেই নারীর সঙ্গে মিলন পতির প্রকৃত সুখ ও কল্যাণেরই কারণ হবে, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি স্বয়ং অগ্রসর হয়ে পতির বিবাহ দেন। মহাকবি কালিদাসের রচিত আর একটি বিখ্যাত নাটক "বিক্রমোর্ব্বশী"তে এর একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়।

রাজা পুরূরবা উর্ব্বশীর প্রতি প্রেমাসক্ত হলে প্রথমে মহারাণী ঔশীনরী স্বভাবতঃই দুঃখে ও অভিমানে আকুল হয়ে উঠেন। কিন্তু পরে অনুতাপক্লিষ্ট হৃদয়ে তিনি রাজাকে প্রসন্ন করবার জন্ত "প্রিয়-প্রসাদন" ব্রত সম্পাদন করেন এবং রাজাকে বলেন: "দেবতাগণকে সাক্ষী রেখে আর্য-পুত্রকে প্রসন্ন করছি। আজ থেকে তিনি যে নারীকে লাভ করতে ইচ্ছুক হবেন এবং যে নারী তাঁকে লাভ করতে ইচ্ছুকা হবেন, আমি তাঁর সঙ্গে প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধা হব।" বিদূষক তাঁকে পরিহাস করে বললে: "মহারাজের প্রতি এই কি আপনার ভালবাসা?"— রাণী বলছেন, "মূর্খ! তুমি কি এটুকুও জান না? আমার নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিয়েও আমি মহারাজাকে সুখী করতে চাই। তুমি কেবল ভেবে দেখ তাঁর পক্ষে এটা মঙ্গলজনক হবে কিনা।" (তৃতীয় অঙ্ক)

শ্রীহর্ষ-বিরচিত বিখ্যাত নাটিকা "রত্নাবলী"তেও সহধর্ম্মিণীর এই মহান্ আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজা বৎস রত্নাবলী বা সাগরিকার প্রতি প্রণয়াসক্ত হলে রাণী বাসবদত্তা তাঁকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখেন। কিন্তু পরে তিনি যখন জানতে পারেন যে, রত্নাবলীর স্বামী সার্ব্বভৌম রাজা হবেন, তখন তিনি স্বেচ্ছায় রত্নাবলীকে রাজার হস্তে সমর্পণ করেন। নাটিকার শেষ দৃশ্যটি ভারতীয় রমণীর স্বভাবগত ঔদার্য্যের একটি অনবদ্য চিত্র:

বাসবদত্তা—এসো বোন্, এসো। আমি তোমার প্রতি কত নিষ্ঠুর আচরণ করেছি। সে সব বিস্মৃত হয়ে তুমি আজ আমাকে ভগিনীর স্নেহচক্ষে দেখ।

* * *

যৌগন্ধরায়ণ—এখন ত দেবী এঁকে ভগিনী বলে জানতে পেরেছেন, ভগিনীর প্রতি যা কর্ত্তব্য দেবী তা করুন।

বাসবদত্তা—অমাত্য মহাশয়, স্পষ্ট করেই বলুন না কেন? রত্নাবলীকে আপনি এবার মহারাজের হস্তে সমর্পণ করুন।'

বিদূষক—দেবি! আপনি অমাত্যের মনের ভাব ঠিকই বুঝেছেন।

বাসবদত্তা—এসো রত্নাবলী, তুমি আমার ভগিনী, সপত্নী নও। মহারাজ! রত্নাবলীকে আপনার হস্তে সমর্পণ করলাম। —এঁর আত্মীয়স্বজন দূরদেশবাসী। সুতরাং এঁর সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করবেন যেন ইনি তাঁদের স্মরণ করবার অবসর পর্য্যন্ত না পান।

* * *

বাভ্রব্য—দেবি! আপনি সত্যই 'দেবী' নামের যোগ্য।

বাসব—রত্নাবলি! আজ থেকে তুমিও দেবীপদে অভিষিক্ত হলে।

শূদ্রক-বিরচিত সুবিখ্যাত "মৃচ্ছকটিক" নাটকের নায়ক ব্রাহ্মণ চারুদত্তের সহধর্ম্মিণী ধূতার চরিত্রটিও অতি সুন্দর। নিজের স্বামীকে নগরের সুপ্রসিদ্ধা বেশবধূ বসন্তসেনার প্রণয়যুক্ত জেনেও, চারুদত্তের নিকট গচ্ছিত বসন্তসেনার অলঙ্কার চুরি গেলে, ধূতা স্বামীর মানরক্ষার জন্ত নিজের শেষ সম্বল, মাতৃগৃহ থেকে প্রাপ্ত রত্নমালাটি অক্লেশে বসন্তসেনার নিকট প্রেরণ করেন। স্বামীর প্রাণদণ্ডের সংবাদে ধূতা চিতারোহণে উদ্যতা হন এবং পরিশেষে বসন্তসেনাকে সাদরে সপত্নীরূপে গ্রহণ করেন। এরূপ আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, সংস্কৃত নাটক-নাটিকার নায়কগণ সাধারণতঃ দুর্ব্বলচিত্ত ও অন্যাসক্ত হলেও, সহধর্ম্মিণীদের প্রতি তাঁদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধারও পরিচয় আমরা পাই। "বিক্রমোর্ব্বশী" ও "রত্নাবলী" থেকেই তার উদাহরণ দেওয়া চলে। "বিক্রমোর্ব্বশী" নাটকে, উর্ব্বশী ও রাজার প্রণয়কাহিনী জানতে পেয়ে রাণী অভিমানভরে সে স্থান ত্যাগ করতে উদ্যতা হলে, অনুতাপক্লিষ্ট রাজা তাঁর পায়ে পড়ে অনুনয় করে বলছেন, "আমি চির অপরাধী, তথাপি ক্রোধ সংবরণ করে আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" রাণী চলে গেলে বিদূষক রাজাকে বলছেন, "এ আপনার পক্ষে ভালই হ'ল।" তখন রাজা সখেদে বিদূষককে বলছেন, "ও কথা বল না। আমি উর্ব্বশীগতপ্রাণ হলেও, রাণী আমার বহুসম্মানের পাত্রী।" "রত্নাবলী" নাটিকাতেও রাজা বলছেন, "আমার প্রতি যাঁর প্রণয় চরম সীমায় উঠেছে, তিনিই আমার অন্যায় কাজ স্বচক্ষে দেখে গেলেন। হায়! অসহ বেদনায় প্রিয়া আজ নিশ্চয়ই প্রাণ বিসর্জ্জন দেবেন, কারণ, উচ্চতম প্রণয়ের এরূপ পতন সত্যই অসহ্য।"

(তৃতীয় অঙ্ক)

আমরা সংস্কৃত-সাহিত্যের সর্ব্বত্রই দেখতে পাই যে, সহধর্ম্মিণীর সম্মান অক্ষুণ্ণ আছে। স্বামী অপরের প্রতি আসক্ত হলেও স্ত্রী-পরিত্যাগের বিধান বা দৃষ্টান্ত কুত্রাপি নেই। উপরন্তু সহধর্ম্মিণীর অনুমতি অনুসারেই কেবল পতির পুনর্বিবাহ সম্ভব হ'ত।

মহাকবি ভবভূতির প্রখ্যাত নাটক "উত্তর-রামচরিত" রাম-সীতার পূত প্রেমকাহিনী অবলম্বনে বিরচিত। প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত রামচন্দ্রের সাদর সম্ভাষণ এবং তাঁরই প্রদত্ত প্রকৃত "প্রেমের" সংজ্ঞা জগতের কাব্য-সাহিত্যে দাম্পত্য-প্রেমের আদর্শরূপে অমর হয়ে আছে—

"ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়ো
রসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ
কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পুনরসহ্যস্তু বিরহঃ।"

"ইনিই আমার গৃহের লক্ষ্মী, ইনিই আমার নয়নের অমৃত-অঞ্জন। এঁরই স্পর্শে অঙ্গে চন্দনরস সিঞ্চিত হয়, এঁরই বাহু—কণ্ঠে

শীতল মরণ মৃত্যুহার। প্রিয়ায়, সবই প্রিয়, অসহ কেবল বিরহ।"

"অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্বাস্ববস্থাসু যদ্
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতং
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে।"

"যা সুখে দুঃখে সমরূপ, যা সর্ব্ব অবস্থাতেই অনুকূল, যা হৃদয়ের বিশ্রামস্থল, যা জরাতেও শুষ্ক হয় না, যা কালক্রমে মোহ-আবরণ অপসৃত হলে স্নেহসারে পরিণত হয়—সেই সুপবিত্র প্রেম সজ্জনদের মধ্যে কদাচিৎ কারও ভাগ্যে লাভ হয়।"

পরিশেষে কালিদাসের মহাকাব্য "রঘুবংশম্" থেকে সহধর্ম্মিণী সম্বন্ধীয় সেই প্রখ্যাত শ্লোকটি উদ্ধৃত করছি। ইন্দুমতীর বিয়োগে অজের বিলাপ (৮-৪৫-৬৯) সংস্কৃত সাহিত্যে সহধর্ম্মিণীর সম্মাননীয় স্থান ও উচ্চ আদর্শের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই শ্লোকটি অজ-বিলাপেরই অন্তর্গত :

"গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা
হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্।" (৮-৬৭)

"তুমি আমার গৃহিণী, সচিব, সখী, ললিতকলায় প্রিয়শিষ্যা। নির্দ্দয় মৃত্যু তোমাকে অপহরণ করে, বল, আমার কি না হরণ করল?"

এরূপে সহধর্ম্মিণী একাধারে পতির গৃহিণী সচিব, সখী, প্রিয়শিষ্যা। বিখ্যাত টীকাকার মল্লিনাথ এর ব্যাখ্যা এরূপ করেছেন : সমগ্র পরিবার পত্নীর আশ্রিত—সেজন্য তিনি "গৃহিণী"। তিনিই পতির বুদ্ধিসহায় বা মন্ত্রী—অর্থাৎ, স্বামীকে হিতোপদেশ দানে তাঁর সমকক্ষ কেহ নয়—সেজন্য তিনি "সচিব"। অপর দিকে, তিনি পতির প্রিয়তমা নর্ম্মসহচারিণী, আনন্দদায়িনী—সেজন্য তিনি "সখী"। পরিশেষে, নৃত্যগীতাদি চৌষট্টি কলায় নৈপুণ্যের জন্য তিনি স্বামীর "প্রিয়শিষ্যা"।

সংস্কৃত-সাহিত্যে সর্ব্বত্রই পত্নী পতির প্রকৃত সহধর্ম্মিণী—তাঁর বুদ্ধি, বল, আনন্দ, সহায়, সম্পদ্। মানব-সভ্যতার প্রথম কমকায়মান শারদ-প্রভাতে পুণ্যশ্লোক আর্য্য ঋষিগণ সহধর্ম্মিণীর এই যে মহিমময় স্থানের কথা সগৌরবে, উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে গিয়েছেন, তাই যুগযুগান্ত ধরে পরবর্ত্তী সমগ্র সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

কলের বাঁশী

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

ধূসর আকাশ, স্বপ্ন-বিলীন দিনের চঞ্চলতা,
বিরল দুপুরে হাজার হাজার হাপরে শুষ্ক হাওয়া,
বাসা বাঁধিয়াছে শান্ত কুলায় নিষ্ফল কাতরতা
সেহাই মেলে নি, ক্ষণ-অবসরে তবু এ কি গান গাওয়া?

কলের বাঁশীতে একটানা সুর, জীবন মিলায়ে ওঠে,
দেউড়ী বন্ধ—ঢেউ-কাটা-কাটা বন্ধ হাজিরা বই,
রক্ত শুকায় তবু দুরাশায় ছায়ার পিছনে ছোটে,
খোয়া-ভাঙা পথে তপ্ত রৌদ্রে ফুটিছে প্রাণের খই।

চলল আবার ছোট বড় চাকা, চিম্নীতে কালো ধোঁয়া
মাটি হতে ওঠে বিকট গোঙানি; কলের পুতুল যারা
হাতল ঘুরায়, মেয়াদ ফুরায়—জীবনের ধন খোয়া
পলে পলে ক্ষয় কল ও কালের এই ত কাজের ধারা।

গদায় পায়ে ডোবে যে সূর্য্য সেই কি সকালে ছিল,
এই আকাশে কি সকাল-বেলার রাঙা হয়ে ছিল আশা?
ফ্যাকাশে আকাশ রক্তের ছোপে কে-ই বা রাঙায়ে দিল
সন্ধ্যার কোলে উঠেছে জাগিয়া রাত্রি সর্ব্বনাশা।
বাঁশের বাঁশীতে প্রভাতী সুরের স্বপ্ন দেখিয়া রাতে
কলের বাঁশীর আওয়াজে হঠাৎ ঘুম ভাঙে মেহনাতে।

বৃষ্টির দুপুর

শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার

এই সব বৃষ্টিক্লান্ত অফুরন্ত নির্জ্জন দুপুর,
নীড়ে থাকা ঝিরিঝিরি আর সব পাখীদের সুর···
পীতাভ সূর্য্যের আলো তার দেহে রয়েছে কি লেগে,
সমস্ত দিনের মতো কোনো এক গভীর আবেগে?
কালো তার ম্লান চোখ মেঘে মেঘে ভরেছে আকাশ,
ভারি বুক ঘেঁসে বুঝি উড়ে গেছে এক ঝাঁক হাঁস।
সে আকাশে কাল রাতে অন্ধকার পৃথিবীর মুখে
মিটোল হাতের মতো ঘুমটুকু রেখেছিল সুখে।

বিজন মাঠের পথে শুনি শুধু মেঘ-বর্ষা-গান···
সবুজ ঘাসের শীষে ছায়াম্লান প্রেমের আহ্বান।
হীরের প্রদীপ নিয়ে মনে হয়, কোনো বুঝি ফুল
দুপুরের মেঘে ভরা ক্লান্ত মন করেছে আকুল।
আমি সেই মন ছুঁয়ে সারাক্ষণ দেখেছি পৃথিবী···
ওগো মেঘ, তুমি তার খুলে আর দিও না গো নীবি।

রাজনগর

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

মহা [ধুমধামের সঙ্গে পঞ্চক্রোশীর জমিদার কালীনাথের কনিষ্ঠা কন্যা জগদ্ধাত্রীর সঙ্গে হরিনারায়ণের বিবাহ হইয়া গেল।

জগদ্ধাত্রী দেখিতে জগদ্ধাত্রী বটে। বয়স পনের বৎসর। তখনকার হিসাবে বয়স একটু বেশী হইয়াছিল। সকলের ছোট মেয়ে বলিয়া পিতামাতা যতটা সম্ভব বিলম্ব করিয়া পরের ঘরে পাঠাইবেন মনে করিয়াছিলেন। হয়ত আরও বিলম্ব করিতেন, কিন্তু গুরুদেব শ্যামানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের আগ্রহে বিবাহে মত দিতে হইল। বিদ্যারত্ন মহাশয় একটু বয়স্থা মেয়ে চাহিয়াছিলেন এবং রূপে গুণে জগদ্ধাত্রী ছিল তাঁহার মনোমত পাত্রী। ফুলের মত কোমল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অতি সুন্দর মুখের ছাঁদ, শিশিরে ধোয়া মল্লিকার মত রং। দোষের মধ্যে চিবুকের আর নাসিকার গড়নটা। চোখের চাহনিটাও এই সঙ্গে ধরা যায়। সবগুলিই ফুলের মালার মধ্যে লুক্কায়িত সূঁচের মত সূক্ষ্ম, ধারালো। দেখিতে জগদ্ধাত্রী ফুলের মালাই বটে, তবে সে মালা যে গলায় পরিবে তাহার একটু সতর্ক হওয়া আবশ্যক। বোধ হয়, এইজন্য তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিদ্যারত্ন মহাশয় তাহাকে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। জগদ্ধাত্রী বা হরিনারায়ণ সেকথা জানিত না।

প্রবাদ আছে, কয়েক পুরুষ আগে পঞ্চক্রোশীর জমিদার-বংশের পূর্ব্বপুরুষ ডাকাতির দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া কয়েকটি মৌজা ক্রয় করেন। কয়েক পুরুষ ধরিয়া জমিদারী করিবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ পৈতৃক ব্যবসায়ের অনুসরণ করিয়া তাঁহারা বিস্তৃত ভূসম্পত্তির মালিক হইয়া দাঁড়ান। পূর্ব্বপুরুষ শুধু জলে ব্যবসায় চালাইতেন, পরবর্ত্তীগণ জলে ও স্থলে ব্যবসা চালাইতে লাগিলেন।

এ অঞ্চলটার একদিকে বড় নদী, অন্য দিকে বড় বড় বিল। বড় নদী হইতে কয়েকটা ক্ষুদ্র শাখা বাহির হইয়া উত্তর-দক্ষিণে ঘুরিয়া ফিরিয়া, একটা আর একটায় পড়িয়া আবার বড় নদীতে ফিরিয়া আসিয়াছে, অথবা বিলের মধ্যে পড়িয়া হারাইয়া গিয়াছে। বড় বড় বিলের গোটা দুইয়ে এখনও গভীর জল থাকে। বাকী কয়েকটা ভরাট হইয়া আসিতেছে। জায়গায় জায়গায় কমবেশী জল বারো মাস থাকে, বাকীটাতে অগ্রহায়ণ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত জল থাকে না। বৈশাখ মাসে কালো এঁটেল মাটিতে লাঙল দিয়া চাষী ধানের বীজ ছড়াইয়া দেয়। দুই একটা বৃষ্টি পাইলে সে ধানের আর মার নাই। আষাঢ় মাসের প্রথমে বর্ষার জল আসিয়া নাবাল জমিতে পড়ে। জল যত বাড়ে; ধানের গাছ পাল্লা দিয়া তত বাড়ে। যত দূর চোখ যায়—সবুজ ধানের শীষ বাতাসে দুলিতেছে। সবুজ সমুদ্রের মধ্যে দূরে দূরে দুই একটা করিয়া চাষীদের গ্রাম। উঁচু জায়গা দেখিয়া মাটি ফেলিয়া আরও উঁচু করিয়া দশ পনের ঘর চাষী বাড়ী তৈরি করিয়াছে। বিলের মধ্যে এই কয়েকটি বাড়ী লইয়া এক একটি গ্রাম। মাটি কাটিয়া ঢালু করিয়া মহিষের গাড়ী উঠিবার পথ করা হইয়াছে—নীচু মাঠ হইতে দ্বীপের মত উঁচু গ্রামে উঠিবার জন্য।

কালো বিলান জমিতে সোনা ফলে। আঁচল ভরিয়া সে সোনা চোখের সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছেন বাংলার শস্য-লক্ষ্মী। ঢালু জায়গায় কয়েকগাছা কঞ্চি পুঁতিয়া ঝিঙেলতা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। লতা চোখে পড়ে না ঝিঙের ঠেলাঠেলিতে। রান্নাঘরের চাল চালকুমড়ায় ঢাকিয়া দিয়াছে। শুইবার ঘরের অত বড় চালায় বড় বড় নূতন লাল হাঁড়ির মত মিষ্টি কুমড়া ঝুলিতেছে। কলার গাছগুলি কাঁদির ভারে হেলিয়া পড়িয়াছে, বাঁশ বাঁধিয়া গাছ সোজা রাখা হইয়াছে। লাউয়ের মাচা হইতে কত যে লাউ ঝুলিতেছে গণিয়া শেষ করা যায় না। লঙ্কার ছোট ছোট গাছগুলি লাল দেখাইতেছে পাকা লঙ্কায়। বেগুন গাছের ডালগুলিতে কাটি পুঁতিয়া ঠেকা দিতে হইয়াছে, নহিলে বড় বড় বেগুনগুলি মাটিতে ঠেকিয়া নষ্ট হইবে। বেগুনের একটু বড় গাছগুলার দিকে চাহিলে কেবল সরু, লম্বা বেগুন ঝুলিতেছে দেখা যায়। এক খানা শুকনা গাছের ডালের সঙ্গে সীম গাছ তুলিয়া দিয়াছে। যে দিকে তাকাও, লম্বা শীষের মাথায় বেগুনি ফুল আর সীম, বাছিয়া তুলিলেও প্রতিদিন ধামাটি সীমে ভরিয়া যাইবে। ঢালু জায়গাটির মাথায় বোধ হয় একখানা কি দুইখানা আখের মাথা লাগাইয়াছিল। সেই আখের মাথা হইতে ঝাড় গজাইয়াছে ভরলা বাঁশের ঝাড়ের মত। পৌষ মাসে গ্রামের নীচে হাঁটা-পথের দুই ধারের মাঠ হাসিয়া উঠিবে সরিষা ফুলের বর্ণে ও গন্ধে। মাঘ মাসে মাঠভরা মটর ক্ষেত, খেসারি ক্ষেত বেগুনি ফুলে ভরিয়া উঠিবে, তার পর দেখা দিবে শুঁটি। গ্রাম হইতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আসিয়া মুঠা ভরিয়া শুঁটি তুলিবে। ক্ষেত হইতে গ্রামের দিকে চাহিলে দেখা যাইবে, শুধু একটা সবুজ দ্বীপ, আর সবুজের ঘোমটা সরাইয়া উঁকি দিতেছে সোনালী রঙের উঁচু খড়ের গাদা।

বড় নদীর একটা শাখা আঁকিয়া বাঁকিয়া মাইল ত্রিশ চল্লিশ পথ চলিয়া গজারির বিলে আসিয়া পড়িয়াছে। মাঝ পথে নদী পঞ্চক্রোশী গ্রামের গা ঘেঁষিয়া গিয়াছে। নদীর নাম কাউটিয়া, লোকের মুখে মুখে হইয়াছে কেউটিয়া। নামটা মানায় বটে নদীকে।

বর্ষায় মুখে হঠাৎ বড় নদীর জল বাড়িয়া উঠিলে কেউটিয়া ফুলিয়া উঠিয়া সেই জলের খানিকটা ঢালিয়া দেয় গজারির বিলে। গজারির বিল ভরাট বিলগুলির ঠিক উত্তরে মাইল দশেক জায়গা জুড়িয়া ঘুমাইয়া থাকে বারো মাস। কেবল জোর বাতাস উঠিলে গোটা বিল পাগলের মত নাচিতে আরম্ভ করে। মাঝবিলে সেই নাচনের মুখে পড়িলে বড় বড় পান্সী নৌকাগুলির পর্য্যন্ত যায় যায় অবস্থা হয়।

কেউটিয়া জল ঢালিতে আরম্ভ করিলে গজারি সেই জল রাখিবার জায়গা পায় না। তখন সর্ব্বনেশে ঢল নামে। বিলের দক্ষিণ দিকের জমি অন্ত দিকের চাইতে নীচু। একটা অগভীর, হাত কয়েক চওড়া খাল সেই নীচু জমির মধ্য দিয়া দক্ষিণ দিকে চলিয়া গিয়াছে আটকিয়ার মাঠে। গজারি বিলের দক্ষিণে যে ভরাট বিলে চাষ ও বসতি হইয়াছে তাহার নাম আটকিয়ার মাঠ। খালের মুখ তিন প্রস্ত গোটা বাঁশের বেড়া দিয়া মাটি ফেলিয়া বন্ধ করা থাকে। আষাঢ় মাসে এই বেড়ার খানিকটা কাটিয়া দিয়া আটকিয়ার মাঠে বিলের জল আনিবার পথ করিয়া দেওয়া হয়। গজারি বিল ভাসিলে জল খালের মধ্য দিয়া ছুটিতে থাকে। বাঁধ ভাঙ্গিয়া হুড়হুড় করিয়া আটকিয়ার মাঠে নামে। চারদিকে রব উঠে, ঢল নামিয়াছে, গেল, সব গেল। ছেলে, জোয়ান, বুড়ো চাষীরা দৌড়ায় কোদাল কাঁধে। নূতন বাঁশের বেড়া দিয়া, মাটি ফেলিয়া জল আটকাইবার চেষ্টা করে। যদি ঠেকাইতে পারে ত ভাল, নহিলে ঢল নামিয়া মাঠের পর মাঠের কচি ধানের চারা ডুবাইয়া দেয়। পাঁচ সাত দিন জলের নীচে থাকিলে সব চারা পচিয়া যায়। সে বছরের মত আমন ধান গেল। স্ত্রী-পুত্রের মুখে দিবার জন্ত এক কাঠা ধানও ঘরে আসে না। চাষীরা বলে কেউটিয়ার ছোবলে বিলান মাটি কাঁদে, মুলুকে আকাল পড়ে।

গজারি বিলের উত্তরে খিয়ের আরম্ভ হইয়াছে। শক্ত, এঁটেল মাটি, রঙে ঈষৎ গেরুয়ার আভা, কোন কোন জায়গায়, বেশীর ভাগ পাঙাশ রঙ। আরও উত্তরে মাটির রং হইয়াছে লাল। শক্ত, নীরস মাটি, নেড়া নেড়া ভাব। ভাল করিয়া ঘাস পর্য্যন্ত জন্মায় না। লিকলিকে ঘাস, সরু সরু লতা মাঠের বুকে নেতাইয়া থাকে। মাঝে মাঝে আলোকলতার সোনালী টোপর পরিয়া দুই চারিটা কুলগাছ। এখানে ওখানে বড় বড় তালগাছের নীচে আগাছার পাৎলা ঝোপঝাড় দেখা যায়। নেড়া মাঠের মধ্যে দূরে হয়ত একটা বটগাছ, মোটা মোটা ঝুরি নামিয়াছে। বটগাছের ডালের মধ্যে পাতার সবুজ রঙের সঙ্গে মিশিয়া টিয়া পাখী আর হরিয়ালের ঝাঁক রৌদ্রের তাপ এড়াইয়া বিশ্রাম করে, কিচির মিচির করিয়া ঝগড়া করে। রৌদ্র পড়িয়া আসিলে তাহারা কলরব তুলিয়া উড়িয়া পালায়।

এই পাঙাশ রঙের শুকনা, নেড়া খিয়ের অকল রোপা ধানের দেশ। বিলান জমির ধানে হয় লাল বরণের চাল। খিয়েরের সেই রোপা ধানে সুগন্ধ সরু কাটারিভোগ, বাসপতি চাল হয়। সময়ে বৃষ্টি পাইলে ধান এত বেশী হয় যে, চাষী তাহা ঘরে রাখিবার জায়গা না পাইয়া বেচিয়া দেয়। সেই ধান বোঝাই করিয়া বড় বড় নৌকা গজারি বিল পার হইয়া কেউটিয়া নদী বাহিয়া বড় নদীতে পড়ে। কেউটিয়া নদী খিয়ের আর বিলান দেশের মধ্যে যাতায়াতের সোজা পথ। বিলের মাথা আর বড় নদীর মাথা, দুই মাথায় দুই বড় গঞ্জ। ছোটখাটো গঞ্জও কতকগুলি আছে কেউটিয়ার দুই তীরে।

বড় নদী হইতে বাহির হইয়া সাপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া কেউটিয়া গজারি বিলে পড়িয়াছে। সর্পিল গতিতে কেউটিয়ার জলে চলিত পঞ্চক্রোশীর ডাকাত বাবুদের সাপের মত লিকলিকে, কালো চকচকে ছিপনৌকা। শিকার দেখিতে পাইলে কেউটিয়ার এক বাঁক হইতে অন্ত বাঁকে ক্ষিপ্র গতিতে অগ্রসর হইত বিশদাঁড়ে ছিপনৌকা। ধান কেনা-বেচার সময় আসিলে বড় বড় বেপারীর নৌকা বড় নদী হইতে কেউটিয়ার পড়িয়া গজারি বিলের মুখে চলিত। আটখানা দশখানা নৌকা সার বাঁধিয়া চলিত ডাকাতের ভয়ে। এই রকম সারি সারি নৌকা টাকা লইয়া ধান কিনিবার জন্ত খিয়ের দেশে যাইত। গজারি বিলে পাঁচ সাতখানা ছিপ নৌকা টহল দিয়া ফিরিত তাহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্ত। বড় নদীর মাথায় গঞ্জের ঘাটে যাত্রী বোঝাই ভুয়া গহনার নৌকা শিকারের খোঁজে আনাগোনা করিত। ভাউলি, পিনাস, বড় লোকের বজরা দেখিলে তাহাদের পাশে পাশে চলিত খবর লইবার জন্ত। সুখবর হইলে তাহাদের পিছু লইত।

প্রতি বৎসর ধানের মরশুমে, পাটের মরশুমে বিশ পঁচিশ খানা বেপারীর নৌকা মারা পড়িত গজারি বিলে আর বড় নদীতে। কয়েক বছর নৌকা মারা পড়িবার পরে বেপারীরা চালাক হইয়া গেল। গঞ্জের আড়তদারদের পরামর্শে কেউটিয়ায় পড়িয়া তাহারা মাস্তলের সঙ্গে নিশান বাঁধিয়া দিত। তারপর পঞ্চক্রোশীর ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া বাবুদের জয়কালী মন্দিরে বেশ মোটা প্রণামী পাঠাইয়া দিত। গঞ্জের আড়তদার, দোকানদার সকলকেই জয়কালীর বাড়ীতে প্রণামী দিতে হইত নিয়মিত ভাবে।

আগে সোয়ারি নৌকায় ডাকাতি হইত কেউটিয়ার বুকে। সহজে মাল পাইলে কাহাকেও প্রাণে মারিবার হুকুম ছিল না। একবার পঞ্চক্রোশীর জয়কালীর ঘাটের মাইল তিনেক আগে বর্ষার রাত্রে এক সোয়ারী নৌকা আটক হয়। একজন বাবু আর কয়েকজন লোক ছিল নৌকায়। মালপত্র বিশেষ কিছুই ছিল না। তবু একগুঁয়েমি করিয়া লোকজন লইয়া লাঠি সড়কি চালাইয়া বাবুটি জনকয়েক ডাকাতকে ঘায়েল

করিলেন। তারপর নিজে মাথায় লাঠির ঘা খাইয়া অজ্ঞান হইয়া নদীর মধ্যে পড়িয়া গেলেন। মাঝিরা জলে ঝাঁপ দিয়া অন্ধকারে পলাইল, জনতিনেক লোকও পলায়ন করিল, বাকীগুলি মরিল। নৌকায় ঢুকিয়া ডাকাতেরা একটা বাক্স পাইল। বাক্স তুলিয়া লইয়া নৌকা ডুবাইয়া দিয়া তাহারা চলিয়া গেল। বাক্স মালখানায় জমা হইলে খুলিয়া পাওয়া গেল কয়েকখানা দামী শাড়ী, এক ছড়া সোনার মটরমালা, আর একটা মুক্তার নোলক। ইহা ছাড়া ধুতি চাদরও ছিল। সকালবেলা জয়কালীর ঘাটে একটা মড়া ভাসিয়া উঠিল। অল্প বয়সের যুবকের লাস। তখনও পচে নাই, একটু ফুলিয়া উঠিয়াছে। লোকে মড়া দেখিতে ঘাটে আসিল। কেমন করিয়া খবর রটিল মৃত লোকটি মেজ কর্তার ছোট জামাতার মত দেখিতে। গুজব শুনিয়া মেজ কর্তার হঠাৎ মনে পড়িল, তাই ত, কাল জামাইয়ের আসিবার কথা ছিল। অন্দরে গুজব পৌছিতে ছোট মেয়ে দৌড়াইয়া পিতার কাছে আসিল। ঘাটে লোক ছুটিল নদী হইতে লাস উঠাইবার জন্য। পাল্কী করিয়া ঘাটে পৌছিয়া ছোট মেয়ে তাড়াতাড়ি লাস দেখিতে গেল। লাসের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া মেজ কর্তার ছোট মেয়ে অজ্ঞান হইয়া গেল। মালখানায় জমা দেওয়া বাক্সের মধ্যে শাড়ী, মটরমালা ও মুক্তার নোলক পড়িয়া রহিল।

সেই হইতে কেষ্টিয়া নদীতে সোয়ারী নৌকা ধরা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যে জায়গায় ডাকাতেরা জামাইয়ের নৌকা আটকাইয়া তাহাকে খুন করিয়াছিল সে জায়গার নাম হইয়াছে জামাইমারীর ঘাট।

পঞ্চক্রোশীর ডাকাতবাবুদের মধ্যে দেশময় নাম রটিয়াছিল কালীনাথের পিতা বৈকুণ্ঠনাথের। কিন্তু সে খ্যাতি হইয়াছিল অন্য কারণে।

বৈকুণ্ঠনাথের অনেক আগেই পঞ্চক্রোশীর বাবুরা ডাকাতি ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে বেয়াদব কাঁয়াদের পাট বোঝাই, ধান বোঝাই, নারিকেল বোঝাই নৌকা ধরিয়া জরিমানা আদায় করিতেন, জরিমানা না দিলে নৌকা ডুবাইয়া দিতেন ; কিন্তু ডাকাতি বন্ধ হইয়াছিল। তখন তাঁহারা বিরাট ভূসম্পত্তির মালিক, প্রজাবৎসল, দুষ্টের শাসক, দুর্ব্বলের রক্ষক জমিদার। আগে নিজেরা ডাকাতি করিতেন, এখন তাঁহাদের ভয়ে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, ডাকাত চোর ঠ্যাঙাড়ে ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দিয়াছে পঞ্চক্রোশীর এলাকায়, আশেপাশের অঞ্চলে। লোকের মুখে তাঁহাদের দোর্দণ্ড প্রতাপের খ্যাতি বহুদূর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

বৈকুণ্ঠনাথের বিবাহের সময়ের একটা গল্প এখনও লোকে বলাবলি করে।

পঞ্চক্রোশী হইতে মাইল পচিশ দূরে বড় নদীর একটি শাখা বরাকী নদীর তীরে সিমুলিয়া গ্রামের জমিদার-পরিবারে বৈকুণ্ঠনাথ বিবাহ করিয়াছিলেন। সিমুলিয়ার বাবুরা কুলে বড়, আগে সিমুলিয়ার রাজা বলিয়া তাঁহারা পরিচিত ছিলেন, অবস্থা এখন পড়িয়া আসিয়াছে, কিন্তু কুল ও খানদানীর গর্ব্ব আগের মতই আছে। পাগড়ী বাঁধিয়া জোব্বা পরিয়া তাঁহাদের বাড়ীর ছেলেরা বিবাহ করিতে যাইত। সিমুলেশ্বরী কালীমন্দিরের সিঁড়ির কাছে সাবেক আমলের দুইটা কামান মাটিতে পোঁতা আছে। এই কামান লইয়া সিমুলিয়ার রাজা নাকি মোগলদের ফৌজদারের সঙ্গে লড়িয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠনাথ বজরা চড়িয়া বিবাহ করিতে গিয়াছেন। বজরা টানিবার জন্য দুইখানা কোশা আর পাহারা দিবার জন্য চারখানা ছিপনৌকা সঙ্গে। মহা ঘটার বিবাহ। কালো, দেখিতে শাল গাছের মত ঋজু দীর্ঘকায় বৈকুণ্ঠনাথ যখন বেনারসী জোড় পরিয়া বজরা হইতে পাল্কী চড়িয়া আসিয়া বিবাহ-সভায় নামিলেন তখন পাগড়ি ও জোব্বায় খানদানীতে অভ্যস্ত সিমুলিয়ার ছোকরাবাবুরা বরের বেশভূষা দেখিয়া হাস্য করিলেন। বরের কালো রঙ ও ষণ্ডামার্ক চেহারার কথা অন্দরে পৌছিল। শুনিয়া কন্যার জ্যেঠাইমা, খুড়ীমা, মাসীমা নাক সিটকাইলেন। মোমের পুতুলের মত সাদা, লাল বেনারসী, হীরা মুক্তা চন্দনে সাজানো মেয়ের দিকে চাহিয়া মেয়ের মা মুখ ফিরাইয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, মেয়ের যেমন তপস্যা তেমনি ইন্দ্রের মত স্বামী হয়েছে। তোমরা ওকে আশীর্ব্বাদ কর।

বিবাহ প্রায় শেষ হইয়াছে, হঠাৎ সভার এক কোণে হাসির রোল উঠিল। হাসির তরঙ্গ ছোটদের দল হইতে বড়দের দলে আসিয়া পৌছিল। তাঁহারা চুপ চুপ শব্দ করিয়া হাসি থামাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কি লইয়া হাসি কেহ বলে না অথচ সভায় হাসি সংক্রামক হইয়া উঠিল। হঠাৎ পঞ্চক্রোশীর ছোট পুরোহিত ব্রজদুলাল চক্রবর্ত্তী উত্তেজিত ভাবে আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, চিৎকার করিয়া বলিলেন, পঞ্চক্রোশীর প্রাতঃস্মরণীয় হরিনাথের বংশকে সিমুলিয়ার যে পাপিষ্ঠেরা ডাকাতের বংশ বলিয়া উপহাস করে তাহাদের গৃহে জল গ্রহণ করিলে আমার যেন চণ্ডালকুলে জন্ম হয়। তিনি বিবাহ-মণ্ডপ ত্যাগ করিয়া নদীর ঘাটের পথে পা বাড়াইলেন। কন্যার এক অল্পবয়স্ক খুল্লতাত খপ করিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, যাও কোথায় ঠাকুর বিয়ের কাজ শেষ না হতে ? চাল কলার আবার এত রাগ ?—ব্রজদুলাল হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াও পারিলেন না। খুল্লতাত মহাশয় তাঁহাকে আসনের দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, ঠাকুর, সিমুলিয়ায় এসেছ মনে থাকে যেন। পঞ্চক্রোশী গিয়ে রাগ দেখিও।

অপমানিত ব্রজদুলাল আসনের কাছে দাঁড়াইয়া ক্রোধে

ফুলিতে লাগিলেন। বরকর্তা কয়েকজন আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সম্প্রদান হইয়া গেল। বর-কন্যাকে বাসরে উঠাইবার জন্য এয়োরা আসিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পঞ্চক্রোশীর নাপিত শ্রীনিবাসকে ডাকিয়া কি বলিয়া দিলেন, সে নদীর ঘাটের দিকে চলিয়া গেল। এয়োদের একজন আসিয়া কনের হাত ধরিলেন, অন্দরে কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য। বৈকুণ্ঠনাথ একটু হাসিয়া বলিলেন, ওঁকে নিয়ে যাবেন না, এখনই ওঁকে পঞ্চক্রোশী রওনা হতে হবে কিনা।

সভায় যেন বাজ পড়িল। বৈকুণ্ঠনাথের শ্বশুর সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। বৃদ্ধ জ্যেঠ-শ্বশুর অত্যন্ত কোপন স্বভাবের লোক। ভ্রাতার ব্যাকুল দৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া তিনি বৈকুণ্ঠনাথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, বাবাজী বোধ হয় ভুলে গিয়েছ যে শিমুলিয়ার রাজবাড়ীতে বিবাহ করতে এসেছ? বৈকুণ্ঠনাথ জোড়হস্তে বলিলেন, আজ্ঞে না, ভুলি নাই।

সভায় একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। লাঠি, তরবারি, সড়কি হাতে কতকগুলি লোক আসিয়া ঘাটে যাইবার পথ আটকাইয়া দাঁড়াইল। বৈকুণ্ঠনাথের শ্বশুর অস্থির হইয়া উঠিলেন, বুঝিলেন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার এই কাণ্ড। সে লোকগুলির পিছনে দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে ডাকিয়া তিনি ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মনে হইল, ব্যবস্থা দেখিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, যাও বাবাজী, অন্দরে যাও। কাল কুশণ্ডিকা হয়ে যাক, মাকে নিয়ে পঞ্চক্রোশী যেও কেউ বাধা দেবে না।

বৈকুণ্ঠনাথ শুনিয়া একটু হাসিলেন। এয়োদের দিকে ফিরিয়া করজোড়ে বলিলেন, "আপনারা ভেতরে যান, এখানে আর দাঁড়াবেন না।" কনে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল। তাহাকে মৃদু স্বরে বলিলেন, তুমি আমার সঙ্গে এসো বজরায়। বৈকুণ্ঠনাথ অগ্রসর হইলেন। পাঁচহাতার টান পড়িতে কনে তাঁহার পিছনে পিছনে চলিল।

সশস্ত্র বরকন্দাজের দল হতভম্ব হইয়া পিছনে হটিতে লাগিল। পঞ্চক্রোশীর দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত-জমিদারের পথরোধ করিয়া লাঠি হাতে দাঁড়াইবার সাহস তাহাদের ছিল না। খুল্লতাত রুখিয়া আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন, হাতে গুলিঠাসা বন্দুক। বৈকুণ্ঠনাথের শ্বশুর আসিয়া তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। কনে ঘোমটার মধ্য হইতে কাকার হাতের বন্দুক স্বামীর দিকে ফিরান দেখিয়া ভয়ে কাঁদিতে লাগিল। বৈকুণ্ঠনাথ বুঝিতে পারিলেন সে কাঁদিতেছে। তিনি দাঁড়াইলেন। কঠোর স্বরে খুল্লতাতকে বলিলেন, বন্দুক ফেলে দিন্। ডাইঝিকে ভয় দেখাতে বন্দুক এনেছেন? হাত পা বেঁধে পঞ্চক্রোশী নিয়ে গিয়ে যাস খাওয়াব আপনাকে।

খুল্লতাত জামাতা বাবাজীর গলার স্বর শুনিয়া চমকাইয়া উঠিলেন, কিন্তু বন্দুক ছাড়িলেন না। নদীর ঘাটের দিক হইতে হঠাৎ ডাকাতের শিগির শুনিয়া বিবাহসভায় সমবেত সকলে আতঙ্কে যে যেদিকে পারে ছুটিতে আরম্ভ করিল। ডাকাত পড়িয়াছে শিমুলিয়ার রাজবাড়ীতে। যাহারা অন্দরের দিকে পলাইয়াছিল তাহারা ছাড়া বিবাহ-সভার আর সবাই চারখানা ছিপের দুই শত লাঠিয়ালের বেড়াজালে আটক হইল। রাজবাড়ীর জন পঁচিশেক বরকন্দাজ দুই-একবার লাঠি ঠোকাঠুকি করিয়া হাল ছাড়িয়া দিল। ছিপের লাঠিয়ালরা তাহাদের বাঁধিয়া ফেলিল।

বৈকুণ্ঠনাথ বিবাহ-সভায় ফিরিয়া আসিলেন। শ্বশুরের পায়ে হাত দিয়া বলিলেন, এরপর যা হবে তার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। কারও কোন ক্ষতি হবে না। আপনি একটু সরে যান।

ম্লান মুখে তিনি অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন। অন্দরে তখন ভয়ার্ত চিৎকার, কান্নাকাটি আরম্ভ হইয়াছে, সান্ত্বনা দেওয়া প্রয়োজন।

পাত্রীপক্ষের পুরোহিত, নাপিত, কন্যার বৃদ্ধ জ্যেঠতাত ও খুল্লতাত, গ্রামের প্রাচীন ভদ্রলোক জনকতক, বাড়ীর কয়েকজন জামাতা ও অন্য আত্মীয়-কুটুম্ব লইয়া পঁচিশ-ত্রিশ জন লোককে লাঠিয়ালরা বজরায় উঠাইল। খুল্লতাতের দুই হাত দুই পা বাঁধিয়া কাঁধে করিয়া বজরায় তোলা হইল দেখিয়া পুরোহিত ব্রজদুলালের চিত্ত প্রফুল্ল হইল। শ্রীনিবাসের সঙ্গে কি পরামর্শ করিয়া দুই জন অন্দরে গেলেন এবং বৈকুণ্ঠনাথের শ্বশুরের সঙ্গে কথা বলিয়া দুই জন ঝি ও তাঁহার দশ-বার বছরের ছোট ছেলেকে সঙ্গে লইয়া আসিল। বৈকুণ্ঠনাথ এ পরামর্শের কথা জানিতেন না। বজরার যে কামরায় কনে বসিয়া কাঁদিতেছিল, তিনি একটু হাসিয়া সেখানে আগন্তুকদের লইয়া গেলেন। বধূকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এই দেখ কারা এসেছে। এবার কান্না বন্ধ হবে ত? ঘোমটার ফাঁকে ভাইকে দেখিয়া, ঝিদের দেখিয়া কনের কান্না বন্ধ হইয়া গেল।

পঞ্চক্রোশীতে কুশণ্ডিকা শেষ হইলে বৌভাতের ভোজ খাওয়াইয়া জনে জনে মূল্যবান প্রণামী, আশীর্ব্বাদী দিয়া বৈকুণ্ঠনাথ নিজের বজরায় সবাইকে শিমুলিয়ায় পাঠাইয়া দিলেন। ভোজের আসরে খুল্লতাতের রূপার থালায় কয়েক-গাছা দূর্ব্বাঘাস দেওয়া হইয়াছিল। অবশ্য সেগুলি তাঁহাকে খাইতে বলে নাই কেহ। জ্যেঠ-শ্বশুরের পায়ে হাত দিয়া বৈকুণ্ঠনাথ বিদায়কালে মার্জ্জনা চাহিলেন।

যে ঘটনায় বৈকুণ্ঠনাথের নাম দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহা ঘটিয়াছিল ইহার অনেক দিন পরে। বৈকুণ্ঠনাথ তখন প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইয়াছেন। ইংরেজ তখনও সিপাহী বিদ্রোহের আগুন নিবাইতে ব্যস্ত—এমন সময় কুখ্যাত নীলকর

সাহেবদের দীর্ঘ দিনের অত্যাচারে জর্জরিত বাঙালী চাষী বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। বহুদিন হইতে উদ্ধত নীলকর সাহেবদের সঙ্গে বৈকুণ্ঠনাথের রেষারেষি চলিতেছিল। নিজ নিজ জমি হইতে উদ্বাস্তু প্রজারা দলে দলে আসিয়া তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করিল। বৃদ্ধবয়সে বৈকুণ্ঠনাথ আবার তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য লাঠি ধরিলেন। হাটুরিয়া ও ইসলামপাতি পরগণার একুশটি নীলকুঠি এক রাত্রের মধ্যে লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইল পঞ্চক্রোশীর লাঠিয়ালদের হাতে। জঙ্গলে ঢাকা, ভাঙা কয়েকটা নীলকুঠি এখনও লোকে দেখাইয়া দেয় বৈকুণ্ঠনাথের কীর্ত্তিচিহ্নরূপে।

এই বৈকুণ্ঠনাথের প্রপৌত্রী জগদ্ধাত্রী আসিল রাজনগরের মধ্যম তরফের গৃহলক্ষ্মী হইয়া।

২

পঞ্চক্রোশীর নীলকর সাহেব-পিটানো জমিদার বৈকুণ্ঠনাথের প্রপৌত্রী জগদ্ধাত্রী বৌ হইয়া হরিনারায়ণের গৃহে আসিল। বৌয়ের রূপ দেখিয়া রাজনগরের লোক সুখ্যাতি করিল।

বিবাহের উৎসব মিটিয়া গেলে পঞ্চক্রোশী হইতে ছোটখাটো একটি বাহিনী লইয়া বৌয়ের ভাই আসিল ভগ্নী ও ভগ্নীপতিকে লইয়া যাইবার জন্য। বিভারত্ন মহাশয় জগদ্ধাত্রী ও তাহার ভ্রাতাকে একান্তে ডাকিয়া হরিনারায়ণের সাংসারিক অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত বলিলেন। জগদ্ধাত্রীকে বলিলেন, দু'চার দিনের জন্য ঘুরে এস মা, তার বেশী তোমার বাপের বাড়ী থাকা চলবে না, হরিনারায়ণের লেখাপড়ার দিকে বড় ঝোঁক, পিতার অকাল মৃত্যুতে ও বৈষয়িক বিভ্রাটে বাধ্য হয়ে পড়াশুনো ছাড়তে হয়েছে বলে সে দুঃখিত। বিষয়-কর্ম্মে মন বসাতে পারছে না, বিষয়-কর্ম্মের বিশেষ কিছু সে জানেও না। বর্দ্ধমান শহরে মাতুলালয়ে মানুষ হয়েছে। বিষয়-কর্ম্মে যাতে সে মন দেয় সেটা তোমাকে দেখতে হবে।

তিনি থামিয়া জগদ্ধাত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন, এই কাজের ভার তোমাকে নিতে হবে মা। কাশীনাথের কাছে শুনেছি বৈষয়িক কর্ম্মে তোমার মতি আছে। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার হাতে এই সংসারের শ্রী আবার যেন ফিরে আসে।

জগদ্ধাত্রী গলবস্ত্র হইয়া বিভারত্ন মহাশয়কে প্রণাম করিল। মুখে কোন কথা না বলিলেও সে যে এই কাজের ভার লইবার স্বীকৃতি জানাইল বিভারত্ন মহাশয় তাহাতে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন।

জগদ্ধাত্রী বুদ্ধিমতী, রাশভারীপ্রকৃতির মেয়ে। বিবাহের পরেই শাশুড়ীহীন সংসারের কর্ত্রী হইয়া বিশেষ বিব্রত বোধ করিল না। তাহার যেটুকু বিব্রতভাব তাহা নিজের প্রায় সমবয়স্ক স্বামীকে লইয়া। সে বুঝিল এখনকার এই উদাসতার মাঝখানেই স্বামীকে কাজের মধ্যে আটকাইতে হইবে।

স্বামী-স্ত্রীর আলাপের মধ্যে ঘন ঘন বিষয়-সম্পত্তির কথা আসিয়া পড়িতে লাগিল। হরিনারায়ণ বিরক্ত হইলেও তাহার অনভিজ্ঞতার কথা গোপন করিতে পারিল না। নিজের বিষয়-সম্পত্তির কথা নিজে কিছু জানে না, আমলা গোমস্তারা যাহা ইচ্ছা করে ইহা লইয়া জগদ্ধাত্রী খুব হাসিল। হরিনারায়ণ লজ্জা পাইল। স্ত্রীলোক বিষয়-সম্পত্তির কি বুঝে এই বলিয়া সে ধমক দিল। জগদ্ধাত্রী হাসিয়া তাহার ধমকানি উড়াইয়া দিল। বলিল, নায়েব মশাইকে কাগজপত্র নিয়ে কাল অন্দরে আসতে বলো। তোমার সামনে আমি তাঁকে গুটিকতক প্রশ্ন করব। বুঝি কিনা তখন দেখবে।

হরিনারায়ণ ভাবিল, স্ত্রীর এই অহঙ্কার চূর্ণ করিতে হইবে। সে যে যথেষ্ট মাথা ঘামাইয়া এইভাবে অগ্রসর হইতেছে হরিনারায়ণ তাহা বুঝিতে পারিল না।

পরদিন বৃদ্ধ নায়েব রীতিমত বিস্মিতভাবে অন্দরে আসিল। কি কাগজপত্র আনিবে জানা না থাকায় সঙ্গে করিয়া আনিতে পারিল না। হরিনারায়ণ নির্ব্বাক শ্রোতা হইয়া জগদ্ধাত্রী ও নায়েবের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল। কর্ত্রী প্রশ্ন করিতে লাগিলেন আর তার জবাব দিবার জন্য খাতার পর খাতা আনিতে নায়েবকে বার বার কাছারিতে ছুটিতে হইল। ঘণ্টা তিনেক এইভাবে প্রশ্ন করিয়া জগদ্ধাত্রী প্রাথমিক তথ্যাদি সংগ্রহপূর্ব্বক পরদিন কাগজপত্রসহ তৈয়ারী হইয়া আসিবার আদেশ দিয়া নায়েবকে বিদায় দিল—হরিনারায়ণ ব্যাপার দেখিয়া অবাক।

এইভাবে কয়েক দিন চলিল। নায়েব গোমস্তার মুখে মুখে রাজনগরে রটিয়া গেল, মধ্যম তরফের নূতন বৌ জমিদারী কর্ম্মে ঘুঘুবিশেষ, বয়স কম ও মেয়েছেলে হইলে কি হয়। কেহ কেহ বলিল, পঞ্চক্রোশীর ডাকাতগোষ্ঠীর মেয়ে, ইহার পরে সে শ্বশুর রুদ্রনারায়ণের মত লাঠি ধরিবে। শুনিয়া কেহ আবার মন্তব্য করিল, ম'তরফের বুড়া লোচন কর্ত্তা যাহা গ্রাস করিয়াছেন তাহা এবার তাহাকে উদ্গীরণ করিতে হইবে। কিন্তু উদ্গীরণ করিবার ডাক আসিবার আগেই তাঁহার কাছে অন্য জগতের ডাক আসিল। মাস দুই এইভাবে চলিবার পর সম্পত্তির প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জগদ্ধাত্রী ও হরিনারায়ণ কিছু জ্ঞানলাভ করিল। জগদ্ধাত্রী জমিদারীর কাজকর্ম্ম জানা কয়েকজন লোককে পঞ্চক্রোশী হইতে পাঠাইবার জন্য পিতাকে লিখিল।

হরিনারায়ণ বুঝিতে পারিল, তাহার স্ত্রী প্রচুর বুদ্ধি রাখে এবং বৈষয়িক ব্যাপার তাহার চাইতে ভাল বুঝে। অপ্রত্যাশিত ভাবে এক দিন সে প্রস্তাব করিয়া বসিল, জগদ্ধাত্রী বাড়ীতে থাকুক সে শহরে গিয়া পড়াশুনা করিবে। স্ত্রীর কাছে সম্পূর্ণ

ভাবে নিজের মনের কথাটি প্রকাশ করিয়া সে বলিল, বিষয়-সম্পত্তির কাজ তাহার ভাল লাগে না, সে তাহার মাতুলদের মত বিদ্যা অর্জন করিতে চাহে। জগদ্ধাত্রী দেখিল স্বামী করুণভাবে অনুমতির প্রত্যাশায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। তাহার চোখে জল আসিল।

বাড়ীসুদ্ধ লোক যে জগদ্ধাত্রীকে ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল হরিনারায়ণের তাহা অজানা ছিল না। নায়েব, গোমস্তা, মুহুরী, তহশীলদার, বরকন্দাজ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহাদের রামরাজত্বে বাস ঘুচিল, এবার তাহারা শক্ত পাল্লায় পড়িয়াছে। এক ফোঁটা মেয়ে হইলে কি হয় জগদ্ধাত্রীর সামনে যাইবার সময় নায়েবমশাই হইতে সুরু করিয়া প্রত্যেকটি লোকের বুক ধুক-পুক করে, মুখ শুকাইয়া আসে। রুদ্রনারায়ণের আমল হইতে দূর ও নিকট সম্পর্কের যে সকল পোয়ের ঝাঁক এ বাড়ীতে স্থায়ী আস্তানা গাড়িয়া লুটিয়া পুটিয়া খাইতেছিল, এখন তাহারা কুৎসা, বিদ্রূপ ও অবাধ্যতার সাহায্যে জগদ্ধাত্রীর বিরুদ্ধাচরণ সুরু করিয়া দিল। কড়া শাসনের ফলে সে ঝাঁক পাৎলা হইতে লাগিল। রুদ্রনারায়ণের মত দুর্দ্দান্ত পিতার পুত্র হইয়া হরিনারায়ণ সুন্দরী বৌয়ের হাতে ভেড়া বনিয়াছে, ন্যায় বিচার করিবার লোক বাড়ীতে কেহ কি আছে যে দুঃখের কথা শুনিবে?

কাছারি-বাড়ী ও সংসারের সকলের ভয়ের পাত্রী জগদ্ধাত্রীর চোখে জল দেখিয়া হরিনারায়ণ বিস্মিত হইল। কিসে কি হইল সে বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারিল না।

চোখের জল মুছিয়া জগদ্ধাত্রী বলিল, আমাকে ফেলে রেখে যদি তুমি বাড়ী ছেড়ে যাবে তবে আমাকে আনলে কেন?

বিব্রত হইয়া হরিনারায়ণ বলিল, আমি কি তাই বলেছি? আমি শুধু মনের কথা তোমাকে বলেছি, যাব বলি নি ত। মনের কথা যদি তোমাকে না বলি ত আর কার কাছে বলব?

জগদ্ধাত্রীর মুখে হাসি ফুটিল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তখন পরামর্শ আরম্ভ হইল।

জগদ্ধাত্রী বুঝিয়াছিল বাধ্য হইয়া পড়াশুনা ছাড়িতে হইয়াছে এজন্য স্বামীর মনে ক্ষোভ রহিয়াছে। তাহার যে মাতুলগোষ্ঠী বিদ্যাচর্চ্চায় এত অগ্রসর তাঁহাদের মধ্যে মানুষ হইয়া এই ক্ষোভ থাকা অসঙ্গত নহে। সে মনে মনে স্থির করিল স্বামীর ক্ষোভ দূর করিবার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা করিবে।

শীঘ্রই সম্পত্তির কাগজপত্র পরীক্ষা ও সকল মহালে সরেজমিন তদন্ত করিবার জন্য পঞ্চক্রোশী হইতে কাজ-জানা পাকা আমিন, জমানবীশ, হিসাবনবীশ প্রভৃতি আসিয়া পৌঁছিল। হরিনারায়ণ সম্পত্তির ভার লইবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন উকিল নিযুক্ত হইল মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য। স্ত্রীর অনুরোধে হরিনারায়ণ কিছু কিছু কাজকর্ম্ম দেখিতে আরম্ভ করিল।

পঞ্চক্রোশী হইতে প্রসিদ্ধ গায়ক ও বাদক শ্যামলাল ধামাধি আসিলেন রাজনগরে হরিনারায়ণকে তানপুরা ও সেতার বাজনা শিখাইতে। সকালে ও সন্ধ্যায় হরিনারায়ণ তাঁহার কাছে বৈঠকখানায় বসিত।

স্ত্রীর উৎসাহে শিকারের নেশা নূতন করিয়া আবার হরিনারায়ণকে পাইয়া বসিল। দুইটি নূতন ঘোড়া আস্তাবলে আসিল তাহার জন্য।

—

হরিনারায়ণের বিবাহের বছর দুই পরে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অনেক দিনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। জগদ্ধাত্রী তাঁহাকে পৌরোহিত্য হইতে অব্যাহতি দিয়া অন্য পুরোহিত নিযুক্ত করিল। হরিনারায়ণ তাঁহার নূতন টোলের ছাত্রদের ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইয়া পঁচিশ বিঘা জমি ও বাৎসরিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ছাত্রদের থাকিবার জন্য নূতন বড় আটচালা ঘর উঠিল। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গৃহিণী সর্ব্বমঙ্গলা দেবী ও বিধবা কন্যা পড়ুয়াদের পরিচর্য্যার ভার লইলেন।

বিদ্যারত্ন মহাশয় ছিলেন ন্যায়শাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত। হরিনারায়ণের সাহায্যে টোল খুলিবার পর তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে নূতন নূতন ছাত্র টোলে পড়িতে আসিতে লাগিল। এ দিকে নিজের পুত্রকে লইয়া তিনি সমস্যায় পড়িলেন। সে এতদিন রাজনগরের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়িতেছিল। টোল খুলিবার পর পিতা তাহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া টোলে পড়াইবার সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু পুত্র ও সর্ব্বমঙ্গলা উভয়েই বাঁকিয়া বসিলেন। পুত্র জীবানন্দের ইংরেজী শিক্ষার উপর ঝোঁক। ইংরেজী পাস দিয়া বড় চাকুরি লইয়া একজন গণ্যমান্য লোক হইবে, বালক জীবানন্দের মনে এই উচ্চাশা ছিল। সর্ব্বমঙ্গলা একমাত্র পুত্রের এই উচ্চাভিলাষকে বিশেষ ভাবে প্রশ্রয় দিতেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মত দরিদ্র অবস্থায় গৃহস্থের পক্ষে ছেলেকে বড় শহরে ছাত্রাবাসে রাখিয়া ব্যয়সাধ্য কলেজী শিক্ষা দেওয়া কতদূর সম্ভবপর তাহা তিনি হিসাব করিয়া দেখেন নাই।

ছেলেকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া আনিতে গিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় স্ত্রীর নিকট বাধা পাইয়া তাঁহাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন যে, বংশগত বৃত্তিত্যাগ করিয়া ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিলে পুত্র জীবনে সুখ ও শান্তি পাইবে না। এ কথাও বলিলেন যে, পুত্র বিদ্যালয়ে বিনাবেতনে পড়িতে পায় দরিদ্রের সন্তান ও মেধাবী ছাত্র বলিয়া। কলেজে শিক্ষার ব্যয় তিনি কোথা হইতে যোগাইবেন? সর্ব্বমঙ্গলা জবাব দিলেন—

ভগবান একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। ছেলে বৃত্তি পেলে ত আর চিন্তা করতে হবে না।

জীবানন্দ ভালভাবে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করিল, কিন্তু বৃত্তি পাইল না। সর্ব্বমঙ্গলা দেখিলেন পুত্রকে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া আর সম্ভব হয় না। স্বামীকে কোন কথা বলিবার মুখ নাই। তিনি তাঁহাকে কিছু না বলিয়া এক দিন পুত্রকে লইয়া জগদ্ধাত্রীর নিকট উপস্থিত হইলেন। হরিনারায়ণ জীবানন্দকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে ডাকিয়া পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাসা করিল। ম্লান মুখে জীবানন্দ সকল কথা খুলিয়া বলিল। হরিনারায়ণের নিজের আশাভঙ্গের কথা মনে পড়িল। সে মনে মনে ভাবিয়া দেখিল, তাহাদের বংশের হিতৈষী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের একমাত্র পুত্রের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা তাহার একান্ত কর্ত্তব্য। সে জীবানন্দকে বলিল, তুমি আজ বাড়ী যাও। দু'এক দিনের মধ্যে আমি জানাবো কি উপায় করা যায়। তোমার বাবার সঙ্গে একবার কথাবার্ত্তা বলা দরকার।

মাতাকে লইয়া জীবানন্দ চলিয়া গেলে হরিনারায়ণ স্ত্রীর কাছে কথাটা পাড়িল। জগদ্ধাত্রী বলিল—বিদ্যারত্ন মহাশয়ের স্ত্রী আমাকেও এ কথা বলেছেন। আমি বলেছি তোমাকে সব জানাব। হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কি বলো ?

জগদ্ধাত্রী বলিল, আমি বলি ছেলেটিকে এষ্টেটে একটা চাকরি দিয়ে রাখ না কেন ? কালে ও একজন ভাল, বিশ্বাসী লোক হয়ে উঠবে।

হরিনারায়ণ প্রস্তাব শুনিয়া একটু আশ্চর্য্য হইল। বলিল, বিদ্যারত্ন মশাই তোমার পিতার গুরুদেব। তাঁর ছেলেকে সামান্য গোমস্তার চাকরি দিয়ে রাখতে চাও ?

জগদ্ধাত্রী এদিকটা ভাবে নাই। আর ভাবিলেই বা কি ? বিদ্যারত্ন মহাশয় পণ্ডিতলোক, পঞ্চক্রোশীর বাবুদের কুলগুরু। তাই বলিয়া তাঁহার ছেলেকেও গুরুর মত মান্য করিতে হইবে ? স্বামী তাহার দোষ ধরিতেছে ভাবিয়া সে একটু রুষ্ট হইল। বলিল, আমার যা ভাল মনে হয় বললাম। ওর লেখাপড়া শেখা ত পয়সা কামাবার জন্ত ? তুমি যা দিয়েছ তার ওপর চাকুরিটা পেলে গরীব পরিবারের যথেষ্ট সাহায্য হবে। এখন তোমার যা ইচ্ছে হয় কর।

হরিনারায়ণের কাছে স্ত্রীর চরিত্রের এই দিকটা দুর্ব্বোধ্য মনে হয়। হরিনারায়ণের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্ত সে অকুণ্ঠভাবে অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত। নিজে পরিশ্রমও করে অতিরিক্ত। তাহার স্নান-আহারের সকল ব্যবস্থা নিজের তত্ত্বাবধানে করে। সামান্য ত্রুটি হইলে ঝি-চাকরদের প্রাণ যাইবার মত অবস্থা হয়। সে দুপুরে ঘুমাইতে গেলে সারা বাড়ীর মধ্যে একটু জোরে কেহ কথা বলিলে তাহার লাঞ্ছনার একশেষ হয়। নিজের শারীরিক আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য বলিয়া কিছু সে জানে না, ভোগবিলাসের দিকেও দৃষ্টি নাই। আজ তিন বছরের উপর বিবাহ হইয়াছে। ছেলে হইল না বলিয়া ইহারই মধ্যে গ্রামে তাহার বাঁজা বলিয়া অখ্যাতি রটিয়াছে। তাবিজ, কবচ, ব্রত নিয়মে কত যে অর্থ ব্যয় করে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে অপরের জন্ত কিছু করিতে হইলে তাহার মুক্ত হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া যায়। কেমন যেন একটু অনুদার ভাব।

হরিনারায়ণ স্ত্রীকে আর কোন কথা বলিল না। পরের দিন সে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। ভাবিলেন টোলের ব্যবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্ত সে আসিয়াছে। ছাত্রদের ডাকিয়া পরিচয় করিয়া দিলেন, কে কোন্ বিষয় অধ্যয়ন করিতেছে জানাইলেন। তাঁহার বক্তব্য শেষ হইলেও হরিনারায়ণকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—আমাকে কোন কাজের জন্ত প্রয়োজন হয়েছে কি ?

হরিনারায়ণ বুঝিল স্ত্রী ও পুত্রের তাহার গৃহে যাইবার কথা বিদ্যারত্ন মহাশয় জানেন না। অপ্রতিভ ভাবে হাসিয়া সে বলিল, না, না, আমার বিশেষ কোন কাজ নেই। একটু পরামর্শের জন্ত এসেছি।

জীবানন্দ-ঘটিত সকল কথা সে খুলিয়া বলিল। তারপর বলিল, দেখুন, আমার ইচ্ছা ছিল উচ্চশিক্ষা লাভ করব। ঘটনাচক্রে তা সম্ভব হয় নি। জীবানন্দের ক্ষোভ আমি নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারি। আপনার বিশেষ আপত্তি না থাকলে সে ইচ্ছামত পড়াশুনো করুক, আমি ব্যয়ভার বহন করব।

বিদ্যারত্ন মহাশয় কিছুক্ষণ গম্ভীর হইয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন—জীবানন্দ আমার নির্দ্দেশিত পথে না গিয়ে অন্ত পথে যেতে চায়। উপদেশ দিয়ে তাকে আমি নিজের মতে আনতে পারি নি। সে নিজের নির্ব্বাচিত পথে সুখী হবে কি দুঃখ পাবে সে কথা আমি আর ভাবি না। কিন্তু তোমার এই মহত্ত্বের কথা সে যেন ভুলে না যায় ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি। তুমি আমাদের পরম উপকারী, তোমাকে আমি মুখে কি আশীর্ব্বাদ করব ? ভগবান তোমাকে সর্ব্বাঙ্গীণ কুশলে রাখুন।

হরিনারায়ণের অর্থসাহায্যে জীবানন্দ কলেজে পড়িতে গেল। স্বামীর মুখে এই সংবাদ শুনিয়া জগদ্ধাত্রী ভালমন্দ কোন কথা বলিল না। হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করাতে কেবল বলিল, তোমার ইচ্ছামত ব্যবস্থা তুমি করেছ, এর উপর আর কি কথা আছে ? সে সন্তুষ্ট না হইলেও রুষ্ট হইয়াছে এমন ভাব প্রকাশ করিল না।

বিবাহের পর পাঁচ-ছয় বৎসর গেল জগদ্ধাত্রীর কোন সন্তান

হইল না। ব্রত, নিয়ম, উপবাসে সে শুকাইয়া উঠিল। সপ্তাহের মধ্যে ছয় দিন সে এক বেলা খায়, তাহাও সারাদিন উপবাস করিয়া থাকিয়া। কত রকম গাছের শিকড় ধারণ করিল, পাকা কাঁটালী কলার সঙ্গে, পিটুলির সঙ্গে, অশোক-কুঁড়ির সঙ্গে খাইল। হরিনারায়ণের আত্মীয়ারা, বিশেষ করিয়া বিধবা স্ত্রীলোকেরা, বংশরক্ষার জন্ত তাহাকে দ্বিতীয় বার পত্নীগ্রহণের পরামর্শ দিতে আরম্ভ করিলেন গোপনে গোপনে। জগদ্ধাত্রীকে তাঁহারা বড় ভয় করিতেন। হরিনারায়ণকে দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিতে রাজী করাইতে পারিলে তাহার সকল দর্প ও প্রতাপ খর্ব্ব করিতে পারা যায়। হিতৈষী ও হিতৈষিণীরা যে সকল পরামর্শ দিতেন হরিনারায়ণ জগদ্ধাত্রীর কাছে তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া হাসিত। স্বামীর হাস্যোচ্ছ্বাসে জগদ্ধাত্রী অনেকখানি সান্ত্বনা পাইত।

বিদ্যারত্ন মহাশয় জগদ্ধাত্রীকে সন্তান কামনা করিয়া বট ও অশ্বত্থের বিবাহ দিবার উপদেশ দিলেন। মহা আড়ম্বরে আয়োজন হইতে লাগিল। করণপুকুরের পুবপাড়ের মাথায় নহবৎ বসিল। শাস্ত্রমতে বিবাহের সকল ব্যবস্থা স্বয়ং বিদ্যারত্ন মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে হইল। করণপুকুরের পুবপাড় বেড়া দিয়া ঘিরিয়া নূতন বট ও অশ্বত্থ গাছ রোপণ করা হইল। সাতদিন পরে জোড়া গাছের বিবাহ হইল যাগযজ্ঞ করিয়া। গাছের বিবাহে লোকে যে ভোজ খাইল মানুষের বিবাহে সে রকম ঘটায় ভোজ সচরাচর জোটে না।

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের যজ্ঞ বিশ্বামিত্রের যজ্ঞের মত ফলপ্রদ হইল। এক বৎসরের মধ্যে হরিনারায়ণ ও জগদ্ধাত্রী পুত্রমুখ দেখিল। ছেলের নাম রাখা হইল প্রসন্ননারায়ণ। দুই বৎসর পরে জগদ্ধাত্রীর একটি মেয়ে হইল। মেয়ের দিদিমা তাহার নাম রাখিলেন মৃন্ময়ী।

এদিকে জীবানন্দ কলেজে প্রথম পাস দিয়া বৃত্তি পাইল। বৃত্তি পাইয়া সে বৃত্তির টাকা প্রণামীস্বরূপ পিতামাতাকে পাঠাইল। সে পিতাকে লিখিল, বৃত্তির টাকায় তাহার পড়াশুনার খরচ কোন রকমে চলিয়া যাইবে, হরিনারায়ণকে যেন তিনি জানান যে, আর সাহায্য করিবার প্রয়োজন নাই। বিদ্যারত্ন মহাশয় হরিনারায়ণকে এই চিঠির মর্ম জানাইলে হরিনারায়ণ জীবানন্দকে লিখিল—তোমার কৃতিত্বে রাজনগরের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। তোমার কষ্ট করিয়া খরচ চালাইবার প্রয়োজন নাই। উপযুক্ত পাত্রকে সাহায্য করা হইতেছে ইহাতেই আমি সন্তুষ্ট। পড়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সাহায্য তোমাকে লইতে হইবে।

বিশেষ সম্মানের সঙ্গে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জীবানন্দ সরকারী কাজের জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা ছিল ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকুরি লইবে। কিন্তু সে চাকুরি পাইল না, সরকার তাহাকে পুলিসের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পদ দিতে চাহিলেন। পিতার ও হরিনারায়ণের মত লইয়া জীবানন্দ সেই পদ গ্রহণ করিল।

জীবানন্দ সরকারী চাকুরিতে নিযুক্ত হইবার পর বিদ্যারত্ন মহাশয় পঞ্চক্রোশীর ত্রৈলোক্য ভট্টাচার্য্যের সুলক্ষণা কন্যা ত্রিনয়নীকে পুত্রবধূ করিয়া ঘরে আনিলেন। মেয়েটিকে খুব অল্প বয়স হইতে তিনি জানিতেন। ত্রৈলোক্য ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত লোক, পঞ্চক্রোশীর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, তাঁহার একটু দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়। পণ্ডিত-পিতা মেয়েকে যত্ন করিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্ত তাঁহাকে আয়াস স্বীকার করিতে দেখিয়া পাড়াপ্রতিবেশীরা এই বলিয়া বিদ্রূপ করিত যে, নিজে অক্ষম হইলে পর ত্রৈলোক্য মাষ্টার মেয়েকে তাঁহার পদে বসাইবেন স্থির করিয়াছেন।

পুত্রের বিবাহ দিয়া দুই বৎসর পরে বিদ্যারত্ন সবে পৌত্র দেবানন্দের মুখ দেখিয়া শান্তিলাভ করিয়াছেন এমন সময় এক দিন অপ্রত্যাশিত ভাবে ওপারের ডাক আসিয়া পৌঁছিল।

ছুটি উপলক্ষে জীবানন্দ সেই সময়ে রাজনগরে। সকালে উঠিয়া বিদ্যারত্ন পূজা-আহ্নিক সারিয়া টোলের ছাত্রদের নানা উপদেশ দিয়া শেষে বলিলেন, আজ একটা কিছু ঘটবার প্রত্যাশা করছি। আমার অভাব হলে এ টোল থাকবে না কিন্তু শিক্ষাব্রত হতে তোমরা যেন কোনক্রমে বিচ্যুত না হও—এই আমার অনুরোধ। নিষ্ঠা ও প্রতিজ্ঞা থাকলে যেখানে যাও না কেন তোমাদের জ্ঞানের সাধনা সার্থক হবে। আমি আশীর্ব্বাদ করি এই নিষ্ঠা ও সঙ্কল্প যেন তোমাদের বরাবর থাকে।

অত:পর তিনি হরিনারায়ণ ও জগদ্ধাত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রসন্নকে আদর করিয়া বলিলেন, এর মধ্যে পিতামহের প্রভাব প্রবল দেখছি, একে কি বেঁধে রাখতে পারবে? এর পর আর একজন আসবে, তোমরা ভেব না।

বিদ্যারত্ন বাড়ী ফিরিয়া দ্বিপ্রহরের আহার সারিয়া বিশ্রাম করিলেন। যথাসময়ে নিদ্রাভঙ্গ না হওয়ায় সর্ব্বমঙ্গলা ঘরে আসিয়া দেখিলেন তিনি তখনও ঘুমাইতেছেন। সূর্য্যাস্তের আগে ধড়মড় করিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূকে ডাকিলেন। তাহাদের বিস্মিত দৃষ্টি দেখিয়া বলিলেন, তোমরা প্রস্তুত হও, আর সময় নেই।

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পুত্রের মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, ভগবানে মতি রেখো। শিশু পৌত্রকে কোলে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন, তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া অস্ফুটে কি বলিলেন। তারপর একটু তাড়াতাড়ি উঠানে নামিয়া আসিলেন। একবার অস্তাচলগামী সূর্য্যের দিকে চাহিলেন, গৃহের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তারপর হাতে একটু জল লইয়া তুলসীতলায় আসিয়া বসিলেন।

সকলে অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে তাঁহার অনুসরণ করিয়া উঠানে নামিয়া আসিয়াছিল। তিনি তাহাদের বলিলেন, তোমরা ঘরে যাও, কিছুক্ষণ পরে এসো। হাতের জলটুকু মাথায়, মুখে বুলিয়া তিনি ধ্যানস্থ হইলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে দোরগোড়ায় দাঁড়াইয়া জীবানন্দ দেখিলেন তাঁহার পিতার দেহের উত্তরার্দ্ধ অস্বাভাবিক ভাবে ঝাঁকুনি দিয়া উঠিল, তারপর সম্মুখের দিকে হেলিয়া পড়িল, মাথা তুলসীবেদীতে আসিয়া ঠেকিল। ছুটিয়া তিনি তুলসীমঞ্চের কাছে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বাবা! বাবা! বলিয়া ডাকিলেন। কোন উত্তর পাওয়া গেল না। ভয় পাইয়া তিনি পিতাকে স্পর্শ করিলেন। স্পর্শ করিয়াই চিৎকার করিয়া বলিলেন, বাবা আর নেই। চিৎকার শুনিয়া টোল হইতে ছাত্রেরা দৌড়াইয়া আসিল। সকাল-বেলাকার উপদেশ শুনিয়া তাহাদের মনে এই রকমই একটা আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছিল। সকলে মিলিয়া তাঁহাকে তুলসী-তলায় শুয়াইয়া দিয়া নাম শুনাইতে লাগিল। কিন্তু সে নাম হয় ত তাঁহার কানে পৌঁছিতেছিল না। কেননা জ্ঞানী সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মপ্রাণ শ্যামানন্দ বিদ্যারত্ন শুভক্ষণে সজ্ঞানে তাঁহার সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

খবর পাইয়া হরিনারায়ণ ও জগদ্ধাত্রী আসিলেন, রাজনগর ভাঙ্গিয়া লোক আসিতে লাগিল বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গৃহে। এমন মৃত্যুর কথা বড় শুনা যায় না।

তারপর কয়েকটা বছর গড়াইয়া গেল। ইতিমধ্যে হরিনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র ইন্দ্রের জন্ম হইয়াছে। তাহার জন্মের কয়েক বৎসর পরে হরিনারায়ণের কনিষ্ঠা কন্যা চিন্ময়ীর জন্ম হইল। সেই বৎসরেই মাস দুই আগে জীবা-নন্দের জ্যেষ্ঠা কন্যা লক্ষ্মী ভূমিষ্ঠা হইয়াছিল।

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত টোল ইতিমধ্যে উঠিয়া গিয়া-ছিল। জীবানন্দ পৈতৃক মাটির বাড়ী ভাঙিয়া পাকা দ্বিতল বাড়ী তুলিয়াছেন, নীলামে কিছু জমিদারী এবং তালুকও কিনিয়াছেন। পাকা বাড়ী হইবার পর তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা সরস্বতী ও কনিষ্ঠ পুত্র উমানন্দ জন্মিল। বাড়ীতে জীবানন্দের বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা থাকে। বড় ছেলে দেবানন্দকে তাঁহার চাকরীস্থলে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইবার জন্য লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে ছেলেকে দেখিবার কেহ নাই বলিয়া সর্ব্বমঙ্গলা যাইতে দেন নাই।

জীবানন্দ উচ্চপদস্থ চাকুরীয়া, ভাল বেতন পান এবং সরকারী বাসস্থানও পান। কিন্তু তাহা হইলেও স্ত্রীকে এপর্য্যন্ত কর্ম্মস্থলে লইয়া যান নাই। বৃদ্ধা শাশুড়ীকে একা রাজনগরে রাখিয়া স্বামীর কর্ম্মস্থলে স্বাধীনভাবে ও আরামের সঙ্গে বাস করিবার কথা ত্রিনয়নী যেমন কোন দিন চিন্তায় আনেন নাই, জীবানন্দও তেমনি নিজে কখনও সে প্রস্তাব স্ত্রীর কাছে করেন নাই। উভয়েই জানিতেন বাড়ী ও চাকুরীস্থল আলাদা জিনিষ। চাকুরী করিবার উদ্দেশ্য বাহির হইতে টাকা আনিয়া পৈতৃক সম্পদকে বাড়ানো। পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করিয়া ছন্ন-ছাড়া হইবার জন্য চাকুরী করিবার কোন মানে হয় না। তাহা ছাড়া শাশুড়ী গৃহদেবতা লক্ষ্মী-জনার্দ্দনকে ছাড়িয়া কোথাও যাইবেন না। তিনি যত দিন জীবিত আছেন তত দিন পুত্রবধূর পক্ষে ত তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার কল্পনা করা অসম্ভব। স্বামী চাকুরীস্থলে পাচক, ভৃত্য লইয়া বাস করিবেন এবং ছুটি উপলক্ষে বাড়ী আসিবেন আর স্ত্রী বার মাস বাড়ীতে থাকিয়া গৃহদেবতার অর্চ্চনা, শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা ও বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিবেন, এই বন্দোবস্ত তখনকার দিনে স্বাভাবিক ও সাধারণ ছিল। জীবানন্দ ও ত্রিনয়নী এই ব্যবস্থামত চলিতেন।

লক্ষ্মীর জন্মের বৎসর হইতে জীবানন্দ বাড়ীতে প্রতিমা তুলিয়া দুর্গাপূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি পূজায় পাঁঠা বলি দিলেন না। রাজনগর ঘোর শাক্ত গ্রাম। পুরোহিত-পরিবারের পূজায় পাঁঠা বলি বন্ধের ব্যাপারে গ্রামে নানা কথা উঠিল। হরিনারায়ণ জীবানন্দকে গ্রামবাসীদের মনোভাব জানাইলেন। জীবানন্দ বলিলেন, দেখুন দাদা, আমি কুলগত বৃত্তি ছেড়ে ম্লেচ্ছ রাজার দাসত্ব করে অন্নসংস্থান করছি। রাজনগরের প্রাচীন ধারার সঙ্গে আমার ব্যবধান ঘটেছে। পুলিসের চাকুরী করতে গিয়ে মনিবের প্রীত্যর্থে অনেক অন্যায় কাজ করতে হচ্ছে, তার উপর মায়ের তৃপ্তির জন্য আর অবোলা জন্তর উপর হাত তুলতে ইচ্ছে হয় না। হরিনারায়ণ তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন। বলিলেন, যেভাবে তুমি তৃপ্তি পাও সেইভাবে মায়ের পুজো করবে বৈ কি, আর অশাস্ত্রীয় কোন কাজ ত হচ্ছে না।

ছুটিতে বাড়ী আসিলে জীবানন্দ প্রায় প্রতি দিনই সন্ধ্যা-বেলা হরিনারায়ণের গৃহে উপস্থিত হইতেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া দুই জন নানা আলাপ-আলোচনা করিতেন। কখন কখন জীবানন্দ বলিতেন, বাবার কথা না শুনে ইংরেজী লেখা-পড়া করে ভাল করেছি কিনা এখন মাঝে মাঝে ভাবি। টাকা রোজগার করছি বটে, কিন্তু মনে শান্তি নেই। একটু থামিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিতেন, চাকুরী ছেড়ে আবার পৈতৃক পেশায় ফিরে যাই, ভাবি মধ্যে মধ্যে। আপনাকে আগে থেকে একটা কথা বলে রাখছি কিন্তু। চাকুরীর মেয়াদ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত যদি বেঁচে থাকি তবে পেন্সন নিয়ে আবার আপনার বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্ম করাতে আরম্ভ করব। কোট প্যাণ্টলুন ছেড়ে খড়ম পায়ে, চাদর কাঁধে, পুঁথি বগলে শ্যামানন্দ বিদ্যারত্নের পুত্র জীবানন্দ মনসাপূজা, লক্ষ্মী-সরস্বতী পূজা, অরণ্যষষ্ঠী, অশোক-ষষ্ঠী পূজা করাতে লেগে যাবে। শুনিয়া হরিনারায়ণ খুব হাসিতেন। বলিতেন, পুলিসসাহেব লক্ষ্মীপূজা করতে বসলে চঞ্চলা মা ঠাকরুণ ভয়ে কিছু স্থির হতে পারেন। কথা

যেথানে পুলিসী যমকে ঠাকরুণকে যদি কিছুকাল এ বাড়ীতে আটকে রাখতে পার ত বেঁচে যাই। মামলা-মোকদ্দমায় সম্পত্তি এখন গজভুক্ত কপিত্থবৎ, শুধু বাইরের চেকনাইটুকু আছে। তবু বাবুদের মাতলামি ও দাঙ্গাবাজি এখনও ঠাণ্ডা হয় নি। গেল বার দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জনে কি কাণ্ড বেধেছিল মনে আছে বোধ হয়।

হরিনারায়ণ জীবানন্দকে এই কথা বলিলেন বটে, দাঙ্গাবাজিতে কিন্তু তিনিও কম যাইতেন না। তবে পিতার আমলে ম'ণ্ডরকের রামলোচন-কর্ত্তা যাহা গ্রাস করিয়াছিলেন তাহা পুনরুদ্ধার করিবার জন্যই প্রধানতঃ কয়েকবার দাঙ্গাবাজির আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁহার প্রধান ব্যসন দাঁড়াইয়াছিল শিকার ও সঙ্গীতচর্চ্চা। অবসর সময়ে পড়াশুনাও করিতেন। ক্রমশঃ

আমাদের রাষ্ট্রজীবনের মান

শ্রীহরিহর শেঠ

পশ্চিমবঙ্গের পরিষদের অধিবেশনে দুর্নীতির অভিযোগ ও সংবাদপত্রের তীব্র সমালোচনায় আলোচনা-প্রসঙ্গে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মহাশয় বিক্ষুব্ধ হইয়া এই মর্ম্মে মন্তব্য করেন,—

'এই জঘন্য কাহিনীগুলি যে সংবাদপত্রে ছাপান হয় ও এই সকল পড়িয়া পাঠকগণ উল্লসিত হয় তাহাতেই বুঝা যায়, আমাদের রাষ্ট্রজীবনের মান কত নামিয়া গিয়াছে।'

মন্ত্রী মহাশয় ঠিক কি বলিতে চাহিয়াছেন সংবাদপত্রের লেখায় তাহা হয়ত বেশ স্পষ্ট নয়। জঘন্য কাহিনীগুলি মিথ্যা কি সত্য বা সংবাদপত্রে ইহা প্রকাশ সমীচীন কি অসঙ্গত, অথবা পাঠকগণ ইহা পাঠে উল্লসিত হন কিনা বা হইলে তাহা হওয়া অন্যায় কি ন্যায়, এখানে সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আদৌ আমার উদ্দেশ্য নহে। একজন শ্রদ্ধাভাজন বিশিষ্ট রাষ্ট্র-কর্ণধারের মুখে আমাদের রাষ্ট্রজীবনের মান সম্বন্ধীয় কথা শুনিয়া, তৎসম্পর্কে আমার যে ধারণা আছে তাহা এখানে বলা আমার উদ্দেশ্য।

আমরা যখন পরাধীন ভারতের প্রজা ছিলাম, তখন মিউনিসিপ্যালিটি, ইউনিয়ন বোর্ড, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতির সদস্য পদ পাইলেও আমরা জোর করিয়া তাহাকেই রাষ্ট্রসেবা মনে করিয়া একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতাম। আজ আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, রাষ্ট্র এখন আমাদের নিজস্ব। তখন যাহা সখের ছিল, আজ তাহা কর্ত্তব্যের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। সভ্যকার শাসন পরিচালনার দায়িত্ব এখন আমাদেরই উপর অর্পিত হইয়াছে। রাজ-অনুজ্ঞায়, রাজার ব্যবস্থায় নির্দ্দিষ্ট বিধানে অপরের রাষ্ট্রের কাজে বেগার খাটিয়া আমরা তখন রাষ্ট্রজীবনের স্বাদ অনুভব করিতাম, আর এখন বিধান-কর্ত্তা ও ব্যবস্থাপক সবই আমরা। সুতরাং আমাদের ঠিক রাষ্ট্রজীবনের মান নির্ণয় করিতে হইলে অধিক পশ্চাতে যাওয়ার সার্থকতা বুঝি না। আমাদের ভারতবাসীর রাষ্ট্রজীবনের ঠিক সূচনা কবে কোন্ যুগে হইয়াছিল বা হয় নাই তাহা ইতিহাসই বলিতে পারে। এই নব পর্য্যায়ের আরম্ভ বলিতে আমি বুঝি আমাদের অহিংস সংগ্রামের মাধ্যমেই হউক আর আপোষ-মীমাংসার দ্বারাই হউক, ভারতবাসীর রাষ্ট্রজীবন সম্বন্ধে যদি কিছু বলিতে হয় তবে তাহার আরম্ভ মাত্র সার্দ্ধ তিন বৎসর পূর্ব্বে স্বাধীনতা অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে হইয়াছে। আমার এই অভিমত গ্রহণযোগ্য কি ভ্রান্ত তাহা অবশ্য আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। আমার ধারণার কথাই লিখিলাম। আমাদের পূর্ব্বের রাজনীতি প্রসঙ্গে মহামনীষী বঙ্কিমচন্দ্র রাজসমীপে ভিক্ষা প্রার্থনাকেই পলিটিক্স বলিয়াছেন।

ভারতীয় শাস্ত্রোক্ত আমাদের জীবনযাত্রার চারি অবস্থার মধ্যে গার্হস্থ্য আশ্রমকেই রাষ্ট্রজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত স্তর বলিয়াই মনে করি। মনুষ্যজন্ম লইয়া সেবাধর্ম্মের সাধনা যে খুবই মহান্ তাহাতে সন্দেহ নাই এবং তন্মধ্যে রাষ্ট্রসেবা অতি পবিত্র কার্য্য। ইহার দ্বারা দেশমাতৃকারই সেবা করা হয়, সেজন্য ইহার স্থানও সকলের ঊর্দ্ধে। ইহার মধ্যে মানুষ, মনুষ্যেতর প্রাণী, এমন কি তরুলতা প্রভৃতির প্রতিও যাবতীয় কর্ত্তব্য নিহিত। সুতরাং সত্যকার রাষ্ট্রসেবার জন্য উৎসর্গপ্রাণ ব্যক্তির মধ্যে ভুলত্রুটির স্থান থাকা বিচিত্র নহে, রাষ্ট্রসম্পর্কীয় কোন আবিলতার স্থান তাঁহার মধ্যে থাকিতে পারে না। সুতরাং তাঁহার জীবনের মান চির-উন্নত, নামা-উঠার কথা সেখানে আসেই না। যেখানে রাষ্ট্রসেবার সহিত বা তাহার পশ্চাতে অন্য কিছু লুক্কায়িত থাকে সেইখানেই নামা-উঠার কথা উঠিতে পারে। রাষ্ট্রক্ষেত্রে এ উদাহরণ ত দুর্লভ নহে। মহামতি ভূদেববাবু এমত ধারণা পোষণ করিতেন যে, পলিটিক্সের নামে অনেক সময়ই আমরা নিজ স্বার্থ সাধনেই প্রবৃত্ত হই।

সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, রাষ্ট্রের নাম লইয়া রাষ্ট্রক্ষেত্রেও কতকগুলি দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে কলুষিত করিতেছে। তদ্দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবনের মান নিশ্চয়ই ক্রমেই নামিয়া যাইতেছে; কিন্তু সমদৃষ্টিসম্পন্ন নিঃস্বার্থ রাষ্ট্রগতপ্রাণ কর্ম্মীদের জীবনের মান তাহাতে নামে না। রাষ্ট্রক্ষেত্রে সেরূপ ব্যক্তির অস্তিত্ব যে একেবারে লোপ পাইয়াছে তাহাও নহে। রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে কেহ প্রবেশ করিয়া তথাকার কার্য্যে কিছুকাল লিপ্ত থাকেন, তাঁহাদের সকলের তৎকালীন জীবনকেই যে রাষ্ট্রজীবন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় তাহাও সঙ্গত নহে। স্বার্থান্বেষী, লোভী, দুর্নীতিপরায়ণ লোক যদি রাষ্ট্রচক্রে না থাকেন তাহা হইলে সে রাষ্ট্রে কাহারও রাষ্ট্রজীবনের মান অবনত হইবার কারণ থাকে না।

স্মৃতিডোর

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

যেখানেই যাই, ফাঁকা ঠাঁই নাই,
পাই নাকো নিরিবিলি,
চারিদিকে মোর সুদূর স্মৃতির,
ঝুলিতেছে ঝিলিমিলি।
ক্ষীণ হয়ে আসে জীবনের আলো,
সোনা যা তা কেড়ে নিল,
সোনালী রঙের ছোপেতে কেন এ
হৃদয় ভরিয়া দিল ?
কারণ খুঁজে না পাই—
কে নির্ব্বাপিত আতস-বাজিতে
নিতি করে রোশনাই ?

২

সব চেনা পথে গত প্রিয় মুখ,
দূরগতদের ভিড়,
পথ-তরুশাখে উড়ো দিনগুলি
বাঁধিয়াছে যেন নীড়।
কত শরাহত কপোতের ব্যথা,
শ্যেনের উচ্চ রব,
শুষ্ক তৃণের মঞ্জরীগুলি
যেন জেগে ওঠে সব।
পর্য্যুৎসুকী মন
ঘরে কত গত মহাসমারোহ
নীরব নিষ্ক্রমণ !

৩

তীব্র ব্যথাকে কেমনে যে কাল
সহনীয় করে ভাবি,
প্রিয় হরিণের বক্ষ চিরিয়া
এনে দেয় মৃগনাভি।
জীর্ণ, ছিন্ন, হিন্দোলে দেয়
গত ঝুলনের দোল,
হাজার ছিদ্র কলসীতে তোলে
যমুনার কল্লোল।
আমি চেয়ে দেখি ফিরে—
কত বিজয়ার প্রতিমা ভাসিছে
আমার নয়ন-নীরে।

৪

সরায়ে আমার ভাস্করে আজ
বসেছে চিত্রকর।
ভূলোকের চেয়ে ছায়ালোক মোর
হতেছে বৃহত্তর।
পাই যক্ষের বক্ষের ধন
যেইখানে মাটি খুঁড়ি।
প্রতি রোহিতের কাছে সে হারাণো
হীরকের অঙ্গুরী।
চিনি না সে মধুকরে,—
কাঁটার ফুলের মধুতে যে মোর
পালি মৌচাক ভরে।

৫

নয়নে যা দেখি তাহা বেশী নয়
পুরাতন এই ক্ষিতি,
কতই যুগের মাধুরী ইহাতে,
কত জনমের প্রীতি !
অসুন্দরকে সুন্দর করে,
করে তোলে মনোলোভা,
ক্ষুদ্র সলিল বিন্দুতে দেয়
ইন্দ্রধনুর শোভা।
জানায় আমার প্রাণ—
জন্মান্তর কেবল কয়টা
নিঃশ্বাস ব্যবধান।

৬

জীবন ধরিয়া বুনিছে যে এই
স্মৃতির রেশমী গুটি,
চলে যায় যবে, কোথায় সে যায়
সব বন্ধন টুটি ?
পাখায় তাহার লাগে নাকি কষ ?
বুকে কি রাখে না দাগ ?
এত দিবসের এ নিবিড় প্রেম
এ গভীর অনুরাগ ?
সত্য কি পায় ছুটি ?
কিংবা আবার ফিরে এসে বোনে
এমনি রেশমী গুটি ?

কচুরিপানা হইতে পচা সার প্রস্তুত

পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনী

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

পূর্ব্বে শহরেই কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইত। সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের একটি 'কমিটি' ইহার সমস্ত ব্যবস্থা এবং আয়োজন করিতেন। সাধারণতঃ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই কমিটির সভাপতি হইতেন এবং কমিটিতে সরকারী কর্ম্মচারিগণেরই প্রাধান্ত থাকিত। প্রধানতঃ তাঁহাদের চেষ্টাতেই প্রদর্শনীর অর্থ সংগৃহীত হইত। এই কমিটিতে জমিদার, ব্যবসায়ী, উকীল, মোক্তার, চিকিৎসক প্রভৃতিরও স্থান থাকিত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইঁহারা সরকারী কর্ম্মচারীদের মতেই মত দিতেন এবং প্রদর্শনীর কার্য্যে বিশেষ হস্তক্ষেপ করিতেন না। এই সকল প্রদর্শনীতে আমোদ-প্রমোদের আয়োজনের, বিশেষতঃ কলিকাতা হইতে থিয়েটার প্রভৃতি আনয়নের দিকেই বেশী দৃষ্টি থাকিত। সফলতা প্রদর্শনীর আমোদ-প্রমোদের আড়ম্বরের উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করিত।

প্রকৃত কৃষকদের সঙ্গে এই ধরণের প্রদর্শনীর কোন যোগাযোগ ছিল না। এইরূপ প্রদর্শনীকে তাহারা "বাবুদের তামাশা" বা "বাবুদের আমোদ-প্রমোদের স্থান" বলিয়াই গণ্য করিত। প্রদর্শনীর উদ্বোধন সভায় বা পরবর্তী কোন অনুষ্ঠানেই তাহাদের স্থান থাকিত না। প্রদর্শনীর প্রাঙ্গণেও বেশী কৃষক দেখা যাইত না। এ ধারে ও ধারে, দূরে দূরে দুই-দশ জন ঘুরিয়া বেড়াইত। কোন দ্রষ্টব্য সামগ্রী (exhibit) আগ্রহ সহকারে তাহাদের দেখানোও হইত না। অপরপক্ষে সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণকে এবং উচ্চপদস্থ বেসরকারী ব্যক্তিবর্গকে অতি উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে প্রদর্শনীর যাবতীয় দ্রব্য দেখাইবার ও বুঝাইবার বিশেষ ব্যগ্রতা দেখা যাইত। থিয়েটার এবং অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের সময় কৃষক সম্প্রদায়ের ভিড় দেখা যাইত এবং অনেকেই ঋণগ্রস্ত হইয়া এই সকল আমোদ-প্রমোদ দেখিতে আসিত। ইহার ফলে প্রদর্শনীর আয় বর্দ্ধিত হইত, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতিতে কৃষক সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করিবার জন্য প্রবল প্রচারকার্য্য চলিত।

ঝাঁটপুর পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনীর একটি ষ্টল

প্রদর্শনীতে কৃষিজাত এবং শিল্পজাত নানাবিধ পণ্যের, সম্ভার থাকিত বটে, কিন্তু সেই সম্ভারের পশ্চাতে উদ্দীপনা

উৎসাহ, আগ্রহ খুবই কম দেখা যাইত। সাধারণতঃ বিশেষ কোন যত্নের সহিত বা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোন পণ্যই সংগৃহীত হইত না। পুরাতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যে সকল দ্রব্য উৎপাদিত হইত তাহাদের মধ্যে বৃহৎ আকারের বা উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইত। উৎপাদনের পরিমাণ, ব্যয়, লাভ প্রভৃতির কোন ইঙ্গিতও থাকিত না। সময়ে সময়ে বাজার হইতে কোন কোন দ্রব্য ক্রয় করিয়া প্রদর্শনীতে দেখানো হইত। এমনও দেখা গিয়াছে, একই শিল্পজাত দ্রব্য (যেমন কাঁথা) প্রতি বৎসরই প্রদর্শনীতে দেখানো হইতেছে এবং তাহার জন্য প্রতি বারই পুরস্কারও প্রদত্ত হইতেছে। কোন্ দ্রব্যের কি কি গুণের উপর নির্ভর করিয়া পুরস্কার দেওয়া

ঘাটপুর পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনীর নিকটবর্তী স্থানে ধানের ক্ষেত

হইবে প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ পূর্ব্বাহ্নে এ সম্বন্ধে কোন প্রচারকার্য্য করিতেন না।

ঘাটপুর মিত্রবাটীর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর মন্দির
(এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়)

যাহা হউক, বর্ত্তমানে পল্লী অঞ্চলে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে, এবং ইহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। কিন্তু ইহাদের কার্য্য-প্রণালী বা পরিচালনায় তেমন কোন পরিবর্ত্তন বা উন্নতি হয় নাই। কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনাও নাই; পূর্ব্বেকার পদ্ধতিই সাধারণতঃ অবলম্বিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে, এখন পর্য্যন্ত পল্লী অঞ্চলের এই সকল প্রদর্শনীতেও কৃষক সম্প্রদায়ের তেমন কোন বিশিষ্ট স্থান বা প্রাধান্য নাই। তাহারা পূর্ব্বে যেমন পশ্চাতে থাকিত, এখনও তেমনই থাকে। প্রদর্শনী সম্বন্ধে পূর্ব্বে কোন প্রচারকার্য্য করা হয় না। স্থানে স্থানে প্রদর্শনী হঠাৎ গজাইয়া উঠে। আর প্রদর্শনীর কিছু আগে এ সম্বন্ধে প্রচার-কার্য্য চালানো হয়। ফলে সাধারণভাবে যে সব কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদিত হয় তাহাদেরই নমুনা প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। অনেক ক্ষেত্রেই কৃষকেরা বা শিল্পিগণ তাঁহাদের পণ্যের নমুনা নিজেরা প্রদর্শনীতে আনেন না; সরকারী কর্ম্মচারি-গণকে উহা সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয়। ইহার জন্য সরকারী তহবিল হইতে বা প্রদর্শনীর তহবিল হইতে অর্থ ব্যয় করিতে হয়। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, পল্লী-প্রদর্শনীর ব্যাপারেও স্থানীয় কৃষক ও শিল্পী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ কোন উদ্দীপনা, আগ্রহ বা উৎসাহ জাগ্রত হয় নাই। কিন্তু প্রদর্শনীর সফলতার জন্য এই উদ্দীপনা, উৎসাহ এবং আগ্রহই প্রধান কথা। প্রদর্শনী যে একান্তই "নিজেদের বস্তু", ইহা যত দিন পর্য্যন্ত স্থানীয় জনসাধারণ হৃদয়ঙ্গম না করিবে তত দিন প্রদর্শনীর সফলতা সম্বন্ধে কতকটা নিরাশ হইতে
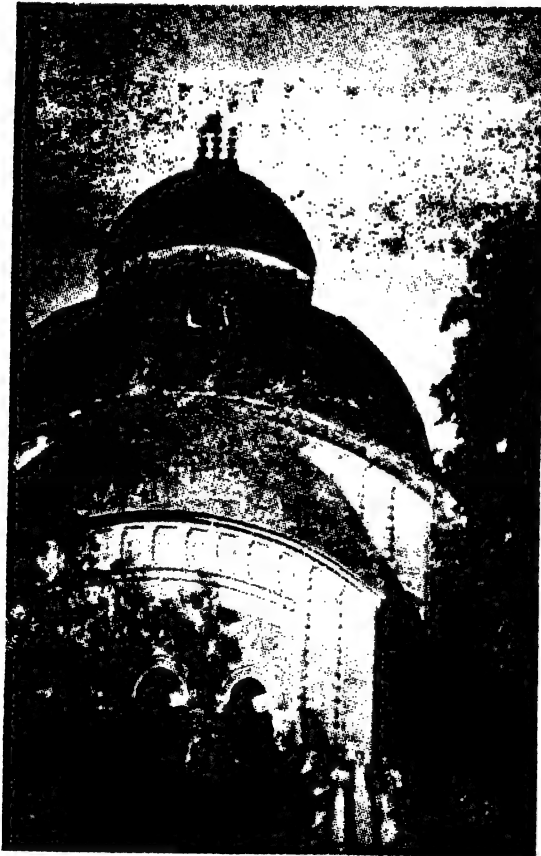
হইবে। যে দিন স্থানীয় জনসাধারণ তাঁহাদের 'অন্তর খুলিয়া' প্রদর্শনীতে যোগদান করিবে, সেই দিনই দেখা দিবে প্রদর্শনীর সার্থকতা। এইরূপ সার্থকতায় পঁহুছিতে হইলে বর্ত্তমান পল্লী অঞ্চলের প্রদর্শনীর গঠন, কর্ম্মপদ্ধতি, পরিচালনার 'খোলনলিচা' একেবারে বদলাইয়া ফেলিতে হইবে; একটি সুচিন্তিত কর্ম্ম-পদ্ধতিতে স্থানীয় জনসাধারণের, বিশেষতঃ কৃষক ও শিল্পী সম্প্রদায়েরই প্রাধান্ত থাকিবে। সরকারী কর্ম্মচারিগণ ও শিক্ষিত সমাজ এবং অন্যান্ত সম্প্রদায় পশ্চাতে থাকিবেন; কিন্তু পশ্চাতে থাকিয়াও তাঁহাদিগকে পূর্ণ সহযোগিতা এবং সক্রিয় সাহায্য করিতে হইবে। প্রত্যেক স্থানেই প্রদর্শনী কিছু কালের (অন্ততঃ পাঁচ-ছয় বৎসরের) জন্ত স্থায়ী হইবে; এবং ইহার জন্ত একটি স্থায়ী কমিটি বা প্রতিষ্ঠান থাকিবে। এই কমিটি বা প্রতিষ্ঠান প্রদর্শনীর জন্ত সারা বৎসর ধরিয়া প্রচার-কার্য্য চালাইবেন। প্রত্যেক ঋতুর প্রারম্ভে কি কি ফসল কি কি প্রণালীতে উৎপাদন করিলে এবং প্রত্যেক ফসলের কি কি গুণ থাকিলে ও উৎপাদনের পরিমাণ কিরূপ হইলে পুরস্কার দেওয়া হইবে সে সম্বন্ধে কমিটি বিশেষভাবে প্রচারকার্য্য করিবেন ও কৃষকদিগকে উপদেশ দিবেন। কোন্ অঞ্চলে নূতন বা উন্নততর কৃষি ও কুটীর-শিল্পের প্রবর্ত্তনের কিরূপ সম্ভাবনা আছে সে বিষয়েও প্রচারকার্য্য চালানো দরকার।

আঁটপুর প্রদর্শনীতে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ খাদ্য-উৎপাদনকারিগণকে মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন পুরস্কার দিতেছেন

আর সেই সকল কৃষি ও শিল্পের প্রবর্ত্তনের দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করিয়া এ বিষয়ে কৃষক ও শিল্পিগণকে উৎসাহ ও প্রেরণা দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। স্থানীয় কৃষি ও শিল্পের উৎকর্ষ সাধনের জন্ত যে সকল উন্নত প্রণালী অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় সেই সকল উন্নত প্রণালী প্রদর্শনীতে 'হাতে কলমে' দেখানো অতীব প্রয়োজন। কিন্তু এ সম্বন্ধে সরকারী জাতিগঠনমূলক বিভাগগুলি এখনও উদাসীন বলা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ শিল্প বিভাগের উদাসীনতার কথা উল্লেখ করা যায়। লেখক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারেন যে, তন্তুবায়-প্রধান অঞ্চলের কোন প্রদর্শনীতে আধুনিক বা উন্নত তাঁতের প্রদর্শন শিল্প-বিভাগ দেখান নাই। এই ক্ষেত্রে প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষের পত্র মারফত এবং মৌখিক অনুরোধ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছিল। এইরূপ বহু উদাহরণ দেওয়া যায়।

আঁটপুর পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনী উপলক্ষে ছাত্রগণকর্ত্তৃক "অধিক ফসল উৎপাদন" শোভাযাত্রা

প্রদর্শনী সম্বন্ধে সাধারণের মনে উদ্দীপনা এবং আগ্রহ জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে প্রথম দুই-তিন বৎসর প্রধানতঃ সরকারী অর্থ সাহায্যেই প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান এবং এ সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রচারকার্য্য চালানো বাঞ্ছনীয়। পল্লী অঞ্চলে এইরূপ প্রদর্শনীর আয়োজন করিবার জন্ত

সরকার যদি পূর্ব্বোক্ত কমিটি বা প্রতিষ্ঠানের হতে প্রতি বৎসর চার-পাঁচ হাজার টাকা দেন তাহা হইলে এই অর্থের সাহায্যে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান এবং এই সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে। অবশ্য, সরকার এই অর্থের ব্যয় সম্বন্ধে উপযুক্ত সর্ত্তাদি আরোপ করিতে পারেন। এই অর্থব্যয় অচিরেই ফলপ্রসূ হইবে। তবে সুচিন্তিত পরিকল্পনার প্রয়োজন। পল্লী অঞ্চলের এইরূপ প্রদর্শনীকে "পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনী" আখ্যা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। পল্লীর যাবতীয় উন্নতি এই প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

উন্নত শ্রেণীর একটি ষাঁড়

গত দুই বৎসর যাবৎ "পশ্চিমবঙ্গ পল্লীমঙ্গল সমিতি" হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার অন্তর্গত আঁটপুর গ্রামে "পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনীর" অনুষ্ঠান করিতেছেন। ইহাতে সরকারী কর্ম্মচারিগণের কোন প্রাধান্যই নাই, কিন্তু মন্ত্রী হইতে পল্লী অঞ্চলের নিম্নতম কর্ম্মচারিগণ এই প্রদর্শনীর সফলতার জন্য সক্রিয় সাহায্য করেন। এই প্রদর্শনীকে "সাধারণের বস্তু" করিবার উদ্দেশ্যে ইহার সহিত নানা সভা-সমিতি সংযুক্ত করা হয়। প্রদর্শনীর কর্ম্মসূচী দেখিলেই স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, ইহা কোন দলগত ব্যাপার নহে। পল্লী-উন্নয়ন ব্যতীত ইহার আর কোন রাজনীতি নাই। বর্ত্তমান বৎসরের প্রদর্শনীর সহিত কৃষকসভা, শিশুপ্রদর্শনী, ছাত্রসভা, তন্তুবায়-সম্প্রদায় সম্মেলন, কংগ্রেস-কর্ম্মী সম্মেলন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্মেলন প্রভৃতি যুক্ত ছিল। এই সকল অনুষ্ঠান প্রদর্শনীর প্রধান অঙ্গ ছিল এবং প্রদর্শনীকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। বিভিন্ন সম্মেলনে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন বিভিন্ন ব্যক্তি—যথা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি, শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। কলিকাতা হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বিভিন্ন দিনে এই প্রদর্শনী পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। মাননীয় বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (সস্ত্রীক) ইঁহাদের মধ্যে অন্যতম। এই প্রদর্শনীর আর একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, মন্ত্রীদ্বয়কে বা অন্য কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কোন 'মানপত্র' দেওয়া হয় নাই, বা মামুলী প্রথা অনুসারে কোন আবেদন-নিবেদন করা হয় নাই, প্রত্যেকেই সাধারণের সহিত একাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন, এবং সাধারণের সহিত 'হৃদয় খুলিয়া' সকল বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন।

মন্ত্রী মহোদয়দের বা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রদর্শনীর ষ্টলসমূহ পরিদর্শনের সময় মামুলী রীতি অনুসারে সাধারণ দর্শকগণকে ষ্টলসমূহ হইতে 'খেদাইয়া' দেওয়া হয় নাই। কোন সভাসমিতিতে 'পুলিসের' কোন বালাই ছিল না। বহু উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী প্রদর্শনীতে এবং সভা-সমিতিতে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা নিজেদের "সাধারণ শ্রেণী" ভুক্ত বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রদর্শনীর নূতন পদ্ধতি দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলিয়াছেন, "এখানকার

কয়েকটি ষাঁড়
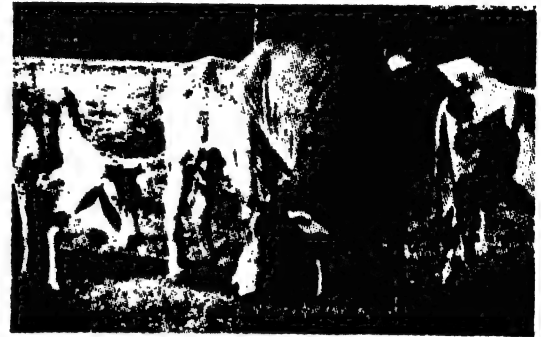
প্রদর্শনী একটা মামুলী ব্যাপার নয়। এই প্রদর্শনীর বয়স মাত্র দু'বছর। এরই মধ্যে এর সুফল ফলতে আরম্ভ করেছে। দেখে আশ্চর্য্য হলাম আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করলে কত সহজে লোকের মন জয় করা যায়। পল্লীমঙ্গল সমিতির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীকে কৃষকেরা নিজেদের বলে মনে করেন, তাই এত লোক সমাগম, এত আনন্দ এবং উৎসাহ।"

এইরূপ "পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনী" ব্যতীত প্রত্যেক কৃষিঋতুর অন্তে বিশেষ বিশেষ শস্যের প্রবর্ত্তন, প্রসার ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য উহাদের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করাও খুব বাঞ্ছনীয়। লেখক যখন সরকারী কৃষি-বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন তখন "আলু প্রদর্শনী" (Potato Show), "গম প্রদর্শনী" (Wheat Show), "তামাক প্রদর্শনী" (Tobacco Snow), "চীনা বাদাম প্রদর্শনী" (Groundnut Show) প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রদর্শনী মোটেই ব্যয়বহুল ব্যাপার নহে। স্থানীয় বিদ্যালয়ে, হাটে, জমিদারী কাছারি প্রভৃতি স্থানে দুই-তিন দিন স্থায়ী এইরূপ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইত। কৃষক সম্প্রদায়ই নিজেদের তক্তা, বাঁশ প্রভৃতির সাহায্যে 'গ্যালারি,

প্রদত্ত করিতেন, এবং স্থানীয় লতা, পাতা, ফুল ইত্যাদি দ্বারা প্রদর্শনীর অঙ্গন সজ্জিত করিতেন। এইরূপ প্রদর্শনীতে তাঁহাদের প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা যাইত। যাত্রা, জারি, কবিগান প্রভৃতিরও আয়োজন হইত। পুরস্কারস্বরূপ নানাবিধ কৃষি-যন্ত্র, পদক, সার্টিফিকেট প্রভৃতি প্রদত্ত হইত। এইরূপ প্রদর্শনী পল্লী অঞ্চলে সংখ্যায় যত বাড়ে ততই কৃষির উন্নতির দিকে লোকের আগ্রহ বাড়িবে।

স্থানীয় মেলার সহিত এইরূপ "পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনী" এবং বিশেষ বিশেষ ফসলের প্রদর্শনী সংযুক্ত করিয়া দিলে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য অধিকতর পরিমাণে সাধিত হইবে। প্রত্যেক জাতি-গঠনমূলক বিভাগের অন্তর্গত একটি "প্রদর্শনী শাখা" স্থাপিত হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়। এই শাখা পল্লী অঞ্চলের "পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনী"র সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিবে এবং প্রত্যেক অঞ্চলে প্রদর্শনের উপযুক্ত দ্রব্যাদি প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিবে।

চীনের নববিধান

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়, এম-এ

কিঞ্চিদধিক দেড় বৎসর পূর্ব্বে ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে সাম্যবাদী দল কর্ত্তৃক সংগঠিত এবং ইহার পরিচালনাধীন গণমুক্তি ফৌজ (People's Liberation Army) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আশ্রিত এবং সাহায্যপুষ্ট কুওমিণ্টাঙ দলের শক্তি চূর্ণ করিয়া চীনের রাষ্ট্রকর্ত্তৃত্ব হস্তগত করিয়াছে। সর্ব্বাধিনায়ক চিয়াং-কাইশেক সদলবলে খাস চীন হইতে পলায়ন করিয়া তাইওয়ান (ফরমোসা) দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। মার্কিন নৌবহরের অন্তরালে অবস্থিত তাই-ওয়ানের নিরাপদ আশ্রয় হইতে তিনি পুনরায় চীন অধিকার করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার মত ইচ্ছা বা সামর্থ্য যে তাঁহার নাই সে কথা তিনি নিজেও জানেন।

সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল ব্যাপী রক্তরঞ্জিত বিরোধের অবসানে চীনে আপাততঃ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে মনে হয়। কিন্তু ঈশান কোণে বিদ্যুদ্‌গর্ভ মেঘের আনাগোনার বিরাম নাই। চীনের ঘরের কোণে অবস্থিত এবং অতীতে তাহার অঙ্গীভূত কোরিয়ার রণদেবতার যে তাণ্ডব সুরু হইয়াছে তাহা আবার কোন অনর্থের সূত্রপাত করে কে বলিবে!

চীনের সাম্যবাদী বিপ্লবের সার্থক পরিণতি সাম্প্রতিক ইতিহাসের একটি পরম বিস্ময়। ১৯২৭ সালে সাম্যবাদী এবং কুওমিণ্টাঙ দলের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন হইবার পর প্রায় কুড়ি বৎসর কাল সাম্যবাদিগণকে দস্যু আখ্যায় অভিহিত করিয়া সমূলে ধ্বংস করিবার অবিরাম চেষ্টা চলিয়াছে। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে কুওমিণ্টাঙ দলের নেতা চিয়াংকাইশেক চীনের অবিসম্বাদিত কর্ত্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তিন বৎসরও কাটিল না, বিভিন্ন রণাঙ্গনে তৎপরিচালিত সৈন্যবাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটিতে আরম্ভ হইল। ১৯৪৯ সালের শেষভাগে তাইওয়ান দ্বীপে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণে এই পরাজয় সম্পূর্ণ হইল।

রাষ্ট্র-কর্ত্তৃত্ব হস্তগত করিবার সঙ্গে সঙ্গে সাম্যবাদী দলকে একাধিক গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ইহার মধ্যে চীনের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সমস্যাই সর্ব্বাপেক্ষা জটিল। জাতির এই জীবন-মরণ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের উপরই সাম্য-বাদী দল, তথা চীনের ভাগ্য বহুলাংশে নির্ভর করে।

একটি সমগ্র দেশ ও জাতিকে নূতন অর্থনৈতিক রূপ প্রদান করিবার সমস্যা যেমন ব্যাপক, তেমনই জটিল। সাম্য-বাদী কর্ত্তৃপক্ষ এই সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। প্রধানমন্ত্রী মাও-সে তুং 'দি ডিক্টেটরশিপ অব পিপল্‌স্ ডেমোক্রেসি' নামক গ্রন্থের এক জায়গায় লিখিয়াছেন— "আমরা আজ অর্থনৈতিক সংগঠনের গুরুদায়িত্বের সম্মুখীন হইয়াছি।...সাম্রাজ্যাধিকারী রাষ্ট্রপুঞ্জ মনে করে যে, এই দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা আমাদের নাই। তাহারা সাগ্রহে আমাদের ব্যর্থতার প্রতীক্ষা করিতেছে। আমাদিগকে বহু বাধা অতিক্রম করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে হইবে।...আজ হউক, কাল হউক, আমাদের সফলতা সুনিশ্চিত।"

বিশ্বের সর্ব্বাধিক জনবহুল দেশ চীনের অধিবাসী-সংখ্যা ৪৭৫,০০০,০০০। আয়তনের দিক হইতে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের পরেই চীনের স্থান। অধিবাসীদিগের মধ্যে শত-করা নব্বই জন চীন জাতীয় এবং বাকী দশ জন মোঙ্গোল, তিব্বতীয়, তুঙ্গান এবং উইঘুর জাতীয়। দেশের প্রধান প্রধান অঞ্চলগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার তারতম্য বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য। খাস চীনের উত্তর ও পূর্ব্বাংশে অবস্থিত সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী অঞ্চল এবং মাঞ্চুরিয়ার শিল্প ও আধুনিক যানবাহন ব্যবস্থা অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় উন্নত। এই অঞ্চলের শিল্পকেন্দ্রগুলিতে বিত্তহীন সর্ব্বহারার সংখ্যাও উপেক্ষণীয় নহে। খাস চীনের অভ্যন্তরপ্রদেশ এবং দক্ষিণাংশে অবস্থিত অঞ্চলসমূহে শ্রমশিল্প একান্ত অপরিণত অবস্থায় রহিয়াছে। কৃষিই এই সমস্ত অনগ্রসর অঞ্চলের অধিবাসী-দিগের প্রধান উপজীবিকা। শতাব্দীর পর শতাব্দী সামন্ত-প্রভুগণ ইহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন। জাপ-যুদ্ধের আমল হইতে এই অঞ্চলের চুংকিং, চেংটু, কুনমিং প্রভৃতি বড় বড়

কয়েকটি শহরে আধুনিক শ্রমশিল্প গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির অর্থনৈতিক জীবনের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই বলিলেও চলে। চিংহাই, সিকং এবং তিব্বত অর্থনৈতিক প্রগতি ও সামাজিক সংগঠনের দিক হইতে সর্বাধিক অনুন্নত অঞ্চল।

প্রকৃতি-মাতা অকৃপণ হস্তে চীনকে কৃষি, আরণ্য এবং খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেশের উৎপাদন-সহায়ক ব্যবস্থাসমূহ আজ পর্য্যন্তও একান্ত অপরিণত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। কু-শাসন, নির্মম শোষণ অত্যাচার এবং সাম্রাজ্যাধিকারী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর স্বৈরাচারই ইহার জন্য দায়ী। ঊনবিংশ শতকে চীন পাশ্চাত্য জাতিসমূহের শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। বিদেশীয় পুঁজিপতিগণের স্বার্থের খাতিরেই সামন্ত-প্রথাকে সযত্নে জীয়াইয়া রাখা হইয়াছে।

বিদেশী পুঁজি আমদানির পর হইতে বিদেশের বাজারের উপর চীনের নির্ভরশীলতা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। দেশে পুঁজিবাদের সূচনা হইল। কিন্তু ইহার ফলে চীন যে পুঁজিবাদী দেশে পরিণত হইল তাহা নহে। বিদেশীয় পুঁজিপতিগণ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যুদ্ধ এবং অসম সন্ধি দ্বারা চীনকে উপনিবেশে পরিণত করিতে উদ্যত হইলেন। বিদেশজাত পণ্যে চীনের বাজার ছাইয়া গেল। দেশের যাতায়াত ও শ্রমশিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা, আর্থিক সংগঠন এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। ফলে জাতির অর্থনৈতিক জীবনের বিকাশের সমস্ত পথ রুদ্ধ হইয়া গেল।

১৯৩৭ সালে যখন জাপান চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে, তখন চীনে বিনিয়োগ করা পুঁজির শতকরা চুয়াত্তর ভাগই ছিল বিদেশীয়। বিদেশী পুঁজিপতিগণ চীনের কল-কারখানা, খনি, রেলপথ, জাহাজের ব্যবসায়, ব্যাঙ্ক প্রভৃতির উপর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া লক্ষ লক্ষ কৃষক এবং শ্রমিকের উপর প্রভুত্ব করিতেছিলেন। ফলে চীনের অর্থনৈতিক জীবন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

নিজেদের দেশের কল-কারখানা চালু রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের যোগানদার হিসাবে চীনকে প্রায়-উপনিবেশে পরিণত করিয়া সাম্রাজ্যাধিকারী রাষ্ট্রগুলি তাহার শিল্পোন্নতি ব্যাহত করিয়াছে। জাপ-যুদ্ধের পূর্ব্বে চীনের জাতীয় আয়ের শতকরা ১০·৭ ভাগ মাত্র শিল্পজ এবং শতকরা ৬৫ ভাগ (মতান্তরে ৭৭ ভাগ) কৃষিজ ছিল, শিল্পজ পণ্যের এক-দশমাংশ মাত্র যন্ত্র-সাহায্যে উৎপাদিত হইত। চীনের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের এক-চতুর্থাংশও কলে প্রস্তুত হইত না। অথচ এই বয়ন-শিল্পই চীনের সর্ব্বাপেক্ষা পরিণত শ্রমশিল্প। উৎপাদন-সহায়ক কোন যন্ত্রপাতিই চীনে নির্ম্মিত হইত না বলিলেও চলে। নিজের দেশে এই সমস্ত যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের সুযোগ এবং সামর্থ্য জাতির অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তি। জাপ-যুদ্ধের পূর্ব্বে সমগ্র চীনদেশে মাত্র ২৭০টি প্রতিষ্ঠানে এই সমস্ত যন্ত্রপাতি নির্ম্মিত হইত। ইহাদের মোট পুঁজির পরিমাণ ৩৩,০০০,০০০ চীনা ডলারের অধিক ছিল না। এই পুঁজি চীনে শ্রমশিল্পে বিনিয়োগ করা মোট পুঁজির এক শত ভাগের এক ভাগও নহে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহৃত হইত না বলিলেও চলে। চীনের সর্ব্ববৃহৎ এবং সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত শিল্পকেন্দ্র সাংহাইয়ে প্রতিটি কারখানা গড়ে ১০০ অশ্বশক্তি (বৈদ্যুতিক শক্তি) ব্যবহার করিত। বৈদেশিক অর্থে পরিচালিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির কোনটিতেও গড়ে ১,৫০০ হইতে ২,০০০ অশ্বশক্তির অধিক যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহৃত হইত না। চীনা মালিকের কারখানাগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্রায়তন ছিল।

উৎপাদন-শক্তিসমূহের অসম বণ্টন অর্থনৈতিক সমস্যাকে আরও জটিল এবং ঘোরালো করিয়া তুলিয়াছিল। বিদেশী পুঁজির প্রধান কেন্দ্র সাংহাই, সিংটাও, টিয়েনসিন, ক্যাণ্টন এবং হ্যাঙ্কো নগরের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলেই শ্রমশিল্প, বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় এবং যাতায়াত-ব্যবস্থার সম্যক্ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। লিয়াওনিং, হোপে, সাণ্টুং, কিয়াংসু, হুপে এবং কোয়াণ্টুং এই ছয়টি প্রদেশের আয়তন চীনের মোট আয়তনের এক-দশমাংশ। চীনের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৩৮·৩ জন এই ছয়টি প্রদেশের অধিবাসী। অথচ সমগ্র দেশের কার্পাস এবং রেশম শিল্পের শতকরা ৯৩ ভাগ; দুগ্ধ-উৎপাদন এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের ৮৬ ভাগ; বিদ্যুৎ-উৎপাদন শিল্পের ৮৮ ভাগ, খনিসমূহের ৫৫ ভাগ, রেলপথের ৫৩ ভাগ, ব্যবসায়-বাণিজ্যের ৮৪ ভাগ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ৯০ ভাগ এই প্রদেশ কয়টিতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল।

শ্রমশিল্পের পক্ষে অপরিহার্য্য কাঁচা মালের যোগানদার অঞ্চল এবং উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ের কেন্দ্রগুলি সমুদ্রতীরবর্তী নগরসমূহ হইতে বহুদূরে অবস্থিত। সুতরাং কাঁচা মাল এবং খাদ্যের জন্য ইহাদিগকে বিদেশের আমদানীর উপর নির্ভর করিতে হয়। কিছু দিন পূর্ব্বেও টিয়েনসিন এবং সাংহাই প্রচুর পরিমাণে তুলা, তামাক, জালানি, বিভিন্ন ধাতু, গম এবং চাল আমদানী করিত। এই সমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকটিই চীনে উৎপন্ন হয়। কিন্তু দেশের অভ্যন্তর-ভাগে উৎপন্ন কাঁচা মাল এবং কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের কোন বাজার ছিল না।

স্বীয় শিল্পোৎপাদন-ব্যবস্থা সচল রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং বস্ত্র-শিল্পের নিমিত্তও চীনকে সাম্রাজ্যাধিকারী রাষ্ট্রগুলির উপর নির্ভর করিতে হইত। বলা বাহুল্য, নিজেদের সুবিধাজনক সর্ত্তে উক্ত রাষ্ট্রগুলি চীনকে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করিত। ইহাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করিবার মত সাহস বা সামর্থ্য পরমুখাপেক্ষী, শক্তিহীন চীনের ছিল না। চীনের শিল্প-প্রগতিতে বাধাসৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই সমস্ত রাষ্ট্র

তাহাকে প্রয়োজনানুরূপ সাহায্য প্রদান করিত না। সাম্রাজ্যাধিকারী রাষ্ট্রগুলির এই নীতির জন্যই সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা সত্বেও বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও চীন শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে একান্ত অনগ্রসর রহিয়া গিয়াছে।

সাম্রাজ্যবাদী শোষণের কুফল মাত্র শিল্পক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, এই শোষণ কৃষির ক্ষেত্রেও চীনের গুরুতর অনিষ্টের কারণ হইয়াছে। বিদেশী পুঁজি কৃষি-ব্যবস্থার স্বয়ং-সম্পূর্ণতা ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহ চীনে যে নীতি অনুসরণ করিয়াছে তাহারই ফলে কৃষক-সম্প্রদায় সামন্ত-প্রভুদের দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। চীনা-ভূস্বামী, বণিক এবং কুসীদজীবীর সহায়তায় বিদেশী পুঁজিপতি কৃষককুলকে শোষণ করিত। ইহাদের অত্যাচারের ফলে পল্লী-অঞ্চলের জনসাধারণ দ্রুতগতিতে দেউলিয়া হইয়া যাইতে লাগিল। সামাজিক বৈষম্যও ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল। বহু কৃষক বিত্তহীন হইয়া পড়িল। কৃষকের সম্পত্তি ভূস্বামী, বণিক, কুসীদজীবী এবং সরকারী কর্মচারীদিগের কবলিত হইল। সমাজে একটি বিত্তবান কৃষক-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল। বিত্তহীন বহু কৃষক জীবিকার সন্ধানে গ্রাম ছাড়িয়া শহরে চলিয়া আসিল। কিন্তু সেখানেও তাহাদের বিশেষ সুবিধা হইল না। সমাজের একটা বড় অংশ গ্রামেই থাকিয়া গেল।

সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং কুশাসন কৃষক-সম্প্রদায়কে দুর্গতির গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়াছিল। তাহার উপর বিশ্বব্যাপী কৃষি-সঙ্কট চীনের চা এবং রেশম উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঘোরতর দুর্য্যোগের সূচনা করিল। সর্বোপরি ত্রিশ বৎসরেরও অধিককাল অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহে জাতীয় উৎপাদন-শক্তি নিঃশেষে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। বৎসরের পর বৎসর অনাবৃষ্টি, বন্যা, অজন্মা এবং তজ্জনিত দুর্ভিক্ষ কৃষককে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্গতি এবং ঘোরতর বিপর্য্যয়ের মুখে টানিয়া আনিয়াছিল। জমিতে সাধারণতঃ যে পরিমাণ ফসল পাওয়া যায়, ১৯০৪ হইতে ১৯২৯ সালের মধ্যে ষোল বার বৃষ্টির অভাবে গড়ে তাহার অর্দ্ধেক নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

চীনের পাঁচ ভাগের চার ভাগ অধিবাসী পল্লী-অঞ্চলে বাস করে। সমগ্র দেশের মোট ৩৮,০০,০০,০০০ জন পল্লীবাসীর মধ্যে শতকরা ৭০ জন ক্ষেত-মজুর ও দরিদ্র কৃষক, ২০ জন মধ্যবিত্ত কৃষক, ৬ জন সম্পন্ন কৃষক বা জোতদার এবং ৪ জন ভূম্যধিকারী পর্য্যায়ভুক্ত।

১৯৪৯ সালের শেষের দিকে মাও-সে তুং পরিচালিত সাম্যবাদী দল চীনের রাষ্ট্রকর্তৃত্ব হস্তগত করিয়াছে। ফলে গৃহযুদ্ধের অবসান হইয়াছে। রাজনীতি এবং অর্থনীতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। চীনের অর্থনৈতিক জীবনের উপর তাহার রাজনীতির প্রভাব বিশেষ ভাবেই লক্ষণীয়।

কাজেই সাম্যবাদী নেতৃবৃন্দকে সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে হইতেছে। চীনের সর্বত্র অর্থনৈতিক প্রগতির মান যে এক নহে একথাও তাঁহাদের অজানা নাই। এই জন্যই তাঁহারা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত সঙ্গতি এবং সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ধাপে ধাপে নিজেদের আদর্শকে রূপায়িত করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, প্রথমতঃ অভিনব গণতন্ত্র (New Democracy) এবং সমাজতন্ত্রবাদের সহায়তায় ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে সাম্যবাদ পুরাপুরি প্রবর্ত্তন সম্ভব নহে।

সাম্যবাদীরা বলেন যে, অভিনব গণতন্ত্রের যুগে ইহার আদর্শের অনুকূল অর্থনৈতিক সংস্থা গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই সংস্থা পুঁজিবাদী নহে, আবার সাম্যবাদীও নহে। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত পুঁজিবাদকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা না হইলেও ইহাকে পুঁজিবাদী সংগঠন বলা চলে না। এই পর্ব্বে ব্যক্তিগত উৎপাদনের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কৃষকের ক্ষেত্রজাত ফসল, বণিকের পণ্য-বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং স্বল্প পুঁজির মালিকের নিজের কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিক্রয়লব্ধ অর্থে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মাও-সে তুং সাম্যবাদী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট যে বিবরণী পেশ করেন তাহাতে বলেন যে, সামন্তসম্প্রদায় এবং বড় বড় পুঁজিপতিদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলাই অভিনব গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক সংগঠনের লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গেই তিনি বলিয়াছেন যে, অভিনব গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক কাঠামোকে কৃষির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। পরে সামন্তকর্তৃত্ব-মুক্ত এই কাঠামোর মধ্য দিয়া কৃষিকে সমবায়ের ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে হইবে। স্বল্প এবং মধ্যবিত্ত পুঁজিবাদীর অস্তিত্ব এই সংগঠনের পরিপন্থী নহে।

অভিনব গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চীনের সাম্যবাদী শাসকগণ যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহাদের বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা বলেন যে, শ্রমিক, কৃষক, নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং অন্যান্য শ্রেণীর নাগরিক সকলেই এই আদর্শের রূপায়ণে সহায়তা করিতে পারেন। এই সমস্ত সম্প্রদায়ের পরস্পরের আদর্শ পৃথক হইলেও ইহারা সকলেই সামন্ততন্ত্র এবং একচেটিয়া পুঁজিবাদের অবসান ঘটাইতে উৎসুক। সাম্যবাদিগণ বলেন যে, উল্লিখিত শ্রেণীসমূহের মধ্যে বিরোধ এবং সংঘাত অপরিহার্য্য হইলেও ইহারা সাম্যবাদীদের নেতৃত্বে উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। অর্থনৈতিক কাঠামোর ক্রমবিকাশের কোন একটি বিশেষ স্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর সহায়তা গ্রহণ সাম্যবাদের নীতিবিরোধী নহে। বিপরীতধর্ম্মী শক্তিনিচয়ের সংঘর্ষের মধ্য দিয়া উন্নততর স্তরে

উত্তীর্ণ হইবার পথে এই সমস্ত শক্তির মধ্যে ঐক্য (unity of opposites) অবশ্যম্ভাবী। চীনের নববিধান এই ঐক্যের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার অর্থনৈতিক রূপ অংশত: পুঁজিবাদী এবং অংশত: সাম্যবাদী। ইহার অর্থনৈতিক কাঠামোতে সমাজতন্ত্রবাদ, রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত এবং ব্যক্তিগত পুঁজিবাদ, সমবায়নীতি সবগুলিকেই স্বীকার করা হইয়াছে।

শ্রম-শিল্প, বিশেষত: যন্ত্রোৎপাদন-শিল্পের (heavy industry) সহায়তা ব্যতীত কোন জাতি শক্তিমান হইতে পারে না। সাম্যবাদীরা মনে করেন যে, যন্ত্রোৎপাদন-শিল্প এবং যন্ত্রেতর দ্রব্যোৎপাদন শিল্পের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। নূতন চীনের শিল্পোন্নতির প্রথম পর্ব্বে এই উভয়বিধ শ্রম-শিল্পের প্রতি সমান মনোযোগ দেওয়া হইবে। এই যুগে যন্ত্রোৎপাদন-শিল্পের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিয়া জীবনযাত্রার সাধারণ মানের উন্নয়ন ঘটাইতে হইবে। দ্বিতীয় পর্ব্বে প্রধানত: এই শিল্পের উন্নতির প্রতি, তৃতীয় ও সর্ব্বশেষ পর্ব্বে যন্ত্র ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যোৎপাদনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইবে।

পুঁজি এবং শিল্পের সমস্যা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শ্রম ও পুঁজির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। উৎপাদন বৃদ্ধিই পুঁজিদার এবং শ্রমিক উভয়ের কল্যাণসাধনের একমাত্র উপায়। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে ইহাদের উভয়ের সঙ্গে সুবিধান একান্ত প্রয়োজন। লালচীনের নেতৃবৃন্দ এবং ধনবিজ্ঞান-বিশারদগণ মনে করেন যে, গণ-পুঁজিবাদের (people's capitalism) অপরিণত অবস্থাই চীনের জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর মূলগত দুর্ব্বলতা।

শ্রম-শিল্পের ক্ষেত্রে চীন নিতান্তই অনগ্রসর। শ্রমজীবী সম্প্রদায় এবং জাতীয় স্বার্থের খাতিরে উৎপাদনের বেগ ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের কল্যাণের সহিত সমগ্র জাতির কল্যাণ অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। ব্যক্তিগত উৎপাদন-প্রচেষ্টালব্ধ অর্থের সবটাই যদি শ্রমজীবীদের কল্যাণে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে উৎপাদনবৃদ্ধি এবং শিল্পোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাব ঘটিবে। সুতরাং এই অর্থের বেশীর ভাগই চীনের শিল্পোন্নতির জন্য মজুত রাখিতে হইবে।

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অন্তর্বাণিজ্যের অবাধ স্বাধীনতা এবং বহির্বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ নবীন চীনের আদর্শ। জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর দ্রুত উন্নতি এবং বিকাশসাধনের জন্যই অনুন্নত চীনের পক্ষে সুপরিকল্পিত ভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করা একান্ত আবশ্যক। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক বিদেশজাত পণ্য আমদানির সাহায্য করা এবং এই উন্নতির পরিপন্থী পণ্যের আমদানি যতটা সম্ভব হ্রাস করিয়া দেওয়া, জাতীয় শিল্পের সংরক্ষণ এবং চীনের কৃষিজ ও শিল্পদ্রব্যের রপ্তানি বর্দ্ধিত করিয়া যে বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যাইবে তাহাদ্বারা জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনের পুনর্গঠনই এই নীতির লক্ষ্য। বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের নীতি প্রয়োগ করিবার কালে জাতি এবং রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণের কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখা হইবে।

অভিনব গণতন্ত্রের যুগে বৈদেশিক মুদ্রার জন্য রাষ্ট্র নিজেই হয়ত কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের ব্যবসায় আরম্ভ করিবে। কিন্তু তাহা হইলেও বেসরকারী উৎপাদনকারীদিগের ন্যায্য মুনাফায় হস্তক্ষেপ করা হইবে না। যে সমস্ত দেশীয় রপ্তানি ব্যবসায়ী নিজেদের বৈদেশিক মুদ্রা সরকারের নিকট বিক্রয় করিবেন, তাঁহাদিগকে ন্যায়সঙ্গত লাভের অধিকার দেওয়া হইবে। মোট লাভের কত অংশ ন্যায্য লাভ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

ভূমি-বন্দোবস্ত-প্রথার সংস্কার বর্ত্তমান সরকারের অন্যতম মূলনীতি। সামন্ততান্ত্রিক ভূম্যধিকারী প্রথা এবং ভূস্বামী সম্প্রদায়ের বিশেষ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিধানের অবসান ঘটাইয়া চাষীকে স্বাধীনতা প্রদান এই নীতির লক্ষ্য।

ভূমি-বন্দোবস্ত প্রথার সংস্কারের সূচনাতেই রাজস্ব এবং সুদের হার কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সংস্কারের পথে ইহাই প্রথম পদক্ষেপ। ইহার পরবর্ত্তী পর্ব্বে কৃষকগণের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত এবং তাহাদের সংগঠনশক্তি দৃঢ়তর হইবে। কৃষক-সম্প্রদায়ের ঐক্য এবং রাজনৈতিক চেতনার তারতম্যের উপর ভূমি-বন্দোবস্ত প্রথা সংস্কারের বেগ এবং ব্যাপকতা নির্ভর করিবে। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা এবং জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে এই সংস্কার সাধন করিতে হইবে।

চীনের নূতন আইনে কৃষক জমির মালিকানা স্বত্ব লাভ করিয়াছে, ফলে তাহার কর্ম্মোৎসাহ জাগ্রত হইয়াছে, কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছে এবং কৃষক সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটিয়াছে। নগরসমূহে শিল্পোন্নতির পথও নিরঙ্কুশ হইয়াছে।

চীনের সাম্যবাদী সরকার রাজস্ব ধার্য্য করিবার কালে পুনর্গঠনের পক্ষে অপরিহার্য্য মাল-মসলার যোগানের প্রতি এবং নির্দ্ধারিত রাজস্ব যাহাতে সমস্ত সম্প্রদায়কেই দিতে হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াছেন। কৃষিকার্য্য হইতে কৃষকের আয় এবং তাহার পরিবারের লোকসংখ্যার কথা বিবেচনা করিয়া দেয় রাজস্বের পরিমাণ স্থির করা হইয়াছে। কৃষি ব্যতীত অন্যান্য শ্রমসাধ্য কাজ করিয়া কৃষক যাহা উপার্জ্জন করে, রাজস্ব ধার্য্য করিবার কালে তাহা আয়রূপে গণ্য হয় না। ফলে কৃষক কৃষিকার্য্যের অবকাশে অন্য কাজ করিতে উৎসাহিত হয়।

কোন পরিবারে কৃষিকার্য্য দ্বারা যে অর্থ উপার্জ্জিত হয় তাহাকে সেই পরিবারের সাবালক এবং নাবালক লোকসংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করা

হয়। উৎপাদনের পরিমাণ যত অধিক, ধার্য্য করের হারও তত উচ্চ হইয়া থাকে। যে সমস্ত কৃষক-পরিবারে মাথাপিছু ১২০ হইতে ২০০ ক্যাটি ধান অথবা গম উৎপাদিত হয়, তাহারা মোট উৎপাদনের শতকরা পাঁচ ভাগ রাজস্ব হিসাবে প্রদান করে। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত রাজস্বের হারও বাড়িতে থাকে। যে সমস্ত পরিবার মাথাপিছু ১৫০১ ক্যাটি বা তাহার অধিক ধান বা গম উৎপাদন করে, তাহাদিগের নিকট হইতে উৎপন্ন ফসলের শতকরা চল্লিশ ভাগ রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হইয়া থাকে।

ভাগ-চাষী এবং ভূম্যধিকারী উভয়কেই কর প্রদান করিতে হয়। চীনের ভূমিবিষয়ক নূতন আইনে পোষ্যবিহীন ব্যাধি-গ্রস্ত স্থবির, বিপ্লবী শহীদ এবং সরকারী কর্ম্মচারীদিগের জন্যও যথোচিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

উপকূল-অঞ্চল অবরুদ্ধ হওয়ার পর চীনের অন্তর্বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বৈদেশিক বিনিময়ের বাজারে প্রায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। বৈদেশিক পণ্য আমদানী-কারীদিগের তরফ হইতে বিদেশী মুদ্রার চাহিদা না থাকায় বিনিময়ের হার বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। বাণিজ্যক্ষেত্রে অচল অবস্থার অবসান হইলে এই হারের বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। যে হারে দ্রব্যমূল্য বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই হারে মুদ্রার মূল্য বর্দ্ধিত হইতে না দিয়া লালচীনের কর্তৃপক্ষ বিদেশী মুদ্রার চোরাকারবারের অস্তিত্ব লোপ করিতে সমর্থ হইয়া ছেন। তাঁহাদের অবলম্বিত ব্যবস্থায় জনসাধারণের সঞ্চয়ের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়া মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাইয়াছে। এই ব্যবস্থা 'Parity Unit System' (প্যারিটি ইউনিট সিষ্টেম) নামে অভিহিত। দ্রব্যমূল্যের উঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে এই ইউনিট বা মানেরও হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। ফলে যাঁহারা ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখেন, তাঁহাদের কোন কারণেই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

চীনের অর্থনৈতিক নূতন সংস্কার আলোচনা-প্রসঙ্গে সাম্য-বাদী সরকার কর্তৃক চীনের বৃহত্তম শিল্পকেন্দ্র সাংহাইয়ের অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠনের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চীনের শ্রমশিল্প বহুলাংশে এখানে কেন্দ্রীভূত হইলেও ইহার সহিত এতদিন পর্য্যন্ত চীনের সংযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল না। সাংহাইয়ের শ্রমশিল্প এতদিন স্বয়ংসম্পূর্ণ বা বৈদেশিক সাহায্য-নিরপেক্ষ ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। কাঁচা মাল, সংগঠন, উৎপাদন পদ্ধতি, বৈদ্যুতিক শক্তি এবং খাদ্যের জন্য সাংহাই চিরদিনই পরমুখাপেক্ষী। এখানে উৎপন্ন পণ্যের অধিকাংশই বিলাসসামগ্রী। উৎপাদন-যন্ত্রাদি যাহা নির্ম্মিত হয় তাহা অতি সামান্য এবং চীনের অপরিণত শ্রমশিল্পের পক্ষেও অপ্রচুর। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র চীনের যাতায়াত-ব্যবস্থা মোটেই প্রয়োজনানুরূপ নহে। এই অবস্থায় দেশের প্রায় যাবতীয় শ্রমশিল্পই সাংহাইয়ে কেন্দ্রীভূত হইয়া জাতির অর্থনৈতিক বিকাশের পথে দুস্তর বাধার সৃষ্টি করিয়াছে।

সাম্যবাদীগণ কর্তৃক অধিকৃত হইবার পর সাংহাইয়ে বিদেশ হইতে কাঁচামালের আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যানবাহন-ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া যাওয়ার ফলে পল্লী-অঞ্চলের সহিত সংযোগ ব্যাহত হওয়ায় সাংহাইয়ে নিদারুণ জ্বালানির অভাব দেখা দিয়াছে। বিক্রয়-কেন্দ্রে পণ্য প্রেরণের সুবিধাও বহুলাংশে ক্ষুন্ন হইয়াছে। সাম্যবাদী প্রচেষ্টার ফলে পূর্ব্বে যে সম্প্রদায়ের ক্রেতারা বিলাসদ্রব্য ক্রয় করিতেন, তাঁহাদের ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়া ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে।

সাম্যবাদিগণ বলেন যে, সাংহাইয়ের শ্রমশিল্পসমূহকে বিদেশীর কবলমুক্ত ও বৈদেশিক সাহায্য-নিরপেক্ষ করিতে হইবে এবং শিল্পপতিদিগকে চীনের চাহিদা মিটাইবার প্রতি অবহিত হইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে দেশ হইতে শ্রমশিল্পের পক্ষে অপরিহার্য্য কাঁচা মাল সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে জ্বালানি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সমস্যা সমাধানের চেষ্টাও চলিতেছে। যন্ত্রোৎপাদন-শিল্প এবং শিল্পের বিকেন্দ্রী-করণ প্রচেষ্টাও উপেক্ষিত হয় নাই। সাংহাইয়ের বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান অন্যত্র সরিয়া যাইবার অথবা দেশের অভ্যন্তর-ভাগে নিজেদের শাখা খুলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ "ইউনি-ভার্সাল হাণ্ড-কাটিং ফ্যাক্টরী", "জি সেং মেশিনারি ওয়ার্কস", "হ্সিন হুং কু ম্যাচ ওয়ার্কসের" নাম করা যাইতে পারে।

সাংহাইয়ের যন্ত্রোৎপাদন কারখানার মালিকগণ আজ কৃষিকার্য্যে ব্যবহার্য্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করিতেছেন। পূর্ব্বে যে সমস্ত কারখানায় পশমের কাপড় বোনা হইত, তাহারা সূতী এবং অর্দ্ধ-পশমী কাপড় বোনার দিকে নজর দিয়াছে। যে সমস্ত কারখানায় আজও পশমী কাপড় বোনা হয়, তাহাদের মধ্যে কয়েকটি স্বদেশজাত পশম ব্যবহারের সিদ্ধান্ত করিয়াছে। কাপড়ের কলের মালিকগণ মিহি কাপড়ের পরিবর্ত্তে আটপৌরে সাধারণ কাপড় প্রস্তুত করিতে মনোযোগী হইয়াছেন। "ষ্টার পারফিউমারী ওয়ার্কস" প্রভৃতি রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত পরিবারে নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি উৎপাদনের উপর জোর দিয়াছে। স্বদেশজাত কাঁচা মালের দ্বারা পণ্যোৎপাদনের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। ডিসেল ইঞ্জিনগুলিকে কয়লার ইঞ্জিনে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র স্বদেশজাত কাঁচা মালের সাহায্যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে সচল রাখা দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিভিন্ন রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ সরকারকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহাদের ব্যবহার্য্য কাঁচামালের অতি সামান্যই চীনে উৎপন্ন হয়। যে সমস্ত কাঁচামাল চীনে উৎপন্ন হয় না তাহার মধ্যে রবার উল্লেখযোগ্য। মাঞ্চুরিয়ায় আজ কৃত্রিম রবার প্রস্তুতের চেষ্টা চলিতেছে।

অমরত্বের পঁয়তাল্লিশ বৎসর

পরিমল গোস্বামী

ব্রহ্মা তাঁর স্বর্গীয় আসনে ধ্যানমগ্ন। পাশে নারদ মধুর সুরে বীণা বাজিয়ে চলেছেন। এমন সময় তাঁর শুভ্র শ্মশ্রু হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠল।

নারদের চোখ ও মন বীণায় আবদ্ধ ছিল, তিনি চমকিত হয়ে বুঝতে পারলেন ব্রহ্মা তাঁর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। আজ বুঝতে পারলেন, কিন্তু তাঁর দাড়ি পাকার পর প্রথম যেদিন ব্রহ্মা সে দিকে তাকান সেদিন বুঝতে পারেন নি। সেদিন তাঁর অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়েছিল। তিনি হঠাৎ দাড়িতে আগুন ধরে গেছে মনে করে চীৎকার করে উঠেছিলেন, আর তা দেখে ব্রহ্মার গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয়েছিল। সেই থেকে নারদকে মাঝে মাঝে স্বর্গ ছেড়ে বাংলাদেশে এসে থাকতে হয়, এটি তাঁর পক্ষে এক প্রকার শাস্তি।

নারদ ব্রহ্মার দৃষ্টিপাতের অর্থ বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, পিতঃ, আমি এখনই চললাম বাংলাদেশে। সেখানে চিত্রগুপ্ত কিছুদিন আগেই গিয়েছেন, সুতরাং এবারের বাংলাবাস আমার পক্ষে খুব কষ্টকর না হতে পারে।

এ ঘটনাটি পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার। (অবশ্য এটি পার্থিব পঁয়তাল্লিশ বৎসর)। তার আগে তিনি যখন বাংলাদেশে আসেন সে প্রায় দু শ' বছর হয়ে গেল, সুতরাং এবারে বাংলাদেশের রূপ তাঁর কাছে একেবারে নতুন, বিশেষ করে কলকাতা শহরের। এ শহরই তখন ছিল না।

চিত্রগুপ্তই তাঁকে শহরের ইতিহাসটি মোটামুটি শুনিয়ে দিলেন, এমন কি কিপলিং-এর কবিতার কয়েকটি ছত্রও আবৃত্তি করলেন নারদের কাছে।

Chance directed, chance erected, laid and built
On the silt.
Palace, byre, hovel, poverty and pride
Side by side…

চিত্রগুপ্ত আরও বললেন, আজ এই দেশে আর এক ইতিহাস রচিত হতে চলেছে। বাঙালী জাতির মধ্যে তিনি এমন একটি প্রাণের সাড়া দেখতে পেয়েছেন যাতে তাঁর আশা হয়েছে বাঙালী ইংরেজের অধীন হয়ে বেশি দিন আর থাকবে না।

নারদ বললেন, কি রকম সাড়া দেখলে? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

চিত্রগুপ্ত বললেন, আপনাকে সব দেখাব।

নারদকে তিনি নিয়ে এলেন শহরের এক অংশে। তখন গভীর রাত্রি। দু'জনে চুপে চুপে একটি বাড়ীতে গিয়ে দেখেন কিসের এক গোপন সভা বসেছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেই নারদ বুঝতে পারলেন এটি একটি বিশেষ ষড়যন্ত্র সভা। অনেক যুবক এসে একসঙ্গে মিলেছে। তাদের মুখে দৃঢ়তার ছাপ, চোখে ব্যাকুলতা। তারা চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে আর চুপে চুপে আলাপ করছে। পরামর্শের বিষয়টি শুনে নারদ বিস্মিত হলেন। আপাতদৃষ্টিতে যারা ক্ষীণাঙ্গ তরুণ যুবক মাত্র, তারা নাকি দুর্দ্ধর্ষ ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়াবে। সেই উদ্দেশ্যেই কাকে কি করতে হবে তা ঠিক করছে। দেশময় একটা ত্রাসের সৃষ্টি করছে তারা, ইংরেজকে তারা এদেশে থাকতে দেবে না, যদি এর জন্যে প্রাণ দিতে হয় দেবে, কিন্তু ছাড়বে না।

চিত্রগুপ্ত নারদকে আর এক পাশে নিয়ে গেলেন। দেখলেন সেখানে কয়েকজন যুবক নিবিষ্টমনে বোমা তৈরি করছে।

নারদ বললেন, এই কয়েকজন ছোকরার এত সাহস?

চিত্রগুপ্ত বললেন, শুধু এরা ক'জন নয়, সমস্ত বাংলাদেশ আছে এদের পিছনে। তরুণ, যুবক, বৃদ্ধ, সবাই। তবে তরুণ ও যুবকদের মধ্যেই উৎসাহ অতি প্রবল। তারাই প্রধান কর্ম্মী তাদের মনে স্বপ্ন।

স্বপ্ন? কিসের স্বপ্ন?

দেশের দুঃখ ঘোচাবে, দেশকে স্বাধীন করবে এই স্বপ্ন।

নারদ চিত্রগুপ্তের দিকে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। বাঙালীর প্রতি চিত্রগুপ্তের এই অহেতুক প্রীতি কেন? মনটা ওর বড়ই দুর্ব্বল মনে হচ্ছে যেন। কিন্তু সন্দেহকে আমল না দিয়ে বললেন, আশ্চর্য্য ব্যাপার!—তিনি শুধু এই কথাটি সংক্ষেপে উচ্চারণ করলেন। তিনি নিজের অনুমানের ভুল বুঝতে পারলেন ধীরে ধীরে।

ক্রমে দিন যায়, ক্রমে তাঁরা দেখতে পান, বাইরে তাদের যে একটা শান্তভাব ছিল তা দ্রুত দূর হয়ে যাচ্ছে। তারা ক্রমেই চঞ্চল হয়ে উঠছে।

এক দিন সবিস্ময়ে দেখতে পেলেন দিকে দিকে বহ্ন্যুৎসব আরম্ভ হয়ে গেছে। যত বিদেশী কাপড় সংগ্রহ করে ছেলেরা

তাতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে, বিদেশী কাপড় আর তারা পরবে না। সবাই দেশী কাপড়ের মাহাত্ম্যে গান ধরেছে—"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।"

তারপর দেখলেন, কবি এসেছে আগুনের বাণী নিয়ে, সাংবাদিকের কলম চলছে নির্ভীক ভাবে, কর্ম্মীরা অক্লান্তভাবে স্বদেশী প্রচার করে বেড়াচ্ছে, সন্ত্রাসবাদীরা গোপন অস্ত্রে শাণ দিচ্ছে, ইংরেজ মারা পড়ছে এখানে সেখানে। বালকেরা হাসিমুখে ফাঁসিতে ঝুলছে দেশ-মায়ের কল্যাণে।

নারদ মুগ্ধ হন, কিন্তু চিত্রগুপ্তের উপর তাঁর সন্দেহ বাড়তে থাকে। তবু মনের ভাব গোপন করে বলেন, কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে পারবে এই সব ছেলেরা ?

চিত্রগুপ্ত তাঁকে শুধু বললেন, দেখে যান সব। এর মধ্যেকার আসল কথাটা হচ্ছে এরা জেগেছে। অপমানের আঘাতে জেগেছে। এরা দেহের শক্তিতে হয় তো দুর্ব্বল, কিন্তু মনের শক্তিতে এরা অজেয়। আরও বড় কথা হচ্ছে, এরা একটা মহৎ আদর্শের জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়েছে। এই যে লক্ষ্য ধরে চলেছে এরা, এই চলাটাই আজ বড় কথা। এর মধ্যে অনেক ছেলেমি আছে, অনেক ভুলই এরা করছে, কিন্তু তা হোক, ভুলের ভিতর দিয়ে না গেলে সত্য শিক্ষা হয় না।

নারদ বললেন, অর্থাৎ আগুনে পুড়ে পুড়ে ওরা খাঁটি সোনা হচ্ছে।

চিত্রগুপ্ত বললেন, ঠিক তাই। এরা অনেকেই মারা পড়বে, আর কি দুঃখ যে এরা সহ্য করবে, কিন্তু তবু খুব আনন্দ হচ্ছে এদের দেখে।

নারদ বললেন, মৃত্যুর হিসাব নিয়ে ব্যস্ত তুমি, মৃত্যুর কথায় খুশি হওয়াই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক।

চিত্রগুপ্ত বললেন, ঠিক তার উল্টো। নামে মৃত্যু নিয়ে কারবার বলেই এই জীবনের দৃশ্য আমাকে মুগ্ধ করেছে।

নারদের সহানুভূতি জাগে চিত্রগুপ্তের প্রতি। এতক্ষণে বুঝতে পারেন তার অন্য কোনও মতলব নেই, জীবনের দৃশ্যে সত্যই সে মুগ্ধ হয়েছে। নারদ নিজেও মুগ্ধ হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন।

এমন সময় একদল ছেলে হৈ হৈ করতে করতে এক বোঝা বিলিতি কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দিল ঠিক তাঁদের পাশেই। নারদ চমকে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন।

চিত্রগুপ্ত বললেন, অদৃশ্য হয়ে না থাকলে আপনার কি বিপদই না হ'ত এ সময়।

কেন ?

আপনার শুভ্র দাড়িকে বিলিতি সুতো মনে করে হয় তো তাতে আগুন ধরিয়ে দিত। ওরা যে রকম মরিয়া হয়ে উঠেছে তাতে ওদের এখন আর কাণ্ডজ্ঞান নেই।

নারদ এ কথার উত্তর দিলেন না, তিনি কেমন যেন উদাসীন হয়ে পড়তে লাগলেন।

চিত্রগুপ্ত বললেন, বাংলা দেশের এই নবজীবনের দৃশ্য আমি কখনও ভুলতে পারব না। জীবন যেখানে সত্যিই জেগেছে সেখানে তো মৃত্যু নেই, বাঙালী জাতিও মরবে না, কেননা এদের জীবন জেগেছে। এরা গুলির মুখে প্রাণ দিয়ে নতুন প্রাণ পাবে, ফাঁসিতে ঝুলে অমর প্রাণ ছড়িয়ে যাবে সকল দেশে।

নারদের মনের উপর চিত্রগুপ্তের ভাষার প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠল, দু'জনেই আত্মবিস্মৃত হয়ে চেয়ে রইলেন জনতার দিকে। দেখতে লাগলেন স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত বিচারালয়ের ব্যবহারাজীব রাজদ্রোহীকে মুক্ত করতে ছুটে চলেছে, বাগ্মীরা হাজার হাজার উৎসাহী শ্রোতার কানে স্বদেশপ্রেমের সুধাবর্ষণ করছে, ব্যবসায়ীরা দোকানে দোকানে স্বদেশী পণ্যের পসরা সাজাচ্ছে। দিকে দিকে কি চাঞ্চল্য, কি উত্তেজনা !

চিত্রগুপ্ত হঠাৎ লক্ষ্য করলেন নারদ কখন সেখান থেকে সরে গিয়ে বীণাটি পাশে নিয়ে বসেছেন। তাঁর অঙ্গুলি চঞ্চল হয়ে উঠল। সহসা তাঁর হাতে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত।

ঝঙ্কার ধাপে ধাপে চড়তে লাগল। বিশ্বসঙ্গীতের মর্ম্ম যেন ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হতে লাগল তর্জ্জনীর আঘাতে আঘাতে। যেন কোন্ অনাদিকালের সৃষ্টির ব্যাকুলতা বেজে

উঠল সেই সুরে। সে সুর হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে চলল, সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল।

চিত্রগুপ্ত মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন, তারপর কখন চমকিত হয়ে উপলব্ধি করলেন সুর নেমে এসেছে পৃথিবীর সীমানায়। লয় আরও দ্রুত হয়েছে। তাতে ধ্বনিত হচ্ছে নবজীবনের গান। যে জীবনধারা তৃণে তৃণে, পল্লবে পল্লবে, ফুলে ফুলে, অযুত নিযুত কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী মানুষের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে চলেছে এই সুর সেই জীবনের সুরের সঙ্গে ঐকতান ধ্বনিত করে তুলছে।

চিত্রগুপ্ত হঠাৎ চমকিত হলেন। তাঁর খেয়াল হ'ল, তিনি কর্ত্তব্য ভুলে একটা রোমান্টিক ভাবাবেশে বিগলিত হয়েছেন। বড়ই অন্যায়। সবাই যেন ষড়যন্ত্র করেছে তাঁর বিরুদ্ধে। সবাই তাঁকে শুধু জীবনের সঙ্গেই মুখোমুখী পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। এই ভাবালুতা ভাল নয়। এর জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে হবে স্বর্গে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। নারদের পক্ষে যা অসঙ্গত নয়, তাঁর পক্ষে তা অবশ্যই অসঙ্গত। না, এ রকম চলবে না। নারদ স্বর্গের স্বাদহীন দেশে জীবনের এমন জয়যাত্রা কখনো দেখেন নি, নারদ জীবনের গান নিয়ে থাকুন, তিনি কেন থাকবেন?

অর্থাৎ উল্টে চিত্রগুপ্ত এবারে নারদকে সন্দেহ করতে লাগলেন। নারদ বৃদ্ধ কিনা তাই মনটা বড়ই দুর্ব্বল। কি করে তাঁকে বাঁচান যায় এই দুর্ব্বলতা থেকে? তিনি নারদকে ডেকে বললেন, ছাড়ুন এসব। আমি যেমন কর্ত্তব্য ভুলে একটা মৃতদেহের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলাম, আপনিও এখন তাই করছেন। আমরা দু'জনেই অপরাধী হচ্ছি এতে। বাস্তব কর্ত্তব্য থেকে পালিয়ে মুক্তি খুঁজছি একটা তরল ভাবের মধ্যে। একেবারে রোমান্টিক হয়ে পড়ছি যে! উঠুন, চলুন, পালিয়ে যাই এই মোহের সীমানা থেকে। এই পার্থিব গজদন্ত মিনারে বসে এভাবে স্বর্গকে ভুলে থাকলে তো চলবে না। আমরা এসকেপিষ্ট হব না, উঠুন।—কিন্তু কে কার কথা শোনে? নারদ বধির হয়ে পড়েছেন—বধির বেটোফোনের মত শুধু বাজিয়ে চলেছেন।

চিত্রগুপ্ত তাঁকে আর কিছু না বলে অগত্যা সেখান থেকে সরে গেলেন। সরে গিয়ে বাংলাদেশ ঘুরে নিজের অবহেলিত কর্ত্তব্য শেষ করলেন, এবং ক'দিন পরে মন থেকে সব ভাবাবেশ ঝেড়ে ফেলে ফিরে এলেন নারদের কাছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! নারদ ঠিক একই ভাবে বীণা বাজিয়ে চলেছেন, কোনও দিকে কোন চেতনা নেই, তাঁর যন্ত্রে শুধু ধ্বনিত হচ্ছে আনন্দম্। বিশ্বচরাচরে আর কিছু নেই—শুধু আনন্দম্।

না না, এ মোহে তিনি আর পড়বেন না। তিনি এ দৃশ্যে আর বিগলিত হবেন না। জগতে মৃত্যুই সত্য—আর কিছু সত্য নয়।

তিনি নারদকে তদ্গত অবস্থায় ফেলে স্বর্গে ফিরে গেলেন, এবং পিতা ব্রহ্মাকে সব নিবেদন করলেন। নারদের ভাবান্তরের কথা শুনে ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি মনে হয়?

চিত্রগুপ্ত বললেন, মনে হয় বাঙালী জাতি তার জাতীয় জীবনে যে বিরাট নাটকের অভিনয় করতে চলেছে নারদ তার আবহ সঙ্গীত রচনায় নিযুক্ত হয়েছেন।

ব্রহ্মা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, নারদকে আর বাংলাদেশে পাঠাব না।

এর মধ্যে পঁয়তাল্লিশ বৎসর কেটে গেছে বাংলাদেশে। স্বর্গের সেটা একটা নিশ্বাসমাত্র। চিত্রগুপ্ত আবার ফিরে এসেছেন কলকাতা শহরে। নারদকে খুঁজে বের করতে তাঁর দেরি হয় নি, কারণ তিনি এখনও ঠিক একই জায়গায় পড়ে আছেন। পড়েই আছেন প্রকৃতপক্ষে। তাঁর বীণার তার ছিঁড়ে গেছে, তিনি সেই ছিন্নতার বীণার উপর মূর্চ্ছিত হয়ে শুয়ে আছেন।

কি হ'ল নারদের? কি দুর্ঘটনা ঘটল হঠাৎ? নারদের বীণার তার তো সহজে ছিন্ন হবার নয়। চিত্রগুপ্ত চার দিকে চেয়ে দেখলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি বাঙালীর মধ্যে যে বিরাট জাগরণের আভাস, যে কর্ম্মচাঞ্চল্য, যে দুর্জ্জয় শক্তি, যে একতাবদ্ধ কর্ম্মপ্রেরণা, যে ভাবোন্মাদনা দেখে গিয়েছিলেন তা যেন এত দিনে একটা বিপুল শক্তিলাভ করে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মত আকাশে মাথা তুলে মহৎ উল্লাসে ভেঙে পড়ছে। যে বিপুল শক্তির প্রথম স্পন্দন তিনি দেখে গিয়েছিলেন তা আজ যেন পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠেছে। যে চাঞ্চল্য ইতিপূর্ব্বে তিনি তরুণদের মধ্যেই সব চেয়ে বেশি

প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা আজ যুবক বৃদ্ধ সবার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে, এমন কি বয়স্করাই যেন বেশি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। গতি ছন্দপূর্ণ হয়েছে, তাতে দ্বিধা নেই, জড়তা নেই। চিত্রগুপ্ত খুশি হয়ে উঠলেন। তাঁর মনে হ'ল এমনি হওয়াই তো স্বাভাবিক। বাষ্পচালিত শকটশ্রেণীকে যখন ইঞ্জিন প্রথম টানতে যায়, তখন কত কোঁস কোঁস গর্জন, কত হাঁসফাঁস, কত ঘর্ঘর, ঝন্ ঝন্, এলোমেলো শব্দ, চাকায় টান পড়ে, কিন্তু সম্পূর্ণ ঘুরতে চায় না; চলার আভাস ফোটে, স্পন্দন জাগে, গতি জাগে না, তার পর চাকা যখন একবার ঘুরে যায় তখন চাকা ক্রমে গতিলাভ করতে থাকে, ইঞ্জিনের গর্জন থেমে যায়, চাকার শব্দে সুর লাগে, সকল দ্বিধা দূর হয়ে যায়, শকট চলতে থাকে সহজ ছন্দে।

চিত্রগুপ্ত পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে স্বস্তির আনন্দে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। নারদের মূর্চ্ছিত অবস্থা দেখে প্রথমেই তাঁর যে ভয় হয়েছিল সে ভয় দূর হ'ল, এবং তাঁর স্পষ্টই বোধ হ'ল স্বর্গের মধুর সঙ্গীতে অভ্যস্ত নারদ সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের সুরের সঙ্গে সুর মেলাতে পারেন নি, শক্তির সঙ্গে মাধুর্য্য সমান্তরাল চলতে পারে নি, তারে বিষম টান পড়েছে, তাই তার ছিঁড়ে গেছে, তাই দুঃখে বেদনায় নারদ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। অতএব আশঙ্কার বিশেষ কোন কারণ নেই। এখন ওঁকে জাগিয়ে সান্ত্বনা দিলেই ওঁর মনটা ভাল হয়ে যাবে, আর কিছুই করতে হবে না।

চিত্রগুপ্ত নারদের কাছে এগিয়ে গেলেন, এবং নারদও ঠিক সেই মুহূর্তে চোখ মেলে উঠে বসলেন। প্রথম জেগে হঠাৎ সব ধাঁধার মত লাগল তাঁর। ক্রমে পূর্ণ চেতনা ফিরে এল, চোখ দুটি উজ্জ্বল হ'ল এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে চিত্রগুপ্তকে পেয়ে আনন্দে তাঁকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন। অবস্থাটা চিত্রগুপ্তের পক্ষে খুব সুখের হ'ল না, কারণ নারদের মুখে শ্মশ্রুর অরণ্য, তার মধ্যে চিত্রগুপ্তের মাথাটি হারিয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে। আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে তিনি বেশ কিছুক্ষণ হাঁচতে লাগলেন।

নারদ হো হো করে হেসে উঠলেন। চিত্রগুপ্তের দুর্দশা দেখেই হয় তো।

চিত্রগুপ্ত বললেন, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, বেয়াদপি মাফ করবেন, কিন্তু বীণার ব্যথতা আপনার নিজের যে ব্যথতায় দাক্ষ্য দিচ্ছে, তা সত্ত্বেও আপনি হাসছেন কি করে?

নারদ বললেন, একটা দুঃস্বপ্ন দেখার পর হঠাৎ যদি জেগে দেখি ওটা নিতান্তই স্বপ্ন, তা হলে কি আনন্দ হয় না? প্রথমে যখন তার ছিঁড়ে বীণা স্তব্ধ হয়ে গেল, তখন মনে হয়েছিল ওটা আমার হৃদয়েরই তার, কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম, তার ছিঁড়ায় আমার কোন অপরাধ নেই, হৃদয়ের সঙ্গেও ও-তারের কোন যোগ নেই।

চিত্রগুপ্ত বললেন, আমি অনুমান করি জীবনের সুরের সঙ্গে সুর মেলাতে আপনার কষ্ট হয়েছে।

নারদ হেসে বললেন, জীবনের সুর কাকে বলছ?

চিত্রগুপ্ত বিস্মিত হয়ে জনতার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলেন, বললেন ঐ যে একদল লোক চলেছে প্রৌঢ় বয়সের, গায়ে মোটা কাপড় জামা, ঠিক যে মোটা কাপড়ের গান এক দিন ওরা গেয়েছিল, সেই গানের কথা আজ রূপ ধরেছে ওদের দেহে। দেশে আজ নিশ্চয় ওদের সম্মানীয় আসন। এখানে

তরুণদের মধ্যে সে বারে যে উৎসাহ দেখেছিলাম, সেই উৎসাহ দেখছি ওদের মধ্যে। ওরাই হয় তো আগেকার সেই তরুণের দল। আজ ওদের স্বপ্ন সফল হয়েছে, ওরা দেশকে গড়ে তোলার জন্যে হয় তো আরও বড় রকমের আত্মত্যাগ করতে চলেছে। বাঙালীকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনে বসাতে চলেছে। দেশের দুঃখ-দৈন্য ঘুচিয়ে জনসাধারণকে টেনে তুলতে চলেছে উপরের ধাপে।

নারদ বললেন, এর আগে তুমি আমাকে এদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে, আজ আমি তোমাকে এদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ওরা দেশকে বড় করতে যাচ্ছে না, ঐ লোকগুলো পারমিট সংগ্রহ করতে যাচ্ছে, কেউ বা ইস্পাতের, কেউ বা সিমেন্টের—

কেন?

ওর সাহায্যে ব্যবসা করে বড় হবে। দেশের জন্যে

ওদের বিশেষ ভাবনা নেই। দেশের জন্তে এককালে ওরা কেউ বা জেল খেটেছে, কেউ বা শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছে, তার দাম আজ ওরা কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিতে চলেছে।

চিত্রগুপ্তর মনটা খারাপ হয়ে গেল। এই দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন? এই দেখে নিজে প্রায় বাঙালী হয়ে পড়েছিলেন? নিজের নির্বুদ্ধিতা স্মরণ করে তাঁর আরও বেশি লজ্জা হতে লাগল। কিন্তু নারদের কথাই যে অভ্রান্ত তার প্রমাণ কি? না-ও তো হতে পারে। তিনি যেন একটু উত্তেজিত ভাবেই বললেন, না না, আপনি ভুল করছেন—ঐ দেখুন দলে দলে মেয়েরাও বেরিয়ে এসেছে পথে। আগে তো এ রকম কখনও দেখি নি, খুব মহৎ কোনো লক্ষ্য না হলে এ রকম হতেই পারে না—

নারদ বললেন, ওরা সিনেমা দেখতে চলেছে।

চিত্রগুপ্ত বসে পড়লেন একথা শুনে।

নারদ বললেন, বীণায় তার কেন ছিঁড়েছে এবারে আশা করি বুঝতে পেরেছ।

চিত্রগুপ্তের কানে সে কথা গেল না। কারণ তাঁর মনে হ'ল এবারে তিনি আর ভুল দেখছেন না। ভুল দেখলে যে নিজের নির্বুদ্ধিতা একেবারে প্রমাণিত হয়ে যাবে। তিনি সত্য দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন—এবারে দলে দলে তরুণেরা বেরিয়ে এসেছে পথে, তাদের মুখে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি। তাদের এই উল্লাস এবং উৎসাহ পূর্ব্বেকার তরুণদের উল্লাস ও উৎসাহকে স্মরণ করিয়ে দিল। চিত্রগুপ্তের চোখ মুখ ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে।

নারদ ভতক্ষণে তাঁর বীণাটি তুলে নিয়েছেন। তিনি ঐ বীণার সাহায্যেই চিত্রগুপ্তের স্বপ্ন ভেঙে দিলেন পাঁজরে এক গুঁতো মেরে। বললেন, কি দেখছ?

দেখছি এরা অন্তত কোনও বড় লক্ষ্য ধরে চলেছে। তাই নয় কি? এদের এই সম্মিলিত শক্তি এই জাতির সম্মুখে কি কোনও আশার বাণী শোনাবে না?

নারদ মৃদু হেসে বললেন, না, চিত্রগুপ্ত, না। ওরা শোনাবে বোমার আওয়াজ—

জাতির সম্মুখে কোনো আদর্শ?

জাতির সম্মুখে মেয়ে সেজে ট্রাকে নাচ দেখাবে—ভারী মজার সব নাচ। এর জন্তে এরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে অর্দ্ধাহারী লোকদের কাছ থেকে বহু টাকা চাঁদা আদায় করেছে। ওদের যে আজ বিভাদেবী সরস্বতী বিসর্জ্জনের দিন।

চিত্রগুপ্ত উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন, যাক, বাঁচা গেল।

কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তিত হলেন—কারণ এর পর একটা জাতির সর্ব্বজনীন মৃত্যুর হিসাব লিখতে এই দুর্মূল্যের বাজারে আবার নতুন করে খাতা বাঁধাতে হবে যে!

ইতিমধ্যে নারদ বীণার ছেঁড়া তারটি দ্রুত মেরামত করে নিয়ে চিত্রগুপ্তের কানের কাছে শ্মশান-সঙ্গীত বাজাতে লাগলেন। চিত্রগুপ্তও পুনরায় ভগ্নমোহ অবস্থায় লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে বলতে লাগলেন—মরণমেব জয়তে।

একা

শ্রীআশুতোষ সান্ন্যাল

একা—শুধু একা আমি শূন্য গৃহে আজ,—
কেহ নাহি আর।
আমার এ নিদ্রাহীন নিশীথের সাথী—
ঐ দূর নীলাভ্রের স্তব্ধ তারাদল,—
তিমির-সায়রে কিগো আলোর কমল?
হোথা বনতলে
কাঁদিতেছে অবিরল
ক্ষুব্ধ ঝিল্লীদল ক্লান্তিহীন।
মনে হয় ও ক্রন্দন বুক মেদিনীর
পুঞ্জীভূত বেদনার বাঙ্ময় প্রকাশ!
হু হু করে মুহুর্মুহু প্রমত্ত পবন
অনন্ত অতৃপ্তি বুকে প্রেতাত্মার মত!
আজি এই স্তব্ধ রাতে
কোন্ বেদনাতে
ভরি' উঠে কূলে কূলে হৃদয় আমার।
দেখিলাম মর্ম্মতল আলোড়ি' বিলোড়ি'—
ধু ধু শূন্য সেথা!
সব আছে—তবু মোর যেন কিছু নাই!
সব ফাঁকা—এতটুকু প্রাণের বন্ধন
কোথাও নাহিক মোর।
শূন্য গৃহ—শুদ্ধ রাত্রি—রাজপথ—জনকোলাহল
সব একাকার!
কি বিপুল নিঃসঙ্গতা আছে মোরে ঘিরি' অহর্নিশ,—
কেহ নাই এ ধরায় আত্মার আত্মীয়!
এই মত ছিনু একা অন্ধকার জননী-জঠরে,—
আর একদিন—
একাকী বিদায় লব এ সংসার হ'তে—
লোকচক্ষু-অন্তরালে নামহীন বনপুষ্পসম।
কল্পনার যে ভুবনে সদা আমি করি' সঞ্চরণ,—
যে উদ্ভুত ভাবলোকে নিরন্ত আমার
নির্জ্জন বিহার—
সেথায় একাকী আমি—কেহ নাই প্রাণের দোসর!

বীরভূমের কয়েকটি থানার সেচ-ব্যবস্থা

শ্রীশিশিরকুমার কর, বি-এস্‌সি, ইঞ্জিনিয়ারীং (ইউ-এস-এ)

গত পৌষ-সংখ্যার 'প্রবাসী'তে দেখলাম—

"ময়ূরাক্ষী নদীর বিরাট জল-সরবরাহের ব্যবস্থায় বীরভূম জেলার কোন কোন অঞ্চল উপকৃত হইবে না। রাজনগর, খয়রাসোল, দুবরাজপুর থানা এই বঞ্চিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। জমি তাদের উঁচুনীচু; সেইজন্য সাধারণ জলসেচন-রীতি তৎসম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়।"

তাই এর প্রতিকার হিসাবে সিউড়ি (বীরভূম) থেকে প্রকাশিত 'শিক্ষা ও কৃষি' পত্রিকায় বড়বন বোর্ড বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মাঃ হুশেন খাঁ একটি প্রস্তাব করেছেন। আমার মনে হয়, সবাই যদি আন্তরিক ভাবে দেশের মঙ্গল চিন্তা করেন তা হলে বাংলার দুর্দ্দিন কেটে যেতে খুব বেশী দিন লাগবে না।

খাঁ সাহেবের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। ভাখড়া বাঁধ পরিকল্পনা ভারতের বর্ত্তমান পরিকল্পনাগুলির মধ্যে বৃহত্তম এবং পৃথিবীর বৃহত্তম পরিকল্পনাগুলির মধ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করে আছে। এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে তথ্যাদি ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে আমার বিশেষ ভাবে জানা আছে, সুতরাং জায়গা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল না হয়েও যদি এ বিষয়ে দু'চার কথা লিখি তা হলে আশা করি সেটা অনধিকার চর্চ্চা হবে না।

খাঁ সাহেব প্রস্তাব করেছেন :

"ঐ অঞ্চল দিয়ে যে সকল ছোট ছোট ঝরণা, জলপ্রবাহ বর্ষাকালে প্রচুর জল বয়ে নিয়ে বড় নদীগুলোকে স্ফীত করছে সেই জলপ্রবাহগুলোর মাঝে মাঝে লোহার কপাট বসানো পাকা সাঁকো তৈরি করে যথাসময়ে জল আটকাতে পারলে তার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী জমির অনেক পরিমাণে উন্নতি সাধিত হয়।"

আমার মনে হয় "লোহার কপাট বসানো" কথাটি দ্বারা খাঁ সাহেব বাঁধ তৈরির কথাই বলতে চেয়েছেন। কারণ "ছোট ছোট ঝরণা এবং জলপ্রবাহ" কথাটিতে আমার এই মনে হয় যে, ওতে জলের পরিমাণ প্রয়োজনের চেয়ে এত বেশী হবে না যার দরুন মাঝে মাঝে অতিরিক্ত জলটা কপাট খুলে বের করে দিতে হবে।

যা হোক, এই ধরণের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করবার আগে অনেক তথ্যাদি সংগ্রহ করা দরকার এবং সেজন্যে বহু বৎসর ধরে পর্য্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান এবং পরীক্ষাকার্য্য চালানো আবশ্যক। এ বিষয়ে কিছু করবার আগে দেখতে হবে ঐ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কত, ঐ সব ছোট ছোট ঝরণা এবং জলপ্রবাহ থেকে কোন্ কোন্ মাসে কত জল পাওয়া যেতে পারে,* কতখানি জায়গার বৃষ্টির জল ঐ পথে নদীতে যায়, ঐ সব জায়গায় ছোট বাঁধ তৈরি করলে কি পরিমাণ জল সঞ্চয় করা সম্ভব হবে, ঐ জল থেকে কতটা মাটিতে শোষিত হয়ে যাবে, কতটা বাষ্পাকারে নষ্ট হবে, বাকি কতটা জল বাঁধের ভিতর রেখে দিতে হবে (dead storage) এবং অবশিষ্ট কি পরিমাণ জল সেচের কাজে লাগানো সম্ভব হবে। ঐ জল, অর্থাৎ লাইভ স্টোরেজ থেকে কৃষির প্রকৃত প্রয়োজনের সময় কি পরিমাণ জমিতে সেচ-ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে? কোন কোন জমিতে বছরে একটা আবার কোন জমিতে বছরে দুটো ফসল ফলে। এর উপরে বিশেষ লক্ষ্য রেখে এটা নির্দ্ধারণ করতে হবে। এই সব জায়গায় কোন্ ধরণের বাঁধ—যেমন মাটির বাঁধ, দু' পাশে পাথর ফেলে মাঝখানে মাটির বাঁধ কি কংক্রীটের বাঁধ, উপযোগী, কার্য্যকরী এবং কম ব্যয়সাধ্য হবে তাও বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষাসাপেক্ষ। বাঁধের ভিত্তি কত চওড়া হবে, কত গভীর হবে, তা নিজের ভার এবং জলের চাপ সহ্য করতে পারবে কিনা অথবা ভিত্তির শক্তি বাড়ানোর জন্যে কোন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া—মানুষের শরীরে ঔষধ ইনজেকসন করার মত ভিত্তির পাথরের ভিতর তরল সিমেণ্ট চালিয়ে ওটাকে একীভূত করা প্রয়োজন হবে কিনা এবং হলেও কত ফুট নীচে পর্য্যন্ত ঐ প্রক্রিয়ার দরকার হবে তা বিশেষজ্ঞ ভূতত্ত্ববিদ্ এবং স্থপতির সমবেত পরীক্ষাসাপেক্ষ। এজন্যে অনেক জায়গায় 'কোর ড্রিলিং' করে বহু নীচে থেকে পাথরের নমুনা তুলে এনে পরীক্ষারও প্রয়োজন হয়। ঐ সঙ্গে পাথরের ভিতরে ফাটল (joints) আছে কিনা এবং থাকলে সেগুলো খোলা কিম্বা বন্ধ জানার জন্য 'ওয়াটার লিকেজ টেষ্ট' করারও দরকার হয়।

দেখতে হবে এই রকম বাঁধ তৈরির ফলে কোন কৃষিক্ষেত্র, বনসম্পদ বা খনিজ সম্পদ জলের নীচে থাকে কিনা। তা ছাড়া আরও দেখতে হবে এই সব বাঁধের কার্য্যোপযোগিতা কত দিন স্থায়ী হবে। এটা ঠিক করতে

---

* অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, প্রচণ্ড বর্ষার সময় দামোদর নদ দিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে ১১,৫৮,১২৫ গ্যালন জল বয়ে যায়; অথচ গরমের সময় এ নদ দিয়ে ঝির ঝির করে যে সামান্য জলের ধারা বয়ে যায় তা কোন হিসাবের মধ্যেই আসে না। তাই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনকে গরমের চার মাস কয়লা জ্বালিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের সমতা রক্ষা করার জন্য বোকারোতে একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপন করতে হচ্ছে। এই কেন্দ্র থেকে ঐ সময়ে ঘণ্টায় দেড় লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে।

হবে যে, ঐ ঝরণার বা জলপ্রবাহের সঙ্গে প্রতি বৎসর কি পরিমাণ পলিমাটি, বালু এবং নুড়ি ভেসে আসছে এবং তা দিয়ে বাঁধটির সমস্ত কার্য্যকরী অংশ ভরে যেতে কত বছর লাগবে। বাঁধ জলপূর্ণ অবস্থায় থাকাকালে যদি দীর্ঘস্থায়ী অতিবৃষ্টি নামে তা হলে সেই অতিরিক্ত জলরাশিকে বাঁধের বা পার্শ্ববর্তী জমির ক্ষতি না করে, বের করে দেওয়ার পথ (spillway) নির্দ্ধারণও বিশেষজ্ঞের পরীক্ষাসাপেক্ষ। সর্ব্বোপরি প্রধান বিবেচ্য বিষয় হবে, আর্থিক দিক থেকে এ সব পরিকল্পনা কতদূর লাভজনক হবে তা নির্দ্ধারণ করা।

বড় বড় পরিকল্পনাগুলির উপকারিতাও বহুমুখী। জলবিদ্যুৎ উৎপাদন দ্বারাই তাদের আয় হয় সব চেয়ে বেশী। যেমন ভাখড়া পরিকল্পনা। এতে বারোটা টারবাইন বসানো হবে এবং প্রত্যেক টারবাইন ঘণ্টায় ৯৩,৩০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে। মোট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে ঘণ্টায় ১১,১৯,৬০০ কিলোওয়াট। এই পরিকল্পনার মোট ব্যয় ১৩০ কোটি টাকা এই বিদ্যুৎ বিক্রী করেই কয়েক বছরের মধ্যে পাওয়া যাবে। তা ছাড়া এর সেচ-ব্যবস্থার ফলে ৬৫ লক্ষ একর জমি থেকে যে ১৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্য এবং ৮ লক্ষ গাঁট লম্বা আঁশের কার্পাস-তূলা অতিরিক্ত উৎপন্ন হবে —সেটা হবে বিশেষ লাভ। এ ছাড়া মাছের চাষ থেকে এবং জলপথের উন্নতির ফলে আরও কিছু আয় হবে। আর একটা বড় লাভ হবে, বন্যা প্রতিরোধের ফলে নানাবিধ ক্ষতি এবং ধ্বংসের হাত থেকে দেশ বেঁচে যাবে। কিন্তু এই সব ছোট পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করবে সেচ-ব্যবস্থার উপরে। তাই পরিকল্পনা-প্রণয়নকারী স্থপতির খুব বেশী সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। খাঁ সাহেব অবশ্য মাছের চাষের উল্লেখ করেছেন। এ দিক দিয়েও পরীক্ষা এবং তথ্যানুসন্ধান প্রয়োজন।

বড় বড় পরিকল্পনাগুলোর তথ্যানুসন্ধানের জন্যে বেশী সময়ের প্রয়োজন। কয়েক বৎসর যাবৎ পরীক্ষা এবং অনুসন্ধান-কার্য্য চালানোর পর গত ১৯০৮ সালে সার লুই ডেন্ এই ভাখড়া বাঁধ পরিকল্পনা পঞ্জাব-সরকারের কাছে পেশ করেন। তদবধি দীর্ঘকাল যাবৎ বিস্তৃত ভাবে তথ্যানুসন্ধান-কার্য্য চলে। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকৃতপক্ষে এই বাঁধের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়েছে। কার্য্যতঃ দেখা যাচ্ছে, এর পেছনে অন্ততঃ চল্লিশ বৎসর ধরে ব্যাপকভাবে তথ্যানুসন্ধান ও পরীক্ষার কাজ চলেছে এবং এখনও চলছে। এ সব পরিকল্পনা প্রণয়নে স্থপতিগণের উপরে যে গুরু দায়িত্ব রয়েছে তা উপেক্ষণীয় নয়।

এই সব জায়গায় ছোট ছোট বাঁধ তৈরি করার চেয়ে অবস্থানুযায়ী ছোট-বড় নলকূপ বসিয়ে কম খরচে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যেতে পারে। জায়গাগুলি জরীপ এবং তৎসম্বন্ধে আনুষঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ না করে এ বিষয়ে অবশ্য নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা চলে না। তবে এ দুটো কাজের জন্যেও এক মাসের বেশী সময় লাগার কোন সঙ্গত কারণ নেই। উঁচু-নীচু জমির অবস্থান এবং জমির নীচে জলের অবস্থা বুঝে নলকূপের স্থান ও মাপ অর্থাৎ উহা কত ইঞ্চি ব্যাসের হবে ও কত গভীর হবে তা ঠিক করতে হবে। মাটির নীচেকার জল সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্যে ভারত-সরকারের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ আছে, তার নাম ইঞ্জিনিয়ারিং জিওলজী এণ্ড গ্রাউণ্ড ওয়াটার ইন্‌ভেষ্টিগেশন। এটা ভূতত্ত্ব বিভাগের (Geological Survey of India) অন্তর্গত। এর ঠিকানা —২৭নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা। এই প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এবং বাংলার সেচমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ও আধুনিকতম তথ্য সহজে সংগ্রহ করা যেতে পারে। গত ১৯২৭ সালে আমার এই তথ্যের প্রয়োজন হয়েছিল। তখন জানতে পারি যে, বাংলা দেশে মাটির নীচে জলের পাঁচটি স্তর আছে। প্রথম বা সর্ব্বোচ্চ স্তরে জলের পরিমাণ কম এবং জল অপরিষ্কার। দ্বিতীয় স্তরের জলও পঙ্কিল, কিন্তু পর্য্যাপ্ত। তৃতীয় স্তরের জল অপর্য্যাপ্ত, কিন্তু নির্ম্মল। চতুর্থ স্তরের জল পর্য্যাপ্ত এবং নির্ম্মল। পঞ্চম অর্থাৎ সর্ব্বনিম্ন জলের স্তর লবণাক্ত। চতুর্থ স্তরেই নলকূপ বসানো ভাল বিশেষতঃ যেখানে পানীয় জলের দরকার। সেচের জন্যে দ্বিতীয় স্তরের জলদ্বারাই অনেক ক্ষেত্রে ভাল কাজ হয়ে থাকে। এ নিমিত্ত অবশ্য উক্ত স্তরের জল পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

এ সম্বন্ধে সাধারণের পক্ষে দু-একটা বিষয় জেনে রাখা দরকার। যে স্তরে বালির দানাগুলি বড় বড় সেই স্তরেই বেশী জল এবং ভাল জল পাওয়া যাবে। সেখানেই নলকূপের ছাকনি-নল (Strainer) লাগানো উচিত। এমনও দেখা গেছে, প্রাকৃতিক কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ একটা জলের স্তরই দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে, এক ভাগ উপর দিয়ে এবং অন্যটা বেশ-কিছু নীচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। এ সব ব্যাপার নলকূপ বসাবার সময় মনোযোগ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করলে বেশ বুঝতে পারা যাবে। পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যেমন একটার পরই আর একটা ছাকনি-নল লাগানো হয় তেমন ভাবে না লাগিয়ে প্রথম স্তরের ছাকনি-নলের পর যতটা জলহীন মাটির স্তর, ততটা পর্য্যন্ত সাধারণ নল লাগিয়ে তার পর যতটা জলবাহী স্তর, ততটা পর্য্যন্ত ছাকনি-নল লাগালে খরচ কিছু বাঁচে এবং ফলও ভাল হয়।

এটা অনেকেই জানেন যে, বছরের মধ্যে কোন ঋতুতে— যেমন বর্ষাকালে, জমিতে জলের দরকার হয় না; আবার কোন ঋতুতে খুব বেশী জলের প্রয়োজন হয়। তেমনি কোন কোন ফসলের জন্যে অতি অল্প জলের দরকার; আবার কোন কোন ফসলের জন্যে খুব বেশী জলের আবশ্যক হয়। এ সব বিবেচনা করে সর্ব্বসাকুল্যে এবং গড়ে এক একর জমিতে ভাল ভাবে সেচের জন্যে বছরে ৬৭,৯৮১ গ্যালন জলের দরকার হয়।*

কোন্ ধরণের নলকূপে কি পরিমাণ জল পাওয়া যেতে পারে তা নির্ভর করে অনেকগুলি অবস্থার উপর, যেমন (ক) কত নীচে থেকে জল তুলতে হবে, (খ) জমি থেকে কত উঁচুতে জল তুলতে হবে, (গ) জমির নীচে জলের স্তরে জলের প্রাচুর্য্য, (ঘ) নলকূপ চালানোর শক্তি অর্থাৎ নলকূপ হস্তচালিত কিংবা অয়েল ইঞ্জিন চালিত অথবা বৈদ্যুতিক মোটর চালিত হবে এবং (ঙ) নলকূপের ব্যাস। কোন অভিজ্ঞ নলকূপ-ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানকে প্রথমোক্ত চারটি তথ্য জানালে তাঁরা কত ব্যাসের নলকূপে ঘণ্টায় কত জল পাওয়া যেতে পারে সে সম্বন্ধে কার্য্যকরী উপদেশ দিতে পারবেন।

প্রাদেশিক সরকারের সেচ-বিভাগ অনেক জায়গায় নলকূপ বসিয়ে তার সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা করছেন। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকার "অধিক শস্য ফলাও" পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করবার জন্যেও অনেক জায়গায় নলকূপ করে দিচ্ছেন। তাঁদের দিয়ে ঐ সব জায়গায় অন্ততঃ এক একটা নলকূপ বসিয়ে নেওয়ার সময় সমস্ত বিষয় ভালভাবে পর্য্যবেক্ষণ করলে ঐ তিনটি থানার কৃষকগণ সমবায়-প্রচেষ্টায় নিজেদের সেচ-সমস্যা সুষ্ঠুভাবে সমাধান করে নিতে পারবেন।

বর্ত্তমানে অর্থাভাবের জন্যে আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই সময় নষ্ট না করে সমবেত প্রচেষ্টায় এই সব ছোটখাটো কাজ নিজেদেরই করে নিয়ে আমাদের বেঁচে থাকার পথ করে নিতে হবে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ঐ অঞ্চলে সুলভ মূল্যে বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। আগামী চার থেকে ছয় মাসের মধ্যে এই পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশের কার্য্য সম্পূর্ণ হবে আশা করা যাচ্ছে। তাই বিদ্যুৎ-পরিচালিত নলকূপের সাহায্যে তখন এই অঞ্চলের সেচ-ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত হবে মনে হয়। এতে প্রাথমিক খরচ বাদে পরে নামমাত্র খরচে, অর্থাৎ শুধু বিদ্যুতের দামে, সেচের জল পাওয়া যাবে। তাই সেচ-বিভাগের কাছ থেকে জল কেনার চেয়ে সমবায়-প্রথায় এ ব্যবস্থা করলে কৃষকগণ যথেষ্ট লাভবান হবেন।

* সেচের জন্যে জলের পরিমাণ নির্দ্ধারণকল্পে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত হিসাব ধরা হয়:

প্রয়োজনীয় জলের পরিমাণ (গ্যালন) = জমির পরিমাণ (বর্গ ফুট) × ১/২ × ৬.২৪২০
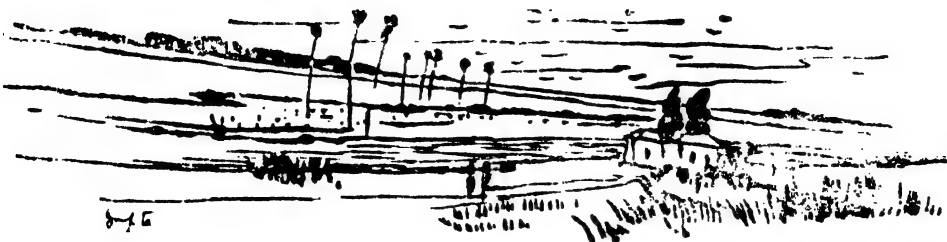
বন্দী যারা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৫

বাড়ী ঢুকে প্রভাত শুনলে ছোট বোন রাণী বলছে, দাদার জন্যে পটলভাজা রাখলে না মা ?

মা জবাব দিলেন, তোর দাদার আজ নেমন্তন্ন। কালিয়া কোপ্তা সন্দেশ রসগোল্লা খেয়ে মুখ বদলে আসবে।

আমি যাব মা !

তুই কোথায় যাবি লো—এ কি বিয়েবাড়ীর ভোজ যে তোকে ল্যাংবোট ঝুলিয়ে নিয়ে যাবে !

তবু রাণী নাকিসুরে বায়না ধরলে, মা-আঁ-যাঁব।

চুপ—আদেখলে মেয়ে কোথাকার ! মাংস যেন সাত জন্মে খাও নি—না ?

কবে খেলাম আবার ! সেই শীতকালে এক দিন—

চটাস করে একটা শব্দ হ'ল—রাণী চীৎকার করে কেঁদে উঠল। ফুলের জগৎ, ধোঁয়ার জগৎ পার হয়ে প্রভাত পৌঁছল বাস্তব জগতে। এ জগতে সৌন্দর্য্য নেই—ধোঁয়া নেই—প্রখর দিনের আলোয় শেওলা-পিচ্ছিল কলতলাটা স্পষ্ট দেখা যায়। কাটা চৌবাচ্চার পাশে ভুক্তাবশেষ ডাঁটার ছিবড়ে—মাছের কাঁটা—তরকারির খোসা। সেগুলো কাকে ঠুকরে ঠুকরে উঠানময় ছত্রাকার করেছে। বাসি ডাল পচার দুর্গন্ধ—কাল সকালে উঠান পরিষ্কার করবার আগে এ থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই। উঠান আর ঘরের ব্যবধান সামান্যই। অবশ্য এ নিয়ে কোন অসুবিধা কেউ ভোগ করে না।

এ বেলা উঠান পরিষ্কারের কথা যে হয় নি তা নয়, প্রভাতই যেন কবে বলেছিল। প্রত্যুত্তরে মা হেসে বলেছিলেন, এই করে ত মাথার চুল পাকালাম—নতুন লোকেরা এসে নতুন ব্যবস্থা করে নেন।

লক্ষ্মী একা আর কত করবে। তা ছাড়া এবেলা ওর সময়ও কম। একরাশ রুটি বেলতে কম সময় যায় না। এঘরে ওঘরে বিছানা পাতা—ছোটদের খাইয়ে আঁচিয়ে বিছানাজাত করা—এসব ত আছেই। উনুনে আঁচ উঠতে যেটুকু সময় লাগে—তার মধ্যে সুনয়নী একটু ঘুমিয়ে নেন। আঁচ উঠলেও লক্ষ্মী মাকে ডাকে না—কড়া চাপিয়ে ডালটা সিদ্ধ করতে দেয়। মা উঠে অনুযোগ দেন, ওমা আমার ডাকিস নি কেন ?

লক্ষ্মী হেসে বলে, এই ত সবে উনুন ধরল—তোমায় ডাকব-ডাকব করছি···চা খাবে ত বল—এক কাপ করে দিই।

সুনয়নী আলস্য ভাঙতে ভাঙতে বলেন, তা দে। সারা দিন খেটে খেটে গতর যেন এলিয়ে থাকে—একটু চা হলে তবু—

এ বেলা চায়ের পাট নেই। পাছে নেশা হয়ে যায় তাই এই কু-অভ্যাস রোধকল্পে অনন্ত মাঝে মাঝে বক্তৃতা দেন। প্রভাতরা জানে ওইটাই আসল কথা নয়। নিমন্ত্রণের চিনি এক বেলাকার চায়ে কোন রকমে কুলিয়ে যায়। দুধ, চা কিংবা কালোবাজারের চিনি কোনটাই সুলভ নয়। হিসাব করে দেখা গেছে ঐ খরচে একটা লোকের এক বেলাকার খোরাক পুষিয়ে যায়। হিসাবটা আছে অনন্তের মুখে।

যে চড়া সুরে মনের তার বাঁধা ছিল—তা অকস্মাৎ কেটে গেল। প্রভাত স্থির করলে নিমন্ত্রণে যাবে না।

আজকাল ওই তেতলা বাড়ীটা দেখে এমন কোন ভাবান্তর হয় না মনে। তবে কোন কোন রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে ওর আলোকদীপ্তি নিদ্রা-কোমল দৃষ্টিকে আঘাত করে—বিদ্যুৎ-বিদারণ রেখা মনকে চমক দেয় মাত্র। সংসারী মন হয়ত হিসাব কষে—সবাই যখন নিদ্রামগ্ন তখন সারা বাড়ীটাকে বিদ্যুতের মালা পরিয়ে রাখার কি সার্থকতা ?

এক দিন রাত্রিতে খাবার সময় সেকথা কে যেন জিজ্ঞাসা করেছিল—সুনয়নী হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, ওদের ত আর চাকরির পয়সা নয় যে, দিন গুণে কড়ি ব্যয় করতে হবে।

সত্যই চাকরির পয়সা নয়। দশ বছর আগে এক দিন সকালে এ গলির বাসিন্দারা দেখলে—প্রায় বিঘাখানেক জমিতে যে উড়ে-বস্তিটা ছিল—সেটাতে ভাঙন ধরেছে। খবর নিয়ে জানা গেল, কোথাকার কে একজন বড়লোক জমিটা সস্তায় কিনেছেন—প্রায় এক বছর আগে। এ গলিটা যাঁর নামে তাঁরই উত্তর পুরুষেরা আজ কমলার কৃপাবঞ্চিত হয়ে সরিকানি মামলায় আরও অনেক বিষয়ের সঙ্গে ওই জমিটুকুও হস্তান্তর করেছেন। না করলে নিজেদের বসতবাড়ীটুকু রক্ষা করা কঠিনই হ'ত ! অবশ্য বসতবাড়ীর বড় বড় থাম-ওয়ালা পলস্তরা-খসা বারান্দাতে পূর্ব্বের সমৃদ্ধির বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট নেই—সেটা এক কালের আভিজাত্যের চিহ্নস্বরূপ পথচারীর করুণা উদ্রেক করে শুধু। গোষ্ঠীবৃদ্ধির সঙ্গে আয়ের অঙ্ক সঙ্কুচিত হওয়াতে বাড়ীটা টুকরো টুকরো ভাগ হয়ে গেছে এবং এই বিভাগের অপরিহার্য্য অঙ্গস্বরূপ কলহ বিবাদ আর দারিদ্র্য সে বাড়ীতে কায়েমি ভাবে বাসা বেঁধেছে। নিষ্ঠুর কালের আঘাতে ওঁরা শতধাবিচ্ছিন্ন হলেও মর্য্যাদার মানদণ্ডটিকে সযত্নে আঁকড়ে ধরে আছেন। ফলে এই গলির অন্যান্য বাসিন্দাদের সঙ্গে ওঁরা স্বভাবে বা সামাজিকতায়

মেলেন না। কেউ কেউ পরিহাস করে বলেন, সেকালের বনেদি বংশ, ওঁরা ইতিহাসের বস্তু। জাতীয় মিউজিয়াম ওদের যোগ্য আশ্রয়।

সে যাই হোক, নতুন যাঁরা গোপনে বস্তির জমিটা কিনে নিলেন—তাঁরা সঙ্গে সঙ্গেই দখল নিতে পারলেন না জমিতে। আইনের অনেকগুলি ছোটবড় ধাপ ডিঙাতে বছরখানেক লাগল তাঁদের। তারপর এক দিন খটাখট শব্দে গোলপাতার বা খোলার ছাউনি স্থানচ্যুত হ'ল—বাক্স প্যাঁটরা বিছানাপত্র থালা-ঘটি নিয়ে বাসিন্দারা বাসা ছাড়ল। জায়গাটা সাফ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এল লরিভর্ত্তি ইট, কাঠ, চুণ, সুরকি, মাটি, লোহা, পাথর—এল বাঁশের গাড়ী, মিস্ত্রির দল। মোটরে করে বাবুরা আসতে লাগলেন ঘন ঘন এবং দেখতে দেখতে বছরখানেকের মধ্যে প্রকাণ্ড এক সৌধ মাথা তুলে দাঁড়াল। গলির এ প্রান্তের চেহারা গেল বদলে। ওরা গৃহপ্রবেশের দিন যথেষ্ট সমারোহ করলে। গলির প্রত্যেক বাড়ীতে কর্ত্তা নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ করলেন, প্রত্যেকের সঙ্গে আলাপ জমালেন অমায়িকভাবে। শোনা গেল এ সমৃদ্ধি পূর্ব্বপুরুষ-লব্ধ জমিদারীর দৌলতে নয়—আধুনিককালের উদ্যমে আয়ত্ত। গত যুদ্ধের সময় কিছু পুরানো লোহায় যে টাকাটা আসে তারই সুনিপুণ প্রয়োগে গড়ে উঠেছে একটি লোহার সিন্দুকের কারখানা, একটি ব্যাঙ্কের কিছু অংশ কেনা হয়েছে, এবং সেই সঙ্গে চলছে টুকিটাকি কন্ট্রাকটারী। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এল—তার বড় ঢেউটা এদের ব্যাঙ্ক ভরে দিলে—লাখ কোটিতে পৌছল।

এখন যে-কোন উৎসবে বাড়ীর সামনে মোটরের সার দাঁড়ায়—সদর-দরজার মাথায় হাজার ওয়াটের বিজলীবাতি জ্বলে—স্বর-বিস্তারক যন্ত্র উদ্গীরণ করে নামকরা সব রেকর্ডের গান। তা বলে ওঁরা যে পদমর্য্যাদার ভারে সর্ব্বদাই ভারী হয়ে আছেন তা নয়। কর্ত্তা সকলের সঙ্গে ডেকে ডেকে কথা ক'ন—কুশল প্রশ্ন করেন। এই গলির অধিকাংশ লোকই এঁদের উপর প্রসন্ন। কেবল যাঁদের পূর্ব্বপুরুষের নামে এই গলিটা তাঁরা বিরূপ মন্তব্য করেন, টাকা হলেই বনেদিয়ানা থাকে না, খানদানির খোসবু এক পুরুষে বার হয় না। ওদের দৌড় ওই রেডিও পর্য্যন্ত! করুক দেখি কলির রাজসূয়—এ আর যার তার কর্ম্ম নয়!

অর্থাৎ ওঁদের মতে দুর্গোৎসবটা একালের আভিজাত্যের বাতসহ নয়। পুজার মধ্যে যে রাজসিকতা, বাজী রোশনাই, কাঙালীবিদায় যাত্রা ঢপ-কীর্ত্তনের আসর বসানো আর বৈঠকখানায় ইয়ার বন্ধু নিয়ে কারণ-সমুদ্রে গা ভাসিয়ে হল্লা করা এ সবের মর্ম্ম এরা বুঝবে কি করে! ঘরের লোহার সিন্দুকে সঞ্চয় করে এদের মন ভরে না—ব্যাঙ্কের শরণ নিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হয়। সঙ্কীর্ণ মন—পাছে হাতের নাগালে থাকলে টাকা খরচ হয় তাই নিয়ম-কানুনের নিগড়ে বন্দী করে আটকে রাখার ব্যবস্থা! এরা অভিজাত! দেখাক তো ক'টা দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেছে কে? শিক্ষার জন্ত দরাজ হাতে বিশ্ববিত্যালয়ে দিয়েছে কি কেউ কিছু? অন্তত: নিজের গ্রামে একটা নিম্নপ্রাথমিক বিত্যালয় স্থাপন? মন্দির অতিথি-শালা প্রতিষ্ঠা, জলাশয় খনন, রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণ, অন্তত:-পক্ষে স্নানার্থীর জন্ত গঙ্গার তীরে একটা ঘাট বাঁধানো…কিছু না, কিছু না। এ যুগে মানুষের পুণ্যের নেশা ছুটে গেছে, আর সেই কারণেই নিকটতম প্রতিবেশীকেও ভুলে গেছে!

কথাগুলি যে ভাবেই বলা হোক—মাঝে মাঝে প্রভাতের মনে তরঙ্গ তোলে। সে ভাবে—আমরা এই ভাবে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছি না কি? এ যুগের হাওয়া পরার্থপরতার বোকামি থেকে মুক্ত করে মানুষকে আত্মপরতার কায়েমি দুর্গ গড়তে উদ্বুদ্ধ করছে না কি? বুদ্ধিবাদী মানুষ যুক্তি-বিচার দিয়ে এই ক্রমবিকশিত সভ্যতাকেই পূর্ণাঙ্গ করে তুলছে।…

সে স্থির করেছিল, নিমন্ত্রণে যাবে না · অনিমেষ অনুযোগ দিলে শরীর খারাপ এই অজুহাত দেখাবে। কিন্তু হাজার ওয়াটের বিজলীবাতিটা ভারি দৌরাত্ম্য বাধালে। পথের ও-প্রান্তে জ্বলেও তারা ঘরটাকে রোশনাইয়ে ভরিয়ে দিয়েছে। শ্রেণীবদ্ধ মোটর দাঁড়িয়েছে গলিতে, মিশ্র পুষ্পসার সৌরভের কিছু অংশ সমস্ত গলিটায় বিতরণের ভার নিয়েছে বাতাস। আর বহুপরিচিত বন্ধু এসেছেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। গুণী জ্ঞানী বিদগ্ধ খ্যাতিমানও কেউ কেউ এসেছেন। ওখানে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আসর বসবে, বিশ্ব-সাহিত্যের প্রসঙ্গ উঠবে—রাজনীতি ও সমাজনীতি নিয়ে তর্ক-উত্তেজনাও কম সৃষ্টি হবে না। এই ধরণের অভিজাত-আসর প্রভাতকে চিরকাল লুব্ধ করে। যে পৃথিবী কোন কোন দিন স্বপ্নে ভাসে তারই বাস্তব মূর্ত্তি—এই সব আসরে ওর চৈতন্তকে অভিভূত করে, সে মগ্ন হয়ে যায় তার মধ্যে।

আশ্চর্য্য, কখন ওর বেদনা মুছে গেছে মন থেকে—রুক্ষ পৃথিবী অন্ধকারেই আত্মগোপন করেছে। অন্ধকারেই ও করেছে বেশ বদল। আরশি আর চিরুণী নিয়ে হাজার ওয়াটের আলোয় পালিশ-করা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে প্রসাধনে নিবিষ্টচিত্ত হয়েছে। তারপর আলোর বন্তায় স্নান সেরে অনিমেষদের উৎসব-আসরে এসে জমেছে।

উৎসাহটা দীপারই বেশী। উৎসব-কেন্দ্রটা যেন ওর স্বচ্ছন্দ বিচরণের উত্তান। রঙীন প্রজাপতির মত সে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। বড় একটা পিতলের বালতিতে ভর্ত্তি রয়েছে গোলাপজল, পিচকারিতে ভরে অতিথিদের গায়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে দীপার ছোট ভাই আর বোন। দীপা মাঝে মাঝে তাদের কাজের তদারক করছে—উপদেশ দিচ্ছে। কখনও রেডিও-সেটের কাঁটা ঘুরিয়ে দিল্লী লক্ষ্ণৌয়ের ভাল প্রোগ্রাম সন্ধান করছে—কখনও পেয়ালা পিরিচ নিয়ে চা পরিবেশনে ব্যস্ত

হয়ে উঠছে। কখনও-বা ঘরের কোণে অর্গিনটার সামনে বসে টুংটাং শব্দ তুলছে—পরমুহূর্তে কোন পরিচিত মুখের আবির্ভাবে দোরগোড়ায় ছুটে এসে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। সর্ব্বত্র ওর সতর্ক পাহারা।

প্রভাত ঘরে ঢুকতেই ও ছুটে এল, বড্ড দেরী করে এসেছেন প্রভাত-দা—চায়ের আসরটা মিস করে ফেললেন।

ভালই হ'ল। প্রভাত হাসল। আর সবাই এসেছেন ত ?

দাদার অবস্থা দেখছেন ? ওই দেখুন—এক কোণে কেমন গম্ভীর হয়ে গুরুজনদের আলোচনা শুনছেন !

সেদিকে চেয়ে প্রভাত হেসে উঠল। দীপা ওষ্ঠে তর্জ্জনী রেখে বললে, আস্তে। দাদা বুঝতে পারবে আমরা ওর কথা নিয়ে ঠাট্টা করছি।

কি এত আলোচনা হচ্ছে ওখানে ? প্রভাত জিজ্ঞাসা করলে।

ব্যারিষ্টার বাবু সাহেব আর কি আলোচনা করতে পারেন ওদেশের কথা ছাড়া ? সত্যি ওঁর গল্প ভারি ইণ্টারেষ্টিং। জানেন, ব্যারিষ্টারি-শিক্ষার অঙ্গ হ'ল নাকি ডিনার আর এটিকেট। ও দুটি সাবজেক্টে পাসমার্ক রাখা রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার !

মানে ? অনিমেষও কি বিলেত যাচ্ছে ব্যারিষ্টারি পড়তে ?

কে জানে দাদার কি ইচ্ছে ! মনে ত হয় না ও পড়বে। কন্টিনেণ্ট ট্যুরও হতে পারে।

অনিমেষের বাবা ওদের কাছে এসে বললেন, চা খেয়েছ প্রভাত ? দীপা—

দীপা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে, বলেছিলাম। কিন্তু উনি বলেন—খুব বেশী চা খাওয়া—

দীপার বাবা হাসলেন, অবশ্য ঘন ঘন চা খাওয়ার পক্ষপাতী আমিও নই। কিন্তু মানুষকে আদর-অভ্যর্থনা জানাতে এ ছাড়া—

দীপা বললে, বিজ্ঞাপনের ভাষা ব্যবহার করছ বাবা।

দীপার বাবাও হাসলেন, তবু তোর বাবার উক্তি পেয়ালার ছবির সঙ্গে ছাপা হবে না। ওরা চায় বাণী—নামজাদা লোকের।

এটা ওদের অন্যায়। নামজাদা লোকেদের চেয়ে অনামীরাই ত চায়ের প্রধান ভক্ত। নয় প্রভাত-দা ?

ইতিমধ্যে অনিমেষ ওধার থেকে উঠে এসেছে। প্রভাতকে বললে, বলিহারি তোমার সময়জ্ঞান ! বাড়ীর কাছে বাড়ী কি না !

প্রভাত লজ্জিত হাস্যে বললে, ত্রুটি স্বীকার করছি। এর জন্য শাস্তি কিছু ভোগ করেছি চায়ের আসর মিস করে—তাই কি যথেষ্ট নয় ! আর সব মূর্ত্তিমানরা কোথায় ?

ওই যে পাশের ঘরে বিলিয়ার্ড খেলছে।

বিলিয়ার্ড !

হাঁ—ও খেলাটা আমার ভারি পছন্দসই—তাই সপ্তাহ-খানেক হ'ল একটা টেবিল আনিয়েছি—ঘরের অভাবে ওটা পড়ার ঘরেই ফিট করিয়েছি।

ভাল লাগছে খেলাটা ?

চমৎকার ! দীপা পর্য্যন্ত এর ভক্ত হয়ে উঠেছে—বাবাও এক দিন যোগ দিয়েছিলেন। আর দেখবি।

চলতে চলতে প্রভাত বললে, তুই নাকি কন্টিনেণ্ট ট্যুরে যাচ্ছিস ?

ট্যুর ? হাঁ ট্যুরও বলতে পার। তবে ওদেশের নামজাদা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে ভারি সাধ হয়। তুই ত জানিস আমার বরাবরের সাধ বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের মত একটা গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করি।

ঘরটার মধ্যে ভিড় জমেছে। প্রকাণ্ড টেবিলের চার পাশে কৌতূহলী জনতা। লাঠি আর বল দিয়ে বোর্ডে ঠোকাঠুকি করছে সবাই—কোলাহল জমেছে। ঠিক খেলা শেখার আগ্রহে সবাই যে এখানে জড়ো হয়েছে তা নয়। নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে একটা কিছু করার তাগিদও ত আছে। এই তাগিদেই সঙ্গী-নির্ব্বাচন করে নিমন্ত্রণ বাড়ীতে যে যার বৃত্ত তৈরি করেন। সে বৃত্তে শেয়ার মার্কেট, কলেজের শিক্ষা, ফুটবলের ষ্টাণ্ডার্ড, চিত্রতারকাদের কথা, ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার বেলগোত্র, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতির বিশ্লেষণ এবং সমাজের গলদ—কোন প্রসঙ্গই অসমালোচিত থাকে না, এবং আলোচনার ধারাটা সমালোচনার পর্য্যায়ে পড়ে বলেই তর্কের ঝাঁজ বাড়তে থাকে।

এ হতে পারে না।

কেন পারে না ?

আমি বলছি পারে না।

যুক্তির খেই হারিয়ে তর্কের আসরে আমিটাই প্রকট হয়ে ওঠে। এই সর্ব্বজ্ঞাতা আমিকে অগ্রগামী না করে কে জমাতে পারেন তর্ক ! এই আমি ভ্রান্তিশূন্য—ভবিষ্যদ্দর্শী—ধুরন্ধর রাজনীতিজ্ঞ—পাণ্ডিত্যে অপরাজেয়, জ্ঞানে-বুদ্ধিতে বৃহস্পতি-তুল্য। এই আমিকে নিয়েই বহুক্ষেত্রে বিভ্রাট বাধে।

এই আমি উগ্র হয়ে উঠেছে একটা বৃত্তে। বিষয়টি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভ। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ঘা দিয়ে এবেলা ওবেলা বিলেত ছুটছেন—যা দিয়ে ভারত-বিভাগের আন্দোলনটা প্রবলতর হয়ে উঠছে। বাংলা আর পঞ্জাব দু' টুকরো হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

তর্কে এক দল নিয়েছেন বিভাগের সপক্ষে। বলছেন, এ না হলে বাঙালীর রক্ষা নেই। লীগের শাসন দুঃস্বপ্নের মত জনগণের মনে ভারী হয়ে চেপে আছে, খানিকটা জমি পেলে লোকেরা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে।
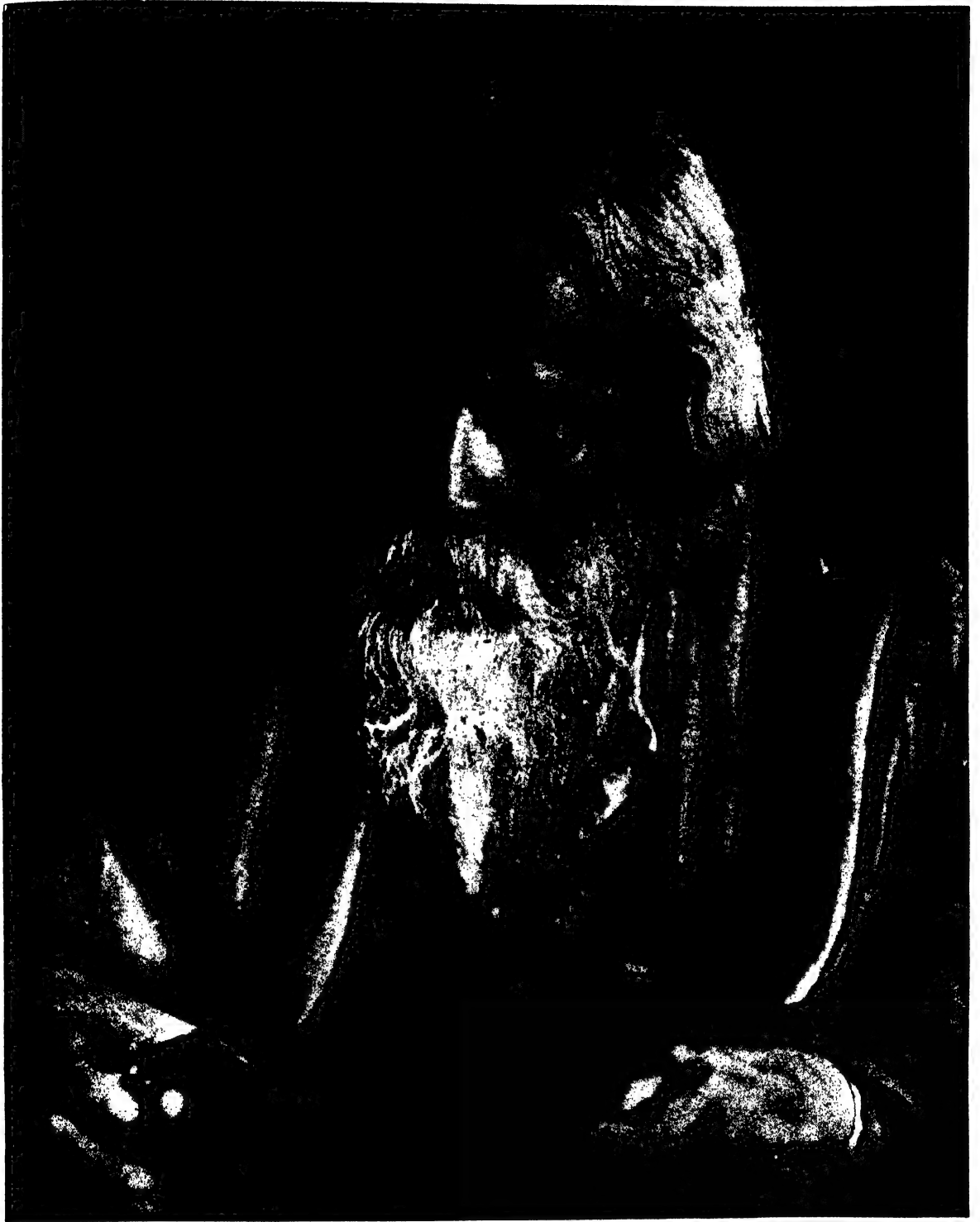
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবলা বসু
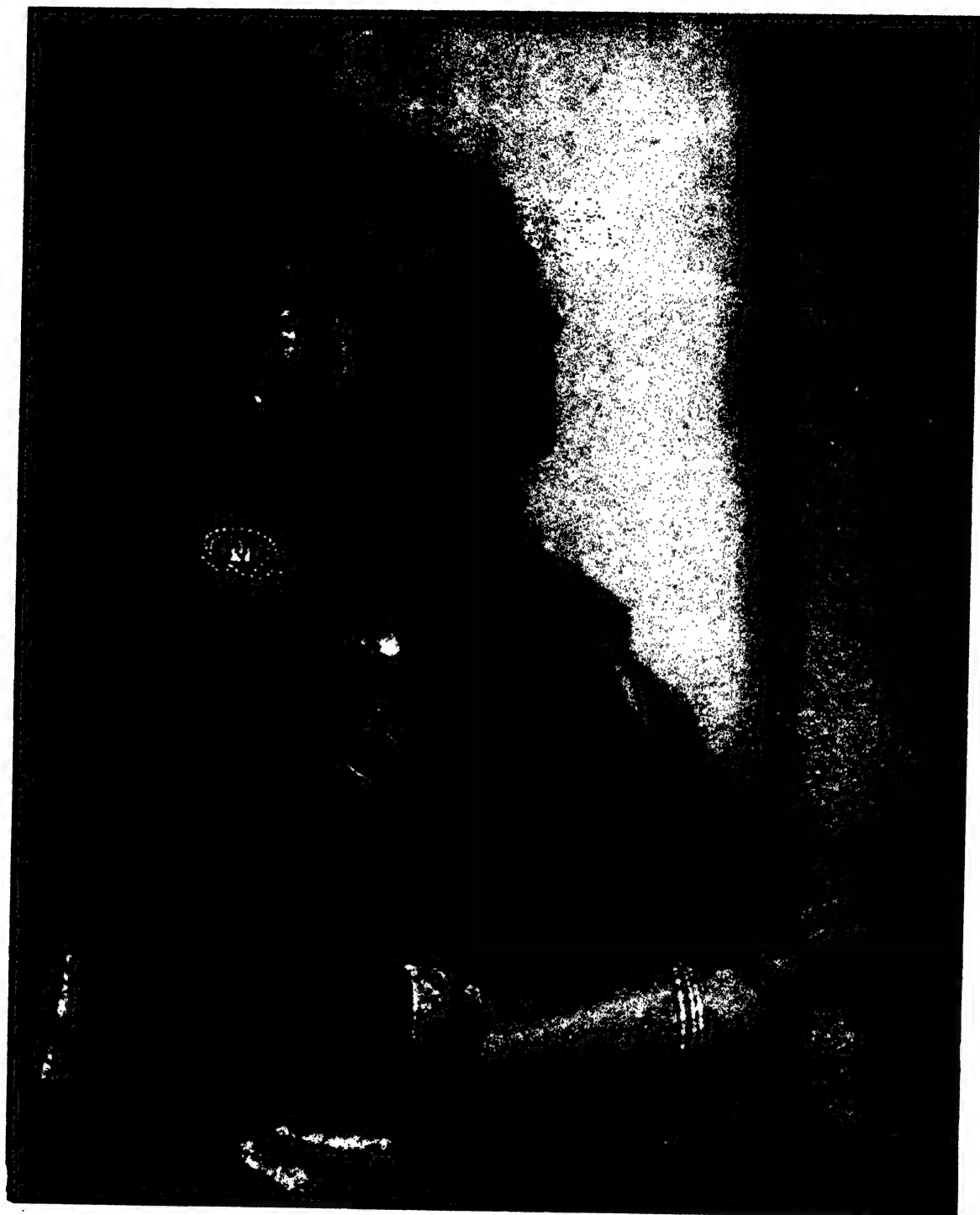
অত দল বলছেন, তাতে করে বাঙালীর মৃত্যু ঘটবে। এতকাল আন্দোলন চালিয়ে জেল খেটে ফাঁসিকাঠে ঝুলে হন্নছাড়া জীবন যাপন করে সবদিকে দেউলে হয়েছি কি এই খণ্ডিত ভারতবর্ষের জন্যে ! আধাআধি রফা নয়—চাই পুরো ভারতবর্ষ—পূর্ণ স্বাধীনতা।

প্রভাত খানিক দাঁড়িয়ে তর্কের মর্ম্মোপলব্ধি করবার চেষ্টা করলে। আসন্ন স্বাধীনতা নিয়ে সর্ব্বত্র তর্ক চলছে—যুগপরিবর্ত্তনের সূচনায় এ হবেই। কিন্তু যে যার মনগড়া নীতির পরিপোষকতায় যখন তর্ককে কলহে রূপান্তরিত করেন প্রভাত আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে তর্কটাই কি উদ্দেশ্যসাধনের একমাত্র উপায় ? পাড়ায় বেকার ছেলেরা—অবসরভোগী বুড়োরা—স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা তাস-পাশা গান-বাজনা নাটক মহলার আসরে কাজ-ফিরতি যুবকেরা এই নিয়ে যখন তখন আলোচনা করছে। ট্রামে-বাসে-ট্রেনে সর্ব্বত্র এই কথা। কিন্তু স্বাধীনতা পেলে কে কি করবে এ কথা কেউ বলছে না। তখন বুঝি এ নিয়ে চিন্তা—কর্ত্তব্য কিছুই থাকবে না ? চরণ মুদির কথা মনে পড়ল প্রভাতের। কিছুদিন আগে ও জিজ্ঞাসা করেছিল—হাঁ দাদাবাবু, এই স্বাধীনতা হলে আমাদের আর এত খাটতে হবে না, কি বলেন ? আবার টাকা টাকা মণ চাল হবে ত ?

প্রভাত হেসে বলেছিল, না চরণ-দা—আর দুটো হাত বার করতে হবে—দুটো পা-ও। খাটতে হবে আরও বেশী।

দাদাবাবুর যেমন কথা। অবিশ্বাসের হাসিতে চরণের মুখ ভরে উঠেছিল।

শুধু চরণ মুদি নয়—স্বাধীনতা সম্বন্ধে এই ভাবের অস্পষ্ট ধারণা প্রায় সকলেরই। স্বাধীনতা মানেই ত যখন যা খুশি করতে পারা—যা খুশি বলতে পারা—গুরুজনের ভয়—আইনের ভয়—রাজদ্রোহের ভয় প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ভয় থেকে মুক্ত হওয়া। ব্যক্তি-স্বাধীনতার এ ছাড়া অন্য অর্থই বা কি !

প্রভাত তর্কের আসরে যোগ দিলে না। এ ধরণের উগ্র মতবাদ প্রকাশে ও অভ্যস্ত নয়। অন্য দিন বিশ্বের মনীষীদের নিয়ে চায়ের আসরে যে স্নিগ্ধ পরিবেশের সৃষ্টি হয়—সে সুর আজকের উৎসবে নেই। আজ উৎসবটাই বাইরের—বাইরের কথাই আসরের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

চলে আসছে—ওর বাঁ পাশে ছোট একটি টিপয় ঘিরে সুপ্রসাধিতা একটি তরুণী ও বর্ষীয়সী বসে কথা কইছেন—প্রভাতের কানে গেল।

বর্ষীয়সীর স্বর : ওঘরে এত হুড়োহুড়ি কিসের রে ?

একটা বিলিয়ার্ড বোর্ড এসেছে। ছেলেরা এমন আনাড়ীর মত বল মারছে ! মুখে রুমাল চাপা দিয়ে মেয়েটি হাসল।

ওমা—তাই নাকি ? তা আর হবে না—অনিমেষের বন্ধু ত ভারি যত মিডিয়কর ছেলে ! ওরা বিলিয়ার্ড খেলার জানে কি।

স্-স্। মেয়েটি প্রভাতকে দেখে বর্ষীয়সীকে থামতে বললে। তিনি একটু হেসে প্রভাতের পানে চাইলেন।

প্রভাতও তাকালে ওঁর পানে। নিখুঁত প্রসাধনে উনি বয়সকে চারের কোঠা থেকে তিনের কোঠায় নামিয়েছেন। কিন্তু ঘাড় ফেরানোর কালে স্পষ্ট দেখা গেল গলার ঈষৎ লোল চামড়ার সূক্ষ্ম খাঁজে খাঁজে পাউডারের প্রলেপ খড়িমাটি-গুঁড়োর মত লেগে রয়েছে। এঁদের চালচলন বা কথাবার্ত্তা যে অকৃত্রিম নয় সেটা প্রভাত জানে। এঁদের অভিমতও কোনদিন ওর অন্তর স্পর্শ করে নি—তবু ওর মনে বার বার ধ্বনিত হতে লাগল—এরা সব মিডিয়কর ছেলে—অত্যন্ত সাধারণ অর্থাৎ অত্যন্ত খেলো।

৬

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুম এল না। হয়তো গুরুপাক আহার্য্য পাকস্থলীর উপর চাপ দেওয়াতে রক্তচলাচল কিছু অস্বাভাবিক হয়েছে কিংবা হাজার ওয়াটের আলোর প্রখরতা গলি ভাসিয়ে ওর খোলা জানালা দিয়ে ঘরকেও উত্তপ্ত করে তুলেছে। আর নানান চিন্তা, অনিমেষদের চায়ের আসর কেন ওর ভাল লাগে ? প্রতিদিন চায়ের টেবিলে গিয়ে যে প্রসঙ্গ ওঠে তা শিক্ষা, সাহিত্য, সঙ্গীত কখনো বা রাজনীতিকে কেন্দ্র করে। তর্কবিতর্ক হয়—তাতে ঝাঁজ থাকে না। শিক্ষা-সমস্যা বা সাহিত্যের সৌন্দর্য্য নিয়ে যে সব অভিমত ব্যক্ত হয় সেগুলি চিন্তাশীলতা ও বৈদগ্ধ্যে ভরপুর। দেশ-বিদেশের মনীষীদের নিয়ে এই ধরণের আলোচনা হয় :

রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতার স্বরূপ কি, শ'য়ের চমক-লাগানো বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে বিশ্বে কেন আলোড়ন ওঠে, এককালের অতিআধুনিক প্রগতিবাদী হাক্স্‌লি কেন ভারতীয় যোগীর মত নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছেন, কোন্ জ্ঞানের ঐশ্বর্য্য আহরণে তিনি বিসর্জ্জন দিলেন পার্থিব যশ-সম্পদকে, মনীষী রলাঁর জীবনদর্শনে বিশ্বকল্যাণের রূপটি কি করে অপূর্ব্ব সুষমায় ফুটে উঠল, নির্য্যাতিত জনগণকে—নীচের তলার মানুষকে নিয়ে গোর্কি রচনা করলেন প্রাণবন্ত সাহিত্য, টলষ্টয়ের মানবপ্রীতি কি ভাবে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যমে সুপ্রকাশিত হ'ল, দুরন্ত ব্যাধির আক্রমণে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে টমাস ম্যান রচনা করলেন জীবনের জয়যাত্রার কাহিনী, দীর্ঘকাল ভবঘুরে জীবন কাটিয়ে শরৎ চন্দ্র বাংলা সাহিত্যে অকস্মাৎ এক দিন পূর্ণচন্দ্রের মত আবির্ভূত হয়ে বাঙালীর হৃদয় জয় করে নিলেন। বিভিন্ন দেশে রীতি রুচি জলবায়ু পরিবেশ ভিন্নতর হওয়া সত্বেও চিন্তার ক্ষেত্রে সবাই পরস্পরের হাত ধরে দাঁড়ান—বর্ণ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম বা ঐশ্বর্য্যের দারুণ অসঙ্গতি সত্বেও মানুষ পৃথক হয়ে থাকে না—'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই চিরন্তন সত্য প্রচার করেন তাঁরা এবং জাতীয়তাবাদকে মুছে

ফেলে মানবিকতার উদ্বুদ্ধ হতে আহ্বান জানান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে এঁরা সবাই মিলে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, কিন্তু হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী এঁদের কথা শোনে নি। এর পর ধ্বংস আর মৃত্যুর বিভীষিকা পৃথিবীর উপর দিয়ে বয়ে গেছে। তবু পৃথিবীতে আজ এত বেশী সমস্যা ও কোলাহল এমন প্রচণ্ড যে ওঁদের সত্যবাণীর সুর কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে। এমনি চলবে আর কতকাল! গর্ব্ব-বিমূঢ় মানুষ শ্রেণী-বিভাগের ধ্বজা তুলে কতদিন আর চীৎকার করবে—আমরা প্রধান—আমরা আর্য্যবংশধর—পৃথিবীর ধন আমাদের, অর্থ আমাদের, সম্মান আমাদের।

উৎসবের আসরেও এই কৌলীন্যের গৌরব! অনিমেষের বন্ধুরা বিলিয়ার্ড বোর্ড নিয়ে আজ হৈ চৈ করছে। ওরা সত্যিই সাধারণ ছেলে। অত্যন্ত সাধারণ—সমাজ-জীবনে বৈচিত্র্যহীন জীবন যাপন করছে। যেমন পড়ে আছে বিস্তীর্ণ দীঘির জল—স্রোতের গতি বা ঢেউয়ের দোলা না থাকলে কে চেয়ে দেখে সেদিকে! কে করবে তা নিয়ে আলোচনা! দীঘির পাড়ে কোথায় ফুটল রক্তগোলাপ, দীঘির জলে কখন পড়ল তার ছায়া, কোন্ রাত্রিতে নক্ষত্র-বিম্বিত জলে উঠল ছোট ছোট ঢেউ এবং কিনারায় বেজে উঠল ছলছলাৎ একটু অস্ফুট ধ্বনি—কে রাখবে তার হিসাব?

কিন্তু হিসাব রাখে না কি সত্যিই? মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে নরেন্দ্রনাথ সব হিসাবকে ওলটপালট করে এক দিন বিশ্বসভা-তলে মহৎ মানুষের চিন্তার ঐশ্বর্য্য উন্মোচন করলেন, মুগ্ধ হয়ে নতি জানালে বিশ্ব। হিসাব রাখলে বৈ কি। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী সত্যদর্শনের মহিমার আলোয় জাতির শিথিল বিশ্বাসকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করলেন, অরবিন্দ অতিমানস তপস্যায় পৃথিবীকে উন্নীত করবার সাধনায় যোগাসন বিছালেন পণ্ডিচারিতে—পৃথিবীতে হিসাব আছে এমন অসংখ্য। যাঁরা অত্যন্ত সাধারণ, যাঁদের জন্ম বিত্তহীন পরিবারে, বাল্য কৈশোর যৌবন কেটেছে বৈচিত্র্যহীন প্রতিবেশে অথচ কর্ম্মশক্তিতে তাঁরা শুধু সমস্ত মানুষের উর্দ্ধেই নয় সমস্ত কালের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। হিসাব আছে বই কি ইতিহাসের পাতায়—মহাকালের চিত্রশালায়।

বিছানার তলা থেকে মোমবাতি ও দেশলাই বার করে প্রভাত আলো জ্বালালে। দেওয়ালে টাঙানো স্বামী বিবেকানন্দ, গান্ধীজী ও বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতি রয়েছে পাশাপাশি। দামী ছবি নয়, খবরের কাগজ কেটে পিজবোর্ডের ওপর মেরে দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছে প্রভাত। সাধারণ ঘরের এই ছেলেরা—সাধারণ ঘরের ছেলেদের অভয় দিয়ে বলেন, ভয় কি—আমরা আছি। কালের স্রোতে ধন ভেসে যায়, ক্ষমতা ভেসে যায়, সমাজ মুছে যায়, দম্ভ সম্মান বর্ণ বা জাতি-বিদ্বেষ কিছুই থাকে না। এ সবই যায় ফিরে আসে না। আমরাও ভেসে যাই কিন্তু ফিরে আসি নূতন রূপে। তোমাদের চিন্তায় বুদ্ধিতে কর্ম্মে বারে বারে প্রেরণা যোগাই। হে অতি সাধারণ ছেলেরা, তোমরা ভয় পেয়ো না, দুঃখ পেয়ো না, হতাশ হয়ো না—আমরা চিরকালই তোমাদের সঙ্গে আছি।

বাতিটা নিবিয়ে ওঁদের কথা ভাবতে ভাবতে প্রভাত ঘুমিয়ে পড়ল।

খানিকটা বেলাই হয়েছে হয়তো। দিনের প্রথম ভাগে রোদ এ ঘরে আসে না—আলোর ঝাঁজটা শুধু প্রখর হয়ে ওঠে। সেই তাপে ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেহে আলস্য লেগে আছে—মন প্রসন্ন।

লক্ষ্মী ঘরে এসে বললে, ওঠ শীগগির—ঘরটা ঝেঁটিয়ে—বিছানাটা ঝেড়ে দিই। কাল খুব খাওয়ালে তো?

হুঁ—আজ মনে হচ্ছে কিছু না খেলেই হয়।

ইস্—এত খেয়েছ! তা আমাদের জন্যে কোন্ দু' একটা মিষ্টি আনলে!

লক্ষ্মী কি সত্যাই পরিহাস করছে? ও তো আর অবুঝ নয় যে ভাল খাওয়ার নাম শুনে নিমন্ত্রণবাড়ীতে যাবার বায়না ধরবে। কিন্তু ওদেরও কি ইচ্ছা হয় না—

সে চিন্তা ঝেড়ে ফেলে প্রভাত বললে, আজ কোন জিনিস আনতে হবে না তো?

কেন সারাদিন তোমার কিই-বা কাজ! হঠাৎ চৌকির ধারে এগিয়ে এসে লক্ষ্মী হাত পাতলে, কই এনেছ আমার ক্লিপ? দাও।

ওই যাঃ—আজও—

জানি—আমাদের কথা কতটুকুই বা ভাব! ঘরের চৌকাঠ পেরুলেই তোমরা পথের মানুষ হয়ে যাও।

বাঃ—চমৎকার কথা বলতে শিখেছিস তো?

না—কথা তুমিই লিখতে পার। তাব তোমার কীর্ত্তি-কাহিনী আর কেউ জানে না?

প্রভাত হেসে উঠল, আমি আবার একটা মানুষ—তার আবার কীর্ত্তিকাহিনী!

আবার হাসা হচ্ছে! আমি জানি না বুঝি কিছু? রাত জেগে বই লেখ—কাগজে ছাপা হয়। কত নাম তোমার—কত চিঠি আসে—

চুপ চুপ! প্রভাত সত্যাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। এ বাড়ীতে সাহিত্য-চর্চ্চা! বাবা শুনলে বকাবকি করবেন।

বাবাকে তো ভারি কেয়ার কর তুমি!

কি রকম?

বাবা এত করে বলছেন একটা চাকুরি নিতে—কিন্তু তোমার হয়েছে চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।

ঠিক বলেছিস—তবে চোর আমি নই—আর কাহিনীটাও ধর্ম্মের নয়। দু'শ বছরের কায়েমি রাজত্বে যারা লক্ষ লক্ষ

কেরাণী তৈরী করেছে তাদের উদ্দেশ্যটা যে সাধু নয়, এটা বুঝিস তো ?

মা—বুঝি না। তোমার খালি কাগজের কথা—সংসারের কোথায় কি ঘটল চোখ মেলে দেখ না।

মানে ?

জানি না—। নাও, উঠবে কিনা। এখনই বাবা খেতে বসবেন, বাসন ক'খানা ধুয়ে না দিলে—

প্রভাত উঠল।

কোথায় চললে আবার ?

তোর ক্লিপ আনতে।

থাক এখন ক্লিপ—ওবেলা আনলেই যথেষ্ট।

কি জানি, আবার যদি ভুলে যাই—তোর খোঁটা খেতে হবে তো! প্রভাত চটি পায়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

বাবা স্তোত্র আওড়াতে আওড়াতে কলতলা থেকে বেরুচ্ছেন। প্রভাতকে দেখে বললেন, আবার চললে কোথায় এত বেলায় ? কি ঠিক করলে—ওবেলা জানিও। জান তো আমার আর পড়াবার শক্তি নেই।

আপনাকে কিছু করতে হবে না—আমি চেষ্টা করব।

তবু নিজের গোঁ-ই বজায় রাখবে ? তীব্র দৃষ্টিতে ক্ষণকাল প্রভাতের পানে চেয়ে মন্তব্য করলেন, উঃ—কলিকাল আর কাকে বলে! তারপর অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, ভাত বাড়—ভাত বাড়—ন'টা বাজে। আমার তো বাজে কাজ নিয়ে থাকলে হবে না—সায়েবের আপিস—ঠেলা তো কম নয়।

ওঁর আপিস না যাওয়া পর্য্যন্ত সবাই তটস্থ হয়ে থাকে। কোথায় কোন কাজে এক মিনিট এদিক ওদিক হবে আর সবাইকে অনর্গল তিরস্কারে ভাসিয়ে দেবার জোগাড় করবেন। এই সকালবেলাটায় ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় বাঁধা প্রত্যেকটি কাজ—পান থেকে চুণ খসবার উপায় নেই। উনি চলে গেলে সুনয়নী তাড়া দেন ছেলেমেয়েদের, ওরে তোরা নেয়ে-টেয়ে নিয়ে খেতে বস শীগ্‌গির। আমি বাপু তিন-পো'র বেলা পর্য্যন্ত হেঁসেল কোলে করে বসে থাকতে পারব না।

কিন্তু ওদের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলেও সুনয়নী রান্নাঘর থেকে ছুটি পান না—সে পাট সারতে তিন-প্রহর বেলাই হয়। সংসারের খুঁটিনাটি কাজ সেরে তিনি আহার করেন বেলা গড়িয়ে এলে—প্রায় সন্ধ্যার মুখে।

এমনি প্রত্যহ। সুনয়নী বলেন, আর পারি না বাপু বয়স ত হচ্ছে। রোদবৃষ্টি একতালে ঠেকিয়ে এই সংসার ঠেলা, এ আর আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।

প্রভাত জানে—সামর্থ্য থাকবে যত দিন সংসার ওঁকে ছাড়বে না, উনিও আঁকড়ে থাকবেন সংসারকে। দরিদ্র মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের অবসর দেবার সামর্থ্য একমাত্র মৃত্যুরই আছে এবং এই সব ঘরে মৃত্যু আসেও অসময়ে ;

বাবা যাই বলুন—পড়াটা ও চালিয়ে যাবে। যদিও বক্তৃতা দিয়ে অনেক নেতা বলে থাকেন—এই শিক্ষার গলদ যথেষ্ট। দেশ স্বাধীন হলে এই শিক্ষার বনিয়াদ উপড়ে ফেলে নূতন শিক্ষার ইমারত খাড়া করতে হবে। এটা আসলে শিক্ষাই নয়—কেরাণী তৈরীর কল। কিছুদিন আগের কথা মনে পড়ছে :

ওর এক বন্ধু আই-এ দিয়ে আপিসে ঢুকেছিল। ছেলেটি বুদ্ধিমান—লেখাপড়ায় ভালই ছিল। কিন্তু বছরখানেক চাকুরী করার পর একদিন কোন বিতর্ক-সভায় বলতে পারে নি—সেক্‌স্‌পীয়রের কোন্ নাটকে কোন্ পাত্রের মুখে বহুখ্যাত, 'There are more things…' উক্তিটি আছে।

ছেলেটি কিছু মাত্র অপ্রতিভ না হয়ে হেসে বলেছিল, আরে—সেক্‌স্‌পীয়র এখন লেজারের মধ্যে চাপা পড়েছেন! ওঁর প্রতিভা নিয়ে এক দিন প্রবন্ধ লিখেছিলাম—স্কুল ম্যাগাজিনে। তারপর ডিগ্রী পেয়ে চাকুরী খোঁজার দরখাস্তে 'আপনার বশম্বদ ভৃত্য' এই বয়ানের সঙ্গে সব ইতি হয়ে গেছে। ছাদে উঠলাম—আবারও সিঁড়ি!

কিন্তু এই শিক্ষা না নিয়েই বা উপায় কি! যখন শিক্ষার নাম বদলাবে তখন জীবনযাত্রার ধারাটিও হবে ভিন্নতর। সে কল্পনা করে আজ লাভ নাই।

পড়াটা সে চালিয়ে যাবে যে করেই হোক। এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় যতখানি বরাদ্দ আছে সবটুকু সংগ্রহ করতেই হবে। তারপর কি হবে—সে পরের কথা।

অবলা বসু

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্ম্মিণী লেডি অবলা বসু ১১ই বৈশাখ পূর্ব্বাহ্ণ ৯-১০ মিনিটের সময় কলিকাতায় স্ব-গৃহে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানে আমরা পরম আত্মীয় বিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি এবং তাঁহার আত্মার উদ্দেশে প্রণতি জানাইতেছি।

এই মহীয়সী মহিলার জীবন-কথা ভারতবর্ষের নব-জাগরণের ইতিহাসের সঙ্গে বিজড়িত। তাঁহার পিতা দুর্গা-মোহন দাশ ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ছিলেন সেই যুগের একজন দিকপাল; তাঁর এক ভ্রাতা ৺সতীশরঞ্জন দাশ ছিলেন বড়লাটের আইনসদস্য; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছিলেন তাঁহার খুল্লতাত-পুত্র। শ্বশুর ভগবানচন্দ্র বসু ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। সরকারী চাকুরীয়াকে বিদেশী শাসনের আমলে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে অনেক বাধা-নিষেধ মানিয়া চলিতে হইত। তৎসত্ত্বেও ভগবানচন্দ্র দেশের শিল্প-সংগঠনে অগ্রণী ছিলেন। ফলে তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন, ভাগ্য তাঁহার পুত্র জগদীশচন্দ্র কড়ায়-গণ্ডায় পরিশোধ করেন।

এইজন্য জগদীশচন্দ্রকে তাঁহার অধ্যাপক-জীবনের গোড়ার দিকে অনেক কৃচ্ছ্র-সাধনের মধ্য দিয়া যাইতে হয়; পত্নী অবলা বসু হাসিমুখে তাহা বরণ করিয়া লন। সেই যুগের ইতিহাস আমাদের জাতীয় জীবনে এই কৃচ্ছ্র-সাধনার অভ্যাস গড়িয়া দিয়াছিল বলিয়াই বাঙালী-সমাজ প্রায় ৭০ বৎসর অসম সাহস ও ত্যাগের পথে চলিতে পারিয়াছিল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রও সেই যুগের অন্যতম প্রতীক এবং তাঁহার সহকর্ম্মী জগদীশচন্দ্রের স্বপ্ন ও সাধনায় অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হন। অবলা বসুর সঙ্গে সেই সময় প্রফুল্লচন্দ্রের যে প্রীতির সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল, বৈধব্যের সময় বসুজায়াকে তাহা নানাভাবে সান্ত্বনা দান করিয়াছিল।

জগদীশচন্দ্র ছিলেন সত্যদ্রষ্টা (Seer); সত্যের পূজারী। প্রকৃতির অন্তঃস্থলে যে সত্য সৃষ্টিকে ধারণ করিয়া আছে, জগদীশচন্দ্র যখন তার অনুসন্ধানে যাত্রা আরম্ভ করেন, তখন এইরূপ সহানুভূতি ও একপ্রাণতার প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য্য। আপনা হইতে আসিয়া তাহা জগদীশচন্দ্রের জীবনকে সার্থক করিয়াছিল। সাধকদের জীবন এরূপ অযাচিত সাহায্যের কাহিনীতে পূর্ণ। জগদীশচন্দ্রের জীবনে সেই সাহায্য লইয়া আসিয়াছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর প্রভৃতি বাঙালী-প্রধানগণ। জগদীশচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী অবলা বসুও তাঁহার জীবন-ব্রত উদ্‌যাপনে তাঁহার সাহায্যকারিণী হইয়া দাঁড়ান।

তাঁহার ৫০ বৎসরের বিবাহিত জীবন জগদীশচন্দ্রের সেবায় অতিবাহিত হইয়াছিল। যাঁহারা অবলা বসুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছিলেন তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে, শিশু যেমন খেলার আনন্দে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যায়, সেইরূপ জগদীশচন্দ্র যখন তাঁহার গবেষণাগারে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া বিজ্ঞানের সাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন, তখন অবলা বসুর কর্ত্তব্য ছিল এই আত্মভোলা মানুষটিকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরাইয়া আনা। ৫০ বৎসর তিনি অনলসমনে ইহা করিয়াছিলেন। তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে সেই ব্রত প্রতিপালন করিতেন বলিয়া আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের জীবনে সার্থকতা-লাভের পথ সুগম হইয়াছিল। এই নিরলস সেবাই অবলা বসুর জীবনের সত্য পরিচয়। এই পরিচয়লাভ করার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহাদের জীবন ধন্য হইয়াছে; মানব-প্রকৃতির মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা জীবন-যুদ্ধে অগ্রসর হইবার শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। অবলা বসু স্বামীর সাধনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য নিজেকে নিঃশেষে দান করিয়া যে বিরাট মহিমা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা অমর হইয়া থাকিবে।

অবলা বসুর জীবনের এই চিত্র মহীয়ান হইয়া আমাদের জাতীয় ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় ও ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়

তাঁহার কিন্তু আর একটা পরিচয় আছে। তাহা তাঁহার পিতৃদেবের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। দুর্গামোহন দাশ সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা; বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয় ও ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠাতৃবৃন্দের মধ্যে দুর্গামোহন ছিলেন অন্যতম—অর্থসাহায্যে ও সামর্থ্যে অগ্রণী। শিক্ষা-বিস্তারের প্রতি সহজাত অনুরাগ ও আকর্ষণ অবলা বসুর জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁহার দিদি সরলা রায়ের পরেই তিনি ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের সম্পাদকপদে মনোনীত হন। বর্ত্তমানে এই শিক্ষালয় ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলে—বঙ্গ, বিহার, আসাম, উৎকলে যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে তাহার অনেকাংশই অবলা বসুর প্রাপ্য।

নারীশিক্ষা সমিতি

এই সার্থকতা তাঁহার সম্মুখে বিস্তৃত করিয়া ধরিল—বাঙালী 'ভগিনী সমাজের' মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের বিরাট সম্ভাবনার আশা। সেই আশায় প্রবুদ্ধ হইয়া তিনি কৃষ্ণপ্রসাদ বসাকের সাহায্যে ১৯১৯ সালে নারীশিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিলেন।

বাংলার গৃহে গৃহে 'সুগৃহিণী' ও সুমাতা গড়িয়া তোলা এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। উক্ত কার্য্য দীর্ঘ ৩১ বৎসর কাল ধরিয়া তাঁহার জাগ্রত জীবনের চিন্তা, নিদ্রার স্বপ্ন হইয়াছিল।

তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, নারীশিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াই তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পথে প্রধান বাধা, উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাব অনুভব করিলেন। সেইজন্ত প্রতিষ্ঠা করিলেন 'বিদ্যাসাগর বাণীভবন'। এই নাম নির্ব্বাচনে তাঁহার উদ্দেশ্য পরিস্ফুট দেখিতে পাই। বিদ্যাসাগর বিধবাদের দুঃখমোচনের জন্ত যথাসর্ব্বস্ব পণ করেন। এই সমাজসংস্কারমূলক কার্য্যে তিনি মাতা ভগবতী দেবীর আশীর্ব্বাদ লাভ করেন। অবলা বসু বিদ্যাসাগরের নামের সঙ্গে তাঁহার প্রতিষ্ঠানের নাম সংযোজিত করিয়া দিলেন এই ভরসা লইয়া যে, পুত্রকন্তার দায়িত্বমুক্ত বিধবারা উক্ত 'ভবনে' শিক্ষালাভ করিয়া বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ব্রত গ্রহণ করিবেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ভারতীয় সমাজে আর্থিক অবনতি ঘটে, একান্নবর্ত্তী পরিবারের উপর মৃত্যুবাণ নিক্ষিপ্ত হয়। বিধবারা একান্নবর্ত্তী পরিবারের আশ্রয় হারাইয়াছিলেন। এই সামাজিক বিপর্য্যয় দেশের চিন্তাশীল সমাজকে ভাবাইয়া তুলে। অবলা বসু বিদ্যাসাগর বাণীভবন প্রতিষ্ঠা করিয়া এই ভাঙনের স্রোত রোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; শত শত বিধবা রমণীকে স্বাবলম্বী হইতে সাহায্য করিয়াছেন।

মহিলা শিল্প ভবন

স্বাবলম্বনের এই শিক্ষা কার্য্যকরী করিবার জন্ত ১৯২৬ সালে তিনি 'মহিলা শিল্পভবন' প্রতিষ্ঠা করিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় এই শিল্প-বিদ্যালয়ের প্রথম পরিচালিকা ছিলেন। তারপর প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ বিপিনচন্দ্র পালের কন্যা অমিয়া দেব এই শিল্পভবন পরিচালনা করিতেছেন। এই ভবনের পাঠ-প্রণালী স্ত্রীলোকের গার্হস্থ্যাশ্রমের কর্ত্তব্য সম্পাদনে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করে না। এই বিদ্যালয়ে অবসর সময়ে, ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত, নানাবিধ কুটিরশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার সুচিন্তিত পাঠ-প্রণালী ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষার আদর্শসম্মত। পরবর্ত্তীকালে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত বহু বিদ্যালয়ে এই পাঠক্রম অনুসৃত হইতেছে। মহিলা শিল্প ভবনের 'কাশ্মীরী কাজ' বাঙালী মহিলার চারুশিল্পকলার ও রুচিবোধের পরিচয় দিতেছে।

নারী সমবায় শিল্প-আশ্রম

১৯৩৫ সাল নাগাদ মহিলা শিল্প ভবনের ছাত্রীবৃন্দের উপার্জ্জনের একটা রাস্তা খুলিবার জন্য এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। অবলা বসু তার বিশ বৎসর পূর্ব্বেই আচার্য্য বসুর সঙ্গে জাপান হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত নানা দেশে সজাগ মন ও অতন্দ্র দৃষ্টি লইয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি যেখানে যেটি স্বদেশের পক্ষে শুভকর ও প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন সেইখান হইতে তাহার বীজ লইয়া আসিয়াছেন, নিজের প্রতিষ্ঠানসমূহে সেই বীজ রোপণ করিয়া তার পরীক্ষা চালাইয়াছেন; তাকে স্থানীয় জল-হাওয়ার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন এবং তাকে রূপান্তরিত করিয়া নিজের প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত করিয়াছেন। জাপান ও পাশ্চাত্যদেশে তিনি নারীর কর্ম্মক্ষেত্রের ক্রমবর্দ্ধমান পরিধি লক্ষ্য করিয়া নিজের দেশের নারী-সমাজের প্রয়োজনে সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন, নারী সমবায়-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিয়া তার পরীক্ষা করিয়াছেন।

জাপানী যুদ্ধের সময় এটিকে কোনক্রমে বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহা কামারহাটিতে ব্যাপক ভাবে কর্ম্ম চালাইতেছে। যে উদ্যান-বাটিকায় এই আশ্রম বিদ্যমান, তাহা পশ্চিমবঙ্গ গবর্ন্মেণ্টের আনুকূল্যে প্রাপ্ত; পশ্চিমবঙ্গ গবর্ন্মেণ্ট ইহাকে নানা ভাবে সাহায্য করিতেছেন। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক উদ্বাস্তু নারী এই আশ্রমে শিল্পশিক্ষার সুযোগ পাইতেছেন। ইহার পরিচালনা করিতেছেন অবলা বসুর ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীবীণা দাস। এই কাজের সম্ভাবনা প্রচুর। অবলা বসু তৎসম্বন্ধে অনেক স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। দেশের লোক তাহা পূর্ণ করিবেন এই ভরসা আমরা করিতে পারি।

বয়স্ক পল্লীশিক্ষা

১৯৩৮ সালে এই কর্ম্মের প্রবর্ত্তন হয়। ১৯৩৭ সালের ২৩শে নবেম্বর আচার্য্য জগদীশচন্দ্র দেহত্যাগ করেন। তখন তিনি এক লক্ষ টাকার একটি ফণ্ড রাখিয়া যান। বয়স্ক পল্লীশিক্ষা বিস্তারে এই ফণ্ড নিয়োজিত হয়। অবলা বসুর আন্তরিক ইচ্ছা অনুসারে তাহা নিবেদিতার নামের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আছে। বয়স্ক পল্লীশিক্ষা নারীশিক্ষা সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। আজ এই ফণ্ডের উপস্বত্ব, প্রায় তিন হাজার টাকা প্রতি বৎসর এই কাজে ব্যয় করা হয়। এই কাজ বাংলাদেশে তখন অভিনব ছিল। পল্লীরমণীর স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা আজ রাষ্ট্রের দায় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বেসরকারী চেষ্টার প্রয়োজন আছে। কারণ রাষ্ট্রকর্ত্তৃক নিয়োজিত কর্ম্মচারিবৃন্দ কদাচিৎ গতানুগতিকতার উর্দ্ধে উঠিতে পারেন। বঙ্গবিভাগের পূর্ব্বে এই বয়স্কশিক্ষা সারা বাংলা দেশে বিস্তৃত ছিল; এখনও তার দু-একটি সাক্ষ্য পূর্ব্ববঙ্গে বিদ্যমান। নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গে নূতন করিয়া তার কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিতেছে।

বাণীভবন জুনিয়ার ট্রেনিং স্কুল

নারীশিক্ষা সমিতির প্রসঙ্গে প্রথমেই উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এই অভাব মিটাইবার জন্য ১৯৩৫ সালে জুনিয়ার ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় কুড়ি

বাইশ জন নারী এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন। তাঁদের সঙ্গে এই সর্ত্ত থাকে যে, শিক্ষান্তে তাহাদিগকে দুই বৎসর গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতে হইবে।

রাজনীতির সম্পর্ক

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তাঁহার উৎসাহ ছিল প্রচুর, কিন্তু তাহা তাঁহার মনকে গণ্ডীবদ্ধ করিতে পারে নাই। তাহা জীবনের নানা ক্ষেত্রে বিচরণ করিত। রাজনীতির বিপৎসঙ্কুল পথও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না এবং সেই পথে তিনি জড়িত হইয়া পড়েন একজন বিদেশিনী মহিলার সাহচর্য্যে আসিয়া—ভারতীয় সমাজে তিনি ভগিনী নিবেদিতা বলিয়া সুপরিচিতা। পুলিনবিহারী দাস এক প্রবন্ধে বসু-দম্পতির সহানুভূতির কথা বলিয়াছেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের শিষ্য-প্রশিষ্যের অনেকেই এই পথের পথিক ছিলেন এবং এই ভাবেই কলিকাতায় পার্শিবাগান অঞ্চলে বিপ্লব আন্দোলনের সহায়ক একটি গোষ্ঠী গড়িয়া উঠে। জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসু এই গোষ্ঠীর মধ্যমণি ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

বিগত ১১ই বৈশাখ ৮৭ বৎসর বয়সে যে জীবন-প্রদীপের নির্ব্বাণ হইল তার আলোক সুদূর অতীতকে ও অদূর ভবিষ্যৎকে আলোকিত করিয়া রাখিবে। সেই আলোকে আমাদের মধ্যে অনেকেই জীবন-পথের সন্ধান পাইয়াছেন। আমরা অবলা বসুর জীবনকালে বাঁচিয়া থাকিয়া এক অপূর্ব্ব অনুভূতি লাভ করিলাম; ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের একটি জীবন্ত পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া ধন্য হইলাম। আমরা অবলা বসুর সমসাময়িক সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন পূর্ণ হইতে দেখিলাম।

সার্থক জীবন অবলা বসুর। যাঁরা এই আদর্শ জীবনের সাক্ষীস্বরূপ এখনও বাঁচিয়া আছেন তাঁহারাও নিজেদের জীবনকে সার্থক মনে করিতেছেন।

বিম্ব ও দাড়িম্ব

শ্রীকালিদাস রায়

বহু দিন পরে বাগানে যাইয়া দেখি,
তেলাকুচা লতা উঠেছে দাড়িম গাছে।
বলিনু মালীরে 'এই দিকে আয়, একি!
ছিঁড়ে দে এক্ষুণি ও লতা রাখিতে আছে?'

দেখিনু দাড়িম দুলিছে পুষ্টি লভি',
লাল হইয়াছে তেলাকুচাগুলা পেকে,
সহসা হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল কবি,
কহিনু মালীরে ছিঁড়িস না, থাক থেকে।
দেখ না মূর্খ, লতার বাঁধন পেয়ে,
গাছটা রয়েছে জোয়ালো আগের চেয়ে।

আলোকলতা

শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ

পরগাছা গো, আলোকলতা!
মর্ম্মে আমার কেবল জাগে,
ব্যথায় ভরা অনুরাগে,
তোমার কথা, তোমার কথা!

মাটির পরশ পাও নি তুমি,
শাখার মাথায় আকাশ চুমি,
আলিয়ে রাখো হৃদয়-ভূমি
এই তো তোমার নিত্য-প্রথা।

সহজ সরল ভঙ্গিমাতে,
প্রাণ-খোলা ওই হাসির সাথে,
গুমরে ওঠে পায়ের তলায়
পরশ পাওয়ার আকুলতা!

ওগো আমার পরগাছা গো,
ওগো আমার আলোকলতা!

বনিয়াদ

শ্রীতৃষা সেন

এবার আমাদের থামতে হবে।

চাঁদমারি খালের বাঁশের সাঁকো পার হয়েছি, নাল-লাগানো কঠিন বুটপায়ে মাড়িয়ে এসেছি বাবলার বন। কণ্টকিত পথের ধুলোয় আমাদের সর্ব্বাঙ্গ প্রলিপ্ত হয়েছে।

ধূসর পথের চলার গান থামে নি কিন্তু এখনও। চিকচিকে খালের জল দেখতে পাও, তার ওপাশ দিয়ে অমসৃণ গ্রাম্য পথ গড়িয়ে গেছে—পেরিয়ে গেছে ভাঙা শিবের মন্দির, ময়ূরাক্ষীর বালুগর্ভ, ইটখোলা আর চালের আড়ত। পেছনে পড়েছে গোবর্দ্ধনপুর, পাঁজা-করা টালি ও ইট আর সুরকি বালির গোলা।

হাজার লোকের সঙ্গে পা মেলানো আমাদের পোষায় নি। তাই আল ভেঙে এগিয়ে এসেছি আমরা। দু'পাশে ধূ-ধূ করছে মাঠ। এখানে ওখানে শামুকের খোল পড়ে রয়েছে, মেঠো শকুনের বাঁকা ঠোঁটের নিষ্ঠুর আঘাত সহ্য করা অত সহজ নয়।

দিগন্তের নিবিড় বনরেখা ধীরে ধীরে নিকটে এসেছে। আরণ্যক প্রবাহের অন্তিম তরঙ্গ অবশেষে উত্তাল হয়েছে আমাদের সম্মুখে। ঘন বাঁশঝাড় গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সকৌতুকে, অসংখ্য আমগাছে আকাশ ঢাকা পড়ে। বুনো ফুলের তীব্র গন্ধ নাকে আসে। আধ অন্ধকারে পাতার শাখায় আর পল্লবের আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে ফিস্-ফিসানি চলতে সুরু হয় সারা বন জুড়ে।

তবুও আমরা পিছিয়ে পড়ি নি। রুকস্যাক থেকে ধারালো ভোজালি টেনে বার করে নি'। হয় তো দরকার পড়বে, হয়ত পড়বে না। তবু ওটা সঙ্গে থাক, কঠিন মুষ্টিতে বদ্ধ থাক। রূপকথার রাজপুত্রের দুর্জ্জয় সাহস দেহের শিরায় শিরায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে আমরা তা টের পাই।

মর্ম্মর-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় পদে এগিয়ে এসেছি আমরা। অত্যন্ত সূক্ষ্ম পায়ে-চলা পথ বেয়ে এগিয়ে এসেছি। ওরই মধ্যে হয় ত কোনও অসতর্ক মুহূর্ত্তে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছ তুমি। লতানে গাছের কাঁটাগুলি চারি পাশে উদ্যত হয়ে আছে। এমন পরিবেশে আমি ত অভ্যস্ত নই। তাই বোধ করি তোমার ভাবোচ্ছ্বাস লক্ষ্য করি নি। ক্লান্ত পা দুখানি শুধু সৈনিকের মত নিয়মের অনুবর্ত্তন করেছে।

এবার কিন্তু থমকে দাঁড়াব আমরা। যাত্রা আমাদের শেষ হ'ল, অথবা এই সবে সুরু?

রোদের রঙ সাদা, কুঠারের শাণিত অগ্রভাগের মত, যে কুঠার বন কাটে, শহর তৈরি করে...আদিম মানবের সব-চেয়ে দরকারী হাতিয়ার। রোদ ঝক্-ঝক্ করছে, চলমান কালের আর কান্তের ঝিরঝিরে দাঁতের মত—মানুষের সভ্যতার ইতিহাস গড়েছে যা। রোদে চোখ আড়ষ্ট হয়ে যায়, দন্তের তরবারির সামনে সঙ্কুচিত নিরীহের ভীতির মত। সেই রোদ তুলে ধরছে বেদনার্ত্ত দৃশ্যপট। আমি হতাশ হয়েছি, হতাশ হয়েছ তুমিও। তবু তোমার বর্ণনার সঙ্গে বাস্তব হয় তো মিলেছে কতকটা। সিংহ-দুয়ারের প্রকাণ্ড থাম দুটো দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সে যেন কোনরকমে শুধু টিকেই থাকা, তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়। পলস্তারা খসে গেছে, চূড়ার উপরকার ওৎপাতা সিংহের প্রায় কিছু অবশিষ্ট নেই। কটকে দ্রুত করাঘাত করে নিজেদের উপস্থিতি জ্ঞাপনের প্রয়োজন হবে না। প্রকাণ্ড দিলান অদৃশ্য হয়েছে উইপোকার অত্যাচারে। দেউড়ির ওদিকটা নির্জ্জন। লাঠিয়ালেরা পেতলের আংটা-লাগানো পাকা বাঁশের লম্বা লম্বা লাঠি নিয়ে করছে না হুকুমের অপেক্ষা।

এসো, পায়ে পা মিলিয়ে আমরা আরও এগিয়ে যাই। ঘুমন্ত পুরীর অশরীরী প্রেতাত্মার দল কান পেতে আজ শুনুক নূতন যুগের পদধ্বনি। যাদের ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি একদা প্রকম্পিত করেছিল আস্ফালনপ্রিয়দের, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনে যে পৌরুষ আছে, সেকথা কি অস্বীকার করতে পার?

তবে, সাবধান। শিয়রে খরধার খড়্গ ঝুলছে না, কিন্তু মাটি ফুঁড়ে উঠতে পারে কালান্তক যম। মনে নেই, দুঃসাহস বুকে পুরে এসেছিল তোমার আগে যে, বন ভেঙে আল ডিঙিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে হয়েছিল তাকে পুরো একটি ক্রোশ। পেছনে তাড়া করে নিয়ে গিয়েছিল মিশ্‌মিশে কালো কেউটে। হতভাগা প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল, তবু বাঁচতে পারে নি।

সে ঘটনা অবশ্য রাত্রের। অমাবস্যার গভীর রাতই বেছে নিয়েছিল কালীমাতার একনিষ্ঠ সেবক। মনসা তার উপযুক্ত প্রতিশোধ নিয়েছিলেন।

আর আমরা এসেছি দিনে। প্রখর আলোক দুঃস্বপ্নের সহচরেরা ত সইতে পারে না। পায়ে আমাদের ভারী জুতো, পুরু মোজা। অত সহজে কাবু হয় তো হব না, তবু সতর্কতা বুদ্ধিমানের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র, যে অস্ত্র নিয়তির লিখন অগ্রাহ্য করবার মত শক্তি দেয়, মহাকালের হুহুংকার উপেক্ষা করতে শেখায়।

চলে এসো, আমরা প্রবেশ করি প্রাসাদের হাতার মধ্যে। রায়বংশের রক্ত-স্রোত তোমার দেহে প্রবহমাণ, তুমি আগে চল। অথবা যদি ভয় পেয়ে থাকো, তবে পাশাপাশি চলতে সুরু করি, কি বল?

এই প্রকাণ্ড গাছটি কিসের তাই ? চাঁপাফুলের ! বংশের আদিমতম পুরুষ এই বৃক্ষটি রোপণ করেছিলেন। মা-লক্ষ্মীর নিয়মিত পূজার সাজি ভরত এইটির কল্যাণে। অসংখ্য পুষ্পের মধ্যে লুকানো থাকত অপরূপ গন্ধময় একটি করে কনক-চম্পক, ভক্তের পূজায় তুষ্ট দেবতা যেটুকু আশীর্ব্বাদরূপে প্রদান করতেন—নৈবেদ্যের থালায় মুদিতনেত্র পূজারী তা খুঁজে পেতেন প্রত্যহ।

এ অঞ্চলে প্রবাদ আছে, এমনি করে বিত্তশালী হয়ে উঠে-ছিল রায়বংশ। তাই না ? কিন্তু বন্ধু, এ যুগের মানুষ ত স্বর্ণময় চম্পকের আবির্ভাব বিশ্বাস করে না। ওর কালো অংশে যে কাহিনী লিখিত তারই উপর অনুমান করে নেওয়া কাল্পনিক সত্যে বরং খানিকটা আস্থা আছে।

চাঁদমারি খাল কলকণ্ঠ মুখরা নারীর মত অনেক তথ্য প্রকাশ করে। ময়ূরাক্ষীর তপ্ত গর্ভের মথিত বালু অনেক কিছু স্মরণ করে শিউরে ওঠে।

কে জানে, আরও অনেকের মতই রায়বংশের বিপুল সম্ভ্রমের প্রতিষ্ঠা হয় তো অসংযত তরবারির বিনিময়ে ? ময়ূরাক্ষীর প্রসারতার উপর দিয়ে পঙ্কিল জলরাশি যখন বিপুল অজগরের মত সর্পিল গতিতে অগ্রসর হয়, খালের জল ক্রমশঃ বাড়তে থাকে, দু'পাশের লম্বা শরগাছ ডুবু-ডুবু হয়, জলপথে শিকারের তখন অভাব হয় না, মালবোঝাই নৌকা আর যাত্রীবাহী পান্‌সি-বজ্‌রার আনাগোনার সীমা থাকে না। অন্ধকার রাতে বাজপাখীর মত ছোঁ মারলে বাইরের জগৎ তা জানতেও পারবে না। বহুদূরের মানুষেরা হঠাৎ এক এক দিন দেখবে, ঘাটে এসে লেগেছে কোনও হতভাগ্যের শব, পচে ভয়ঙ্কর রকম ফুলে উঠেছে। নব-বিবাহিত বর ও বধূর সমস্ত আনন্দময় কল্পনা সড়কির সাপের জিভের মত ঝিকঝিকে আগায় একোঁড়-ওকোঁড় করে দেয় যারা, রাজার আইন তাদের স্পর্শও করে না কোনও দিন।

ছুয়া আভিজাত্যের মোহে ঘা লাগবে তোমার। তুমি আস্ফালন জুড়ে দেবে, প্রমাণ করতে চাইবে বারংবার—রায়-বংশে লক্ষ্মীর দয়া পঙ্কিলতার মধ্যে আবর্ত্তিত হয় নি।

ক্রত-উচ্চারিত শব্দ-ঝঙ্কারে তোমার পটুত্ব আছে। একথা বরাবরই স্বীকার করে এসেছি। নূতন করে আরও একবার না হয় স্বীকার করব।

কার কথা বলতে চাও প্রথমেই ? ভোলানাথ রায়ের কথা। রাণী ভবানীর আমলের কথা। প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করতেন ভোলানাথ। অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। হুকুম হলে বাঁশের লাঠিটি মাত্র সম্বল করে দেড়শো দু'শো মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে চলে যেতেন। রাণী তাই ভোলানাথকে সন্তানের মতই ভালবাসতেন। কাশীতে তীর্থ করবার সময় জিজ্ঞেস করেছিলেন : "ভোলানাথ, তুমি ত কিছু চাইলে না ?"

ভোলানাথ করজোড়ে জবাব দিয়েছিলেন : 'মা, আপনার দয়ায় আমার কিছু অভাব ত নেই।'

তা হয় না, অন্ততঃ এই বালাজোড়া রাখো। ভোলানাথের সমস্ত অনুনয় উপেক্ষা করে রাণী নিজের হাতের কাঁকন খুলে দিলেন।

বারকয়েক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন ভোলানাথ। তারপর সহসা সশব্দে বালাজোড়া বিসর্জ্জন দিলেন ভাগীরথীর বক্ষে।

'এ কি করলে ভোলানাথ ?' সাশ্চর্য্যে প্রশ্ন করেছিলেন রাণী।

'আজ্ঞে যার জিনিস তাকেই দিলাম।' সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে উত্তর দিয়েছিলেন ভোলানাথ কাতর-কণ্ঠে। বুদ্ধিমতী রাণী অনুভব করেছিলেন বিশ্বস্ত ভৃত্যের অন্তরের কথা। দুর্বৃত্তের হাত হতে প্রাণসংশয় করেও যদি বা বাঁচানো যায়, তবু দারিদ্র্যের কঠিন নিষ্পেষণ হয় তো স্মৃতিচিহ্নের মর্য্যাদা রক্ষায় যত্নশীল হতে দেবে না। বিনিময়ে ভোলানাথ তাই পেয়ে-ছিলেন বিষে ঘাটেকের লাখেরাজ।

বংশমহিমায় ক্রমশঃ তোমার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, গলা কাঁপছে, হাতের আঙুলগুলি উত্তেজিত ভাবে ক্রমাগতই নড়ছে। হাঁটতে হাঁটতে তুমি বার বার থেমে যাচ্ছ।

তোমার আবেগবিহ্বলতাকে আঘাত হানতে ইচ্ছা করে না বন্ধু। কিন্তু বেগ কিছুকালের জন্য সংবরণ করতেই হবে। আমাদের আগমনে ধূর্ত্ত ঐ শৃগালটা ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে, গোটাকতক চামচিকে কোথা হতে আবির্ভূত হয়ে সহসা ফর্‌-ফর্‌ করে উড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে। তুমি ভ্রূক্ষেপ করবে না বটে, আমার কাছে কিন্তু অত্যন্তই বিসদৃশ ঠেকছে। তোমার কাছে শুনি রায়বংশের গৌরবগাথা, অথচ প্রকৃতির চারণেরা যে বিপরীত সঙ্গীত গাইছে।

রৌদ্র অধিকতর লেলিহান হয়ে উঠছে। জঙ্গলে আগাছায় এদিক পানে ঝাঁজ আসে না, বরং কেমন যেন কুহেলিকায় আচ্ছন্ন অপরূপ পরিবেশ। এমন জ্বালাময় সৌরভ আর কোথাও অনুভব করি নি, এমন ঘুমের মত ঘোর ঘোর ভাব আর কোথাও দেখি নি।

ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে দাঁড়াও এই দরদালানে। রুক-স্যাক থেকে ছোট সতরঞ্চখানি বার কর তুমি। আমি ততক্ষণ তোজালির কোপ বাড়ি ঐ শিশুবটের উপর। মোটা মোটা শেকড়ে চাড় দিয়ে এই পরিত্যক্ত প্রাসাদকে ধ্বংসের মুখে আরও খানিকটা এগিয়ে দিত গাছটা, সেটুকু বন্ধ করে দেব। রায়বংশের বিদেহী সেই সব বিরাট পুরুষেরা নিশ্চয়ই তাতে অন্ততঃ সামান্ত পরিমাণেও কৃতজ্ঞতা বোধ করতে পারেন।

শতাব্দীর সঞ্চিত অভিশাপের মত রাশি রাশি ধূলার আস্তরণ স্থানচ্যুত করতে গিয়ে বিপন্ন হয়ে পড়েছি। বট-

শিশুর শ্যামলতা তবু কিছু পরিমাণে রক্ষা করেছে নাক-মুখ-চোখ, তোমার এবং আমার—দু'জনেরই।

যাক্। সতরঞ্চখানা পেতে ফেল। বেশ টান করে পাত। কোমরের বেল্ট আল্‌গা করে দেওয়া যাক; খাঁকি হাফশার্ট-খানাও খুলে ফেলি না? পিঠের বোঝা দুটো এপাশে থাক। হাঁফ ছেড়ে বাঁচি একটু এইবার।

তবে হাত-পা ছেড়ে দেবার আগে আর একটি কাজ করতে হবে। ফ্ল্যাস্কের ছিপি খুলে ফেল। ষ্টেশন ষ্টল থেকে নগদ পয়সা দিয়ে কেনা চাটুকু আশা করি এখনও উত্তপ্তই আছে।

কি বলছ? টিফিন-ক্যারিয়ারেও হাত দেওয়া খুব বেশী অসঙ্গত হবে না? প্রস্তাবটা নেহাৎ মন্দ নয়। ভাগা-ভাগি করে ফেল তা হলে। তুমিই কর। নিজের দিকে ঝোলটা তাতে কমই টানবে, মনে মনে এই ভরসা করছি আর কি!

ওই তো, ওই তো তোমার দোষ। দেহে মেদবৃদ্ধির মত একটা কুফল। খান দুই লুচি পেটে গেছে কি না গেছে, একেবারে সঙ্গে সঙ্গে বিস্তারিত হলে? আর কিছু না পার, তোমাদের মামবাড়ীর কাহিনীগুলিরই পুনরাবৃত্তি কর না হয়, যার অভিরঞ্জন এক দিন তোমার ঠাট্টা করেছিল। আর তারই ফলে না গ্রীষ্মাবকাশে এই দীর্ঘ পথ পর্য্যটন করে এড-ভেঞ্চারের লোভে, কতকটা কৌতূহলের সঙ্গেই উপস্থিত হয়েছি। আসল কাজ এখনও সুরুই হয় নি যে আমাদের।

কিন্তু তোমায় নিয়ে আর ত পারা যায় না। আড়ে-দৈর্ঘ্যে বপুখানি ত নেহাৎ কম নয়, সটান একেবারে লম্বা হলে? তা হলে করি কি? পুরানো বাড়ীখানা দেখেশুনেই ঘুরে বেড়াব? আচ্ছা স্বার্থপর যা হোক!

বেশ, এই উঠলাম। শুধু একটি কথা দয়া করে মনে রেখ। নাক ডাকাতে চাও, ডাকাও; আপত্তি করা ত বৃথা। তবে হুঁসিয়ার হয়ে। কোথা থেকে ছোবল মারবে, তার ঠিক ত নেই।

আমি অবশ্য পা বাড়াচ্ছি। তোমার সঙ্গে পেরে না উঠেই যাচ্ছি, একথা যেন মনে কর না তা বলে। এই বিরাট প্রাসাদের ভগ্ন স্তূপ আমাকে ক্রমাগতই আকর্ষণ করছে। হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমায় এর প্রতিটি আনাচ কানাচ। ফণিমনসা সারি সারি সশস্ত্র সৈন্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। টুকরো ইটের গাদার ওপর রাঙচিতে ফুলের গাছ। টকটকে লাল রঙের নাম-না-জানা ফুলও রয়েছে। প্রেমিক পুরুষ স্বচ্ছন্দে আহরণ করে নিয়ে যেতে পারে, প্রিয়ার কবরী-বাঁধন শিথিল করবার মনোরম একটি ছলনা হিসাবে।

ওটার পাশ দিয়ে ঘুরে যাওয়া যাক্। আগাছার ঝোপ-ঝাড়গুলি অতিরিক্ত রকম ঘন হয়ে উঠছে। চলাফেরা করা বাস্তবিকই কষ্টকর। সুতরাং মরচে-ধরা এই লোহার টুকরোটি তুলে নেব। কে কবে অকারণে ওটা ফেলে গিয়েছিল ওখানে, কে জানে। উপকারে লাগবে আমার।

আরও এগোতে হবে। মধ্যে মধ্যে তাকিয়ে দেখতে হবে, ভাঙা জানলা বা ঐ ধরণের কোন ফাঁকফুকর আছে কিনা। দরজার তালা ভেঙে ঢোকার চেয়েও কাজ তাতে ঢের বেশী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে।

গোটা আকাশে একটুকরো মেঘও নেই—বিদেশী মেয়ের নীল চোখের মত কৌতুকোজ্জ্বল।

লতানে গাছটায় সাদা রঙের ছোট ছোট ফুল ফুটেছে অসংখ্য। তিক্তমধুর সৌরভে আশপাশটা ভরে আছে। দু' হাত বাড়িয়ে ডাক দেয় যেন। তবু তফাৎ দিয়ে পাশ কাটাতে হবে। বিষধর গোখরার চেয়ে কম ভয়ঙ্কর নাও হতে পারে ওরা। এটা যদি সত্যকার বন হ'ত, তবে হয় ত এত বিভীষিকাময় হ'ত না। কিন্তু তা নয়। সরল হিংস্রতা তাই নেই, তার বদলে জট পাকাচ্ছে, অদৃশ্য নাগপাশ বিছিয়ে রেখেছে চারদিকে অজানিত মৃত্যুর কুটিলতা। জমিদার-বংশের ধ্বংসস্তূপ!

—ওটা কি? লাল চেলির একটু অংশ? বাঁকটা ঘুরতে কিন্তু কিছুই দেখতে পাই না. চোখের ভুল? হতে পারে। অসম্ভব কথা নয়।

কিন্তু কানও কি ভুল শুনবে? খট্ খট্ খট্…খড়ম পায়ে কে যেন একনাগাড়ে হেঁটে চলেছে। অভ্যস্ত পদক্ষেপ। নিয়মিত ধ্বনি উঠছে।

অথচ লোক ত দেখি না! আশ্চর্য্য নয়? চীৎকার করে উঠি প্রাণপণ উচ্চ কণ্ঠে: 'কে?' কর্কশ শব্দটুকু পড়ো বাড়ীটার দেয়ালে প্রতিহত হয়ে দ্বিগুণ প্রাখর্য্যের সঙ্গে ফিরে আসে শুধু। সামনের গাছটা থেকে স্থানচ্যুত হয় একটি হলুদ রঙের পাতা। দুটো পাখী চকিত ভয়ে ডানা ঝাপটে উড়ে পালাচ্ছে।

তারপর কোলাহল শান্ত হয়ে যায়। যেমনটি ছিল, ঠিক তেমনি। আকাশ ও মাটির মধ্যে যে ফিস্ ফিস্ করে গোপন কথাবার্ত্তা চলছিল, অব্যাহত গতিতে আবার তা চলতে থাকে। ঢিল অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুকুরের ছোট ছোট ঢেউগুলি যেমন মন্থর গতিতে বিলীন হয়ে যায় নিস্তরঙ্গ-তার মধ্যে, ঠিক তেমনি নির্ব্বিকার ভাবে।

কেবল সেই খড়মের একঘেয়ে খট্ খট্ শব্দ নীরব হয় নি। তবে ক্ষীণ হয়ে আসতে সুরু করেছে। কেউ যেন ক্রমশঃই দূরে সরে যাচ্ছে।

ব্যাপারটা দেখতে হবে। দু' হাত লম্বা লোহার রড সজোরে চেপে ধরি। ওর মাত্র একটি আঘাতই 'যে-কোন দুর্বৃত্তের খুলি চৌচির করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু লোকটা কি আকাশ দিয়ে উড়ে চলেছে? নইলে আমার হাত-পা ছিঁড়ে গেল, পদে পদে হোঁচট খাচ্ছি, সারা-গায়ে দরদর ধারে ঘাম ঝরছে অথচ ও সমান গতিতে এগিয়ে চলেছে! শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, কোনও জমে পদস্খলন হয় না। সমান গতিতে অগ্রসর হচ্ছেই। অদ্ভুত ত!

তবে জঙ্গলও দেখছি আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে যাচ্ছে। একটা দীঘি! দাম আর কচুরীপানায় ভর্তি, তবু বোঝা যায় গৌরবের দিন কেটেছে একদা ওরও। হয় ত গভীরতাও কম ছিল না সেদিন। ওদিকের কালো পাথরে বাঁধানো ঘাট দেখেই তা বোঝা যায়।

খড়মের আওয়াজ হঠাৎ থেমে গেছে। পুরনো তাল-গাছের প্রকাণ্ড গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে রয়েছি। উদাত্ত কণ্ঠের মন্ত্রপাঠও শুনতে পাচ্ছি যেন। মনে হচ্ছে সেই সঙ্গে কচি গলায় কেউ একজন সেই সব দুরূহ সংস্কৃতের অশুদ্ধ প্রতিধ্বনি করছে।

কৌতূহল দমন করা গেল না। গুঁড়িটার পেছন থেকে বেরিয়ে এসেছি। কৈ, এবারও ত কাউকে দেখা গেল না? দ্বিপ্রহরের রৌদ্র, ভুল হবার জো নেই।

ওধারে তেঁতুলগাছের বিরাট একটা শাখা ঝুঁকে পড়েছে জলের উপর। তারই ডালপালার মধ্যে লুকিয়ে বসে একটা ডাহুক অবিশ্রাম ডাকতে সুরু করেছে।

তা হলে?...

আমাকে চিন্তান্বিত হয়ে ফিরতে দেখে তুমি বোধ হয় ভাবলে যে, রায়বাড়ীর বাইরের জীর্ণ খোলসটা দেখে ভেতরের অন্তঃসারশূন্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছি, বিরক্ত হয়েছি ঠকিয়ে এতদূর আনার জন্যে। সুতরাং সোৎসাহে উঠে বসে হয়ত জুড়ে দিতে চাইবে সেই পুরনো কাহিনীগুলি। কিন্তু আমার ধৈর্য্য নিঃশেষ হয়েছে। তাই তোমায় বাধা দেব। বলব বাজে বকার সময় ত নেই। তাড়াতাড়ি সারতে হবে কাজ। যোলপুর ইষ্টিশান কাছে নয়। এস, সজ্জিত হওয়া যাক।

তোমার তাতে আপত্তি থাকার কথা নয়। শুয়ে শুয়েই চারিপাশের যে দৃশ্য এতক্ষণ তুমি উপভোগ করেছিলে, তাতেই আসলে তোমারও অর্দ্ধেক উদ্যম জল হয়ে গেছে। যত শীঘ্র পালাতে পারা যায় ততই ভাল—এই হ'ল তোমার মনের গোপন কথা।

সেই কালীভক্তটি আমাদের জন্যে অনেকখানি কাজই অবশ্য এগিয়ে দিয়ে গেছে। সামনের ঐ লোহার পেরেক-মারা দরজায় মরচে-ধরা তালা সে-ই ভেঙেছিল, এ ধরণের অনুমান এমন কিছু ভুল নয়। তর্কের অনেকখানি অবকাশই রইল বটে, তবু তুমি এগিয়ে এস। দু' জনের সম্মিলিত বলপ্রয়োগ ঠেলে খুলে ফেলব মান্ধাতার আমলের কপাট। প্রতিবাদ উঠবে ভীষণ, ফাঁক দিয়ে সশব্দে বেরিয়ে আসবে এক ঝাঁক বাদুড় অথবা চামচিকে।

তারপর চলবে ভাটির স্রোত। আমরা ভেতরে ঢুকে পড়ব। অস্বস্তিকর দুর্গন্ধে গলা জ্বালা করবে। তবে ওটুকু উপদ্রব সহ্য করবার ক্ষমতা আমাদের আছে বৈ কি। নইলে এসেছি কেন এতদূর?

ভেতরটা অন্ধকার। কপাটের ফাঁক দিয়ে এইবার যা একটু আলো ঢুকতে পারছে। টর্চ জ্বেলো না। পরে দরকার হবে। দু'পাশে দুটো দরজা। কোন্ দিকে এগোব? এস, ডানদিকে অগ্রসর হই। জান ত, পুরুষের দক্ষিণ দিকে সমস্ত শুভ সঞ্চারিত হয়।

দেখ দেখ, মাথার ওপর ঝাড় লণ্ঠনের ধ্বংসাবশেষ এখনও কতকটা চোখে পড়ে। নেহাৎ অল্পদামী বলে ওদিকে কেউ হাত বাড়ায় নি। বংশগৌরব ছাড়া রায়েদের যেমন আজ আর কিছুই নেই, বাড়ীতেও হয়ত তেমনি কয়েক খণ্ড মূল্যহীন কাচ ভিন্ন অন্য কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। অন্ততঃ আমার ত তাই ধারণা।

আবার একটি দরজা। সামনেই সিঁড়ি, স্বর্গ লক্ষ্য করে উঠে গেছে। রকম দেখে মনে হয়, তোমার কথাই সত্যি। রায়েরা ছিলেন সেই ধরণের সাধু-চরিত্র, যাঁদের নামে লোকে মাথা নীচু করত ভয়ে নয়, ভক্তিতে। যাঁদের জলসত্র প্রাণ বাঁচাত বিদেশ গাঁয়ের তৃষ্ণার্ত্ত পথিকদের, বুভুক্ষু ডাঙার মধ্য দিয়ে বাঁক কাঁধে আসা হাটুরেদের।

ঠিক এই মুহূর্তে বাইরের জগতে কাঠফাটা রোদ। প্রান্তর যেন অদৃশ্য লাঙলের চাপে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। আকাশে ভাসমান দীর্ঘপক্ষ শকুনি ভিন্ন অন্য পাখী নেই। ডালপালা, ঘরবাড়ী নদীনালা সব কিছুই যেন ঝিমুচ্ছে। আর ভিতরে নীরন্ধ্র অন্ধকার। টর্চের আলোয় চোখে পড়ছে রাশি রাশি ঝুল। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে এক-আধটা ভাঙাচোরা ঝাড়লণ্ঠন। ত্রিশিরা কাচগুলির সংখ্যা অত্যন্তই কমে গেছে।

অথচ ঘুম নেই। ওই মোটা মোটা কড়ি-বরগা ঘুমুচ্ছে না। ঘরের মেঝে ঘুমুচ্ছে না। চার পাশের দেওয়াল যেন জেগে আছে। আমার অতীন্দ্রিয় কর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে অস্ফুট ক্রন্দন, হৃতসর্ব্বস্বা বিধবা এবং সন্তসন্তানহীনা এই বাড়ীর শেষ কুলবধু-দের বুকফাটা স্তব্ধীভূত ক্রন্দন। আমাদের বুটের রূঢ়শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আর উচ্ছ্বাস যেন শালীনতার সকল বাঁধ ভেঙে চুরমার করে দিতে চাইছে। গোটা বাড়ী এক দিন গমগম করত। কক্ষে কক্ষে নববিবাহিতাদের নূপুর-নিক্কণ শোনা যেত, কঙ্কণ রণিত হ'ত, দেবালয় কাঁসর-ঘণ্টায় মুখর হয়ে উঠত। নিষ্পাপ শিশুদের কলকণ্ঠে, নারীদের অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাসে গৃহদেবতার প্রসন্নতা যেন উপচে পড়ত।

সেই সব সুখ-স্বপ্ন আজ যেন অবরুদ্ধ ক্রন্দনে বয়ে বয়ে পড়ছে। ম্লানকণ্ঠে কে যেন বলতে চায় নিজেদের ব্যর্থতার কাহিনী, রিক্ততার কাহিনী। যে হাত চিরকাল অপরকে দয়াভিক্ষা দিয়েছে, সেই হাত অত্যন্ত প্রয়োজনেও সাহায্য ভিক্ষা করতে পারে নি। বংশগত সঞ্চিত ধনরাশি এমনভাবে লুকানো যে স্পর্শ করবার উপায় নেই। বিষবর্জ্জর শবদেহ তাই ভাসমান হয়েছিল ময়ুরাক্ষীর কূলপ্লাবনে। সেই হতভাগ্যের অন্তিম কাকুতি কি এই প্রাসাদের রেণুতে রেণুতে বিজড়িত রয়েছে? আমাদের পদধ্বনি আবর্ত্তিত হচ্ছে সৌধের দুরান্তে, তারই সঙ্গে ফুটে উঠছে কি আর্ত্তকণ্ঠের বেদনা?

—ও কি, কাকে যেন দেখলাম! আলোটা ঘোরাও ত এদিকে। এই যে, এই বাঁকটা ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কে? রক্তাম্বর পরিধানে। কাকে যেন সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। খড়মের খট্ খট্ শব্দ শুনতে পাও?

তুমি বুঝি আবার ভয় পেলে! তাই না? কিন্তু, রায়েরা মানব মন ত, তাঁরা পুণ্যবান, তাঁরা যোগী। তাঁদের অর্চনায় মৃন্ময়ী প্রতিমায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তাঁদের গৃহলক্ষ্মী গ্রাসের অন্ন অকাতরে বিতরণ করে অসময়ের অতিথির সম্মান রক্ষা করেছেন। তাঁদের করুণায় সর্ব্বস্বান্ত পথিক আসন্ন বিপদের আবর্ত্ত হতে মুক্তি পেয়েছে। পরিপূর্ণ ব্রাহ্মণত্বের জীবন্ত প্রতীক এই রায়বংশ।

সুতরাং শঙ্কার কি আছে? মনে করে নাও অশরীরী কোন মহাপুরুষ আমাদের পথ দেখাচ্ছেন। বিশেষতঃ তোমার দেহেও যে ঐ একই রক্ত প্রবহমাণ। এই বাড়ীর প্রতিটি অংশে তোমার নিজেরও অধিকার আছে। নয় কি?

চল চল, এগিয়ে চল। সুড়ঙ্গের মত নিরুত্তপ্ত শৈত্যময় আঁধারভরা পথটুকু ক্রমশঃই যেন সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

তুমি আমার পেছনে থাক। তোমার হাতে চকচকে তোজালী, আমার হাতে কঠিন লোহার রড। প্রাচীন অট্টালিকার গোলকধাঁধার রহস্যের সমাধান চাই আমাদের।

এইখানে এসে তা হলে থামতে হবে। সামনে কাল রঙের ছোট দরজা। ভেঙে ফেলা যাক। কোন সঙ্কোচ নেই। হৃদয়ে জড়তা নেই।

দুম্ দুম্।

পুরনো হয়ে গেছে, তবু কাঠ কি শক্ত! লোহার রডে কত দূর কি হবে ঠিক বোঝা যায় না। প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে। ঝুর ঝুর করে বালি ঝরে পড়ছে। আমার কপালে স্বেদবিন্দু। হাত দুটোতে ব্যথা হয়ে গেল। ঝড়ের মত নিঃশ্বাস বইছে। আমি হাঁপিয়ে পড়েছি।

তা হলে এবার তুমি এগিয়ে এস। দেহের পেশীতে বল সঞ্চয় কর। আঘাত হান।

আশ্চর্য্য প্রথম প্রয়াসেই উন্মুক্ত হ'ল—শতাব্দীর রুদ্ধ দ্বার।] এও কি কোন অলৌকিক শক্তির সাহায্যের দরুন?

তবে সে ব্যাপারের মীমাংসা এখন থাক। প্রকাণ্ড প্রাসাদের অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা যে মোহের আবরণ বিষণ্ণ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করছিল, তা অকস্মাৎ টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। জড়ের মত দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। এস আমরা ঘরে ঢুকি। তাকিয়ে দেখলে মনে হয়, যেন এইটাই ছিল পূজার ঘর। শূন্য বেদীর ওপর রক্তধারা ঠোক ত। কি শুনছ, কাঁপা আওয়াজ?

লক্ষ্য কর, কি চমৎকার পালিশ। এক খণ্ড পাথরেই তৈরি হয়েছে বেদীটা। এক পাশ ধরে দু'জনে তুলতে চেষ্টা করা যাক।

যা ভেবেছি, ঠিক তাই। বাক্সের ডালার মত খুলে এল ভারী পাথর। লোহার টুকরোর সাহায্যে ওটাকে কাৎ করে ফেল।

হয়ে গেছে। ঐ যে সার সার সিঁড়ি চলে গেছে নীচের দিকে। এস এবার আমরা নেমে পড়ি। কি বললে? ভূগর্ভে অবতরণ বিপজ্জনক জানি, কিন্তু এতটা এগিয়ে আর ত ফেরা যায় না। চলে এস। টর্চটা আমার হাতে দাও।

গোটা পনের ধাপের পরেই সিঁড়ি শেষ হয়েছে আর একটি দরজার কাছে। দেখা যাচ্ছে, শুধু এই দরজাটিতেই ঝুলছে মরচে-ধরা প্রকাণ্ড একটি তালা। পুরনো আমলের ভারী তালা। লোহার রডের কর্ম্ম নয়। তোমার পকেটে সযত্নে রক্ষিত শিশিটা বার কর ত। ঢাল তরল আগুন ঐ তালাটার উদরে। পারে ত হজম করুক।

প্রাচীন পন্থা প্রগতির কাছে হার মেনেছে বরাবরই। এক টানেই ওটা তা হলে খুলল শেষটায় কস্ করে।

সোৎসাহে যুগপৎ ধাক্কা দিতে বাধা নেই কিছু। বরং তাতে আটকে যাওয়া কপাট দুটো বিনা প্রতিবাদে খুলে যেতে পারে। তাড়াতাড়ি পাশে সরে যাওয়া চাই কিন্তু। ভক্ করে ভাপ্সা দুর্গন্ধের সঙ্গে বেরিয়ে আসবে অনেক দিনের অবরুদ্ধ বাষ্প।

কিছুক্ষণের আগ্রহাকুল প্রতীক্ষা অনিবার্য্য। তারপর তিন সেল টর্চের আলো প্রতিফলিত কর কক্ষের মধ্যে।

কিন্তু কোথায় সেই সকালবেলাকার আনন্দময় আলোর কুচির মত ঝিকঝিকে মোহরের লোভনীয় স্তূপ, যার প্রত্যাশায় চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল বারংবার; আবার বিবর্ণ হচ্ছিলে তোমার একার প্রাপ্যের অংশ গ্রহণে আমার অনুরোধ করতে হবে ভেবে?

আর কোথায় বা তার তাম্রময় আধার, প্রতিষ্ঠাসূচক মঙ্গল কলস, যাদের গায়ে খোদিত থাকবে নানা প্রবচন, সমস্ত অমঙ্গলের রক্ষাকবচ। ইতিহাসের ছাত্র আমি, বাংলার

তিমিরাচ্ছন্ন অতীতে আলোকপাত করবার মত লিপি আবিষ্কার করব ভেবেই না উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলাম একক্ষণ, কোত্তেরও সীমা ছিল না সেই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব খ্যাতি ও সম্মানের অর্দ্ধাংশ তোমায় প্রদান করবার নিশ্চিত বাধ্যবাধকতা স্মরণ করে।

...কোথায় গেল সে সব ?

তার বদলে ঘরের ভিতর উবু হয়ে পড়ে রয়েছে ক্ষুদ্র একটি নরকঙ্কাল, হায় রে এই কি বনামধন্য রাজবংশের বনিয়াদ ?

আমরা থমকে দাঁড়াই।

'চিরজীবী জয় যৌবন'

শ্রীগোপাললাল দে

ফুল ফুটে যেন নয়নে অধরে—পুষ্পিত বক্ষ নিচোল ভরা,
পাণি-পল্লব চরণকমল কটি নিতম্ব শিল্পী-গড়া ;
শ্রীঅঙ্গ শোভা দেখিতে দেখিতে আঁখি চলে দূর কালে ও দেশে,
যৌবনরূপ উঠিল ভেসে ;
হেলেনেরে হেরি, মিশর-নাগরী, মমতাজ বিবি, নূরজাঁ রাণী,
পদ্মিনী তনু ক্ষীণ আয়তনে এত বিদ্যুৎ কে রাখে টানি ?
দস্যু পুরুষ, প্রেমিক পুরুষ, কবি ও পূজারী দাঁড়ায়ে রই,
যৌবনে এত রূপ দেখে আমি অবাক হই।

হেরিয়া চলিনু—তরুণ কিশোর বধে কংসেরে, মগধরাজে,
কৃষ্ণ-সারথি যুবক পার্থ দিক-জয়ে, কুরুক্ষেত্রে সাজে ;
তরুণ দু'জনা বাঁধে সমুদ্র পাহাড়েরে কাটে রক্তোজয়ে,
লঙ্ঘি' সাগর দেশ করে জয়—কখনো বীর্য্যে, কখনো 'লয়ে' ;
শিবাজীতে হেরি, চন্দ্রগুপ্তে, প্রতাপে, যুবক সেকেন্দারে,
সপ্তরথীর কেন্দ্রে তারে ;
নাগ-সঙ্কুল সমুদ্র ডুবি' পার হয়ে আসে উদয়-বাণী,
যৌবনে এত তেজ বীর্য্যেতে অবাক মানি।

হেরি সারি সারি বেছে আনা নারী বাদশা-হারেমে পরীর সাজে,
গুলাবের জলে স্নান করে কেশ কস্তুরী-ধূপ-ধোঁয়ার মাঝে,
কাশ্মীর-হ্রদে ভাসানো বাগানে বিরাম, পরম প্রমোদ-না'র,
মণি-পান্নার ঘর ভরে যায়, হাসি-কান্নায় দিবস যায়,
দিক দেশ হ'তে আসে সম্ভার—খাদ্য পানীয় ভূষণ বাস,
চিরবসন্ত বারোটি মাস ;
ভুবন ভরিয়া এত আয়োজন, এত উপায়ন রচিল আনি',
যৌবনে এত ভোগ দেখে আমি অবাক মানি।

পট ফিরে যায় ; পিতা ও মাতার বারো বছরের কিশোর বলে,
'ধরায় স্বর্গ আনিতে হবে না ? ঘরে যেতে বলো কিসের ছলে ?'
নিদ্রিতা প্রিয়া শিশুটিরে নিয়া ; জীবের দুঃখে পাগল হায়,
নব-যৌবন রাজার কুমার চলিল কোথায় ? ফিরে না চায়।
গেল শঙ্কর, বিশ্বম্ভর, গেল রঘুনাথ, নরোত্তম,
জীব, নরেন্দ্র তাদেরই ক্রম।
কোথা গিরিধারী ? রাজার ঝিয়ারী রাজনারী কাঁদে ব্রজ-ধূলায়,
যৌবনে এত ত্যাগ বৈরাগ্‌ ! অবাক তায় !

যযাতিরে হেরি যৌবন যাচে রাজ্যমূল্যে পুত্রপাশে,
ভেষজ-বিধানে নব-যৌবন চ্যবন আমার নয়নে ভাসে,
চির-যৌবন নারদের বীণা বাজে ত্রিভুবনে ত্রিযুগ ধরি',
চির-যৌবনা উর্ব্বশী লাগি' উঠে ক্রন্দন রোদসী ভরি',
সুরাসুরে চির সিন্ধু-মথন চির-যৌবন অমিয়া তরে ;
কবি-শিল্পীর মানস-সরে
যত রূপকথা কাহিনী গাথায় 'চির-যৌবন' হংসরাজ ;
দেবদেবী তাই স্থির-যৌবন রাখালের চির কিশোর-সাজ।
মহাসিন্ধুর তীরে তীরে নর চিরদিন চারু বয়স মাগে,
যৌবনে এত সুখ দেখি' মোর অবাক লাগে।

আজি এ কি রূপে হেরিনু তোমায়, ওগো চিরজীবী যৌবন !
রূপে রাগে সুখে ভোগে বৈরাগে বীরব্রতে বাঁধা অনুক্ষণ ;
ওগো বিচিত্র ! কত না চিত্রে ফুটিয়া উঠিছ বতন্তর,
কঙ্কাল-মাল কেলি' মহাকাল যুগে যুগে হ'ল কি সুন্দর ;
চিরবিস্তরণ অভয় শরণ। তবে জাগো ওরে উন্মাদ,
নন্দনবন এলো না ভুবনে, ব্যর্থ হবে কি তোর সাধ ?
'সর্ব্ব জগৎ নাহি আক্রমি' সন্ধ্যা-ভজনা করে কি রবি ?'
সুখ পাবি না তো ভোগেরে লভি।
চারি যুগ ধরি' সাগরাম্বরা নিখিল ধরার সর্ব্বজন,
গা'বে "জয় জয় চিরজীবী জয় যৌবন" !

নববর্ষে কিশোর-কিশোরীদের কুচকাওয়াজ—আচার্য্য যদুনাথ সরকার অভিবাদন গ্রহণ করিতেছেন
[ফটো—'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে'র সৌজন্যে

তরুণের অভিযান

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

নববর্ষের আগমনে বাংলার তরুণ-সমাজে এবার একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। কিশোর-কিশোরীর শোভাযাত্রা আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদিতে এই দুঃখের দিনেও বাংলায় নূতন আশার আলো দেখা দিয়াছিল। সেটা সাময়িক কি না সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে। আবার অনেকের মনে সত্যই একটা ভরসা জাগিয়াছে যে, আমাদের তরুণ-সমাজ এত দিনে হয়ত তাহাদের বৈশিষ্ট্য ও সহজ সরল মনোভাব ফিরিয়া পাইতে চলিয়াছে।

সম্প্রতি কয়েকটি সভায় দেখিলাম কিশোর ও তরুণ সম্প্রদায় আগ্রহের সহিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শুনিতেছেন। যে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে গত কয় বৎসর যাবৎ কোন প্রকার সভা করার অর্থই ছিল কোলাহল, মারপিট, সেখানেও সেদিন দেখিলাম যুবক ও তরুণী শান্ত সহজভাবে সভার কর্ম্মসূচী আদ্যোপান্ত শ্রবণ ও নিরীক্ষণ করিতেছেন। আগেকার সে চঞ্চলতা নাই, অসহিষ্ণুতা নাই মনে হইল। এই ধারণা ভুল কি না জানি না, কিন্তু সত্য হইলে অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, নিরতিশয় আশার কথা।

নববর্ষের শোভাযাত্রাতেও যে সকল অঞ্চলে কিশোর-কিশোরীরা দলবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে সেনাদলের গতিতে সমানতালে রাজপথে চলিয়াছিলেন বা মাঠে ময়দানে সমষ্টি-গত ভাবে ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেখানে চতুর্দ্দিক তাঁহাদের মুখের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, দর্শকের মন আশা ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আশা ও আনন্দের কারণ—লোকে ভাবিল, জাতির ভবিষ্য-পথের আলোক আবার বুঝিবা ধূম-অঙ্গার মুক্ত হইয়া নির্ম্মল স্নিগ্ধ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল।

কৈশোরের উৎসাহ ও উদ্দীপনা, যৌবনের উদ্যম ও প্রয়াস এইগুলিই মহামূল্য জাতীয় সম্পদ। এগুলির তো এতদিন অপচয় হইতেছিল, বা দেশের ও দশের সর্ব্বনাশের কাজে নিয়োজিত হইতেছিল। তরুণের বিজয় অভিযান, যাহা জাতির পুরোভাগে চলিবার কথা, তাহা বিপথে পরিচালিত হইয়া জাতির প্রগতিকে প্রতিহত ও অবরুদ্ধ করিতেছিল। জানি না আজ হাওয়া ফিরিয়াছে কিনা, যদি না ফিরে তবে বাংলার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

এ বিষয়ে দেশের কর্ত্তৃপক্ষস্থানীয় যাঁহারা, তাঁহাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বাংলার তরুণ নির্জ্জীব নিশ্চল হইয়া থাকিতে পারে না, একথা আমাদের সকলেরই জানা প্রয়োজন। এই উৎসাহ ও প্রেরণা সুপথে চালিত করিবার নির্দ্দেশ যদি দেশের সন্তানদিগকে না দেওয়া যায় তবে তাহা উন্মার্গগামী ও অকাজে নিয়োজিত হইতে বাধ্য। দেশে তথাকথিত বিপ্লবপন্থী ও বিদেশী রাষ্ট্রের দালালের অভাব নাই, তাহার উপর সম্প্রতি জুটিয়াছেন "দেশোদ্ধারকারী" ভাগ্যান্বেষীর দল, যাঁহারা তরলমতি ছেলেমেয়েদের মস্তক-চর্ব্বণে সুদক্ষ, কেন না বহুদিন যাবৎ উঁহাদের সাহায্যেই ইঁহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের স্পর্শে কৈশোরের অমৃতময় এষণা-প্রেরণা গরলপূর্ণ
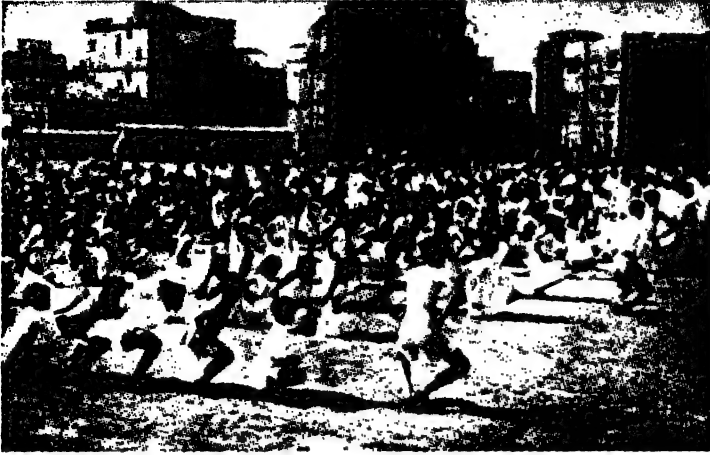
নববর্ষে বালক-বালিকাদের ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন

[ফটো—'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে'র সৌজন্যে

ছাড়িয়া জেরুসালেম জয়ে বাহির হইল। পিতামাতার বাধানিষেধ সবকিছু তুচ্ছ করিয়া এই ধর্ম্মযুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহার পর ইহাদের দুর্দ্দশার ইতিহাস পাঠ করাও ক্লেশকর। প্রথমেই ফন্দিবাজ স্বার্থপরের দল তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব হস্তগত করে, তারপর কিছু ছেলে ক্রীতদাসরূপে বিদেশে বিক্রীত হয়, অবশিষ্টগুলি ঘোর দারিদ্র্যহেতু ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শোচনীয় ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কোথায় গেল তাহাদের মৃত্যুঞ্জয়ী উৎসাহ, কোথায় রহিল তাহাদের জেরুসালেম জয়ের স্বপ্ন!

আমাদের দেশে তরুণদের অভিযানের পরিণতি এতাবৎ কাল প্রায় ঐ ভাবেই চলিতেছে। ছেলে-মেয়েদের সামনে উচ্চ আদর্শ ধরা হয়, তাহাদের অদম্য উৎসাহ এবং সাহসকে নানা স্তোকবাক্যে উদ্দীপ্ত করা হয়, পরে নানা প্রকার ফিকির-ফন্দী তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া বলা হয়, "এই ত ঐ আদর্শ লাভের পথ, এই পথেই তোমরা দেশের ও দশের এবং নিজেদের পরম কল্যাণসাধন করিতে পারিবে। জীবনের মহত্তম

হয়, যৌবনোদ্যমের হরিচন্দন বিষে পরিণত হয়। কত শত সহস্র কিশোর-কিশোরী যুবক-যুবতী ইহাদের পরামর্শে আলেয়ার পিছনে ছুটিয়া দিশাহারা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, তাহাদের নূতন জীবনের দিবাস্বপ্ন ক্রমে বিভীষিকা-পূর্ণ দুঃস্বপ্নরূপ ধারণ করিয়া নিদারুণ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। এই সকল তথাকথিত নেতারা বুদ্ধিমান, সুতরাং নিজেরা কখনও বিপদের সম্মুখীন হন নাই, যত দুঃখ-কষ্ট অত্যাচারের মুখে নির্ম্মমভাবে ঠেলিয়া দিয়াছেন তরুণ-তরুণীদের। ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহারাই, লাভ ও ফলভোগ করিয়াছেন ইহারা। কেন না তরুণ-তরুণীদের ছিল উদ্যম, উৎসাহ ও সাহস—ইহাদের ছিল বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা, কাজেই জলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছে প্রথমোক্তেরা, নেতৃত্বের অভিনন্দন ও অর্থসামর্থ্য আসিয়াছে ইহাদের নিজেদের ভোগে। এই ত বাংলার তরুণের অভিযানের ফল!

মধ্যযুগে যখন খ্রীষ্টানজগৎ ক্রুসেডের (ধর্ম্মযুদ্ধ) উত্তেজনায় মত্ত, যখন সমুদয় খ্রীষ্টানরাষ্ট্র প্যালেষ্টাইন-বিজয়ী মুস্লিম-খলিফাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে তখন একদল সুচতুর ভণ্ড খ্রীষ্টান তরুণদিগকে বলে, "একাজ বড়দের দ্বারা সিদ্ধ হইবে না, ইহা তরুণদিগেরই পক্ষে সম্ভব।" ঐ কুপরামর্শের ফলে অসংখ্য তরুণ দেশ

আসানসোল কৃষি-প্রদর্শনী

[ফটো—পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের সৌজন্যে

আদর্শ তোমরা এই পথে রূপায়িত করিতে পারিবে।"

তাহার পর ঝড়ঝঞ্ঝা যখন আসে, বিপদ যখন ঘনীভূত হইয়া ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, তখন ঐ উপদেষ্টা মহাশয়-ব্যক্তিগণ থাকেন কোথায়? ইহা সত্য যে যদি কয়েকটি তরুণ-কুসুম পদদলিত হয়, কয়েকটি উৎসাহী কিন্তু বিচারে অক্ষম জীবন পরের হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য উৎসর্গীকৃত হয় তখন সেই নেতারূপী স্বার্থান্বেষীদের চীৎকারে আকাশ বিদীর্ণ হয় এবং সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা ভরিয়া যায় গালিগালাজে। তাহার পর, সব গোল মিটিলে, ঐ ভাগ্যান্বেষীর দল নিজেরা লাভের অঙ্ক সবটাই গ্রহণ করেন, তরুণের দল থাকে যে তিমিরে সেই তিমিরে।

বেথোলা বিল অঞ্চলে পচা সার প্রস্তুত

[ফটো—প. ব. স.

বাস্তবিকই বাংলার তরুণের এই অবস্থা আমরা দেখিয়া দেখিয়া বার্দ্ধক্যে আসিয়া পৌছিয়াছি। যৌবনে নিজেরাও এইভাবে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত হইয়াছি। এখন হিসাব-নিকাশের সময় দেখিতেছি বুদ্ধিমান্ লোকেরা ঐ সকল তরুণ ও কিশোর-কিশোরীদের মাথায় হাত বুলাইয়া স্বার্থসিদ্ধিই করিয়াছে প্রতিদানে তাহাদিগকে কিছুই দেয় নাই।

আজ দেশ স্বাধীন, আজও কি ঐ পথেই তরুণ-তরুণীর উদ্যম, উৎসাহ, প্রগতির স্বপ্ন, সবকিছু ব্যর্থ ও শূন্যতায় পর্য্যবসিত হইবে? এখনও কি ভাগ্যান্বেষীর দল পিছনে থাকিয়া অবলীলাক্রমে বাংলার তরুণ সন্তানসন্ততিকে ধ্বংসের পথে, মৃত্যুর মুখে আগাইয়া দিতে থাকিবে?

যত দিন দেশে কিশোর ও তরুণ থাকিবে, তত দিনই চলিবে এই তরুণের অভিযান। ইহা এখন আমাদের রক্তের ধারার মধ্যে ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছে, এবং ইহার সফলতার মধ্যেই আমাদের দেশের আশা-ভরসা সবকিছু নিহিত রহিয়াছে। কিশোর-মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, যৌবনের স্বপ্নই ত মনুষ্যজাতির সকল প্রগতির মূলে। যদি আমরা এই মূলধন হেলায় স্বার্থান্বেষীদের হাতে তুলিয়া দিই তবে দোষ কাহার? মরিবে তরুণ, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদেরও সকল আশা-ভরসা অন্ধকারে বিলীন হইয়া যাইবে।

বেথোলা বিল অঞ্চলে পচা সার তৈরি করার আর একটি দৃশ্য

[ফটো—প, ব. স.

সত্যই কি এই তরুণের অভিযান সুপথে পরিচালিত করিয়া তাহাদের ও সেই সঙ্গে সমস্ত জাতির উন্নতিসাধন করা অসম্ভব? আজ যখন ঐ তরুণের দল ধ্বংসাত্মক কার্য্যে অগ্রসর হইতে থাকে তখন রাষ্ট্রের অর্থ অজস্র ধারে ব্যয়িত হয়। অথচ ঐ তরুণ দলেরই শক্তি-সামর্থ্য সমস্ত দেশের প্রগতিমূলক কাজে যোজনা করিতে যদি ঐ টাকার দশমাংশও চাওয়া যায় তখন শুনি টাকা নাই। রোগের নিবৃত্তি ও প্রতিকারের জন্য দশ গুণ টাকা দিতেই হয় অথচ

রোগ-প্রতিরোধের জন্ত কাণাকড়িরও বরাদ্দ নাই। হায় রে দেশ, হায় রে দেশের কর্তৃপক্ষ!

বিশ্বভারতীর এবং তৎপূর্ব্বে শান্তিনিকেতনের গুরুদেব চাহিয়াছিলেন নৃত্যগীত ও শিল্পকলার আনন্দময় পরিবেশে কিশোর ও তরুণদের সকল শক্তিকে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও প্রগতির পথে লইয়া যাইতে। বিদেশী সরকার তাহাতে কোনও সহানুভূতি দেখায় নাই। আজ স্বদেশী সরকার "নমোনমঃ" করিয়া তাঁহার স্মৃতিতর্পণরূপে কিছু দিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র দেশের তরুণ-সমাজের বিরাট শক্তির যেভাবে অপচয় চলিতেছে তাহার প্রতিকার কি কাহারও দায় নয়?

দেশে বেকার-সমস্যা ত দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, ইহার প্রতিকার চাকুরী নহে সেকথা সকলেই বলিয়াছেন। কিন্তু প্রতিকার যে পথে হইবে তাহার পথ-প্রদর্শকই বা কোথায় এবং সে পথে যাহারা চলিতে চায় তাহাদের সহায়সম্বল আসিবেই বা কোথা হইতে? আর কয়দিন পরে স্কুল কলেজের গ্রীষ্মাবকাশের আরম্ভ হইবে। লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী বেকার অবস্থায় বসিয়া থাকিবে চতুর ভাগ্যান্বেষীদিগের সম্মুখে। এমন কোনও প্রকার পরিকল্পনা করা কি সম্ভব ছিল না, যাহাতে এই অবকাশে তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও সুপ্ত শক্তির উদ্বোধন হইতে পারিত! কৃষি-ব্যাপারে, গ্রাম-উন্নয়ন-কার্য্যে শত-সহস্র তরুণ-তরুণীকে পাওয়া যাইত যদি সময় থাকিতে যথোচিত ব্যবস্থা করা হইত।

শস্যবৃদ্ধি, গ্রাম-উন্নয়ন এই সকল কার্য্যে বিদেশে তরুণ-তরুণীদের শক্তির প্রয়োগ ও বিকাশ শতগুণে হইয়াছে ও হইতেছে। এদেশে তাহার প্রয়োজন নাই একথা অতি-মূর্খেও বলিবে না, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করার আয়োজন ত কোথাও দেখি না।

দরিদ্র চাষীর সহায়তা, দেশের অন্নাভাব দূর করা, রোগক্লিষ্ট দেশের ব্যাধি-প্রতিকার-ব্যবস্থা, দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি—এই সকল কাজের সূচনাও করা যাইতে পারে। উহার পূর্ণ বিকাশ সময় ও অর্থসাপেক্ষ সন্দেহ নাই, কিন্তু আরম্ভ সুষ্ঠুভাবে হইলে উহার প্রচার ও বিস্তার ক্রমে বাড়িবেই।

মূল কথা এই যে, দেশের কর্তৃপক্ষকে দেখাইতে হইবে যে, তাঁহারা তরুণের অভিযানের সপক্ষে এবং তাঁহাদের ক্ষমতা যতটুকু আছে সেই অনুযায়ী তাঁহারা উহার সাহায্য ও সমর্থন করিতে প্রস্তুত। আমাদের ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী যাহারা তাহাদের জন্য এতটুকু ব্যবস্থাও যদি সম্ভব না হয় তবে রাষ্ট্র ও জাতির চরম ক্ষতি হইবে। দেশ শ্মশানে পরিণত হইলে সেখানে নেতৃত্বের মূল্যই বা কি, মন্ত্রিত্বের মূল্যই বা কি?

অর্থমনর্থম্

শ্রীচন্দ্রকিরণ সৌনরেকসা

অনুবাদক—শ্রীভবর বাগচী

মণিশঙ্কর বিহ্বল হয়ে পড়েছে।

হরিশঙ্কর আপন মনেই বলে চলেছেন—'অবাক হবার কোন কারণ নেই বাবা। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি বিপথগামী তা ত শাস্ত্রের কথা। কে আগে জানতো বৌমার মধ্যে এতখানি কলঙ্ক রয়েছে!'

মণিশঙ্কর ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হয়ে বললে, 'কলঙ্ক বউয়ের নয়—তার বাবার। কিন্তু সে ত নির্দোষ।'

'ওসব একই কথা বাবা। ছোট জাতের মেয়ে হবে রাজ-রাণী? কলিযুগে ধর্ম আর কিছুই রইল না। উঃ…কতদিন যে তার হাতের রান্না খেয়েছি! বুড়ো বয়সে শেষকালে এক নষ্ট মেয়ের হাতে জাত গেল! না…না…এই পূর্ণিমা কিছুতেই পার হতে দেব না। হরিদ্বারে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে শুদ্ধ হতেই হবে। গোপাল শর্মাকে এখনি 'তার' করে বউমাকে নিয়ে যেতে বল!'

স্ত্রীর ভবিষ্যতের কথা ভেবে অজানা আশঙ্কায় শিউরে উঠল মণিশঙ্কর। নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক আর কুসুমের মত শুভ্র এই কিশোরীকে চিরদিনের মত বিদায় দিতে হবে? তবু একবার শেষ চেষ্টা হিসাবে মণিশঙ্কর আস্তে আস্তে বললে, 'জ্যাঠা-মশাই, যা হয়ে গেছে তাকে ফেরাবেন কি করে? আর বউয়ের হাতের রান্না যখন খেয়েই ফেলেছেন, এখন তার মা ছোট বংশের মেয়ে বলে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত হবে?'

'কি বললে?'—রাগে গর্জ্জে উঠলেন হরিশঙ্কর—'আমার কথা কি ক্যালনা? পবিত্র গুরুবংশে কলঙ্ক লেগেছে, তোমার কাছে তা একেবারেই মূল্যহীন হ'ল? আত্মীয়-স্বজনেরা যখন সমস্ত সম্বন্ধ ছিঁড়ে ফেলবে তখন তার পরিণাম কি হবে ভেবে দেখেছ? লীলার বিয়ে এক মুহূর্তে ভেঙে যাবে। তুমি কি মনে কর তারা পণ্ডিত তারণদেও আমাদের ঘরের মেয়েকে

নেবে? আমাদের বংশের পবিত্রতা দেখেই ত কৌতূকের দাবি ছেড়ে দিয়েছে।'

দম নেবার জন্য থামলেন হরিশঙ্কর।

'নিজের ধর্ম্ম এত তুচ্ছ করবার জিনিস নয় মণি! মরে যখন যাবে তখন সঙ্গে যাবে শুধু এই ধর্ম্ম। ছোটখাটো বিষয় হলে এড়িয়ে যাওয়া যেত, কিন্তু এ ব্যাপার এত গভীর যে অগ্রাহ্য করা চলবে না। আমি ভাল করে খোঁজ নিয়ে জেনেছি বৌমার মা জাতিতে সত্যি নাপিত। শর্ম্মার স্ত্রী তাকে পালন করেছে। না…না…এখানে ওসব সাহেবীয়ানা চলবে না। এই পাপেই ত সমস্ত সংসার রসাতলে যেতে বসেছে। সাধে কি মনু বলে—'যদা যদা হি ধর্ম্মস্ত…' তার পরেরটা এখন মনে নেই, তুমি একবার ভাগবতখানা দেখে নিও। ওঁ হরি…'

পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে জ্যাঠামশায়ের কথা শুনে চলল মণিশঙ্কর। হরিশঙ্করের চোখ এড়ায় না তা। মনে মনে কিছু বেদনা বোধ করেন। তাই ধীরে ধীরে মণিশঙ্করের দিকে এগিয়ে এসে তার পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—'শুধু শুধু মন খারাপ করছ কেন? দশ দিনের মধ্যে আবার তোমার মাথায় টোপর পরাবার শক্তি আমি এখনও রাখি বাবা!'

মণিশঙ্কর আরও শঙ্কিত হয়ে ওঠে, কারণ জ্যাঠামশায়ের শক্তির পরিমাণ তার অজানা নয়। দশ দিন কেন, দশ মাস পরেও আবার নূতন করে টোপর পরবার বাধা ছিল না, কিন্তু কল্যাণীর মত নিরপরাধ শান্ত আর সুন্দরী স্ত্রীকে বিনা কারণে ত্যাগ করে আবার বিয়ে?…না অসম্ভব!

মণিশঙ্করের নীরবতা হরিশঙ্করের উৎসাহকে বাড়িয়ে দিলে। আগের মতই পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, 'দেখেছ বাবা, বৌয়ের মত কি রকম জিলাপীর প্যাঁচে ভরা! তোমাকে পর্য্যন্ত সামান্ত আভাসটুকু দেয় নি! কথায় বলে না—পাখীর মধ্যে কাক আর মানুষের মধ্যে নাপিত সবচেয়ে চালাক! যার যা স্বভাব তার তা প্রকাশ হবেই…'

মণিশঙ্কর ভাবতে থাকে।

সত্যি ত আগুন সাক্ষী রেখে যাকে সে জীবন-মরণের সাথী বলে গ্রহণ করলে তার কাছেই সঙ্কোচ? তাকেই অবহেলা আর আত্মগোপন?

মণিশঙ্কর আশার আলোর কোন চিহ্নই দেখতে পায় না। হরিশঙ্কর তার ভাবনার তারে আঘাত দিয়ে বললেন, 'ভেবে দেখ মণি, এক দিকে তোমার স্ত্রী আর এক দিকে নীলার ভবিষ্যৎ! যদি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখি তা হলে ভাদুড়ি পণ্ডিতের মর্য্যাদা, আমাদের বংশ-গৌরব ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে তাও কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না?'

মণিশঙ্করের চোখে আবার নেমে আসে ভাবনার গাঢ় ছায়া।

* * *

কাঁদতে কাঁদতেই রাত কাটিয়ে দেয় কল্যাণী। জ্যাঠাশ্বশুর আর শাশুড়ীর আশীর্ব্বচন তাকে আধমরা করে ফেলেছিল, তার উপর রাতের বেলায় মণিশঙ্করের উত্তপ্ত মেজাজের পরিচয় পেয়ে প্রাণটুকু যেন বেড়িয়ে আসার পথ খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দীর্ঘদিনের নিঃস্বার্থ সেবা, তার কিশোরী মনের শ্রদ্ধা ভালবাসা দিয়ে যাদের সে বিভোর করে রেখেছিল আজ সামান্ত কারণে তাদেরই সে ঘৃণার পাত্রী হয়ে উঠেছে? স্বামী যখন তাকে জিজ্ঞেস করলে কেন আগে জানায় নি, সে তখন তাকে কিছুই গোপন করে নি। বাপ-মায়ের কলঙ্ক সন্তান কি করে নিজের মুখে উচ্চারণ করতে পারে তা একটি বারও ভেবে দেখল না? সে ত সাধারণ মানুষ। অসাধারণ কিছুই ত করে নি…

মণিশঙ্করের মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। গলার স্বরকে অভিমানে পূর্ণ করে দিয়ে বললে, 'তা হলে এতদিন ধরে ভালবাসার অভিনয় করে এসেছ? তুমি আমাকে আপনার মনে করতে পার নি বলেই সব গোপন করে গেছ!'

কল্যাণী চুপ করে থাকে।

মণিশঙ্কর পাশ ফিরে শোয়।

কল্যাণীর দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে—নীরবে নিঃশব্দে! মুক্তার মত ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু মাথার বালিস ভিজিয়ে দেয়। চোখ ফুলে ওঠে, কিন্তু মণিশঙ্কর নিশ্চুপ নির্ব্বিকার। সান্ত্বনার একটা কথা, সোহাগের একটা বাণীও সে শোনায় না। সারা জীবনের কাজ, সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনা একটি ভুলে ভেঙে ছারখার হয়ে যায়। তাই কল্যাণীর এত বড় অপরাধ ক্ষমা করবে কে? নীচ জাতির পতিতা মায়ের মেয়ে হয়ে মণিশঙ্করকে সে আপনার করে নিয়েছিল কি তাদের বংশকে কলঙ্কিত করবার জন্ত?

মণিশঙ্কর অভিমানে মুখ ফিরিয়ে থাকলেও এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু কল্যাণীর চোখে ঘুম আর আসে না। বাবার কাছে 'তার' চলে গেছে তাকে নিয়ে যাবার জন্তে। তারা তাকে আবার গ্রহণ করবে কিনা কে জানে? এদিকে বাবার ভাগ্যেও কম লাঞ্ছনা জুটবে না হয়ত…

এই সব ভাবনায় সে ছট্‌ফট্ করতে থাকে।

দীর্ঘ প্রতীক্ষিত রাতের অবসান হ'ল। রাত্রির অন্ধকারের বুকে ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে লাগল আলোর রেখা। প্রভাত-সূর্য্যের প্রথম স্পর্শ লাগবার সঙ্গে সঙ্গেই গোপাল শর্ম্মা হাজির হলেন।

'জয় রামজী!'

ভিতর বাড়ী থেকে কোন উত্তরই এল না। কিন্তু তার বদলে বরং হরিশঙ্কর বেরিয়ে এলেন।

'বেশ লোক যাহোক্ শর্ম্মাজী! আপনার সঙ্গে কি এমন শত্রুতা করেছিলাম যার প্রতিদান দিলেন নাপিতের মেয়ের বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে!'

গোপাল বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যান। সতের বছর আগেকার ভুলের মাশুল যে এতদিন পরেও দিতে হবে কে ভেবেছিল? যে ভুলের বীজ তিনি পুঁতেছিলেন আজ তা মহীরুহে পরিণত হয়েছে। সেই ভুল তাঁকে আত্মগ্লানিতে দগ্ধে মেরেছে; যাকে তিনি মনে করেছিলেন বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে আজ তাই আবার ঘোষণা করছে নিজের উপস্থিতি! লজ্জায় অনুশোচনায় মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

'চুপ করে রইলে কেন শর্ম্মাজী? সংসারে ঠকাবার লোক আর কাউকে পেলে না?'

ধীরে ধীরে নড়ে উঠলেন গোপাল শর্ম্মা। মাথার পাগড়ীটা হরিশঙ্করের পায়ের কাছে রেখে বললেন—'আমার মান সম্মান সব আপনার পা'য়ে সঁপে দিলাম। মেয়ের রঙীন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি সত্যি, কিন্তু আমার সে গোপন কথা আপনি কি করে জানলেন? কল্যাণীর মরা বাঁচা এখন আপনার হাতে। আমি অপরাধী সত্যি, কিন্তু কল্যাণী মা যে নির্দোষ!'

রুদ্ধ আবেগ গোপাল শর্ম্মাকে থামিয়ে দেয়। চিকের আড়াল থেকে কল্যাণী এতক্ষণ সব দেখছিল। তাই তার সমস্ত বুকখানা অব্যক্ত ব্যথায় বার বার মোচড় দিয়ে ওঠে। বাবার ও রকম অনুনয় সে আর সহ্য করতে না পেরে সোজা ছুটে এসে ঘুমন্ত স্বামীর পা জড়িয়ে ধরে বলে—'ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি! বাবা তাঁর পাগড়ী জ্যাঠামশায়ের পায়ের ওপর রেখেছেন, তবু তিনি দয়া করছেন না! উঃ ভগবান…মরণও আমায় নিতে ভয় পায়? আমার জন্তই বাবার আজ এত দুর্ভোগ আর লাঞ্ছনা…'

মণিশঙ্কর ত্রস্তে বিছানায় উঠে বসে। নিষ্পাপ বউয়ের করুণ মিনতি তাকে বিচলিত না করে পারে না। বার বার ইচ্ছে হয় কল্যাণীকে বুকে জড়িয়ে বলে—ওগো রাণী! কে তোমাকে কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে? কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই চোখের সামনে জ্যাঠামশায়ের রুদ্র মূর্ত্তি, লীলার বিবাহ, আত্মীয়বিচ্ছেদের ব্যথার ছবি পর পর ফুটে উঠতে থাকে। তাই কয়েক মুহূর্ত্ত বিহ্বলের মত বসে থেকে ধীরে ধীরে কল্যাণীর বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়।

ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতেই মণিশঙ্কর শুনতে পেলে জ্যাঠামশায়ের কথা—

'আপনার কাজ তো বেশ করেছেন, এবার দয়া করে মেয়েকে নিয়ে গিয়ে আমাদের উদ্ধার করুন। এখানে বউমার আর স্থান হবে না।'

ইতিমধ্যে মণিশঙ্কর তাদের মাঝে এসে পড়েছে। গোপাল শর্ম্মা অসহায়ের মত কাতর নয়নে তার দিকে তাকালেন। দৃষ্টির সেই অনুনয়-বিনয়, লজ্জা-ক্ষোভের চিহ্ন মণিশঙ্কর সহ্য করতে পারে না, শুধু অপরাধীর মত চুপচাপ মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

'বউমাকে তার জিনিষপত্র গুছিয়ে নিতে বল্। আর দেখিস্ একখানা গয়নাও যেন সঙ্গে না নেয়!'

মণিশঙ্কর তার পরেও সেই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে দেখে নিজেই অন্দরমহলের দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে হরিশঙ্কর বললেন—'নাঃ আমি নিজেই বলছি গিয়ে!'

* * *

একটার পর একটা সম্বন্ধ আসে আর ভেঙে যায়। মণিশঙ্করের মত হয় না। আবার বিবাহের নামে তার গায়ে জ্বর এসে যায়। বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাসে কল্যাণী যখন তার অন্তরের সমস্ত আনন্দটুকু নিঃশেষে মুছে নিয়ে গেল তখন অব্যক্ত ব্যথায় সমস্ত অন্তরটা ফেনিয়ে উঠতে লাগল! আজ না হোক কয়েক বছর পরে বিয়ে তাকে করতেই হবে, কিন্তু সেই অনাগত দিনের রঙীন স্বপ্ন কৈ তার চোখে তো লাগে না? সেদিনও হরিশঙ্করের কাছে কোন সদাশয় ব্যক্তি অনুরোধ করে গেছে।

লোকটি চলে যেতেই মণিশঙ্করের ডাক পড়ল। অন্যমনস্ক, উদাসভাবে সে গিয়ে হাজির হ'ল। রোজ সেই একই আলোচনার পুনরাবৃত্তি অসহ্য হয়ে উঠেছে। এতগুলো লোক কি তার ভরসায় কন্যাদের পালন করছে?

হরিশঙ্কর গড়গড়ার নলে একটা সুখটান দিয়ে বললেন—'বাবা মণি! আমি তো ভীষণ বিপদে পড়ে গেছি! রোজ রোজ কত লোককে আর ফেরানো যায়? কাল আজমীর-গড়ওয়ালাদের বিদায় করেছি, আজ মীরপুরের লোকেরা এসে এতক্ষণ ধর্ণা দিয়েছিল! যা হোক, একটা কিছু তাড়াতাড়ি করে ফেল, কতদিন আর এমনি ভাবে কাটাবে?'

'এ বছরটা পার হতে দিন!'—মুহূর্ত্তকয়েক ইতস্ততঃ করে মণিশঙ্কর বলে ফেলল। জ্যাঠামশায়ের সামনে কেন জানি সে স্বাভাবিক হতে পারে না।

'ও সব তোমার পাগলামি!—হরিশঙ্কর আরও স্নেহার্দ্র স্বরে বললেন—'আর আপত্তি কর না বাবা। মীরপুরওয়ালারা আট শ' টাকা নগদ দিতে চায় আর সেই সঙ্গে সাত ভরি সোনা! আর মেয়েও নাকি অপরূপ সুন্দরী। আর যদি তা নাই হয় তাতেই বা ক্ষতি কি? কুলীনের মেয়ের আবার রূপ!'

মণিশঙ্কর চুপচাপ শোনে শুধু!

পনর দিনের মধ্যে বিবাহ পাকা হয়ে গেল। সামনের সোমবারেই আশীর্বাদ। তাড়াতাড়ি অনুষ্ঠান শেষ করে আশীর্বাদস্বরূপ পাওয়া এক শ' টাকা জ্যাঠামশায়ের হাতে গছিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে মণিশঙ্কর। ঠিক তখনই পিওন তার হাতে একটা খাম তুলে দিলে।

ঠিকানা দেখে কেঁপে উঠল মণিশঙ্কর। খামটা কল্যাণীর কাছ থেকে এসেছে। চলে যাওয়ার পর এই প্রথম সে চিঠি লিখেছে। ভয়ে ভয়ে খামটা ছিঁড়ে ফেলে চিঠিটা বের করে পড়তে লাগল মণিশঙ্কর। শেষও করে ফেলল এক নিঃশ্বাসে। কোথাও বিদ্রূপ নেই, কোনখানে আঘাত নেই, নেই এতটুকু স্নেহের ইঙ্গিত। যথারীতি কুশল-সংবাদের পর সে লিখেছে তার মেসো রায় বাহাদুর শ্রীরাম গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তাই মণিশঙ্করকে একবার দেখতে চান।'

আবার বাড়ীর ভেতর ঢোকে মণিশঙ্কর। জ্যাঠামশায়েরও হাতে চিঠিটা দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়ায়। চিঠিটা পড়ে হা হা করে হেসে ওঠেন হরিশঙ্কর।

'দেখছ মায়াবিনী আর একটা বড় জবর চাল চেলেছে। মণিকে ওখানে নিয়ে গিয়ে ভুলিয়ে রাখবে আর কি? কিন্তু তার সঙ্গে যখন সমস্ত সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে তখন এ চিঠির মূল্য কোথায়?'

মণিশঙ্করের যাওয়া হ'ল না।

* * *

বিয়ের জিনিস দেখছিলেন মণির মা। কাছেই একটা চেয়ারে বসে ফর্দ মেলাচ্ছিল মণিশঙ্কর।

'দশ টাকার জরি, তিন টাকার সেলাই আর বাইশ টাকার কাপড়। মোট...'

হাঁপাতে হাঁপাতে দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকলেন হরিশঙ্কর। ভাইপোর হিসাবে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—'মণি শুনেছ রায় বাহাদুর তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আমাদের বউমার নামে লিখে রেখে গেছেন?'

'এ্যা...!' মণিশঙ্কর আর তার মা দু'জনেই একসঙ্গে বলে ওঠেন।

মুহূর্তের জন্য মণিশঙ্করের চোখ মুখ আশার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে হিসাবে মন দিতে চেষ্টা করল।

'পাঁচ টাকার—'

'হিসাব পরে হবে'খন।'—ভাইপোর হাত থেকে ফর্দটা ছিনিয়ে নিলেন।

হরিশঙ্কর: 'রায় বাহাদুরের সম্পত্তির হিসাব রাখ কি? তিরিশ হাজার তো ব্যাঙ্কে। তার ওপর বাড়ী আর দোকান মিলিয়ে পঞ্চাশ হাজারের কম হবে না।'

'সে খবরে আমাদের লাভ কি?'—মণিশঙ্কর অধৈর্য্য হয়ে ওঠে: 'তাদের কাছে কোন দেনা পাওনা আছে নাকি?'

'দেনা-পাওনা নেই মানে? আমাদের বৌমাই তো সব সম্পত্তি পেয়েছে।'—

বিজ্ঞের মত চোখ মুখের ভাব করে হরিশঙ্কর বললেন: 'আমরা যদি না দেখি তা হলে বাইরের লোকেরা দু'দিনে লুটে পুটে নেবে।'

'কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের আর সম্পর্ক কোথায়? শুক্ল বংশের বউ কখনও ছোট জাতের মেয়ে হতে পারে না।'

'তাতে কিছুই ক্ষতি নেই। হিন্দুধর্ম্মের সাত পাকের বিয়ের সম্পর্ক পরের জন্ম পর্য্যন্ত থাকে। সনাতন ধর্ম্মের মহত্ত্ব তো সেখানে?'—হরিশঙ্কর ঘাড় দোলাতে লাগলেন—'এ বিয়ে কি পুতুলখেলা পেয়েছ? বউমা আমাদেরই। আর কলঙ্কের কথা? একবার যখন লেগেছে তখন হাজার বার ত্যাগ করলেও কি মুছবে? শাস্ত্র তো পড়লি না, তা হলে জানতে পারতিস্ ধর্ম্মানুসারে প্রথম স্ত্রী সত্যিকারের সহধর্ম্মিণী। এমনি যত বিয়েই কর না কেন মনু বলেছে—'

প্রমাণ করবার চেষ্টা করতেই মণিশঙ্কর তাড়াতাড়ি বলে উঠল—'আত্মীয়স্বজনের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়েছে। তা ছাড়া শীলার বিয়ে; ভানু পণ্ডিতের...'

'উচ্ছন্ন যাক্ ভানু পণ্ডিত। তার গরজ থাকে এক শ' বার আসবে। শীলার জন্য কি ছেলের অভাব? পাঁচ হাজার খলে যার সামনে তুলে ধরব লক্ষ্মী ছেলের মত সুড় সুড় করে সে-ই এগিয়ে আসবে।'

মণিশঙ্কর বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে জ্যাঠামশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তা লক্ষ্য না করেই হরিশঙ্কর বলে চললেন—'আর আত্মীয়স্বজনের ভাবনা। পোলাও কালিয়ার ভোজ দিলে সব মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। দেখি কার সাহস আছে বলুক দেখি শুক্ল বংশের বউ নাপিতের মেয়ে। তুমি এই ট্রেনেই ফৈজাবাদে চলে গিয়ে বৌমাকে নিয়ে এস। মীরপুরওয়ালা-দের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে এখনি চিঠি দিচ্ছি।

সে মেয়ে আমার পছন্দ হয় নি। শুনেছি তার বাঁ পায়ে নাকি একটু দোষ আছে।' *

---

* হিন্দী হইতে অনূদিত

"জাতীয় গ্রন্থাগারে"র রূপান্তর

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি বা "জাতীয় গ্রন্থাগার" ১৮৮৬ সন নাগাদ গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইল। আয় ক্রমশ: হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া গচ্ছিত তহবিলের উপর টান পড়িল। গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষও অবশ্য বসিয়া ছিলেন না। এরূপ একটি জনহিতকর সংস্কৃতিমূলক জাতীয় প্রতিষ্ঠান যাহাতে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারে, তাঁহারা তাহার উপায় চিন্তা করিতে সবিশেষ তৎপর হইলেন। এ. ম্যাকেঞ্জি নামক গ্রন্থাগারের একজন অংশী ইতিপূর্ব্বে ইহাকে 'ফ্রি পাবলিক লাইব্রেরি'তে পরিণত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৮৫, ১৫ই ডিসেম্বর এই উদ্দেশ্যে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা রচনা করিয়া গ্রন্থাগারের সভাপতি মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ ও ইহার নকল বাংলা গবর্ণমেণ্টকে পেশ করেন। গ্রন্থাগারের কাউন্সিল বা অধ্যক্ষ-সভা ও সরকার উভয়ের মধ্যে এ সম্পর্কে যে পত্রালাপ চলে তাহা ম্যাকেঞ্জির প্রস্তাবকেই ভিত্তি করিয়া। পূর্ব্বনির্দ্দেশমত ১৮৮৬ সনের ৩০শে জানুয়ারী গ্রন্থাগারের অংশীদার এবং প্রথম শ্রেণী চাঁদাদাতাদের বিশেষ সাধারণ সভায় এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়:

"That it be referred to the Council of the Library to enter into negotiation with the Government of Bengal and the Corporation of Calcutta with the view of converting the Library into a Free Public Library, preserving the rights of the Proprietors so far as can consistently be done, subject to the approval of the members at a special meeting."

এই প্রস্তাব হইতে স্পষ্টই বুঝা গেল, কতকগুলি সর্ত্তসাপেক্ষ গ্রন্থাগারকে 'ফ্রি পাবলিক লাইব্রেরি'তে পরিণত করিতে অংশী ও চাঁদাদাতাদের আদৌ আপত্তি ছিল না। ইহা ত বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রায় একটি সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী গ্রন্থাগারে পরিণত হইয়াছিল। তবে অর্থকৃচ্ছ্রতা হেতু কর্ম্মচারী-সংখ্যা হ্রাস করিয়া কর্তৃপক্ষ ইহার কার্য্য ক্রমে অনেকটা সঙ্কুচিত করিতে বাধ্য হন। যাহা হউক, অধ্যক্ষ-সভা সাধারণ সভার নির্দ্দেশমত সরকারকে পত্র লিখিলেন। কিন্তু ইহার ফলাফল পরবর্ত্তী বৎসরের পূর্ব্বে জানা যায় নাই। ইতিমধ্যে এই বৎসরে, ১৮৮৬ সনে গ্রন্থাগারের আর্থিক অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া পড়িল। মেট্‌কাফ হল মেরামতির অংশস্বরূপ তাঁহাদিগকে প্রায় চারি হাজার টাকা ব্যয় করিতে হয়। এই পরিমাণ অর্থ এবং দৈনন্দিন ব্যয় মিটাইতে গিয়া গ্রন্থাগারের গচ্ছিত তহবিল কমিয়া এগার হাজার হইতে একেবারে ছয় হাজারে গিয়া ঠেকিল।

অধ্যক্ষ-সভা ১৮৮৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসেই গ্রন্থাগারের ইত্যাকার অবস্থা সরকারকে পুন: জানাইতে ক্রটি করিলেন না। ম্যাকেঞ্জির প্রস্তাবে গ্রন্থাগারের ব্যয়ভার কলিকাতা করপোরেশনের বহন করিবার কথা ছিল। সরকার ও কর্পোরেশনের মধ্যে এই ভিত্তিতে পত্র-ব্যবহার চলিল। করপোরেশন এরূপ প্রস্তাবে এই বলিয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন যে, উক্ত গ্রন্থাগার দ্বারা করদাতারা বিশেষ উপকৃত হইবেন না। গবর্ণমেণ্ট অধ্যক্ষ-সভাকে ১৮৮৭, ২১শে মার্চ্চ পত্রযোগে এই কথা জানাইলেন। তখন স্যর অগষ্টাস রিভার্স টমসন বঙ্গের ছোটলাট। তিনি বাঙালীদের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন না। তাঁহার নির্দ্দেশে অধ্যক্ষ-সভাকে আরও জানাইয়া দেওয়া হইল যে, বাংলা-সরকারও গ্রন্থাগারকে কোনরূপ অর্থসাহায্য দিতে পারিবেন না।

অথচ, গ্রন্থাগারের এরূপ অবস্থা যে, আশু অর্থ না মিলিলে ইহাকে রক্ষা করাই দায়। ১৮৮৭ সনের ১৬ই মে অংশী ও চাঁদাদাতাদের আবার একটি সভা আহুত হইল। অংশীগণ যাহাতে নূতন করিয়া গ্রন্থাগারকে অর্থসাহায্য করেন তজ্জন্য একটি প্রস্তাবে তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ ভাবে অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু ইহাতেও বিশেষ ফলোদয় হইল না। অধ্যক্ষ-সভা মহা ফাঁপরে পড়িলেন। তবে এই বিপদের মধ্যেও আশার ক্ষীণ আলোক দেখা দিল।

২

স্যর জন ষ্টুয়ার্ট বেলী ১৮৮৭ সনের এপ্রিল মাসে বঙ্গের ছোটলাট হইয়া আসেন। পূর্ব্বরীতি অনুযায়ী তিনি গ্রন্থাগারের অন্তত্র বান্ধব হইলেন। গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ-সভা ১৮৮৮ সনে পুনরায় সরকারের নিকট এই মর্ম্মে আবেদন জানান যে, তাঁহারা যেন ইহাকে মাসে অগত্যা দুই শত টাকা করিয়া সাহায্য দান করেন। ছোটলাট বেলী নিজে গ্রন্থাগারের সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। গ্রন্থাগারের উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ না করিলেও, তাঁহার, সুতরাং সরকার পক্ষে অস্থায়ী সেক্রেটারী এইচ. জে. এস্. কটন ১৮৮৮, ১১শে সেপ্টেম্বর অধ্যক্ষ-সভাকে এই মর্ম্মে পত্র লেখেন যে, ম্যাকেঞ্জির প্রস্তাবের ভিত্তিতে গ্রন্থাগার, তথা অধ্যক্ষ-সভা পুনর্গঠনে সম্মত হইলে তাঁহারা সরকার ও গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি লইয়া এই উদ্দেশ্যে একটি কমিটি নিয়োগ করিবেন।

এখানে ম্যাকেঞ্জির পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমাদের দু'চার কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক। তাঁহার প্রস্তাবের ভিত্তিই ছিল —গ্রন্থাগারটিকে একটি "ফ্রি পাবলিক লাইব্রেরি"তে পরিণত করা। অর্থাৎ, এতদিন এখানে অংশীও চাঁদাদাতাদের এবং তাঁহাদের নির্দ্দেশিত লোকেদেরই পুস্তকাদি পাঠ ও বাহিরে

লইয়া যাওয়ার অধিকার ছিল। ইহার পরিবর্তে, ইহার দ্বার সকলের নিকটই উন্মুক্ত করা হইবে। এখানে বসিয়া পুস্তকাদি পাঠে কাহারও সুপারিশ প্রয়োজন হইবে না। অবশ্য অংশী ও চাঁদাদাতাদের জন্য "Lending Department" নির্দিষ্ট থাকিবে। এখান হইতে তাঁহারা পুস্তকাদি বাহিরে লইয়া যাইতে পারিবেন। অধ্যক্ষ-সভাও পুনর্গঠিত হইবে। ইহাতে মিউনিসিপালিটির পক্ষে ৬ জন, অংশী ও চাঁদাদাতাদের পক্ষে ৪ জন এবং সরকার মনোনীত ২ জন, একুনে ১২ জন সদস্য থাকিবেন। গ্রন্থাগারের পাঠাগার প্রত্যহ সকাল ৬টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত সাধারণের জন্য খোলা থাকিবে। 'লেণ্ডিং' বিভাগ খোলা থাকিবে রবিবার ব্যতীত প্রতিদিন সকাল ১০টা হইতে বৈকাল ৫টা পর্য্যন্ত। এই বিভাগের ব্যয় চাঁদা-দাতাদের চাঁদা এবং গচ্ছিত তহবিলের আয় হইতে নির্ব্বাহিত হইবে। ইহা ছাড়া গ্রন্থাগার সম্পৃক্ত যাবতীয় ব্যয় কলিকাতা মিউনিসিপালিটি বা করপোরেশন বহন করিবেন। এজন্য করপোরেশন করদাতাদের উপর টাকায় অনধিক এক পাই cess বা কর বসাইতে পারিবেন।

এই পরিকল্পনাটি করপোরেশন ইতিপূর্ব্বে যে কি ওজুহাতে বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। সরকার এবারে কিন্তু ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহাদের পক্ষে অস্থায়ী সেক্রেটারী কটন সাহেব উপরি-উক্ত পত্রে কমিটির তিন জন সদস্যেরও নাম করিলেন এবং গ্রন্থাগারকে দুই জন সদস্য নিয়োগের অনুরোধ জানাইলেন। এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারের সাধারণ সভায় অধিবেশন হইল ১৮৮৮ সনের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে। সভা ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ও সি. ই. ভিসেণ্টকে সদস্য মনোনীত করিলেন। সরকার-নিযুক্ত সদস্যত্রয় ছিলেন যথাক্রমে—এইচ. এ. রেনল্ডস (সভাপতি), সার হেনার হ্যারিসন ও সার আলফ্রেড ক্রফ্‌ট। এই পাঁচ জন সদস্য লইয়া কমিটি গঠিত হইল। তাঁহারা অবিলম্বে কার্য্যও আরম্ভ করিলেন। কমিটির অধিবেশন বহু বার হইল। গ্রন্থাগার-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় আলোচনান্তর ১৮৮৯, ৫ই মার্চ্চ তাঁহারা সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করেন। তাঁহাদের মতে,

"A public library is an institution in which every citizen should be at liberty to consult works of reference and standard literature."

অর্থাৎ, একটি সাধারণ গ্রন্থাগারে যে-কেহই যে-কোন পুস্তক পাঠ করিবার অধিকারী। তাঁহারা আরও বলেন যে,

"The Library should contain a free or public department, from which books should not generally be liable to removal."

অর্থাৎ, গ্রন্থাগারের একটি সাধারণ বিভাগ থাকিবে যেখান হইতে পুস্তকাদি পারতপক্ষে অন্যত্র লইয়া যাওয়া হইবে না। ইহা সব সময়ের জন্য সাধারণের নিকট উন্মুক্ত থাকিবে। এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কমিটি তাঁহাদের রিপোর্ট রচনা করেন।

গ্রন্থাগার পরিচালনা ও অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে ম্যাকেঞ্জির পরিকল্পনাই কমিটির সহায় হইল। তাঁহারা সব দিক বিবেচনা করিয়া স্থির করেন যে, হয় গবর্ণমেণ্ট নয় সরকার-পোষিত করপোরেশন গ্রন্থাগার পরিচালনার অংশী হইবেন, এই দুই পক্ষ একই সময়ে হইবেন না। গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ-সভায় ইঁহাদের পক্ষে সভ্য থাকিবেন ছয় জন, তাঁহারা প্রতি বৎসর নূতন করিয়া নিযুক্ত হইবেন। গ্রন্থাগারের অংশী ও চাঁদাদাতাদের পক্ষেও সভ্য থাকিবেন ছয় জন। প্রথমোক্ত সদস্যগণকে 'External Body of the Calcutta Public Libary'ও বলা হইত। তাঁহাদের ভিতর হইতে সভাপতি এবং শেষোক্ত ছয় জনের ভিতর হইতে সহকারী সভাপতি মনোনয়নেরও তাঁহারা প্রস্তাব করেন। গ্রন্থাগারের দুইটি বিভাগ—(১) জনসাধারণের জন্য "Free Public Reading Room," অর্থাৎ, বিনা চাঁদায় সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী পাঠাগার এবং (২) 'Lending Department,' অর্থাৎ, গ্রন্থাগারের বাহিরে অংশী ও চাঁদাদাতাদের পুস্তক লইয়া যাইবার জন্য 'লেণ্ডিং বিভাগ'। এই সময় গ্রন্থাগারের বাৎসরিক আয় সাত হাজার টাকার কিছু উপর ছিল। কমিটির মতে এই টাকা হইতে দ্বিতীয় বিভাগের কার্য্য চলিতে পারিবে। প্রথম বিভাগটির যাবতীয় খরচ গবর্ণমেণ্ট বা করপোরেশনকে বহন করিতে হইবে। এই ব্যয় অন্যূন আট হাজার টাকা পড়িবে। দুই বিভাগের ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা প্রতি বৎসর পুস্তকাদি ক্রয় করিতে হইবে। কমিটি রিপোর্টে আরও বলেন যে, গ্রন্থাগার পুনর্গঠনের জন্য যে দশ হাজার টাকার মত প্রয়োজন হইবে তাহা গবর্ণমেণ্টেরই বহন করা কর্ত্তব্য।

৩

ম্যাকেঞ্জির প্রস্তাব অনুযায়ী কলিকাতা করপোরেশন যাহাতে গ্রন্থাগার পরিচালনায় অগ্রণী হন, ইহাই ছিল বাংলা-সরকারের ইচ্ছা। তাঁহারা যথাসময়ে কমিটির রিপোর্ট প্রাপ্ত হন এবং গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ-সভা ও করপোরেশনের নিকট মতামত আহ্বান করিয়া ইহার নকল অবিলম্বে পাঠাইয়া দেন। অধ্যক্ষ-সভার নিকট পত্র প্রেরিত হয় ১৬ই মার্চ্চ (১৮৮৯) তারিখে। তাঁহারা পরবর্ত্তী ১লা জুন সাধারণ সভা আহ্বান করিলেন। এই সভায় উক্ত রিপোর্টে উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ তাঁহারা মোটামুটি ভাবে গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে এই অনুরোধ জানাইলেন যে, গ্রন্থাগার পুনর্গঠনকল্পে ইহার নিয়মাবলী রদ-বদল করা অবশ্যই প্রয়োজন হইবে। এই সব নূতন বা সংশোধিত নিয়মাদি তাঁহাদের দ্বারা পূর্ব্বাহ্নে অনুমোদন করাইয়া লওয়া আবশ্যক। এই মর্ম্মে গৃহীত প্রস্তাব ১৮৬০ সনের ২১শ আইন অনুসারে

পরবর্তী ২রা জুলাইয়ের সাধারণ সভায় পুনরায় অনুমোদিত হইলে সরকারের নিকট প্রেরিত হইল।

ওদিকে কলিকাতা মিউনিসিপালিটিও ২০শে জানুয়ারী ১৮৯০ তারিখে রিপোর্টের অনুকূলে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। প্রস্তাবটি এই :

Resolved.—"That, as recommended in the report of the Government Committee, the Municipality represent the external body of the Council of the Calcutta Public Library and bear the entire cost of Rs. 8000 per annum, or whatever it might be, towards defraying its erpenses, on the understanding that the recommendations contained in paragraphs 6, 7, and 11 of the report form the basis of the future management of the Library."

ছোটলাট স্বয়ং পরবর্তী ১৯শে ফেব্রুয়ারী (১৮৯০) তারিখে করপোরেশনের এই প্রস্তাব সম্পর্কে গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ-সভার অভিমত চাহিয়া পাঠাইলেন। অধ্যক্ষ-সভাও কালবিলম্ব না করিয়া ১০ই মার্চের অধিবেশনে নিম্নরূপ অনুকূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন :

"That the Council of the Calcutta Public Library accept with thanks the proposal made by the Commissioners for the town of Calcutta for the future management of the Library, and arrange to relinquish the present management of the Library from and after date of the next Annual General Meeting of the Proprietors and Subscribers."

পরবর্তী ১৭ই মার্চ অধ্যক্ষ-সভা তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ইহাও জানান যে, ১৯শে এপ্রিল গ্রন্থাগারের বার্ষিক অধিবেশন হইবে। তাহার পরই নূতন যুগ্ম অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হইতে পারিবে। যাহা হউক, উক্ত দিবসে বার্ষিক সভা যথারীতি অনুষ্ঠিত হইল। সভা প্রস্তাবিত নূতন ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়া নিজেদের প্রতিনিধি মনোনয়ন করিলেন। কাজেই ইহার পরদিন, ২০শে এপ্রিল ১৮৯০ হইতে নবগঠিত যুগ্ম অধ্যক্ষ-সভার পক্ষে কার্য্য আরম্ভ করিতে কোন বাধা রহিল না।

এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনার পূর্ব্বে ১৮৮৬-৮৯, এই কয় বৎসরে গ্রন্থাগারের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানিয়া রাখা আবশ্যক। গ্রন্থাগারের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ অতিশয় শোচনীয় হওয়ায় ইহার পুনর্গঠন যে একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি। তবে ইহার মধ্যেও পুস্তকের পাঠকসংখ্যা কিন্তু বিশেষ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই, আশানুরূপ না হইলেও নূতন পুস্তক ক্রয় ও সংগ্রহ দ্বারা গ্রন্থাগারকে পুষ্ট করা হইতেছিল। মেট্‌কাফ হল সংস্কার করিতে যাইয়াই ইহার গচ্ছিত তহবিল প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া যায়। আয়ের অনুপাতে ব্যয় হ্রাস করিতে হয়। ইহার জন্য গ্রন্থাগারের উন্নতির পথে বিশেষ অন্তরায় ঘটে। এখন ইহা শুনিলে কম আশ্চর্য্য বোধ হইবে না যে, ম্যাথু গ্রেগরী পাঁচ বৎসরেরও উপর (১৮৮৫-৯০) মাসিক মাত্র ষাট টাকা বেতনে 'জাতীয় গ্রন্থাগারে'র গ্রন্থাগারিকের পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। এই কয় বৎসরে গ্রন্থাগারের অবস্থা নিম্নের পরিসংখ্যান হইতে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে :

সন	পুস্তক : গ্রন্থাগারের বাহিরে পঠিত — মনন-সাহিত্য	উপন্যাস	সাময়িক পত্র	মোট	অংশী	চাঁদাদাতা	গচ্ছিত তহবিল
১৮৮৬	৪,১৫১	৮,৬২৬	১১,৫২৯	২৪,৪০৬	৮৭	১৫৮	৬,০০০৲
১৮৮৭	৪,১৩১	৯,১০৯	১২,২৮০	২৫,৫২০	৭৬	১৫৫	৬,০০০৲
১৮৮৮	৩,০৮৯	৮,৯৭৭	১২,৫৯৬	২৪,৩৬২	৭৫	১৫০	৬,০০০৲
১৮৮৯	২,৭০১	৭,০০২	১২,৭৭১	২২,৪৭৪	৭৫	১২৯	৫,০০০৲

গ্রন্থাগারের এই সঙ্কটপূর্ণ সময়ে যাঁহারা ইহাকে সুপরিচালিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণের নাম এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতে হয়। তিনি দীর্ঘকাল গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ-সভার সঙ্গে প্রথমে সহঃ সভাপতি (১৮৭৪-৭৬) এবং পরে সভাপতি রূপে (১৮৭৭-১৯শে এপ্রিল ১৮৯০) যুক্ত থাকিয়া আপদে বিপদে ইহাকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। পরে যখন গ্রন্থাগারটিকে বাহিরের সাহায্য ব্যতিরেকে মাত্র অংশী ও চাঁদাদাতাদের অর্থে চালানো কঠিন হইয়া পড়ে তখন তিনিই অগ্রণী হইয়া ইহার পুনর্গঠনে সরকারের সঙ্গে আলোচনায় তৎপর হন। গ্রন্থাগারটি কলিকাতা করপোরেশনের সাহায্যলাভে এত সত্বর যে সমর্থ হইয়াছিল তাহার মধ্যেও নরেন্দ্রকৃষ্ণের কর্ম্মকুশলতা লক্ষ্য করি। বিখ্যাত ঐতিহাসিক হেনরি বিভারিজ ১৮৮৮ সন হইতে গ্রন্থাগারের অন্যতম অধ্যক্ষ হন। গ্রন্থাগার পরিচালনায় তাঁহার কৃতিত্বও উপেক্ষণীয় নহে।

৪

কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ১৮৯০ সনের ২০শে এপ্রিল তারিখে কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে ছয় জন এবং গ্রন্থাগারের অংশী ও চাঁদাদাতা পক্ষে ছয় জন—এই মোট বার জন সদস্য লইয়া অধ্যক্ষ-সভা বা কাউন্সিল পুনর্গঠিত হয়। করপোরেশন-প্রেরিত সদস্যদের মধ্যে ছিলেন—ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, এইচ. এম্. রুস্তমজী, জয়গোবিন্দ লাহা ও মৌলবী সিরাজুল ইস্‌লাম খাঁ বাহাদুর। গ্রন্থাগার কর্ত্তৃক মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ, হেন্‌রি বিভারিজ, প্রাণনাথ পণ্ডিত প্রমুখ ছয় জন

প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন। নব-গঠিত কাউন্সিলের সভাপতি হইলেন, পূর্ব্বনির্দ্দেশ অনুযায়ী, কলিকাতা করপোরেশনের চেয়ারম্যান এইচ্. লী., সি. এস্, এবং সহ-সভাপতি হইলেন পূর্ব্বেকার অধ্যক্ষ-সভার সভাপতি মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ।

গ্রন্থাগারের বৎসর আরম্ভ হইল সরকারী নিয়মে ১লা এপ্রিল হইতে। নূতন অধ্যক্ষ-সভা নবোৎসাহে কার্য্যও সুরু করিয়া দিলেন। বাংলা গবর্ণমেন্ট তাক আলমারী ও আসবাব-পত্র ক্রয়পূর্ব্বক গ্রন্থাগারের সংস্কার-সাধনের জন্য কমিটির প্রস্তাবমত দশ হাজার টাকা না দিয়া ১৮৯০-৯১ সনের খাতে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়া উহা অধ্যক্ষ-সভার হস্তে অর্পণ করেন। তবে তাঁহারা ইহাও বলেন যে, গ্রন্থাগার-কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করুন। এই ভাবে যত অর্থ আদায় হইবে, তাঁহারাও সেই পরিমাণ অর্থ দিতে অঙ্গীকৃত রহিলেন। ১৮৯০ সনে সাধারণের নিকট অর্থ চাহিয়া দুই বার আবেদন জানানো

বিপিনচন্দ্র পাল

হইল। প্রথম বারের আবেদনে ২,৫৩৭৲ টাকা, এবং দ্বিতীয় বারের আবেদনে আরও ৯৫১৲ টাকা পাওয়া গেল। এইরূপে সাধারণের নিকট হইতে দানস্বরূপ মোট ৩,৪৮৮৲ টাকা আদায় হইল। গ্রন্থাগার-তহবিলে বেসরকারী দাতাদের মধ্যে বহু রাজা মহারাজা, ধনী মানী, জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি ছিলেন। দুই জন মাত্র সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ—পাঁচ শত টাকা দান করেন। তাঁহারা—বেতিয়ার মহারাজা এবং হেন্‌রি বিভারিজ। এতদ্ব্যতীত মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাণী স্বর্ণময়ী, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাব আবদুল লতিফ, দুর্গামোহন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র প্রভৃতির নামও এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গবর্ণমেন্টও উক্ত পরিমাণ অর্থ দান করিলেন। কলিকাতা করপোরেশন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিয়া গ্রন্থাগার পরিচালনায় বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিলেন। কাজেই আর্থিক দুশ্চিন্তা আর রহিল না।

এই বৎসরের অন্য দুইটি বিষয়ও এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থাগারিক ম্যাথু গ্রেগরিকে ছয় মাসের বেতন 'গ্রাচুইটি'-স্বরূপ দিয়া বিদায় দেওয়া হইল। নূতন ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারিকের মাসিক বেতন ধার্য্য হয় এক শত টাকা। পরবর্ত্তী কালের বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা, মনস্বী বিপিনচন্দ্র পাল গ্রেগরির স্থলে উক্ত বেতনে ১৮৯০, ১৮ই আগষ্ট লাইব্রেরিয়ান বা গ্রন্থাগারিক ও সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন। ২০শে আগষ্ট হইতে তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সহকারী হইলেন অক্লান্ত কর্ম্মী ও সাহিত্যসেবী গগনচন্দ্র হোম।*

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা—নূতন নিয়মে গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকা প্রণয়ন। পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসর যাবৎ অর্থকৃচ্ছ্রতার দরুন গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকা নূতন করিয়া প্রকাশিত হইতে পারে নাই। অথচ মুদ্রিত পুস্তক-তালিকাই হইল গ্রন্থাগার ও পাঠক-সাধারণের মধ্যে সত্যকার যোগসূত্র। নূতন গ্রন্থাগারিক লেখকানুক্রমিক তালিকার পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করিতে উদ্যোগী হইলেন। আবার বিষয়-বিভাগ অনুযায়ীও তালিকা প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইল যাহাতে লেখক ও বিষয় অনুসারে পুস্তকের সন্ধান অতি সহজেই মিলিতে পারে। এইরূপ তালিকাকে ইংরেজীতে বলা হয় "Dictionary of Catalogue"। গ্রন্থাগারের অন্যতম অধ্যক্ষ, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি হেন্‌রি বিভারিজের নির্দ্দেশেই এই নূতন প্রণালী অবলম্বিত হয়।

যে মূল নীতির ভিত্তিতে গ্রন্থাগার পুনর্গঠিত হইয়াছিল তাহার কার্য্যও অবিলম্বে আরম্ভ হইল। গ্রন্থাগারের দ্বার

---

* গগনচন্দ্র হোম "জীবন-স্মৃতি"তে (পৃ. ৩০) লিখিয়াছেন:

"মুহৃদ্বর বিপিনচন্দ্র যখন কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর —এখন ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরী—সম্পাদক, তখন আমি সিটি কলেজ ছাড়িয়া তাঁহার সহকারীর কার্য্য গ্রহণ করি। আমার এই কাজ লইবার প্রধান প্রলোভন ছিল অধ্যয়নের সুযোগ। যে কয় বৎসর পাবলিক লাইব্রেরীর কাজে ছিলাম, সে কয় বৎসর প্রাণ ভরিয়া নানা বিষয়ে পড়িয়া লইয়াছিলাম। আমার এ জ্ঞানচর্চ্চায় সঙ্গী ও উৎসাহদাতা ছিলেন বিপিনচন্দ্র। লাইব্রেরীতে কোন নূতন বই আসিলেই তিনি নিজে তাহা না পড়িয়া ও আমাকে না পড়াইয়া ছাড়িতেন না। আমি তাঁহার নিকট এ-জন্য চিরকৃতজ্ঞ।"

অংশী, চাঁদাদাতা, এবং সাধারণ পাঠক সকলের নিকটই উন্মুক্ত হইল। এখানে বসিয়া যে-কেহ যে-কোন পুস্তক যাহাতে অনায়াসে পড়িতে পায় তজ্জন্য "Public Reading Room" বা সাধারণ পাঠাগার ১৮৯০ সনের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন হইতে নির্বিঘ্নে ও নিরাপত্তিতে সকলেই পাঠাগার ব্যবহার করিতে সক্ষম হইলেন। এ বৎসর মনন-সাহিত্য নিম্নলিখিত বিষয়-বিভাগ অনুযায়ী গ্রন্থাগারের বাহিরে পঠিত হইয়াছিল। এরূপ বিষয়-বিভাগ এই প্রথম—ইতিহাস ৩৭৪ খানা, জীবনী ও স্মৃতিকথা ২৫২, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ২৬৮, দর্শন ৮১, বিজ্ঞান ১০৬, ধর্মতত্ত্ব ৮৯, চিকিৎসাশাস্ত্র ৩০, ললিতকলা ও কবিতা ১০৬, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ও চীন ২৬৯, আইন ১১২ এবং বিবিধ ৩৭৭। উপন্যাস ও সাময়িকপত্র পঠিত হয় যথাক্রমে ৭,৪০১ এবং ১৬,৩৪৬ খানা। ১৮৯০-৯১ সনে নূতন বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন গ্রন্থাগারের একমাত্র 'বান্ধব' হইলেন।

৫

নূতন ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের কার্য্য ভালরূপে চলিতে লাগিল। ১৮৯১-৯২ সনেও বান্ধব রূপে বড়লাট ল্যান্সডাউনেরই মাত্র নাম পাইতেছি। বিভারিজ অধ্যক্ষ-সভা হইতে এ বৎসর পদত্যাগ করেন। পুস্তক-তালিকা প্রস্তুতের কাজও দ্রুত চলিতে থাকে। গ্রন্থাগার পুনর্গঠনকালে নিয়মাদির রদবদল যে আবশ্যক হইবে তাহা কর্তৃপক্ষ পূর্ব্বেই আঁচ করিতে পারিয়াছিলেন। নবগঠিত অধ্যক্ষ-সভা নূতন অবস্থার অনুগ নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন করিয়া ১৮৯২ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী অংশী ও চাঁদাদাতাদের সাধারণ সভায় উপস্থাপিত করেন। সাধারণ সভা এ বিষয় ভাল করিয়া বিবেচনা করার জন্য একটি সাব-কমিটি নিয়োগ করিয়া দেন। এই কমিটির রিপোর্ট দৃষ্টে ১৪ই আগষ্ট (১৮৯২) তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভা তাহা হুবহু গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় বিষয়টি হইল—বাংলা-সরকার কর্তৃক এই জাতীয় গ্রন্থাগারটিকে বাংলা পুস্তক প্রদানের প্রস্তাব। ১৮৬৭ সনের ২৫শ আইন অনুযায়ী বাংলাদেশে মুদ্রিত যাবতীয় বাংলা পুস্তকের কয়েক খণ্ড বাংলা-সরকারের অধীন বেঙ্গল লাইব্রেরিতে জমা দেওয়া হইত। এ কারণ ওখানে প্রচুর বাংলা বই মজুত হয়। ১৮৯০ সনের ২৬শে জুন সরকার এক পত্রে "জাতীয় গ্রন্থাগারে"র কর্তৃপক্ষকে জানান যে, তাঁহারা এই সকল পুস্তক দান করিতে প্রস্তুত আছেন। গ্রন্থাগারের পক্ষে লাইব্রেরিয়ান বিপিনচন্দ্র পাল ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯১ তারিখে সরকারকে উক্ত দান গ্রহণে অধ্যক্ষ-সভার সম্মতির বিষয় করেন। কিন্তু সরকার উক্ত পুস্তক দানবিষয়ক প্রস্তাবের সঙ্গে এইরূপ একটি সর্ত জুড়িয়া দেন যে, 'বেঙ্গল লাইব্রেরি'র লাইব্রেরিয়ান ও ট্রান্সলেটর পণ্ডিত (পরে, মহামহোপাধ্যায়) হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে অধ্যক্ষ-সভার সভ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রস্তাবে অধ্যক্ষ-সভায় করপোরেশন, সুতরাং 'সরকারী' অংশের আপত্তি হয় নাই। কিন্তু অংশী ও চাঁদাদাতাদের পক্ষ হইতে স্বভাবতঃই প্রবল আপত্তি উঠিল। কারণ এরূপ হইলে সংখ্যাধিক্য হেতু 'সরকারী' অংশেরই গ্রন্থাগারের উপর নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। তবে তাঁহারা পাল্টা প্রস্তাব করিলেন যে, সরকারী সদস্য একজন বর্দ্ধিত হইলে তাঁহাদের প্রতিনিধি-সংখ্যাও অনুরূপ ভাবে বাড়াইয়া সাত জন করিতে হইবে। উভয় পক্ষে কিছুকাল পত্র মারফত আলাপ-আলোচনা চলিল। পরে সরকার তাঁহাদের মূল প্রস্তাবই প্রত্যাহার করিয়া লন। বেঙ্গল লাইব্রেরির বাংলা পুস্তক আর পাওয়া গেল না।

পরবর্ত্তী বৎসরে, ১৮৯২-৯৩ সনে গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ-সভায় করপোরেশন পক্ষে যে দুই জন সদস্য নিয়োজিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নবাব আবদুল লতিফ, নরেন্দ্রনাথ সেন ও রাধাচরণ পালের নাম পাওয়া যাইতেছে। ইঁহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে বেশ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অধ্যক্ষ-সভায় অংশী ও চাঁদাদাতাদের দুই জন বিশিষ্ট প্রতিনিধি—প্রাণনাথ পণ্ডিত ও জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় এ বৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রাণনাথ পণ্ডিতের মৃত্যুতে অধ্যক্ষ-সভা ২৮শে অক্টোবর ১৮৯২ তারিখের অধিবেশনে এই শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করেন :

"That the Council of the Calcutta Public Library desire to place on record the sense of the loss which the Library has sustained by the untimely death of Babu Prannath Pandit and their appreciation of the zeal and ability with which he promoted the interests of the institution."

এই বৎসরে বিপিনচন্দ্র পাল পদত্যাগ করিলে তাঁহার স্থলে রাধারমণ মিত্র গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। অধ্যক্ষ-সভার সভাপতিও ১৮৯৩ সনের মার্চ মাসে এক বৎসরের ছুটিতে স্বদেশ-যাত্রা করেন। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন সি. সি. ষ্টিভেন্স। এই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যেও গ্রন্থাগারের কার্য্য অব্যাহত গতিতে চলিতে লাগিল। সাধারণ পাঠাগারে পাঠক-সংখ্যাও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইল। ১৮৯১-৯২ ও ১৮৯২-৯৩ সনে উপন্যাস ও সাময়িক পত্র গ্রন্থাগারের বাহিরে পঠিত হয় এইরূপ :

	১৮৯১-৯২	১৮৯২-৯৩
উপন্যাস	৬,৫৩৬	৭,৫৬৯
সাময়িক পত্র	১৭,৬৯১	১৯,৬৯৯

মনন-সাহিত্য পাঠের বিভাগিত হিসাব এইরূপ পাওয়া যাইতেছে :

	১৮৯১-৯২	১৮৯২-৯৩
ইতিহাস	৫১৭	৪১৮
জীবনী ও স্মৃতিকথা	৪৮১	৩৪৬
ভ্রমণ-বৃত্তান্ত	৪৩২	২৮১

দর্শন	১৫৮	১৪০
বিজ্ঞান	১৯৮	৩৪৮
ধর্মতত্ত্ব	১৩৯	১১৯
চিকিৎসাশাস্ত্র	৭৯	৮৭
ললিতকলা ও কবিতা	৩১৫	২২২
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ও চীন	৪৭৩	৩৮৫
আইন	১০৫	৯৯
বিবিধ	৯৯২	৮৫৯

উপরে মনন-সাহিত্য পাঠের পরিসংখ্যান দৃষ্টে বুঝা যায়, বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্র বাদে অন্ত সব বিভাগেই পাঠক-সংখ্যা ১৮৯২-৯৩ সনে কথঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছে। মনন-সাহিত্যমূলক পুস্তকাদি পাঠে অমনুরাগ হইতে ইহা অবশ্য ধরিয়া লওয়া যায় না যে, গ্রন্থাগার পরিচালনায় ত্রুটিই ইহার জন্য দায়ী। তবে ইহা অন্যতম কারণ হইতে পারে সন্দেহ নাই।

৬

গ্রন্থাগার-সম্পৃক্ত পরবর্তী কয়েক বৎসরের রিপোর্ট বা বার্ষিক বিবরণী আমার হস্তগত হয় নাই। এ সব পাওয়া গেলে, বড়লাট লর্ড কার্জন ১৯০৩, ৩০শে এপ্রিল 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি'র (বর্ত্তমান 'নেশন্তাল লাইব্রেরি'র পূর্ব্বজ) উদ্বোধন-বক্তৃতায় ইহার যে শোচনীয় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন তাহার কারণ পরিষ্কার বুঝা যাইত। যাহা হউক, লর্ড কার্জন কলিকাতায় বড়লাট হইয়া আসিবার পরই সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি একে একে পরিদর্শন করেন, 'কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি'তেও তিনি গমন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থাগারটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তিনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন, নচেৎ সরকারী দপ্তরখানায় 'ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরী'র সঙ্গে ইহার মিলন-সাধনে তিনি এতখানি তৎপর হইতেন না।

এই 'ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরি' সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা আবশ্যক। ১৮৯১ সনে ভারত-গবর্ণমেণ্টের বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলি একত্র করিয়া ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী গঠিত হয় এবং ইহার ভার দেওয়া হয় সরকারী রেকর্ড-কিপারের উপর। বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে স্বরাষ্ট্র বিভাগের গ্রন্থাগারটি নানা মূল্যবান্ পুস্তকে সমৃদ্ধ ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কলেজ, কোর্ট উইলিয়ম কলেজ এবং লণ্ডনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া বোর্ডের গ্রন্থাগারসমূহের যাবতীয় পুস্তক এখানে রক্ষিত হয়। লর্ড কার্জনের মতে এরূপ মূল্যবান লাইব্রেরিও সুযোগের অভাবে প্রায় অব্যবহৃত ছিল। সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা বা বিভাগীয় কর্ত্তাদের সুপারিশে বেসরকারী লোকেরা এখানকার পুস্তক ব্যবহার করিতে পারিত। কিন্তু এরূপ দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করিয়া কি সরকারী, কি বেসরকারী কেহই বড় একটা ইহার সুবিধা ভোগ করিতে অগ্রসর হইতেন না। বড়লাট ইহাকে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি'র সঙ্গে মিলাইয়া ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজধানী কলিকাতা নগরীর উপযোগী একটি প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইলেন।

মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ "জাতীয় গ্রন্থাগারে"র প্রাণস্বরূপ ছিলেন। এবারেও দেখিতেছি, তিনি লর্ড কার্জন তথা সরকারী প্রস্তাবকে রূপ দিতে বিশেষ ভাবে আগ্রহান্বিত হন। ১৯০০ সনের ৯ই নবেম্বর গ্রন্থাগারের সহকারী সভাপতি রূপে তিনি কলিকাতা করপোরেশনের চেয়ারম্যান আর. টি. গ্রীয়ারকে কয়েকটি সর্ত্ত দিয়া একখানা পত্র লেখেন। ইহার মধ্যে প্রধান সর্ত্ত ছিল দুইটি—(১) গ্রন্থাগারের প্রত্যেক প্রোপ্রাইটর বা অংশীকে তাঁহার অংশের মূল্য বাবদে পাঁচ শত টাকা সরকারকে ক্রয়মূল্য-স্বরূপ দিতে হইবে, এবং (২) কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির পুস্তকাদি বাহিরে আনিবার অধিকার তাঁহাদের থাকিবে, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির যে-সব বই বাহিরে দিতে আপত্তি নাই তাহাও তাঁহারা পাইবেন। ইহা ছাড়া বাতিল পুস্তকাদি আসবাবপত্রসহ অংশীগণ পাইবেন যাহা তাঁহারা যোগ্য স্থানে দান করিতে পারেন।

এই কয়টি সর্ত্তের ভিত্তিতে গ্রীয়ার সাহেবের মধ্যস্থতায় এক দিকে গ্রন্থাগার-কর্ত্তৃপক্ষ ও অন্ত দিকে গবর্ণমেণ্টের মধ্যে প্রায় তিন মাস যাবৎ আলোচনা চলিয়াছিল। এতাদৃশ আলোচনার পর, সর্ত্তগুলি কিছু রদবদল করিয়া কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির সঙ্গে সরকারী ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরির মিলন-সাধনে উভয় পক্ষ সম্মত হইলেন। গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ-সভার পক্ষে তৎকালীন সম্পাদক এস. সি. দে ১৯০১, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখের সভায় গৃহীত মিলনসূচক প্রস্তাব যথাস্থানে প্রেরণ করিলেন। প্রস্তাবটি এই :

"The letter of Mr. Greer [R. T. Greer, C.S. from the Corporation of Calcutta], dated 14th January and the letter from Mr. Slack [F. A. Slack, general department, Bengal Secretariat], dated 12th January were placed before the Council who accept the terms contained therein and they recommend their acceptance by the Proprietors. A special meeting of the Proprietors is to be called under Rule XV, and all the correspondence passed between the Council and the Government after the last meeting of the Proprietors in September last will be laid before them."

অংশী ও চাঁদাদাতাদের সাধারণ সভার অধিবেশন কোন তারিখে হইয়াছিল জানিতে পারি নাই। তবে এই প্রস্তাব যে হুবহু গৃহীত হইয়াছিল তাহা পরবর্তী কার্য্যক্রম হইতে বুঝা যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রত্যেক অংশী নিজ নিজ অংশের মূল্য বাবদ পাঁচ শত টাকা সরকারের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরীর সঙ্গে মিলিত হইয়া ১৯০৩, ৩০শে এপ্রিল হইতে আনুষ্ঠানিক ভাবে শেষোক্ত নামেই পরিচিত হইল এবং কার্য্যও

আরম্ভ করিয়া দিল। তবে অংশীদের ইচ্ছানুযায়ী গ্রন্থাগার ভবনের নাম "Metcalfe Hall"ই রহিয়া গেল। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, কৃষিসমাজের অংশও সরকার ক্রয় করিয়া লন এবং সমগ্র বাড়ীটিই অতঃপর গ্রন্থাগারের জন্ম ব্যবহৃত হইতে থাকে। এই বাড়ীর স্বত্ব-স্বামিত্ব সরকার বিনা আপত্তিতেই অধিকার করিয়া লন। অথচ ইহার প্রকৃত মালিক ছিলেন কিন্তু কলিকাতার দেশী-বিদেশী চাঁদাদাতৃগণ। এইরূপে 'কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি' বা 'জাতীয় গ্রন্থাগার', ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরি নামক একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হইল।

অপরূপা

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

যার লাগি'
নিশিমেষে জাগি'
সমস্ত হৃদয়-মন দোলে অকারণ,
দেখি নাই কভু সেই মোহনীয়া মেয়েটি কেমন।
অন্তরের শূন্যে শুধু বিস্তীর্ণ বিরহ তার করি অনুভব,
তারি স্বপ্ন আসে নিয়ে বন্দনার ছন্দ-মহোৎসব।
মুগ্ধ প্রাণ অহৈতুক কাল্পনিকী নিয়া
ওঠে উচ্ছ্বসিয়া।

স্বপ্ন টুটে
কি আনন্দ ছুটে!
সাথ্য ঝিলিমিলি সম অপার বিস্ময়
ধমায় সর্ব্বস্ব ঘেরি': রূঢ়-স্থূল বাস্তবতাময়
সত্যের ধরণী যেন মুছে যায় অর্থহীন মৌন-দৃষ্টি হোতে।—
প্রত্যক্ষ ভুলিয়া যাই: জ্যোতির্ম্ময়ী মিথ্যার আলোতে
অপরূপ-রূপাতীতা কবি-মর্ম্মমিতা
আত্মায় সম্মিতা।

গাহি পুরাতন গান

শ্রীঅজিতকুমার সেন

পুরানো মানুষ,—গাহি পুরাতন গান;
সাধা সুরে ছাড়া বাজে না এ ভাঙা বাঁশী;
নূতনের কিছু নাহি মনে অভিমান,
বুকে বহি শুধু পুরানো কান্না-হাসি।

তোমরা চলেছ নব যাত্রার পথে,
নবীন সম্ভাবনার তোমরা হোতা;
—ক্লান্তি এসেছে আমার দীর্ণ রথে,
দৃপ্ত গতির ছন্দ আমার কোথা?

আমি গেঁথেছিনু আমার গানের মালা—
শুধু ক'টি কথা, শুধু গুটিকয় সুরে;
তাই দিয়ে রচা পসরার বহি ডালা—
হাটে বাটে মোর কাটিল দিবস ঘুরে।

তার বেশী কিছু করি নি কোনও আশা,
কুড়ায়ে যা কিছু পেয়েছি তাহারি মায়া—
প্রাণে দিল তান, কণ্ঠেতে দিল ভাষা,
জীবনে জাগালো বিচিত্র আলোছায়া।

দিন হ'ল সারা, সন্ধ্যা ঘনায়ে আসে,
অনদিগন্তের স্বপ্ন টুটেছে আজি;
—উন্মনা আছি দাঁড়ায়ে পথের পাশে
মেলি মোর বাসি গানের জীর্ণ সাজি।

জানি না দিয়েছে কেবা কি যে দাম তারে,
কাহার চক্ষে লাগিল তাহারে ভালো;
মোর শুধু শেষ ঘুরে ফেরা দ্বারে দ্বারে,
—আমার ভুবনে আসে যে নিবিয়া আলো।
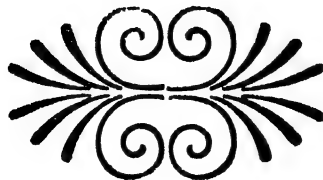
আলোচনা

"রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন"

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধে (প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫৭, পৃ. ৫৪০-৪১) লেখক শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ বাঙ্গলার একজন সংস্কৃত গ্রন্থকারের পরিচয় স্বয়ং পুথি হইতে উদ্ধার করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ জাতীয় উদ্যম বর্ত্তমানে অত্যন্ত বিরল এবং সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। আমরা সাদরে তাঁহার প্রবন্ধটিকে কতিপয় ভ্রম-প্রমাদ হইতে মুক্ত করিয়া পরিবর্দ্ধিত করিতে চেষ্টা করিব। সুপ্রসিদ্ধ কোলব্রুক সাহেব (১৭৬৫—১৮৩৭ খ্রী.) ভারতে অবস্থানকালে নিজে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এদেশ হইতে বহুতর মূল্যবান্ পুথি সংগ্রহ করেন এবং ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সেগুলি সঙ্গে লইয়া যান। পুথিগুলি এখন লণ্ডনের ইণ্ডিয়া আপিস গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে—তন্মধ্যে "কারিকাবলি"-ব্যাকরণ ও তাহার টীকার সম্পূর্ণ প্রতিলিপি আছে। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এগেলিং সাহেব লণ্ডনস্থ উক্ত গ্রন্থাগারের সংস্কৃত পুথির বিবরণীর ২য় ভাগে গ্রন্থের যে পরিচয় মুদ্রিত করিয়াছেন (পৃ. ২৫১-২) তাহা অধিকতর প্রামাণিক ও তথ্যপূর্ণ। মূল গ্রন্থের পুষ্পিকায় গ্রন্থকারের উপাধি লিখিত আছে "ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তী"—ইতি শ্রীরামনারায়ণভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তিকৃতায়াং কারিকাবলৌ কৃৎসু ক্তাপাদস্তপাদঃ। টীকার প্রারম্ভেও আছে—নির্ব্বিঘ্নেন গ্রন্থসমাপ্তিকামো "ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তী" শ্রীরামনারায়ণঃ…। সুতরাং গ্রন্থকারের "তর্কপঞ্চানন" উপাধি মোটেই ছিল কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ব্যতীত তাহা স্বীকার করা যায় না। সেকালে নৈয়ায়িকদের মধ্যে "ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তী" উপাধিটি বেশ প্রচলিত ছিল (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৫৩, পৃ. ১২ দ্রষ্টব্য) এবং একজন পণ্ডিতের দুইটি উপাধি তৎকালে প্রায় থাকিত না।

এই গ্রন্থকার যে মজিলপুর-নিবাসী ছিলেন তাহা প্রথম আমরা জানিতে পারি মজিলপুরের বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ কালিদাস দত্তের "জয়নগর-মজিলপুর" শীর্ষক সুলিখিত তথ্য-বহুল প্রবন্ধে (ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৫, পৃ. ৮৭৫)। মজিলপুরের ৩৫ জন পণ্ডিতের নাম ঐ প্রবন্ধে কীর্ত্তিত হইয়াছে—খ্রী. ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত "কালিকাবলী (?)-ব্যাকরণে"র রচয়িতার উপাধিটি কিন্তু "তর্কপঞ্চানন" বলিয়াই লিখিত হইয়াছে। তৎপর, "বঙ্গে দাক্ষিণাত্য-বৈদিক" গ্রন্থে (১৩৩৭ সন) মজিলপুরের বংশগুলির ধারাবাহিক বিবরণ-মধ্যে গ্রন্থকারের নাম, দুইটি উপাধি (তর্কপঞ্চানন ও ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তী) ও বিস্তৃত বংশলতা পাওয়া যায় (পৃ. ৪৪-৫)। এই গ্রন্থে মজিলপুরের বিভিন্নবংশীয় বহু পণ্ডিতের নাম আছে; তন্মধ্যে মাত্র পাঁচ জনের নাম উল্লেখ করিয়া কাব্যতীর্থ মহাশয় কি প্রমাণবলে তাঁহাদিগকে রামনারায়ণের সমসাময়িক ধরিলেন, তাহা বুঝিলাম না। রামনারায়ণের পিতা জমিদার কেশব রায়চৌধুরীর সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং "প্রায় শত বৎসর" জীবিত ছিলেন—এই "অবিসংবাদিত" উক্তিদ্বয়েরও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা আবশ্যক।

লণ্ডনস্থ কারিকাবলি টীকার প্রতিলিপির শেষে "সাগর-যোগমহাকাব্যঃ" পদ লিখিত আছে। রামনারায়ণ-রচিত, অজ্ঞাতপূর্ব্ব এই গ্রন্থের কিঞ্চিৎ পরিচয় কাব্যতীর্থ মহাশয় জীর্ণ পুথি হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। ইহার এবং পদাঙ্কের আরও বিশদ বিবরণ মুদ্রিত হওয়া উচিত।

কাব্যতীর্থ মহাশয়ের একটি মারাত্মক ভ্রম সংশোধন করা আবশ্যক। ডাঃ বিদ্যাভূষণের একটি উক্তিকে তিনি "তৎকালীন নবদ্বীপের টোলের ছাত্রবিবরণী" মনে করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মজিলপুরের এই রামনারায়ণই "তৎকালীন বঙ্গদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকরূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।" কোদালিয়া-নিবাসী তারাকুমার কবিরত্নের পিতামহ অপর একজন রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননের সম্বন্ধেও অনুরূপ উক্তি বিশ্বকোষের দোহাই দিয়া লিখিত হইয়াছিল (বঙ্গে দাক্ষিণাত্য-বৈদিক, পৃ. ৮৬)। উভয়ই অতি বিস্ময়কর প্রমাদবচন। শেষোক্ত তর্কপঞ্চানন রাজা রাধাকান্ত দেবের সময়ের লোক (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৩য় অংশ, পৃ. ২০৭)। নবকৃষ্ণের সভাজয়ী বুনো রামনাথকে তাঁহারই ছাত্র কল্পনা করা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য সংক্ষেপে লিখিতেছি। নবদ্বীপে আবহমান একজন "প্রধান" নৈয়ায়িক নির্ব্বাচিত হইতেন, যাঁহার চতুষ্পাঠীতে ভারতের নানা স্থান হইতে বহু ছাত্র চূড়ান্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইত। কে কোন্ সময়ে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন তাহা ধারাবাহিক জানা যায় না এবং তদ্বিষয়ে বিশেষ গবেষণাও এ যাবৎ হয় নাই। নবদ্বীপনিবাসী কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী (১২৫৩—১৩২১ সন) সর্ব্বপ্রথম "নবদ্বীপ-মহিমা" গ্রন্থে (১২৯৮ সনে মুদ্রিত, পৃ. ১০১-৬) "ন্যায়ের প্রাধান্ত-পদ" শীর্ষক পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে গবেষণা করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহাই বিশ্বকোষে ও ডাঃ বিদ্যাভূষণের গ্রন্থে যথাদৃষ্টং গৃহীত হইয়াছে। কান্তিচন্দ্রের লেখাই এ বিষয়ে বিশ্বকোষাদির একমাত্র প্রমাণ, অথচ তাহা

স্বীকৃত হয় নাই। কান্তিচন্দ্র লিখিয়াছেন, সুবিখ্যাত শঙ্কর তর্কবাগীশের পূর্ব্বে হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত ("সিদ্ধান্তরত্ন" নহে) এবং তৎপূর্ব্বে "খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আমরা রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননকে এই প্রধান পদে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই। * * * কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ ও বুনো রামনাথ এই রামনারায়ণের ছাত্র ছিলেন। এক্ষণে রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননের বংশ নাই।" (পৃ. ১০২)। নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের দানভাজন নানাশাস্ত্রীয় গ্রন্থকার কৃষ্ণকান্ত শব্দশক্তিপ্রকাশিকার টীকারম্ভে বস্তুতঃই গুরুবন্দনা করিয়াছেন :

ন্যায়সংসারপাথোধি ম্রেয়োপাসকতারকং।
রামনারায়ণং বন্দে তর্কপঞ্চাননং গুরুম্॥
(পঞ্চম শ্লোক)

কৃষ্ণকান্তের অধস্তন বংশধারা অদ্যাপি নবদ্বীপে বিদ্যমান। মজিলপুরের (অথবা কোদালিয়ার) রামনারায়ণ নবদ্বীপেই অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ বা দাবি অত্যাপি হয় নাই। নবদ্বীপনিবাসী বুনো রামনাথ ও কৃষ্ণকান্ত নবদ্বীপ ছাড়িয়া মজিলপুরে আসিয়া নব্যন্যায় পড়িয়া গিয়াছিলেন, ইহা তৎকালে কল্পনার অতীত ছিল। নবদ্বীপের রামনারায়ণের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে আমাদের আবিষ্কৃত তথ্য অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছে—তিনি দীধিতির সুপ্রাচীন টীকাকার অধুনা ভাষা-পরিচ্ছেদ-মুক্তাবলীরও প্রকৃত রচয়িতা বলিয়া প্রমাণিত, নবদ্বীপনিবাসী মহানৈয়ায়িক "কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমে"র অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ ছিলেন (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৫০, পৃ. ১০০-১)। লক্ষ্য করা আবশ্যক, কাব্যতীর্থ মহাশয় ডা: বিদ্যাভূষণের গ্রন্থ হইতে যে সন্দর্ভ পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা প্রমাদবর্জ্জিত নহে—বুনো রামনাথ ও কৃষ্ণকান্ত নবদ্বীপের প্রবীণ অধ্যাপক ছিলেন বটে, কিন্তু পারিভাষিক "প্রাধান্য"-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না।

—

"দক্ষিণরায় বনাম বর্‌খান গাজী"

শ্রীনীলিমা মণ্ডল

গত মাঘ সংখ্যায় 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত "নেতাজীর পিতৃভূমি কোদালিয়া" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীনীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন, "এই প্রসঙ্গে এক মহাপুরুষের কথা আমার মনে পড়িতেছে, তিনি এই অঞ্চলের পর্ত্তুগীজ দস্যুদের বিতাড়িত করিয়া ইহাকে মনুষ্যবাসের উপযোগী করেন। তাঁহার নাম কালু রায় বা দক্ষিণরায়। তিনি আজও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় প্রতি বৎসর ১লা মাঘ 'দক্ষিণদার' রূপে পূজিত হইতেছেন।"

তিনি আরও লিখিয়াছেন, "বর্‌খান গাজী যে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বর্‌খান বা বড়গাজী হুসেন শাহের সাহায্যে হিজলী হইতে চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ অঞ্চল পর্য্যন্ত মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করেন। সোনারপুর অঞ্চল হইতে বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি মুকুট রায়ের সেনাপতি দক্ষিণরায়কে পরাজিত করেন।"

নীরেন্দ্রবাবু সম্ভবত: সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' হইতে এই উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, সতীশবাবু বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ঐ তথ্যের বিচার করিতে পারেন নাই; লৌকিক কাহিনীই হুবহু গ্রহণ করিয়াছেন। আধুনিক পণ্ডিতগণ ইহাকে ইতিহাস বলিয়া স্বীকার করেন না। মাধব আচার্য কৃষ্ণরাম দাস প্রভৃতি হিন্দুকবিরা 'রায়মঙ্গল' কাব্যে দক্ষিণরায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আবদুল গফুর প্রভৃতি মুসলমান কবিরা গাজীর কাহিনীতে বর্‌খানকে উঁচু করিয়া ধরিয়াছেন। কুম্ভীরদেবতা কালুকে লইয়া উভয় পক্ষই টানাটানি করিয়াছেন—কোথাও-বা তিনি কালু রায়, কোথাও বা কালুপীর। কেহ কেহ আবার কালু রায় ও দক্ষিণরায়কে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াছেন। নীরেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ হইতে সেই মতই সমর্থিত হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে দরাপ খাঁ গাজীর শিলালেখে উৎকীর্ণ বুর্‌হান কাজী ও দরাপ খাঁর 'কুর্‌সীনামা'য় প্রাপ্ত বর্‌খান গাজী একই ব্যক্তি হইতে পারেন, কিন্তু ইহার সহিত হুসেন শাহ সম্পৃক্ত বর্‌খান গাজীর কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না।

তবে এই দক্ষিণরায় বা বর্‌খান গাজী কে? ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙালীর ইতিহাসে' লিখিয়াছেন, "মধ্যযুগে মনসা এবং দক্ষিণরায় বা ব্যাঘ্রপূজার বিস্তৃত প্রচলন এই দুইটি প্রাণী হইতেই।"

ডক্টর সুকুমার সেন লিখিয়াছেন, "দক্ষিণরায় ও বর্‌খান গাজীর ব্যাপার হইতে মনে হয় যে, কাহিনীর এই অংশটুকুতে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার আভাস রহিয়া গিয়াছে, চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ অঞ্চলে সুন্দরবনে আবাদপত্তন করিবার সময় কখনো কি কোন হিন্দু ও মুসলমান দলপতির মধ্যে বিবাদ হইয়াছিল?" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ)।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, "বাঙালী জাতি ও বাঙলা ভাষা সৃজনের কালে অর্থাৎ বিশিষ্টতা গ্রহণের কালে যে সমস্ত শুদ্ধ অনার্য এবং মিশ্র আর্য-অনার্য মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিবিষয়ক ভাব ও অনুষ্ঠান বিদ্যমান ছিল, ধর্মপূজার আদি-রূপ তন্মধ্যে যেমন অন্যতম, তেমনি সহজিয়া, তান্ত্রিকতা, নাথধর্ম এবং সর্পের দেবতা বিষহরী বা মনসার পূজা, ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণরায়ের পূজা প্রভৃতিও ছিল।...নাথধর্ম, মনসা ও দক্ষিণ-

রায়ের পূজাও মধ্যযুগের বাংলার হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। আবার ওদিকে মুসলমান ধর্মের প্রতিষ্ঠার পরে দক্ষিণরায়ের পূজা ইসলামী রঙে রঞ্জিত হইয়া গাজী মিয়াঁর নামে বাঙালী মুসলমান জনপদবর্গের মধ্যে বিদ্যমান আছে।" (প্রবাসী-বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কানপুর অধিবেশনে 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি' শাখার সভাপতির ভাষণ।)

বাহুল্যভয়ে অধিক উদ্ধৃত করিলাম না।

দক্ষিণরায় ব্যাঘ্র হইতেও পারে, না-ও হইতে পারে। উত্তর ভারতে বিভিন্ন স্থানে ব্যাঘ্রপূজা প্রচলিত আছে— যদিও বাংলা দেশে দক্ষিণরায় নরমূর্তিতে বা শুধু নরমুণ্ড রূপে পূজিত। বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের অধিকারী বলিয়া ইঁহার নাম দক্ষিণরায় কিনা তাহাও বিবেচ্য। রায়মঙ্গল উপাখ্যানে কিছু ঐতিহাসিক ছাপ থাকিতে পারে, কিন্তু উহাই ইতিহাস নহে। হিন্দুধর্মে অনার্য ধর্মের অনুপ্রবেশ খুবই স্বাভাবিক।

এই প্রসঙ্গে দক্ষিণরায়ের মুণ্ডপূজা বিশেষ লক্ষণীয়। মোঙ্গল জাতির মধ্যে মুণ্ডপূজা খুবই প্রচলিত। এখনও ত্রিপুরায় ধাতুনির্মিত চৌদ্দটি মুণ্ড মোঙ্গল জাতির লোকেরা তাহাদের ধর্মমতে পূজা করে, পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণেরাও ইহাদের উপর হিন্দু দেবদেবীর আরোপ করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা মতে পূজা করিতেছে।

দক্ষিণরায় ও বরখান গাজীর উপর কোন বিশেষজ্ঞ আলোকপাত করিবেন কি?

শান্তির সন্ধানে—শ্রীমৃণালকান্তি বসু। থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোং লিঃ। মূল্য এক টাকা চার আনা।

রোগ-শোক, দুঃখ-দৈন্য, ভয়-ভীতি, ভুল-ভ্রান্তি মানুষের জীবনকে নিয়ত নিরলস গতিতে অশান্তির পাথারে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। দুর্ঘটনা দুর্বিপাক হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই। নৈরাশ্যের বিষবাষ্পে জীবন আমাদের জর্জ্জরিত। সুতরাং এ জীবনে শান্তির আশা মানুষ কেমন করিয়া করিতে পারে?

অথচ এক বিন্দু শান্তির জন্যই মানুষ লালায়িত। সুখের চেয়ে শান্তিকেই সে শ্রেয়তর এবং প্রেয়তর মনে করে। একটা চলিত কথাও আছে, 'সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।' এই স্বস্তি শান্তিরই নামান্তর। সুখের জন্য অনেক কাঠ-খড়, অনেক অধিকরণ-উপকরণের প্রয়োজন; গাড়ী-বাড়ী, বিত্ত-বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক-জমিদারি,—এই সকল হইতেছে সুখের বাহন। সুতরাং, এ কথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, সুখ দুর্লভ পদার্থ। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকখানি প্রমাণ করিয়াছে যে, শান্তি সুখের চেয়ে শুধু শ্রেয়তর বস্তুই নয়, পরন্তু সুলভতর বস্তু। সুখ মানুষের করায়ত্ত জিনিষ নহে, শান্তি কিন্তু করায়ত্ত বস্তু। অনেক ক্ষয়-ক্ষতি, অনেক ব্যয়-অপচয়, অনেক বিমষ্টির দাবি মিটাইয়া অর্জিত ধনের সঞ্চিত অংশটুকু লইয়া ব্যাঙ্কের লেজার বইয়ে স্বামাধিকার করা সত্যই কঠিন কার্য্য; অপর পক্ষে লেখক দেখাইয়াছেন, মানুষের চিৎ-শক্তি এবং অভ্যাস-ক্রিয়ার দ্বারা অভাব-দৈন্য রোগ-শোক প্রভৃতিকে অতিক্রম করিয়া শান্তির উপকূলে অবতীর্ণ হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ কার্য্য। শান্তি অধিগত করিবার জন্য মানুষকে বহিঃশক্তির মুখাপেক্ষী না হইলেও চলে; তার উপায়-কৌশল নিজ অন্তরের মধ্যেই বর্ত্তমান। দুঃখদৈন্য ব্যর্থতানৈরাশ্য আকীর্ণ জীবন-পথে এই সন্ধানটুকুর মূল্য অপরিমেয়। সাধারণ নীতি-তত্ত্বের পরিবর্ত্তে লেখক অনেক ক্ষেত্রে নিজ জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহার শান্তি-সূত্রগুলি সঙ্কলিত করিয়াছেন বলিয়া সেগুলি সমধিক হৃদয়গ্রাহ্য হইয়াছে।

বইখানি দুঃখনৈরাশ্যতামস হৃদয়ে আশার আলোক উদ্দীপ্ত করিবে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১। প্রভাত-চিন্তা ২। নিশীথ-চিন্তা—কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা; যথাক্রমে ১৫০ ও ১৪৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০ হিসাবে।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশে বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে যে বিস্ময়জনিত উদ্দীপনার সঞ্চার হয়, তাহার সুফল অচিরকালমধ্যে ফলিতে আরম্ভ করে; 'বঙ্গদর্শনে'র আদর্শে শহরে ও মফস্বলে সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং বহু সুধী মনীষী বঙ্গবাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ঢাকা হইতে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে প্রকাশিত 'বান্ধব' পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া প্রধানতঃ পূর্ব্ববঙ্গ-সাহিত্যিক-সমাজ তৎপর হইয়া উঠেন। এই সময় হইতেই মনস্বী কালীপ্রসন্ন ঘোষের কীর্ত্তি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কালীপ্রসন্নের সাহিত্য-সাধনার স্থায়ী কীর্ত্তি তিনটি গম্ভীর অথচ সুললিত নিবন্ধ-সংগ্রহরূপে সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করে। এই তিনখানি গ্রন্থ—'প্রভাত-চিন্তা' (ইং ১৮৭৭), নিভৃত-চিন্তা (১৮৮৩) এবং 'নিশীথ-চিন্তা' (১৮৯৬) সমসাময়িক এবং পরবর্ত্তীকালেও বাংলার রসিক-সমাজকে মুগ্ধ করিয়াছিল, বাংলার ছাত্র-সমাজ উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক পাইয়া ধন্য হইয়াছিল এবং সাহিত্যিক-সমাজ বাংলা গদ্য রচনার এক নূতন আদর্শ পাইয়া অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। পুস্তকগুলি দীর্ঘকাল অপ্রাপ্য ছিল। বিশেষ আনন্দের বিষয়, গ্রন্থকারের সুযোগ্য পুত্র শ্রীসারদাপ্রসন্ন ঘোষ এইগুলির পুনঃপ্রকাশ আরম্ভ করিয়াছেন। 'প্রভাত-চিন্তা' ও 'নিশীথ-চিন্তা' আমরা পাইয়াছি এবং আশা করিতেছি 'নিভৃত-চিন্তা', 'প্রমোদলহরী', 'ভ্রান্তিবিনোদ', 'ছায়াদর্শন' প্রভৃতি গ্রন্থও তাঁহার চেষ্টায় পুনঃপ্রকাশিত দেখিব। পুস্তকের অক্ষর বড় ও ছাপা সুন্দর। এইগুলি আবার পূর্ব্ব জনপ্রিয়তা লাভ করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কৃতী সন্তানেরা যদি এই ভাবে পূর্ব্বপুরুষের সাহিত্যকীর্ত্তি সঞ্জীবিত রাখিবার প্রয়াস করেন, তাহা হইলে বাংলা-সাহিত্যের অনেক দুর্ভাবনা ঘুচিয়া যাইবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত ও যুগসঙ্কট—শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত এম-এ, ৭৯ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২৭৬, মূল্য ৪।০ টাকা।

মোট দশটি অধ্যায়ে লেখক ভারতের তথা বর্ত্তমান জগতের দুঃখ-দুর্দ্দশার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া প্রতিকারের পন্থা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ভারতে সমস্যার পর সমস্যা ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিকে বিব্রত করিতেছে, সমাধানের পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, অথবা সমাধানের যে পথ ধরা হইতেছে তাহাতে সমস্যার জটিলতা আরও বাড়িয়া চলিয়াছে—ফলে ব্যাধি অপেক্ষা ঔষধের প্রতিক্রিয়া আরও মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল সমস্যাই যেন আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। কেহ কেহ হয়ত ভাবিতেছেন মানব-সভ্যতা আজ চরম উন্নতি শিখরে উন্নীত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকার ভারতের চরম দুর্দ্দিন দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছেন এবং ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তির প্রকৃত পথনির্দ্দেশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। অধ্যায়গুলির নামকরণ হইতেই লেখকের আলোচ্য বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যথা—অভিযোগ, যুগপরিচয়, অর্থসঙ্কট, চিকিৎসাসঙ্কট, চতুরাশ্রম, বুদ্ধিবিভ্রাট, শিক্ষাসঙ্কট, সমন্বয় এবং ধর্ষিতা ধরিত্রী।

বর্ত্তমানকালের দুঃখের কারণ 'কল' বা যন্ত্রের উপর মানুষের একান্ত নির্ভরশীলতা। শহর কলের সৃষ্টি। বর্ত্তমান সভ্যতাও কলের। লেখকের ভাষায় "বর্ত্তমান যুগ কলই" যুগ। শান্তি ছিল ভারতের গ্রামে, আবার গ্রাম্য জীবনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে শান্তি-সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিবে। বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতা সৃষ্টির নামে ধ্বংস করিতেছে।

বড় বড় যন্ত্রের মোহ ছাড়িয়া আবার কুটীর-শিল্পে ফিরিয়া যাইতে হইবে, হস্তশিল্পে, যন্ত্রের কৃষি ছাড়িয়া আবার জন্তুর সাহায্যে চাষবাসে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। ভূমিকে নিঃস্ব করিয়া সার যোগাইলে চলিবে না। ব্যক্তিকে ধ্বংস করিয়া যন্ত্রের উৎপাদনবৃদ্ধি মনুষ্যত্বের অপমান ও সমাজ-জীবনের মৃত্যুতুল্য।

পুস্তক পাঠ করিতে করিতে কখনও কখনও মনে হইবে যেন লেখক নিছক অতীতে ফিরিয়া যাইতে চাহেন এবং বর্তমান জগতের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে সজাগ নহেন। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায়, তাহা নহে। পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা—যাহাকে লেখক 'যুগসঙ্কট' আখ্যা দিয়াছেন, তাহা হইতে মুক্তি পাইবার পথ সহজ ত নহেই, সম্ভব কিনা গভীর চিন্তার বিষয়। যন্ত্রকে যদি আংশিকভাবেও স্বীকার করিতে হয়—যথা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে, তবে তাহার দৌড় কোথায় গিয়া থামিবে? পাশ্চাত্ত্য দেশে যন্ত্র ক্রমে ক্রমে মানুষের হাতের কাজ গ্রাস করিতেছে—ফলে মানুষকে যন্ত্রের দাস হইতে হইয়াছে। ইহার প্রতিকার লেখকের নির্দ্ধারিত পথে হইবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। মানুষের ভিতর অহিংসা ও নানা সৎপ্রবৃত্তি জাগাইতে পারিলে জগতের বহু সমস্যার সমাধান ও মানুষের অনেক দুঃখ লাঘব হয় একথা স্বীকার করিলেও, বর্তমান জগতে উহা কিরূপে সম্ভব তাহাও ভাবিবার বিষয়। ইংরেজ অধিকৃত ভারত জগতের সহিত যতটা যুক্ত ছিল আজ তাহা অপেক্ষা ব্যাপকভাবে সে সমগ্র পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত, ইহা চোখ খুলিলেই দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় শক্তিশালী পাশ্চাত্ত্যের চিন্তাধারা ও কর্ম্মধারা আমাদের জীবনে, চিন্তায় ও কর্ম্মে আরও ব্যাপকভাবে সক্রিয় হইবে সেই সম্ভাবনাই বেশী দেখা যাইতেছে। লেখকের মতে ইহাই 'যুগসঙ্কট'। কিন্তু এই সঙ্কট এড়াইবার পথ কি? আজ ভারতের পল্লী-সভ্যতার পুনরুদ্ধার কি ভাবে সম্ভব? আজ কুটির-শিল্প কিরূপে আবার পুনরায় বাঁচিয়া উঠিবে? মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া বহু মনীষী পাশ্চাত্ত্যের নূতন চিন্তা ও কর্ম্মধারাকে নূতন ভারতের পুরাতন খাতে চলাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সাধনার সফলতা খুব বেশী হইয়াছে বলা যায় কি? সুতরাং যুগের 'সঙ্কট' ভারতের সঙ্কট রহিয়া গিয়াছে, স্বাধীনতা-লাভের পর হইতে যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। আমাদের পুরাতন নীতিবোধ, ধর্ম্ম, সমাজব্যবস্থা, আর্থিক কাঠামো এক কথায় ভারতীয় সভ্যতা আজ নূতন যুগের পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সহিত কঠোর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। ইহাকে একেবারে বর্জ্জনের কথাই আসে না। কতটা গ্রহণ করিব, কতটা গ্রহণ করিয়া আমাদের প্রাচীন সভ্যতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিব ইহাই সমস্যা। এই পুস্তক পাঠকের চিন্তার খোরাক যোগাইবে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

জতুগৃহ—শ্রীহীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীসমীরকুমার বসু, ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

এই উপন্যাসের এক জায়গায় লেখক বলিয়াছেন, 'এই বিপুল পৃথিবীটা যেন এক বিরাট জতুগৃহ। এই জতুগৃহের প্রতিষ্ঠাভূমি মানুষের দেহ-আধারেই। তার দেহের বেদীমূলে কামনা বাসনার শতশিখায় যে অনল প্রতি পলে প্রজ্বলিত হচ্ছে তার বিরাম নাই। কোথাও এ শিখা সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে, কোথাও নির্ধূম জ্যোতির্ম্ময়তায় স্থির ভাতি দিয়ে বিভাসিত হচ্ছে।' কাহিনীর মধ্যে এই সত্যটি পাওয়া যায়।

সাধারণ একটি মধ্যবিত্ত সংসার ও অল্প কয়েকটি চরিত্র লইয়া গল্পের আরম্ভ এবং শেষ হইয়াছে। মিনতি শৈশবে একজনকে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু দৈবের প্রতিকূলতাবশে তাহার সঙ্গে মিলন হয় নাই। সেই পবিত্র প্রেমের দীপ জ্বালাইয়া সে স্বামী-গৃহে আসিল। স্বামীর সাহচর্য্যে সেই প্রেম প্রসারিত হইতে পারিত, কিন্তু অমরেশ আপন লালসাময় কামনার দ্বারা দেহ উপভোগের বস্তু বুঝিয়া সেই প্রেমকে কামের ভূমিতে নামাইয়া আনিবার চেষ্টা করিল। বধূর আদর্শে লাগিল প্রচণ্ড আঘাত। এই সংসারের আর একটি প্রান্তে বিদ্যা, জ্ঞান ও সংযমের সঞ্চয় লইয়া শ্বশুর মধুসূদন পাতিয়াছিলেন সাধনার আসন। বধূর আঘাতজর্জ্জর অন্তর এমনই একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয়ের অনুসন্ধান করিতেছিল—সে শ্রদ্ধানত অন্তরে আসিয়া দাঁড়াইল সেই আসনের সম্মুখে। শ্বশুরের সঙ্গে বধূর ঘটিল অন্তরের সংযোগ। অতঃপর এই তিনটি প্রাণীর মধ্যে 'চাওয়া ও পাওয়া'র রূপটি দুঃখ-বেদনা-আনন্দের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট হইতে লাগিল।

বলা বাহুল্য, গল্পটির রস অন্তর্মুখী। বাহিরের ঘটনায় আশানুরূপ গতি না থাকায় নিছক গল্প-সন্ধানী পাঠক হয়তো ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন, কিন্তু দুই বিপরীতধর্ম্মী আদর্শের সংঘাত চিরন্তনী বৃত্তির আভাস লইয়া কাহিনীকে সাধারণ স্তর হইতে উর্দ্ধতর স্তরে লইয়া গিয়াছে। সেই স্তরের অনুভূতি না থাকিলে এই ধরণের কাহিনী অনুধাবন করা দুঃসাধ্য।

বধূ মিনতি, স্বামী অমরেশ, শ্বশুর মধুসূদন—এই তিনটি চরিত্রই মানসিক বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া সুচিত্রিত হইয়াছে। ইহাদের প্রেম, নিষ্ঠা, জ্ঞান ও চিত্তজয়ের মাধ্যমে সুন্দরতম আনন্দলোকে পৌঁছিবার মর্ম্মকথাটিও সুব্যক্ত হইয়াছে।

ছোটদের গল্প—শ্রীমা। অনুবাদক—শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত। অরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরী। মূল্য ১৷৹ টাকা।

পণ্ডিচেরী আশ্রমের শ্রীমা লিখিত গল্পের অনুবাদ। গল্পগুলি লিখিবার উদ্দেশ্য, বইগুলি পড়িয়া ছোটরা যেন নিজেরাই নিজেদের আবিষ্কার করিতে পারে। আত্মসংযম, সাহস, প্রফুল্লতা, আত্মনির্ভরতা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়, সাবধানতা, আন্তরিকতা, শৃঙ্খলা প্রভৃতি যে সব গুণ চরিত্র-গঠনের সহায়ক তাহারই এক-একটি বিষয় লইয়া অনেকগুলি গল্প লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গল্পগুলি বিভিন্ন দেশের সাহিত্য, ধর্ম্মগ্রন্থ, ইতিহাস, কিংবদন্তী, জীবনী এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে সংগৃহীত। এগুলি শুধু বিভিন্ন দেশ বা জাতির আচার-নীতিগত সংস্কৃতির ধারক নহে, শিশুচিত্তে এগুলির প্রভাবও অসীম। জাতীয় চরিত্র পরিপুষ্টির উপাদান গল্পগুলিতে প্রচুর পরিমাণেই আছে—এবং এগুলির সরস ও মধুর বর্ণনাভঙ্গীতে শিশুচিত্ত সহজেই আকৃষ্ট হয়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

মাটির মাধুরী—শ্রীসুধীর গুপ্ত। চয়নিকা, ১৪০এ রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹ আনা।

কবিতার বই। আটাশটি কবিতার সমষ্টি। লেখায় আবেগ আছে। গীতিকবিতা-রচনায় শ্রীসুধীর গুপ্ত নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। 'মন ও মাটির সুসমঞ্জস যোগাযোগে'র কামনা রচনার বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করিয়াছে। তাই 'কল্পনা', 'সন্ধ্যা' 'রাতের স্বপন', 'মরুর ব্যথা'র সহিত 'বিষয় বণ্টন', 'ধর্মঘট' 'হে বিপ্লব' আসিয়াছে। লেখক বলেন,

"এসো চ'লে যাই বস্তু-জগৎ ছাড়িয়ে,
চির-মধুরের অনন্তলোকে হা রিয়ে,
জড়-জীবনের পাষাণ-পুরীর ওপারে।"

সংসারের দারুণ অবিচার-অত্যাচারের পরিচয় পাইয়াও তাঁহার প্রশ্ন,

"বাস্তবের শেষ সীমানায়
স্বর্গধাম হোথা কি সুন্দর?"

যেখানে বাস্তব-অবাস্তবের তর্ক নাই সেইখানে মন মুক্তপক্ষ,

"মনের আকাশে স্বপন-বলাকা দিল তাই ডানা মেলে।"
"মন উড়ে যায়—বহুদূরে যায়, ভাবের জগতে ভাসে গো।"

'জোছনা'য় পাই,

"কাল সারারাত বিনিদ্র চোখে চেয়ে,
দেখেছি আমার বাগানের পথ বেয়ে—
পূর্ণিমা-অভিসার।"

"মমতা-মদির মেদুর মাধুরী" অথবা "পাখার পালকে জ্যোৎস্নার ঝিলিমিলি" প্রভৃতি পদের শব্দ-মাধুর্য্য মনকে মুগ্ধ করে। শব্দে ছন্দে এবং রোমান্টিক ভাবে "মাটির মাধুরী" কাব্যামোদী পাঠকের চিত্তগ্রাহী হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস (সমালোচনা)—শ্রীশিবানন্দ। প্রকাশক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়, ১১ কুটীঘাট রোড, বরাহনগর। মূল্য ৪৲ টাকা।

'লেখক তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক।' নাম প্রকাশ না-ই করুন, বঙ্কিমচন্দ্রের উপর গ্রন্থকারের যে অপরিসীম শ্রদ্ধা আছে তাহা পুস্তকখানি পাঠ করিলেই বুঝা যায়। শ্রদ্ধা সত্যদর্শনে সাহায্য করে। স্রষ্টা যাহা দিয়াছেন তাহার বিচারেই আলোচনা সার্থক হয়। যাহা দেন নাই তাহা লইয়া অনর্থক বাগ্‌বিস্তার আজিকার অনেক আলোচনার রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লেখক সে রীতি অনুসরণ করেন নাই। 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসমালার ঐক্যসূত্র ও বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশই তাঁহার উদ্দেশ্য।' মূর্ত্তি রূপায়িত না করিয়া ভাস্কর বাস্তু-নির্ম্মাণে মন দিলে সংসারের কত উপকারই না হইত—এইরূপ অদ্ভুত উক্তি যেমন অপরূপ, যাঁহারা বাস্তবের দোহাই পাড়িয়া বঙ্কিম-সাহিত্য সম্পর্কে মন্তব্য করেন তাঁহাদের যুক্তিও প্রায় তদনুরূপ। ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিবার অভ্যাস অনেকের আছে। শিবের গীত গাহিয়া লেখক ধান ভানিবার কাজে অবহেলা করেন নাই বলিয়া তাঁহার সমালোচনায় আমরা চিন্তার খোরাক পাই।

'রচনার কালক্রমানুসারে' লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির আলোচনা করিয়া 'উদ্গতি-সূত্রের সন্ধান' করিয়াছেন। শচীশচন্দ্র "বঙ্কিম-জীবনী"তে ইংরেজী ১৮৬৭ সালকে কপালকুণ্ডলার প্রকাশকাল বলিয়াছেন। লেখক মনে করেন ১৮৬৬। অনুমানের প্রয়োজন নাই। ১৮৬৬, ৩রা ডিসেম্বরে "সোমপ্রকাশে" কপালকুণ্ডলার সমালোচনা বাহির হয়। কাজেই, উহার অল্পদিন পূর্ব্বে যে উপন্যাসখানি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। "রাধারাণী"র প্রথম সংস্করণ কবে মুদ্রিত হইয়াছিল, লেখকের মনে এ প্রশ্ন জাগিয়াছে, সদুত্তর পান নাই। ১২৮২ সাল (অর্থাৎ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ), কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণের "বঙ্গদর্শনে" ইহা প্রথমে প্রকাশিত হয়। পরে ইহা ১৮৭৭ ও ১৮৮১ সনে প্রকাশিত "উপকথা"র দুইটি সংস্করণে এবং ১৮৮৬ সনে তৃতীয় সংস্করণ রূপে "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাসে" মুদ্রিত হয়। তৃতীয় সংস্করণের এই অংশই ১৮৮৬ সনে প্রথম স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে বাহির হয়। "রাধারাণী" ইহার পূর্ব্বে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

"কৃষ্ণকান্তের উইলে"র রোহিণী-চরিত্র সম্বন্ধে নানা জনের নানারূপ-জল্পনা-কল্পনা, বাদ-প্রতিবাদ আছে। এ সম্পর্কে লেখকের যুক্তি ও তর্ক বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। "রোহিণী-চরিত্রের বাণী সুর হইতেছে তাহার প্রবল সম্ভোগতৃষ্ণা যাহা তাহার দুর্ভাগ্যে এবং সংযমাশঙ্কার অভাবে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।" "আনন্দমঠে"র আলোচনা পাঠ করিয়া আমরা একান্ত আনন্দ লাভ করিলাম। "শান্তিকে আনন্দমঠের নায়িকা বলা যাইতে পারে না…। কে বলিবে আনন্দমঠের সমাপ্তিতে যখন 'বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল' তখন এক বিজয়া-দশমীর করুণ সুরে পাঠকের হৃদয় মর্ম্মরিত হইয়া উঠে না? সে ব্যথা যাহার জন্য পাঠকের বুকে বাজে তিনিই আনন্দমঠের নায়িকা—দেশমাতৃকা।" চন্দ্রশেখরের আলোচনা উপভোগ্য। "রজনী বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষক উপন্যাস বলিয়া পরিচিত।" লেখক বলিতেছেন, "লবঙ্গলতা যে দেবী নয় মানবী, অথচ মানবী হইলেও কত বড় শক্তিমতী নারী, তাহা অমরনাথের সহিত তাহার শেষ কথা-প্রসঙ্গে বুঝিতে পারি।" এই সমালোচনা-সমৃদ্ধ গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পাঠক পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ধূলার ধরণীতে—শ্রীবিজনলতা দেবী। বিদ্যাসাগর বুক ষ্টল, ৪১ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা। মূল্য—২৷৹।

সামাজিক উপন্যাস, কিন্তু প্রচারের উৎকট প্রয়াস কোথাও নাই। গুটিকয়েক স্ত্রী ও পুরুষ চরিত্রের সুখ, দুঃখ, আশা ও আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়া লেখিকা অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন অথচ সুন্দরভাবে সমাজের গলদগুলি দেখাইয়া দিয়াছেন। স্বল্প কথায় সংযমের সহিত তিনি তাঁর মূল বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। গল্পচ্ছলে লেখিকা ছবি আঁকিয়াছেন এবং সে ছবি আঁকা ব্যর্থ হয় নাই। সবগুলি চরিত্রই রক্তমাংসে গড়া মানবচরিত্র হইয়াছে। কিন্তু ড্যাস্ ও ডটের আধিক্য, বিরামচিহ্ন ও ছাপার ভুল রসগ্রহণে ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। পরবর্ত্তী সংস্করণে আশা করি এই ত্রুটিগুলি থাকিবে না।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

হিন্দু সমাজ-সমন্বয় আন্দোলন—শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দ সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ—২১১ নং রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা—১৯। ।৵০+২১৪ পৃষ্ঠা, মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ কি চায়, আত্মরক্ষাকামী হিন্দুর কর্ত্তব্য; হিন্দুর দুরবস্থা ও তাহার প্রতিকার; হিন্দু মিলন-মন্দির আন্দোলন-সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; ইত্যাদি প্রায় চৌষট্টিটি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা প্রণবানন্দজী স্বয়ং তাঁহার শিষ্যগণকে এবং তৎপ্রবর্ত্তিত জনকল্যাণকর কর্ম্মে ব্রতী কর্ম্মিগণকে পত্রাদি দ্বারা যে সব উৎসাহপূর্ণ পরামর্শ, উপদেশ ও কর্ম্মানুষ্ঠানের নির্দ্দেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও সময়ে দিয়াছিলেন সে সবও বহুল পরিমাণে গ্রন্থের স্থানে স্থানে পরিবেশিত হইয়াছে। 'ভারত-সেবাশ্রম সঙ্ঘ' কি প্রাণশক্তির বলে দীর্ঘকাল ধরিয়া হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের সেবা করিয়া চলিয়াছে, তাহার শক্তির উৎস কোথায় এবং অনন্ত সমস্যার আবেষ্টনে নিরুৎসাহ না হইয়া যথার্থ মানব-প্রীতির ভিত্তিতে নির্ব্বিরোধী সমন্বয় ও সমাধান কিভাবে হইতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট কর্ম্মপদ্ধতির নির্দ্দেশ ইহাতে পাওয়া যায়।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম—শ্রীবিধুভূষণ জানা। কমলা বুক ডিপো, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২৩৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲ টাকা। পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ।

গ্রন্থকার ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রবর্ত্তিত অল বেঙ্গল ফিজিক্যাল কালচার এসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত ইনষ্টিটিউট অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন-এর ভূতপূর্ব্ব ব্যায়ামাধ্যাপক এবং অধুনা বহু ব্যায়ামাগার ও মহিলা ব্যায়াম-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যায়াম-শিক্ষকরূপে সুপরিচিত। ২২ বৎসর বয়সে যখন তিনি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তখন শরীরচর্চ্চা সম্বন্ধে এরূপ পুস্তকের একান্ত অভাব ছিল। দীর্ঘকাল পরে সম্প্রতি তিনি বহুলাংশে পরিবর্দ্ধিত ও বহু ফটো ও চার্ট ইত্যাদি সংযুক্ত করিয়া এই বইটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উৎকৃষ্ট কাগজ ও বাঁধাই, ব্যায়ামবীরগণের ফটো ইত্যাদি বইখানিকে আকর্ষণীয় করিয়াছে। সরস ও সাবলীল রচনা এবং প্রকাশভঙ্গীর গুণে পুস্তকখানি বিশেষ সুখপাঠ্য হইয়াছে। স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম সম্বন্ধে এইরূপ মূল্যবান তথ্য, সারগর্ভ উপদেশ ও সুচিন্তিত মতামতের সন্ধান অন্য কোনও বাংলা পুস্তকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। শরীরচর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা, ব্যায়াম ও খেলাধুলা দ্বারা স্বাস্থ্যগঠন, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী, বলিষ্ঠ শরীরের পক্ষে কিরূপ খাদ্যের প্রয়োজন, সূর্য্যালোক, বায়ু, জল প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদানগুলির প্রভাব ও উপকারিতা, সুসন্তানকামী পিতা-মাতার পক্ষে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কর্ত্তব্য, স্বাস্থ্যের সহিত নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিক শক্তির সম্বন্ধ এই সমস্ত বিষয়ের বিশদ আলোচনা গ্রন্থকারের প্রচুর অভিজ্ঞতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতেছে। ঐকান্তিক উৎসাহ ও অধ্যবসায় মাত্র সম্বল করিয়া বাংলার সমস্ত শারীর-শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে একত্রিত করিয়া সুসংস্কৃত ও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ব্যায়াম-শিক্ষার প্রচলনের উদ্দেশ্যে ব্যায়ামানুরাগী শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের সহিত ইনিই সর্ব্বপ্রথমে অল বেঙ্গল ফিজিক্যাল কালচার কন্‌ফারেন্স আহ্বান করিয়াছিলেন। পুস্তকের শেষভাগে প্রদত্ত বাংলা ও ভারতের এবং পাশ্চাত্ত্য ব্যায়ামবীরগণের ও ব্যায়ামনিপুণা মহিলাগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ইহাকে অধিকতর চিত্তগ্রাহী করিয়াছে। ব্যায়ামবীরগণের তালিকায় উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর বসু, মণিধর, রবীন সরকার প্রমুখ প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবিদ্‌গণের নাম ও মহিলাগণের তালিকায় হেতুয়ার জাতীয় যুব-সঙ্ঘের অধিনায়িকা ও লাঠি, ছোরা, ড্রিল, বাদ্য প্রভৃতি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিনী কুমারী ৺শোভনা দাসের নাম বাদ পড়িয়াছে। পরবর্ত্তী সংস্করণে এই তালিকা

পূর্ণতর দেখিলে আনন্দিত হইব। এই বইখানি পত্রিকার ন্যায় প্রত্যেক গৃহে ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আদরলাভ করুক, এই কামনা করি।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী—সম্পাদক: শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, ২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৬, মূল্য ছয় টাকা।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় একজন বিখ্যাত সাংবাদিক ছিলেন। বিভিন্ন বাংলা সাপ্তাহিক ও দৈনিকের সম্পাদনা করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। এ যুগের বাঙালী-সাধারণের নিকট তিনি সম্পাদকরূপেই বিশেষ করিয়া পরিচিত আছেন। কিন্তু তিনি যে বঙ্গ-ভারতীর একজন অক্লান্তকর্ম্মা একনিষ্ঠ সাধকও ছিলেন তাহা ইদানীন্তন কালে ক'জন জানেন?

বাস্তবিকই পাঁচকড়ি বাবু বাংলা-সাহিত্যের নানাভাবে সেবা করিয়া গিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি সংবাদপত্র সম্পাদনা ব্যতিরেকে 'মানসী', 'বিজয়া', 'সাহিত্য', 'প্রবাহিণী', 'নারায়ণ' 'বঙ্গবাণী', 'কল্পনা', 'সারথি', 'অনুসন্ধান' প্রভৃতি সাময়িক পত্রেও এমন সব তথ্যমূলক প্রবন্ধাদি লিখিয়া গিয়াছেন যাহা বাংলা-সাহিত্যের সম্পদ-বৃদ্ধিতে অশেষ সহায়তা করিয়াছে। বর্ত্তমান পুস্তকে 'বঙ্গবাণী', 'নারায়ণ' ও 'সাহিত্যে' প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীই মাত্র স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাসমূহ স্থান পাইবে, সম্পাদকদ্বয় এইরূপ আশা আমাদিগকে দিয়াছেন।

আলোচ্য খণ্ডে প্রবন্ধসমূহ 'সাহিত্য', 'সমাজ ও ধর্ম্ম' এবং 'বিবিধ' এই তিনটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। বিবিধ অংশে মাত্র দুইটি প্রবন্ধ—'বঙ্গে ভাস্কর্য্য' ও 'চুড়ি লিবি গো'। আজি হইতে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বাংলার ভাস্কর্য্য-শিল্পের আলোচনায় লেখক প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং ভূয়োদর্শনের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে বাস্তবিকই মুগ্ধ হইতে হয়। বৃহত্তর ভারতের শিল্পের উপর ভারতবর্ষ তথা বাংলার শিল্পের প্রভাব সম্বন্ধে পরবর্ত্তী যুগে যে-সকল আলোচনা হইয়াছে তাহা হইতে আমরা স্থিরনিশ্চয় হইয়াছি যে, ভারত ও বৃহত্তর ভারতের যোগাযোগের ফলেই দ্বীপময় ভারতে ভাস্কর্য্য-শিল্পের এতটা উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছিল। অতি সাধারণ 'চুড়ি'র ভিতর দিয়া লেখক ভারতবর্ষের তথা বঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যে বেদনা-পুত ঐক্যবোধের প্রতীকই দেখিতে পাইয়াছেন। 'সাহিত্য' অংশে বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া বহু সাহিত্যিকের রচনা ও জীবনকথা বিভিন্ন প্রবন্ধে বিভিন্ন সময়ে লিপিবদ্ধ করিয়া তৎ তৎ সম্বন্ধে স্বকীয় মতামত প্রদান করিয়াছেন। 'জীবন-চরিতের মূলসূত্র' প্রবন্ধটিতে অনেক চিন্তার খোরাক মিলে।

কিন্তু এই সংকলন-পুস্তকের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান অংশ 'সমাজ ও ধর্ম্ম'। বাঙালীকে ইদানীং 'প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট' বলিয়া নানা জনে অভিমত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। তাঁহারা অনেকে 'অ-বাঙালী' বলিয়া হয়ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যও অবগত নহেন। নহিলে তাঁহাদিগকে পাঁচকড়িবাবুর এই অংশের প্রবন্ধগুলি একবার পাঠ করিয়া দেখিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতাম। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে বঙ্গদেশ সর্ব্বাপেক্ষা উদার। ইহা শুধু রাজনৈতিক কারণেই নহে, গত দুই কি দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে ধর্ম্ম ও সমাজ-জীবনে ভিতর ও বাহির হইতে তাহাকে যে ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহাই তাহাকে এইরূপ একটি সর্ব্বগ্রাহী উদার মনোভাবসম্পন্ন জাতিতে পরিণত করিয়াছে। বাঙালী জাতির, অন্যান্য প্রত্যেক জাতির ন্যায়, একটি নিজস্ব 'genius' বা ধর্ম্ম আছে। এই ধর্ম্মই তাহাকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। তাহার এই ধর্ম্ম কি—না, নিজস্ব সংস্কৃতির ভিত্তিতে সকলকেই আত্মস্থ করিয়া লওয়া। এই ধর্ম্ম বা বিশিষ্টতার মূলগত অর্থ না বুঝিয়া অর্ব্বাচীন লোকেরা তাহাকে 'প্রাদেশিক' আখ্যা দিয়া নিজেদেরই অজ্ঞতার পরিচয় দিতেছেন।

ইহা ত গেল মাত্র একটি দিক। আর একটি দিকেও এই অংশের প্রবন্ধগুলি অতিশয় মূল্যবান। পূজা-পার্ব্বণ, ব্রতকথা, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ভিতরেই বাঙালী জাতির ভাঙন-গড়নের ইতিহাস যে লুক্কায়িত আছে, পাঁচকড়ি বাবু তাহা আমাদের চোখে যেন আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি ইতিহাসের যে-সব মূলসূত্রের সন্ধান দিয়াছেন, যেমন হস্তলিখিত পুথি ও কুলপঞ্জীর ব্যবহার প্রভৃতি, তদনুযায়ী এখন প্রচুর কাজ হইতেছে। তাঁহার প্রবন্ধাবলী প্রধানতঃ বাংলাদেশ ও জাতিকে কেন্দ্র করিয়া রচিত। এ কারণ এই সকল অনেকটা পূর্ণাঙ্গ হইতেও পারিয়াছে। বাংলার সমাজ-জীবনে বৌদ্ধধর্ম্মের বিভিন্ন বিভাগ, সহজিয়া মত ও তন্ত্রের কিরূপ প্রভাব পড়িয়াছে এবং তাহা দ্বারা বাঙালীর ধর্ম্ম, পূজা-পার্ব্বণ কত নিগূঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত, ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হইতে কিরূপ স্বতন্ত্র তাহারও আভাস আমরা এই অংশের প্রবন্ধনিচয়ের মধ্যে পাই। বাঙালীর জাতীয় উৎসব 'শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব' সম্বন্ধে গ্রন্থকারের প্রবন্ধত্রয় পাঠে আমরা ইহার গূঢ়ার্থ বুঝিয়া বর্ত্তমানের হিড়িকের মধ্যেও সত্যের সন্ধান পাইব ও আত্মস্থ হইতে পারিব। অন্যান্য পূজা-পার্ব্বণেরও মর্ম্মকথা—যাহা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি—জানিয়া লইয়া স্ব-ভাবে ফিরিতে পারিব, নিজেদের সত্যকার উন্নতি করিতে পারিব। 'মাতৃপূজা'র দেশ-মাতার স্বরূপ আমরা দেখিয়া লইব।

মনন-সাহিত্য ভাষার মেরুদণ্ডস্বরূপ। এই সহজ সত্য কথাটি গত যুগের বিভিন্ন বঙ্গমনীষীর রচনা পাঠে আমাদের উপলব্ধি না হইয়া যায় না। বাংলা সাহিত্যের কত অমূল্য সম্পদ যে বিভিন্ন পত্র-পত্রীর পৃষ্ঠায় ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অথচ এগুলি বাংলা-সাহিত্যের পাকা ইমারতের এক একটি স্তম্ভ-স্বরূপ। বাংলা-সাহিত্যরূপ বিরাট সৌধের এই স্তম্ভগুলি অনাদরে ও মেরামতির অভাবে যদি মরিচা ধরিয়া যায় তাহা হইলে যে মূল সৌধকে লইয়াই টান দিবে। আশার কথা, কোন কোন সাহিত্যিক বা সাহিত্য-সেবী প্রতিষ্ঠান ইদানীং এই কার্য্যে হাত দিয়াছেন। এই দিক দিয়া আলোচ্য পুস্তকখানি প্রকাশে পরিষদ সত্যই বাঙালী জাতির ধন্যবাদার্হ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বঙ্গ ও বাঙ্গলা

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত

ঐতরেয় আরণ্যকে (আ: ৮০০ খ্রী: পূ: হইতে ৫০০ খ্রী: পূ: এর মধ্যে) 'বঙ্গ'এর প্রথম উল্লেখ। বঙ্গ, বগধ ও চেরপাদ—অসভ্য জাতি। এই তিন জাতি পক্ষী। সেকালে বঙ্গে আগমন নিষিদ্ধ ছিল। বৌধায়ন শুদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বেদে গণ্ডকী হইতে বঙ্গ পর্য্যন্ত ভূভাগ—'প্রাকী'। প্রাকী অসুরদের দেশ। বেদের গোড়ার দিকে 'অসুর' শব্দ মর্য্যাদা-ব্যঞ্জক ছিল। শক্তিশালী সুরগণ 'অসুর' উপাধি গ্রহণ করিতেন। অসুর—যাঁহারা সুরাপান করিতেন না। অসুরেরা রুদ্রোপাসক ছিলেন। তাঁহাদের বিদ্যা ছিল মায়া। তাঁহারা দুর্গ নির্ম্মাণে পটু ছিলেন। শতপথব্রাহ্মণে অসুরেরা ম্লেচ্ছ—অর্থাৎ বর্ব্বর। পাণিনীর কালে ইঁহারা যোদ্ধ জাতি অর্থাৎ মল্ল। রামায়ণে মল্লদেশের উল্লেখ আছে।

খ্রী: পূ: ৮০০ শত বৎসর পূর্ব্বে মগধ, অঙ্গ ও বঙ্গে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে জৈন চতুর্যমধর্ম্মের আন্দোলন ইতিহাসে দৃষ্ট হয়। খ্রী: পূ: ষষ্ঠ শতক মহাবীর বর্দ্ধমান ও শাক্যসিংহের কাল। এই কালে মগধে বিম্বিসার রাজা। বিম্বিসার অঙ্গদেশ জয় করেন এবং নূতন রাজগৃহে রাজধানী স্থাপিত করেন। জৈন আয়ারাঙ্গসুত্তে আছে—মহাবীর রাঢ়ে আসিয়াছিলেন। আয়ারাঙ্গসুত্তে—রাঢ়—সুরভ, বজ্জ। সুতরাং তৎকালে বঙ্গ—রাঢ় অথবা সুরভ, বজ্জ বলিয়া কথিত হইত।

বৈদিকধর্ম্মের প্রতিবাদকল্পে বৌদ্ধরাজগণ মল্ল উপাধি ধারণ করিতেন। মল্ল উপাধি ধারণ করিতে তাঁহারা গর্ব্ব অনুভব করিতেন। গৌতম বুদ্ধের সমকালীন মগধে তিন মল্লরাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ১। মল্লরাজ্য—রাজধানী কুশিনারা (কাটিয়া গোরখপুর)। ২। মল্লরাজ্য—রাজধানী পাওয়া (রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী)। ৩। মল্লরাজ্য—রাজধানী কাশী।

খ্রী: পূ: ৭৩৯ অব্দে বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তর ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের পশ্চিমস্থিত বৃহৎ ভূ-ভাগ—পঞ্চগৌড়। খ্রী: পূ: পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে পঞ্চগৌড় নন্দ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। মহর্ষি পতঞ্জলী বঙ্গকে আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভূত বলিয়াছেন। পতঞ্জলী পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন (আ: ১৮৭ খ্রী: পূ:)। তিনি মিথিলাবাসী ছিলেন। তাঁহার প্রাচ্য-অসুরদের দেশই বঙ্গ। সুতরাং এইকালে বঙ্গ—রাঢ় অথবা সুরভ, বজ্জ—মল্লদেশও।

সমুদ্রগুপ্তের কালে (৩৩৫-৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে) পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট ও ডবাক্ আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এইকালে আর্য্যাবর্ত্ত বহির্ভূত মল্লদেশ বা বঙ্গ নানা খণ্ডে বিভক্ত দেখা যায়। বঙ্গ (বাঁকুড়া ইহার মধ্যে পড়ে), প্রবঙ্গ (মেদিনীপুর), সুহ্ম, ব্রহ্ম, উপবঙ্গ (২৪ পরগণা, খুলনা) ও বাংলা ('ব'দ্বীপ)।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে পুষ্করণাধিপতি মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মা 'ব'দ্বীপ বাংলা হইতে বর্ত্তমান বাঁকুড়া পর্য্যন্ত বঙ্গ অধিকার করিয়া এক অখণ্ড বাংলার সৃষ্টি করেন। এই বাংলা কখনও আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত হইয়াছিল কিনা ইতিহাস বলিতে পারে না।

পালরাজারা গৌড়ের রাজা। শশাঙ্ক, বিজয়সেন বাংলার রাজা। শশাঙ্ক গৌড় জয় করিয়াছিলেন। তিনি মগধও জয় করিয়াছিলেন। শশাঙ্কের কাল—৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁহার পূর্ব্বে গোপচন্দ্র নামক একজন বাংলার রাজা ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ আর্য্যাবর্ত্তে রাজ্য-বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। শশাঙ্কের পর বিজয়সেন পর্য্যন্ত (১০৯৭-১১৫৯) বাংলায় মল্ল, বর্ম্ম, শূর, চন্দ্ররা রাজা। রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায় (৮০৯-৯১০ খ্রীষ্টাব্দ) মল্লদেশের উল্লেখ আছে। এই কালে রামায়ণের মল্লদেশ সঙ্কুচিত হইয়া বর্ত্তমান তমলুক হইতে ছোটনাগপুর পর্য্যন্ত ভূমি দাঁড়াইয়াছে। ভগীরথ—মল্লদের আদিরাজা। তাঁহার কাল ৭ম শতক। ভগীরথ মল্ল উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। মল্লভূমির প্রধান নগর বিষ্ণুপুর। বিষ্ণুপুর—গুপ্তবৃন্দাবন।

নবম শতকে বাংলার হরিকেলমণ্ডলের কান্তিদেব রাজা। কান্তিদেবের রাজধানী বর্দ্ধমান। দশম শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলার চন্দ্রদেবরাজা কান্তিদেবের রাজ্য বিক্রম দ্বারা লাভ করেন। একাদশ শতকে বাংলার হরিবর্ম্মা রাজা। এই সময়—'গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়া—'। বিজয়সেন, হরি বর্ম্মা প্রায় সমসাময়িক। বাংলার শূরবংশ, সেনবংশ, রায়বংশ (রায়গড়), এবং গৌড়ের রামপাল পরস্পর বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। রামপালের (১০৮৪-১১২৬ খ্রীষ্টাব্দ) দিব্যভূমি উদ্ধারে বাংলার রাজারা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

বিজয়সেন ত্রিবেণীর নিকট বিজয়পুর-রাজধানী স্থাপন করেন। পাল-সাম্রাজ্যের তিনি অবসান ঘটান। সমতট হইতে কামরূপ, মিথিলা, কলিঙ্গ পর্য্যন্ত ভূমি অধিকার করিয়া তিনি এক অখণ্ড বৃহত্তর বাংলার সৃষ্টি করেন। মগধেশ্বর কায়স্থ বটমিত্র বল্লালসেনের শ্বশুর ছিলেন। কাশীর রাজাকেও লক্ষণসেনের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

তুর্কবিজয়ের পর—পলাশীর যুদ্ধ পর্য্যন্তও আমরা মল্লভূমরূপে স্বাধীন বাংলা দেখিয়াছি। ইংরেজের কৃপায় সে মল্লভূমও ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া গিয়াছে।

মল্লভূম গিয়াছে দুঃখ নাই। ইংরেজদিগের প্রত্যাবর্ত্তনে আমরা বিজয়সেনের না হউক চন্দ্রবর্ম্মার বাংলা ফিরিয়া পাইয়াছি। বাংলা স্বাধীন হইয়াছে কি ? স্বাধীনই হউক আর পরাধীনই হউক—বাংলা বাংলাই রহিয়াছে।

ভারতচন্দ্র স্মরণোৎসব

গত ২৫শে চৈত্র রবিবার অপরাহ্ণে কৃষ্ণনগর সাহিত্য-সঙ্গীতির উদ্যোগে 'অন্নদা মঙ্গল' রচনার পর দুই শত বৎসর পূর্ণ হইবার উপক্রমে কৃষ্ণনগর রাজবাটীর সভাগৃহ বিষ্ণুমহলে রায়গুণাকর কবি ভারতচন্দ্রের স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অন্য কোন বাঙালী কবির সম্পর্কে এ জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কবি শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর। প্রারম্ভে অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ও স্বরূপ বিবৃত করেন। কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, তাঁহাকে স্মরণ ও তাঁহার রচনার সহিত পরিচয়-সাধন ইহাই ছিল অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে সংগৃহীত কবির অন্নদা মঙ্গলের ১২০৪ সালে লিখিত একখানি পাণ্ডুলিপিকে মাল্যভূষিত করিয়া সভাপতি মহাশয় কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য কবির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। উলুবেড়িয়া কলেজের অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন গোস্বামী ভারতচন্দ্রের রচনায় বাংলার তৎকালীন সমাজচিত্র সম্পর্কে তাঁহার ব্যাপক আলোচনার অংশবিশেষ পাঠ করেন। এই উপলক্ষ্যে কবি এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ও তদ্‌বংশীয়গণের স্মৃতিচিহ্ন-সংবলিত একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। অন্নদামঙ্গলের বিভিন্ন প্রাচীন সংস্করণ ও কবিকর্ত্তৃক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট লিখিত একখানি পত্র, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বাক্ষরসংযুক্ত পঞ্চাশ বিঘা পরিমিত ভূমিদানের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত সাদা দলিল, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের নির্দ্দেশে রচিত বা লিপিকৃত কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের পুঁথি এবং এই বংশের রাজগণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত বাদশাহ ও নবাবদের ফরমান এই প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত হইয়াছিল। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্রীসজনীকান্ত দাস।

কবির রচনার সহিত সাধারণের পরিচয়-সাধনের উদ্দেশ্য হাওড়ার প্রসিদ্ধ টপ্পাগায়ক শ্রীকালীপদ পাঠক ও খ্যাতনামা সঙ্গীতবিশারদ ডাক্তার শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল মহাশয়ের নেতৃত্বে সঙ্গীত সহযোগে বিদ্যাসুন্দর পাঠের ব্যবস্থা করা হয়। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের অংশবিশেষ ও মধ্যে মধ্যে গেয় টপ্পাগুলি নির্ব্বাচিত করেন শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য। ইহাতে স্বল্প পরিসরের মধ্যে কাহিনীটির পূর্ণ রূপ ও ভারতচন্দ্রের রচনার সুন্দর নমুনা পাওয়া যায়।
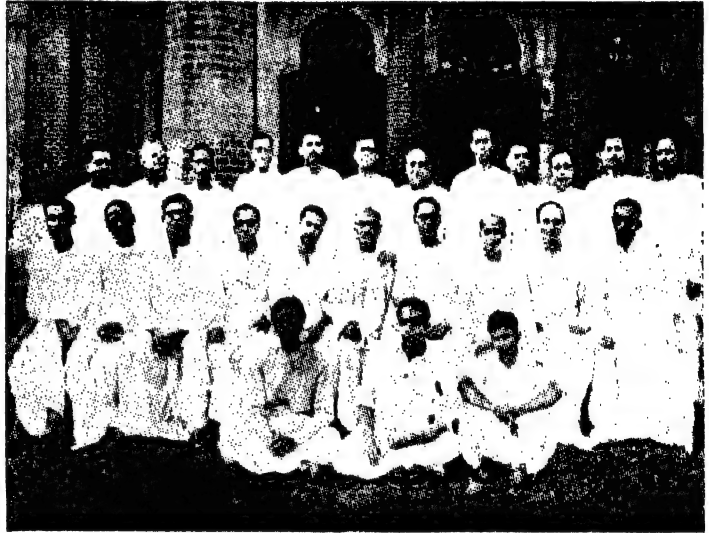
কৃষ্ণনগরে ভারতচন্দ্র স্মরণোৎসবে সমবেত সুধীবৃন্দ

পাটনায় বাঙালীদের ধ্রুব নাট্যাভিনয়

স্থানীয় ব্রাহ্ম-মন্দিরের দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ের সাহায্যকল্পে শ্রীসুষমা সেন (এম.এল.এ.), শ্রীউমা দে, ও শ্রীশকুন্তলা সেনের পরিচালনায়, গত ৯ই এবং ১৩ই এপ্রিল স্থানীয় লেডি "ষ্টিফেনসন হলে" 'ধ্রুব' সহ-নাটিকা (mixed

ধ্রুব নাট্যাভিনয়ের একটি দৃশ্য

playlet) অভিনীত হয়। পার্শি বালিকা টি, প্যাণ্ডির বেদেনী ও কথক নৃত্য, মণিকা, মমতা ও মনীষা ভগ্নীত্রয়ের সমবেত নৃত্য, পুষ্পমাল্যশোভিত ঋষিবালকগণের নৃত্যগীত দর্শকদিগকে প্রচুর আনন্দ দান করে। মুখরা বিদূষকপত্নীর ভূমিকায় বন্দনা গাঙ্গুলী কৃতিত্বের পরিচয় দেন। বিদূষকের ভূমিকায় সুপ্রকাশ রায় সরস অভিনয় দ্বারা দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করেন। নারদের ভূমিকায় শ্রীতীশ মিত্রের অভিনয়ও উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। অল্পবয়স্ক বালিকা স্বপ্না রায় ধ্রুবের বহু গান সম্বলিত দীর্ঘ ভূমিকাটি সুচারুরূপে অভিনয় করে।

পাটনায় বাঙালীদের শুভ নববর্ষোৎসব

পহেলা বৈশাখের সন্ধ্যায় "পাটনা মিউজিক ক্লাব" এবং "সুহৃৎ পরিষদ ও হেমচন্দ্র গ্রন্থাগারে"র উদ্যোগে বাঙালী শূরোভানের প্রাঙ্গণে মহাসমারোহে নববর্ষোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। হাসি রায়ের রবীন্দ্র সঙ্গীত, অর্চনা মৈত্রের ভজন; রমা চক্রবর্তীর পরিচালনায় মণিকা, মমতা ও মনীষা গাঙ্গুলীর সমবেত নৃত্য; সুনীল সিংহের পরিচালনায় মহিলাদিগের ঐকতানবাদন, আবৃত্তি ইত্যাদি খুবই উপভোগ্য হইয়াছিল। শূরোদ্যান রবীন্দ্র পরিষদ, মিলনী মহিলা সমিতি ও অন্যান্য সমিতির প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় উৎসবটি বিশেষ সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল।

উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠান শেষ হইলে পর, গ্রন্থাগারের সভাপতি মাননীয় বিচারপতি এস. কে. দাস মহাশয় একটি সরস ভাষণে নববর্ষের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন।

রবীন্দ্র স্মারক পুরস্কার

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক প্রেস নোটে প্রকাশিত হইয়াছে যে, বিচারকমণ্ডলীর সুপারিশক্রমে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫০-৫১ সালের জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থকারগণের প্রত্যেককে ৫০০০৲ টাকা মূল্যের "রবীন্দ্র স্মারক পুরস্কার" দিয়াছেন—পরলোকগত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ("ইছামতী" গ্রন্থের জন্য) এবং শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় (প্রাচীন ভারতীয় জীবন সম্পর্কিত গ্রন্থের জন্য)।

মেডিক্যাল কলেজের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনীর আবেদন

সন ১৩১৮ সালে বাঁকুড়া সম্মিলনী স্থাপিত ও তৎপরে রেজেষ্টারীকৃত হয়। প্রথম হইতেই আর্ত্তত্রাণ-কার্য্য, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, কৃষিশিক্ষাপ্রদান ইত্যাদি নানারূপ জনহিতকর কার্য্যে এই সম্মিলনী আত্মনিয়োগ করে এবং চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদান করিবার উদ্দেশ্যে মেডিকেল স্কুল ও রোগক্লিষ্ট ব্যক্তি-দের শুশ্রূষার জন্য প্রায় ১৫০টি রোগীর অবস্থানের উপযোগী একটি হাসপাতাল বাঁকুড়া শহরে কেন্দুডি ও লোকপুর পল্লীতে স্থাপিত হয়। ভারতীয় চিকিৎসা পরিষদ ও গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ অনুসারে ১৩৫৫ (১৯৪৮) সাল হইতে মেডিকেল স্কুলে ছাত্র ভর্ত্তি নিষিদ্ধ হওয়ায় সম্মিলনী মেডিকেল স্কুলটিকে কলেজে উন্নীত করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ হইতেই বায়োলজী (জীববিদ্যা) ও অন্যান্য বিজ্ঞান বিভাগসহ আই-এস্‌সি ক্লাস খুলিয়া মেডিকেল কলেজের গোড়াপত্তন করেন। ১৯৫১ সাল হইতে কর্তৃপক্ষ মেডিকেল কলেজে ছাত্র ভর্ত্তির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের উদ্দেশ্যে পরিদর্শন কমিটিও নিযুক্ত হইয়াছে। মেডিকেল কলেজের উপযোগী প্রাথমিক সরঞ্জাম ও গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য আশু অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। ইতিমধ্যে প্রায় লক্ষাধিক টাকার সরঞ্জামাদি যোগাড় হইয়াছে এবং নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। তিন লক্ষ টাকার নূতন বৃহৎ ভবন আরম্ভ হইয়াছে। ইহা একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ইহার সাফল্য সর্ব্বসাধারণের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতেছে। এখন রিজার্ভ ফণ্ডে এক লক্ষ টাকা দরকার। অনতিবিলম্বে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কমিটি কলেজ পরিদর্শনের জন্য যাইবেন। কলেজ ফণ্ডের জন্য সম্মিলনী বাঁকুড়া ব্যাঙ্কে পৃথক হিসাবও খুলিয়াছেন।

সরলাবালা মিত্র

গত ২০শে চৈত্র, ইং ৩রা এপ্রিল মহিলা শিক্ষাব্রতী সরলা-বালা মিত্র পরলোকগমন করিয়াছেন। বাংলার নারী-শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্দ্ধ শতাব্দীব্যাপী সেবার পরিসমাপ্তি ঘটিল।

হাওড়া জেলার আন্দুল গ্রামের সুপ্রাচীন দত্ত চৌধুরী বংশে পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সে সরলাবালার বিবাহ হয় এবং বালিকা বয়সেই তিনি বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হন। তখন হইতে তাঁহার

খুল্লতাত সুকবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও তৎপত্নী সুলেখিকা শরৎকুমারীর যত্নে ও উৎসাহে সরলাবালা বিদ্যা-চর্চায় একান্তভাবে মনোনিবেশ করেন। অক্ষয়চন্দ্র ও শরৎকুমারী উভয়েই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার পরিচালিত "ভারতী" পত্রিকার সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন।

অক্ষয়চন্দ্র ও শরৎকুমারীর তত্ত্বাবধানে সরলাবালার বিদ্যা-চর্চা ভালভাবেই চলিয়াছিল। বেথুন স্কুল ও কলেজে অধ্যয়ন করিয়া তিনি একে একে এণ্ট্রান্স, এফ-এ, ও বি-এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। বি-এতে সংস্কৃত পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় তিনি একটি সুবর্ণ-পদক প্রাপ্ত হন।

তৎকালে উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে মহিলার সংখ্যা নিতান্ত অল্প থাকায় বি-এ পাশ করিয়া সরলাবালা শিক্ষা বিভাগে কর্মগ্রহণ করিলেন এবং বেথুন কলেজে অধ্যাপনার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

কিছুকাল অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকার পর ১৯০৬ সালে ভারত গবর্ণমেণ্ট একটি বিশেষ বৃত্তি দিয়া তাঁহাকে বিলাতে পাঠান—নারী-শিক্ষয়িত্রীদের উপযোগী শিক্ষা-প্রণালী বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য। ইংলণ্ডে যাইয়া লণ্ডনস্থ "মেরিয়া গ্রে ট্রেণিং কলেজে" দুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়া ট্রেণিং ডিপ্লোমা লইয়া ১৯০৮ সালে সরলাবালা দেশে ফিরিয়া আসেন।

তদনন্তর গবর্ণমেণ্ট হিন্দু শিক্ষয়িত্রী গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেন এবং সরলাবালাকে উহার পরিচালন-ভার অর্পণ করিলেন। এইরূপে তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের লেডি প্রিন্সিপ্যালের পদে নিযুক্ত হইলেন। বঙ্গ মহিলাগণ (অনেকে তাঁহারই মত অকাল-বিধবা) তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া ও শিক্ষালাভ করিয়া পরবর্তী জীবনে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন এবং তাঁহার ধারা অব্যাহত রাখিয়াছেন। ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত তিনি লেডী প্রিন্সিপ্যালের পদে সমাসীন থাকিয়া অবসর গ্রহণ করেন ও তদবধি পেনশন ভোগ করিতে থাকেন।

নারী জাগরণ ও মহিলা সংগঠন কার্য্যে সরলাবালা সুদীর্ঘকাল আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই সেবা-কার্য্যের ইতিহাস সরলাবালাকে বাঙালীর জাতীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছে।

অনন্তবন্ধু চৌধুরী

গত ৮ই চৈত্র নয়াদিল্লীর খ্যাতনামা চিকিৎসক অনন্তবন্ধু চৌধুরী ৫৮ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ফরিদপুর জেলার উলপুরের অধিবাসী ছিলেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম-বি উপাধি লাভ করিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি মেসোপটেমিয়ায় গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর তিনি ১৯২৩ সালে দিল্লী ক্যাণ্টনমেণ্টের চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত হন। ১৯২৪ সালে নয়াদিল্লীতে স্থায়ী ভাবে তিনি চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। সেই সময় হইতে সুদীর্ঘ ২৬ বৎসর দিল্লীতে চিকিৎসা-ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিয়া চিকিৎসাক্ষেত্রে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। যক্ষ্মারোগের তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত যক্ষ্মা ক্লিনিকের গোড়াপত্তন হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি ঐ ক্লিনিকের প্রধান পরিচালক ছিলেন। তিনি দিল্লীস্থ বাঙালীদের সমস্ত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। যে কয়জন বাঙালীর অক্লান্ত চেষ্টায় নয়াদিল্লীর প্রাচীনতম বাঙালী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—রাইসিনা বেঙ্গলী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল—১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, ডাঃ চৌধুরী তাঁহাদের অন্যতম। সেক্রেটারীরূপে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি এই বিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। কালীবাড়ী, বাঙালী ধর্মশালা ও বেঙ্গলী ক্লাব তাঁহারই প্রচেষ্টার ফলে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। তাঁহার উদ্যোগে নয়াদিল্লীতে পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু কল্যাণ সমিতি স্থাপিত হয় এবং এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধাররূপে ডাঃ চৌধুরী শত শত নিরাশ্রয় গৃহ-

ছাত্রার আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। প্রবাসী বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মেলনের গত দিল্লী অধিবেশনের তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা।

সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র

এই শিক্ষাব্রতী ৮০ বৎসর বয়সে কলিকাতা নগরীতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি ঢাকা নগরীর কলেজসমূহে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ঢাকার জগন্নাথ কলেজের বর্ত্তমান উন্নতির মূলে আছে সত্যেন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ সেবা। বিদেশী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার নানা প্রয়োজনে নানাবিধ বাধা-নিষেধের মধ্যে সেই যুগের সকল শিক্ষাব্রতীকেই কাজ করিতে হইত এবং সেই বিদেশী রাষ্ট্রই ভারত বিভাগে সাহায্য করিয়া সত্যেন্দ্রনাথকে বৃদ্ধ বয়সে ঘর-ছাড়া করিয়াছিল। আমরা সত্যেন্দ্রনাথের বিদেহী আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

কমলচন্দ্র নাগ

"শিল্প ও সম্পদ"-সম্পাদক কমলচন্দ্র নাগ ৩০ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মরলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ঐকান্তিক চেষ্টায় এই সাপ্তাহিকখানিকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কালোবাজারী ও মুনাফাখোরের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়া তিনি কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহা হইল তাঁহার কীর্ত্তির নিদর্শন। একজন নিষ্ঠাবান সাংবাদিকের অকাল বিয়োগে বাংলার সংবাদপত্র-জগৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

নগেন্দ্রনাথ নাগ

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের অন্যতম গবেষক নগেন্দ্রনাথ নাগ মহাশয়ের মৃত্যুতে আমরা বন্ধু বিয়োগের ব্যথা অনুভব করিতেছি। আগ্রা কলেজে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে তিনি সুনাম অর্জ্জন করেন। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের আহ্বানে সাড়া দিয়া তিনি গবেষণার উপযুক্ত ক্ষেত্র লাভ করেন। জীবনের শেষ দুই তিন বৎসর তিনি সন্ন্যাসরোগে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার আত্মা শান্তি লাভ করুক।

শিল্পী হীরাচাঁদ দুগার

বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হীরাচাঁদ দুগার গত ৩রা মে পালিতানায় (সৌরাষ্ট্র) মাত্র ৫১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতনে কলাভবন প্রতিষ্ঠার প্রথম বৎসরে ছাত্ররূপে হীরাচাঁদ সেখানে যোগদান করেন। শান্তিনিকেতনে থাকাকালে আচার্য্য নন্দলাল বসুর শিক্ষায় তিনি একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীরূপে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। দীর্ঘকাল শিল্পকলার চর্চ্চা হইতে বিরত থাকার পর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি পুনরায় শিল্পসৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেন।

গত বৎসর দুগারের একটি একক শিল্পপ্রদর্শনী কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইয়া শিল্পানুরাগীদের বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীইন্দ্র দুগার শিল্পকলার ক্ষেত্রে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন।

বিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের শিক্ষাচার্য্য সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায়ের মন্ত্র-শিষ্য বিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেহত্যাগে সঙ্ঘ-জীবন অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইল। ১৩০৪ সালে হুগলী জেলায় সিঙ্গুরের বন্দ্যোপাধ্যায়-পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ ১৩২৩ সালে শ্রীমতিলাল রায়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৩২৭ সালে ব্রাহ্মণত্বের সকল সংস্কার বিসর্জ্জন দিয়া সঙ্ঘের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। বৈদিক সাহিত্যে অধিকার ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি নিষ্ঠা তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। সেই গুণে তিনি দেশের বিদ্বজ্জন সমাজে স্বকীয় প্রতিষ্ঠা বজায় রাখেন। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ ও তাঁহার পরিজনদের উদ্দেশে আমাদের সমবেদনা নিবেদন করিতেছি।

আর্থার ভেন্ডারবার্গ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট সভার নেতৃস্থানীয় এই রাজনীতিকের তিরোধানে ঐ রাষ্ট্রের সমূহ ক্ষতি হইল।

জার্ম্মান পিতামাতার সন্তান ভেন্ডারবার্গ আমেরিকার রাজনীতি ক্ষেত্রে ডেমোক্রাট ও রিপাবলিকান দুই পক্ষের দলাদলির ঊর্দ্ধে বিরাজ করিতেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে দলাদলি উগ্র হইয়া দেশে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া রাখে তাহা পররাষ্ট্র নীতি লইয়া। উক্ত রাষ্ট্রের "জনক" জর্জ্জ ওয়াশিংটন বলিয়াছেন যে, তাঁদের রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের ঝগড়ার মধ্যে জড়াইয়া পড়িবার চেষ্টা হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবে। ইহার নাম "আইসোলেসনিজম্" (isolationism)—পররাষ্ট্র হইতে সযত্নে দূরে থাকা।

আর্থার ভেন্ডারবার্গ এই কথা বুঝিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান জগতে উহা সম্ভব নহে। সেইজন্যই তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংগঠনে বিশেষ ভাবে সহায়তা করেন। ইহা তাঁহার কীর্ত্তি হইয়া থাকিবে।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

হাল্কা হাওয়া
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

পারস্য-উপসাগরের আবাদেন দ্বীপের তৈল-বিশোধনাগার
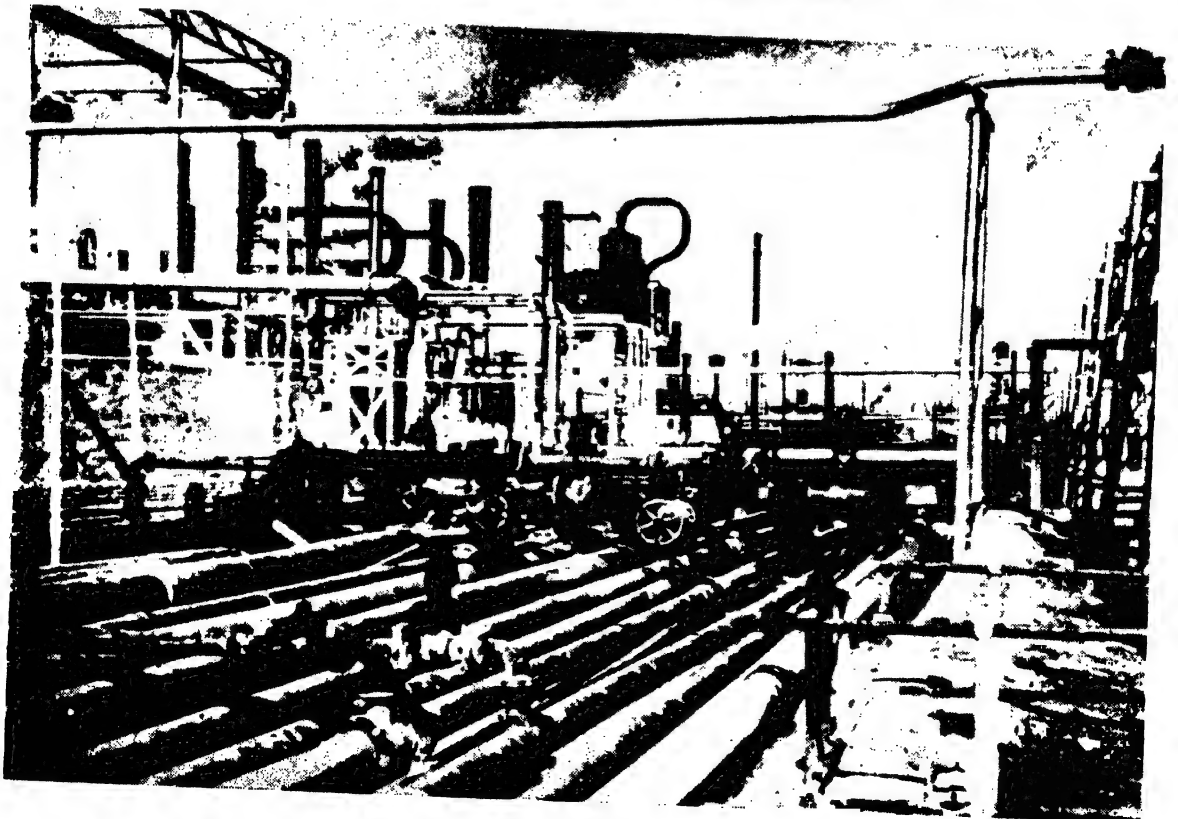
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫১শ ভাগ ১ম খণ্ড } আষাঢ়, ১৩৫৮ { ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

রাষ্ট্রবিধি সংশোধন সম্বন্ধে আলোচনা

রাষ্ট্রবিধি সংশোধন বিষয়ে পার্লামেন্টের আলোচনা উচ্চগ্রামে আরম্ভ হইয়া শেষে নিম্নস্বরে নামিয়া আসিয়াছিল এবং ইহা লইয়া অনেক সমালোচনাও হইয়াছে। কিন্তু এ সম্পর্কে প্রধান দুইটি তথ্য বিষয়ে আমরা সম্যক্ বিচার দেখিলাম না। ডাঃ আম্বেদকর বলিয়াছিলেন যে, ব্যক্তিস্বাধীনতার বিধি ও ধারার ব্যাখ্যা সুপ্রীম কোর্ট যেরূপ দিয়াছেন তাহাতে কেহ মানুষ খুনের জন্য লোককে উত্তেজিত করিলেও তাহা দণ্ডনীয় হইবে না। সুপ্রীম কোর্ট এ কথাও বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রবিধি বদলাইবার অধিকার পার্লামেন্টের নাই।

এই দুই উক্তিকেই চরম সংজ্ঞা বলিয়া গ্রাহ্য করা মহাভ্রম হইবে। ধ্বংসাত্মক কার্য্যে, নরহত্যা প্রভৃতিতে উস্কানি দিলে সমাজ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যাহত হয় এ কথা বুঝাইবার অপেক্ষা রাখে না। কতকগুলি লোকের উস্কানি দেওয়ার অধিকারকে অবশিষ্ট ৩৫ কোটি লোকের স্বাধীনতার ঊর্দ্ধে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। সমাজধ্বংসী কার্য্যের উদাম, উদ্যোগ বা প্রয়াসকে আইনসঙ্গত বলিয়া গণ্য করিলে সমাজরক্ষা চেষ্টাকে বে-আইনি করা হয়। ইহা মানুষের মৌলিক অধিকারেরও গোড়ার আরও মৌলিক যে জিনিষ আছে তাহাতে গিয়া আঘাত করে। আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টেও এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, সমাজধ্বংসী কার্য্যে উস্কানি দেওয়াকে মৌলিক অধিকার বলিয়া গ্রাহ্য করা যায় না কারণ উহা অধিকাংশ নাগরিকের ও সমাজের সমষ্টিগত মৌলিক অধিকারে আঘাত করে। একের অধিকার অপরের ক্ষতির কারণ হইতে পারে না, এইখানে আইন সামঞ্জস্য বিধান করে, এই সামঞ্জস্যের বলেই সমাজ চলে—আমাদের সুপ্রীম কোর্ট এই মূল কথাটা বিচারের বাহিরে ফেলিয়াছেন।

সুপ্রীম কোর্টের দ্বিতীয় বক্তব্য পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রবিধি বদলাইতে পারে না। ইহা অতি আশ্চর্য্য যুক্তি। একবার রাষ্ট্রবিধি প্রণীত হইলে আর উহা বদলানো যাইবে না, ভুলভ্রান্তি ধরা পড়া সত্ত্বেও অনন্তকাল উহাই টানিয়া চলিতে হইবে ইহা যুক্তি নহে। একথা স্বীকার করা অসম্ভব, কেননা ইহা সমাজ ও রাষ্ট্রের সংহতি, প্রগতি ও রক্ষার পরিপন্থী। এরূপ রাষ্ট্রবিধি যে ভাবেই প্রণীত, গৃহীত ও লিখিত হইয়া থাকুক উহা বিষবৎ বর্জনীয় ও অগ্রাহ্য। রাষ্ট্রবিধিতেই উহার পরিবর্ত্তনের কথা নিহিত আছে, প্রয়োজনানুসারে উহা সংশোধিত হইবে, ইহাতে আপত্তি করা নিরর্থক।

রাষ্ট্রবিধি সংশোধন কি ভাবে হইবে, আদালতের অধিকার কতটা থাকিবে, গবর্মেণ্টের ক্ষমতাই বা কতটা হইবে তাহা বিবেচ্য বিষয় এবং ইহা লইয়া মতভেদের অবকাশ থাকিতে পারে না। ব্যক্তিস্বাধীনতার ব্যাখ্যার সময় অল্প লোকের স্বেচ্ছাচারিতাকে শান্তিপ্রিয় কোটি কোটি নাগরিকের স্বাধীনতার ঊর্দ্ধে স্থান দিয়া সমাজের নিরাপত্তা বিপন্ন করাতেই এই সংশোধনের প্রয়োজন ঘটিয়াছে।

মানুষ ও বন্য পশু উভয়েই স্বাধীনতার অধিকারী। বন্য পশুর স্বাধীনতার সীমা নাই, গণ্ডী নাই, তাই প্রতি পশুকে প্রতি মুহূর্ত্তে নিজের প্রাণ ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সতর্ক সংগ্রাম করিতে হয়। মানুষ নিজের স্বাধীনতার গণ্ডী টানিয়া দিয়াছে গোষ্ঠীর জন্য, নিজের অধিকারখর্ব্ব করিয়াছে সমাজের উন্নতির জন্য, স্বেচ্ছায় স্বার্থ প্রবৃত্তি ও রিপুর উপর সংযমের বন্ধন আরোপ করিয়াছে স্বজাতির সংহতির জন্য এবং প্রয়োজন হইলে আত্মাহুতি পর্য্যন্ত দিতে নিজেকে বাধ্য করিয়াছে রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য। এই কারণেই মানব-সমাজ প্রগতির পথে চলিতে সক্ষম হওয়ায় উহা বন্য পশুবর্গের বহু ঊর্দ্ধে উচ্চস্তরে পৌঁছিয়াছে। আজ যদি ভারতীয় রাষ্ট্রবিধি ঐরূপ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খল ভাঙিবার সহায়তা করে তবে তাহার যে সংস্কার প্রয়োজন সে বিষয়ে তর্কবিতর্ক অবান্তর ও অবাস্তব।

আমরা রাষ্ট্রগত স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যে অনভ্যস্ত, তাই আজ আমরা বুঝি স্বীয় বা দলগত স্বাধীনতা। অপরের স্বাধীনতায় আঘাত করিয়া বা অপরের অধিকার খর্ব্ব করিয়া যথেচ্ছাচার করার ক্ষমতা কাহারও থাকা উচিত নয় একথা আমরা প্রতিপদে ভুলিয়া যাই। এক জনের বা এক দলের স্বেচ্ছাচারে লক্ষ

লক্ষ লোক বিপদগ্রস্ত হইবে বা নিদারুণ কষ্ট সহ্য করিতে বাধ্য হইবে ইহা ন্যায়, ধর্ম্ম, সবেরই বিরোধী ব্যবস্থা। অথচ ইহার বিষয়ে রাষ্ট্রবিধি সংস্কার প্রয়োজন কিনা সেই তর্কে গগন বিদীর্ণ করিতেছেন আমাদের রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের দল। হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের বিদগ্ধ চূড়ামণিগণের কথা না বলাই সমীচীন। তাঁহারা ন্যায় বিচারের কূটতর্কে ভুলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহারা মনুষ্যসমাজের ধর্ম্মাধিকরণে আসীন এবং সমাজ ও রাষ্ট্র রক্ষায় তাঁহাদেরও দায়িত্ব ও কাণ্ডজ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

কলিকাতার গ্যাস কোম্পানীতে ধর্ম্মঘট হইয়াছে। কারখানার নিছক শ্রমিকে শ্রমিকে ঝগড়া। ইহা লইয়াই ধর্ম্মঘট হইয়াছে, অথচ ক্ষমতালোভী নেতার দল ইহার মধ্যে লাফাইয়া আসিয়া পড়িয়াছেন। গ্যাস বন্ধ হওয়ায় হাসপাতালে অপারেশন বন্ধ—কেননা অস্ত্র ও ব্যাণ্ডেজ বীজাণুমুক্ত করিতে বিশেষপ্রকার গ্যাসচুল্লীর প্রয়োজন—রাস্তার আলো বন্ধ, রাত্রে অলিগলির গৃহস্থ চোরের ভয়ে আতঙ্কিত। একটা অতি সামান্য ব্যক্তিগত বিরোধ উপলক্ষ করিয়া যাহারা শহরের লক্ষ লক্ষ লোককে বিনা বিজ্ঞপ্তিতে বিপন্ন করিতে পারে তাহাদিগকে স্বেচ্ছাচারী ও সমাজদ্রোহী ছাড়া কি বলিব? অথচ ইহা নিবারণ করিবার উপায়ও ছিল না। আমাদের সুপ্রীম কোর্ট আমেরিকান সুপ্রীম কোর্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে এই সংশোধনেরও প্রয়োজন হইত না; চার বৎসরে সামাজিক শৃঙ্খলাবোধও অনেকটা অগ্রসর হইতে পারিত।

ভারতীয় রাষ্ট্রবিধি আরম্ভ হওয়ার দেড় বৎসর উত্তীর্ণ না হইতেই উহার গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। পৃথিবীতে এমন রাষ্ট্রবিধি প্রস্তুত হইয়াছে যাহা ন ভূতো ন ভবিষ্যতি—এই কথা এতদিন যাঁহারা প্রচার করিতেছিলেন, দেড় বৎসরের মধ্যে প্রভিশনাল পার্লামেণ্টকে দিয়াই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধারাগুলিকে পরিবর্ত্তন করাইতে হইল। ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারাটিকে এমন ভাবে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে যাহার পর বাক্য ও চিন্তার স্বাধীনতা ব্যাহত হইবার আশঙ্কা জন্মিয়াছে। আমাদের রাষ্ট্রনীতি-বিশারদদের মণ্ডলী রাষ্ট্রবিধি সংস্কার কিভাবে হওয়া উচিত সেকথা ছাড়িয়া দলগত ও ব্যক্তিগত নির্ব্বাচনের স্বার্থে সংস্কার একেবারেই হওয়া উচিত কিনা তাহা লইয়াই বক্তৃতা করায় এই অপরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

রাষ্ট্রবিধির ব্যাখ্যা বিষয়ে আদালতের রায় বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রূপ হইতেছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতার ব্যাখ্যা মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতেছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। এক হাইকোর্ট রায় দিয়া বসিলেন যে, হত্যার জন্য প্ররোচনা দেওয়াও ব্যক্তিস্বাধীনতার মধ্যে পড়ে। সরকারী তহবিল ভাঙিয়া ধরা পড়িয়াও আসামী ব্যক্তিস্বাধীনতার দোহাই দিয়া মুক্তি পাইয়া গেল। দুর্নীতির মামলার পর্য্যন্ত ব্যক্তিস্বাধীনতার রন্ধ্রপথে আসামী খালাস পাইতে লাগিল। বিচার শুধু করিলেই হয় না, উহা ন্যায় বিচার হইয়াছে সর্ব্ব-সাধারণ যেন ইহা এক বাক্যে বুঝিতে পারে, বিচারের এই মূল সূত্র স্বাধীনতার পর পদে পদে উপেক্ষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ডাঃ আম্বেদকর পার্লামেণ্টে আদালতগুলি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রুতিসুখকর হয় নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার কথার পিছনে যুক্তি ছিল একথা স্বীকার করিতেই হইবে। একই বিষয়ে বিভিন্ন আদালতের রায়েও সামঞ্জস্য হইতেছিল না। বিহার হাইকোর্ট জমিদারী উচ্ছেদ আইন অধিকার-বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করিলেন; এলাহাবাদ হাইকোর্ট উহার বিপরীত বলিলেন। অবশ্য সুপ্রিম কোর্টে আপীলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইত, কিন্তু গবর্ন্মেণ্ট ততদূর অপেক্ষাই করিলেন না। রাষ্ট্রবিধির খসড়া যাঁহারা করিয়াছেন, যাঁহারা উহা পাস করিয়াছেন এবং যাঁহারা উহা কার্য্যকরী করিতেছেন এই তিন দলে সামঞ্জস্যের অভাবে রাষ্ট্রবিধির এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। উহার শ্রেষ্ঠ অংশটিকে দেড় বৎসরের মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া দিতে হইয়াছে। ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সামাজিক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার ঊর্দ্ধে স্থান দেওয়া যেমন খারাপ, উহা বাতিল করিয়া দেওয়া তদপেক্ষা সেইরূপ অযৌক্তিক, অন্যায় এবং বিপজ্জনক। হাইকোর্টের অতিরিক্ত চুলচেরা যুক্তিতর্কই ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব্ব হওয়ার জন্য অনেকখানি দায়ী ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সাংবাদিক মোড়লগণ শেষমুহূর্ত্তে কিছু আপত্তি করিয়াছেন কিন্তু প্রথমে দৃঢ়তা দেখাইতে পারেন নাই। পার্লামেণ্টে সাংবাদিক সদস্যদের আচরণে সাংবাদিক জগতের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই। ইঁহারা মুখে আপত্তি করিয়াছেন, কিন্তু ভোটের সময় ইহার পক্ষে ভোট দিয়া এবং কেহ কেহ নিরপেক্ষ থাকিয়া প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে বিল সমর্থনই করিয়াছেন।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সম্পর্কে যে সকল যুক্তি প্রযোজ্য, মূলতঃ সংবাদপত্র সম্পর্কেও তাহা সমীচীন। যে সংবাদপত্রে দায়িত্বজ্ঞানের অভাব বা সততার অভাব দেখা যাইবে তাহারও সাতখুন মাপ হইবে ইহা ন্যায়সঙ্গত নয়। অন্যায় বা অনাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও কঠোর সমালোচনার স্বাধীনতা সংবাদপত্রের থাকা প্রয়োজন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই অধিকারের অপব্যবহারের স্বাধীনতা থাকা উচিত একথা কি রূপে গ্রাহ্য হয়? তবে অপব্যবহার হইয়াছে কিনা তাহা বিচারের প্রধান অধিকার থাকা উচিত সাংবাদিকমণ্ডলীরই।

মানভূম সত্যাগ্রহে বিহারী দমননীতি

মানভূম সত্যাগ্রহের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্য্যায় উত্তীর্ণ হইয়া এখন তৃতীয় পর্য্যায় চলিতেছে। চাষীরা এখন ধান বপনের কাজে ব্যস্ত থাকিবে বলিয়া সত্যাগ্রহের তৃতীয় পর্য্যায়ের কার্য্যক্রমের মধ্যে কেবলমাত্র গঠনমূলক কর্ম্মতালিকা গৃহীত হইয়াছে। সত্যাগ্রহের প্রথম পর্য্যায়কে বিহার সরকার উপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে উহার পিছ

জনসমর্থন নাই। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে জনসাধারণকে বিপুলভাবে সাড়া দিতে দেখিয়া তাঁহারা চিন্তান্বিত হন। সত্যাগ্রহকে অস্বীকার করা আর সম্ভব নহে দেখিয়া তাঁহারা উহা ভাঙ্গিবার জন্ম যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করেন ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট তাহাদের চূড়ান্ত অত্যাচারের দিনেও সেরূপ কল্পনা করে নাই। খাদ্য সংগ্রহে ও নিয়ন্ত্রণে বিহার গবর্ন্মেণ্টের দুর্নীতি ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ করিয়াও তাঁহারা কোন প্রতিকার পান নাই এবং শেষ অস্ত্র হিসাবেই তাঁহারা সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছেন। সত্যাগ্রহ ভাঙিবার জন্ম ভাড়াটিয়া গুণ্ডা এবং সাদা পোশাক পরিহিত পুলিস লাগানো হইয়াছে; সত্যাগ্রহীদিগকে আইন অমান্তের অভিযোগে গ্রেপ্তার না করিয়া চুরি, দাঙ্গা প্রভৃতির মিথ্যা মামলা সাজাইয়া জেলে দেওয়া হইতেছে। তাঁহারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবেন না এই সুযোগ লইয়া এই সমস্ত অভিযোগ আনা হইতেছে।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ বিহার গবর্ন্মেণ্টের আচরণ সম্বন্ধে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন:

"মানভূম জেলার সদর সাব ডিভিসনে বিহার সরকার কর্তৃক অনুসৃত শোচনীয় এবং ক্ষতিকর খাদ্যনীতির এবং সরকারের লেভী ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণ আদেশের বিরুদ্ধে আমাদের সত্যাগ্রহ জনসমর্থনে অগ্রসর হইতেছে। আমাদের আন্দোলনে জনসাধারণের সমর্থন আছে কি না তাহা প্রকাশ্যভাবে প্রতিপন্ন করিবার জন্ম খাদ্যনিয়ন্ত্রণ আদেশের বিধান লঙ্ঘন করার সঙ্গে সঙ্গে সদর মানভূমের স্থানে স্থানে জনসভার অনুষ্ঠান করা, এবং ঐ সব সভায় উপস্থিত হইয়া এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের জন্ম মন্ত্রিগণকে ঐ সব সভায় উপস্থিত হইতে নিমন্ত্রণ করা—আমরা আবশ্যক মনে করি। তদনুসারে আমরা পুরুলিয়া, বান্দা এবং বালদায় জনসভা করি এবং মন্ত্রীদিগকে ঐ সব সভায় উপস্থিত হইতে নিমন্ত্রণ করি। এই সব সভা কোথাও পাঁচ কোথাও দশ হাজার লোকের সমাবেশে অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করে যে আমাদের আন্দোলনে জনগণের পূর্ণ আন্তরিক সমর্থন রহিয়াছে এবং জনগণের অভিমত সরকারের খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে। মন্ত্রীদের কেহই এই সব সভার কোনো একটিতেও উপস্থিত হওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই। ২২শে এপ্রিল আমাদের বালদা সভা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ এক সম্পূর্ণ নূতন এবং হাস্যকর চাল চালিয়াছেন। এস-ডি-ও এবং কতকগুলি উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ পুলিস কর্ম্মচারী একটি রিজার্ভ পুলিস বাহিনী সহ সভার কাছে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা নিজেদের ৩০।৪০ জনের অনধিক লোকের দ্বারা একটি বিরুদ্ধ সভার অভিনয় অনুষ্ঠান করাইয়াছিলেন আমাদের সভার ঠিক পাশেই। এই লোকগুলি চীৎকার করিয়া ও আমাদিগকে গালি দিয়া আমাদের সভার কাজ পণ্ড করিবার চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ পরে জনৈক পুলিস কর্ম্মচারী আসিয়া এই সভাকে বেআইনী ঘোষণা করিয়া শ্রোতাগণকে চলিয়া যাইতে বলেন। ৫ মিনিট পরে আবার একজন পুলিস কর্ম্মচারী আসিয়া ২ মিনিটের মধ্যে সভা ছাড়িয়া যাইতে বলেন এবং এক বা দুই মিনিট পরেই কুৎসিত জঘন্য ভাষায় গালি দিয়া ও মারো মারো চীৎকার করিয়া শ্রোতাদের উপর লাঠি চালাইতে আরম্ভ করে। আমাদের কর্ম্মীরা মধ্যে পড়িয়া লাঠির আঘাত খায়। প্রায় ৩০ জন অল্পবিস্তর জখম হয়। তৎপরে পুলিস আমাদের লোকসেবক সঙ্ঘের তিন জন সচিবকে, দুই জন ভূতপূর্ব্ব এম-এল-একে, যাঁহারা সম্প্রতি বিহার এসেম্বলীর সদস্তপদ হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন এবং দুই জন কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকালে পুলিস উহাদিগকে খুব জোরে টানা হেঁচড়া করে, ধাক্কা দেয় এবং উহাদের কয়েকজনকে ঘুঁসি মারে। উহাদের একজনের জনৈক কনেষ্টবলের বন্দুকের গুঁতাও লাগিয়াছে। ঐ রাত্রিতেই উহাদিগকে পুরুলিয়া জেলে আনা হয়। পুলিস উহাদের উপর দাঙ্গা ও চুরির চার্জ্জ আনিয়াছে।"

সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে পাল্টা সভা করিবার জন্ম ২৫শে এপ্রিল অর্থসচিব শ্রীঅনুগ্রহনারায়ণ সিংহ এবং রাজস্বসচিব শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় মানভূমে উপস্থিত হন। সভাক্ষেত্রেই মন্ত্রী মহাশয়দের জিজ্ঞাসা করা হয় যে, লোকসেবক সঙ্ঘের বিশিষ্ট কর্ম্মীদের তাঁহারা নিজেরাই নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদী বলিয়া জানেন, তবু কেন তাঁহাদিগকে চুরি ও দাঙ্গার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহার উত্তর মন্ত্রীরা দিলেন না, দিল তাঁহাদের সঙ্গের পুলিস। "মুক্তি" পত্রিকায় প্রকাশ—মন্ত্রীদের চক্ষের সম্মুখেই পুলিস ও সরকারী কর্ম্মচারিগণ শ্রীঅলক চৌধুরী ও সুকোমল দত্তকে মঞ্চ হইতে টানিয়া নামান। তিন চার জন পুলিস ঘিরিয়া লাঠি ও বন্দুকের কুঁদা দিয়া তাঁহাদিগকে মারিতে থাকে। অপরদিকে সহকারী পাবলিসিটি অফিসার, হরিজন ওয়েলফেয়ার অফিসার, সাব-ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি নিজেরা মারপিট সুরু করেন এবং "শালা বাঙালীকো মরমে ঘুস্ ঘুস্‌কে মারো" এই ধ্বনির সঙ্গে পুলিসকে লাঠি চার্জ্জে উৎসাহিত করেন। মন্ত্রীরা পুলিস পরিবেষ্টিত হইয়া সভাস্থল ত্যাগ করিবার পর আরও নির্দ্দয় ভাবে লাঠি চার্জ্জ সুরু হয়। দুই জন অজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং কয়েকজন গুরুতর ভাবে আহত হন।

মানভূমের লোকসেবক সঙ্ঘ এবং উহার পরিচালক ও কর্ম্মীবৃন্দ প্রেসিডেণ্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও প্রধান মন্ত্রী জবাহরলাল নেহরুর অপরিচিত নহেন। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ নিজে প্রেসিডেণ্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহকর্ম্মী। স্বর্গত নিবারণচন্দ্র এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরই অনবদ্য জীবনের ও সাধু চরিত্রের প্রভাবে ইহার কর্ম্মীবৃন্দ প্রভাবান্বিত, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও পণ্ডিত নেহরু তাহা ভালভাবেই জানেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ দাসগুপ্ত, শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য লোকসেবক সঙ্ঘের সচিব। শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য আচার্য্য বিনোবা ভাবের পরিচালনাধীন সর্ব্বোদয় সমাজের সদস্য। শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসাগরচন্দ্র মাহাত আদর্শের সংঘাত হেতু এসেম্বলীর সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহাদের গ্রেপ্তার করিয়া রাত্রিতেই জেলে পাঠান হয়, জেলের ভিতরেই বিচার হয়, বিচারের সময় আত্মীয়-স্বজনকে উপস্থিত থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয় না। ব্রিটিশ আমলে সত্যাগ্রহীদের ব্যাপারে যাহা হইত শ্রীকৃষ্ণ সিংহের গবর্ন্মেণ্ট তাহারই ঘৃণ্য অনুকরণ করিয়াছে। প্রভেদ এইমাত্র যে, ইংরেজ গবর্ন্মেণ্ট আইন অমান্যকারীদের আইন অমান্যের অভিযোগেই গ্রেপ্তার করিতেন, স্বাধীন ভারতের কংগ্রেসী গবর্ন্মেণ্ট কপটভাবে তাহাদের দাঙ্গা ও চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করিতেছেন।

২রা মে শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষের নেতৃত্বে ৫০ জন সত্যাগ্রহীর একটি দল কাশীপুর থানায় পৌঁছায় এবং শোভাযাত্রা সহকারে থানার প্রধান রাস্তাগুলি পরিভ্রমণ করে। রাস্তার দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান জনতা সত্যাগ্রহীদের অভ্যর্থনা জানায়। সত্যাগ্রহীগণ শোভাযাত্রার পর বাজারের মধ্যস্থলে হরিমন্দিরে উপস্থিত হন। পূর্ব্ব হইতেই একদল ভাড়াটিয়া গুণ্ডা এক কংগ্রেসকর্ম্মীর নেতৃত্বে ট্রাকে চড়িয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হয়। সত্যাগ্রহীগণ ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেই গুণ্ডার দল সমস্ত প্রচারপত্র সত্যাগ্রহীদের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ উৎপাত করিতে ও সত্যাগ্রহীদের অকথ্য ভাষায় গালাগালি করিতে থাকে। সত্যাগ্রহীগণ হরিমন্দিরে বসিয়া চরখা কাটিতে থাকেন। স্থানীয় পুলিস দারোগা গুণ্ডাদের পিছনে নিষ্ক্রিয়ভাবে দণ্ডায়মান থাকে। এদিকে সত্যাগ্রহীদের বক্তৃতা শুনিবার জন্য চতুর্দ্দিকের অপেক্ষমাণ সহস্র সহস্র জনতা ১০।১৫ জন গুণ্ডার ঐরূপ অপমানকর ব্যবহারে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে ও গুণ্ডাদের ঐরূপ আচরণের প্রতিবাদ জানায়। ইহাতে গুণ্ডাদল জনতার প্রতি ঢিল নিক্ষেপ করিতে থাকে। সত্যাগ্রহীগণ তখন যাহাতে কোনরূপ অশান্তি না হয় সেইজন্য জনতা ও গুণ্ডাদলের মাঝে আসিয়া দাঁড়ায়। নিক্ষিপ্ত ঢিলে দুই জন সত্যাগ্রহীর মাথা কাটিয়া যায় ও স্থানীয় হাই স্কুলের দুই-তিনটি ছাত্র গুণ্ডাদের দ্বারা প্রহৃত হয়। ইহাতে জনতা আরও উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং গুণ্ডাদলকে ঐ স্থান হইতে অপসারিত করিবার জন্য দাবী জানায়। গুণ্ডাদল ভয় পাইয়া পুলিসের পিছনে স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর দোকানে আশ্রয় লয়।

শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, শ্রীযুক্ত বসন্ত গোস্বামী ও অন্যান্য সত্যাগ্রহীগণ উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করেন ও সত্যাগ্রহের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া সমবেত জনতার সম্মুখে বক্তৃতা করেন।

৫ই মে শ্রীযুক্ত লাবণ্যপ্রভা ঘোষের নেতৃত্বে ৫০ জন সত্যাগ্রহীর একদল মণিহারা গ্রাম হইতে বিভিন্ন গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া সাতুড়ি থানায় উপস্থিত হন। পূর্ব্ব হইতেই থানা ওয়েলফেয়ার অফিসার, জেলা ওয়েলফেয়ার অফিসার, দারোগা প্রভৃতি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সত্যাগ্রহের স্থানে যাহাতে কেহ না আসে তজ্জন্য ভয় দেখাইয়া বেড়ান। ট্রাকে করিয়া দশরথ পাণীর নেতৃত্বে একদল গুণ্ডা সত্যাগ্রহীদের আগমনের পূর্ব্ব হইতেই থানার নিকট মজুত করিয়া রাখা হয়। স্থানীয় হরিজনদের ভিতরও কয়েকজনকে মদ খাওয়াইয়া সত্যাগ্রহী দলের বিরুদ্ধে লাগানো হয়। সত্যাগ্রহীরা শোভাযাত্রা সহকারে গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইলেই ঐ সব গুণ্ডা সত্যাগ্রহীদের সামনে দাঁড়াইয়া চেঁচাইতে থাকে। সরকারী অফিসাররা উহাদের নেতৃত্ব করিতে থাকেন। শ্রীযুক্তা ঘোষ সমস্ত তুচ্ছ করিয়া ৫০ জন সত্যাগ্রহী সহ ধ্বনি দিতে দিতে গ্রামের ভিতরে সত্যাগ্রহের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া উপস্থিত হন। জনতা সত্যাগ্রহীদের বক্তৃতা শুনিবার জন্য চতুর্দ্দিকে সমবেত হয়। কিন্তু এক দিকে গুণ্ডার দল সাদা পোশাকে উপস্থিত সিপাহী ও অফিসারদের প্ররোচনায় চেঁচাইতে থাকায় বক্তৃতা দেওয়া সম্ভব হয় না। উপস্থিত দারোগা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। যখন শ্রীযুক্তা ঘোষ ও স্বর্গত নিবারণচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র চিত্তভূষণ চরখা কাটিতে থাকেন তখন গুণ্ডাদলের ভিতর হইতেই সাদা পোশাক পরিহিত একজন সিপাহী একটি খুব বড় প্রস্তরখণ্ড চিত্তবাবুকে লক্ষ্য করিয়া জোরে ছুড়িয়া মারে ও তৎক্ষণাৎ প্রস্তরখণ্ডটির আঘাতে চিত্তভূষণের মাথা হইতে রক্তপাত আরম্ভ হয়। ইহাতে গুণ্ডাদলও কিছুক্ষণের জন্য থমকাইয়া যায়। সভাও কিছুক্ষণের জন্য শান্ত আকার ধারণ করে। চিত্তভূষণ তখন দাঁড়াইয়া সমবেত জনতাকে উত্তেজিত না হইবার জন্য অনুরোধ করেন এবং সত্যাগ্রহের তাৎপর্য্য বুঝাইতে আরম্ভ করেন।

শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ গবর্ন্মেণ্ট কর্ম্মচারীদের আচরণ সম্বন্ধে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—"২রা হইতে ৫ই মে কাশীপুর এবং সাস্তরী অঞ্চলে আমি সত্যাগ্রহ পরিচালনা করি। ৭ই মে নিটুরীয়ায় সত্যাগ্রহ হইবে স্থির হয়। কিন্তু কাশীপুর ও সাস্তরীতে পুলিসের আচরণ দেখিয়া আমাদের আশঙ্কা হয় যে নিটুরীয়ায় পুলিস গুণ্ডা পাঠাইয়া আবার গোলমাল বাধাইতে পারে। এজন্য আমরা নিটুরীয়ায় সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখা স্থির করি এবং আমাদের এই সিদ্ধান্ত জানাইবার উদ্দেশ্যে কয়েকজন সহকর্ম্মীসহ ৭ই মে নিটুরীয়ায় যাই। সেখানে আমরা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া গ্রামের এক বাড়ীতে জল পানের জন্য যাই। একজন চৌকিদার আমাদের অনুসরণ করিতেছিল। সে ঐ বাড়ীর লোককে আমাদের জল দিতে নিষেধ করে। যদিও কয়েকজন স্ত্রীলোক আমাদের জল দিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু ঐ বাড়ীর লোকটি ভীত হইয়া পড়িয়াছে

দেখিয়া আমরা জলপান না করিয়া মধুকুণ্ড রেল ষ্টেশনের দিকে যাই। পথে তামুরিয়া গ্রামে এক জন দোকানীর নিকট জল চাই। আমরা যে সত্যাগ্রহী এবং আমাদের জল দিলে তাহার বিপদ ঘটিতে পারে ইহা শুনিয়াও সে আমাদের জল দেয়। দোকানী বলে—তৃষ্ণার্ত্তকে জল দেওয়া আমার ধর্ম্ম। আমাকে জেলে দেয় দিবে, আমি ভয় করি না। আমরা সেখানে একটু বিশ্রাম করিতেছিলাম। এই সময়ে কয়েকজন পঞ্জাবীকে লইয়া এক দল পুলিস জীপে আসিয়া নিকটে নামে। গবর্মেণ্টের স্থানীয় রেশন দোকানের মালিক খের সিংহের একজন আত্মীয় ঐ দলে ছিল। ইহারা আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়ায়, খের সিংহের আত্মীয় আমাদের বলে—"চলিয়ে, চলিয়ে, হিঁয়াসে জলদী উঠিয়ে।" আমরা বলি যখন প্রয়োজন মনে করিব তখনই আমরা উঠিব। সে বাধা দিয়া বলে—"নেহি, নেহি, আপলোককো হিঁয়াসে যানা পড়েগা। হাম আপলোগকো হিঁয়া বৈঠনে নেহি দেঙ্গে। হামলোককো গবর্মেণ্টসে হুকুম হায় কৈ বাহারকা আদমী গাঁওমে আনেছে উনলোগকো রহনে নেহি দেনা।" আমি তাহাকে প্রশ্ন করি—বাহিরের লোক কে?—তুমি না আমরা। ইহাতে পঞ্জাবীটি চিৎকার করিয়া বলে—এই গ্রাম আমাদের, আমরা তোমাদের থাকিতে দিব না। পঞ্জাবীরা দোকানীদের ভয় দেখায়। তাহার বিপদ হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া আমরা ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হই। পঞ্জাবীরাও আমাদের অনুসরণ করে। পথে তাহাদের কথাবার্ত্তায় জানিতে পাই যে ইহারা আসানসোলের লোক। বিহারী কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে তাহাদের ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছে।"

মানভূম সত্যাগ্রহের ব্যাপারে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য হইলাম সংবাদপত্রসমূহের ব্যবহারে। এত বড় অমানুষিক অত্যাচার একটি জেলার জনসাধারণের উপর অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াও ইঁহারা কি করিয়া নির্ব্বিকার রহিয়াছেন আমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম। দুই-একটি পত্রিকায় দুই-একবার বিবৃতি ছাপিলে ও মন্তব্য করিলে কর্ত্তব্য শেষ হয় না; বিহার সরকার কর্ত্তৃক মানভূমের বাঙালীদের উপর এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দিনের পর দিন উপযুক্ত ভাবে সংবাদ প্রকাশ ও মন্তব্যের দ্বারা তাঁহারা উহা নিবারণে সাহায্য করিতে পারিতেন। বাঙালী সংবাদপত্রগুলি যদি বিহারে কয়েক কপি বিক্রয় কমিবার ভয়ে বঙ্গের বাহিরে বাঙালীদের উপর অত্যাচার সহ্য করিয়া যান তবে তাহাকে আর যাহাই বলা যাউক, সাংবাদিকতা বলা যায় না ইহা নিঃসন্দেহ।

পুলিস

পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল এবং কলিকাতা পুলিসের অস্থায়ী কমিশনার সাধারণ পোশাকে বিভিন্ন থানা ভ্রমণ করিতেছেন এবং ইহার ফলে অনেক অফিসার সাসপেণ্ড হইয়াছেন বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের উপর উপরওয়ালারা এইভাবে দৃষ্টি রাখিলে কাজ ভাল হইবে এবং তাহারা সতর্ক হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রকার পরিদর্শনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যতটা সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আমরা বিশেষ আশান্বিত হইতে পারিতেছি না। ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল পুলিসে কায়েমী স্বার্থের ঘাঁটি আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া বলিতেছেন এবং কলিকাতার পুলিস কমিশনার কর্ম্মচারীদের ইউনিফর্ম্ম না পরার উপর ঝোঁক দিতেছেন। একজন সাব-ইন্‌স্পেক্টর পায়ে ফোড়ার জন্য ইউনিফর্ম্ম পরিতে পারে নাই বলিয়া তাহাকে এ-এস-আই পদে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইউনিফর্ম্ম পরা অবশ্যই উচিত; উহার সম্বন্ধে সতর্ক করিবার জন্য যেখানে জরিমানা এবং কঠোর তিরস্কার যথেষ্ট সেখানে একটি স্বল্পবিত্ত পরিবারের আয় অর্দ্ধেক করিয়া দেওয়া অত্যধিক শাস্তি বলিয়া মনে হয়। শাস্তি অত্যধিক হইলে উহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় কর্ত্তৃপক্ষের এ কথাটা ভুলা উচিত নয়, তবে যদি এ শাস্তি সাময়িক হয় এবং কর্ম্মচারী সজাগ হইলে উন্নতি হয় তবে অন্য কথা। কিছুদিন যাবৎ বেঙ্গল পুলিসে হাওড়া, হুগলী এবং ২৪-পরগণা জেলায় সাসপেন্সনের এবং ডিগ্রেডের হিড়িক পড়িয়াছে বলিয়া আমরা রিপোর্ট পাইতেছি। এই সমস্ত সাসপেন্সনে পুলিসের নৈতিক মান এবং কর্ত্তব্যবোধের উন্নতি অপেক্ষা পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদের খামখেয়ালী ও স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয়ই যেন বেশী এইরূপ কথাও আমরা শুনিতে পাই, ইহার সত্যাসত্য নির্ণয় প্রয়োজন। "দৈনিক বসুমতী"তে এইরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত বাহির হইয়াছে। যে পুলিস কর্ম্মচারীকে ডাক্তার ছুটি দিয়াছেন তাঁহাকে অসুখের ভান করার অভিযোগে ডিগ্রেড করা হইয়াছে এবং সাসপেণ্ড করিয়া ডিসমিস করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ২৪-পরগণার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সম্বন্ধে আরও গুরুতর অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি একজন কেরাণীকে আপিস হইতে আরদালী দিয়া বলপ্রয়োগে বাহির করিয়া দিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে অন্য সমস্ত অফিসারও বাহির হইয়া গিয়াছেন। আই-জি ন্যায় বিচারের আশ্বাস দেওয়ায় তাঁহারা কাজে ফিরিয়া যান কিন্তু ন্যায় বিচার না করিয়া কেরাণীটিকে অন্য আপিসে বদলী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে গোলমাল আপাততঃ চাপা পড়িল বটে, কিন্তু অসন্তোষের বীজ রহিয়া গেল ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। পুলিসে টীম ওয়ার্ক এত বেশী দরকার যে ইহাতে কাহারও প্রতি সামান্যমাত্র অবিচার হইলেও তাহাতে শৃঙ্খলাবোধ আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ন্যায় বিচার এমন হওয়া চাই যাহাতে প্রত্যেকে উহাকে ন্যায় বিচার বলিয়া প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝিতে পারে। ন্যায় বিচার কষ্ট করিয়া আইনের প্যাঁচ দিয়া বুঝিতে হইলে উহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায় ইহা আমরা

ধহবার বলিয়া আসিতেছি। আদালতের রায়ে এবং বিভাগীয় কর্তাদের কাজে ইহার ব্যতিক্রম হইলে সমান ক্ষতি হয়।

ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং পুলিস কমিশনারের সাধারণ পোশাকে পরিদর্শনের ফল খুব ভাল হইবে যদি খুঁত ধরার প্রতি সীমাবদ্ধ না থাকিয়া কাজের উন্নতির প্রতি তাঁহাদের বেশী লক্ষ্য থাকে। পুলিসের খরচ প্রতি বৎসর কোটি টাকার হিসাবে বাড়াইয়াও কেন উহার দক্ষতা বাড়িতেছে না, যেটুকু দক্ষতা ছিল তাহা ক্রমেই কেন লোপ পাইতেছে তাহার উপায় আবিষ্কার করা তাঁহাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য। অনুপযুক্ত লোককে কঠিন কাজের ভার দেওয়া, ব্যক্তিগত প্রিয় অপ্রিয় হিসাবে অফিসার পোষ্টিং করা এবং প্রমোশন দেওয়া, উপর-ওয়ালাদের মনোরঞ্জনে অসমর্থ কর্তব্যপরায়ণ অফিসারদের ক্ষতি করা প্রভৃতি পুলিসে এত বেশী চালু হইয়াছে যে, এই সমস্ত অন্যায়ের প্রতিকার না হইলে পুলিসের মনোবল কিছুতেই বাড়িতে পারে না। আমরা বার বার এই কথা লিখিয়াছি এবং পুলিস বিভাগে ভাল অফিসারদের অন্যায় লাঞ্ছনা কি ভাবে চলিতেছে তাহা বার বার দেখাইয়াছি। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম সম্বন্ধে আমরা যাহা লিখিয়াছি তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে। কিন্তু তবুও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এ দিকে নিবদ্ধ হয় নাই। নিম্নপদস্থ পুলিস কর্মচারীদের বেতনের পরিমাণ এত কম যে, সাধারণ ভাবেই তাহাদের পক্ষে উৎকোচের লোভ সংবরণ করা দুঃসাধ্য। তাহার উপর যদি তাহারা শুনে যে একজন উচ্চতম অধিকারী হাজার টাকা দামের সরকারী ঘোড়া তাঁর প্রিয় পাত্রীকে এক শত টাকায় বেচিয়া দিতেছেন তবে তাহাদের নৈতিক অধঃপতন কোন্ অতলে নামিয়া যাইবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। বর্তমান অস্থায়ী কমিশনার যখন হেডকোয়ার্টার্সের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন তখন লালবাজার ট্রান্সপোর্টের অফিসার-ইন্-চার্জ্জ পদ হইতে হিমাংশু গুপ্তকে সরাইয়া তাঁহার নিজের লোক আনিয়া বসাইয়াছিলেন। হিমাংশু গুপ্ত লালবাজার ট্রান্সপোর্টকে অতি বিশৃঙ্খল অবস্থা হইতে একেবারে কার্য্যকর অবস্থায় আনিয়াছিলেন, অনেক অনাবশ্যক খরচ কমাইয়াছিলেন, পেট্রল, টায়ার প্রভৃতি সম্বন্ধে অত্যন্ত কড়া হইয়াছিলেন এবং গাড়ী মেরামতের নামে যে বিরাট ছিদ্রটি ছিল তাহা বুজাইয়া দিয়াছিলেন। সেদিনকার হেড কোয়ার্টার্সের যে ডেপুটি কমিশনার তাহা সহ্য করিতে পারেন নাই তিনি কি আজ আশা করেন যে কর্মচারীদের শুধু পোশাক দুরস্ত করিয়া কলিকাতা পুলিসের উন্নতি সাধন করিবেন?

ইন্সপেক্টর জেনারেল সুকুমার গুপ্ত বেঙ্গল পুলিসের উন্নতির জন্য খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন, ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়াও যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছিলেন ইহা আমরা জানি। পুলিসের অনাবশ্যক পাগড়ীর বদলে টুপির ব্যবস্থা করিয়া তিনি বহু লক্ষ টাকা বাঁচাইয়াও দিয়াছেন। বর্তমান আই-জি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক; তিনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছেন। কলিকাতা পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনার রূপে ক্রিমিন্যাল বিষয়ে তাঁহার প্রচুর অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার কাজে আমরা দক্ষতার পরিচয় পাইতেছি না কেন। তাঁহার নিকট দেশবাসী এবং আমরাও অনেক আশা করিয়াছিলাম। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলের গুরু দায়িত্বপূর্ণ পদ পাইয়াছিলেন। রাষ্ট্রধ্বংসী কাজ যাহারা করিতেছে তাহাদের অপরাধ নিবারণ যথাযথ ভাবে করিতে তিনি সমর্থ হন নাই। স্বাধীন দেশের পুলিস যদি ভাল হয় তবে দেশের সাধারণ আবহাওয়া অনেক পরিষ্কার হইয়া যায়। ইহার জন্য প্রয়োজন অকর্মণ্য প্রিয়পাত্র দূরীকরণ ও কর্মঠ লোক অপ্রিয় হইলেও তাহার পোষণ। পুলিসে ঘুষ আগেকার মতই চলিতেছে, তাহার প্রতিষেধ প্রয়োজন। কি ভাবে পুলিস ও গোয়েন্দা বিভাগকে পুনরায় সজাগ ও কর্মতৎপর করিতে হইবে সে বিষয়ে ইঁহারা চেষ্টিত হইয়াছেন ইহা আনন্দের কথা, কিন্তু সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইবে যদি ইঁহারা যোগ্য ও অযোগ্যের মধ্যে যথাযথ বিচার করিতে না পারেন। পুলিসে বাহিক discipline খুবই প্রয়োজন, কিন্তু সততা ও কর্মদক্ষতা ততোধিক প্রয়োজন।

পরীক্ষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণ কতকটা জুয়াখেলার পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এ বৎসর যতটা বিশৃঙ্খলা হইয়াছে ততটা আগেও হয় নাই। অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির পথেই চলিয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। প্রশ্নকর্তাদের সঙ্গে অধ্যাপকদের কোন যোগ না থাকার ফলে পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্র লইয়া হৈ চৈ হইয়াছে, পুনরায় পরীক্ষা লইতে হইয়াছে এবং গাদা গাদা ছেলেমেয়ে ফেল করিতেছে। প্রশ্ন ছাপায় ভুল এবং সিলেবাস-বহির্ভূত প্রশ্ন রচনা এবারকার বিশেষত্ব হইয়াছে। রসায়ন, অঙ্ক, বুক-কিপিং, হিন্দী প্রভৃতিতে প্রশ্নপত্রে ছাপার ভুলে পরীক্ষার্থীদের ক্ষতি হইয়াছে। বি-কম পরীক্ষায় অ্যাডভান্সড একাউন্টেন্সিতে অর্দ্ধেক প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছে Cost Accountancy হইতে। Cost Accountancy হইতে অর্দ্ধেক প্রশ্ন আসিবে এই কথাটি কলেজগুলিকে জানাইয়া দিলেই এই গোলমালটা হইত না। আই-এ বুক-কিপিং এ বি-কমের প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছে এবং যে অঙ্কটি ছেলেদের পারিবার কথা সেটিতে ছাপার ভুল থাকায় তাহারা গলদঘর্ম্ম হইয়াছে এবং আরও ঘাবড়াইয়া গিয়াছে। বি-এ বাংলার প্রশ্নপত্রে প্রশ্নকর্তাদের বাহাদুরী প্রকাশের ভাবটাই বেশী প্রকট ছিল; তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ঐ ষ্ট্যাণ্ডার্ডে নয়টি প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দেওয়া সম্ভব কি না তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা হয়

নাই। বি-এ বাংলার প্রশ্নে রচনা তিনটির মধ্যে প্রথমটির মত অভার প্রশ্ন খুব কম দেখা যায়। পদার্থ বিভার প্রথম পত্রে অভায় এবং ভুল প্রশ্ন করা হইয়াছে। এবারকার আর এক বিশেষত্ব হেড এগ্‌জামিনার কর্তৃক ভুল নির্দেশ। পদার্থ বিভার প্রশ্নে একটি খুব ভাল অঙ্ক দেওয়া হইয়াছিল, বুদ্ধিমান ছেলে না হইলে উহার উল্টা অর্থ করিবে। তিন শ'তে একটি ছেলে অঙ্কটি নির্ভুল করিয়াছে। হেড এগ্‌জামিনার অঙ্কটির ভুল উত্তরকে ঠিক বলিয়া পরীক্ষকদের নির্দেশ দিয়াছিলেন। আন্দোলনের ফলে উহা সংশোধিত হয়।

ইংরেজীর খাতা দেখায় হেড এগ্‌জামিনারেরা যাহা করিতেছেন তাহার ফলে বহু পরীক্ষার্থী ফেল করিতেছে। নির্দেশ-পত্রে এক স্থলে বলা হইয়াছে যে, আজকালকার পরিবর্তনশীল অবস্থা বুঝিয়া মোটামুটি ইংরেজী জ্ঞান দেখিলেই চলিবে, আবার উহারই আর এক স্থলে ব্যাকরণ এবং ইডিয়ম দেখিতে বলা হইতেছে। গত বৎসর ইণ্টারমিডিয়েটে শতকরা ৩০ এর মত পাস করিয়াছিল, এবার তার চেয়েও কম হইবে বলিয়া শোনা যাইতেছে। পরীক্ষায় গত বৎসর এত ফেল করিবার পর বিশ্ববিদ্যালয় কিরূপ উত্তর চান, কতদূর পর্য্যন্ত আই-এ ইংরেজীর ষ্ট্যাণ্ডার্ড ধরা হইবে সে বিষয়ে কলেজগুলিকে নির্দেশ দিলেন না কেন? কেন বলিলেন না যে এমন ভাবে পড়াইতে হইবে যাহাতে পাসের সংখ্যা ৭০.৮০-র কম না হয়? জুনিয়ার কেম্ব্রিজ, সিনিয়ার কেম্ব্রিজ বা লণ্ডন ম্যাট্রিক প্রভৃতিতে কয়টা ছেলে ফেল করে? কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের ষ্ট্যাণ্ডার্ড নীচু একথা বলিবার সাহস তো কাহারও নাই। পাস করানো বলিতে বেঞ্চি টেবিল পাসের যে ধারণা প্রচলিত আছে তাহা ভুল, গ্রেস দিয়া নম্বর বাড়ানোর পক্ষপাতী আমরা নহি। আমরা চাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নকর্ত্তা, পরীক্ষক এবং অধ্যাপক ও শিক্ষকদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকিবে। খাতা দেখিয়া পরীক্ষকেরা যে সমস্ত গলদ দেখিতে পাইবেন তাহা অধ্যাপকদের জানানো হইবে, প্রশ্নকর্ত্তারা প্রশ্ন রচনার সময় বিশিষ্ট অধ্যাপকদের সঙ্গে প্রশ্নের ধারা সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া লইবেন। শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে উপেক্ষা করিয়া পরীক্ষার মান কখনও উন্নত করা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষ কোন দিক দিয়াই যদি যোগ্যতা দেখাইতে না পারেন তবে তাঁহাদের পক্ষে সরিয়া যাওয়াই সম্মানজনক পন্থা। বিশ্ববিদ্যালয় এখন যেভাবে চলিতেছে তাহা আর কয়েক বৎসর চলিলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অসম্ভব ক্ষতিগ্রস্ত হইবে নিশ্চয়।

পরীক্ষকের আসনে দুই দলের লোক থাকেন, এক দল প্রশ্নরচয়িতা, অন্য দল উত্তর-পরীক্ষক। দ্বিতীয় দলের হাত-পা বাঁধা থাকে উচ্চতম কর্ত্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে। এরূপ হওয়া ঠিক নয়। প্রশ্নকর্ত্তা যাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে কাণ্ডজ্ঞান-বিহীন লোক গেলে সমস্ত পরীক্ষাই ব্যর্থ হইয়া যায়। অথচ এই শ্রেণীর লোক এবারও দেখিতেছি সর্ব্বক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছেন। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার মান কি এবং উদ্দেশ্য কি তাহা ভুলিয়া যদি নিজেদের কল্পিত পাণ্ডিত্য প্রদর্শনই প্রশ্নরচনার মূল উদ্দেশ্য ধরা হয় তবে পরীক্ষাকে লটারীর পর্য্যায়ে ফেলা হয়। এবারের পরীক্ষায় অনেক বিষয়ে তাহাই করা হইয়াছে।

"খাদ্য নাই, মিথ্যা কথা !"

এই কথাটাই শিলিগুড়ির "জনমত" পত্রিকার সাম্প্রতিক এক সংখ্যা জোর করিয়া উপরি-উক্ত শিরোনামায় বলিয়াছে। কুচবিহারের শোচনীয় ঘটনায় এই কথার মূল্য আছে, এবং তার যাচাই হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় এই তথ্য প্রণিধান করুন। সরকারী পরিসংখ্যানের উপর এই প্রবন্ধ নির্ভর করিতেছে:

"১৯৫১ সনের ১৫ই জানুয়ারী তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ যে ১৯৫০-৫১ সনে ৩০,৬০০ একর জমিতে আউস ধান্য রোপণ হইয়াছে। গত বৎসর ২৮,৮০০ একর জমিতে আউস ধান্য ছিল। সরকারী মতে ঐ গেজেটে লেখা আছে যে, একরে ৫ মণ করিয়া পরিষ্কার চাউল (clean rice) পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ এই জেলায় এ বৎসর আউস ধানের চাউল পাওয়া যাইবে ৩০,৬০০ × ৫ = ১,৫৩,০০০ মণ।

১৯৫০ সনের ১৬ই নবেম্বর কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ যে, ১৯৪৯-৫০ সনে ৪,০৮,৭০০ একর জমিতে আমন ধান্য রোপণ হইয়াছিল। মুসলমান কৃষক চলিয়া যাওয়ায় ও বন্যার জন্য ১৯৫০-৫১ সনে ৩,০৬,৫০০ একর জমিতে আমন ধান্য রোপণ হইয়াছে। অর্থাৎ মারামারি ও বন্যা বাবদ এক লক্ষ একর জমিতে ধান চাষ হইল না। হয়ত আগামী বৎসর চারি লক্ষ একর জমিতেই ধানচাষ সম্ভব হইবে। এগুলি সবই আবাদী জমি। বহু বৎসর এই জমিতে আবাদ হইয়া আসিতেছে। ঐ দিনের গেজেটে প্রকাশ যে এই ধান্য হইতে একর প্রতি ১১·২৫ মণ পরিষ্কার চাউল (clean rice) পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ এই জেলায় ১৯৫০-৫১ সনে আমন ধান্যের চাউল পাওয়া যাইবে ৩,০৬,৫০০ × ১১¼ অর্থাৎ প্রায় ৩৪ লক্ষ মণ। তাহা হইলে এই জেলায় ১৯৫০-৫১ সনে মোট চাউলের উৎপাদন ৩৫½ লক্ষ মণ। ইহা হইতে বাদ যাইবে বীজন বাবদ আউস ধান ত্রিশ হাজার মণ (একর প্রতি এক মণ হিসাবে) এবং আমন ধান এক লক্ষ মণ। অর্থাৎ এক লক্ষ ত্রিশ হাজার মণ ধানের চাউল। যা হউক, শুখাই, লোকসান, বীজন প্রভৃতি বাবদ দেড় লক্ষ মণ চাউলের ধান বাদ দিলে সোজা হিসাবে এই জেলায় ৩৪ লক্ষ মণ চাউল আহারের জন্য জন্মিয়াছে। এই জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির চরম কল্পনা করিয়া দশ লক্ষ ধরা হইল। ইহার মধ্যে এক-দশমাংশ অর্থাৎ এক লক্ষ অতি শিশু,

বালক ও দু'বেলা ভাত খায় না এরূপ লোক মিলিয়া। এই নয় লক্ষ লোককে সপ্তাহে সাড়ে তিন সের হিসাবে চাউল দিলে বৎসরে মাথাপিছু চার মণ চাউল আবশ্যক হয়। অর্থাৎ এই জেলার বাৎসরিক চাহিদা ৯ × ৪ = ৩৬ লক্ষ মণ চাউল। এই জেলার এই বৎসর এক লক্ষ একর জমি চাষ না হওয়াতেই এই অবস্থা। আমাদের প্রাপ্ত চাউল অন্য জেলা হইতে চা-শ্রমিক প্রভৃতি বাবদ ১৪ লক্ষ মণ (আই. টি. পি. এ. ও আই. টি. এ. হিসাব দ্রষ্টব্য)। তাহা হইলে আমাদের সমগ্র জনগণের চাহিদা ৩৬ লক্ষ মণ। আর আমরা পাই ৩৪ + ১৪ = ৪৮ লক্ষ মণ। তবে ঘাটতি কোথায় ?

১৯৪৯-৫০ সনে ৪,০৮,৭০০ একর জমিতে আমন ধান রোপণ হইয়াছিল। তাহাতে আমন ধান্য হইতে চাউল পাওয়া গিয়াছিল প্রায় ৪৬ লক্ষ মণ। আউস ধান্য ২৮,৮০০ একর জমিতে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাতে চাউল পাওয়া গিয়াছিল এক লক্ষ চল্লিশ হাজার মণ। মোট উৎপন্ন ৪৭২/১ লক্ষ মণ। বীজন ও লোকসান বাবদ ২২/১ লক্ষ মণ চাউলের ধান ধরিয়া দিলেও মোট উৎপন্ন ৪৫ লক্ষ মণ চাউল এবং অন্য জেলা হইতে ১২ লক্ষ মণ চাউল পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইলে মোট পাইয়াছি ৫৭ লক্ষ মণ চাউল। মোট চাহিদা ৩৬ লক্ষ মণ চাউল। বাড়্তি হইতেছে ২১ লক্ষ মণ চাউল। তবে ঘাটতি কোথায় ?"

পল্লী-উন্নয়নে স্বাবলম্বন

"হরিজন" পত্রিকায় শ্রীকৃষ্ণ জাজু তিরুমঙ্গল ফিরকা ডেভেলপমেণ্ট অফিসারের একটি বিবরণ সংক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে মাদ্রাজ মাদুরা জেলার আপ্পাকারাই গ্রামের উন্নয়ন কার্য্যের নানাবিধ সংবাদ আছে। নিকটের অন্যান্য গ্রামেও অল্প-বিস্তর তাহা চলিতেছে। ঐ অঞ্চলের কুমপট্টি আশ্রমের কর্ম্মিবৃন্দ অনেক দিন হইতে গঠনমূলক কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তার ফলে বর্ত্তমান জাগৃতি দেখা দিয়াছে, এই সিদ্ধান্তই জাজু মহাশয় করিয়াছেন। আমরা সম্পূর্ণ বিবরণটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। আপ্পাকারাই গ্রামের উদাহরণে বাঙালী গ্রামবাসী উৎসাহিত হউন। সৎকার্য্যে টাকার অভাব হয় না, তাহা নূতন করিয়া প্রমাণিত হইয়াছে :

"গ্রামের গৃহসংখ্যা প্রায় ১৫০, আর লোকসংখ্যা ৮০০। গ্রামবাসীরা নিজেদের খরচে সকল আনাচ-কানাচ সংযুক্ত করিয়া পাকা নর্দ্দমা তৈয়ারি করিয়াছে। স্থানীয় 'গ্রাম সেবা সংঘম্' এই নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাধা করে। ব্যয় সংকুলানের জন্য অর্থ সংগ্রহকালে প্রতি গৃহস্থের বাড়ীর সম্মুখে যত দীর্ঘ নালা বাঁধিতে হইয়াছে তদনুপাতে চাঁদা লওয়া হয়। যে সকল গরীব শ্রমিক গৃহস্থ এই চাঁদা দিতে অক্ষম, তাহাদের অংশ সাধারণের যৌথ অর্থভাণ্ডার হইতে দেওয়া হয়। প্রতি ফুট ড্রেন নির্ম্মাণের ব্যয় হিসাব করিয়া ২৮০ হইবে মনে হয়, কিন্তু গ্রামবাসীরা যখন কাজ সম্পন্ন করিল তখন দেখা গেল ১৮০ ব্যয়েই কাজ সারা হইয়াছে। ব্যক্তিগত চাঁদা আদায় করিয়া ২,৭০০ ফুট এবং সাধারণ তহবিল হইতে ৯৩০ ফুট ড্রেন নির্ম্মিত হইয়াছে। সামনে দিয়া পাকা ড্রেন যায় নাই গ্রামে এমন একটি বাড়ীও আর নাই।

১। এই নালা দিয়া ময়লা জল দুইটি বড় কুণ্ডে জমা হয়। কুণ্ডগুলি বিশেষভাবে পরিকল্পনা করিয়া নির্ম্মিত। সমস্ত ময়লা মাটির সঙ্গে মিশাইয়া সারে পরিণত করা হয়। একটি কুণ্ড ভর্ত্তি হইয়া গেলে অপরটি ব্যবহার করিতে হয়। এইরূপে একটির পর অপরটিতে কাজ চলিতে থাকে। কুণ্ডে যে সার তৈয়ারি হয় তাহা তুলিয়া নিলামে বিক্রয় করা হয়। যে টাকা পাওয়া যায় তাহা গ্রামের সাধারণ তহবিলে জমা হয়। এই সারের বেশ চাহিদা আছে। উহাতে শস্য ও শাকসব্জীর চাষ ভাল হয়। নালা নির্ম্মাণে গবর্ণমেণ্ট ৫০০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। বাকি সকল খরচ গ্রামবাসীরাই জোগাইয়াছে। ড্রেনগুলি নির্ম্মাণ করিতে হিসাবমত ৪,৫০০৲ টাকা খরচ পড়িয়াছে।

নালা তৈয়ারির জন্য যে বিশেষজ্ঞের সাহায্য প্রয়োজন হয় তাহা ডেভেলপমেণ্ট বিভাগ দিয়াছেন। গ্রামে একটি 'সাফাই' দল গঠিত হইয়াছে। ইঁহারা সপ্তাহে এক দিন সমস্ত গ্রামের রাস্তা সাফ করিবেন। নূতন পরিকল্পনামত এই সাফাই দল প্রাতঃকালে গ্রামের পরিচ্ছন্নতা সাধনের কাজ শেষ করিবেন এবং সন্ধ্যায় প্রার্থনা ও ভজন গান পরিচালনা করিবেন। সকালে যে স্থান পরিষ্কার করা হইয়াছে সেই স্থানে সন্ধ্যায় প্রার্থনা-সভা বসিবে। গ্রামের এই ভজন সংঘমগুলি বেশ জনপ্রিয় হইতেছে।

২। গ্রাম বেষ্টন করিয়া গোযানের উপযোগী একটি রাস্তা গ্রামবাসীরা নিজেদের খরচায় নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। উহাতে যাতায়াতের সুবিধা এবং মাঠে গোযান লইয়া যাওয়া সম্ভবপর হইবে।

এই রাস্তাটি নির্ম্মাণ করিবার জন্য এই ব্যবস্থা হইয়াছে যে, কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক গোযানের মালিক সপ্তাহে এক দিন বিনা ভাড়ায় গাড়ী দিবে এবং প্রত্যেক গৃহস্থ প্রতি সপ্তাহে এক দিন বিনা বেতনে শ্রম দিবে। এই রাস্তা নির্ম্মাণ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। গ্রামের এই রাস্তা নির্ম্মাণ ছাড়া গ্রামের সকল অস্বাস্থ্যকর গর্ত্ত ও ডোবা বুজাইয়া দেওয়া হইতেছে এবং রাস্তা গাড়ী গাড়ী মাটি দিয়া উঁচু করা হইতেছে।

৩। গ্রামে জেলা-বোর্ড পরিচালিত একটি স্কুল হইয়াছে। স্কুলটিকে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার জন্য গ্রামবাসীরা ২ একর জমি দান করিয়াছে এবং বাড়ী তৈয়ারির জন্য ২,০০০৲ টাকা দিয়াছে।

৪। গ্রামবাসীদের সুতা কাটায়ও বেশ উৎসাহ হইয়াছে। প্রায় ৭০টি চরকা চলিতেছে। মেয়েরা আর ছোট ছেলেরা নিয়মিত চরকা কাটে। গ্রামেই তাঁতে এই সুতার কাপড় বুনাইবার চেষ্টা হইতেছে।

৫। একটি পঞ্চায়েৎ বোর্ড এবং একটি বিবিধ সমবায় সমিতি সৃষ্টি হইয়াছে।

৬। বয়স্কদের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় হইয়াছে।

৭। মাতৃসদন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি গৃহ নির্ম্মাণ করা হইতেছে।

৮। এই ফিরকার মধ্যে এই গ্রামখানি হরিজন উন্নয়ন কর্ম্মে সবচেয়ে বেশি অগ্রণী হইয়াছে।

৯। ওয়ার্দ্ধা পদ্ধতির কয়েকটি পায়খানা এই গ্রামে ব্যবহৃত হইতেছে। ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অপর এক নূতন ধরণের পায়খানা তৈয়ারি আরম্ভ হইয়াছে।

১০। উপরি-উক্ত বিবিধ কর্ম্মপ্রচেষ্টা ছাড়া গ্রাম্য সংস্কৃতির আচার অনুষ্ঠানের দিকে খুব নজর দেওয়া হইয়াছে। পাঠগৃহ স্থাপন ও রেডিও শোনার ব্যবস্থা হইয়াছে।"

পশ্চিম বাংলা সরকারের কয়েকটি সংখ্যাতত্ত্ব (১৯৪৯-৫০)

[পশ্চিম বাংলা সরকারের কর্ম্মচারীদের বেতনের পরিমাণ ৬,৭৯,৪১,৪০০৲ টাকা, তা ছাড়া আরও ৩,৯০,৩৫,৩০০৲ টাকা ভাতার ব্যয় আছে। মাগ্‌গী ভাতা, ভ্রমণ ভাতা, বিশেষ ভাতা ইত্যাদি নানারূপ সরকারী ভাতা আছে এবং এই ভাতার পরিমাণ বেতনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ।]

কয়েকটি প্রধান প্রধান বিভাগের মাহিনা ও ভাতার পরিমাণ : গুণ (?) অনুসারে

বিভাগ	বেতন	ভাতা
জেলা পুলিশ	১,১৪,৪৪,৪০০	৮৪,৯৭,৯০০
কলিকাতা পুলিশ	৭৪,৭৯,৮০০	৪৯,৯১,৫০০
জেল	১৩,২৭,৪০০	৮,২৫,৬০০
সি. আই. ডি. পুলিশ	৭,৬০,১০০	৬,৫৬,০০০
রেলওয়ে পুলিশ	৫,৯৬,৫০০	৩,৩৪,০০০
স্পেশাল পুলিশ	২,৩৬,৯০০	৩,০৬,৫০০
মোট পুলিশ	২,১৮,৪৫,১০০	১,৫৩,১১,৫০০
সিভিল সাপ্লাই	১,৫৯,৪১,৭০০	৮২,১৯,৭০০
মেডিক্যাল হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য	৪০,৭৩,৮০০	২৬,৪২,৮০০
জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বিভাগ	৩৬,৩০,৩০০	২০,০৩,০০০
শিক্ষা বিভাগ	৩১,৫৩,৭০০	১১,৬৩,৬০০
সেক্রেটারিয়েট	২৯,৬০,২০০	১১,৯৭,৮০০
মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট	৬,৬০,০০০	৫,২৭,০০০

এখন মোটামুটি বিভাগ অনুসারে শতকরা পরিমাণ দাঁড়ায় :

পুলিশ	৩২ জন	সিভিল সাপ্লাই	২৭ জন
জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা	৭ "	জেলা শাসন	৬ "
শিক্ষা	৫ "	সেক্রেটারিয়েট	৪½"
মহকুমা শাসন প্রায়	১ "	অন্যান্য	১৮ "

এক বৎসরের পুরাতন হইলেও "যুগবাণী" পত্রিকা হইতে এই হিসাবটি তুলিয়া দিলাম। পশ্চিমবঙ্গের কর্ম্মাধিকরণের (bureaucracy) ব্যয়ের বহর কমে নাই, ইহা আমরা দেখিতেছি। প্রতিবাদ করিয়া এক বৎসরে কোন ফল পাওয়া যায় নাই। এই অপব্যয় ও অপচয়ের নানা ফন্দি আছে। বদলী হওয়া, যাওয়া-আসার নানাবিধ ব্যয় আদায় করা, পরিবার এক জায়গায় কর্ম্মচারী অন্ত জায়গায় এই অজুহাতে কর্ম্মচারীটির ভ্রমণের রকমফের করা—এই দুইটি এই কৌশলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কলিকাতার পাক্ষিক "খাদ্য উৎপাদন" পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল :

"কৃষিবিভাগে কর্ম্মচারী বদলী :

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী ও ১৯শে ফেব্রুয়ারীর 'হরিজন' পত্রিকায় সরকারী বিভাগগুলিতে ব্যয় সঙ্কোচ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ প্রবন্ধে প্রধানতঃ বোম্বাই প্রদেশের কর্ম্মচারিগণের ঘন ঘন বদলীর উদাহরণ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু প্রবন্ধটি সকল প্রদেশের কর্তৃপক্ষগণের পাঠ করা উচিত। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের কয়েকজন কর্ম্মচারীর বদলীর পশ্চাতে যেন একটা রহস্য রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। ৭ মাস অবস্থানের পর একজন কর্ম্মচারীকে অন্ত স্থানে বদলী করা হইয়াছে। এক বৎসর অবস্থানের পর অপর কর্ম্মচারীকে অন্তস্থানে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তৃতীয় জন এক স্থানে ৪ মাস অবস্থানের পর অন্যত্র বদলী হইয়াছেন। অপর একজনকে এক বৎসর পূর্ব্বে এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে বদলী করা হইয়াছিল, সম্প্রতি তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্বের স্থানে বদলী করা হইয়াছে।

শুনা যায় মার্চ্চ মাসের শেষাশেষি ইঁহাদের বদলী করা হইয়াছে, অথচ সরকারী কর্ম্মচারিগণের পক্ষে হিসাব-নিকাশের ও কার্য্য-সম্পাদনের জন্ত এই মাস অতি প্রয়োজনীয় মাস। জল সেচনের বহু ছোট ছোট পরিকল্পনা সম্পাদনের ও উহাদের হিসাব-নিকাশের ভার উপরোক্ত কর্ম্মচারিগণের উপরেই ন্যস্ত থাকে। সুতরাং এই সময়ে তাঁহাদের বদলী-ব্যাপারটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। এই সময়ে এইরূপ বদলী সম্বন্ধে অনেকেই অনেক রকমের সমালোচনা করিতেছেন। আমাদের প্রশ্ন এই যে, এই বদলী ব্যাপারে ডেপুটি ডিরেক্টার অব এগ্রিকাল-চারগণের মতামত গ্রহণ করা হইয়াছিল কিনা, কারণ তাঁহাদের স্ব স্ব এলাকার কার্য্যের জন্ত প্রধানতঃ তাঁহারাই

দায়ী। এই ব্যাপারে মাননীয় কৃষি সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ইহা কি সত্য ?

আমরা শুনিলাম যে, কৃষি বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর পরিবারবর্গ বর্দ্ধমানে অবস্থান করিতেছেন। কর্ম্মচারী মহাশয় এমন ভাবে তাঁহার ভ্রমণ-তালিকা (tour programme) প্রস্তুত করেন যে, যেন তিনি প্রত্যেক শনিবার বা অন্ত কোন ছুটির আগের দিন বর্দ্ধমানের কাছাকাছি স্থানে গমন করিতে পারেন। অর্থাৎ তিনি প্রায় সরকারী খরচে প্রায় প্রত্যেক রবিবার বা অন্ত কোন ছুটির দিন বর্দ্ধমানে তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে থাকিয়া বিশ্রাম উপভোগ করিতে পারেন। তিনি প্রত্যেক শনিবার বা প্রত্যেক ছুটিতে বর্দ্ধমান যান, ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি নাই; কিন্তু আপত্তিটা হইতেছে সরকারী কাজের অজুহাতে সরকারী খরচে যাওয়া সম্বন্ধে।"

সুন্দরবন পল্লী উন্নয়ন কমিটি

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে, ১৯৪৯ সালের ২৯শে মে তারিখে, সরকারী একখানি পত্রে আমরা জানিতে পারি যে, সুন্দরবন পল্লী উন্নয়ন কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। কৃষি, বন ও মৎস্য বিভাগের সেক্রেটারী তাহার সভাপতি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রায় সকল বিভাগের কর্ত্তাব্যক্তিরা তাহার সভ্য। বেসরকারী বিশেষজ্ঞ বলিয়া শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীবিজয়বিহারী মুখার্জ্জি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর শ্রীদ্বারকানাথ ঘোষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ পত্রের সঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন আমাদের নিকট প্রেরিত হয়।

এখন ১৯৫১ সালের জুন মাস। এই কমিটি অনুসন্ধানাদি করিয়া কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা জানিলে সুখী হইব। এবং সুন্দরবনের উন্নয়নের জন্য কোন বিশেষ প্রস্তাব এই কমিটি করিয়াছেন, তাহা জানাইলে আরও সুখী হইব। জমিদারী ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগী প্রথা নিঃশেষ করিলেই সুন্দরবন অঞ্চল শস্যসম্পদে ফাঁপিয়া উঠিবে, এত সহজ বিশ্বাস আমাদের নাই। শ্রমের মন ও শ্রমের শক্তি যাহার আছে ভূমি তাহার। এই বিশ্বাস করি বলিয়াই আমরা প্রশ্ন করিতেছি—সুন্দরবনবাসী এই শ্রমের মন ও শক্তি দিয়া নিজেদের উন্নয়ন করিতে প্রস্তুত আছেন কি ?

এই সম্পর্কে "আনন্দবাজার পত্রিকা"র দিল্লী আপিস হইতে গত ২৬শে বৈশাখ তারিখে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রেরিত হয়। তাহা পাঠ করিয়া বুঝিতে পারি যে ভারত-সরকার এই সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলের সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দিয়াছেন।—"সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ পতিত ও জলাভূমি অবিলম্বে উদ্ধার করা হইবে এবং সেখানে চাষ করিয়া বার্ষিক প্রায় ৪০ হাজার টন খাদ্যশস্য উৎপাদন সম্ভবপর হইবে। প্রকাশ, সোনারপুর জলনিকাশ পরিকল্পনার জন্য ভারত-সরকার ১১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ৩৩ লক্ষ টাকা ঋণ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সোনারপুর জলনিকাশ পরিকল্পনা অনুযায়ী চারটি পাম্প বসানো হইবে।

এই পরিকল্পনার ফলে ২৩,২৬০ একর জমি কাজে আসিবে এবং প্রথম বৎসরেই ২১ হাজার টন ধান্য পাওয়া যাইবে। পরবর্ত্তী বৎসরসমূহে অতিরিক্ত ১৭,৮০০ টন ধান্য ও ডাল পাওয়া যাইবে। জলনিকাশ পরিকল্পনার জন্য প্রথম বৎসরে ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। উৎপন্ন দ্রব্যাদির মূল্য হইবে প্রথম বৎসরে ৫১ লক্ষ টাকা।

আগামী নবেম্বর মাসের পূর্ব্বেই যাহাতে পাম্প বসাইবার কার্য্য শেষ হয়, তজ্জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা হইতেছে।"

হিন্দুস্থান হামারা

কবি ইকবালের জাতীয় সঙ্গীতের প্রথম কলিতে এই শব্দ দুইটি আছে।

গত ১৯শে বৈশাখ তারিখে এই নামে একটি পাকিস্থানী দলের সংগঠন-বার্ত্তা প্রথম সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়। এই দলের অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে ভারত-বিজয়। হিমালয় হইতে কুমারিকা, আরব সাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পরিবেষ্টিত ভূখণ্ডের মধ্যে "ইসলামের মহৎ সমপ্রাণতার ও সহনশীলতা"র প্রসার করিবার আদর্শ হইল এই নূতন দলের প্রেরণা। পাকিস্থানের রাজধানী করাচী নগরী হইতে এই সংবাদটি প্রচারিত হইয়াছিল। তদবধি এই "আজাদী" দলের অস্তিত্বের পরিচয় দিবার জন্য মাঝে মাঝে আমাদিগকে নানা ভরসার কথা শুনানো হয়।

তাহার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশের রাজক্ষমতা অপসারিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু কোটি কোটি মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা এখনও পরাধীনের জীবনযাপন করিতেছে। তাহাদের মুক্ত করিতে হইবে। অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া নয়। শরিয়তের বিধান অনুসারে শেষ অস্ত্র রূপে তাহার ব্যবহার হইতে পারে। ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে সভ্য জগতের শুভ বুদ্ধির নিকট মানবিকতার নামে আর্জ্জি দাখিল করিতে হইবে। ভারতকে মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতার গহ্বরে পতন হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

এই বিষয়ে পাকিস্থান রাষ্ট্রের একটা "ইসলামীয়" দায়িত্ব আছে। তার "নীরব" সহিষ্ণুতা ত্যাগ করিতে হইবে কোটি কোটি অ-হিন্দুর প্রাণ ও সম্মান রক্ষার জন্য। কোটি কোটি মুসলমান, খ্রীষ্টান, শিখ, পারসী পাকিস্থানের "প্রতিবেশী" রাষ্ট্রের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইতেছে। বিশ্ব-মানবতার দরবারে

তাহাদের ক্রন্দন পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে এই দলের আপাত-কর্ত্তব্য।

এই পাকিস্থানী দলের অস্তিত্ব লইয়া আমরা চিন্তিত হই না। কিন্তু আমরা ভারতরাষ্ট্রের সাড়ে তিন কোটি নরনারীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চিন্তিত না হইয়া পারি না। তাঁহারা আমাদের রাষ্ট্রে সম্মানের সহিত বাস করুন, ইহা আমাদের আন্তরিক কামনা। কিন্তু পাকিস্থানী নানাবিধ প্ররোচনা তাঁহাদের মন বিক্ষিপ্ত করিতেছে এই কথা আমরা জানি। জমিয়ৎ-উল-উলেমা-ই-হিন্দ নামক ভারতীয় মুসলিম আলেমবৃন্দের প্রতিষ্ঠান বরাবর মুসলিম লীগের বিরোধিতা করিয়াছে। তাঁহাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মনের দুঃখে দোটানায় পড়িয়া কষ্ট পাইতেছেন। আবার কেহ কেহ "বিশেষ" মুসলিম স্বার্থের নামে নানাবিধ দাবী-দাওয়া করিতেছেন। ফলে ভারতের মুসলিম জনসমষ্টি দ্বিধার ভাব লইয়া দিন যাপন করিতেছে। ইহারাই হইবে "হামারা হিন্দুস্থান" দলের ক্রীড়নক। ইহাদের কর্ম্মের ফলে নির্দোষ লোক, উভয় সম্প্রদায়ের লোক, এই "ইসলামী" প্রচার-কার্য্যের ফলে ধনে-প্রাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার মধ্যে এই নিয়তি উহ্য ছিল, আজ তাহা স্পষ্ট হইয়াছে।

দু'মুখো নীতি

পাকিস্থানীদের দু'মুখো নীতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। এরা অপরকে যে আচরণের পরামর্শ দেয়, নিজে তাহা করে না। ভারতরাষ্ট্রে যাহারা এখনও আছে, তাহাদের ব্যবহারেই ইহা পরিস্ফুট হইয়া আমাদের চক্ষুর পীড়াদায়ক হইয়াছে। বর্ত্তমানে এরা গান্ধীজীর শোকে চক্ষুর জলে বান ডাকাইতেছে, গান্ধীজীর মত বন্ধু মুসলমানের আর কেহ নাই, এই কথা প্রচার করিতেছে। "আজাদ" পত্রিকা এই অসততার প্রচারক। দুই-তিন মাস পূর্ব্বেও এই পত্রিকার প্রবন্ধগুলির উপর চক্ষু বুলাইলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অথচ চার বৎসর পূর্ব্বে ১৯৪৭, জুলাই মাসের একদিন প্রথম প্রবন্ধটির আরম্ভ দেখা যায় এই ভাষায় :

"মিঃ গান্ধী তাঁর চিরাচরিত মিথ্যার বেসাতি পুরাদমে চালাইয়া যাইতেছেন। একদিন তাঁর কাজ ছিল, পাকিস্থানের অগ্রগতিতে বাধাদান, আজ তাঁর চেষ্টা হইল পাকিস্থানের ভিতর গোলমাল সৃষ্টি। এজন্য তিনি পাকিস্থানের মাইনরিটির উপর ভরসা করিয়াছেন। তিনি নিতান্ত দায়িত্বহীনের মত আবার মাইনরিটিকে উস্কাইয়া দিয়া পাকিস্থানের ভিতর একটা অন্তর্ব্বিরোধ বাধাইবার জন্য যে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়াছেন...।

"পাকিস্থানের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করার ভিত্তি একমাত্র দায়িত্বহীন ও কুচক্রী মানুষেই করিতে পারে। এই ভাবে প্রচার চালাইয়া মিঃ গান্ধী পাকিস্থান ও হিন্দুস্থানের সম্পর্ককে তিক্ত করিয়া তোলা ছাড়া আর কিছুই করিতেছেন না। এর ফলে পাকিস্থানের সংখ্যালঘুদের মনোবল যেমন ক্ষুন্ন হইবে, ঠিক তেমনই হিন্দুস্থানের সংখ্যাগুরুদের মনেও প্রতিহিংসার ভাব জাগ্রত না হইয়া পারে না। বস্তুতঃ মিঃ গান্ধী তাই করিতে চান। তা হইলেই অশান্তি দেখা দিবে, এবং তাঁর বিশ্বাস এই সুযোগে গোলমাল পাকাইয়া হয়ত কাঁকতালে সমগ্র ভারতবর্ষকেই তাঁর সাধের অখণ্ড রামরাজ্যের পদানত করা সম্ভব হইবে। মিঃ গান্ধীর এই আশার গুড়ে যে বালি পড়িবে—তা না বলিলেও চলে।"

গান্ধীজী আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন, 'পাকিস্থানের ভিতর সকল মাইনরিটিকে মুসলমান করিয়া ফেলা হইবে।' এই আশঙ্কার কারণ সূর্য্যালোকের মত স্পষ্ট। নোয়াখালিতে ৫০,০০০ হাজার হিন্দুকে ধর্ম্মান্তরিত করা হইয়াছিল; ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী আবদুল গোফরানের একটা হিসাবে এই কথাই দেখিয়াছি। এই আশঙ্কার উত্তরে কি বিষ ঢালিয়াছিল পত্রিকাখানি।

চারি বৎসর পরে উক্ত পাকিস্থানী সম্পাদকবৃন্দের মনোভাব কি কিছুমাত্র সংযত হইয়াছে?

মুসলিম মুনাফাকারী

ঢাকার "পয়গাম" পত্রিকার ২৩শে বৈশাখ সংখ্যায় নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। ভারত-বিভাগের ফলে উদ্বাস্তু নরনারীর দুঃখ দুর্দ্দশার সুযোগ লইয়া একদল মুসলিম মুনাফাকারী ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। ভারতরাষ্ট্রেও সেইরূপ হিন্দু মুনাফাকারীর অভাব নাই। আমাদের সহ-যোগীর দুঃখে আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। এই অনাচারের প্রতিকারের একটিমাত্র উপায় আছে। তাহা অবলম্বন করার সাহস রাষ্ট্রপতিগণের আছে কি? এবং তৎ-সম্বন্ধে আমাদের সহযোগী নিজের কর্ত্তব্য কি তাহা জানাইলে সুখী হইতাম :

"উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাগ্যবান ব্যক্তিরা কিভাবে তাঁহাদের পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব-দের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া অন্য সম্প্রদায়ের বাস্তুহারা বা মোহাজেরদের সহিত গোপনে সম্পত্তি বিনিময় বা বিক্রয় করিয়া এক একটি মহল্লায় সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং অবাঞ্ছিত লোকদের প্রবেশ করাইয়া দিয়া থাকেন, তাহার বহু দৃষ্টান্ত আমরা পাইয়াছি। নিজের শরিকানী সম্পত্তি অন্য সম্প্রদায়ের লোকের নিকট বিনিময় করিয়া রান্নাঘর পর্য্যন্ত ভাগাভাগি করার সংবাদও আমরা পাইয়াছি। নিজেদের সুবিধার জন্য ইঁহারা নিজের একান্ত আপনার জনেরও কোন পরোয়া করেন না। ওয়াকফ সম্পত্তি বা দেবোত্তর, মসজিদ বা মন্দির সংলগ্ন জমিও হস্তান্তর করিতেও ইঁহারা দ্বিধাবোধ করেন না। অথচ

ইঁহারাই আবার সীমানা পার হইয়া এক একজন সংখ্যালঘু দরদী সাজিয়া সমস্ত প্রকার সুবিধা আদায়ের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই সমস্ত সংখ্যালঘু দরদীর স্বরূপ প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন।"

"কালনেমীর লঙ্কাভাগ"

"জনশক্তি" পত্রিকা শ্রীহট্টের সর্ব্বজনপ্রিয় সংবাদপত্র ছিল। ভারত-বিভাগের পরে তাহা কাছাড় জেলার শিলচর হইতে প্রকাশিত হইতেছে। এই পত্রিকার ২৮শে চৈত্র সংখ্যায় একটি অতি অদ্ভুত সংবাদ বাহির হইয়াছে। এই অধঃপাতের বিবরণটি সহজে বিশ্বাস করা কঠিন। "কালনেমীর লঙ্কা ভাগ" যাহার উর্ব্বর মস্তিষ্কে উদয় হইয়াছিল, তাহার গতি কি হইয়াছিল, তাহা অশিক্ষিত হিন্দুও জানে। আমাদের রাষ্ট্র-পরিচালকগণ তাহা জানেন না কি? কোন্ ভাগ্যবানের ভাগ্যে কত জমি পড়িল, তাহা জানাও প্রয়োজন:

"আসামের ব্যবস্থা-পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে রাজস্ব-মন্ত্রী শ্রীমোতিরাম বরা জানান যে গৌহাটিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তি-দের সরকারী জায়গা বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে, কারণ তাদের প্রচুর জায়গা ছিল না:

(১) শ্রীসিদ্ধিনাথ শর্ম্মা (সভাপতি, আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি), (২) শ্রীপূর্ণচন্দ্র শর্ম্মা (চীপ হুইপ, কংগ্রেস এসেমব্লী পার্টি), (৩) শ্রীপূর্ণানন্দ চেটিয়া (উপমন্ত্রী, আসাম), (৪) মাননীয় মন্ত্রী জে. জে. এম. নিকলস্ রায়, (৫) মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরামনাথ দাস, (৬) মাননীয় মন্ত্রী শ্রীমোতিরাম বরা, (৭) শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী (উপমন্ত্রী, আসাম), (৮) শ্রীবিমলা প্রসাদ চালিহা (সাধারণ সম্পাদক, আসাম প্রাদেশিক কমিটি) (৯) মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরূপনাথ ব্রহ্ম।

শিলং-এ ডিপুটি স্পীকার মিসেস বনেলী খংমেনকেও সরকারী জায়গা বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে।

শিলচর ও অন্যান্য সহরের ভাগ্যবানদের নামের তালিকা দেখার জন্য জনসাধারণ উৎসুক অপেক্ষা করিতেছে।"

কবি নজরুল ইসলাম

এই বাঙালী কবির ৫৩ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। তদুপলক্ষে নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান উৎসব করিয়াছেন। "ইণ্টার ন্যাশনাল কেওস লীগ" স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহার চিকিৎসার জন্য এক বৎসরের মধ্যে ২০,০০০৲ টাকা তুলিবেন।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে কবি বঙ্গীয় সাহিত্য-জগৎকে মুগ্ধ করেন তিনি আজ চলৎ-শক্তিহীন; বাক্‌শক্তিও বিলুপ্ত। কবির সহধর্ম্মিণীও পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তবে তিনি একেবারে চলৎ-শক্তি রহিত নন। আজ কবির চিকিৎসা উভয় রাষ্ট্রের দায়; তাহা সমাজের দায়।

বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ

"বাঁকুড়া-দর্পণ" পত্রিকায় ৮ই জ্যৈষ্ঠ যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ঐ জেলার জনসাধারণের মনোভাব প্রকাশ করিতেছে। তাঁহাদের ক্ষোভ প্রশমিত করা পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রি-মণ্ডলীর কর্ত্তব্য:

"বাঁকুড়া সম্মিলনী বহু চেষ্টা করিয়া বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুলটি তৎকালীন সরকারের দয়া দাক্ষিণ্যে বঞ্চিত থাকিয়াও দেশবাসীর বহু মঙ্গল বিধান করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু আমরা স্বাধীনতা লাভ করিবার পরই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই মেডিক্যাল স্কুলটি বন্ধ করিয়া দিলেন। আমরা আশা করিয়া-ছিলাম—নিজেদের চেষ্টায় যে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিয়াছিল, সরকার নিশ্চয়ই তাহার উন্নতিবিধানে তৎপর হইবেন। যাহা হউক, সম্মিলনীর প্রচেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নির্দ্দেশে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সি-প্যাল ডাঃ ডি. সি. চক্রবর্ত্তী, প্রফেসার বিজলী সরকার এবং ডাঃ যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২০।৫।৫১ তাং প্রাতে বাঁকুড়া পৌঁছিয়া প্রস্তাবিত কলেজটি পরিদর্শন করেন। তাঁহাদের সঙ্গে আলোচনায় বুঝিলাম তাঁহারা সম্মিলনীর প্রচেষ্টায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আশা করি বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের এই চেষ্টা যাহাতে ফলবতী হয় সে বিষয়ে যথাযথ নির্দ্দেশ ও সুযোগ-সুবিধা দানে বঞ্চিত করিবেন না।"

বুনিয়াদী শিক্ষার ফ্যাসন

"কংগ্রেসী সরকারের আমলে গান্ধীজীর শিক্ষার আদর্শকে অনুসরণ করিয়া জেলায় জেলায় বুনিয়াদী শিক্ষা নীতি প্রবর্ত্তনের প্রচেষ্টা চলিতেছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ইতিমধ্যে অর্দ্ধশতাধিক প্রাথমিক বুনিয়াদী বিদ্যালয় চালু হইয়াছে এবং শীঘ্রই উক্ত সংখ্যা শতাধিক হইবে বলিয়া মনে হয়। আমাদের দরিদ্র ভারতবর্ষের উপযোগী শিক্ষা-নীতি যাহাতে ব্যয়বহুল না হয়, যাহাতে দীনহীন ভারত-বাসী বিনা ব্যয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারে এবং সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে নিজের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিয়া লইবার পথের সন্ধান পায় ও বিশেষ করিয়া 'গণমানব' প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে সে উদ্দেশ্য লইয়া মহাত্মাজী বুনিয়াদী শিক্ষানীতি প্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিলেন।

"গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষায় মধ্যে বড় কথা ছিল আদর্শ শিক্ষক। বুনিয়াদী শিক্ষা চালু করিতে হইলে সত্যাশ্রয়ী, নিঃস্বার্থ কর্ম্মীদলকে শিক্ষক হিসাবে পাওয়া চাই। কিন্তু আজ দেশে সেই ধরণের কর্ম্মী মিলিতেছে না। এখানে যিনি শিক্ষক হইবেন তাঁহার নিকট 'আদর্শই' হইবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি নিজের আদর্শকে সু উচ্চে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে যে কোনরূপ

ত্যাগ স্বীকারে রাজী থাকিবেন। কিন্তু তাহা ত 'এই দিনগত পাপক্ষয়' শ্রেণীর শিক্ষকদের নিকট হইতে প্রত্যাশা করা যাইবে না। একে ত এই শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষকেরা বিদ্যালয়ে ন্যূনতম বেতনের জন্য অন্য উপায়ে রুজি রোজগারেই সদা ব্যস্ত থাকেন। তাঁহাদের নিকট বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ হাস্যকর ব্যাপার হিসাবেই দেখা দিবে এবং আজ হইতেছেও তাই। ঐ সমস্ত শিক্ষককে এক বৎসরের মধ্যে বুনিয়াদি শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তাড়াহুড়া করিয়া বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে পাঠাইবার ফলে কাগজে কলমে বুনিয়াদি বিদ্যালয় চালু হইতেছে সত্য কিন্তু প্রকৃত বুনিয়াদী আদর্শ চালু হইতেছে না। তাই বুনিয়াদী শিক্ষার যে প্রধান কথা ব্যয়স্বল্পতা ও গণাভিমুখীনতা তাহার কোনটাই হইতেছে না—অধিকন্তু বুনিয়াদী শিক্ষা একটা ব্যয়বহুল ফ্যাসনে পরিণত হইতেছে।"

বনগাঁও-বারাসত-বসিরহাট অঞ্চলের মুখপত্র "সংগঠনী"র ১লা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার উক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা-বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

ভারত-সংস্কৃতি ও শ্রীঅরবিন্দ

এই শিরোনামায় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায়ের একটি প্রবন্ধ গত ৮ই মাঘের "নবসঙ্ঘ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহা পাঠ করিয়া মনে যেসব প্রশ্ন উদিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিতে চাই। আলোচনার ফলে "নবসঙ্ঘ" এই বিষয়ে শ্রীমতিলাল রায়ের নিকট হইতে আরও অনেক তত্ত্ব ও তথ্য প্রকাশ করিতে পারেন, যাহা আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করিবে।

তৎপূর্ব্বে উক্ত প্রবন্ধ হইতে কতকগুলি কথা উদ্ধৃত করিতে চাই যাহার ফলে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে। এই উদ্ধৃতি পাঠ করিলে আমাদের প্রশ্নের ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। তাহা আর বিস্তৃত করিয়া বর্ণনার প্রয়োজন হইবে না। সঙ্ঘগুরু "সঙ্ঘবন্ধু"দের কাছেই কথোপকথন ছলে কথাগুলি বলেন :

"...তথাপি আজ কেন মাতা মৃণালিনীর প্রতিষ্ঠা হইল না? শ্রীঅরবিন্দের আত্মা খাঁটি হিন্দু। তিনি গীতাভাষ্য লিখিয়াছিলেন—আত্মার অবিনশ্বরত্ব তাঁর অজানা নয়, তথাপি কেন মাতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অস্তিত্বও শেষ হইয়া গেল? ইহার কারণ—তাঁর আত্মা হিন্দু হইলেও, স্বভাবের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল পাশ্চাত্ত্যের প্রভাব। ইউরোপের শিক্ষায় লালিত-পালিত হওয়ার ফলে তিনি সংস্কারবশে ইউরোপীয়ানদের প্রতি একটু স্নেহ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেন। এই স্বভাব-দৌর্ব্বল্যের রন্ধ্রপথেই ভারতের শাশ্বত অবিনাশী যে আত্মা, তাহা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; মাদাম রিশারের মধ্যে তাই তিনি মাতা মৃণালিনীকে দেখিলেন। ভারতাত্মা ইহা স্বীকার করিবে না।...

"শ্রীঅরবিন্দের জন্ম ভারতের বর্ত্তমান দুরবস্থায় আকস্মিক বলিতে হয়। তিনি জন্মিয়াছিলেন ভারত-সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের প্রেরণা লইয়া। এইখানে তিনি সিদ্ধ; কিন্তু আকৈশোর বিরুদ্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও শিক্ষার প্রভাবও তাঁহার জীবনে যথেষ্ট শিকড় গাড়িয়াছিল। ইহার সহিত শ্রীঅরবিন্দের আমরণ সংগ্রাম আমাদের লক্ষ্যে পড়ে। ইহা যাহার দৃষ্টিপথে পড়ে না, তিনি ব্যক্তি-মাহাত্ম্যে ভ্রান্ত এবং শ্রীঅরবিন্দের স্বরূপাবধারণে অসমর্থ, একথা আমি নিঃসংশয়েই বলিব।

"১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ অযাচিতভাবে আমার ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মানুরাগের বশবর্ত্তিতায় তাঁহার সহিত আমার পরিচয়ের কোনই কারণ ছিল না। জন্মাবধি শিবগুরুর প্রত্যক্ষ সঙ্কেতে আমার জীবন পরিচালিত। যৌবনে শ্রীমৎ ৺কালিকানন্দের মন্ত্রদীক্ষিত শিষ্য আমি। উদাসী সম্প্রদায়ের রামজীর করুণায় যৌবন হইতেই ব্রহ্মচর্য্যের দীক্ষা। শ্রীমৎ ৺রামানন্দপুরীর আশীর্ব্বাদে দশনামী সম্প্রদায়ের তত্ত্বের পরিচয়ও আমি পাইয়াছি। বাংলার তন্ত্র-সহজিয়ার গুরু-মণ্ডলীর সহায়তায় তাঁহাদের সাধনপথেও আমার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট মনে হইত। তবুও শ্রীঅরবিন্দ আমায় করিলেন—তাঁহার মন্ত্রশিষ্য। জ্ঞান, শক্তি, প্রেমের মন্ত্রে তিনি আমায় দীক্ষা দিলেন। অতীতের সর্ব্বধর্ম্ম-বিসর্জ্জনে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে, আত্মসমর্পণ-যোগমন্ত্রের দীক্ষায় আমার অভিষেক ভুলিতে পারি না। বিপ্লবের রক্ত-পতাকা উড়াইয়া যখন ভারত-ব্যাপী আন্দোলনে আমি প্রবৃত্ত, শ্রীঅরবিন্দ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট 'আর্য্য' পত্রিকা বাহির করিয়া আমায় বলিলেন—'হল্ট্ (থাম)। রাজসিক চরিত্রের দিন শেষ হইয়াছে।' ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রবর্ত্তক' বাহির হয়। শ্রীঅরবিন্দের যোগের ব্যাখ্যায় আমি তখন মুখরিত-কণ্ঠ। তারপর ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট 'আর্য্যে'র সমাপ্তি। আমিও ঘরে ফিরিয়া সঙ্ঘ-রচনায় উদ্বুদ্ধ হই।

তাঁহার ত্রি-মন্ত্রের ইংরেজী অনুবাদ তিনিই দিয়াছিলেন—Culture, Commune এবং Economy। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী আমি আত্মস্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করি। পর বৎসর ২৪শে নবেম্বর তিনি কার্য্যভার মীরাদেবীকে দিয়া নিশ্চিন্ত হন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃণালিনী দেবী পরলোকগমন করায়, তাঁহার অভীপ্সিত সাধনতীর্থ অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মন্ত্রশিষ্য বাংলায় চিরদিনের জন্য পুনরাগমন করিলে, মাদাম মীরাই তাঁহার যোগের উত্তর-সাধিকা হন। পাশ্চাত্ত্য প্রকৃতির প্রেরণা ও প্রভাব এই ক্ষেত্রে বিজয়ী হয় মীরাদেবীর উৎসর্গে। শ্রীঅরবিন্দ ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে স্বয়ং কর্ম্মবিরত। মীরাদেবীর মধ্য দিয়াই পণ্ডিচারীতে

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংবাদগুলির পর কিছু আধ্যাত্ম-রহস্যের কথা বলিয়া শ্রীঅরবিন্দের আত্মার প্রতি বাঙালী জাতিকে সশ্রদ্ধ হইয়া উৎসর্গমন্ত্রে দীক্ষা লইতে বলিব।

"...শ্রীঅরবিন্দ ভুলিতে দেন নাই ঋকের বাণী—'সজিত্বানং সদাসহম্ বর্দ্ধিষ্ঠং'—ইহাই ছিল শ্রীঅরবিন্দের জাতির প্রতি মহাদান। তিনি চাহিয়াছিলেন দিব্য জীবন। জীবনের ত্রিকেন্দ্র—ধর্ম্ম, রাষ্ট্র এবং সমাজ। ধর্ম্মের ভিত্তির উপরেই তিনি চাহিয়াছিলেন রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁহার কথা ছিল—পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রনীতির অনুসরণ ভারত করিবে না। ভারত সনাতনপন্থী হইতে গিয়াও অতীতের ক্ষেত্রে গিয়া দাঁড়াইবে না। ভারত গড়িবে অধ্যাত্মচেতনার মানুষ। এই মানুষ লইয়া যে সঙ্ঘ, তাহাই ভারত-সংস্কৃতি রক্ষা করিবে।

"এই অধ্যাত্মচেতনার কথা তিনি কি ভারত-গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করেন নাই? গীতায় কি 'ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা'র কথা নাই? তিনি কি ভারতের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুমতেই মাতা মৃণালিনীর পাণিগ্রহণ করেন নাই? তিনি কি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে দেবী মৃণালিনীকে পত্র লিখিতে গিয়া বলেন নাই—'হিন্দু-শাস্ত্রে ভাগবত দর্শনের যে পথ-নির্দ্দেশ আছে, তাহা এক মাস কাল অনুসরণ করিয়াই বুঝিতেছি—ঈশ্বরদর্শনের এই পথই প্রশস্ত?' সেই শ্রীঅরবিন্দকে নীরব ও নিশ্চেষ্ট হইয়া যখন মাদাম রিশারের উপর আপনার অধ্যাত্ম গুরুভার ন্যস্ত করিতে দেখি, তখন কি পরিশেষে তাঁহার স্বভাবের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল যে পাশ্চাত্ত্য প্রকৃতি ও প্রেরণা, তাহা অনুধাবন করিতে বিলম্ব হয়? তিনি বার বৎসর বয়সেই এই প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন। ১৪ বৎসর বয়সে আত্মস্থ হইয়া ভারতের জয় আনিয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। ২১ বৎসর বয়সে ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া সর্ব্বাগ্রে স্বাধীনভারতের সাক্ষাৎকার লাভ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই স্বাধীনতার দীপ্ত সূর্য্য ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তিনি সন্দর্শন করিলেন। শ্রীঅরবিন্দ নূতন ভারত-সৃজনের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। কিন্তু ভবিষ্য জাতিকে আজ তাঁহার ব্যক্তিমাহাত্ম্যে শুধু অভিভূত হইলেই চলিবে না, ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির সাহায্যে আমাদের লাভ করিতে হইবে ভারতীয় চরিত্র। ভারত-সংস্কারের ইহা অহমিকা নহে। পরন্তু ভারতের আদর্শ অব্যাহত রাখার জন্য ভারতের অমর সত্তাকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে। বিশ্বের শান্তি ও আলো ভারত আপনাকে হারাইলে কোন দিন আসিবে না। ভারতের যে সুমহতী চেতনা তাহা শুধু আত্মিক নহে, তাহার ব্যবহারিক আচারও আছে। সর্ব্বদা ভারত-বাসী স্মরণে রাখিবে—'আচারো পরমোধর্ম্মঃ'—ভারত সদাচারপরায়ণ না হইলে, ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। শ্রীঅরবিন্দের মহাবাণীর আমরা অনুসরণ করিব, কিন্তু ভারতে বর্ত্তমান প্রতীচ্য প্রভাবাচ্ছন্ন প্রকৃতির পরিবর্ত্তন আজ প্রয়োজনীয়। নতুবা শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় মহাপুরুষের কল্কি-শরণ চরম লক্ষণরূপে আমাদের ভাগ্য বিড়ম্বিত করিবে।..."

আমরা প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতাকে তাঁহার প্রশ্নের ও আশঙ্কার বিশদ আলোচনা করিতে আহ্বান করিতেছি। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রকৃতি আমাদের নূতন করিয়া বুঝিতে হইবে। সেই শিক্ষা-প্রদান তাঁহার একটা দায়।

রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব

যতই দিন যাইতেছে ততই রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব ব্যাপকতর ভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে। কেবল বাঙালীই এই উৎসবক্ষেত্রে সমবেত হন না, অন্যান্য ভাষাভাষী স্ত্রী-পুরুষও এই উৎসবের উদ্যোগ-আয়োজনে অগ্রণী হইতেছেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে দক্ষিণ কলিকাতার "ভারতী তামিল সঙ্ঘ" সুষ্ঠু-ভাবে এই উৎসব পালন করেন। বাংলা দৈনিক পত্রে তার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তার মধ্যে পাঠ করিলাম যে এই অনুষ্ঠানে "প্রধান অতিথি রূপে" যোগদান করিয়াছেন "যুগান্তর" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন একজন তামিল ভদ্রলোক।

"ভারতী তামিল সঙ্ঘে"র পরিচয় না দিলে এই অনুষ্ঠানের মাধুর্য্য সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে না। তামিল ভাষাভাষী স্ত্রী-পুরুষ নানা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অনেক বৎসর হইতে দক্ষিণ কলিকাতায় বাস করিতেছেন। অনেকেরই বাংলা শিক্ষা করিবার প্রবৃত্তি জাগে নাই। শুনিলাম ১৯১৭ সালের আগষ্ট মাসের পরে ইহারা হঠাৎ এই বিষয়ে তৎপর হইয়া উঠেন। "ভারতী তামিল সঙ্ঘ" এই তৎপরতার ফল।

তামিল কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীর স্মৃতি বহন করিতেছে এই সঙ্ঘ। এই কবি বর্ত্তমান তামিল সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার। স্বদেশী যুগ তাঁর জীবনের উষাকাল। তিনি বিপ্লবী ছিলেন। সেই জন্য ইংরেজের রাজ্যে তাঁর স্থান মিলিল না। পণ্ডিচেরীতে প্রায় ১৫ বৎসর নির্ব্বাসিতের মত তিনি জীবন কাটাইয়াছিলেন। সেই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী জীবন আরম্ভ হয়। দু'জনেই বিপ্লবী, দু'জনেই কবি। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ। কিন্তু বয়সের পার্থক্য অতিন্দ্রিয়বাদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিবার পক্ষে কোন বাধা সৃষ্টি করে নাই এই দুই সমপ্রাণ বিপ্লবীর মধ্যে। ইংরেজের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অপসারণের পরে সুব্রহ্মণ্য ভারতীর প্রকাণ্ড আদর বাড়িল তাঁর নিজের দেশের, নিজের ভাষাভাষী স্ত্রী-পুরুষের নিকট। দক্ষিণ কলিকাতার তামিল সঙ্ঘের নব-কলেবর তার প্রমাণ।

শুনিয়াছি এই সঙ্ঘের চেষ্টায় আমাদের তামিল বন্ধুগণ

বাংলা ভাষা শিক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং সর্ব্ব-ভারতীয় বঙ্গভাষা প্রচার সমিতির আনুকূল্যে সে চেষ্টা চলিতেছে। এই পরস্পরের পরিচয়ের ফলে আমরা আশা করি এই দুই ভাষাকে অবলম্বন করিয়া যে দুই সংস্কৃতি নূতন ভাবে বিকশিত হইয়াছে তার যুক্ত চেষ্টায় ভারতরাষ্ট্রে ভাষার বিরোধ সংযত হইবে। এই জন্য এই দুই সংস্কৃতির মধ্যে সেতু রূপে মিলনের পথ প্রশস্ত করিবে। সেই চেষ্টার পরিচয় এখনও তেমন ভাবে পাই না। অন্ততঃ এই বৎসরের রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবে তাহা পাই নাই। সভাপতি মহাশয় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গতানুগতিক বর্ণনা দিলেন, প্রধান অতিথিও তাহাই করিলেন। শোভন হইত যদি "প্রধান অতিথি" সুব্রহ্মণ্য ভারতীর পরিচয় দিতেন এই অনুষ্ঠানে যখন সেখানে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই বাঙালী। এবং তামিল বক্তা মহাশয় যদি রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দিতেন; তাঁহার কবি ঋষি জীবনের। ইহার অভাবে একটা সঙ্কুচিত ভাব লক্ষ্য করিয়াছেন অনেক বাঙালী অতিথি।

আর একটি মন্তব্য করিয়া আমরা এই সমালোচনা শেষ করিব। রবীন্দ্রনাথের মত বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তি ভারত-বর্ষে গত দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই। সেইজন্য তাঁহার পরিচয় সম্যক হইবে না, যদি তাঁহার পরিচয় দেওয়া হয় কেবলমাত্র কবিরূপে; ফুল, জ্যোৎস্না, পাখীর কাকলী, শান্তিনিকেতনের বসন্ত ও বর্ষা বর্ণনা করিয়া যাঁর দিন কাটিয়াছে; এবং বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন তিনি এই কয়টি মূলধনের বেসাতি করিয়া। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা চলিলে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব ব্যর্থ হইবে। তার উদ্দেশ্য সার্থক হইবে না। এই উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রূপের পরিচয় দিতে হইবে। তাঁহার কবি-রূপ, ঋষি-রূপ, তাঁহার সমাজ-সংগঠকের রূপ, তাঁহার যোদ্ধ-রূপ—অনাচার, অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে যিনি সংগ্রাম করিয়াছেন আজীবন। "মংপু"র মৈত্রেয়ী দেবী বহু দিন পূর্ব্বে শান্তিনিকেতনে কোন উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের সমাজ-সংগঠক রূপের কথা বলিয়াছিলেন। সেই কথা রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে স্মরণীয়:

"...যখন বিলাতী বর্জ্জন ও কাপড় পোড়ানোর উত্তেজনায় দেশ বিক্ষুব্ধ, তখন নানা বিরোধিতা ও নিন্দা সহ্য করিয়া তিনি একাকী সেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে প্রবৃত্ত হলেন যেখানে দাঁড়িয়ে দেশের বিস্তৃত মঙ্গল ঘটানো সম্ভব। তখন সেই বিপ্লবের বিষয় তিনি বলেছিলেন: 'সকল দেশের ইতিহাসেই যখন কোন বৃহৎ ঘটনা মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া দেখা দেয়···সেই সময়ে দেশের মধ্যে যদি অনুকূল উপকরণ পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকে; যদি তাঁহার ভাণ্ডারে নিগূঢ়ভাবে জ্ঞান ও শক্তির সম্বল সঞ্চিত থাকে, তবেই সে বিপ্লবের দারুণ আঘাতটাকে আটকাইয়া সে দেশ আপনার নূতন জীবনকে নিজের সামঞ্জস্য দান করিয়া গড়িয়া তুলে···।"

শান্তিনিকেতনে সেই "অনুকূল উপকরণ" প্রস্তুত করিবার সাধনায় কবিগুরু ৪০ বৎসর যাপন করেন। আয়ার্লণ্ডের গ্রিফিথ্‌স ও ভারতের গান্ধিজী "সিনফিন" ও "গঠনমূলক" পন্থা নির্দেশ করিয়া তাহাই করিয়াছিলেন।

বাঙালী-বিহারী সম্প্রীতি

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের একান্ত-সচিব (প্রাইভেট সেক্রেটারী) শ্রীচক্রধর শারণ নয়াদিল্লী হইতে গত ৩০শে এপ্রিল 'যুগান্তর' সম্পাদককে জানাইয়াছেন যে, ১৯৫০ সালের ২৯শে অক্টোবর "স্বাগত রাষ্ট্রপতি" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বাঙালী ও বিহারীদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় করিতে রাষ্ট্রপতির নিকট স্বর্গত স্যার জে. সি. বসুর এক লক্ষ টাকা দান সম্পর্কে যে প্রশ্ন তোলা হইয়াছে, ১৯৪৫ সালেও কোন একখানি পত্রিকার সংবাদদাতা অনুরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রপতি এই সম্পর্কে যে জবাব দিয়াছিলেন তাহা কয়েকখানি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। যুগান্তরে উক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে যে ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নিরসন করিবার জন্য 'বিহার হেরাল্ডে' প্রকাশিত রাষ্ট্রপতির পত্রখানি প্রকাশের জন্য রাষ্ট্রপতির একান্ত সচিব অনুরোধ করায় উক্ত পত্রখানি প্রকাশিত হয়।

'বিহার হেরাল্ড'-এ প্রকাশিত রাষ্ট্রপতির পত্র

প্রিয় মহাশয়,

আপনার ৬ই নভেম্বর তারিখের পত্র পাইয়াছি। সংবাদ-দাতা লিখিত চিঠিতে যে প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে আমার মতামত ব্যক্ত করিবার সুযোগ দেওয়ায় আপনি আমার ধন্যবাদার্হ।

আমার যতদূর মনে হয়, বাঙালী ও বিহারীদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য স্বর্গত স্যার জে. সি. বসু এক লক্ষ টাকা দানপত্র করিয়া দেন নাই। লেডী অবলা বসুও এতদুদ্দেশ্যে আমার নিকট কোন অর্থ দেন নাই। ঘটনাটি হইতেছে এই যে, বিহারে, বিশেষ করিয়া কয়লাখনি এলাকায় মাদকদ্রব্য বর্জ্জন আন্দোলন চালাইবার জন্য স্যার জে. সি. বসু তাঁহার ট্রাষ্টিদের হাতে কিছু অর্থ দিয়া যান। তাঁহার ট্রাষ্টিদের মৃত্যুর পর লেডী অবলা বসু আমাকে মাদকদ্রব্য বর্জ্জন আন্দোলন চালাইবার দায়িত্ব গ্রহণে অনুরোধ করেন এবং এতদুদ্দেশ্যে স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত অর্থের সুদ হইতে এই আন্দোলনের খরচ দেন। মোটামুটি হিসাবে প্রতিবৎসর দুই হাজার হইতে আড়াই হাজার টাকা এই ব্যাপারে ব্যয় হইত। ঝরিয়া কয়লাখনি এলাকায় এই কাজ করিবার জন্য কর্ম্মী নিয়োগ করিতে হইয়াছিল এবং দুই বৎসর ধরিয়া কাজ চলিয়াছিল। ১৯৪২ সালে আগষ্ট মাসে আমি গ্রেপ্তার হইবার কালে মদ্যবর্জ্জন তহবিলের হিসাবে ব্যাঙ্কে আমার কিছু টাকা ছিল। আমি কার্য্যের প্রতি আর দৃষ্টি রাখিতে পারিলাম না

এবং ইহাও শুনিলাম যে এই কার্য্যে নিযুক্ত কয়েকজন কর্ম্মীও গ্রেপ্তার হইয়াছেন। আমার গ্রেপ্তারের পর আমার নামের সমস্ত হিসাবই সরকার আটক করেন। আমি সরকারকে লিখি যে মদ্যবর্জ্জন তহবিলের টাকা ছাড়িয়া দিয়া লেডী অবলা বসুর নিকট উহা দেওয়া উচিত। সরকার তদনুসারে আদেশ জারী করেন এবং ব্যাঙ্ক অবশিষ্ট টাকা লেডী বসুর নিকট প্রেরণ করে। কাজ চালু থাকিবার সময় আমি মাঝে মাঝে ট্রাষ্টিদের নিকট হিসাব প্রেরণ করিতাম এবং তাহা তাঁহাদের দ্বারা গৃহীত হইত আর আমাকে ইহাও জানান হইয়াছিল যে ট্রাষ্টিরা আমাদের কাজে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এই ব্যাপারের সহিত আমার আর কোন সংস্রব ছিল না। স্যার জে. সি. বসুর ট্রাষ্ট অথবা অন্ত কোন সূত্রে আমি বাঙালী ও বিহারীদের সম্প্রীতির জন্ত অন্য কোন অর্থ পাই নাই।

সংবাদদাতার পত্রের অবশিষ্টাংশ সম্পর্কে আমার কোন মন্তব্য করিবার দরকার আছে বলিয়া আমি মনে করি না। এই সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা চিরকালের মত অবসানের জন্য আপনি উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করিলে আমি বাধিত হইব।"

আপনার বিশ্বস্ত
রাজেন্দ্র প্রসাদ

আমরা আশা করি, এই পত্র প্রকাশে আচার্য্য জগদীশ-চন্দ্রের নামের সহিত জড়িত এই তর্কবিতর্কের অবসান হইবে। গত ২০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের "যুগান্তর" পত্রিকায় ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে দেশবাসীর, বিশেষত: বাঙালীর মন হইতে নানা সন্দেহ দূর হইবে।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

কেন্দ্রীয় পরিষদ রবীন্দ্রনাথের কীর্ত্তি বিশ্বভারতীর স্থায়িত্ব বিধানের জন্ত আইন পাশ করিয়াছেন। তাহা করিতে গিয়া তাঁহারা বিশ্বভারতীর আদর্শ বর্ণনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে মন্ত্র—"শান্তম্, শিবম্, অদ্বৈতম্"—মনোনীত করিয়াছিলেন তাহা মুছিয়া ফেলিলেন। এই সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহার মধ্যে আমরা কোন যুক্তি পাইলাম না। এই মন্ত্র নাকি বর্ত্তমান অবস্থায় (context) অবান্তর। বিশ্বভারতীর পরিচালক সভা এই সম্বন্ধে নীরব। তাঁহাদের সম্মতি ব্যতীত এরূপ কালাপাহাড়ী কাণ্ড হইতে পারিত না। আমরা এই খামখেয়ালির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। কেন্দ্রীয় পরিষদের বাঙালী সভ্যগণের মধ্যে দুই-তিন জন যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের নাম দেশবাসী স্মরণ রাখিলে আমরা ভবিষ্যতের জন্ত আশ্বস্ত হইব।

গৌহাটি কটন কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী

আগামী আগষ্ট (১৯৫১) সনে গৌহাটি কটন-মহাবিদ্যায়তনের ৫০বৎসর পূর্ণ হইবে। তথায় এক সুবর্ণ জয়ন্তী পরিষদ এবং তাহার অধীনে বিভিন্ন কর্ম্মপরিষদও গঠিত হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, কটন মহাবিদ্যায়তনের বিগত ৫০ বৎসরের কীর্ত্তিকাহিনী বিবৃত করিয়া একখানি সুবর্ণ জয়ন্তী "স্মারণী সংহিতা" প্রণয়ন করা হইবে। উহার একাংশে উক্ত বিদ্যায়তনের প্রাক্তন বিদ্যার্থিবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ এক সুদীর্ঘ নামের তালিকাও স্থান পাইবে। পরিষদের আবেদনটি এই :

এই উদ্দেশ্তসিদ্ধির জন্ত এতদ্দ্বারা প্রাক্তন সকল বিদ্যার্থীকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন নিজ নিজ বিবরণ (এবং যথাসম্ভব পরিচিত অন্তান্ত প্রাক্তন বিদ্যার্থীর বিবরণ) স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া আগামী ১৫ই জুনের মধ্যেই স্মারক-গ্রন্থের সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দেন।

এতদ্ব্যতীত বিদ্যায়তনের একটি প্রামাণিক ইতিবৃত্ত রচনার জন্ত সর্ব্বসাধারণের নিকট উক্ত বিদ্যায়তন-সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার তথ্য, দলিলপত্র, মন্তব্য (Reports) এবং সাহিত্যিক বিবৃতি প্রার্থনা করা যাইতেছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক আগামী ১৫ই জুন তারিখের পূর্ব্বেই এই সকল বিবরণী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

কটন মহাবিদ্যায়তনের প্রত্যেক প্রাক্তন বিদ্যার্থীকেই সুবর্ণ জয়ন্তী পরিষদের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। সদস্তদিগের নিম্নতম চাঁদার হার ১০৲ টাকা মাত্র।

এই উৎসবের জন্ত আসাম সরকার ৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। সুবর্ণ জয়ন্তী তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা কটন মহাবিদ্যায়তনের ছাত্রদের জন্য কয়েকটি প্রতিযোগিতামূলক "জয়ন্তী-বৃত্তি" ও "জয়ন্তী-পুরস্কার" সৃষ্টি করা হইবে।

চিঠিপত্রাদি পাঠাইবার ঠিকানা—সম্পাদক, সুবর্ণ জয়ন্তী পরিচালক সমিতি, গৌহাটি, আসাম।

টিউনিশিয়া রাজ্যের স্বায়ত্ত-শাসন

উত্তর-আফ্রিকার টিউনিশিয়া দেশ ফরাসী রাষ্ট্রের অধীন। তাহার শাসনকর্ত্তার উপাধি "বে"। তাঁহার নাম লেমিন পাশা। তিনি একজন আমীর। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাঁহার ক্ষমতা ছিল ব্রিটিশ আমলে আমাদের রাজাদের মত। টিউনিশিয়াবাসী এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট ছিল না। তাহারা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের অধীনে আসে প্রায় ৬৫ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৮৫ সালে)।

সম্প্রতি "বে" লেমিন পাশার নামে আর এক দফা সংস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে। তাহার ফলে টিউনিশিয়ার লোকেরা পাইবে এই সব অধিকার : টিউনিশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ফরাসী বিশেষজ্ঞবর্গের দাপট হইতে কিঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করিবেন ; রাজ্য শাসন-পরিষদে টিউনিশিয়াবাসী মন্ত্রিমণ্ডলী ও ফরাসী উপদেষ্টাবর্গ সমসংখ্যক হইবে ; টিউনিশিয়ার শাসন-ব্যবস্থায়ও আমাদের সিবিল সার্বিসের মত ব্যবস্থা ছিল—টিউনিশিয়া-বাসীদের তাহাতে প্রবেশের পথে নানা বাধা ছিল। তাহা কিঞ্চিৎ অপসারিত হইয়াছে।

শিক্ষা ও পরীক্ষা

অধ্যাপক শ্রীবিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এখানে শিক্ষা অপেক্ষা পরীক্ষাই অধিকতর গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্তরের পক্ষেই ইহা অল্লাধিক সত্য। আমরা বিশেষ করিয়া স্নাতক-পূর্ব্ব (under-graduate) স্তর সম্বন্ধে আলোচনা করিব; এই স্তরের পক্ষে ইহা অধিকতর সত্য। এই স্তরের পরীক্ষা-কার্য্যে প্রধানের ভূমিকায় যাঁহারা নিযুক্ত হইয়া থাকেন তাঁহারা ইহার শিক্ষক নহেন, উচ্চ স্তরের শিক্ষক—পদমর্য্যাদায় তাঁহারা এই স্তরের শিক্ষকের উর্দ্ধে। শিক্ষক প্রত্যক্ষ ভাবে তদীয় ছাত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করেন না; বরং যাহাতে তিনি পরীক্ষা ব্যাপারে কোনও প্রকারে সংশ্লিষ্ট না হন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের তৎপ্রতি সজাগ দৃষ্টি। সুতরাং শিক্ষার ধারার সহিত পরীক্ষার ধারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে; বিশেষ করিয়া স্নাতক-পূর্ব্ব স্তরের শিক্ষার পক্ষে ইহা মঙ্গলজনক হয় নাই। একটি অবাঞ্ছিত ফল হইয়াছে এই যে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই অস্বাভাবিক রূপে পরীক্ষাদ্বারা প্রভাবিত হইয়া পড়িয়াছেন। এই স্তরের অধ্যাপনা আজ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলিকেই কেন্দ্র করিয়া পরিচালিত হইয়া থাকে; শিক্ষার্থীও প্রকৃত শিক্ষাকে উপেক্ষা করিয়া পরীক্ষার উপযোগী অংশের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থাকে। শিক্ষক তাঁহার ছাত্রজীবনের পঠিত পুস্তকগুলি হইতে তথাকথিত কার্য্যকরী (important) অংশগুলি নির্ব্বাচন করিয়া শিক্ষার্থীর নিকট উত্থাপন করেন। আধুনিক গ্রন্থের সহিত সংযোগ রক্ষা করিবার অথবা নূতন করিয়া চিন্তা করিবার প্রয়োজন বোধ করেন না। শিক্ষার্থীও প্রচলিত প্রশ্নগুলির বাহিরের যে-কোন আলোচনাই অবান্তর বলিয়া গণ্য করে। চিন্তার অভ্যাসকে পুষ্ট না করিয়া স্মৃতিশক্তির প্রয়োগ করাই রীতি হইয়া উঠিয়াছে। পাঠ্য বিষয়টি সমগ্রভাবে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া পরীক্ষোপযোগী 'পয়েন্ট' সংগ্রহ করিবার প্রয়োজনই অধিক বলিয়া অনুভূত হইতেছে। শিক্ষার উপর পরীক্ষার এই অতিরিক্ত প্রভাবই আমাদের শিক্ষার ব্যর্থতার মূল কারণ। পরীক্ষার অনুগামী শিক্ষা কখনও সম্পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না।

শিক্ষার অনুগামী পরীক্ষাই সঙ্গত ও শ্রেয়ঃ। কারণ শিক্ষাই আমাদের মৌলিক প্রয়োজন, পরীক্ষা নহে। শিক্ষাই মুখ্য, পরীক্ষা গৌণ। শিক্ষার পরিমাপের জন্য পরীক্ষার প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া পরীক্ষাই উদ্দেশ্য নহে, উদ্দেশ্য শিক্ষা।

প্রাচীন কালে শিক্ষার প্রয়োজন প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধ হইত এবং শিক্ষার সাফল্যের জন্য শিক্ষকের উপর একান্ত ভাবে নির্ভর করিবার প্রথা ছিল। শিক্ষকের প্রতি আনুগত্যের প্রয়োজন অনুভব না করিয়া এবং প্রকৃত শিক্ষাকে অবহেলা করিয়া কোনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আকাঙ্ক্ষা কাহারও মনে জাগিত না; সেরূপ কোনও পরীক্ষা তখন ছিল না। শিক্ষার্থী শিক্ষকের গৃহে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিত, শিক্ষণীয় বিষয়ের জ্ঞান অর্জ্জন ব্যতীতও শিক্ষকের সান্নিধ্যে থাকিয়া চরিত্র-গঠন করিত। আনুষ্ঠানিক ভাবে পরীক্ষা গৃহীত হইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। প্রকৃত পক্ষে শিক্ষার মত পরীক্ষাও দৈনন্দিন ছিল। শিক্ষক যখন স্থিরনিশ্চয় হইতেন যে, শিক্ষার্থীর শিক্ষা পরিণতি লাভ করিয়াছে, তখন শেষোক্তের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে শিক্ষার্থী বিষয়বিশেষের অভিজ্ঞতার সহিত জীবনযাপন-প্রণালীর একটি বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিয়া বাহির হইত।

আজিকার দিনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্বন্ধ এরূপ ঘনিষ্ঠ হইবার অবকাশ নাই। একজন শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষার্থীর সকল বিষয়ের জ্ঞান উন্মেষের ভার গ্রহণ সম্ভবপর নহে। সুতরাং আধুনিক শিক্ষালয়ে শিক্ষকমণ্ডলীকর্ত্তৃক এক-একটি শিক্ষার্থীশ্রেণীর শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। পরীক্ষা-প্রণালীও ব্যষ্টি অপেক্ষা সমষ্টির উপযোগী করিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বৎসরের নির্দ্দিষ্ট দিনে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে, নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি প্রশ্নের লিখিত উত্তর বিচার করা পরীক্ষার পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আধুনিক অবস্থার সংঘাতে শিক্ষা ও পরীক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তির সহিত সংস্রব ক্ষীণতর হইয়া পড়িয়াছে।

ব্যক্তির সহিত সংস্রব ক্ষীণ হইয়া পড়িলে শিক্ষা ও পরীক্ষা উভয়ই ত্রুটিবহুল হইয়া পড়ে। শিক্ষকের প্রভাব হইতে মুক্ত হইলে ব্যক্তিত্ব অর্জ্জন দূরে থাকুক, বিষয়জ্ঞান লাভ করাও দুরূহ। আধুনিক পরিস্থিতিতে সকল দেশের শিক্ষার্থীর অন্তরেই পরীক্ষা এক নূতন মোহজাল বিস্তার করিয়া থাকে। কিন্তু উন্নত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরীক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে এমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে যাহার দরুন পরীক্ষার প্রভাব দ্বারা শিক্ষকের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হওয়া সম্ভব নহে। প্রথমতঃ, এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার অনুগামী হইয়া থাকে; সুতরাং দৈনন্দিন পাঠে অবহেলা করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা কম। দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষাব্যাপারে

শিক্ষকের একটি বিশিষ্ট অংশ নির্দ্দিষ্ট থাকে। তৃতীয়তঃ, শিক্ষক ভিন্ন অন্য পরীক্ষক যাঁহারা নিযুক্ত হন তাঁহারা শিক্ষকের সমমর্য্যাদাসম্পন্ন হইয়া থাকেন। বাহিরের পরীক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও পদমর্য্যাদা দ্বারা শিক্ষকের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের দেশে শিক্ষাকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করিতে হইলে পরীক্ষার এই বিশেষত্বগুলির কথা বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কোনও কোনও ক্ষেত্রে দুর্নীতির কথা উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। তাহা লইয়া যে সকল সমালোচনা হইয়া গিয়াছে তাহা প্রকৃত পক্ষে শিক্ষা-সংস্কারের সহায়ক নয়। সেইরূপ, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার যে সকল সংস্কার-সাধনে উদ্যোগী হইয়াছেন তাহাও প্রকৃত শিক্ষা-সংস্কারের কাছ ঘেঁষিয়া যায় না। এই সকল সাধারণ সংস্কারে বিশ্ববিদ্যালয় সফলকাম হউন ইহা অবশ্য সকলেরই কাম্য; কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার দিক দিয়া বিচার করিলে এই সকল সংস্কার প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত স্বল্প ও গৌণ।

সম্পূর্ণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইলেও লিখিত-পরীক্ষা-পদ্ধতি সন্তোষজনক বলিয়া শিক্ষাবিদ্‌গণ বিবেচনা করেন না। তাই অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার পরিপূরক হিসাবে অতিরিক্ত ব্যবস্থার প্রচলন আছে; আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নাই। অধিকন্তু পরীক্ষা কেন্দ্রীভূত করিয়া বিপুলসংখ্যক উত্তরপত্রের পরীক্ষা একই বাঁধা নিয়ম অনুসারে করার প্রয়োজন হইয়া থাকে। কোনও পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র বিচার করিবার সময় তাহার শিক্ষকের মতামত আহ্বান করা এরূপ বিরাট ব্যবস্থায় সহজ নহে; নীতির দিক দিয়াও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মতামত গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু সকল শিক্ষকই একই বাঁধা নিয়মের অনুসরণ করিয়া, যন্ত্রচালিতের মত অধ্যাপনা করিবেন ইহা স্বাভাবিকও নহে, সঙ্গতও নহে। বিভিন্ন শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক; সুতরাং বিভিন্ন পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র বিভিন্ন হওয়াই সমীচীন। একই বাঁধা নিয়মে উত্তরপত্র বিচার করা হইলে সকল পরীক্ষার্থীর প্রতি সুবিচার নাও হইতে পারে। কেবল দুর্নীতি দ্বারাই পরীক্ষা দূষিত হয় এরূপ নহে; বিচার-বিভ্রম দ্বারাও হইতে পারে। কেন্দ্রীভূত পরীক্ষায় বিচার-বিভ্রমের পথ প্রশস্ত। সকলের প্রতি সমান বিচার করিবার উদ্দেশ্যে পরীক্ষা কেন্দ্রীভূত করিতে গিয়া আসল উদ্দেশ্যটিই বিফল করিবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়।

এই পঙ্গু পরীক্ষা-পদ্ধতিকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের স্নাতক-পূর্ব্ব স্তরের শিক্ষা পরিচালিত হইতেছে। অনেক দিনের সংস্কারবশে শিক্ষার প্রসঙ্গে পরীক্ষার কথাই আমাদের মানসপটে সর্ব্বাগ্রে উদিত হয়; শিক্ষার সংস্কার বলিলে আমরা সাদা কথায় পরীক্ষার সংস্কারই বুঝিয়া থাকি। এমন কি শিক্ষা-পরিচালক মহলেও এরূপ মনোভাব বিরল নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে এই মহলে একটি মতবাদের মৃদু গুঞ্জন উত্থিত হইয়াছিল। তাহার সার মর্ম্ম এই যে, "পরীক্ষার প্রশ্নের প্রকৃতি ও মান উচ্চতর করিলেই শিক্ষার সংস্কার সাধিত হইবে ও শিক্ষা উন্নততর হইবে। তাহা হইলে অধিকসংখ্যক পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইতেছে দেখিয়া শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই উপযুক্ত শিক্ষার প্রতি একনিষ্ঠ হইয়া উঠিবেন এবং শিক্ষার অপকর্ষ আপনা হইতে বিদূরিত হইবে।" সৌভাগ্যবশতঃ এই মতবাদ প্রবল হইতে পারে নাই।

পরীক্ষা দ্বারা শিক্ষানিয়ন্ত্রণ স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত। পূর্ব্বে শিক্ষা, পরে পরীক্ষা। শিক্ষালয়গুলিতে শিক্ষার যেরূপ মান প্রচলিত আছে, তাহা অপেক্ষা পরীক্ষার মান ঊর্দ্ধে স্থাপন করিবার নৈতিক অধিকার কাহারও নাই। হয়ত বা পরীক্ষার প্রশ্নের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন দ্বারা শিক্ষার প্রকৃতি কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। কিন্তু কার্য্যকরী হইলেও সকল পন্থা সমর্থনযোগ্য নহে। আজ দেশে খাদ্যাভাব নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহা দূর করিবার এক কার্য্যকরী পন্থা এই হইতে পারে যে, প্রকৃতির কঠোর বিধানে দেশবাসীর একাংশকে দুর্ভিক্ষহেতু বিলুপ্ত হইতে দেওয়া। সৌভাগ্যবশতঃ এরূপ সহজ পন্থা কাহারও মনে উদিত হয় নাই। শিক্ষাক্ষেত্রেও সহজ উপায় অপেক্ষা সঙ্গত উপায়ের অনুসন্ধান করিতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রয়োজন প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর। তাহাদিগকেই মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয়। অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় এক দিক দিয়া তাহাদের জীবনকে বিড়ম্বিত করিয়া তুলিয়াছে। শিক্ষার বিপর্য্যয় অপর দিক দিয়া তাহাদের কর্ম্মশক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। শিক্ষার অপকর্ষের জন্য আজ তাহারা কর্ম্মক্ষমতা হারাইয়া সমাজের পরিহাস ও উপেক্ষার পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষাই জাতীয় শক্তির ভিত্তি-স্বরূপ; শিক্ষা ব্যতীত কেবল আর্থিক বা প্রাকৃতিক সম্পদ জাতিকে শক্তিশালী করিতে পারে না। এই বৃহত্তর দৃষ্টিকোণের কথা নাই তুলিলাম; কিন্তু শিক্ষাই যাহাদের জীবন-মরণ সমস্যার কেন্দ্রস্বরূপ, তাহাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার ভার কি রাষ্ট্র, কি বিশ্ববিদ্যালয় অবহেলা করিতে পারেন না। অভিভাবকের কষ্টার্জ্জিত অর্থ ও তরুণ জীবনের অমূল্য সময়ের বিনিময়ে বৎসরান্তে কয়েকখানি প্রশ্নপত্র বিতরণ করিলে

ইহাদের প্রতি কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হইবে না। পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেই শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয় না। পরীক্ষা-সংস্কার শিক্ষা-সংস্কারের প্রান্তদেশ মাত্র। ইহার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষার যথোচিত পরিবেশযুক্ত শিক্ষালয়। তাই বলিয়া শিক্ষাকে ব্যয়সাধ্য করিলে চলিবে না। ব্যয়সাধ্য না করিলে শিক্ষা সুষ্ঠু হইতে পারে না—ইহা আংশিকভাবে সত্য। আজিকার শিক্ষালয়গুলির অবনতির প্রধান কারণ পরিচালনা-ব্যবস্থার সঙ্কীর্ণতা। তথাপি শিক্ষালয়ের উন্নতির জন্য অর্থের প্রয়োজনীয়তা আছে বৈকি। কিন্তু মধ্যবিত্ত শিক্ষার্থী সে ভার বহন করিতে অসমর্থ। শিক্ষা ব্যবসা নহে, শিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যয় শিক্ষার্থীর নিকট হইতে পূরণ হইতে পারে না। সুতরাং যদি শিক্ষার অত্যধিক সঙ্কোচ সঙ্গত না হয়, তাহা হইলে এই অতিরিক্ত ব্যয়ভার রাষ্ট্র ও ধনিক-শ্রেণীর মধ্যে ভাগ করিয়া লইতে হইবে। অন্যথা শিক্ষা মধ্যবিত্তের অনধিগম্য হইয়া শোচনীয় রূপে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে; কারণ সাধারণতঃ ধনিক শ্রেণীর শিক্ষার্থী সংখ্যায়ও অধিক নহে, শিক্ষায় একনিষ্ঠও নহে।

বর্ত্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে স্নাতকোত্তর (post-graduate) স্তরের শিক্ষার ভার কেন্দ্রীভূত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্বহস্তে গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে স্নাতকপূর্ব্ব স্তরের শিক্ষালয়গুলিতেই স্নাতকোত্তর স্তরের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রোপযোগী ব্যবস্থা হইত। এই পরিবর্ত্তনের ফলাফল স্পষ্টরূপে নির্দ্ধারণ করিবার মত সময় অতিবাহিত হইয়াছে। সুফল যাহা হইয়াছে তাহা স্নাতকোত্তর স্তরের অধ্যাপনা ও গবেষণাক্ষেত্রে। ইহা ন্যূনাধিক সকলের বিদিত; বর্ত্তমান প্রসঙ্গে ইহার আলোচনার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কুফল হইয়াছে স্নাতক-পূর্ব্ব স্তরের বিস্তীর্ণ শিক্ষাক্ষেত্রে। আজ যে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যর্থতা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহা এই কুফলেরই স্পষ্ট অভিব্যক্তি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দুই স্তর বিচ্ছিন্ন হইবার ফলে স্নাতক-পূর্ব্ব স্তরের শিক্ষকের মর্য্যাদা ও কার্য্যদক্ষতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। উচ্চ স্তর গঠন করিবার প্রাক্কালে বিভিন্ন শিক্ষালয়ের অপেক্ষাকৃত দক্ষ শিক্ষকগণ স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষকরূপে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃকআহূত হইলেন। প্রারম্ভে ইহার প্রয়োজন অবশ্যই ছিল। কিন্তু উচ্চ স্তর গঠন করিতে গিয়া নিম্ন স্তরের ভাঙন সুরু হইল—নিম্ন স্তরের শিক্ষকের মধ্যে কূপমণ্ডূকতা দোষ প্রকট হইতে লাগিল। উচ্চতর শিক্ষণীয় বিষয়ের সহিত সংস্রব পরিত্যক্ত হওয়ায় তাঁহারা স্থিতিশীল (static) হইয়া উঠিলেন। কোনও শিক্ষালয়ের সকল শিক্ষকই সর্ব্বোচ্চ গুণসম্পন্ন হইবেন এরূপ আশা করা যায় না; শিক্ষকতার ক্ষেত্রেও ক্রমবিকাশই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে স্বল্পসংখ্যক সর্ব্বোচ্চ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি উচ্চতর বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকিলে শিক্ষালয়ে উচ্চতর পরিবেশ সৃষ্টি হইতে পারে না।

"বিশ্ববিদ্যালয়ে" শিক্ষা (অর্থাৎ স্নাতক-পূর্ব্ব ও স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষা) ও "মাধ্যমিক" শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমটি "বিশেষ" শিক্ষা, দ্বিতীয়টি "সাধারণ" শিক্ষা। সাধারণ শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর রুচি ও যোগ্যতা অনুসারে শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে "বিশেষ" শিক্ষা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হইয়া থাকে। বিশেষ শিক্ষার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য শিক্ষণীয় বিষয়ে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণা করিবার শক্তি অর্জ্জন করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপককে কেন্দ্র করিয়া এই শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিকল্পিত হওয়া প্রয়োজন। অধ্যাপকগণ যে যে বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করিতেছেন, স্নাতক-পূর্ব্ব স্তর হইতেই তাহার উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। উচ্চ স্তর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, এই স্তরের শিক্ষা স্বতঃই "সাধারণ" শিক্ষার পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়ায়—"বিশেষ" শিক্ষার লক্ষণ অন্তর্হিত হয়। এইরূপে যাহা প্রকৃত পক্ষে সাধারণ শিক্ষা তাহার জন্য বর্ত্তমান ব্যবস্থায় আরও দুইটি বৎসর ব্যয়িত হইয়া থাকে।

সুতরাং দুই স্তর বিচ্ছিন্ন হইবার ফলে শিক্ষানীতির দিক দিয়া স্নাতক-পূর্ব্ব স্তরের শিক্ষার মান অবনত হইবার কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা-নীতি দ্বারা এই অবনতির মাত্রা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। স্নাতকোত্তর স্তরের ব্যয়-সঙ্কুলান করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অধিকতর রূপে পরীক্ষা-লব্ধ অর্থের উপর নির্ভর করিতে লাগিলেন। অভাব পূরণ করিবার জন্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়া প্রয়োজন; সুতরাং পরীক্ষা সহজ করিবার নীতি গৃহীত হইল। ক্রমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যতালিকার বৃহৎ অংশ স্পর্শ না করিয়াই—কেবল স্মৃতিশক্তির প্রয়োগ করিয়া কয়েকটি প্রচলিত প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া—পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব। যদিও শিক্ষকতার জন্য উচ্চতর গুণসম্পন্ন (qualified) ব্যক্তির প্রয়োজন অনুভূত না হইলেও পরীক্ষাকার্য্যে প্রধানের ভূমিকায় শিক্ষক অপেক্ষা উচ্চতর পদমর্য্যাদার ব্যক্তি নিযুক্ত হইলেন। শিক্ষার্থীদের মনের উপর প্রতিক্রিয়া হইল এই যে, তাহারা শিক্ষকের উপর নির্ভর করিবার কোন প্রয়োজন বোধ করিল না, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নগুলিকেই একান্তভাবে অবলম্বন করিল। সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা ও পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর একমাত্র সহায় করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাপগুলি অতিক্রম করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকবর্গের একটি শক্তিশালী অংশ শিক্ষায়তনগুলির সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নহেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আয়ব্যয়ের হিসাবে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যতই থাকুক না কেন, শিক্ষালয়গুলিতে তাঁহাদের গৃহীত নীতির প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইতে লাগিল তৎসম্বন্ধে তাঁহারা হয় অনভিজ্ঞ না হয় অমনোযোগী রহিয়া গেলেন। অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে শিক্ষালয়গুলি হইতে প্রকৃত শিক্ষার পরিবেশ ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতে লাগিল। তথাপি পুরাতন শিক্ষালয়গুলিতে অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ কতক পরিমাণে প্রকৃত শিক্ষার পরিবেশ রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু নূতন নূতন শিক্ষালয়ের অনুমোদন এবং পুরাতন শিক্ষালয়গুলির পরিস্ফীতির অনুমোদন করিবার সময় কর্ত্তৃপক্ষ শিক্ষানীতি অপেক্ষা অর্থনীতি দ্বারা যে অধিকতর প্রভাবিত হন নাই এরূপ মনে করিবার কারণ নাই; সুতরাং শিক্ষার পরিবেশ রক্ষা করিবার প্রয়াস তথাকথিত শিক্ষাবিস্তারের বন্যায় ভাসিয়া গেল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল শিক্ষায়তনের পরিচালনাও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার ক্ষুদ্রতর সংস্করণ মাত্র। এখানেও সাধারণতঃ পরিচালকবর্গের এক শক্তিশালী অংশ শিক্ষার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট নহেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষ-পুটাশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহারা স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের লাভ-ক্ষতির হিসাব এবং নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। সুতরাং প্রকৃত শিক্ষা উপেক্ষিত হইয়া শিক্ষা-ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে লাগিল।

এই পটভূমিকা যদি বাস্তব অবস্থা প্রতিফলিত করিয়া থাকে, তাহা হইলে সংস্কারের মূল সূত্র স্পষ্টতঃ এইরূপ:— বিশ্ববিদ্যালয়কে, তথা অনুমোদিত শিক্ষালয়গুলিকে অর্থ-কেন্দ্রিক ও পরীক্ষা-কেন্দ্রিক স্তর হইতে উত্তোলন করিয়া শিক্ষা-কেন্দ্রিক স্তরের উপর স্থাপন করিতে হইবে। স্নাতক-পূর্ব্ব স্তরের শিক্ষাকেন্দ্র যথাসম্ভব স্নাতকোত্তর স্তরের সহিত সংযুক্ত রাখিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে একাধিক স্নাতকো-ত্তর শিক্ষার কেন্দ্র স্নাতক-পূর্ব্ব স্তরের শিক্ষালয়গুলির সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। শিক্ষা ও পরীক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই অত্যধিক কেন্দ্রীভূত করিবার নীতি ত্যাগ করিয়া কতক পরিমাণে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। শিক্ষা পরিচালনা-ক্ষেত্র হইতে ক্ষমতালোলুপ ও স্বার্থান্বেষীদিগের প্রভাব হ্রাস করিয়া শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষাব্রতীদিগের প্রভাব বৃদ্ধি করিতে হইবে। শিক্ষালয়গুলিতে উপযুক্ত শিক্ষক ও উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ রক্ষা করিবার জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ছাত্রের পরীক্ষাগ্রহণ কার্য্যে শিক্ষকদের একটি বিশিষ্ট অংশ নির্দ্দিষ্ট রাখিতে হইবে। সর্ব্বশেষে শিক্ষার বিষয় নির্ব্বাচনে আংশিক ভাবে জাতীয় ও স্থানীয় প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

'পিউ, পিউ'

শ্রীগোপাললাল দে

'পিউ পিউ পিয়া পিয়া'
আধো জাগরণে মরমে পশিল কানের ভিতর দিয়া।
নবীন নিদাঘ, ত্রিযামা যামিনী মিলায় বনের দ্বারে,
উষা সাবধানী আঁচল খসায় মেদুর দখিনা বায়ে,
পুলকিত চোখে মত্ত চে'য়ে দেখে, শিরে শশাঙ্কলেখা,
একটু একটু ফুটিছে কেমন দূর দিগন্তরেখা;
শিশির ছড়ায়ে স্বপন উড়ায়ে বহিছে হিমেল হাওয়া,
হেনকালে শুনি প্রলাপোচ্ছ্বাস, 'পিউ পিউ পিয়া পিয়া'।

নরলোকবাসী ওখনো জাগে নি ঘরে ঘরে দেওয়া দ্বার,
আলোকে আঁধারে কোলাকুলি করে, 'শুক' সে সাক্ষী তার;
দারা ঝিঁঝিঁনী শিস্ দিয়ে তারা থামিয়াছে এত খনে,
শিথিল অঙ্গ রাতি-বিহঙ্গ লুকায় তিমির কোণে;
কাকেরা জাগেনি, কোকিল ডাকেনি, ভ্রমর বুলেনি ফুলে,
ও কারা গাহিছে অকুণ্ঠ স্বরে নিদমোহাগার কূলে?
আঁখি খুলে যায়, চারিদিকে চাই, উল্লসি উঠে হিয়া!
উতলা প্রভাত দুলি দুলি ভুলে, 'পিউ পিউ পিয়া পিয়া'।

বাতায়ন-পাশে হাতের নাগালে কৃষ্ণচির কচি ডালে,
হেরিনি কখন ফুলে পল্লবে ভরে' গেছে এককালে;
খুঁজে খুঁজে দেখি বিহগ-মিথুন পল্লব আড়ে বসি'
এ উহার পানে চাহি খনে খনে উঠিতেছে উচ্ছ্বসি'।
কি যে সেই ভাষা, কি যে ভালবাসা, কি পুলক ভরে গানে
বুঝাবো কেমনে? কৌতুকী, এসো শুনিবে আপন কানে,
শ্যামল গ্রামের নিরালা গোপনে শুনে যাও মরমিয়া,
নিদাঘ-রাতির শেষের পহরে 'পিউ পিউ পিয়া পিয়া'।

অস্বভাবী মানসতা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ

সংসারের পথে চলিতে হইলে আধিব্যাধির জন্য আমরা যতটা যন্ত্রণা ভোগ করি, বোধ হয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ভোগ করিতে হয় কলহ-বিবাদ মনোমালিন্যের জন্য। আবার এই কলহ-বিবাদ যত হয়, তাহার অধিকাংশই হয় আমাদের প্রতি লোকে অন্যায় করে বলিয়া ততটা নহে, যতটা হইতেছে লোককে আমরা ভুল বুঝি বলিয়া এবং লোকে আমাদের ভুল বুঝে বলিয়া। এই ভুল বুঝাবুঝি যদি না থাকিত তাহা হইলে সংসারে আমাদের অনেক দুঃখই কমিয়া যাইত। ধরুন আমি একজন নির্ব্বিরোধী ভদ্রলোক; আপনমনে আমি রাস্তা দিয়া যাইতেছি, এমন সময় একজন লোক অকারণে আমাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিতে লাগিল অথবা আমার গায়ে কাদা ছুঁড়িয়া মারিয়া আমাকে উপহাস করিতে লাগিল। ইহাতে আমার ক্রোধ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যদি শুনি যে সেই লোকটি পাগল, তাহা হইলে আমার ক্রোধ ততটা হইবে না, ফলে তাহার অন্যায়কে আমি খানিকটা ক্ষমার চোখে দেখিতে পারিব।

কিন্তু একেবারে উন্মাদ এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, এই দুই শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী নানা শ্রেণীর অস্বভাবী (abnormal) মনযুক্ত ব্যক্তি আছে যাহারা অন্যান্য বিষয়ে স্বাভাবিক হইলেও এক-আধটি বিষয়ে এমন একটা মনোবিকারগ্রস্ত যে, তাহাদের আচরণ কখনও কখনও ঠিক স্বাভাবিক খাতে প্রবাহিত হয় না। এই সমস্ত মনোবিকার সম্বন্ধে যদি আমাদের সঠিক জ্ঞান থাকে তাহা হইলে ঐ মনোবিকারযুক্ত ব্যক্তিদিগের সহিত মেলামেশা করিবার সময় আমরা খানিকটা ক্ষমা ও সহিষ্ণুতাপূর্ণ আচরণ করিতে পারি। তাহার ফলে আমরা নিজেরাও ততটা দুঃখ পাই না এবং অপরকেও ততটা দুঃখ দিই না। কাজেই যাহারা ঠিক উদ্দাম পাগলও নহে, আর সম্পূর্ণ স্বাভাবিকও নহে অথচ খানিকটা অস্বভাবী প্রকৃতির, সেই সমস্ত "বাইগ্রস্ত" লোককে চিনিয়া রাখা ভাল।

অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান নানা জাতীয় মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির শ্রেণীবিভাগ করিয়াছে; ইহাদের কতকগুলি হইতেছে যৌনপ্রবৃত্তির বিকৃতিজনিত, আর কতকগুলি হইতেছে কামজ চিন্তাতিরিক্ত অস্বাভাবিকতার ফল মাত্র। আমরা প্রথমে শেষোক্ত মনোবিকারযুক্ত ব্যক্তিদের কথা আলোচনা করিব।

যাযাবর—এই জাতীয় লোকের মধ্যে যেন একটা ঝড়ো হাওয়ার মত উদ্দামতা আছে। ফলে ইহারা স্থির হইয়া বেশী-দিন এক স্থানে টিকিয়া থাকিতে পারে না। "স্নেহ সুধা-মাখা বাসগৃহ তল," পুত্রকন্যার আকর্ষণ, দয়িতার প্রেম ইহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে হয়ত অনেকেই খুব কাজের লোক, মন দিয়া কাজ করিলে ইহারা কর্ম্মক্ষেত্রে খুবই উন্নতি করিতে পারে কিন্তু এক-টানা এক স্থানে চাকুরি করিবার মত ধৈর্য্য ইহাদের নাই। তাই ইহারা প্রতিদিন কাজ ছাড়ে, আবার ধরে। পথের দুঃখ ইহাদের অজ্ঞাত নহে, অনিশ্চিত জীবনের অসুবিধাও ইহারা জানে, তবুও নিশ্চিত সৌভাগ্য ছাড়িয়া অনিশ্চিতের মায়ামৃগের পিছনে ইহারা ছুটিবেই। ইহার কারণ কার্য্যে শৈথিল্য বা তজ্জনিত পদচ্যুতি নহে, শুধু "হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোন খানে" জাতীয় একটা প্রেরণা। অন্যান্য বিষয়ে ইহারা হয় ত অমায়িক, অত্যন্ত ভদ্র সদালাপী ও পরহিতৈষী। কিন্তু ইহাদের কেন্দ্র করিয়া কেহ নীড় রচনা করিয়া সুখী হইতে পারিবে না, দারা-পুত্র-পরিবারের ভরণপোষণ সম্বন্ধেও ইহারা নির্ভরযোগ্য অবলম্বন নহে।

উৎকেন্দ্রিক (Eccentric)—এই জাতীয় বায়ুগ্রস্ত ব্যক্তিরা তাহাদের কথাবার্ত্তা পোশাক-পরিচ্ছদ এমন কি চিন্তাপ্রণালী বাক্য-আচরণ প্রভৃতিতে একটু দলছাড়া খাপ-ছাড়া ভাব প্রকাশ করে। ইহার মূলে হয়ত কোন কোনও বিষয়ে দুর্ব্বলতা বা অসম্পূর্ণতা আছে। সম্ভবতঃ সেই অসম্পূর্ণতার দীনতাটুকুকে ঢাকিবার জন্যই তাহারা অন্যান্য বিষয়ে উদ্ধত-স্বেচ্ছাচারী-ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট লোকের ন্যায় অভিনয় করে। কাহারও সম্ভবতঃ নারী সম্বন্ধে দুর্ব্বলতা আছে, এই দুর্ব্বলতাটুকু ঢাকিবার জন্য সে হয়ত একেবারে সন্ন্যাসী পরমহংসের অভিনয় করে। সে অপর্য্যাপ্তবসনা রমণীর ছবি বা প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিয়া নিজেকে অশুচি মনে করে, বাড়ীর মেয়েদের সাজপোশাকের একটুমাত্রও বেচাল সহ্য করিতে পারে না ইত্যাদি। আবার কেহ হয়ত নিজের ব্যক্তিত্বের দীনতার জন্য ঘরে স্ত্রী অথবা আপিসে বড়বাবুর নিকট প্রতিনিয়ত অপদস্থ হয়। সে তখন বন্ধুবান্ধবের নিকট অথবা পুত্রকন্যার নিকট অকারণে একগুঁয়েমি দেখাইয়া নিজের ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তার অভিনয় করে।

কলহপ্রিয় (Trouble-makers)—যাহাকে মনস্তত্ত্বের

ভাষায় "Demantia præcox" (চিত্তভ্রংশী বাতুলতা) বলে, অনেক সময় তাহারই অভিব্যক্তি হইতেছে এই জাতীয় বায়ুবিকার। হয়ত তীব্র আত্মকেন্দ্রিকতা, নিজের সম্বন্ধে অত্যধিক উচ্চ ধারণা এবং তাহার ফলে অপরের সম্বন্ধে বিবেচনা বা সহৃদয়তার অভাব হইতেই ইহার সৃষ্টি হয়। এই জাতীয় বাইগ্রস্ত লোকেরা অল্প কারণেই বচসা করে, কলহ করে, সামান্য কারণে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে। নিজের স্বার্থসিদ্ধি হউক আর নাই হউক, কাহারও বিরুদ্ধে একটা এক নম্বর ঠুকিয়া দিতে পারিলেই ইহারা অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করে। অপরের ব্যথা বা মনের কথা ইহারা বুঝিতে চায় না, পারেও না। করুণা সহানুভূতি প্রভৃতির বালাই ইহাদের নাই, বন্ধুও ইহাদের কেহ নাই, শুধু নিজের সম্বন্ধে একটা মহামানী দুর্য্যোধন-জাতীয় মনোভাব ইহারা অন্তরে পোষণ করে এবং সেই মন্ময় দুর্য্যোধনটির পান হইতে চুণ খসিলেই তাহারা কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া দেয়। জীবনের পথে চলিতে চলিতে অতি তুচ্ছ ঘটনাকেও ইহারা কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে আত্মসম্মানের হানিকর ঘটনা মনে করিয়া কলহ আরম্ভ করে। নিজেদের মতবাদগুলিকে ইহারা এমনই অভ্রান্ত, এমনই পবিত্র বলিয়া মনে করে যে, তাহার বিরুদ্ধে কোনও ইঙ্গিত পর্য্যন্ত ইহারা সহ্য করিতে পারে না। অথচ অপরের মতবাদকে নির্ম্মম দৃঢ়তার এবং রূঢ়তার সহিত ইহারা অনায়াসেই আক্রমণ করিতে পারে। ইহারা যাহাকে ভাল বলিবে তাহা শুধু ভাল নহে তাহা হইবে উৎকৃষ্টতম, যাহাকে মন্দ বলিবে, তাহাকে শুধু মন্দ বলিয়াই ইহারা সন্তুষ্ট হইতে পারে না, তাহাকে নিকৃষ্টতম বলিয়া জোরগলায় প্রচার করিবে।

অথচ ইহারা ঠিক খারাপ লোকও নহে। ইহাদের মতের বিরুদ্ধে না গেলে ইহারা হয়ত বৈঠকী মজলিশী লোক; ইহারা হয়ত খোশ মেজাজে গল্প করিতে পারে, রসিকতা করিয়া আসর জমাইতে পারে, প্রথম সাক্ষাতে হয় ত তাহাদের চমৎকার লোক বলিয়াও মনে হইতে পারে, কিন্তু পরিচয় দীর্ঘ হইলেই বুঝা যাইবে যে, ইহাদের সহিত মানাইয়া চলা কতটা কঠিন।

গোঁড়া (Fanatics)—ইহারা এক-একটি বিষয়ে অত্যধিক মূল্য অথবা গুরুত্ব প্রদান করিয়া নিজেদের নিষ্ঠাকে একটা অস্বাভাবিক পরিণতি দান করে। নিষ্ঠা খারাপ জিনিস নহে, কিন্তু বাড়াবাড়িতে নিষ্ঠা জিনিসটাই হইয়া পড়ে একটা তামসিক ব্যাপার। তাহা সত্য দৃষ্টির ক্ষমতা হরণ করিয়া একটা আপেক্ষিক অন্ধতা দান করে। তবে এই গোঁড়ামি যদি নিষ্ক্রিয় ভাবে শুধু কাহারও ব্যক্তিগত আচরণকেই নিয়ন্ত্রিত করে তাহাতে সমাজের তত ক্ষতি হয় না, কিন্তু এই গোঁড়ামি যদি সক্রিয় হইয়া অপরকে আঘাত করে, তাহা হইলে তাহা অনেকেরই দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়। পৃথিবীর ইতিহাস এই জাতীয় দুঃখের কাহিনীতে পূর্ণ।

এই গোঁড়াদের মনে রাখা উচিত যে, গোঁড়ামি দিয়া তাহারা যে জিনিসটির মূল্য বাড়াইতে চেষ্টা করে, মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার বশে সেই জিনিসটিই লোকের কাছে আরও মূল্যহীন হইয়া পড়ে। ফলে গোঁড়ার দল যে নীতি বা মতবাদকে পক্ষপুটে পুষ্ট করিয়া শক্তিশালী করিতে চেষ্টা করে, সেই নীতি বা মতবাদটি তাহাদের প্রচেষ্টার জন্য ক্ষতিগ্রস্তই হয়।

অহেতুক পাপাচারী (Senseless criminals)—ইহারা অনেক সময়ই নিজেদের অজ্ঞাতসারেই পাপাচরণ করিয়া বসে। চুরি, গৃহদাহ, আক্রমণ এমন কি হত্যা পর্য্যন্ত ইহারা হয়ত নিতান্ত অকারণেই করিয়া থাকে।

সাধারণ লোকের আচরণ মনের "ইদ্" (id) বা আদিম প্রেরণা এবং "অধিশাস্তা" (super ego) বা সামাজিক নীতিবোধের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু এই জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে উক্ত সামঞ্জস্যটি নাই। ফলে আদিম প্রেরণা ইহাদের যেদিকে পরিচালিত করে, ইহারা অসংযত প্রবৃত্তিবশে তাহাই করিয়া বসে।

প্রক্ষোভী (Explosive psychopaths)—ইহাদের বিশেষত্ব হইতেছে হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠা আবার পরক্ষণেই হয়ত অতি নিরীহ ভাল মানুষ হইয়া পড়া। রাগিয়া গেলে ইহারা হয়ত মাথা খুঁড়িতে থাকিবে, পিস্তল উঁচাইয়া আত্ম-হত্যা করিতে যাইবে, ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িতে চেষ্টা করিবে, আবার একটু পরেই সবকিছু ভুলিয়া গিয়া যাহার উপর সে ক্রুদ্ধ হইয়াছিল তাহারই সহিত অমায়িক ব্যবহার করিবে।

বিষাদপ্রিয় (Depressive psychopaths)—এই জাতীয় ব্যক্তিরা দুঃখবাদীর দল, ইহারা প্রতিদিনের তুচ্ছ তুচ্ছ ঘটনাবলী, ব্যক্তিগত ছোটখাটো অপরাধগুলি লইয়াই মাথা ঘামাইতে থাকে এবং "হায়, মিছা মনে হয় জীবনের ব্রত মিছা মনে হয় সকলি" এই জাতীয় একটা মনোভাব লইয়া নৈরাশ্যের ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া দিন যাপন করে এবং কখন কখনও বা জীবনের গুরুভার ব্রত পালন করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়া বসে।

মিথ্যাপ্রবণ (Pathological liars)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "অলীক বাবু" এই জাতীয় বায়ুগ্রস্ত লোকের উদা-

হরণ। অকারণে অপ্রয়োজনে ইহারা মিথ্যার পর মিথ্যা কথা বলিয়া যায়। সাধারণতঃ ইহারা খুব সপ্রতিভ, জেরা করিয়া কোণঠাসা করিতে গেলে ইহারা পর পর মিথ্যার জাল বুনিয়া যাইতে থাকে। কিন্তু পরে যে এই সমস্ত মিথ্যা ধরা পড়িয়া যাইতে পারে, সেই হিসাবটি রাখে না। কার্নে ল্যাণ্ডিস এবং এম্. মারজোরিক তাঁহাদের *Textbook of Abnormal Psychology* নামক গ্রন্থে এই জাতীয় একজন মিথ্যাবাদীর উদাহরণ দিয়াছেন। সেই লোকটি ছিল একজন ছুতার, তাহার বয়স যখন ৫৫ বৎসর তখন একদিন সোজা এটর্নির অফিসে যাইয়া বলিল, সে ক্রোধের বশে একটি লোককে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে। তাহার পর সে কিভাবে এই হত্যাকাণ্ডটি করিয়াছে তাহার এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিয়া গেল যে ঘটনাটিকে কিছুতেই অবিশ্বাস করা যায় না।

তাহার পর পুলিস তদন্ত হইল এবং দেখা গেল যে, যাহাকে হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া লোকটি এত কথা বলিয়াছে, সে লোকটি জলজ্যান্ত বাঁচিয়া আছে! শুধু তাহাই নহে, ঐ লোকটির সহিত সে ছুতারটির দেখাসাক্ষাৎ পর্য্যন্ত হয় নাই!

এই জাতীয় মিথ্যার শাস্তি যে কি তাহা ঐ ছুতারটি জানিত, তবুও সে মিথ্যা বলিয়া বাহাদুরী দেখাইবার লোভটুকু সামলাইতে পারিল না। অথচ মজার কথা হইতেছে এই যে, ঐ ছুতারটি ঠিক পাগল নহে, অন্যান্য ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সাধারণ মানুষ!

যৌনপ্রবৃত্তির বিকৃতির জন্য যে সমস্ত অস্বভাবী মানসতার উৎপত্তি হয়, এইবার সেইগুলি আলোচিত হইতেছে। এই বিকৃতি নানা ভাবেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়া থাকে। এই বিকৃতির প্রকারভেদও নানা-শ্রেণীর হইতে পারে। কেহ কেহ এমন হয় যে হয়ত নিজেরই প্রেমে পড়িয়া যায় এবং নিজের রূপে মুগ্ধ হইয়া মশগুল হইয়া থাকে; এই অবস্থাটিকে স্বরতি বা স্বকামিতা (Narcissism) বলা যাইতে পারে। আবার কেহ কেহ এমনও হয় যে, সারাজীবন যৌন-চেতনা সম্বন্ধে সে নিজেকে অপরিণত অপোগণ্ড বলিয়াই মনে করে। ফলে তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া দাম্পত্য অথবা সামাজিক জীবনে নানাপ্রকার জটিলতর সৃষ্টি হয়। এই জিনিসটিকে অপোগণ্ডতা বা infantalism বলা যাইতে পারে।

বস্তুকাম (Fetichism) বলিয়া আর এক জাতীয় অস্বভাবিতা আছে। তাহার প্রভাবে মানুষ প্রেমাস্পদকে ছাড়িয়া এক-একটি বিশেষ বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের যৌনক্ষুধার নিবৃত্তি করে। ফলে কেহ হয়ত নারীর পরনের শাড়ীটি লইয়া, কেহ হয়ত মাথার ফিতাটী লইয়া বা হাতের আংটিটি লইয়াই তাহার যৌনক্ষুধা পরিতৃপ্ত করে।

যৌনপ্রবৃত্তির বিকৃতির রূপ অসংখ্য। প্রেমাস্পদের মনোরঞ্জন করার চেষ্টা মানুষ হইতে পশুপক্ষী পর্য্যন্ত সকলের মধ্যেই আছে। 'কুমারসম্ভবে' দেখা যায়:

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈক পাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ
শৃঙ্গেন চ স্পর্শ নিমীলিতাক্ষীং
মৃগীম কণ্ডুয়ত কৃষ্ণসারঃ। ৩৬,৩

অর্থাৎ, একটি পুষ্পকে পাত্র স্থির করিয়া ভ্রমর নিজ প্রিয়তমা ভ্রমরীর অনুবর্ত্তন করিয়া মধুপান করিতে লাগিল এবং কৃষ্ণসার মৃগ স্পর্শসুখে নিমীলিতলোচনা মৃগীকে শৃঙ্গ-দ্বারা কণ্ডুয়ন করিয়া দিতে লাগিল।

অথবা—

দদৌ রসান্ পঙ্কজ রেণুগন্ধি
গজায় গণ্ডুষ জলং করেণুঃ
অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং
সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা। ৩৭।৩

অর্থাৎ, হস্তিনী প্রেমভরে পদ্মরাগ-সুগন্ধীকৃত জলগণ্ডূষ স্বীয় প্রিয়তম করীকে পান করাইতে লাগিল এবং চক্রবাক্ অর্দ্ধোপভুক্ত মৃণালখণ্ড প্রণয়িনীকে ভোজন করাইল।

ইহাই ত প্রেমের চিরন্তন অভিব্যক্তি। কিন্তু ইহারও বিকৃতি আছে। প্রেমাস্পদকে দুঃখকষ্ট দিয়া কাঁদাইয়াও এক শ্রেণীর লোক তৃপ্তি পায়। 'রাহুর প্রেমে' রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন:

রোগের মতন বাঁধিব তোমারে দারুণ আলিঙ্গনে
মোর যাতনায় হইবি অধীর
আমারি অনলে দহিবে শরীর
অবিরাম শুধু আমি ছাড়া আর কিছু না রহিবে মনে।

প্রেমের এই জাতীয় নিষ্ঠুর লীলা অনেকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে আলিঙ্গন এত কঠোর হয়, চুম্বন এত তীব্র হয় যে, তাহা অনেক সময়েই অসহনীয় হইয়া উঠে। প্রেমের এই নির্ম্মম অভিব্যক্তিটিকে ধর্ষকাম (sadism) বলা যাইতে পারে।

ইহার আবার বিপরীত দিকও আছে। মানুষ শুধু যে প্রেমাস্পদকেই দুঃখ দেয় তাহা নহে, অনেক সময় নিজেকেও দুঃখ দিয়া একটা তৃপ্তি পাইয়া থাকে। এই স্বেচ্ছাকৃত আত্মনিপীড়নের প্রবৃত্তিটিকে মর্ষকাম (masochism) বলা হয়।

যৌনপ্রবৃত্তির অস্বভাবিতা অনেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত লজ্জাকর জঘন্য পরিণতির দিকে মানুষকে টানিয়া লইয়া যায়।

পুরুষের ক্ষেত্রে এমন অনেক অক্লিষ্টকামী (satyriasis)

ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের যৌনক্ষুধা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না এবং তাহারা প্রায় অনিবার্য্য ভাবে ব্যভিচারের পথে আকৃষ্ট হয়। এই কামোন্মত্ততা নারীর ক্ষেত্রেও বিরল নহে। প্রায় সব সমাজেই "বৃষস্যন্তী"তার (Nymphomania) উদাহরণ যথেষ্ট আছে এবং ইহার ফলেই গণিকাবৃত্তি ব্যভিচার প্রভৃতি পাপের দ্বারা সমাজ কলঙ্কিত হয়। বার্নার্ড শ তাঁহার *Mrs Warren's Profession* এবং শরৎ চন্দ্র তাঁহার "নারীর মূল্য" নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন, নারীর গণিকাবৃত্তির কারণ হইতেছে অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা, স্বামিত্বের অত্যাচার প্রভৃতি। কথাটা হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই সত্য। তাহা হইলেও নিছক কামোন্মত্ততা বা বৃষস্যন্তীতার জন্যও যে ব্যভিচার ঘটিয়া থাকে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এই সমস্ত অস্বভাবী ব্যক্তিত্বের কারণ প্রকৃতি প্রভৃতি লইয়া অনেক গবেষণা হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত গবেষণা হইতে কোনও সর্ব্বজনস্বীকৃত সিদ্ধান্ত আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। শুধু তাহাই নহে, এমন ঔষধপত্রও আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই যাহা দ্বারা এই অস্বভাবী আচরণগুলিকে স্বাভাবিক খাতে প্রবাহিত করা যাইতে পারে। কাজেই সাধারণ মানুষের একমাত্র উপায় হইতেছে এই জাতীয় অস্বভাবী মানসতাযুক্ত লোকগুলিকে চিনিয়া রাখা এবং ইহাদের সহিত খানিকটা ক্ষমা ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করা। ইহাদের নিকট হইতে সাধারণ স্বাভাবিক মানুষের আচরণ প্রত্যাশা করা চলিবে না এবং তাহা জোর করিয়া দাবি করিলে অনর্থক দুঃখের মাত্রা বর্দ্ধিতই হইবে।*

* এই সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠক ডি. ক্যারণ এবং পি. ম্যাগিনসনের *Psychopathetic Personality*, কার্ণে ল্যান্ডিস এবং এম. মারজোরিক বোলেসের *Textbook of abnormal Psychology*, ডি. কে. হেণ্ডারসনের *Psychopathetic States* প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিতে পারেন।

যোগভ্রষ্ট

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আর একটু যদি বিশুদ্ধ হ'ত, সতর্ক হ'ত মন,
হ'ত না বিফল আমার এই জীবন।
গরুড় পাখীর পাখার বাতাস সুধা হিল্লোল প্রায়
কতবার এসে লেগেছে আমার গায়।
শুনেছি তাঁহার বাঁশরীর সাড়া পেয়েছি অঙ্গবাস,
পুলকে বন্ধ হইয়াছে নিঃশ্বাস।
সাগর সমীপে ক্ষুদ্র নদীও হয় তরঙ্গাকুল
তাহাকেই হয় সাগর বলিয়া ভুল,
তেমনি আমিও হারায়ে গেলাম কি বিপুল মহিমায়!
সব অনিত্য মিলালো নিত্যতায়।
মনে হ'ল এই মহা মুহূর্ত শেষ হইবার নয়
চিরদিন তরে হয়ে রবে অক্ষয়।
যাঁহারে পাইলে সব পাওয়া যায়, সকল দ্বৈত ভুলি,
মধুময় হয় এই পার্থিব ধূলি,
সেই সে আমার শত জনমের শত সাধনার ধন
পলকে কোথায় হ'ল যে অদর্শন।
নির্ব্বোধ আঁখি, দুর্ব্বল আঁখি হ'ল না উন্মীলিত
প্রতিপদ-চাঁদ হ'ল যে অস্তমিত।
শুধু জানিলাম ভগবানে দেখা নহেক অসম্ভব—
সাধু জীবনের ওই তো মহোৎসব।
প্রতি মানুষের ভিতরে রয়েছে উপাসিকা গোপবধূ
প্রতি ফুলে রয় যেমন করিয়া মধু।
অসম্ভব কি আছে মানুষের? তুলনা তাহার নাই
পেতে পারে রাস-পরিমণ্ডলে ঠাঁই।
পূর্ণকুম্ভ লয়ে গেল মোর সাথীদল সারি বাঁধি,
ভগ্ন কুম্ভ লয়ে আমি একা কাঁদি।
যোগভ্রষ্ট সর্ব্বভ্রষ্ট উড়ু উড়ু করে মন
নয়নে লেগেছে সে রূপের অঞ্জন।

বন্দী যারা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৭

বৈকালে অমলেন্দুদের বাইরের ঘরে সবাই জড়ো হ'ল। শশাঙ্ক, ভূপতি, সুবোধ, শান্তি, অনিল, শরদিন্দু, অমর, মাধব এরা এসেছে, আরও অনেকে আসে নি।

প্রভাত বললে, মাত্র এই ক'জন ?

অমলেন্দু বললে, আরও বেশী আশা কর ? এ তো আর ডিফেন্স পার্টির সভা নয়—লাঠি ছোরা বন্দুক—এসিড যোগাড় করার ব্যাপারও নয়—

ভূপতি বললে, এই ভাল। 'অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' বলে একটা প্রবাদ আছে জান তো ?

প্রভাত বললে, আড়াই শো মেম্বারের মধ্যে অন্ততঃ পঞ্চাশ জনকেও আশা করেছিলাম।

ভাগ্যিস পঞ্চাশ জন আসে নি! অমলেন্দু হাসল।

মানে ? ভ্রুকুটি করে চাইলে প্রভাত।

আরে ঘর তো এইটুকু—পঞ্চাশ জন এলে মিটিংটা বসত কোথায় ? উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠল অমলেন্দু। বললে, পাবে হে পাবে—আড়াই শো কেন—আড়াই হাজার কি তারও বেশী। আগে স্বাধীনতা ঘোষণা হোক—তখন ঝাঁকিয়ে শোভাযাত্রা বার হবে।

প্রভাত নিঃশ্বাস ফেলে বললে, তা ঠিক।

ক' মাসেরই বা কথা। লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণার দিন থেকে—কলকাতা-নোয়াখালি-বিহার—তারপর আবার কলকাতা—তাণ্ডব লীলায় ঘূর্ণিবাত্যা প্রায় সমগ্র দেশকে আলোড়িত করেছে। শক্তি পরীক্ষার নেশায় ছেলেরা দল গড়েছে—সভ্যসংখ্যা বেড়ে গেছে আশাতীত ভাবে। উত্তেজনার মুহূর্তে অস্ত্রসংগ্রহ, বোমা তৈরি, ঘরে আগুন লাগানো—একযোগে আক্রমণের মহড়া সবই চলেছে নিয়মিত ভাবে। সবাই এসে মিলেছে সেনদের পাঁচিল-ঘেরা বড় উঠানে—এত লোক এসেছে যে উঠানে জায়গা হয় নি।

আজ যে উদ্দেশ্যে সবাই মিলবে—তাতে যুদ্ধের উন্মাদনা নেই—উৎসবের উল্লাসও নেই। মানুষের নৈতিক চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা নম্রভাবে অথবা বলপ্রয়োগে যে করেই হোক সকলের অঙ্গীভূত করতে হবে।

অমলেন্দু প্রস্তাব করলে, সমিতির নাম থাক জন-কল্যাণ সমিতি।

ভূপতি বললে, 'জনের কল্যাণ কতটুকু করতে পারব জানি না—নামের ঘটায় লোক হাসানো ঠিক হবে কি ?

প্রভাত বললে, লোক হাসানোর কথা বলছ কেন ? আমরা তো লোক-দেখানো কাজ করতে নামছি না।

কিন্তু জন-কল্যাণ করব—এই অহঙ্কারও আমাদের মানায় না।

তা হলে তোমার মতে এর নামকরণের প্রয়োজন নেই ? অমলেন্দু পরিহাসের সুরে বললে।

ভূপতি বললে, জনসেবা সমিতিও রাখা যায়। সত্যিই তো আমরা সেবার ভাব নিয়ে কাজ করব।

প্রভাত বললে, বেশ বলেছ ভূপতি—এর নাম জনসেবা সমিতি থাক। তারপর ? এর কর্ম্মসূচী ঠিক করতে হবে তো ?

বেশী বাড়িয়ে লাভ নেই—যা আমরা কন্‌ট্রোল করতে পারব তাই নিয়ে কাজে নেমে পড়ি এস।

প্রভাত বললে, আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে কালোবাজার ধ্বংস করা।

শশাঙ্ক বললে, বেশ করে ভেবে দেখ—এ কাজে বাধা আসবে যথেষ্ট।

'জানি'—প্রভাত বললে, 'যাদের স্বার্থহানি ঘটবে তাঁরা তো চটবেনই। কালোবাজারের মহাজন, বিক্রেতা—এমন কি বড় বড় ক্রেতা সবাই দাঁড়াবেন আমাদের বিপক্ষে। হয়তো রাষ্ট্রনায়কেরাও বাদ যাবেন না।

তবে ? টাকার জোরে তাঁরা আইনের ফাঁক বার করবেন—তা থেকে কি করে রক্ষা পাব আমরা ? শান্তি প্রশ্ন করলে।

আমাদের সঙ্কল্প আমাদের রক্ষা করবে।

অনিল মন্তব্য করলে, অবশ্য বেশী দিন আমাদের এই ভার বইতে হবে না। দেশে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁরাই বইবেন এই ভার।

সে যদি হয়—আমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে। ভূপতি হাসল।

কেন হবে না ? নিশ্চয় হবে।

অবশ্য এই আশা নিয়েই আমরা কাজে নামছি। কিন্তু প্রভাত-দা—জাতীয় ছাপ পড়লেই রাতারাতি কি সব বদলে যাবে ? বহুরূপীরা খদ্দর পরে ভেক নিয়ে বহু অঘটনই তো ঘটাতে পারে।

প্রভাত বললে, আজও মহাত্মাজী রয়েছেন আমাদের মধ্যে—তাঁর কার্য্যের দৃষ্টান্ত রয়েছে আমাদের সামনে—আমরা পারবই।

শশাঙ্ক বললে, কিন্তু পুঁজিপতিদের শাসন করতে পারবেন

কি রাষ্ট্রনায়কেরা ? রাজ্য চালাতে গেলে—বিশেষ করে এই সর্বস্ব-শুষে নেওয়া রাজ্য—এ চালাতে গেলে—ওদের সহ-যোগিতা পেতেই হবে।

তাতে কি ?

কল দাঁড়াবে বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক। কিছু ছেড়ে দিয়ে কিছু নেওয়ার রীতি—যার মধ্যে রয়ে যায় গলদ।

ভূপতির কথার উত্তরে অমলেন্দু বললে—তা থাকুক—ক্রমে এ গলদও দূর হবে। গাছের গোড়া ধরে সজোরে নাড়া দিলেই একসঙ্গে সব পাকা পাতা বা কল খসে পড়ে না—কিছু থেকেই যায়। একসঙ্গে সবুজ করার চেষ্টা—

প্রভাত বললে, ও নিয়ে বিতর্ক থাক। আজ আমাদের দরকার কাজ করা—যে নীতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে মানুষ—তাতেই তাকে প্রতিষ্ঠিত করা।

শশাঙ্ক হো হো করে হেসে বললে, নীতিবিদ্‌রা সাধারণের কাছে ভয়ঙ্কর জীব—প্রভাত। তারা কোন কালে জনপ্রিয় হতে পারে না।

আমরা তো আর নেতৃত্ব করতে যাচ্ছি না যে জনপ্রিয়…

জনপ্রিয় না হলে জনসেবায় নামব কি পুঁজি নিয়ে !

বহুক্ষণ ধরে তর্কবিতর্ক হ'ল। সবাই একবাক্যে স্বীকার করলে এর প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু আইন কতটুকু সাহায্য করবে—সেটাও ভেবে দেখতে হবে। সরকার বলছেন—কালোবাজার দমনে সহায়তা করবেন—ক্রেতার সহযোগিতাও তাঁরা চাইছেন। তাঁরা বার বার বলছেন—জিনিষের ন্যায্য দাম দাবি করুন—জিনিষ কিনে রসিদ নিন—নিকটস্থ পুলিস অফিসারকে জানান—দুর্নীতি দমনে তাঁরা যথাসাধ্য করবেন।

যাই হোক, ওরা আরও কয়েকটি প্রস্তাব করলে। তার মধ্যে—শিক্ষা সংস্কৃতির কথাটিও প্রসঙ্গত: এসে পড়ল।

ভূপতি বললে, সংস্কৃতি বলতে আমরা কি বুঝব ?

সুবোধ বললে, শিক্ষা দীক্ষা নিশ্চয়।

অনিল বললে, চালচলনটাই বা নয় কেন ?

আর পোশাক-পরিচ্ছদ ? শান্তি প্রশ্ন করলে।

প্রভাত বললে, ভাষাও বলতে পার। কিন্তু এগুলি সব মিলিয়েই কি সংস্কৃতি নয় ? ভারতের বেদ পুরাণ রামায়ণ মহাভারতে—মানুষের আচার-আচরণে এর প্রমাণ রয়েছে। যাই হোক—আমরা সাহিত্য-সেবাকে এর মধ্যে বেছে নেব। প্রত্যেক মাসের শেষে—আমাদের আলোচনা বৈঠক বসবে—গুণী জ্ঞানী কোন লোককে এনে তাঁর বক্তৃতা শুনব—তাঁর সঙ্গে আলোচনা করব।

পোশাক-পরিচ্ছদটাও সেই সঙ্গে—

থাক—থাক—একসঙ্গে অতগুলি বিষয় সমিতির পক্ষে না হোক—সভ্যদের পক্ষে বেশ গুরুপাক হবে নাকি ? শশাঙ্ক হেসে উঠল।

প্রভাত বললে, সবই তো একসঙ্গে নিচ্ছি না আমরা, আমাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে ভাল জিনিষ রাখতে হবে বৈ কি।

তা হলে আসছে সপ্তাহে সাহিত্য বৈঠক নিয়ে সমিতির উদ্বোধন করা যাক কি বল ?—ভূপতি প্রস্তাব করলে।

বেশ—বেশ !…

তরুণ-মনে উৎসাহের জোয়ার এসেছে। একটা কিছু করতে হবে—যা নিয়ে জীবন ভরে—জীবনের পাত্র আনন্দের সুধায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং সেটি যত শীঘ্র হয় ততই ভাল।

বাইরে এসে ওরা দেখলে একটি রোয়াকে বসে পাড়ার আরও কয়েকটি ছেলে গল্প করছে। ওদের হাসি ঠাট্টায় পাড়াটা কেঁপে উঠছে, বিড়ি সিগারেটের ধোঁয়ায় মাথার উপরের গ্যাসের আলোটি পর্য্যন্ত ঘোলাটে দেখাচ্ছে।

প্রভাত দাঁড়িয়ে পড়ল তাদের সামনে। বললে, তোমরা সব এখানে বসে রয়েছ অথচ—গেলে না ?

একটি ছেলে তাড়াতাড়ি বললে, আপনারা তো রয়েছেন—যা আপনাদের মত—তাই আমাদেরও মত।

মতামতের কথা নয়—সকলেরই এতে কর্ত্তব্য রয়েছে ত।

দলের মধ্য থেকে একটি ছেলে অস্ফুট মন্তব্য করলে, ক্লাবেও স্কুল বসালে আমরা যাই কোথায়। আমরা যে নাম-কাটা সেপাই !

শান্তি ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, শিক্ষাটা খারাপ জিনিষ নয়, ওতেও আনন্দ আছে।

দলের মধ্যে অসন্তোষের চাপা গুঞ্জনধ্বনি উঠল।

একটি ছেলে স্পষ্ট বলে উঠল, কি জানেন স্যার—আমরা ওসব সভা-টভা—কাগজ-কলমের লেখাটেখা বুঝি না—আইনকানুনকে ভয় করি—বলুন কি করতে হবে—ব্যস—। কি বলিস রে সতু—

আর একজন উল্লাস-ধ্বনি করে বললে, বলুন না স্যার কি করতে হবে।—বোমা তৈরী বলুন—বাল্‌বে এসিড ভর্ত্তি বলুন—রকেট করে আগুন ছোঁড়া বলুন—দেখেছেন তো বচ্ছরে।…পুলিস এসে না পড়লে পাড়াকে পাড়া লোপাট করে ছাড়তাম।

এরা উত্তেজনা চায়—হৈ-হল্লায় গা ঢেলে দিয়ে চায় ভেসে যেতে। ঘটনার স্রোত কূলেই নিয়ে যাক—কিংবা গভীরে—এদের মাথাব্যথা নেই।…অবশ্য একথা অস্বীকার করা যায় না—এরা না থাকলে প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম দিবসের পর—এ পাড়ার অস্তিত্ব হয় তো থাকত না। তবু এদের এরূপ উন্মাদনাকে ভয় করে প্রভাতরা। ওরা যেন দুরন্ত আগুন—ঘটনার বায়ু পেয়ে মুহূর্ত্তে দাবানলে পরিণত হয়। কোনমতেই আয়ত্তে আনা যায় না। ওদের নীতিবোধকে কোনমতে জাগিয়ে তুলতে পারলে হয়ত সংগ্রাম-পর্ব্বের গতিটাকে গঠন-পর্ব্বের

সাধনার সঙ্গে সংযুক্ত করা সহজ হয়। আর সেই সংযোগে—বিশ্বকল্যাণ—

স্যার—ভুলবেন না আমাদের—আপনাদের জান মান বাঁচিয়েছি—

প্রভাত বললে, কিন্তু তোমরা যে সঙ্ঘবদ্ধ থাকতে চাও না, সঙ্ঘের নিয়ম না মানলে—

সব নিয়ম কি মানা যায় স্যার।...একটু ক্ষেমা-ঘেন্না করে না নিলে—

নেবেন স্যার—ক্ষেমা ঘেন্না করে নেবেন। আর সকলে হৈ হৈ করে উঠল।

প্রভাতকে টেনে নিয়ে এল ভূপতি। খানিক ঘুরে এসে বললে, দুঃখ হয় প্রভাত যে এদের শক্তি এই ভাবে নষ্ট হচ্ছে!

ওরা সবাই কি লেখাপড়া করে না—সবাই কি—

লেখাপড়া—? এই একটা বছরে—ক' দিন স্কুল কলেজ খোলা ছিল—ছেলেরা নিশ্চিন্তে ক'টা দিন পড়তে পেয়েছে! এরা হয়তো খুব খারাপ ছেলে ছিল না—কিন্তু মানুষের মন বাঁধন-ছেঁড়া প্রাণীর মত—একবার যদি নিয়ম ভাঙল—

প্রভাত নিঃশ্বাস ফেলে বললে, তবু এদের চাই আমরা। এদের ঠিকমত না চালাতে পারলে আমরাও ঠিকমত চলতে পারব না ভাই। আচ্ছা—চলি।

৮

পরের দিন দুপুরবেলায় পনেরো টাকার একটা মনি অর্ডার এল প্রভাতের নামে। একসঙ্গে পনেরো টাকা—কে পাঠালে! উত্তেজনায় সে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে কুপনটা নিয়ে দেখতে লাগল কে পাঠালে টাকা? লেখাটি পড়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল মিনিট দুই। এও কি সম্ভব? লেখার পারিশ্রমিক পাঠিয়েছেন—কাগজের মালিক? নতুন লেখকের লেখার পারিশ্রমিক—চাইবার আগেই পাঠিয়েছেন এবং বিলম্বে পাঠাবার জন্য মার্জ্জনা চেয়েছেন। আশ্চর্য্য তো! যেসব কাগজ নিয়মিত টাকা দেয় এটি তাদের সগোত্র নয়।

মাঝারি গোছের একখানি পূজাসংখ্যায় প্রভাতের একটি লেখা বার হয়। সে কাগজ লেখককে পারিশ্রমিক হতে বঞ্চিত করে না—এই আশ্বাস পেয়ে সে কর্ম্মকর্ত্তাদের দ্বারস্থ হয়েছিল।

কি চাই আপনার? পুরু লেন্সের ভিতর থেকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি হেনে প্রকাণ্ড গোলমুখো কর্ম্মকর্ত্তা কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলেন।

লেখার টাকা চাইতে এসেছি—এটা সোজাসুজি বলতে পারা যায় কখনও? লজ্জায় মাথা নামিয়ে কোনমতে সে বলেছিল, পারিশ্রমিক—

কিসের পারিশ্রমিক? আপনি কি আমাদের কাগজে লিখেছেন? কি নাম আপনার?

উত্তর দিতে সঙ্কোচে মাথা কাটা গিয়েছিল।

কি করেন আপনি? ষ্টুডেণ্ট? কবিতা লিখেছেন বুঝি? কবিতা নয়? গল্প?

টেবিলের বাঁ ধারের র‍্যাক থেকে পূজাসংখ্যাখানি টেনে নিয়ে পাতা উল্টাতে লাগলেন তিনি—আর দুরু দুরু বুকে সামনে দাঁড়িয়ে প্রভাতের চোখ কান মুখ ক্রমশঃ গরম হয়ে উঠতে লাগল।

পূর্ণ পাঁচ মিনিট পাতা উল্টানোর পর লেখাটা আবিষ্কার করে ভদ্রলোক বললেন, এই লেখার জন্য আপনি দক্ষিণা চান?

প্রভাত সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে শুষ্ক কণ্ঠে বললে, কিন্তু আপনারা তো পারিশ্রমিক দেন।

ঠিকই শুনেছেন—পারিশ্রমিক দিই, কিন্তু সকলকে নয়। একটু থেমে তিনি বললেন, আপনারা নতুন লোক—কিছুদিন হাত মকসো করুন। বড় বড় কাগজে লেখা বেরুলে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে ভাবুন। এখন থেকেই যদি টাকার খাঁই করেন তো সাহিত্য-সেবা করবেন কোন্ পুঁজি নিয়ে। একজন নামী লেখকের দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন, জানেন—পুরো একটি বছর উনি আমার কাগজে লিখেছেন, কিন্তু পারিশ্রমিক দাবি করেন নি।

পুরো পনেরো মিনিট ভদ্রলোকের উপদেশামৃত গলাধঃকরণ করে প্রভাত তাড়াতাড়ি চলে আসতে পেরেছিল। এই অতিতিক্ত অভিজ্ঞতার জন্যই আরও কয়েকটি পত্রিকায় লেখা বার হলেও পারিশ্রমিকের আশায় মালিক বা সম্পাদকের দ্বারস্থ সে হয় নি। তাঁরাও যেচে টাকা পাঠান নি।

আজ সত্যই অঘটন ঘটল। টাকাটা হাতে নিয়ে ওর উৎসাহে জোয়ার এল। নূতন লেখককে সম্মানমূল্য দিতে পারে এমন পত্রিকাও আছে! এই সম্মানপ্রাপ্তির সঙ্গে নিজের শক্তিকে নূতন করে আবিষ্কার করলে প্রভাত। এই অর্থ তো অভাব মোচনের আশ্বাস নয়—মানুষের সুপ্ত সৃজনীশক্তিকে উদ্দীপ্ত করে পৃথিবীতে স্বর্গলোক রচনার গোপন মন্ত্রটি জানিয়ে দেওয়া। নিজেকে তার এত ভাল লাগছে এই মুহূর্ত্তে। এই মুহূর্ত্তে আর একটি গল্প লিখবে সে—যা প্রকাশিত হয়েছে তার চেয়েও উৎকৃষ্ট একটা গল্প যা সাহিত্যে স্থায়ী মূল্য পাবে।

প্রভাত ঘরের দুয়ার বন্ধ করে কাগজ কলম নিয়ে বসল। ওর মুখ চোখ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে—শঙ্কা সঙ্কোচে নয়—আনন্দের প্রখর উত্তেজনায়। নবসৃষ্টির মুহূর্ত্তে সৃষ্টিকর্ত্তা কি এমনি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন? আঙুল টন টন করছে—তবু থামতে পারছে না। মনের মধ্যে ভাব-কল্পনার প্রবাহ রসঘন বিষয়বস্তুর সংযোগে দানা বাঁধছে—কাহিনী গড়ে উঠছে।

ক্ষণমুহূর্তাশ্রয়ী কল্পনাকে অক্ষরের শৃঙ্খলে বন্দী করে ফেলতে না পারলে পৃথিবীর কোলাহলে কোথায় হারিয়ে যাবে।

দুয়ারে কয়েকবার আঘাত পড়েছে—প্রভাত সাড়া দেয় নি। সে তো মায়ের মত জপে বসে নি, আসন ত্যাগ করলে সাধনার বিঘ্ন হবে যে। রান্নাঘরে কড়াইয়ে ডাল চাপিয়ে—এ ঘরে কোশাকুশি গঙ্গাজল নিয়ে আচমন করে মা জপে বসেন। জপেই বসেন মাত্র—সমস্ত ইন্দ্রিয় সচকিত হয়ে থাকে ঘরের বাইরে যা ঘটছে তার উপর।

ওরে—ডালটা যেন চুঁই-চুঁই করছে—জল কমে গেছে বুঝি? একটু জল ঢেলে দে লক্ষ্মী।

ওই যা:—ময়দার জল দিতে ভুলে গেছি।

ওরে লক্ষ্মী—একটু সাবান কুচিয়ে মালায় রাখ—আর বালিশের ওয়াড় ক'টা খুলে দে।…আকাশে মেঘ করেছে আকালফুত—এক গাঁই কাপড় মেলে দেয়া আছে ছাদে—দেখিস যেন ভিজে না যায়।

মন আর মন্ত্র—দুয়ের ব্যবধান যোজন-পথ—সে পথ অতিক্রম করার শক্তি সুনয়নীর নেই।

আবার আঘাত পড়ল দরজায়—জোরে এবং অবিরাম। শেষ লাইন ক'টা কোনমতে টেনে দিয়ে প্রভাত উঠে পড়ল। মা শুকনো মুখে বাইরে দাঁড়িয়ে।

প্রভাতকে দেখে বললেন, ঘুমিয়ে পড়েছিলি বুঝি? সেই থেকে কড়া নেড়ে নেড়ে হাত ব্যথা হয়ে গেল—তবু যদি তোর সাড়া পাই! এগিয়ে ঘরের মধ্যে এলেন। তক্তপোষের উপর কাগজ কলম ছড়ানো রয়েছে দেখে সুনয়নী হাসিমুখে বললেন, দরখাস্ত লিখছিলি বুঝি চাকরির জন্ত? তা বলতে হয়। আচ্ছা আমি আর এক সময়ে আসব'খন।

মাকে গমনোদ্যত দেখে প্রভাত বললে, আমার কাজ হয়ে গেছে।

সুনয়নী মুখ ফিরিয়ে হাসলেন, ওঁর আপিসেই দিচ্ছিস তো? উনিও তাই বলেন—আমরা থাকতে থাকতে ছেলেটার একটা হিল্লে লাগিয়ে দিয়ে যেতে পারি যদি—

প্রভাত বিরক্তি দমন করতে না পেরে বললে, আসল কথাটা কি তাই বল—আমি এখনি বার হব।

বার হবি? তবে তো ভালই হ'ল বাবা। দেখ—বলে আঁচলের তলা থেকে দু'গাছি ক্ষয়বয়া রুলি বার করে বললেন, এই দু'গাছা কোন দোকানে যদি বিক্রী করে—

বিক্রী! প্রভাত বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। আছে তো মাত্র ঐ দু'গাছা—তাও—

মা ম্লান হেসে বললেন, এতে আর আছে কি? ক্ষয়ে ক্ষয়ে চুণ হয়ে গেছে—পেতলের মত ক্যাক্ ক্যাক্ করছে সোনা! তা এখন সোনার দামও তো চড়া—তাবছি আজকাল যেমন তারের রুলি হয়েছে—তাই বরুক দু'গাছা—

প্রভাত বললে, সংসারের খবর রাখি না বলে—আমাকে যা তা করে বোকা বোঝাবে? তোমার গহনা সব একে একে কোথায় যায়—আর কেন যায়—আমি জানি না বুঝি?

লজ্জা যেন সুনয়নীরই। ছেলের দৃপ্ত বেদনার্ত স্বরে মাথা নামিয়ে চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। কিন্তু এ ভাবে নিরুত্তর থাকলে দোষের বোঝা লাঘব হবে না—বুঝতে পারলেন। প্রসঙ্গটা হালকা করে দেবার জন্ত তিনি হেসে উঠলেন, ভারি তো গহনা। মেয়েমানুষের গহনা হ'ল স্বামী পুত্র, তাদের রোজগারেই আমরা গা ভর্ত্তি করি। আর সোনা তো বাহার দেওয়ার জন্ত নয়—সময় অসময়ের জন্ত। অসময়েই যদি কাজে না লাগল…একটু থেমে অধিকতর সাহস সঞ্চয় করে বললেন, শোভার শ্বশুর-বাড়ীতে—তত্ত্ব না হোক—জামাইকে একখানা ধুতি—একটা জামা দিতেই হবে। আমাদেরও সাধ-আহ্লাদ বলে একটা জিনিস আছে তো? আর এ গহনা তো পরিই না—বাক্সে তোলা থাকে… একটা কাজ যদি হয়—

মায়ের যুক্তির অভাব নেই—তিনি অনর্গল বলে যেতে লাগলেন। মনুষ্য-জন্মের সাধ-আহ্লাদ যে এমন মারাত্মক—এই সত্য কি প্রভাতই জেনেছে কখনও? ও হাঁপিয়ে উঠছে মায়ের যুক্তি-শর প্রয়োগে।

তাড়াতাড়ি বললে, আচ্ছা আচ্ছা বুঝলাম। কত টাকা হলে আপাতত: সমস্যা মেটে?

মা হিসাব করলেন, একখানা ধুতি মিহি সুতোর—আট টাকার কমে হবে কি?

মিলের ধুতি হলে হবে।

আর একটা পাঞ্জাবী—একটু চকচকে হয়। সেও কোন্ সাত-আট টাকা না পড়বে। একটু থেমে বললেন, এই রুলি দিয়ে কেউ কি পনেরোটা টাকা দেবে না?

তোমার রুলি রাখ—টাকা আমি দিচ্ছি।

তুই কোথায় পাবি টাকা?

এই নাও। যেখানেই পেয়ে থাকি জিজ্ঞাসা করো না—বাবাকে যেন বলো না।

হাঁ, ওঁকে বলি আর খানাজদি হোক! আমি তেমন কাঁচা মেয়ে নই! তত্ত্বর কথা বলে সেদিন দেখলি তো—কি কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড না বাধালে!

—কিন্তু উনি জানতে পারবেন তো?

না। কাপড় জামা কিনে তুই দিয়ে আসবি। যাবি তো বাবা? চোখের মধ্যে করুণ মিনতি ভরে মা চেয়ে আছেন ওর দিকে। না বলা অত্যন্ত কঠিন।

প্রভাত বললে, আচ্ছা পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব।

তা হলে আজ তো মঙ্গলবার—আজই কেন ঘুরে আয় না

হাওড়ার হাট থেকে। সেখানে দু'এক টাকা কমেও পেয়ে যাবি হয়তো।

তাই যাব।

মা চলে গেলে মনি অর্ডারের কুপনটি আর একবার পড়লে প্রভাত। এই টাকা পেয়ে কিছু আগে দু'একটা সাধ উঁকি মারছিল মনের কোণে। ওর অনেক দিনের সাধ—একটা ভাল ফাউণ্টেন পেন কেনে। পেনটা লেখার পারিশ্রমিক পাওয়ার স্মারকচিহ্ন হিসাবে কিনবে। চমৎকার হবে। কমদামী কলমের নিবের ডগায় কালির প্রবাহ স্বচ্ছন্দ হয় না—নাড়তে নাড়তে এমন বিরক্তি ধরে। ভাবের বন্যা যখন মনের কূল ছাপিয়ে উত্তাল হয়—তখন নিবের অগ্রবিন্দুতে কালির দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে ক্রোধে আপাদমস্তক জ্বলে উঠে না কি? সে উত্তাপে ভাবের পুঁজি বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যায়। কিন্তু সংসারের উত্তাপই কি কম? তার সুকুমার আশা সেই উত্তাপে···এমনি করে সংসার বুঝি শত পাকে জড়িয়ে রাখে মানুষকে। এই চোরাবালি নূতন পথিককে টেনে নামায় নীচের দিকে। অসহায় পথিক!

৯

সেই দিনই অনিমেষ বললে, তোর সন্ধানে ভাল মাষ্টার আছে প্রভাত? লীলা আর অরুকে পড়াবে। যদি গার্জেন হিসেবে থাকতে চায় তা হলেও ভাল। আমি তো আর ওদের দেখাশুনা করতে পারি না।

আচ্ছা—সন্ধান পেলে জানাব।

হাঁ—মাইনেটাও আন্দাজ মত জানাস তাঁকে। আপাতত টাকা পঞ্চাশের মত পাবেন। তবে গার্জেন হয়ে যদি বাড়ীতে থাকেন—কিছু কম হতে পারে—খাওয়া-পরার ব্যয় আছে।

প্রভাত মনে মনে স্বীকার করলে অনিমেষের বিষয়বুদ্ধি। চমৎকার। হিসাবী ছেলে সে—বাপের কারবার রাখতে পারবে। কিন্তু ওর মনের মধ্যেও রয়েছে হিসাবী মানুষ। কথাটা শোনার সঙ্গে দুর্নিবার একটি আকাঙ্ক্ষা ওকে অস্থির করে তুলছে। সেটা প্রকাশ করা সঙ্গত হবে না বলেই যেন অস্বস্তি বাড়ছে। কেন এমন হয়? নিজের প্রয়োজনের চেয়ে বড় বস্তু পৃথিবীতে নেই বলেই কি এমন অস্থিরতা? কেবলই মনে হচ্ছে—লীলা আর অরুকে পড়াবার যোগ্যতা কি তার নেই? কিন্তু সে কথা মুখ ফুটে বলার দুর্বলতা ওকে পীড়া দিচ্ছে। অনিমেষ ওদের কয়েক বছর ধরে জানে—মনের বহু সঙ্কল্পের অংশীদারও বটে। অথচ প্রাসাদের কক্ষ থেকে কোন দিন কি অনিমেষ ভাল করে এই গলিটার দিকে চেয়ে দেখেছে? এই গলির দু'ধারে নানান আকারের যে সব বাড়ী রয়েছে তার মধ্যে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত এই বাড়ীটা দেখে কোন দিন কি ওর মনে হয় নি—এ যেন রাজকীয় উদ্যানের একাংশে অবস্থিত রস-শোষণ-অক্ষম একটি রুগ্ন বৃক্ষ—যা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে উদ্যান-সৌন্দর্য্য উপভোগ অব্যাহত থাকে। অথবা এ প্রশ্নও মনে ওঠা বিচিত্র ছিল না—জীবনের রাজ্য থেকে পরিত্যক্ত হয়ে বিপরীত মুখে ওর যাত্রা হয়েছে সুরু—ওকে বাঁচানো প্রয়োজন। আপন মনে হাসল প্রভাত। অনিমেষের দৃষ্টি যদি সামনে থেকে পাশে বা পিছনে নাই পড়ে তো সে অপরাধ অনিমেষের নয়। এই যুগে পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের পরিচয় যেমন বেড়েছে—দূরত্ব পরিহার করে মানুষ হয়েছে নিকট প্রতিবেশী—তেমনি দূরে সরে যায় নি কি নিকটতম প্রতিবেশীরা? বিশ্ব নিয়ে মানুষ আর স্বপ্ন দেখে না—জীবনের পাত্রে বায়ু-বিকম্পিত রঙীন রৌদ্র আর রামধনুর আলিম্পন আঁকে না—কোমলতম বৃত্তিকে বর্জ্জন করার সাধনা নিয়ে স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে জীবনধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। অনিমেষের দোষ নেই।

এমনি একটি কাজ পেলে প্রভাত বর্ত্তে যায়। এমনি কাজই তাকে খুঁজে নিতেই হবে। অবশ্য বন্ধুত্বের গ্রন্থি-বন্ধনে—কৃতজ্ঞতার অবকাশ সৃষ্টি—না—প্রভাত তা পারবে না। উপরের দিকে হাত তুলে ধরলেই—হৃদ্যতার সাবলীল প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যাবে। সে সম্ভব নয়।

অথচ আশ্চর্য্য—যা সম্ভব নয় সেই চিন্তাই মনকে ছেয়ে রয়েছে। এমনি একটি কাজ না মিলে সে বাঁচবে কি করে! তার পড়াশোনা পোশাক-পরিচ্ছদ—বহু বেহিসাবী খরচ—কোনটা নেই!

পরের দিন অনিমেষই বললে, আরে তুইও তো ওদের দেখতে পারিস্। পারবি না? যার তার হাতে বিশ্বাস করে ওদের ছেড়ে দিতে পারব না।

তা হলে অনিমেষও এ কথা ভেবেছে। কিন্তু ছিঃ—এ যেন উপর থেকে পয়সা ছুঁড়ে নীচের প্রার্থীকে ধন্য করে যেন দেওয়া?

প্রভাতের কানের ডগায় যেন আগুনের আঁচ লাগছে—মুখে চোখে লাগছে উত্তাপ। সে কোনমতে বললে, আমি!

হাঁ—তুমি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি কে আছে যাকে বিশ্বাস করতে পারি! বাবাকে বলেছিলাম যে প্রভাতকে বলেছি মাষ্টারের সন্ধান করতে। বাবা বললেন, দূর বোকা—অনুরোধ না করে ওকে জোর করে বললি নে কেন যে এ ভার তোমাকেই নিতে হবে! অরু লীলা কি ওরও ভাই বোন নয়! আমি বললাম, ওর সময় হবে কি না। বাবা দিয়ে বাবা বললেন, পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের ছেলের পক্ষে এ এমন কিছু কঠিন কাজ নয়—তুই যদি বাইরে না বেড়িস তো তোকে নিতে হ'ত না এই কাজ?

প্রভাত চুপ করে রইল।

অনিমেষ একটু হেসে বললে, তবে সঙ্কোচ তোর হতে পারে। একটু থেমে বললে, অর্থাৎ যাকে আপন মনে করলাম

—তার কাছ থেকে আবার পারিশ্রমিক নিই কি করে? এটা হয়ই মনে—না হওয়াটা বরং আশ্চর্য্যের। কিন্তু তুই যে টিউশানি করে পড়াটা চালিয়ে যাবি—এ কথা তো কতবার বলেছিস। সেই যখন টিউশানি করবিই—অন্ত জায়গায় যে সময়টা দিতে পারতিস—

প্রভাত মাথা নেড়ে বললে, এ হয় না। সত্যি যদি আপন মনে করি—

যাদের আপন মনে করা যায়—তারা অশিক্ষিত থাকুক—এটা নিশ্চয় চাও না?

কিন্তু—

অনিমেষ ওর হাত ধরে সবলে আকর্ষণ করলে। টেনে নিয়ে গেল নিজেদের বাড়ীতে। সেখানে সবেমাত্র চা-পর্ব্বের আয়োজন চলছে। দীপা অর্গ্যানে বসে টুং টাং করছে—নীলা অরু একটা ছবির বই খুলে মন নিবিষ্ট করেছে। অনিমেষের বাবা চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন।

অনিমেষ বললে, বাবা—প্রভাত রাজী আছে নীলা অরুর ভার নিতে।

অর্গ্যানের উপর আঙুলের গতি থেমে গেল—নীলা অরু ছবির বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুললে, অনিমেষের মা টেবিলের উপর টি-পট নামাতে নামাতে ঘাড় ফেরালেন—অনিমেষের বাবা খবরের কাগজখানা কোলের উপর ফেলে হাসলেন। সকলেরই মুখে চোখে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। অনিমেষের এই আকস্মিক ঘোষণায় প্রভাতও স্তব্ধ হয়ে গেল—কিছুমাত্র প্রতিবাদ করতে পারলে না।

যথারীতি চা-পর্ব্ব সুরু হ'ল—স্বচ্ছন্দ আলাপ-আলোচনা চলল, প্রভাত কিন্তু স্বচ্ছন্দ হতে পারলে না। ও যা কামনা করছিল তাই তো পেয়ে গেল—তবু মন ভরল না। যে সুর ওর আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ছিল—এই প্রাপ্তির তারে তা ঠিকমত যেন বাজল না। কেন—কেন? এই প্রশ্ন বারংবার প্রভাতের মনকে চঞ্চল করে তুললে।

চা-পর্ব্ব শেষ হ'ল—টেবিল ছেড়ে সে দুয়ারের দিকে এগিয়ে গেল। সামনেই সিঁড়ি। কোন দিকে না চেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

অন্তদিন অনিমেষের কাছে এসে বলে, চললাম। আজ গভীর অন্তমনস্কতার সাধারণ ভদ্রতা রক্ষার কথাটা পর্য্যন্ত ওর মনেই হ'ল না।

সিঁড়ির শেষ ধাপ অতিক্রম করতেই প্রভাতের মনে হ'ল—কে যেন নিঃশব্দে তার সঙ্গ নিয়েছে। কে? মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করতেই দীপা হাসিমুখে বললে, আমি। প্রভাতের সামনে এসে সে দাঁড়াল। বললে, দেখুন প্রভাত-দা—দাদার মোটেই বুদ্ধি নেই। যা হয় না তা নিয়ে এতও হৈ চৈ করতে পারে!

কি হয় না? প্রভাত হতভম্বের মত প্রশ্ন করলে।

এই আমাদের বাড়ীতে আপনার মাষ্টারী করা।

কেন হয় না? প্রভাত অধিকতর বিস্মিত হ'ল।

এ তো অত্যন্ত সোজা কথা। নীলা অরুকে আপনি যে ম্যানেজ করতে পারবেন না—এই সোজা কথাটাও দাদা বুঝতে পারে না! কথা শেষ করে দীপা হাসতে লাগল।

কেন—আমি ওদের শাসন করতে পারি না!

মোটেই না—আপনার শাসন ওরা মানবে কেন? ছেলেবেলা থেকে ওদের আদর আব্দার সয়ে আজ মাষ্টারের মত গম্ভীর হতে পারবেন? পারবেন ধমক দিতে—বেত চালাতে? সম্পূর্ণ অজানা লোক না হলে ছেলেদের ম্যানেজ করা যায় না।

ওরা তো তেমন দুষ্টু নয়।

সেইজন্তই তো আমার ভয়। আপনার কাছে যথেষ্ট প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে—এখন আপনার নতুন মূর্ত্তি ওদের ভাল লাগবে না। না প্রভাত-দা—ওদের পড়াবার সঙ্কল্প আপনি ছাড়ুন। দীপা গম্ভীর সুরে উচ্চারণ করলে কথাগুলি।

তথাপি প্রভাতের বিস্ময় কাটল না। দীপা যেন যুক্তি দিয়ে কথা বলছে না, এ ওর মনোগত ইচ্ছা।

প্রভাত বললে, অনিমেষ দুঃখিত হবে।

কেন—যার ফল সত্যি ভাল হয় না—তা নিয়ে দুঃখ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমি বুঝিয়ে বলব ওঁদের।

হঠাৎ প্রভাতের ইচ্ছা হ'ল প্রশ্ন করে দীপাকে—আমার যে টাকার দরকার কত সে কি তুমি জান না? তুমিও কি কোন দিন তিনতলা থেকে চেয়ে দেখ নি এই ভগ্নপ্রায় বাড়ীটার পানে? কিংবা চেয়ে দেখলেও ওর সর্ব্বাঙ্গে যে লেখা তা পড়তে পার নি?

তবু উল্লসিত হ'ল প্রভাত। ওর মনে হতে লাগল—এই বাড়ীর আর সকলের চেয়ে দীপার দৃষ্টি স্বতন্ত্র এবং সে দৃষ্টির প্রসার আছে। এখানে চাকরি নেওয়ার অসঙ্গতিটুকু ও অন্ততঃ ধরতে পেরেছে!

কোন কথা না বলে প্রভাত এগিয়ে গেল।

দীপা অধীর হয়ে উঠল, কৈ উত্তর দিলেন না তো?

কাল উত্তর দেব।

কি এমন শক্ত উত্তর যে এখনই দেওয়া যায় না?

চাকরিটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারাই এই চাও তুমি? প্রভাত হেসে উঠল।

আপনি তো কত দিন বলেছেন—চাকরি করবেন না।

ওটা তো আর আপিসের চাকরি নয় যে দশটা পাঁচটার গোলামি!

চাকরী তো? না—না বলুন। দীপা এই মুহূর্ত্তে নিশ্চিন্ত হতে চায়।

প্রভাত ক্ষুব্ধ হ'ল। চুপ করে রইল।

কি, জানাব তো—আপনি পড়াতে পারবেন না।

যা খুশি তোমার। বাইরে এসে প্রভাত নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। ক্রমশঃ

দামোদর মুখোপাধ্যায় (বিদ্যানন্দ)

১৮৫৩-১৯০৭

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দামোদর মুখোপাধ্যায়কে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে জানি। উইল্কি কলিন্সের 'ওয়্যাদ্ ইন্ হোয়াইটে'র অনুবাদ 'শুক্লবসনা সুন্দরী'র লেখক, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র উপসংহার 'মৃণ্ময়ী'র লেখক, 'সোনার কমল' প্রভৃতি মনোহারী কয়েকখানি উপন্যাসের লেখক এবং 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র বহু টীকার অনুবাদক ও সম্পাদক দামোদর মুখোপাধ্যায় যে এক এবং অভিন্ন ইহা বহু লোকেই অবগত নহেন। ইহার সহিত 'প্রবাহ' ও 'অনুসন্ধান' পত্রিকার সম্পাদক দামোদর মুখোপাধ্যায়কে যুক্ত করিয়া সমগ্রভাবে যিনি দেখিবেন, তিনিই ইঁহার জ্ঞানের পরিধি ও সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। কালের বিপুল প্রবাহ দামোদর মুখোপাধ্যায়কে আজ পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া একটু পিছনে ফিরিয়া দেখিলেই জনচিত্তহারী রসিকজনসুহৃদ্ দামোদরকে দেখা যাইবে। মনস্বী রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার 'হিন্দুশাস্ত্র' সপ্তম ভাগের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

> "দামোদর বাবু খ্যাতনামা লেখক, তাঁহার গ্রন্থাদি বঙ্গীয় পাঠকদিগের নিকট সুপরিচিত, তাঁহার রুচি মার্জ্জিত, তাঁহার লেখনী মধুময়ী।...যাঁহারা 'কপালকুণ্ডলা' পড়িয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে 'মৃণ্ময়ী'ও পাঠ করিয়াছেন। এবং যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্র কৃত ভগবদ্গীতার অনুবাদ পাঠ করিতেন, তাঁহারা দামোদর বাবু কৃত ভগবদ্গীতার বিস্তীর্ণ ও বহুটীকাসমন্বিত অনুবাদ দেখিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। আমি যত দূর জানি, বঙ্গভাষায় ভগবদ্গীতার এরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বহুটীকাসমন্বিত অনুবাদ আর একখানি নাই।"

সমগ্র দামোদর মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। ইতিমধ্যেই উপকরণের অভাব ঘটিয়া নানা অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে।

জন্ম ঃ বংশ-পরিচয়

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি (২ ফাল্গুন, ১২৫৯) নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে মাতুলালয়ে দামোদরের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—রামরতন মুখোপাধ্যায়; মাতা পদ্মমণি দেবী। দামোদরের পৈতৃক বাসভূমি শান্তিপুরে।

শৈশব-শিক্ষা

দামোদর মাতুলালয়েই প্রতিপালিত হন। তিনি শিক্ষালাভ করেন বহরমপুর কলেজে। তাঁহার মাতুল—প্রসিদ্ধ ব্যাকরণকার লোহারাম শিরোরত্ন (মৃত্যু : ১৩ কার্ত্তিক ১২৯০) তখন বহরমপুর নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ। দামোদর বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজী তিন ভাষাতেই বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন।

সাহিত্যানুরাগ

মাতৃভাষার দামোদরের পরম অনুরাগ ছিল। যৌবনের প্রথম উন্মেষ হইতেই তিনি বঙ্গবাণীর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে উপন্যাসের সংখ্যাই অধিক। ১২৯০ সালের আষাঢ় মাস (ইং ১৮৮৩) হইতে তিনি ইউরোপীয় নভেল-গ্রন্থের অনুবাদে প্রবৃত্ত হন; বুলওয়ার লিটন-কৃত রায়েনজি, উইল্কি কলিন্স-কৃত ওম্যান ইন হোয়াইট ও সার্ ওয়াল্টার স্কট-কৃত ব্রাইড অব লামের মুরের অনুবাদ 'উপন্যাস রত্নাবলী' নাম দিয়া মাসে মাসে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন; ইহার প্রতি খণ্ডের মূল্য ছিল ।/০ আনা। ১২৯৯ সালের আশ্বিন মাস (ইং ১৮৯২) হইতে 'অনুসন্ধান'-কার্য্যালয় কর্ত্তৃক 'মাসিক উপন্যাস' নাম দিয়া প্রতি মাসে নূতন নূতন উপন্যাস প্রকাশের যে ব্যবস্থা হয়, দামোদর তাহার প্রধান উদ্যোক্তা ও লেখক ছিলেন। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়াছিলেন; তাঁহার রচনাবলী একদা পাঠককে কম আনন্দ দেয় নাই।

গ্রন্থাবলী

দামোদরের গ্রন্থগুলির সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। আমরা সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা প্রদান করিতেছি :—

১। **মৃণ্ময়ী** (উপন্যাস)। (১০ আগষ্ট ১৮৭৪)। পৃ. ৩৫৪।

"কপালকুণ্ডলার উপসংহার ভাগ।"

২। **বিমলা** (আখ্যায়িকা)। ইং ১৮৭৭ (২০ মার্চ)। পৃ. ১৯৫।

৩। **দুই ভগ্নী** (উপন্যাস)। ? (৫ জুলাই ১৮৮১)। পৃ ১৩৩।

৪। **কমল-কুমারী** (ঐতিহাসিক উপন্যাস)। বৈশাখ ১২৯১ (২-৫-১৮৮৪)। পৃ. ২৭৯।

"স্যর্ ওয়াল্টার স্কটের ব্রাইড্ অব্ লামের্ মুর্ অবলম্বনে বিরচিত।"

৫। **প্রতাপসিংহ** (ঐতিহাসিক উপন্যাস)। ইং ১৮৮৪ (১৫ মে)। পৃ. ২২৪।

প্রধানতঃ টডের রাজস্থান অবলম্বনে লিখিত।

৬। **মা ও মেয়ে** (উপন্যাস)। ১২৯১ সাল (ইং ১৮৮৪)। পৃ. ১৬৪।

৭। শুক্লবসনা সুন্দরী (উপন্যাস : উইল্‌কি কলিন্সের 'উম্যান্ ইন্ হোয়াইট্' অবলম্বনে)

১ম ভাগ : চৈত্র ১২৯১ (ইং ১৮৮৫)। পৃ. ২৩২

২য় ভাগ : সম্বৎ ১৯৪৫ (আগষ্ট ১৮৮৮)। পৃ. ৩২২

৩য় ভাগ : ১২৯৭ সাল (ইং ১৮৯০)। পৃ. ৩২০

৮। শিশুরঞ্জন ভারত-ইতিহাস (সচিত্র)। ১২৯৩ সাল (১০-৪-১৮৮৭)। পৃ. ১১৮।

"অতি প্রাচীন কাল হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলি পর্য্যন্ত।"

৯। বিষ-বিবাহ (উপন্যাস)। (২৭ আগষ্ট ১৮৮৮)। পৃ. ৭২।

দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তক (১৩০৪ সাল) 'প্রেম-পরিণয়' নামে পদ্য-কাব্য সহ একত্রে প্রকাশিত। 'প্রেম-পরিণয়' ১২৯৯ সালের পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল।

১০। লক্ষ্মণ-বর্জ্জন (পৌরাণিক আখ্যায়িকা)। সম্বৎ ১৯৪৭ (ইং ১৮৯০)। পৃ. ১৩৬।

১১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১ম খণ্ড। (১৭ জুলাই ১৮৯৩) পৃ. ৮০।

"মূল, অন্বয়, তৎসহ 'গীতা-বোধ-বিবর্দ্ধিনী' সংস্কৃত ব্যাখ্যা, বাঙ্গালা প্রতিশব্দ, বাঙ্গালা ব্যাখ্যা, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, হনুমান্ ও বলদেবকৃত ভাষ্য, আনন্দগিরি, শ্রীধর, মধুসূদন, নীলকণ্ঠ ও বিশ্বনাথকৃত টীকা, যামুনমুনিকৃত 'গীতার্থসংগ্রহ' ও বঙ্গানুবাদ, 'গীতার্থ-সার-দীপিকা' নামে সুবিস্তৃত বাঙ্গালা তাৎপর্য্য, নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও বহুবিধ টিপ্পনী সমেত।"

এই বিরাট্ গ্রন্থ কয়েক বৎসর ধরিয়া খণ্ডশ: প্রকাশিত হইয়াছিল।

১২। শান্তি (উপন্যাস)।

উপন্যাসখানির প্রথমার্দ্ধ ১২৯৩-৯৫ সালের 'প্রচারে' মুদ্রিত হয় ; গ্রন্থাকারে সম্পূর্ণ অবস্থায় খুব সম্ভব ১৮৯৩ সনে প্রচারিত হইয়াছিল ; আমি ১ম সংস্করণের পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারি নাই। 'শান্তি' বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গীকৃত। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে দামোদরের বৈবাহিক (ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্রের শ্বশুর) ছিলেন। তিনি গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন :—"প্রিয়তমেষু—শান্তি প্রাপ্ত হইলাম। ইহলোকে পাইলাম—পরলোকেও ভরসা করি, দামোদর তাহাতে আমায় বঞ্চিত করিবেন না।"

১৩। আয়েসা (উপন্যাস)। ইং ১৮৯৭। পৃ. ১২৭।

"দুর্গেশনন্দিনীর উপসংহার।"

১৪। যোগেশ্বরী (উপন্যাস)। ১৩০৪ সাল (১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮)। পৃ. ৬০৪।

১৫। সুকন্যা (নাটক)। ১৩০৬ সাল (২১ মার্চ ১৯০০)। পৃ. ৯৪।

১৬। সোনার কমল (উপন্যাস)। ১৩০৮ সাল (১৩ সেপ্টেম্বর ১৯০১)। পৃ. ৪৩৮।

১৭। কর্ম্মক্ষেত্র (উপন্যাস)। অগ্রহায়ণ ১৩০৮ (২-১-১৯০২)। পৃ. ৩৭৯।

"বহুদিন পূর্ব্বে ['মাসিক উপন্যাসে' কার্ত্তিক ১২৯৯] এই গ্রন্থ অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রচারিত হইয়াছিল।"

১৮। অন্নপূর্ণা (উপন্যাস)। ১৩০৯ সাল (২ সেপ্টেম্বর ১৯০২)। পৃ. ৫৯৯।

"যোগেশ্বরীর উপসংহার।"

১৯। নবাব-নন্দিনী (উপন্যাস)। ১৩০৮ সাল (৫ ডিসেম্বর ১৯০১)। পৃ. ২৯৩।

"দুর্গেশ-নন্দিনীর অনুসরণ।"

২০। সপত্নী (সামাজিক উপন্যাস)। ১৩১১ সাল (৪ মে ১৯০৪)। পৃ. ৪০২।

২১। ঈশ উপনিষদ্। ১৩১১ সাল (ইং ১৯০৪)।

২২। ললিতমোহন (উপন্যাস)। চৈত্র ১৩১১ (২৭-৩-১৯০৫)। পৃ. ৩১৯।

২৩। অমরাবতী (উপন্যাস)। বৈশাখ ১৩১২ (৫-৫-১৯০৫)। পৃ. ২৭২।

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

২৪। নবীনা (সামাজিক উপন্যাস)। ১৩১৬ সাল (২৪ জানুয়ারি ১৯১০)। পৃ. ২০০।

২৫। শম্ভুরাম (উপন্যাস)। ১৩১৭ সাল (২৬ আগষ্ট ১৯১০)। পৃ. ২১৬।

২৬। আদর্শ প্রেম (উপন্যাস) ইং ১৯১৩ (৩০ অক্টোবর)। পৃ. ১৫৭।

"প্রায় ৭ বৎসর পূর্ব্বে [আগষ্ট ১৯০৬] এই উপন্যাস একলিপি-বিস্তার পরিষদের আনুকূল্যে ও ব্যয়ে দেবনাগর অক্ষরে 'রাজভক্তি' নামে প্রচারিত হইয়াছিল। এক্ষণে আবশ্যকবোধে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইল।"—প্রকাশকের বিজ্ঞাপন।

* * *

ইহা ছাড়া রমেশচন্দ্র দত্ত-সম্পাদিত 'হিন্দুশাস্ত্র' গ্রন্থের ২য় খণ্ড, ৭ম-৮ম ভাগ (১৩০৪ সাল = ইং ১৮৯৭)—মহাভারত ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা দামোদর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম দুই অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত, বাকী ৩-১৮ অধ্যায়ের দামোদর-কৃত।

দামোদর পাঠমালা, জ্ঞানোদয়, বর্ণবোধ, পত্রপাদপ প্রভৃতি অনেকগুলি পাঠ্য পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন।

সাময়িক-পত্র সম্পাদন

গ্রন্থরচনার ন্যায় সাময়িক-পত্র সম্পাদনেও দামোদর কৃতিত্ব

দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি :

'প্রবাহ' : ইহা সে-যুগের একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্র, ১২৮৯ সালের ১লা বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৮২) প্রকাশিত হয়। প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক সূচনায় লিখিতেছেন :

"প্রথমতঃ, সময়ের সহিত সাময়িক পত্রের বিশেষ সম্বন্ধ। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান সাময়িক পত্রসমূহ প্রায়ই নিতান্ত অনিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাহাতে পাঠকের অতিশয় অপ্রীতি জন্মে, কার্য্যের নিতান্ত বিশৃঙ্খলা হয়, এবং উদ্দেশ্য সাধনের বিঘ্ন ঘটে। আমাদিগের প্রবাহ প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইবে। সুতরাং অন্য পত্র সমস্ত সত্ত্বেও প্রবাহের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, প্রবাহ কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া চলিবে না। প্রবাহ আত্মীয়ের সমাদর বা অনাত্মীয়ের হতাদর করিবে না।...প্রবাহ সম্প্রদায় বিশেষের, মত বিশেষের বা ব্যক্তি বিশেষের দাস হইবে না।...প্রবাহ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবে। তৃতীয়তঃ, যাহা সাধারণের বোধাতীত, বা যাহা নীরস, বা যাহাতে প্রয়োজন নাই, প্রবাহ কদাপি তাহাতে হস্তার্পণ করিবে না। যাহা সাধারণের কল্যাণকর, যাহার সহিত দেশের বা সমাজের উন্নতির সম্বন্ধ আছে, যাহার সহিত সকলের হিত, আনন্দ, অনুরাগ ও উন্নতির সম্বন্ধ আছে, তাহাই প্রবাহের আলোচ্য হইবে।...চতুর্থতঃ, যে সকল রাজ-কার্য্যের সহিত সর্ব্বসাধারণের ইষ্টানিষ্টের অধিক সম্বন্ধ দেখিবে প্রবাহ তাহার সমালোচনা করিবে।...পঞ্চমতঃ, প্রবাহ সমসাময়িক সমস্ত গণনীয় ঘটনার উল্লেখ বা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিবে। সাহিত্য সম্বন্ধীয়, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়, ইতিহাস সম্বন্ধীয় উন্নতি, অবনতি, নবাবিষ্কার, বা নবতত্ত্ব প্রবাহ সকলকে জানাইতে যত্ন করিবে। ষষ্ঠতঃ, প্রবাহ বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষ সমাদর করিবে।...সপ্তমতঃ, নাটক ও অভিনয় সময়ে সময়ে জাতীয় উন্নতি, বা অবনতির প্রধান হেতু হইয়া থাকে। এই জন্য প্রবাহ নাটক ও প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে তাহার অভিনয়ের গুণাগুণ সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিবে। অষ্টমতঃ, প্রবাহ বিশ্বাস করে যে বঙ্গভাষার এখন নিতান্ত ক্ষীণ অবয়ব। এ সময়ে জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির নিমিত্ত যিনি যাহা করেন তাহাই শুভ। এই জন্য প্রবাহ সকল গ্রন্থকারকেই সমাদর করিবে, গ্রন্থের দোষের কথা যেমন বুঝিবে তেমনি সরলভাবে ব্যক্ত করিবে, এবং গুণের কথা সানন্দে প্রচারিত করিবে। কিন্তু কদাপি অকারণ বিদ্রূপ করিয়া কাহাকেও হতোৎসাহ করিবে না, বা মনস্তাপ দিবে না। প্রবাহের এই সকল সঙ্কল্প আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, যে প্রবাহের উদ্দেশ্য অনেক ও বহুব্যাপী এবং তৎসমস্ত সাধনোদ্দেশে কোন সাময়িক পত্রের আবির্ভাব একান্ত বাঞ্ছনীয়।"

'প্রবাহে'র স্থিতিকাল দুই বৎসর।

দীর্ঘকাল পরে দামোদর 'প্রবাহ' পুনঃপ্রচারিত করিয়াছিলেন। এই "বিবিধ প্রবন্ধ ও সমালোচনাপূর্ণ মাসিকপত্রে"র ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—মাঘ ১৩১১ (ইং ১৯০৫)। কথা-সাহিত্যিক নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইহার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। প্রথম বারের ন্যায় এবারও 'প্রবাহ' দুই বৎসরের অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। আমরা ইহার ২য় বর্ষের ৯ম সংখ্যা (আশ্বিন ১৩১৩) পর্য্যন্ত দেখিয়াছি।

'অনুসন্ধান' : অনুসন্ধান-সমিতির মুখপত্র এই পাক্ষিক পত্রের ৭ম খণ্ড (১৩০০ সাল) দামোদরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

'নিউস্ অব দি ডে' : এই নামের একখানি ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র দামোদর কিছু দিন সম্পাদন করিয়াছিলেন (দ্র° 'বাঙ্গালীর গান,' পৃ. ১০১৪)।

মৃত্যু

১৯০৭ সনের ১৬ই আগষ্ট (৩১ শ্রাবণ ১৩১৪), ৫৫ বৎসর বয়সে, দামোদরের মৃত্যু হয়। তাঁহার পরলোকগমনে নারায়ণ-চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ তৎসম্পাদিত 'স্বদেশী' পত্রে লিখিয়াছিলেন :

"বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশ হইতে আবার একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে। গত ৩১এ শ্রাবণ শুক্রবার প্রবীণ সাহিত্যাচার্য্য পূজনীয় দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া, বঙ্গসাহিত্যকে অনাথ করিয়া দিব্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন।...

দামোদরবাবু কেবল সাহিত্যসেবী ছিলেন না, সাহিত্য-জীবীও ছিলেন। সাহিত্যই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। সমগ্র জীবন তিনি সাহিত্যচর্চ্চাতেই ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। অনেক সাহিত্যিকের সহিত আলাপ পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় সরলহৃদয় উচ্চমনা সাহিত্যিক বুঝি আর একটিও দেখি নাই। যিনি তাঁহার সহিত একবার আলাপ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার বিনীত ও সরল ব্যবহারে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার সমগ্র জীবনব্যাপী সাহিত্যচর্চ্চার শেষ ফল, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অভিনব সংস্করণ।...

তাঁহার ন্যায় স্বদেশহিতৈষী একান্ত দুর্লভ।...যে দিন হইতে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতে একমাত্র ঔষধ ব্যতীত তিনি সর্ব্ববিধ বৈদেশিক দ্রব্যের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। এমন কি, বিলাতী চিনির সংস্রবের আশঙ্কায় গুড় ব্যতীত অন্য কোন মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতেন না।...

দামোদর বাবুর হিন্দু ধর্ম্মে গাঢ় অনুরাগ ছিল। আজি তাঁহার মৃত্যুতে আমরা একজন খাঁটি বাঙ্গালী লেখক হারাইলাম।" (শ্রাবণ ১৩:৪)

নিম্নবঙ্গের দুইটি আদিম দেবতা

শ্রীকালিদাস দত্ত

নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসন্ধান হইতে জানা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে আদিম মানবগণই প্রথমে পৃথিবীতে নানারূপ দেবতার সৃষ্টি করে। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে অদৃশ্যে বহু অশরীরী জীবের দ্বারা যাবতীয় জাগতিক ঘটনা পরিচালিত হয়, সুতরাং মানবগণের জীবনে সুখ-স্বচ্ছন্দতা লাভ ও রোগ, অকালমৃত্যু প্রভৃতি বিপদে

১নং চিত্র। বারা ঠাকুর
(পশ্চিম সুন্দরবন)

মুক্তি উহাদের কার্য্যের উপর নির্ভর করে। তজ্জন্য তাহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার নির্ব্বাহক হিসাবে ঐ সকল জীবের নানা আকারে কাল্পনিক প্রতীক্ গড়িত ও প্রার্থনা, ক্রন্দন, তুক্‌তাক্, জীববলি প্রভৃতি বহুবিধ উপায়ে উহাদের তুষ্টিসাধন করিবার চেষ্টা করিত। ঐ সমস্ত আদিম দেবতা-সৃষ্টির উহাই ছিল মূল কারণ।

আর্য্যজাতির আগমনের পূর্ব্বকাল হইতে ভারতবর্ষেও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় ঐরূপ বহু দেবতার অস্তিত্ব ছিল। আর্য্যাধিকারের পরে ঐ সকল দেবতা অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ কল্পনাজাত বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতা-দিগের ক্রমশঃ আবির্ভাব হইলে উক্ত রূপ আদিম দেবতা-সমূহের অধিকাংশের বিলোপ ঘটে এবং অবশিষ্টগুলির কিয়দংশ কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে পৌরাণিক দেবতা-মণ্ডলীর অন্তর্গত হইয়া যায় ও কিয়দংশ অপ্রধান (mino) দেবতা হিসাবে সাধারণ জনগণের মধ্যে টি'কিয়া থাকে। সেকারণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতাসমূহ হইতে পৃথক্ ভাবে এখনও ঐ সকল দেবতাকে লৌকিক দেবতারূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশে ঐ জাতীয় যে সকল লৌকিক দেবতা আছে তন্মধ্যে বারাঠাকুর ও বাবাঠাকুর নামক দুইটি দেবতার কথা আমি এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতেছি। নিম্নবঙ্গের পশ্চিমাংশে সুন্দরবন অঞ্চলেই উহাদের আস্তানার সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

বারাঠাকুরের মূর্ত্তি দুইটি দেহবিহীন নরমুণ্ডের অনুরূপ। উহার রং সাদা ও শিরোভূষণ বৃক্ষপত্রের অগ্রভাগের ন্যায়। উহাতে বন্য লতা, পাতা ও ফুল অঙ্কিত থাকে (চিত্র ১)। প্রতি বৎসর পৌষ মাসের শেষ ভাগে ঐ প্রকার বহুসংখ্যক মূর্ত্তি কুম্ভকারগণ পূজার জন্য নির্ম্মাণ করে এবং মাঘ মাসের প্রথমে প্রায় সর্ব্বত্র ঐগুলি সাধারণতঃ দিবসে আবার কোন কোন স্থানে রাত্রিকালে মৃত্তিকার বেদীতে বসাইয়া ক্ষেত্রপালের বীজমন্ত্রে ও শিবের ধ্যানে পূজিত হয়। রাত্রিকালে উক্ত পূজা 'জাঁতাল' নামে প্রসিদ্ধ। উহাতে ঐ দেবতা দুইটিকে খেজুর বৃক্ষের পল্লবদ্বারা ঘিরিয়া উহাদের নিকট আমিষ নৈবেদ্য ও মদ্য উৎসর্গ করা হয় এবং ছাগ ও হাঁস প্রভৃতি পশুপক্ষী বলি দেওয়া হয়।

উল্লিখিত বারা ও জাতাল শব্দের অর্থ কি তাহা অজ্ঞাত। বারা শব্দে অভিহিত চব্বিশ পরগণা জেলায় কয়েকটি স্থানেরও নাম আছে, যথা—বারাসত, বারাতলা ইত্যাদি।

বর্ত্তমানে ঐ দেবতাটিকে লোকে দক্ষিণরায় নামেও অভিহিত করে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে দক্ষিণরায়ের সহিত উহার কোন সংস্রব নাই। কারণ দক্ষিণরায় হইলে

একই আকারে নির্ম্মিত উহার দুইটি মূর্ত্তি ও বিভিন্ন বারা নাম থাকিত না। এতদ্ভিন্ন উহা যদি দক্ষিণরায় রূপে সুন্দরবনের দেবতা হইবে তাহা হইলে উহার অনুরূপ দেবতা অন্যান্য দেশে থাকিবে কেন ?

দক্ষিণ ভারতে কূটনদেবের নামে ঐ প্রকার এক যুগ্ম দেবতার পূজা তামিল ও তেলেগু জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে (চিত্র ২)। হোয়াইট্‌হেড সাহেব তাঁহার দক্ষিণ-ভারতের গ্রাম্য দেবদেবী নামক পুস্তকেও উক্ত কূটনদেবের ভিন্ন বিশালমারি নামে প্রসিদ্ধ ঐ শ্রেণীর অন্য একটি যুগ্ম দেবতারও চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন।*

প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত ঈষ্টার দ্বীপের আদিম অধিবাসীরাও প্রস্তরে ঐ ধরণের যুগ্ম উপাস্য প্রতীক্ খোদিত করিয়া পূজা করিত। সেখানে এক প্রান্তরে উহার অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে (চিত্র ৩)।

পুরাতন বাংলা সাহিত্য পাঠে জানা যায় যে, বঙ্গদেশে মুসলমান অধিকারকালেই গাজীসাহেব, ওলাবিবি, বনবিবি ও সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবী-গুলির সহিত দক্ষিণরায়েরও সৃষ্টি হয়। কিন্তু বারামূর্ত্তি দুইটির সহিত দক্ষিণ ভারত ও অন্যান্য স্থানের আদিম জাতিদিগের মধ্যে পূজিত পূর্ব্বোক্ত রূপ দেবতাগুলির আকারের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিলে সহজেই বুঝা যায় যে, উক্ত যুগ্ম দেবতাটি বহু প্রাচীন এবং পরবর্ত্তীকালে উদ্ভূত উল্লিখিত দেবদেবীগুলির সমসাময়িক নহে। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন আর্য্যেতর ভাষামূলক উহার বারা নাম ও রাত্রে উহার পূজার পূর্ব্বোক্ত জাঁতাল নামও উহার ঐরূপ প্রাচীনত্বের পরিচায়ক।

২নং চিত্র। কূটন দেবর
(দক্ষিণ ভারত)

৩নং চিত্র। বারাঠাকুরের মত যুগ্ম দেবতা
(ঈষ্টার দ্বীপ)

দক্ষিণ-ভারতে উল্লিখিত কূটনদেবর পুরুষরূপে প্রসিদ্ধ† কিন্তু বিশালমারি নারীরূপে পরিচিতা।‡ সুন্দরবন ও চব্বিশ পরগণা জেলার কোন কোন স্থানে বারাঠাকুরকে পুরুষ রূপেই দেখা যায়। সে কারণ উহাদের দুইটিরই মুখে গোঁফ অঙ্কিত থাকে। (চিত্র ১ দ্র.) আবার কোথাও একটিকে গোঁফবিহীন দেখাইয়া নারায়ণী নামে অভিহিত করা হয়। নারায়ণী নামে এই নারী-মূর্ত্তিটি কিরূপে আসিয়াছে তাহা অজ্ঞাত।

দক্ষিণরায়ের সহিত এইরূপ নারীমূর্ত্তি থাকিবার উল্লেখ রায়মঙ্গল অথবা অন্য কোন পুরাতন গ্রন্থে নাই। বারুই-পুর থানার অধীন ধপধপীতে ও হাওড়াতে খুকুট প্রভৃতি

Village Gods of South India, Whitehead. Plates XV, XVI.

†*Ibid.* Pages 26-27.

‡*Ibid.* Page 29.

স্থানে দক্ষিণরায়ের যে সকল স্বাভাবিক আকারে নির্ম্মিত পুরাতন মূর্ত্তি আছে,* সেগুলির সহিত কোথাও কোন নারীমূর্ত্তি নাই।

ঐ মূর্ত্তিগুলি একাকী এবং উহাদের হস্তে কোথাও তরবারি ও বন্দুক আবার কোথাও তীর ধনুক আছে।

৪ নং চিত্র। বাবা ঠাকুর
(মজিলপুর)

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইদানীং বারামূর্ত্তি দুইটি শিবের ধ্যানে পূজিত হয়। উহার পূজারী ব্রাহ্মণগণ উহাদের একটিকে শিবের পুত্র বলিয়া পরিচয় দেন। পরবর্ত্তীকালে বোধ হয় ব্রাহ্মণগণ উহাদের পূজার ভার গ্রহণ করিলে ঐ মূর্ত্তি দুইটির একটিকে শিবের পুত্র ও অন্যটিকে উহার জননী নারায়ণীতে পরিণত করা হইয়াছে। কোন কোন স্থানে আবার লোকে উহাকে দক্ষিণদার নামেও আখ্যাত করে। দক্ষিণ দেশের রক্ষক এই অর্থে সম্ভবতঃ উহার ঐরূপ নামকরণ হইয়া থাকিবে। উক্ত দক্ষিণদার হইতেও উহা দক্ষিণরায়ে পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে।

প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে কেবলমাত্র খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে রচিত রায়মঙ্গল নামক একখানি কাব্যে দক্ষিণরায় রূপে উহার উল্লেখ আছে। উহাতে কথিত আছে যে, একদা দক্ষিণরায়ের মস্তক এক পীরের সহিত যুদ্ধে দেহচ্যুত হইলে ঈশ্বর আসিয়া উহা পুনরায় জোড়া লাগাইয়া দেন, সে কারণ তাঁহার ঐরূপ কাটামুণ্ড মূর্ত্তিও বারা নামে তাঁহার স্বাভাবিক মূর্ত্তির সহিত দক্ষিণ দেশে পূজিত হইতেছে।* এই অলীক কাহিনী ব্যতীত বারাঠাকুরের দক্ষিণরায়ের সহিত অভিন্নত্বের আর কোন প্রমাণ কোথাও নাই।

অতীত যুগে কোন্ সময় কি উদ্দেশ্যে ঐ শ্রেণীর অস্বাভাবিক আকারের যুগ্ম দেবতার সৃষ্টি হয় তাহা অজ্ঞাত। দক্ষিণ ভারতের ঐ জাতীয় পূর্ব্বোক্ত কুটন-দেবর ও বিশালমারি প্রভৃতি দেবতাগুলি সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদাদি প্রচলিত আছে তৎসমুদয় হইতেও উহা সঠিক নির্দ্ধারণ করা যায় না। হোয়াইটহেড সাহেব মহীশূর

* খণখণী ও খুরুটের দক্ষিণরায়ের চিত্র নিম্নলিখিত পুস্তক দুইখানিতে প্রকাশিত হইয়াছে—ই. বি, রেলওয়ে কোম্পানীর বাংলায় ভ্রমণ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৪ ও দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।

* "তার কত দূরে দেখে পীরের মোকাম।
ঘিরিয়া ফকির করে হাজৎ সেলাম।
হালাল মোরগ জবাই করে খাসী।
মনোহর সন্দেশ কুসুম রাশি রাশি।
শিরণী অনেক দিল সদাগর ভূপ।
কর্ণধারে জিজ্ঞাসিল এহি অপরূপ।
মুরতি বানান নাহি মৃত্তিকার ঢিবি।
পূজা করে ফকিরেরা কেমন দেবাদেবী।
বাঘের উপরে নাহি দক্ষিণের রায়।
একখানি মুণ্ডমাত্র বারা বলে তায়।
এমন প্রকার পূজা কেন হয় হেথা।
জান যদি কহ শুনি দুই এক কথা।
* * *
গুজা বড়খাঁ গাজী পরতেক পীর।
ঠাকুর দক্ষিণরায় আঠার ভাঁটির।
দুই জনে দোস্তানী হইয়াছিল আগে।
তারপর হুড়োহুড়ী মহাযুদ্ধ লাগে।
অধিকার বড় ধন সবে নিতে ধায়।
ভাই ভাই বিরোধ কতেক ঠাঁই যায়।
দক্ষিণরায়ের বুকে মারে বড় গাজী।
পড়িয়া উঠিয়া রায় বলে মায়া বাজী।
বড়খাঁ হানিল খাঁড়া গলায় তাহার।
মায়ামুণ্ড ক্ষিতি পড়ে এমনি প্রকার।
বিরোধ ভাঙ্গিয়া দিল আসিয়া ঈশ্বর।
তার পরে দোস্তানি পাইল দোঁহে বর।
কাটামুণ্ড বারা পূজা সেই হতে করে।
কোন্খানে দিব্য মূর্ত্তি বাঘের উপরে।"
(রায়মঙ্গল)

রাজ্যে প্রচলিত বিশালমারি পূজার পদ্ধতি লক্ষ্য করিয়া উক্ত বিষয়ে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই :

"In Mysore, there are traces of Sun worship in the cult of Bisalmari and there are many features in the system, everywhere, which seem to be borrowed from the worship or rather propitiation of the spirits of the departed. But the system as a whole is redolent of the soil and evidently belongs to a pastoral and agricultural community." *

হোয়াইটহেড সাহেব এই মন্তব্যের শেষাংশে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে কিছু সত্য থাকা সম্ভব। কারণ সুন্দরবন অঞ্চলেও ধান্যশস্য সংগ্রহকার্য্য পৌষ মাসে শেষ হইলে নবান্ন উৎসবের সহিত মাঘ মাসের প্রথমেই সর্ব্বত্র বারাপূজা আরম্ভ হয়।

এই বারাঠাকুর ভিন্ন বাবাঠাকুর নামে প্রসিদ্ধ অন্য যে লৌকিক দেবতাটির কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে উহারও ঠিকুজী অজ্ঞাত। উহার পূজারী ব্রাহ্মণগণ উঁহাকেও শিবের পুত্র বলিয়া পরিচয় দেন এবং পঞ্চানন্দ নামে অভিহিত করেন। উক্ত পঞ্চানন্দ কথারও ব্যুৎপত্তি কি তাহা ঠিক জানা যায় না। কেহ কেহ উহা পঞ্চানন শব্দের গ্রাম্য বা ব্যঙ্গসূচক অপব্যবহার বলিয়াছেন।† ঐ দেবতাটির মূর্ত্তি বারাঠাকুরের মূর্ত্তির মত কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্ম্মিত ও পূজিত হয় না। গ্রামবাসীদিগের প্রয়োজনমত সময় সময় পটুয়ারা তাহাদের প্রাচীন ছক অনুযায়ী উহা নির্ম্মাণ করে এবং সর্ব্বত্র হয় কোন বৃক্ষতলে মৃত্তিকার বেদীর উপর নতুবা হিন্দুদিগের প্রধান দেবমন্দিরসমূহ হইতে পৃথক ভাবে নির্ম্মিত গৃহ বা আচ্ছাদন মধ্যে রক্ষিত থাকে। উহার ঐরূপ আস্তানাগুলি থান নামে পরিচিত। উক্ত থান শব্দ স্থান শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়।

সাধারণ লোকে ঐ দেবতাটির নিকট সূতিকাগৃহে শিশুদিগের পেঁচো পাওয়া (ধনুষ্টংকার) প্রভৃতি নানারূপ রোগমুক্তির জন্য মানস করে এবং তাহা পূর্ণ হইলে আমিষ নৈবেদ্য ও ছাগ বলি দিয়া উহার পূজা সম্পন্ন করে।

সাধারণতঃ একটি উচ্চ বেদীর উপর দক্ষিণ পা মুড়িয়া ও বাম পা ঝুলাইয়া ঐ মূর্ত্তিটিকে উপবিষ্ট প্রদর্শিত হয় এবং উহার দক্ষিণ হস্তটি দক্ষিণ পায়ের হাঁটুর উপর ও বাম হস্তটি ঐ পায়ের গোড়ালির উপর রক্ষিত থাকে। আকারে উহা একটি মল্লের অনুরূপ। উহার রং রক্তবর্ণ, গাত্রদেশ নগ্ন, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, মস্তকোপরি কেশরাশি বেণীর আকারে গুটাইয়া সজ্জিত, মুখে দীর্ঘ ঘন গোঁফ, চক্ষু দুইটি উন্মুক্ত ও আকারে বৃহৎ এবং দুই কর্ণে দুইটি কলিকা ফুল থাকে (চিত্র ৪)।

৫নং চিত্র। বাবাঠাকুরের মত দেবতা
(দক্ষিণ ভারত)

ঐরূপ স্বাভাবিক আকারে গঠিত হইলেও উহাতে আদিমভাব এখনও সুস্পষ্ট আছে। এতদ্ভিন্ন উহার বাবা ঠাকুর নামটিও আদিম ধরণের।

দক্ষিণ ভারতে তামিল ও তেলেগু জাতির মধ্যেও উহার অনুরূপ একটি দেবতা এখনও পূজিত হয়। ঐ মূর্ত্তিটিরও একটি আলোকচিত্রের প্রতিলিপি এখানে প্রকাশিত হইল। উহা দেখিলে বুঝা যাইবে উক্ত বাবাঠাকুরও বারাঠাকুরের মত একটি আদিম দেবতা (চিত্র ৫)।

দক্ষিণ ভারতের অনার্য্য দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত তামিল ও তেলেগু জাতির উপাস্য পূর্ব্বোল্লিখিত দেবতাগুলির সহিত উক্ত বারা ও বাবাঠাকুরের আকারের সৌসাদৃশ্য হইতে প্রতীতি হয় যে, নিম্নবঙ্গেও তামিল ও তেলেগু জাতির পূর্ব্বজগণের অনুরূপ ধর্ম্মভাবাপন্ন অনার্য্য মানবগণের বাস

The Village Gods of South India. Chapter VIII. Page 142.

† বাঙ্গলা অভিধান—শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র

ছিল এবং ঐ দেবতা দুইটি তাহাদেরই উপাস্য প্রতীক, কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐরূপ আদিম মানবগণের পরিচয় অজ্ঞাত।

মহাভারত ও কয়েকটি পুরাণে বঙ্গদেশের সাগরতীরবর্ত্তী ভূখণ্ডে অনার্য্যগণের বসবাসের উল্লেখ আছে। মহাভারতের সভাপর্ব্বে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে উহারা ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত। ঐ সমস্ত অনার্য্যের বাসহেতু অশুভ দেশ বলিয়া অতীত যুগে উক্ত ভূভাগে আর্য্যদিগের বাস নিষিদ্ধ ছিল। কূর্ম্মপুরাণে ঐ প্রকার নিষেধাজ্ঞার যে নিদর্শন আছে তাহা এই :

> "হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যে পূর্ব্ব পশ্চিময়োঃ শুভম্।
> মুক্তা সমুদ্রয়োর্দেশং নান্যত্র নিবসেদ্দ্বিজঃ।"§

অর্থাৎ,

দ্বিজ হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্যে বাস করিবে, আর পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র তীরবর্ত্তী দেশ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাগেও শুভ দেশে বাস করিবে, কিন্তু অন্য দেশে বাস করিবে না

কিছুদিন পূর্ব্বে সুন্দরবনের পশ্চিমাংশ প্রদেশে ভূগর্ভের অধিক নিম্নদেশ হইতে প্রাগৈতিহাসিক শিল্পরীতিতে গঠিত কতকগুলি পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটির সচিত্র বিবরণ 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় শ্রীবিমলকুমার দত্ত প্রকাশ করিয়াছেন।* সম্প্রতি শ্রীসুধাংশুকুমার রায়ও ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত বোলসিদ্ধি গ্রামে একটি গভীর জলাশয় খননকালে কতকগুলি, আদিম মানবের শবাধারে রক্ষিত মৃৎপাত্রের অনুরূপ, মৃৎপাত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।†

পশ্চিম সুন্দরবনের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে তাহার পরিচয় আমি পূর্ব্বে 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করিয়াছি।‡ ঐ সকল প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, নিম্নবঙ্গের সাগরতীরবর্ত্তী ভূখণ্ডও বহু প্রাচীন স্থান এবং তথায় সুদূর অতীত যুগে আদিম মানব সভ্যতার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব।

পশ্চিম সুন্দরবনের প্রাচীন স্থানগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খনন ব্যতীত উপরোক্ত পুরাবস্তুসমূহের বয়স যথাযথ নির্দ্ধারণ করা কঠিন হইলেও ঐগুলিও যে এই প্রবন্ধে বর্ণিত বারাঠাকুর ও বাবাঠাকুরের মত নিম্নবঙ্গের আদিম মানব সভ্যতার উদ্বর্ত্তনের নিদর্শন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

§ কূর্ম্মপুরাণ, উপরিভাগ, ১৩ অধ্যায়, ২৪

* "Some Early Antiquities from Lower Bengal."—*The Modern Review* for September 1948.

†*Hindusthan Standard,* 24 February, 1951.

‡ "প্রাচীন যুগে পশ্চিম সুন্দরবন"—'প্রবাসী', শ্রাবণ ১৩৫৭।

দেশবন্ধু

শ্রীনীলরতন দাশ

বন্দিনী দেশজননীর ডাকে কার প্রাণ চঞ্চল ?
মার আবাহন করিয়া শ্রবণ আঁখি কার ছলছল ?
ভোগীর জীবন নিমেষে ত্যজিয়া কেবা সাজে যোগিবর ?
ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত কার তপস্যা দুষ্কর ?

আর্ত্ত আতুর নিঃস্বের ব্যথা কাহার মর্ম্মে বাজে ?
রাজার ভূষণ ছাড়ি' এক বাসে কে নামে ধূলির মাঝে ?
সর্ব্বস্ব কে বিলাইয়া হয় মহৈশ্বর্য্যবান্ ?
অসীম উদার চিত্ত কাহার মৃত্যুবিহীন প্রাণ ?

ভগীরথ সম কে আনে বহিয়া ভাবগঙ্গার ধারা ?
মুক্তিমন্ত্রে দেশের আত্মা কে করে আত্মহারা ?
রাজরোষে কেবা বন্দীজীবন হাসিমুখে লয় বরি' ?
কারাগার হয় তীর্থ কাহার চরণ পরশ করি' ?

নিঃশেষে প্রাণ কে করেছে দান জাতির মুক্তি তরে ?
তিনি যে দেশের বন্ধু পূজিত বাংলার ঘরে ঘরে।
তিনি আমাদের নব্যযুগের ছিলেন সব্যসাচী,
তাঁহারি শৌর্য্যে মুক্তিসমরে আমরা যে জিনিয়াছি।

সিদ্ধার্থকে দেখি নাই চোখে, দেখি নাই দধীচিরে ;
দেখি নাই মোরা হরিশ্চন্দ্র পুরাণের দানবীরে।
অতীত কাহিনী শুনিয়া যাদের হয় নিকো প্রত্যয়,—
দেশবন্ধুকে দেখিয়া তাদের ঘুচিয়াছে সংশয়।

রাজার পুত্র ভিক্ষু সাজিল আমাদের সম্মুখে,—
ধন্য হইল জীবন মোদের জন্মি' তাঁহার যুগে।
সর্ব্বত্যাগী সে সন্ন্যাসীর স্মরি' নির্ভীক বাণী।
শ্রদ্ধাবনত চিত্তে জানাই প্রাণের প্রণামখানি।

যে পৃথিবী হারাল চাঁদ

শ্রীঅনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

সামনে পানের দোকান থেকে একটা সিগারেট ধরাল সুব্রত। সবে ছুটি হয়েছে আপিসগুলোর। লোকে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল ডালহৌসী স্কোয়ারের চারপাশ। কোথায় কোন অন্ধকূপের রুদ্ধ বাতাসে এতক্ষণ এরা ধুঁকছিল ভাবতে গিয়ে হাসি পেল সুব্রতর। মানুষে মানুষে ঠাসাঠাসি কয়েকটা ট্রাম পর পর চলে গেল বৈদ্যুতিক ঝঙ্কার টেনে। এই মানুষগুলোর পানে তাকিয়ে সুব্রত নির্বিকার উদাসীনতায় ধোঁয়া ছাড়ে।

শেষ হয়ে এসেছে সিগারেট দু' আঙুলের ফাঁকে। একভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা দুটো টাটিয়ে উঠেছে। বাড়ী ফিরতে হবে। অগোচরে সময় অনেকখানি অতিক্রান্ত হয়েছে। সিগারেটের জলন্ত ভগ্নাংশ একপাশে ছুঁড়ে ফেলে সুব্রত পা মেলাল এই অগণিত জনতার পথচলার সঙ্গে, হারিয়ে গেল চলমান মানুষের ভিড়ে। কে বলবে সে-ই একটু আগে এদেরই পানে তাকিয়ে অবজ্ঞার হাসি হেসেছিল।

অনেকখানি পথ। ঘরে ঢুকে ধপাস করে বসে পড়ল। রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বলল—চা খাওয়াবে মণি?

'ইস্ আবদার দেখ'! মণিকা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। 'লজ্জা করে না বলতে। ঘরে যেন কতই বস্তা বস্তা চিনি রয়েছে—না!' আজকাল ওর কথায় আর রাগ করে না সুব্রত—করত আগে। একটু চুপ করে থেকে বললে, চিনির কথা ভুলে ভেবেছিলাম চিনিরই মত মিষ্টি জবাব পাব। কিন্তু না:, কথা যে কত সুর দিয়ে, ছন্দ দিয়ে বলতে হয়, তা তুমি একেবারেই ভুলে গেছ। বলতে পারতে, চিনি নেই।

ন্যাকামি কর না। চিনি নেই তুমি জান না নাকি!

বাজারে চিনি ঘরে ঘরে চিনি, দেশে এত চিনি, আর এ ঘরে একটুও চিনি নেই! হায়রে চিনিহারা ঘর!

থাক আর কাব্য করতে হবে না। এসব নিয়ে রসিকতা করতে সাধও যায়! ধন্য তুমি। দিন দিন মাথা খারাপ হচ্ছে নাকি?

মাথার আর দোষ কি! চিনি নেই, গুড় নেই, চাল নেই, ডাল নেই, তেল নেই, তবে ঘোড়ার ডিম আছে কি?

আছে তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু! মণিকা হন্ হন্ করে নিজের কাজে চলে যায়।

নিজের রাগ দেখে নিজেরই হাসি পেল সুব্রতর। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতায় ডুব দিয়ে ডাকল, মণি—

রান্নাঘর থেকেই সাড়া আসে—আবার কি?

না, এবার আর কিছু নয়। ছেলেদুটো কোথায়?

কে জানে কোন্ চুলোয় গেছে!

হাসল সুব্রত। রোজ চুলোতেই যায় নাকি?

ইস্, রোজ ছেলেদের কত খবরই নাও! মরল কি বাঁচল তার খোঁজও তো নাও না। আজ যে বাৎসল্যরস উথলে উঠল! হ'ল কি তোমার?

জবাব দিলে না সুব্রত। দেবার প্রয়োজন নেই। তাকের উপর থেকে একটা বই টেনে নিলে। বইটা আজ শেষ করতে হবে, অনেক দিন থেকে পড়ে রয়েছে।

কখন যে সন্ধ্যা তার ধূসর অবগুণ্ঠন নামিয়েছে, তার সাড়া সুব্রত পায় নি। অন্ধকারের খোঁজ পেলে, যখন বইয়ের পাতার কালো অক্ষর বাইরের কালোয় হারিয়ে গেল। না:, বিরক্ত হয়ে উঠল সুব্রত। লণ্ঠনের খোঁজ করতে হাতের কাছেই পাওয়া গেল। দেশলাইয়ের কাঠি চারটে খরচ হয়েও লণ্ঠন জ্বলল না। নেড়ে চেড়ে দেখলে, তেল নেই একটুও। মণিকে ডাকতে গিয়ে থেমে গেল। মনে পড়ল, তেলও তো নেই। আর পারা যায় না। সারা মন বিরক্তিতে ভরে উঠল। রান্নাঘরে আলো জ্বলছে, একবার ভাবলে সেখানে গিয়ে বইটা শেষ করে। না:, থাক। ধীরে ধীরে জানলার কাছ ঘেঁসে দাঁড়াল। ঘরের বাইরে অন্ধকারের পৃথিবী তানপুরার তারের ঝঙ্কারের মত বার বার পুলকের-শিহরণে কেঁপে কেঁপে উঠছে। তারার ভরা আকাশে শীর্ণ চাঁদের ম্লান আলো। এলোমেলো বাতাস ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে নাম না-জানা কোন এক রাতের ফোটা ফুলের সুবাসকে। সুব্রত সিগারেট ধরাল একটা।

অনেকগুলো সিগারেটে ঘরের বাতাস যখন মন্থর হয়ে উঠেছে, মণিকা ঘরে এল। বললে, অন্ধকারে ভূতের মত ঘরে বসে কি করছ? আলো জ্বাল নি যে বড়?

তেল আছে ঘোড়ার ডিম যে আলো জ্বালব! সুব্রত কেমন অস্বাভাবিক হয়ে গেল।

যাক্ তেল যে নেই, তা টের পেয়েছ। সুখবর বলতে হবে।

এই তো সেদিন এক বোতল তেল এনে দিলাম। এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেল? তেল কর কি? খাও নাকি?

হ্যাঁ খাই তো। কবে কোন্ যুগে এক বোতল তেল এনেছে এখনও তা থাকবে, না? খাবখোর করে আমি যোগাড় না করলে মজাটা টের পেতে! কাজে তো এক রত্তি নেই, খালি কথাই সর্ব্বস্ব।

আচ্ছা আচ্ছা, এবার যাও। আমাকে একটু একা থাকতে দাও দেখি।

যাচ্ছি আমি যে তোমার দু'চক্ষের বিষ হয়েছি, তা অনেক দিন থেকেই জানি। বলি, এতক্ষণ চুপচাপ বসে এতো সিগারেট ফুঁকেছ!

হ্যাঁ।

পেটে ভাত জোটে না, সিগারেট টেনে নবাবী! লজ্জাও কি করে না?

নাঃ।

রাগে ঘর ছাড়ল মণিকা।...

সংসার। অভাবই শুধু। এখানে শুধু 'নেই নেই' এই সুর দিনরাত একঘেয়ে বাজে। অসহ্য লাগে সুব্রতর। মনে পড়ে ফেলে-আসা দিনগুলোর কথা। মনে পড়ে সেই দিনগুলোর রচা গান, পাওয়া স্বপ্ন, দেওয়া হৃদয়। কই তারা? কোথায় তারা? সে স্বপ্ন দেখেছিল ভালবাসার—দেখেছিল প্রাচুর্য্যে অভাবহীন পৃথিবীর। সেদিনের কামনা কি একান্ত অন্তরেরই কামনা ছিল না? সে কি সত্যিই চায় নি ভবিষ্যতের দিনগুলোকে রঙে-রসে সুন্দর করতে? তবে এ কি হ'ল? সেদিনের স্বপ্ন কেন এই বাস্তবে এসে হার মানল? কেন?

না না, হার সে মানেনি। মাঝে মাঝে এমনি এক দুর্ব্বলতা তার মনের মাঝে চেপে বসে। সুব্রত তাড়াতাড়ি এই অসহায় মোহাচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি নিলে। না, হার সে মানে নি। সুব্রত কবি, সুব্রত প্রেমিক, সুন্দরের পূজারী। হার মেনেছে মণিকা। হার মেনেছে ওরই মত মানুষের দল যারা ভুলে গেছে হাসতে, ভালবাসতে ভুলেছে সুন্দরকে। তাই চাঁদ তাদের কাছে ব্যর্থ, তাই রজনীগন্ধা তাদের আকুল করে না। তারা চিনল শুধু অভাবকে, অত্যাচারকে, অবিচারকে। দেখলে না আর কিছু, চিনল না আর কিছু।

বাইরে সাড়া জাগল। ছেলেদুটো ফিরে এসেছে।

মণ্টু বললে—অন্ধকারে কি করছ বাবা?

দেখছি রে।

কাকে?

সারাটা জীবন যাদের অন্ধকারে কাটে, অন্ধকারের সেই সব অন্ধ মানুষদের।

তারা কারা?

তারাই তো এই জগতের মানুষ রে।

সুব্রতর কথাগুলো ওরা ঠিক বুঝতে পারে না। চোখদুটোতে বিস্ময় এনে বাপের পানে তাকিয়ে থাকে।

সত্যি বল না বাবা, অন্ধকারে কি করছিলে? আলো জ্বালো নি কেন?

কি হবে জেলে? আমাদের ঘরের ছোট্ট আলো কি ঘুচতে পারবে রে জগৎ-জোড়া এই অন্ধকার?

অমল আস্তে আস্তে বাপের কোল ঘেঁসে দাঁড়াল। সুব্রত হাসে, কি রে?

একটা আনি দাও না বাবা।

আনিতে কি হবে রে?

বন্দুক কিনব।

নিশ্চয়ই কিনবে। আনন্দে ওকে বুকে তুলে নিয়ে হাতে গুঁজে দিল চক্চকে একটা টাকা!

খুশীর প্রাবল্যে ছুটে চলে যায় অমল।

একটু পরে মণিকা এল। এ সব কি হচ্ছে শুনি?

কিসের কি?

বড় দাতাগিরি ফলানো হচ্ছে! সংসার চলছে না পয়সার অভাবে, আর উনি ছেলেকে দান করছেন টাকা!

ভাবছ বুঝি খুব খুশীমনেই টাকা দিয়েছি? না। সাধ্য থাকলে আরো দিতাম, কিনে দিতাম কাঠের নয়, সত্যিকার বন্দুক।

জানি না বাবা, যা খুশী করগে।

মোড়ের মাথায় হোটেলটায় বসে সুব্রত চা খায়। এক একটা চুমুক দেয়, আর ভাবে। ভাবে কত কি। সামনে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ভাবে। আঙুলের ফাঁকে ধরা জ্বলন্ত সিগারেট থেকে কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে ওঠে। সিগারেটের টুকরোতে টেবিলের তলাটা ভরে ওঠে।

সমর বলে—বাপস্, কত সিগারেট্ তুই খাস্ রে!

হাসে সুব্রত। বলে—খেয়ে খেয়ে লাংস দুটো একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে রে, বুঝলি?

হরি বললে—আর একটু চা দিই তার?

না হে, থাক।

সে কি, আজ এক কাপেই খতম!

চায়ে আর নেশা হচ্ছে না হে। ষ্ট্রং কিছু চাই। সুব্রত দুটো হাত টেবিলে রেখে মুখ গুঁজল।

শরীরটা আজ কি আপনার ভাল নেই? ম্যানেজার প্রশ্ন করে ওকে।

ভালই আছে। কি হবে শরীরের? কি হতে পারে? সুব্রত মুখ তুলল। কিছু হয় নি। নাথিং, কই হে, এক কাপ চা দাও দিকি।

এই তো বললেন আর চা খাবেন না।

বলেছি নাকি! ভাটস্ সিলি। হেসে উঠল সুব্রত। মানুষের মাতলামো তো রোজ দেখ, পৃথিবীকে কোন দিন মাতাল হতে দেখেছ? দেখ নি? আই পিটি ইউ পুওর বয়। আমার পৃথিবী আজ নেশা করেছে।

রাস্তা দিয়ে একদল বরযাত্রী গেল। সুব্রত শুধাল—গোলমাল কিসের হে এত ?

জানেন না বুঝি ? আমাদের হরিনারাণের বিয়ে যে !

ছোঁড়াটা মাতাল। মন্তব্য করলে সুব্রত।

সে কি !

মাতাল না হলে, সুস্থ মানুষ কি বিয়ে করে !

সমর হাসে। বলে—কি ব্যাপার ? আজ এত 'আর্লি' ?

এমনই। চায়ে চুমুক দিলে সুব্রত।

পকেট থেকে সিগারেটের টিন বার করলে সমর। ওর দিকে এগিয়ে দিলে। কাম্ অন্।

নাঃ।

না মানে ? অমৃতে অরুচি ?

ছেড়ে দিয়েছি।

আর, পাগলামি করিস নে। হাসে সমর।

দিস্ ইজ নো পাগলামি মাই ডিয়ার। সুব্রত কাপ ঠেলে রেখে বললে।

সিগারেট্ ছেড়ে দিলে বাঁচবি কি নিয়ে রে ? পাগলামি রাখ। তোর জন্যেই ষ্টেট্ এক্স্প্রেসের টিনটা এত দামে কিনলাম। কাম্ অন্।

তাই নাকি ? আগে বলতে হয়। উৎসাহী হয়ে উঠল সুব্রত।

আজ সমস্ত রাত ধরে টিনটা শেষ করে দোব। নেভার মাইণ্ড।

বাড়ী যাবি না রে ?

ড্যাম ইট। আজ আছে শুধু মাতাল রাত আর টিনভর্তি সিগারেট। আর কিছু নেই। নাথিং।

আপিসের কেরাণী সুব্রত। স্তূপাকার ফাইলের মধ্যে বৈচিত্র্যহীন জীবন আর্তনাদ করে। কিন্তু সব কেরাণীর মত নীরবে হার মানতে চায় না, আত্মসম্মান বলিদান দিতে পারে না। যৌবনের শিরায় শিরায় তার বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ।

সুব্রত নিজের চেয়ারটিতে বসে সিগারেট টানে। ফাইলগুলো একপাশে ঠেলে রেখে খোলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকে। মেঘে মেঘে সজল হয়ে আসে আকাশের নীল, সামনে আমের গাছের পাতায় পাতায় লাগে হাওয়ার শিহরণ। দেখে, পাখীরা সেখানে সারা দুপুর ভিড় করে আসে আর যায়। দেখে।

কি কাজ নেই নাকি ? দিব্যি আরামে বসে রয়েছ !

আছে বৈকি কাজ, অনেক কাজ। কাজ আছে বলেই তো ফাঁকিকে এমন করে পাওয়া যাচ্ছে। হাসে সুব্রত।

কেউ যদি এসে পড়ে এখন ?

পাছে আমার ফাঁকি দিতে দেখে ফেলে, সেই ভয়ে ওদের কেউ এদিকে আসে না। আর এলেই বা কি ? পা দুটো টেবিলের উপর তুলে দিয়ে আরামের মাঝে পরিপূর্ণতা আনব।

বেশ আছ তুমি।

বেশ নেই হে। বেশ থাকলে কেন এই বিদ্রোহ, কেন এই অত্যাচার, কেন এই দাসত্ব ?

সবাই অবাক হয়ে দেখে সুব্রতকে। সবাই যখন ঘাড় নীচু করে গালাগাল হজম করে, ওই শুধু দাঁড়িয়ে থাকে মাথা তুলে। সবাই যখন অভাবে কাঁদে, ও একলা শুধু সেই কান্নার মাঝ থেকে হাসির টুকরোগুলো খুঁজে খুঁজে জমিয়ে মালা গাঁথে। সুব্রত ছোট হয়েছে, কিন্তু নীচু হতে পারে নি।

সাহেবের ঘরে ডাক পড়ল। এসব কি আরম্ভ করেছেন ? কাজে রোজ একগাদা করে ভুল ! অথচ উপরওলাদের সঙ্গে তর্ক করতে তো ভুল করেন না। মন দিয়ে কাজ করুন।

এর চেয়ে বেশী মন কাজে দেওয়া যায় না।

মানে ?

অভাব অভিযোগ, দুঃখ কষ্ট এ সবের দিকে সারাটা দিন মন দিয়ে আপিসের কাজে দেওয়ার মত মনের এইটুকুই বাকী থাকে।

অত কথা শুনতে চাই না।

তা জানি। শুনতে চান না আপনারা, শোনাতেই চান।

কথাই শিখেছেন। এত কথা শিখলে আর কাজ হবে কোথা থেকে ! যান, যা বললাম শুনুন, ভাল করে কাজ করুন।

সুব্রত গেল না। শুধাল, ভাল কাজ চান ?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

চাওয়া অন্যায়।

অন্যায় !—সাহেব চমকে ওঠেন।

নয়তো কি ? মানুষ যখন ভাল খেতে পাচ্ছে না, ভাল পরতে পাচ্ছে না, প্রাণ খুলে হাসতে পারছে না, তখন ভাল কাজের প্রত্যাশা করা অন্যায়ই শুধু নয়, অপরাধ।

তর্ক করবেন না, বাইরে যান। সাহেব গম্ভীর হলেন।

আপনার মত লোকের সঙ্গে তর্ক করে নিজের বিদ্যে-বুদ্ধির অপমান করতে চাই না।

হোয়াট ! হোয়াট ডু ইউ মীন ? সাহেব প্রায় লাফিয়ে উঠেন চেয়ার ছেড়ে।

বেশী মাইনে পেয়ে উঁচুতে বসে আছেন বলেই কি মনে করেন নিজেকে সর্বজ্ঞ। দ্যাট ইস্ এ গ্রেট মিস্টেক মাই ডিয়ার স্যার।

গেট আউট, বেরিয়ে যান। সাহেবের সারা মুখ রাগে যেন রক্তস্নান করল। আপনার মত লোক এ আপিসে দরকার নেই—এক্ষুনি বেরিয়ে যান।

ধীরে। অত চেঁচাবেন না। ভদ্রভাবে কথা বলতে শিখুন।

ভদ্রতা আর তোমার কাছে আমার শিখতে হবে না। অভদ্র ছোটলোক কোথাকার! এক্ষুনি আপিস ছেড়ে চলে যাও—নইলে···

দারোয়ান ডাকবেন, এই তো? তার আগে আপনার মুখে যদি এমন একটা ঘুঁষি বসিয়ে দিই যে ঠোঁট দুটো আলাদা হয়ে ঝুলতে থাকে, তবে সে লজ্জা রাখবেন কোথায়? না, সে আর করব না। গুড বাই।

হাসতে হাসতে সাহেবের চেম্বার ছাড়ল সুব্রত। তারপর সোজা একেবারে পথে নামল। একটা সিগারেট ধরিয়ে অসীম তৃপ্তির সঙ্গে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। প্রকাণ্ড আপিসের বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললে, ড্যাম ইট।

মণিকা বললে—আজ এত তাড়াতাড়ি যে? কি ব্যাপার?

বিশেষ কিছু নয়।

ছুটি হয়ে গেল বুঝি?

না, ছুটি নিয়ে এলুম।

মানে? মণিকার বুকটা কেঁপে ওঠে।

মানে সোজা। আপিসকে একটা বিরাট ও আভিজাত্যিক গুডবাই দিয়ে এলাম।

কার সঙ্গে ঝগড়া করলে?

খোদ বড় সায়েবের সঙ্গে। ঝগড়াই শুধু নয় মণি, মারতে বাকী রেখেছিলাম।

এবার কি হবে? খাবে কি?

বোকা মেয়ে, যাদের কিছু নেই, তাদের খিদেও যে নেই, এও জান না!

কথাই তোমার সর্ব্বস্ব! সংসার চলে না, কোন রকমে আধপেটা খেয়ে দিন চলছে, আর উনি আজ এ আপিস ছাড়ছেন কাল ও আপিস ছাড়ছেন—মাসের মধ্যে পনর দিন বেকার হয়ে বসে থাকা! লজ্জাও করে না। গরীবের আবার অত মান-অপমান কিসের? জানি না বাবা, যা খুশী করগে, মরগে। আমি কেন মিথ্যে বকে মরি।

সুব্রত একটা কথাও বললে না। সারাদিনের পরিশ্রান্ত দেহটাকে খাটের উপর এলিয়ে দিলে।

বহুক্ষণ পরে নামল সন্ধ্যা। শিউলীর আকুল সৌরভ বাতাসকে মাতাল করে আনে। আকাশে জেগেছে মস্ত চাঁদ।

সুব্রত ডাকল—মণি···

কি? মণিকা আবার এল।

কি করছ? এখানে একটু বসবে এস না।

কেন কি হবে?

দেখেছ কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে আকাশে। দেখ না মণি।

দেখেছি, তাতে কি?

চাঁদ, বোকা মেয়ের কথা শোনো! তুমি এসেছ, আর ও বলছে তাতে কি! এই মেয়েই এক দিন ভালবাসত তোমায়। হায় চাঁদ!

থাক আর ন্যাকামি করতে হবে না। চাঁদ দেখে ত আর পেট ভরবে না। আমি যাই অনেক কাজ রয়েছে।

শোন না, লক্ষ্মী মণি আমার, একটা গান গাওনা আজ। কত দিন গাও নি। গান তোমায় ভোলে নি, তুমি ভুলেছ গানকে।

চাকরি ছেড়ে তোমার মাথা খারাপ হ'ল নাকি? মণিকা চলে গেল নিষ্ঠুর অবজ্ঞাভরে।

পাগলই সে হয়েছে। সারাটা জীবন ওই চাঁদই তাকে পাগল করে গেল। হায় চাঁদ!

হোটেলের একটা কোণে সুব্রত নীরবে বসে থাকে। সামনে ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা পড়ে আছে।

সমর বললে—আবার চাকরি ছাড়লি তবে।

অন্যায়কে অন্যায় বলে নিঃশব্দে মেনে নিতে পারি না, ওই আমার দোষ।

এখন কি করবি তবে?

হয়েই যাবে একটা কিছু। তার জন্যে ভাবি না। দেখি যে সিগারেট একটা। অনেকক্ষণ ধোঁয়া ছেড়ে ভাবতে লাগল সুব্রত। তার পর বললে—বাঁচতে আমি চাই, সুষ্ঠু ভাবে, পরিপূর্ণতায়। বাঁচতে চাই ভালবাসায়, বেদনায়, কাব্যে। কিন্তু বাঁচতে ওরা দিলে কই? ওরা অবজ্ঞায় আমাদের বাঁচাকে উপেক্ষা করতে চায়, অভাবের জ্বালা ভোগ করিয়ে আমাদের ভালবাসার সমাধি দিতে চায়। কিন্তু আমাকে ওরা পারলে না। আই হ্যাভ এচিভড এ গ্লোরিয়াস্ ভিক্টোরি মাই ফ্রেণ্ড। হায়রে তারাই যারা অভাবের বেদনাকেই বড় করে চিনল, যারা কান্নাকে সহজ ভাবে নিতে পারলে না। কিন্তু আমার এতটুকোর এই কান্নাকে নিয়েই।

সমর অবাক হয়ে শুনে যায় ওর কথাগুলো। শোনে অনেকেই। ওকে ওদের আশ্চর্য্য লাগে। বিস্ময়ের মত মনে হয়। মনে হয় পাগল, কারো বা মনে হয় খাঁটি মানুষ। ভয় লাগে, শ্রদ্ধা জাগে, জাগে অবজ্ঞা, জাগে বেদনা।

পাঁচটা টাকা হবে রে? সুব্রত শুধায়।

হ্যাঁ।

দেখি।

নোটটা নিয়ে হোটেলের একটা চাকরকে বলে—যা তো, এই পাঁচ টাকার ফুল কিনে আনবি, ভাল ফুল। আচ্ছা। গোলাপই আনিস্, লাল গোলাপ!

এত ফুল কি হবে? সমর অবাক হয়।

কথা শোনো? আজকে চাঁদের রাত, আর ও বলে ফুল কি হবে।

সুব্রত অনেক রাত পর্য্যন্ত হোটেলে বসে থাকে। চা খায়। সিগারেট টানে আর বকে যায়।

ম্যানেজার বললে—অনেক রাত হ'ল, বাড়ী যাবেন না?

রাত? ক'টা হ'ল?

তা বারটা প্রায় বাজে।

মাত্র? দ্যাটস্ নাথিং। তোমরা জান না, আজ যে আমার চাঁদের সঙ্গে অভিসারের রাত।

সমর বললে—সত্যি, বাড়ী চল।

বাড়ী? অল্ রাইট। দেখি ফুলগুলো। উঠে দাঁড়াল সুব্রত।

সুব্রত বাড়ী ফিরল, তখন অনেক রাত। চাঁদ তাকে পথ চিনিয়ে এনে দিলে। সবাই সুপ্ত ঘুমের দেশে। খোলা জানলা দিয়ে চাঁদের যেটুকু আলো ঘরে ধরা দিয়েছে, দেখা গেল ওরা তিন জনেই আচ্ছন্ন ঘুমে। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে, সুব্রত মণিকার দিকে ঝুঁকে পড়ল। কি হয়ে গেছে সেদিনের সেই সুন্দরী মেয়েটা! চোখের কোল দুটো কালো হয়ে গেছে, সারা মুখ ভরে যে উজ্জ্বল দীপ্তি তার ছিল, তা বেদনায় ধুসর হয়ে গেছে। কই তার সেই হাসি আর যৌবন? এ তো এক শীর্ণ কঙ্কাল? এ মেয়ে শুধু কাঁদতেই জানে, অভাবে হার মানতেই পারে, বেদনায় নিঃশব্দে আত্মাহুতিই দিতে পারবে। কই সেই মেয়ে? কই তার সে মণি? যাকে ভালবেসেছিল সুব্রত। যার সাহচর্য্যে পৃথিবীর হাসি আর গানকে চিনেছিল, প্রাণকে চিনেছিল, চিনেছিল যৌবনকে। সুব্রত রোজই ওকে দেখে। কিন্তু আজ নূতন ক'রে দেখল। এমনি করে কোনদিন দেখে নি, এমনি করে চেনবার চেষ্টা করে নি। অভাবকে, বেদনাকে ও সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলে না। কান্নার রাখে অশ্রু ছাড়া আর কিছু পেলে না—তাই তো হার মানল। তাই হাসি ভুলেছে, ভুলেছে গান—ভুলল সুন্দরকে, তার প্রিয় সব কিছু ভুলেছে। নিঃশব্দে মৃত্যু হ'ল মেয়েটার যৌবনের।

সবগুলো গোলাপ ঘুমন্ত মণিকার উপর ছড়িয়ে দিয়ে ঘর ছাড়ল সুব্রত। ও ঘুমাচ্ছে, ঘুমাক। চোখে যেন কিসের সজল ছায়া পড়েছে। রাতের পরীরা হয়তো কালো দুটো চোখে চুমু দিয়ে গেছে। ঘুমোও তুমি। তোমার এই একটা রাত অন্ততঃ সুন্দর হোক।...

ভোর হয়েছে। জানলার পাশে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ চোখে সুব্রত পূবের আকাশের দিকে তাকায়।

মন্টু আজ অনেক আগে উঠেছে। পাশের ঘরে বাবাকে দেখে কাছে গেল।

বাবা।

কি রে? আয়।

কি দেখছো বাবা এখানে দাঁড়িয়ে?

দেখবি, আয় কাছে, আয়। কাকে দেখছি জানিস? ওই যে অনেক দূরে, একটা আলোর দীপ্তি, তাকে।

ও তো সূর্য্য বাবা।

হ্যাঁ, সূর্য্যই। ওকে প্রণাম কর।

কেন বাবা?

খোকা, ওই তো সব রে। ওই শক্তি, ওই দীপ্তি। সব অন্ধকারের শেষ ওই তো করে। শেষ করে সব পাপের, সব অকল্যাণ আর অসত্যের পুঞ্জীভূত গ্লানিকে। এই সূর্য্যই তো আনে নূতন দিন, প্রত্যহ নূতন রক্ত-প্রভাত। এ হার মানে না, বেদনা জানে না। ওকে প্রণাম কর। আজ শুধু নয়, রোজ। আর বল, সূর্য্য তোমার মত আমার শক্তি দাও, দৃঢ়তা দাও, বাঁচবার স্পন্দন দাও। সূর্য্যকে যদি ভালবাসতে পারিস, তবে পৃথিবীকে ভালবাসতে কোনদিনই তোর ভয় হবে না।

এসব কথা ছেলেটার যেন ভাল লাগে না, সব বুঝতেও পারে না। সুব্রত থামতেই ডাকল তাই, বাবা?

কি রে?

মায়ের গায়ে অত ফুল কেন? কি করে এল?

তাই নাকি? কি জানি, রাতের পরীরা হয়তো ফেলে গেছে। চল দেখে আসি।

দরজা অবধি গিয়ে থেমে গেল সুব্রত। একগাদা ফুল বুকে চেপে নিস্পন্দ প্রতিমূর্ত্তির মত বিছানায় বসে মণিকা। দুটো চোখে টলমল করছে জল।

গণিতশাস্ত্রে ভারত

শ্রীকণিকা দে

পূর্ব্বগগন যখন সূর্য্যের লালিমায় ওতঃপ্রোত হয়—পশ্চিম গগন তখন তার আভামাত্রই উপলব্ধি করে। সভ্যতারও বিকাশ হয় প্রথমে প্রাচ্য জগতে, পরে ধীরে ধীরে পাশ্চাত্ত্য জগতে তা পৌঁছায়—তাও কেবল সভ্যতারশ্মির আভামাত্র। সভ্যতা-বিকাশের আদিকাল হইতে ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক এবং ভৌতিক অর্থাৎ জ্ঞানবিজ্ঞানের যে বিভিন্ন-শাখায় অসাধারণ উন্নতিলাভ করে তাহার মধ্যে গণিতশাস্ত্র সর্ব্বপ্রধান। যে গণিত বিজ্ঞানের প্রবেশদ্বার-স্বরূপ, যাহার অভাবে বৈজ্ঞানিক কোনও সিদ্ধান্তের সমাধান হওয়া অসম্ভব ছিল সেই গণিতে বৈদিক আর্য্যদের জ্ঞান ছিল অপর্য্যাপ্ত এবং তারই বলে তাহারা বিজ্ঞানজগতে এইরূপ উন্নতিসাধন করিতে পারিয়াছিলেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্রেও যে তাহারা পারদর্শী ছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বৈদিক মন্ত্রেই পাওয়া যায়। বেদাধ্যয়ন করিবার পূর্ব্বে বেদের ষড়াঙ্গের (বেদাঙ্গ) জ্ঞানলাভ অত্যাবশ্যক। এই ষড়াঙ্গের দুই অঙ্গ—জ্যোতিষ ও কল্প যাহাতে গণিতের জ্ঞান অপরিহার্য্য।

প্রাচীন আর্য্যদের গণিতবিষয়ক উৎকর্ষের আলোচনা করিলে তাহাদের অসামান্য প্রতিভার পরিচয়ই যে কেবলমাত্র পাওয়া যায় তাহা নহে—সমগ্র বিশ্বকে গণিতশাস্ত্রের জ্ঞান দান করিয়া ভারত যে অমূল্য এবং প্রধানতম উপহার দিয়াছে তাহা সত্যই উল্লেখযোগ্য। প্রধানতম দান এই কারণে বলা হইতেছে যে, আজ সমগ্র পৃথিবীতে বিজ্ঞানের যে আশ্চর্য্য উন্নতি সাধিত হইয়াছে গণিতশাস্ত্র ব্যতিরেকে তাহা অসম্ভব ছিল। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বিদেশী লেখক ইহা স্বীকার করিতে রাজী নহেন যে, প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ গণিতে পারদর্শী ছিলেন—শুধু তাহাই নহে বৈদিক ঋষিগণ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ছিলেন, একথা বলিতে পর্য্যন্ত ইঁহারা কুণ্ঠাবোধ করেন না। প্রথমতঃ, বৈদিক যুগকেই তাঁহারা আরও আগাইয়া লইতে সচেষ্ট হন যাহাতে বৈদিক সভ্যতা প্রাচীন সভ্যতা হইতে অধিকতর প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত না হয়। দ্বিতীয়তঃ, ভারত যে কখনও পাশ্চাত্ত্য জগৎ হইতে অধিকতর সভ্য ছিল ইহা পর্য্যন্ত মানিয়া লইতে তাঁহারা রাজী নহেন।

ইহা ব্যতীত ইউরোপ ভারত অপেক্ষা গ্রীস প্রভৃতি দেশের প্রতি অধিকতর কৃতজ্ঞ, কারণ ইউরোপীয় জ্ঞানের মূল উৎস গ্রীস—গ্রীসই তাহাদিগকে অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানের সহিত গণিতের জ্ঞানও দিয়াছে। আবার গণিতশাস্ত্রের জন্য গ্রীস মিশরের নিকট ঋণী। এই জন্যই ইউরোপীয় বিদ্বৎসমাজে এইরূপ মত প্রচারিত যে গণিতবিদ্যার আদি বিকাশ গ্রীস ও মিশরেই হয়।

প্রকৃতপক্ষে তো মুসলমান প্রভুত্ব যখন ইউরোপে বিস্তৃত হইতে লাগিল তখনই (দ্বাদশ শতাব্দীতে) আরবাদি দেশের মারফত ইউরোপ ভারতীয় গণিতের পরিচয় প্রথম পাইল। কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন যে, ভারত গণিতশাস্ত্রের জ্ঞান মিশর হইতে পাইয়াছে এবং তাহার পরে নিজের রুচি অনুসারে তাহার অনুশীলন করিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ ডবলিউ. আর. বল তাঁহার রচিত 'সর্ট হিষ্ট্রী অব ম্যাথেমেটিকস্'-এ ইহা প্রমাণ করিতে যত্নবান হইয়াছেন যে, ভারতীয় জ্যোতিষী আর্য্যভট্ট সম্ভবতঃ ডিয়োফেণ্টসের গণিতপদ্ধতির সহায়তা লইয়াছেন এবং ব্রহ্মগুপ্ত ইউক্লিডের জ্যামিতি-বিষয়ক সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন মাত্র।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, এই লেখকগণের হয় বৈদিক সাহিত্যের সহিত কোন পরিচয় নাই, নতুবা নিজেদের বদ্ধমূল ধারণার সমর্থনের নিমিত্ত এইরূপ লিখিয়াছেন। গণিতের শাস্ত্রীয় পদ্ধতির মূলতম আধার দশাঙ্ক গণনা অর্থাৎ ১ হইতে ৯ ও শূন্য অঙ্ক এবং একক, দশক, শতক, সহস্রাদির গণনা; দশগুণোত্তর প্রণালী তো যাবতীয় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ও প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়। উদাহরণ-স্বরূপ যজুর্ব্বেদ হইতে উদ্ধৃত করা হইতেছে—

"একা চ শতম্ চ সহস্রম্ চাযুতম্ চ নিযুতম্ চ প্রযুতম্ চার্ব্বুদম্ চ ন্যর্ব্বুদম্ চ সমুদ্রশ্চ মধ্যম্ চান্তশ্চ পরার্দ্ধশ্চ।"

ইহাতে একক, শতক, সহস্র, অযুত, নিযুত, প্রযুত, অর্ব্বুদ, ন্যর্ব্বুদ, সমুদ্র, মধ্য, অন্ত, পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত গণনা করা হইয়াছে। অতএব প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বৈদিক কালেও আর্য্যগণের ১ হইতে ৯ ও ০ অঙ্কের জ্ঞান ছিল এবং দশগুণোত্তর প্রণালীর সহিতও তাহাদের পরিচয় ছিল। অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে—কেবলমাত্র নামের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কোন কোন গ্রন্থে ইহার সম্যক্ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। বৌদ্ধগ্রন্থ 'ললিতবিস্তর'-এ এই প্রণালীর গণনা ৫৪ অঙ্ক পর্য্যন্ত রহিয়াছে। কাত্যায়নের পালি ব্যাকরণে ১৪১ অঙ্ক পর্য্যন্ত রহিয়াছে যাহার শেষ সংখ্যা অসংখ্য নামে অভিহিত। কিন্তু অধিকাংশ লেখক ১৮ অঙ্ক পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন এবং ইহার পরে আরও অঙ্ক যে সম্ভব একথা লিখিয়াই সমাপ্ত করেন। এই গণনা কেবল গ্রন্থমধ্যেই যে সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে, ব্যবহারিক জীবনেও ইহার উপযোগ ছিল। ৭।৮ম শতাব্দীর শিলালিপিতে এই পদ্ধতির অনুসরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে গণিতকেও শাস্ত্র বলিয়া মানিয়া লওয়া হইত। ছান্দোগ্য উপনিষদে এরূপ একটি কাহিনী

রহিয়াছে যে, নারদ যখন সনৎকুমারের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিতে যান, তখন সনৎকুমার তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে তিনি কোন্ কোন্ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। তাহার উত্তরে নারদ চতুর্দ্দশ বিদ্যার নামোল্লেখ করেন—তাহাতে রাশিবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যারও (অর্থাৎ গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র) নাম করিয়াছিলেন।

শূন্যের ব্যবহার বৈদিক আর্য্যগণ উত্তমরূপেই জানিতেন। ইহা ব্যতিরেকে দশ, বিশ, ত্রিশ ইত্যাদির জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব। পিঙ্গলের (বি. পূ. ২য় শতাব্দী) ছন্দশাস্ত্রেও শূন্যের বর্ণনা রহিয়াছে।

কথিত আছে, প্রথমে বীজগণিত ও অঙ্কগণিত দুই বিভিন্ন বিষয় ছিল না—ব্রহ্মগুপ্তই ইহাদের পৃথক্ করেন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ 'বীজগণিতকুট্টক' বলিয়াই পরিচিত। তাঁহার পরবর্ত্তীকালে শ্রীধরাচার্য্য ইহাকে বীজগণিত অথবা অব্যক্ত গণিত নামকরণ করিয়াছেন। ব্রহ্মগুপ্তের পূর্ব্বে আর্য্যভট্ট বীজগণিতের সিদ্ধান্তের বর্ণনা করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার বর্ণনা একবর্ণ সমীকরণ পর্য্যন্তই সীমাবদ্ধ। ব্রহ্মগুপ্ত তাঁহার ব্রহ্মসিদ্ধান্তে উহাকে বিশ্লেষণ করিয়া সমীকরণের চারি ভেদ নির্ণয় করিয়াছেন—একবর্ণ, অনেকবর্ণ, মধ্যমহরণ ও ভবিতা। তৎপশ্চাৎ গণিতশাস্ত্রীগণ ইহার উত্তরোত্তর বিকাশসাধন করেন। আর্য্যভট, শ্রীধর, ব্রহ্মগুপ্ত, মহাবীর, পদ্মনাভ, ভাস্করাচার্য ইত্যাদি পরবর্ত্তীকালের পণ্ডিতগণ বীজগণিতের সাহায্যে এইরূপ কঠিন প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন যাহা ১৭।১৮ বিক্রম সম্বৎ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের নিকট সমস্যাই রহিয়া গিয়াছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বীজগণিত হইতে অঙ্কগণিতের বিকাশ। ইহা ত নামের দ্বারাই সূচিত হয় যে, গণিতের সিদ্ধান্ত বীজরূপে ইহার মধ্যে বর্ত্তমান। শুল্ব-সূত্রকে বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেই গণনা করা হয়। উহাতে জ্যামিতিবিষয়ক সিদ্ধান্ত বর্ণিত রহিয়াছে। উহাতে কোন কোন অঙ্ক এইরূপ জটিল যে বীজগণিতের নিয়মাবলীর সাহায্য লওয়া অপরিহার্য্য। অতএব বৈদিক আর্য্যগণ অঙ্কগণিতে পারদর্শী অথচ গণিতের অন্যান্য শাখায় অনভিজ্ঞ ছিলেন—এইরূপ মনে করা সম্পূর্ণ ভুল।

অঙ্কশাস্ত্রের ন্যায় ভূমিতিশাস্ত্র অথবা জ্যামিতিশাস্ত্রও অতীব প্রাচীন। জ্যোতিষ-বিষয়ক গণনাতে অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মাবলীর জ্ঞান যতটা আবশ্যক রেখাগণিতের জ্ঞান তাহা হইতে কোন অংশে কম নহে। কারণ জ্যামিতির জ্ঞান ব্যতীত গ্রহের গতি ও দূরত্ব মাপা, উহার চিত্র অঙ্কন করা অসম্ভব। এই কারণে উহাকে রেখাগণিত নামেও অভিহিত করা হয়। সূত্রগ্রন্থে যেখানে যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মাণ করিবার রীতি দেওয়া রহিয়াছে সেখানে জ্যামিতির ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তেরও সমাধান করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ বেদাঙ্গের এক বেদাঙ্গের নাম কল্প যাহাতে যজ্ঞক্রিয়া ও উহা সমাধান করিবার পদ্ধতির বর্ণনা রহিয়াছে। উহার দুই ভাগের একটির নাম শুল্ব-সূত্র অথবা শ্রোতসূত্র। উহাতে যজ্ঞবেদী অর্থাৎ যজ্ঞকুণ্ডের বর্ণনা দেওয়া রহিয়াছে। এই সমুদয় যজ্ঞকুণ্ড ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির। এগুলি তৈয়ারী করা এরূপ কঠিন এবং কষ্টকর যে উহাতে জ্যামিতির প্রগাঢ় জ্ঞান অত্যাবশ্যক। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, শুল্ব-সূত্র গণিত-বিজ্ঞান নহে, ইহার উদ্দেশ্য ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উপদেশ দেওয়া, কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে ইহাতে জ্যামিতির জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে—ইহা এরূপ বিশদ, গুরুগম্ভীর এবং কঠিন যে জ্যামিতি-বিষয়ক সমস্ত তর্ক, সাধ্য ও অঙ্কন ইহারই মধ্যে রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত জ্যামিতির অন্যান্য জ্ঞানও যে এই গ্রন্থ হইতে লাভ করা সম্ভব তাহাতে সন্দেহ নাই।

শুল্ব-সূত্র অনেক রহিয়াছে—উহাদের মধ্যে বৌধায়ন আপস্তম্ব এবং কাত্যায়নই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে আবার প্রথমটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। বিভিন্ন প্রকার বেদীর নাম—শ্যেন (বাজ), অলজ, রথচক্র, দ্রোণ, সামুখ্য, শ্মশান, কূর্ম্ম, গরুড়, সপর্ণ ইত্যাদি। ইহাতে বিশেষত্ব এই যে, সর্ব্বপ্রকার বেদীর ক্ষেত্রফল সমান। নাম দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে, ঐরূপ আকারের বেদীও নির্ম্মিত হইত। শ্মশানবেদীর আকার পিরামিডসদৃশ, বৌধায়ন-সূত্র গ্রন্থে ইহার সবিস্তার বর্ণনা পাওয়া যায়। বেদী নির্ম্মাণ করিতে হইলে বিভিন্ন আকারের ইষ্টকেরও প্রয়োজন হইত এবং ইহা স্থাপিত করিতে হইলে গণিতের পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক ছিল। আকারানুসারে ইষ্টকের নামও বিভিন্ন ছিল—যথা শূলপাঠ্যা, দীর্ঘপাঠ্যা, উভয়ী, হংসমুখ ইত্যাদি।

এইরূপে বেদী নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত জ্যামিতি-শাস্ত্রের সকল নিয়মই ব্যবহার্য্য—বৃত্ত, বর্গ, আয়ত ইত্যাদি বিবিধ ক্ষেত্রের রচনা, এবং একটিকে অন্যতে পরিবর্ত্তন করা, উহার দ্বিগুণ, ত্রিগুণ অথবা বহুগুণ করা ও কয়েকটি ভাগে বিভাজিত করা—এইরূপ বহু পদ্ধতির উল্লেখ ইহাতে রহিয়াছে। উহার দুই-একটি নিয়ম উল্লেখ করিলে অনেকেই বিষয়টি বুঝিতে পারিবেন এবং একেত্রে উহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বহু সমবর্গের ক্ষেত্রফলের সমান এক বর্গ অঙ্কন করিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়ম প্রয়োগ করিতে হয়।

'যাবৎ প্রমাণানি সমচতুরস্রাণ্যে কীকর্ত্তু চিকীর্ষেদে কোণানি তানি ভবন্তি তির্য্যক্ দ্বিগুণাণ্যেকত একাধিকানি ত্র্যস্রির্ভবতি তস্যেষুস্তৎকরোতি।' কা। অর্থাৎ, অনেক সমবর্গের সমান বর্গ অঙ্কন করিতে হইলে উহাদের সংখ্যা হইতে এক কম করিয়া উহার সহিত বর্গের ভুজগুলির গুণ কর, গুণফলকে এক সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমি মনে কর যাহার শেষ দুই বাহুর যোগ ঐ সকল বর্গের সংখ্যা হইতে এক অধিক আর বর্গ-বাহুর গুণন হউক। এই প্রকার অঙ্কিত সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের শীর্ষরেখার বর্গ অভীষ্ট ক্ষেত্রফল হইবে।

বর্গকে বৃত্ততে পরিণত করা জ্যামিতি-শাস্ত্রের কঠিন সাধ্যে রহিয়াছে, কিন্তু প্রাচীনকালেও শুল্ব-গ্রন্থে উহার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়।

'চতুরশ্রং মণ্ডলং চিকীর্ষন্নক্ষ্যাং কোট্যাং নিপাতয়েৎ পার্শ্বতঃ পরিক্রম্যাতিশয়তৃতীয়েন সহমণ্ডলং পরিলিখেৎ। সানিত্যা মণ্ডলম্। যাবদ্ধীয়তে তাবদাগন্তু। আপ.।'

'চতুরশ্র মণ্ডলং চিকীর্ষন্নক্ষ্য চার্দ্ধমধ্যাৎ প্রাচীমভ্যাপাতয়েদযদতি শিষ্যতে তস্য সহতৃতীয়েন মণ্ডলং পরিলিখেৎ। বৌধা.।'

'কর্ণস্থিত বর্গ শেষ দুই বাহুর বর্গের সমান হয়' জ্যামিতির এই অতিপ্রচলিত সিদ্ধান্ত আর্য্যগণ যে বৈদিক যুগেই জানিতেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বাস্তবিকই আর্য্যগণ যখন অত্যন্ত কঠিন সাধ্যও সমাধান করিয়াছেন তখন এই অত্যন্ত আবশ্যক সাধ্যে কি করিয়া তাঁহারা অনভিজ্ঞ থাকিতে পারেন। কিন্তু ইউরোপবাসিগণ এই সাধ্য সিদ্ধির সমুদয় গৌরব গ্রীক-গণিতজ্ঞ পাইথোগোরসকেই (বি. পূ. পঞ্চম শতাব্দী) দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ইহারও একমাত্র কারণ এই যে, তাহারা হিন্দু শাস্ত্রীয় গ্রন্থের সহিত অপরিচিত ছিলেন। শুল্ব-সূত্রে অভিজ্ঞ কতিপয় ইউরোপীয় পণ্ডিত কিন্তু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, উক্ত সিদ্ধান্তের আবিষ্কারক হিন্দু পণ্ডিতগণই, যাঁহারা পাইথোগোরসের শত শত বৎসর পূর্ব্বে শুল্ব-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইংরেজ পণ্ডিত টি. এল. হীথ গ্রীকপুরাণে (mythology) লিখিয়াছেন যে, পাইথোগোরসই যে উক্ত সিদ্ধান্তের আবিষ্কারক তাহার কোন নিশ্চিত প্রমাণ নাই। অন্যান্য বহু ইংরেজ পণ্ডিত, তথা হেকেল ভুক প্রভৃতি জার্ম্মান পণ্ডিতগণেরও এই একই মত। এমন কি জার্ম্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার ইহার সমর্থনই করিয়াছেন। প্রায় সকল শুল্ব-সূত্রেই ইহার বর্ণনা রহিয়াছে।

'দীর্ঘ চতুরশ্রস্যাক্ষয়ারজ্জুঃ পার্শ্বমানী তির্য্যঙ্মানীচয়ৎ পৃথক ভূতে কুরুতঃ তদুভয়ং করোতি। বৌধা.।'

'দীর্ঘস্যাক্ষয়া রজ্জুঃ পার্শ্বমানী তির্য্যঙমানী চয়ৎ পৃথক্ ভূতে কুরুতঃ তদুভয়ং করোতি। আপ.।'

'দীর্ঘ চতুরশ্রস্যাক্ষয়া রজ্জুস্তির্য্যঙ্মানী পার্শ্বমানী চ যৎ পৃথক্ ভূতে কুরুতস্তদুভয়ং করোতীতি ক্ষেত্রজ্ঞানম্। কাত্যা.।'

ইহার ভাবার্থ এই যে, আয়তক্ষেত্রের কর্ণস্থিত বর্গক্ষেত্র শেষ দুই বাহুর বর্গক্ষেত্রের যোগের সমান।

শুল্ব-সূত্র ব্যতিরেকে সূর্য্যসিদ্ধান্তেও বীজগণিত ও রেখা-গণিতের বিশদ বর্ণনা রহিয়াছে। সূর্য্য-সিদ্ধান্তের প্রাচীনতা কত তাহা আজ পর্য্যন্ত নিশ্চিত রূপে নির্দ্ধারণ করা যায় নাই। ইহাতেও বাহুর সাহায্যে ত্রিভুজ ও অন্যান্য ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করিবার প্রণালী বর্ণিত রহিয়াছে। ইউরোপে ক্লেভিয়স ষোড়শ শতাব্দীতে ইহার আবিষ্কার করেন। ঠিক এইরূপেই ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য্য প্রমুখ পণ্ডিতগণও ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য সমত্রিভুজ হইতে সমনবভুজ পর্য্যন্ত ক্ষেত্রফল নির্ণয় করিবার প্রণালী লিখিয়া গিয়াছেন।

ত্রিকোণমিতিও ভারতেরই আবিষ্কৃত শাস্ত্র, যাহার ইংরেজী নাম ট্রিগোনোমেট্রী—সংস্কৃত নামেরই রূপান্তরমাত্র। সূর্য্যসিদ্ধান্তে জ্যা (sine), কোটিজ্যা (cosine), উৎক্রমজ্যা (secant) ইত্যাদির নাম রহিয়াছে। ইহাদের সহায়তায় নক্ষত্রাদির দূরত্ব জানিতে পারা যায়। ইউরোপে ব্রিগস্ (১৬৬১-৮৮ বিক্রম সম্বৎ-এ) ইহার প্রচার করেন।

বৃত্তের পরিধির সহিত বৃত্তের ব্যাসের যে সম্বন্ধ উহাকে আজকাল গ্রীক অক্ষর 'পাই' (¶) দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। ইউরোপে সর্ব্বপ্রথম গ্রেগরী নামক এক স্কটল্যাণ্ড-নিবাসী (জন্ম বি. ১৬৯৫) 'পাই'-এর মান নির্ণয় করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী কালে উইলিয়ম জোন্স (জন্ম বি. ১৭৬৩) ইহার বিচার করেন। গ্রেগরী ইহার মান এইরূপ নির্ণয় করেন—

$$৪(১-\frac{১}{৩}+\frac{১}{৫}-\frac{১}{৭}+\frac{১}{৯}-\frac{১}{১১}+\cdots)$$

গ্রেগরীর জন্মের শত শত বর্ষ পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতের এক জ্যোতির্ব্বিদ পুর্ত্তমান সোমযাজী ১৩৫৩ শকাব্দাতে স্বতন্ত্ররূপে ইহার মান নির্ণয় করিয়াছিলেন—ইহা লেখকের 'করণ পদ্ধতি' নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে—

'ব্যাসাৎ চতুর্ঘ্নাৎ বহুশঃ পৃথকস্থাৎ ত্রিপঞ্চসপ্তাদ্যযুগহৃতানি। ব্যাসে চতুর্ঘ্নে ক্রমশস্ত্বৃণাৎ স্বং কুর্য্যাত্তদাস্যাৎ পরিধিঃ সুসূক্ষ্মঃ'।

অর্থাৎ ব্যাস ৪ দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলকে ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১ আদি বেজোড় সংখ্যা দ্বারা ক্রমশঃ ভাগ কর। উহাতে ১, ৫, ৯, ১৩ দ্বারা অর্থাৎ এক এক ছাড়িয়া শেষ দ্বারা যে ভাগফল নির্ণয় হয় তাহার যোগফল এবং শেষ ৩, ৭, ১১, ১৫ দ্বারা ভাগফলের বিয়োগফলকে সরল কর তাহা হইলে পরিধির মান নির্ণয় হইবে।

ইহা নিঃসন্দেহ যে, গ্রেগরী ঠিক এই কথারই সমর্থন করিয়াছেন। উপযুক্ত রীতি অনুসারে ইহার মান ৩'১৪১৫৯২৬৫৩৫ নির্ণীত করা যায়—ইহা নিম্নলিখিত শ্লোকে রহিয়াছে—

চণ্ডাংশচন্দ্রাধম কুম্ভপালৈঃ সমাহতাম্চক্র কলাবিভক্তা অনুমনুমানমনুমনিত্যৈঃ।

এইরূপ বলা যায় না যে, সোমযাজীই ভারতে সর্ব্বপ্রথম ইহার বিচার করেন। প্রাচীন কাল হইতেই গণিতের অন্যান্য শাখার সহিত ইহারও বিচার করা হয়। পুরাণেও কোথাও কোথাও ইহার আলোচনা রহিয়াছে এবং শুল্ব-সূত্র গ্রন্থেও ইহার বর্ণনা পাওয়া যায়।

বিদেশীর এবং বিজাতীয় শাসনের প্রভাবে আমরা আমাদের অনেক নিজস্ব সম্পদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু বর্তমান যুগে পরাধীন ভারতেও এমন অনেক গণিতশাস্ত্রীয়

জন্ম হইয়াছে যাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন যে ভারতের গণিত-ক্ষেত্রের উর্বরতা নষ্ট হয় নাই। পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী, গৌরীশঙ্কর দে, গণেশ প্রসাদ প্রভৃতির কীর্ত্তি বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতের রামানুজম গাণিতিক প্রতিভায় বিশ্বকে চমকিত করিয়া দিয়াছেন।

ইরোদে ১৯৪৪ বিক্রম সম্বতে এক সাধারণ পরিবারে শ্রীনিবাস রামানুজের জন্ম। দশ বৎসরের পূর্ব্বেই তাঁহার গণিতবিষয়ক প্রতিভা দীপ্তি পাইতে লাগিল। ১২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি এক বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইলেন—স্কুলে পড়িবার কালে অন্যমনস্ক হইয়া রাতদিন গণিতের বিষয় চিন্তা করিতেন। কোন দুরূহ পুস্তক অন্বেষণ করিয়া তাহার জটিল সিদ্ধান্তের সমাধান করিতেন এবং পরে একথা জানিয়া নিরাশ হইতেন যে উক্ত সমাধান অনেক পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। ১৬ বৎসর বয়ঃকালেই ত্রিকোণমিতিরও প্রধান প্রধান নিয়ম-সমূহ তিনি স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখাইয়াছেন। যদি সেই অল্প বয়সেই তাঁহার কোন বড় গণিত-গ্রন্থ দেখিবার অবকাশ হইত, তাহা হইলে প্রত্যেক সিদ্ধি তিনি আবিষ্কার করিতে নিশ্চয়ই পারিতেন। তিনি নিজের প্রতিভার রহস্য এই বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, কোনও প্রশ্ন চিন্তা করিতে করিতে যখন তিনি নিদ্রামগ্ন হইতেন তখন স্বপ্নে কোন দেবী আসিয়া যেন তাহার সমাধান করিয়া যাইতেন। তার পর দিন প্রত্যূষে উঠিয়া তিনি উহা নোট করিয়া লইতেন।

রাতদিন গণিতেই মগ্ন থাকাতে কলেজের পড়াশুনায় ব্যাঘাত হওয়ায় তিনি চাকরী লইতে বাধ্য হন। ইঁহার প্রবন্ধ ১৯১১-১২ সনে প্রকাশিত হওয়ায় পর দেশবাসীর, বিশেষ করিয়া বিদেশী পণ্ডিতগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। জী. এইচ. হার্ডি ১৯১৪ সালে তাঁহাকে ইংলণ্ড যাইতে অনুরোধ জানান। তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার কথা চারিদিকে প্রচারিত হইল। তিনি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

যাহা হউক, ভারতীয় গণিতশাস্ত্রের আলোচনাকালে সেই সকল দেশেরও আলোচনা করা উচিত যাহারা গণিতসম্বন্ধীয় জ্ঞান ভারত হইতেই লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন দেশসমূহের মধ্যে গ্রীস ও মিশর ব্যতিরেকে বেবিলন, ফীনিশিয়া, টায়র, চাল্ডিয়া প্রভৃতি দেশেও গণিতের চর্চ্চা ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন যে, টায়রনিবাসিগণ গণিতবিদ্যায় বিশেষ উন্নতি করিয়াছিল। ফীনিশিয়ান জাতি গণিতশাস্ত্রের যথেষ্ট বিকাশসাধন করিয়াছিল—গ্রীস পর্য্যন্ত ইহার জন্য তাহাদের নিকট ঋণী। কাহারও কাহারও মতে পাইথোগোরস ফীনিশিয়াবাসী ছিলেন, গ্রীক নহেন। ইহুদীরা গণিতে বিশেষ উন্নতি করিয়াছিল বলিয়া জানা যায় না।

মিশরে গণিতবিষয়ক কিছু হস্তলিখিত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে যাহা মিশরীয় পণ্ডিত অহমস বিক্রম পূর্ব্ব ৫০০ শতাব্দীতে লিখিয়াছিলেন। রিণ্ড (Rhind) নামক এক ইংরেজ গবেষক ইহার খোঁজ পাইয়াছিলেন বলিয়া উহা রিণ্ড-সংগ্রহ নামে আখ্যাত হইয়াছে। বর্ত্তমানে উহা ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এই গ্রন্থে মিশরবাসীর গণিতবিষয়ক জ্ঞানের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে 'পাই' এর মান নির্ণয় করিবার প্রয়াসও রহিয়াছে। ভারত হইতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মপ্রচারকগণ মিশর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন—তাঁহাদের সহিত ভারতীয় গণিতের মিশরে যাওয়া অসম্ভব নয়। সিকন্দ্রিয়াতে হীরো নামক (বি. পূ. ২৩) এক প্রসিদ্ধ গণিতশাস্ত্রী ছিলেন। উক্ত নগরেই আবার কিয়ন নামক অন্য এক গণিতশাস্ত্রীর বিদুষী কন্যা হিপাশিয়া (Hypatia) গণিতশাস্ত্রে নিপুণা ছিলেন (৪৩৭-৭২ বি. শ.)। কথিত আছে, তিনি বীজগণিতের এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন—তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রচলিত সিদ্ধান্তের প্রতিকূল হওয়ায় তাঁহাকে জীবন্ত দগ্ধ করা হইয়াছিল। ইউক্লিড গ্রীক ছিলেন, কিন্তু রেখাগণিতের জ্ঞান তিনি সিকন্দ্রিয়াতে গিয়াই লাভ করিয়াছিলেন। পরে উহার আরও বিকাশসাধন করেন। ইহাতে প্রতীত হয় যে, প্রাচীনকালে সিকন্দ্রিয়া গণিতবিদ্যার কেন্দ্র ছিল।

ইসলামধর্ম্মের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম কয়েক জন খলিফার কলাবিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছিল। ভারতের সহিত আরবের বাণিজ্য-সম্বন্ধ বহু প্রাচীন কাল হইতেই চলিত ছিল। খলিফাগণ দর্শন, জ্যোতিষ, সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করিবার নিমিত্ত ভারত হইতে পণ্ডিতগণকে আমন্ত্রণ করিতেন। খলিফা-অল-মনসুর (৮১১-৩২ বি. শ.) সর্ব্বপ্রথম আরবী ভাষায় বীজগণিত অনুবাদ করেন। হারুন-অল-রসিদ (৮৫৭ বি. শ.) এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী অলমামূ (৮৭০-৯০ বি. শ.) গণিতের বহু গ্রন্থ অনুবাদ করাইয়াছিলেন। বাগদাদের মুহম্মদ ইবন মূসা অল খ্বারিজমী নামক এক প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ সমগ্র ইউরোপে গণিত-বিষয়ক জ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতীয় গণিত-পদ্ধতিকে উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়া তিনি এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন যাহার নাম 'অল জব্রউল মুকাবল' এবং যাহার অর্থ যোগ রূপান্তর বিদ্যা। ইহার অন্তর্গত বীজগণিতের সিদ্ধান্ত সমগ্র ইউরোপে প্রচারিত হইল—বীজগণিত 'অলজব্রা' নামে অভিহিত হইল। বর্ত্তমানে উহা ইংরেজীতে উক্ত নামেই পরিচিত।

ইউরোপে সর্ব্বপ্রথম স্পেন দেশেই (১০৩০ বি. শ.) ভারতীয় গণিতগ্রন্থের অনুবাদ হয়। তাহা ইসলামধর্ম্মের সহিত সেখানে পৌঁছিয়াছিল।

যে ভারত গণিতের মূল উৎস—যে ভারত তার এই অমূল্য দান সমগ্র বিশ্বে দিয়াছে, আজ সেই ভারতের গণিতের ইতিহাস পরিপূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত হওয়া উচিত।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে বহু গল্প, আখ্যান প্রভৃতি বহু পুস্তকে এবং প্রবন্ধে নিবদ্ধ আছে। অপ্রকাশিত উপাখ্যানের সংখ্যাও কম নহে; বাস্তবিক যিনিই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, অল্প সময়ের জন্যই হউক কিংবা অধিক সময়ের জন্যই হউক, আশুতোষ সম্বন্ধে তাঁহার কিছু না কিছু বলিবার আছে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল মধুপুরে; আমার শ্বশুর শ্রীদীননাথ দে (অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ) আমাকে "গঙ্গাপ্রসাদ হাউসে" লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন; ৩২ ৩৩ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে; সেই প্রথম পরিচয়ের স্মৃতি আমার মনে এখনও সজীব হইয়া আছে; বিরাট মানুষেরাই এমন আন্তরিকতা এবং প্রসন্নতা সহকারে আমার মত ক্ষুদ্র মানুষের সহিত এরূপ ভাবে কথাবার্তা বলিতে পারেন। তিনি আইনবিশারদ ছিলেন। আমি মনে করিয়াছিলাম তিনি কৃষি সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ; সুতরাং কৃষি সম্বন্ধে দুই-একটা কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে 'বাহাদুরী' লইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু মুহূর্ত্তেই বুঝিলাম যে, কৃষি সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ নহেন, আমিই বিশেষ অজ্ঞ। বাস্তবিকই কৃষি সম্বন্ধে তাঁহার ব্যাপক জ্ঞান দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলাম। আমার মনে হইয়াছিল হাইকোর্টের বিচারপতি না হইয়া আশুতোষ যদি কৃষি-অধিকর্ত্তা হইতেন দেশের কৃষির প্রভূত উন্নতি সাধিত হইত।

এই প্রথম পরিচয়ের পর প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল; ইহার মধ্যে মাঝে মাঝে তাঁহার নিকট যাইবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু যাইতে পারি নাই; এত বিরাট তাঁহাকে মনে হইয়াছিল। এক দিন মনে সাহস সঞ্চয় করিয়া আমার পরম বন্ধু ও আত্মীয় ডক্টর সুহৃৎ চন্দ্র মিত্রের (বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের পরিচালক) সহিত ভবানীপুরে স্যর আশুতোষের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তখন সকাল সাড়ে ছয়টা হইবে, তখনও তিনি প্রাতর্ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই; কিন্তু বাড়ীতে সাক্ষাৎকারিগণের ভিড় খুবই ছিল। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের পর আমি যখন অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইতেছি তখন তিনি বলিলেন, "কি জামাই, কেমন আছ?" তাঁহার স্মৃতিশক্তি আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করিল। আমি তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে যাইতেছি, এমন সময়ে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না না, আমাকে প্রণাম করিও না, আশু মুখুজ্যের বদনাম আছে যে, যে তাঁকে প্রণাম করে তিনি তার উপরেই সুপ্রসন্ন হন।" বর্ত্তমানে যে ঘরে মাননীয় শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বসেন, সেই ঘরে তিনিও বসিতেন; সেই ঘরও লোকজনে পূর্ণ ছিল। কোনরকমে ডক্টর মিত্র ও আমি বসিবার একটু স্থান পাইয়াছিলাম। একটু পরেই ভৃত্য আসিয়া তাঁহার টেবিলে একটা বড় বাটীতে চা কি অন্য কিছু পানীয় আনিয়া দিল; রং দেখিয়া মনে হইল, উহাতে দুধের পরিমাণই বেশী। দুই এক জনের সহিত কথা বলিবার পর তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, এখন কলকাতায় কেন?" কি প্রখর দৃষ্টি! আমি অতি আশঙ্কার সহিত উত্তর দিলাম, "কয়েক মাস অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, বিশ্রামের জন্য দুই মাস ছুটি লইয়াছি।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কাছে বিশ্রামের সংজ্ঞা (definition) কি? তাস খেলবে? ফুটবল খেলা দেখবে?" সেই সময় সিনেমার প্রচলন ছিল না, থাকিলে হয়ত বলিতেন, "সিনেমা দেখবে?" আমি নিরুত্তর রহিলাম, তিনি বলিলেন, "change of work is a holiday. অর্থাৎ, কাজের পরিবর্ত্তনই বিশ্রাম; আমি যখন আইনের জটিল ব্যাপারে শ্রান্ত বোধ করি, তখন এসিয়াটিক সোসাইটির কাজে নিজেকে পূর্ণ ভাবে নিযুক্ত করি। যখন আমি ইউনিভারসিটির কাজে পরিশ্রান্ত হই, তখন হয় ইতিহাস, নয় সাহিত্য, নয় কলা চর্চ্চা করি; তুমি এই ছুটিতে ভারতীয় ইতিহাস পড়ে ফেল।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া মনে হইল তিনি কি বাজে কথা বলিতেছেন! কৃষি যার কাজ তাকে ইতিহাস পড়তে বলা! কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আমার মনে হইল জ্ঞান অর্জ্জনই তাঁহার নিকট অমূল্য সম্পদ, এবং এক জনের নিজ দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন তার নিকট শ্রেষ্ঠ সম্পদ; সেইজন্যই তিনি আমাকে ভারতীয় ইতিহাস পড়িবার জন্য বলিলেন।

ইহার পর তিনি আমাকে যে অমূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা আমার জীবনে যত দূর সম্ভব প্রয়োগ করিয়াছি এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সফল হইয়াছি। তিনি বলিয়াছিলেন, "দেশের উন্নতির জন্য যদি কোন পরিকল্পনা মনে উদয় হয়, তৎক্ষণাৎ তাহা আরম্ভ করিয়া দিও, কি কি বাধাবিপত্তি আসিতে পারে তাহা কল্পনা করিয়া কাজে পশ্চাৎপদ হইও না, বাধাবিপত্তি যেমন যেমন আসিবে তখন তাহাদের সমাধান করিবে। তবে সৎ উদ্দেশ্য লইয়া সদ্ভাবে কাজ করিতে হইবে।" এই কথা বলিয়া তিনি ইউনিভারসিটি সংক্রান্ত দুই-একটি উদাহরণ দিয়াছিলেন। তাঁহার সপ্তবিংশতি স্মৃতিবার্ষিকীতে তাঁহাকে প্রণতি জানাই।

মার্কিণ রণতরী হইতে কোরিয়ান রিপাব্লিকের পূর্ব্ব-উপকূলস্থ কম্যুনিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর উপর গুলিবর্ষণ

চীনা কম্যুনিষ্টদের আক্রমণের ফলে কোরিয়ার ছিন্নমূল নরনারী

জাপানের ইউকোহামায়, কোরিয়ার যুদ্ধে মৃত মার্কিণ সৈন্যদের শবদেহের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন

কোরিয়া রণাঙ্গনের নিকটবর্ত্তী-অঞ্চল হইতে নাগরিকদের নিরাপদ স্থানে অপসারণ

রাজনগর

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

হরিনারায়ণের দুই ছেলে প্রসন্ন ও ইন্দ্রের মধ্যে বয়সের ব্যবধান প্রায় আট বৎসর। প্রসন্নের বয়স পনের ষোল হইলেও তাহাকে উনিশ-কুড়ি বৎসরের যুবকের মত দেখায়। হাত-পা লম্বা লম্বা, বুক চওড়া, মুখের চেহারা অনেকটা পিতামহের মত। তাহার গায়ের রং ইন্দ্র ও বোনেদের অপেক্ষা ময়লা। লাঠিখেলা ও কুস্তিতে এই বয়সেই সে দক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। সে সরলবুদ্ধি ও সদা প্রসন্নচিত্ত। লেখাপড়ার দিকে বিশেষ মন নাই। পিতার শাসনের ফলে পড়াশুনায় তাহার ভয় ও অপ্রীতি জন্মিতেছিল।

হরিনারায়ণ স্ত্রীর কাছে অভিযোগ করিতেন যে, অত্যধিক আদর দিয়া তিনি প্রসন্নকে মাটি করিতেছেন। প্রথম সন্তান প্রসন্নর উপর জগদ্ধাত্রীর একটু অধিকমাত্রায় স্নেহ ছিল। এত স্নেহ প্রসন্নের আট বৎসরের ছোট ইন্দ্রের উপর ছিল না, দুই মেয়ের উপরেও নয়। হরিনারায়ণ পুত্র-কন্যাদের প্রতি জগদ্ধাত্রীর স্নেহের তারতম্য লক্ষ্য করিতেন, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলিতেন না। ইন্দ্রের পক্ষ লইয়া লড়িবার একজন লোক এই সময়ে সংসারে আসিল। তাহার নাম ষষ্ঠীচরণ। ষষ্ঠীচরণ জাতিতে নমঃশূদ্র। রুদ্রনারায়ণের আমলে সড়কি চালনায় তাহার নামডাক ছিল। লোকে বলিত সে সড়কিসিদ্ধ ছিল। মন্ত্র পড়িয়া সে সড়কি ছাড়িলে তাহার হাতের সড়কি ফিরাইতে পারে এমন লোক সে অঞ্চলে কেহ নাকি ছিল না। কলেরায় স্ত্রী ও দুইটি জোয়ান ছেলে সাত দিনের মধ্যে মরিয়া গেলে বাড়ীঘর ফেলিয়া কণ্ঠি ধারণ করিয়া ষষ্ঠীচরণ বহুদিন নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইল। তারপর বৃদ্ধ বয়সে রাজনগরে ফিরিয়া মনিববাড়ীতে চাকুরির খোঁজে আসিয়া উপস্থিত হইল। ছেলেরা মরিলে লাঙ্গল বলদ বেচিয়া দিয়াছিল। চাকুরি না লইলে খাইবে কি? আগেকার ষষ্ঠীচরণের সে শরীর, সে তেজ নাই, সে কোপন স্বভাবও প্রায় গিয়াছে, আছে শুধু কর্কশ জিহ্বার ধারটুকু।

সে চাকুরির খোঁজে আসিয়াছে শুনিয়া হরিনারায়ণ বলিলেন, তুমি সর্দার মানুষ, বাড়ীর চাকরের কাজ কি তোমাকে মানায়? কি কাজ করতে চাও বল ত?

ষষ্ঠীচরণ জবাব দিল, মানায় না ত কি না খায়্যা মরমু? কি কাম করমু তা আগে-বাগে কই ক্যামনে? যা মনে লয় তাই করমু, যা মনে না লয়, বাবাই কও আর হালাই কও নিশ্চয় তা করমু না। এই ত হল সাফ কথা। আপুনি কি কও?

হরিনারায়ণ হাসিলেন। বলিলেন, বেশ তুমি চাকরি কর। বেতন কি চাও?

ষষ্ঠীচরণ বেতনের কথা শুনিয়া চটিয়া গেল। ষণ্ডের মত একটা বৃহৎ ঘোঁৎ শব্দ করিয়া বলিল, বুড়া ষষ্ঠী চাকুরি করতি চায় বলি তারে মুখের পর এমন ওপমানের কথাডা বলতি সাওস কর‍্যান আজ। আপুনি আমার সাতপুরুষের মুনিব, আপুনিরে কই আর কি? ব্যাতন লিয়্যা চাকরি করে যদি ষোঙল এমুন বাপের ব্যাটা লয় আপুনিরে কই তবে। মনে যা লয় আপুনি ষষ্ঠীরে ডাক্যা তার হাতে দিব্যান, ষষ্ঠী সন্তোষ হয়্যা হাতে করি তাই লিবে। ব্যাতন-ট্যাতন ষষ্ঠী গেরাহ্যি করে না। ব্যাতন লিয়া কাম ছোটনোকে করে আপুনিরে কই তবে। এই ত হ'ল সাফ কথা।

হরিনারায়ণ ষষ্ঠীচরণের সাফ কথা শুনিয়া এবার আর হাসিলেন না, গম্ভীরভাবে বলিলেন, বেশ, সেই কথা থাক। এখন ভেতরে যাও, মা-ঠাকরুণের কাছে কিছু নিয়ে খাবে—যাও। অনেক বেলা হয়েছে।

ষষ্ঠীচরণও গম্ভীরভাবে বলিল, ছি-চরণ দুইখ্যান আগ্যান দেহি একবার।

হরিনারায়ণকে শ্রীচরণ দুইখানি আগাইয়া দিতে হইল। ষষ্ঠীচরণ ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া একটু ধূলি লইয়া মাথায় ও বুকে দিল। তারপর হৃষ্ট চিত্তে অন্দরের দিকে চলিল। হরিনারায়ণ একটু হাসিয়া তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার দৃষ্টিতে কৌতুকের সঙ্গে একটু স্নেহও ছিল।

ষষ্ঠীচরণ অন্দরে ঢুকিতেই দেখিল, ছয়-সাত বছরের একটি অতি সুদর্শন বালক একখানা বাঁশের ছোট লাঠিকে দুই হাঁটুর মধ্যে ধরিয়া ঘোড়া বানাইয়া হেট হেট শব্দ করিয়া উঠানময় দৌড়াইতেছে। হাতে ছোট একগাছা বেতের সঙ্গে শাড়ীর ছেঁড়া-পাড়-বাঁধা চাবুক! ঘোড়া চলিতে চলিতে দুষ্টামি করিয়া দাঁড়াইলে সেই চাবুক উঠাইয়া আস্ফালন করিতেছে। ষষ্ঠীচরণকে দেখিয়া ঘোড়া থামিয়া গেল, আর নড়িতে চাহে না।

ষষ্ঠীচরণ অন্দরে ঢুকিয়া হাঁক দিল—অ বৌমা ঠাকরাণ, বুড়া ষষ্ঠীরে ছি-চরণ ডাখায়্যা যাও গো। তারপর একমনে ঘোড়া হাঁকানো দেখিতে লাগিল। ঘোড়া আর নড়ে না দেখিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, নতুন মানুষ দেখ্যা তোমার পক্ষীরাজের ভয় লেগেছে দাদা, তাই চলতেছে না। আইসো আমার কাছে, আমি তোমারে ভাল ঘোড়ায় চড়াই।

বালক কিছু বলিবার আগে সে দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে কাঁধে উঠাইয়া লইয়া বলিল, ভালো কর্যা ধরবা দাদা, বুড়া পক্ষীরাজ এ ব্যালা ছোটবেন। বালককে দুই হাতে তাহার

গলা জড়াইয়া ধরিতে শিখাইয়া দিল। তারপর মুখে টগ্‌বগ্, টগ্‌বগ্ শব্দ করিয়া সে উঠানে দৌড়াইতে সুরু করিল। খানিকটা দৌড়ায় আর বলে—কইগো, হট্‌হট্ করতিছ না ক্যান? বুড়া ঘোড়ারে চাবুক মারতিছ না ক্যান? তারপর আবার টগ্‌বগ্ টগ্‌বগ্ শব্দ করিয়া ছোটে। বালক নূতন বাহনে চড়িয়া মহা-খুশী। বাহনের পুনঃ পুনঃ আশ্বাস পাইয়া এইবার হেট্-হেট্ শব্দ করিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিল।

জগদ্ধাত্রী বারান্দায় দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিলেন কিছুক্ষণ। মনে মনে হাসিয়া ছেলেকে বলিলেন, এই দুষ্টু ছেলে, নেমে আয় বলছি। ষষ্ঠীকে চিনিতে না পারিয়া বলিলেন, তুমি কে গো? ছেলেকে নাবিয়ে দাও।

ষষ্ঠী জগদ্ধাত্রীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, পেন্নাম বৌমা। আমি বুড়া ষষ্ঠী সর্দ্দার। তোমার শ্বশুরঠাকুরের আমোলের মানুষ গো। তোমারে বিয়া দিয়া আনলাম সেদিন। কর্ত্তার ঠেঁয়ে শোনবা সব বেত্তান্ত, আমার কইবার ফুরসুৎ নাই। চোখ নাচাইয়া হাসিয়া সে বলিল, নতুন চাকরি লিছি কিনা। তারপর বলিল, মেঠাই-মোণ্ডা ঘরে কি আছে আনো দেহি বৌমা।

জগদ্ধাত্রী ব্যাপারটা আন্দাজ করিয়া লইলেন। বলিলেন, ভাঁড়ারঘরে ঠাকুরের কাছে যাও জলপান দেবে। এই ছোঁড়া, নেমে আয় বলছি।

ষষ্ঠীচরণ খেঁকাইয়া উঠিল—ছোঁড়া নামবি ক্যামনে ঘোড়া নামাইয়া না দিলি? তোমার মুখখানা ত বড় খারাপ ভাখছি বৌমা। ক্যাবোল ধমুক দিতি পার ভাখছি। যা খাতি দিবা ভাও, দাদা এহন পক্ষুরাজ চইড়্যা বেড়াতি যাবি, নামবার ফুরসুৎ নাই ওর।

এত দিনের কর্ত্তৃত্বের পর জগদ্ধাত্রী এই প্রথম এমন অবাধ্য চাকর দেখিলেন। তিনি রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। ভৃত্য রাম-চরণকে ডাকিলেন। সে আসিলে আদেশ করিলেন—বজ্জাত ছেলেটাকে কান ধরে ঐ বুড়োর কাঁধ থেকে নামিয়ে নে।

মাতার মুখের ভাব দেখিয়া বালক ভয়ে কাঁদিতে লাগিল।

রামচরণ বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য। সে ষষ্ঠীচরণকে বিলক্ষণ চিনিত। বলিল, সর্দ্দারের ব্যাটা, কি পাগলামো করছ? মা রাগ করছেন। খোকাবাবুকে নামায়ে দাও।

ষষ্ঠী হাসিল। বলিল, বৌমা, পাগোল কেডা কও দেহি? পাগোল বুড়া ষষ্ঠী না পাগোল তুমি? নিজের প্যাটের ছাওয়াল, তার অবোলা শিশু। বুড়ার কাঁধে চড়ি মজা করতেছে একটু। ইয়ের মধ্যি কি আছে যে তুমি খেপি গ্যালা? বুড়ারে বুঝায়্যা কও দেহি। চলনু আমি কর্ত্তার কাছে, আমার চাকরি করা পুষাবি না।

বালককে কাঁধে লইয়াই সে হন-হন করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। রামচরণ সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

হরিনারায়ণের সম্মুখে বালককে কাঁধ হইতে ধপ করিয়া নামাইয়া দিয়া ষষ্ঠী বলিল, চাকরি একটা পাইছিলাম কর্ত্তা তা আপুনি মুনিব হলিও এহানে চাকরি পুষাবি নাক। ক্যান পুষাবি না তা কই শোন। এই দাদা, আমার কোলে আল কইর‍্যা বয় দেহি। সে বালকের হাত ধরিয়া টানিল। তাহাকে কোলে বসাইয়া বলিল, বৌমা দেহি রাগের ধদুচি, জ্বলতেছে ত জ্বলতেছে। ভদ্দরলোকে কয় চাঁড়ালের রাগ, ষষ্ঠী চাঁড়াল নাকি ব্যাজায় রাগী। বৌমার কাছে ষষ্ঠী বুড়া দুদের ছাওয়াল, কর্ত্তা।

কি ঘটিয়াছে সে নিজস্ব ভাষ্যসহ বর্ণনা করিল। তারপর বলিল, চাকরি ত একটা পাইছিলাম, তা পুষালো না। বরাতের দোষ কর্ত্তা। অ রামচরণ, এডারে লিয়্যা যাও মায়ের কাছে। ষষ্ঠী বুড়ার কাঁধে চড়ছে বুল্যা এডারে গলায় পাও দিয়্যা মারতি কওগে। আমি এবার তাহলি যা তুলি কর্ত্তা। হিচরণ দুইখান আগায়্যা দ্যান দেহি। ওঠ দাদা, ওঠ।

ইন্দ্র তখনও বৃদ্ধের কোলে বসিয়া, তাহার উঠিবার বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। ষষ্ঠীচরণ উঠিতে বলায়—তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধের চোখ হইতে টপটপ করিয়া জলের ফোঁটা তাহার মাথায় পড়িতে লাগিল।

হরিনারায়ণ ইহা দেখিলেন। রামচরণকে আদেশ করিলেন অন্দর হইতে ষষ্ঠীচরণের জন্ম খাবার আনিতে। নিজে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে বলিলেন, তুমি চাকরি নিয়েছ ষষ্ঠীচরণ, চাকরি করতে হবে। ছেলেকে বলিলেন—ষষ্ঠীদাদার কাছে থাকবি? সে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। তিনি একটু হাসিয়া অন্দরের দিকে গেলেন।

রামচরণ হাত নাড়িয়া জগদ্ধাত্রীকে কি বলিতেছিল। কর্ত্তাকে দেখিয়া ভাঁড়ারের দিকে সরিয়া পড়িল। হরিনারায়ণ জগদ্ধাত্রীকে বলিলেন, এদিকে এসো, কথা আছে।

জগদ্ধাত্রীর রাগ পড়িয়া গিয়াছিল। তিনি চুপ করিয়া স্বামীর কাছে ষষ্ঠীচরণের জীবনের কাহিনী শুনিলেন। শুনিয়া মনটা নরম হইয়া আসিল। হরিনারায়ণ বলিলেন, এককালে ষষ্ঠীচরণকে দেখে লোক ভয়ে কাঁপত। সড়কি চালনায় তার জুড়ি ছিল না। বৌ ও বড় বড় ছেলে দুটি হঠাৎ মরে গেলে সে বিবাগী হয়ে কত জায়গা ঘুরল। এখন তার এই অবস্থা। কথাগুলো ওর চিরকাল ঐ রকম। শুনলে মনে হয় গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে চায়। কিন্তু এই মুহূর্ত্তে বাইরে গিয়ে দেখ, ছোট খোকাকে কোলে করে কাঁদছে। কাজকর্ম্ম করতে চায় এখানে। এককালে লোকে ওকে মানত। কাজকর্ম্ম কি আর করবে, ছেলেটাকে নিয়ে থাকুক। তুমি কি বলো?

রামচরণকে ষষ্ঠীর জন্ম খাবার লইয়া যাইতে জগদ্ধাত্রী দেখিলেন। তিনি বলিলেন, তা থাকুক। বুড়ো ভেতরে এসে খেয়ে গেলে পারত।

হরিনারায়ণ বলিলেন, তাই ত এসেছিল। ছোট খোকাকে দেখে ও নিজের কাজ ঠিক করে নিয়েছিল। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওর অভিমান হয়েছে, তুমি একটু বললে জল হয়ে যাবে।

হরিনারায়ণ বাহিরে চলিলেন।

বৈঠকখানার বারান্দায় বসিয়া ষষ্ঠীচরণ কলার পাতায় মুড়কি, নারিকেলের ছাঁচ ও গুড়ের সন্দেশ খাইতেছিল। ইন্দ্র তখনও তাহার কোলে বসিয়া। ষষ্ঠী তাহার ডান হাত চাপিয়া ধরিয়াছে বাঁ হাতে। হরিনারায়ণ দেখিলেন বুড়ার মুখ নড়িতেছে, ছেলের মুখও নড়িতেছে। ষষ্ঠী বলিতেছে আর খাসনে দাদা, তোর জাত যাবি আমার সাতে খালি। ছেলে মুড়কি চিবাইতে চিবাইতে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে।

সেই হইতে ইন্দ্রের বাহন হইল বৃদ্ধ ষষ্ঠীচরণ, ইন্দ্র তাহাকে ডাকিত ষটুটে দাদা।

ষষ্ঠীচরণ মনিববাড়ীতে চাকুরিতে বাহাল হইল, কিন্তু তাহার কথাবার্ত্তার পুরাতন ধরণধারণের পরিবর্ত্তন হইল না, তাহার চালচলনও বদলাইল না। কি যে অশুভ ক্ষণে জগদ্ধাত্রীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, দুই জনে প্রায়ই খিটিমিটি বাধিত। জগদ্ধাত্রী যেমন ওজনে কথা বলেন ষষ্ঠী তেমনি ওজনে জবাব দেয়। ইন্দ্রের স্নানাহার, জামা, কাপড় লইয়া সে জগদ্ধাত্রীকে রীতিমত ধমকায়, বলে—ভালা এক চক্ষু মা বটেন তুমি। ছাওযালডার দিকে দিষ্টি নাই। এডা কি তোমার সতীন-পুত, না আপন প্যাটের ছাওয়াল কও দেহি বৌমা? জগদ্ধাত্রী রাগিয়া প্রথম প্রথম স্বামীর কাছে নালিশ করিতেন। বলিতেন বুড়োটা তাহাকে শ্বশুরের মত ধমকায়। স্বামী তাঁহার অভিযোগ শুনিয়া হাসেন দেখিয়া আর নালিশ করেন না। হরিনারায়ণ ষষ্ঠীকে ডাকিয়া বলেন, তোমার বৌমাকে একটু মাপ করো ষষ্ঠী। বড় রাগী মানুষ। ষষ্ঠী বলে, যা কইছেন আপুনি। হক চাঁড়ালের বিটির মত রাগখানা আছেন। কয় আমার ছাওয়ালডারে তুমি খারাপ করতেছ। বলিয়া ষষ্ঠী হাসিতে লাগিল। আবার বলিল, আচ্ছা ডাকাতের বিটিরে ঘরে আনছেন কর্ত্তা। আমারে কয় কর্ত্তার আস্কারা পায়্যা তুমি মাথায় ওঠছ, তোমার মুণ্ডু ছেঁচব আজাহার সর্দ্দারেরে দিয়া। আমি কই—হ বৌমা তাই কর। আজাহার আমার ধম্মো-ব্যাটা, তয় তুমি হুকুম দিলি আমার মুণ্ডু ছেঁচতেও পারে সেডা। তবে তোমারে কই আজাহারের কাম কি, তুমি মাটি ধর। ডাকাতের বিটি তুমি, ও কামডা শেখাই ত আছে ভাল-মত। হাসিতে হাসিতে ষষ্ঠী বলিল, এই কথা শুনি বৌমা ঘাড় কাৎ কইর‍্যা কৈ মাছ ঢ্যামন নাকায় ত্যামনি নাকাতে নাগল। আপুনি যদি সেডা ডাখতে কর্ত্তা।

হরিনারায়ণ অনেক কষ্টে হাসি চাপিলেন। বলিলেন, তোমাকে ভাল পরামর্শ দেওয়া দেখছি মিছে ষষ্ঠী। ষষ্ঠী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, এডা বড়ো বত্তাত কথা কইছ্যাম কর্ত্তা। একি-বারে মিছে। হরিনারায়ণ হাসিয়া ফেলিলেন।

একদিন ষষ্ঠীচরণ ইন্দ্রকে কাঁধে করিয়া বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হইবে এমন সময় জগদ্ধাত্রীর বড় মেয়ে মেনা বায়না ধরিল সেও ষটুটে দাদার সঙ্গে যাইবে। মেনার বয়স নয়-দশ বছর, দেখায় আরও কম। জগদ্ধাত্রী তাহাকে ধমকাইলেন। সে কাঁদিতে লাগিল। ইন্দ্র কাঁধের উপর হইতে বলিল, তুই আয় না দিদি। ষষ্ঠী রাগে গর গর করিতে করিতে ইন্দ্রকে কাঁধের উপর হইতে নামাইয়া দিল। বলিল, তোকে আজ নিয়া যায় কোন্ হালা। যা তোর মার কাছে। বৌমা, বিটিকে ধমক দ্যাও ত ভালো কইর‍্যা। ভদ্দরনোকের মিয়্যা ছাওয়াল বেড়াতি যায় কোন্ মুলুকে কও দেহি।

জগদ্ধাত্রী ষষ্ঠীর কাণ্ড দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন। মেয়েকে বলিলেন, যা মা ষটুটে দাদার কাঁধে চড়ে একটু বেড়িয়ে আয়। রোজ ছোট খোকা যায়, আজ তুই যা।

ষষ্ঠী রাগিয়া বাহিরের দিকে যাইতে যাইতে বলিল, মাইয়্যা ছাওয়াল কাঁধে তুল্যা বেড়াতি যাতি পারমু না—ঠাকরাণ। ওডা আমারে খেমা করো। কাঁধে তুললি মাথায় উঠতি মন করবি। কর্ত্তা ব্যাঙের ডোগা আনতি কইছ্যান, তেনার পিত্তি বাড়ছে। আমি দাও নিয়্যা ব্যাঙের আড়ায় চললাম।

ইন্দ্র গোঁজ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল এতক্ষণ। ষটুটে দাদা চলিয়া যায় দেখিয়া সে দৌড়াইল। জগদ্ধাত্রী ষষ্ঠীকে জব্দ করিবার এক উপায় আবিষ্কার করিয়া খুশী হইলেন।

মেনাকে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া ষষ্ঠী যত সহজে এড়াইতে পারিল প্রসন্নকে এড়ান তত সহজ হইল না।

প্রসন্ন ছেলেবেলা হইতে তন্ত্রমন্ত্রে বড় বিশ্বাসী। আরও ছোট থাকিতে চড়কপূজার সময় মেটে, বাগ্দী, হাড়ি, মালী-দের সন্ন্যাসী সাজিতে দেখিয়া সেও সন্ন্যাসী সাজিত। গলায় জবাফুলের মালা পরিয়া, সিন্দূরের কোঁটা কাটিয়া, একটা জবা-ফুল দাঁতে চাপিয়া সে মাকে দেখাইয়া অন্দরের উঠানে সন্ন্যাসী-দের নকল করিয়া নাচিত। নাচিতে নাচিতে তাহার 'দশা ধরিত', অর্থাৎ ভর হইত। দশা ধরিলে সে কিড়িং মিড়িং করিয়া মন্ত্র আওড়াইত। মাঠ হইতে বিড়ালের মাথার খুলি বা পাখীর কঙ্কাল কুড়াইয়া আনিয়া বেলগাছতলায় চোখ বুঁজিয়া ধ্যান করিতে বসিত। উপনয়নের পরে বহু দিন নিষ্ঠাভরে সে সন্ধ্যা-আহ্নিক করিল, সবগুলি কাপড় গেরুয়া রং করিয়া সেই কাপড় পরিয়া বেড়াইল অনেক দিন পর্য্যন্ত। রাজ-নগরে সাধুসন্ন্যাসী কেহ আসিলে সর্ব্বক্ষণ সেখানে পড়িয়া থাকিত।

ইহার পর তাহার শরীরচর্চ্চার দিকে মন গেল। সে

কুস্তি শিখিতে আরম্ভ করিল তাহার মামার বাড়ীর আগেকার দারোয়ান রামনন্দনের কাছে। রামনন্দন ছোট দিদিমণির সঙ্গে পঞ্চক্রোশী হইতে রাজনগরে আসিয়া এখানেই রহিয়া গিয়াছে। লাঠিখেলা শিখিবার জন্ত প্রসন্ন নূতন ধুতি চাদর ও দশ টাকা দক্ষিণা দিয়া আজাহার সর্দারের সাগরেদীতে বহাল হইল।

আজাহার সর্দারের কাছে প্রসন্ন শুনিয়াছিল যে তাহার পিতামহের আমলে ষষ্ঠীচরণ ছিল সড়কি চালনায় সেরা ওস্তাদ। তাহার গুরু গুণী বাগ্দীর কাছে মন্ত্র পাইয়াছিল। মন্ত্র পড়িয়া ষষ্ঠীচরণ সড়কি ছাড়িলে গোখুরা সাপের মত সে সড়কি তাড়া করিত, কোনমতে নিস্তার পাওয়া যাইত না। ষষ্ঠীচরণ কাহাকেও সে মন্ত্র দেয় নাই।

প্রসন্ন মন্ত্র শিখিবার জন্ত ষষ্ঠীর পিছনে লাগিল। ষষ্ঠী বলে, ছোটবাবু, এখন ভাগে বন্দুকের য়্যাওয়াজ হইছে, সড়কি মড়কি আর কোন্ কাযে আসে? প্রসন্ন কিন্তু নাছোড়বান্দা। তাহাকে এড়াইতে না পারিয়া ষষ্ঠী বলে, আপুনি ত বড়ো অবুঝ ছাওয়াল দেহি: আমার সাতে তিন কুড়ি বয়্যাস পার হইছে, কবে মন্তর তন্তর ভুল্যা খাইছি। আর আলাব্যান না বুড়ায়ে। প্রসন্ন তবু তাহার পিছনে লাগিয়া রহিল। শেষে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ষষ্ঠী স্বীকার করিল, স্ত্রী-পুত্র মারা গেলে কণ্ঠি পরিবার সময়ে বাবাজীর আদেশে জিওলী নদীর জলে সে মন্ত্র বিসর্জ্জন দিয়াছে। বিসর্জ্জন দিবার পরে তাহার মধ্যে মন্ত্রের যে শক্তি ছিল তাহা মরিয়া গিয়াছে। মরা মন্ত্র কোন কাজে লাগে না, আর মরা মন্ত্র যে উচ্চারণ করে তাহার মহাপাতক লাগে। প্রসন্ন একথা বিশ্বাস করিল। ষষ্ঠীর গলায় এখন তুলসীর মালা। হিংস্র বিদ্যা বিসর্জ্জন না দিলে তাহাকে কি আর কণ্ঠি পরিতে দিয়াছে বোষ্টমেরা?

পুত্রের শরীরচর্চা, লাঠিখেলা শিক্ষা প্রভৃতিতে হরিনারায়ণ কোন আপত্তি করেন নাই। ইহার রেওয়াজ ছিল সেকালে। কিন্তু কিছুদিন বাদে প্রসন্নর সাধুসন্ন্যাসী, তন্ত্রমন্ত্রের ঝোঁক আবার বাড়িয়া উঠিল। এ জিনিসটায় হরিনারায়ণের আপত্তি ছিল। ষষ্ঠী আসিয়া একদিন খবর দিল হাড়িপাড়ায় একজন গুণী আসিয়াছে, প্রসন্ন তাহার কাছে গিয়া গাঁজা টানে তাহার চেলা হইয়া বিদ্যা শিখিবার জন্ত।

হরিনারায়ণ জগদ্ধাত্রীকে এই সংবাদ দিলেন। বলিলেন, ছোঁড়া পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, কোন সময়ে তার টিকি দেখতে পাই নে। ছেলেবেলা থেকে আদর দিয়ে তুমি ওকে নষ্ট করেছ। ওকে নিয়ে ভবিষ্যতে দুঃখ পাবে। তারপর বলিলেন, ওকে বাড়ী থেকে বেরুতে দিও না। তোমার কথা না শুনলে ওকে সায়েস্তা করবার ভার আমাকেই নিতে হবে।

জগদ্ধাত্রী কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার অমন ছেলে কোন কুকাজ করিতে পারে তিনি ভাবিতেই পারেন না। নিশ্চয় কোন দুষ্ট লোক কর্ত্তার কাছে লাগাইয়াছে। প্রসন্ন বাড়ী ফিরিল রাত করিয়া। জগদ্ধাত্রী বলিলেন, তুই পড়াশুনা ছেড়ে কোথায় ঘুরে বেড়াস বল ত? লোকে বলছে হাড়িপাড়ার কার কাছে নাকি যাচ্ছিস? প্রসন্ন উচ্ছ্বসিত হইয়া লোকটির গুণপনা বর্ণনা করিতে লাগিল: বলিল, সে যে-সে গুণী নয় মা। জলের ওপর হাঁটতে পারে, আসন করে বসে শূন্যে উঠতে পারে। জগদ্ধাত্রী হাসিয়া বলিলেন, তুই দেখেছিস? প্রসন্ন বলিল—আজ থেকে তিন দিন পরে দেখাবেন তিনি। শুধু যজ্ঞ করবার জন্ত কিছু টাকার দরকার। দাও না মা গোটা কুড়ি টাকা। জগদ্ধাত্রী বলিলেন, তোকে ঠকিয়ে টাকাগুলো নিয়ে সরে পড়বে। প্রসন্ন জিভ কাটিয়া বলিল, সিদ্ধ পুরুষের নিন্দে করতে নেই মা, মহাপাতক হয়। টাকার অভাবে যজ্ঞ করতে পারছেন না। যজ্ঞ শেষ হলে আমাকে শুধু তাঁর বিদ্যা শেখাবেন না, জলের ওপর হাঁটবার মন্ত্রটাও বলে দেবেন।

জগদ্ধাত্রী ছেলের পীড়াপীড়িতে টাকা দিলেন। পরদিন রাত্রে যজ্ঞ। অনেক চেষ্টা করিয়াও প্রসন্ন সে রাত্রে হাড়িপাড়ায় যাইবার জন্ত মায়ের অনুমতি পাইল না। তিনি বলিলেন, রাত্রে তোকে বেরুতে দিয়েছি শুনলে কর্ত্তা তোকে শেষ করবেন, আমাকেও আস্ত রাখবেন না। খুব সকালে উঠে যাস বাবা।

খুব সকালে উঠিয়া প্রসন্ন হাড়িপাড়ায় গেল। শুনিল সিদ্ধ পুরুষ রাত্রেই অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। পায়ে হাঁটিয়া না শূন্যে উড়িয়া কেহ সঠিক বলিতে পারিল না।

ইহার বছরখানেক পরে করণপুকুরের ধারে একজন ভৈরব আসিয়া আস্তানা গাড়িল, তাহার সঙ্গে দুই ভৈরবী। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল ভৈরব বিন্ধ্যাচল হইতে আসিয়াছেন, কেহ আবার বলিল খাস কামাখ্যা হইতে তাঁহার আগমন। ভৈরব যোগিনীসিদ্ধ। মন্ত্রের বলে বৃদ্ধকে যুবা করিতে পারেন, সব রোগ ভাল করিতে পারেন। বশীকরণ, মারণ সকল বিদ্যায় সিদ্ধ। ক্রোধ হইলে ভীমের মত জোয়ান মানুষকে এক মুঠা মাটি ছিটাইয়া উচ্চিংড়া করিয়া দেন, উচ্চিংড়া হইয়া ফুরফুর করিয়া সে উড়িয়া চলিয়া যায়। দুই ভৈরবীরও অনেক 'গুণ' জানা আছে। তাঁহারা দুই জনেই যোগিনীর অবতার। চেহারা দেখিলে, বিশেষ করিয়া ছোট ভৈরবীকে দেখিলে মনে হয় আগুনের মত তেজ। কি গায়ের রং, কি মুখের গড়ন!

ভৈরবের আগমন-সংবাদ জানিতে পারিয়া প্রসন্ন তাহার আস্তানায় ছুটিয়া গেল। দেখিল ভৈরবের মহা খাতির। ছোট তরফ ও ন'তরফের কর্ত্তা সেখানে হাজির। চাটাইয়ের ঘর উঠিতেছে ভৈরব ও ভৈরবীদ্বয়ের জন্ত। অনেক বাড়ী হইতে সিধা আসিয়াছে। গোটা দুই পাঁঠা এরই মধ্যে কাহার

ভৈরবের সেবার জন্ত পাঠাইয়াছে। করণপুকুরের পাড়ে কদম-গাছের নীচে খুঁটায় তাহাদের বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া তাহারা দড়ি টানিতেছে ও মুখ তুলিয়া ব্যা ব্যা শব্দ করিতেছে।

ভৈরবীরা আলাদা আসন করিয়া বসিয়াছে। তাহাদের কাছে মেয়েদের ভিড়। বয়স্কা গৃহিণী, অল্প বয়সের বৌ অনেক জুটিয়াছে, গাঁয়ের মেয়ে যাহাদের বিবাহ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আসিয়াছে। নেউগী-পাড়ার চন্দ্রমোহনের বিধবা মেয়েটাও আসিয়াছে। প্রসন্নকে দেখিয়া সে একটু মুচকিয়া হাসিল। মালীপাড়ার শরৎ মালীর ছেলের বৌটা দূরে দাঁড়াইয়া ভৈরবীদের দেখিতেছে।

ছোট তরফের কর্তার দুই স্ত্রী। প্রথম স্ত্রীর কেবল মেয়ে হইতেছে এইজন্ত তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষের এ পর্য্যন্ত ছেলে বা মেয়ে কিছুই হয় নাই। সে বাঁজা। পঞ্চান্ন বৎসর বয়স হইলেও ছোট তরফের কর্তা তৃতীয় বার দারপরিগ্রহের কথা চিন্তা করিতেছেন। ভৈরবের মন্ত্রতন্ত্রে দ্বিতীয় পক্ষের বাঁজা দোষ কাটে কিনা দেখিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। চিন্তা করিতে করিতে তিনি বারবার ভৈরবী-যুগলের সম্মুখ দিয়া পায়চারি করিতেছিলেন। ন'তরফের কর্তা রাম-লোচনের পুত্র রামতারণের বয়স ষাটের কাছে হইলেও খুব শক্তসমর্থ আছেন। আগের তিন স্ত্রী, দুইটি পরলোকে, একটি জীবিত। তৃতীয়ার বয়স হওয়ায় চতুর্থ পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। চতুর্থ পক্ষের মৃতবৎসা রোগ আছে। ইহার প্রতিকারের জন্ত একবার সিদ্ধপুরুষ ভৈরবের মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্য লওয়া প্রয়োজন। চিন্তাযুক্ত হইয়া তিনিও বারবার ভৈরবী-যুগলের সম্মুখ দিয়া পদচারণা করিতেছিলেন। প্রসন্ন পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার পর চন্দ্রমোহনের বিধবা মেয়েটা ভ্রূ কুঁচকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দুই তরফের দুই কর্তাকে চিন্তিতভাবে পায়চারি করিতে দেখিয়া সে আবার মুচকিয়া হাসিতে লাগিল। পুরুষেরা বলেন চন্দ্রমোহনের বিধবা মেয়েটি পাগল। মেয়েরা বলেন বজ্জাত ছুঁড়িটা ছেলে খাবার ডান।

প্রসন্ন ভৈরবকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। সে দেখিল এত ভিড়ে ও বয়োজ্যেষ্ঠদের উপস্থিতিতে তাহার আবেদন জানাইবার সুবিধা হইবে না। সন্ধ্যার পরে ভৈরব-ভৈরবীদের জন্ত মায়ের কাছ হইতে চাহিয়া ভাল প্রণামী লইয়া আবার আসিবে স্থির করিয়া সে উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই ভৈরব স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া চোখের একটু ইঙ্গিত করিলেন। সে ইঙ্গিতের মানে তুমি যাহা করিতে চাহিতেছ তাহাই করিবে। সিদ্ধ পুরুষের এই দৃষ্টিপ্রসাদ লাভ করিয়া প্রসন্ন উৎফুল্ল হইল।

কিন্তু মায়ের কাছে টাকা আদায় করা এবার সম্ভব হইল না। জগদ্ধাত্রী ভৈরব ও ভৈরবীদের খবর লোকমুখে শুনিয়াছিলেন। যুগল ভৈরবীর বর্ণনা ও গাঁয়ের সেরা পাজি এবং মাতাল দুই কর্তার আনাগোনার কথা শুনিয়া তাঁহার মন বিরূপ হইয়াছিল। প্রসন্ন টাকার কথা বলিতে তিনি বলিলেন, ওখানে তোকে যেতে হবে না, বাবা। সিদ্ধ ভৈরব আমার মাথায় থাকুন, ওখানে তুই যাতায়াত করলে আমি সত্যি রাগ করব। প্রসন্ন বলিল, মানুষকে উচ্চিংড়ে করবার বিদ্যেটা পেলেই আমি আর যাব না। এইটি আমার না শিখলে চলবে না।

মা রাগিয়া বলিলেন, তোকেই উচ্চিংড়ে করে উড়িয়ে দেবে, তুই যাস না বলছি।

টাকা না পাইয়া প্রসন্ন রাগ করিল। শিশুকাল হইতে সে মায়ের আদরই পাইয়া আসিতেছে। মায়ের কুপিত মূর্ত্তি মাঝে মাঝে দেখিলেও তাহার ধারণা জন্মিয়াছিল মা তাহার হাতের পুতুল, মায়ের ক্রোধ অন্ত লোকের জন্ত। সে গরম হইয়া বলিয়া ফেলিল—তুমিও বাবার ধাত পেলে নাকি? টাকা তোমায় দিতে হবে।

ছেলের মুখে পিতার সম্বন্ধে অশোভন ইঙ্গিত শুনিয়া জগদ্ধাত্রী জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিলেন, ছেলেকে অত্যধিক প্রশ্রয় দেওয়া সম্বন্ধে স্বামী অযথা তাঁহাকে সাবধান করেন নাই। ক্রোধে তাঁহার মূর্ত্তি অন্ত রকম হইয়া গেল। অনেক চেষ্টায় একটু শান্ত হইয়া বলিলেন, কর্তাকে না জিজ্ঞেস করে এক পয়সাও দিতে পারব না। এখন তুমি যাও।

প্রায় এক মাসের মধ্যে জগদ্ধাত্রী স্বামীকে এই ব্যাপার জানাইবার অবকাশ পাইলেন না। প্রথমে বড় মেয়ে মৃন্ময়ী, তারপর ছোট মেয়ে চিন্ময়ী, তারপর ইন্দ্রের বসন্ত হইল—জল বসন্ত। জগদ্ধাত্রীকে সর্ব্বক্ষণ তাহাদের কাছে থাকিতে হইত। চিন্ময়ী বা চিনি সকলের ছোট হইলেও সকলের চেয়ে শান্ত। কেবল সে ঝি চাকরদের হাতে পথ্য খাইত, কোন আপত্তি করিত না। রোগের যন্ত্রণার মধ্যেও বড় বোন ও ভাইয়ের মত মা মা বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিত না। মা কাছে আসিয়া বসিলে তাঁহার কোলে মাথাটা তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিত। যন্ত্রণায় তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িত। নীরবে, শান্তভাবে কষ্ট সহিবার অসীম ক্ষমতা ছিল তাহার।

একে একে ইহারা যখন সকলে সুস্থ হইয়া উঠিল তখন তাঁহার প্রসন্নর কথা মনে পড়িল। মনে হইল, তাইত, কয়েক দিন ধরিয়া ছেলেটাকে একবারও দেখেন নাই। কি হইল তাহার? হরিনারায়ণ আহারে বসিলে মাসখানেক আগে প্রসন্নর টাকা চাহিবার কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, বলিলেন, দিনরাত ব্যস্ত থাকায় ছেলেটার খোঁজ লইবার অবকাশ পান নাই। হরিনারায়ণ গম্ভীরভাবে শুধু বলিলেন, তুমি খেয়ে উঠে একবার আমার কাছে এসো, সব শুনবে। সে ভালই আছে।

জগদ্ধাত্রী স্বামীর মুখে সকল কথা শুনিলেন।

প্রসন্ন ভৈরবের আস্তানায় যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। নিজের উপনয়নের সময়কার দামী তিনটি আংটি ভৈরব-ভৈরবীদের দিয়াছে। তিনি জানিতে পারিয়া ভর্ৎসনা করায় দিনে কোথাও যাইত না, রাত্রে উঠিয়া পলাইয়া সেখানে যাইত। কামাখ্যা দেবীর চরণামৃত বলিয়া তাহাকে একদিন মদ খাওয়াইয়া দেয় উহারা। তারপর যোগিনী-সাধনা শিখাইবার নাম করিয়া ভৈরবীদের একজন তাহাকে হাত করিয়া ফেলে। তখন সে গোপনে জগদ্ধাত্রীর ক্যাশ-বাক্স খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া লয় ভৈরবীর জন্ম। মদ খাইয়া নেশার ঝোঁকে কি কথায় ভৈরবের সঙ্গে মারামারি লাগিয়া যায়। ভৈরব ত্রিশূল লইয়া আক্রমণ করিলে প্রসন্ন তাহাকে শূন্যে তুলিয়া করণপুকুরের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। তখন ভৈরবীরা চীৎকার করিয়া লোক জড়ো করে, তাহারা পুকুর হইতে ভৈরবকে উঠায়। জল খাইয়া তখন তাহার পেট ঢাক হইয়াছে, জ্ঞান নাই। অনেক চেষ্টা করিয়া জ্ঞান হইল। সকালে হরিনারায়ণের কাছে এই খবর আসে। তিনি প্রসন্নের ঘরে গিয়া দেখেন সে ঘুমাইতেছে, সমস্ত বিছানায় রক্তের দাগ। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন প্রসন্নের উরুতে বড় একটা ক্ষত-চিহ্ন। দেখিয়া মনে হইল কোন ধারাল অস্ত্রের আঘাতে ঘা হইয়াছে। ক্ষতের মুখে রক্ত জমাট বাঁধিয়া আছে।

ছেলেকে না জাগাইয়া তিনি ঘরের দরজা তালাবদ্ধ করিয়া দিলেন। তারপর রামনন্দন ও তার সঙ্গে আট জন লাঠিয়াল পাঠাইলেন ভৈরব ও ভৈরবীদের ধরিয়া আনিবার জন্ত। তাহাদের সঙ্গে ছোট তরফ ও ন'তরফের দুই কর্তা আসিয়া উপস্থিত। তাহারা অনেক কথা বলিলেন, শেষে ভয় দেখাইলেন সিদ্ধপুরুষের উপর অত্যাচার করিলে ধর্মে সহিবে না। কিন্তু তাহাতে কান না দিয়া হরিনারায়ণ লাঠিয়ালদের হুকুম দিলেন ভৈরব-ভৈরবীদের রাজনগরের সীমানার বাহিরে লইয়া গিয়া বৈলাহাটির রাস্তায় উঠাইয়া ছাড়িয়া দিবে আর বলিয়া দিবে রাজনগরের দিকে ফের পা বাড়াইলে গায়ের চামড়া খুলিয়া লইব মারিতে মারিতে। এ প্রায় দিন পনের আগের ঘটনা। দিনপাঁচেক হইল তিনি প্রসন্নকে বন্দীদশা হইতে মুক্তি দিয়াছেন। তাহার ঘা সারিয়া গিয়াছে। সে এখন বাড়ীর বাহিরে বড় একটা যায় না।

এত কাণ্ড, কিন্তু জগদ্ধাত্রী কিছুই জানেন না। শুনিয়া তিনি বড় রকমের আঘাত পাইলেন মনে।

৩

বড়ছেলে প্রসন্নকে লইয়া হরিনারায়ণের পরিবারে যখন অশান্তি ঘনাইয়া চলিতেছিল, বিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে পা দিয়া বাংলাদেশ তখন ধীরে ধীরে এক ঝটিকা-কেন্দ্রের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। দুঃখ, লাঞ্ছনা, অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া এই ঝটিকার ভাঙিয়া পড়িবার আগের অবস্থা দুই-চারিটি কথায় বলা হইতেছে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার চৌষট্টি বৎসর রাজত্বকালের শেষে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের ইতিহাস একটি চক্রের মধ্যে আবর্তন শেষ করিল। এই চৌষট্টি বৎসর ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘাত পরিপাক করিয়া নবজাগরণের জন্ম প্রস্তুত হইবার কাল।

ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে বসিবার কয়েক বৎসর আগে রামমোহন রায় বিলাতে দেহরক্ষা করেন। বিলাত যাইবার আগে তিনি ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার ও সাহিত্য প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁহার সময় ও শক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

ধর্মসংস্কারের পথে ব্রহ্মোপাসনা মন্দির স্থাপন করিয়া তিনি যে নূতন মতের প্রবর্তন করেন, বাংলার নব্য ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের ধর্মতৃষ্ণা পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাহা সেই সমাজের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রসারকে বন্ধ করিল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নূতন ধর্মমতকে নূতন তত্ত্বচিন্তার প্রশস্ততর খাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবার সুযোগ করিয়া দিলেন। নূতন ধর্ম-চিন্তার এই ধারা বাংলার সীমানা অতিক্রম করিয়া অন্যান্য প্রদেশেও আত্মপ্রকাশ করিল। কাথিয়াবাড়ে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্য্যসমাজী আন্দোলন এই ধারার আর একটি রূপ।

নূতন চিন্তার যে ধারা আসিল, বাংলার ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানসক্ষেত্রে উর্বরতা সঞ্চারিত করিয়া তাহা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের বীজ অঙ্কুরিত করিল।

একটি বীজ হইতে জন্ম হইল হিন্দু মেলার, অন্য বীজ হইতে জন্মিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও অভিজাত শ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রথম ফল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা। পোশাকে, আহারে, বিহারে, সাহেব, ইংরেজী ভাষায় অসাধারণ বাগ্মী, কৃতী ব্যবসায়ী রামগোপাল ঘোষ এবং হিন্দু কলেজের অন্যান্য পুরাতন ছাত্রগণ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার চৌত্রিশ বৎসর পরে পরবর্তী যুগের এই শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতারা ইংরেজ হিউমের প্রেরণায় ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করিলেন।

সাংস্কৃতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে তত্ত্ববোধিনী সভার জ্ঞানী ও গুণী সভ্যগণ বাংলা ভাষায় নূতন ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ ও দার্শনিক চিন্তা প্রচার করিতে লাগিলেন। এই উদ্যমের একটি প্রবল প্রেরণা আসিল ইউরোপ হইতে। ইহার কিছু পূর্ব হইতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীতে ভারতবর্ষ ও ইরাণের প্রাচীন সংস্কৃতি-সম্পদ লইয়া গবেষণার যুগ আরম্ভ হইয়াছিল। এই গবেষণার ফলে ভারতবর্ষের প্রাচীন সাংস্কৃতিক সম্পদ ও

প্রাচীন ভারতীয় জাতির বহির্ভারতীয় সম্পর্কের উপর অভিনব আলোকপাত হইল। সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্ম্মীরূপে রামমোহন রায়ের অনুগামিগণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি ও নবপ্রবর্ত্তিত ইউরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় মন দিলেন।

সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্ম্মীরা ইউরোপীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের নিকট প্রভূত ঋণ গ্রহণ করিলেন। কোঁৎ, হিউম, হাক্সলে, মিল, স্পেনসার সে আমলের শিক্ষিত বাঙালী সমাজের মনোরাজ্যের পথনির্দ্দেশক। ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে আরও অনেক নূতন চিন্তা, নূতন ভাব, ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী, গ্রীস ও ইটালীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদর্শ তাঁহাদের কাছে পৌঁছিল।

হিন্দু কলেজের যুগ, অন্ধ অনুকরণ ও অপ্রকৃতিস্থ উত্তেজনার যুগ তখন চলিয়া গিয়াছে। দেশের সাংস্কৃতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে পুরাতন কর্ম্মীদের কাজ শেষ হইয়াছিল। নূতন কর্ম্মীরা নবজাগরণের প্রস্তুতিকে দ্রুততর, ব্যাপকতর করিবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। এই কর্ম্মীদের মধ্যে ভিক্টোরিয়া যুগের শেষার্দ্ধের বাঙালী সাহিত্যিকগণ বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিলেন। রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, মধুসূদন, নবীনচন্দ্র এই যুগের কবি, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রভৃতি এই যুগের ঔপন্যাসিক, দীনবন্ধু মিত্র নাট্যকার। ইঁহাদের সকলেরই সাহিত্যসৃষ্টিতে নবজাগরণের বাণী সুস্পষ্ট উদ্গীরিত হইয়াছে। আত্মসচেতনতা, স্বাধীনতার উপাসনা, দেশের প্রাচীন গৌরব স্মরণ, ভারতের যে সকল জাতি স্বাধীনতা লাভ ও রক্ষার জন্য সংগ্রাম করিয়াছিল তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা, দেশের পরাধীনতার জন্য ক্ষোভ ফুটিয়া উঠিল ইহাদের রচনায়।

সাহিত্যিকগণের কর্ম্মপ্রচেষ্টার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের বাহিরে সর্ব্বভারতীয় সাংস্কৃতিক সংগঠনের বহু বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র আলোকিত করিয়া পূর্ব্বভারতে আবির্ভূত হইলেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ।

সাংস্কৃতিক সংগঠনের বিভিন্নমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টা রাজনৈতিক সংগঠনের কাজকে আগাইয়া দিতে সাহায্য করিল। বিভিন্ন প্রদেশের বিচ্ছিন্ন, একক প্রয়াস মিলিত উদ্যমে পরিণত হইল জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায়। ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে এংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের তীব্র আন্দোলন, ভারতীয়দের অপমান ও তাহাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার রাজনৈতিক সংগঠনের কাজকে ত্বরান্বিত করিয়া দিল।

ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের ফলে বাংলায় যে রেনাসাঁসের প্রবর্ত্তন হইল তাহার ধারক ও বাহক হইলেন আইনজীবী, সরকারী চাকুরিয়া, ডাক্তার, শিক্ষা-ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, বর্দ্ধিষ্ণু তালুকদার, ছোট ও মাঝারি জমিদার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি লইয়া গঠিত নূতন মধ্যবিত্ত সমাজ। এই সমাজ ছিল প্রধানতঃ হিন্দুসম্প্রদায়ের লোকেদের লইয়া গঠিত। এই শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারের মধ্য দিয়া, নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া, সকল প্রদেশের শিক্ষিত সমাজের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের সমবেত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ অখণ্ড রূপ দেশবাসীর চিত্তে ফুটাইয়া তুলিয়া নবজাগরণের বাণীকে বাস্তব রূপ দিবার কার্য্যে ব্রতী হইল।

বিংশ শতাব্দীর দ্বারে আসিয়া বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্য করিয়া আরম্ভ হইল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের প্রকৃত জাতীয় আন্দোলন, যাহার সুদীর্ঘ প্রস্তুতি আরম্ভ হইয়াছিল রামমোহন রায়ের সময় হইতে। ইহা রাজনগরের ইতিহাসের যে সময়ের কথা বলা হইতেছে তাহার কয়েক বৎসর পরের ব্যাপার।

নবজাগরণের প্রবাহকে বিংশ শতাব্দীর দ্বার পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া উনবিংশ শতাব্দী বিদায় লইল। সারা দেশ জুড়িয়া যখন বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত তখন এ দিকে বড়ছেলে প্রসন্নকে লইয়া হরিনারায়ণের পরিবারে অশান্তি চরমে উঠিল।

ভৈরব ও ভৈরবীঘটিত গোলযোগের পর কিছুদিন পর্য্যন্ত সে শান্তভাবে রহিল। জগদ্ধাত্রী কখন ভর্ৎসনা কখন অনুনয় ও স্নেহবাক্যে তন্ত্রমন্ত্র ছাড়িয়া লেখাপড়ার দিকে তাহার মন যাহাতে আকৃষ্ট হয় সে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বিশেষ ফল হইল না। কিছুদিন পরে সে নিজে হইতে হঠাৎ সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া বসিল যে, সংস্কৃত পড়িয়া সে শাস্ত্রচর্চ্চা করিবে। ইহার ভিতরের কথাটা এই যে তন্ত্রমন্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লেখা, সুতরাং তাহা শিখিতে হইলে সংস্কৃত শেখাটা প্রয়োজন। পুত্রের এই সুমতিতে আহ্লাদিত হইয়া জগদ্ধাত্রী স্বামীকে সে কথা জানাইলেন। টোলপাড়ায় নিজে গিয়া শ্যামানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলিয়া হরিনারায়ণ ছেলের সংস্কৃত পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কিছুদিন একমনে সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করিয়া প্রসন্ন হাঁপাইয়া উঠিল। কোন দিন পড়িতে বসে, কোন দিন বন্দুক কাঁধে মুরলী বিলে চলিয়া যায় পাখী মারিবার জন্য।

একদিন খেয়ালমত পাখীর পিছনে ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক দেরী হইয়া গেল। নৌকা জেলেপাড়ার ঘাটে বাঁধিয়া রাখিয়া প্রসন্ন যখন মাঠ পার হইতেছিল হঠাৎ দমকা হাওয়া উঠিল। শুকনা পাতা ও ধুলাবালি উড়াইয়া বাতাস পাগলামি আরম্ভ করিল। কোথা হইতে কালো মেঘ আসিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিতে লাগিল। ধুলায়, মেঘে এমন অন্ধকার হইয়া আসিল যে চোখে কিছু দেখা যায় না। বড় বড় জলের ফোঁটা পড়িতে লাগিল। প্রসন্ন বন্দুক ও পাখীর বোঝা লইয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে মাঠ পার হইয়া গ্রামের পথ ধরিল। পথের পাশের বড় বড় গাছের ডালগুলি মড় মড় শব্দ করিয়া আছড়াইতেছিল। কিছুদূর গিয়া হাতের ডান দিকে একখানা

চালাঘর দেখিতে পাইয়া সে সেই দিকে চলিল। সেই সময় কে একজন ঘরের ঝাঁপ ভিতর হইতে বন্ধ করিতেছিল। প্রসন্ন ঝাঁপের উপর লাথি মারিয়া বলিল—ঝাঁপ খোল। ঘরের বাহির হইতে গোবরের গন্ধ পাইয়া সে বুঝিল এটা গোয়াল ঘর।

যে ঝাঁপ বন্ধ করিতেছিল সে চীৎকার করিয়া উঠিল—কে রে হারামজাদা তুই! বৃষ্টি হইতে বাঁচিবার জন্ত প্রসন্ন ততক্ষণ ঝাঁপ ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়াছে। ঘরের এক কোণে একটা কেরোসিনের টেমি জ্বলিতেছিল। প্রসন্ন দেখিল চন্দ্রমোহনের বিধবা মেয়ে তরু বাখারির বেড়ায় গোঁজা ঘাস কাটিবার বড় হেঁসেখানা টানিয়া হাতে লইতেছে। হেঁসে হাতে ফিরিয়া দাঁড়াইতে বন্দুক ও দড়ি বাঁধা পাখীর বোঝা হাতে, বৃষ্টির জলে সিক্তদেহ প্রসন্নকে দেখিয়া সে হাসিয়া উঠিল। বলিল—আমি বলি ভর সন্ধ্যায় কোন্ ব্যাটা চোর ছ্যাঁচড় এল। এসে দেখি টেসন্ন বাবু। আহা, আহা, টেসন্ন বাবু যে ভিজে গেছ। হাতের জিনিসগুলো নামিয়ে রাখ ত ভাই। মাথাটা একটু হেঁট কর, মুছে দিই। যা তালগাছের মত ঢ্যাঙ্গা তুমি।

প্রসন্ন জানিত চন্দ্রমোহনের বিধবা মেয়ে তরু পাগল। গ্রামের সকলেই তাহাকে তরু পাগলী বলিত। বয়সে প্রসন্নর চাইতে তিন-চার বছরের বড় হইবে। আট বছরে মেয়ের বিবাহ দিয়া চন্দ্রমোহন গৌরীদানের পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিল। নয় বছরে মেয়েটি বিধবা হয়। শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা অপয়া বৌ বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। তাড়াইয়া দিবার আরও কারণ ছিল। বিধবা হইবার পরে একাদশীর দিন চুরি করিয়া জামরুল খাইতে গিয়া ধরা পড়িয়াছিল ননদের কাছে। শাশুড়ী বিধবা বৌয়ের এই লোভ দেখিয়া হাতের কাছে যাহা পাইলেন তাহাই দিয়া তাহাকে মারিতে লাগিলেন। ঘরের কাঠের খুঁটির সঙ্গে তাহাকে বাঁধিয়া খুন্তি পোড়াইয়া তাহার গায়ে ছ্যাঁকা দিলেন। চুল কাটিয়া মাথা মুড়াইয়া দিলেন। কিন্তু এখানেই শাস্তির শেষ হইল না। প্রতি একাদশীতে তাহাকে খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া ঘরে শিকল দিয়া রাখিতেন। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে দুপুরে দারুণ তৃষ্ণায় সে ছটফট করিত, চিৎকার করিয়া কাঁদিত। ননদ ও শাশুড়ী মিলিয়া কাঁচা কঞ্চি তাহার পিঠে ভাঙিয়া তাহার তৃষ্ণা নিবারণের ব্যবস্থা করিতেন। এই নির্মম ব্যবস্থার ফলে কয়েক মাসের মধ্যে তাহার কঠিন অসুখ হইয়া মাথা খারাপের লক্ষণ দেখা দিল। তখন পাগল বলিয়া তাহাকে শ্বশুরবাড়ী হইতে বিতাড়িত করা হইল।

মেয়ে হাতের নোয়া খোয়াইয়া বাপের বাড়ী আসিলে তাহাকে দেখিয়া গৌরীদানের পুণ্যের কথা ভুলিয়া তাহার পিতামাতা ইনাইয়া বিনাইয়া অনেক কাঁদিলেন। খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া মেয়েকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন তাঁহারা। তার পর এক দিন চন্দ্রমোহনের স্ত্রীবিয়োগ হইল। অনেক দিন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিবার পর বছর ষোল বয়েস হইতে তরুর আবার মাথা খারাপের লক্ষণ দেখা দিল। সে নরুন পাড় পাতলা ধুতি পরে, লম্বা, ঘন, কালো চুলে সাজিমাটি, বেসম মাখিয়া ফুলাইয়া রাখে, সোনার সরু হার গলায় পরে, লুকাইয়া নাকি পানও খায়। কেহ কেহ বলে আড়ালে গান করে। কথায় কথায় সে আবার ছড়া কাটে। মায়ের মৃত্যুর পর হইতে সে একা হাতে সংসারের কাজকর্ম সব করে, বুড়া বাপের সেবা করে, বারো বছরের ভাইটিকে দেখাশোনা করে। সংসারের কাজকর্ম অবশ্য সে সুস্থ লোকের মতই করে।

তাহার পাগলামির লক্ষণ বিচিত্র। পাগলামির ভাব আসিলে দুপুর রাত্রে পুকুরে নামিয়া গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকে। কখন আবার ভিতর আঙিনার বাবুইঝাঁক আমগাছটা জড়াইয়া ধরিয়া সুর করিয়া কাঁদে, কেহ কেহ ঝুমকা জবা ও অশোকফুলের গুচ্ছ চুলে জড়াইয়া রাত্রে পুকুরের শান বাঁধানো ঘাটে তাহাকে নাকি নাচিতে দেখিয়াছে। এই সকল অনাসৃষ্টি কাণ্ডের কথা জানিতে পারিয়া পাড়ার লোকে প্রথমে পেত্নীর ভর হইয়াছে মনে করিয়া চন্দ্রমোহনকে ওঝা ডাকিতে পরামর্শ দিল। এখন দেখিয়া শুনিয়া তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছে মেয়েটা পাগল। শুধু পাড়ার গিন্নীবান্নীদের মত ছিল অন্ত রকম।

তরু পাগলী না জানি কি পাগলামি সুরু করিয়া দেয় মনে করিয়া প্রসন্ন ভাবিল সে চলিয়া যাইবে। বাহিরে তখন প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টি। বৃষ্টির ছাট ঘরের মধ্যে আসিতেছে দেখিয়া তরু ঝাঁপ আঁটিয়া দিল। গোয়ালের দুইটি গরু ঝড়ের গর্জনে জাব খাওয়া বন্ধ করিয়া ঘাড় ঘুরাইয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছিল। বাছুরটা এক একবার ডাকিয়া উঠিতেছিল।

পাগলী বেড়ার গায়ে হেঁসে গুঁজিয়া রাখিল। প্রসন্ন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে খড়ের গাদা হইতে এক আঁটি খড় আনিয়া মাটিতে বিছাইয়া দিয়া বলিল—বোস টেসন্ন বাবু, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। প্রসন্নর হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে বসাইল। নিজে মাটিতে বসিয়া বলিল, ঠাণ্ডা হয়ে একটু বোস না বাপু, নিরিবিলি পেয়েছি, দুটো মনের কথা কই।

মনের কথা কারে কই
তুমি আমার প্রাণের সই।

একটু হাসিয়া বলিল, তোমায় নাম বেঁকিয়ে টেসন্ন বলছি বলে রাগ করো না ভাই। আমার সোয়ামীর ঐ নাম ছিল তাই নিতে পারি নে। তুমি আমার নামে সোয়ামী।

আবার সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসি

আর থামে না। একটু পরে হাসিতে হাসিতে বলিল, তোমাকে দেখলে ভাই আমার মরা সোয়ামীর কথা মনে পড়ে। মন খারাপ হয়। নয় বছর বয়েসে সোয়ামী মরেছে বলে ভেবেছ তার কথা মনে নেই ? মিছে কথা।

হঠাৎ সে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। দুই হাতে বুক চাপড়াইয়া বলিল, এই বুকের মধ্যে তার মূর্ত্তি আঁকা আছে।

ঘর মাথাইয়া বলিল, শুনছ, অ ভাই, শুনছ ? তোমাকে দেখলে আমার তার কথা মনে পড়ে। মন খারাপ হয়। তুমি বাড়ী যাও টেঁপর, আর থেকো না এখানে। এসো ঝাঁপ খুলে দি।

সে ঝাঁপ খুলিয়া প্রসন্নর দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। বৃষ্টির ছাটে তাহার গা, মাথা ভিজিতে লাগিল। বাহিরের অবস্থা দেখিয়া প্রসন্ন নড়িয়া বসিল, উঠিল না।

ক্রমে বৃষ্টি থামিয়া আসিল। পাগলী বলিল, আবদা খেতে আজ গোয়ালে ঢুকেছিলে টেঁপর বাবু ? তোমার পায়ে পড়ি এবার বাড়ী যাও।

প্রসন্ন বন্দুক ও পাখী লইয়া ঘরের বাহিরে আসিল। পাগলী বলিল, চলো ভাই, তোমায় একটু এগিয়ে দি। বড় আঁধার হয়েছে।

ক্রমশঃ

অজ্ঞেয় মনস্তত্ত্ব

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

কালকে তুমি গিয়েছিলে কাদের বাড়ী ?
নূতন ভাবে ঘুরিয়ে প’রে বংলা শাড়ী ?
পাউডারেতে আননখানি উজল করি,
চাঁদ-কপালে কুম্‌কুমেরি তিলক পরি ;
কর্ণে দোলে নতুন রকম চক্রশোভা
কাঁপিয়ে কালো কেশরচনা মনোলোভা,
আঁখির কোণে সুর্ম্মা টানি মিহিন্ ক’রে
উর্ব্বশী কাল গিয়েছিলে কাহার দোরে ?
বান্ধবী এক পাশের বাড়ী আছে জানি
নেমন্তন্ন করেছিল, সেটাও মানি।
বিবাহ নয় সভাও কোন হয় নি তথায়,
সাজের ঘটা হঠাৎ কেন ঢুকলো মাথায় ?
আমার সাথে যাবার সময় সাঁঝ-ভ্রমণে
সজ্জা তোমার দেখব ভরি’ দুই নয়নে,
তবেই তো তা সার্থকতায় ধন্য হবে !
চিত্ত আমার উঠবে ভরে’ কি গৌরবে !
কাল যে গীতি শুনিয়েছিলে পরাণ ভরি’—
“প্রিয় তুমি চাইছ বলেই সজ্জা করি,”
সে গান তবে বৃথাই শুধু কথার মালা ?
মোর আঁখিতে পড়লো না কাল সাজের পালা !
রাজপথেতে রূপসী সব চলছে সেজে
পরের চক্ষু মুগ্ধ করার উৎসাহে যে !
প্রিয়তম দেখলো কিনা কে খোঁজ রাখে ?
তোমাদের এই মনস্তত্ত্ব বুঝবে বা কে ?

কথাহারা এই রাতে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

হৃদয়-বীণার স্বরগ্রামে কা’র রাগিনটে জাগে সুর,
　　লাজুক প্রাণের কোথা যেন কাঁপে আশা !
ঝাপ্‌সা জ্যোছনা মন আবছায়া ছড়ায়েছে বহু দূর,
　　কোথা যেন কার গুমরিছে ভালোবাসা !
গগন-কিনারে তারা-আলিপনা আঁকে বসে বিভাবরী,
ধরণীর কূলে দুলে ওঠে কত জীবনের বাঁধাতরী !
এই রাতে প্রিয় ! বিরহ-মিলন-ঢেউ লাগে কত প্রাণে !
　　হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের পরিচয়ে ;
অবচেতনার গোপন দুয়ারে আমারে কে যেন টানে,
　　বৃহতের মাঝে খণ্ডের পরাজয়ে।
প্রহেলিকা মাখা এই সংসার মোর কাছে অদ্ভুত,
সোহাগের রঙে করে টলমল কামনার বুদ্‌বুদ।
পৃথিবীর বুকে রেখে যায় সবে ক্ষণিকের সুখগীতি,
　　রেখে যায় তারা প্রণয়ের ইতিহাস।
অসীমকালের প্রবাহে মিলায় শেষ চেনা শেষ স্মৃতি,
　　আয়ু ঝরে আর থেমে যায় উল্লাস।
তবু ঘর বেঁধে ক্ষণিকের খেলা হেলাফেলা করে কাটে,
মন দেয়া নেয়া পথে পরবাসে সময়ের ভাঙাঘাটে।
পাওয়ার মতন পাওয়া যারে আর হোলো না জীবনে মম,
　　যার রূপালোকে সিনান করেছি কবি !
যার যৌবন-আতিথ্য পেয়ে কুলকুসুম সম
　　ছিনু একদিন, মনে পড়ে তার ছবি।
গৃহদীপখানি নিবে গেছে মোর কথাহারা এই রাতে,
শুধাই তোমারে, কভু কোন ক্ষণে দেখা হবে তার সাথে ?

আজি হতে শতবর্ষ পরে

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

তের-চোদ্দ বছর আগেকার কথা বলছি। অনেক দিন বিদেশে কাটিয়ে অনেক অর্থ উপার্জন, অনেক অপব্যয় এবং তার ফলে শরীরটি রোগে জর্জরিত, ট্যাঁক ঝর্ঝরিত, অন্তর অনুতাপে মর্মরিত, সদ্‌বুদ্ধি মঞ্জরিত ও বহুতর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে কলকাতায় ফিরে এসেছি। এসে দেখি, আমাদের আড্ডাগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন যবনিকার অন্তরালে আত্মগোপন করেছেন। যাঁরা আছেন তাঁরা ধুঁকতে-ধুঁকতে কেউবা বাগবাজার, কেউবা বালিগঞ্জে নতুন বাসা বেঁধেছেন।

তখন মহাসমারোহে বিশ্বযুদ্ধ নাট্যের দ্বিতীয় অঙ্কের রিহার্স্যাল চলেছে। থেকে থেকে ব্ল্যাকআউট, গ্রে-আউট প্রভৃতি নতুন নতুন দৃশ্যপটে শহরবাসীকে অভ্যস্ত করাবার চেষ্টা হচ্ছে। হিটলারের সদম্ভ চিৎকারে ধরণী কম্পিত ও বিশ্ববাসী ত্রস্ত।

যুদ্ধের নাম শুনলেই আমি ভীত হয়ে পড়ি। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের ঘা মনের মধ্যে তখনও দগদগ করছিল। সেবারে জার্মান-কন্‌সালের আপিসে চাকরি করতুম, খাটুনি কিছুই ছিল না বললেই হয়। সকাল সন্ধ্যে আপিসে যাওয়া-আসা—তাও চলত আপিসেরই গাড়িতে। কোনো কাজ নেই, অথচ কাজের লোক বলে আপিসময় খাতির। মোটা মাইনে, শীত-গ্রীষ্মে কলকাতা-সিমলে করা এবং তার ওপরে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এমন চাকরিটি যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে বিনা নোটিসে চলে গিয়েছিল।

সেবারে যুদ্ধ বাধার ফলে দেখলুম কত ভিখিরি লক্ষপতি ক্রোরপতি হয়ে গেল। আমি কিন্তু সেই থেকে আজ পর্যন্ত অবস্থাকে ঠিকমত মেরামত করে নিতে পারলুম না। অনেক কষ্টে অনেক চেষ্টার পর ভাগ্য-গগনের এক কোণে একটু ক্ষীণ আশার জ্যোতি দেখা দিয়েছে—এমন সময় আবার যুদ্ধ! একটা জিনিস আমি বরাবর লক্ষ্য করেছি যে, পৃথিবীতে বড় বড় ঘটনাগুলো যেন ষড়যন্ত্র করে আমার বিরুদ্ধেই ঘটে থাকে।

এবারের যুদ্ধ কি রকম হবে? গেল বারে যা হয়েছিল তার চেয়েও এবারে অনেক বেশি সাংঘাতিক এবং ব্যাপক হবে নিশ্চয়ই। অর্থ উপার্জনের নানা রাস্তা খুলে যাবে। কিন্তু আমি কি কিছু করতে পারব? মেঘে মেঘে বেলাও অনেক হয়ে গিয়েছে, সৈন্যবিভাগে ঢুকেও যে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করব তারও উপায় নেই। মনের অবস্থাও শরীরকে অতিক্রম করে অনেক এগিয়ে পড়েছে। অন্ধকারময় আলস্য ও ততোধিক অন্ধকারময় ঔদাসীন্য, যাকে আধ্যাত্মিক ভাষায় তামসিকতা বলে তারই মধ্যে ডুবে যাচ্ছি।

মনের এই রকম অবস্থা হ'লে আগেকার দিনে শান্তির আশায় আমরা প্রায়ই ইডেন গার্ডেনে গিয়ে বসতুম। শহরের কোলাহল থেকে দূরে এই নির্জন বাগানটিতে বসলে সত্যিই শান্তিলাভ হ'ত। গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে কত দিন এই বাগানে সময় কাটিয়েছি—বড় বড় ঝাউ ও দেবদারু গাছের নিরন্তর সন্‌সন্‌ আওয়াজ মনের মধ্যে শান্তির বার্তা বহন করে আনত। মাঠের মধ্যে ছায়ায় পড়ে থাকতুম, কখনো বা দূরে কখনো বা কাছের রাস্তা দিয়ে কোনো পথিক আপনার কাজে চলে যেত, শান্তমনে একটুখানি চিন্তার তরঙ্গ তুলে। কখনো বা গঙ্গাবক্ষে জাহাজের একটু ভোঁ আওয়াজ কানে এসে লাগত, কিন্তু এ সব সত্ত্বেও জনবিরল সেই পরিবেশের মধ্যে পাখীর কাকলী, গ্রীষ্মের উতলা বাতাস, গাছের মর্মরধ্বনি মনের মধ্যে একটা শান্ত ঔদাস্য জাগিয়ে তুলত।

কিন্তু রাত্রে ইডেন গার্ডেন আবার অন্যরূপ ধারণ করত। দিবসের উদাসিনী নিশীথের স্পর্শ পেয়ে হয়ে উঠত রহস্যময়ী বিলাসিনী। চারিদিকে আর্ক-লাইটের স্নিগ্ধ আলো-কে জ্যোৎস্নার আলো ব'লে ভ্রম হ'ত। বড় বড় গাছ, ঝোপঝাড় আলো ও ছায়ার রহস্যে রহস্যময় হয়ে উঠত। ব্যাণ্ড-ষ্ট্যাণ্ডে বাজত অপূর্ব বিদেশী বাজনা। শ্বেতচর্ম বিদেশী, বিদেশিনী এবং শিশুরা প্রজাপতির মত রঙীন পোশাক প'রে তালে তালে ঘুরে বেড়াত সেখানে। আমাদের অর্থাৎ দিশি লোকেদের মাঠের মধ্যে এক অদৃশ্য সীমারেখার পরে প্রবেশ-অধিকার ছিল না। তাদের এই নবাবির পয়সা জোটাতুম আমরা অথচ আমরাই সেই আনন্দ-উপভোগে ছিলাম বঞ্চিত। নিজেদের এই অধিকার সাব্যস্ত করবার জন্যে কত দিন লালমুখো সার্জেণ্টের ধাক্কা খেয়েছি, কত মারামারি হয়েছে ইংরেজদের সঙ্গে, ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে, তার ঠিকানা নেই। যদিও বলতে নেই —এক যুদ্ধের চাপেই তাদের উষ্মা ঢের নেমে গিয়েছিল। নানারকম ভাবতে ভাবতে এক দিন সন্ধ্যের সময় শান্তিপূর্ণ এই ইডেন উদ্যানে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

হরি হরি! কোথায় গিয়েছে তার আলোক-সজ্জা,

কোথায় সেই অপূর্ব বাজনা? অন্ধকার অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার। এখানে সেখানে দূরে দূরে এক আধটা আলো টিম্‌টিম্ করে জলছে বটে, কিন্তু তাতে চারিদিকের অন্ধকার আরো বেড়েছে বই কমেনি। অন্ধকার হাতড়াতে হাতড়াতে বাজনার মাঠে গিয়ে উপস্থিত হলুম। হা হতোস্মি! এক দিন properly dressed নয় বলে দিশি লোকের যেখানে বেড়াবার অধিকার ছিল না সেখানে দেখলুম একদল লোক ল্যাঙট্ পরে চাঁদের আলোতে মনের সাধে কপাটি খেলছে।

মাঠের একধারে বসে একমনে তাদের খেলা দেখছি। মশ্‌মশ্ জুতোর আওয়াজ শুনে ফিরে দেখি একটা লোক—দিশি লোক অবিশ্যি, পাশের রাস্তা দিয়ে টলতে টলতে চলে যাচ্ছে। একবার দাঁড়িয়ে লোকটা আমাকে বেশ করে দেখবার চেষ্টা করলে। অন্ধকার ভেদ করে সেই অবস্থায় তার পক্ষে যতদূর দেখা সম্ভব দেখে চলে গেল। মনের মধ্যে যেন কি রকম ভয় ভয় করতে লাগল। সেখান থেকে উঠে গিয়ে আর একটা জায়গায় গিয়ে বসলুম।

যারা কপাটি খেলছিল তারা খেলা শেষ করে গোল হয়ে বসে বিড়ি ফুঁকতে লাগল। আমি দেখছি আর ভাবছি—আজি হতে শতবর্ষ পরে এই বাগানের কি অবস্থা হবে? ভবিষ্যতের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে মন ঘুরে বেড়াচ্ছে—একটা লোক আমার একটু দূরে এসেই বসে পড়ল। চিন্তায় পড়ল বাধা। লোকটার দিকে কয়েকবার দেখতে দেখতে মনে হ'ল যেন সে আকাট যণ্ডা। বাবা! কিছু মতলব আছে নাকি। আমার মত ক্ষীণজীবী লোকের পাশে ঐ রকম একটা যণ্ডা লোকের অবস্থান প্রায় মৃন্ময় পাত্র ও কাংস্যময় পাত্রেরই সামিল! কি জানি কেন মনে হতে লাগল উঠে চলতে আরম্ভ করলেই কিংবা দৌড় দিলেই লোকটা ক্যাঁক্ করে ধরে বসিয়ে দেবে ছুরি। খুব শান্তির আশায় আসা গিয়েছিল ইডেন গার্ডেনে! মনকে ভরসা দিতে লাগলুম—আচ্ছা আমায় মারবে কেন? ট্যাঁকে একটি পয়সা নেই, চেহারা যা হয়েছে তাতে আমাকেই তো পকেটমার বলে লোকের ভ্রম হতে পারে। আচ্ছা, ও আমার সম্বন্ধে এই কথাই ভাবছে না তো? এই অন্ধকারই যত নষ্টের গোড়া। অন্ধকারেই সাধুকে অসাধু, অসাধুকে সাধু বলে প্রতীয়মান হয়। রজ্জুতে সর্পভ্রম বা সর্পে রজ্জুভ্রম—ঐ অন্ধকারেই হয়ে থাকে। অতি সর্বনেশে জিনিষ এই অন্ধকার। সাধে কি আর উপনিষদ চিৎকার করেছেন—"তমসো মা জ্যোতির্গময়।"

লোকটা এবার উঠল। হয়ত সে ভাল লোক, নয়ত অন্য কোন শিকারের সন্ধানে ছুটল, কে বলতে পারে! আর বেশি দেরি না করে আমিও ওখান থেকে উঠে পড়লুম।

তারপরে বিশ্ব-মহাযুদ্ধ-নাট্যের দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয়! এই বিশ্বব্যাপী মহাপ্রলয়ে পৃথিবী একেবারে উল্টে গেল বললেই হয়। এরই তালে কত জোচ্চোর হয়ে পড়ল ব্যবসাদার, কত ব্যবসায়ী ধরা পড়ল জোচ্চোর বলে। যে সব জাতি অত্যন্ত তৈলাক্ত হয়ে ধরাকে সরাজ্ঞান করে সদম্ভে 'চলে আও চলে আও' বলে হুঙ্কার ছাড়ছিলেন—পাঁচ বছরে তাদের সমস্ত তৈল নিষ্কাষিত হয়ে গেল। চারিদিকে পরিবর্তনের ঝোড়ো হাওয়া বইতে লাগল—এই হাওয়াতেই আমাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল গেল উড়ে। যেদিকে যাই যেদিকে তাকাই সব দিকেই পরিবর্তন। মোট কথা, এক আমার ভাগ্য ছাড়া দুনিয়ার চেহারাই গেল বদলে।

যুদ্ধ থেমে যাবার কিছুদিন পরে আর একবার যার নাম ইডেন গার্ডেন ছিল—সেখানে গিয়েছিলুম, রাত্রিবেলা নয় দিনের বেলা। সেখানে গিয়ে মনে হ'ল যুদ্ধটা কি এই খানেই হয়েছিল! দেখলুম ইডেন গার্ডেন একেবারে চৌপট হয়ে গিয়েছে। সেখানে এক সময়ে যে সুন্দর উদ্যান ছিল তা বলে না দিলে ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকেরা জানতেই পারবে না। শুনলুম সেখানে নাকি কিসের 'এগজিবিশন' হয়েছিল, তারই ফলে বাগানের এই অবস্থা। পাঁচ বছর আগে 'আজি হতে শতবর্ষ পরে' বাগানের যে দুর্দশা হবে বলে মনে করেছিলুম তার চেয়েও বেশি দুর্দশা প্রত্যক্ষ করলুম। শহর রক্ষা করার ভার যাঁদের ওপরে তাঁরা একশ বছরের কাজ পাঁচ বছরেই শেষ করে ফেলেছেন। পরাধীন জীবনে আমরা সর্ববিষয়েই পেছিয়ে পড়েছিলুম। এমনি করে একশ' বছরের কাজ পাঁচ বছরেই শেষ না করলে অন্য জাতের সঙ্গে আমরা পাল্লা দিয়ে চলব কেমন করে?

আমাদের জীবনপ্রভাতে কলকাতা শহরের আশপাশে আরো দুটি শান্তির নিলয় ছিল। একটি হচ্ছে বেলুড়ের মঠ, অপরটি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর মন্দির ও বাগান। দুটি জায়গাই গঙ্গার ধারে। ডাঙাপথে যাওয়া গেলেও অধিকাংশ লোকেই সেখানে দর্শনে যেতো জলপথে। মনে পড়ে, আমাদের ছেলেবেলায় ছুটির দিনে কয়েক জনে মিলে নৌকো করে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে যেতুম। সেইখানে গঙ্গার ধারে কোনো জায়গায় খিচুড়ি রেঁধে খেয়ে, সমস্ত দিন কাটিয়ে, কখনো সন্ধ্যার আরতি শেষ হলে, কখনো বা তার আগেই ফিরে আসতুম। কোন কোন বার বিকেল নাগাদ ওপারে বেলুড় মঠে গিয়ে সন্ধ্যা অবধি কাটিয়ে ফিরে আসতুম। কখনো বা সমস্ত দিনটা

বেলুড় মঠে কাটিয়েই বিকেলবেলা ওপারে গিয়ে সন্ধ্যার আরতি দেখে চলে আসতুম। এও মনে পড়ে তখন সমস্ত দিনে নৌকা ভাড়া নিত বার আনা থেকে এক টাকার বেশি নয়। শীতকালে সন্ধ্যাবেলা এবং অন্যান্য বিশেষ উৎসবের দিনে কিছু লোকের ভিড় হ'ত বটে, কিন্তু অন্য সময় মন্দির ও বাগানে কোনো লোক থাকত না বললেই হয়। গঙ্গার ধারে পরমহংস-বিবেকানন্দপ্রমুখ ভক্তজনপূত সেই নির্জন মন্দির-প্রাঙ্গণ, গঙ্গার ঘাট ও উদ্যানে মূর্তিমতী শান্তি বিরাজ করত।

উঁচু বাঁধান সেই বটগাছটি—শুনতুম পরমহংসদেব এই-খানে বসে তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন—তার মূলে আমরাও বসতুম। মন চলে যেত সুদূর অতীতে, কানে এসে বাজতে থাকত ঠাকুরের কথামৃত, চোখের ওপরে ভেসে উঠত সেদিনকার অনেক দৃশ্য যা "কথামৃতে" লিপিবদ্ধ আছে। অকস্মাৎ কখনো মাথার ওপরে উঠত বাতাস, গ্রীষ্মের উদাস হাওয়ায় সেই বিরাট মহীরুহের শাখাপ্রশাখা হা হা করে উঠত, প্রকৃতির এই ঔদাসীন্যের কিছু আমাদের মনেও সঞ্চারিত হ'ত। কখনো বা গিয়ে বসতুম ঘাটের প্রকাণ্ড চাতালের নীচে, সম্মুখে প্রবাহিত হ'ত গৈরিক গঙ্গা, তারই কুলুকুলু নাদে যেন একটা নেশা হ'ত। সে নেশার মধ্যে উদ্দামতা নেই, সংসারের মালিন্য ও আবিলতা থেকে যেন সে অনেক দূরে নিয়ে যায়। দীর্ঘ দ্বিপ্রহরে লোকজন কারও দেখাসাক্ষাৎ পাওয়া যেত না। মনে পড়ে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেলেও সাহস করে সেখানকার পুকুরের কিংবা নদীর জল খেতে পারতুম না। বিকেল হলে আলমবাজারের পাটকলের সামনে কলের জলে তৃষ্ণা নিবারণ করতে যেতুম।

চারিদিকের দারুণ অশান্তি ও আসন্ন দুর্যোগের দিনে ছুটে গিয়েছিলুম আগেকার সেই শান্তির নীড়ে। কিন্তু হায়! সেখানে না যাওয়াই ছিল ভালো। গেট থেকে আরম্ভ করে মন্দিরের দরজা অবধি—রাস্তার দু'ধারে সারবন্দী দোকান বসেছে। চায়ের দোকান, খাবারের দোকান, পুতুলের দোকান, পান-সোডা-লিমনেড—কিছু বাকী নেই। লোকের ভীড়ের অন্ত নেই। অধিকাংশই বাজে লোক অর্থাৎ মন্দির বা ঠাকুরদর্শনের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই তাদের নেই। দর্শনার্থীদের কাছ থেকে কোনো ছুতোয় কিছু আদায় করাই তাদের পেশা। অপ্রত্যাশিত ভাবে এই দৃশ্য দেখে মনটা হয়ে পড়ল সঙ্কুচিত। মনে হ'ল দেবস্থানকে এইভাবে পণ্যশালায় পরিণত করে তার পবিত্রতাকে নষ্ট করার অর্থ কি? মায়ের কি অর্থের অভাব হয়েছে? না সমারোহ বাড়িয়ে দিয়ে এগুলি যাত্রী ধরার ফাঁদ মাত্র। অত্যন্ত পীড়াদায়ক অনুভূতিতে আমার অন্তর ক্লিষ্ট হতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ছবিও চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল—'আজি হতে শতবর্ষ পরে' এখানকার কি অবস্থা হবে।

আমি মানস নয়নে দেখলুম মন্দির-প্রাঙ্গণের এক কোণে যেখানে পরমহংসদেব থাকতেন সেই ঘরটিকে গর্ভগৃহ করে তার ওপরে সু-উচ্চ প্রস্তর মন্দির তৈরি হয়েছে, গর্ভগৃহে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শ্বেতপ্রস্তরের প্রতিমূর্তি স্থাপিত করা হয়েছে। দেশবিদেশ থেকে দলে দলে যাত্রীসমাগমে মন্দির-প্রাঙ্গণ পূর্ণ। সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডার দল ঘুরছে, মেষপালের মধ্যে রক্তপিপাসু নেকড়ের মত। মন্দিরের উদ্যানে পঞ্চবটী, পঞ্চমুণ্ডির আসন প্রভৃতি স্থান পাণ্ডারা দেখিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, যেমন প্রয়াগে অক্ষয় বট দেখায়। মন্দিরের চারিদিকে বড় বড় বাড়ি উঠছে যাত্রীর দল থাকবার জন্য। হয়তো ভিন্নপ্রদেশীয় লোক এই সব বাড়ির মালিক। বিলাসী যাত্রীদের সুবিধার জন্য মন্দিরের আশেপাশে বড় বড় হোটেল গড়ে উঠেছে। পরমহংসদেবের মুখনিঃসৃত বাণী—অতি সোজা কথায় অতি সাধারণ তুলনায় তিনি যে-সব ধর্মকথা বলতেন, অতি বড় পণ্ডিত ও অতি বড় মূর্খেরও যা বুঝতে কষ্ট হ'ত না—সেই সকল বাণীর গূঢ়, অন্তর্গূঢ় ও নিগূঢ় সব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সেই সব অধ্যাত্ম তত্ত্ব শিক্ষা দেবার জন্য কাছেই আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। দেশে বিদেশে এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কথা ছড়িয়ে পড়েছে। সাদা, কালো, হলদে, তামাটে সব জাতিরই ছাত্র একত্রে এক জায়গায় বসে ভারতীয় অধ্যাত্ম তত্ত্ব শিক্ষা করছে—সবই হয়েছে, কিন্তু সেই শান্তিময়, নির্জন, নিরাবিল পরিবেশ—যার কোলে গিয়ে পড়লে দু'দণ্ডের জন্যেও সংসারের মালিন্য থেকে মুক্তি পাওয়া যেত তা আর নেই।
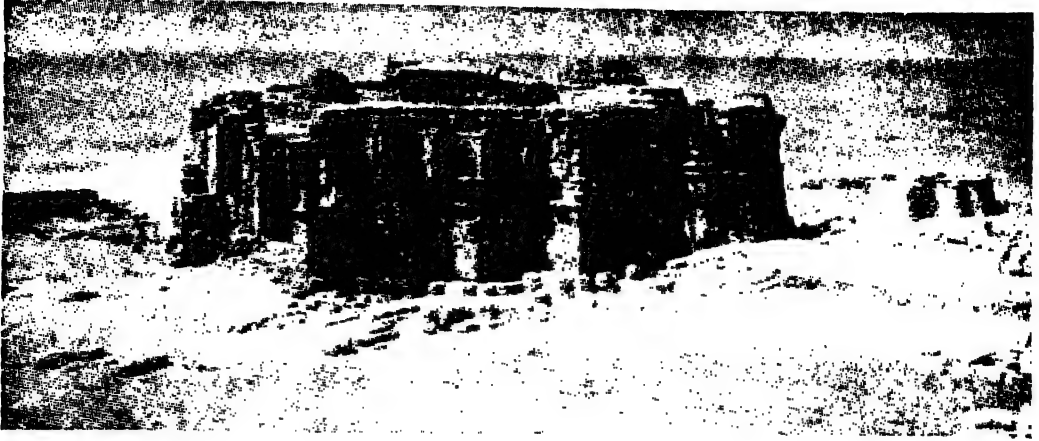
সোমনাথের ধ্বংসাবশেষ

সোমনাথ উৎসব ও সংস্কৃত বিশ্বপরিষদ্

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

সোমনাথের নবনির্মিত মন্দির ও লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে গত বৈশাখের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে (১১ই মে ১৯৫১) প্রভাস-তীর্থে যে বিচিত্র উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল আমন্ত্রিত হইয়া তাহাতে যোগদান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। উৎসবের খুঁটিনাটি সমস্ত অনুষ্ঠান দেখিবার বা বুঝিবার সুযোগ না হইলেও এ সম্পর্কে যাহা যাহা দেখিয়াছি বা জানিতে পারিয়াছি তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন বলিয়া বোধ করি। বিবরণের ভূমিকা হিসাবে সোমনাথের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ভারতের পশ্চিম প্রান্তে শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত সমুদ্রতীরবর্তী প্রভাসতীর্থ হিন্দুদিগের প্রধানতম তীর্থগুলির অন্যতম। আজ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান হিন্দুগণ তাঁহাদের ধর্মকার্যে 'কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ' এই পঞ্চ পুণ্যতীর্থের আবাহন করিয়া থাকেন। এই পবিত্র প্রভাসতীর্থেই বিচিত্র সুখদুঃখের স্মৃতি বহন করিয়া প্রসিদ্ধ সোমনাথের জীর্ণ মন্দির বিরাজমান ছিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই মন্দির হিন্দুদিগের গৌরব ও শ্রদ্ধার বস্তু ছিল—এই মন্দিরে অধিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ প্রসিদ্ধ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে মুখ্য—ইহার ঐশ্বর্যের খ্যাতি দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ফলে যুগে যুগে বিধর্মীর নিষ্ঠুর অত্যাচার ইহাকে বিধ্বস্ত ও কলুষিত করিয়াছে—গজনীর সুলতান মামুদ হইতে আরম্ভ করিয়া আলাউদ্দীন খিলজির সেনাপতি আলফ্ খাঁ, আমেদাবাদের প্রতিষ্ঠাতা আহম্মদ শাহ্, গুজরাটের সুলতান বেগদা ও উদ্ধত ঔরঙ্গজেব—ইঁহারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন সময়ে এই প্রসিদ্ধ মন্দিরকে যথাশক্তি বিনষ্ট করিবার চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু ধর্মপ্রাণ হিন্দু নরপতিবর্গের অদম্য আগ্রহে ইহা বার বার সংস্কৃত ও পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। ঔরঙ্গজেবের নির্দেশ ছিল যে, ইহাকে এমনভাবে ধ্বংস করিতে হইবে যাহাতে ইহার পুনঃ-সংস্কার সম্ভবপর না হয়। তাই তাঁহার অনুচরবর্গের তাণ্ডব-লীলার পর ইহা ব্যবহারের অযোগ্য ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। অনতিদূরে স্বতন্ত্র মন্দির নির্মাণ করিয়া সোমনাথের পূজানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী নিদারুণ অত্যাচারের ফলে হিন্দুদের মধ্যে একটা নৈরাশ্য ও উৎসাহ-হীনতার ভাব আসিয়া পড়ে—তীর্থের পূর্ব-গৌরব অনেকটা ম্লান হইয়া যায়—ইহার জনপ্রিয়তাও ক্ষুণ্ণ হয়।

ভারতের পরাধীনতা ও পরাজয়ের গ্লানির প্রতীক এই ধ্বংসস্তূপকে অপসারিত করিয়া নূতন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ও ইহার পূর্ব-গৌরবের উদ্বোধন স্বাধীন ভারতের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরেই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং কে. এম্. মুন্সি মহোদয় এই গুরুকর্তব্য পরিপালনে উদ্যোগী হন। ভারত ও সৌরাষ্ট্র সরকারের সমবেত প্রযত্নে এতদুদ্দেশ্যে একখানি ন্যাসপত্র সম্পাদিত হয় এবং একটি ন্যাসরক্ষক সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির অক্লান্ত চেষ্টায় অতি অল্পকালের মধ্যে মূল মন্দির ও তাহার বিগ্রহ নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন হইল। সঙ্কল্পিত সমস্ত কার্য সম্পূর্ণ করিতে অবশ্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইবে। সমুদয় মন্দির নির্মাণের কার্য সম্পাদন এবং মন্দিরের অনুবর্তী

যেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মর্ত্যদেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন সেই দেহোৎসর্গে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন ব্যতীত সমগ্র অঞ্চলটির সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন ইঁহাদের বিরাট পরিকল্পনার অন্তর্গত। এই উদ্দেশ্যে পথঘাটের সংস্কারসাধন, তীর্থযাত্রীদের জন্য ধর্মশালা-স্থাপন, গোশালার ব্যবস্থা এবং সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় আছে। এই বৃহৎ ব্যাপারের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান হিসাবেই বিগত উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। ইহার আড়ম্বর ও সমারোহের প্রাচুর্যে শুধু দর্শকবৃন্দই নয় সংবাদপত্র-পাঠক সমগ্র দেশবাসীই আকৃষ্ট হইয়াছেন। তবে আড়ম্বরের অনুপাতে সুব্যবস্থার আপেক্ষিক অভাব নিমন্ত্রিতদের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। ফলে কিছু কিছু অসুবিধাও তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হইয়াছে।

দেশের গণ্যমান্য জ্ঞানী গুণীর উপস্থিতিতে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ লোকের সমাবেশও কম হয় নাই। অবশ্য দেশের এক প্রান্তবর্তী এই তীর্থে সমস্ত দেশের লোকসমাগমের আশা করা যায় না। স্বাভাবিক ভাবেই পশ্চিম প্রান্তের লোক বেশী সমবেত হইয়াছিলেন। ধ্বংসস্তূপসমাকীর্ণ সমুদ্র-তীরবর্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তর দীর্ঘকাল পরে অগণিত জনকোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল—দীর্ঘকাল পরে সমবেত জনসঙ্ঘ সমুদ্রতটশোভী মন্দিরের অপরূপতা দর্শনে নয়ন-মনের পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল—নানা দিগ্‌দেশাগত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গম্ভীর কণ্ঠনিঃসৃত মন্ত্রধ্বনি অতি পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল। কয়েক দিন পূর্ব হইতেই অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এবং শঙ্করা-বতার ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্যের শুভ জন্মতিথি বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমীতে আসল প্রতিষ্ঠা কার্য সম্পাদিত হয়। কার্য সম্পাদনের জন্য আমন্ত্রিত পণ্ডিতবর্গের যথোচিত সম্মান রক্ষার ত্রুটি করা হয় নাই। কাশীর এক পণ্ডিতের মুখে শুনিলাম যাতায়াতের ব্যয় বাদে তিনি আড়াই শত টাকা দক্ষিণা পাইয়াছেন। বাংলাদেশে কর্মকাণ্ডে পারদর্শী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের একান্ত অভাব না হইলেও এক্ষেত্রে তাঁহাদের কাহারও অনুপস্থিতি উপেক্ষণীয় নয়। সংস্কৃতের উচ্চারণ ও অন্যান্য ব্যাপারে বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য এই বিষয়ে কতটা দায়ী তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বস্তুতঃ সর্বভারতীয় ব্যাপারে বাঙালী পণ্ডিতের ন্যায্য স্থান অধিকারের পক্ষে কোন বাধা থাকিলে তাহা দূর করিবার জন্য সর্বান্তঃকরণে যত্নবান্ হইতে হইবে।

বেদ ও স্তোত্রাদির আবৃত্তি শব্দপ্রক্ষেপক ও শব্দবর্ধক যন্ত্রের সাহায্যে শ্রবণ করা ব্যতীত অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অংশের সহিত পরিচয়লাভের সুযোগ অতি অল্প লোকেরই হইয়াছে। উপস্থিত সকলের এ বিষয়ে তেমন ঔৎসুক্য থাকিতে পারে না সত্য—তবে কৌতূহলী অভ্যাগতের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল বলিয়া মনে হয় না। বিভিন্ন প্রদেশের অনুষ্ঠান-পদ্ধতির মধ্যে যে পার্থক্য বর্তমান তাহার বিশেষ বিবরণ সুলভ নহে। এই জাতীয় সর্বভারতীয় অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ প্রচারিত হইলে এই বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের যথেষ্ট সুবিধা হয়। বস্তুতঃ আশা করিয়াছিলাম—কখন কি অনুষ্ঠান হইতেছে, সংবাদপত্রে উদ্‌ঘোষিত সযত্ন-সংগৃহীত বিভিন্ন সমুদ্রের জল, বিভিন্ন মহাদেশের মাটি কখন কিভাবে ব্যবহৃত হইতেছে আমাদিগকে বুঝাইয়া বা জানাইয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু আমাদের সে আশা পূর্ণ না হওয়ায় মনে একটা ব্যথা অনুভব করিয়াছিলাম—ইহা গোপন করিয়া লাভ নাই। আধুনিক যুগে প্রচারের সুযোগের যখন অভাব নাই তখন এ-দিকে কর্তৃপক্ষের অবহিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি। আশা করি, উৎসবের পূর্ণ বিবরণ সংকলনের সময় তাঁহারা এই কথা মনে রাখিবেন।

সোমনাথ প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করিয়া এই সময়ে আরও দুইটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথম, দেহোৎসর্গে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ স্থানে যে স্মৃতিস্তম্ভ গঠিত হইবে তাহার ভিত্তি-স্থাপন। দ্বিতীয়, অখিল ভারতীয় সংস্কৃত পরিষদের অধিবেশন। ভিত্তি-স্থাপন করেন সৌরাষ্ট্রের রাজ-প্রমুখ জামসাহেব শ্রীদিগ্‌বিজয় সিংহজী। এই স্মৃতিস্তম্ভের পরিকল্পনাটি অপূর্ব—ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বাণী শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা উৎকীর্ণ থাকিবে বলিয়া নয়—যে কৃষ্ণ ও তাঁহার আদর্শকে আমরা ভুলিতে বসিয়াছি এবং সেইজন্যই অবর্ণনীয় দুঃখ-তাপে দগ্ধ হইতেছি সেই শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি ও আদর্শকে ভারতবাসীর চিত্তে নবীনভাবে উদ্বুদ্ধ করিবার অভিনব প্রচেষ্টা বলিয়াই ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তার পর যিনি ভিত্তিস্থাপন করিলেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম বংশধর বলিয়া পরিচিত। প্রচলিত বংশ-তালিকা অনুসারে তিনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে ১৩৩তম পুরুষ। ভারতীয় রীতিতে কেবলমাত্র ধুতি-চাদর পরিধান করিয়া ইঁহার সভাস্থানে আগমন ও সরস মনোজ্ঞ বক্তৃতা-প্রদান উপস্থিত সভ্যবৃন্দকে মুগ্ধ করে।

অখিল ভারতীয় সংস্কৃত পরিষদের অধিবেশন দুই দিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীপুরুষোত্তমদাস টণ্ডন এই অধিবেশনের উদ্‌বোধন করেন এবং ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের রাজ-প্রমুখ শ্রীপদ্মনাভ দাস বালরাম বর্মা সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ ইহার উদ্দেশ্য বর্ণনা ও সাফল্য কামনা করিয়া বক্তৃতা করেন।

এই অধিবেশনে সোমনাথ সংস্কৃত-বিশ্বপরিষদ গঠন সম্পর্কে নিম্নোক্ত মর্মে একটি মূল্যবান্ প্রস্তাব গৃহীত হয়:

১। ভারতের সংস্কৃতি ও কর্মপ্রেরণার মূল উৎস সংস্কৃত ভাষা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাচীন ভাষাসমূহের অন্যতম এই ভাষা—ইহারই সাহায্যে ভারতীয় সংস্কৃতির মহত্ত্বের প্রকৃত উপলব্ধি সম্ভবপর।

২। সংস্কৃত-শিক্ষার উন্নতি বিধানই ভারতের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন। এই উপায়েই ভারতের প্রাচীন সম্পদের আধার এবং ভারতীয় আধুনিক ভাষা-সমূহের আকর ও পুষ্টির কারণ এই ভাষা জনগণের জীবনে অন্তরঙ্গ স্থান অধিকার করিতে পারে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের গবেষণা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির অনুগত হইলে আমাদের বিচিত্র ও বিপুল ঐতিহ্য সমগ্র জগদ্বাসীর অধিকতর সুখলভ্য হইতে পারিবে।

দেহোৎসর্গের পরিকল্পিত স্মৃতিস্তম্ভ

৩। উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত একটি সংস্কৃত-পরিষদ্ গঠিত হউক। ইহা সোমনাথ-ভাসমণ্ডলী ও পৃথিবীর অন্যান্য যে সকল প্রতিষ্ঠান অনুরূপ উদ্দেশ্য লইয়া অনুরূপ ক্ষেত্রে কার্য করে তাহাদের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে কার্য করিবে।

প্রাচীনকালে প্রভাস শুধু শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম লীলাক্ষেত্র বা তীর্থস্থান হিসাবেই প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই—জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনার কেন্দ্র-হিসাবেও ইহার খ্যাতি ছিল দেশব্যাপী। ইহার এই পূর্ব গৌরব পুনরুজ্জীবিত করিবার উদ্দেশ্যে এখানে একটি বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র গড়িয়া তোলার অভিপ্রায় সোমনাথের কাগপত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এই বিশ্বপরিষদ্ গঠন তাহারই প্রথম পর্ব। সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই ইহার সাফল্য কামনা করিবেন।

সংস্কৃত শিক্ষা আজ যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহাতে ইহাকে পূর্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা—এমন কি ইহাকে বাঁচাইয়া রাখা এক গুরুতর সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। সমাজে সংস্কৃত পণ্ডিতের পূর্ব-সম্মান নাই—ধর্মবোধ ও ধর্মাচরণের শৈথিল্যের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতের সামাজিক মূল্য কমিয়া গিয়াছে। ফলে অতি সাধারণভাবেও তাঁহার জীবিকার্জন দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় সংস্কৃতের ছাত্রসংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে—ইহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই। অবশ্য সংস্কৃত-ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন, ভবিষ্যতের ভাবনা তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে আন্দোলন ও প্রতীকারের উপায় চিন্তা করিতেছেন*—সরকারী সাহায্যই আত্মরক্ষার উপায় বিবেচনা করিয়া আবেদন-নিবেদন করিতেছেন। বিভিন্ন রাজ্য-সরকারও এদিকে দৃষ্টি দিয়াছেন এবং সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু কিছু উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু কোন চেষ্টাই এখন পর্যন্ত সার্থক হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ সমস্যার ব্যাপকতা ও গৌরবের কথা চিন্তা করিলে সমাধানের সম্ভাবনা সম্বন্ধেই সংশয় উদিত হয়। অথচ আধুনিক জীবনেও সংস্কৃতের প্রভাব ও মূল্য উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। আমাদের সমগ্র-জীবনযাত্রা মূলতঃ সংস্কৃতাশ্রয়ী। ধর্মকর্ম যাহাই করি না কেন তাহার অবলম্বন সংস্কৃত—আমাদের নিত্যব্যবহার্য ভাষা সংস্কৃতের একান্ত অনুগত—সংস্কৃতের বিশেষ জ্ঞান ব্যতীত শুদ্ধভাবে এই ভাষা ব্যবহার করা সম্ভবপর নয়। আমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার কেন্দ্র—আমাদের জীবনের অবলম্বন—প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান গৌরবগাথা সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় উপ-নিবদ্ধ। সুতরাং সংস্কৃত ত্যাগ করিলে আমাদের দুর্দশার সীমা থাকিবে না।
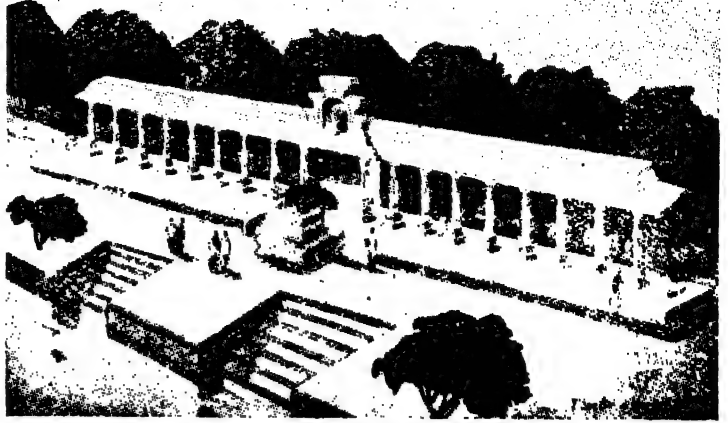
সত্য বটে, এই ঐহিকপরায়ণতা ও ধনতান্ত্রিকতার যুগে জনসাধারণকে সংস্কৃতের অভিমুখী করার আশা দুরাশা মাত্র। কিন্তু তথাপি ইহার প্রতি অনুরাগবৃদ্ধি বিষয়ে নিশ্চেষ্ট বা নিরুৎসাহ হইলে চলিবে না। সংস্কৃত চর্চার আয়োজন ও সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত করিতে হইবে—সংস্কৃত শিক্ষা-ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে—সংস্কৃত-শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ যথাসম্ভব প্রশস্ত করিতে হইবে। তাহা ছাড়া, বিশাল সংস্কৃত-সাহিত্যসমুদ্র মন্থন করিয়া রত্নরাশি আহরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সেই রত্নরাশি যাহাতে জনসাধারণের কাজে লাগিতে পারে সে বিষয়ে সচেষ্ট হইতে হইবে—সরলভাবে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় সেগুলির বহুল প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে - সর্বোপরি, সাধ্যমতে বিক্ষিপ্ত উপেক্ষিত বা অসমাদৃত অমূল্য প্রাচীন গ্রন্থরাশির

* এই প্রসঙ্গে আগ্রার নিখিল-ভারত সংস্কৃত শিক্ষা-সম্মেলন, কলিকাতার পশ্চিমবঙ্গ চতুষ্পাঠী অধ্যাপক-সম্মেলন এবং জব্বলপুরের মধ্যপ্রদেশীয় সংস্কৃতাধ্যাপক সঙ্ঘ—এই আধুনিক প্রতিষ্ঠানগুলির নাম উল্লেখযোগ্য।

দেহোৎসর্গের বর্ত্তমান অবস্থা

সংরক্ষণ ও সমালোচনের সুবন্দোবস্ত যাহাতে অবিলম্বে হইতে পারে সে দিকে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। অবশ্য বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ শক্তি অনুসারে এই সমস্ত কার্য সম্পাদন করিতেছেন—অনেকের কার্য বিশেষ প্রশংসাও অর্জন করিতেছে সন্দেহ নাই। তবে ইঁহাদের মধ্যে পরস্পর যোগাযোগের সূত্র অতি শিথিল। তাহা ছাড়া ব্যাপক পরিকল্পনা লইয়া সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে অনেকের সমবেত চেষ্টায় যেসব কার্য সম্পাদন সম্ভবপর সে জাতীয় কার্যে হাত দিবার বিশেষ কোনও ব্যবস্থাই হয় নাই। সদ্যঃ পরিকল্পিত এই সোমনাথ সংস্কৃত বিশ্বপরিষদ্ সমগ্র দেশের সংস্কৃতচর্চ্চার মধ্যে বহু আকাঙ্ক্ষিত ঐক্যসূত্রের প্রবর্ত্তন করিয়া নবীন উৎসাহে সুশৃংখলভাবে নব নব ক্ষেত্রে কার্য আরম্ভ করিয়া সংস্কৃত-শিক্ষার্থী ও সংস্কৃতানুরাগীর হৃদয়ে নূতন প্রেরণা সঞ্চারিত করিতে পারিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে—দেশের শিক্ষাক্ষেত্র মনোরম ফলপুষ্পে সমৃদ্ধ হইয়া দেশ-বিদেশের তৃপ্তি সাধন করিবে—আমাদের মস্ত বড় একটা অভাব দূরীভূত হইবে। দেশের কর্ণধারগণ যখন এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছেন তখন এই আয়োজন সাফল্যমণ্ডিত হইবে এ ভরসা আমাদের আছে।

ইরো

শ্রীঅমলেন্দু সেন

ইরো (IRO) যাঁহার ডাকনাম, পোশাকী নামে তিনি ইণ্টারন্যাশনাল রিফিউজী অর্গানিজেশন, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক শরণার্থী সঙ্ঘ বলিয়া পরিচিত। নাম দেখিয়া যতটা মনে হয়, ইঁহার কার্য্যক্ষেত্র অবশ্য ততটা ব্যাপক নয়। আজ প্রায় আড়াই বৎসর হইতে চলিল ইনি কেবলমাত্র ইউরোপের গৃহহারাদের অচল অবস্থা দূর করিবার কাজে নামিয়াছেন। সে কাজটিও বড় সামান্য নয়।

উদ্বাস্তু-সমস্যা ভারতে প্রায় চার বৎসরের, কিন্তু ইউরোপের ইহা চল্লিশ বৎসরের পুরাতন শিরঃশূল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতেই ইহার আরম্ভ। যুদ্ধ, অন্তর্বিপ্লব অথবা উৎপীড়নের ফলে ইউরোপের নানা দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী স্বদেশ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থামিলে প্রায় ১০-১২ লক্ষ লোক নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া যায়, কিন্তু তবুও ১৬।১৭ লক্ষ গৃহহারা নরনারী ইউরোপের নানা দেশে ছড়াইয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে যে, ইঁহারা ইঁহাদের প্রবাস-ভূমিতে আপনজন নহেন, একান্তই অনাত্মীয় আগন্তুক মাত্র। ইউরোপের এই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলির নিজেদেরই দিন চলা ভার, তাহার উপর আগন্তুকদের এই বিপুল শাকের আঁটি বহন করা তো তাহাদের পক্ষে একেবারেই মারাত্মক ব্যাপার।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে লীগ-অব্-নেশনস্ এবং ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত আই-জি-সি-আর (ইণ্টার-গবর্ণমেণ্টাল কমিটি অব্ রিফিউজীজ) তখনকার উদ্বাস্তুদের জন্য যথাসাধ্য

করিতেছিলেন। যুদ্ধশেষে ইউ-এন্-আর-আর-এ (অর্থাৎ সম্মিলিত-জাতিপুঞ্জের আর্তত্রাণ এবং পুনর্বাসন বিভাগ) এই কাজে যোগ দেন। পরে সম্মিলিত-জাতিপুঞ্জের মহাসভা (জেনারাল এসেম্বলী) ১৯৪৬ সনের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে সিদ্ধান্ত করেন যে এই কাজ সুষ্ঠুভাবে করিবার জন্য পৃথক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইবে, তাহার নাম হইবে 'আন্তর্জাতিক-শরণার্থী-সঙ্ঘ'। যত দিন উহা কাজে নামিতে না পারে, তত দিন কাজ চালাইবার জন্য পি-সি-আই-আর-ও (প্রিপ্যারেটরী কমিশন অব দি ইন্টারন্যাশনাল রিফিউজী অর্গানিজেশন) নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। এই সভা আই-জি-সি-আর এবং ইউ-এন-আর-আর-এ'র হাত হইতে শরণার্থী-সংক্রান্ত সকল কাজের ভার লন ১৯৪৭ সনের ১লা জুলাই তারিখে। ইঁহারা গোড়া বাঁধিয়া দিলে ১৯৪৮ সনের ২০শে আগষ্ট তারিখে ইরো আসিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়।

আঠারটি রাষ্ট্র এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য। ইহার খাস দপ্তর সুইজার্ল্যাণ্ডের জেনিভা শহরে। ২৭টি কেন্দ্রে ৫৬১০ জন কর্মচারীর সাহায্যে ইহার কাজ চালানো হইতেছে।

যে ষোল লক্ষ লোকের ভার ইঁহারা লইয়াছেন, তাহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই দেশছাড়া হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন লাখ মানুষ ফরাসী দেশে ছিল, বাকী সব ছিল ইংলণ্ডে, বেলজিয়ামে এবং হল্যাণ্ডে ছড়াইয়া। হোয়াইট-রাশিয়ান, আর্মানী, স্পেনীয় প্রজাতন্ত্রবাদী, নাৎসীতাড়িত ইহুদী ইত্যাদি নানা শ্রেণীর ও নানা জাতির লোক ছিল ইহাদের মধ্যে।

অপর প্রায় দশ লক্ষ নরনারী—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে অগণিত মানুষ দেশদেশান্তরে ভাসিয়া বেড়ায়, তাহারই এক অংশ। ইহার মধ্যে সাত লক্ষ জার্মানীর নানা অঞ্চলে আবদ্ধ ছিল। এই সমস্ত গৃহহারাদের মধ্যে আন্দাজ ৬০০০ আছে মধ্য প্রাচ্যে, আর বাকী সব ফ্রান্স, ইটালী, অষ্ট্রিয়া এবং বেলজিয়ামে। কেহ বা যুদ্ধের ভয়ে, কেহ বা উৎপীড়নের আশঙ্কায় নিজ নিজ দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছিল, কিন্তু অধিকাংশই এমন লোক যাহাদের নাৎসীরা নির্বাসিত করিয়াছিল অথবা বেগার খাটিবার জন্য চালান দিয়াছিল। বেশীর ভাগই পোলাণ্ড অথবা বাল্টিক রাজ্যসমূহের লোক, তাহা ছাড়া কিছু রুশ এবং যুগোস্লাভও আছে। মোট সংখ্যায় প্রায় এক-পঞ্চমাংশ ইহুদী।

গৃহহারাদের মধ্যে ইরোর সাহায্য কে পাইবে এবং কে পাইবে না, তাহা ইরোর সংবিধানতন্ত্রে সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা বসিয়া খাইতে চায় এবং যাহারা কেবলমাত্র জীবিকা অর্জনের সুবিধা হইবে বলিয়া দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছিল, তাহারা সাহায্য পায় না। আর পায় না জার্মানরা এবং দেশদ্রোহীরা।

যাহারা সাহায্য পাইবার যোগ্য, ইরো তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়া লইয়াছেন—শরণার্থী বা রিফিউজী, এবং উদ্বাস্তু অথবা ডিস্‌প্লেস্‌ড পার্সন। দুই শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদ মোটামুটি এই যে, যাহারা বাধ্য হইয়া দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছে তাহারা শরণার্থী এবং যাহাদিগকে ধর্ম, জাতি কিংবা রাজনীতিগত কারণে, অথবা বেগার খাটিবার জন্য, বলপূর্বক দেশান্তরিত করা হইয়াছিল, তাহারা উদ্বাস্তু। অনাথ শিশুরা শরণার্থী বলিয়া গণ্য।

এই গৃহহারাদের সম্বন্ধে আসল মুস্কিল এই যে, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, ইটালী ইত্যাদি যে যে দেশে ইহারা আছে, সেখানে এই বিপুলসংখ্যক মানুষের থাকা, খাওয়া এবং কাজের ব্যবস্থা হওয়া সুকঠিন। সুতরাং চলিয়া যাইতে হইবে সকলকেই, তা সে স্বদেশেই হউক কিংবা বিদেশেই হউক। হয় প্রত্যাবর্তন (রিপ্যাট্রিয়েশন), নয় পুনর্বাসন (রি-সেট্‌ল্‌মেণ্ট),—মান্যঃ পন্থা।

ঘরের লোক ঘরে ফিরিয়া যাওয়াই অবশ্য সবচেয়ে ভাল। ইরো কাজে নামিবার আগেই ৭০।৭২ লক্ষ লোক স্বদেশে ফিরিয়া যায়, সে কথা আগে বলিয়াছি। যাহারা যায় নাই, তাহারা নানা কারণে ঘরে ফিরিতে অনিচ্ছুক অথবা অপারগ। তাহাদের বুঝাইয়া রাজী করিবার জন্য ইরো ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে প্রতিনিধিদলকে উদ্বাস্তু-শিবিরে আনাইয়া প্রত্যেক দেশের বর্তমান অবস্থা উদ্বাস্তুদিগকে জানাইবার ব্যবস্থা করেন। তাহার ফলে কেহ দেশে ফিরিতে রাজী হইলে ইরো তাহাদিগকে কুড়ি দিনের খাবার সঙ্গে দিয়া দেশে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন। ১৯৫০ সনের ৩১শে আগষ্ট তারিখ পর্যন্ত এভাবে প্রায় ৭১০০০ উদ্বাস্তুকে ঘরে পাঠানো হইয়াছে। ইহার অর্দ্ধেকই পোলাণ্ডের লোক। হাজার চারেক চীনা মালয়, ব্রহ্মদেশ এবং ফিলিপাইনে প্রেরিত হইয়াছে।

বাকী রহিল যাহারা, দেশে ফিরিতে তাহাদের আপত্তি কি, ইরো তাহা বিবেচনা করিয়া দেখেন। যাহার আপত্তি অসার বলিয়া মনে করা হয়, সে দেশে ফিরিতে না চাহিলে ইরো তাহাকে আর কোনওরূপ সাহায্য করেন না। আর যাহাদের আপত্তি সঙ্গত বলিয়া গণ্য করা হয়, তাহাদের জন্য কোনও দেশে পাঠাইবার চেষ্টা চলিতে থাকে। 'সঙ্গত আপত্তি' কাহাকে বলে, তাহাও বলা আছে ইরোর সংবিধানেই। উৎপীড়নের ভয় তাহার মধ্যে একটি।

এই পুনর্বাসন প্রচেষ্টায় প্রথম কাজ দেশে দেশে আবেদন জানানো। ইরোর আবেদন ও অনুরোধের ফলে পৃথিবীর নানা দেশ হইতে প্রতিনিধিদল আসিয়া বাছিয়া বাছিয়া উদ্বাস্তুদের লইয়া যায়। যাওয়ার বন্দোবস্ত করেন ইরো। এই জন্য ইরো এক সময় ৪০ খানা জাহাজ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মাসে ৩০খানা ট্রেন স্থলপথে উদ্বাস্তুদের চলাচলের জন্য রাখা

হইয়াছিল। ইহার উপর সাধারণ যাত্রীবাহী ট্রেন, ষ্টীমার এবং এরোপ্লেনেও যত লোককে পাঠান যায় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ১৯৫০ সনের ৩১শে আগষ্ট তারিখ পর্য্যন্ত এই ভাবে প্রায় ৮০,৬০,০০ নরনারীকে ৮০টি বিভিন্ন দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহার মধ্যে এক আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই দেড় লক্ষাধিক মানুষকে আশ্রয় দিয়াছে। নূতন ইস্রায়েল রাষ্ট্র নির্ব্বিচারে সকল ইহুদীকেই স্থান দিতে সম্মত হওয়ায় সেখানেও প্রায় সওয়া লক্ষ লোক গিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়াছে সওয়া লক্ষের কিছু বেশী।

ইহারা প্রায় সকলেই কাজের লোক। কিন্তু এই নির্ব্বাচিত লোক ছাড়া বাকী লোকগুলি? বাকী লোকগুলি ইতোমই শুভ্রোভ্রষ্ট হইতে চলিয়াছে। এই শ্রেণীর মানুষকে লইয়াই মহা সমস্যা। এই শ্রেণীর মধ্যে যেমন আছে ১৭০,০০ বৃদ্ধ, রুগ্ন এবং বিকলাঙ্গ নরনারী, তেমনই আছে ২৬০০০ শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার এবং উকীল। ইহারা হাতের কাজ জানে না, সুতরাং অ-কেজো বলিয়া গণ্য হয়। একই কারণে শিশু এবং বালক-বালিকারা অবাঞ্ছনীয়। উপরন্তু যে সকল নরনারী নিজেরা সমর্থদেহ, অথচ রুগ্ন অথবা বৃদ্ধ পিতা মাতা স্বামী কিংবা স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাইবার অনুমতি না পাইয়া উদ্বাস্তু-শিবিরেই থাকিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে, এমন ৩০,০০০ হাজার লোকও এই শ্রেণীতেই পড়িয়াছে।

ইরোর চেষ্টায় এ বিষয়ে যে কিছু কিছু সুবিধা না হইতেছে তেমন নয়। পরিবারভুক্ত অক্ষম লোকের সংখ্যা খুব বেশী না হইলে সমস্ত পরিবারটিকে আশ্রয় দিতে কোনও কোনও দেশ সম্মত হইতেছে। কিন্তু সন্তানবতী বিধবাকে, ৪৫ বৎসরের অধিকবয়স্ক অসহায় কোনও মানুষকে এবং রুগ্ন ও বিকলাঙ্গ লোককে আশ্রয় দিতেছে খুব কম দেশই। এই দিক দিয়া উদারতা দেখাইয়াছে ফ্রান্স ৯৮০টি অতি বৃদ্ধকে স্থান দিয়া, সুদান ১৫০ জন যক্ষ্মারোগীকে আশ্রয় দিয়া এবং নরওয়ে কতকগুলি অন্ধ ব্যক্তিকে নিজ দেশে গ্রহণ করিয়া।

গৃহহারাদের যত দিন না স্বদেশে অথবা অন্যত্র পাঠাইয়া দেওয়া যায়, তত দিন তাহারা ইরোর তত্ত্বাবধানে থাকে। ১৯৫০ সনের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত মোট ১৪,৭৯,৬৪৪ জন মানুষ ইরোর হাতে আসিয়াছে। ঐ তারিখে ইরোর তত্ত্বাবধানে ছিল আন্দাজ ৫০,৭০,০০ নরনারী।

ইহাদের রাখা হয় নানা জায়গায় উদ্বাস্তু-শিবিরে। প্রত্যেক শিবিরের পরিচালনভার ন্যস্ত থাকে বাস্তুহারাদেরই নির্ব্বাচিত একটি সঙ্ঘের উপর। এই সঙ্ঘ খাদ্য বণ্টন করেন, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করেন, ছোটদের জন্য পাঠশালা এবং বড়দের জন্য কারিগরী বিদ্যালয় পরিচালনা করেন। শিবির-গুলির স্বাস্থ্যরক্ষার ভার ২৫০০ বাস্তুহারা চিকিৎসক এবং ১০০০ বাস্তুহারা নার্সের উপর। প্রায় দেড় লক্ষ উদ্বাস্তুকে নানা রকম কাজ দেওয়া হইয়াছে। হাতের কাজ জানা লোকের চাহিদা পৃথিবীর সর্ব্বত্র, তাই নানা জায়গায় কয়েকটি কারিগরী স্কুল এবং কৃষি-বিদ্যালয় ও এক জায়গায় একটি নৌ-বিদ্যালয় পর্য্যন্ত স্থাপিত হইয়াছে।

বিভিন্ন দেশের কতকগুলি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ইরোর কাজে খুব সাহায্য করিয়া আসিতেছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ফ্রান্সে আগত সমস্ত বাস্তুহারার ভার লইয়াছেন সে দেশের একটি প্রতিষ্ঠান (Service d'aide aux emigrants)। খরচটা অবশ্য ইরোই দিবেন।

ইরোর আর এক কাজ হারানো মানুষ খোঁজা। নাৎসীরা ত্রিশ লক্ষেরও বেশী লোককে তাহাদের ক্ষেত খামারে এবং কারখানায় কাজ করিবার জন্য ভিন্ন দেশে চালান দিয়াছিল, অথবা নানা কারণে দেশান্তরে বন্দী করিয়াছিল। তাহারা সকলে এখন নিখোঁজ। ইহাদের খোঁজ লওয়ার জন্য প্রায় ৪২,৭০,০০ আবেদন পাইয়া ইরো একটি নূতন বিভাগ খুলিয়াছেন। তাহার নাম ইট্‌স্ অর্থাৎ ইণ্টারন্যাশনাল ট্রেসিং সার্ভিস। জার্ম্মানীর এরোলসেন নামক স্থানে ইহার দপ্তর। এই বিভাগ এ পর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের সন্ধান পাইয়াছেন। তাহা ছাড়া পঞ্চাশ হাজারেরও বেশী লোকের নিশ্চিত মৃত্যুর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। আন্দাজ আড়াই হাজার শিশুকেও সনাক্ত করা হইয়াছে। ইরোর নথিপত্রে ৪৬ লক্ষ নরনারীর বিবরণ সংগৃহীত এবং লিপিবদ্ধ হইতেছে।

ইরোর খরচ চলে সদস্যরাষ্ট্রগুলির দেওয়া চাঁদায়। প্রথম বৎসরে যে ১১ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার চাঁদা পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে ৭ কোটি ১০ লক্ষই দেয় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। সব দেশের চাঁদা টাকায় পাওয়া যায় না, জিনিষ অথবা কাজের মূল্য দিয়া তাহার হিসাব হয়। যথা, ইংলণ্ড হয়ত জাহাজ দিল, বেলজিয়াম তাহা মেরামত করিয়া দিল, হল্যাণ্ড তাহাতে ভরিয়া দিল খাদ্যদ্রব্য। এই প্রত্যেকটি কাজের এবং জিনিষের মূল্য ইংলণ্ড, বেলজিয়াম ও হলাণ্ডের নামে ইরোর খাতায় চাঁদার ঘরে জমা হইল।

প্রথমে আশা করা গিয়াছিল যে, ইরো ১৯৫০ সনের জুন মাসের মধ্যে কাজ শেষ করিতে পারিবেন। তাই ইঁহারা প্রথমে দুই বৎসরের মেয়াদে কাজে নামেন। কিন্তু কাজ তখনও অনেক বাকী দেখিয়া ইরোর আয়ুষ্কাল ১৯৫১ সনের ১লা এপ্রিল তারিখ পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই তারিখের পর সম্মিলিত-জাতিপুঞ্জ সরাসরি এই বাস্তু-হারাদের ভার লইবেন এরূপ নির্দ্ধারিত হয়। কাজ বুঝিয়া লইবার জন্য ১৯৫১ সনের ১লা জানুয়ারী তারিখেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ একজন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করেন। তাঁহাকে বলা হয় হাই-কমিশনার ফর রিফিউজীজ।

ইরো কাজ করিয়াছেন অনেক। লক্ষ লক্ষ গৃহহারা আজ

আশ্রয় পাইয়াছে ইহাদের চেষ্টার ফলে। কিন্তু বাস্তুহারাদের যে বিরাট অংশ এখনও পড়িয়া আছে, তাহাদের স্থায়ী আশ্রয়-স্থলের কোন ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। তবু এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটি দেশ-দেশান্তরে উহা খুঁজিয়া ফিরিতেছেন।

সম্ভাবনা

(বাস্তব চিত্র)

শ্রীঅঞ্জলি সরকার

অসময়ে কে ডাকে? কাজের মাঝখানে বিরক্তি নিয়ে উঠে আসতে হ'ল। দরজায় ওপিঠে দাঁড়িয়ে অল্পবয়সী একটি বউ। ছোট্ট কপালে বড় সিঁদুরের টিপ, সিঁথি লাল টুকটুক করছে। আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে বিনা ভূমিকায় সে বললে, আপনাদের বাড়ীতে ছোট ছেলেমেয়ে আছে? আমি পড়াতে চাই।

এরকম জীবন্ত বিজ্ঞাপনের সাক্ষাতে একটু থাবড়ে গেলাম। নীরব বিস্ময়ে মাথা নাড়লাম—নেই? ওঃ। সেও দাঁড়িয়ে আছে, আমিও। ভাল করে তাকে পর্য্যবেক্ষণ করে নেবার সময় পেলাম একটু। পঁচিশের এধারেই বয়স। তেলজল সাবানের অভাবেও গায়ের রং সবটা ঢাকা পড়ে নি। শাড়ীখানা ন্যাকড়ার মত গায়ে লেপটে রয়েছে, ফেঁসে-যাওয়া ব্লাউজটা ঢলঢল করছে। রোগা নয় তবে শুকিয়ে যাওয়া চেহারা; কোঁকড়ানো চুলের গোছা টেনেটুনে বাঁধা। কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা আছে, কিন্তু তা রসহীন নয়। মুখখানায় লাবণ্য আছে, হাসিখুশী ভাব আছে, আছে তেজস্বিতার আভাস।

কোথা থেকে আসছেন আপনি? কেউ পাঠিয়েছেন?

না। আমি পাকিস্থান থেকে এসেছি। কিছু খেতে দেবেন আমায়? চার দিন ভাত খাই নি—বড্ড মাথা ঘুরছে।

বুঝলাম ভনিতার ধার ধারে না মেয়েটি। চা-রুটি খেতে দিলাম। চৌকাঠের ধারে পিঁড়ি পেতে বসে খেতে খেতে সে আত্মকাহিনী সুরু করলে। কথায় কথায় কিন্তু দক্ষিণ হস্তের ক্রিয়া চলতে লাগল সমান তালে। একান্ত মনোযোগ দিয়ে চায়ের শেষ তলানিটুকু, রুটির শেষ গুঁড়োটুকু চেটেপুটে নিঃশেষ করলে। 'যা দেবী ক্ষুধারূপেণ'—তাঁকে প্রত্যক্ষ করলাম। পঞ্চাশের মন্বন্তরের স্মৃতি আপনা থেকেই মানস-পটে ভেসে উঠল।

নাম বিভাবতী বন্দ্যোপাধ্যায়। ঢাকার স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেছে। আট বছর আগে বিয়ে হয়েছিল ফরিদপুরে। স্বামী গ্র্যাজুয়েট, কলকাতার ছাত্র। পাকিস্থান এরা ছেড়েছে আহত হয়ে নয়, আতঙ্কিত হয়ে। তিন বছরের পুত্রসন্তান, বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ী, অবিবাহিতা ননদ—সবাই আশ্রয় নিয়েছে মেদিনীপুরে বিবাহিতা ননদের ছাপোষা সংসারে। আশ্রিত এবং আশ্রয়দাতা এ দু'পক্ষে কি সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে সেটা আঁচ করতে পারছি। দরদী শ্রোতা পেয়ে বউটির মনের অর্গল খুলে গেল, সে বলে চলল—দেশে স্বামীর কাপড়ের দোকান ছিল। বাপের বাড়ীতে বিশেষ কেউ নেই। আপাততঃ ল্যান্সডাউন রোডে কোন এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ীতে একখানা ঘর পাওয়া গেছে বাইরের দিকে। অন্দরে আনাগোনা করাটা ওপক্ষের বাঞ্ছিত নয়, কাজেই স্নানাদি রোজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। কোন কোন দিন পাড়াপ্রতিবেশীর বাড়ীতে ব্যবস্থা করতে হয়। পেট ভরে খাওয়া কি তা ওরা ভুলে গেছে, কোন দিন কষ্টে সংগৃহীত চিঁড়ে জলে ভিজিয়ে খাওয়া। সঙ্গে আনা যৎসামান্য টাকাকড়ি যথাসময়েই নিঃশেষিত হয়েছে। যেদিন যেমন পারে আত্মীয়-বন্ধু-পরিচিতের বাড়ীতে অন্ন গ্রহণ করে আর অর্থাগমের পথ খুঁজে বেড়ায়। শিক্ষিত স্বামীকে এগিয়ে দিয়ে নিজে পিছনে পড়ে থাকবার মত মনোবৃত্তি তার নয়। তাই কাজের সন্ধানে সারা শহর চষে বেড়ায়, যেদিন যেখানে দাঁতে কাটবার যেটুকু পায় তাতেই সন্তুষ্ট। এক পরিচিত ভদ্রলোক বিনা মাইনেতে কোন্ একটা কমার্সিয়াল স্কুলে টাইপরাইটিং শেখার বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন।

আত্মপরিচয়ের পালা শেষ করে তিনটে আবেদন জানাল বউটি:—চার দিন এবং এরকম চার দিন বহু বারই তার বিড়ম্বিত জীবনে এসেছে—সে ভাতের স্বাদ গ্রহণ করে নি, যদি এক গ্রাস ভাত দিতে পারি। পরণের কাপড় ছাড়া আর কাপড় নেই, যদি একখানা কাপড় দিতে পারি। লেখা-পড়া যখন কিছু শিখেছে তখন যেন একেবারে ভিক্ষা করতে না হয়, যেখানে হোক, যে ধরণের হোক, কাজ যদি একটা দিতে পারি।

কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই, আশাভরা প্রাণ আত্মশক্তিতে ষোল আনা বিশ্বাস, আত্মসম্মান মাথা উঁচু করে নিজেকে প্রচার করছে, বিস্তৃত জীবন পড়ে আছে সামনে। যতগুলি মহিলা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ পরিচয় ছিল, সেগুলির নাম ঠিকানা দিলাম, দু'এক জনের নামে চিঠিও লিখে দিলাম তার হাতে। পুরনো-শাড়িপুরে শাড়ী একখানা দেওয়া গেল, একবেলা

ভাত খেল আমাদের ঘরে। এর পরে আরও ক'দিন এসেছে, আরও হয়ত আসবে, হয়ত আসবে না। সেবা-সমিতিগুলো যথাসম্ভব সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হবে না। কিন্তু সে তো সাময়িক সাহায্য মাত্র। সমাজগত জীবনের একদিককার কাটল দিয়ে মনুষ্যত্ব চুঁইয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বাঁধ দিয়েও তার নিম্নগতি আটকানো যাচ্ছে না—অন্য দিকে আমাদের অনবধানতা অক্ষমতার দরুন মানবতা লাঞ্ছিত হচ্ছে, নারীত্বের হচ্ছে ঘোর অবমাননা। চাকরী খুঁজে, সাহায্য প্রার্থনা করে, করুণাপ্রত্যাশী হয়ে দরজায় দরজায় ঘুরে ঘুরে এই বিপুল সম্ভাবনা শুধু শূন্যের অঙ্ক বাড়িয়েই চলবে, এই দেখতে হবে?

২

দেখতে দেখতে মনে পড়ে গেল কিছুদিন আগের দেখা আর একজন বাস্তুত্যাগী মহিলার কথা। ব্রজবাসিনী দেবী। বিভাবতীর পিতামহীর বয়সী। ব্রাহ্মণী। পিতামাতা সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ ছিলেন। অতি বাল্যকালে বিবাহ হয়। শ্বশুর জ্ঞানচর্চ্চায় জীবন কাটিয়েছেন। স্বামী লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ছিলেন পূর্ব্ববঙ্গে। অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সে অপঘাতে তাঁর জীবনাবসান হয়। কালের গতির সঙ্গে তাল রেখে একাধিক পুত্রকন্যাকে মা নিজের সবটুকু সামর্থ্য দিয়ে বৃহত্তর জগতে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র পূর্ব্ববঙ্গের কোন কলেজে অধ্যাপনা করতেন। বিবাহ করেছেন। অন্যান্য পুত্রকন্যাদের কেউ ইঞ্জিনীয়ারিং, কেউ বি-এ, কেউ আই-এস্‌সি পড়ে। এক কন্যার বিবাহ দিয়েছেন নোয়াখালিতে। ভরা সংসার—খুশী মন। কি একটা ছুটি উপলক্ষ্যে অধ্যাপক-পুত্র আর তার ছুটি সন্তান বাদে মা আর সকলকে পাঠালেন নোয়াখালিতে—মেয়েকে দেখতে, তার নবজাতককে অভিনন্দন জানাতে। সেখানে পৌঁছবার পর তৃতীয় দিনে পাকিস্থানী তাণ্ডবে তাদের সবাইকে আত্মাহুতি দিতে হ'ল।

মা আর ছেলে বাড়ীতে বসে এক দিন জানলেন—তাঁদের গৃহ হয়েছে শ্মশানে। অধ্যাপক উন্মাদ হয়ে গেলেন, তাঁকে আমরা দেখি নি। মাকে দেখেছি। তাঁর অবস্থা দেখলে মনে হয় এর চেয়ে পাগল হওয়াও ছিল ভাল। বুকের ভেতর কত বড় হাহাকারকেই না তিনি চেপে রেখেছেন। কিন্তু তিনি যে মা—অক্ষম পুত্র আর নাবালিকা ছুটি পৌত্রী—তাঁরই স্নেহ-নীড়ে মাথা গুঁজে, চোখ বুজে থাকতে চায়। মায়ের সহজাত বৃত্তি অসহনীয় পরিস্থিতিতে সমতা এনে দিয়েছে।

এখন তিনি পূর্ব্ব বাংলার দেশের বাড়ীতে ছেলেকে রেখে এসেছেন বিশস্ত লোকের তত্ত্বাবধানে। নাতনী ছুটি হাওড়ার এক পরিবারে আশ্রিতা। মহিলাটি নিজে থাকেন কখনও বালিগঞ্জ ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে, কখনও কারো বাড়ীর বারান্দার রোয়াকে।

চাল আটা পয়সা—যা উপার্জ্জন করতে পারেন হাওড়ায় পৌঁছে দিয়ে আসেন—নিজের ভিক্ষায় ভরসা। দেশে ক্ষেতখামার, জমিজমা প্রাচুর্য্য বুকে নিয়ে পড়ে আছে। সে মাটিতে খাঁটি সন্তানের স্থান নেই—আছে দখলকারীর জুলুম। বালীগঞ্জ থেকে হাওড়া, বেহালা থেকে শেয়ালদা অনেকবার ঘুরে এসেছেন সামান্যতম সুবিধার আশায়। কিন্তু মরীচিকা তৃষ্ণা বাড়ায়ই, মেটায় না। সর্ব্বস্বান্ত বিধবার ব্যবস্থা কিছু হয় নি। দেহের মধ্যে শক্তি সঞ্চিত ছিল, বাষ্প হয়ে উবে গেছে।

এই ব্রাহ্মণ-রমণীর তেজস্বিতা বেদনায় ম্লান হয় নি, বেদনাকে ভাস্বর করেছে। ভাগ্যের কাছে নিজেকে নীচু হতে দেন নি। আত্মসম্মানবোধকে তুলে ধরে ভাগ্যের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চেয়েছেন। দুশমনকে অভিশাপ দেন না, কিন্তু বিধিলিপির কাছেও দাসখৎ লিখে দেন নি। চূড়ান্ত দুর্বিপাকের সঙ্গে যুঝে চলেছেন। অদৃষ্ট নিয়তি হয় ত তাঁকে বাঙ্গ করে। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থা তাঁকে ভীত করতে পারে নি।

ভদ্রী বিভাবতী, জরাজীর্ণা ব্রজবাসিনী দেবী পুবাল বন্যায় একজন নয়, দু'জন নয় রাশি রাশি ভেসে এসেছে। সমাজ কি দাঁড়িয়ে থাকবে এ বন্যা-স্রোতের দর্শকমাত্র হয়ে? এদের জন্যে সমাজের বুকে দরদ যদি না জাগে তা হলে শুধু সরকারের চেষ্টায় আর কতদূর হতে পারে?

যে সংস্কারের প্রেরণা বিভাবতীকে ভিক্ষা করে খেতে নিষেধ করেছে, যার অনুপ্রাণনায় অপর্য্যাপ্তা ব্রজবাসিনী দেবী মহানগরীর কুটিল পথে মাথা উঁচু করে চলছেন সে সঞ্জীবনী শক্তি আজ হয়ত তাদের সুরাহা করতে পারছে না। কিন্তু বন্দিনী বিদ্যুল্লেখাই ত বজ্রদানবকে দীর্ঘ দিনের মত বাঁচিয়ে রাখে। বাঁধে আটকানো দামোদর ময়ূরাক্ষী মরুপ্রান্তরে স্বর্ণোদ্যান রচনা করবার ক্ষমতা রাখে। তেমনি এই অপ-ব্যয়িত, অনাবৃত, উপহসিত নারীশক্তিকে কল্যাণের পথে ঠিক পরিচালিত করলে বা তার পূর্ণ শক্তিকে সমাজ যন্ত্রের অন্তস্তলে প্রয়োগ করলে অন্ধ পঙ্গু মনুষ্যত্ব পুনরুজ্জীবিত হবে না কেন? নারীত্বের মহিমাকে বাঁচিয়ে রাখতে যারা এত-খানি দিতে পেরেছে তাদের বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করে আমরা অমৃতত্বের সেতু রচনা করতে পারব না কেন?

বাঙালীর কথা বাঙালী না ভাবিলে কে ভাবিবে?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

বর্ত্তমানে বাঙালীজাতির ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত। কতকটা ঘটনাচক্রের প্রভাবে, কতকটা সম্প্রদায়বিশেষের অত্যাচারে, কতকটা ভারতরাষ্ট্রের অন্যান্য জাতির ঈর্ষায়, আর অনেকটা নিজেদের বুদ্ধির দোষে ও শ্রম-বিমুখতার ফলে বাঙালীর বর্ত্তমান অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আজ পূর্ব্ববঙ্গের বাঙালী হিন্দু উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে কাহার দোষে? যখন হাতে ক্ষমতা ছিল, যখন প্রতিকারের পথ ছিল তখন "ইংরাজ তাড়াও," "ইংরাজ তাড়াও" রবে আমরা চিৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়াছি। আর আজ পণ্ডিত জবাহরলাল বাঙালীর দুঃখ বুঝিতেছেন না, এই সেদিনও সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বাঙালী শুধু কাঁদিতে জানে বলিয়া বাঙালীজাতি সম্বন্ধে অবজ্ঞাসূচক উক্তি করিয়াছিলেন। আর আমরা, বাঙালীরা নিশ্চিত ধ্বংসের পথে আগাইয়া চলিয়াছি, কিন্তু প্রতিকারের কোনও চেষ্টা নাই, হা-হুতাশই আমাদের একমাত্র সম্বল! বাঙালীর আজ সে আত্মপ্রত্যয় কোথায়?

বাঙালীজাতি গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত কতকগুলি শ্লোগান বা বুলি আওড়াইয়া চলিয়াছে। কয়েক জন নেতাকে সমগ্র বাঙালীজাতির তরফে চিন্তা করিবার আমমোক্তার-নামা দিয়া বাঙালী বহুদিন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়াছিল। ফলে আজ গভীরভাবে চিন্তা করিবার শক্তিও সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। অপ্রিয় সত্য কথা বলিতে বাঙালী নেতা, বাঙালী ধনী শিক্ষিত ব্যক্তি সকলেই ভয় পান। কিন্তু চোখ-কান বন্ধ করিয়া মৌনব্রত অবলম্বন করিলেই ত আর সমস্যার সমাধান হয় না বরং উত্তরোত্তর তাহা জটিলতর হইতে থাকে। সেইজন্য আমাদের বর্ত্তমান সমাজে প্রকৃত গলদ কোথায় সেগুলি এক একটি করিয়া চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া উচিত। তবেই তো সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর হইবে, আবিষ্কৃত হইবে প্রকৃত কল্যাণের পথ। আমরা এখন এমন একটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিব, অপ্রিয় হইলেও যাহা সত্য।

ভারত-বিভাগের পর হইতেই দলে দলে হিন্দুরা সেই যে পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ সুরু করিয়াছিল তাহার অবসান এখনও হয় নাই। গোড়ার দিকে পূর্ব্ববঙ্গ-ত্যাগের হিড়িক এত ব্যাপক হয় নাই, এবং সমস্যা সমাধানের জন্য দিল্লী চুক্তির মত কোন উপায়ও তখন উদ্ভাবিত হয় নাই। ভারত-বিভাগের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কাল হইতে ইংরেজী ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত যাহারা পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রীসভা একটি নির্দ্দেশ দেন। তদনুযায়ী জনৈক পাকিস্থানবাসী হিন্দু বহু কোষ্ঠা সম্বলিত একটি সুলিখিত রিপোর্ট দাখিল করেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, গবর্ণমেণ্ট এই রিপোর্টটি ছাপাইয়া সাধারণে প্রচার করেন নাই—যদিও এই রিপোর্ট পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে। বর্ত্তমান লেখকও এই রিপোর্টের একখণ্ড সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উদ্বাস্তু-পরিবারের লোকেরা কিরূপে বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে উক্ত রিপোর্টের ৪০ পৃষ্ঠায় তাহার একটি হিসাব আছে। তাহার অংশবিশেষ আমরা নিম্নে তুলিয়া দিলাম:

একই উদ্বাস্তু-পরিবারের লোকসমূহ—

	এক স্থানে আছে	দুই স্থানে আছে	তিন স্থানে আছে	তিনের অধিক স্থানে আছে
শতকরা হিসাবে	৬০.৯	৩১.৫	৫.৯	১'৬. = ১০০

এইরূপে একই পরিবারের লোকসমূহ বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ার কি কুফল হইয়াছে তাহা সরকারী রিপোর্টে প্রদত্ত তথ্যাদি উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব। যে সকল উদ্বাস্তু-পরিবার নিজেদের বাড়ীতে, মায় সরকারী সাহায্যে নির্ম্মিত কুঁড়ে ঘরে বাস করেন তাঁহাদের অনুপাত শতকরা ৭'৩; ভাড়া বাড়ীতে বাস করেন শতকরা ৪৭'৮ জন; আত্মীয় কুটুম্বের সহিত বাস করেন শতকরা ৯'৫। সরকারী রিপোর্টের নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে এই সব ছিন্নমূল নরনারীর জীবনের একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক পাঠকদের নিকট উদ্ঘাটিত হইবে।

"The above picture of distribution, however, scarcely gives an adequate picture of the hardship which refugees are undergoing in the matter of accommodation.

* * * *

"As to those living in rented accommodation or accommodation provided by relatives, conditions were in many cases even worse. Cases came to light during the survey where as many as 19 members of two related families were residing in one room 16' × 12' with a strip of verandah. Half the people had to sleep in the room for some hours of the night, and others during the remaining hours. In another case a family of 7 was living in a *Kutcha* hut 12' × 9' in size. They had constructed a dias with split bamboos and the children slept on this platform while adults slept below. There were hundreds of other cases where people were living in such wretched condition, specially in greater Calcutta area and the few places where concentration of refugees have been very heavy.

"The serious over-crowding mentioned above was also affecting the morals of refugees to an alarming extent. More than one married couple have been found to occupy the same room; father and mother in the prime of life were occupying the same room with grown up sons and daughters; grown up boys and girls,

nominally related were found living in same room and *sometimes in different parts of same bed.* (italics ours).

"The difficulties of accommodation were having other pernicious effects. Helpless refugees had been compelled in many cases to take shelter in houses of more or less nominal relatives with grown up girls and young women. In many cases for want of sufficient accommodation in the relatives' houses adult male members had to live in boardings and messes. Not unoften such male members have to reside far away for their service or business. In many such cases, young men of the families of relatives who had given shelter *were taking advantages of the protected women and girls.* (Italics ours). Such cases are naturally not reported and it was only from scandals which had become known to neighbours that such matters came to the notice of investigators.

"Even more numerous have been cases where refugee earners were compelled to leave families with women and children in rented premises—inhabited by a large crowd—separate families (including landlords in many cases) residing in different rooms, using common watertap, latrine, roof, stairs, etc."

Paras 121-123 of the Report at p. 68.

আমরা ইহার বঙ্গানুবাদ ইচ্ছা করিয়া দিলাম না। এই রিপোর্টে যে সময়ের কথা বলা হইয়াছে তখনকার চেয়ে বর্ত্তমান অবস্থা শত গুণ অধিক শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে শিয়ালদহ ষ্টেশনে উদ্বাস্তু নারীদিগকে অর্থের বিনিময়ে দেহ বিক্রয় করিতে বাধ্য করিয়া কতকগুলি বিবেক-হীন লোক যে কি বিপুল ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিয়াছিল সংবাদ-পত্রে তাহার কিছু কিছু বিবরণ অনেকেই পড়িয়াছেন। আমরা এই ঘটনাগুলিকে হয় সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম, না না হয় "ছোটলোকী" কাণ্ড বলিয়া ধামাচাপা দিবার চেষ্টা করি। বৈঠকখানায় বসিয়া চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে "ধিক্কারজনক" কাণ্ড দেখিয়া নাক সিটকাই।

কিন্তু সংবাদপত্রে কয়টাই বা বিবরণ প্রকাশিত হয়, ভিতরে ভিতরে নারী-দেহকে পণ্য করিয়া দুর্বৃত্তেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির এই যে বিরাট আয়োজন করিয়াছে তাহার কতটুকু খোঁজ আমরা রাখি? কেন এইরূপ হইতেছে, কি করিয়া এই সব অত্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার বন্ধ করা যায় তাহার আলোচনা হয় না কেন? দোষীদের ধরিবার বা শাসন করিবার কি ব্যবস্থা হইতেছে সে সম্বন্ধে আমরা ত মাথা ঘামাই না। আর আমাদের তথাকথিত নেতারা বিষয়টির গুরুত্ব বুঝিয়াও ইহা লইয়া আন্দোলন করিলে সস্তা হাততালি পাইবেন না বা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিবে বলিয়া চুপচাপ। বাস্তুহারার নাম করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে, লম্বা চওড়া বক্তৃতা হইতেছে; বহু 'বাস্তুঘুঘু'র স্বার্থসিদ্ধি হইতেছে, পূর্ব্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের দ্বন্দ্ব হইতেছে; কিন্তু কৈ, জাতীয় চরিত্র যাহাতে নষ্ট না হয়, মাতৃ-জাতির যাহাতে অ-কল্যাণ না হয় সে সম্বন্ধে ত কাহাকেও কোনও কথা বলিতে বড় একটা শুনি না।

বাংলার নারীজাতির প্রকৃত হিতৈষী কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি কয়েকজনের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই কি বাংলার নারীজাতির সকল দুর্দ্দশার অবসান হইয়াছে, যাবতীয় সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে? বাঙালী হিন্দু কি মরিয়া গিয়াছে, না মোহ-ঘোরে অচেতন হইয়া আছে? কেবল উদরপূর্ত্তি আর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথা ভাবিলেই কি সব সমস্যার পূরণ হইল? উদ্বাস্তদের কিছু কিছু টাকা "dole" স্বরূপ ভিক্ষা দিলেই কি সব হইল? পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু নেতারা সবাই এ বিষয়ে চুপচাপ কেন? নারীজাতি দুর্গতির হাত হইতে যাহাতে রক্ষা পায়, নারীত্বের অপমান যাহাতে না হয় তাহার জন্য কি চেষ্টা হইতেছে দেশবাসীর তাহা জানা আজ একান্ত প্রয়োজন। কি পশ্চিমবঙ্গের, কি পূর্ব্ববঙ্গের সকল হিন্দু নেতার কাছেই আজ আমার এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি।

আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে যাহা মনে আসিয়াছে তাহা এইখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইহা সম্পূর্ণ বা সামগ্রিক সমাধান নহে। মনে হয় উদ্বাস্তদের অবিলম্বে পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করিলে ও যাহাতে এক একটি উদ্বাস্তু-পরিবারের সব লোককে একই জায়গায় রাখিয়া পুনর্ব্বসতির বন্দোবস্ত হয় সে বিষয়ে চেষ্টা করিলে এই সমস্যার সমাধান সহজসাধ্য হইবে। পুনর্ব্বাসনের উদ্দেশ্যে উদ্বাস্তু-দের জন্য সরকার কর্ত্তৃক যে ধরণের বাসগৃহ নির্ম্মিত হইতেছে তাহা রেল কোম্পানীর নির্ম্মিত কুলি বস্তির একটু উন্নত সংস্করণ মাত্র। উদ্বাস্তরা যাহাতে ভদ্রভাবে পারিবারিক জীবন যাপন করিতে পারে তদুপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় কথা, যে সব স্থলে উদ্বাস্তদের ভিড় বেশী সেখানে নারী-উদ্বাস্তদের রেজিষ্ট্রেশন ও তাহাদের সম্বন্ধে 'রোলকলে'র ব্যবস্থা করা উচিত। নারী পুলিস সৃষ্টি কি জন্য হইয়াছে যদি নারীজাতির রক্ষাকল্পে তাহারা উপযুক্তভাবে নিয়োজিত না হয়? যে সব নারীর আচরণ নারী-পুলিসের মনে সন্দেহের উদ্রেক করিবে তাহাদিগকে উপযুক্ত সরকারী কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে আলাদা ক্যাম্পে রাখার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, যাহারা উদ্বাস্তু-নারীদের অসহায়তার সুযোগ লইয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধনে তৎপর সেই সকল দুর্নীতি-পরায়ণ লোকের জন্য কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। প্রয়োজন মনে হইলে নূতন আইন পাস করিতে হইবে আর এই আইন যথাযথ ভাবে প্রযুক্ত হইতেছে কি না তাহা দেখিবার জন্য নূতন পদ সৃষ্টি করিয়া উপযুক্ত চরিত্রবান্ ব্যক্তি-দের নিযুক্ত করিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমস্যা সমাধানের উপায় বাহির করিবার জন্য যদি সরকারী ও বেসরকারী লোক লইয়া একটি কমিটি গঠন করেন তো তাহাদ্বারা বিশেষ সুফল লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে।

মৃগতৃষ্ণিকা

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

স্বাধীনতার পর প্রায় চার বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এই চারি বৎসরে দেশবাসীর দৈহিক ও মানসিক অবস্থা যেরূপে দ্রুত অবনতির পথে চলিয়াছে তাহা অতিশয় আশঙ্কাজনক। অধিকাংশ লোকই এ বিষয়ে চিন্তা করার অবকাশ রাখেন না, কেবলমাত্র আক্ষেপ এবং নিষ্ফল অভিযোগে মনকে সান্ত্বনা দিবার বিফল প্রয়াস করেন। কিন্তু চিন্তা করা এখন নিতান্তই প্রয়োজন। এভাবে নিরুদ্দেশ যাত্রায় পথ চলিলে শেষে ধ্বংস যে অবশ্যম্ভাবী তাহাতে সন্দেহ নাই। বাংলা ও বাঙালীর এ বিষয়ে শুধু চিন্তা করার কারণ আছে তাহাই নয়, এসম্পর্কে কর্ত্তব্যজ্ঞানও উদ্দীপ্ত হওয়া প্রয়োজন। কেননা বর্ত্তমানে বাঙালীর অবস্থা যাহাই হউক অতীতে সমস্ত জাতি ও দেশের প্রগতি-পথের সন্ধান বাঙালীই দিয়াছে এবং ভবিষ্যতে তাহাকেই দিতে হইবে। অন্য কাহারও এ বিষয়ে ঐরূপ জ্বলন্ত উদ্দীপনা নাই, আত্মোৎসর্গের কামনাও নাই।

দুঃখের বিষয়, আজ বাংলাদেশ বিভক্ত এবং নেতৃত্ব-বিহীন। দেশ বিভাগ ইতিপূর্ব্বেও একাধিকবার হইয়া গিয়াছে; কার্জ্জনের বিভাগের পরও আসাম পৃথক হইয়াছে বাংলার অংশ লইয়া, বিহার পৃথক হইয়াছে বাংলার বিরাট অংশ লইয়া, কিন্তু দেশে দৃঢ়চেতা মনীষী-সজ্জন থাকায় দেশের লোক উদ্‌ভ্রান্ত ও অবসাদগ্রস্ত হইতে পারে নাই, আশার আলো স্তিমিত হইলেও নির্ব্বাপিত হয় নাই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্দীপনা ছিল, বৃথা হা-হুতাশে সময় কাটায় নাই দেশের সকলে।

সম্প্রতি কিছু দিন যাবৎ বাংলার চিন্তার স্রোতে ভাটা পড়িয়াছে। যাঁহাদের খ্যাতি আছে, মানসিক শক্তির প্রতিপত্তি আছে, সাহিত্য, দর্শন বা অন্য সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, তাঁহারাও যেন বিদ্যাবুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান-বিসর্জ্জন দিয়াছেন। এখন প্রয়োজন দেশের লোককে ক্রমাগত উপদেশ দেওয়া সচেষ্ট হইতে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে এবং পৌরুষের পথে ফিরিয়া সক্রিয়ভাবে আত্মোদ্ধারের ব্যবস্থা করিতে। দেশের লোককে শুনাইতে হইবে পুরুষসিংহের গর্জ্জন, মৃতবৎসা গাভীর বিলাপে দেশ সজীব হইবে না।

বলা বাহুল্য যে, বাঙালীকে জাগাইতে হইলে কেবলমাত্র পরনিন্দায় ও পরশ্রীকাতরতায় চতুর্ম্মুখ হইলেই শুধু চলিবে না। নিজে জড়ভরত হইয়া বসিয়া মহাপুরুষের আবির্ভাবের জন্য নিশ্চেষ্টভাবে অপেক্ষা করিলে মহাপুরুষ আসিবেন কিনা জানি না, দেশ মহাশ্মশানে পরিণত হইবেই সে বিষয়ে সন্দেহমাত্রের অবকাশ নাই।

বাংলা ও বাঙালী বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত ও মরণের সম্মুখীন একথা সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছে সুতরাং সেকথা বলা অবান্তর। বাঙালী যে পথে চলিয়াছে সে পথ যে চরম অবনতির ও আত্মবিনাশের পথ সে কথাও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝেন, কিন্তু "তোমার কোনও দোষ নাই, তুমি পরের দোষে জাহান্নামের পথে চলিতেছ" এ জাতীয় অহিফেন তাহাকে সেবন করাইলে তাহার ধ্বংসের সময় কি আরও দ্রুত অগ্রসর হয় না?

উদাহরণ-স্বরূপ একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির অভিভাষণ হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাউক:

"আমি যে বাংলা ও বাঙ্গালীর সম্বন্ধে এমন উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে কি সত্যই ভারতের প্রতি অপরাধ করা হইয়াছে? আমিই যদি না বাঁচি তবে ভারতপিতার জন্য ভাবিবার কোন কারণ আছে? 'আপনি বাঁচিলে তবে তো বাপের নাম।' তারপর, আজিকার এই যে ভারত, তাহা তো আমার সেই ধ্যানের ভারত নয়—যে ভারতকে বাঙ্গালী কবি-ঋষি ও মনীষিগণ তাঁহাদের প্রেম ও প্রতিভাবলে—শুধুই দেশ-দেবতা নয়—বিশ্বদেবতার মূর্ত্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, আজিকার এই বানিয়া-তন্ত্রের ভারত—অহিংসার গজমুণ্ডধারী, ধনলুণ্ঠনস্ফীত-লম্বোদর, ব্ল্যাকমার্কেটরূপী-মূষিকবাহন, গণেশ-মার্কা ভারত—কি সেই মহাভারত, সেই পার্থসারথির ভারত? যে ভারতের নামে, বাঙ্গালী আপনারা এখনও ভাববিভোর হইয়া উঠেন—ইহা সেই ভারত নয়; সে বাঙ্গালীরই স্বপ্নলব্ধ ভারত; সে স্বপ্ন এখনও সফল হয় নাই, বরং তাহাকেই চূর্ণ করা হইয়াছে। যদি বাঙ্গালী আর বাঙ্গালী হইয়াই বাঁচিয়া না থাকে, তবে ভারতও মরিবে—অন্ততঃ ভারতের আত্মা যে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহই আর নাই। অতএব, আমি যে বাঙ্গালীর জন্যই কাঁদি, তাহাতে ভারতের অকল্যাণ হয় না; বরং আমার সেই ভারতভক্ত পিতৃপিতামহগণ আমার ঐ প্রতিবাদকেই আশীর্ব্বাদ করিবেন।

সর্ব্বশেষে, বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার ঐ নৈরাশ্য। আমি বাঙ্গালীর যে অতীত ও বর্ত্তমান আপনাদের সম্মুখে ধরিয়াছি, তাহাতে ভারতপ্রেমিকেরা পুলকিত হইয়া উঠিবেন, অন্ততঃ হওয়াই কর্ত্তব্য। এই জাতির মত এমন অপদার্থ জাতি এতদিন যে বাঁচিয়াছিল—এতদিন যে তাহাদের সেই জুয়াচুরী

ধরা পড়ে নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। এমন ভাবসর্ব্বস্ব, চরিত্রহীন, শ্রীসম্পদবিমুখ, বৈশ্যধর্ম্মদ্রোহী জাতি ভারতপিতার কুপুত্র ছাড়া আর কি? সে জাতির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ভিন্ন পিতার কলঙ্ক ঘুচিবে না। অতএব, হয়—এ জাতি এখনই নানা উপায়ে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাক্, নয় তো—ইহার অস্থিমজ্জা ও মস্তিষ্কপদার্থ উত্তমরূপে পিষ্ট ও মর্দ্দিত করিয়া ভারতপিতার সুপুত্রগণের বিশাল জমিগুলিতে সাররূপে মিশাইয়া মিলাইয়া দেওয়া হোক্—তাহাতেও কথঞ্চিৎ পাপক্ষয় হইবে। পশ্চিম-ভারতের প্রসাদজীবী বাঙ্গালী—কি সাহিত্যিক, কি শিক্ষাব্রতী, কি ব্যবসায়ী, কি রাষ্ট্রসেবক—সকলেই নানা ছন্দে, নানা সুরে ঐ মোক্ষমন্ত্র ঘোষণা করিতেছেন। যাঁহারা ধর্ম্ম লইয়া আছেন—বড় বড় মঠ বা আশ্রমে এ জাতির জন্ত অমৃত-পিষ্টক প্রস্তুত করিতেছেন, তাঁহারা জাতি, দেশ বা কাল কোনটাকেই ভাবনার মধ্যে স্থান দেন না। কেহ বা এই পশুদশাপ্রাপ্ত মানুষগুলাকে না বাঁচাইয়া—বলির পশু হইবার জন্ত এবং তদ্দ্বারা জগতে মহা-মানবধর্ম্ম স্থাপন করিবার জন্য এক মহামন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছেন; কেহ বা মানুষের এই দেহটাই একদিন—সে কত সহস্র বৎসর তাহা বলা যায় না—দেব-দেহে পরিণত হইবে, সেই মহতী সিদ্ধির জন্য সকলকে যোগসাধনা করিতে বলিয়াছেন। এই দুই ধর্ম্মই বাঙ্গালীর বড় রুচিকর হইয়াছে; ঐরূপ উচ্চভাবের অহিফেন-রসে মনের উৎকণ্ঠা-নিবৃত্তি বা সদা-মৃত্যুভয় ভুলিয়া থাকার বড় সুবিধা হইয়াছে। মরণোন্মুখ জাতির যতকিছু অরিষ্ট লক্ষণ কোনটাই দেখা দিতে আর বাকি নাই। অতএব, কোন পক্ষেরই কোন ভাবনার কারণ নাই; একপক্ষ—বাঙ্গালীর জাতি হিসাবে মৃত্যুলাভই বাঞ্ছনীয় মনে করে, অপর পক্ষ—মৃত্যুকে ইতিমধ্যেই কদলী প্রদর্শন করিয়া অমৃতের রস-আস্বাদনে মশগুল হইয়াছে।"

এই তো অবস্থার বর্ণনা, তাহার পর বাঁচিবার উপায়:

"কিন্তু আজিকার এই মৃত ও মুমূর্ষু বাঙালীকে বাঁচাইবার সেই মৃতসঞ্জীবন বিশল্যকরণী কে আনিবে? তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম; তখন স্মরণ হইল, এই জাতির চরিত্রে একটা অনিয়মের নিয়ম আছে কারণ, এ জাতি বিশেষ করিয়া প্রাণধর্ম্মী, ইহার এক আশ্চর্য্য প্রাণবত্তা আছে—তাহা কোন মনোবিজ্ঞান বা তর্কশাস্ত্রের অধীন নয়। আর কিছুতেই এ জাতি জাগিবে না, একমাত্র—কোন মহাপ্রাণ পুরুষের সাক্ষাৎ সংস্রব ব্যতিরেকে। যদি এখনও তেমন পুরুষের আবির্ভাব হয়—তবে সেই একজনের আহ্বানে এই শ্মশান-ভূমিতেও শবদেহ উঠিয়া বসিবে, ইহার মৃত্তিকাতল হইতেও অস্থিকঙ্কাল বাহির হইয়া কলেবর-শোভিত হইবে। এ জাতির প্রাণ-মাহাত্ম্য এমনই। রাজনীতি নয়, অর্থনীতিও নয়—এমন কি, কোন আধ্যাত্মিক ধর্ম্মমন্ত্রও নয়, ইহাকে বাঁচাইবার—মৃত্যুপুরী হইতেও ফিরাইয়া আনিবার—একটিমাত্র উপায় আছে; মহা-প্রাণ, হৃদয়-বীর্য্যবান, মহাশক্তির বরপুত্র, 'বন্দে মাতরম্'-মন্ত্রের সিদ্ধসাধক কোন বাঙালী-সন্তান যখনই ইহাকে পাঞ্চজন্য-নির্ঘোষে ডাক দিবে, তখনই এ-জাতির মোহ ঘুচিয়া যাইবে, সেই একজনের এক প্রাণই কোটি মানুষকে প্রাণবন্ত করিবে। সেই অমৃত বাংলার মাটিতেই নিহিত আছে—জীবন ও মৃত্যুর সাধারণ নিয়তি তাহার নিকটে ব্যর্থ। তখন সেই নব-প্রভাতে, এই অশৌচ-রাত্রির যত অপচার—ইঁদুর, ছুঁচা ও চামচিকা—ভূত-প্রেত ও পিশাচের দল নিমেষে অন্তর্দ্ধান করিবে। অতএব, আসুন, এই মিলন-প্রাঙ্গণে, সেই আবির্ভাবের উদ্দেশে আমরা বোধন-ঘট স্থাপনা করি, এবং ভারতের জাতীয়-সঙ্গীত যাহাই হউক—বাঙালীর সেই প্রাণ-সঞ্জীবন মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, বাংলা-সাহিত্য তথা বাঙালীর জীবন, দুইয়েরই জয় ঘোষণা করি—বন্দে মাতরম্।"

বক্তা নিজেই নিজের ভাষণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন:

"এখন আপনারা বলুন, আমি কি অপরাধ করিয়াছি? এই সাহিত্য-সম্মেলন-সভায় আমি আপনাদের জন্য যে একটু-খানি সাহিত্য রচনা করিলাম, তাহার স্বাদ কটু হইলেও—মোহনাশক নহে কি? ঐ একটা কথা—বাঙালী-জাতির বিনাশ যে অবধারিত—তাহা যত সত্য, তত মর্ম্মান্তিক; তাই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের জাতি কি এমন করিয়া মরিতে পারে? কিম্বা, আমাদের অতি-আধুনিক সমাজপতি ও সাহিত্যপতিগণের বাড়ী, গাড়ী ও ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজনে, বাকি সমগ্র জাতি হিন্দুস্থানী ভারতের পদসংবাহন করিয়া কোনমতে বাঁচিয়া থাকুক—ইহাই কি আপনারা কামনা করেন? মাতৃভাষার স্কন্ধে হিন্দীকে বসাইয়া, বাঙালী হিন্দুস্থানী বণিকরাজের রাজভাষার অর্চনা করিবে? শুধুই বড় চাকুরীর জন্য নহে—সিনেমা ব্যবসায়ীর নিকটে প্রচুর অর্থলাভের লোভে, হিন্দীতে গল্পরচনা করিবে—সাহিত্যিক সাহিত্য ত্যাগ করিয়া সিনেমার দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইবে; আবার, বাংলাসাহিত্যের দরবারে বসিয়াও যেমন, তেমনই বাঙালী মহাপুরুষের স্থাপিত বাংলাসাহিত্যের পীঠস্থানটিও অধিকার করিয়া ঐ হিন্দীর পাদোদক পান করিবে, এবং সকলকে তাহাই করিতে বলিবে। ইহারই নাম বাঁচিয়া থাকা? মৃত্যুর আর বাকি কি?"

আমরা বক্তাকে কোনও অনুযোগ দিতে চাহি না। আজকার দিনে সাধারণ বাঙালীর চিন্তাধারা এইরূপই বিক্ষিপ্ত ও লক্ষ্যহীন। এই জাতীয় "অহিফেন-রস", শুধু ধর্ম্মপ্রচারকগণ নহে, তাঁহার ন্যায় লেখক ও বক্তার দল প্রত্যহই বাঙালী জনসাধারণকে পরিবেশন করিতেছেন, সুতরাং তিনি নূতন কিছু অন্যায় করেন নাই। তবে তাঁহার ভাষণে কয়েকটি প্রশ্ন জাগিয়া উঠে।

তিনি বাঙালীর স্বপ্নলব্ধ ভারতের কথা বলিয়াছেন। প্রশ্ন এই যে সে ভারত সম্পর্কে দিবাস্বপ্ন দেখা ছাড়া তাহাকে বাস্তবে পরিণত করার কতটা প্রয়াস বাঙালী করিয়াছে ও করিতেছে। জানি এই প্রশ্নের উত্তরে শত শত আত্মবলিদানকারী মহৎ জনের নাম আমাদের শুনান হইবে। কিন্তু তাঁহাদের পথ আমরা কয় জন লইয়াছি? এবং অতীতে তাঁহারা শোণিত-তর্পণে যে আরাধনা করিয়া গিয়াছেন আত্মাহুতিতে যে যজ্ঞ পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, আমরা নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া তাহার ফলভোগ করিতে পারিব কোন্ শাস্ত্র অনুসারে?

বাঙালীর চরিত্র বর্ণনে তিনি পরোক্ষে নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা করিয়া আমাদের সকলের আত্মপ্রসাদ উপভোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু বাঙালী কি সত্যসত্যই "শ্রীসম্পদবিমুখ বৈশ্যধর্ম্মদ্রোহী", না ঘোর কর্ম্মবিমুখ অলস এবং "ফাঁকি দিয়া স্বর্গলাভে" সচেষ্ট? এই অভিভাষণের সমালোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং এই মাত্র আমরা বলিব যে তাঁহার বক্তৃতা বিন্দুমাত্রও মোহনাশক নহে, বরঞ্চ মোহগ্রস্ত বাঙালীকে আরও অভিভূত করিবে। অন্যায় অত্যাচারে নিরীহ বাঙালী জর্জ্জরিত ইহা সত্য, কিন্তু তাহার প্রতিকারে যে জাতি আলস্য ও মোহ ত্যাগ করিয়া যুদ্ধের জন্য বদ্ধপরিকর হইতে প্রস্তুত নহে তাহার উদ্ধার মহাপুরুষ কেন স্বয়ং দেবাদিদেবেরও সাধ্যাতীত।

অভিনবতম মার্কিন M-46 Patton ট্যাঙ্ক

মূল কথায় ফিরিয়া আসা যাউক। স্বাধীনতার পর এই যে প্রায় চারি বৎসর চলিয়া গেল তাহাতে দেশের লোকের অবস্থা এত অবনত ও অবসন্ন হইল কেন?

স্বাধীনতা কি বস্তু, তাহার মূল্যদান কিভাবে হয়, তাহার রক্ষারই বা ব্যবস্থা কিরূপে করিতে হয় একথা আমরা ভুলিয়াছি ছয় শতাব্দী যাবৎ। সুতরাং সে বিষয়ে আমাদের ধারণা যে অদ্ভুত ও অবাস্তব হইবে সে বিষয়ে আশ্চর্য্য কি?

প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে এই স্বাধীনতার প্রেরণায় কয়েক দল সিপাহী কয়েকজন স্বল্পজ্ঞান নেতার অধীনে যুদ্ধে নামিয়া পড়ে। ইতিহাসে ইহার নাম সিপাহী বিদ্রোহ। দেশ ইহাদের ডাকে সাড়া দেয় নাই। জগৎ শুনিয়াছে শুধু ইহাদের হিংসার কথা, নিদারুণ বর্ব্বরতার কথা। ইহাদের দমনে দেশেরই লোকে সাহায্য করিল বিদেশীকে, ফুৎকারে নিবিয়া গেল স্বাধীনতার আলো।

তাহার দীর্ঘদিন পরে স্বাধীনতার আহ্বান আসিল বাংলায় ও মহারাষ্ট্রে। তাহাতে সাড়া দিয়াছিল কয়জন? শতাব্দীর আরম্ভে বিপ্লববাদ দেখা দিল বাংলায়, মুষ্টিমেয় কয়েকজন অশেষ বীরত্বের সহিত মৃত্যু ও কারাবরণ করিল। দেশের দশজন মৌখিক সহানুভূতি দেখাইয়াছিল মাত্র, কিন্তু সক্রিয় সাহায্য করিয়াছিল কয়জনে? দেশের লোকের মন যদি চঞ্চল ও তৎপর হইয়া উঠিত তবে এ স্বাধীনতা বহু পূর্ব্বেই আসিত অন্য ভাবে, অন্য রূপে। তাহার পরের কথা তো আধুনিক সময়ের, প্রায় সকলেরই জানা আছে।

শেষের দিকে যখন দেশে মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল, তাহাতে সাড়া দিল কিছু বেশী লোকে। কিন্তু সক্রিয়ভাবে নামিল এক শতে একজন নয়, এক হাজারে একজন নয়, দশ হাজারে দু-পাঁচজন, এই বাংলাদেশে। বাংলার বাহিরে দশ হাজারেও একজন নামিল কিনা সন্দেহ।

অথচ আজ এই দেবদত্ত স্বাধীনতায় আমাদের সকলেরই ধারণা যে, আমরা অভূতপূর্ব্ব বীরত্বের ফলে স্বাধীনতা যখন পাইয়াছি তখন আমাদের সকল সমস্যাই পূরণ হইবে মন্ত্রবলে। যদি না হয় সে দোষ আমাদের নয়, দোষ

অতিনবতম মার্কিন জেট্‌-বম্বার B-36D
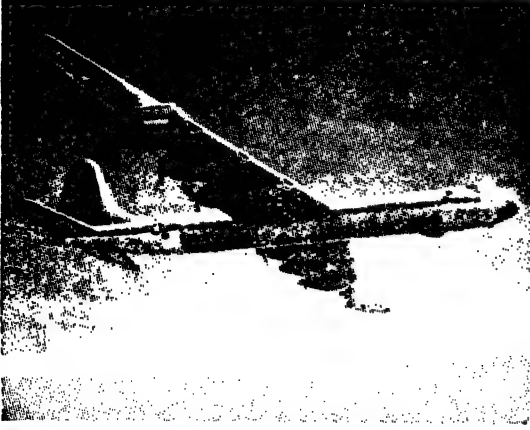
অন্যের এবং কর্ত্তব্য আমাদের কিছুই নাই, যে আপ্তবাক্য "আপনি বাঁচলে বাপের নাম" আমরা ছয় শত বৎসরের দাসত্বের ফলে ইষ্টমন্ত্ররূপে লাভ করিয়াছি তাহা জপিলেই মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবেই এবং তাহা হইলেই প্রত্যেকের ঘরে লক্ষ্মী অচলা হইয়া প্রতিষ্ঠিতা থাকিবেন। বলা বাহুল্য, স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রকৃতভাবে যোগদান যাহারা কখনও ভুলিয়াও করে নাই তাহারাই এখন সর্ব্বাপেক্ষা মুখর এবং তাহাদের এই মোহাবেশের অবকাশে কাজ গুছাইতে ব্যস্ত কয়েকজন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি।

কূপমণ্ডূকের মত বহির্জগতের দিকে দৃষ্টিমাত্র না দেওয়ায় আমাদের ছয় শত বৎসর যাবৎ দাসত্ব, দীনত্ব ও ক্লীবত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। এখন দাসত্বশৃঙ্খল ছিঁড়িয়াছে দৈববশে কিন্তু ক্লীবত্বের অভিশাপ যায় নাই, যাহার ফলে পুনর্ব্বার দাসত্বে প্রবেশের পথ খুলিয়া যাইতেছে।

বহির্জগতে যাহারা স্বাধীন তাহারা সজাগ দৃষ্টিতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় দিবানিশি ব্যস্ত। ইংরেজী প্রবাদবাক্য "Eternal vigilance is the price of Liberty" তারা সকলেই জানে। মহাপুরুষের আবির্ভাবের আশায় নিষ্ক্রিয় কেবল আমরা। আর একদল আছেন যাঁহারা শান্তির আশায় সবকিছু জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত। তাঁহাদেরই অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক। জগতের বর্ত্তমান পরিস্থিতি তাঁহাদের কাছে মায়ার খেলা মাত্র, বড় বড় ঋষি-বচন আবৃত্তি ভিন্ন আমাদের কর্ত্তব্য ইহাতে আর কিছুই নাই। সুতরাং অহিংসার নামাবলী পরিয়া ভিক্ষার ঝুলি লইয়া মাধুকরী বৃত্তিই আমাদের পক্ষে শ্রেয়। ইহাদের সম্বন্ধে কি আর বলিব, ভারতের ইতিহাসে এইরূপ প্রবৃত্তির ফল কি হয় তাহা রক্তাক্ষরে প্রতি পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

পূর্ব্বোক্ত বক্তা বলিয়াছেন, বাঙালী বৈশ্যধর্ম্মবিমুখ। যদি ইহা সত্যই হয় তবে প্রশ্ন আসে বাঙালী কি তবে ক্ষাত্রধর্ম্মে বিশ্বাসী? কই তাহার ত কোনও বিশেষ চিহ্ন দেখা যায় না।

বিদেশের যে দুই জাতি পৌরুষ ও উদ্যমের জন্য বর্ত্তমানে প্রখ্যাত তাহাদের ক্ষাত্রধর্ম্মের সম্বন্ধে কিছু এখানে বলা প্রয়োজন। সেই দুই জাতি রুশ ও মার্কিণ। ইহাদের মধ্যে রুশজাতি আধুনিক বিপ্লববাদীদিগের আরাধ্য, সুতরাং প্রথমে তাহাদের বিষয়েই বলা প্রয়োজন। আরও বলা উচিত এই জন্য যে, যাঁহারা শান্তিকামী তাঁহারা ভুলিয়া যান যে পৃথিবীর বৃহত্তম ভূখণ্ডের অধিকারী ঐ জাতি তাহার সাম্রাজ্যবাদ যতদিন প্রত্যক্ষ ও মূর্ত্তভাবে ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশে আপনার প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট
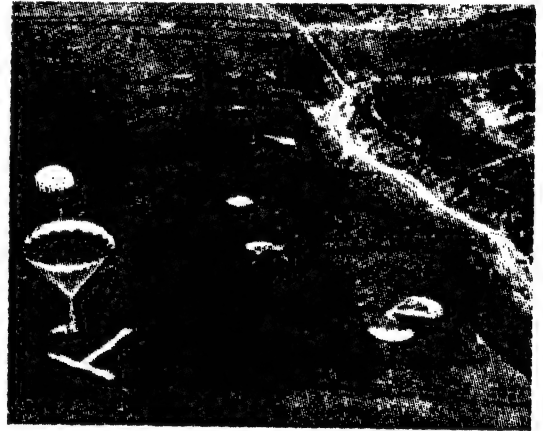
কোরিয়ায় প্যারাসুট দ্বারা রণস্থলে রসদ প্রেরণ

থাকিবে ততদিন জগতে শান্তির আশা মরীচিকা মাত্র। এই সাম্রাজ্যবাদ সসাগরা বসুন্ধরার একচ্ছত্র অধিকারের জন্য উৎসুক এবং উহার জন্য সমস্ত দেশ ও জাতির সমষ্টিগত ধনপ্রাণ পণরূপে রক্ষিত।

এই বিজয় অভিযানের জন্য ঐ দেশের প্রত্যেক লোককে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইতে হইয়াছে এবং দেশের যাবতীয় ধনসম্পদ প্রযোজিত হইয়াছে রাষ্ট্রের সমর-শক্তির সংগঠনে। যাহারা তাহাতে রাজী হয় নাই তাহাদেরপ্রাণদণ্ড সঙ্গে সঙ্গেই হইয়াছে। রাষ্ট্রের কারখানায় যে মজদুর কার্য্যে তৎপরতা দেখায় নাই বা রাষ্ট্রের শস্যক্ষেত্রে যে চাষী প্রাণপণ খাটে নাই তাহার ভবলীলা সাজ হইতে

রুশনির্ম্মিত দুইটি ট্যাঙ্কের ধ্বংসাবশেষ

মুহূর্ত্ত মাত্র দেরী হয় নাই। ওদেশে ষ্ট্রাইক বা ধর্ম্মঘট নাই কেননা সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র সেনার গুলীবর্ষণ অবশ্যম্ভাবী। ব্যক্তিগত অধিকার বা স্বাধীনতার বালাই নাই, রাষ্ট্রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে কাহারও কোনও কথা বলিবার বা লিখিবার অধিকার নাই রাষ্ট্রনেতার আদেশ বা অনুমোদন ব্যতিরেকে। তবে দেশে প্রকাশ্যভাবে বৈশ্যধর্ম্ম নাই কেননা স্থাবর সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার কাহারও নাই, যাহা কিছু অধিকার দেশে আছে তাহা সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষের। এইরূপ ব্যবস্থা দেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রায় ৯০ লক্ষ লোকের জীবনান্ত করিতে হইয়াছে ও প্রায় দুই কোটি লোক নির্ব্বাসিত হইয়াছে। এই হইল রুশ সোভিয়েটের ক্ষাত্রধর্ম্মের পণ। ইহার ফলে রুশরাষ্ট্রের সামরিক শক্তি এখন প্রচণ্ড। নিম্নে তাহার পরিচয় দেওয়া গেল :

রুশ সোভিয়েট সামরিক শক্তি

লোকসংখ্যা	সৈন্য	রণপোত	সাবমেরিন	এরোপ্লেন
১৯২৭৫৬০০০	৪৫০০০০০	১২৭	৩০০	১৯০০০

তুলনামূলকভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমরশক্তি এইরূপ :

লোকসংখ্যা	সৈন্য	রণপোত	সাবমেরিন	এরোপ্লেন
১৪৬৫৭১০০০	১৬০০০০০	২৩৮	৫০	৮৮০০

আর ভারতরাষ্ট্রের সমরশক্তি এইরূপ :

লোকসংখ্যা	সৈন্য	রণপোত	সাবমেরিন	এরোপ্লেন
৩৩৭২১১০০০	৪০০০০০	২২	০	২০০

চীনরাষ্ট্রের সমরশক্তি এইরূপ :

লোকসংখ্যা	সৈন্য	রণপোত	সাবমেরিন	এরোপ্লেন
৪৫৭১০৯০০০	১৫০০০০০	১২		৪০০

কিন্তু সামরিক শক্তির পিছনে থাকা প্রয়োজন বিরাট কলকারখানা ও যান্ত্রিক সভ্যতার সকল আয়োজন, যাহার অভাবে বর্ত্তমানজগতে যুদ্ধজয়ের কোনই সম্ভাবনা থাকে না। ইহার পরিমাপ সাধারণতঃ যে ভাবে গৃহীত হয় সেই অনুসারে ঐ চারিটি রাষ্ট্রের তুলনা এইরূপ :

বাৎসরিক উৎপাদনক্ষমতা

	ইস্পাত	কয়লা	খনিজ তৈল	বৈদ্যুতিক শক্তি
	দশ লক্ষ টন হিসাবে			শতকোটি কিলোওয়াট হিঃ
রুশ—	২৫.৪	২৫০	৩৫	৩৯.৬
মার্কিণ—	৮০.৩	৫৯০	২৭৬.২০	৩৪৪
ভারত—	১.২	৩০	০.৩০	৪.৫৮
চীন—	১.৪	১১	০.০৭	৩.৭

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সামরিক আয়োজনের, ক্ষমতা বৈশ্যরাষ্ট্র মার্কিণেরই অনেক বেশী এবং ভারত ও চীনের মধ্যে যাহা পার্থক্য তাহা ভারতেরই পক্ষে।

কোরিয়ায় ইঞ্চন বন্দরে মার্কিণ রণতরী বহর
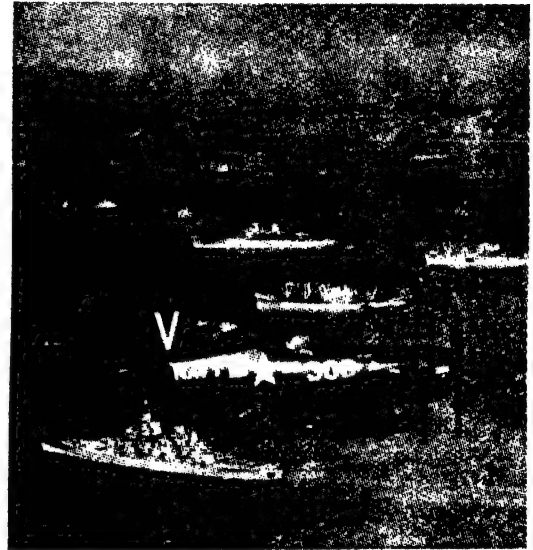
মার্কিণ ও রুশ এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর স্ব স্ব পক্ষে যাহারা আছে তাহাদের সামরিক শক্তি যোগ করিলে দুই পক্ষের তুলনামূলক পরিচয় দাঁড়ায় এইরূপ :

	লোকসংখ্যা	সৈন্য	রণপোত	সাবমেঃ	এরোঃ
রুশ দল	৭১৯৩৭৬০০০	৬৬৫৮০০০০	১৪৬	৩০৬	২০৬০০
মার্কিণ দল	৭০০০০০০০০	৭২০০০০০	৮০০	১৮৫	২২১০০

ভারত ইহার মধ্যে নাই।

বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতার অনুপাতে সামরিক আয়োজনের ক্ষমতা দুই পক্ষের এইরূপ :

	ইস্পাত	কয়লা	খনিজ তৈল	বৈদ্যুতিক শক্তি
	দশ লক্ষ টন হিসাবে			শতকোটি কিলোয়াট হিঃ
রুশপক্ষে	৩২.৭	৩১৩.৪	৪০.৮০	৬১.২৭
মার্কিণপক্ষে	১২৪	১০০০	৪১১	৫৬৪

এই হিসাবেও ভারতকে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

ইংরেজীতে বলে সভ্যতার পরিমাপ হয় গন্ধকদ্রাবকে। আজিকার জগতে ক্ষাত্রধর্ম্মের পূজারীদিগের প্রধান উপকরণ ইস্পাত, কয়লা ও খনিজ তৈল। সুতরাং ঐ মাপকাঠি হিসাবে তাহাদের ক্ষাত্রধর্ম্মের পরিমাপ আমরা দিলাম।

যুদ্ধবিতাড়িত দক্ষিণ কোরিয় শরণার্থীর স্রোত

তারপর অস্ত্রশস্ত্রের কথা। আমাদের অস্ত্রশালার অবস্থা ত এখনও ১৯২৫ সালের উপযোগী হইয়া আছে; বিদেশের যে সকল জাতি যুদ্ধের জন্য সজ্জিত ও প্রস্তুত তাহারা নিজস্ব অস্ত্রাগারে নিজের পরিকল্পিত অভিনবতম অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। আমরা প্রায় সকল বিষয়েই বিদেশীর মুখাপেক্ষী। সুতরাং প্রথম শ্রেণীর সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হইলে আমাদের শত্রুর সমকক্ষ কোনও দ্বিতীয় শক্তির নিকট অস্ত্রপ্রার্থী হইতে হইবে। জলে, স্থলে, আকাশে ও জলের নীচে যুদ্ধ চালনার জন্য শ্রেষ্ঠতম অস্ত্র যাহা কিছু তাহার প্রায় কিছুই আমাদের নাই, থাকিলেও অতি সামান্য পরিমাণে ও অতি ক্ষুদ্র পরিমাপের যৎকিঞ্চিৎ অমাদের আছে।

দ্বিতীয় মহাসমরের শেষে মার্কিণ দেশে অস্ত্রশস্ত্রের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাহা সত্ত্বেও কোরিয়ার যুদ্ধে উত্তর-কোরিয়ার সৈন্যদল অভিনবতম রুশ ট্যাঙ্কের সাহায্যে মার্কিন বর্ম্মাবৃত বহরকে মারিয়া হটাইতে লাগিল। সভ্য জগৎ চমকিত হইয়া দেখিল যে যুদ্ধের সামান্য চারি বৎসরের মধ্যে রুশ সেনার অস্ত্রাধ্যক্ষেরা এ বিষয়ে মার্কিণ দেশকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু মার্কিণ দেশ যান্ত্রিক সভ্যতায় পৃথিবীতে অদ্বিতীয়, সুতরাং তাহারা দ্রুতগতিতে নূতন পরিকল্পনায় ট্যাঙ্ক নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। এখনকার মার্কিণ এম্—৪৬ মার্কা প্যাটন ট্যাঙ্ক, বর্ম্মে, কামানের জোরে এবং দ্রুত চালনার বিষয়ে প্রতিপদে রুশ বর্ম্মশকটকে হারাইয়া দিতেছে। বলিতে কি, চীনা ও উত্তর-কোরিয় সৈন্য যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ ও সংখ্যায় বিশেষ গুরু হওয়া সত্ত্বেও হটিয়া যাইতেছে এই প্যাটন ট্যাঙ্ক ও মার্কিণ হাওয়াই বহরের আক্রমণের তেজে।

মার্কিণ হাওয়াই বহরের বমার (বোমারু) প্লেনের দাপট থামাইতে রুশ জেট্-প্লেন এখন রণাঙ্গনে নামিয়াছে। ঐ M. I. G. প্লেনগুলি গতিবেগে মার্কিণ জেট্-প্লেনকেও হারাইয়া দিয়াছে। উহাদের আক্রমণে মার্কিণ বমার প্লেনের চলাচল ক্রমেই ব্যাহত হইতেছিল। এখন জেট্-চালিত বমার B. 36. D, যাহাতে দুই রকমই ইঞ্জিন আছে, রণক্ষেত্রে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা ৪৫০০০ ফুট উপরের আকাশে ঘণ্টায় ৪৩৫ মাইল বেগে চলিবে। ইহাকে নামানো M. I. G. প্লেনেরও সাধ্যাতীত হইবে। তবে সওয়ালের জবাব ত আছেই, সুতরাং ভবিষ্যতে কি হয় দেখা যাইবে।

সমুদ্রে বিরাট রণতরী, প্লেনবাহী জাহাজ, সমুদ্রগামী প্লেন এই সকল বিষয়ে নিত্য নূতন ব্যাপার চলিয়াছে। যে দেশের আকাঙ্ক্ষা যত বড়, তাহাকে এসব বিষয়ে ধন-প্রাণের হিসাবে খরচও করিতে হয় তত বেশী। যুদ্ধের শাস্ত্রও ক্রমেই বদল হইতেছে, পদাতিক ও অশ্বারোহী ক্রমে মোটর-বাহিত ও প্লেন-বাহিত সৈন্যে পরিণত হইতেছে, তাহা ছাড়া বর্ম্ম-বাহিনীর সেনাদলও আছে, গোলন্দাজও আছে।

সর্ব্বশেষে বিজ্ঞানের ব্রহ্মাস্ত্র আণবিক বোমা। আজও ইহার ব্যবহার মানুষের সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আসে নাই। তবে ইহার ক্ষমতা এতই ভয়ানক যে যাহার সেরূপ সামর্থ্য আছে সে ইহার নির্ম্মাণের চেষ্টা করিবেই। ইহার ভিতরের রহস্য মার্কিণ, জার্ম্মান ও রুশ বৈজ্ঞানিকেরা জানে, সুতরাং মানুষের সর্ব্বনাশের পথ খুলিয়াই যাইতেছে। তবে ক্ষাত্রধর্ম্মে সর্ব্বনাশের কথা চিন্তায় আনিতে নাই কাজেই সেকথা বলে অন্যজনে।

অস্ত্রশস্ত্রের পর আসে জীবনের মূল্যের কথা। যুদ্ধে বীরোচিত মরণ ত সম্মানের বিষয়, সে কথা আজও সকল দেশই মানিয়া চলে। কিন্তু যুদ্ধে সর্ব্বনাশ তাহাদেরও হয় যাহারা যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে কোনওরূপে যোগদান করে না। যুদ্ধক্ষেত্র আর আজিকার দিনে কোনও নির্দ্দিষ্ট প্রান্তর নাই।

যে দেশে যুদ্ধ চলে সেখানকার অসামরিক জনগণ আকাশ জলস্থল সকল দিক দিয়াই আক্রান্ত হয় কেননা আজকার যুদ্ধশাস্ত্রে শত্রুনিধন হয় "সবশুদ্ধ" অর্থাৎ শত্রুসেনার ঘরে বাইরে কোথাও আশ্রয় বা সাহায্য পাইবার

উপায় থাকে না। কোরিয়ার যুদ্ধে সেখানকার গ্রাম, নগর, শস্যক্ষেত্র সব-কিছুই বিধ্বস্ত হইতেছে, সেখানকার অধিবাসিগণ যুদ্ধের জোয়ার-ভাটার সঙ্গে ভাসিয়া চলিতেছে। আজ এই গ্রামে আশ্রয় পাইল, কাল বিপক্ষের পাল্টা আক্রমণ আগাইয়া আসিলে পলায়ন ভিন্ন গতি নাই। কত লক্ষ অসামরিক বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ যে এই ভাবে উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

রুশ ও মার্কিণ ত বিরাট দেশ। ব্রিটেন তাহাদের তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে এবং বিগত মহাযুদ্ধে ব্রিটেনের উপর দিয়া যে ঝড় গিয়াছে তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু সেই সকল বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া বিষম কায়ক্লেশ ও কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াও ইংরেজ তাহার পূর্ব্বগৌরব, পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার চেষ্টা সমানেই করিয়া যাই-তেছে। যে জাতি সামান্য চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী ও দুর্দ্দান্ত যুদ্ধক্ষমতাযুক্ত ছিল, তাহার ঐশ্বর্য্য গিয়াছে, সাম্রাজ্যও খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে, নিদারুণ অর্থাভাবে আয়করের চাপ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ক্ষাত্রধর্ম্ম যায় নাই, সুতরাং বিনা চীৎকারে, বিনা হাহুতাশে তাহারা দৃঢ় চিত্তে অতি কঠিন কণ্টকময় পথে চলিয়াছে প্রগতির দিকে। ব্রিটেনের ক্ষাত্রধর্ম্মের পরিমাপ বর্ত্তমানে এইরূপ :
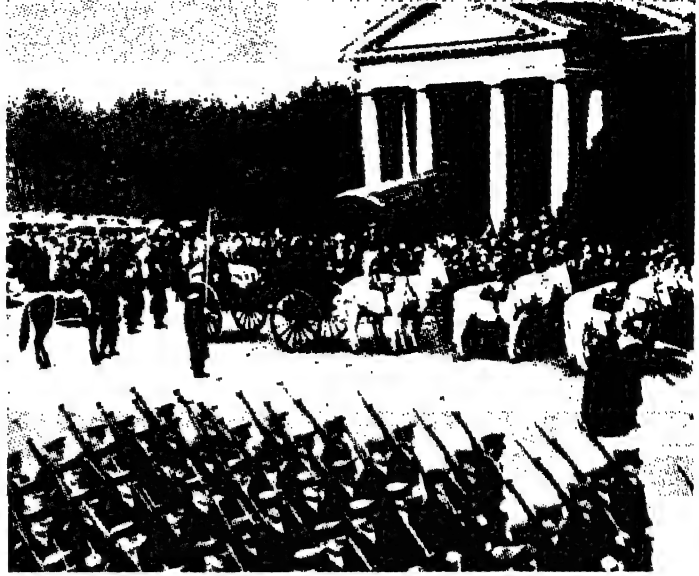
কোরিয়ায় নিহত মার্কিন জেনারেল ওয়াকারের অন্তিম সামরিক শোভাযাত্রা

লোকসংখ্যা	সৈন্য	নৌবহর	সাবমেরিন	এরোপ্লেন
৫০০১১০০০	৬৮২০০০	১২৬	৩৪	৬০০০

ইস্পাত	কয়লা	খনিজ-তৈল	বৈদ্যুতিকশক্তি
দশ লক্ষ টন হিসাবে			শত কোটি কিলোওয়াট হিঃ
১৫.৮	২১৮.৭০	০.৪	৪৯.১০

অসীম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত ব্রিটেনের লোক এই ক্ষাত্রযজ্ঞের কার্য্য-ক্রম চালাইতেছে। অন্য দেশেও সেই কাজ চলিতেছে, সেখানে লোকে জানে স্বাধীনতার মূল্য কি। জার্ম্মানীও ধ্বংস ও বিষম পরাধীনতার মাঝে দাঁড়াইয়া চলিতেছে প্রগতির পথে। তাহাদের দুঃখকষ্ট নির্য্যাতনের তুলনায় আমরা তো সুখে আছি। সুতরাং তুলনামূলক ভাবে আমাদের বিচার করা উচিত বাঙালী কি ক্ষাত্রধর্ম্মে বিশ্বাসী বা তাহার জন্য যে সংযম ও যে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন প্রয়োজন তাহা করিতে প্রস্তুত? (ক্রমশঃ)

আণবিক বোমায় বিস্ফোরণ। প্রায় দুই মাইল ব্যাসের ধূম্রমালা

লম্বা পথ, দূরত্ব কমাবার জন্ত জঙ্গলের রাস্তা ধরেছিলাম, জরুরী কাজ ছিল, সদর কাছারিতে হাজিরা না দিলেই নয়। আঁকাবাঁকা—পায়ে হাঁটা পথ, দু-পাশে খাড়া উলুখাস, মাঝে মাঝে ফাঁকা জমি। বেলা তখন বিকেলের দিকে ঝুঁকেছে। গন্তব্য স্থলে পৌঁছাতে মাত্র মাইলখানেক বাকি, জঙ্গলও ঘন নয়, ঐটুকু পার হতে পারলেই জঙ্গলীদের গ্রাম, গ্রামের কাছেই কাছারি।

পথপ্রদর্শক হিসাবে এদিককার একজন প্রজাকেই সঙ্গে নিয়েছিলাম। জঙ্গলের মাঝামাঝি এসে গিয়েছি হঠাৎ লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। এই সব পথে সন্ত্রস্ত হয়ে চলা ওদের ধর্ম। বন্ত পশুর মতই সব সময় বিপদের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হতে থাকে, কারণে অকারণে চমকে ওঠে। ইতিমধ্যে দু'বার চমকেছে। দাঁড়ানো অবস্থায় খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "বাবু একটু কাজ আছে এখুনি আসছি", কথাটা শেষ করেই চলতি পথ ছেড়ে খোলা জমির দিকে এগিয়ে গেল, আমার অনুমতির অপেক্ষায় থাকা তার পোষাল না। সামান্ত ফাঁকার পরেই গাছের ভিড়। লোকটা দেখি গাছের দিকে চলেছে। ক্রমান্বয়ে একটার পর একটা গাছের আড়াল পড়তেই লোকটা অল্প সময়ের ভিতর দৃষ্টির বাইরে গিয়ে পড়ল।

একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। জঙ্গলী আর ফেরে না। এদিকে বেলা পড়ে আসছে, অন্ধকার হবার আগেই এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হয়। এক পা দু' পা করে এগুতে লাগলাম, ভাবলাম জঙ্গলী ফিরে আসতে আসতে খানিকটা এগিয়ে যাওয়া যাবে। পায়ে চলা পথ এখানে মাত্র একটি, রাস্তা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। পড়ন্ত রোদের ঝলক গাছের ফাঁক দিয়ে পথের উপর এসে পড়েছে, উলু-খাসের ডগাগুলো সব সোনা হয়ে গিয়েছে। তীব্র আলোক-রশ্মিতে অদ্ভুত দৃশ্য নজরে পড়ল; দেখলাম রাস্তার পাশেই শোয়া ঘাস, বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে খাড়া হয়ে উঠছে। ভাবলাম গরু বা বাছুর শুয়েছিল, ভদ্রবেশী মানুষকে এদিকে আসতে দেখে উঠে গিয়েছে। সিদ্ধান্তটি কিন্তু মনকে প্রবোধ দেওয়ার জন্তই। খটকা লাগলেও সাহস আনলাম এই ভেবে, জঙ্গলী যখন এই পথ দিয়ে গিয়েছে তখন ভয় পাবার কিছু নেই।

কিন্তু মন যে আর সোয়াস্তি মানে না। কেমন যেন গা ছম্ ছম্ করতে লাগল। এ সময় জঙ্গলীকে কাছে পাওয়া একান্ত দরকার। ডাক দিলাম, সাড়া পাওয়া গেল না। সাড়ার পরিবর্তে কোন ভারী ওজনের কিছু আছাড় খাওয়ার শব্দ এল। তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ। জঙ্গলীর ব্যবহার ভাল লাগছিল না, পুনরায় ডাক দিতে লোকটা ছুটতে লাগল। পাতার নিষ্পেষণে তার গতিবিধি বুঝতে পারছিলাম। ছোটার আওয়াজ অল্প সময়ের ভিতর ক্ষীণ হয়ে গেল। জঙ্গলী আমার সঙ্গে রসিকতা আরম্ভ করলে নাকি? যে গন্ধ ওর মুখে পেয়েছিলাম তার প্রতিক্রিয়ায় কোন আচরণই অসম্ভব নয়। আমি একজন নায়েব ব্যক্তি, আমার সঙ্গে অতটা কি সাহস করবে? যাই হোক, ব্যাপারটা কি দেখে নেওয়া ভাল। গ্রামের কাছে পায়ে হাঁটা পথ বহুমুখী হয়ে থাকে, জঙ্গলী সঙ্গে না থাকলে কোথায় গিয়ে পড়ব তার ঠিক নেই, সুতরাং তাড়ির তাড়নায় যাই করুক, ও সঙ্গে না থাকলে··· চিন্তায় বাধা পড়ল, নিকটেই মানুষের জড়িত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, এঃ বেটা নেশায় চুর হয়ে গিয়েছে। এ অবস্থায় ওকে একলা ফেলে যাই বা কেমন করে। মনুষ্যত্বের বৃহৎ আদর্শ সামনে এসে পড়তে মন চাঙ্গা হয়ে উঠল। যেদিক থেকে গোঙানির শব্দ আসছিল সেই দিকে চলতে লাগলাম। বেশী হাঁটতে হ'ল না, শুনতে পেলাম কোন ভারী জিনিস কেউ হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে, নিশ্চয় ওটা গাছের ডাল। মাতাল দেখছি তালে ঠিক আছে, বেটা জ্বালানি কাঠের সরবরাহ করছে। কিছুমাত্র ভুল নেই যে, লোকটা মোটা ডাল টানতে গিয়ে টাল সামলাতে পারে নি, আছাড় খেয়েছিল। ঐ তো পাতা চাপা দেবার আওয়াজ শুনছি, ভোজনের সম্পদ লুকাচ্ছে, কাল সকালে এসে নিয়ে যাবে। এই সব কীর্তির সহিত আমার নিত্য পরিচয় হয়ে থাকে, অন্য কিছুর সম্ভাবনাকে কাছেই আসতে দিলাম না। ঊর্দ্ধতর আদর্শের তাগিদে কর্তব্যবোধ সচেতন হয়ে উঠল। ঠিক করে ফেললাম মাতাল

চোরকে ধরতে হবে। কাজ হাঁসিলের পর বকশিশ পাই বা না পাই উপরওয়ালার সুনজর তো বাগিয়ে নিতে পারব। কথায় কথায় কাছারীতে হাজিরা দেওয়া থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। অতি সন্তর্পণে পা ফেলতে লাগলাম। কোন-রূপ যোগবিদ্যা জানা ছিল না, কত আর দেহভারকে হাল্কা করা যায়। যেখানে দাড়াই সেইখানেই ঝরা পাতা মড় মড় করে ওঠে। চলার পথে যে প্রতিবাদ উঠছিল, তাতে জঙ্গলী বোধ হয় গা ঢাকা দেবার সুবিধা পেয়ে গেল। যথা-স্থানে এসে পৌঁছলাম বটে, কিন্তু কোন জীবের পাত্তা পেলাম না। শেষ পর্য্যন্ত এই বনবাদাড়ে লুকোচুরি খেলা সুরু করলে নাকি? কর্ত্তব্যজ্ঞান যথারীতিতে রাগের স্তরে উঠে যেতে লাগল। চেষ্টাসাধ্য গুরুগম্ভীর গলায় এমন ভাবেই ডাকলাম যাতে মনের অব্যক্ত কথাও সহজবোধ্য হয়ে যায়, যার অর্থ—রহিমপুরের নায়েব স্বয়ং খানাতল্লাসীর জন্য উপস্থিত, শ্রীবদনটি দেখাও, তা নইলে বিপদ অনিবার্য্য। গম্ভীর আহ্বানে উত্তর যা পেলাম তা আমারই অস্বাভাবিক গলার প্রতিধ্বনি, অস্বস্তিকর অনুভূতি।

লোকটা যাদুবিদ্যা জানে নাকি? এতটা ফাঁকার মাঝে চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়ল? আমার প্রশ্নের উত্তরও প্রস্তুত ছিল, দেখলাম উইয়ের ঢিবির দিকে কাঁটা বনের ডগা নড়ছে। ঘটনাটি হাস্যকর হয়ে উঠেছিল, অনুমান করলাম বাহাধনের নেশা কেটে গিয়েছে। চুরি ধরা পড়লে নেশা থাকে? তার উপর মনিবতুল্য ব্যক্তির সহিত রসিকতা। তবে বেচারা হামা দিয়ে কাঁটা বনের ভিতর ঢুকে পড়েছে, অন্যথায় সাজোয়ান চেহারা লুকায় কেমন করে? কি সর্ব্বনাশ, লোকটা যেদিকে এগুচ্ছে, সেদিকে জাতসাপের আড্ডা না হয়েই যায় না। কাঁটাবনে দেহটাও বোধ হয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। লোকটার অবস্থা দেখে দয়া হ'ল, বললাম, আর লুকোতে হবে না, ফিরে আয়। স্বার্থের তাগিদে দরদী হতে হয়েছিল, কাঁটাবনের ভিতর ঐ ভয়াল স্থানটিতে আমার এগোবার সাহস ছিল না। জঙ্গলী আমার আন্তরিক সহানুভূতি অগ্রাহ্য করে গভীরতম বনের ভিতর ঢুকে গেল।

পড়ন্ত রোদের চোখ ঝলসান আলো, ইতিমধ্যে ঝিমিয়ে আসতে আরম্ভ করেছে, জঙ্গলীর খেলার সঙ্গে যোগ রাখা সঙ্গত মনে হ'ল না, একাই কাছারির দিকে এগোতে লাগলাম। নিরাপদে জঙ্গল পার হয়ে, ক্ষেতজমির কাছে এসে পড়লাম। ধান নিয়ে যাবার জন্য এদিকে রাস্তা আছে। রাস্তায় খোয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকায় গরুর গাড়ীর চাকা দু'ধারে প্রায় ফুট-খানেক গর্ত্ত করে দিয়েছে, বাইরে থেকে গর্ত্ত নজরে পড়ে না, ধুলায় ঢাকা। ওর ভিতর বেটক্করে পা পড়লে, অঙ্গটি মচকায় অথবা ভাঙে। এই কারণে আমি হাঁটছিলাম মাঝখান দিয়ে, মাটি এখানে শক্ত, জলদি চলার অসুবিধা ছিল না।

রাস্তার দু'ধারে ক্ষেতজমি, ফসলের অবর্ত্তমানে উলুঘাসে ভরে গিয়েছে।

জঙ্গল পিছনে ফেলে খানিকটা পথ এসে পড়েছি এমনি সময় মনে হ'ল কেউ আমাকে অনুসরণ করছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলাম ব্যাপারটা কি দেখবার জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণের সঙ্কেতও বন্ধ হয়ে গেল। গ্রাম এখন একটু দূরে। দিনের আলো শেষ হয়ে এসেছে। আসন্ন রাত্রির অগ্র-দূতী কানের কাছে বলে চলেছে "পা চালাও", "পা চালাও", বাণী যতই স্পষ্ট ভাবে অনুভব করছি ততই আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছি। একটু বাদে অনুসরণকারীর অস্তিত্ব জাহির হ'ল সামনের দিকে। সাঙ্কেতিক শব্দ বার্ত্তার বাহন—কুটো ভাঙা—বা পাতা মোচড়ান শুনে বুঝছিলাম—সামনে, উলুঘাসের আড়ালে কেউ চলেছে। ঐ না—জঙ্গলীর হলদে চাদরটা দেখা যায়, এখনও হামা দেবার শখ মেটে নি? তবে রে শা—আমাকে একলা পেয়ে ভয় দেখানোর মতলব? লোকটার ঔদ্ধত্য আমাকে এমনই উত্তেজিত করে তুলল যে, ছোটলোকটাকে সাজা দেবার জন্য কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে তেড়ে গেলাম। তাড়া-হুড়ায় দলিলপত্রের মোটা খাতা ধুলোর উপর পড়তে যে শব্দ উঠল, তা প্রায় খেলনার বন্দুক ছোটানোর মত। দলিলের খাতা তুলে নিয়ে দেখি, জঙ্গলী পালাচ্ছে, যে লম্বা ছুট। উলুঘাসের ডগা নড়া দূরে মিলিয়ে গেল। ওর পিছু ধাওয়া করে লাভ নেই।

ইতিমধ্যে অন্ধকার চতুর্দ্দিকে ঘনিয়ে এসেছে, আবার কেমন একটা অজ্ঞাত ভয়ের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে লাগলাম। ভয় মাটির এলাকার বাইরে থেকে আসছিল। সে অনুভূতি প্রকাশ করা অসম্ভব—তবে ভরসা এই জঙ্গলীদের গ্রামের কাছে এসে পড়েছি। বিবেচনা করে দেখলাম বাকি পথটা নির্বিঘ্নে চলতে হলে গ্রাম থেকে লোক যোগাড় করে নেওয়া ভাল। গ্রামে স্বয়ং উপস্থিত হবার উপলক্ষ্য তো মজুত আছেই, বলব, তোমাদেরই একজন মাতাল হয়ে জঙ্গলের ভিতর পড়ে আছে। মশাল জ্বেলে ওদিকে যাও, লোকটাকে ঘরে নিয়ে এস। মাতালকে যে নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে দৌড়তে দেখেছি—সেকথা উল্লেখের কোন প্রয়োজনই দেখি না। তার বাকি খাজনার কথা পাড়লেই যার আঁতে ঘা সে যে পিছু নেবে তাতে সন্দেহ নেই।

জোরেই চলতে লাগলাম। মাঝে মাঝে কেশে নিচ্ছি। আপন কণ্ঠস্বরে মানুষের গলার সান্নিধ্য খুঁজছি। এই সময় ভিন্ন প্রাণীর সাড়া পাওয়া গেল, হরিণের ডাক—ত্রাসের ডাক। উপরকার অজ্ঞাত বিপদ অপেক্ষা মাটির ভয় কাছে এসে পড়ায় চলার গতি আরও বাড়িয়ে দিলাম। হন হন করে চলেছি। ক্ষেতজমির এদিকটা পরিষ্কার। ক্ষেতের উপর দিয়ে হাঁটলে অল্প সময়ের ভিতর গ্রামে গিয়ে পৌঁছানো যায়, দেরী না করে রাস্তা বদলে ফেললাম। একটু অগ্রসর হতে দেখি চিতাবাঘ ধরার ফাঁদ পাতা রয়েছে। এই ধরণের ফাঁদ দুই কামরায় বিভক্ত থাকে। একটিতে ছাগল অথবা কুকুর রাখা হয়—অপরটির দরজা খোলা থাকে। খাদ্যের প্রলোভনে বাঘ ভিতরে ঢুকলেই উপর থেকে মজবুত দরজা পড়ে যায়। কেন বলতে পারি না—আমার দৃষ্টি চলে গেল ফেলে আসা রাস্তার দিকে। আলো-আঁধারিতে যে চলন্ত প্রাণীকে দেখলাম, তাতে রক্ত হিম হয়ে যাবার যোগাড়। মানসিক অবস্থার পূর্ণোপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত বুদ্ধি যেন জোর করে আমাকে খাঁচার ভিতর ঠেলে দিলে। ভিতরে ঢোকার সময় কোন দিকে হুঁস ছিল না, দরজার মুখেই কোন কঠিন ধাতুর সঙ্গে ঠোকর লেগে পায়ের আঙুল বেশ জখম হয়ে গেল।

বন্দী অবস্থায় বসে আছি, রাত এগিয়ে চলেছে গাঢ়তর অন্ধকারের দিকে। জঙ্গলীদের গ্রামে মানুষের যেটুকু ক্ষীণ গলা শুনতে পাচ্ছিলাম—তাও রাত বাড়ার সঙ্গে থেমে গেল। কোথাও শব্দ নেই—আবেষ্টনী নিঝুম হয়ে গিয়েছে। উত্তেজনা ও ভয়ে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম, ক্লান্তি তন্দ্রাভিভূত করে আনতে লাগল। ঝিমাতে ঝিমাতে কখন বেড়ার উপর ঝুঁকে পড়েছিলাম। কানের কাছে জোর দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দে চমকে উঠলাম। ক্রমে নিঃশ্বাসের আওয়াজ প্রবলতর হয়ে উঠতে লাগল—তার পর সামনে বাঁয়ে ডাইনে পিছনে ঘন ঘন একই আওয়াজ। কেউ যেন আঘ্রাণের দ্বারা আমাকে শোষণ করে নিতে চায়। শোষণের শব্দ ভুল শুনি নি, ছাগলটাও ধড় মড় করে উঠে দাঁড়াল—কিন্তু ডাকল না। পরের ঘটনা যেন ওৎ পেতে ছিল। শোষণ-ক্রিয়া থামতেই খাঁচার মোটা বাঁশের উপর টান পড়তে লাগল। শক্তির প্রয়োগ যে ভাবে চলছিল তাতে খাঁচা বেশীক্ষণ আমাকে আশ্রয় দিতে পারবে বলে মনে হ'ল না। জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে চরম পরিণামের জন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া অন্ত কোন কাজ ছিল না। কপালগুণে খাঁচা ভাঙ্গার কাজে বিঘ্ন ঘটল। ফাঁদে ঢোকার সময় দলিলপত্র বাইরে ফেলে এসেছিলাম—সেগুলি ছিঁড়ে যেতে লাগল। অনুমান করলাম—দলিলের প্রতি আকর্ষণ আসায় হয়ত আমার প্রতি অনাসক্তি এসে থাকবে। ক্ষণিকের বিরামে একটু নড়ে চড়ে বসার সুযোগ পেলাম। এতক্ষণ যে কোন ধাতুর উপর বসেছিলাম—তা জানতে পারি নি—বস্তুটি দেহের তলা থেকে বার করে আনতে বুঝলাম ছোট সাবল। দলিলে মনঃসংযোগ হওয়ায় একটু নিশ্চিন্ত ভাব আসছিল, কিন্তু শান্তিলাভ আমার কোষ্ঠিতে লেখা নেই—দলিল দেখার সঙ্গে আমাকে বন্দীশালা থেকে বের করে আনার নতুন পন্থা আবিষ্কার হ'ল। বাঁশ ছেড়ে মানুষকেই টানার চেষ্টা চলেছে, পাশ থেকে, সামনে থেকে। পিছনে ছাগলটা আমার জন্ত একেবারে নিরাপদ হয়ে গিয়েছে।

অন্ধকারে দীর্ঘকাল বাসের পর দৃষ্টি কিছু প্রখর হয়েছিল, দেখলাম বেড়ার ফাঁক দিয়ে সাদা থাবা মাঝে মাঝে ভিতরে চলে আসছে। এই ভাবে আমাকে ছোঁয়ার চেষ্টা স্থানপরিবর্ত্তন করে অনবরত চলতে লাগল। কখন কোন দিক দিয়ে ছোঁয়া লেগে যাবে জানবার উপায় নেই। সাবল ব্যবহারের ইচ্ছা ইতিমধ্যে দ্বিধা কাটিয়ে উঠে-

ছিল—কিন্তু সুবিধার অভাবে অস্ত্রটি কাজে লাগাতে পারিনি। কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল, আমার উদ্ধারকারী বুদ্ধির সাহায্য নিয়েছে, বাঁ পাশের তলা থেকে মাটি সরিয়ে ফেলছে। কাজ সারার ক্ষিপ্র গতি দেখলে মনে হয়, কোন বৈদ্যুতিক কলের সাহায্যে গর্ত্ত বেড়ে চলেছে। হঠাৎ মাটি খোঁড়া থেমে গেল। পরক্ষণেই থাবা এসে পড়ল আমার গোড়ালীর উপর, অনুভব করলাম এক সঙ্গে পাঁচ ছয়টি বিছে আমূল হুল ফুটিয়ে দিলে। বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপের সহিত সাবলের কেমন যোগ ঘটেছিল, অস্ত্রটি সজোরে থাবার উপরের অংশে ঢুকিয়ে দিলাম। সাবল মাংসকে এ কোঁড় ও কোঁড় করে মাটির মধ্যে খানিকটা ঢুকে গেল। পরমুহূর্ত্তে, সাবলসমেত আমার গোড়ালী এবং সাদা থাবা সাংঘাতিক হেঁচকা টানে বেড়ার গায়ে গিয়ে পড়ল। সাবল এড়োভাবে পড়েছে—আমার পা সোজা, কতকটা ধনুকে তীর যোজনার মত। গোড়ালীর, মাংস, শিরা, উপশিরা চড় চড় করে ছিঁড়ে যাচ্ছে। ঘটনাচক্র আমাকে এমনই বিহ্বল করে ফেলেছিল, যে, বেদনার কোন অনুভূতি পাচ্ছিলাম না। বাঁচা মরার চিন্তা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়েছে, মোহযুদ্ধের ন্যায় অবর্ণনীয় তন্দ্রার মধ্যে জেগে আছি—বিকট ঝাঁকুনি ভোগ করছি, ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শুনছি। প্রায় ঘণ্টাখানেক এই প্রথায় আপ্যায়ন চলার পর বহু মানুষের কোলাহল খাঁচার পাশে শুনতে পেলাম, তার সঙ্গে মশালের আলো। কোলাহলের সহিত লাঠি পেটানোর আওয়াজ। আর কতক্ষণ পর্য্যন্ত চলেছিল বলতে পারি না। যখন সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে পেলাম তখন দেখি সকাল হয়ে গিয়েছে। স্বয়ং কর্ত্তা, ম্যানেজারবাবু, ডাক্তারবাবু—আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন। দাতব্য

চিকিৎসালয়ের বারান্দায় জঙ্গলীদের ভিড় জমেছে—উঠানে দুটো প্রকাণ্ড বাঘ—দুটোই মরা।

কর্ত্তার কৃপায় চিকিৎসার সুব্যবস্থা হলেও, বাঁ পায়ের অনেকখানি হাসপাতালে রেখে আসতে হয়েছিল। আমার ভাগ্য ভাল যে গল্প লেখার জন্য আজও বেঁচে আছি। কিন্তু জঙ্গলী বাঘের কামড়েই মারা গেছে। বেচারা বুনো চোখের দৃষ্টি দিয়ে যা দেখেছিল তাতে পালিয়ে গাছে উঠার চেষ্টা করেছিল মাত্র, তার আচরণে রসিকতার আভাস পর্য্যন্ত ছিল না।*

---

* সত্য ঘটনা অবলম্বনে।

ভগ্নভিটে

শ্রীঅমরকুমার দত্ত

এই যে আমার গ্রামের ভিটে, সাক্ষী কালের অচঞ্চল
সবুজ তৃণ-গুল্ম ঘেরা মাতৃভূমির শ্যামাঞ্চল ;
এই ভিটেরই বুকের 'পরে লক্ষ আঁচড় দেখতে পাই
হেথায় স্মৃতির দৃশ্যপটে ছায়াছবির অন্ত নাই।

অনেক যুগের অনেক কথা, অনেক গানের সুরের রেশ,
হেথায় ভেসে বেড়ায় ঘুরে, হয়নি তারা নিরুদ্দেশ,
কণ্ঠে তাদের দোদুল দোলে অনেক দিনের রত্নহার,
অনেক সুখের হাসির মালা, অনেক দুখের বেদনভার।

হেথায় আঁকা পিতার ঠাকুর, তাঁর ঠাকুরের বসত-ঘর,
তাঁদের পুণ্য জীবনলিপি—একটি ভাঙা ইটের 'পর ;
তাঁদের হাসি, কান্না তাঁদের, তাঁদের আসা যাওয়ার সুর
আজকে আমার হৃদয় হতে নয়কো অনেক অনেক দূর।

আসছে সজল স্বপন-ছবি—আমার মায়ের বধূর বেশ,
অচিন গাঁয়ের অচিন মেয়ের বিধুর অধীর নিশার শেষ ;
শেষ রজনীর নহবতের গোপন ব্যথার অশ্রুজল
বৃক্ষতলের শুকনো পাতায় দুলছে আজও সুনির্ম্মল।

কোথায় তাঁরা কোথায় আমি, হায়রে কোথায় কিশোরকাল
এই ভিটেরই পুষ্পপাতায় আমার রচা স্বপ্নজাল ;
কোথায় পিতার স্নেহের পরশ, পিতামহের আশীর্ব্বাদ,
পিতামহীর আজব কথা, মায়ের কোলের মধুর স্বাদ ?

ভগ্ন ভিটের অঙ্গনেতে বিদেশ অনেক ঘোরার পর
হারানো ধন পেলাম খুঁজে—সবার স্নেহ-মধুর স্বর ;
পল্লীভিটের আসন দিল—সবার পরশ, সবার কোল,
শতেক যুগের জীবন-ধারার তরঙ্গেতে দিল দোল।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ভিতরের মানুষটি বৈজ্ঞানিক পি. সি. রায়কে ছাড়িয়ে পরীক্ষণাগার ও বিজ্ঞান কলেজের বাহিরে দেশের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ব্যাপ্তি কল্যাণকর্ম্মের সূত্রে সম্ভব হওয়ায়, তাঁর জীবনকে অপূর্ব্ব একটি সার্থকতায় মণ্ডিত করেছিল। আমরা আচার্য্য সম্বন্ধে কয়টি অতি সাধারণ কথার উল্লেখ করব। কথাগুলি আমরা জানি। এইরূপ আরও অনেক কথা আরও অনেকে অবশ্যই জানেন।

প্রায় ১০।১১ বৎসর আগেকার কথা। আচার্য্য কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের নৈর্ঋত কোণের ঘরে আছেন। এক দিন বৈকালে দেখা করতে গেলুম। জিজ্ঞাসা করলুম, "মধ্যবিত্ত বাঙালীর উদ্ধারের আশা এখনও করেন কি? আপনি ত এর জন্যে কত প্রচার, কত চেষ্টা করেছেন। 'অন্নসমস্যা' থেকে সুরু ক'রে কোন সমস্যারই বিচার ও সমাধানের চেষ্টার বাকি ত আপনি কিছু রাখেন নি।"

একটু চিন্তিত ভাবে আচার্য্য উত্তর করলেন, "নাঃ,—মধ্যবিত্তের আরও অধোগতিই হয়েছে। প্রচারের কথা তোমার ত মনে থাকবেই। আজও দেখ না, সেই ডিগ্রী ও চাকরির মোহ, আর সেই আলসে-পনা।" তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, "রামমোহন রায় কোন্ সনে জন্মেছিলেন বল তো।"

উত্তর করলুম, "ঠিক বলতে পারছি না—১৭৭২ কি ১৭৭৪ সালে হবে।"

তিনি বললেন, "তবেই বোঝ। সে আর পলাশীর যুদ্ধের কয় বৎসরই বা পরে?"

আমি বললুম, "প্রায় ১৬।১৭ বৎসর পরে।"

একটু গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, "নদীর একটা বাঁকপথ আর কি।"

কুতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "সে কি?

তিনি বললেন, "বুঝতে পারছ না? সুমুখে নদীর একটা বাঁকপথ দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, নদী বুঝি ঐখানেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু বাঁকের মুখে এগিয়ে চল। দেখবে, মোড় ঘুরে নদী আবার কোন্ সুদূরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এ-ও সেই বাঁক পথ। পলাশীর যুদ্ধ তো বাঙালীর চরম দুর্গতির দিন। দেশের প্রধানরা জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতায় দেশকে এক দল বিদেশী বণিকের কাছে বিকিয়ে দিয়েছে। তার পর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের করাল কবলে গিয়েছে বাংলার ⅓ ভাগ লোক। বাংলায় তখনও শ্মশানের আগুন জ্বলছে। তার উপর আবার ইংরেজ রাজ্য বাংলায় সেই সুরু হয়ে, সারা ভারতবর্ষকে গ্রাস করবার জন্য হা করেছে। এর চেয়ে ঘোর দুর্দ্দিন আর কি হতে পারে? মনে হয়েছে, দেশের বুঝি ঐখানেই ইতি হয়ে গেছে। কিন্তু তার পর আর ৪।৫ বৎসর এগিয়ে এসে দেখ, বাংলার এক অখ্যাত পল্লীতে নব্যভারতের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করলেন। এইবার বাঁকপথে পৌঁছে যাওয়া গেল আর কি? তার পর চেয়ে দেখ, সুমুখে নব্যভারত ভবিষ্যতের দিকে কত দূর দূরান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়ে রয়েছে। প্রথম সূচনায় দেখ, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় কত রকমেরকত বড় লোক! কি প্রতিভা! বাঙালীই তো নব্যভারত গঠনের স্বপ্ন প্রথম দেখেছিল।"

একটু চুপ করে থেকে দক্ষিণ হস্তখানি বুকের উপর তুলে নিয়ে আবার বললেন, "আশা আমি ষোল আনাই করি হে। যে দেশের ছেলে এক পকেটে রিভলভার, আর এক পকেটে পোটাসিয়াম সায়ানাইড নিয়ে ঘুরতে পারে, পরাধীনতার জ্বালায় জ্বলে প্রাণের মায়া রাখে না, সে দেশ সম্বন্ধে হতাশ হবার কি আছে? এও সেই বাঁকপথ। পুঁজি আছে দেশে—ঠিকমত খাটিয়ে খেতে হবে।"

শ্রদ্ধায়, আনন্দে ও বিস্ময়ে আচার্য্যের মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।

কানাই দত্তর যখন ফাঁসি হয়, তখন আচার্য্য এক দিন কানাইয়ের স্বজাতি এবং আত্মীয়, হুগলী জেলার শ্রদ্ধেয় স্মরণীয় কংগ্রেসসেবী ডাক্তার আশুতোষ দাসকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বাসভরে বলেছিলেন, "তোমাদের তাঁতিরাই আজ দেশকে বাঁচালে। দেশকে বড় হতে হলে 'মারটারডম' চাই। তোমাদের জাত রক্ত দিয়েছে, আত্মদান করেছে। তোমরা নমস্য।" আশুতোষ দাস তখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন।

১৯২২ সালে উত্তরবঙ্গে প্রবল বন্যা। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র লোকসেবার ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। বেঙ্গল রিলিফ কমিটির আপিস খোলা হয়েছে কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের দক্ষিণ মহলের নীচের তলের একখানি ঘরে। সারা বাংলায় আর্ত্তত্রাণ-চেষ্টার সাড়া পড়ে গেছে। বন্যাপীড়িতের সাহায্যের জন্য অর্থ ও বস্ত্রাদি—আচার্য্যের নিজের ভাষায় বলতে হয়—বন্যার মত এসে পড়ছে। কর্ম্মমুখর আপিস ঘরে এক পার্শ্বে আচার্য্যের কাছে গিয়ে বসেছি। বিজ্ঞানাচার্য্যের সেবাব্রত রূপটি সেই পরিবেশে একটি অপূর্ব্বতা দিয়েছে, আর নূতন আশা ও উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। আচার্য্য বললেন, তাঁর স্বরে সংযত উচ্ছ্বাস ছিল, "দেখ হে, বিজ্ঞানমন্দির এখন

সেবামন্দির হয়ে সার্থক হয়েছে। দেশের ছেলেদের প্রাণটা একবার দেখ। উৎসাহটা দেখ। জ্ঞান ও কর্ম্ম এমনি করেই মিলিয়ে নিতে হবে।"

আশা-আনন্দ-উৎসাহমিশ্র প্রাণপ্রদ একটা অনুভূতির গভীরতায় ক্ষণকাল স্থির হয়ে আছি, এমন সময় ক' বোঝা কাপড়চোপড় এবং কিছু সংগৃহীত অর্থাদি নিয়ে ক'জন নারী আপিস ঘরের দ্বারদেশে এসে উপস্থিত হ'ল। এরা বারনারী। "এস, এস, মা-লক্ষ্মীরা" বলে আচার্য্য তাদের সাদরে আহ্বান করলেন। পিতার সেই অকৃত্রিম স্নেহের আহ্বানে পরিত্যক্তাদের মুখ দীপ্ত হয়ে উঠল। অকথিত থাকলেও তাদের মুখের ভাবে এই কথাটাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল যে এমন প্রাণভরা আপন-করা সহজ আহ্বান তারা ত কই আর কখনও শোনে নি।

আচার্য্য অনেক দিন পর্য্যন্ত ছুটিতে বাড়ি যেতেন খুলনা জেলার রাড়ুলি গ্রামে। নিজ গ্রামের গল্প তাঁকে ধীরে ধীরে আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করতে করতে বলতে শুনেছি। এক দিন বললেন, "দেখ, গ্রামে গেলে সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখা-সাক্ষাৎ করতে হয়। আমার চেয়ে সব বয়সে বড় আছেন—কেউ দিদি, কেউ মাসী। বাড়িতে গেলে তাঁরা কাঠের বড় পিঁড়ি পেতে দেন, আদর করে বসতে বলেন। সে-সব ভারি মোটা পিঁড়ি। একালে হয়ত তোমরা দেখ নি। ক' পুরুষ ধরে তার ব্যবহার হয়ে আসছে। জ্যেষ্ঠাদের নমস্কার ক'রে সেই পিঁড়ির উপর গিয়ে বসি। তাঁরা কত যত্ন করে আম কেটে, আনারস কেটে বড় পাথরের পাত্রে সাজিয়ে দেন। তার পর বসে বসে খেতে খেতে ঘরসংসারের নানা সুখদুঃখের গল্প করেন।" কোথায় দেশবিশ্রুত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আর কোথায় গ্রাম-সুবাদের বর্ষীয়সী মাসী-পিসী। তবু এঁরা যেন একটু বিশেষ ক'রেই পরস্পরের আপনার। এঁদের কথা বলতে আচার্য্যের মুখে সেই চির-সহজ সম্পর্কের মাধুর্য্যের স্পর্শ লাগত। আচার্য্য যেন নিজ গ্রামে একান্তভাবে গ্রামেরই, অপর কারও নন্। এ সম্পর্ক তাঁর জন্মের পূর্ব্ব থেকেই পুরুষানুক্রমে চলে আসছে—জন্মের পরে নূতন করে গড়ে ওঠবার অপেক্ষা রাখে নি।

ছাত্রদের সঙ্গেও তাঁর এই নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল—আমি তোমাদের, তোমরা আমার। ছাত্রদের সহজে আপন করে নিতে পারতেন তিনি। তাই দেখা যেত, পরীক্ষণাগারের মুহূর্ত্তগুলি আনন্দে, স্নেহে ও ভালবাসায় তিনি ভরে রেখেছেন। এই পথেই তাঁর বিজ্ঞানসাধনা বহু ছাত্রে সঞ্চারিত হয়ে ব্যাপক ও সার্থক হয়েছে। এক দিন পরীক্ষণাগারের ভিতর গিয়ে তাঁর পার্শ্বে দাঁড়িয়েছি। ঈষৎ ঢালু উঁচু একটি টুলের উপর তিনি উবু হয়ে বসে আছেন। ছাত্রগণ নীরবে আপন আপন কাচের নল, শিশি-বোতল এসিড প্রভৃতি নিয়ে ব্যস্ত। আচার্য্যের ছোট একটি কাজ আমার হাতে সম্পন্ন হয়েছে বলে পরম খুশীতে তিনি আমার গালে পিঠে বেশ কয়েকটা চড় ঘুসি দিলেন। তাঁর আদরের এই অত্যাচারে অনেকেই ধন্য হয়েছে। তার পর পার্শ্বে দণ্ডায়মান এক ছাত্রের কাঁধের উপর হাত রাখলেন। মুহূর্ত্তেই দেখি, পরম কৌতুক ও চরম বিস্ময়ের কারণ হয়ে বৃদ্ধ আচার্য্য বালকের আনন্দে সেই যুবক ছাত্রের পিঠের উপর চড়ে বসেছেন। ছাত্র সেই আনন্দ ও প্রেরণার পবিত্র আধারটিকে পিঠে নিয়ে, পরমানন্দে পরীক্ষণাগারের অপর প্রান্তে অনুরূপ একটি টুলের উপর নামিয়ে দিয়ে নিজ স্থানে ফিরে এসে আপন কাজে মনঃসন্নিবেশ করলেন।

১৩২৮ সনে মাঘের এক অপরাহ্ণে তাঁর ঘরটির ভিতর গিয়ে হাজির হয়ে প্রণাম করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়ালুম। খুব আনন্দিত হয়ে তিনি বলে উঠলেন: "আরে, আরে, আরে, এস, এস। কবে বেরিয়েছ জেল থেকে?"

উত্তর করলুম, "গতকাল।"

তিনি বললেন, "কেমন ছিলে? পৌষ-সংক্রান্তিটা তা হলে জেলের ভিতরই কেটেছে? এস এস, পৌষপার্ব্বণ তোমার ফাঁক যাবে না। সত্যানন্দবাবুর বাড়ি থেকে নানা রকম পিঠে এসেছে।" এই কথা বলে আলমারি খুলে একটি পাত্রে নিজহাতে পিঠে সাজিয়ে, আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এই চেয়ারটায় বসো। বসে বসে খাও, খেতে খেতে গল্প কর।"

এমন আদরযত্ন ঠাকুরমার দ্বারাই সম্ভব হয়। আচার্য্যের ভিতর ঐরূপ একজন কেহ ছিলেন, সন্দেহ নেই। সে পরিচয় অনেকেই হয়ত অনেকবার পেয়েছেন।

আর এক দিন একটি পাত্রে মুড়ির উপর পয়রা খেজুরে গুড় ঢালতে ঢালতে বললেন, "খেয়েছ কখন এমন জিনিষ? আমাদের খুলনার জিরেনের গুড়। কি সুন্দর গন্ধ! দেখ। তোমরা কলকাতার লোক, হোটেলে বসে কেক্ খেতে শিখেছ। মুড়িগুড় তো তোমাদের কাছে ছিঃ ছিঃ পাড়াগেঁয়ে খানা"—বলে হাসতে লাগলেন। আবার বললেন, "আরে আমি বৈজ্ঞানিক একথা তো মানতেই হবে। আমি বলছি, তোমাদের ঐ চৌদ্দ সিকের এক বাক্স হান্টলি পামারের সৌখীন বিস্কুট আর আমাদের পাড়াগাঁয়ের দু'-আনার মুড়িগুড় একবারে সমান—পুষ্টিতে কোন তফাৎ নেই। কিন্তু তোমরা শহুরে হয়েছ—মুড়িগুড়-জলখাবারে তোমাদের কৌলীন্য নষ্ট হবে।"

এক সন্ধ্যায় ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজে 'সময়ের সদ্ব্যবহার' সম্বন্ধে এক ঘণ্টারও উপর বক্তৃতা দিয়ে, 'চল চল' বলতে বলতে তাড়াতাড়ি এসে আচার্য্য তাঁর ছোট ঘোড়াগাড়িখানিতে উঠে বসলেন। বাহিরে হাত বাড়িয়ে, তাঁর সেই সনাতন

কড়ির বোতল থেকে জল ঢেলে মাথায় থাবড়ে থাবড়ে দিতে লাগলেন। এইবার মাঠে যাওয়া হবে সান্ধ্য ভ্রমণে। আচার্য্যের মোটর ছিল না। ছোট ঘোড়ার গাড়িখানি সম্বন্ধে তিনি বলতেন, "এ আমার মেডিকেল বিল, প্রত্যহ এই গাড়ি করে এসে মাঠে বেড়িয়ে যাওয়া না খেলে আমাকে ওষুধ খেতে হবে।"

গাড়ির মাথার উপর দুই টুকরি ভাংড়া আম দিয়েছিল। বেড়াতে বেড়াতে আচার্য্য বললেন, "চল, আজ রাতে সায়ান্স কলেজে থাকবে, আম খাবে।" কলেজে নিজের ঘরটির ভিতর এসে তিনি অবিলম্বে রাত্রের স্বল্পাহার শেষ করলেন। তার পর তাঁর বহুবিশ্রুত চৌপায়ের উপর শুয়ে পড়ে বললেন, "তোমরা সব একজনে গোটা একটা করে আম খাবে।" ঘর অন্ধকার—মুখ টিপে হাসলুম। কি কৃপণ রে বাবা! তাঁর মাথায় ও পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তিনি শীঘ্রই নিদ্রাগত হলেন। তার পর আমরা প্রত্যেকে—যতদূর মনে পড়ে—খাবার সময় চার বার গোটা একটা করে আম খেলুম। সকাল-বেলা দুষ্টুমি ফাঁস করে দিলে পর তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "বামুনের ছেলে, পেটুকত্বা তোমাদের পেশা।"

১৯২০ সালের পূর্ব্বেকার কথা। আচার্য্য ২.৩ দিনের জন্য পাবনায় চলেছেন। পথে পদ্মাতীরে পাকশীর রেল বসতিতে এক ভদ্রলোকের অতিথি হয়ে মধ্যাহ্নের স্নানাহার সমাপন করা হ'ল। সংবাদপত্রে রামানুজম্ এফ. আর. এস.-এর অকাল মৃত্যুর সংবাদ পাঠ করে আচার্য্য বড় ব্যথিত হলেন। মৃত মনীষীর গুণের কথা অনেকক্ষণ বললেন। তার পর কথাবার্ত্তার কালে আচার্য্যের এক পুরাতন ছাত্র এসে প্রণাম করলেন। ইনি মুন্সেফ। অনেক বৎসর পূর্ব্বে এম-এস্‌সি পাস করেছিলেন। মুন্সেফ-ছাত্রের গালভরা কাঁচা-পাকা গোঁফদাড়িতে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আচার্য্য সকৌতুকে বললেন, "তোমাদের এম-এসসি—বি-এল কাণ্ডখানা বাপু আজও কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকলো না।"

তার পর ষ্টীমারে পাবনায় পৌঁছে সদলে শীতলাইয়ের যোগেন মৈত্রের অতিথি হলেন। মৈত্র মহাশয়ের বাড়িতে ভাল হৃষ্টপুষ্ট গাই গরু ছিল। গো-সেবার ব্যবস্থা ছিল পরিপাটী। গব্য ঘৃত বাড়ীতেই তৈরি হ'ত। এই সব সুব্যবস্থা দেখে আচার্য্য খুব খুশী হলেন। পরদিন অপরাহ্ণে জনসভায় 'ধান ভানতে শিবের গীত'—মৈত্র মহাশয়ের গব্য ঘৃত সম্বন্ধীয় উদ্যোগের তারিফ করে আচার্য্য বললেন, "বাড়ির তৈরি গব্য ঘৃত উঁচু দরের খাঁটি জিনিস। আমরা অধ্যাপকরা এমন উপাদেয় জিনিস পেলেই নিয়ে থাকি।"

বলা বাহুল্য, বিদায়-বেলায় মৈত্র মহাশয় আচার্য্যের গাড়িতে কলসী-ভরা গব্য ঘৃত তুলে দিয়ে ধন্য হয়েছিলেন। আচার্য্যের খুব আনন্দ—কলকাতায় বাসায় ছেলেরা যে খাঁটি ঘি চোখে দেখতে পায় না।

সিবিলিয়ান কে. এম. গুপ্ত তখন বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার, চুঁচুড়ায় থাকেন। চুঁচুড়া কৃষি-প্রদর্শনী খুলতে গিয়ে আচার্য্য সদলে তাঁর অতিথি। গুপ্ত সাহেবের বাংলোর মেঝের উপর আসন পেতে শাক-সুক্ত ডাল-দালনা-ঝোল প্রভৃতি দিয়ে দেশী মতে আহারের ব্যবস্থা আচার্য্যের খুব পছন্দ হ'ল। তার পর প্রদর্শনীর কার্য্য অন্তে বৈকালিক জল খাবারের আসরে বসে আচার্য্য দেখলেন, চবাচুষ্যের ভিড়ে কয়েক ছড়া সোনার বরণ উত্তম মর্ত্তমান রম্ভা রয়েছে। রুমালখানি পকেট থেকে বা'র করে, দুই ছড়া কদলী তুলে নিয়ে, পরম মনোযোগ সহকারে বাঁধতে বাঁধতে আচার্য্য বললেন, "ওহে, এ আমাদের অধ্যাপকদের পাওনা—লজ্জা করলে চলবে কি করে?" স্বচ্ছ হাসির লহর তুলে সকলে তখন আচার্য্যের পাওনা-গণ্ডার হিসাব সম্বন্ধে অবহিত হলেন। তার পর গুপ্ত সাহেব শুভ্র বস্ত্রখণ্ডে সমস্ত রম্ভাগুলি সযত্নে বেঁধে নিজ হাতে আচার্য্যের গাড়িতে তুলে দিয়ে কৃতার্থ হলেন।

বক্তৃতায় আচার্য্য মাঝে মাঝে সেক্সপিয়র ও এমার্সন থেকে বচন উদ্ধার করে দিতেন। একদিন বেলা তিনটা আন্দাজ তাঁর ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন, "ওহে, আমাকে ঘণ্টা-খানেক এই 'হিষ্ট্রি অফ্ ইংলিস ড্রামা'র খানিকটা পড়ে শোনাও। পারবে ত?" অগত্যা বেপরোয়া হয়ে, তাঁর হুকুমে হেঁকে হেঁকে পুরা এক ঘণ্টা নাট্যরাজ্যে বিচরণ করা হ'ল। পড়া শেষ হতে বললেন, "তুমি ত পড় ভাল হে।" বৃথা লাভ!

এক দিন গিয়ে শুনলুম আচার্য্য স্নানঘরে আছেন—তবে আমি সেখানে যেতে পারি। দরজার ধারে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলুম, তিনি সাবান দিয়ে গেঞ্জি মোজা রুমাল সাফ করছেন। আমাকে দেখে খুশী হয়ে বললেন, "দেখ হে, তোমাদের আচার্য্য সাবান কাচছেন। নিজহাতে কাজ যে করবে না, সে বাঁচবে না। আমাদের জাতটা বড় আলসে। আবার মেয়েরা আজকাল বলতে সুরু করছেন, রাঁধুনী না রাখলে শ্বশুরবাড়ী যাবেন না। সঙ্গীন ব্যাপার!"

অসহযোগ আন্দোলনের মুখে দেশে যখন চরকা এসে পড়ল আচার্য্য তখন বলেছিলেন যন্ত্রযুগে চরকার চেষ্টা পাগলামি—সময়ের গতি ফিরিয়ে দেবার মত। কিছুকাল পরে একদিন বিজ্ঞান কলেজে তাঁর ঘরের ভিতর গিয়ে দেখি, মেঝের উপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পাকি-চরকায় তিনি দিব্য সুতো কাটছেন। আমাকে দেখে বললেন, "দেখ হে, তোমাদের আচার্য্য চরকা কাটছেন। একদিন চরকার বিরুদ্ধে বলেছিলুম। মহাত্মার যুক্তি যেদিন বুঝলুম যে, আমাদের গরীব দেশে কোটি কোটি লোকের বেকার সময়টা একমাত্র

চরকা দিয়েই কাজে লাগানো যায় আর তাতে দেশজোড়া আলস্য ও অবসাদ ঘোচে, সেদিন থেকেই সুতো কাটতে আরম্ভ করেছি। দেখ তো, সুতো কেমন হচ্ছে ?"

গান্ধীজী সে সময়ে বাংলার কয়েকটা স্থানে যাবেন। ভ্রমণ-ব্যবস্থায় আচার্য্যের হাত ছিল। একদিন আচার্য্য বললেন, "নিদ্রাটা মহাত্মার একবারে আয়ত্তের মধ্যে। বাস্ রে! ঠিক নেপোলিয়নের মত। ৬'টায় সভা আরম্ভ হবে। ৫টা ৪৫ মিঃ বললেন—একটু ঘুমিয়ে নেবো। অমনি নিদ্রাগত হলেন। ৫টা ৫৫মিঃ উঠে বললেন, "এইবার সভায় যাওয়া যাক্।"

একদিন আচার্য্য আমাকে ডেকে বললেন, "ওহে, এক কাজ করতে পারবে ? কঠিন কাজ কিন্তু।" উৎসুক হয়ে উত্তর করলুম, "কি বলুন।" তিনি বললেন, "আমাদের খুলনা অঞ্চলে —আমরা আবার খুলনে বলি—নমঃশূদ্ররা নাপিত পায় না। হিন্দু নাপিত মুসলমান-খ্রীষ্টানকে কামাবে, কিন্তু হিন্দু নমঃ-শূদ্রকে কামাবে না। এ কোন্ দেশী কথা বাপু! অনেক দুঃখে বিবেকানন্দ বলেছিলেন—আমাদের ধর্ম্ম এখন ভাতের হাঁড়িতে। সমস্ত জাতটা 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না' করতে করতে মরতে চলেছে। তুমি ত বামুন। এখন নাপিত হয়ে খুলনা জেলার নমঃশূদ্র গ্রামে বসতে পারবে ? একাজ বামুনদেরই হাতে নিতে হবে।"

এই কঠিন কাজে হাত দিতে পারি নি।

পল্লীগ্রামের প্রতি আচার্য্যের প্রাণের টান বরাবর ছিল। পাবনায় মৈত্র-বাড়ির বাঁধাঘাটে বসে খালি গায়ে খাঁটি সরিষার তেল মেখে দস্তুরমত পাড়াগাঁয়ের ধরণে আনন্দে অবগাহন স্নান করতে তাঁকে দেখেছি। একবার নদীয়া জেলার ঝাউডাঙ্গা গ্রামে পল্লীপ্রান্তস্থিত হরিজন-পাঠশালার মেটে ঘরে শীতের রাত্রি যাপন করে ভোরবেলা তিনি চৌপয়ের উপর বসে আছেন। আমরা পল্লীর অভ্যন্তরে গৃহস্থ-বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ ও রাত্রিযাপন করে, তাড়াতাড়ি মাঠ পার হয়ে তাঁর সম্মুখে এসে উপস্থিত হতেই তিনি বলে উঠলেন, "লোটাহাতে খুব ভোর ভোর মাঠ করে এসে বাঁচলুম—আমি পাড়াগাঁয়ের ছেলে।"

পল্লী-পাঠশালার বোধোদয় বইখানাও বোধ করি সেই জন্তে তিনি পরিণত জীবনেও ভুলতে পারেন নি। ১৯২০ সালের ২১শে নবেম্বর তারিখে কেম্ব্রিজ থেকে এই জ্ঞানতপস্বী একখানি চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন :

"ছেলেবেলায় বোধোদয়ে পড়িতাম অনেক দেখিয়া শুনিয়া যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম অভিজ্ঞতা এবং তাহাই আহরণ করিবার চেষ্টায় আছি।"

মনের যৌবন বটে!

১৯১৮-১৯ সালের কথা। একবার তাঁদের গ্রামের কুলপুরোহিত-ঘরের এক ছেলের অনেককাল কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। আচার্য্য সেই ফেরারি বিপ্লবীর জন্তে উদ্বেগ প্রকাশ করে বললেন, "সে ভাল আছে এই খবরটুকু পেলে, আমাদের গ্রামে তার বাড়িতে জানিয়ে দিই। তা হলেই তার বাড়ির লোক আশ্বস্ত হবে।"

আমি বললুম, "তবে খবর পাঠিয়ে দিন, সে ভাল আছে।"

আচার্য্য আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, "তাই বলি, তোমাদের ভেতর এই সব স্বদেশীর গোলমাল আছে বাপু। ঠিক খবর জান ত ?" আমি বললুম, "আজ্ঞা হ্যাঁ।"

আচার্য্য খুশী হয়ে তখনই খুলনায় বিপ্লবী ফেরারি শ্রীসতীশ-চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাড়িতে তার কুশলবার্ত্তা পাঠিয়ে দিলেন। তার পর তাঁরই আদেশে আমাকে এক দিন চন্দননগরে শ্রীমতিলাল রায়ের প্রবর্ত্তক আশ্রমে সতীশ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে তার অগ্রজের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

১৯৪০, এপ্রিল মাস। একদিন আমার কথার উত্তরে আচার্য্য বললেন, "তা, তোমাদের বালি ত এই কাছেই। একদিন গেলেই হবে।" আমি বললুম, "আপনি দু' বছর আগে যাবার কথা দিয়েছেন। এখন আবার ব্যক্তি-সত্যাগ্রহ এসে পড়লো। আমাকে আরামবাগের পল্লীতে সত্যাগ্রহ-শিবিরে গিয়ে থাকতে হবে।" আচার্য্য বললেন, "আচ্ছা, পরে সে কথা হবে একদিন।"

প্রণাম করে বিদায় নিয়ে দরজার বাইরে গিয়েছি, তিনি হেঁকে বললেন, "শোন, শোন।" ফিরে গেলুম। তিনি বললেন, "কি জানি বাপু, কখন আবার তোমাদের জেলখানায় চালিয়ে দেবে। তার পরের ব্যাপার তো অনিশ্চিত। তার চেয়ে চল, বুধবার বালি যাই, কথা দিয়েছি যখন। কিন্তু দু'দিনেই ব্যবস্থা করতে হবে।" সেদিন ছিল রবিবার।

আমি খুব আনন্দিত হয়ে উঠলুম। তিনি বললেন, "কিন্তু গাড়ীর বন্দোবস্ত করতে হবে। কার গাড়ী পাবে তুমি? অসুবিধা হবে না ত ?"

আমি বললুম, "ডাক্তার পঞ্চানন চাটুয্যের গাড়ী পাওয়া যাবে।"

তিনি বললেন, "তাঁর গাড়ী কি করে পাবে ?"

আমি বললুম, "আজ্ঞে, তিনি যে আমাদের বালির লোক।"

বালি আসবার দিন বিজ্ঞান-কলেজে পঞ্চানন চাটুয্যের মজবুত লম্বা চেহারা দেখে আচার্য্য খুব খুশী হলেন। বললেন, "আমি ত নামতে পারি না। তুমি আমাকে নীচে নামিয়ে নিয়ে যেতে পারবে ?"

"আজ্ঞা হাঁ, দেখুন না" বলে ডাক্তার চাটুয্যে আচার্য্য-দেবকে পাঁজাকোলা করে তুলে অবলীলাক্রমে নীচে নামিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর গাড়ীতে বসিয়ে দিলেন।

আচার্য্য হাসতে হাসতে বললেন, "কিছু ত জানতেই পারলুম না। তুমি মজবুত বটে !"

বালিতে গঙ্গাতীরের মাঠে সভা হয়। আচার্য্য সেখানে কথা রাখতে গিয়েছিলেন, কথা বলতে নয়—সভায় দাঁড়িয়ে কথা বলবার শক্তি তখন আর তাঁর ছিল না। আচার্য্যের পরণে সেদিন ছিল লুঙ্গি আর কোট, হাতে লাঠি।

এক ব্যক্তি মাঝে মাঝে আচার্য্যের বক্তৃতা লিখে নিতেন। আচার্য্য তাঁকে বলতেন, "এই আমার গণেশ।" গণেশের হাত ধরে পিছনে পিছনে সভায় প্রায় টেনে নিয়ে যেতেন। উদ্যোক্তাদের বলতেন, "এই আমার গণেশ, বসবার জায়গা দাও, যেন হাওয়া পায়। গণেশ না লিখলে আমার বক্তৃতা পণ্ড হবে।"

শেষের ক' মাস আচার্য্যদেব শয্যাগত ছিলেন। একদিন অপরাহ্ণে তাঁর কাছে গিয়ে বসেছি। মোজা-পরা শীর্ণ পা-দুখানিতে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। তিনি মাঝে মাঝে এক-আধটা কথা বলছেন। তাঁর এক বন্ধু পাশে চেয়ারে বসেছিলেন। বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি করা হয়?"

আচার্য্য আমার দিকে চাইলেন। আমি চট্ করে কিছু জবাব দিতে পারলুম না। কারণ আমরা কি-যে করি তার কিছু ঠিক নেই—আবার কিছু-যে করি না তাও ত ঠিক নয়। বৃদ্ধ আবার সেই প্রশ্ন করলেন। তখন বুদ্ধি জুগিয়ে গেল। আমি বললুম, "আজ্ঞে, স্বদেশী করি।"

আচার্য্যদেবের শীর্ণ মুখখানি হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, "বেশ বলেছ।"

শেষের দিনে সকালবেলা যখন পদপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়েছি আচার্য্যদেব তখন সংজ্ঞাহীন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে তিনি চিরবিদায় নিয়ে চলে গেলেন। মেঘলা সেই সকালটায় বিজ্ঞান কলেজে সেই পুঞ্জীভূত দুঃখের কথা মনে পড়লে আজও চোখে জল আসে।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী গোপাহেমাঙ্গিনী

ময়মনসিংহ সেরপুর (মন্নানীবাড়ী) নিবাসী কলিকাতা হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট শ্রীহিমাংশুচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী গোপাহেমাঙ্গিনী ১৯৫০ সালের বি. এ. পরীক্ষায় বাংলা অনার্সে তৃতীয় স্থান এবং মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য, বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে নব উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। তার পর হইতেই স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ, তাঁহাদের শিক্ষার উপযোগী নানা বিষয়-সম্বলিত পত্র-পত্রিকার প্রচার হইতে আরম্ভ হয়। বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্রবাবু সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারীর অবদান সংক্ষেপে অথচ সুনিপুণ ভাবে সঙ্কলিত করিয়াছেন। মহিলাদের সম্পাদিত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক পত্রিকার পরিচয় এবং সম্পাদিকার নাম, পত্রিকার উদ্দেশ্য অতি সুন্দরভাবে গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন, সমাজ, সাহিত্য, লোকসেবা, ছোটদের মাসিকপত্র, সংবাদপত্র সকল বিষয়ে নারীর দান এই বইখানিতে দেখিতে পাই।

প্রথমে, প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা (আগষ্ট ১৮৫৪), মজিলপুরনিবাসী উমেশচন্দ্র দত্তের মাসিক 'বামাবোধিনী পত্রিকা' (আগষ্ট ১৮৬৩) ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত পাক্ষিক 'অবলাবান্ধব' (২২ মে ১৮৬৯) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্তঃপুরকামিনীদের জ্ঞানার্জনস্পৃহা উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে, ক্রমশঃ তাঁহারা নিজেদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধেও সচেতন হইয়া উঠেন। এ বিষয়ে আন্দোলনের ভার তাঁহারা নিজেরাই গ্রহণ করিলেন; দেশে মহিলা-সম্পাদিত সাময়িকপত্রের আবির্ভাব হয়। সেই আবির্ভাব হইল (১৮৭০ এপ্রিল) বাংলা ১২৭৭ সালের ১লা বৈশাখ। প্রকাশিত হইল পাক্ষিকপত্র বঙ্গমহিলা। সম্পাদিকা ছিলেন—মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়। ইনি বিখ্যাত ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভগিনী। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকাগুলির সম্পাদিকার নাম, প্রকাশ-তারিখ, পত্রিকার উদ্দেশ্য, উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের উল্লেখে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় রূপে সাহিত্যপিপাসুগণের ব্যবহার করিতে হইবে। 'বঙ্গমহিলা' যেমন মহিলা-সম্পাদিত প্রথম পাক্ষিক পত্রিকা তেমনই 'অনাথিনী' মহিলা-পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকা। সম্পাদিকা—থাকমণি দেবী। প্রকাশ-কাল—শ্রাবণ ১২৮২ (জুলাই ১৮৭৫)। ইহার পর বঙ্গমহিলা-সম্পাদিত দ্বিতীয় সংবাদপত্র 'হিন্দুললনা' ১২৮৪ সালের মাঘ (ফেব্রুয়ারী ১৮৭৮) সালে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৭০ হইতে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রকাশিত পত্রিকাগুলির পরিচয়ের পর বিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত মহিলা-পরিচালিত পত্রিকার পরিচয় এ বইতে আছে। এই সকল পত্র ও পত্রিকার সম্পাদিকাদের মধ্যে হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান ও মুসলমান মহিলা অর্থাৎ সর্ব্ব ধর্ম্ম ও সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মহিলারাই আছেন। দ্বাদশ জন মহিলা-সম্পাদিকার সুন্দর চিত্র গ্রন্থের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। বিষয়-সূচীতে বর্ণানুক্রমে প্রত্যেক পত্রিকার ও সম্পাদিকার নামোল্লেখ আছে। বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত এই বইখানির ছাপা, কাগজ, চিত্র যেমন সুন্দর, তেমনই ব্রজেন্দ্রবাবুর ন্যায় গবেষকের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধিৎসার ফলে, আমাদের দেশের নারীজাতির সাময়িকপত্র সম্পাদনে ধারাবাহিক ভাবে যোগ্যতার পরিচয় পাইয়া ধন্য হইয়াছি। সমাজকে শিক্ষার দ্বারা, জ্ঞানের প্রচার দ্বারা, সুন্দরতর, প্রিয়তর ও মধুরতর করিবার জন্য নারীসমাজের এত বড় দানের পরিচয় ব্রজেন্দ্রবাবু সাহিত্য-সমাজে উপস্থিত করিয়া মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সোনা-রূপো—শ্রীসুকৃতি সেনগুপ্তা। কেতাব ভবন। ৫, সান ইয়াত সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ১৮০ আনা।

এখানি কিশোর-উপন্যাস—যদিও কিশোর উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্ণয় করা বেশ কঠিন। প্রায়ই দেখা যায়, গল্পে রহস্যজাল বুনিয়া কিশোরচিত্তে কৌতূহল সঞ্চারের উদ্দেশ্য লইয়া যে ধরণের রচনা প্রকাশিত হয় তাহাতে বাস্তবের সম্পর্ক বড় একটা থাকে না। অবাস্তব গোয়েন্দা-কাহিনী বা ঐ ধরণের বিভীষিকাপূর্ণ উদ্ভট জিনিসকে কিশোরচিত্তের পুষ্টিকর খাদ্য বলিয়া চালাইয়া দেওয়া হয়। অবশ্য অন্যায় ব্যতিক্রম যে নাই তাহা নহে। আর আলোচ্য উপন্যাসখানি এই ব্যতিক্রমের পর্য্যায়ে পড়ে। ইহাতে উৎকট কৌতূহল সঞ্চারের চেষ্টা নাই বা অলৌকিক রহস্যের আভাসও নাই। নিতান্ত সাদাসিধা ধরণের গল্প—পাঁচ জন মধ্যবিত্তের সুখদুঃখের অংশ লইয়া গল্পটি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং গল্পটির মধ্যে মানুষের হৃদয়বৃত্তির সন্ধানও খানিকটা পাওয়া যায়। তবে গল্পের বাঁধুনিটা ঢিলা হওয়াতে বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে কৃতিত্ব দেখাইয়াও গল্পটিকে লেখিকা ঠিকমত

জমাইতে পারেন নাই বাস্তবানুগ ঘটনাগুলিকে যথাসম্ভব গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া পাঠকমনে কৌতূহল জাগাইয়া রাখাই হইল ভাল গল্পের লক্ষণ। মনে হয় গঙ্গার ঘাটে মাতৃ-অঙ্কচ্যুত ছেলেটিকে লইয়াই গল্প জমিয়া উঠিত—বর্মার পথ হইতে ছোট মেয়েটিকে কুড়াইয়া না আনিলেও চলিত। তথাপি গল্পের মধ্যে জাপানী বোমা-ভীত অসহায় নরনারীর পলায়ন-দৃশ্যের বর্ণনাতে লেখিকার ভাষার উৎকর্ষ ও বাস্তবানুগত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অল্প আয়াসে একটি সুসংবদ্ধ ভাল গল্প তিনি কিশোরদের পরিবেশন করিতে পারেন—এ আশা অবশ্যই করিতে পারা যায়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

প্রাচ্য-বাণী পূর্ণচন্দ্র সিংহ স্মৃতিতর্পণ—ডক্টর যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী সম্পাদিত। ১৩০ পৃষ্ঠা।

কলিকাতার গড়পাড় অঞ্চলের "প্রাচ্য-বাণী মন্দির" নীরবে ভারতের সভ্যতা, সাধনা ও সংস্কৃতির সেবা করিতেছে আজ প্রায় দশ বৎসর যাবৎ। তাহা সম্ভব হইয়াছে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ও তাঁর সহ-ধর্ম্মিণী শ্রীরমা চৌধুরীর আগ্রহে।

ইতিমধ্যে এই প্রতিষ্ঠান যে সব গ্রন্থাবলী, গ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহা উল্লেখযোগ্য। নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যাবলীর ব্যাখ্যা ও পূর্ব্ববঙ্গের অখ্যাত কবি ও গীতিকারের পরিচয় দিয়া এই প্রতিষ্ঠান বিদ্বজ্জন সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছে।

বর্ত্তমান পুস্তকখানিতে কালীপ্রসন্ন সিংহের বংশধরবৃন্দের মধ্যে এক-জন সাংস্কৃতিক গুণসম্পন্ন লোকের জীবনকথা বর্ণিত হইয়াছে। এই অজানা জ্ঞান-সেবকের পরিচয় দিয়া "প্রাচ্য-বাণী মন্দির" একটি দায়মুক্ত হইলেন। একটি ভুলের প্রতি আমি সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। ৪৪ পৃষ্ঠার "মহাকবি গিরিশচন্দ্র" ঘোষ মহাশয়ের নামের সঙ্গে সংযুক্ত করা হইয়াছে ইংরেজী ভাষায় পরিচালিত সাপ্তাহিক "বেঙ্গলী" পত্রিকার নাম। এই পত্রিকার সম্পাদকের নামও ছিল গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি কিন্তু ছিলেন সংশয়বাদী, আর মহাকবি গিরিশচন্দ্র ছিলেন পরমহংস-দেবের ভক্ত।

মুক্তি কোন্ পথে—দরাক আলি। পোঃ আঃ বসন্তী, ২৪ পরগণা। পৃষ্ঠা ৮২। মূল্য ১।০।

এই পুস্তকখানি একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান কর্ত্তৃক লিখিত ও প্রকাশিত। পুস্তকের প্রথম কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যে হিন্দু পরিচালিত কয়েকখানি জাতীয়তাবাদী পত্রিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতার নাগরিক জীবনের উপর যে বীভৎসতার কালো মেঘ নামিয়া আসে তখন হইতে গ্রন্থকার এই মারাত্মক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেছেন।

ফল হয় নাই। ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়াছে। "পাকিস্থান" প্রতিষ্ঠার কেবলমাত্র ইংরেজের "কূটনীতি" দায়ী, এই কথা আমি বিশ্বাস করি না। মুসলমান সমাজের এক বৃহৎ অংশের মন এই নীতির বীজ সাগ্রহে বপন না করিলে এই বিষাক্ত ফসল ফলিত না, কোটি কোটি নরনারী, বালক-বালিকা গৃহচ্যুত হইত না; নারীর সম্মান এরূপভাবে বিপর্য্যস্ত হইত না, যাহা ইসলামের ও হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কলঙ্ক।

অতীত কথা লইয়া হা-হুতাশ করিয়া লাভ নাই। সেইজন্য আমি গ্রন্থকারের গঠনমূলক প্রস্তাবসমূহের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ৮২ পৃষ্ঠায় সাধনমূলক কার্য্যের ইঙ্গিত আছে। আজ হিন্দু-মুসলমান সকলের মন বিক্ষিপ্ত। সুতরাং শ্রেণীর স্বার্থ অবলম্বন করিয়া দল গঠন করিবার প্রস্তাব পরীক্ষাসাপেক্ষ। ইহার ফলাফল নির্ভর করিবে ভারতরাষ্ট্রের মুসলমান সম্প্রদায়ের মনোভাবের উপর; তাঁহারা নাগরিক হইবেন, না আর এক বিশেষ শ্রেণীর "জিম্মি" বলিয়া পরিচিত হইবেন, সেই পরীক্ষার উপর।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

কথা-শেখা—শ্রীক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীগোবিন্দমোহন গুপ্ত। দি সিটি বুক কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এ যুগের শিশুরা যে আমাদের চাইতে অনেক ভাগ্যবান, তাহা এ যুগের শিশুদের বর্ণপরিচয়ের বইগুলি দেখিলেই বুঝা যায়। এমন রংচঙে চিত্রসম্বলিত সুমুদ্রিত বই আমাদের কালে আমাদের ভাগ্যে জোটে নাই। 'কথা-শেখা' এ যুগের ছেলেমেয়েদের উপযোগী একখানি সুমুদ্রিত সচিত্র বই, প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা বহুবর্ণে মুদ্রিত। পাঠগুলিও সুনির্ব্বাচিত ও সুবিন্যস্ত।

ব.

১। ভারত ও মধ্য এশিয়া; ২। ভারত ও ইন্দোচীন; ৩। ভারত ও চীন (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার ৭৯, ৮০ এবং ৮১ সংখ্যক পুস্তিকা)—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী। বিশ্বভারতী, ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা। মূল্য প্রত্যেকখানি ।০।

বিস্তৃতি জীবনের প্রধান লক্ষণ। অতীতে যে যুগে ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতি প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যে ভরপুর ছিল, সে যুগে তাহা ভারতবর্ষের কূল ছাপাইয়া দূরদূরান্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তৎকালে মধ্য এশিয়ার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এবং ইন্দোচীন বা ভিয়েৎনামে ভারতীয় সভ্যতার বিজয়বৈজয়ন্তী উত্তোলিত হইয়াছিল। ইহাদের আকাশ-বাতাস সেদিন

ভারতবর্ষের একান্ত নিজস্ব প্রেম ও মৈত্রীর বাণীতে মুখরিত হইয়াছিল। ইহাদের ধর্ম্ম-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান এবং স্থাপত্য-ভাস্কর্য্যের উপর ভারতীয় সংস্কৃতির ছাপ আজও নিঃশেষে মুছিয়া যায় নাই। কাশগর, খোটান ইয়ারখন্দ, আনাম এবং কাম্বোজের পথে-প্রান্তরে আজও ভারতীয় সংস্কৃতির বহু নিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কিন্তু কে তাহার খবর রাখে? গুণবর্দ্ধন, পরমার্থ, কুমারজীব এবং ধর্ম্মরক্ষের নাম আজ কাহারও মনে নাই।

তার পর, চীন। ভারতবর্ষের সহিত তাহারও নিবিড় আত্মিক এবং সাংস্কৃতিক যোগ বিদ্যমান। ইহারা পরস্পরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। বুদ্ধরক্ষ, ধর্ম্মদেব, মঞ্জুশ্রী, ফা-হিয়েন, হিউয়েনসাং—কত নাম করিব—ইঁহাদের একাগ্র সাধনা চৈনিক এবং ভারতীয় সংস্কৃতির মিলন-মাল্য রচনা করিয়াছিল। তার পর ইতিহাসের এক অশুভ ক্ষণে এই মাল্য ছিন্ন হইয়া দুই দেশের মধ্যে অপরিচয়ের দুস্তর ব্যবধান সৃষ্ট হইল।

যুগনিদ্রাবসানে জাগ্রত এশিয়া ভূখণ্ড আজ প্রাণচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। নিপীড়িত মানবতার বিজয়রথের চক্রঘর্ঘর দিনের পর দিন স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের পরস্পরকে জানিবার প্রয়োজন খুবই বেশী। সুতরাং আলোচ্য পুস্তিকা তিনখানি যে অতিশয় সময়োপযোগী হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

যে কয়জন ভারতীয় ঐতিহাসিক মহাচীন ও বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস এবং ভারতবর্ষের সহিত তাহাদের সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের আলোচনায় খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন গ্রন্থকার ডাঃ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী তাঁহাদের অন্যতম। আলোচ্য পুস্তিকা তিনখানিতে তিনি মধ্য এশিয়া ও ভিয়েৎনামের প্রাচীন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস এবং চীন, মধ্য এশিয়া ও ভিয়েৎনামের সহিত ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের মোটামুটি বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, বর্ণনাভঙ্গী আর একটু সহজ হইলে পুস্তিকা তিনখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

"বিদ্যার বহু বিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত মনের যোগ" সাধনের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার প্রণয়ন ও প্রকাশ পরিকল্পিত হইয়াছিল। "ভারত ও মধ্য এশিয়া", "ভারত ও ইন্দোচীন" এবং "ভারত ও চীন" সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

পুষ্পাঞ্জলি—শ্রীসুনীতি ভট্টাচার্য্য। সিদ্ধেশ্বরী লাইব্রেরী, ১০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা। মূল্য ১৷০।

দুর্ব্বল ভাব—পঙ্গু ছন্দ ও শিথিল ভাষা অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইতে চাহিয়াছে, ভাল করিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই।

শ্রীমতী—শ্রীপ্রশান্তকুমার বাগচী। ১নং মণিলাল ব্যানার্জি, খিদিরপুর, কলিকাতা। কার্ডবোর্ড ১৷০। সাধারণ ১৷০।

কবিতাগুলি সত্যই শ্রীমতী। ভাষায় ও ছন্দে সৌন্দর্য ও সাবলীলতা আছে। প্রথম দিকে কয়েকটি ছোট ছোট গীতিকবিতা, শেষে 'দেশান্তরী' নামক সুদীর্ঘ আখ্যান-কবিতা।

আমাদের লেখা—১৩৫৫।১৩৫৭ বার্ষিকী। শান্তিনিকেতন। প্রতি সংখ্যা ১৲।

শান্তিনিকেতন পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীদের রচনাসংগ্রহ। স্বাধীন চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গী শান্তিনিকেতনের শিক্ষায় কিরূপ বিকাশলাভ করে, এই লেখাগুলি দেখিলে বেশ বুঝা যায়। শিশুবিভাগ, মধ্যবিভাগ, আদ্যবিভাগ—তিন বিভাগের রচনাই ইহাতে আছে। নিজের জীবনের ছোটখাটো ঘটনা বা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে গিয়া ছেলেমেয়েরা সহজভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে শেখে, লেখায় আসে সাবলীলতা, আন্তরিকতা। বাঁধাধরা প্রবন্ধ লেখানো, আর মনের কথা গুছাইয়া বলিতে উৎসাহ দেওয়া—দুইয়ের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ। শিক্ষাদ্বারা যদি মনের বিকাশ-সাধন করিতে হয়, তবে দ্বিতীয় পন্থাই বেশী কার্য্যকর।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিচিত্রিতা (কিশোর-সাহিত্য সংকলন)—সম্পাদক: শ্রীরাধা বসু ও শ্রীতন্ময় বাগচী। প্রকাশক: অস্মিতা বাগচী, ৭নং মহীশূর রোড, কলিকাতা—২০। দাম আড়াই টাকা।

কিশোর-মনের খোরাক জোগাবার জন্যে বাংলা সাহিত্যের সেরা লিখিয়েদের রচনা এই সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে। পুজোর মরশুমে কিশোর-দের জন্য রঙবেরঙের কালিতে ছাপা সুদৃশ্য বাঁধাই-করা রচনা-সংগ্রহে বাজার সরগরম হয়ে উঠে। সেগুলির বেশির ভাগই বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত। 'বিচিত্রিতা'ও সেই পর্য্যায়ের অনুবৃত্তি ভেবে খুব আগ্রহ ভরে এর পাতা উল্টাই নি। কিন্তু ভূমিকায় 'আমাদের যা বলবার আছে' পড়ে হেলাফেলায় বই বন্ধ করা গেল না। গভীর কৌতূহলে পাতার পর পাতা উল্টে গেলাম...দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, আশাপূর্ণা দেবী, গোপালচন্দ্র নিয়োগী, সুনির্ম্মল বসু, শিবরাম চক্রবর্ত্তী, অখিল নিয়োগী, সরোজকুমার রায় চৌধুরী...কাকে বাদ দিয়ে কার নাম করব? প্রত্যেকটি রচনাই সুলিখিত এবং সুনির্ব্বাচিত। সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত হলেও বীথিকা চক্রবর্ত্তী ও তন্ময় বাগচীর অনুবাদ-গল্পটির লিখন-ভঙ্গী ভাল লেগেছে বলে এর কথা আলাদা ভাবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কিন্তু কতকগুলো ভাল লেখা একত্রে সাজিয়ে দেওয়াই কোন সঙ্কলন-গ্রন্থের

আসল উদ্দেশ্য বা সার্থকতা নয়। একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রচনা নির্বাচন করতে হবে এবং এই দুরূহ কার্য্যে সম্পাদকদ্বয় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন আর এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর ছাপ রচনা-সংগ্রহের সর্ব্বত্র পরিস্ফুট বলেই 'বিচিত্রিতা' আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। দামী কাগজে নানা রঙের কালিতে ছেপে এর অঙ্গ-সৌষ্ঠব বর্দ্ধনেও প্রকাশক কার্পণ্য করেন নি। বাজার-চলতি কিশোর-সাহিত্য সঙ্কলনের মধ্যে 'বিচিত্রতা'র জাত যে আলাদা—এক নজরেই তা ধরা পড়বে।

পনেরো আগষ্ট (নাটক)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ জানা। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ, ১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা।

দীর্ঘ পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে জাতিকে যাঁরা মুক্তির আলোতে পৌঁছে দিলেন, তাঁদের অকৃত্রিম দেশপ্রেম ও চরম আত্মত্যাগের কাহিনী—গানে, গল্পে, কাব্যে, নাটকে রূপ দেবার প্রয়াস সমকালীন সাহিত্যিকদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। সেই অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নাট্যকার 'পনেরো আগষ্ট' নাটকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও লাঞ্ছনার একটি অধ্যায়ের ছবি আঁকবার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও জাগ্রত দেশপ্রেম আলোচ্য নাটকের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। কিন্তু বিষয়বস্তুর সারবত্তাই সার্থক নাটক রচনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। নাটকের জন্য রচিত কাহিনীকে তার নিজস্ব আঙ্গিক ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে বিস্তার করতে না পারলে অনেক উৎকৃষ্ট কথাবস্তুও পাঠকমনে খাঁটি নাটকীয় রস সঞ্চার করতে পারে না—নাটক হিসাবে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। খুবই দুঃখের সঙ্গে লিখতে হচ্ছে—"পনেরো আগষ্টে"র কথাবস্তুর গরিমা ও গাম্ভীর্য্য সত্ত্বেও বিন্যাস-কৌশলের অভাবে তা সত্যিকার নাটক হয়ে উঠতে পারে নি। দু'একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। বরুণ রায়ের সুন্দরী কন্যা সুখনাকে লাভ করতে চায় আবগারী দারোগা শঙ্কর। আর সে জন্যে শঙ্করের পথের কাঁটা—সুখনার ভাল-বাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র রাজবন্দী সমীরকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু এইজন্য জেল-সুপারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র—কল্পনা কুশলতার দিক থেকেই শুধু দুর্ব্বল নয়—নাটকীয় 'সিচুয়েশন' সৃষ্টির দিক থেকেও ত্রুটিপূর্ণ। যে ব্যাপার নিয়ে একটা প্রচণ্ড সংঘাত সৃষ্টির অবকাশ ছিল—নাট্যকার জেল-সুপারকে দিয়ে তারই জেলের বন্দীকে পীড়নের সহজ পথে গিয়ে নাটকীয় তরঙ্গকে মাঝখানেই রুদ্ধ করে দিয়েছেন! এই ধরণের বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। ত্রুটিগুলির বিষয়ই বেশী করে উল্লেখ করলাম। কারণ লেখকের নিষ্ঠা আর প্রেরণা দুই-ই আছে—আশা করি ভবিষ্যতে তিনি সত্যিকার নাটক রচনা করবেন।

নাটকের প্রস্তাবনায় কয়েদীর বেশ পরিহিত রাজবন্দীদের রুদ্র-নৃত্য বাদ দিলেই শোভন হবে—এতে নাটকীয় এফেক্ট দ্রুততর এবং গভীরতর হবে।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

ন্যায় প্রকাশিকা—শ্রীজীবনকৃষ্ণ তর্কতীর্থ, সংস্কৃত বিবৃতি ও বঙ্গানুবাদ সহিত। হিঙ্গাজিয়া, শ্রীহট্ট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২৲।

আলোচ্য গ্রন্থে প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রে প্রবেশলিপ্সু দিগের জন্য সরল সংস্কৃত কারিকায় গৌতমোক্ত ষোড়শ পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে। বিস্তৃত

বিবৃতি ও অনুবাদে বিষয়সমূহ সুপরিস্ফুট হইয়াছে। গ্রন্থের বক্তব্য সিদ্ধান্তানুসারী। সমাপ্তি শ্লোক এবং ভূমিকার কয়েকটি উক্তি পুনর্বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। রঘুনাথ শিরোমণির জন্মস্থান শ্রীহট্ট কিনা—এবিষয়ে মতান্তর বর্ত্তমান। তাৎপর্য্যটীকাকার এবং উদয়নাচার্য্য সমসাময়িক হওয়া অসম্ভব। তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধির অপর নাম ন্যায়নিবন্ধ। 'ত্রিসূত্রী নিবন্ধ' উহার অংশবিশেষ। মূল কারিকার কয়েক স্থলে ছন্দ-পতন দেখা গেল।

সংস্কৃত-ভাষা এবং ভারতীয় দর্শনের একান্ত দুর্দিনে গ্রন্থকারের বর্ত্তমান প্রয়াস আনন্দদায়ক। গ্রন্থখানি ন্যায়শাস্ত্র-রসিকদিগের সমাদর লাভ করিবে।

শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর

যদি—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র রায়। ৩৩৩ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৸০।

প্রবন্ধ-সমষ্টি। দশটি নিবন্ধ পুস্তকখানিতে স্থানলাভ করিয়াছে। প্রায় প্রত্যেকটি লেখাই সুচিন্তিত ও সুলিখিত। মাঝে মাঝে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ লেখার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। পুস্তকখানি শিক্ষিত পাঠকমহলে সমাদৃত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

মেঘ ও রৌদ্র—শ্রীবলাই প্রামাণিক। ২, সীতানাথ রোড, কলিকাতা—৬। মূল্য ২৲।

উপন্যাস। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে জোর করিয়া একত্রিত করিবার প্রয়াস পুস্তকখানির সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইল। স্থানে স্থানে দুই একটি সুস্থ মানুষের সাক্ষাৎ মিলিলেও, দুর্ব্বল ও বিকৃত চিন্তাধারার পরিবেশের মধ্যে তাহাদেরও হারাইয়া ফেলিতে হয়। লেখকের ভাষা সহজ।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

শিক্ষা ও শিক্ষানীতি—শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য, এম-এ., বি-টি। ওরিয়েণ্ট লংম্যানস্ লিমিটেড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৮৯। মূল্য ৩৸০।

পুস্তকের 'নিবেদনে' লেখক বলিয়াছেন—"দেশের কতশত প্রতিভা আত্মপ্রকাশের অভাবে অকালে ঝরিয়া পড়িতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।... কিশোরের মনোরাজ্যের সহিত পরিচয়ের অভাবে আজ শিক্ষাক্ষেত্রে ও বৃহত্তর জীবনেও এই সমস্যা নানারূপে অবাঞ্ছিত পরিণতি অর্পণ করিতেছে। তাই এ বিষয়ে জনজাগরণের আশায় গ্রন্থখানি সকলের হাতে তুলিয়া দিলাম।" হাতে লইয়া আমরা কিশোরের মনোরাজ্যের পরিচয় ও জনমানসের জাগরণীর সন্ধান করিয়া নিরাশ হইলাম। বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ দেখিয়া মনে হয় ট্রেনিং স্কুল বা কলেজের শিক্ষার্থীর জন্য বইখানি লেখা হইয়াছে। শিক্ষার ইতিহাস হইতে সুরু করিয়া আধুনিক কালের বয়স্ক শিক্ষা পর্য্যন্ত বহু বিষয় গতানুগতিক ধারায় আলোচনা করা হইয়াছে; ইহাতে লেখকের স্বকীয়তার ছাপ পড়ে নাই। অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থের সার সঙ্কলন হিসাবে ইহা শিক্ষণ-শিক্ষালয়ের ছাত্রদের কাজে লাগিতে পারে।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

সরল হিসাব প্রণালী—শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মডার্ণ বুক এজেন্সী। ৩২৩ পৃষ্ঠা। মূল্য ৫৲ টাকা।

বাংলায় বুক-কীপিং বইয়ের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। যে সকল বাঙালী ব্যবসায়ী আদালতে দেউলিয়া হইবার জন্য দরখাস্ত করেন তাঁহাদের খাতা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ঠিক ঠিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রেওয়া মিল না করার দরুন অনেক সময়ে তাঁহাদের ঠকিতে হইয়াছে ও লোকসান গিয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানিতে লেখক অতি প্রাঞ্জল ভাষায় দ্বিগুণাত্মক হিসাবনীতি বুঝাইয়া দিয়াছেন। ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত আদান-প্রদান, লাভ-লোকসান নির্ণয়, অংশীদারী কারবার ও যৌথ কোম্পানীর কারবার সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি সহজবোধ্যভাবে বাংলায় লিখিয়াছেন। এই বইখানি ছাত্র ও ব্যবসায়িগণের প্রভূত উপকারে আসিবে। সাধারণতঃ যে সকল ইংরেজী শব্দ আমরা ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত ব্যবহার করি, পরিশিষ্টে তাহার ব্যাখ্যা ও বাংলা দিয়া বইখানির উপকারিতা লেখক বাড়াইয়া দিয়াছেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

শ্রীবৃন্দাবনলীলা—(৷৵০ + ১২৩) পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ সিকা।

গীতালিপি—(১৲+২২৩) পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা।

উভয় গ্রন্থ 'লেখক ভাই' প্রণীত এবং ১২১৷১নং কালিদাস পতিতুণ্ডী লেন, কলিকাতা—২৬ হইতে 'আলোকবাণী' সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীবৃন্দাবনলীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শৈশবলীলা—নাড়ুগোপালের কীর্ত্তি হইতে কিশোরবয়সের দোললীলা পর্য্যন্ত বারোটি লীলার তাৎপর্য্য প্রণেতার নিজস্ব সরস যুক্তিপূর্ণভাবসহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রত্যেকটি লীলা পাঠেই ধর্ম্মপিপাসু নরনারী নূতন আস্বাদন পাইবেন।

গীতালিপিতে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিষাদযোগ হইতে মোক্ষযোগ পর্য্যন্ত অষ্টাদশ অধ্যায়ের ধারাবাহিক আলোচনা স্থানে স্থানে মূলের পদ্যানুবাদ সহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথমে 'গীতাসারতত্ত্ব' শীর্ষক বিস্তৃত অধ্যায়সূচী এবং শেষে 'সংক্ষিপ্ত গীতা কথা' শীর্ষক গীতার মর্ম্মকথা স্থান পাওয়ায় সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রণেতার বিশিষ্ট চিন্তাধারা আলোচনায় প্রকাশিত হইয়াছে—যাহা গীতার মর্ম্ম বুঝিবার পক্ষে পাঠককে সহায়তা করিবে নিঃসন্দেহ।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কব্বুরে সাংস্কৃতিক সম্মেলন

'শ্রমিক বর্ম্মরাজ্য সভা' অন্ধ্রদেশের একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীরা মাছুগুলা এবং অনন্তগিরির পার্ব্বত্য জাতি ও সমতলের শ্রমিকদের উন্নয়নকার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন।

গত ৭ই ও ৮ই জুন কব্বুরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এক সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত হইয়া বাংলাদেশ হইতে শ্রীযুত নলিনীকুমার ভদ্র উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। ৭ই জুন সকালে স্থানীয় "বীর-মন্দিরে" পতাকা উত্তোলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালে বীর-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, দ্বৈভাষিক পত্রিকা (তেলুগু ও ইংরেজী) 'যুগধর্ম্ম'-সম্পাদক শ্রীমহেশ্বর শর্ম্মা "ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শন ও মার্কস্‌বাদ" সম্বন্ধে তাঁহার ভাষণ প্রদান করেন। ৮ই তারিখ অপরাহ্ণে বীর-মন্দিরে এক সভায় কয়েকজন বক্তার বক্তৃতার পর শ্রীযুত নলিনীকুমার ভদ্র ইংরেজী ভাষায় এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি তাঁহার প্রবন্ধে ভারতীয় সংস্কৃতি, আদিম জাতিদের অবস্থা, পূর্ব্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করেন। বীর-মন্দিরের সেক্রেটারী ও স্থানীয় সংস্কৃত বিদ্যা-পীঠের অধ্যাপক শ্রী কে. ভি. এন. আপ্পারাও, এম-এ, নলিনী-বাবুর প্রবন্ধের বিষয়-বস্তু মুখে মুখে তেলুগু ভাষায় অনুবাদ করেন। স্থানীয় হিন্দী স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী কে. রত্নমা এক মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীচন্দ্রমূর্ত্তি, শ্রীলক্ষ্মীপতিরাও প্রমুখ বীর-মন্দিরের কর্ম্মীদের চেষ্টায় অনুষ্ঠানটি বিশেষ সাফল্য-মণ্ডিত হয়।

নিষ্কাম দান

শ্রীযুত নির্ম্মলকুমার দে কলিকাতা হাইকোর্টের তরুণ ব্যারিষ্টার। প্রচুর পৈতৃক বিত্তের অধিকারী। সেই বিত্ত তিনি বহুজনের হিতের জন্ত দান করিয়াছেন। সম্পত্তির মূল্য হইবে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা। এই দানের সদ্ব্যবহারের ভার পড়িয়াছে রামকৃষ্ণ মিশনের উপর। শুনিতে পাই, দে মহাশয় সস্ত্রীক পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া কোন ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করিবেন। যিনি কলিকাতা নগরীতে অনেক বাড়ীর মালিক ছিলেন, তাঁহার এই পরিবর্ত্তন ভগবৎকৃপার নিদর্শন। গান্ধীজী ধন-বৈষম্যের অবিচার দূর করিবার জন্ত ন্যাস (trusteeship) নীতি প্রচার করেন। নির্ম্মলবাবু গান্ধীজীর আসন্ন ভক্ত বা গুণগ্রাহী না হইয়াও তাঁহার পন্থা অবলম্বন করিলেন। গান্ধী-ভক্তবৃন্দের এই নিষ্কাম উদাহরণ হইতে নিজেদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তৎপর হওয়া উচিত। নির্ম্মলবাবুর কুল পবিত্র হইল; তাঁহার জননী হইলেন কৃতার্থা।

কুসুমরঞ্জন পাল, আবদুর রউফ মালিক

এতদিন পর নেতাজীর তিন জন সহকর্ম্মীর খবর পাওয়া গিয়াছে। যুদ্ধজয়ের পর বিজয়ী রুশবাহিনী তাঁহাদের বন্দী করিয়া লইয়া যায় তাহাদের নিজস্ব এলাকায়। লোকে মনে করে যে, রুশ বন্দীশালার অত্যাচারে তাঁহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে। উক্ত নামীয় দুই জনের মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তৃতীয়, আবদুর রশিদ মালিক খালাস পাইয়াছেন; কিন্তু তিনি কোথায় আছেন তাহা কেহ বলিতে পারে না বা বলিতে চায় না। আজাদ হিন্দ বাহিনীর ইউরোপীয় শাখার কর্ম্মী এরূপ কত জন রুশ-বন্দীশালায় বা বিজয়ী রাষ্ট্রপুঞ্জের বন্দীশালায় প্রাণ দিয়াছেন বা এখনও তথায় আছেন, তাহার সংবাদ আমাদের পররাষ্ট্র বিভাগ নিশ্চয়ই লইতে চেষ্টা করিতেছেন। তাহার ফলাফল জানাইলে সুখী হইব।

কিরণশশী সেবায়তন

বুক পরীক্ষা ও যক্ষ্মারোগের চিকিৎসার জন্ত কিরণশশী সেবায়তনের সংলগ্ন জমির উপর যে বিরাট চারতলা ভবন নির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার একতলা সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অর্থের অভাবে বাকী তিনতলার নির্ম্মাণকার্য্য স্থগিত রাখিতে হইয়াছে; অথচ ইহা অত্যন্ত জরুরী। রোগীর সংখ্যা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাইতে থাকায় সেবায়তনে স্থানসঙ্কুলান হইতেছে না।

যক্ষ্মা সংক্রমণের সূচনায় এই ধরণের চিকিৎসাগার (ক্লিনিক) অভাবগ্রস্ত রোগীদিগকে অতি সহজেই বিনা ব্যয়ে রোগনির্ণয় ও চিকিৎসাদি ব্যাপারে সাহায্য করিতে পারে। বহু ক্ষেত্রে এইভাবে রোগের প্রসার বন্ধ করা সম্ভব হয়। আমাদের দেশে বিপুলসংখ্যক লোক যক্ষ্মাব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে খুব কম রোগীই হাসপাতালে স্থানসংগ্রহে সমর্থ হন। দরিদ্র-বান্ধব-ভাণ্ডার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কিরণশশী সেবায়তনে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা করা হয়। ১০।১২, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটের এই বিরাট চিকিৎসা-ভবনের নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্ত সর্ব্বসাধারণের অর্থসাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। টাকাকড়ি ৬৫।২বি, বিডন ষ্ট্রীট এই ঠিকানায় দরিদ্র-বান্ধব-ভাণ্ডারের সম্পাদক শ্রীচন্দ্রশেখর গুপ্তের নিকট পাঠাইলে তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

মৌলানা হস্‌রত মোহানী

এই শ্রেষ্ঠ আলেম ও উর্দ্দু কবি প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। আলীগড় কলেজে তিনি শিক্ষিত; শেষ জীবনে আলীগড়ের বিষক্রিয়ায় অভিভূত হইয়া পড়েন। মুসলিম লীগের "দ্বি-জাতি"তত্ত্বে বিশ্বাস না করিয়াও তিনি তাহার উন্মাদনায় যোগদান করেন। প্রায় ৩০ বৎসর কাল জাতীয়তাবাদী হস্‌রত মোহানীর এই পরিণতিতে তাঁহার গুণমুগ্ধ হিন্দু-মুসলমান অনেকেই বিক্ষুব্ধ হন।

হস্‌রত মোহানী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঘোরতর শত্রু ছিলেন। তিনি খেলাফৎ আন্দোলনের জাগৃতির সময় উত্তর ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে এই বৈর ভাব তীব্রভাবে জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। ১৯২২ সালের আমেদাবাদ কংগ্রেসে তাঁহার পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব মোটেই আকস্মিক ছিল না; এবং তাহা ভোটে দিয়া হারিয়া যাওয়ার গৌরব তিনি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। গান্ধীজী "স্বরাজে"র কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সংজ্ঞা দিতে অস্বীকার করেন; তদবধি স্বাধীনতার সারবস্তু এই সংজ্ঞায় দেশবাসীকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। সেই সময় হইতে হস্‌রত মোহানী কংগ্রেসী নীতিকে বিদ্রূপ করিতে থাকেন।

রাজনীতি ছাড়া হস্‌রত মোহানীর প্রীতি ছিল সাহিত্যের প্রতি। তিনি বিশিষ্ট উর্দ্দু কবি ছিলেন। ঐ সাহিত্যকে তিনি নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ডক্টর আনন্দ পাঁড়ে

গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর আনন্দ পাঁড়ে জিপ দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন। তিনি দামোদর পরিকল্পনার কোনার বাঁধ নির্ম্মাণের ভার পাইয়াছিলেন এবং সেই কার্য্য উপলক্ষে ভ্রমণের সময় মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবনান্ত ঘটে। তাঁহার পরিবার-পরিজনের উদ্দেশে আমাদের সমবেদনা জানাইতেছি।

সুরেশ চক্রবর্ত্তী

পণ্ডিচেরী যাত্রার সময় শ্রীঅরবিন্দের অন্যতম সহচর ছিলেন সুরেশ চক্রবর্ত্তী। তদবধি তিনি গুরুর সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে সাধনোচিত লোকে প্রস্থান করিয়াছেন।

এই সংবাদে স্বদেশী যুগের স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিল। ইনি ছিলেন রংপুরের ঈশান চক্রবর্ত্তীর পুত্র। তিনি পিতার আদর্শে স্বদেশী যজ্ঞে নিজেকে আহুতি দিয়াছেন। ঈশান চক্রবর্ত্তী রংপুরে বিশিষ্ট সরকারী চাকুরিয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্রগণ বিপ্লব-আন্দোলনে যোগদান করিবার পথে কোন বাধা পান নাই। জ্যেষ্ঠ প্রফুল্ল বোমার কার্য্য-কারিতা পরীক্ষার সময় আঘাত পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুরেশ মুরারীপুকুরের বাগান-বাড়ীতে অবস্থিত বিপ্লবের কেন্দ্রে যোগদান করেন।

তার পর তাঁহার পণ্ডিচেরী প্রবাস। বাহিরের জগতের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক ছিল সাহিত্যের মাধ্যমে। গত কয়েক বৎসর "হসন্ত" এই ছদ্মনামে পত্রাকারে লিখিত তাঁহার প্রবন্ধাবলী বাংলার সাহিত্য ও রাজনীতির সহিত প্রাণের নিগূঢ় সম্পর্কের পরিচয় দান করিত। আজ সেই সম্পর্কও ছিন্ন। তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে নৈনীতাল হাসপাতালে পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু, বাঙালী সমাজের নিকট একটি নিদারুণ শোক সংবাদ। তাঁহার মৃত্যু বিশেষভাবে উত্তর প্রদেশের নিকটেই এক অপূরণীয় ক্ষতি বলিয়া বিবেচিত হইবে, কারণ তাঁহার সমগ্র কর্ম্মবহুল জীবনের কেন্দ্রই ছিল উত্তর-প্রদেশ। স্বাধীনতা-সংগ্রামে উত্তর-প্রদেশের কংগ্রেসে তাঁহার বিশিষ্ট দান ও স্থান স্বীকৃত হইয়াছে। ১৯৪২ সালের 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলন যখন এক সময়ে গোপন ক্রিয়াকলাপে পরিণতি লাভ করে, তখন তরুণী শ্রীযুক্তা অরুণা আসফ আলীর সঙ্গে সেই সেই গোপন সংগ্রামের নেতৃত্ব তিনি গ্রহণ করেন। বহুবার তিনি কংগ্রেস আন্দোলনে কারাবরণ করিয়াছেন। ১৯৪৬ সালে তিনি উত্তর-প্রদেশ পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তিনি ভারতীয় গণ-পরিষদেরও সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। মতবাদে সোস্যালিষ্ট হইলেও কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক একটুও শিথিল হয় নাই। শ্রীযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে উত্তর-প্রদেশের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মীর অভাব ঘটিল।

এস্. কে. সেন

মোটর বা জিপ দুর্ঘটনা আজকাল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়াছে। গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গের সেচ-বিভাগীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এস, কে. সেন এইরূপ একটি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাইয়াছেন। আমরা তাঁহার আত্মীয়-পরিজনের উদ্দেশে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

এইরূপ দুর্ঘটনা অসাবধানতা বা হঠকারিতার ফল। তাহার জন্য অনেক সময় চালকই দায়ী। যান্ত্রিক সভ্যতার আমলে নানা নূতন রোগের মত ইহাও সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্র বা পৌর-প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে প্রতিষেধক ব্যবস্থার অন্ত নাই। কিন্তু এই রোগ দমন করা যাইতেছে না। মার্কিণ মুলুকে হিসাব করিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে যে, যুদ্ধের সময়ে দৈনিক যত লোক হত বা আহত হয়, মোটর, জিপ ও বিমান দুর্ঘটনায় তদপেক্ষা অল্পসংখ্যক লোক হতাহত হয় না।

তুলসীদাস কর

অধ্যাপক তুলসীদাস কর তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে ৬ই জ্যৈষ্ঠ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৮ হইয়াছিল। ইনি সুদীর্ঘকাল বেঙ্গল এডুকেশন্তাল সার্বিসে—বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে কার্য্য করিবার পর সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইনি গত ৩৬ বৎসরকাল থিয়সফিক্যাল সোসাইটির কার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি প্রথমে কলিকাতার বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটির সম্পাদক ও পরে সভাপতির পদে

তুলসীদাস কর

অধিষ্ঠিত হন। ইনি উক্ত সোসাইটির মুখপত্র "ব্রহ্মবিদ্যা"র সম্পাদক ছিলেন। মরণের পর, অভিব্যক্তিবাদ, পুনর্জন্মবাদ, দিব্যদৃষ্টি, জ্ঞানের পথ ইত্যাদি তাঁহার কয়েকখানি পুস্তক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি বেশ উঁচু দরের বক্তা ছিলেন, তাঁহার বক্তৃতা যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে দর্শন ও ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার জ্ঞান কিরূপ প্রগাঢ় ছিল।

ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং বিভিন্ন পঞ্জিকার সমন্বয়সাধন করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইনি বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইনি "প্রবাসী" মাসিক পত্রিকার সহিত ইহার প্রথম যুগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

নেপালে পণ্ডিত নেহ্রু

ভাটগাঁওয়ের মন্দিরে
ইন্দিরা গান্ধী, নেপালস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের কন্যা এবং নেপালের স্বরাষ্ট্রসচিব
শ্রীবিশ্বেশ্বরীপ্রসাদ কৈরালাসহ পণ্ডিত নেহ্রু
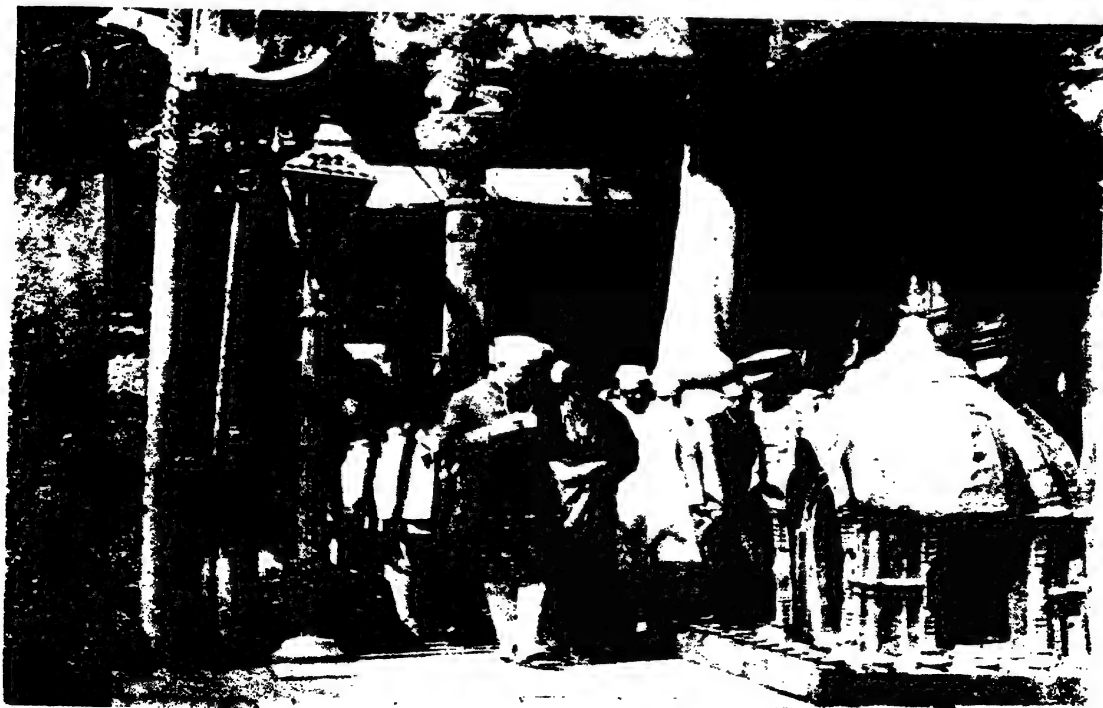
কাঠমাণ্ডুর নিকটবর্ত্তী গুহেশ্বরী মন্দির পরিক্রমণরত পণ্ডিত নেহরু

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫১শ ভাগ
১ম খণ্ড
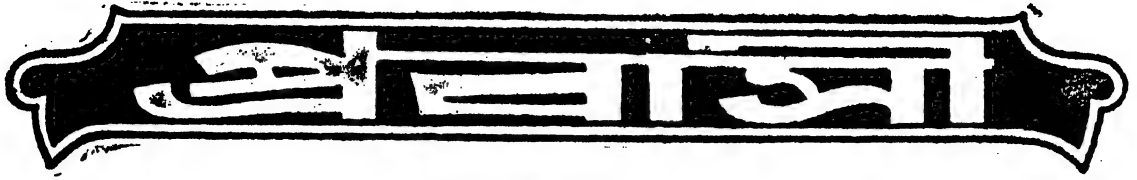
শ্রাবণ, ১৩৫৮

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

নির্ব্বাচনী ঘোষণাপত্র

এই মাসে বিভিন্ন প্রকারের চারিটি কার্য্যসূচী এদেশের জনসাধারণের সম্মুখে দেওয়া হইয়াছে। প্রথমটি ভারত সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, দ্বিতীয়টি কংগ্রেসের কার্য্যসূচী, তৃতীয়টি কৃষক-প্রজা-মজুর পার্টির কার্য্যসূচী ও চতুর্থটি সমাজতন্ত্রী (সোস্তালিষ্ট) পার্টির কর্ম্মসূচী। এই চারিটির সম্যক্ বিচার সম্পাদকীয় মন্তব্যের মধ্যে দেওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু উহার প্রধান বিষয়বস্তুর আলোচনা এখন নিতান্তই প্রয়োজন, কেননা এই সকল ঘোষণাই আগামী নির্ব্বাচনকে লক্ষ্য করিয়া করা হইয়াছে এবং সে নির্ব্বাচনের আর মাত্র কয়েক মাস সময় আছে, সুতরাং দেশবাসীকে অবহিত করা প্রয়োজন।

জাতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়ামাত্র আমরা দেখিয়াছি। তাহাতে মোটামুটি জানা যায় যে, দেশের ও জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নয়নকল্পে যে কার্য্যক্রম অবিলম্বে আরম্ভ করা প্রয়োজন তাহার একটি পরীক্ষামূলক খসড়া (৩২২ পৃষ্ঠাব্যাপী) সাধারণের সম্মুখে রাখা হইয়াছে। এই খসড়ায় স্বাক্ষর করিয়াছেন পণ্ডিত নেহরু ও পাঁচ জন সদস্য, শ্রীগুলজারিলাল নন্দ, শ্রীভি. টি. কৃষ্ণমাচারী, শ্রীপি ভি. দেশমুখ, শ্রীজি. এল. মেহ্‌তা। মন্ত্রিমণ্ডলী, রাজ্য গবর্ন্মেণ্টসমূহ, পরিকল্পনাকারক-কমিশনের উপদেষ্টাবর্গ ও বিভিন্ন মণ্ডলীর নিকট হইতে সমালোচনা ও প্রস্তাবাদি পাইবার পর পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হইবে।

পরিকল্পনা রচয়িতাগণ বলিয়াছেন যে, গণতান্ত্রিক দেশে এ জাতীয় পরিকল্পনার সাফল্য ও সার্থকতা নির্ভর করে দেশবাসীর পক্ষ হইতে সরকারের প্রতি বিশ্বাস এবং পূর্ণ সহযোগিতার উপর। পরিকল্পনার মোটামুটি রূপ এই প্রকার :

পরিকল্পনার জনকল্যাণমূলক কার্য্যের উন্নয়নের দরুন মোট ১৭৯৩ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। পরিকল্পনাটি দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের দরুন ১৪৯৩ কোটি টাকা ব্যয় হইবে এবং ইহা কার্য্যকরী হইলে ১৯৫৫-৫৬ সালের শেষাশেষি অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি মোটামুটিভাবে যুদ্ধপূর্ব্বকালের মতই পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে ; এই সময়ের মধ্যে লোকসংখ্যা যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, তাহার হিসাবও ইহাতে ধরা হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশের দরুন ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় পড়িবে। ইহাতে পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসরে উন্নয়নের হার দ্রুততর করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

পরিকল্পনা কমিশনের অভিমত এই যে, যে কোন প্রকারেই হউক না কেন, পরিকল্পনার প্রথমাংশ কার্য্যকরী করিতেই হইবে। যথেষ্ট পরিমাণে বিদেশের সাহায্য পাওয়া গেলে পরিকল্পনার দ্বিতীয়াংশ লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

পরিকল্পনার প্রথমাংশে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে :

(১) উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনসহ যে সকল কার্য্যসূচী হাতে রহিয়াছে সেগুলির সম্পূর্ণতা সাধন করা ;

(২) অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে খাদ্য ও কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধি ;

(৩) উৎপাদনমূলক ও কারিগরি সম্পদের উন্নয়ন এবং লোক বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা প্রসারের জন্য আবশ্যক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা ;

(৪) সমাজসেবা কার্য্যের অগ্রগতির স্থায়িত্ব সাধন ও উহার প্রসারের ব্যবস্থা এবং

(৫) পরিচালনা ও সমাজসেবা কার্য্যের পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা এবং অপেক্ষাকৃত অনুন্নত রাজ্যসমূহে দ্রুত উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ

	কেন্দ্রীয় সরকার	ক তপশীল ভুক্ত রাজ্যসমূহ	খ তপশীল ভুক্ত রাজ্যসমূহ	গ তপশীল ভুক্ত রাজ্যসমূহ	(হিসাব লক্ষ টাকায়) মোট
কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন	১৮,০৪	১২৭,৪৭	৩৭,৯৩	৮,২৬	১৯১,৭০
সেচ ও বিদ্যুৎ	১৭৫,৯০	১৯১,৬০	৭৯,৯১	২,৮৫	৪৫০,২৬
পরিবাহন ও যোগাযোগ	৩০৯,৬৯	৫৬,৪৭	১৬,৩৭	৫,৬৭	৩৮৮,২০
শিল্প	৭৫,৩৮	১৮,০৪	৭,১০	৪৭	১০০,৯৯
সমাজকল্যাণ	৫৪,২৪	১৬০,২৫	২৮,৭০	১০,৮৯	২৫৪,০৮
পুনর্বাসন	৭৯,০০	—	—	—	৭৯,০০
বিবিধ	২১,৭৬	৫,৭৯	১,০০	—	২৮,৫৪

এই পরিকল্পনাতে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, ইহাতে চারি বৎসরের কঠোর বাস্তবের সংঘাতের দরুন সরকার পক্ষ যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। পরিকল্পনার অভাব দেশে কখনও হয় নাই, কেননা এদেশের ছেলে-বুড়া, স্ত্রী-পুরুষ, পণ্ডিত-মূর্খ, সকলেই স্বাধীনতা লাভের পর দিব্যজ্ঞানলাভ করিয়াছেন এবং সেই কারণে পথে-ঘাটে, মাঠে-ময়দানে পরিকল্পনা ও কার্য্যসূচীর ছড়াছড়ি। কিন্তু এই পরিকল্পনাকারীদিগকে ভাবিতে হইয়াছে কি ভাবে ইহা কার্য্যে পরিণত করা যাইবে, সেজন্ত তাঁহারা কতকটা সংযতভাবে ইহা রচনা করিয়াছেন। সেই কারণে ইঁহারা বেকার সমস্যা এবং গ্রাম্য ও কুটির শিল্প ইত্যাদির সমস্যাপূরণে সোজা ও লম্বা প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন নাই যে উহা দু'দিনেই সফল হইবে।

দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্বন্ধেও ইঁহারা একটু হাতে রাখিয়া কথা বলিয়াছেন, কেননা ইঁহাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে শিখিতে হইয়াছে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সহজ, রাখা অতি অসম্ভব, কঠিন। একদিকে সংবিধানের দ্বারা লঙ্ঘন করাও ইঁহাদের অসাধ্য, অন্যদিকে দেশে উৎপাদন ও শস্যবৃদ্ধির যে অবস্থা ইঁহারা দেখিতেছেন তাহাও অগ্রাহ্য করা সম্ভব নহে, সুতরাং সেখানেও অতি সন্তর্পণে ইঁহাদের "শনৈঃ পন্থা" নীতি অবলম্বন করিতে বলিতে হইয়াছে।

বর্ত্তমানে দেশের লোকের মধ্যে আয়ের যে দারুণ বৈষম্য আছে তাহার কারণ ইঁহাদের অজ্ঞাত নহে। কিন্তু বিগত তিন চারি বৎসরের অভিজ্ঞতায় ইঁহারা বুঝিয়াছেন যে সরকারী ক্ষমতার সীমা কতটা এবং দেশের স্বাভাবিক সম্পদের পরিমাণই বা কি। দেশের কর্মীলোকের কর্ম্মবিমুখতা ও পুঁজিবাদীদিগের অর্থলোলুপতার বিষয়ও ইঁহাদের অজ্ঞাত নাই। সুতরাং সকল দিক বজায় রাখিয়া ইঁহাদের চিত্র আঁকিতে হইয়াছে। যাঁহাদের হাতে ক্ষমতা নাই বা অভিজ্ঞতা নাই তাঁহাদের এ সবের বালাই নাই, সুতরাং তাঁহাদের কার্য্যসূচী জনগণের নিকট অধিক মুখরোচক হইতে পারে।

আমরা এ কথা বলিতে চাহি না যে, এই পরিকল্পনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। বরং আমরা বলিব যে, ইহাতে দূরদৃষ্টি ও সাহসের অভাব প্রতি পদেই দেখা যাইতেছে। বোধ হয় বর্ত্তমানের নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি পরিকল্পনাকারীদিগের মন কিছু অধিক মাত্রায় অভিভূত করায় এবং নিজেদের ও সহকারীদিগের কার্য্যক্ষমতার সীমা কতটুকু তাহা জানায় ইঁহারা ভবিষ্যতের ছবি উজ্জ্বল ভাবে দেখিতে অসমর্থ।

এখন রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির কার্য্যসূচী বিচার করা যাক। এ বিষয়ে আমাদের প্রধান বিচার্য্যবস্তু পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কে কতটা অবহিত। কেননা "বাংলা ডুবিয়া যাক" বা "বঙ্গালী নষ্ট হো" এ কথা অন্ত প্রদেশীয়দের মর্ম্মে আঘাত না করিতে পারে, কিন্তু আমাদের করে। অন্যদিকে ইহাও সম্ভব নয় যে পশ্চিমবাংলা বা বাঙালী জাতি একলা দাঁড়াইয়া সকল সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হইবে। তবে বাঙালীর অস্তিত্বের সহিত যে সকল নীতি বা ব্যবস্থা অতি গূঢ়ভাবে যুক্ত তাহার পরিপন্থী সব কিছুই আমাদের বিষবৎ বর্জ্জনীয়, একথা স্পষ্টভাবে বুঝিয়া আমাদের বিচারে নামিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে বর্ত্তমানে কংগ্রেস, কৃ-প্র-ম, সমাজতন্ত্রী জনসঙ্ঘ, হিন্দু মহাসভা, ফরওয়ার্ড ব্লকের খণ্ডগুলি, আর. এস. পি., আর. সি. পি. আই, কম্যুনিষ্ট পার্টি ইত্যাদিতে ছোটবড় প্রায় বারতেরটি দল রাজনৈতিক প্রাধান্যের চেষ্টা চালাইতেছে। ইহাদের মধ্যে তিন দলের কার্য্যসূচী আমরা দেখিয়াছি এবং সেগুলির অতি সংক্ষিপ্ত বিচার আমরা এখানে করিতেছি।

কংগ্রেসের কার্য্যসূচী অতিবিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়িয়া করা হইয়াছে। কিন্তু বাংলা কি ভাবে ইহাতে উপেক্ষিত হইয়াছে তাহা ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের অংশেই দেখা যায়। এখানে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের কথা বলা হইয়াছে, বাংলার স্থান পূর্ব্ব ভারতে সুতরাং বাংলাকে বাদ দেওয়া হইয়াছে বলা যায়। ইহাই বাংলা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব অতি সুস্পষ্ট ভাবে নির্দ্দেশ করিতেছে।

পণ্ডিত নেহরু, পুরুষোত্তম দাস টণ্ডন (যিনি বাংলা ভাষার গৌরব পর্য্যন্ত অস্বীকার করেন), রাজাগোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই সকল মহাশয় ব্যক্তির বাংলা ও বাঙালীর প্রতি মনোভাব যে কি তাহা সকলেই জানে। সুতরাং কংগ্রেসের কার্য্যসূচী যদি ইঁহাদের বা ইঁহাদের নিয়োজিত আত্মীয়-স্বজন এবং খল ও শঠ তোষকবর্গের হাতে থাকে তবে বুঝিতে হইবে ঐ কর্ম্মসূচী এবং বাঙালীর মধ্যে পক্ক বিল্বফল ও কাকের সম্বন্ধ। কংগ্রেসের মধ্যে দুর্নীতি ও অযোগ্যতা যে সকল কপট যোগীদের জন্ত আসিয়াছে তাহাদের কংগ্রেস হইতে—অন্ততঃ অধিকারীমণ্ডলী হইতে—বহিষ্কারের সূচনা যত দিন না হয় তত দিন কংগ্রেসী সরকার হইতে বাঙালীর আশার কিছুই নাই।

কৃষক-প্রজা-মজুর দলের নির্ব্বাচনী কর্ম্মসূচীতে অতি অসংবদ্ধভাবে তাঁহাদের পরিকল্পনা দেওয়া হইয়াছে। যাহা কিছু উহাতে পাওয়া যায় তাহার প্রধান অংশ কংগ্রেসী কর্ম্মসূচীর সঙ্গে এক। বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত অত্যন্ত বিক্ষিপ্তচিত্ততার পরিচায়ক। এক বিষয়ে তাঁহারা খুবই সতর্কতা দেখাইয়াছেন, তাহা ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন সম্পর্কে। ইহার উল্লেখমাত্র নাই এবং শ্রীমান্ প্রফুল্ল ঘোষ যখন ঐ দলে, তখন "কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃপরম্"?

সোশ্যালিষ্ট পার্টির কার্য্যসূচীতেও বিশেষ সঙ্গতির অভাব রহিয়াছে। জমিদারী উচ্ছেদ সম্পর্কে ইঁহাদের ব্যবস্থা অতি অপরূপ। অভিজ্ঞতার অভাব ও বাস্তবের প্রতি উপেক্ষা প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই রহিয়াছে।

বারান্তরে এই সকল নির্ব্বাচনী কর্ম্মসূচীর আরও ব্যাপক সমালোচনা আমরা করিব।

কংগ্রেসের কার্য্যক্রমের বিবরণ এইরূপ :

স্বাধীনতা অর্জন এবং ভারতীয় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ভারতের জনসাধারণের মুক্তি-সংগ্রামের এক অধ্যায় শেষ হইয়াছে। আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাফল্য বহুদিক হইতে অতুলনীয়। গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়া জাতীয় কংগ্রেস এই সংগ্রাম করিয়াছে এবং দেশের অগণিত নরনারীর সঙ্গে একযোগে তাঁহার প্রদর্শিত নীতি ও পন্থা অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছে। দেশকে এই সংগ্রামের পথে পরিচালনা করা এবং সেই সংগ্রামে সাফল্যলাভ করা কংগ্রেসের মহান্ সৌভাগ্য। জাতির জনক আমাদের বলিয়া গিয়াছেন, জাতীয় জীবনের নৈতিক ও চারিত্রিক ভিত্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে এবং ইহারই ভিত্তিতে রাজনৈতিক জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন, উপায় ও লক্ষ্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। যে উপায় আমরা অবলম্বন করি, চূড়ান্ত লক্ষ্য ঐ অনুযায়ীই গঠিত হইয়া থাকে। ভারতীয় শিক্ষা এবং ঐতিহ্যে কর্ত্তব্য সম্পাদনের উপরই প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অধিকার ও সুবিধা সুযোগ এই কর্ত্তব্য হইতেই উদ্ভূত হয়। কংগ্রেস ও জনসাধারণ এই শিক্ষা আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল ; এবং ইহা হইতে যে প্রেরণা তাহারা লাভ করিয়াছে, তাহাদ্বারা তাহারা উপকৃত হইয়াছে এবং ইহা তাহাদের লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। বিশ্বে যখন বিরোধ ঘনাইয়া আসে, সংঘর্ষ ও সাধারণ মানের অবনতি যখন জাতীয় জীবনকে জটিলতর করিয়া তোলে, তখন ইহা মনে রাখা আবশ্যক। এই নীতি গ্রহণেই সাফল্য সম্ভবপর হইবে এবং এই পথেই ভারত চরম উন্নতি অর্জ্জন করিবে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েও রাজনৈতিক স্বাধীনতাই মাত্র আমাদের লক্ষ্য ছিল না, আমরা জনসাধারণকে শোষণ ও অভাব হইতেও মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলাম। এজন্য তাহাদের খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা প্রাথমিক কর্ত্তব্য এবং ইহার পর তাহাদের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর নানা জটিল সমস্যা জাতির সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে এবং ইহার ফলে নবার্জিত স্বাধীনতাও বিপন্ন হইয়াছে। দেশের স্বাধীনতা ও ঐক্যকে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা, বিভিন্ন অংশের সংহতিসাধন করিয়া ভারতীয় ইউনিয়ন গঠন করা, লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন ব্যবস্থা করা এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির ভিত্তি স্থাপন করা—ইহাতেই জাতির সমগ্র অন্তর ও শক্তি নিযুক্ত ছিল। গত মহাযুদ্ধ আমাদের পুরাতন পরিচিত জগৎকে বহুদিক হইতে ধ্বংস করিয়াছে এবং অনেক নূতন সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে। দেশ বিভাগের ফল এক তীব্র তিক্ততার সৃষ্টি। আমাদের সামরিক ও অসামরিক ব্যবস্থাসমূহ নূতন করিয়া গঠন করিতে হইয়াছে এবং বিদেশী কর্ম্মচারীদের স্থলে দেশী কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হইয়াছে।

স্বাধীনতা অর্জনের পর নানা জটিল ও বিরাট সমস্যার ফলে আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সন্তোষজনক হয় নাই। দেশের লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের জন্য এখন যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য, বস্ত্র এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা নাই। সংবিধানে কংগ্রেসের যে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য বর্ণিত আছে, উহা এখনও অনেকাংশে সফল হয় নাই। আমাদের এই উদ্দেশ্য সাধিত না হইলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিরর্থক। সুতরাং অর্থনৈতিক প্রগতির উপরে প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। স্বাধীনতা রক্ষা এবং দেশের সংহতি রক্ষার পরেই ইহার স্থান।

দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কিরূপ হইবে, এবং ইহার উদ্দেশ্য সংবিধানে বর্ণিত হইয়াছে। সমাজ প্রতিষ্ঠানের এই ধারণার ফলেই ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উদ্ভব হইতে পারে এবং এখানে প্রত্যেকেই সমান অধিকার ও সুবিধা পাইয়া থাকে ও ধর্ম্ম, শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বিরোধ অপসারিত হয়। জাতীয় ক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগের ফলে সামাজিক প্রগতি ও শান্তি সম্ভবপর হইয়া থাকে এবং ইহার ফলে জাতি শক্তিশালী হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগে নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি উদ্ভূত হইতে পারে এবং ইহার ফলে বিশ্বশান্তি সম্ভবপর হয়।

ভারতের ন্যায় অল্প সম্পৎশালী দেশের উন্নতি সাধন করিতে হইলে জাতীয় জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে এই সকল সম্পদের প্রয়োগ প্রয়োজন। এজন্য কংগ্রেস পরিকল্পনা-কমিশনের কার্য্যকলাপ সমর্থন করিতেছেন কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্য্যকর করিবার জন্য ইহার পশ্চাতে জনসাধারণের সমর্থন থাকা আবশ্যক। বর্ত্তমান ভারতে পল্লীজীবনের উন্নতির প্রতি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। অতীতে ইহা উপেক্ষিত হইয়াছে সুতরাং বর্ত্তমানে ইহার সংশোধন আবশ্যক। তাহা হইলেই ইহাদের প্রগতি সম্ভবপর হইবে এজন্য ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার সংশোধন আবশ্যক। জমিদারী, জায়গীরদার এবং অনুরূপ ব্যবস্থার যতশীঘ্র সম্ভব উচ্ছেদ করিতে হইবে।

জমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগ কৃষিজাত উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে অন্তরায়। এজন্য যৌথ চাষ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কৃষি শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে হইবে। তাহাদের জন্য সামান্য ধরণের কাজকর্ম্ম এবং কুটীরশিল্পের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে সকল জমি নূতনভাবে আবাদ করা হইবে, তাহা বণ্টনের ব্যাপারে তাহাদের অধিকতর সুবিধা দেওয়া হইবে। সমবায় পদ্ধতিতে এই সকল জমির চাষ করিতে হইবে এবং ইহাদের গৃহ নির্ম্মাণের জন্যও জমি দিতে হইবে।

দুগ্ধ সরবরাহ বৃদ্ধি ও কৃষির উন্নতিকল্পে দুগ্ধবতী গো-মহিষ ও ভারবাহী গবাদি পশু সংরক্ষণ এবং সুপ্রজনন ব্যবস্থার প্রতি ক্রমশঃ অধিকতর মনোযোগ নিবদ্ধ করিতে হইবে।

অন্নসংস্থানকারী লোকের চাপ এতই বাড়িয়াছে যে, জনসাধারণের একাংশকে চাষাবাদ হইতে অন্যান্য বৃত্তি গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিছু লোককে বৃহৎ শ্রম-শিল্পে নিয়োগ করা যাইতে পারে; কিন্তু ছোটোখাটো ও কুটীর শিল্পেই অধিকাংশ লোকের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সব কুটীর শিল্প ভারতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং রাষ্ট্রের সহায়তায় উহাদের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে ও অন্যান্য শিল্পের সহিত সমন্বয় সাধন করিতে হইবে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই ব্যবস্থাকে কার্য্যকর ও স্বল্প ব্যয়সাধ্য করিবার জন্য ছোটখাট ও কুটীর শিল্পে সর্ব্বাধিক সুষ্ঠু কর্ম্মকৌশল প্রয়োগ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে গবেষণার ব্যাপারে উৎসাহ দিতে হইবে। কুটীর শিল্পকে যথাসম্ভব যৌথ শিল্প সংস্থায় রূপান্তরিত করা উচিত।

হস্তচালিত তাঁত আমাদের প্রধান কুটীর শিল্প এবং সরকারের সর্ব্ববিধ সাহায্যলাভের যোগ্য। বহু তাঁতি বেকার হইয়াছে অথবা আংশিকভাবে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে। তাহাদিগকে যথোপযুক্ত পরিমাণ সুতা সরবরাহ করার বিশেষ বন্দোবস্ত করা সরকারের উচিত। শ্রমশিল্পে 'নির্লিপ্ততার' নীতি অনুসরণ করা সম্ভবপর নহে। অধিকাংশ দেশে এই নীতি অগ্রাহ্য হইয়াছে এবং ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় আদৌ উপযোগী নহে। যে কোন পরিকল্পনার সঙ্গে ইহা সামঞ্জস্যহীন; মূল শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত হইবে—কংগ্রেসের ইহাই বহুকালের নীতি। এই নীতি ক্রমশঃ কার্য্যকর করিতে হইবে। তবে বেসরকারী প্রচেষ্টার জন্য বৃহৎ ক্ষেত্রও রহিল। কিন্তু এক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগী ব্যক্তিদিগকে জাতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য মানিয়া লইতে হইবে। বেসরকারী কর্ম্মক্ষেত্রে সরকারী কর্ম্মপ্রচেষ্টার ক্রমিক সম্প্রসারণ বিভিন্ন ব্যাপারের উপর নির্ভরশীল; তন্মধ্যে লব্ধ ফল, সহজপ্রাপ্য সম্পদ ও বর্ত্তমান সময়ে দেশবাসীর দক্ষতা বিবেচ্য। সামাজিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে কোন্ ব্যবস্থা অনুকূল হইবে, তাহাই হইবে পরীক্ষার নিরিখ। দেশের বৈষয়িক সমুন্নতির অন্তরায় হইতে পারে এমন কোন কায়েমী স্বার্থ অথবা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অধিকারী ব্যক্তিদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না অথবা কোনরূপ শ্রুতি-সুখকর ধ্বনিতে বিভ্রান্ত হইলে চলিবে না।

জনসাধারণের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং সহজপ্রাপ্য সম্পদের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করিয়া বৈষয়িক উন্নয়নের উদ্দেশ্য কার্য্যে রূপান্তরিত করিতে হইবে। সমাজ-জীবনে পক্ষে অপরিহার্য্য কোন ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইতে পারে, এমন বিষয় পরিহার করাই সর্ব্বদা প্রথম বিবেচ্য ব্যাপার হইবে। এই হেতু যেসব পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ অল্প, তাহাদের নিয়ন্ত্রিত বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমান অবস্থায় দ্রব্য-মূল্যের স্তর উর্দ্ধগতি হওয়ায় আমাদের বহু ব্যাপারে অসুবিধা ঘটিয়াছে এবং এই হেতু আমাদের বৈষয়িক উন্নয়নে গুরুতর বিঘ্ন সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং দৃঢ়ভাবে একটি মূল্য নির্দ্ধারণ নীতি অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক। এই নীতির প্রথম উদ্দেশ্য হইবে মূল্য বৃদ্ধি রোধ করা এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইবে কৃষিজাত দ্রব্য ও শিল্পজাত পণ্যমূল্যের বর্ত্তমান তারতম্য হ্রাস করা।

যদি মূল্যবৃদ্ধি রোধ ও হ্রাস করিতে হয়, তাহা হইলে কিয়ৎ পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত বণ্টন-ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। খাদ্যের ব্যাপারে দেশের কোটি কোটি জনসাধারণের ভাগ্য দেশব্যাপী নিয়ন্ত্রণ-প্রথার সহিত অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক যুক্ত। এই নিয়ন্ত্রণ-প্রথা না থাকিলে দেশের বহু স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। জনসাধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির তুলনামূলক প্রাচুর্য্য বিধানকল্পে অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিতে হইবে। এই অবস্থার উদ্ভব হইবার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ-প্রথার ক্রমিক বিলোপ সাধন করা যাইবে। একথা সত্য যে, নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় দুর্নীতির সৃষ্টি হইয়াছে। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্য্যকর করা এবং উহার পরিচালনার উন্নতি সাধন করার মধ্যেই দুর্নীতি দূর করার উপায় নিহিত।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ও শিল্পে বৈজ্ঞানিক কৌশল প্রয়োগের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। এই অবস্থা অব্যাহত রাখিতে হইবে এবং কারিগরী শিক্ষার জন্য যথোপযুক্ত বিধিব্যবস্থা করিতে হইবে। নদী উপত্যকা পরিকল্পনার ব্যাপারকে সর্ব্বাগ্রে স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং উহাকে সকল সময়েই অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। কৃষি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতিতে উহা অত্যাবশ্যক। বৃহদায়তন শ্রমশিল্পের ব্যাপারে ইস্পাত, কৃত্রিম সার, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও শিল্পে ব্যবহারোপযোগী রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের সহিত সংশ্লিষ্ট মূল শিল্প স্থাপনে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। ব্যাপকভাবে দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নয়ন সাধন করিতে হইলে সমাজের পক্ষে অধিক পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় করা প্রয়োজন হইবে। উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য বর্ত্তমানে দুঃখভোগের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এই হিসাবে যে পরিমাণ ত্যাগ করা প্রয়োজন, তাহা যথাসাধ্য সকলকে সমভাবে করিতে হইবে। কিন্তু যাহাদের আয় বেশী তাহাদিগের এই ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা পূরণের বিশেষ দায়িত্ব আছে। সমবেত প্রচেষ্টায় অর্থ সঞ্চয় করিয়া মূলধন গঠনে অধিক মাত্রায় ব্রতী হইতে হইবে। গঠনমূলক উদ্দেশ্য সিদ্ধিকল্পে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত প্রচেষ্টা কাজে লাগাইবার জন্য ইতিমধ্যেই কয়েকটি রাজ্যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। এই প্রচেষ্টা বহুল পরিমাণে জয়যুক্ত হইয়াছে।

অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে অর্থনৈতিক সাম্য ও সামাজিক ন্যায় বিচারেরও বিধান করিতে হইবে। এই পথেই সামাজিক শান্তি ও গণতন্ত্র রক্ষা পাইতে পারে। শহর ও পল্লী অঞ্চলের

মধ্যে যে বৈষম্য ছিল, যুদ্ধোত্তর মূল্যের ফলে তাহা কতকটা হ্রাস পাইয়াছে। রাষ্ট্রকর্ত্তৃক অর্থনৈতিক উন্নয়ন-ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে, বিশেষভাবে সেচ ও শক্তি উৎপাদন সংক্রান্ত বড় বড় পরিকল্পনা গ্রহণ করায় জনসাধারণের জীবনধারণের মানের পার্থক্য হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু এ সম্পর্কে এখনও অনেক কিছু করিবার আছে। এই বৈষম্য দূর করিবার জন্য সরকারী অর্থ সমাজহিতকর ব্যাপারে নিয়োগ করিতে হইবে এবং মৃত্যুকর ধার্য্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে হইবে। কর ব্যবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যাহাতে সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন আয়ের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত সামঞ্জস্য বিধান হয়।

চোরাবাজার হইতে অবৈধ লাভ-কর ফাঁকি ফাটকাবাজি এবং অন্যান্য সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপের ফলে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে বৈষম্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। জনসাধারণের সুবিধার জন্য এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের জন্য অনতিবিলম্বে এই দুর্নীতি দমন প্রয়োজন।

শ্রমিকদের অধিকার এবং স্বার্থ রক্ষায় রাষ্ট্রের যে আগ্রহ, বিভিন্ন উন্নত ধরণের আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। তবে এই সকল আইন কার্য্যকরী করিবার ব্যবস্থা আরও উন্নত করিবার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। শ্রমিকদের জন্য গৃহ নির্ম্মাণের প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মালিক ও শ্রমিকদের সহযোগিতায় এ বিষয়ে উৎসাহদানে রাষ্ট্রের যথাশক্তি চেষ্টা করা প্রয়োজন। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন শুধু যে শ্রমিকদের স্বার্থের জনাই কাম্য তাহা নহে, উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির জন্যও তাহা আবশ্যক। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে মাথাপিছু উৎপাদনের মাত্রা স্বল্প। একাধিক কারণে ইহা হইতে পারে। এই কারণগুলি অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি না পাইলে শ্রমিক তথা সমগ্র জাতির স্বার্থ ব্যাহত হইবে। শ্রমিক-মালিক বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য সালিশী-ব্যবস্থা এইরূপভাবে সংশোধন করিতে হইবে, যাহাতে সামাজিক ন্যায় বিচারের আদর্শের ভিত্তিতে এবং সময় ও অর্থের স্বল্পতম ব্যয়ে ন্যায়সঙ্গত মীমাংসায় উপনীত হইতে পারা যায়।

দেশের রেল চলাচল ব্যবস্থায় যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। ইঞ্জিন নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র পরিচালনায় চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন নির্ম্মাণ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফট লিঃ রেলওয়ে ওয়াগনও নির্ম্মাণ করিতেছেন। এ সম্পর্কে ক্রমশঃ স্বাবলম্বী হওয়াই আমাদের লক্ষ্য। পরিচালন-ব্যবস্থার আরও উন্নতি এবং যাত্রীদের, বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর গাড়ীতে ভ্রমণকারী যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করা আবশ্যক। কতিপয় রাজ্যে যানবাহন ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্তে আনা হইয়াছে। ইহার ফলে কার্য্যদক্ষতা এবং জনসাধারণের সুবিধা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সরকারী চাকুরীর অবস্থা এবং নিয়োগ প্রণালীকে জাতীয় পরিকল্পনার সহিত সুসমঞ্জস করিয়া তুলিতে হইবে। রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুযায়ী কর্ম্মচারীদের বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারী কর্ম্মচারীদের নৈতিক মান উন্নত হওয়া অত্যাবশ্যক। এতদুদ্দেশ্যে কার্য্যকরী সংস্থা গড়িয়া তোলা প্রয়োজন।

দুর্নীতির কথা প্রায়ই বলা হইয়া থাকে। সমাজ-জীবনে পাপগ্রহের ন্যায় বিবিধ প্রকার দুর্নীতি আজ বিদ্যমান, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দুর্নীতি দমনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। বিভাগীয় তদন্ত, আদালতে বিচারগত ব্যবস্থা এবং অভিযোগ প্রতিপন্ন করার সময় সাপেক্ষ পদ্ধতি বর্ত্তমানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রধান অন্তরায়স্বরূপ। এইরূপ দীর্ঘসূত্রী পদ্ধতিতে অনেক সময় অপরাধী নিষ্কৃতি পাইয়া যায়।

শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের গুরুত্ব সর্ব্বজনস্বীকৃত। কিন্তু যত দিন আমাদের সামর্থ্যের অপ্রতুল থাকিবে তত দিন উল্লেখযোগ্যভাবে তাহার উন্নয়নও সম্ভব নহে। তথাপি শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ঠিক পথে চালিত করিতে হইবে এবং যে সব ত্রুটি রহিয়াছে, তাহা দূর করিতে হইবে। শিক্ষাকে চাকুরী পাওয়ার উপায় মাত্র বলিয়া মনে করিলে চলিবে না, শিক্ষার উপর ছাত্রের বুদ্ধিবৃত্তি এবং চরিত্রগঠন নির্ভর করে। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া শিক্ষার সমস্যা বিচার করিতে হইবে। ভবিষ্যৎ বংশের অবস্থা কি হইবে, তাহা নির্ভর করিবে বর্ত্তমানে যে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহার উপর। সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। উৎপাদন প্রচেষ্টা এবং জাতীয় অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় হইতে শিক্ষাব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করিলে চলিবে না ; অপরপক্ষে শিক্ষাব্যবস্থাকে উহার অনুকূল করিয়া তুলিতে হইবে। বুনিয়াদী শিক্ষা অর্থাৎ কারুবিদ্যার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থাকে যথাসম্ভব কাজে লাগাইতে হইবে। যে কোন প্রকার কায়িক শ্রম পাঠক্রমে অবশ্য করণীয় বিষয় হওয়া উচিত এবং কায়িক শ্রম ভিন্ন ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা দেওয়া উচিত নহে। সত্য ও সুন্দরের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার এবং শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও নৃত্যকলায় উৎসাহদান শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

মহামারী নিবারণ, জল সরবরাহব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রচেষ্টায় যথেষ্ট অগ্রসর হওয়া গিয়াছে।

কয়েকটি এলাকায় ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। ফলে এই সব এলাকায় চাষ-আবাদের অনেক সুবিধা হইয়াছে। জনস্বাস্থ্য এবং উৎপাদনবৃদ্ধি উভয় দিক দিয়াই ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক। এদেশে মৃত্যুর হার হ্রাস পাইতেছে এবং সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা জনস্বাস্থ্যের উন্নতিরই লক্ষণ।

সংবিধানের বিধান অনুযায়ী তপশীলী জাতি, আদিবাসী ও অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নতিবিধানের বিশেষ দায়িত্ব সরকারের উপর অর্পিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকার উভয়েই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস চিরদিনই অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের সামাজিক উন্নয়ন অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করিয়াছে এবং তজ্জন্য যে সব উদ্যোগ করিয়াছে তাহাতে সাফল্যও অর্জন করিয়াছে। অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরা যত দিন না অন্যান্যের সহিত সমান অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধা লাভ করিতেছে তত দিন এই প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে। বিশেষভাবে আদিবাসীরা তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি অনুযায়ী যাহাতে উন্নত হইতে পারে তজ্জন্য তাহাদের সাহায্য করিতে হইবে।

ঐতিহাসিক এবং সাংবিধানিক প্রয়োজনে ভারতের কতক-গুলি রাজ্যকে আপাততঃ "খ" এবং "গ" তালিকাভুক্ত রাজ্য হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করিতে হইয়াছে। এই শ্রেণীবিভাগ অন্তর্বর্ত্তীকালীন। ইহাকে স্থায়ী ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতের কোন কোন অংশ এতকাল স্বতন্ত্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। সীমান্ত এলাকা এবং আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন। যথাসম্ভব দ্রুত এই পার্থক্য তুলিয়া দেওয়াই "খ" এবং "গ" তালিকাভুক্ত রাজ্যগুলি সম্পর্কে সাধারণ নীতি হওয়া উচিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই রাজ্যগুলিতে আইনসভা নাই, ইহাই প্রধান অসুবিধা। যথাযথরূপে আইনসভা গঠিত হইলেই "ক" তালিকাভুক্ত রাজ্যগুলির সহিত এই রাজ্যগুলির পার্থক্য বহুলাংশে দূর হইবে। যে সব রাজ্যে আইনসভা এবং মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব রহিয়াছে সেখানে পার্থক্য থাকার আর কোন কারণ নাই। তবে কয়েকটি চুক্তির সর্ত্ত পালনের ব্যতিক্রম হইতে পারে মাত্র। "গ" তালিকাভুক্ত কোন কোন ক্ষুদ্র রাজ্যকে বৃহৎ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্নও বিবেচ্য।

পাকিস্থান হইতে আগত বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন সমস্যা আমাদের একটি প্রধান সমস্যা। গত চার বৎসর যাবৎ এই সমস্যা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। ইহাকে একটি অগ্রগণ্য সমস্যারূপে গ্রহণ করিয়া ইহার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিতে হইয়াছে ও দিতে হইবে। গত লোকগণনার হিসাব অনুসারে ৪৯ লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিম পাকিস্থান হইতে ও প্রায় ২৬ লক্ষ পূর্ব পাকিস্থান হইতে আসিয়াছে। পশ্চিম পাকিস্থান হইতে যাহারা আসিয়াছে, তাহাদের প্রায় ৩০ লক্ষ জন গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী। পশ্চিম পঞ্জাবের গ্রামাঞ্চল হইতে আগত যে সকল উদ্বাস্তুর জমি ছিল অথবা যাহারা তথায় কৃষিকার্য্য করিত, তাহাদের মধ্যে যাহারা শহরে কাজ চাহিয়াছিল, তাহাদিগকে ছাড়া অপর সকলকে পুনর্বাসনের জন্য জমি দেওয়া হইয়াছে। যাহারা শহরে কাজ চাহিয়াছিল তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ। পশ্চিম পাকিস্থানের শহরাঞ্চল হইতে আগত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় ১৩ লক্ষ ১৭ হাজার জনকে সরকারী অথবা অন্য কোন চাকুরী দিয়া অথবা শিল্প শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে বিশেষ শিক্ষা দিয়া কোন না কোন ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের সমস্যা ১৯৫০ সালের প্রথম দিকে গুরুতর আকার ধারণ করে এবং তাহা-দের পুনর্বাসনের জন্য পরিকল্পনা রচিত হয়। বহুসংখ্যক উদ্বাস্তু স্বগৃহে ফিরিয়া যাওয়ায় অবস্থা অনেকটা অনিশ্চিত হইয়া উঠে। যে ২৬ লক্ষ উদ্বাস্তু থাকিয়া যায়, তাহাদের মধ্যে সাড়ে তের লক্ষ—অর্থাৎ অর্দ্ধেকের কিছু বেশী লোকের পুনর্বসতি করান হইয়াছে। গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ অবিরাম গতিতে পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে উদ্বাস্তুরা আসিতে থাকায় পশ্চিমবঙ্গে এক নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। এই অস্বাভাবিক ও উদ্বেগজনক অবস্থার প্রতিকারের চেষ্টা করা হইতেছে।

বর্ত্তমান আর্থিক বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্ট পশ্চিম ও পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে আগত বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের জন্য ১৪০ কোটি টাকা ব্যয় করিবেন। ইহা ছাড়া তাহাদিগকে বাস্তুত্যাগীদের ও অন্যান্য জমি হইতে প্রায় ৫৬ লক্ষ একর জমি এবং শহরাঞ্চলে ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার গৃহ, দোকান ও শিল্প কারখানার স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই গৃহগুলির মধ্যে ৮৬ হাজারটি সরকার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নূতন গৃহ। সরকারের পৌনঃপুনিক চেষ্টা সত্ত্বেও উদ্বাস্তুদের পাকিস্থানে পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে। ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যতদূর সম্ভব শীঘ্র এই প্রশ্নের মীমাংসা করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্ব পঞ্জাব, দিল্লী, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই ও দেশের অন্যান্য অংশে উদ্বাস্তুদের জন্য বহু নূতন শহর ও উপ-নিবেশ নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐগুলির মধ্যে কয়েকটি আদর্শ শহর ও উপনিবেশ। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনকার্য্যে উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া গিয়াছে। গত প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ ইউরোপ ও এশিয়ার নানা দেশ উদ্বাস্তু সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। আমরা আমাদের কার্য্যে অন্যান্য স্থানের তুলনায় অনেক বেশী ফললাভ করিয়াছি। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এখনও বহুসংখ্যক উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন বাকী রহিয়াছে, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে। বর্ত্তমানে এই সমস্যার কলেবর আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। এজন্য আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনকার্য্যকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়া যাইতে হইবে।

ভারত ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া প্রত্যেক নাগরিকের এখানে সমান কর্ত্তব্য, অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে। স্বীয় ধর্ম্মাচরণের অবাধ স্বাধীনতা তাহার আছে। দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এই সকল অধিকার সংরক্ষণ এবং দেশের

অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে তাহারা যাহাতে যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করিতে পারে, সেজন্ত তাহাদের সমষ্টিগত উন্নতি ও বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগদান রাষ্ট্রের বিশেষ কর্ত্তব্য। যাহাতে তাহারা ন্যায়সঙ্গত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করার জন্ত সর্ব্বতোভাবে যত্নবান হইতে হইবে।

ভারতের নারী সমাজ অতীতে, বিশেষতঃ দেশের মুক্তি-সংগ্রামে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে এবং বহুভাবে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। কিন্তু নানাবিধ সামাজিক বিধি-নিষেধের জন্ত তাহাদিগকে বহু ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে। এই সকল বিধিনিষেধ ও অযোগ্যতা দূর করা নিতান্ত প্রয়োজন। সামাজিক উন্নতি, সমাজনীতি শিক্ষা-সংক্রান্ত সর্ব্ববিধ কার্য্যকলাপের সহিত নারী সমাজকে নিবিড়ভাবে জড়িত থাকিতে হইবে। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্ত পুরুষদের অপেক্ষা নারীরা অনেক বেশী দায়িত্বসম্পন্ন। জাতি-কল্যাণমূলক সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টায় তাহারা যদি অংশ গ্রহণ না করিতে পারে, তবে জাতীয় উন্নতি ব্যাহত হইতে বাধ্য। সুতরাং কংগ্রেসের অভিমত এই যে, আইন-সভাগুলিতে এবং সমাজকল্যাণকর বিবিধ প্রচেষ্টায় তাহাদের কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্ত চেষ্টা করিতে হইবে।

ভারতের দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ-পুনর্গঠনের দাবি ক্রমাগত উত্থিত হইতেছে। কংগ্রেস দীর্ঘকাল পূর্ব্বেই ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট জনগণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই যে, ভাষার সাংস্কৃতিক ও অন্তবিধ গুরুত্ব আছে; কিন্তু অন্যান্ত কতকগুলি বিষয়ও বিবেচনা করার রহিয়াছে। অর্থনৈতিক ও শাসন সংক্রান্ত সমস্যাগুলিও আমাদিগকে স্মরণে রাখিতে হইবে। যেখানে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবির পশ্চাতে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের সর্ব্বসম্মত অভিমত রহিয়াছে, সেখানে সীমা নির্দ্ধারণ কমিশন নিয়োগসহ সংবিধানে বিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা বিধেয়।

পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে ভারত তাহার জাতীয় স্বার্থ এবং বিশ্বশান্তির খাতিরে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে এবং পৃথিবীর সমুদয় দেশের সহিত মৈত্রী সম্পর্ক রক্ষার চেষ্টা করিয়াছে। এই নীতির মধ্যে কোন দুর্ব্বলতা নাই। কেহ কেহ ভারতের পররাষ্ট্র নীতির বিরূপ সমালোচনা করিলেও পরবর্ত্তী ঘটনাবলী দ্বারা তাহার নীতির অভ্রান্ততা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই নীতিতে ইতিমধ্যেই সুফল পাওয়া গিয়াছে এবং নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, ভবিষ্যতে আরও সুফল পাওয়া যাইবে। কাজেই এই নীতিতেই ভারতের অবিচল থাকা উচিত। ভারতে এখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈদেশিক উপনিবেশ রহিয়াছে। কংগ্রেস ঘোষণা করিয়াছে যে, এই সকল স্থান ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভূত হইবে। এই কার্য্য যাহাতে শান্তিপূর্ণ ভাবে সাধিত হয়, তাহাই আমাদের নীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সহিত ভারত মৈত্রী সম্পর্ক বজায় রাখিয়াছে। নেপালের সাম্প্রদায়িক শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তনে আমরা সবিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় পাকিস্থান সম্পর্কে আমরা এই কথা বলিতে পারি না। পাকিস্থানের সহিত ভারতের সম্পর্ক নানাভাবে জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বহু সমস্যা লইয়া আমাদের মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যমান। এই সকল সমস্যার মীমাংসার জন্ত আমরা বারম্বার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে প্রধানতম সমস্যা হইতেছে কাশ্মীর। পাকিস্থানের আক্রমণ এবং অবিরাম উত্তেজনামূলক প্রচারকার্য্য সত্ত্বেও জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের জনগণের অভিপ্রায় অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ মীমাংসার চেষ্টা আমরা করিয়াছি। ভারতের এই নীতি অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। কাশ্মীরীদের প্রতি আমাদের একটা কর্ত্তব্য রহিয়াছে এবং এই কর্ত্তব্য আমাদিগকে পালন করিতেই হইবে।

বিশ্ব আজ বিক্ষোভিত—এক সঙ্কট অতিক্রম করিয়া অন্ত সঙ্কটের সম্মুখীন হইতেছে। এই বিশ্বব্যাপী সঙ্কটের ছায়া ভারতের উপরও পড়িয়াছে। ইহার অনিবার্য্য প্রতিক্রিয়া হইতে বাঁচিবার উপায় তাহার নাই। একমাত্র স্বীয় আদর্শে অবিচলিত থাকিয়া এবং সম্মিলিত জাতি হিসাবে শক্তি সঞ্চয় করিয়া এই বিক্ষুব্ধ বিশ্বে শান্তিরক্ষা কার্য্যে ভারত সত্যকার সাহায্য করিতে পারে। এই বিপৎসঙ্কুল সময়ে আমাদের অভীষ্টলাভ করিতে হইলে এক মন, এক লক্ষ্য লইয়া ঐক্যবদ্ধ ভাবে আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে।

কৃষক-প্রজা-মজুর দলের নির্ব্বাচনী কর্ম্মসূচী

কৃষক-প্রজা-মজুর দলের নির্ব্বাচনী কর্ম্মসূচীর মূল কথা এই :

প্রত্যেক দলের ম্যানিফেষ্টোতে কতকগুলি খুব ভাল ভাল কথা থাকে যাহাতে কোন প্রগতিশীল দল খুঁত ধরিতে পারে না। আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি যে, কংগ্রেস ম্যানিফেষ্টো বা ভারতীয় রাষ্ট্রবিধির নির্দ্দেশকারক নীতিতে যে সমস্ত উচ্চ আদর্শের কথা বলা হইয়াছে সেইগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা না থাকিলে তার কোন মূল্য নাই। শাসনযন্ত্রের আজ এমন অবস্থা হইয়াছে যে কোন পরিকল্পনা সফল করিবার জন্ত তাহার উপর নির্ভর করা যায় না। শাসনযন্ত্রের কর্ম্মচারীরা আজ যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন তাহা তাঁহাদের নিকট অপরিচিত এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ত যে মনোভাব দরকার বিদেশী শাসনাধীনে কাজ করার দরুন তাহাও তাঁহারা আয়ত্ত করেন নাই। বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রে দক্ষতা,

সততা ও সেবার মনোভাবের অভাব রহিয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, যে শাসনযন্ত্রের সাহায্যে আমাদিগকে সংস্কার সাধন করিতে হইবে যথাযোগ্যভাবে তাহার পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ না করিতে পারিলে সমস্ত সংপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে এবং দেশের লোকের মনোবল আরও কমিবে, হতাশা আরও বাড়িবে।

আমাদের দলের গঠনতন্ত্রে শ্রেণীহীন ও জাতিবিহীন এবং রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণমুক্ত স্বাধীন সমাজ গঠনের আদর্শ গৃহীত হইয়াছে। আমাদের প্রথম কাজ হইবে শাসনযন্ত্রের পুনর্গঠন যাহাতে কর্মচারীরা নিজেদের জনসাধারণের প্রভু না ভাবিয়া সেবক ও সাহায্যকারী বলিয়া মনে করে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও রাষ্ট্রযন্ত্র মানুষের জীবনযাত্রার অল্প বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিত। এখন উহা অনেক ব্যাপক হইয়াছে। শাসনযন্ত্র অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ হইলে এখন সমস্ত দেশের ক্ষতি হয় এবং জনসাধারণের মনোবল ভাঙিয়া যায়। এইজন্ত শাসনযন্ত্রের সংস্কারসাধন আমাদের কাজ হইবে। কন্ট্রোল এবং জীবনযাত্রায় সরকারী হস্তক্ষেপ কত দিকে কমানো যায় তাহা দেখিতে হইবে। সমাজবিরোধী শক্তিসমূহকে সংযত করিতে হইবে। রাজনৈতিক শাসনযন্ত্র হইতে পৃথক একটি অর্থনৈতিক শাসনযন্ত্র সৃষ্টি করিতে হইবে।

আমাদের দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান মানুষের জীবনের মান হইতে নীচে ইহা সকলেই স্বীকার করেন। তাহারা খাদ্য বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা প্রভৃতি যথাযোগ্যভাবে পায় না। আমাদের অর্থনীতি এমন হইয়াছে যাহাতে অল্প লোক বড়লোক হয় এবং বহু লোক বেকার সমস্যা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষায় কষ্ট পায়। এই সমস্ত সমস্যাকে সে গবর্ন্মেণ্ট দূর করিতে পারে না যে জনসাধারণের বিশ্বাস ও ভালবাসা অর্জন করিতে না পারে। আজ যে অবস্থায় আমরা উপনীত হইয়াছি জনসাধারণের সামগ্রিক ও উৎসাহপূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া তাহার উন্নতি হইতে পারে না। নেতাদের আদর্শানুরাগ দেখিলে তবেই জনসাধারণের নিকট হইতে এই উৎসাহলাভ করা সম্ভব হইবে। যে গবর্ন্মেণ্ট চোরাকারবারী এবং সমাজের অন্যান্য শত্রুদের দমন করিতে অনিচ্ছুক তাহারা এই সহযোগিতা আশা করিতে পারে না।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা ডেমোক্রাসি গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা ছড়াইয়া দিয়া স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে যুক্তিসঙ্গত ক্ষমতা না দিলে জনসাধারণের প্রয়োজন এবং বুদ্ধি অনুসারে চলিতে দেওয়া যায় না, ইহা না হইলে ডেমোক্রাসিও ভালভাবে কাজ করিতে পারে না। আমরা বিশ্বাস করি যে, ছোট ইউনিটেই ডেমোক্রাসি ভালভাবে কাজ করে। ইহাতে অবশ্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্ব্বল করিতে বলিতেছি না। বর্ত্তমান যুগে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার অত্যাবশ্যক। তবে এ কথা ঠিক যে বনিয়াদ দুর্ব্বল হইলে তার উপর শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গড়িয়া উঠিতে পারে না। আত্মকর্তৃত্বশীল ছোট ইউনিটগুলির সঙ্গে সহযোগিতার দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তিবৃদ্ধি প্রয়োজন।

ভারতের জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ অনুন্নত। এখনও হরিজন শ্রেণী রহিয়াছে। ইহাদের উন্নতি রাষ্ট্রের বিশেষ লক্ষ্য হইবে।

আমাদের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বাড়াইতে পারিলে দেশের আর্থিক উন্নতি হইবে। সর্ব্বক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা ইহা হইবে। তার জন্ত এখন সকলকে ত্যাগস্বীকারে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন, কারণ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত মূলধন বাড়াইতে হইবে। অতীতে স্বদেশীর মনোভাবের দ্বারা এই কাজ হইয়াছে। জনসাধারণের স্বাস্থ্যের জন্ত যে সমস্ত জিনিষ দরকার তাহা ছাড়া আর সমস্ত নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের আমদানী যথাসম্ভব কমাইতে হইবে। আমাদের সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা কেবল ক্যাপিটাল দ্রব্য এবং টেক্‌নিসিয়ান আমদানীতে ব্যয় করিতে হইবে।

শিল্প-বিপ্লবের পর হইতে পাশ্চাত্ত্য দেশের অর্থনীতির সমতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কৃষির বদলে শিল্প প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্ত্যদেশের সাম্রাজ্যবাদী নীতির জন্য কেন্দ্রীভূত বৃহৎ শিল্পের উপর ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে। উপনিবেশ ও অধীনস্থ দেশসমূহ হইতে তাহারা খাদ্য ও কাঁচামাল আমদানী করিত এবং অপ্রয়োজনীয় শিল্প দ্রব্য জোর করিয়া বিক্রয় করিত। ভারতবর্ষেও ইহাই ঘটিয়াছে। কৃষি ও শিল্প, গ্রাম ও শহরের মধ্যে যে সমতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল তাহা আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

আমাদের কৃষি প্রাচীন পদ্ধতিতে চলিতেছে। কৃষকেরা অজ্ঞ এবং দারিদ্র্যভারাক্রান্ত। মধ্যবর্তীরা কৃষকের পরিশ্রমের একটা মোটা অংশ লইয়া যাইতেছে। কৃষকের উন্নতির পথে যতগুলি অন্তরায় আছে সেগুলি দূর করা আমাদের উদ্দেশ্য হইবে। ইহার জন্য কৃষককে জমির মালিক করিতে হইবে; অবশ্য কৃষক যাহাতে জমির অনিষ্ট করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা ঐ সঙ্গে রাখিতে হইবে। জমি ভাগ হইয়া লাভজনক সীমার নীচে নামিতে দেওয়া হইবে না। জমি টুকরা টুকরা হইয়া ছড়াইয়া পড়িলে গ্রাম্য অর্থনীতি বাঁচিতে পারে না। তার জন্য জমি, শ্রমিক, যন্ত্রপাতি ও গবাদি পশু একত্র করিয়া সমবায় প্রথায় চাষ করিতে হইবে। বড় চাষীদেরও ইহার মধ্যে আনিতে হইবে।

পতিত ও জলাজমি চাষে আনিলে কৃষি-শ্রমিকদের বেকার সমস্যা দূর হইবে। এই সমস্ত জমি ভূমিহীন কৃষি-মজুরদের দেওয়া হইবে। বিকেন্দ্রীকৃত শিল্পেও ভূমিহীন কৃষি-মজুরদের কাজ দেওয়া হইবে। এখন যেরূপ ভাল জমিতে খারাপ ফসল ফলানো হইতেছে ভবিষ্যতে তাহা যাহাতে না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

আমাদের কৃষি বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। নদী হইতে সেচের জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাতে অনাবৃষ্টি এবং বন্যা দুইয়েরই প্রতিবিধান হইবে। ইহা হইতে সস্তা বিদ্যুৎও পাওয়া যাইবে।

শিল্প বিকেন্দ্রীভূত করিয়া ক্ষুদ্র ও কুটীর-শিল্পে উৎসাহ দিতে হইবে। বিকেন্দ্রীভূত শিল্পের দ্বারাই জাতীয় সম্পদ বহু লোকের হাতে ছড়াইয়া পড়িবে। ইহাতে কল-কারখানার খরচ কমিবে এবং শ্রমিকচাঞ্চল্যও অনেক কমিবে। আমাদের অসংখ্য বেকারের অন্নসংস্থানের ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। সামরিক দ্রব্য, মূল শিল্প, বড় ইঞ্জিনিয়ারিং, বিদ্যুৎ উৎপাদন, খনি, ধাতু নিষ্কাষণ প্রভৃতি বৃহৎ শিল্প হিসাবে থাকিবে, অন্য সমস্তগুলিকে বিকেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। ক্ষুদ্র শিল্পে বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ সাহায্য লইতে হইবে। উৎপন্ন বিদ্যুৎ সর্ব্বাগ্রে গ্রামে দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা দ্বারাই অর্থনৈতিক সমতা ফিরিয়া আসিবে।

আমরা বিকেন্দ্রীভূত শিল্পের উপর ঝোঁক দিব বটে, কেন্দ্রীভূত বৃহৎ শিল্পকে অস্বীকার করিব না। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ছোট বড় মাঝারি সর্ব্বপ্রকার শিল্পের সাহায্য লইতে হইবে। কতকগুলি সামরিক ও মূল শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করা যাইতে পারে, তবে গবর্মেণ্টের শিল্প পরিচালনা আমরা ভাল মনে করি না। ইহাতে সরকারী একচেটিয়া কারবার সৃষ্টি হয়, উৎপাদন ব্যয় বাড়ে এবং ক্রেতাদের ক্ষতি হয়। ভারতবর্ষের সরকারী কর্ম্মচারী উপযুক্ত না হওয়ায় আমাদের দেশের ক্ষতি হইবে। সমস্ত শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করিলে সরকারী একচেটিয়া ব্যবসা সৃষ্টি হইবে, উহা ডেমোক্রেসির পরিপন্থী। ইহাতে শ্রমিকরাও তাহাদের ন্যায্য পাওনা পাইবে না। এই জন্য অধিকাংশ বৃহৎ শিল্পকে সোশালাইজ করা হইবে, উহারা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান অথবা সমবায় সমিতি দ্বারা চালিত হইবে। কোন কোন বৃহৎ শিল্প বিকেন্দ্রীভূত শিল্পের সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করিবে। শ্রমিক যাহাতে সপরিবারে স্বাস্থ্যকর, আরামপ্রদ এবং সুখী জীবনযাপন করিতে পারে তার জন্য নিম্নতম মজুরীর হার যথেষ্ট উঁচু করিতে হইবে।

আমাদের বর্ত্তমান প্রয়োজনানুসারে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। সমাজের ব্যবহারিক প্রয়োজনের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। ইহাতে উচ্চ শিক্ষা ব্যাহত না হইয়া উন্নততর হইবে। রাশিয়া প্রভৃতি আধুনিক রাষ্ট্রে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য যেরূপ চেষ্টা হইয়াছে আমাদেরও তাহাই করিতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া ডেমোক্রেসি কখনও ভাল ভাবে চলিতে পারে না।

উদ্বাস্তু সমস্যার বিরাটত্বে আমরা ঘাবড়াইয়া গিয়া এমন সব কাজ করিয়াছি যাহাতে এই ব্যাপারে স্থানীয় এবং প্রাদেশিক মনোভাব দেখা দিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উদারতা সরকারী কর্ম্মচারীদের সহানুভূতির অভাবে এবং প্রদেশসমূহের সঙ্কীর্ণতায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উদ্বাস্তুদের দেশের অর্থনৈতিক সম্পদে পরিণত করা যাইত। ইহাদের সাহায্যে আমরা আদর্শ শহর এবং সমবায় কৃষি গড়িয়া তুলিতে পারিতাম। অতীতে যাহা হয় নাই তাহার জন্য বিলাপ না করিয়া এখনও উদ্বাস্তুরা যাহাতে নূতন জীবন আরম্ভ করিতে পারে এবং পুরানো সম্পত্তি ফিরিয়া পায় তার চেষ্টা করা উচিত। পাকিস্থানের সহিত সহযোগিতার দ্বারা ইহা করিতে হইবে। মুসলিম উদ্বাস্তুদের ভারতে পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর দাবী আমরা স্বীকার করিতেছি, পাকিস্থান রাজী হইলে গবর্মেণ্টকে উদ্বাস্তুদের সম্পত্তির দাবী মীমাংসা করিতে হইবে, একে অপরকে গ্যারান্টি দিবে এবং তাহাই হইবে মীমাংসার ভিত্তি। উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে আর বিলম্ব করা চলিবে না।

বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে কিছু না বলিলেই ভাল হইত। তবে কোন পার্টি ম্যানিফেষ্টোতে বৈদেশিক নীতির কথা না থাকিলে উহা সম্পূর্ণ হয় না বলিয়া বলিতে হইতেছে। আমাদের বৈদেশিক নীতি আভ্যন্তরীণ রাজনীতি হইতে উদ্ভূত হউক ইহাই আমরা চাই। নিজেদের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে যদি আমরা ওয়াকেবহাল থাকি এবং আমাদের অর্থনীতিকে ধনতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ উভয়কে বাদ দিয়া বিকেন্দ্রীভূত শিল্পের উপর যদি আমরা গড়িয়া তুলিতে চাই তবে আমাদের পক্ষে নিরপেক্ষতা রাখা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

আমরা কোন ইজম্ বা আদর্শবাদের কথা বলি নাই। আমরা ইচ্ছা করিয়াই ইহা এড়াইয়া গিয়াছি। আদর্শবাদের কথা না তুলিয়া জাতির সম্মুখে কাজের প্রোগ্রাম তুলিয়া ধরাই আমরা বিজ্ঞজনোচিত বলিয়া মনে করি। আমরা মনে করি ইহাই আমরা করিয়াছি। আমরা আশা করি, দেশবাসী যদি আমাদিগকে সুযোগ দেন তবে যেরূপ বিশ্বস্ত ভাবে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রাম করিয়াছি সেইরূপ বিশ্বস্ততার সহিত জাতীয় নীতি পরিচালিত করিব।

সোস্যালিস্ট দলের নির্ব্বাচনী কর্ম্মসূচী

সোস্যালিষ্ট দলের নির্ব্বাচনী কর্ম্মসূচীর মূল বিষয় এইরূপ :

বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ। প্রতি কৃষক পরিবার মোট ৩০ একর জমি রাখিতে পারিবে। তদূর্দ্ধ সমস্ত জমি অন্ত চাষী এবং ভূমিহীন মজুরদের দেওয়া হইবে।

ক্ষুদ্র জমিদারদের পুনর্ব্বসতির জন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে এবং ৩০ একরের অধিক জমির মালিকদের ১০০ একর পর্য্যন্ত দশ বৎসরের জন্ত এন্যুইটি দেওয়া হইবে।

সর্ব্বসাধারণের ভোটে নির্ব্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েৎ এবং মালটি-পারপাস সমবায় সমিতি কৃষি-পুনর্গঠনের ভিত্তি হইবে। সরকারী কৃষি বিভাগগুলিকে একত্র করিয়া একটি ভূমি কমিশনের অধীন করা হইবে।

জমির উন্নতির জন্য ভূমি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠিত হইবে। তাহারা কূপ খনন, কম্পোষ্টের গর্ত খনন, জল নিষ্কাষণ প্রভৃতিতে সাহায্য করিবে।

নূতন ও পতিত জমি উদ্ধারের জন্য গবর্মেণ্ট খাদ্য সেনাদল তৈরি করিবে।

সর্ব্বপ্রকার সমবায় প্রচেষ্টায় উৎসাহ দেওয়া হইবে। কালেকটিভ কার্ম গঠিত হইবে। ইহাতে ভূমিহীন মজুরেরা কাজ পাইবে।

দেশের উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত হইবে। ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্ত হইলে মূলধনের পরিমাণ বাড়িবে। লোহা, বিদ্যুৎ, খনি, কেমিক্যাল সার এবং চা ও কফিক্ষেত প্রভৃতি সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত হওয়া অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজন।

অপর সমস্ত শিল্পে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকিবে। সরকারী কণ্ট্রোল এমন করা হইবে যাহাতে সকল প্রকার উৎপাদনের উপর হইতে সকল প্রকার বাধা উঠিয়া যায়। মূলধন বৃদ্ধি অপেক্ষা শ্রমিকের উপর বেশী ঝোঁক দিতে হইবে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ টেকনিসিয়ানদের ডাকিয়া আনিতে হইবে।

অটোনমাস পাবলিক কর্পোরেশনগুলির নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দ্বারা যাহাতে একচেটিয়া ব্যবসায়ের দোষমুক্ত হইতে পারে তাহা দেখিতে হইবে। এই সমস্ত কর্পোরেশনে ওয়ার্কস কমিটির মারফত শ্রমিক প্রতিনিধি লইতে লইবে। যৌথ ব্যবসায়ে শ্রমিক প্রতিনিধি গ্রহণ বাধ্যতামূলক হইবে। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে ডবল অডিটের সাহায্যে শ্রমিকস্বার্থ রক্ষা করিতে হইবে।

রোগ বীমা, প্রসূতি মঙ্গল এবং বৃদ্ধ বয়সের পেন্সনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রত্যেক শ্রমিককে ইউনিয়নের সদস্য হইতে হইবে।

পরিকল্পনা ব্যবস্থা গোড়া হইতে গঠন করিতে হইবে।

কৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের সমবায় পদ্ধতিতে জমি দিতে হইবে। মধ্যবিত্ত ও কারিগরদের পুনর্ব্বসতি গবর্মেণ্ট করাইবে।

সমাজের উন্নতিতে মুষ্টিমেয় সম্পত্তির মালিক বাধা হইলে তাহা দূর করিতে এবং জনসাধারণের স্বাধীনতা বৃদ্ধি করিতে রাষ্ট্রবিধি বদলাইতে হইবে।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলিকে পুনর্গঠন করিতে হইবে। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে।

শাসনযন্ত্র সংশোধনের দ্বারা দুর্নীতি, উৎকোচ গ্রহণ, অযোগ্যতা এবং দীর্ঘসূত্রিতা দূর করিতে হইবে। বিচার সহজলভ্য করিতে হইবে। শাসনযন্ত্রের সহিত জনসাধারণের সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে। আটলাণ্টিক ও সোভিয়েট দলের বিরোধ হইতে দূরে থাকিতে হইবে। ইন্দোনেশিয়া হইতে মিশর পর্য্যন্ত কালেকটিভ সিকিউরিটি ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইউ-এন-ওর যে সমস্ত সভ্য যুদ্ধ ও বুভুক্ষা দূর করিতে চাহিবে তাহাদের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে। ধনী ও শক্তিশালী জাতি এবং দরিদ্র ও দুর্ব্বল জাতির মধ্যে ভেদ সৃষ্টিতে বাধা দিতে হইবে। আফ্রিকায় স্বাধীনতা আন্দোলন এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র সোস্যালিষ্ট আন্দোলনে ভারতবর্ষ সাহায্য করিবে।

ইহাই হইবে সোস্যালিষ্ট দলের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

কংগ্রেস দলত্যাগী দল

মুর্শিদাবাদ জেলার নির্দলীয় সাপ্তাহিক "সমাচার" পত্রিকার ১১ই আষাঢ় তারিখের সংখ্যায় উপরোক্ত বিষয়ে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। এরূপ আশঙ্কা প্রকাশ অস্বাভাবিক নয়:

"বর্ত্তমানে জেলায় কেন ভারতের সর্ব্বত্র কংগ্রেস ত্যাগের হিড়িক লাগিয়াছে। ক্ষুদ্র-বৃহৎ, পরিচিত-অপরিচিত, নেতা-কর্ম্মী নির্ব্বিশেষে বহু কংগ্রেসী কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হইতে পদত্যাগ করিতেছেন, এবং পদত্যাগের কথাটা ফলাও করিয়া প্রচার করিয়া আত্মতুষ্টি লাভ করিতেছেন। কংগ্রেসত্যাগী নেতৃবৃন্দ দল গঠন করিতেছেন এবং আসন্ন নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার মানসে নির্ব্বাচনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। বিবৃতির অন্ত নাই, কংগ্রেস-বিদ্বেষ প্রচারেও কেহ ক্ষান্ত হন নাই। আজকাল সর্ব্বত্র সদ্য-কংগ্রেস-ত্যাগীদের প্রাচুর্য্য দেখা যাইতেছে এবং তাঁহাদেরই নিকট হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কংগ্রেসের বিরুদ্ধ সমালোচনা শোনা যাইতেছে। বিদ্বেষ-প্রচারে এই সমস্ত সদ্য কংগ্রেসত্যাগী মহাশয়েরা যেন বামপন্থীদেরও হার মানাইয়াছেন। কংগ্রেস-বিদ্বেষী কংগ্রেসীর দল সর্ব্বত্র বর্দ্ধিত হইতেছে।...

কংগ্রেস আজ আদর্শচ্যুত হইয়াছে, জনগণের আস্থা হারাইতেছে, দেশ-শাসনভার হস্তে লইয়া কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই—সমস্ত অভিযোগই সত্য বলিয়া স্বীকার করা গেল। কংগ্রেসের মধ্যে না থাকিয়া নূতন আদর্শে নূতন দল গঠনেও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু দলত্যাগী কংগ্রেসীরা নূতন দলের মধ্যেও সেই পুরাতন ভাবধারা যে আনিবেন না, তাহাতে নিঃসন্দেহ হইবার উপায় কোথায়? নূতন বোতলে পুরাতন মদ যে চালানো হইবে না—সে সম্বন্ধে নিশ্চয়তা কোথায়? দেশের শাসনব্যবস্থা হস্তে লইবার আগ্রহেই যদি দলত্যাগী কংগ্রেসীরা আগ্রহান্বিত হইয়া থাকেন, তবে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করাই তাঁহাদের দলগঠনের উদ্দেশ্য বলিতে হইবে। কৃষক-প্রজা-মজদুরের তকমা আঁটিয়া যদি জমিদার জায়গীরদার মহাজন ও মিল মালিক রাজনীতি করিতে নির্ব্বাচনে নামেন, তবে কংগ্রেস ত্যাগের প্রয়োজন কি ছিল? জনসাধারণ অজ্ঞ হইলেও নেতাদের চিনে।...

কংগ্রেস সম্বন্ধে আচার্য্য বিনোবার মত

১৯৪৬ সালের নবেম্বর মাসে গান্ধীজী যাহা করিয়াছিলেন নোয়াখালির গ্রামাঞ্চলে, ১৯৫১ সালের এপ্রিল মে মাসে আচার্য্য বিনোবা ভাবে তাহা করিতেছেন হায়দরাবাদ রাজ্যের কম্যুনিষ্ট বিধ্বস্ত গ্রামাঞ্চলে। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইতেছে "হরিজন" পত্রিকায়। সেই পত্রিকার ৮ই আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত বিবরণের কিছু অংশ উদ্ধৃত করিলাম। বিনোবাজীকে নানা প্রশ্ন করা হয়; তার উত্তর তিনি দেন :

"স্বরাজের আমলে আমরা কি অনাচারের প্রতিরোধ করিব না?" এক জন প্রশ্ন করিল। উত্তর হইল, "করা উচিত। কিন্তু কে উহা করিতে পারে। দেশবাসীর যে সেবা করে সে-ই এরূপ প্রতিরোধ করার অধিকারী। কংগ্রেসসেবীরা সেবা অপেক্ষা নির্ব্বাচন লইয়া বেশী ব্যস্ত। যে সেবা তাহারা করে তারও পিছনে মতলব থাকে। খ্রীষ্টান মিশনরীরা অনুন্নত শ্রেণীদের সেবা করে, কিন্তু অন্তরের অন্তরে তাহারা আশা করে যে কোন না কোন দিন অন্তত কিছু লোককে তাহারা ধর্ম্মান্তরিত করিতে পারিবে। তাহাদের সেবাও নিঃস্বার্থ নয়। কংগ্রেসসেবীরা সমাজতন্ত্রীদের নিকট হইতে সহযোগিতা পাইতে ইচ্ছুক নয়, কেননা তাহাতে সমাজতন্ত্রীদের প্রতিষ্ঠা বাড়িবে এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহাতে নির্ব্বাচনে তাহাদের সুবিধা হইতে পারে। গান্ধীস্মারকনিধি সংগ্রহের সময়ে বিহারে এইরূপ ঘটিয়াছিল বলিয়া শোনা যায়।..."

প্রশ্ন : কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে কি করা উচিত?

বিনোবা : ইহার সেবাকাজে আত্মনিয়োগ করা উচিত। যুদ্ধের আশু সম্ভাবনা না থাকিলে সৈন্যদের কি চাষের কাজে নিয়োগ করা হয় না? বর্ত্তমানে কংগ্রেসকর্ম্মীদের বস্তুত কি কাজ করিবার আছে? এক টাকা-চাঁদা-দেওয়া সদস্য সংগ্রহ করা, রেজিষ্টারি খাতা রাখা, নির্ব্বাচন চালানো, আর চিঠিপত্র লেখা? এই কি সব? তাহাদের কাজের দিকে চাহিয়া দেখ। সক্রিয় সদস্যের নামে তাহারা শত শত নিষ্ক্রিয় সদস্যকে ভর্তি করিয়া লইয়াছে। হাতে ক্ষমতা পাওয়ার পরে কংগ্রেসে কি গরিবের কোন স্থান আছে? এবং সদস্য সংগ্রহ করায়, সদস্যপত্র বিতরণ করায় এবং এই বিতরণ বিলম্বিত করায় সে কি দুর্নীতি! এই সকল কি সেবা?

প্রশ্ন : তবে আমরা কি করিব? আপনি বলিয়া দিন। আমরা কংগ্রেস ছাড়িয়া দিব? কখনও কখনও এই চিন্তা আমাদের মন অধিকার করিয়া বসে।

বিনোবা : কংগ্রেস ছাড়িবেন না। ইহা সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান, ইহার উজ্জ্বল ঐতিহ্য আছে। ইহার দোষ এই যে, কংগ্রেস-সদস্যদের বর্ত্তমানে কোন কর্ম্মসূচী নাই। কংগ্রেসীরা নিজেরা একটি কর্ম্মসূচী স্থির করিয়া নিন এবং অবিলম্বে উহাতে আত্মনিয়োগ করুন। মাদ্রাজ ও বোম্বাই সরকার মাদক-নিবারণ আইন চালু করিয়াছেন। কংগ্রেসীরা এই মাদক বর্জ্জনের কর্ম্মসূচী গ্রহণ করিয়া ইহাকে সার্থক করিয়া তুলুন। কংগ্রেসের প্রধান কার্য্যালয় হইতে যে সকল নির্দ্দেশপত্র আসে তাহাতে গঠনকর্ম্মের কোন উল্লেখ থাকে না কেন ইহা বুঝা যায় না। সেবাকার্য্য না করিলে কি করিয়া কংগ্রেসের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে। পুরাতন মর্য্যাদার আপনারা এখনও সুবিধা গ্রহণ করিতেছেন কিন্তু উহাতে বেশি দিন আপনাদের কাজ চলিবে না।..."

"ভাষার দৌরাত্ম্য"

জামশেদপুরের "নবজাগরণ" সাপ্তাহিকের ১২ই জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় উল্লিখিত শিরোনামাযুক্ত প্রবন্ধে বিহারের বাঙালী বিহারী সমস্যা সম্বন্ধে যে সম্পাদকীয় মন্তব্য করিয়াছেন, তৎপ্রতি রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই মন্তব্য আংশিক আমরা উদ্ধৃত করিতেছি :

"আমাদের ভারতবর্ষে লেখা ও কথা ভাষার সমষ্টি দুই শত পঁচিশ। ইহার মধ্যে চব্বিশটি ভাষা সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ছিয়ানব্বই ভাগ লোক ব্যবহার করেন। আবার এ চব্বিশটির মধ্যে হিন্দী সাত শত নব্বই লক্ষ, বাংলা পাঁচ শত চল্লিশ লক্ষ, বিহারী দুই শত উনাশী লক্ষ এবং তেলুগু দুই শত তেরটি লক্ষ লোকের ভাষা। অন্যান্য ভাষাভাষীর সংখ্যা আরও নিম্নস্তরে। এরূপ ক্ষেত্রে ভাষাকে প্রোৎসাহ না দিয়া বিরোধিতা করা কখনও দূরদর্শিতার পরিচায়ক নহে। দেশের সম্মুখে আজ বিভিন্ন জটিল সমস্যা রহিয়াছে এবং সমাধানও যখন সহজসাধ্য নহে তখন ইহার মধ্যে ভাষার দৌরাত্ম্য ডাকিয়া আনিয়া অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি করার পশ্চাতে কি হেতু রহিয়াছে তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। হিন্দী ভাষা রাষ্ট্র ভাষার মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে এবং প্রয়োজন বোধে সকলকেই উহা শিখিতে হইবে ইহা অবশ্যম্ভাবী এবং যাঁহারা না শিখিবেন তাঁহাদেরও যে অনুতপ্ত হইতে হইবে ইহাও সত্য। যেমন প্রথম ইংরেজ শাসনকালে মুসলমান সম্প্রদায় ইংরেজী ভাষাকে গ্রহণ না করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছিল, বর্ত্তমান যুগেও যাহারা হিন্দী না শিখিবেন তাঁহারাও সেই পর্য্যায়ে আসিবেন। তাহা ব্যতীত ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিও যখন হিন্দী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন তখন তাহার প্রসার ও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। তবুও এ ব্যস্ততা, জবরদস্তি কিসের? উত্তরে বলা যাইতে পারে রাজনৈতিক। কিন্তু আজ যে কলহের উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে রাজনৈতিক বা ভাষাসমস্যা কোনটিরই প্রকৃষ্ট সমাধান হইবে না। কারণ শূন্যগর্ভ আতসবাজীর উপর কোন দিনই শান্তির পাকা দালান গড়িয়া উঠিতে পারে না।

এতদঞ্চলে বাংলা-হিন্দীর সংঘর্ষটা যেন ক্রমশঃ মাত্রা

ছাড়াইয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। শিক্ষার মাধ্যম লইয়া প্রথমটা চলিতেছিল বটে, কিন্তু আদমসুমারির ব্যাপার দেখিয়া বিষয়টি অনেকে ঘোলাটে বলিয়া মনে করেন। দারোগা সাহেব ডাকিয়া আনিতে বলিলে সিপাহী সাহেব যদি বাঁধিয়া লইয়া যান তাহা যদি নেতা না জানিয়া থাকেন, তবে দেশের চরম দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

মাননীয় কৃষ্ণবল্লভ বাবুর ধলভূম সফরের সুফল এবং ডি. পি. আই শাস্তাপ্রসাদজীর ঐকান্তিক অনুরাগ মোটেই কার্য্যকারী হইতেছে না কতকগুলি নিম্নপদস্থ স্কুল ইন্সপেক্টর ও ওয়েলফেয়ার অফিসারদের অদূরদর্শিতার জন্য। ইহাদের মারফতে সরকার রাষ্ট্রভাষা প্রচারের জন্য গত বৎসর চার লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু চার জন লোকও রাষ্ট্রভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। সুতরাং মন্ত্রিমণ্ডলী তথা নেতৃবৃন্দের উচিত যে, তাঁহাদের অভিপ্রেত কার্য্য ঠিকমত পালিত হইতেছে কিনা তাহা দেখা, নতুবা দোষগুলি তাঁহাদেরই স্কন্ধে চাপিয়া বসিবে। বাঙালী অতিমাত্রায় ইংরেজী পরিপাক করিয়াছিল, এবং প্রয়োজন বোধেও রাষ্ট্রভাষাও যে আয়ত্ত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিলাইয়া কাঁঠাল নরম করা যাইতে পারে, কিন্তু পাকাইতে পারা যায় না এবং সুগন্ধ সুস্বাদু রসও পাওয়া যায় না। সময় ও সুযোগ দুইটিরই বিশেষ প্রয়োজন।"

উদ্বাস্তু কর্ত্তৃক রেলপথে বাধাদান

রাণাঘাট ও কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে উদ্বাস্তুগণ যাহা করিতেছে, তাহা প্রমাণ করে যে তাহাদের একাংশ কোন সভ্য দেশের নাগরিক পদলাভের যোগ্য নয়। সেই কথা ছাড়িয়া দিলেও তাহারা যাহা করিতেছে তাহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক ও শাসক সম্প্রদায়ের সহানুভূতি তাহারা হারাইতেছে। এই কথা ভাবিয়া দেখিতেছে না যে এই অবস্থায় কি করিয়া তাহারা ভারত-রাষ্ট্রে স্থান পাইতে পারে; কাহার জোরে তাহারা নিজেদের ন্যায্য দাবী স্বীকার করাইয়া লইবে।

পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পরে সমাজ-জীবনে যে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে "প্রবাসী" বরাবরই তৎসম্বন্ধে অবহিত আছে। এই উদ্বাস্তুগণ যে ভারতরাষ্ট্রের একটা দায় তাহাও আমরা স্বীকার করি। কিন্তু উদ্বাস্তুগণের একাংশ যে আচরণ করিতেছে, তাহাতে লোকের ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়া অস্বাভাবিক হইবে না, অম্বুবাচীর জন্য ২৲ টাকা না ২।৵০ আনা হইবে—এরূপ একটা দাবী সুস্থ মস্তিষ্ক লোকে করিতে পারে না।

বন-মহোৎসব

এবারও আনুষ্ঠানিকভাবে বন-মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে গত ১৬ই আষাঢ় (১লা জুলাই)। এই উৎসবের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াও বলিতে চাই যে, এইরূপ উৎসবের একটা সার্থকতা আছে; তাহা মানুষকে গাছপালার আর্থিক প্রয়োজনের কথা মনে করাইয়া দেয় এবং এই বোধ একটা অভ্যাসের সৃষ্টি করে যাহা সমাজবদ্ধ জীবের স্বাস্থ্য ও সম্পদের পরিপোষক।

"গত বৎসর পশ্চিমবঙ্গে বন-মহোৎসব উপলক্ষে উনিশ লক্ষেরও বেশী (১,৯০৯,৭১০) গাছ লাগানো হয়েছিল। কোন্ জেলায় কত গাছ লাগানো হয়েছিল তার হিসাব নিচে দেওয়া হ'ল :

দার্জ্জিলিং	১১৫,১৯৩	বর্দ্ধমান	৩৭৬,৬৫০
জলপাইগুড়ি	৬৬,৫২১	মেদিনীপুর	৫৬৯,৯৭৪
কুচবিহার	২,৩২৯	হুগলী	১১৫,১৩৫
পশ্চিম দিনাজপুর	২২,৫৩১	হাওড়া	৪৫,৬১৫
মালদহ	৩৫,১৭৩	মুর্শিদাবাদ	৬৭,৮৯৭
বীরভূম	৫২,৭৯৯	নদীয়া	৫৮,২৪৯
বাঁকুড়া	৬০,২৫১	২৪-পরগণা	৩২০,৫৭১
কলিকাতা	৮২২		

পশ্চিমবঙ্গে যেসব গাছ লাগানো হয়েছিল তার মধ্যে শতকরা চল্লিশ ভাগ ছিল, খাওয়া চলে এমন নানা রকম ফলের গাছ। বাকি গাছগুলো ছিল জ্বালানি কাঠ এবং অন্যান্য কাজের উপযোগী।

বনবিভাগ থেকে ৫৬১,৩৪৭টি বুনো গাছের চারা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছিল। কৃষি বিভাগ থেকে বিক্রী করা হয়েছিল ৪,৬০০টি ফলের গাছের চারা ও কলম। বিভিন্ন জেলা থেকে এ পর্য্যন্ত যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় যে প্রধান প্রধান ফলের গাছ, যা গত বছরে লাগান হয়েছিল তার হিসাব এই : আমগাছ ২৩৬,০২৭; কাঁঠাল গাছ ৬৪,৩১৬; লিচু গাছ ২৮,৮২১; জাম গাছ ৪০,১২১; নারকেল গাছ ৭৮,৬৯৬; সুপারি গাছ ৭২,৫০৬। যেসব গাছ থেকে জ্বালানি কাঠ এবং কড়ি-বরগা ইত্যাদি তৈরি করার উপযোগী কাঠ পাওয়া যাবে সেই ধরনের গাছের হিসাব এই : বাবলা ১৭৫,৯৫৪; অর্জ্জুন ১১৬,২৪৮; শিশু ৪০,৮০৯; সেগুন ৩১,২২৫; মেহগনি ১৮,৯৪৯।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলির মধ্যে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি থানার ১৪নং ইউনিয়নের দুর্মুত গ্রামেই সবচেয়ে বেশী গাছ লাগানো হয়েছিল। ওখানে গত বছর গাছ পোঁতা হয়েছিল মোট ১১,০৪৯টি। তার মধ্যে ৬,৯৭১টি গাছ বেঁচে রয়েছে। একা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গাছ পুঁতেছেন কাঁথি থানার ২নং ইউনিয়নের পশ্চিম সরপাই গ্রামের শ্রীনীলোৎপল গুহ। তিনি মোট ৫,৪২৯টি গাছ লাগিয়েছিলেন। তার মধ্যে বেঁচেছে ৩,৪৮৩টি।"

শ্রীনীলোৎপল গুহের কর্ম্মশক্তি দিকে দিকে বিকীর্ণ হউক।

এই প্রসঙ্গে বাঁকুড়া জেলা-শাসকের একটা বিবৃতির মধ্যে ঐ জেলার গত বৎসরের "বন-মহোৎসবে"র ফলাফল সম্বন্ধে

অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। "গত বৎসর বাঁকুড়া জেলায় ২১৬৭ জন চাষী ধান উৎপাদন প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। এই প্রতিযোগিতার ফলে দেখা গেছে সাধারণতঃ যেখানে একর প্রতি ২৪ মণ ধান হয় সেখানে প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রতি একরে গড়পড়তা ৪৫ মণ ধান ফলিয়েছেন। এই প্রতিযোগিতায় প্রতি থানায় একজন করে ১৯ জন চাষী স্ব স্ব এলাকায় একর প্রতি বেশী ধান ফলিয়ে প্রত্যেকে ১০০৲ টাকা করে পুরস্কার পেয়েছেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত ১৯ জন চাষী একর প্রতি গড়ে ৫৯ মণ ৩৫ সের ধান ফলিয়েছেন। এ ছাড়া আলু উৎপাদন প্রতিযোগিতায় গত বৎসর জেলায় ৩৪৯ জন চাষী যোগ দেন। ইহার ফলে প্রতিযোগীদের মধ্যে চাষীরা প্রতি একরে গড়পড়তা ৮০।।০ মণ আলু ফলিয়েছেন অথচ এ জেলায় সাধারণতঃ প্রতি একরে ৬০ মণ আলু ফলে। কিন্তু অন্য জেলার তুলনায় এই জেলার চাষীরা বিঘাপ্রতি বেশী পরিমাণ আলু তৈয়ারী করতে না পারায় কেহই পুরস্কার পান নাই।

গত বৎসর গম উৎপাদন প্রতিযোগিতা কেবলমাত্র ওন্দা থানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তেঁতুয়া গ্রামের শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র ঘোষ এক বিঘা জমিতে ১৩ মণ ২৭ সের ১২ ছটাক গম ফলিয়ে ১০০৲ টাকার পুরস্কার পেয়েছেন।"

সংস্কৃত বর্জ্জন ব্যবস্থা

"আনন্দবাজার পত্রিকা"র ১৯শে আষাঢ় সংখ্যায় নিম্নে উদ্ধৃত পত্রটি প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই প্রতিবাদের সমর্থন করি :

মহাশয়—বিগত ১৩।৩।৫৮ তারিখের দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় "স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্য নূতন পাঠ্যতালিকা" শীর্ষক সংবাদটি পাঠ করিয়া শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি। কারণ যে সংস্কৃত ভাষা ভারতীয় ঐতিহ্য বহন করতঃ পৃথিবীর শিক্ষিত সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে, নূতন পাঠ্যতালিকায় সেই সংস্কৃতকে বাদ দিয়া বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধ করিবার আয়োজন চলিয়াছে। বলা বাহুল্য, বঙ্গভাষার সমৃদ্ধি আমাদেরও সর্ব্বতোভাবেই কাম্য। কিন্তু এই আত্মঘাতী নীতি আমরা সর্ব্বথায়ই নিন্দার্হ মনে করি। কারণ পাঠ্যতালিকা হইতে সংস্কৃত বাদ পড়িলে বঙ্গভাষা সমৃদ্ধ না হইয়া পক্ষান্তরে পঙ্গু হইয়াই পড়িবে। এক কথায় বলিতে গেলে, ভারতীয় ভাষা মাত্রের শিক্ষণব্যবস্থাই সংস্কৃত ভাষার উপর নির্ভরশীল। প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পরিভাষা কমিটি যে সরকারী পরিভাষা রচনা করিয়াছেন, তাহাতেও সংস্কৃতের দানই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শুনা যাইতেছে—বর্ত্তমান সপ্তাহেই এই নূতন পাঠ্যতালিকা পাস হইয়া যাইবে।

অতএব শিক্ষিত সমাজ তথা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠানসমূহকে এই নূতন তালিকায় সংস্কৃতের বর্জ্জন বিষয়ে তুমুল প্রতিবাদ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।—শ্রীবিষ্ণুপদ কাব্যতীর্থ এম-এ, শ্রীরামধন শাস্ত্রী, শ্রীঅবনীশ্বর বিত্যারত্ন, শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীরবীন্দ্র ঠাকুর।

অপরাধ কাহার?

"এবার কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ে আই-এ পরীক্ষায় শতকরা মাত্র ২৬ জন ছাত্র পাস করিয়াছে। আই-এ পরীক্ষার পাসের হার এত কম নাকি কখনও হয় নাই। পাসের সংখ্যা এত কম দেখিয়া মনে হয় বিশ্ববিত্যালয় বোধ হয় উচ্চশিক্ষার সম্বন্ধে একটা বিশেষ নীতি অনুসরণ করিয়া এই প্রকার করিতেছেন। নহিলে রাতারাতি বাংলাদেশের অধিকাংশ ছাত্রই এত অপদার্থ হইয়া পড়িল ইহাই বা বিশ্বাস করা যায় কিরূপে? বিশ্ববিত্যালয় যদি ছাত্রদের শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য এইরূপ করিয়া থাকেন তাহা হইলেও হঠাৎ না করিয়া ধীরে ধীরে এই প্রকার করা উচিত ছিল। কিংবা বিশ্ববিত্যালয়ের ইহাই যদি অভিপ্রেত হয় যে একটা বিশেষ standard বা মানের যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্র ব্যতীত অপর কাহাকেও উচ্চশিক্ষা দেওয়া ঠিক নহে, তাহা হইলেও ম্যাট্রিক পাসের পর ছাত্রেরা যখন কলেজে ভর্ত্তি হইতে যায় তখনই নির্ব্বিচারে সকল ছাত্রকেই গ্রহণ না করিয়া এই প্রকার একটি নিয়ম করিয়া দেওয়া উচিত যে, যে সকল ছাত্র অন্ততঃ শতকরা এত নম্বর না পাইয়াছে তাহাদিগকে কলেজে গ্রহণ করা হইবে না। ইহাতে ছাত্র এবং ছাত্রদিগের অভিভাবকেরা অনর্থক সময় ও অর্থনষ্ট এবং মনঃকষ্টের হাত হইতে রক্ষা পায় এবং জনসাধারণকেও বৃথা জল্পনা-কল্পনা ও অনুমানের গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে ঘুরিয়া মরিতে হয় না।"

আসানসোলের "বঙ্গবাণী" পত্রিকার ১৮ই আষাঢ় সংখ্যায় উপরোক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, এই মন্তব্যে শিক্ষিত সমাজ ও দেশের কল্যাণকামী সকলের মনোভাব সত্য পরিস্ফুট হইয়াছে। এই বিষয়ে আমাদের রাষ্ট্র-চালকবর্গ নিজেদের শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই বলিয়াই এরূপ অনাচার ও অবিচার প্রশ্রয় পাইতেছে। ভাবী নাগরিকবৃন্দ যে কি চান সহজে পরীক্ষা পাস না প্রকৃত শিক্ষা—তাহাও তাঁরা জানেন না। সুতরাং সমগ্র সমাজের অর্থনষ্ট ও মনঃকষ্ট অনিবার্য্য।

ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের অবস্থা

চাউলের রেশন কমিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রেশন অঞ্চলসমূহে বিশেষ হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে। ইহা মোটেই অস্বাভাবিক নহে। এই ব্যাপারের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হইতেছে যে, ভারতরাষ্ট্রের তুলনায় পাকিস্থানের অধিবাসীরা

বর্গসুখ উপভোগ করিতেছে। এ কথাও যে আদৌ ঠিক নহে নিম্নের পরিসংখ্যান হইতে তাহা সম্যক্ বুঝা যাইবে :

বেকার সংখ্যা

(এক শত হিসাবে)

	ভারতরাষ্ট্রে	পাকিস্থানে
১৯৪৮	২২৪,৯০০	৭৭,১৮৩
১৯৪৯	২৯৩,০৪৩	৭০,৯১৬
১৯৫০	৩১৪,৩৩৬	৯৬,৪৩১

সাধারণ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য

১৯৩৯ = ১০০ মান ধরিয়া

	ভারতরাষ্ট্র (বোম্বাই)	পাকিস্থান (লাহোর)
১৯৪৭	২৬৩	৩৯৮
১৯৪৮	২৮৬	৪৪৪
১৯৪৯	২৯০	৪০৮
১৯৫০	২৯৫	৪১৫

খাদ্যশস্যের মূল্য

১৯৩৯ = ১০০ মান ধরিয়া

	ভারতরাষ্ট্রে	পাকিস্থানে
১৯৪৭	৩০২	৪৬০
১৯৪৮	৩০৫	৪৯৭
১৯৪৯	৩২১	৪৫২
১৯৫০	৩৩৪	৪৫৩

International Labour Review (U. N. O)-এর শেষ সংখ্যা হইতে এই পরিসংখ্যানগুলি গৃহীত।

আসামের সঙ্গে ভারতরাষ্ট্রের যোগাযোগ

আসামের সঙ্গে ভারতরাষ্ট্রের যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া যায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে। সেইজন্যই নূতন করিয়া "আসাম লিঙ্ক" নামে পরিচিত রেলপথের সূচনা হয় ১৯৪৯ সালের প্রথমে। ক্রমশঃ নানাভাবে তার উন্নতি সাধন করা হইতেছে। গত ১লা জুলাই (১৬ই আষাঢ়) জনতা এক্সপ্রেসের (কেবল ৩য় শ্রেণীর যাত্রীর গমনাগমনের ব্যবস্থা) প্রবর্তন তার অন্যতম। কাটিহার (বিহার) হইতে আমিনগাঁও (আসাম) পর্য্যন্ত আসাম রেল লিঙ্কের ৪৬১ মাইল রাস্তায় এই জনতা এক্সপ্রেস গমনাগমন করিবে। উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে এই প্রথম জনতা এক্সপ্রেস ট্রেন প্রবর্তিত হইল।

সাত শতাধিক যাত্রীর স্থানসমন্বিত সমস্ত তৃতীয় শ্রেণীর বগীর এই ট্রেনটি ১লা জুলাই অপরাহ্ণ ৪-৩৫ মিনিটে কাটিহার হইতে যাত্রা করিয়াছে। প্রায় ২৩ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে উহার গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবার কথা। আসাম রেল লিঙ্কের মোট ৭৭টি ষ্টেশনের মধ্যে ৩৯টি ষ্টেশনে ট্রেনটি থামিবে।

ভারতে ইহা পঞ্চম জনতা এক্সপ্রেস। অপরগুলি ই আই আর, ই পি আর, জি আই পি এবং ও টি আর লাইনে চলাচল করে। ১৯৪৮ সালে এখানে এক্সপ্রেস ট্রেন প্রবর্তিত হয়।

কাটিহারের অন্যতম বয়োজ্যেষ্ঠ রেলকর্ম্মী শ্রীভোলা রায় নামক ৫৫ বৎসর বয়স্ক জনৈক চাপরাশী এই ট্রেনটির উদ্বোধন করেন। রেলে ৩৩ বৎসর চাকুরী করার পর তিনি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

এই জনতা এক্সপ্রেস প্রবর্তিত হওয়ায় এখন কাটিহার ও আমিনগাঁওয়ের মধ্যে ৩টি ট্রেন সরাসরি যাতায়াত করিবে। আসাম রেল লিঙ্কই আসাম ও অবশিষ্ট ভারতের মধ্যে রেল-পথে একমাত্র যোগসূত্র।

বার্ণপুরে সাহিত্য সম্মেলন

গত ১৭ ও ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বার্ণপুরে এক সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। সভাপতি ছিলেন শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর অভিভাষণ ছিল বাঙালী জীবনের বর্ত্তমান ব্যর্থতার বর্ণনায় পূর্ণ—যাহা কোন উপকার করে না কাহারও।

"...বাংলা ভাষাকে অপ্রয়োজনীয় ভাষায় পরিণত করিবার পক্ষে ভারতবর্ষ জুড়িয়া যেরূপ অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে একদিন যদি বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার ন্যায় মৃতভাষা হইয়া দাঁড়ায়, একদিন যদি বাঙালী বাইরের কাজ-কারবার হইতে আরম্ভ করিয়া নিত্যকার সংসারের কথোপকথন পর্য্যন্ত ইংরেজী ও হিন্দী ভাষার দ্বারা চালাইয়া লইতে থাকে, তাহা হইলে বিস্ময়ের কিছু থাকিবে না।..."

কোন জীবন্ত সংস্কৃতি ও তার অন্যতম ধারক এই ভাবে অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে না। এবং বাঙালী জাতি জীবন্ত নয় তাহা এখনও প্রমাণ সাপেক্ষ। এই সম্মেলনে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রাঢ় দেশের সভ্যতা সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা স্মরণীয়। "ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে রাঢ়ের মাটি অতি প্রাচীন হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন। ভারতের প্রাচীনতম অংশ বাংলাদেশ। যেমন মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতা সেইরূপ রাঢ়ের সভ্যতা—দামোদর ও অজয়ের অধিত্যকা ভূমির সভ্যতা বিরাট, বিশাল ও মহান্।

"রাঢ়ের প্রাচীন ইতিহাস গৌরবময়। এখানে সেনভূমি, বিজয়পুর, গোপভূম প্রভৃতি বহু প্রাচীন সম্পদের সাক্ষ্য দেয়। এখানকার আদিবাসী মালো, রাজবংশী, বাগ্দী প্রভৃতির সাহায্যে সপ্তদশ শতাব্দীতে গোপভূমের রাজা মহীন্দ্রনাথ মোগলের সহিত রাঢ়ে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ভীষণ যুদ্ধ করেন।

"ঐ যুদ্ধে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী প্রাণ দিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের অনতিদূরে এই যুদ্ধক্ষেত্র আজও মোগলের মাঠ নামে পরিচিত। কাঁকসায় (কণকেশ্বর) বহু স্মৃতিচিহ্ন এখনও বিদ্যমান। কাকীদেবের তাম্রশাসনে বর্দ্ধমানপুরী, বর্দ্ধমান-ভুক্তির উল্লেখ আছে।

"বর্গীর হাঙ্গামায় বর্দ্ধমান জেলার সভ্যতা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ক্লাইভ কাটোয়ার পথেই পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, বর্দ্ধমানের কোনও ইতিহাস নাই—এই ইতিহাস লিখিতে হইবে।"

এইরূপ বক্তৃতার প্রয়োজন ছিল এবং বর্ত্তমানে তার প্রয়োজন আরও বাড়িয়াছে। সাহিত্যব্রতীদের তাহাই কর্ত্তব্য।

খেলার মাঠে অভদ্রতা

ইংরেজ প্রবর্ত্তিত ক্রিকেট ও ফুটবল খেলা আমাদের যুবকবৃন্দের নেশা হইয়াছে। ২২ জন লোক খেলিবে, এবং লক্ষ লোক তাহার জন্ত ভিড় করিবে—এই ব্যবস্থা খুব স্বাস্থ্যপ্রদ নয়। বিশেষতঃ খেলার মাঠে যে অভদ্রতা দেখা দিয়াছে সম্প্রতি তৎপ্রতি লোকমত কঠোর হওয়া উচিত। ক্লাবগুলির পক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা আমরা বলিতে চাই না। পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রীকে যে এই ঝগড়ার মীমাংসা করিতে ডাকা হইল, তাহা আমাদের স্বরাজ সম্বন্ধে কর্ত্তব্যজ্ঞানের অভাব বলিয়া মনে করি।

শিক্ষিত ও অশিক্ষিত

নানা রঙের সমাজতন্ত্রবাদী দাবি করিয়া থাকেন যে, তাঁহারাই ভারতবাসীকে "জনতা"র জন্ত ভাবিতে শিখাইয়াছেন। এই কথা কতটা যে মিথ্যা দেশের জনসাধারণ তাহা জানে না। কিন্তু বাঙালী শিক্ষিত ব্যক্তির তাহা জানা উচিত ও প্রয়োজন। তাহাই বঙ্কিম-স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে কোন কোন লেখক জানাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। "আনন্দবাজার পত্রিকা"র ১৬ই আষাঢ় তারিখের "রবিবাসরীয়" সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বের শিক্ষিত বাঙালী মনের পরিচায়ক :

"কেন যে এ ইংরেজী শিক্ষা সত্ত্বেও দেশে লোকশিক্ষার উপায় হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার স্থূল কারণ বলি—শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মরুক্ রামা লাঙ্গল চষে, আমার কাউলকারি সুসিদ্ধ হইলেই হইল। রামা কিসে দিন যাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুখ, তার কি সুখ, তাহা নদের কটিকচাঁদ তিলার্দ্ধ মনে স্থান দেন না।...বাঙ্গালার লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না।

"সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গালার সর্ব্বত্রে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সুশিক্ষিত অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহা ঘটিবে না। সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই।"

প্রকৃত ধর্ম্ম ও সমাজের আদর্শ

শ্রীমৎ স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "আর্য্যরত্ন" পত্রিকায় ১৩৫৮ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকৃত ধর্ম্ম ও সমাজের আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক লিখিত একটি প্রবন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আর্য্যসভ্যতাসম্মত, এবং সর্ব্বজনগ্রাহ্য হওয়া উচিত :

"যে "মানবধর্ম্ম" ভারতবর্ষে আচরিত হইত তাহা ভুলিয়া গিয়াই ত আমরা সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়িয়াছি এবং সেই আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে আমাদের মঙ্গল নাই, এবং জগতেরও মঙ্গল হইতে পারে না।

"আমাদের নেতাগণ অলীক সাম্প্রদায়িকতার অজুহাতে ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ঘোষণায় পঞ্চমুখ না হইয়া লোকসমাজের নিকট প্রকৃত মানবধর্ম্মের কথা ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। সেই সার্ব্বজনীন মানবধর্ম্মের স্বরূপ আমাদেরই বৈদিক শাস্ত্রে ব্যক্ত হইয়াছে একথা এক্ষণে কাহারও নিকট অজ্ঞাত নয়। বেদের ধর্ম্ম কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের নিজস্ব দান নয়। কারণ ইহা সাম্প্রদায়িক মত নহে, ইহার একমাত্র সত্য—ধর্ম্ম যাহা সকল শ্রেণীর মনুষ্যের প্রতি প্রযোজ্য ও শ্রেয়স্কর। হিন্দু হউক—মুসলমান হউক, খ্রীষ্টান হউক—বৌদ্ধ হউক—বন্ত বা অসভ্য হউক, নারী বা পুরুষ হউক সকলেরই বৈদিকধর্ম্মে তুল্য অধিকার। যাহার পরিচয় কেবলমাত্র মানব সেইই বেদে অধিকারী। যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানীং জনেভ্যঃ এই বেদমন্ত্রে সেই উদাত্ত ঘোষণা করা হইয়াছে। সেই বৈদিক ধর্ম্ম কি? তদুত্তরে বৈদিক দর্শন বলিয়াছে, যতোঽভ্যুদয়ো নিঃশ্রেয়সঃ—অর্থাৎ যদ্দ্বারা ইহলোকে অভ্যুদয় বা চরম উন্নতি এবং পরলোকে মোক্ষলাভ হয়। উহা লাভ করিতে হইলে মানুষকে ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ এই দশ প্রকার গুণ অর্জ্জন করিতে হয়। তজ্জন্য মাটির পুতুল গড়িয়া পূজা করিবার আবশ্যক হয় না, জর্ডন নদীর জল সিঞ্চন করিবার প্রয়োজন ঘটে না—কিংবা মক্কায় গিয়া হজ করিতে হয় না। স্বীয় ইন্দ্রিয়গুলির দুর্ব্বার বৃত্তিকে সংযত করা এবং সদাচার পালন করা এই দুইটি কার্য্য দ্বারাই সেই বৈদিক ধর্ম্মকে আয়ত্ত করা যায়।"

কৌলীন্য প্রথা

কৌলীন্ত প্রথার জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে মাসিক "মন্দির" পত্রিকায় আষাঢ় সংখ্যায় (১৩৫৮) যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপ্রতি গবেষকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশে, সেই প্রবন্ধের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা নৃতত্ত্ববিজ্ঞানসম্মত কিনা তাহাও তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

"একই ব্যক্তির সহিত এই প্রকার বহুতর নৈকট্য সম্পর্কের কাহিনী শুনিয়া পাঠক নিশ্চয়ই অবাক হইতেছেন। কিন্ত

আমাদের 'নিকট-কুলীনে'র ঘরে এমনি ধারা পাল্‌টি সম্বন্ধ অহরহ ঘটিয়া থাকে। নূতন নূতন ঘরে সর্ব্বদা কুলক্রিয়া সম্পাদন করা সহজ হয় না বলিয়াই এই প্রকার মুসলমানীপ্রথা কুলীন সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। আমি কিন্তু এই প্রথাটিকে নিতান্ত অন্যায় মনে করি না।

যে সংসারে কন্যা জন্মগ্রহণ করে, লালিত-পালিত ও বর্দ্ধিত হয়, সেই সংসারের ভাব ও সংস্কার ঐ কন্যাদ্বারা বহুল পরিমাণে স্বামীকুলে সঞ্চারিত হয়। এই কারণেই মাতা ও পিতা উভয়েরই দোষগুণ সন্তানগণের মধ্যে অল্পাধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। নিতান্ত অপরিচিত ও বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট অজানিত কুলের কন্যা বধূ হইয়া ঘরে আসিলে বংশের যে একটি সনাতন ধারা ও রীতি আছে, উহা যথেষ্ট পরিমাণে ওলট-পালট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। পরন্তু চিরপরিচিত নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি পরিবার যদি সর্ব্বদা পরস্পর পরস্পরের সহিত আদান-প্রদান করেন ও বাহির হইতে অন্য কাহারও কন্যা ঘরে না আনেন, তবে কেবলমাত্র সেই কয়েকটি পরিবারেরই ভাব, চিন্তা ও রীতি পরস্পরের ভিতর সঞ্চারিত হইয়া বংশের একটা অখণ্ড ধারা ও সনাতন বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া থাকে। অবশ্য নিকট-কুলীনগণ বর্ত্তমান সময়ে যে প্রণালীতে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আদান-প্রদান করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, আমি ঐ প্রথার পক্ষপাতী নহি। আমার মতে অন্ততঃ ছয়টি পরিবার লইয়া এক একটি মণ্ডলী গঠিত হওয়া উচিত। মণ্ডলীর অন্তর্গত সমস্ত ছেলেমেয়ে যদি কেবলমাত্র নিজ গণ্ডীর মধ্যেই বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন, কোনও প্রকার মণ্ডলীর বাহিরে পদার্পণ না করেন তবেই বংশের অখণ্ডতা ও বিশুদ্ধতা রক্ষা হইতে পারে।"

বলা বাহুল্য, আজিকার দিনের বাস্তবের পরিবেশে, গণ্ডী যতই প্রশস্ত হউক তাহার সীমা রক্ষা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে।

ব্রিটিশ জনসাধারণের জীবনযাত্রা

এই শিরোনামায় একটি বর্ণনা "যুগান্তর" পত্রিকার ১০ই আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা আশা করি তাহা পাঠ করিয়া আমাদের দেশের নরনারী একটু সংযতবাক্ ও সংযত-ব্যবহারী হইবেন :

"সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে শৃঙ্খলানুবর্ত্তিতা এখানে সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সব কাজ চলিতেছে : খাওয়া, বেড়ানো, বিশ্রাম, লৌকিকতা—সব কিছুই নির্দ্দিষ্ট সময়ে সমাধা করিতে হইবে। পার সাধারণ নিয়ম মানিয়া চলো ; না পার নিজে অসুবিধা ভোগ করো। কিন্তু অপরের নির্দ্দিষ্ট কাজে ব্যাঘাত ঘটাইও না।

সকালে ৯টার মধ্যে প্রাতরাশ শেষ করিয়া সবাই কাজে বাহির হয়। অধিকাংশ পরিবারে মেয়েরাও কাজ করে। বাড়ীর কারও জন্য খাবার লইয়া বসিয়া থাকার সময় কোথায় ? ছেলেমেয়েদের স্কুল ও কারখানার কাজ আরও সকালে আরম্ভ হয়। দুপুরে বাহিরেই খাওয়া-দাওয়া। স্কুলেই ছাত্র-ছাত্রীদের খাবার ও দুধ (বিনামূল্যে) দেওয়া হয়। সব বড় বড় আপিসে ও কারখানায় কর্ম্মীদের জন্য ক্যান্টিন আছে। সেখানে দর অপেক্ষাকৃত সস্তা। তাহার ঘরভাড়া, রাঁধিবার গ্যাস, বাসনপত্র, অনেক সময় কর্ম্মীর বেতনও আপিসের মালিকগণ বহন করেন। সেজন্য রেস্তরাঁ অপেক্ষা কম দরে খাবার দেওয়া সম্ভব হয়।

খাদ্যে ভেজাল দেওয়া এদেশে অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। এই অপরাধ নিবারণের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ সতত সচেতন। খাদ্য বিভাগের কর্ম্মচারীরা হোটেলে দোকানে অতর্কিত হানা দিয়া খাদ্য পরীক্ষা করিতেছেন। ভেজাল বা পচা খাদ্য পাইলে আটক করিয়া আদালতে মামলা করিতেছেন। সে ক্ষেত্রে শুধু কঠোর শাস্তি নয়, আটক মাল নষ্ট করিয়া ফেলিতে আদেশ দেওয়া হয়। ধরা পড়িলে কঠোর শাস্তি, লাঞ্ছনা ও দুর্নাম : ফলে ব্যবসাও বন্ধ হইতে পারে। সেজন্য কুপথে পা বাড়ানো ব্যবসায়ীর পক্ষেও নিরাপদ নয়।

কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া বৈকাল ৬টা নাগাদ সবাই বাড়ি ফিরে। তার পর বাড়ীর সকলে মিলিয়া নৈশভোজ, কিছুক্ষণ গল্পগুজব আলোচনা। তার পর বেড়াইতে যাওয়া, সিনেমা-থিয়েটার-ক্লাব ইত্যাদি। এইভাবে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সমস্ত সমাজ-জীবন চলিতেছে। শৃঙ্খলা মানিয়া চলিলে সুষ্ঠু ভাবে সব কাজ সম্পন্ন হয়। নতুবা অসুবিধা ঘটে। অপরের জীবনযাত্রাও ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা। ইচ্ছা থাকিলেও সে শৃঙ্খলায় ব্যাঘাত ঘটাইয়া নিজের দরকারমত কোন কাজ করাইয়া লওয়া সম্ভব নয়।

রাস্তা-ঘাটে, ট্রেনে-বাসে সাধারণ ইংরেজ নরনারী অপরের প্রয়োজন সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। বাসে উঠিবার জন্য ঠেলা-ঠেলি নাই, ডাকঘরে ও ষ্টেশনে সবাই লাইন বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে—অগ্রবর্ত্তীর কাজ শেষ হইয়া গেলে নিজের কাজ মিটাইয়া লইতেছে। ট্রেনে বসিবার আসন না পাইলে চলিবার পথে দাঁড়াইয়া থাকিবে—তিন জনের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে চারি জন বসিবার জন্য তাড়াহুড়া নাই। অপরের নিকট যে ব্যবহার প্রত্যাশা করে—অপরের সহিতও অবিকল সেরূপ ব্যবহার করিতেছে।..."

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি বা পরিচালক শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে ৭৮ বৎসর বয়সে মহাপ্রয়াণ করিয়া তাঁহার গুরুদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানে রামকৃষ্ণ মিশনের বিশ্বব্যাপী নানা প্রতিষ্ঠানে তাঁহার অভাব অনুভূত হইবে। শ্রীমৎ শঙ্করানন্দ স্বামী প্রায় ৭২ বৎসর বয়সে তাঁহার গুরুকর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের অনুগামী ও শুভানুধ্যায়ীরা স্বামিজীর সাফল্য কামনা করেন।

শিল্পে অধিকারভেদ

ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

এ তত্ত্ব বিদগ্ধমহলে সুপরিচিত যে শিল্পে সকলের অধিকার নেই। অনেকের মতে সৃষ্টি সম্বন্ধে এ কথা সর্বসম্মত হলেও রসগ্রহণ ব্যাপারে এ তত্ত্ব পূর্ণ সত্যের দাবি করে না। রসগ্রহণ ব্যাপারেও অধিকার জিনিষটা অনুশীলনসাপেক্ষ। চাষীর ছেলে বলেই তার জন্মগত অনধিকার রয়ে গেল শিল্পলোকে, আর উচ্চ বর্ণাশ্রমধর্ম আমি যেহেতু পালন করেছি অমনি শিল্পলোকে প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়ে গেলাম অনায়াসে, এর কোনটাই বিচারসহ নয়। শিল্প-রস-সম্ভোগ হ'ল এক ধরণের সৃষ্টি, এ কথাটা গোড়াতেই মেনে নিচ্ছি। এখানে আমি দার্শনিক ক্রোচের অনুপন্থী। তবে যে সৃষ্টি মুগ্ধ করে শুধু আমাকে নয়, আমার মত আরও দশ জনকে, অজন্তা বা ইলোরার গুহাচিত্রের মত আরও হাজার জনকে হাজার বছর ধরে, সে সৃষ্টির সঙ্গে এ সৃষ্টির পার্থক্য আছে। এ ভেদটা হ'ল প্রদীপশিখার সঙ্গে সূর্যের প্রভেদ। প্রদীপশিখা আমার মনে আলো জ্বালায়, তার দীপ্তি ক্ষণিকের, আর তিমিরান্তক গগনাধীশ্বর অসংখ্য মনকে আলোকিত করছে কত লক্ষ বৎসর ধরে। এ দুয়ে যে পার্থক্য তা জাতিগত নয়, তা শুধু বর্ণগত। শিল্পী যে আঙ্গিকের সহায়তায় বিশ্বজনের মনের কাছে তার মনের কথাটি ধরে দেয়, সেই আঙ্গিকই তাকে সৃজনধর্মী শিল্পী করে তোলে। ক্রোচে এই আঙ্গিককে বলেছেন technique of externalization—যা ছিল একান্ত গোপন তাকে বাইরের মহলে টেনে আনার কৌশল বা রীতি। এ রীতি আমাদের নাগালের বাইরে, জাতশিল্পীর খাস এলাকায়। শিল্পী অভিনবকে সৃজন করে, আর অগণিত মানুষ যুগে যুগে আবার সেই শিল্পকেই সৃষ্টি করে নিজেদের মনে মনে। সেখানেও সৃষ্টিলীলা চলল। তবে সেই লীলা অব্যক্ত। তার প্রকাশ পরিব্যাপ্ত হ'ল শুধু আমার মনে। আমার পাশের লোকটিও জানল না সেখানে কি আনন্দ-বেদনার আলোড়ন চলেছে। যে অশ্রুর জোয়ার জাগল, যে আনন্দের বান ডাকল আমার মনোলোকে, তার স্থিতি ক্ষণিকের। সেই মাহেন্দ্র লগ্ন যখন পার হয়ে গেল, তখন আবার দৈনন্দিন জীবনের লাভক্ষতি, টানাটানির হিসাবনিকাশ শুরু হ'ল। সেই ক্ষণিকের আনন্দ-বেদনার নিগূঢ় মর্মকথা আর কানে কানে বলল না কেউ, বাইরে তার কোন ছবি রইল না। রবীন্দ্রনাথের কথাই বলি। তিনি লিখলেন কোন অনামিকার উদ্দেশে :

> 'তোমার দুখানি কালো আঁখি 'পরে
> শ্যাম আষাঢ়ের ছায়াখানি পড়ে।
> ঘন কালো তব কুঞ্চিত কেশে যূথীর মালা
> তোমারি ললাটে নব বরষার বরণ ডালা।
> [অভিনয়]

কবির সৃষ্টি এখানে চিত্রকল্প হয়েছে। অতল কালো দুটি চোখের 'পরে প্রেমের শ্যামল ছায়া নামে। যূথীর মালা-অলঙ্কৃত ঘন কালো কুঞ্চিত কেশভারের অপরূপ সৌন্দর্য মেয়েটিকে মনের আরও কাছে টেনে আনে। কবি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকে দেখেছেন। বারে বারে তার কাছে সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, যদি ঘটে থাকে অনবধানতার অপরাধ। কবি তার নিরুপমাকে বলেছেন—'আঁখি যদি আজ করে অপরাধ করিও ক্ষমা'। আমাদের মনও ঠিক এই অনুরোধই জানিয়েছে বর্ষার মায়াঘোর প্রত্যাসন্ন কত না সন্ধ্যায়। আমাদের আনন্দ আমাদের ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করতে পারে নি, ব্যক্তিসত্তার দুর্ভেদ্য প্রাচীরে বার বার মাথা কুটে মরেছে। অক্ষম মন তবু দশ জনকে তার খবর জানাতে পারে নি, আর কাউকে পারে নি সে আনন্দের ভাগ দিতে। সৃজনীশক্তি-সমৃদ্ধ যে কবিমানস তা আহরণ করেছে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ছন্দের পেয়ালায়, বিতরণ করেছে জনে জনে সেই স্বর্গীয় প্রেমের মধু। এখানেই কবির সঙ্গে আমাদের তফাৎ।

আর একটি উদাহরণ দিই। চৈনিক শিল্পীর সবুজ পাথরে গড়া 'অশ্বমূর্তি' সম্ভবত: সপ্তম অথবা অষ্টম শতাব্দীর শিল্প-নিদর্শন। এ মূর্তিটি রক্ষিত আছে ভিক্টোরিয়া এণ্ড এলবার্ট মিউজিয়ামে। এখানে ঘোড়া 'ঘোড়া' হয় নি, হয়েছে আর কিছু। প্রথম দর্শনে ঘোড়াটাকে সিংহ বলে মনে হয়। কোন এক বিশেষ মুহূর্তে অশ্বের শারীরসংস্থান শিল্পীর চোখে এমন এক ভঙ্গী ও রেখায় ধরা দিলে যার সঙ্গে অশ্বের স্বাভাবিক শারীরসংস্থানের মিল রইল সামান্যই। শিল্পী সেই ক্ষণিকের অভিজ্ঞতাকে শাশ্বত করলেন আঙ্গিকের সহায়তায়। দেশে দেশে কালে কালে সে শিল্প গুণীর কাছে বরমাল্য পেলে। এ যুগের সমালোচক লিখলেন :

> "The carver of the Chinese horse might without much trouble have made the horse more realistic; but he was not interested in the anatomy of the horse, for the horse had suggested to him a certain pattern of carved masses and the twist of the neck, the curls of the mane, the curves of the haunches and legs had

to be distorted in the interests of this pattern. The result was not very much like a horse—in fact, this horse is often mistaken for a lion—but it is a very impressive work of art." *

এ শিল্প শিল্প হিসাবে মনে দাগ কাটে। এই হ'ল সমালোচকের রায়। আমরাও হয়ত অনেক সময় বস্তু-বিশেষকে দেখেছি 'a certain pattern of carved masses'-এর রূপে। এ ত অতি সাধারণ অভিজ্ঞতার কথা। শিশুকে বসে থাকতে দেখেছি কোন বিশেষ মুহূর্তে এমন এক বিশিষ্ট ভঙ্গীতে, যে ভঙ্গী স্মরণ করিয়ে দেয় মনুষ্যেতর জীববিশেষের বিশিষ্ট ভঙ্গীর কথা। সে ক্ষণিক অভিজ্ঞতাকে যদি রূপ দিতে পারতাম তা হলে হয়ত মানবশিশুর প্রতিমূর্তি পেতাম না, কিন্তু তার জন্য সে সৃষ্টির শিল্পমূল্যের ব্যত্যয় ঘটত না। কিন্তু আমার পঙ্গু শিল্পীসত্তা বাইরে প্রকাশ করতে পারল না আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে। আকাশের বুকে মেঘের রং দিয়ে আঁকা ক্যাঙারুর ছবি আমি দেখেছি কোন এক সময়ে, কিন্তু তা আর কাউকে দেখাতে পারলাম না আমার সৃষ্টি-প্রতিভা নেই বলে। আমার দেখাটা ঐ চীনা শিল্পীর দেখার চেয়ে সব সময়ে যে নিম্ন মানের সে কথাটা আমি স্বীকার করি না। আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি হয়ত শিল্পীর চেয়ে ছিল ব্যাপকতর এবং গভীরতর। কিন্তু তা রইল প্রকাশ-হীন, বিকলাঙ্গ আঙ্গিকের দরুন। এই আঙ্গিককে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'রূপের টুথ'। তিনি লিখেছেন :

"My pictures are my versification in lines. If by chance they are entitled to claim recognition, it must be primarily for some rhythmic significance of form which is ultimate and not for any interpretation of an idea or representation of a fact." †

শিল্পের ধর্ম হ'ল এই সুষ্ঠু প্রকাশে। কি প্রকাশ করল, কেন প্রকাশ করল, সেটা বড় কথা নয়। যেখানে এই প্রকাশ নেই, সেখানে শিল্প-প্রতিভা স্বীকৃতির কোন দাবি রাখে না। রবীন্দ্রনাথের কথাই বলি। তিনি তাঁর 'প্রতিনিধি' কবিতাটিতে তাঁর হারানো প্রিয়াকে স্মরণের অর্ঘ্য দিচ্ছেন। কবি বলছেন যে তাঁর দয়িতা বেঁচে আছেন কবির জীবনে। কবি তাঁর অমর্ত্য প্রিয়ার প্রতিনিধিত্ব করছেন মর্তালোকে :

"তোমার সে ভালোলাগা মোর চোখে আঁকি
আমার নয়নে তব দৃষ্টি গেছ রাখি।
আজি আমি একা একা দেখি দু'জনের দেখা
তুমি করিতেছ ভোগ মোর মনে থাকি—
আমার তারায় তব মুগ্ধ দৃষ্টি আঁকি"

এ ছন্দ অনবদ্য, এ প্রকাশ সুন্দর। এখানে মতান্তরের অবকাশ অল্প। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে অনুরূপ অভিজ্ঞতার দাবি হয়ত অনেকেই করতে পারেন। যদি সে সব অভিজ্ঞতার প্রকাশ সম্ভব হ'ত, তা হলে বোধ হয় তার শিল্পমূল্যও স্বীকৃত হ'ত রসিকজনের দরবারে। কিন্তু প্রকাশহীন যে কথা, তার সৌন্দর্য কেবল মাত্র একটি মনের জন্য। বহু মনের মজলিশে সে উপেক্ষিত। তাই বলছিলাম যে, সৃষ্টির ব্যাপারে জন্মগত অধিকারভেদকে মেনে নিই নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে। সেখানে ব্রাহ্মণের অধিকারে ব্রাহ্মণতের জাতির হস্তক্ষেপের কোন অবকাশ নেই; সে জগতের জাতিভেদ প্রথা অচলায়তনের মহিমায় বিরাজিত।

এ হ'ল মূলের গভীরের কথা। সেখানে রহস্যাচ্ছন্ন আঁধার পাথার-তলে শিল্পী তার কল্প-লতার শিশু চারাটিকে সযত্নে পালন করে। এ শিশুবৃক্ষ মহীরুহ নয়। তবে বিপুল সম্ভাবনা সে আপনার জীবনে বহন করে। সে সম্ভাবনাকে ফলবতী করার জন্য তপস্যার প্রয়োজন—চাই অনলস প্রয়াস। এই আত্যন্তিক সাধনাই 'প্রভাতসঙ্গীতের কবি'কে 'চিত্রার কবি' করে। অবনীন্দ্রনাথ শিল্পীর এই সাধনার কথা বলেছেন, "যোগসাধন করতে হয় শুনেছি চোখ বুজে, শ্বাস প্রশ্বাস দমন করে; কিন্তু শিল্পসাধনার প্রকার অন্য প্রকার—চোখ খুলেই রাখতে হয়, প্রাণকে জাগ্রত রাখতে হয়, মনকে পিঞ্জর খোলা পাখীর মত মুক্তি দিতে হয়—কল্পনালোকে ও বাস্তবজগতে সুখে বিচরণ করতে। প্রত্যেক শিল্পীকে স্বপ্ন-ধরার জাল নিজের মতো করে বুনে নিতে হয় প্রথমে। তার পর বসে থাকা—বিশ্বের চলচলের পথের ধারে নিজের আসন নিজে বিছিয়ে। চুপটি করে নয় সজাগ হয়ে। এই সজাগ সাধনার গোড়ায় ভ্রান্তিকে বরণ করতে হয়।"*

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর যুক্তির সপক্ষে মিলেটের কথাগুলি উদ্ধৃত করে দিয়েছেন :

"Art is not a pleasure trip, it is a battle, a mill that grinds."

এ কথা খাঁটি কথা। শিল্পীর সৃষ্টি সৃষ্টির বিলাস নয়। অনেক সাধনা, অনেক তপস্যার পরে তাঁর শিল্প রসলোকে উত্তীর্ণ হয়। কোন এক জন ইউরোপীয় সঙ্গীতশিল্পীর কথা মনে পড়ছে। তাঁর বেহালা বাজাবার সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীর প্রশংসা করা হলে তিনি বলেছিলেন :

---

* Herbert Read : *The Meaning of Art*, p. 26.

† *Calcutta Municipal Gazette*, Tagore Memorial Special Supplement, 1941.

* "বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী"

"God alone knows with what difficulty I acquired this ease."

শিল্পীর এই সহজ প্রতিভাটুকু আয়ত্ত করতে হয় জীবনের অনেক সুখকে, অনেক স্বাচ্ছন্দ্যকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে। এ যেন সূর্যের আলো। খোলা চোখে সাদা আলো দেখায় বড় সুন্দর। কিন্তু এই নয়নাভিরাম শুভ্রতার আড়ালে আছে কত রঙবেরঙের আলোর আমন্ত্রণ, কত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া, তার খবর সাধারণ মানুষ রাখে না। শিল্পীর সৃষ্টির আলো স্বচ্ছতা পাবার আগে, শুভ্রতা লাভ করবার পূর্বে কেমন ছিল, কি করে তার মালিন্য ঘুচল সে খবর রসবোদ্ধা রাখে না। সে মনের পত্রপুটে রসটুকু গ্রহণ করেই খুশি হয়। যিনি আনন্দ বিতরণ করলেন সর্বজনের মনের ঘাটে ঘাটে, ঘটে ঘটে ভরে দিলেন আপন প্রসাদ তাঁর বেদনার খবর কেউ রাখে না। এ কথা আমরা ভুলে যাই :

> অলৌকিক আনন্দের ভার
> বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার,
> তার নিত্য জাগরণ ; (ভাষা ও ছন্দ)

শিল্পীর মানস-সত্তা জীবনের কুশাঙ্কুরে ক্ষতবিক্ষত হয়। তাই কবি বলেন, "I fall on the thorns of life, I bleed" আর সে রক্তধারায় আঁকা হয় রসলোকের কালজয়ী রেখাচিত্রগুলি। অন্তর্গূঢ় বেদনা সৃষ্টিকে সম্ভব করে। সে বেদনা সাধারণ মানুষের অতি তুচ্ছ না-পাওয়ার দুঃখ থেকে স্বতন্ত্র। এ বেদনা অলৌকিক আনন্দের উৎসমুখ। বেদনাতুর কবিচিত্তের ক্ষতমুখ থেকে যে রক্তক্ষরণ হয়, তাই সুধারূপে বর্ষিত হয় বিশ্বচেতনার মর্মস্থলে। শিল্পস্রষ্টা যিনি, তাঁর গভীর উৎকণ্ঠা, গভীরতর উদ্বেগ-উদ্বেলতার কথা বলি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

> যেদিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়
> মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দাম দুর্বার
> দুঃসহ অন্তরবেগে তীরতরু করিয়া উন্মূল
> মাতিয়া খুঁজিয়া ফিরে আপনার কূল উপকূল
> তট-অরণ্যের তলে তরঙ্গের ডম্বরু বাজায়ে
> ক্ষিপ্ত ধূর্জটির প্রায়, সেই মত বনানীর ছায়ে
> স্বচ্ছ শীর্ণ ক্ষিপ্রগতি স্রোতস্বতী তমসার তীরে
> অপূর্ব উদ্বেগ ভরে সঙ্গীহীন ভ্রমিছেন ফিরে
> মহর্ষি বাল্মীকি কবি। রক্তবেগ তরঙ্গিত বুকে
> গম্ভীর জলদমন্দ্রে বারংবার আবর্তিয়া মুখে
> নবছন্দ। (ভাষা ও ছন্দ)

এই স্বর্গীয় অশান্তি আছে বিশ্বের সমস্ত শ্রেষ্ঠ শিল্প-সৃষ্টির মূলে। কবির সৃষ্টিতে একটা আকস্মিকতার সুর থাকে। শিল্প যেন হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন। আপাতদৃষ্টিতে একে হঠাৎ পাওয়া বলে ভ্রম হয়। সুদীর্ঘ দিনের নিরলস অক্লান্ত কর্মময় দিনরাত্রির সুকঠোর ইতিহাস আত্মগোপন করে থাকে ঐ সৃষ্টির পিছনে। শিল্পী কলম বা তুলি ধরল আর অমনি লেখা বা আঁকা হয়ে গেল আন্তরিক শিল্প-প্রতিভার গুণে, এ ছেলেমানুষের কথা। সৃষ্টির প্রেরণা (Inspiration) ভিক্ষুকের হাতে দেবতার দান নয়—এ হ'ল অর্জন। অবনীন্দ্রনাথ বলছেন—'Inspiration কি অমনি আসে। অর্জন করলেন না, শিল্প-inspiration আপনি এল ভিক্ষুকের কাছে রাজত্বের স্বপ্নের মত, এ হবার যো নেই।'* শিল্পাচার্য নিজের কথার সপক্ষে মহাশিল্পী রোঁদার মত উদ্ধৃত করে দিয়েছেন :

> "Inspiration! ah! that is a romantic old idea void of all sense. Inspiration will, it is supposed, enable a boy of twenty to carve a statue straight out of the marble block in the delirium of his imagination; it will drive him one night to make a master-piece straight off because it is generally at night that these things occur. I do not know why . . . . craftsmanship is everything; craftsmanship shows thoughtful work; all that does not sound as well as inspiration, it is less effective, it is nevertheless the whole basis of art!"

এই inspiration-এর ধর্ম হ'ল হঠাৎ রূপ দেওয়া। বহুদিন ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে পাথর খোদাই চলল। একটির পর একটি করে ফুল ফুটল পাথরে। তার পরে হঠাৎ একদিন গোলাপবাগিচার খ্যাতিসৌরভ ছড়িয়ে পড়ল দিগ্‌দিগন্তরে। শিল্পের এই আকস্মিকতাকে এ যুগের শিল্প-সমালোচক নাম দিয়েছেন 'Instantaniety'। হার্বার্ট রীড বলেছেন :

> "Many theories have been invented to explain the workings of the mind in such a situation, but most of them ever, in my opinion, by overlooking the instantaniety of the event." †

এই আকস্মিকতাকে শিল্পের ক্ষেত্রে অস্বীকার করা যায় না। হঠাৎ মন চমকে ওঠে, মুগ্ধ বিস্ময়ে অভাবনীয়কে দেখে নেয় দুটি নয়ন ভরে। শিল্পসৃষ্টির মূলে যে আছে এই আকস্মিকতা, একথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন তাঁর সাহিত্যিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে। সৃষ্টি হল অকারণ সৃষ্টি। তার পিছনে লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশ নেই। গান হয় অকারণে গাওয়া। 'ভাষা ও ছন্দ' থেকে আবার বলি :

> 'বেদনার অন্তর করিয়া বিদারিত
> মুহূর্তে নিল যে জন্ম পরিপূর্ণ বাণীর সঙ্গীত।'

পরিপূর্ণ বাণীর সঙ্গীত জন্ম নেয় মুহূর্তের আকস্মিকতায় যেমন হঠাৎ শিশু দেখে প্রথম চোখ-মেলে আলো।

* বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃ. ১২

† *The Meaning of Art*, p. 29.

শিল্পীর কল্পলোকের গভীরতা বিদীর্ণ করে কবিতা ভূমিষ্ঠ হয় রসবোদ্ধার চিত্তলোকে। এই হ'ল কবিতার প্রকৃতি-শিল্পের স্বরূপ। এই শিল্পসৃষ্টির অধিকার হ'ল জাতশিল্পীর—যে শিল্পী ভগবানের আশীর্বাদই শুধু লাভ করেন নি, সে আশীর্বাদকে পূর্ণায়িত করেছেন আপনার ধ্যান ধারণা ও সাধনা দিয়ে।

এবারে রস-সম্ভোগের কথা বলি। সেখানেও অধিকার-ভেদ আছে। এও অতি সাধারণ কথা যে পিকাসোর সব ছবি সাধারণ দর্শকের ভাল লাগে না। সে যুগের আপিস-ফেরত বাবু শিল্পী টমাসের এক গাদা রং-মাখানো ছবি-সম্বলিত একখানি মাসিক বসুমতী পেলেই খুশী হতেন। আর আজকালকার মাসিক পত্রিকার পাঠকেরা সেই শ্রেণীর ছবির দিকে ফিরেও তাকান না। রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের কবিতা ভাল লাগে না এমন পাঠকের সংখ্যাই বেশী। শিল্প যত বুদ্ধিধর্মী হবে, তার আবেদন ততই কমে যাবে সাধারণ মানুষের কাছে, এ হ'ল অভিজ্ঞতালব্ধ কঠোর সত্য। আবার কবি বা শিল্পী যখন অনন্যপূর্ব, অসাধারণ অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেন তাঁর সৃষ্টিতে, তখনও সাধারণ মানুষ তাঁর নাগাল পায় না—দুর্বোধ্যতার, অস্পষ্টতার অভিযোগ দেয়। এই ধরণের উৎকৃষ্ট শিল্পকে বুঝতে হলে রসবোধের উৎকর্ষসাধন করতে হয়, আর সে উৎকর্ষ লাভ করা যায় অনুশীলনের ভিতর দিয়ে। মহাসৃষ্টি যেমন মহাবীর্যের অপেক্ষা রাখে, তেমনি মহৎ ভোগও অনন্যসাধারণ প্রতিভার মুখাপেক্ষী। সেক্সপীয়রের সাহিত্যরস একেবারে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে হলে সেক্সপীয়রের মতই অসাধারণ মনীষার প্রয়োজন হয়। কবির কল্পনার গতিবেগ, তার অনুভূতি, তার ভাবনা ও বেদনার কথা যদি রসিক মন অনুভূতির পথ দিয়ে উপলব্ধি না করে, যদি বুদ্ধি দিয়ে তার মর্মস্থলে প্রবেশ না করে, যদি কবির কল্পনা-উদ্দীপ্ত লোকে তার অবাধ বিচরণের শক্তি না থাকে, তবে ত কবির সৃষ্টির আবেদন ব্যর্থ হয়ে যাবে তার কাছে। কবির বীণার তারে যে সুর সাধা হয়েছিল, ঠিক সেই সুরটি রসিক মনকে আয়ত্ত করতে হবে, তবেই কাব্য পাঠ হবে সার্থক, তবেই সত্য হবে ছবি দেখা। কবির কথা, শিল্পীর কথা সবাই বুঝবে না জাতিগোত্রনির্বিশেষে। এখানে ডিমোক্রেসি চলে না। এখানে অধিকারের সীমারেখা সুস্পষ্ট। যে কথা আমি কখনও শুনি নি, ভাবি নি বা জানি নি, যার অভিজ্ঞতা আমার নেই সেকথা কবিকণ্ঠে যখন শুনি, তখন তার রস পুরোপুরি উপভোগ করতে পারি না। যে ছবি আমি কখনও দেখি নি, সে ছবির কথা যখন শিল্পী বলেন, তখন আমার ধারণা নীহারিকালোকের অস্পষ্টতার রূপ খুঁজে ফেরে, সৌরমণ্ডলের সুনির্দিষ্ট রূপ তখনও তার আয়ত্তাতীত। উদাহরণ দিই :

'......সন্ধ্যাবেলা যবে
নদীতীরে অন্ধকার নামিত নীরবে
প্রেমনত নয়নের স্নিগ্ধচ্ছায়াময়
দীর্ঘ পল্লবের মত।' [বিদায়—অভিশাপ : রবীন্দ্রনাথ]

যদি আমার জীবনে প্রেমময়ী নারীর আবির্ভাব কখনও না ঘটে থাকে, যদি আমি প্রেমশান্ত নয়নের স্নিগ্ধ ছায়া কোন এক পরম লগ্নে প্রত্যক্ষ না করে থাকি তবে কবির চিত্রকল্প বর্ণনার মাধুর্য অন্ততঃ আমার কাছে ব্যর্থ হয়ে গেল। আমি সে মধুর রসে বঞ্চিত হলাম, যার মাধুর্য রসিক জনের মনে অনিন্দ্যসুন্দর প্রেমের বার্তা বহন করে আনবে। দেবযানী সম্বন্ধে কবির বর্ণনা-চাতুর্য আমার চোখে ধরা দিলে না। সন্ধ্যায় শান্ত নদীতীরের প্রকৃত ছবিটি আবছা হয়ে গেল, আমার অভিজ্ঞতার দৈন্যের জন্য। যারা জীবনে নারীর প্রেম লাভ করেছে সেই ভাগ্যবানদের হাতে রইল কবির সৃষ্ট রস উপভোগ করবার দুর্লভ অধিকার; যারা তা পেলে না, তারা এই কাব্যরস থেকেও অনেকটা বঞ্চিত হ'ল। এ ত গেল অনুভূতির দৈন্যের কথা। শিক্ষার দৈন্য আবার অনেক সময় শিল্পরসোপলব্ধির পথে অন্তরায় হয়। যার বর্ণপরিচয় সবে ঘটেছে, সবে হাতে-খড়ি হয়েছে, সে ত আর এজরা পাউণ্ডের বুদ্ধিদৃপ্ত, চোখঝলসানো কবিতার মর্মমূলে প্রবেশ করতে পারবে না। যেমন :

"Your mind and you are our Sargasso sea,
London has swept about you this score years
And bright ships left you this or that in Fee;
Ideas, old gossip, oddments of all things,
Strange spars of knowledge and dimmed wares .. of price,
Great minds have sought you—lacking someone else.
You have been second always. Tragical ?"

এমনিধারা শিক্ষার তারতম্য, রুচির তারতম্য, মনন-ধর্মের ভিন্নমুখীনতা একই ধরণের কাব্য বা শিল্পকে সর্বজনের কাছে গ্রহণযোগ্য করে না। যে শিল্প মহৎ, তার সত্য মূল্যের উপলব্ধি সম্ভব হয় শিক্ষার দ্বারা, সাধনার দ্বারা, অর্জনের দ্বারা। তাই বলছিলাম যে শিল্পের ক্ষেত্রে—তা সে সৃষ্টিই হোক্ আর সম্ভোগই হউক, অধিকারভেদটাকে গোড়াতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ সত্যকে না মানলে উদ্ভট কল্পনার সাহায্য নিয়ে অনেক বিচারবিহীন মন্তব্য করতে হয়—যেমন করেছিলেন টলষ্টয়, রোলাঁ এবং আরও অনেকে।

টলষ্টয় এবং তাঁর শিষ্য রোলাঁ বহু বার একথা বলেছেন যে, শিল্পকে সকলের কল্যাণসাধন করতে হবে।

এমন শিল্প রচনা করতে হবে যার আবেদন সর্বশ্রেণীর সর্ব-মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছুবে। শিল্পী রোলাঁ গুরুবাক্যের প্রতিধ্বনি করেছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি এ তত্ত্ব মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে পারেন নি। মানুষ রোলাঁ টলষ্টয়ের ধর্মে বিশ্বাসী, শিল্পী রোলাঁ পরবর্তী যুগে সে বিশ্বাসের প্রতিবাদ জানিয়েছেন, যখন সেই মানবহিতের ব্রতকে শিল্পের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। 'জন ক্রিষ্টোফার' উপন্যাসে রোলাঁর পরিণত শিল্পীমন শিল্পের সত্যধর্মকে জেনেছে। তাই তাঁর মানসপুত্র জন ক্রিষ্টো-ফারের মুখে আমরা এ কথা শুনি যে শিল্পের পাদপীঠ স্পর্শ করবার অধিকারী সকলে নয়—সেখানে সকলের প্রবেশাধি-কার নেই। ভারতীয় রসশাস্ত্রেও এই অধিকারভেদের কথা স্বীকার করা হয়েছে। এ অধিকার বর্ণগত বা বংশগত নয়, তা অর্জনসাপেক্ষ। কবীর এ অধিকার অর্জন করেছিলেন সমাজের নীচের তলায় বাস করেও। আর যাদের হাতে ছিল এই শিল্পলোকের জন্মগত উত্তরাধি-কার, তাদের মধ্যে অনেকেই সে অধিকারকে হারিয়েছে সাধনার দীনতার জন্য। শিল্পীর জীবনে সবচেয়ে বড় কথা হ'ল অনলস সাধনা। সৃষ্টি করতে হলে বা শিল্প বুঝতে হলে কঠিন পরিশ্রমের এই পথ ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। এই সুকঠোর পরিশ্রমই আমাদের এনে দেয় শিল্পলোকে প্রবেশের ছাড়পত্র। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের ভাষায়:

> 'শিল্পের অধিকার নিজেকে অর্জন করতে হয়। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধন যে আইনে আমাদের হয়, তেমন করে শিল্প আমাদের হয় না। কেন না শিল্প হ'ল 'নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা'; বিধাতার নিয়মের মধ্যেও ধরা দিতে চায় না সে। নিজের নিয়মে সে নিজে চলে, শিল্পীকেও চালায়, দায়ভাগের দোহাই তো তার কাছে খাটবে না।'*

* বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃ. ১৬

আপনারও তো ছেলেমেয়ে আছে

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

আপনার ছেলেমেয়ে আছে কিনা এ প্রশ্নে জটিলতা নাই; এক কথাতেই এর উত্তর দেওয়া চলে। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে 'মানুষ' করে তোলার ব্যবস্থা করেছেন কিনা, তার উত্তর খুব সহজ হবে না। কেননা শিশুকে মানুষ করার সুব্যবস্থা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এজন্য চাই শিশুর প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা, তার বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ গঠন, তার ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে তাকে যথাযথভাবে চালিত করে নিয়ে যাবার যোগ্যতাসম্পন্ন অভিভাবক বা শিক্ষক। আমাদের দেশে অল্পসংখ্যক ভাগ্যবান শিশু ছাড়া বেশীর ভাগকেই অযত্নের ভিতর দিয়ে বাল্যকাল অতিবাহিত করতে হয়; তাদের দেহ ও মনের সুস্থবিকাশের জন্য কোন পূর্বপরিকল্পিত প্রণালী প্রয়োগ করা হয় না। অবস্থার চাপে শিশু যে ধরণের তরুণ বা বয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হয় তাকেই তার ভাগ্যলিপির বিধান বলে মেনে নেওয়া হয়। অভিভাবক চান শিশু তাড়াতাড়ি তার অসহায় অবস্থা কাটিয়ে সাবালক হয়ে উঠুক; তা হলে তাঁরা অপোগণ্ডদের তদারক করার ঝামেলা থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন। কিন্তু শৈশবকাল মানুষের জীবনে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। একে সংকীর্ণ করার চেষ্টা শুভ ফলপ্রদ হয় না।

শৈশবের গুরুত্ব

শৈশবকাল বৃদ্ধির সময়—দেহ, মন, বুদ্ধি ও কর্ম-তৎপরতার বিকাশলাভের কাল। যে প্রাণীর শৈশব যত দীর্ঘায়িত, তার বুদ্ধিবিকাশের সুযোগও তত বেশী। দেখা গেছে, যাবতীয় প্রাণীর মধ্যে মানবশিশুই সর্বাপেক্ষা অধিক দিন পর্যন্ত বিলম্বিত শৈশবের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়। ইতর প্রাণীর শিশু অল্প দিনেই সাবালক হয়ে ওঠে। তাদের জীবন-বিকাশে বৈচিত্র্য নাই; সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে তারা নিজ নিজ গোষ্ঠীর ধারা বহন করে নিয়ে চলে। একটি বিড়ালছানা বা কুকুরছানা বেড়ে উঠে যখন পরিণত বয়সে উপনীত হয়, তখন তারা তাদের জনক-জননীর স্থান অবলীলাক্রমে গ্রহণ করে—বিশেষ কোন পার্থক্য আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু মানব শিশুর ক্ষেত্রে তা ঘটে না। সহজাত প্রবৃত্তি ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার মানসিক শক্তি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মানব-শিশু জন্মগ্রহণ করে। এই শক্তি শিশুর মধ্যে প্রথম থেকেই প্রকাশমান থাকে না, থাকে অঙ্কুর অবস্থায়। এর বিকাশকেই বলা হয় শিক্ষা। আমেরিকার বিখ্যাত শিক্ষাবিদ জন্ ডিউয়ি বলেছেন:

> ....education is not something to be forced upon children and youth from without, but is the growth

of capacities with which human beings are endowed at birth.

—*Schools of Tomorrow.* p. 2.

সন্তান যে সকল শক্তি নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয় সেগুলির বিকাশ-সাধন করাই জনক-জননীর বড় সমস্যা। অনুকূল কোমল মাটি ও জলের স্পর্শ, বাতাস ও আলোর দাক্ষিণ্য পেলে বৃক্ষশিশু সতেজ সবল হয়ে ওঠে, কিন্তু মানব-শিশুর বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল পরিবেশ ত এত সহজে এবং অনায়াসে সৃষ্ট হয় না। শৈশবের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজন সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে আমরা হয় ছেলেমেয়েদের শৈশব অবস্থাকে উপেক্ষা করি, আর না হয় আমাদের অতিরিক্ত আগ্রহের ফলে অনেক সময় তাদের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়।

শিশু ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যবান নানা গুণসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হউক পিতামাতার তাই কাম্য। কিন্তু এজন্য বয়স্ক ব্যক্তির ভাব ব' চিন্তাধারা প্রথম থেকেই তাদের উপর চাপিয়ে দিলে এ উদ্দেশ্য সফল হবে না। শিশুর জগৎ আর বয়স্ক ব্যক্তির জগতে অনেক পার্থক্য। বয়স্ক ব্যক্তিরা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীতে শিশুদের জীবন, তাদের স্বপ্নকল্পনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয় বিচার করতে গেলেই ভুল করেন। বয়স্ক ব্যক্তিরা অনেক দেখে, বহু বার ঠকে, অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করে শিক্ষালাভ করেছেন; তাঁদের দৈহিক ও মানসিক শক্তিও শিশুদের তুলনায় অনেক বেশী। শিশুর মায়াকাজল-মাখানো চোখে তার পরিচিত পরিবেশ—ফুল-পাখী, মেঘ-আকাশ, নদী-পর্বত, নানা জীবজন্তু যে স্বপ্নজাল বোনে, কল্পনায় এদের নিয়ে সে যে মায়ালোক রচনা করে, বয়োবৃদ্ধ খুব কম লোকই নিজেদের ছেলেবেলাকার দিনগুলি স্মরণ করে এরূপ সহজ আনন্দ উপলব্ধি করতে পারেন। শিশুদের মানসিক শক্তির পরিমাণ সম্বন্ধেও তাঁরা সঠিক অনুমান করতে পারেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশের চিন্তানায়ক রুশো শিশুদের শিক্ষাদান-পদ্ধতি নিয়ে যে আন্দোলন সুরু করেন তা থেকেই বর্তমান কালের শিশুমনস্তত্ত্ববিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত। তৎকালীন অভিভাবকদের সম্বন্ধে তিনি যা বলেছিলেন আমাদের দেশে এখনও তা প্রযোজ্য। তাঁর প্রসিদ্ধ 'এমিল' (*Emile*) পুস্তকে তিনি লিখেছেন:

We know nothing of childhood, and with our mistaken notion of it the further we go in education the more we go astray. The wisest writers devote themselves to what a man ought to know without asking what a child is capable of understanding.

অর্থাৎ, শৈশবকাল সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। এ বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে শিক্ষাদান-কার্যে যতই আমরা অগ্রসর হই, ততই বেশী করে ভুল করতে থাকি। বিজ্ঞতম লেখকগণ বয়স্ক ব্যক্তিদের কি জানা উচিত সে বিষয়ে আলোচনা করেন, কিন্তু তা উপলব্ধি করা শিশুদের সামর্থ্যে কুলাবে কিনা ভেবে দেখেন না।

যাদুকর টবের ভিতর আমের আঁটি পুঁতে দিয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাতে ফল ধরানো দেখিয়ে যাদুবিদ্যার ভেল্কি দেখাতে পারে, কিন্তু বাস্তবে সেরূপ গাছে ফল ধরে না। ফললাভের জন্য প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী স্বাভাবিক বৃদ্ধি অপরিহার্য। তেমনি শিশুকে তাড়াহুড়া করে কতকগুলি বিষয় শিখিয়ে দিলেই তাকে পরিণত মানুষের পর্যায়ে তোলা যায় না। রুশো বলেন:

Nature intends that children shall be children before they are men. If we insist on reversing this order we shall produce a forced fruit, immature and flavourless fruit that rots before it can ripen......childhood has its own way of thinking, seeing, and feeling.

অর্থাৎ, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হবার আগে শিশু শিশুই থাকবে এই হ'ল প্রকৃতির বিধান। এর ব্যতিক্রম ঘটালে অর্থাৎ শিশুকেই বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে প্রযোজ্য শিক্ষা দিতে গেলে ফল হবে অকালপক্বতা। অকালে পাকানো ফল স্বাদহীন এবং অল্প দিনেই পচে ওঠে। শৈশবের নিজস্ব চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুভব-ক্ষমতা আছে। এ বিষয়ে পিতামাতা ও অভিভাবককে সচেতন থাকতে হবে।

এর বিপরীত অবস্থা ঘটে, যখন শিশুকে শিশু বলেই নিতান্ত উপেক্ষা করা হয়। শিশুকে তাড়াতাড়ি মানুষ করে তোলার জন্য অস্বাভাবিক ব্যস্ততা এবং কড়াকড়ি যেমন অনাবশ্যক ও ক্ষতিকর, তেমনি তার প্রতি মোটেই কোন প্রকার দৃষ্টি না রাখা বা অতিরিক্ত আদর দিয়ে এবং তার সর্বপ্রকার আব্দার পূরণ করে তাকে একটি ক্ষুদে অত্যাচারী রূপে গড়ে তোলাও অসমীচীন। "Over strictness and over-indulgence are equally to be avoided"—রুশোর এই সতর্কবাণী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

যে মুহূর্তে শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তখনই সে এসে পড়ে সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশের মধ্যে। তখন থেকেই সুরু হয় তার স্বতন্ত্রভাবে জীবন-গঠনের পালা। প্রথম কিছুদিন মাতৃস্তন্যই তার একমাত্র সম্পদ ও জীবনের অবলম্বন; তাই নিয়েই সে তৃপ্ত। অস্বস্তি বা কষ্ট প্রকাশের উপায় হ'ল কান্না। কান্নার অর্থ—অসুবিধা হচ্ছে, তা দূর করতে হবে; কান্না যেন তার কষ্টমোচনের বা অভাব দূর করার আবেদন। কান্না শুনে মা যখন এসে শিশুকে কোলে তুলে নেন, মুখে স্তন্য দেন বা তার ভিজা বিছানা বদলে দেন তখন কচি শিশুও বুঝতে পারে যে, আবেদনে ফল হয়েছে। পরে ক্রমে আবেদন 'দাবি' হয়ে দাঁড়ায়। কান্নার জোরে সে অনেক কিছুই পাবার কামনা করে। বুদ্ধিমতী জননী

শিশুর কান্না শুনে বুঝতে পারেন তা কিসের কান্না—ক্ষুধার না অস্বস্তির, ঘুমানোর না কোলে উঠার আব্দারের। এখন থেকেই তার চরিত্র-গঠন সুরু হয়েছে। অযথা আব্দারের প্রশ্রয় দিলে তার জেদ ক্রমে বেড়েই যাবে। শিশুর দেহ ও মনের বৃদ্ধি প্রথমতঃ নির্ভর করে জননীর উপর। সন্তানের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁকে হতে হবে কোমল ও কঠোর; শিশুকে সুস্থ সবল রাখার জন্য পরিচর্যা তিনি করবেন, কিন্তু অতিরিক্ত স্নেহের প্রকাশে নিজের দুর্বলতা দেখিয়ে শিশুকে একগুঁয়ে করে তুলবেন না। জননী যখন সন্তান-পালনের যাবতীয় ভার আয়া বা পরিচারিকার হাতে তুলে দেন তখন স্বেচ্ছায় তিনি শিশুর চরিত্রগঠনের একটি বড় সুযোগ হারান। মাইনে করা পরিচারিকা জননীর স্থান পূরণ করতে পারে না। শিশুর সদভ্যাস গঠন অপেক্ষা কোন প্রকারে তাকে শান্ত করে রাখাই তার প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।

পিতার দায়িত্ব

একটি শিশু কিরূপ মানুষে পরিণত হবে তা অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যেমন শিশুর বংশানুক্রম এবং পিতামাতার নিকট থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া গুণাবলী, তার গৃহের পরিবেশ, সঙ্গীদের সঙ্গ, তার শিক্ষা বা ট্রেনিং। শিশু যে পরিমাণ স্বাভাবিক শক্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তার বিকাশসাধনে পিতার দায়িত্ব অনেকখানি। তাঁর স্নেহ ও উপযুক্ত পরিচালনা শিশুর জীবনগঠনে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে। সন্তান প্রতি-পালনে পিতার দায়িত্বকে রুশো 'পবিত্র কর্তব্য' বলে অভিহিত করেছেন, বলেছেন এ বিষয়ে পিতার তিনটি ঋণ আছে। আমাদের শাস্ত্রের ভাষায় এগুলিকে বলতে পারি মানব-ঋণ, সমাজ-ঋণ ও রাষ্ট্র ঋণ। রুশো বলেন:

To the human race he owes men; to society, men fitted for society; to the state, citizens. Everyman who can pay this triple debt, and does not pay it, is a guilty man; and if he pays it by halves, he is perhaps more guilty still. He who cannot fulfil the duties of a father has no right to be a father.

(Rousseau's *Emile*—Translated by E. Worthington. Pp. 22-23)

অর্থাৎ, মানবজাতির প্রতি কর্তব্য—মানুষের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য মানুষ দান করে ঋণ শোধ করা, সমাজের প্রতি কর্তব্য সমাজ-জীবনের পক্ষে উপযোগী মানুষ দান করা; রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য নাগরিক দান করা। যাঁর এই তিন প্রকার দান করার ক্ষমতা আছে অথচ করেন না তিনি অপরাধী; তিনি যদি এই কর্তব্য আংশিকভাবে সম্পন্ন করেন তবে তিনি আরও বেশী অপরাধী। যিনি পিতার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে পারেন না, তাঁর সন্তানের জনক হওয়ার কোন অধিকার নাই।

শিশুর দল মানবজাতিকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করে চলেছে। এদের শিক্ষা দিয়ে সমাজের পক্ষে যোগ্য করে তোলা পিতামাতা ও রাষ্ট্রের সম্মিলিত কর্তব্য। পিতামাতার সহযোগিতা ভিন্ন রাষ্ট্রের একার পক্ষে এ কর্তব্য সম্পাদন করা সম্ভবপর নয়। অভিভাবক যদি শিশুর প্রতি নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকেন, তিনি যদি শিশুর প্রকৃতি ও স্বভাব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হন এবং তার কল্যাণের জন্য সত্যিকারের উৎকণ্ঠা অনুভব করেন তবে বর্তমানকালের ছাত্রসমাজের অনেক সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে আসবে, কতকগুলির উদ্ভবই হবে না। দুঃখের বিষয় হলেও অস্বীকার করে লাভ নেই যে, আমাদের দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব কমসংখ্যক লোকই শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখেন এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞান বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। অথচ কোন্ স্নেহশীল পিতা চান না যে, তাঁর সন্তান 'মানুষ' হউক?

চুরির হীরা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

পেয়েছিল দুটি হীরক কুড়ায়ে—
কিরাত যুবক বনে।
সে চেনে না হীরা, থাকিত সে মণি দুটি—
আঁধার কুটীরে তারকার মত ফুটি,
দেখিয়া দেখিয়া মিটিত না তার ক্ষুধা,
প্রস্তরও নাকি জোগাইতে পারে সুধা?
অজানা কি এক আনন্দ তার
জাগিত সঙ্গোপনে।

শিকারেতে যায়, সেই হীরা দুটি—
জাগে সদা সব কাজে,
হেরে হরিণীর আঁখিতে তাহারি আলো,
দেখে সে নিরখি, লাগে তার বড় ভালো।
বাঘিনীর চোখে প্রখর দীপ্তি তারি,
ওকি ভীষণতা!—তবু যায় বলিহারী।
সকল আলোই সে হীরার আলো
নয়নে ও মনে রাজে।

একদিন যুবা দেখিল তাহার
হীরা জোড়া গেছে চুরি।
উলটি পালটি দেখে চারিধার খুঁজি
নাহি সন্ধান, হারায়েছে তার পুঁজি,
দেখে নদীতীর, দেখে গিরি দরী বন,
শেষ আর যেন হয় না অন্বেষণ।
মাদল, বাঁশরী, ধনু, ফুলহার
দূরে ফেলে দেয় ছুড়ি।

মূল্য জানে না—তবু হীরা লাগি
কেঁদে মরে বনবাসী।
চোখে ঘুম নাই, অনশনে কাটে দিন,
সবল শরীর শুকায়ে হতেছে ক্ষীণ।
পাথর যেতেছে পাথরের লাগি গলি,
দুঃখে তাহার কাতর বনস্থলী।
সান্ত্বনা দেয় সুদূর হইতে
আরণ্যকেরা আসি।

বনদেবী ডাকি স্বপ্নেতে কন
"হীরা তোর ফিরে পাবি।"
নিরাশ হৃদয়ে জাগিল আশার রেখা,
প্রিয় হারানিধি সাথে হতে পারে দেখা।
দেবীর বাক্য মিথ্যা হবার নয়,
আসে বিশ্বাস, থাকে নাক' সংশয়।
শিথিল শরীরে নব বল পায়
সেই কথা ভাবি ভাবি।

কিশোরী কন্যা সঙ্গে—পাহাড়ী
আসিয়া যুবারে কয়,
স্বপন দিয়াছে বনদেবী কাল রাতে,
বিয়া দিতে হবে কন্যার—তব সাথে।
এ মেয়ে আমার কাননে কুড়ায়ে পাওয়া,
ইহার উপর দেবতার দাবী-দাওয়া।
জীবন্ত এই পরশমণির
পাবে তুমি পরিচয়।

বিয়া হয়ে গেল—কিরাত যুবক
হেরিল সবিস্ময়ে।
হারাণো হীরায় গড়া আঁখি কন্যার,
সহজে চেনার উপায় নাহিক আর।
কালো তারা দিয়ে দেগে দেছে অপরাধ,
চুরির শাস্তি কেমনে পড়িবে বাদ?
বারবার চায়, চিনিতেও পারে,
তবু সন্দেহ রহে।

স্বপনে আবার কন বনদেবী
চোর পড়িয়াছে ধরা।
হীরা দুটি লয়ে, সুখে ছিল দিবা যামী।
চঞ্চলতা যা—উহাতে দিয়াছি আমি।
দিনু লাবণ্যে—প্রাণ প্রতিষ্ঠা করি।
মধু ছিল যাহা হইয়াছে মধুকরী।
ইচ্ছা উহার এই ধরণীর
সব মধুময় করা।

দেখে যুবা, আর মনে মনে বলে—
'এ হীরা দুটিও খাসা,'
চাহনিতে ওর এই বনভূমি হায়
সোনা ও স্বপনে ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়,
বেজে উঠে বাঁশী, গাছে গাছে পাখী নাচে
সবার সঙ্গে ও-চোখের যোগ আছে।
আলোতে উহার বাসা বাঁধে এসে
জগতের ভালবাসা।

রাজনগর

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

ইহার পর বিল হইতে ফিরিবার পথে আমবাগানের মধ্যে, রাত্রে চন্দ্রমোহনের পুকুরঘাটে প্রসন্নর সঙ্গে তরু পাগলীর প্রায়ই দেখা হইতে লাগিল। এইভাবে কিছু দিন চলিল। কিছু লোকজানাজানি হইল। মাসকয়েক পরে এক দিন প্রসন্ন শুনিল পাগলী ধুতরা বিচি না কি খাইয়াছিল, খুব দাস্ত বমি হইয়া বিছানা লইয়াছে। প্রসন্ন কয়েক দিন ধরিয়া সন্ধ্যার পরে চন্দ্রমোহনের বাড়ীর আশপাশে ঘোরাঘুরি করিল, পাগলীর সঙ্গে আর দেখা হয় না।

প্রসন্ন মদ ধরিল। বাগ্‌দী পাড়ায় গিয়া মদ খাইয়া আসিত, বাড়ীতে আনিতে সাহস পাইত না। কেনারাম বাগ্‌দী দুই মাইল দূরের গঞ্জ হইতে মদ আনিয়া দিত, বকশিশ ও প্রসাদ পাইত। প্রসাদ সে একা পাইত না, তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মঙ্গলারও ভাগ জুটিত। স্বামী বাড়ী না থাকিলে মঙ্গলা বাবুর সেবা করিত। মঙ্গলা দেখিতে ঘোর কালো, বয়স কম। অত কালো হইলেও তাহার চেহারায় চিকনাই আছে। কেনারামের নাতনীর বয়স তাহার। প্রথম বৌ মরিয়া গেলে তিন কুড়ি সাত টাকা দিয়া চল্লিশ বৎসর বয়সে নয় বছরের মঙ্গলাকে বিবাহ করিয়াছিল কেনারাম। এখন মঙ্গলার বয়স সতের বছর। ছেলেপুলে হয় নাই। প্রসন্ন মঙ্গলাকে আদর করিয়া মশানকালী বলিয়া ডাকিত।

প্রসন্নর কি ঝোঁক চাপিয়াছিল, এক মড়ার খুলি সংগ্রহ করিয়া বাগ্‌দীপাড়ায় বেতাই চণ্ডীর থানে গিয়া সাধনা করিতে আরম্ভ করিল। সিঁদুরের ফোঁটা পরিয়া কানে জবাফুল গুঁজিয়া এক বোতল কারণ লইয়া বেতাই চণ্ডীর থানে গিয়া সে পদ্মাসনে বসিত। তার পর মড়ার খুলিতে একটু কারণ ঢালিয়া চোখ বুজিয়া ধ্যানস্থ হইত। কে তাহাকে বলিয়াছিল একুশ দিন সাধনা চালাইতে পারিলে জাগ্রত বেতাই চণ্ডীমাতা দেখা দিয়া বর দিবেন। সপ্তাহখানেক পরে তাহার মনে হইল সাধনার পদ্ধতি পরিবর্তন করিতে হইবে। মঙ্গলাকে সে আদেশ করিল এক বোতল বেশী কারণ লইয়া সন্ধ্যাবেলা থানে যাইতে হইবে। বলিল, তোর কানে আমি মন্ত্র দেব। মন্ত্র জপ করলে তুই মায়ের দেখা পাবি। তখন আর ভাবনা কি বল?

মন্ত্র শিখিবার জন্ত যত না হউক বাবুর কাণ্ডকারখানা দেখিবার জন্ত কুতূহলী হইয়া মঙ্গলা সন্ধ্যার পরে কাপড়ের মধ্যে মদের বোতল লুকাইয়া বাহির হইল। কেনারাম তখন বাড়ী ফিরিতেছিল। বৌকে অন্ধকারে চুপি চুপি বাড়ীর বাহিরে যাইতে দেখিয়া তাহার মনে সন্দেহের উদয় হইল। ভাবিল দৌড়াইয়া গিয়া উহার চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া আনিবে। আবার কি ভাবিয়া সে বাড়ী হইতে একগাছা মোটা লাঠি লইয়া বৌয়ের অনুসরণ করিল। মঙ্গলা জানিতে পারিল না স্বামী তাহার পিছনে পিছনে আসিতেছে।

জঙ্গল ভাঙিয়া বেতাই চণ্ডীর থানে পৌঁছিয়া মঙ্গলা দেখিল বাবু একটা বোতল শেষ করিয়া মড়ার খুলি কোলে পূজায় বসিয়াছেন। পায়ের শব্দে ঘাড় ফিরাইয়া প্রসন্ন মঙ্গলাকে দেখিল, বলিল—বোতল কই? মঙ্গলা কাপড়ের মধ্য হইতে বোতল বাহির করিয়া দিল। বোতলের মদ অর্দ্ধেক খুলিতে ঢালিয়া প্রসন্ন খাইল, বাকীটা মঙ্গলাকে খাইতে আদেশ করিল। মঙ্গলা আদেশ পালন করিয়া জড়সড় হইয়া বসিল। তাহার কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল।

প্রসন্ন পদ্মাসন ছাড়িয়া হঠাৎ সেখানে শুইয়া পড়িল। মঙ্গলাকে বলিল, এই, তুই আমার বুকের ওপর উঠে দাঁড়া। জিভ বের করে দাঁড়াবি। আজ অমাবস্যার রাতে কালী-সাধনা হবে।

প্রস্তাব শুনিয়া ভয়ের মধ্যেও মঙ্গলা হাসিয়া ফেলিল। বলিল, আপুনি কি কথা কও যে বাবু। ও আমি নারব।

প্রসন্ন শুইয়া থাকিয়া তাহাকে ধমক দিল—ওঠ বলছি হারামজাদী! জিভ বের কর। ধমক খাইয়া মঙ্গলা ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, আমি মা কালী হবো না বাবু নজ্জা নাগে।

প্রসন্ন চটিয়া গেল। বলিল, হারামজাদী ব্রাহ্মমুহূর্ত বইয়ে দিলে রে।

সে চোখ বুজিয়া আবার আদেশ করিল—শীগগির ওঠ বুকের ওপর। জিভ বের করিস, নইলে সব পণ্ড হয়ে যাবে। সে মন্ত্র বলিতে লাগিল—হ্রীং হাং কালী কালী মহাকালী নমস্তৈ...

মঙ্গলা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রসন্নর বুকের উপর এক পা রাখিল।

কেনারাম লাঠি হাতে ভাটির ঝোপের আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল। বৌকে বাবুর বুকের উপর এক পা চাপাইতে দেখিয়া আর মন্ত্রের ঘটায় সে কেমন বিহ্বল হইয়া গেল। সে ভাবিল তাহার তিন কুড়ি সাত টাকা খরচ করিয়া বিয়ে করা বৌ 'ঘুগিনী' হইল বুঝি। ঘুগিনী হইয়া পাখা বাহির করিয়া সে উড়িয়া যাইবে। ঝোপের আড়াল হইতে সে কাতর স্বরে বলিল, ওরে মুণ্ডলী, আমারে ফেইল্যা তুই যাস নি রে, তুই ঘুগিনী হোস নি রে।

কেদারামের গলা শুনিয়া মদনার মদের নেশা এক মুহূর্তে ছুটিয়া গেল। সে জঙ্গলের মধ্যে ছুটিয়া পলাইল। প্রসন্নের মন্ত্র থামিয়া গিয়াছিল। নেশার ঘোরে অচৈতন্তের মত সে মাটিতে পড়িয়া রহিল।

বাগ্‌দীপাড়ার ছেলের গুহ্য সাধন-ভজনের সংবাদ কিছু কিছু হরিনারায়ণের কাণে আসিয়া পৌঁছিল। তিনি ভাবিয়া পাইলেন না সংস্কৃতচর্চ্চা করিতে করিতে এই সব বেলেল্লাপনায় তাহার মন যায় কি করিয়া। কি ভাবে ছেলেকে শাসনে আনা যায় তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। জগদ্ধাত্রীর কাছে তিনি প্রস্তাব করিলেন প্রসন্নকে কিছু দিনের জন্ত রাজনগর হইতে অন্যত্র পাঠাইবেন। কতকটা ছেলের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, কতকটা স্বামীর অসন্তোষের ভয়ে জগদ্ধাত্রী ছেলের উপর কঠোর ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ছেলেকে চোখের আড়াল করিতে রাজী হইলেন না। অতি অল্প বয়সেই প্রসন্ন কলুষিতচরিত্র ও মদ্যপ হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি ঠেকাইতে পারেন নাই। অস্বাভাবিক মাতৃস্নেহের কথা ছাড়িয়া দিলেও আর এক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া তিনি বিষয়টা দেখিতেন। জগদ্ধাত্রীর মনে হইত উঠতি বয়সে এই উদ্দামতা পুরুষমানুষের পক্ষে এমন কিছু অমার্জ্জনীয় অপরাধ নহে। যথাসময়ে এ সব দোষ কাটিয়া যাইবে। মনে মনে দুই ছেলের তুলনা করিয়া তিনি ভাবিতেন, ইন্দ্র হইবে একেবারে নিরামিষ বেটা-ছেলে। এখনই বয়স্কদের মত তাহার ভারিকি চালচলন হইয়াছে। ইন্দ্রের প্রতি স্বামীর পক্ষপাতিত্ব তাঁহার মনকে পীড়িত করিত। তিনি মনে করিতেন প্রসন্ন এত উদ্দাম প্রকৃতির হইলেও তাহার স্বভাবের মধ্যে কেমন একটা সরলতা ছিল। পিতার কাছে লাঞ্ছিত হইয়া সে মাতার ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিত। এমন ছেলের উপর বাহিরে কর্কশ ভাব দেখাইলেও মনে তিনি কঠিন হইবার মত জোর পাইতেন না। প্রসন্ন তাঁহার বাক্স খুলিয়া টাকা পয়সা সরাইলেও আজকাল তিনি প্রায়ই স্বামীর কাছে তাহা গোপন করিতেন।

বেতাই চণ্ডীর থানে সাধনায় ব্যাঘাত ঘটায় প্রসন্ন কয়েক দিন উদ্‌ভ্রান্তের মত হইয়া রহিল। তার পর ভাবিয়া স্থির করিল মন্ত্র বলার ত্রুটি হওয়াতে স্বয়ং বেতাই চণ্ডীমাতা এই ব্যাঘাত ঘটাইয়াছেন। ভাল করিয়া মন্ত্র শিখিবার জন্য সে আবার সংস্কৃত পড়ায় মন দিল। তাহার নিষ্ঠা ও মেধার পরিচয় পাইয়া বিভারত্ন মহাশয় প্রীত হইলেন। হরিনারায়ণের কাছে তিনি প্রসন্নর অনেক প্রশংসা করিলেন।

ইহার কয়েক দিন পরে বৃদ্ধ ষষ্ঠীচরণের শক্ত অসুখ হইল। তিন চার বছর হইল তাহার আর কাজ ছিল না। ইন্দ্র বড় হইয়া উঠিতেছিল। তাহাকে কাঁধে করিয়া বেড়াইবার সামর্থ্য ছিল না বুড়ের, প্রয়োজনও ছিল না। তবু প্রতিদিন সকালে সে মনিববাড়ীতে হাজিরা দিত। ইন্দ্রের জন্য ঘুড়ি ও লাটাই তৈয়ারী করিত, তাহার ছোট বোন চিনুর জন্য মাটির পুতুল বানাইত, হরিনারায়ণের জন্য বেতের আগা, ডুমুর সংগ্রহ করিত। জগদ্ধাত্রীর সঙ্গে কথাকাটাকাটি করিবার উৎসাহও আর তেমন ছিল না। মন ভাল থাকিলে পঞ্চকুণ্ডীর ডাকাতের বেটি বলিয়া জগদ্ধাত্রীকে খেপাইত। বৃদ্ধ ষষ্ঠীচরণের এই ঝগড়া বাধাইবার চেষ্টা দেখিয়া জগদ্ধাত্রী মৃদু হাসিতেন। মাঝে মাঝে সে খাবার লইয়া ঝগড়া করিত। বলিত এক-চোখী পঞ্চকুণ্ডীর ডাকাতের বিটি তাহাকে বাসি ভাত দিয়াছে। মাছ না দিয়া শুধু কাঁটা দিয়াছে ঝোলের মধ্যে। সে এখন ভাল করিয়া চোখে দেখে না, কানে শোনে না, তাই এত সাহস হইয়াছে ডাকাতের বিটির। বিকালের দিকে অন্ধকার হইবার আগে সে কাঁচা চাল ডাল তরিতরকারী গামছায় বাঁধিয়া বাড়ী লইয়া যাইত। তাহার প্রতিবেশী শোটকার বাড়ীতে এইগুলি দিত। শোটকার স্ত্রী ভাত ডাল ফুটাইয়া মেয়ের হাতে ষষ্ঠীচরণের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিত। ষষ্ঠী প্রপৌত্রীর বয়সী পুঁটিকে বলিত—পুঁটিদিদি, আর জন্মে তুই আমার শাউড়ীর বিটি ছিলি রে।

ক্রমে ক্রমে জীবনীশক্তি ক্ষয় হইয়া বৃদ্ধ জড়বৎ হইয়া আসিতেছিল। মনিববাড়ী হইতে নিয়মিত সিধা যাইত। ইন্দ্র মাঝে মাঝে তাহাকে দেখিতে যাইত। একদিন ইন্দ্রের সঙ্গে প্রসন্নও গেল তাহার বাড়ী। পুঁটি তখন বৃদ্ধকে খাওয়াইতেছে। পুঁটি ইন্দ্রকে লজ্জা করিত না, প্রসন্নকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় দিয়া ঘরের এক কোণে সরিয়া গেল। প্রসন্নকে দেখিয়া বৃদ্ধ একটু হাসিল, বলিল—বড়বাবু আইছ? সড়কি সিদ্ধির মন্তর শেখবা? মন্তরটা তিড়িংমিড়িং কইর‍্যা এহনও মনের মধ্যি নাফায়। উয়ারে খালাস করতি হবি।

পরের দিন ষষ্ঠীচরণের মৃত্যু হইল।

ষষ্ঠীর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া জগদ্ধাত্রী চোখ মুছিলেন, ইন্দ্র আর চিনু কাঁদিতে লাগিল। আজাহার সর্দ্দার তাহার দুই পুত্র সেরাজ ও দেরাজকে সঙ্গে লইয়া মৃত গুণীকে দেখিতে আসিল। শ্মশানঘাটে উলিপুরের সকল বৃদ্ধ লাঠিয়াল মৃত গুণীকে সম্মান জানাইয়া গেল। হরিনারায়ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

ষষ্ঠীচরণের মৃত্যুর মাসতিনেক পরে উচ্ছৃঙ্খল প্রসন্ন আর এক কাণ্ড করিয়া বসিল।

ষষ্ঠীচরণের বাড়ীতে গিয়া তাহার ঘরের মধ্যে পুঁটিকে সে দেখিয়াছিল। রাজনগরের নমঃশূদ্র ঘরের পুঁটির মত রূপ অনেক ভদ্রঘরেও দেখা যাইত না। যেমন উজ্জ্বল তাহার গায়ের রং তেমনি সুগঠিত নাক, মুখ ও চোখ। নমঃশূদ্র-পল্লীতে তাহাকে হঠাৎ দেখিলে লোকে চমকিত হইত।

শোটকা অল্প বয়সে মেয়ের বিবাহ দিয়াছিল ভিন্ন গ্রামে।

বছর দুই পরে মেয়ে বিধবা হইয়া তাহার ঘরে ফিরিয়া আসিল। মেয়ের এখন বছর পনের বয়স, রূপ ফাটিয়া পড়িতেছে। শোটকা মেয়ের সাঙ্গা দিবার চেষ্টা করিতেছে, লোকের উৎপাতে টেকা দায় হইয়াছে।

পুঁটিকে দেখিবার পর প্রসন্ন মাঝে মাঝে নমঃশূদ্রপাড়ায় যাইতে আরম্ভ করিল। পথে ঘাটে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া এক সন্ধ্যায় সে শোটকার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। 'শোটকা' 'শোটকা' বলিয়া ডাকিল। ডাক শুনিয়া পুঁটি ঘরের মধ্য হইতে বলিল—বাবা মতি জ্যেঠার বাড়ী গিছে। তার পর কে ডাকে দেখিবার জন্ত ঘরের দাওয়ায় আসিল। প্রসন্নকে দেখিয়া সে মাথায় কাপড় তুলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকিল। তাহার ঠাকুরমা ঘরের এক কোণে বসিয়া মালা ঘুরাইতেছিল। সে বলিল—কে ডাকে রে? কে আইছে? গলাডা ত চিনলাম না। পুঁটি উত্তর না দিয়া জড়সড় হইয়া দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিল। বুড়ী জবাব না পাইয়া চটিয়া গেল। বলিল—আবাগের বিটি, কানে শুনতি পাও না? কাম আছে শোটকারে ডাকতেছে। কও যে দাওয়ায় উঠি বসো, বাপ আসবি এখুনি। যা, ক'য়ে আয়। শোঙের মত খাড়া রইছিস ক্যান?—পুঁটির মা রান্না করিতেছে অন্ত ঘরে। সে থাকিলে অবস্থাটা বুঝিতে পারিত। এ বুড়ীকে পুঁটি কেমন করিয়া ব্যাপার বুঝাইয়া বলে? কেন যে বাবু নিজে আসিয়া তাহার বাপকে ডাকিতেছে এক প্রহর রাতে পুঁটি কি তাহা বুঝে না? তাহার বুক ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল। ঠাকুরমার মুখঝামটা খাইয়া পুঁটিকে দাওয়ায় যাইতে হইল। মাথার কাপড় আরও টানিয়া দিয়া সে বলিল—আপনি বসো দাওয়ায়। বাবারে ডাকি আনতেছি।

মতির বাড়ী শোটকার বাড়ীর দুইখানা বাড়ী পরে। আম গাছ, নিম গাছ ও গোটা কয়েক খেজুর গাছে জায়গাটা অন্ধকার হইয়া আছে। রাস্তায় দাঁড়াইলে মতির বাড়ীর আলো দেখা যায়। এখান হইতে জোরে ডাকিলে তাহার বাবা শুনিতে পাইবে। পুঁটি দাওয়া হইতে উঠানে নামিয়া বাপকে ডাকিবার জন্ত দুই পা অগ্রসর হইতে প্রসন্ন খপ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল, বলিল—আয় আমার সঙ্গে যদি ভাল চাস। সে তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। পুঁটি চিৎকার করিয়া উঠিল—ও বাবা গো!

মতির বাড়ীতে দাওয়ায় বসিয়া গল্পরত শোটকার কানে সে চিৎকার পৌঁছিল। উঠান হইতে একখানা বাঁশ তুলিয়া লইয়া সে ছুটিয়া আসিল। শোটকার মা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে দাওয়ায় বাহির হইয়া আসিল। পুঁটির মা রান্না ফেলিয়া দৌড়াইয়া আসিল। শোটকা দেখিল, পুঁটিকে একজন লোক টানিয়া লইয়া যাইতেছে। চিৎকার করিতে করিতে বাঁশ উঁচাইয়া সে দৌড়াইল। লোকটার মাথায় বাড়ী মারিবে এমন সময় পুঁটির হাত ছাড়িয়া তাহাকে এক ধাক্কায় ফেলিয়া দিয়া লোকটা ফিরিয়া দাঁড়াইল। ধাক্কা খাইয়া পুঁটি রাস্তার পাশে কচু ও ভাটিগাছের ঝোঁপের উপর পড়িয়া গেল। শোটকা দেখিল আততায়ী মধ্যম তরফের কর্তার বড় ছেলে। ভয়ে তাহার আস্ফালন বন্ধ হইয়া আসিল, তবু সে বলিল—বাবু, আপনার এই কাম?—ইতিমধ্যে মতি, তাহার বাড়ীর আরও তিন-চার জন লোক, পাড়ার কয়েকজন লোক সেখানে আসিয়া পড়িল। প্রসন্ন কোন কথা না বলিয়া, কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া চলিয়া গেল।

একজন পুঁটিকে উঠাইয়া দাওয়ায় বসাইয়া দিল। সে খুঁটিতে ঠেস দিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। শোটকা তাহার নিকটে আসিল এবং স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিল—পুঁটি কৈ রে? আয় মা, আমার কাছে আয়।

পুঁটি আসিয়া বাপের পায়ের কাছে বসিয়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

পরের দিন সমস্ত ব্যাপার খানিকটা অতিরঞ্জিত হইয়া হরিনারায়ণের কাছে পৌঁছিল। তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল।

জগদ্ধাত্রী ছেলের পক্ষ লইয়া বলিলেন—আমি এই মাসেই ছেলের বিয়ে দেব। হরিনারায়ণ বলিলেন—উহাকে সদর দেউড়িতে বেঁধে বিছুটি লাগাতে হবে। ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন—তুমি কুলাঙ্গার। তোমার দ্বারা মান, সম্ভ্রম, বিষয়-সম্পত্তি সব নষ্ট হবে। তুমি বেরিয়ে যাও বাড়ী থেকে। তোমার মুখ দেখতে চাই না।

স্বামীর কথা শুনিয়া জগদ্ধাত্রী ভয়ানক রাগিয়া গেলেন। স্বামীর মুখের উপর শ্বশুরকুল, পিতৃকুলের পুরুষদের চরিত্র-দোষের কথা উল্লেখ করিলেন, বলিলেন—রাজনগরের, পঞ্চ-ক্রোশীর ঘরে ঘরে খোঁজ নিয়ে তারপর ছেলেকে বকো। তিনকুড়ি বয়েস হয়েছে, চুল দাড়ি পেকে পাটের মত সাদা হয়েছে এমন বুড়োরও দেখবে স্বভাবদোষ। নিজের ঘরে কি দেখেছ ছেলেবেলায়? বড় তরফ, ছোট তরফ, ম'তরফে খুড়ো ভাইপো, ভাই ভাই, সকলে মিলে কেলেঙ্কারির একশেষ। মদ খেয়ে গেরস্থঘরের বৌঝিদের দিকে নজর দিতে তাদের বাধে না। যে কুলে জন্মেছে, যেমন রীত দেখছে চারদিকে, সেই পথে চলছে। ছেলের দোষ দিলে কি হবে? এক দেখি সৃষ্টিছাড়া মানুষ তুমি।

জগদ্ধাত্রী আবার বলিলেন—তুমি অযথা রাগ করছ। উঠতি বয়সে বেটাছেলের এক আধটু বেচাল হওয়া কি দোষের কথা জানি নে বাপু। এ আবার দোষ নাকি? সইতে না পারো ছেলের বিয়ে দাও, শুধরে যাবে।

জগদ্ধাত্রীর কথা শুনিয়া হরিনারায়ণের মৃত রামলোচন কর্তার কথা মনে হইল।

হরিনারায়ণ মাতুলালয়ের শিক্ষিত, মার্জ্জিত পরিবেশে

মানুষ হইয়াছিলেন। পিতার উদার প্রকৃতি, মাতার প্রতি তাঁহার অবহেলা, সংসারের ছন্নছাড়া অবস্থা বালক হরিনারায়ণের মনে গভীর দাগ কাটিয়া বসিয়াছিল। রাজনগরের তৎকালীন পারিবারিক ও সামাজিক চালচলনের প্রতি তাঁহার মনে বিতৃষ্ণার ভাব ছিল। বয়সের সঙ্গে রাজনগরের অনেক কিছুর সহিত আপনাকে খাপ খাওয়াইয়া লইলেও এই বিতৃষ্ণার ভাব দূর হয় নাই।

প্রসন্নর উচ্ছৃংখল চরিত্র হরিনারায়ণকে চিন্তিত করিত। মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হইত ছেলেটার মধ্যে ভাল জিনিষ কিছু ছিল কিন্তু কুসংসর্গ ও তন্ত্রমন্ত্রে অন্ধ ভক্তির ফলে সে বিপথে যাইতেছে। কিন্তু তাহাকে সংশোধন করিবার কোন উপায় তিনি দেখিতে পাইলেন না। কোন ভাবেই সে শাসনের মধ্যে থাকিতে চাহে না, ভয় বলিয়া কোন জিনিস তাহার ধাতে নাই। প্রসন্ন জন্মিবার পর বিদ্যারত্ন মহাশয় তাহাকে দেখিয়া যে কথা বলিয়াছিলেন হঠাৎ তাহা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি বলিয়াছিলেন এ ছেলেপি তামহের প্রকৃতি পাইবে, কোন বাঁধন মানিবে না। প্রসন্নকে লইয়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্থায়ী মনান্তরের মত হইয়াছে। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া হরিনারায়ণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

মন খুব খারাপ লাগাতে বৈঠকখানা ঘরের বারান্দার এক কোণে সেতার লইয়া বসিলেন। অনেকক্ষণ নিজের মনে বাজাইলেন।

প্রসন্ন সে বাজনা শুনিতে পাইল। সারা দিনটা তাহার বিশ্রী কাটিয়াছে। পিতা অগ্নিমূর্ত্তি ধরিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন, বাড়ী হইতে দূর হইয়া যাইবার আদেশ দিয়াছেন। তারপর তাহাকে লইয়া পিতামাতার মধ্যে কলহ হইয়াছে। এমন গুরুতর কলহ হইতে সে আগে দেখে নাই। সেতারের করুণ সুরে তাহার মনের মধ্যে কেমন আকুলি বিকুলি করিতে লাগিল। সে চিন্তা করিয়া দেখিল পিতা তাহাকে দেখিতে পারেন না, বলিলেন—সংসারের অমঙ্গল হইবে তাহার দ্বারা, সে কুলাঙ্গার। সংসারে সকলেই তাহাকে খারাপ বলে এক মা ছাড়া, কিন্তু মা ত স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকের আর কত বুদ্ধি। যাহাই হউক, কেহ যখন তাহাকে চাহে না তখন সে আর সংসারে থাকিবে না। সে হিমালয়ে চলিয়া যাইবে। সন্ন্যাসী হইয়া সাধনা করিবে, তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইবে। মা কালীর কৃপা থাকিলে একদিন না একদিন সে সিদ্ধিলাভ করিবে।

সঙ্কল্প স্থির করিয়া সে মনে মনে পিতার উদ্দেশ্যে বলিল—আপনার আদেশ মাথায় করিয়া লইলাম।

গৃহত্যাগ করিতে মনে মনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া প্রসন্ন বাড়ীতে জানাইল যে, সে পঞ্চক্রোশী যাইবে। ইহার আগে একবার তাহার পঞ্চক্রোশী যাইবার প্রস্তাব হইয়াছিল। হরিনারায়ণ শুনিয়া একটু নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন। প্রসন্নর যাইবার বন্দোবস্ত হইল। যাইবার আগের দিন প্রসন্ন কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইল।

ইন্দ্রের বয়স তখন বারো বৎসর। দাদা কোনদিন তাহাকে আমল দেয় নাই, বয়সে ছোট বলিয়া গ্রাহ্য করে নাই। সেই দাদা আজ ডাকিয়া একসঙ্গে বেড়াইতে যাইবার প্রস্তাব করায় ইন্দ্র বিস্মিত হইল।

দুই ভাই মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইল অনেকক্ষণ। মাঠের মধ্যে বেড়াইবার সময় একটা খরগোস তাহাদের সম্মুখ দিয়া দৌড়িয়া পলাইল। কি করিয়া খরগোস শিকার করিতে হয়, কি করিয়া বনমুরগীকে ফাঁদ পাতিয়া ধরিতে হয় প্রসন্ন তাহা ইন্দ্রকে বলিল। মঠে দাদা একবার একটা বনমুরগী ধরিয়াছিল ফাঁদ পাতিয়া। ইন্দ্র সে গল্প করিল দাদার কাছে। মাঠের প্রান্তে মুরলী বিলের ওপারে সূর্য্য ডুবিতে লাগিল ধীরে ধীরে। তাহাদের মাথার উপর দিয়া অসংখ্য হাঁস দল বাঁধিয়া ডাকিতে ডাকিতে মুরলী বিল হইতে উড়িয়া কাজলার বড় বিলের দিকে চলিল।

গল্প শেষ করিয়া ইন্দ্রের কাঁধে হাত দিয়া প্রসন্ন বলিল—একটা কথা বলছি তোকে ইন্দ্র। আমি পঞ্চক্রোশী যাচ্ছি। বাড়ীতে আর ফিরবো না। ইন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে দুই ভ্রাতা বাড়ী ফিরিল।

প্রসন্ন পঞ্চক্রোশী যাইতেছে বলিয়া সকলের নিকট বিদায় লইয়া বাড়ী হইতে রওনা হইল। পরের দিন দুপুরে সঙ্গের লোক আসিয়া খবর দিল রাত্রে নৌকা ছাড়িয়া বড়বাবু কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। অনেক অনুসন্ধান করা হইয়াছে, তাঁহাকে পাওয়া যায় নাই।

জগদ্ধাত্রী শুনিয়া শয্যা লইলেন। হরিনারায়ণ কোন কথা বলিলেন না। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মনে করিয়া তিনি আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

৪

বছর তিনেক কাটিয়া গিয়াছে। রাজনগরের সমাজ প্রসন্নকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। জগদ্ধাত্রীর অমন সুন্দর স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িয়াছে, তিন বছরে তাঁহার বয়স যেন দশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। স্ত্রীর শরীরের অবস্থা দেখিয়া হরিনারায়ণ উদ্বিগ্ন হইলেন। তীর্থে তীর্থে লোক পাঠাইয়া, কখনও নিজে বহু স্থানে ঘুরিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের সন্ধান করিয়াছেন, কোন ফল হয় নাই। প্রসন্ন জীবিত কি মৃত তাহাও কেহ বলিতে পারে না। হরিনারায়ণের নিজের শরীরও ধীরে ধীরে ভাঙিতে লাগিল।

প্রসন্ন অন্তর্হিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাজনগরের প্রাচীন যুগের একটা অধ্যায় শেষ হইয়া গেল। যাহারা ছোট ছিল তিন বছরের মধ্যে তাহারা কিছু বড় হইয়া উঠিল। প্রসন্নকে

বুঝিতে রাজনগরের সমাজের কোন অসুবিধা ছিল না, কিন্তু এই তিন বছরে যাহারা কিছু বড় হইয়া কৈশোরে ও যৌবনে পা দিল তাহাদিগকে বুঝিতে এই সমাজের অসুবিধার অন্ত রহিল না। কতকটা অজ্ঞাতসারেই যেন দেশের হাওয়ায় দীর্ঘকাল ধরিয়া যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল পরিণতির মুখে আসিয়া অকস্মাৎ বন্ধনমুক্ত হইয়া তাহার সমগ্র প্রভাব এই সকল কিশোরের মধ্যে যাহারা ভাবপ্রবণ তাহাদিগকে পরিপূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। রাজনগরের সমাজের প্রাচীন ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন এই তরুণের দল হইতে বাহির হইয়া আসিল আসন্ন জাতীয় সংগ্রামের প্রথম স্বেচ্ছাসৈনিক-বাহিনীর দুইটি কিশোর সৈনিক।

মনের আকস্মিক পরিবর্ত্তনে প্রসন্ন যখন আত্মীয়স্বজনের চোখের আড়ালে সরিয়া গেল ইন্দ্র তখন বারো বৎসরের বালক। তাহার সঙ্গী ছিল পিতৃবন্ধু জীবানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবানন্দ। দেবানন্দ রাজনগরে থাকিত না, পিতার সঙ্গে তাঁহার কর্ম্মস্থলে থাকিয়া পড়াশুনা করিত। সে ইন্দ্র অপেক্ষা বছর দুয়েক বড়। দেবানন্দ ছুটিতে বাড়ী আসিলে দু'জনে সর্ব্বদা একসঙ্গে থাকিত।

ইন্দ্রর বয়স যখন পনর বৎসর দেবানন্দ তখন স্কুলের পড়া শেষ করিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে। তাহাদের দুই-জনের চেহারা ও স্বভাব পরস্পরের বিপরীত। লম্বা চওড়া পনের বৎসরের ইন্দ্রকে তরুণ যুবকের মত দেখায়। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। খেলাধুলায় তাহার বিশেষ আগ্রহ। এই বয়সে তাহার বন্দুকের তাক দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হয়। তাহার প্রকৃতিতে ভাবপ্রবণতা একটু বেশী। দেবানন্দ দুই বৎসরের বড় হইলেও মাথায় ইন্দ্র অপেক্ষা ছোট। গায়ের রং শ্যাম, পাতলা চেহারা। ভাসা ভাসা দুই চোখের দৃষ্টিতে গভীরতা আসিয়াছে। মুখের গড়ন অতি সুকুমার। দীর্ঘ, অবিন্যস্ত চুলের নীচে মসৃণ কপালে মাঝে মাঝে একটু কুঞ্চনের আভাস দেখা দেয়। দেবানন্দ স্বল্পভাষী গম্ভীর প্রকৃতির। ছাত্রমহলে মেধাবী ছেলে বলিয়া তাহার নাম আছে, আবার অসামাজিক, দাম্ভিক বলিয়া দুর্নামও আছে।

ইন্দ্র লক্ষ্য করিতেছে কিছু দিন হইতে দেবুদার স্বভাবের দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছে। আগে সে প্রাণ খুলিয়া তাহার সঙ্গে কথা বলিত, এখন আর বলে না। এই ত সে দিন দেবু-দার পরামর্শে পিতার পুস্তক-সংগ্রহ হইতে গোপনে আনন্দমঠ বাহির করিয়া আনিয়া পোড়ো বাড়ীর বাগানে বা মেটেগীদের ইটের পাঁজার আড়ালে বসিয়া দুই জনে পড়িত। আনন্দমঠ পড়িয়া তাহারা দুই জনে একটা সন্তানের দল গড়িয়াছিল। এই দল ইংরেজের সঙ্গে লড়াইয়ের অভিনয় করিত। দলবল জুটাইয়া, তাহাদিগকে সন্তান ও ইংরেজ এই দুই দলে ভাগ করিয়া পরস্পরের সঙ্গে লড়াই হইত। দেবুদা হইত ভবানন্দ। ভবানন্দের ডান হাত কাটা পড়িলে বাম হাত দিয়া সে ইংরেজ নিপাত করিয়া চলিত। বাঁশের চাঁচা বাখারি হইত ভবা-নন্দের তরবারি। যেদিন ইন্দ্র বহুনন্দনের পুরাতন তরবারি লুকাইয়া আনিতে পারিত লড়াই সেদিন রীতিমত জমিয়া উঠিত। তাহাদের আর একটা খেলা ছিল রুশ-জাপানের যুদ্ধ। দেবুদা এডমিরাল টোগো হইত আর ইন্দ্র ও অন্যান্য অনুচরদের সাজিতে হইত রুশ। টোগো বাঁশ লইয়া তাড়া করিত আর রুশরা পোর্ট আর্থার ছাড়িয়া পলাইয়া যাইত। ইন্দ্র বুঝিতে পারে সন্তানদলের ভবানন্দের ভূমিকা লইয়া ইংরেজ মারিবে বলিয়া যে দেবুদা তাহার সঙ্গে ঝগড়া করিত সে দেবুদা আর নাই।

ভবানন্দ ও এডমিরাল টোগো সাজিলে কি হইবে আগে দেবুদা ছিল কতকটা ভীতু। বাঘ, ঘরার ভয় ছিল তাহার, যে ভয় রাজনগরের কোন ছেলের নাই বলিলেই চলে। আগে দূরে জঙ্গলের মধ্যে বাঘের ডাক শুনিলে ঘরের মধ্যে থাকিয়াও সে এমন করিত যে অত ছোট যে লক্ষ্মী সেও হাসিত আর যখন তখন দাদাকে ভয় দেখাইবার জন্য দুই হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া হুম্ হুম্ শব্দ করিয়া বাঘের ডাকের নকল করিত। কতবার ইন্দ্র দেবুদাকে ঘোড়ায় চড়া শিখাইবার চেষ্টা করিয়াছে, একবারও তাহাকে ঘোড়ার পিঠে চড়াইতে পারে নাই, এত ভয় ছিল দেবুর।

একদিনের কথা তাহার বেশ মনে আছে। তাহারা দুই জন মাঠের মধ্যে বেড়াইতেছে। ইন্দ্র দেখিল কিছু দূরে একটা মাদী ঘোড়ার পায়ে দড়ি দিয়া খুঁটার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে আর বাচ্চাটা মায়ের পাশে দাঁড়াইয়া ঘাস খাইতেছে। বেশ নধর দেখিতে বাচ্চাটা, ঘাড়ের বড় বড় চুল দুই দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বাচ্চাটাকে দেখিয়া ইন্দ্রের মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি খেলিল। সে বলিল—কি সুন্দর বাচ্চা দেখছ দেবুদা, ওর গায়ে একটু হাত বুলুতে ইচ্ছে করছে। চলো না। দেবু বলিল—ওর মা কাছে রয়েছে। বাচ্চার গায়ে হাত দিলে কামড়ে দেবে, নয় ত চাট মারবে।

—কিচ্ছু করবে না। বাচ্চাকে আদর করছি দেখে ওর মায়ের আহ্লাদ হবে, চলো না।

দুই জনে বাচ্চার কাছে গেল। ঘোটকী একবার মুখ তুলিয়া উভয়ের দিকে চাহিয়া আবার ঘাস ছিঁড়িয়া খাওয়ায় মন দিল। বাচ্চাটা অন্যমনস্ক ভাবে তাহাদের দিকে চাহিয়া একটু সরিয়া গেল। ইন্দ্র আস্তে আস্তে দেবুকে বলিল—চড়বে? দেবু মাথা নাড়িয়া জানাইল, না। সে মনোযোগ দিয়া বাচ্চার খাওয়া দেখিতে লাগিল। ইন্দ্র বলিল—ঘোড়ার খালি পিঠে চড়লে আমি কি করি জানো? সামনে হেঁট হয়ে ঘাড়ের লম্বা চুল শক্ত করে ধরি, আর দুই পা ঘোড়ার পেটের সঙ্গে চেপে

ধরি। হঠাৎ ইন্দ্র দুই হাতে কোমরে ধরিয়া দেবুকে উঁচু করিয়া তুলিয়া বাচ্চার পিঠে বসাইয়া দিয়া চিৎকার করিয়া বলিল—শক্ত করে ঘাড়ের চুল ধরো। বাচ্চা চমকিয়া উঠিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। দেবু ভয়ে চোখ বুঁজিয়া ফেলিল। একটু পরে চোখ খুলিয়া হতভম্ব দেবু দেখে সে কয়েক হাত দূরে ঘাসের উপর শুইয়া রহিয়াছে আর ইন্দ্র কাছে দাঁড়াইয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিতেছে—আহা, লাগে নাই ত দেবুদা? কি করে পড়ে গেলে দেবুদা? বাচ্চার ঘাড়ের চুল বুঝি ভাল করে ধরতে পার নি? অত করে বলে দিলাম যে।

দেবু উঠিয়া গায়ের ধুলা ঝাড়িতে লাগিল। কপট সহানুভূতির স্বর আর বজায় রাখিতে না পারিয়া ইন্দ্র হাসিয়া ফেলিল। দেবুও হাসিতে লাগিল, বলিল—একটুও লাগে নি আমার। কখন যে পড়লাম জানতেই পারি নি। তোকে বলে রাখছি একদিন এর শোধ নেব।

আগেকার সেই ভয়কাতুরে দেবুদার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে বছর দুইয়ের মধ্যে। অনেক সাহস বাড়িয়াছে। বেড়াইতে গেলে সন্ধ্যা হইলেও বাঘের ভয়ে বাড়ী ফিরিবার জন্য তাড়া দেয় না। আরও গম্ভীর হইয়াছে। ইন্দ্রের সঙ্গে পর্য্যন্ত আগেকার মত প্রাণ খুলিয়া গল্প করে না। ছুটিতে রাজনগরে আসিলে দেবুদা তাহার সঙ্গে পোড়ো বাগানে, মুরলীর বিলের মাঠে, জিওলী নদীর ধারে বেড়াইতে যায়, নানা রকম কথাও বলে, কিন্তু ইন্দ্র বুঝিতে পারে দেবুদা কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ থামিয়া যায়, কি যেন চাপিয়া যায় ইন্দ্রের কাছে। ইন্দ্র অভিমানী ছেলে। সে ভাবে দেবুদা এখন কলেজে পড়িতেছে আর সে এখনও স্কুলের ছাত্র, তাই দেবুদা তাহাকে এখন আগের মত বন্ধু বলিয়া মনে করে না। আবার ভাবে দেবুদার বাবা জীবানন্দ কাকা রায় বাহাদুর হইয়াছেন—তাই বোধ হয় দেবুদার মনে অহঙ্কার হইয়াছে, তাচ্ছিল্য করিয়া আগেকার মত কথা বলে না।

সেদিন ইন্দ্র না জানি কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিল। অনেক বেলা থাকিতে দেবু বেড়াইতে যাইবার জন্য তাহাকে ডাকিতে আসিল। দুই জনে মুরলীর বিলের মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে মেউগীদের জঙ্গলে ঢাকা ইটের পাঁজা ছাড়িয়া জেলে-পাড়ার মধ্য দিয়া বিলের ধারে পৌঁছিল। এই পাঁজাটা ইন্দ্র জ্ঞান হওয়া অবধি এই রকমই দেখিতেছে। পাঁজার উপরে আকন্দ, ভেরেণ্ডা, ভাঁট গাছের জঙ্গল হইয়াছে। একটা কুলগাছ বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে। বড় বড় টোপা কুলে গাছ ছাইয়া আছে। একটা মাকাল ফলের লতা গাছটাকে জড়াইয়া উপরে উঠিয়াছে। ছোট ছোট কতকগুলি কাঁচা মাকাল ফল লতা হইতে ঝুলিতেছে। ইন্দ্র শুনিয়াছিল মেউগীদের কে এক জন গুপ্তধন পাইয়া পাকা বাড়ী করিবার জন্য ইট পোড়াইয়াছিল। বাস্তুপূজা করিয়া যেদিন গৃহনির্ম্মাণ আরম্ভ হইবে তাহার আগের দিন সে স্বপ্নে কি আদেশ পাইয়া কামাখ্যা রওনা হয়। কামাখ্যা হইতে সে আর ফিরিয়া আসে নাই। কামাখ্যার ডাকিনী-যোগিনীরা নাকি মন্ত্র পড়িয়া তাহাকে ভেড়া বানাইয়া রাখিয়াছিল তাহার গুপ্তধনের লোভে। সেই হইতে পাঁজাটা ঐ রকম পড়িয়া আছে।

বিলের ধারে পৌঁছিয়া তাহারা দেখিল বাড়ীর সম্মুখে ছোট খালটার ধারে যে গাবগাছ আছে তাহার নীচে চাটাই পাতিয়া বসিয়া চরণ জেলে হুঁকা টানিতেছে। কাছে জড়াইয়া রাখা একটা জাল। তাহাদিগকে দেখিয়া গাব-গাছের গুঁড়িতে হুঁকা ঠেকাইয়া রাখিয়া চরণ প্রণাম করিয়া ধুলা লইয়া কপালে, মাথায় দিল। ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল—ছোটবাবু কি বিলে বেড়াতি যাবার ইচ্ছে কইর্‌যা এদিক পানে আইছেন? ইন্দ্র দেবুর দিকে ফিরিয়া বলিল, বেলা বেশী নাই, এখন কি বিলে যাবে? দেবুর একটু উৎসাহ দেখা গেল। বলিল, চল, একটু ঘুরে আসি। চরণ ডাকিল—ট্যাংরা, অ ট্যাংরা। ট্যাংরা তাহার ছেলে। বাবুদের বিলে বেড়াইতে লইয়া যাইবার জন্য সে তাহাকে ডাকিল। একথা বুঝিয়া দেবু বলিল—ট্যাংরা থাক চরণ, আমরা কাছে একটু ঘুরে আসছি। বৈঠা আছে ত ডিঙ্গিতে? চরণ বলিল, তা আছে বাবু। দুই ডিঙ্গি রইছে ঘাটে। একটা কথা কয়্যা দিচ্ছি ছোটবাবু। নিজেরা যাতিছেন সখ কইর্‌যা, পদ্মবিলের মধ্যি যারেন না য্যান। ফিরতি কালে আঁধার নামবি, দিক ঠাওর করতি পারব্যান না।

পদ্মবিলের দিকে তাহারা যাইবে না চরণকে এই আশ্বাস দিয়া দুই জন ডিঙ্গিতে উঠিয়া ঘাটে বৈঠার ঠেলা দিয়া ডিঙ্গি চালাইয়া দিল। মুরলী বিল প্রকাণ্ড বিল। ডিঙ্গি লইয়া না ঘুরিলে বুঝা যায় না বিলটা কত বড়। দেবু ও ইন্দ্র কিছুদূর ডিঙ্গি চালাইয়া বৈঠা তুলিয়া রাখিল। সূর্য্যের তেজ একেবারে কমিয়া আসিয়াছে। বকের ঝাঁক তাহাদের মাথার উপর দিয়া গ্রামের দিকে উড়িয়া যাইতেছে। দূরে বিলের দক্ষিণ দিকে পাতলা কুয়াশা দেখা যাইতেছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এই কুয়াশা সমস্ত বিলের উপর ছড়াইয়া পড়িবে। মুরলীর বিল কুয়াশার চাদর গায়ে জড়াইয়া ঘুমাইয়া পড়িবে।

দেবু একদৃষ্টে সেই কুয়াশার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া আছে। দূরে দুই একখানা করিয়া ঘাস-কাটা নৌকা ফিরিতেছে। এক সার বক খুব নীচু দিয়া উড়িয়া গেল। তাহাদের একটির গা হইতে খসিয়া একটা পালক ডিঙ্গির উপর আসিয়া পড়িল। ইন্দ্র পালকটা হাতে লইয়া কিছুক্ষণ নাড়া-চাড়া করিল। তার পর সেটা জলের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া বলিল, দেবুদা, চল ফেরা যাক্।

দেবু ঘাড় ফিরাইয়া ইন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল, একটু পরে ফিরব। সে জিজ্ঞাসা করিল, মেউগীদের ঐ ইটের

পাঁজায় কাছে বসে আনন্দমঠ পড়বার কথা তোর মনে আছে ইন্দ্র?

প্রশ্ন শুনিয়া ইন্দ্র একটু অবাক হইল। সে ত সেদিনের কথা, মনে থাকিবে না কেন? সে বলিল, খুব মনে আছে। ভবানন্দের যুদ্ধের কথাও মনে আছে? সে দেবানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল।

দেবানন্দ—আর দু'জনে মিলে রঙ্গলালের যে কবিতাটা মুখস্থ করেছিলাম—

ইন্দ্র—সেটাও মনে আছে—

ইন্দ্র তখন কবিতাটির খানিকটা বলিল।

দেবানন্দ উৎকর্ণ হইয়া ইন্দ্রের আবৃত্তি শুনিল। তাহার আবৃত্তি শেষ হইলে নিজেও পরের অংশ আবৃত্তি করিল। শেষে বলিল—আরেকটা কবিতা:

বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

ইন্দ্র—ওটাও মুখস্থ আছে।

দেবানন্দ—"ভারত বিলাপে" কবি অসভ্য জাপানের কথা লিখেছেন। আরও দুই বছর বেঁচে থাকলে অসভ্য জাপান রুশ ভালুককে কি রকম শিক্ষা দিয়েছে দেখে যেতে পারতেন। দেখে জীবন ধন্য হ'ত।

গম্ভীরস্বভাব দেবানন্দের মুখের ভাব আর চোখের চাহনি দেখিয়া ইন্দ্র বিস্মিত হইল। দেবানন্দ তাহা লক্ষ্য করিল। একটু হাসিয়া বলিল, তুই বোধ হয় ভাবিস দেবুদা কলেজে পড়ে, তার অহঙ্কার হয়েছে, তাই কথা বলে না। তা নয় ভাই। কত রকমের কথা যে আমার মাথার মধ্যে আসে, কত কথা ভাবি, কিন্তু প্রাণ খুলে কারও সঙ্গে আলাপ করতে ভয় হয়। তা ছাড়া আমার যে কি মুশকিল হয়েছে, বাবার দিকে চাই না—

কথা শেষ না করিয়া সে চুপ করিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে অন্য প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিল, তোর সঙ্গে চুরি করে প্রথম আনন্দমঠ পড়ি। তার পর গোটা বইটা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। তোর মনে আছে বোধ হয় শেষের দিকে সত্যানন্দ হিন্দুরাজ্য স্থাপনের আশা করছেন, মহাপুরুষ এসে তাঁকে বোঝাচ্ছেন ইংরেজ রাজা না হলে সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধার হবে না। ইংরেজ রাজত্বে প্রজারা সুখী হবে, ইংরেজ মিত্র-রাজ্য। সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিসর্জন। বিসর্জন এসে প্রতিষ্ঠাকে সরিয়ে নিল। ফলটা হ'ল কি? যা প্রতিষ্ঠা করবার কথা সেটা উড়ে গেল, ইংরেজ এসে জুড়ে বসল। প্রজারা কেমন সুখী হ'ল তা তো জানা কথা।

ইন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া সে আবার বলিল, রাজনগরে তোরা এখনও সব জানতে পারছিস না। বড়লাট কলমের এক খোঁচায় বাংলাকে ভেঙে দুখানা করে দিয়েছেন। পঁচাত্তর হাজার লোকের স্বাক্ষর নিয়ে দরখাস্ত পাঠানো হয়েছিল বিলেতে, ওরা কোন কথা শোনে নি।

তাহাদের পাশ দিয়া একখানা ঘাসের ডিঙ্গি চলিয়া গেল। ডিঙ্গি হইতে গ্যাঁদা জেলে বলিল, বিলে ব্যাড়ান হ'ল ছোট-বাবু?

দেবানন্দ চার দিকে চাহিয়া দেখিল। গ্রাম ছায়া নামিয়া আসিয়াছে বিলের মধ্যে। সে বলিল, চল এবার ফিরি।

ইন্দ্র অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতেছিল। দেবুদা কি বলিল, তাহা ভাবনার বিষয় নহে। সে বিস্মিত হইয়াছিল হঠাৎ দেবুদার এই ভাবে আত্মপ্রকাশ করায়। তাহার অনেক দিনের অভিমান এক মুহূর্তে দূর হইয়া গেল। মনে মনে সে স্বীকার করিল দেবুদা জ্ঞানে, বুদ্ধিতে তাহার চাইতে ঢের বড়। দেবুদা এমনি করিয়া মনের কথা তাহার কাছে খুলিয়া বলুক, বন্ধুর মত তাহাকে সঙ্গে লইয়া চলুক, তাহা হইলে তাহার মনে আর কোন খেদ থাকে না।

গ্যাঁদা জেলের সম্ভাষণে সে চমকিয়া উঠিল। দেবানন্দ ফিরিবার প্রস্তাব করায় সে বৈঠা হাতে লইয়া বলিল, চল।

বিলের ঘাট হইতে সোজা পথে দুই জন যখন বনদুর্গা-তলায় পৌঁছিল তখন অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। দেবানন্দ বলিল, বাড়ী যাবি নাকি রে?

ইন্দ্র বলিল, এখন বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে করছে না দেবুদা। চল তোমাদের বাড়ী গিয়ে একটু গল্প করি।

টোলপাড়ায় দেবানন্দদের বাড়ীতে ঢুকিতেই প্রথমে তাহাদের দেখা হইল লক্ষ্মীর সঙ্গে। লক্ষ্মী আঁচলে এক রাশ ফুল লইয়া মহা ব্যস্তভাবে ফিরিতেছিল। দাদার সঙ্গে ইন্দ্রকে দেখিয়া সে দাঁড়াইল। গম্ভীরভাবে বলিল, ইন্দির দাদা, আপনার একশ' বছর পেরমায়ু হবে।

কোথা হইতে একটা টিকটিকি এই সময়ে টিকটিক শব্দ করিয়া উঠিল, লক্ষ্মী বলিল, ঐ শুনুন তিন সত্যি।

ইন্দ্র হাসিয়া বলিল, কি করে জানলে আমি একশ' বছর বাঁচবো?

লক্ষ্মী—আপনার কথা এই মাত্তর ভাবছিলাম কি না। আর অমনি আপনি এসে পড়লেন। কেন ভাবছিলাম জানেন? আজ সন্ধ্যাবেলা আমার মেয়ের বিয়ে কি না। কাকে নেমন্তন্ন করি তাই ভাবতে ভাবতে আসছিলাম। দাদা ত বাড়ীর লোক, ও ত খাবেই। বাড়ীর লোককে ত নেমন্তন্ন করা যায় না, পরকে নেমন্তন্ন করতে হয়। কে পর কে পর ভাবতে ভাবতে মনে হ'ল ইন্দির দাদা ত আমাদের পর, ওকেই নেমন্তন্ন করি। কি মজা দেখেছ ভাবতে ভাবতে আপনি এসে গেলেন।

লক্ষ্মীর আপনপর সম্বন্ধে সূক্ষ্ম গবেষণার কথা শুনিয়া দুই

বন্ধু হাসিতে লাগিল। ইন্দ্র বলিল—আশ্বিন মাসে কি মেয়ের বিয়ে হয়? কাকীমা মত দিলেন? লক্ষ্মী বলিল, খুব হয় মশায়। ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করতে তিনি কি বললেন জানেন? বললেন, লক্ষ্মীর মেয়ে, অত জাতবিচের কেন, দিয়ে ক্যালো, দিয়ে ক্যালো।

লক্ষ্মী বাদবিচারের জায়গায় জাতবিচার কথাটি বলিয়াছিল। তাহার কথা শুনিয়া ইন্দ্র উচ্চ হাস্ত করিল। অত হাসির ঘটা দেখিয়া লক্ষ্মী অবাক। ইহার মধ্যে হাসিবার কি আছে? বলিল—ঠাকুমার কথাটা ঠিক হ'ল না বুঝি? তা হলে আপনি নেমন্তন্ন নেবেন না?

তাহার মুখ ভার হইয়া উঠিল। ইন্দ্র লাফাইয়া উঠিল। বলিল—নেমন্তন্ন নেবো না মানে? দেখছো দেবুদা, সব খেয়ে ফেলবো ভয়ে লক্ষ্মীপ্যাঁচা নেমন্তন্ন ফিরিয়ে নিচ্ছে।

দুমদাম করিয়া পা ফেলিয়া লক্ষ্মী চলিয়া গেল। দেবানন্দ হাসিয়া বলিল—তোমার বরাতে বিয়ের ভোজ খাওয়া নেই দেখছি। লক্ষ্মীপ্যাঁচা ডেকে সব মাটি করলে। লক্ষ্মী বোধ হয় মেয়ের বিয়ে দেবে বলে উপোস করে আছে।

পুতুলের বিয়ে দেবে বলে উপোস করে আছে? ইন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল। সে লক্ষ্মীকে খেপাইয়াছে বলিয়া অনুতপ্ত হইল। বলিল—কি কাণ্ড দেখ দেখি। চলো ত ভেতরে।

ভিতরে গিয়া তাহারা দেখিল আঁচলে ফুল ছড়াইয়া দিয়া লক্ষ্মী মেঝের উপর শুইয়া পড়িয়াছে। ঘরের এক পাশে পুতুলের বিবাহের আয়োজন সম্পূর্ণ। মাতা ত্রিনয়নী ভাবিলেন উপবাস করিয়া মেয়ের শরীর বুঝি খারাপ লাগিতেছে। তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। একখানা পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে যাইতেছেন এমন সময় ইন্দ্র ও দেবানন্দ ঘরে ঢুকিল। ইন্দ্র ঘরের চারদিকে চোখ বুলাইয়া বলিল—কাকীমা, আমি বড় অন্যায় করেছি। লক্ষ্মীর মেয়ের বিয়ে আর এই শুভদিনে ভুল করে ওকে লক্ষ্মীপ্যাঁচা বলে ফেলেছি। জানেন ভুল করে বলেছি, ইচ্ছে করে ত বলি নি।

লক্ষ্মীর শুইয়া পড়িবার হেতু জানিয়া ত্রিনয়নী পাখা সরাইয়া রাখিলেন। ইন্দ্রকে বলিলেন—তুমি বোস বাবা। লক্ষ্মী ত অবুঝ মেয়ে নয়, তুমি যে ভুল করে বলেছ ও এতক্ষণ বুঝতে পেরেছে। লক্ষ্মী, ওঠো মা, লগ্ন বয়ে গেলে আর ত বিয়ে হবে না আজ।

লক্ষ্মী উঠিয়া বসিল। মায়ের দিকে চোখ রাখিয়া বলিল—ও তিন সত্যি করে বলুক ভুল করে বলেছে, ইচ্ছে করে বলে নি।

ইন্দ্র আগাইয়া আসিয়া লক্ষ্মীর পাশে বসিল। তাহার মাথায়, পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল—আমার দোষ হয়েছে লক্ষ্মী। হঠাৎ বলে ফেলেছি। তুমি তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেল ত। মা খিদে পেয়েছে।

লক্ষ্মী এক লাফে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—খিদে পেয়েছে এতক্ষণ বলো নি কেন? হাঁ মা, ইন্দির দাদাকে বিয়ের আগে খেতে দিলে দোষ হয়?

লক্ষ্মীর ভাবান্তর ও ব্যস্ততা দেখিয়া সকলে হাসিতে লাগিল। ইন্দ্র বলিল—বিয়ের আগে কি খেতে আছে? বিয়ে হোক, আশীর্ব্বাদ হোক, তবে ত খাব।

লক্ষ্মী ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল—আপনি আশীর্ব্বাদ করবেন? আপনাকে ত আগে বলি নি। টাকা পাবেন কোথায়? আমার মেয়ে বড়লোকের বাড়ী যাচ্ছে, গোটা টাকা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করতে হয়, তাই না মা?

ইন্দ্র—সে দেখব এখন। আমরা এ ঘর থেকে উঠি। বিয়ে হয়ে গেলে আশীর্ব্বাদের সময় আমাদের ডেকো।

তাহারা বসিবার ঘরে গেল। অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। ভৃত্য টেবিলের উপর একটা আলো রাখিয়া গেল। খোলা জানালা দিয়া শিউলি ফুলের গন্ধ আসিতেছে। শিউলির গন্ধ রাত্রের অন্ধকারের মধ্যে ছড়ায় বেশী। জোনাকী-পোকাগুলি ইতিমধ্যে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। দূরে এক সঙ্গে অনেকগুলি শেয়াল ডাকিয়া উঠিল। ইন্দ্র ও দেবানন্দ নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিতেছে এমন সময় দেখা গেল অন্ধকারের মধ্যে একটা লণ্ঠন দুলিতে দুলিতে এদিকে আসিতেছে। লণ্ঠনের সঙ্গে একটা ছায়ামূর্ত্তি। সেদিকে চোখ পড়িতে দেবানন্দ বলিল—তোমার চোবেজী আসছেন।

লণ্ঠন হাতে, লাঠি কাঁধে যদুনন্দন চৌবে ঘরের বারান্দায় উঠিয়া আসিল। ইন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া বলিল—তুমি একটু বস, আমার দেরী হবে।

যদুনন্দন জানে পেলিশ সাহেবের বাড়ীতে আসিলে খোকা-বাবুর দেরী হওয়াই নিয়ম। সে দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া ইতিমধ্যে একটু নিদ্রার আয়োজন করিয়া লইল। কিছুক্ষণ পরে কুমুদিনী আসিয়া তাহাদের ডাকিল। দেবানন্দ ও ইন্দ্র ত্রিনয়নীর ঘরে গিয়া দেখিল তাহাদের খাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। লক্ষ্মীর মেয়ের বিবাহ সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে। বরকনে'কে ছাঁদনাতলা হইতে তুলিয়া আনা হইল। এইবার আশীর্ব্বাদ করিতে হইবে। ত্রিনয়নী আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন দুইটি টাকা দিয়া। আঁচলে বাঁধা টাকা হইতে একটি টাকা লইয়া দেবানন্দকে দিয়া তিনি বলিলেন—তুই বড়, তুই আগে আশীর্ব্বাদ কর। আশীর্ব্বাদের টাকা মেয়ের মা লক্ষ্মী আঁচল পাতিয়া লইতেছে। দেবানন্দের পরে ইন্দ্রের পালা, ত্রিনয়নী একটু ইতস্ততঃ করিয়া তাহার হাতে দুইটি টাকা দিতে গেলেন। ইন্দ্র মাথা নাড়িয়া জানাইল তাহার টাকার দরকার নাই। লক্ষ্মী মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিতেছে ইন্দ্রদাদা কি দেয়। ইন্দ্র লক্ষ্মীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, তাহার উৎসুক

মুখের দিকে একবার চাহিল। তারপর ডান হাতের অনামিকা হইতে দামী পাথরবসানো সোনার আংটি খুলিয়া হেঁট হইয়া লক্ষ্মীর আঁচলের উপরে রাখিল। হাসিয়া বলিল—আশীর্ব্বাদ করা হ'ল। এইবার খেতে বসি তবে?

ইন্দ্রের কাণ্ড দেখিয়া লক্ষ্মী ও দেবানন্দ অবাক। ত্রিনয়নী পলকের জন্য চোখ বুজিয়া কি যেন ভাবিলেন। মৃদু স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন—বাবা, হাতের আংটি খুলে দিলে, কর্ত্তা তোমার ওপর রাগ করবেন না? ইন্দ্র বলিল—রাগ করবেন কেন? বাবা লক্ষ্মীকে খুব ভালবাসেন।

তাহারা খাইতে বসিল। খাওয়া শেষ হইলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ইন্দ্র যদুনন্দনকে ডাকিল। যদুনন্দনের নাক ডাকিতেছিল। ডাকা-ডাকিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—বড় দের হ'ল খোকাবাবু। রোজ এই কথাটি যদুনন্দনের বলা চাই।

ইন্দ্র বাড়ী ফিরিয়া পিতার কাছে দেবানন্দের সঙ্গে বিলে বেড়াইবার গল্প ও লক্ষ্মীর মেয়ের বিবাহের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিল। হাতের আংটি খুলিয়া দিবার বিবরণ শুনিয়া তিনি বলিলেন—অত দামী আংটিটা দিয়ে দিলি। একটু মায়া হ'ল না? ইন্দ্র বলিল—কাকীমা টাকা দিতে চেয়েছিলেন বাবা, আমার নিতে লজ্জা করল। সবাই দেখছিল আমি কি দিই। আমি ছোট হব কেন? তাই আর কিছু না থাকায় আংটিটা দিলাম। হরিনারায়ণ এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিলেন না। বোধ হয় ছেলের আভিজাত্যবোধকে আঘাত করিতে চাহিলেন না। শুধু বলিলেন—তোর হাতের আংটি কে পরবে? লক্ষ্মী ত পরতে পারবে না এখন।

ইন্দ্রের হাতের আংটি কে পরিবে এই লইয়া হরিনারায়ণের চিন্তা পরদিন দূর হইল। দুপুরবেলা লক্ষ্মীকে সঙ্গে লইয়া ত্রিনয়নী হরিনারায়ণের গৃহে আসিলেন। জগদ্ধাত্রী কয়েক-দিনের জন্য পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। ত্রিনয়নী ইন্দ্রের বিধবা মামীর কাছে আংটির কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলিলেন—দিদি, ইন্দ্রের হাতের আংটি ওটা, ফিরিয়ে দেওয়া ভাল। কিন্তু একটা কথাও ভাবছি। ইন্দ্র বড় অভিমানী ছেলে, ফিরিয়ে দিতে গেলে কি মনে করবে? ইন্দ্রর মামী এইভাবে দামী আংটি দেওয়া ভাল মনে লইতে পারিলেন না। বলিলেন—ইন্দির ছেলেমানুষ, ভাল খারাপ বোধ নেই। তা এক কাজ কর না। মেয়ের হাত দিয়ে আংটিটা কর্ত্তার কাছে পাঠিয়ে দাও। ত্রিনয়নী এই যুক্তি ভাল মনে করিয়া মেয়েকে আড়ালে লইয়া গিয়া অনেক বুঝাইয়া হরিনারায়ণের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। মেয়েকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—অত বড় আংটি তোর হাতে হবে না, তোকে ছোট একটা আংটি গড়িয়ে দেব।

লক্ষ্মী বৈঠকখানায় হরিনারায়ণের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল ইন্দ্র ঘরের এক পাশে বসিয়া বই পড়িতেছে। ইন্দ্রকে দেখিয়া সে একটু দমিয়া গেল। আংটি ফিরাইয়া দিলে সে নিশ্চয় রাগ করিবে। এদিকে মায়ের উপদেশ ও নূতন আংটি গড়াইয়া দিবার আশ্বাস। হরিনারায়ণ শুইয়াছিলেন। লক্ষ্মী তাঁহার পাশে গিয়া বসিতে তিনি বলিলেন—কিগো লক্ষ্মীপ্যাঁচা, আংটি পছন্দ হয়েছে? ইন্দ্র চোখ তুলিয়া সে দিকে চাহিল। লক্ষ্মী মহা সঙ্কটে পড়িল। ইন্দির দাদার সম্মুখে মায়ের উপদেশমত কাজ করা শক্ত মনে হইল তাহার। ভয়ে ভয়ে ঢোঁক গিলিয়া বলিল—ইন্দির দাদার আংটিটা যে আমার মেয়ের হাতে বড্ড বড় হয়। মেয়ের যে ছোট আংটির দরকার জ্যেঠামশায়।

হরিনারায়ণ উঠিয়া বসিয়া লক্ষ্মীর দিকে চাহিলেন। বলিলেন—তুমি কার সঙ্গে এসেছ মা? লক্ষ্মী বলিল—মার সঙ্গে এসেছি। মা মামীমার সঙ্গে কথা বলছেন।

বৈঠকখানার বারান্দায় কর্ত্তার খাস খানসামা হরিচরণ ঘুমাইতেছিল। হরিনারায়ণ তাহাকে ডাকিলেন। কর্ত্তার ডাকে সে উঠিয়া আসিলে বলিলেন—যদুনন্দনকে বল পোদ্দার-পাড়ায় গিয়ে প্যারী পোদ্দারকে সঙ্গে নিয়ে আসুক। লক্ষ্মীকে বলিলেন—তুমি ভেতরে খেলা কর গে। প্যারী এলে হাতের মাপ দিয়ে বাড়ী যাবে, কেমন?

লক্ষ্মী বুঝিতে পারিল না আংটিটা ফেরত দিতে হইবে কিনা। সে আংটিটা হরিনারায়ণের বিছানার উপরে রাখিয়া ইন্দ্রের দিকে আর না চাহিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

প্যারী পোদ্দার লক্ষ্মীর আংটির মাপ লইয়া হরিনারায়ণকে বলিল—কর্ত্তা, আংটি কেটে ছোট করলে পাথরটা বেশী বড় বড় দেখাবে। একটা ছোট পাথর দেব? হরিনারায়ণ বলিলেন—না, পাথর এঁটে থাক। বরং ভাল মুক্তো দিয়ে বাড়তি সোনা থেকে একটা নোলক গড়িয়ে আনবে।

লক্ষ্মী এইবার হরিনারায়ণের অভিপ্রায় কি বুঝিতে পারিল। যতক্ষণ সে হরিনারায়ণের গৃহে ছিল মায়ের কাছে কোন কথা ভাঙ্গিল না। ইন্দ্রের মামীমা যে আংটি দেওয়াতে খুশী হন নাই তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল। বাড়ী ফিরিবার সময় ইন্দ্র তাহাদের সঙ্গে চলিল। লক্ষ্মী মহা উল্লাসে আংটি ও নোলক গড়াইতে দিবার কথা বলিল। ত্রিনয়নী ইন্দ্রের দিকে চাহিলেন। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল সেও লক্ষ্মীর মত খুশী হইয়াছে।

ইন্দ্র তাহার আবাল্য-সঙ্গী দেবানন্দের ভাবপরিবর্ত্তনের কারণ বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে ইহার নানা রকম ব্যাখ্যা করিয়াছিল। সেদিন মুরলী বিলে বেড়াইতে গিয়া দেবানন্দ ইন্দ্রের কাছে মনের কথা খানিকটা বলিয়া থামিয়া গেল। বছর দুই আগে হইতে এই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল। * (ক্রমশঃ)

পুলিস কর্ম্মচারীদিগের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ

শ্রীশতঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৮৭ সনে সঞ্জীবচন্দ্রের একমাত্র পুত্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র—আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেহেরপুরে (তখন কৃষ্ণনগরের সবডিভিসন) পুলিস-ইন্‌স্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। তিনি লিখে গেছেন, "আমার বাপ-খুড়ারা কবুল জবাব দিয়েছেন, তাঁরা চাকরি করে দিতে পারবেন না। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের জন্ত চেষ্টা করছি, হচ্ছে না। এক দিন রাইটার্স বিল্ডিংসে আমার বাপ-খুড়ার বন্ধু গবর্ণমেন্টের অনুবাদক চন্দ্রনাথ বসুর কাছে দেখা করে ফিরে আসছি, বোর্ডের দিকে চেয়ে দেখলাম লেখা আছে—ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অব পুলিস। দেখা করার জন্ত কার্ড চাপরাসীর হাতে দিয়ে অপেক্ষা করছি, একটু পরে সাহেব ডেকে পাঠালেন। সসম্মানে অভিবাদন করে আমি চাকরির প্রার্থনা জানালাম। সাহেব বললেন—তুমি বঙ্কিমের ভাইপো, পুলিসে তোমার উপযুক্ত কি চাকরি আমি দিতে পারি! একটু পরেই সাহেব বললেন—আচ্ছা, পুলিস-ইন্‌স্পেক্টরের পোষ্ট তুমি গ্রহণ করবে? উত্তরে আমি বললাম, "আপনি যে পোষ্ট আমায় দেবেন, তাই আমি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করব।" সাহেব বললেন, "দু'-এক দিনের মধ্যেই তোমায় জানাব।"

সপ্তাহকালের মধ্যেই জ্যোতিশ্চন্দ্রের নিয়োগপত্র সঞ্জীবচন্দ্রের হাতে এসে পৌছল। তিনি এই সুসংবাদ অন্দরমহলে গৃহিণীর নিকট পৌছে দিলেন। জ্যোতিশ্চন্দ্র আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে পিতামাতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। সেদিন কাঁঠালপাড়ার বাড়ীতে আনন্দের উৎস বয়েছিল। এত আনন্দের একটা বিশেষ কারণ ছিল। জ্যোতিশ্চন্দ্রের যখন এই চাকরি হয় তখন তাঁর বয়স ২৭ বৎসর; সরকারী চাকরিতে প্রবেশ করার বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গেছে; সঞ্জীবচন্দ্র সুখ-শান্তিপ্রিয় পুত্রের চাকরির জন্ত অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। এই জন্য জ্যোতিশ্চন্দ্রের চাকরির সংবাদে তিনি আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় বঙ্কিমচন্দ্রের সকাশে এ সংবাদ জানাতে এলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দে আপ্লুত হয়ে ভাইপোকে নিয়ে অন্দরমহলে গৃহিণীসমীপে উপস্থিত হয়ে এ সংবাদ জানালেন। জ্যোতিশ্চন্দ্র খুড়ীকে প্রণাম করে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "এত দিনে আমার একটা দুর্ভাবনা গেল। বয়স হয়ে যাচ্ছিল, কিছু কর্চ্ছিলে না, এর পর আমি মরে গেলে করতে কি?" পরক্ষণেই বললেন, "কালক্ষেপ না করে চাকুরিস্থলে যাবার জন্ত প্রস্তুত হও। মাত্র বার দিন সময়, Preparatory leave। ছুটি ফুরোবার আগেই join করবে, অন্তথা না হয়। যদি হাতে টাকা না থাকে আমায় জানিও। আমি এক-শ টাকা পাঠিয়ে দেব।"

যথাসময়ে জ্যোতিশ্চন্দ্র মেহেরপুরে পৌছে চাকুরিতে যোগদান করলেন। চাকরিতে পাকা হয়েই তিনি পিতৃব্য বঙ্কিমচন্দ্রকে লিখলেন—পুলিসের চাকরি কি ভাবে নির্ব্বাহ করব আমায় উপদেশ দিন। বঙ্কিমচন্দ্র তদুত্তরে লিখলেন:

প্রিয়তমেষু

তুমি বোধ করি পূজার সময় বাড়ী গিয়াছিলে এত দিনে ফিরিয়া আসিয়া থাকিবে।

আমার নিকট উপদেশ চাহিয়াছিলে, আমি এই পত্রের মধ্যে সাতটি উপদেশ লিখিয়া পাঠাইলাম। ঐ সাতটি Golden rule বিবেচনা করিবে। বিশেষ প্রথম পাঁচটি। উহার অনুবর্ত্তী হইলে সর্ব্বত্র মঙ্গল ঘটিবে। এখানকার সমস্ত মঙ্গল। ভরসা করি এই মাস হইতে তুমি সংসারের ভার লইতে পারিবে। ইতি ১৩ আশ্বিন। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিশেষ উপদেশ

I. প্রথম প্রয়োজনীয় কথা। সত্য ভিন্ন কখন মিথ্যা পথে যাইবে না। কলমের মুখে কখন মিথ্যা নির্গত না হয়। তাহা হইলে চাকরি থাকে না। নিতান্ত পক্ষে কর্ত্তৃপক্ষের অবিশ্বাস জন্মে। অবিশ্বাস জন্মিলে আর উন্নতি হয় না।

II. দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় কথা। পরিশ্রম। বিনা পরিশ্রমে কখন উন্নতি হয় না। কখন কোন কাজ পড়িয়া না থাকে।

III. উপরওয়ালাদিগের আজ্ঞাকারী। তাঁহাদিগের নিকট বিনীত ভাব। চাকরি রাখার পক্ষে এবং উন্নতির পক্ষে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তর্ক করিও না।

IV. আপনার কাজের Rules & Laws বিশেষরূপে অবগত হইবে।

V. কাহারও উপর অত্যাচার করিবে না। পুলিসের লোকে আসামীর উপর বড় অত্যাচার করে। অনেকের বিশ্বাস যে তা নহিলে কাজ চলে না। তাহা ভ্রান্তি। না চলে সেও ভাল। ইহা নিজে কখন করিবে না, বা অধীনস্থ কাহাকে করিতে দিবে না। ইহার কারাদণ্ড আছে।

VI. সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিবে। অধীনস্থ ব্যক্তিদিগকে ব্যবহার দ্বারায় বশীভূত করিবে। কেহ শত্রু না হয়। কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুরোধে অনেকের অনিষ্ট করিতে হয়। তাহার উপায় নাই। দোষীর অবশ্য দণ্ড চাই।

VII. নিষ্কারণে ভীত হইবে না।

পত্রোক্ত উপদেশসমূহের গুরুত্ব এখনও কমিয়া যায় নাই। এগুলি যথারীতি প্রতিপালিত হইলে দেশের চেহারা ফিরিয়া যাইবে।

কৃষি-সভ্যতায় ভারতের স্থান

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

বর্ত্তমান 'এটম বোমা'র যুগে আমরা প্রাচীন কালের কৃষি-পণ্ডিতগণের নাম ভুলিয়া গিয়াছি। বর্ত্তমানে আমরা চাল, গম, ডাল শস্যের অভাবে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু যে সকল নমস্য ব্যক্তি এই সকল খাদ্যের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম আমরা একবারও স্মরণ করি না। এমন কি এই সকল খাদ্যের উন্নতিবিধানে যাঁহারা পরীক্ষা ও গবেষণা করিয়া সভ্যতার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় রচনা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের নামও আমরা জানি না। যাঁহারা ইক্ষু এবং তুলার ব্যবহার মনুষ্য-সমাজে প্রচলন করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা আমাদের কাছে অজানাই রহিয়া গেলেন; তাঁহাদের অবদান আমরা কখনও স্মরণেও আনি না। এ কারণ কৃষি-সভ্যতায় ভারতের স্থান যে কত উচ্চে আমরা তাহা নির্ণয় করিতে পারি না।

যে সকল দেশ পৃথিবীর কৃষি-সম্পদ সৃষ্টি করিয়াছে এবং বর্দ্ধিত করিয়াছে তাহাদের মধ্যে ভারতের স্থানই সর্ব্বাগ্রে; রাশিয়ার কৃষি-বৈজ্ঞানিকগণ, বিশেষতঃ এন, আই ভ্যাবিলভ, ভারতের এই খ্যাতি প্রচারের জন্য আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। ভ্যাবিলভের উৎসাহ ও প্রেরণায় এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ ইউরোপ, উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার ৬০টি দেশে বহু কৃষি-অভিযান প্রেরিত হয়, তাহার ফলে ৩০০,০০০ রকমের (species and varieties) গাছপালা সংগৃহীত হয়। ইউ. এস. এস. আর. এর বিভিন্ন অংশে উহাদের উৎপাদন করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। এইরূপ পরীক্ষালব্ধ ফল হইতে "ফসলের মানচিত্র" প্রস্তুত হইয়াছে। এই মানচিত্রে বিভিন্ন দেশের কোন্ কোন্ অংশে কোন্ কোন্ জাতি বা উপজাতির গাছপালা বিদ্যমান তাহাও দেখান হইয়াছে। কৃষির সমৃদ্ধির জন্য সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকগণের এই অবদান চাষের উপযুক্ত গাছপালার বহু জাতি, শ্রেণী, উপজাতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা একেবারে বদলাইয়া দিয়াছে। অনেক সুপরিচিত এবং বিশদভাবে পরীক্ষিত শস্যের নূতন নূতন জাতি, উপজাতি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে; উদাহরণ-স্বরূপ গম, ভুট্টা, রাই, তিসি, আলু প্রভৃতি শস্যের কথা বলা যায়।

রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণা ও পরীক্ষার ফলে এমন অনেক অঞ্চল আবিষ্কৃত হইয়াছে যেখানে বহু রকম (varieties, species, sub-species) শস্য, গাছপালার এবং তাহাদের বন্য (wild) স্বজনবর্গের স্থান নির্দ্ধারিত করা যায়। মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকার, এমন কি দক্ষিণ এশিয়ায় অসংখ্য জাতি, উপজাতির গাছপালার আদি স্থান নির্দ্দেশ করা সম্ভব হইয়াছে। গম, যব, ভুট্টা, তুলা প্রভৃতি শস্যের আদিম জাতি ভ্যাবিলভ কর্ত্তৃক সঠিক ভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং উহাদের আদি জন্মস্থান নিরূপিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত ৮টি প্রাচীন কেন্দ্রকে বর্ত্তমান কৃষির উৎপত্তি স্থান বলা যাইতে পারে:

(১) চীন দেশের কেন্দ্র। মধ্য এবং পশ্চিম চীনে পর্ব্বতময় অঞ্চল এবং তন্নিকটবর্ত্তী নিম্ন জমিসমূহই কৃষির সর্ব্বপ্রথম এবং বৃহৎ কেন্দ্র; ১৩৬ রকমের স্থানীয় (endemic) গাছপালা এই কেন্দ্রে দেখা গিয়াছে।

(২) হিন্দুস্থান কেন্দ্র (উত্তর-পশ্চিম ভারত, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ব্যতীত। কিন্তু আসাম এবং ব্রহ্মদেশসহ)। চীন দেশের কেন্দ্র অপেক্ষা এই কেন্দ্র অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র; এই কেন্দ্র ১১৭ রকমের স্থানীয় গাছপালার আদি জন্ম স্থান।

(২ক) ইন্দোমালয় কেন্দ্র (ইন্দো-চীন এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জসহ)। এই কেন্দ্রকে হিন্দুস্থান কেন্দ্রের পূরক বলা যাইতে পারে। এখানে ৫৫ রকমের গাছপালা দেখা গিয়াছে।

(৩) মধ্য এশিয়া। [উত্তর-পশ্চিম ভারত (পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর), আফগানিস্থান, তাদজিকি, উজবেকিস্থান এবং পশ্চিম তিয়ানশানসহ]। এই কেন্দ্রে ৪২ রকমের গাছপালা দৃষ্ট হইয়াছে।

(৪) পূর্ব্ব কেন্দ্র (এশিয়া মাইনর ককেশিয়া, ইরাণ এবং তুর্কমেনিস্থানসহ)। এই অঞ্চলে ৮৩ রকমের গাছপালা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(৫) ভূমধ্যসাগর কেন্দ্র। ৮৪ রকমের গাছপালার জন্মস্থান।

(৬) আবিসিনিয়া কেন্দ্র। ৩৮ রকমের গাছপালা এখানে দেখা গিয়াছে।

(৭) দক্ষিণ মেক্সিকো এবং মধ্য আমেরিকা। ৪৯ রকমের গাছপালা দেখা গিয়াছে।

(৮) দক্ষিণ-আমেরিকা। ৪৫ রকমের গাছপালা পৃথিবীকে দান করিয়াছে।

(৮ক) চিলো কেন্দ্র, চিলির তীরবর্ত্তী একটি দ্বীপ। যদিও এই কেন্দ্র হইতে মাত্র ৪ রকমের স্থানীয় গাছপালা পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু এই দ্বীপের অধিবাসিগণের নিকট হইতেই ইউরোপবাসিগণ প্রথম আলু (solanum tuberosum) পাইয়াছিলেন।

(৮খ) ব্রেজিল এবং পেরাগুয়ে কেন্দ্র। কেবল ১৩ রকম গাছপালা এই কেন্দ্রের অধিবাসী।

ভ্যাবিলভ বলেন :

"India is the birth-place of rice, of sugarcane, a large number of legumes, numerous tropical fruits, such as the mango, and many of the citrus family (lemon, orange, some species of mandarine). Assam in particular is noted for its citrus products. That India is the birth-place of rice is proved by the fact that numerous wild species of rice and ordinary rice are to be found there both wild and as a weed, having the common characteristics of wild cereals which ensure of scattering of the seed when ripe. Even if in the diversity of species tropical India must yield place to China. Yet rice, which she introduced to China, whose staple diet it has been for a thousand years, relatively increases her importance in the world's agriculture."

ইহার তাৎপর্য্য—"চাল, ইক্ষু, শুঁটি বিশিষ্ট বহু রকমের শস্ত (legumes), গ্রীষ্ম প্রধান দেশের বহু রকম ফলের (আম, লেবু জাতীয় অনেক রকমের ফল) ভারতবর্ষই জন্মস্থান; লেবু জাতীয় ফলের জন্ত আসাম বিখ্যাত। ভারতবর্ষ যে চালের আদি জন্মস্থান তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তথাকার বহু জাতি, উপজাতির চাল হইতে, এই সকল চাল অনেক ক্ষেত্রেই বন্ত বা আগাছা বলিয়া গণ্য হয়; বন্ত তণ্ডুল জাতীয় শস্তের যে সকল সাধারণ লক্ষণ আছে, ইহাদের মধ্যেও সেই সকল লক্ষণ দেখা যায়। সুপরিপক্ক হইলে এই সকল শস্তের বীজ ছড়াইয়া পড়ে, এবং তাহা হইতে পুনরায় শস্ত জন্মায়। শ্রেণী বা জাতির বিভিন্নতা সম্বন্ধে চীন দেশের স্থায় ভারতবর্ষ প্রথম স্থান না পাইলেও এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতই চীন দেশে চাল প্রবর্ত্তন করিয়াছে। হাজার বৎসর ধরিয়া এই চালই চীনের প্রধান খাদ্য ; সুতরাং পৃথিবীর কৃষিতে ভারতের দানের মূল্য কম নহে।"

হিন্দুস্থান কেন্দ্রের সহিত তাহার পরবর্ত্তী দুইটি কেন্দ্র (২ক ও ৩) ধরিলে দেখা যাইবে যে, পৃথিবীর কৃষিসম্পদে ভারতের দানই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মধ্য এশিয়া কেন্দ্র গমের জন্মস্থান এবং এই গমই পৃথিবীর সকল স্থানেই 'রুটি'র উপাদান (bread stuff) যোগায়। এখানে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মহেঞ্জোদাড়োর গহ্বরের মধ্যে গম পাওয়া গিয়াছিল। প্রায় সর্ব্বপ্রকার শুঁটি জাতীয় ডাল শস্ত যথা—মটর, মুশুর, ছোলা প্রভৃতি এবং বহু রকমের তৈলপ্রদ শস্তের এই কেন্দ্রেই জন্ম।*

ভ্যাবিলভ বলেন, পুরাতন পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গাছ (crop plants) দক্ষিণ এশিয়াতে পাওয়া গিয়াছিল, ইহাদের সংখ্যা ৪০০।

---

* *Indian Farming*-এ প্রকাশিত "India—the Cradle of Agricultural Civilisation" নামক প্রবন্ধ হইতে তথ্যাদি গৃহীত।

হিমালয়ের উদ্দেশে

শ্রীকালিদাস রায়

তোমার অঙ্কে লভিলাম ঠাঁই সাতটি দিনের তরে,
তাহারি লাগিয়া চিরদিন মোর মনটা কেমন করে।
ভরি আকণ্ঠ তব গিরিশ্রীমাধুরী করিনু পান,
জীবনে পাইনু সুধার মতন উদার তোমার দান।
হয়ে প্রসন্ন তপন জুড়াল নয়ন ইন্দুসম,
জুড়াইয়া দিল পবন তোমার হৃদয়ের দাহ মম।
ভুলিয়া গেলাম গৃহসংসার পরিজন প্রিয়জন,
ভুলিয়া গেলাম কর্ম্মের ডাক স্বার্থের প্রলোভন,
স্বর্গপুরীর পৈঠায় যেন হেরিনু স্বপ্নলোক,
ভুলিয়া গেলাম লাভক্ষতি-লোভ-পাপ-তাপ-ক্ষোভ-শোক।
ভুলিয়া গেলাম মান যশ নাম অতীত ভবিষ্যৎ,
দিলে দেখাইয়া সম্মুখে ঐ মহাপ্রস্থান-পথ।
একি সন্ন্যাস ? এই কি মুক্তি ? কিসের পূর্ব্বাভাস ?
মনে হয় যেন পরম ধনের দিয়াছিলে আশ্বাস।
বেদান্তের স্পর্শপূত করেছিলে মোর মন,
আমাকে কি তুমি দীক্ষা দেওয়ার করেছিলে আয়োজন ?
শিখিয়া এলাম ব্রহ্মস্বাদ-সহোদর কারে বলে,
স্মরিতে আজিও কম্প্র অঙ্গ শিহরিছে স্বেদজলে।

'যে নদী মরুপথে…"

আনিসা বেগম

মজিদ আর কোন দ্বিধা না করে মাকে নিজের মতটা জানাল। জোবেদা ছেলের কথা শুনে চমকে উঠে বললেন, ও বাবা, তুই বলিস কিরে! সেলিনা হ'ল জমিদারের মেয়ে, আমাদের গরীব ঘরের বৌ হবে সে? তার মা-বাপ চোখে দেখে দেবেই বা কেন। শেষে বলে কয়ে আমি একটা বিপর্য্যয় ঘটাব? ও আমার দ্বারা হবে না বাবা। আর মেয়েই বা রাজী হবে কেন?

মজিদ তখন বলে উঠল, না মা সেলিনা রাজী আছে। সে রাজী না হলে আমার কি বলবার সাহস হ'ত। জোবেদা ছেলের কথা শুনে চুপ করে তার মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। মজিদ বার বার মাকে অনুরোধ করাতে বাধ্য হয়ে তিনি রোকেয়ার কাছে গিয়ে কথায় কথায় মতটা প্রকাশ করলেন। রোকেয়া শুনে বলে উঠলেন, "এ কি সম্ভব! কি করে তুমি একথা ভাবতে পারলে বুবু?" জোবেদা রোকেয়ার রুদ্র চেহারা দেখে বললেন, "আমি তখন ছেলেকে বলেছিলাম এ বিয়ে সম্ভব নয়; ছেলে জোর করে বললে, হাঁ মা সেলিনা রাজী আছে, তুমি একবার বলে দেখ।" একথা শুনেই রাগে রোকেয়ার মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল, বললেন, "কি এত দুর মিথ্যা অপবাদ। তোমার ছেলের আস্পর্দ্ধা তো কম নয়, শয়তানী বুদ্ধিও খুব আছে দেখতে পাচ্ছি।" জোবেদা বলে উঠলেন, আপনার কাছে তা হতে পারে, কিন্তু আমি জানি ছেলে আমার সে রকম নয়; আপনি এত চটছেন কেন; মেয়েকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখুন, তারপর আমায় যা বলতে হয় বলবেন।

জোবেদা নিজের বাড়ীর উদ্দেশে রওনা হলেন। রোকেয়া গজ গজ করতে করতে সেলিনার ঘরে প্রবেশ করে তাকে ডাক দিলেন। সেলিনা মায়ের ডাক শুনে তাড়াতাড়ি বালিশ থেকে মুখ তুলে অশ্রুসিক্ত চোখ দুটো মুছে কম্পিত হৃদয়ে নতমুখে অপরাধীর ন্যায় নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। ঐরূপ ভাবে মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাগে রোকেয়ার গা রি রি করতে লাগল; তিনি কর্কশ স্বরে বলে উঠলেন, "কি রে অমন করে সং সেজে দাঁড়ায়ে আছিস যে!" তোর নামে মজিদের মা অপবাদ দিয়ে গেল, তুই নাকি মজিদের প্রতি আসক্ত হয়েছিস। ছোঁড়াটা গোপনে আমার বাড়ী ঢোকে, কেমন তার আস্পর্দ্ধা দেখব; এক দিন আমি ওকে শায়েস্তা করব।—শুনবামাত্র সেলিনার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল, সে তখন পাগলের মত মায়ের পায়ের তলায় লুটিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "না মা, ওর বিন্দুমাত্র অপরাধ নেই, যত শাস্তি দিতে হয় আমায় দাও।"

তার পর চোখের জল মুছে আবার বলতে লাগল, "মজিদ কোন দিন এ বাড়ীতে ঢোকে নি, সে রোজ আমাদের বাড়ীর কাছে ঐ গাছতলাটায় বসে বই পড়ে; দূর থেকে আমি তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি, তাকে কয়েকখানা চিঠিও দিয়েছি। কিন্তু কোন উত্তর না পেয়ে নিজের নসীবকে কত ধিক্কার দিয়েছি; তবুও অবোধ মন বুঝল না, শেষ পর্য্যন্ত তার কাছে গিয়ে মনের কথা খুলে বলেছি।"

কথাগুলো বলে সেলিনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। রোকেয়া মেয়ের কথা শুনে হতভম্ব হয়ে বলে উঠলেন, "হারে হতভাগিনী মেয়ে তুই জানিস না—এ ধরণের ভালবাসা কত গোনাহ! লোকে কলেজে-পড়া মেয়েদের দোষ দেয়; আর তুই অন্দরে মানুষ হয়ে এমন নির্লজ্জ কি করে হলি রে! তুই যে আমার মুখে চুণ-কালি দিবি স্বপ্নেও ভাবি নি। যা করেছিস তোবা কর, খোদার কাছে আর আমার মুখ পোড়াস নে।" সেলিনা মায়ের পা দুখানি জড়িয়ে ধরে আরও কাঁদতে কাঁদতে বললে, "না মা, খোদা আমায় মাফ করবেন, তুমি আমায় ক্ষমা করে বাঁচাও।" একটু চুপ করে থেকে আবার বলতে লাগল—

"তোমাদের মুখে চুণ-কালি দিই নি মা, কেন ও কথা বলছ? খোদা না করুন, যেন সেদিন আসার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হয়। চোখে দেখা ভাল বাসাতে পাপ হয় না মা।"

রোকেয়া মেয়ের রকম দেখে বেজায় রেগে গিয়ে বলে উঠলেন, "ওরে তুই যে দেখছি লজ্জা-শরমের মাথা একেবারে খেয়েছিস। দেখ সেলিনা এত আদর যত্নে মানুষ হয়েছিস, কোনও দিন একটা কুটো পর্য্যন্ত নাড়তে হয় নি তোকে, কি করে তুই ওদের মত গরীব-ঘরের বৌ হবি। পরে তুই বুঝবি, আর মায়ের সকল কথা একে একে পড়বে মনে।"

সেলিনা বলে উঠল, "সুখ দুঃখ সব কপালের কথা মা; আমার ভাগ্যকে তো কেউ বদলাতে পারবে না।"

শেষ পর্য্যন্ত বড় আদরের মেয়েকে রোকেয়া চোখের জলে পরের ঘরে বিদায় দিলেন। মেয়েকে বিদায় দেওয়ার পর স্নেহময়ী মায়ের চক্ষের সম্মুখে নানা দুঃখের ছবি ভেসে বেড়াতে লাগল। মেয়ের দুঃখকষ্টের কথা ভাবেন আর অঝোর ধারায় কাঁদতে থাকেন।

সেলিনা বড়লোকের মেয়ে। আজ সে গরীবের ঘরের বৌ হয়েছে—তার যে কত কষ্ট সহজেই সেটা অনুমান করা যায়।

সেলিনার প্রতি পদে অসুবিধা ঘটতে লাগল, শুতে উঠতে বসতে সকল দিকে তার কষ্ট। চৌকিতে শুধু একটা কাঁথা বিছানো, শুতে গিয়ে সে গায়ে খুব ব্যথা বোধ করে, ভাল করে রাতে তার ঘুম হয় না, খাওয়া-দাওয়াতে সেলিনার খুব বাছবিচার ছিল, সেদিকেও তার কষ্টের অবধি রইল না। সেলিনা সকল দুঃখ মুখ বুজে সহ্য করে যেত, কাউকে বুঝতে দিত না। স্বামী শাশুড়ী সকলেই বুঝত, কিন্তু দুঃখ মোচন করবার উপায় ত তাদের ছিল না।

এমনি ভাবে বছরখানেক কেটে গেল। পাড়ার পাঁচ জন বলতে সুরু করলে, "ওমা বৌকে ত কোন দিন কাজে হাত দিতে দেখি না, শাশুড়ী একা খাটেন, এ কি ধরণের মেয়ে—মা গো মা!" জোবেদা বলে উঠলেন, না মা, বৌ আমার কাছে কাজের জন্ত আসে, আমি তাকে বলি, "আমি বেঁচে থাকতে তোমার কষ্ট করতে দেব না।" পাশে থেকে আর একজন হেসে উত্তর দিলে, আমাদের ভাগ্যে ওরকম শাশুড়ী জুটলে আমাদের হিসাব কিছু বাড়ত। ঐ রশিদের বৌ মুনসেফের মেয়ে, কাজকর্ম্ম কিছু জানত না, শাশুড়ীও আদর করে বৌকে কাজ করতে দিতেন না, বৌ কিন্তু নাছোড়বান্দা হয়ে উঠল, বলত—এখন যদি না শিখি ত আর কখন শিখব মা? আপনি খাটবেন আর আমি বসে থাকব তা হবে না মা।—বৌয়ের পীড়াপীড়িতে শাশুড়ী শেষ পর্য্যন্ত তাকে কাজ করবার অনুমতি না দিয়ে পারলেন না; সে মন দিয়ে ঘর-সংসারের কাজ করতে লাগল। এখন কেমন সুন্দর কাজ করতে শিখেছে দেখলে অবাক হই।

জোবেদা একটু বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, "মা মা, তোমরা বোঝ না আমার গরীবের সংসারে সোনামুখীর কত রকমের কষ্ট হয় তার ইয়ত্তা নেই, সবকিছু মা আমার হাসিমুখে সহ্য করছে।" আর একজন চট্ করে বলে উঠল, "সহ্য না করে উপায় কি মা।" জোবেদা বলে উঠলেন, "ঢের ঢের বড়লোকের মেয়েকে বৌ হয়ে গরীবের ঘরে আসতে দেখেছি, তাদের কত মেজাজ দেখেছি, কত কথা শুনেছি; এই সব দেখে দেখে আমি বুড়ো হলাম, আমার কপালজোরে এমন বৌ পেয়েছি মা। যাক, তোদের সঙ্গে আর আমি বাজে তর্ক করতে পারি না।" জোবেদার বিরক্তি দেখে সকলে চলে গেল।

সকলের মায়া মমতা কাটিয়ে হঠাৎ এক দিন জোবেদা সংসার থেকে চিরতরে বিদায় নিয়ে পরপারে চলে গেলেন। সেলিনার চক্ষে সারা জগৎ অন্ধকার হয়ে উঠল! কি করবে সে একা, বুক ফেটে তার কান্না আসতে লাগল।

জোবেদার অবর্ত্তমানে সংসারের সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেল। যে সেলিনা কখনও একটা পেঁয়াজের মাথা কুটে নি, এখন তাকে সকালে উঠে উনুনে আগুন ধরাতে হয়। সে কি বিষম কষ্ট, চোখ মুখ ধোঁয়ায় লাল হয়ে অনবরত জল ঝরতে থাকে। কিন্তু তবুও উনুনে আঁচ হয় না। শেষ পর্য্যন্ত মজিদ এসে চুলো ধরিয়ে দেয়। ভাতের ফেন গালতে গিয়ে পায়ে পড়ে ফোস্কা হয়। তরকারি কুটতে গিয়ে হাত কেটে যায়। তার যন্ত্রণার অবধি থাকে না।

এক দিনের কষ্ট হয় ত সহ্য করা যায়, রোজ এইরূপ কষ্টে সেলিনার চোখে জল আসত। যতক্ষণ মজিদ বাড়ীতে থাকে ততক্ষণ অবশ্য সে সাহায্য করে। মজিদ আপিসে চলে গেলে কোলে ছেলে নিয়ে কাজ করতে সেলিনার খুব কষ্ট হ'ত। তার অপরিসীম কষ্ট দেখে মজিদের চোখ অশ্রুতে ভরে উঠত, ভাবত,—"হায় খোদা, সেলিনাকে সুখশান্তি দেবার সামর্থ্য আমার নেই, আমি গরীব; খোদা আমায় দোয়া কর যেন পূর্ব্বের মত সেলিনাকে আমি সুখে রাখতে পারি।"

স্বামীর চোখে অশ্রু দেখে সেলিনা শশব্যস্ত হয়ে তাকে কত সান্ত্বনা দিত। দেখতে দেখতে সেলিনা খুব কর্ম্মপটু হয়ে উঠল। স্বামীকে নিয়ে বেশ কিছু দিন তার আনন্দে কাটল, কিন্তু সে সুখ বেশীদিন সহ্য হ'ল না। মজিদ আজকাল কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছে, পূর্ব্বের মত আর হাসিতামাশা করে না, সেলিনার দুঃখে আর বিচলিত হয় না। এখন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে মজিদ খুব ব্যস্ত, বাড়ীতে তাকে বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না।

সকালে আপিসের টাইমে বেরিয়ে যায় আর রাত একটা ছুটোর পর বাড়ী ফেরে। সেলিনা না খেয়ে স্বামীর জন্ত বসে অপেক্ষা করে; বার বার ঘড়ির দিকে তাকায়, কান খাড়া করে থাকে—মনে হয় এই আসছে, এই আসছে। এমনি ভাবে রাত গভীর হয়ে যায়; দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মজিদ এসে হয়ত না খেয়েই শুয়ে পড়ে, কোন কথা বলে না। সেলিনা অবাক হয়ে বলে, "কি, না খেয়ে শুয়ে পড়লে যে?" মজিদ একটু রুষ্ট ভাবে বলে, "খেয়েছি; কিন্তু তুমি যে এখনও জেগে বসে আছ?" সেলিনা উত্তর দেয়, "তোমারই জন্ত বসে আছি, শুয়ে পড়লে ঘুম যদি না ভাঙ্গে দোর কে খুলবে।"

মজিদ বীরদর্পে জবাব দেয়, "না খুললে দোর ভাঙতাম।"

রাত্রিজাগরণের পর স্বামীর এইরূপ তিক্ত কথা শুনে সেলিনার বুক ফেটে কান্না আসত। চোখভরা অশ্রু নিয়ে সেলিনা না খেয়ে চুপ করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। অশ্রুধারায় তার বালিস ভিজে যেত, চোখে ঘুম আসত না, বিনিদ্র রজনী যাপন করে ভোরে উঠবার আর শক্তি থাকত না; অতি কষ্টে জড়তা কাটিয়ে উঠে রান্নার আয়োজন সুরু করত। কত দিন রাত্রে হয়ত মজিদ বাড়ীই ফিরত না; এই রূপে সেলিনার দুঃখ যেন আরও গভীরতর হয়ে বেড়ে চলল। যেদিন মজিদ বাড়ী ফিরত না সেদিন সেলিনা দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করত। রাত যত গভীর হ'ত ততই সে ভাবত হয়তো স্বামীর কোনো অমঙ্গল হয়েছে, আর আকুল ভাবে শুধু বসে কাঁদত। এইরূপ

অশান্তিতে সেলিনার রাত কাটত। ভোরে যখন মজিদ বাড়ী ঢুকত রাগে দুঃখে সেলিনা স্বামীর মুখপানে চাইত না।

মজিদ বুঝতে পেরে কাছে এগিয়ে এসে বলত, "কি আর আমার সঙ্গে কথা বলবে না? খুব রাগ হয়েছে? রাত্রে বোধ হয় খুব ভয় পেয়েছিল?" স্বামীর কথা শুনে সেলিনা দূরে সরে গিয়ে অশ্রু মুছে আপন মনে কাজ করে যেত।

সামসু মজিদের বন্ধু, তার বাড়ীতে সকলে অসুস্থ। তাদের থার্মোমিটারটা ভেঙ্গে গিয়েছিল বলে ভোরে উঠে মজিদের বাড়ীতে থার্মোমিটার নিতে এসেছিল। এসে শুনল, রাত্রে মজিদ বাড়ী ফেরে নি। শুনে সামসু অবাক হয়ে ভাবলে, "মজিদ কত বড় পাষণ্ড যে এত বড় বাড়ীতে বৌকে একা রেখে সারা রাত বাইরে কাটায়!" হঠাৎ চেয়ে দেখে দূরে আগমনশীল মজিদের মূর্ত্তি। যখন মজিদ সম্মুখে এসে দাঁড়াল সামসু তখন বন্ধুকে খুব ভর্ৎসনা করতে লাগল আর বললে, "দেখ, নিতান্ত পশু ছাড়া এমনিভাবে স্ত্রীকে নির্জ্জন বাড়ীতে একা ফেলে রেখে কেউ রাত্রে বাইরে থাকে না। স্ত্রী সারা রাত কেমন করে কাটালে সেটা একটু ভেবে দেখবার শক্তিটাও কি তোর লোপ পেয়েছে। ইস্! কি নিষ্ঠুর তুই! যদি স্ত্রীর মর্য্যাদা রক্ষা না করতে পারবি তবে বিয়ে করতে কেন গেছলি।"

মজিদ বলে উঠল, স্ত্রীলোকের আবার কি মর্য্যাদা? চিরদিন শুনে আসছি নারীরা পুরুষের কাছে নত হয়ে থাকে, তাদের আবার আলাদা মর্য্যাদা কি। সামসু উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, "তোরা জোর করে নিজের হাতে সেটা গড়ে নিয়েছিস। দেখ, নারীকে অত অসম্মান করিস না, নারী মায়ের জাত—মায়ের আসন কত উচ্চে। কেন বাজে বকিস? স্ত্রীকে অত কষ্ট দিলে তোর যে মহা পাপ হবে। শিক্ষিতা স্ত্রী হলে এই অত্যাচার আজ কিছুতেই সহ্য করত না—নিজের পথ সে খুঁজে নিত।" মজিদ বলে উঠল, "তা হয়ত নিত, কিন্তু তাতে পুরুষের কি কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।" সামসু বলে উঠল, "কি বলিস, ক্ষতি হয় না? একটা সংসার গড়ে সেটাকে ভেঙে আবার নূতন করে গড়বার প্রয়াস, এতে কি মনে খুব সুখ হয়? না সংসার সুখের হয়? ছেলেপিলে থাকলে মায়ের সঙ্গে তখন তারাও বাপকে ছেড়ে যায়; বাপের বুকে দাবানল জ্বলতে থাকে তখন।" কথাগুলো বলতে বলতে সামসু অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। নিজেকে একটু সংযত করে নিয়ে আবার বলতে লাগল, "একটা কথা মনে রাখিস মজিদ। স্বামী স্ত্রীর মনের মিলের মত মধুর জিনিস সংসারে আর কিছুই নেই। তোর ঐ সনাতন মনোভাব ছাড়। অবজ্ঞার চক্ষে নারীকে আর দেখিস না। কোরান খুলে পড়ে দেখেছিস তাতে নারীকে কত সম্মান খোদা দিয়েছেন। বড় বড় কত কবি নারীকে কত উচ্চে আসন দিয়েছেন। কবির লেখা কয়েক পংক্তি তোকে শোনাচ্ছি:

"নারীরে তুচ্ছ ভাবিও না সখা করো নাক হেয় জ্ঞান
নারীর চরণ-ধূলায় স্বর্গ করিছে অবস্থান।
আদি পাপ বলে যেতে চায় দলে কে তোমায় সতী নারী?
সে নহে জননী মুসলিম কভু— কুরানের পথচারী।
হা ভাই প্রথম পড়েছিল ভুলে বলে নাক কুর্‌আন,
ইহুদির রচা এ কাহিনী করে নারীত্বের অপমান।"

মজিদ মন দিয়ে শুনছে দেখে সামসু বললে—আরও একটু শোন—

"বন্ধু আমার রমণী তোমার ভোগের বস্তু নয়;
সৃষ্টির ধর্ম্ম পূর্ণ করিতে নারীরা জন্ম লয়;
তোমরা নিজের পরিজন কাছে যারা যত প্রিয়তম
রসুলের বাণী, 'খোদার কাছেও তারা তত উত্তম।'

দেখ সবটা আর আবৃত্তি করলাম না। এ নারীর লেখা নয়; নারীর বুকের ব্যথাকে ছন্দে রূপায়িত করেছেন মহাকবি আবুবকর। দেখ, তোকে ভালবেসে সেলিনা যে ফুল তুলে নিজের গলার মালা করেছিল, সেটাকে তুই আজ কণ্টকের মালায় পরিণত করলি। তার প্রাণঢালা ভালবাসার প্রতিদান কতটুকু দিয়েছিস? সুখী যদি হতে চাস তবে যেমনটি ছিলি ঠিক তেমনি আবার হ', শয়তানের সঙ্গ ছাড়।"

মজিদ এতক্ষণ মাথা নত করে বন্ধুর উপদেশ শুনছিল, এবার বলে উঠল, "আজ থেকে আমি শপথ করলাম, সেলিনার উপর আর কোনরূপ অবিচার করব না বন্ধু।"

সামসু দ্রুত পদে নিজের বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল, মজিদও অন্দরমহলে প্রবেশ করলে। ঘরে ঢুকে দেখে অত বেলা পর্য্যন্ত সেলিনা অঘোরে ঘুমোচ্ছে—দেখে তার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল, কখনও ত সেলিনা এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমায় না। তবে কি আজ তার কোন অসুখ করেছে, মজিদ নিজের কম্পিত হাতখানি সেলিনার হাতে রাখতেই চমকে উঠল, বললে,"উঃ! গা যে পুড়ে যাচ্ছে সেলিনা। জ্বর কখন থেকে হ'ল? আমায় ত বলো নি।"

স্বামীর কথা শুনে সেলিনার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল। কোনরূপে আত্মসংবরণ করে নিয়ে আকুল ভাবে বলতে লাগল, "বলব আর কাকে? আজ ছয় মাস শুধু চোখের জলে ভাসছি, দশ দিন ধরে জ্বরে ভুগছি, কত কষ্ট ভোগ করছি, সেটুকু দেখবার পর্য্যন্ত কেউ নেই! হাত পা পুড়িয়ে জ্বর গায়ে কোলে ছেলে নিয়ে কত কষ্টে যে খেটে চলেছি তা শুধু আমিই জানি।" চোখের জল মুছে সেলিনা আবার বলতে লাগল, "শত কষ্ট বুকে বেজেছে, দু'হাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছি, সে কার মুখ চেয়ে? কোন সুখের জন্ত? তুমি বুঝতে সবকিছু এক দিন; তখন আমার দুঃখ দেখে তুমি অস্থির হয়ে পড়তে। তখন আমি তোমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলেছি, কিসের দুঃখ প্রিয়; এই সুখ আমাদের রাজ ঐশ্বর্য্যের

চেয়ে বেশী—কিন্তু কোথায় গেল সে সব সুখের দিন। তোমার জন্য সকল সুখ আমি বিসর্জন দিয়েছি। কিন্তু তুমি হৃদয়ের কোণে আমায় একটু স্থান দিতেও কুণ্ঠিত।" একটু দম নিয়ে আবার সুরু করলে, "এখন আর আমার প্রাণের কোন মূল্য নেই তোমার কাছে। যাক আর কিছু আমার বলবার নেই। খোদার কাছে এখন আমার একমাত্র আরজ জীবনের শেষনিশ্বাসটুকু যেন তোমার বুকে বিলীন হয়ে যায় প্রিয়—এই আমার অন্তিম কামনা।" মজিদ সেলিনার মাথা নিজের বুকে রেখে অনবরত শুধু অশ্রু বিসর্জন করছিল। হঠাৎ সেলিনাকে চুপ করতে দেখে সে পাগলের মত বলে উঠল, "সেলিনা—সেলিনা এ কি করলে! আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি, আর তোমাকে অনাদর করব না। এবার থেকে সৎপথে চলব। তোমার প্রাণে আর ব্যথা দেব না। তুমি ফিরে এসো, ফিরে এসো।"

কিন্তু সে আকুল আহ্বান সেলিনার কানে গিয়ে পৌঁছল না। সে তখন সংসারের কোলাহলের বহু উর্দ্ধলোকে চলে গেছে, তার দুঃখক্লিষ্ট জীবন-নাট্যের উপর মৃত্যু টেনে দিয়েছে কৃষ্ণ যবনিকা।

সংস্কৃত ভাষা

শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি আনে স্বীয় ভাষণে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন।

পৃথিবীতে তিনটি শ্রেষ্ঠ সভ্যতা এ পর্য্যন্ত জন্মলাভ করিয়াছে—গ্রীক সভ্যতা, চীন সভ্যতা ও ভারতীয় হিন্দু সভ্যতা। সংস্কৃত ভাষা হইতেছে এই হিন্দু সভ্যতার বাহন। এত বড় উন্নত স্বয়ংপূর্ণ এবং আত্মশক্তিতে ক্রমবিকাশ ও প্রসারের সম্ভাবনায় সিদ্ধ ভাষা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নাই। ম্যাক্সমুলার গ্রীক ও লাটিন ভাষা হইতে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

বৈদিক ভাষা হইতেই সংস্কৃত ভাষার ক্রমবিকাশ এবং খ্রীষ্টীয় শতাব্দী আরম্ভ হইবার বেশ কিছু আগেই বৈয়াকরণ পাণিনি এই ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করিয়া ইহাকে সুসম্বদ্ধ রূপ দান করেন। পাণিনি তক্ষশীলা অঞ্চলের লোক ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের প্রভাব আজিও অপ্রতিহত।

আধুনিক পণ্ডিতমহলের মত এই সংস্কৃত ভাষা ঠিক জনসাধারণের ভাষা ছিল না। তবে ইহা যে সর্ব্বভারতের শিষ্টমণ্ডলীর ভাষা ছিল তাহা নিশ্চয়। কথ্য ভাষা ছিল বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষা। তবে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক ছিল অতি নিকট, কারণ সবই ছিল এ গোষ্ঠীর ভাষা। এই সংস্কৃতই ছিল সর্ব্বভারতীয় হিন্দুর রাজকার্য্যের ভাষা। ভারতের সকল অঞ্চলেই পণ্ডিতেরা এই ভাষার চর্চ্চা করিতেন এবং যাবতীয় জ্ঞান এই ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিতেন। হিন্দুর যে একটা সর্ব্বভারতীয় ঐক্য আছে তাহা এই সংস্কৃত ভাষার প্রসাদাৎ। শত শত বৎসরের রাজনৈতিক দুর্দ্দিনের মধ্যে আজও ভারতের সকল প্রদেশেই এই সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা বজায় আছে। এই ভাষায় অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পুস্তকাদি রচনা এখনও হইতেছে। স্বামী দয়ানন্দ যখন দিগ্‌বিজয়ে বাহির হন তখন তিনি সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহার করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষা এখনও প্রাচীনপন্থী সর্ব্বভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর ভাষা। সেই পণ্ডিতমণ্ডলী সংখ্যায় ও প্রভাবে এখনও বিশেষ প্রবল।

হিন্দুর একটা অতি উচ্চ, সমৃদ্ধ, বিশাল ও শক্তিশালী সভ্যতা আছে এবং এই উন্নততর সভ্যতার বলেই সে বহুদিনের বহুবিধ দুর্যোগের পর আজ আবার আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। প্রথম দিককার মুসলমান আক্রমণ ও প্রচণ্ড ধ্বংসলীলার ফলে মনে হইয়াছিল হিন্দু সভ্যতা বুঝি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু কোনও অনুন্নত সভ্যতার পক্ষে উন্নত সভ্যতাকে জয় করা কঠিন। তাই বাবরের সময়ে দেখা যায় দুর্ব্বল পাঠান রাজশক্তির উপর আবার প্রাধান্য লাভ করিয়াছে রাজপুতের অধিনায়কত্বে হিন্দুরাজশক্তি। বাবর ইব্রাহীম লোদীকে হেলায় জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজপুতদের সঙ্গে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল সর্ব্বস্ব পণ করিয়া। মোগল রাজত্বের শেষে আবার দেখা যায় হিন্দু-শক্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। একদা ইংরেজ ভারত অধিকার করিলেও প্রধানতঃ হিন্দুদের প্রতিরোধের ফলে নিতান্ত বেগতিক বুঝিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

যে জাতির গৌরবময় অতীত আছে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইলে তাহাকে অতীতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইলে চলিবে না। তাই আমাদের পক্ষে অতীত সভ্যতার অনুসন্ধান ও পরিচয়লাভ একান্ত প্রয়োজন এবং তাহার উপায় হইতেছে

অশেষ জ্ঞানের ভাণ্ডার এই সংস্কৃত ভাষায় ব্যাপক ও গভীর চর্চ্চা। সৌভাগ্যক্রমে সে চর্চ্চার ধারা আমাদের দেশে কখনও বন্ধ হয় নাই। স্বীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি নিষ্ঠাসম্পন্ন এক দল লোক চিরদিনই আমাদের দেশে জ্ঞান ও সংস্কৃতির চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছেন। সেইখানেই আমাদের প্রাণশক্তি নিহিত। আজ আমাদের চেষ্টা হওয়া উচিত যাহাতে এই শক্তি আরও বিস্তার ও গভীরতা লাভ করে।

বস্তুতঃ সংস্কৃত ভাষাকে ছাড়িয়া আমাদের চলিবার উপায় নাই। ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ, গতি ও প্রকৃতি বুঝিতে হইলে সংস্কৃত ভাষার আলোচনা একান্ত আবশ্যক। ভারতের শতকরা সত্তর জনের অধিক আর্য্যগোষ্ঠীর ভাষায় কথা বলে। দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর ভাষাগুলিও ক্রমাগত সংস্কৃত ভাষার আশ্রয়ে আসিতেছে। আর্য্যগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইলে সংস্কৃতের সাহায্য ছাড়া উপায় নাই। বাংলাভাষা হইতে সংস্কৃতের প্রভাব ও দান বাদ দিলে বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে বাদ দিয়া রবীন্দ্রনাথকে ভাবা যায় না। আধুনিক রাষ্ট্রভাষা হিন্দী যদি বাজারের আলু পটল কিনিবার গণ্ডী ছাড়াইয়া সত্যিকারের রাষ্ট্র ও সাহিত্যের ভাষা হইতে চায় তবে তাহাকে সর্ব্বথা ভাষা-জননী সংস্কৃত ভাষার শরণ লইতে হইবে, হইতেছেও তাই। দেশে জ্ঞানের বহুল প্রচার করিতে গেলে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাগুলির পুষ্টি ও বিকাশ অবশ্যম্ভাবী এবং তাহার জন্য চাই সংস্কৃত ভাষার সাহায্য। লোকে বুঝিতে পারে না একথা বলিয়া যাঁহারা অর্থহীন অথবা অভিসন্ধিপূর্ণ চিৎকার করিতেছেন তাঁহাদের কণ্ঠস্বর শীঘ্রই নীরব হইয়া আসিবে।

সুতরাং এই সম্বন্ধে দুর্বুদ্ধি যত শীঘ্র ও সহজে পরিহার করা যায় ততই ভাল। সে দুর্বুদ্ধি হইতেছে, সংস্কৃত মৃত ভাষা এই ধারণা। এই ধারণা সৃষ্টির জন্য দায়ী এক শ্রেণীর ইউরোপীয় ও আপাত-স্বার্থের লোভে বিমুগ্ধ এক দল এদেশবাসী। দ্বিতীয় শ্রেণীর এই সব লোক এককালে ফারসী ও পরবর্ত্তীকালে ইংরেজীকেই একান্তভাবে মানিয়া আসিয়াছেন। ফলে তাঁহাদের হয়ত কিছু কাঞ্চন-কৌলিন্য লাভ হইয়াছিল; কিন্তু দেশে তাঁহাদের অবস্থাটা ছিল অনেকটা 'আকাশস্থো নিরালম্বঃ' গোছের। আজ বানের জল সরিয়া যাওয়াতে তাঁহারা ক্রমশঃ কাদায় পড়িতেছেন।

আজ যদি আমরা অতীতের সহিত যোগভ্রষ্ট হইয়া ছিন্ন-ভিন্ন হইতে না চাই তাহা হইলে আমাদের সংস্কৃত ভাষা ও সেই ভাষায় নিবদ্ধ সর্ব্ববিধ জ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং সম্পর্ক রাখিতে হইবে। বর্ত্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সম্বন্ধে একটা ক্রমবর্দ্ধমান উদাসীনতা দেখা যাইতেছে। ইহা শুভ লক্ষণ নয়। এইরূপ চলিতে থাকিলে আমাদের সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা সব কিছুই আত্ম-বিশ্বাসশূন্য ও আত্মনির্ভরহীন হইয়া জীবনের সহিত সম্পর্ক হারাইবে; এবং দীর্ঘকালব্যাপী বৈদেশিক শাসনের মধ্যেও নিজেদের ঐতিহ্য এবং সভ্যতা বজায় রাখিয়া যে অনিষ্টকে এতকাল ঠেকাইয়া রাখা গিয়াছে আজ আমরা নিজেরাই সেই অকল্যাণ করিয়া চলিব। এই যুগসন্ধিক্ষণে আমাদের বিশেষ অবহিত হইবার সময় আসিয়াছে। অবশ্য সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চার ধারার কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার। প্রাচীন চতুষ্পাঠীর পথে ষোল আনা চলা অসম্ভব। আজ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা উভয়ই যুগোপযোগী হওয়া চাই।

আত্মজিজ্ঞাসা ও জীবনযাত্রা

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আজকাল জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই সত্যকে ভুলে চলা আধুনিকতার লক্ষণ এবং ফ্যাশানে দাঁড়িয়েছে। এক জন শিক্ষিত যুবক ঈশ্বরোপলব্ধিকে জীবনের উদ্দেশ্য হিসাবে বেছে নেওয়াতে অপর যুবক বিস্ময় প্রকাশ করে বলছে 'বিংশ শতাব্দীর এম্-এস্‌সি! ঈশ্বরলাভ জীবনের উদ্দেশ্য! ...সে তো মধ্যযুগের কথা।' এক আধুনিকা তরুণীর একটি সঙ্গীত বেশ ভাল লেগেছে, সে সঙ্গীতটি শিখেছে, কিন্তু তার পরই মনে প্রশ্ন জাগল, 'সঙ্গীতটি আধুনিক তো!' স্পষ্ট উত্তর না পেয়ে সে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল...এটি আধুনিক কিনা এই সন্দেহে, এবং তার চেষ্টা বৃথায় গেল কিনা এই ভয়ে একটা নৈরাশ্য তার চোখে মুখে সুপরিস্ফুট। আমি বললাম, 'আধুনিক হোক্ আর প্রাচীন হোক্...ভালো লেগেছে তো তোমার! তাই কি যথেষ্ট নয়?' কিন্তু 'আধুনিক' এই শব্দটিরই একটা মার্কা বা ছাপ চাই। এই চিন্তাহীন, বিচারহীন, একটা অন্ধ কুসংস্কার আধুনিকতার নামে সমাজ ও দেশকে পেয়ে বসেছে।

তাই 'সত্য' সম্বন্ধে 'একাডেমিক' আলোচনায় আধুনিকদের অনুৎসাহ নেই, কিন্তু তাঁদের মতে সত্যের উদ্দেশ্য হবে শুধু আলোচনাই—জীবনের সঙ্গে তার সম্বন্ধ থাকবে না কিছু। আর তা না হলে সত্যকেই এমন রূপ ধরে আসতে হবে যা আধুনিক জীবনযাত্রাকেও মেনে নেবে। এ ভাবে জীবনে ও সত্যে একটা গোঁজামিল দেওয়া চলবে। সত্য-দর্শনের এই ভণ্ডামিটাই দর্শনের দিক থেকে আধুনিকতার লক্ষণ, তাই আধুনিকদের সত্য-দর্শনও অসম্পূর্ণ তা ক্লাস-রুম লেকচারের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ। * যেখানে 'সমগ্রে'র আন্তরিকতা নেই সেখানে খাঁটি জিনিষ পাবার প্রত্যাশাই তো বৃথা।

তাই সত্যকে জানতে হলে এই ঠুনকো আধুনিকতার ভণ্ডামি ছেড়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীরই সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। তাকে জানতে হবে শুধু বিচার নয়, শুধু পুথি নয়, শুধু কাগজ কলম নয়—বিচার, পুথি, কাগজ, কলম—যে জীবনের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র সেই সমগ্র জীবন দিয়ে।

এ ভাবে যে সত্যকে জানা যাবে তা নিশ্চয়ই আমাদের জীবনধারাকে সম্পূর্ণ বদলে দেবে। কারণ এ জানা শুধু বক্তৃতা বা পাণ্ডিত্য জাহির করবার জন্য নয়, এ দর্শন জীবনকে বদলে দিতে বাধ্য। যাঁর জানা আছে যে শয়নগৃহে তাঁর মৃত্যুরূপী 'কালসর্প' রয়েছে তাঁর পক্ষে কি নিশ্চিন্তে নিদ্রা সম্ভবপর? না অন্য কর্ত্তব্য-সচেতনতা স্বতঃই এসে পড়ে?...আমাদের আধুনিক দর্শন বা বিচার এই দুই নামের যোগ্যই নয়। তার প্রধান কারণ, তা প্রচলিত জীবনযাত্রার দৃষ্টিভঙ্গীকে বদলাতে নারাজ—তা মিথ্যাই হোক সত্যই হোক। তার চেষ্টা হ'ল দৃষ্টিভঙ্গীকে ঠিক রেখে তার পর দর্শন যা দাঁড়ায়। তাই তার মতবাদগুলোও ঐ মিথ্যা ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

জীবনে সত্য কি আমরা কিছুই জানি নি? আমরা কি একেবারেই অন্ধ হয়ে জন্মেছি যে জীবনটাকে শুধু না-জানার পথেই কাটাতে হবে?—বিন্দুমাত্র আলোক কি আমরা পাই নি যাকে অবলম্বন করে পথের সন্ধান, সত্যের সন্ধান করা চলে? না, যেটুকু আলো নিয়ে জন্মেছি তাকেও আবৃত করে গভীর অন্ধকারে চলাই আমাদের স্বভাব? পাছে আলো দেখে ফেলি, পাছে পথের সন্ধান পাই, পাছে চিরাচরিত চলার পথ ছেড়ে দিতে হয়? তাই চোখ বন্ধ করে চক্রাকারে ঘুরে চলাই কি আমাদের রীতি?—তার পর সেই অন্ধকারকেই 'সত্য' কল্পনা ক'রে পাণ্ডিত্যের গিলিতচর্ব্বণ, এই কি আমাদের দর্শন? আজ যেন তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ অতি সহজ সত্যটাকেও আমরা ঢেকে রেখেছি—'জানব না' এই সঙ্কল্প করে দূরে সরিয়ে দিয়েছি।

কে না জানে যে মৃত্যু নিশ্চিত—এ দেহের অবসান নিশ্চিত। কিন্তু জীবনের চলার পথে কোন পণ্ডিত এই সত্যটিকে মেনে চলা সুরু করেছেন? মৃত্যুরূপী সত্যকে বাদ দিয়ে সব করা হয়েছে বলেই সার সত্য জীবন থেকে এতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অথচ যমের নিকট নচিকেতার এইটেই ছিল প্রধান প্রশ্ন।

যে মুহূর্ত্তে এই মৃত্যুরূপী সত্যকে আমরা সত্য বলে গ্রহণ করেছি সে মুহূর্ত্তেই আমাদের জীবন-দর্শন খুলে গেছে, প্রাণে জিজ্ঞাসা জেগেছে। পথের আকাঙ্ক্ষা, আরও আলোর আকাঙ্ক্ষা জেগেছে...'তবে মরে কে? দেহের মৃত্যু তো নিশ্চিত। দেহের মৃত্যুতেই কি 'আমি' মরি? দেহাতিরিক্ত 'আমি' বলে কি কেউ আছে? যদি থাকে সে কে, কেমন? এ সব প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগবে। মৃত্যুর দিকে চোখ বুজে না রাখলে, এই আত্মজিজ্ঞাসা বা 'আমি কে' এই প্রশ্ন জাগবেই। এই 'আমি'র স্বরূপ জানবার আকাঙ্ক্ষা আসবেই, এখন এই 'আমি'র স্বরূপের উপরই নির্ভর করবে আমার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী।

'আমি কে'? তা জানবার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা শুধু বিচারমাত্রে পর্য্যবসিত হওয়া স্বাভাবিক নয়। বিচারের উপর মানুষের আস্থা আছে কিন্তু সম্পূর্ণ নেই (তার প্রমাণ মানুষের জীবন ও বিচারের বিরাট ব্যবধান)—তাই মানুষ শুধু যুক্তিতর্কের বিচারে এই মীমাংসায় তৃপ্ত হতে পারে না। তাকে খুঁজে দেখতে হবে 'আমি কে'?—তাই অনুভব করা বা জানার মূল্য তার কাছে যুক্তি-বিচারের চেয়ে অনেক বড়। সে উপলব্ধি করতে চাইবে—'আমি কে'?—এই উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা জীবনে কি আকার নেবে তা মানুষ নিজেই বুঝতে পারবে...মানুষকে ডুবে যেতে হবে ঐ 'আমি'র ভিতর...ঐ 'আমি'র উৎসের সন্ধানে সেখানেই মিলবে সত্যের ইঙ্গিত, সেই ইঙ্গিতই তার জীবন-যাত্রাকে দেবে বদলে।

আধুনিক শিক্ষাধারা এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে মূলের গলদ এইখানে যে, মানুষ মৃত্যুকে অস্বীকার করে জীবনকে দেখতে চায়—তার ঠুনকো দর্শন তাই তাকে বিভ্রান্ত করে। মৃত্যুকে স্বীকার করা কথাটার মানে জীবনের ভিতর দিয়ে তাকে স্বীকার করা—নতুবা সে স্বীকৃতিতে থাকবে ভণ্ডামি এবং সে বিচারে থাকবে আত্মপ্রতারণা।

বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার

ব্রহ্মচারী রমেশ

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে কলম্বস ভারতবর্ষ অভিযানে বাহির হইয়া এক নূতন দেশের সন্ধান লাভ করেন। তখন সেই দেশ খর্ব্বাকৃতি পীতজাতীয় অধিবাসীদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। কলম্বসের অনুচরগণ তাহাদিগকে রেড ইণ্ডিয়ান নামে অভিহিত করে এবং ঐ দেশের নামকরণ করা হয় পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। বহু ক্ষুদ্র-বৃহৎ দ্বীপ লইয়া এই দেশ গঠিত। এই দেশ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জমান কোনও বিরাট দেশের অংশ বিশেষ বলিয়া ভৌগোলিকগণের ধারণা। এই দ্বীপপুঞ্জকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) বড় এণ্টাইলস্, (২) ছোট এণ্টাইলস্ এবং (৩) বাহামা দ্বীপপুঞ্জ।

সাংস্কৃতিক মিশনের সদস্যগণকে রাজ্যপাল শ্রীকৈলাসনাথ কাটজু কর্তৃক বিদায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন

কিউবা, জ্যামেকা, হাইতি, স্যান ডোমিনগো এবং পোর্ট টেরিটো লইয়া বড় এণ্টাইলস্ গঠিত। ইহার আয়তন এক লক্ষ বর্গ মাইল। ইহা নিগ্রো-প্রধান অঞ্চল এবং এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই রোমান কাথলিক। ইহা যুক্তরাষ্ট্রকর্তৃক শাসিত।

বাহামা দ্বীপপুঞ্জ বড় এণ্টাইলস্-এর উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের সমষ্টি। ইহার আয়তন ৪৪৫০ বর্গমাইল। ইহা ব্রিটিশের অধিকৃত একটি উপনিবেশ। এই দ্বীপপুঞ্জের লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। ইহার রাজধানীর নাম নাসাউ। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বস প্রথমে এই দ্বীপে উপনীত হন।

ছোট এণ্টাইলস্ দক্ষিণ আমেরিকার ভেনিজুয়েলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার উত্তরাংশকে লি-ওয়ার্ডস দ্বীপপুঞ্জ এবং দক্ষিণ অংশকে উইণ্ড-ওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জ নামে অভিহিত করা হয়। আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে দক্ষিণ অংশটি অনেকটা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। এই রাজ্যটি ইংরেজের

ত্রিনিদাদের গবর্ণরকর্তৃক সরকারী ভবনে মিশনের সভ্যগণকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন

শাসনাধীনে পরিচালিত। উইণ্ড-ওয়ার্ডের পূর্ব্ব দিকে বার্বাডাস এবং দক্ষিণ দিকে ত্রিনিদাদ, টবাকো প্রভৃতি অবস্থিত। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ হইতে বহির্ভারতে প্রেরিত ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশনের প্রচারকমণ্ডলী বর্ত্তমানে এই ত্রিনিদাদ অঞ্চলে প্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ ১৯২৯ সাল হইতে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসংস্কৃতি প্রচারের উদ্দেশ্যে বহির্ভারতে প্রচারক প্রেরণ করিতে সুরু করেন। তাঁহার প্রেরিত প্রচারকবাহিনী একাধিকবার ব্রহ্ম, মালয় ও শ্যামের সীমান্তে প্রচারকার্য্য পরিচালনা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতের আভ্যন্তরীণ নানা বিপর্য্যয় হেতু বহির্ভারতে এই প্রচারকার্য্য কিছু দিন বন্ধ ছিল। ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকায় স্বামিজীর প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ হইতে একটি প্রচারকবাহিনী প্রেরিত হয় এবং দেড় বৎসর তাঁহারা সেখানে অবস্থান করিয়া অপূর্ব্ব সাফল্যলাভ করেন।

দক্ষিণ আমেরিকা, ব্রিটিশ গায়েনা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও অন্যান্য স্থানে যে সকল ভারতীয় হিন্দু পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছে তাহাদের মধ্যে বিস্মৃতপ্রায় হিন্দু সংস্কৃতির পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্য স্বামী অদ্বৈতানন্দজীর নেতৃত্বে একটি ছোট মিশন গত ১৯৫০ সালের ১১ই নবেম্বর দক্ষিণ আমেরিকা অভিমুখে

যাত্রা করিয়াছে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের চারি জন সন্ন্যাসী লইয়া এই প্রচারক-দলটি গঠিত। এই প্রচারকমণ্ডলীর যাত্রার প্রাক্কালে বিদেশে প্রচারকার্য্যের সাফল্য কামনা করিয়া রাজ্যপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু এক বাণী প্রেরণ করিয়া

মরিসাসের বন্দরে সম্বর্দ্ধনা

বলেন, "...সুদূরের হিন্দুদিগকে আপনারা মাতৃভূমির কথা স্মরণ করাইয়া দিবেন এবং ভারতের শাশ্বত মর্ম্মবাণীর দ্বারা কেবল তাঁহাদিগকে নহে, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকেও উদ্বুদ্ধ করিবেন।" ১০ই নবেম্বর মিশনের বিদায়-সম্বর্দ্ধনার জন্য মহাবোধি হলে ডাঃ শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়। ১১ই নভেম্বর কলিকাতার কিং জর্জ্জ ঘাট হইতে এস. এস. বোটাম্বা নামক জাহাজযোগে মিশনের সদস্যগণ যাত্রা করেন। জাহাজ ত্রিনিদাদের পথে মরিসাস বন্দরে দুই দিনের জন্য ভিড়ে। স্থানীয় গীতা মন্দিরে ভারতীয়গণের পক্ষ হইতে মিশনের সদস্যগণের এক অভ্যর্থনা সভা আহূত হয়। বন্দর হইতে ২৫ মাইল দূরে নিউগ্রোভ নামক স্থানে স্থানীয় কৃষ্ণসহায়ক মণ্ডলের উদ্যোগে ভারতীয়-গণের অনুষ্ঠিত অন্য এক সম্মেলনে মিশনকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। মিশনের নেতা স্বামী অদ্বৈতানন্দজী অভ্যর্থনার উত্তরে বলেন—"স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে ভারতীয়-গণের বহির্ভারতে দুইটি মহান্ দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়া চলিতে হইবে। এখানকার তিন লক্ষ ভারতীয় অধিবাসীকে এদেশের জনসাধারণের উন্নতি ও প্রগতির জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। অন্য দিকে এখানকার ভারতীয়গণকে স্বাধীন ভারতের সাংস্কৃতিক প্রেরণা লাভ করিতে হইবে।"

৬ই ডিসেম্বর জাহাজ কেপটাউনে এক দিনের জন্য নোঙর করে। স্থানীয় হিন্দু এসোসিয়েসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক অভ্যর্থনা-সভায় মিশনের সন্ন্যাসিগণকে বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। এই দেশে সন্ন্যাসীদের আগমনে শহরে বিশেষ সাড়া পড়িয়া যায়। স্থানীয় *Cape Argus* নামক শ্বেতাঙ্গ-পরিচালিত পত্রিকায় নিম্নোক্ত সংবাদ প্রচারিত হয়:

"Four 'dead' men see Cape Town today. They stepped ashore from the cargo-liner *Batwa* to have a look at the city. Dressed in bright orange turbans and gowns and wearing sandals, they aroused the interest of passers-by as they walked up Adderley street. They are monks who are dead to this world. They have been reborn and baptized for the purpose of helping humanity."

সুদীর্ঘ ৪৮ দিন সমুদ্রযাত্রার পর মিশন গত ২৯শে ডিসেম্বর ত্রিনিদাদ বন্দরে অবতরণ করে। ত্রিনিদাদের ইতিহাসে ঐ দেশে সন্ন্যাসীর আগমন উহাই প্রথম। স্থানীয় বেতার ও সংবাদপত্রসমূহের দ্বারা মিশনের আগমনবার্ত্তা প্রচারিত হইলে ভারতীয় ও অভারতীয় সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা দলে দলে পোর্ট অব স্পেনের বন্দরে সমবেত হন। ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার শ্রী এম. এম. খুরানা, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রী বি. বি. মাথুরা সম্পাদক শ্রী আর. আর. ওঝা, আইন-পরিষদের সদস্য সি. ই. আই. জেমস, সুন্নৎ-উল জামাতের নেতা হাজি ইব্রাহিম, কাউন্সিলর শ্রী আই বি. লাল সিং, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের খ্রীষ্টান প্রার্থনা সমিতির সভাপতি জর্জ্জ ম্যাকডোনাল্ড মেম্বার্স, নিগ্রো নেতা মিঃ আই. জে. টমিংহাম প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ মিশনের সভ্যগণকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

৩১শে ডিসেম্বর কুইন্স পার্কে এক সম্বর্দ্ধনা-সভার আয়োজন হয়। ৪০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতেও বহু বিশিষ্ট নেতা ইহাতে যোগদান করেন। স্থানীয় রেল-কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতে অর্দ্ধমূল্যে টিকেট বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয় এবং অতিরিক্ত গাড়ী চালু করা হয়। নাগরিকদের অভ্যর্থনার পর ত্রিনিদাদ ও টোবাকোর গবর্ণর স্যর হিউবার্ট র‍্যান্স সরকারী ভবনে মিশনের সদস্যগণকে অভিনন্দিত করেন। মিশনের পক্ষ হইতে গবর্ণরকে একখানি বেদান্ত উপহার দেওয়া হয়।

৭ই জানুয়ারী (১৯৫১) পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী ত্রিনিদাদের নিকটবর্ত্তী টুনাপুনা শহরে ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক সাংস্কৃতিক মিশনের সম্মানার্থে এক বিরাট জনসভার আয়োজন করা হয়। পঞ্চাশ হাজার নরনারী ইহাতে যোগদান করে।

২৬শে জানুয়ারী মিশনের উদ্যোগে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রবাসী ভারতীয়গণ প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন করেন। মিশনের নেতা স্বামী অদ্বৈতানন্দজী বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের পর সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীআনন্দমোহন সহায় ও গবর্ণর স্যর হিউবার্ট র‍্যান্স উক্ত সভায় যোগদান করেন। হাই কমিশনারের প্রচেষ্টায়

ওয়াটারলু নামক স্থানে অনুষ্ঠিত অন্ত এক সম্মেলনেও মিশনের সদস্যগণ স্বাধীন ভারতের মর্ম্মবাণী প্রচার করেন।

২০শে ফেব্রুয়ারী মিশন কর্তৃক ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। ৫ই মার্চ টুমাপুনা শহরে মিশনের সদস্যগণ শিবরাত্রি উৎসব প্রতিপালন করেন। এতদুপলক্ষে বিরাট সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৪ঠা মার্চ একটি প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা রাম, কৃষ্ণ, শিব ও স্বামী প্রণবানন্দজীর প্রতিকৃতিসহ শহরের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে। ৫ই মে সাংস্কৃতিক সম্মেলনে হাই কমিশনার শ্রীআনন্দ-মোহন সহায় সভাপতিত্ব করেন এবং গবর্ণর স্তর হিউবার্ট র‍্যান্স ইহার উদ্বোধন করেন। ইতঃপূর্ব্বে এই দেশে শিবরাত্রি ব্রত উদ্‌যাপিত হয় নাই।

মিশনের সদস্যগণ বর্ত্তমানে সানক্রে নামক স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া প্রচারকার্য্য করিতেছেন। প্রত্যহ পূজা আরতি, ভজন-কীর্ত্তন, ছায়াচিত্রযোগে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী বর্ণনা ও ব্যাখ্যা, ধর্ম্মালোচনা, গীতাপ্রচার, বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্য দিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার করা হইতেছে।

মরিসাসের ভারতীয় দূতাবাসে—মধ্যস্থলে ভারতীয় হাইকমিশনার মি: জন এ. থিবি

এই কেন্দ্রে একটি সাংস্কৃতিক পাঠাগারও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্দেশে প্রবাসী ভারতীয়গণের জীবনযাপন প্রণালী, রীতি-নীতি, সামাজিক পরিবেশ এবং তাহার উপর রাজনৈতিক প্রভাব কিরূপ বিস্তারলাভ করিয়াছে তাহা মিশনের অন্যতম সদস্য ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণের একটি পত্রে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। ব্রহ্মচারীজী লিখিয়াছেন :

"আমরা বর্ত্তমানে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের একটি বৃহৎ দ্বীপ ত্রিনিদাদে প্রচাররত আছি। ভারত হইতে দ্বীপটির দূরত্ব প্রায় তের হাজার মাইল। আয়তন প্রায় ১০০০ বর্গ-মাইল, লোকসংখ্যা ছয় লক্ষ সাড়ে আঠারো হাজার। তন্মধ্যে

মরিসাসের নিউগ্রোভ শহরে হিন্দুদের একটি মন্দির

ভারতীয় হিন্দুর সংখ্যা ১ লক্ষ ৭২ হাজার। এক শত বৎসরাধিক পূর্ব্বে (১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে) বিহার এবং যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এই সকল হিন্দুর পূর্ব্বপুরুষগণকে শ্রমিক হিসাবে এই দ্বীপে আনা হইয়াছিল। প্রথমে ৫ বৎসরের চুক্তিতে এই সমস্ত শ্রমিক সংগ্রহ করা হইত। ৫ বৎসর পরে যে সমস্ত শ্রমিক ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চাহিত, তাহাদের বিনাব্যয়ে ভারতে প্রেরণের দায়িত্ব ছিল সরকারের। পরে এই শ্রমিকের আমদানী বন্ধ হইয়া যায়। বর্ত্তমানে অবশ্য এই সমস্ত শ্রমিকের অনেকে নিজেদের চেষ্টা যত্ন উদ্যোগের ফলে শিক্ষিত, উন্নত এবং ধনবান হইয়াছেন। অনেকে নিজেদের জন্ত জমিদারী করিয়াছেন, আইন-ব্যবসায়ী, চিকিৎ-সক এবং ব্যবসায়ীও হইয়াছেন। ভারতের জনসাধারণের তুলনায় এখানকার জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত। ইংরেজী একমাত্র কথ্য ভাষা।

স্থানীয় হিন্দুরা এই এক শত বৎসরের মধ্যে নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি ভুলিয়াছে, বেশভূষা ছাড়িয়াছে, সামাজিক রীতিনীতি সব ভুলিয়াছে, সেই সঙ্গে আচার-অনুষ্ঠানও বিস্মৃত হইয়াছে। তাহারা মিশনরীদের চেষ্টায় ধর্ম্মান্তরিত হইতেছে। সরকারী চাকুরী পাইতে হইলে খ্রীষ্টান হইতে হয়, মিশনরী স্কুলে শিক্ষালাভ করিতে হয়। নাম বদলাইয়া মিশনরী স্কুলে ছাত্রদের ভর্তি করিতে হয়। চার-পাঁচ বৎসর পরে বাইবেল পড়াইতে পড়াইতে ছাত্রদের খ্রীষ্টান করিয়া লওয়া হয়। এই ভাবে ভারতীয়গণকে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মান্তরিত করা হয়। হিন্দুরা মাতৃভাষা (হিন্দী) একেবারেই জানে না। প্রাচীনেরা কিছু কিছু বুঝিতে পারে, কিন্তু নব্য সম্প্রদায় একেবারেই নয়। তাই হিন্দুধর্ম্ম বিষয়েও তাহারা কিছু জানে না। দুই চার জন ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা দুই একটি শিবালয়ের পূজারী। কিন্তু সংস্কৃত না জানায় তাঁহারা না জানেন পূজার মন্ত্র—না জানেন অনুষ্ঠান-পদ্ধতি।

এখানে হিন্দুদের সামাজিক প্রথানুসারে বিবাহ হয় না। এতদিন পর্য্যন্ত যেমন তেমন করিয়া যুবকযুবতীকে মিলাইয়া দিয়া দু'চারজন লোকের সম্মুখে বলিয়া দেওয়া হইত যে তাহাদের উভয়ের বিবাহ হইল, পরে সামান্য কারণে বিবাহচ্ছেদ,

মরিসাসের রোজহিল শিবালয়

তাও সমাজের সামনে বোঝাপড়া করিয়া নয়। পতির ইচ্ছা হইল পত্নীর সহিত থাকিবে না—ব্যস। যেমন ইচ্ছা কাজও তেমনি সঙ্গে সঙ্গে। অথবা পত্নীর ইচ্ছা হইল স্বামীর সহিত বাস করিবে না—সঙ্গে সঙ্গে আর একজনকে লইয়া চলিয়া গেল অথবা পিত্রালয়ে ফিরিয়া গেল। কিন্তু বর্ত্তমান সরকারের আইনানুসারে হিন্দুদের বিবাহ কোর্টে গিয়া রেজেষ্ট্রী করিতে হয়। ফলে কথায় কথায় বিবাহবিচ্ছেদ অনেকটা কমিয়াছে বটে, কিন্তু আসলে এখনও বেশ আছে। স্থানীয় হিন্দুর পারিবারিক জীবন একেবারে ছন্নছাড়া। ইহাদের নৈতিক বলও নিতান্ত নৈরাশ্যজনক। মদ্যের প্রচলন বেশ আছে। মদ্যপান যে হিন্দুশাস্ত্র মতে দোষের তাহা মনে কেহ স্থান দেয় না। আমাদের প্রচারের ফলে কেহ কেহ (হিন্দু) বুঝিতে পারিয়াছে যে, স্বাধীন ভারতের নাগরিক মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে মদ্যপান ত্যাগ করিতে হইবে।

আর্থিক অবস্থা খুব ভাল না হইলেও সাধারণ লোকে খাইয়া পরিয়া মোটামুটি ভালই আছে। আমাদের দেশের মত এদেশের লোককে অনশনে অর্দ্ধাশনে কাটাইতে দেখা যায় না। জমিতে কাজ করিয়া খায় এই শ্রেণীর লোকেরও ভাল পোশাক, বাড়ীটি বেশ সাজানো-গোছানো। একটু অবস্থা ফিরিলেই চেয়ার টেবিল, রেডিও চাই। এদেশে ট্যাক্সি খুব সস্তা, তাই রেল বা বাসে লোক যাইতে চায় না। হিন্দুরাই অধিকাংশ ট্যাক্সি চালক। এক একজন ট্যাক্সি চালক প্রতিদিন ৩০.৪০ টাকা উপার্জ্জন করে। এখানে হিন্দুদের মধ্যে ১০ হাজার ট্যাক্সি চালক আছে। তরকারি ফলমূলের মূল্য খুব বেশী, তাই কৃষকশ্রেণীর লোকেরা খাইয়া পরিয়া বেশ দু'পয়সা পায়।

এদেশের সামাজিক জীবনের মান খুবই অনুন্নত। আমাদের দেশে মন্দির আছে; ফুটবল বা অন্যান্য ক্লাব আছে, গানের আসর আছে, থিয়েটার বা অন্যান্য সঙ্ঘ, সাহিত্য-সমাজ ইত্যাদি নানা প্রকারে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আছে; তাহাতে সর্ব্বশ্রেণীর লোক একত্র মিশিবার ও নানাপ্রকার আলোচনা ও আদান-প্রদানের সুযোগ পায়। এখানে তাহার একান্ত অভাব। তাই প্রত্যহ বৈকালে আমাদের প্রার্থনান্তিক সভা, পূজা আরতিতে হাজার হাজার লোক সমবেত হয়।

যাই হোক, আমাদের প্রচারের ফলে একটা আলোড়ন জাগিতেছে। যুবসম্প্রদায় আমাদের নির্দ্দেশগুলি পালনের জন্য বিশেষভাবে তৎপর হইয়াছে। দু'একটি শহরে আমাদের নির্দ্দেশ অনুসারে কাজকর্ম্মও চলিতেছে। গ্রামের যুবকেরা পরস্পর মিলিয়া গ্রামোন্নয়ন কাজ—যেমন, ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা, রাস্তাঘাট পরিষ্কার, সেবা-শুশ্রূষা, কো-অপারেটিভ ষ্টোর ইত্যাদি করিতেছে। আশা করি, সফল হইয়া দেশে ফিরিতে পারিব।"

অতি প্রাচীনকালেও আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পৃথিবীর সর্ব্বত্র হিন্দু সংস্কৃতির প্রচারে মনোযোগ দিয়াছিলেন। এশিয়ার বহু স্থানে তাহার নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। এশিয়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও সুদূর আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশে হিন্দুর সভ্যতা ও স্থাপত্যের অভূতপূর্ব্ব বিস্তারলাভ ঘটিয়াছিল। হিন্দুরা পুরুষানুক্রমে ঐ সকল দেশে নাগরিক রূপে বাস করিতেছে। তাহাদের খোঁজখবর লওয়া দরকার। ভারতমাতার একনিষ্ঠ সাধক স্বামী বিবেকানন্দ এক দিন সমগ্র বিশ্বে ভারতীয় আদর্শকে পাশ্চাত্যে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তখন ভারত ছিল পরাধীন। আজ ভারত স্বাধীন হইয়াছে। আজ স্বাধীন ভারতের বাণী বিশ্বের সর্ব্বত্র পৌঁছাইয়া দিবার সময় আসিয়াছে। আজ বিশ্ববাসী স্বাধীন ভারতের সম্বন্ধে জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। ভারতের বাহিরে আছে প্রায় এক কোটি প্রবাসী ভারতীয়। তাহাদিগকে ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। ভারতের ঋষি যে মহান্ সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা কোন বিশেষ জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সেই শাশ্বত বাণীর আদর্শ প্রচারের জন্যই ভারত-সেবাশ্রম সঙ্ঘ সচেষ্ট। এই উদ্দেশ্যেই সঙ্ঘের প্রেরিত সাংস্কৃতিক মিশন বহির্ভারতে প্রচার-অভিযান আরম্ভ করিয়াছে।

বন্দী যারা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১০

প্রথম সাহিত্য-বৈঠক কোথায় বসবে এই নিয়ে সভ্যদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। অমলেন্দুদের বাইরের ঘরটি সাহিত্য-বৈঠক উদ্বোধনের পক্ষে অনুকূল নয়—এ ঘরে বড়জোর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভা বসতে পারে, বসেছিলও দু-একবার। সেটা ঘরোয়া ব্যাপার। কিন্তু সাহিত্য-বৈঠকে সম্ভ্রান্ত শিক্ষাব্রতী, পদস্থ ব্যক্তি বা সাহিত্য-রসিককে নিমন্ত্রণ করা রীতি। কোন খ্যাতিমান সাহিত্যিক হয়ত সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করবেন। সম্ভব হলে একজন প্রধান অতিথি ও একজন সভা-উদ্বোধক থাকবেন। কোন ভাল সঙ্গীতজ্ঞকে দিয়ে উদ্বোধন-সঙ্গীত গাওয়াতে হবে। সুতরাং অমলেন্দুদের ছোট বৈঠকখানা ঘরে কুলাবে না। কিন্তু শান্তি, সুবোধ, শশাঙ্ক, ভূপতি বা প্রভাত কারও বড় ঘর নেই যা বৈঠকখানা হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এদের কারও ভাড়াবাড়ী—দু-একখানা ঘরে আট-দশ জন করে মানুষ—এক রাশ সংসারের প্রয়োজনীয় বস্তুর সঙ্গে ঠাসাঠাসি হয়ে থাকে—কারও বা নিজস্ব বাড়ী, আর বাড়ানোর জন্য ভাড়াটে বসাতে হয়েছে অনেকগুলি। গোনাগুন্তি ঘরের মধ্যে ফাল্‌তো জায়গা থাকবে কি করে। ওরই মধ্যে অমলেন্দুদের তবু বাইরের ঘর আছে—ওর বাপের ডিস্‌পেনসারি। ঘরটা কাঠের পার্টিশন দিয়ে দু' ভাগ করা। এক ভাগে ডাক্তারির টেবিল চেয়ার পাতা, একটা মাঝারি আলমারিতে খানকয়েক মোটা বই, কিছু যন্ত্রপাতি, মেজার গ্লাস কয়েকটা; অন্ত ভাগ লোকচক্ষুর অন্তরালে। সেখানে দু' আলমারি ভর্ত্তি শিশি বোতল, একটা পাথর-বসানো ছোট টেবিল—তার উপর কয়েকটা পোরসিলিনের বাটি, একটা চ্যাপটা ছুরি, কিছু কাগজ। সোলাভর্ত্তি একটা বেতের ঝুড়ি রয়েছে টেবিলের নীচে, তার পাশে জলভর্ত্তি একটি বালতি আর টেবিলের সামনে একখানি টুল। সে ঘরে একজন লোক কোনমতে দাঁড়িয়ে বা বসে ওষুধের শিশিগুলিতে ওষুধ ভর্ত্তি করে দিতে পারে। ওই টেবিল চেয়ারগুলি সরিয়ে কাঠের পার্টিশনটা তুলে দিয়ে অবশ্য সভা বসান চলে। কিন্তু অমলেন্দুর বাবা পসারহীন নির্ব্বিরোধী মানুষ হলেও সাহিত্য-পাগল মানুষ নন—এতটা অনিয়ম তিনি সহ্য করবেন বলে মনে হয় না।

শান্তি বললে, কোন খোলা জায়গায়—হ'লই বা শহর থেকে দূরে—

ভূপতি বললে, আছে একটা ভাল জায়গা—কিন্তু—

কোন্ জায়গা ?

কেম সেনেদের বৈঠকখানা। দু' শ লোক বসলেও মনে হবে হলঘরটা অর্দ্ধেক ভর্ত্তি হয় নি।

কিন্তু সেখানে কেমন করে হবে ? প্রভাত বললে।

কেন হবে না—চেষ্টা চাই। বল আগে রাজী কিনা সকলে ?

আট জনের মধ্যে ছ' জন রাজী হ'ল।

বাকি দু'জন বললে, বড়লোকের বাড়ী। যা গুমোর—কথাই কয় না।

"যাতে কথা কয় এবং অভ্যর্থনা করে সে ব্যবস্থা আমার—" ভূপতি বললে।

প্রভাত বললে, তোর কি কারও সঙ্গে আলাপ আছে ?

একটি ছেলে আছে ওবাড়ীর, আসছে বার আই-এ দেবে। সুন্দর ছেলে, কবি-কবি চেহারা আর লেখেও সে ভাল ভাল কবিতা, রীতিমত ছন্দ মিলিয়ে।

শান্তি বললে, ভূপতির ছন্দজ্ঞান টনটনে বলেই এ কথা বলছে।

কলেন পরিচীয়তে। ভূপতি হাসল। সেই ছেলেটিকে আমাদের সমিতির সভ্য করে নিতে হবে।

সে যে বনিয়াদী ঘরের ছেলে।

বনিয়াদি ভেঙে পড়ছে বনেদের সঙ্গে। ছেলেরা পায়ে হেঁটে ইস্কুলে যায়, সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে ওঠে—কাঁচিমার্কা সিগ্রেট টানে। দুটো বড় বড় আস্তাবল পড়ে রয়েছে, গাড়ী বা ঘোড়া একটাও নেই।

বেশ মেম্বার বাড়াও। কিন্তু শুনি ওরা নাকি সাধারণ লোকের সঙ্গে কথাই কয় না ভাল করে ?

ভুল শুনেছ। ছেলেটির জ্যেঠামশাই ত্রিলোচন সেন পাড়ার মধ্যে পায়ে হেঁটে আলাপ জমিয়ে আসেন। শুনি ত ওঁরও সাহিত্য-বাতিক আছে।

বাতিকগ্রস্ত লোক কিন্তু সাংঘাতিক হয়। মানুষ খুন করে যারা তারাও মানুষের মেজাজ বোঝে—হুঁশিয়ার থাকে যেন মানুষটা চটে না যায়—কিন্তু সাহিত্য-বাতিকগ্রস্ত যারা অক্ষম লেখা নিয়ে সম্পাদকের দ্বারস্থ হয় তারা যে কি ভয়ঙ্কর জীব তোমরা ধারণাও করতে পারবে না। সময়ে অসময়ে তাদের সেই অক্ষম লেখা শুনিয়ে সম্পাদকদের পৌনে-মরা করে ছাড়ে তারা। মন্তব্য শেষে শশাঙ্ক হো-হো করে হেসে উঠল।

যাই হোক, ওরা পরামর্শ করতে লাগল কি করে ত্রিলোচন সেনকে সমিতিতে আনা যায়।

শান্তি বললে, ওঁকে একখানি নিমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হোক আর অনুরোধ করা হোক—

দূর গাধা, নিমন্ত্রণ পত্র দিয়েই কখনও অনুরোধ করা যায়—দয়া করিয়া আপনার বৈঠকখানাটি ছাড়িয়া দিলে বাধিত হইব!

অময় বললে, তার চেয়ে ওঁকে সমিতির প্রধান উপদেষ্টা বা পৃষ্ঠপোষক করে দিয়ে—

না না, তার চেয়ে ওঁকে স্থায়ী সভাপতি করে দেওয়া হোক, তা হলে যে-কোন কাংশানে (উপলক্ষে) ঘরটি আমরা ব্যবহার করতে পারব। ভূপতি সমস্তার প্রায় মীমাংসা করে দিলে।

কিন্তু উনি সভাপতি হয়ে করবেন কি? শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করলে। এ ত আর ঠাকুরের নৈবেদ্য নয় যে চালের চূড়োর উপর মণ্ডার বাহার দিতেই হবে!

সভাপতিরা এর বেশী আর কতটুকুই বা! নৈবেদ্যের মর্য্যাদা বাড়াতে যেমন সন্দেশ, সভার মর্য্যাদা বাড়াতে তেমনই সভাপতি। নাও চটপট মিটিং বসিয়ে প্রস্তাবটা পাস করে ফেল এবং ওঁকে এক কপি পাঠিয়ে দাও।

অনেক কাটাকুটি করে একখানি পত্র মুসাবিদা করলে সবাই মিলে। স্থির হ'ল আগে ও-বাড়ীর ছেলেটিকে ডেকে তার কাছে আভাস-ইঙ্গিত দিয়ে ওঁকে চিঠিখানা পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

ভূপতি বললে, চিঠি নিয়ে আমাদের সেক্রেটারির কিন্তু যাওয়া উচিত। প্রভাত না হয়—

প্রভাত বললে, দেখা অবশ্যই করব। সময়টা তুমি জেনে নিও। ওঁরা আর আমরা তো এক নই যে ইচ্ছে করলেই হুট করে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে বলব—ভাল আছেন?

সবাই হাসল।

ভূপতি বললে, যা বলেছিস! ওঁদের সদর দেউড়ি—পুজোর দালান—আমলা গোমস্তার ঘর পেরিয়ে তবে অন্দর-মহল। এত্তেলা পাঠিয়ে সেখানে যাওয়া নিয়ম। কিন্তু ওঁরা এখন হাতীতে খাওয়া কয়েৎবেল রে ভাই—ওপরটাই খাড়া আছে—ভিতের মধ্যে হাজারটা ফাটল।

পরের দিন ভূপতিই খবর নিয়ে এল—কালই চলে যা প্রভাত—আমরাও দুই একজন তোর সঙ্গে যাব।

ও-ছেলেটির সঙ্গে কথা বলেছিস?

হুঁ—ছেলেটিও আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে চায়—তবে বড্ড লাজুক। তুই লিখিস শুনে বললে—ওঁর সামনে কথা কইতে পারব না আমি—আমি যে লিখি কেন জানালেন ওঁদের! ভূপতি হেসে উঠল। দেখ প্রভাত—এখন থেকেই তোকে কত মান্য করে কবি।

প্রভাত বললে, দলে ভারী হয়েই তো আমার বিপদ—তাকে কাটাবার ব্যবস্থাও তাই—

ভূপতি বললে, কবির জ্যেঠামশাই ত্রিলোচন সেনের সত্যিই লেখাপড়ার চর্চ্চা আছে। বাড়ীতে প্রকাণ্ড লাইব্রেরি—অনেক বই দেশ-বিদেশের। তা ছাড়া যে সমাজ কালের সূর্য্য-কিরণে কুয়াসার মত মিলিয়ে যাচ্ছে—তাকে খানিকক্ষণের জন্যও আটকে রাখার চেষ্টা ওঁর আছে। সেটি যদি সাহিত্য-বাসরের মাধ্যমে হয় তো মন্দ কি!

এটা ওঁর কথা—না তোমার অনুমান?

কবির কথার ধরণে তাই বোধ হ'ল।...স্থায়ী সভাপতির আসন দিলে ত্রিলোচন সেন খুশীই হবেন—একথাও কবি বললে।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায়ই ভূপতি ঘরে ঢুকে উল্লাসে চীৎকার করে উঠল, কেল্লা ফতে।

সবাই উৎসুক কণ্ঠে বললে, মানে—?

মানে ত্রিলোচন সেনের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। ওদের গেটের ধারে দাঁড়িয়ে কবির সঙ্গে কথা কইছিলাম—উনি বেড়িয়ে বাড়ী ঢুকছেন। আমায় দেখে কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে শুভব্রত?

কবির নাম বুঝি শুভব্রত?

হাঁ। তার পর আলাপ পরিচয় হ'ল। লোকটি মোটেই অহঙ্কারী নয়—সত্যিই সাহিত্যরসিক। আমাদের সঙ্কল্প শুনে আনন্দ প্রকাশ করলেন। বললেন, আমাদের ছেলেবেলায় এই ধরণের ভাল ভাল কাজ করবার আইডিয়া ছিল মাথায়। দেখছই তো—কাজ বিশেষ এগোয় নি—আমরা আজ অচলায়-তন। বলে হো হো করে সে কি প্রাণখোলা হাসি, ভারি অমায়িক লোক।

জিজ্ঞাসা করলি নে কেন—কেন এগোয় নি কাজ?

নিজেই বললেন সেকথা। কাজটা নাকি সখের মত করে নিয়েছিলেন—সময় কাটাবার জন্য—তাই। যদি সমস্ত মন দিতে পারতেন—তা হলে সংসারের তাড়নায় এদিক ওদিক ছিটকে পড়েও সেটিকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হ'ত। বললেন, যদি সময় কাটাবার জন্য সাহিত্য-চর্চ্চা বা দেশ-সেবা আরম্ভ কর তা হলে সাহিত্য বা দেশ কোনটিই উন্নত হবে না—তোমরাও ফুরিয়ে যাবে।

ও সব তত্ত্বকথা রাখ—সাহিত্য-সভার জন্যে ওঁর বৈঠকখানা পাওয়া যাবে কিনা বল?

'নিশ্চয়'! উনি বললেন, 'আমি যখন তোমাদের সভাপতি হচ্ছি—আমার একটি অনুরোধ তোমাদের রাখতে হবে।'

যথা?

প্রথম যেদিন বৈঠক বসবে—সেদিন উনি একটি প্রবন্ধ পাঠ করবেন।

হু—তার পর?

তার পর—আমাদের প্রোগ্রাম চলবে—খুশীমত। অবশ্য

সেগুলো—সেদিন যিনি পৌরোহিত্য করবেন তাঁর অনুমতি-সাপেক্ষ।

এই ধরণের প্রস্তাব যে হবে তা জানি। অমলেন্দু নীরস কণ্ঠে উত্তর দিলে।

তাতে ক্ষতিটা কি? প্রভাত বললে।

ক্ষতি আর কি? সাহিত্য-সভা আহ্বানের পরিশ্রমটা আমাদের—ফল লাভ আশ্রয়দাতার। অমলেন্দুর কণ্ঠে শ্লেষ।

আমাদের লেখাও আমরা অবশ্য পাঠ করব।

কোন কোন ক্ষেত্রে পঠিত বলে গৃহীত হবে। কোন ক্ষেত্রে বা খানিকটা পাঠের পর ওয়ার্নিং বেল বাজবে।

প্রভাত বললে, এখন থেকেই বিরূপ মন্তব্য করা ঠিক নয়। একটা সভা হোক তো ওখানে—তার পর অসুবিধা বুঝি—

বেশ। শুধু ভবিষ্যদ্বাণী করে রাখলাম। অন্ন ঋণ যেমন মানুষকে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ করে—আর তার ভারে মাথা পড়ে নুয়ে—আশ্রয়-দানের ঋণও তেমনি!…অমলেন্দু ব্যঙ্গভরে হাসল।

সংশয় প্রভাতের মনেও উঠেছে। আশ্রয়-ঋণের দায়ে তাদের মহৎ পরিকল্পনাগুলি নষ্ট হয়ে যাবে না তো?

ভূপতি বললে, যাই হোক প্রভাত—তোর একবার দেখা করা উচিত ওঁর সঙ্গে। আর সেটি যত শীঘ্র হয়—ততই ভাল।

বেশ কাল বিকেলেই দেখা করব।

১১

দেখাটা এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে হবে—প্রভাত ভাবে নি। বিকেলে বেড়িয়ে এসে—মুখ হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে একটু চাঙ্গা হয়ে ওঁরই সঙ্গে দেখা করতে যাবে স্থির করেছিল। সঙ্কল্পমত বাড়ী ঢুকতেই দেখে এক জন স্থূলকায় প্রৌঢ় ওদের বাইরের ঘরে বসে অনন্তর সঙ্গে আলাপ করছেন।

প্রভাতকে দেখে অনন্ত ডাকলেন—এই যে প্রভাত—শোন।

প্রভাত সামনে দাঁড়াতেই উপবিষ্ট ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে বললেন, প্রণাম কর এঁকে।

হাত উঁচিয়ে প্রণাম করবে—না পায়ের ধুলো নেবে—এক মুহূর্ত্ত ভেবে প্রভাত অবনত হ'ল। আগন্তুক অবশ্য ওকে পায়ে হাত দেবার সুযোগ দিলেন না—টপ করে ওর একখানা হাত ধরে বললেন, থাক বাবা, থাক। এমনিতেই আশীর্ব্বাদ করছি—

অনন্ত বললেন, চেন এঁকে?

প্রভাতের ভঙ্গীতে পরিচিতির স্বীকৃতি ফুটল না।

অনন্ত বললেন, তোমরা আজকালকার ছেলেরা কি-ই বা জানো! অনেক দূরদূরান্তরের খবর তোমরা রাখ কিন্তু কাছের মানুষকে চেন না। এই গলিটা যাঁর নামে তিনি ছিলেন ওঁর পিতামহ, প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি।

প্রভাত বুঝল ইনিই ত্রিলোচন সেন। সে ভাল করে তাঁর দিকে চাইলে। হাঁ—পূর্ব্বপুরুষের খ্যাতির চিহ্ন এর চেহারাতেও কিছু লেগে রয়েছে বটে! বিশাল বপু—উদরের পরিধিতে, বাহুমূলের মাংসস্তূপে আর ধবধবে গৌরবর্ণের উজ্জ্বলতায় অতীত গৌরব স্মরণ করিয়ে দেয়। চক্ষু আয়ত, কিন্তু কেমন যেন অবসাদভরা। যে দৃষ্টিপ্রদীপে জীবন-দেবতার আরতি হয় তার মত অনাবিল শুভ্রতায় শুচিস্মিত নয়। পরিচ্ছদে শুভ্রতা আছে শুধু তা শান্তশ্রীমণ্ডিত নয়। মর্য্যাদা প্রচার করার মালিন্য ওঁর বেশবাসে—ওঁর অঙ্গভঙ্গীতে।

ত্রিলোচন সেন বললেন, বসো বাবা।

স্বরটা আদেশব্যঞ্জক; বয়োজ্যেষ্ঠের কাছে স্নেহের সম্বোধনই আশা করা স্বাভাবিক—প্রভাতের কিন্তু মনে হ'ল ওঁর অন্তরঙ্গ সম্বোধনে এতটুকু আন্তরিকতার ছাপ নেই। বসবার জায়গা ছিল না—ও দাঁড়িয়েই রইল।

ত্রিলোচন সেন বললেন, শুনলাম এবার পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাস নেবে। তারপর কোন্ লাইন ধরবে?

প্রভাত বললে, আপাততঃ কিছু ঠিক করি নি।

সে কি—একটা কিছু ঠিক না করেই পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছ! চাকরিই যদি ইচ্ছা হয়—

না—চাকরি করব না। প্রভাত দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল।

অনন্ত বললেন, ছেলে আমার একটু ইনডিপেণ্ডেণ্ট স্পিরিটের। বলে চাকরির হ্যাংলামি সইতে পারব না। বলে তিনি ঈষৎ শব্দ করে হাসলেন।

ত্রিলোচন সেন বললেন, তা হোক, চাকরি করাটাই সব কালের সব চেয়ে সেরা জিনিস নয়। ওতে সংসার কোন রকমে চলে কিন্তু উন্নতি হয় না।

মন্তব্যটি প্রভাতের মন্দ লাগল না—কৌতূহলভরে ও চেয়ে রইল।

ত্রিলোচন বললেন, ঠাকুরদা এত নামখ্যাতি কিনে গেছেন চাকরি করে নয়—অবশ্য এক সময়ে কোম্পানীর মুচ্ছুদ্দিগিরি করেছিলেন, কিন্তু ওদের সংস্পর্শে এসেই স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রবৃত্তি ওঁর জাগে। আর তার ফলেই…অসমাপ্ত কথার শেষে তিনি হাসলেন।

খানিক চুপ করে থেকে বললেন, বাবাও সেই পথ ধরে চলছিলেন, কাকাদের মত হ'ল অন্য। ভিন্ন মতের চাপে পড়ে ব্যবসা গুটোতে হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীও গেলেন ছেড়ে। তার পর মামলা-মোকদ্দমা—নীচের আদালত থেকে হাইকোর্ট, তা থেকে প্রিভি কাউন্সিল—আপীস হানি ডিগ্রী—চার মহলা বাড়ীটা ছত্রিশ খণ্ড হয়ে গেল—জমিদারী তালুক-মুলুক, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দেখতে দেখতে কর্পূরের মত উবে গেল। আজ সে সব ঐশ্বর্য্য-খ্যাতিকে মনে হয় স্বপ্ন!…দীর্ঘ-নিশ্বাসের দোলায় তাঁর প্রকাণ্ড শরীরটা আন্দোলিত হয়ে উঠল।

অনন্ত বললেন, তবু মরা হাতী লাখ টাকা। এই গলিটা আর বাড়ীটা আর পশ্চিমের জমিজমা—

না না, কিছুই নেই, তাঁদের চরণের ধূলির একটি কণাও নেই। দেখেছেন ত বিরাট আস্তাবলটা পড়ে আছে—পাঁচখানা ব্রুহাম আর চারখানা ছিল ফিটন—ওয়েলার জুড়ি তাও ছিল একখানা। আটাশটা ঘোড়ার দলাই-মলাইয়ের শব্দে পাড়াটা উঠত কেঁপে। আজ 'নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা'! বলে হা-হা করে হেসে উঠলেন তিনি। ঠিক কোভ-সম্ভ্রান্ত হাসি নয়,—অতীত গৌরবের গর্ব্বও সে সুরে মেশানো।

প্রভাতের ভাল লাগল না এ সব আলোচনা। যাবার জন্ত দু' পা অগ্রসর হতেই ত্রিলোচন সেন বললেন, জানি তোমাদের সময় কম—এ সব গালগল্প ভালও লাগে না তোমাদের। তবু আমাদের একটা ধর্ম্ম আছে মানো ত?

প্রভাত তাঁর দিকে বিস্ময়পূর্ণ চোখে চেয়ে রয়েছে দেখে তিনি উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলেন, ধর্ম্মটা হচ্ছে বকা। তোমাদের কাল নিয়ে তোমরা যেমন বড়াই কর আমাদের কাল আমাদের পক্ষে তেমনই গৌরবের। যাক্‌ সেকথা—এখন হঠাৎ তোমার কাছে এলাম কেন জান? তোমরা যে পত্র দিয়েছ—

প্রভাত লজ্জিত কণ্ঠে বললে—আমারই উচিত ছিল—আপনার কাছে যাওয়া—

কেন—আমাকে প্রেসিডেণ্ট করেছ বলে! দেহের গুরুত্বের সঙ্গে পদের গুরুত্ব যোগ করলে—মানুষ বুঝি পর্ব্বতেরই সমগোত্র হয়? বলে হো হো করে হাসলেন।

অনন্ত সম্ভ্রমযুক্ত বিস্ময়ে চুপ করেই রইলেন। ত্রিলোচন সেনের সহসা আবির্ভাবের হেতুটা তাঁর কাছে স্পষ্ট হ'ল না। সৌজন্যের খাতিরে নিঃশব্দে একটু হাসলেন শুধু।

ত্রিলোচন সেন বললেন, শুনলাম তোমরা একটি সমিতি করেছ—এই সাহিত্য-সভা তারই একটি শাখামাত্র। তা সত্য বলতে কি মানুষের কল্যাণ থেকে দেশের মঙ্গল যাই বল—সবকিছুর প্রেরণা আসে সাহিত্য থেকে। কে একজন যেন ভাল বলেছেন—আমাদের মনের যে সব কামনা বাস্তব জগতে পূর্ণ করবার সুযোগ সুবিধা হয় না—তা সাহিত্য-সৃষ্টির মারফতে মিটিয়ে নিতে চেষ্টা করি আমরা।

অনন্ত ও প্রভাত দু'জনকেই নির্ব্বাক দেখে তিনি হয় ত স্থান কাল পাত্র সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন। বললেন, ওই দেখ—আবার বাজে বকছি। যা বলতে এলাম—তা গোলমাল করে ফেলছি। তবু আমাদের বংশ-পরিচয় একটু দিয়ে রাখি। তুমি বোধ করি জান না—লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর আরাধনা করা আমাদের বংশগত পাগলামি। ঠাকুরমা—চোদ্দ অক্ষর মিলিয়ে বিয়ের পত্ত থেকে ঠাকুরের স্তোত্র সবই লিখেছেন—মা শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছেন অজস্র। বাবা মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দে একটা নাটক লিখেছিলেন—ঊষা-হরণ। সেটা তখনকার দিনে ভাল অভিনয় বলে লোকের প্রশংসা পেয়েছে। নিজে তিনি অনিরুদ্ধের পার্ট করতেন। আমি অবশ্য এ সব কোন গুণেরই অধিকারী নই। কেবল মোটা মোটা খাতা ভরিয়েছি আবোল তাবোল লিখে—সেগুলো তুলে রেখেছি আলমারিতে। পোকা আর উইয়ে মিলে তার যথারীতি সদ্ব্যবহার করেছে। তাই সিপ্রা প্রায়ই বলে—বাবা—এ বাড়ীর কীটপতঙ্গ থেকে সবাই বিদ্বান বলেই কিছু লিখতে ভরসা হয় না—কিছু লিখে মনে মনে পস্তাতেও সাহসে কুলোয় না। বলে উচ্চ হাস্ত করে উঠলেন।

পরমুহূর্তে হাসি থামিয়ে বললেন—মেয়েটা যাই বলুক—বাংলা সাহিত্যের অনেক খবর ও রাখে। ওই তো বললে, বাবা—আমাদের বাড়ীর কাছেই একজন ভাল গল্প লিখিয়ে আছেন—তার খবর তো তুমি রাখ না।

প্রভাত বিব্রত ভাবে বললে, কি যে বলেন! আমি তো সাহিত্যের কিছু—

ও আবিষ্কার আমার নয়—সিপ্রার। সে নাকি কোন কোন কাগজে তোমার নাম দেখেছে। তা ছাড়া তোমাদের সমিতির সব খবর সে রাখে। ওই যে সভাপতি-নির্ব্বাচন-পত্র —ওইটি দেখেই তো বললে, বাবা—এ নিশ্চয়ই সেই প্রভাত-বাবুর কাজ—যিনি লেখেন।

অনন্ত বিস্মিত হয়ে বললেন, কৈ—এ খবর তো আমরা জানি না?

আমাদের জানবার কথাও নয়। ত্রিলোচন সেন জবাব দিলেন। আমাদের সময়ে মাইকেল বঙ্কিম গতায়ু—রবীন্দ্র-নাথ উঠেছেন বটে—সে আমাদের শেয়ার মার্কেটে বা আপনাদের সদাগরী দপ্তরের দলিলে নয়। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর কিছু দিন হৈ চৈ হ'ল, তবু কৃত্তিবাসী রামায়ণ আর কাশীদাসী মহাভারতের গণ্ডী পেরুতে কৌতূহল হয় নি। তাই কি বই দুখানা টেনে নিয়ে কোন দিন পড়েছি ভাল করে? নেহাত ঠাকুরবাড়ীর নাটমন্দিরে বৈশাখ কার্ত্তিক আর মাঘ মাসে কথকতার আসর বসত তাই।

প্রভাত ইতস্ততঃ করে বললে, কবে আপনার সুবিধে হবে জানতে পারলে—

সুবিধে! হো হো করে প্রাণখোলা হাসি হাসলেন তিনি। বললেন, সুবিধে আমার সব দিনই—আবার কোন দিনই হয় ত হবে না। তোমাদের প্রয়োজনটা কবে—তাই বল। কাল? পরশু?

এক সপ্তাহ পরে হলেই—

আরে তার চেয়ে এক কাজ কর—মাসখানেক পিছিয়ে দাও। না—মাসখানেক পিছিয়ে দিলে—উৎসাহে ভাটা পড়বে?

না—তা কেন। সপ্রতিভ ভাবে প্রভাত বললে। কিন্তু মাসখানেক পিছিয়ে দিলে কি সুবিধে হবে?

সুবিধে—আর মাসখানেক বাদেই তো আমরা স্বাধীন হয়ে যাব—। নতুন ভারতবর্ষে নতুন করে পত্তন করব সাহিত্যের আসর। সেই ভাল হবে না? আপনি কি বলেন অনন্তবাবু?

অনন্ত মূঢ়ের মত হাসলেন, হাঁ—সেই তো ভাল।

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন ত্রিলোচন সেন। বললেন, সেই দিন আমার প্রবন্ধটি পাঠ করব। ওটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নিয়ে লেখা কিনা। দু'শ বছরের বিদেশী শাসন কি ভাবে কায়েম হয়েছে সারা দেশে—আর কি ভাবে আমরা চেষ্টা করেছি সেই শিকল ভাঙবার জন্য—তারই ধারাবাহিক বিবরণ দিতে চেষ্টা করেছি। জিনিসটা যতটা নিরেস ভাবছ তা নয়। আচ্ছা তা হলে উঠি—ঐ কথা রইল কেমন? আপনিও যাবেন—কেমন? অনন্তকে নমস্কার করে অনুরোধ করলেন।

অনন্ত হাসি মেশানো মুখে অস্তি কিংবা নেতি বাচক ঘাড় নাড়লেন, কে জানে?

ত্রিলোচন চলে অনন্ত স্বাভস্থ হলেন। বললেন, দেখ প্রভাত, একটা কথা জেনে রাখবে। সাহিত্যচর্চ্চা ভাল কিন্তু সংসারটাকেও ভুললে চলবে না। আমরা যাই ভাবি আর যাই করি—এই মাটিতে পা রেখেই আমাদের চলতে হবে।

সব কথা প্রভাতের কানে গেল না। ও ভাবছিল, ওর এই গোপন-সাধনার কথা বাইরে ছড়িয়ে পড়ল কি করে? কাগজে লিখে ও ত কোনদিন নিজের দু-একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া বাইরের কাউকে সেকথা বলে নি। বাইরের লোককে জানানোর যে বাহাদুরি নেবার চেষ্টা তা ওকে পীড়া দেয়। আত্মপ্রচার ওর কাছে আত্মপীড়নের নামান্তর। বন্ধু ছাড়া একজন—হাঁ একজন মাত্র জানে ওর এই গোপনে সাহিত্য-চর্চ্চার কাহিনী। একজনকেও না শোনালে সৃষ্টির আনন্দ আস্বাদ করা যায় না ঠিকমত, তাই এমন একজনকে বেছে নিয়েছিল, কবিতার রস আর খাদ্যপানীয়ের রস যার কাছে সমান। সেই নিরীহ প্রাণীটি কি ও-বাড়ীর বিরাট প্রাচীরের ওপিঠে পৌঁছে দিয়েছে এই সংবাদটি?

লক্ষ্মী, লক্ষ্মী!

প্রভাতের ডাকে লক্ষ্মী ছুটে এল। কিছু বলছ দাদা?

প্রভাত উত্তেজনার মুখে যা বলবে মনস্থ করেছিল তা আর প্রকাশ করলে না। মুখে হাসি ফুটিয়ে বললে, ওরে আজ একটা ভারি মজা হয়েছে। আমার সেই কবিতার খাতাটা সেনদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। সেই যে রে—যেটা তুই সেদিন—

অনুযোগের গতি লক্ষ্য করে লক্ষ্মী সতর্ক হ'ল। বললে, বা: রে, তোমার কবিতার খাতাটা আমি কবে আবার—

তুই ত সেদিন বললি ও-বাড়ীর সিপ্রা না উজ্জয়িনী না মহাকালী নাম্নী কোন মেয়েকে—

লক্ষ্মী খিল খিল করে হেসে উঠল। বললে, তোমার চালাকি বুঝি! কিন্তু কি এমন অন্যায় কাজটা করেছি বল ত? তোমার নাম নিয়ে পাঁচ জনে যদি সুখ্যাত করে তাতে আমাদের কতখানি আনন্দ তা জান?

জানি। তার ফলে মাঝে মাঝে মুখ বদলানোর ব্যাপারটি পরিপাটিরূপে হয়।

লক্ষ্মী ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, আমি হ্যাংলা নই।

আরে রাগিস কেন—আজ সত্যিই যে সিপ্রা না উজ্জয়িনীর বাবা এসেছিলেন নিমন্ত্রণ করতে ওদের কথামত। সাহিত্য-সভা।

লক্ষ্মী বিস্ময়ে ক্ষণকাল চেয়ে রইল প্রভাতের দিকে। একটু পরে বললে, উজ্জয়িনী তো শ্বশুরবাড়ী—সে কেমন করে আসবে?

কেন—শ্বশুরবাড়ী থেকে মানুষ কি বাপের বাড়ী আসে না?

আসে—কিন্তু ওদের রীতি আলাদা। বিয়ে হয়ে একবার যে মেয়ে স্বামীর ঘর করতে যায়- স্বামী বর্ত্তমানে বাপের বাড়ীতে ফিরে আসা তাদের রীতি নয়।

ও সেকালের রাজামহারাজার গল্প।

না গো মশাই—না। সেকালের মহারাজরা ত কন্যাকে বিয়ে করে নিয়ে যেতেন আর পাঠাতেন না, কিন্তু এরাই আনেন না মেয়েকে।

অদ্ভুত প্রথা। প্রভাত বললে, সত্যিই প্রথাটা বিচিত্র। অপত্য-স্নেহ বলে যে একটি পদার্থ আছে—

লক্ষ্মী গম্ভীর হয়ে বললে, তুমি হয়ত কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেবে, কিন্তু শুনেছি ওঁদের বাড়ীর কোন্ মেয়ে নাকি অষ্টবর্দ্ধনে এসে আর শ্বশুরবাড়ী ফিরে যায় নি, সেই থেকে এই প্রথা চলছে।

মেয়েটি মারা গিয়েছিল?

তা জানি না। মারা না গেলেও এমন ঘটনা ঘটে—সঙ্কোচে লক্ষ্মী কথাটা শেষ করলে না।

প্রভাত ব্যাপারটি অনুমানে ধরতে চেষ্টা করলে। বনিয়াদি বংশের মর্য্যাদাহানিকর এমন কিছু ব্যাপার হয়ত—হয়ত বা নিষিদ্ধ ভালবাসার ব্যাপার। কাহিনী যাই হোক অতঃপর প্রথার শাসনে জিনিসটাকে মর্য্যাদার পর্য্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে। আশ্চর্য্য বটে!

পথের দিকের জানালাটা খুলে দিলে। বিদায়ী সূর্য্য আলোক-মার্জ্জনায় নোনাধরা দেয়াল পরিষ্কার করে

তুলছেন। কিন্তু তাঁর করুণার দানে ঘরের অন্ধকার ঘুচলেও মনের সৌন্দর্য্যবোধ রূঢ় আঘাতে জর্জ্জরিত হচ্ছে।

গলির একটু দূরে তেতলা ঘরের আধ-খোলা জানালার গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে আছে যে তরুণীটি সে কি বিদায়ী সূর্য্যের আলো-রেখা অনুসরণ করে এ ঘরের একমাত্র বাতায়নের রন্ধ্রপথে সমগ্র ঘরখানির চরম দুর্দ্দশা দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠছে না ?

প্রভাত জানালাটা বন্ধ করে দিল।

একটু পরে মা এসে দুয়ারে মৃদু আঘাত করলেন। প্রভাত —প্রভাত একবার দুয়োর খুলবি বাবা।

দুয়ার খুলে প্রভাত বললে, কিছু আনতে হবে ত ?

ছেলের স্বরে বিরক্তি লক্ষ্য করে মা অপ্রতিভ হলেন। বললেন, কি করি বল—ওঁর এই একটা দিন বিশ্রাম—

দাও। মায়ের হাত থেকে বাটি নিয়ে বললে, কেন যে অল্প অল্প করে জিনিস আনাও বুঝি না। একেবারে কিছু বেশী করে আনালেই ত হয়।

মা অত্যন্ত কুণ্ঠিত স্বরে বললেন, সংসারের আয়ব্যয় কিছু কিছু জানিস ত বাবা, একসঙ্গে আনার পয়সা—

প্রভাত ম্লান হেসে বললে, জানি। কিন্তু সেই একই পয়সা খরচ হয়।

মা বললেন, উনি বলেন—জিনিস ঘরে থাকলে বেশী খরচ হয়।

হুঁ—তোমাকেও বাবা বিশ্বাস করেন না।

ছেলের মন্তব্যে মা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হলেন। তাড়াতাড়ি সে লজ্জা ঢাকবার জন্ত বললেন, ঠিক তা নয়—আমিও দেখেছি সত্যিই খরচ বেশী হয়। জিনিসের সচ্ছল হলে মনে হয় রান্নাটা একটু ভাল ভাবেই হোক।

ও তা হলে মনে ইচ্ছা থাকলেও আমাদের ভাল করে রেঁধে খাওয়াতে পার না ?

মা বললেন, তুই কথাকাটাকাটি না করে তেলটা নিয়ে আয়। ডালে সম্বরা দিতে হবে।

এত সকালে আজ রান্না সারছ ?

উনি বললেন—ওবেলা তোমাদের বেড়াতে নিয়ে যাব। অনেকদিন কোথাও বেরুই নি ত!

প্রভাত দ্বিরুক্তি না করে বার হয়ে গেল। ওর স্বপ্নে বেসুরের আঘাত করে এই প্রাত্যহিক ছোটখাটো ঘটনাগুলি। মানুষ ইচ্ছা করেই কি সৃষ্টি করে অভাব ? কিংবা অভাবের বেড়ি গলায় পরিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র চলছে আদি কাল থেকে। পৃথিবীতে প্রকৃতিজাত সম্পদকে বিভাগ করলে কারা ? দেহের শক্তি অনুযায়ী কেউ দখল করলে বেশী—মস্তিষ্কের চালনায় কেউ বা বঞ্চনার জাল বিস্তার করলে। কেউ উঠল উপরে —কেউ নামল নীচে—কেউ কেউ বা তলিয়ে গেল আরও নীচে—রসাতলে। এক কালে ছিল—যার লাঠি তার মাটি। আজ সে লাঠি ভেঙ্গে গেছে—আজ কলকাঠির উপর চলছে দুনিয়ার ঐশ্বর্য্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। এরই মধ্যে আমরা পেয়ে যাব স্বাধীনতা। দুনিয়ার কলা-কৌশলে কোথায় সম্পত্তি-সঞ্চয়ের ক্লেদ জমছে—এ নিশ্চয় অতঃপর আমরা বুঝতে পারব।

প্রভাত আপন মনে হেসে বললে, বুঝতে পারব কি ?

ক্রমশঃ

শ্রাবণ-সন্ধ্যায়

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কাজল মেঘেতে ছাওয়া শ্রাবণ-অম্বর,
ঝরঝর ঝরঝর বারিধারা ঝরে,
গুরুগুরু ডাকে দেয়া, দিগ্ দিগন্তর
কে যেন ছিঁড়িয়া ফেলে বিদ্যুৎ নখরে
দিক্‌চক্রবালে নীল বনের রেখাটি
বৃষ্টির ধারায় গেল দৃষ্টির বাহিরে,
পিচ্ছিল পল্লীর পথে সন্তর্পণে হাঁটি
সিক্তবস্ত্রে পান্থ চলে আপন কুটিরে।

সজল সমীরে দোলে বেণুবনশাখা,
গ্রামের গোধন ফিরে চলেছে গোহালে,
কুলায়ে ফিরিছে পাখী—আর্দ্র দুটি পাখা,
বোবা মন কেঁদে ওঠে আজি সন্ধ্যাকালে।
বর্ষণমুখর এই শ্রাবণ-সন্ধ্যায়
কারে চেয়ে শূন্য হিয়া করে 'হায়! হায়'!

ঝুটী বনাও বতিয়াঁ

স্বরলিপি—শ্রীওঁকারনাথ চট্টোপাধ্যায়

(অস্থায়ী)

চলো কাহেকো ঝুটী বনাও বতিয়াঁ, বহি যাঁও জাঁহা রহে সারি রতিয়াঁ

(শের্) এ অবশ্ কয়্তে হো মৌকা ন থা ঔর ঘাত ন থি।

মেহেদী পাঁও মে ন থি, আপ্‌কে বারসাৎ ন থি

কাজ আদাইকে সিবা, ঔর কোই বাত ন থি।

দিন্ কো আ সকতে ন থে আপ্‌তো, কেয়া রাত ন থি ?

বস্ এহি কহিয়ে কি মঞ্জুর মুলাকাৎ ন থি।

বহি যাঁও জাঁহা রহে আরে তুম রতিয়াঁ চলো কাহেকো ঝুটী বনাও ॥*

(ভৈরবী—দাদ্‌রা)

\+ 0 + 0 + 0
। পা । | দা । মা | পা । । | । পা মপা | পা মপা দা | পা মা জ্ঞা |
০ হাঁ ০ ০ ০ ব না ০ ও ০ ব তি য়াঁ ০ ০ চ লো ০

\+ 0 + 0 + 0
মজ্ঞা মা জ্ঞা | জ্ঞম পা মা | জ্ঞঋা । সা | । । । | । পা পা | পা দা ।
কা ০ ০ হে ০ ০ কো ঝু ০ টী ০ ০ ০ ০ আ রে ব তি য়াঁ

\+ 0 + 0 + 0 +
। পা পা | পা দা । | । পা দা | পদা না দা | পা । । | । । । | দা দা দা
০ আ রে ব তি য়াঁ ০ ব তি য়াঁ০ ০ হাঁ রে ০ ০ ০ ০ ০ ব তি য়াঁ

0 + 0 + 0
। পদা পদা | পদন নদ পম | পা । পদ | পদ নর্স । | । না র্সা
০ য়াঁ০ ০০ ০০০ ০০ ০০ আঁ ০ বতি য়াঁ০ ০০ ০ ০ ব তি

\+ 0 + 0 + 0
না র্সা নদা | পা । পা | মপা । । | । পা পা | পা দা । | পা মা জ্ঞা
য়াঁ ০ রে ০ ০ ব না ০ ০ ও ব তি য়াঁ ০ ০ চ লো ০

\+ 0 + 0 + 0
মজ্ঞা মা জ্ঞা | জ্ঞম পা মা | জ্ঞঋা । সা | । । । | । । পা | দা র্সা না
কা ০ ০ হে ০ ০ কো ঝু ০ টী ০ ০ ০ ০ ০ আ রে ব হি

---

* পরলোকগত ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের ভৈরবী দাদ্‌রার ইহা একটি প্রসিদ্ধ লোকপ্রিয় গান এবং কলিকাতা নিখিল ভারত সঙ্গীত-সম্মেলনে ইহাই তাঁহার শেষ গান।

\+ 0 + 0 + 0 +
র্সা া া | র্সা া া | র্সন র্সা া | া র্সা ঋ´ | ঋ´ ঋ´ ঋ´ | র্সা র্সদা া | দা র্সা া
জাঁ ০ ০ ০ ০ ০ আঁ০ ও ০ ০ ব হি জাঁ ০ ০ ০ আঁও ০ জাঁ ০ ০

0 + 0 + 0 +
া র্সা ঋা | জ্ঋ´ া র্সা | া া া | া র্সা ঋ´ | না র্সা নর্সঋা | র্সদা া র্সা
ও ব হি জাঁ ০ বো ০ ০ ০ ০ ব হি জাঁ ০ ০০০ ও০ ০ ০

0 + 0 + 0 + 0
র্সা া র্স´ | া া ঋ´ | নর্সা া া | দা পা া | দা র্সা না | র্সা া া | া া নর্সা
জাঁ ০ বো ০ ০ জাঁ হাঁ ০ ০ র হে ০ জাঁ ০ ০ বো ০ ০ ০ ০ বহি

\+ 0 + 0 + 0
র্সা া া | া া া | নর্সঋ´ র্সঋ´ র্সা | নর্স´ নর্স´ নদপ | া া পা | পদ না না
জাঁ ০ ০ ০ ০ ০ জাঁ০০ ০০ ০ ০০ ০০ ০০০ ০ ০ হাঁ রে০ ০ ব

\+ 0 + 0 + 0
র্সা া া | নর্স´ ঋ´ র্সা | া া া | া া না | র্সা া া | া া া
হি ০ ০ জাঁ০ ০ বো ০ ০ ০ ০ ০ ব হি ০ ০ ০ ০

\+ 0 + 0
ঋ´ঋ´ র্সন দপ | মপ দন র্সঋা | নর্স´ নর্সঋা া | র্সা া া
জাঁ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০০ ০ বো ০ ০

\+ 0 + 0 + 0
না র্সা র্সা | া র্সা ঋা | নসঋা র্সঋা র্সা | নর্সা নর্সা নদপা | া পা মপা | া পা পা
ব হি জাঁ ০ বো জাঁ হাঁ০০ ০০ ০ ০০ ০০ ০০০ ০ জাঁ হা ০ র হে

\+ 0 + 0 + 0
মজ্ঞা পা পা | মপা পা মপা | পা দা দা | পা মা জ্ঞা | মজ্ঞা মা জ্ঞা | জ্ঞমা পা মা
আ রে তু ম র তি য়াঁ ০ ০ চ লো ০ কা ০ ০ হে০ ০ কো

\+ 0 + 0 + 0
জ্ঋ া সা || া া পদা | র্সা া া | া া া | া জ্ঞা া | র্ঋর্মজ্ঞা া া
ঝু ০ টী ০ ০ বহিঁ জাঁ ০ ০ ০ ০ ০ ০ তে ০ হেঁ ০ ০

\+ 0 + 0 + 0
জ্ঞা র্রা র্সা | া া র্সা | জ্ঞা া া | জ্ঞা জ্ঞা া | জ্ঞা া জ্ঞা | জ্ঞা র্রা র্সা
এ ০ ০ ০ ০ উস্ জৈ এ ০ ও বস্ ০ কয়্ ০ তে হো ০ মৌ

\+ 0 + 0 + 0
র্সা া া | র্সা র্সা া | নর্স´ ঋ´ র্সা | র্সা র্সদা া | নর্সা নর্সা নদপা | া া া
কা ০ ন থা ঔর ০ ঘা০ আৎ ন থি ০ ০ আআ ০০ ০০০ ০ ০ ০

+ 0 + 0 + 0
। । দা | দা দা । | দা । দা | দা দা । | দা । পদা | । পা দা |
০ ০ মে হ দী ০ পাঁ ও মে ন থি ০ আ আপ্ কে ০ ব ম্ন

+ 0 + 0 + 0
পদা না দা | পা । । | । পা দা | না র্সা র্সা | । । । | র্সা । র্সা |
সা০ ৎ ন থি ০ ০ ০ আ রে ক জ দা ০ ০ ০ ই ০ কে

+ 0 + 0 +
র্সা র্সা । | র্সা । র্সা | র্ঋ র্নর্সা । | । নর্সর্ঋা সর্ঋর্সা | নর্সা মর্সা ঃদঃ |
সি বা ০ ঔ ০ র কো ই ০ ০ বা০০ ০০০ ০০ ০ৎ ০ন

0 + 0 + 0 + 0
পা । পদা | সা দা । | । । । | দা । । | দা । । | দা । দা | দা । । |
থি ০ আরে হাঁ ০ ০ ০ ০ ০ দিন্ ০ কো আ ০ ০ সক্ ০ তে ন থে ০

+ 0 + 0 +
পা মপা পা | । পা দা | পমা পা মপদা | দা পা । | । । পদা |
আ আপ্ তো ০ কেয়া ০ রা ০ ০০ৎ ন থি ০ ০ ০ আরে

0 + 0
নর্সা র্সর্সা । | র্সা র্সর্সা । | র্সর্সা র্সা র্সা |
বহি জাঁও ০ বস্ এহি ০ কহি এ০ কে

+ 0 + 0
র্সা । । | র্সর্সা । । | ঃর্ঋঃ র্ঋর্স নদপমা | মপা দনা র্সর্ঋর্জ্ঞা |
মন্ জু উর মুলা ০ ০ কা ০০ ০০০০ ০০ ০০ ০০০

+ 0 + 0 + 0
র্সর্ঋা নর্সা নর্সর্ঋা | ঃর্সঃ দা পা | । । পা | দা র্সা না | র্সা । । | র্সা । র্ঋ
আআ আআ আ ৎ ন থি ০ ০ ০ আ রে ব হি জাঁ ০ ০ বো ০ জাঁ

+ 0 + 0 + 0
না র্সা । | দা পা দা | র্সা । । | । । । | দনা সর্জ্ঞা র্ঋনা | র্সা
হাঁ ০ ০ র হে ০ জাঁ ০ ০ বো ০ ০ আআ ০০ ০০ আ

(তান-সমূহ)

+ 0 + 0 +
নর্সা র্ঋর্সা দপা | মপা দনা র্সর্ঋা | র্সনা দপা মজ্ঞা | জ্ঞমা পদা নর্সা | নদা পমা জ্ঞঋা |
আআ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

0 + 0
সা । পদা | র্সা । । | র্সা । । |
আ ০ বহি জাঁ ০ ০ বো ০ ০

\+ 0 + 0 +
নর্সা ঋর্সা নদা | পা । । | পদা নর্সা নর্সা | নর্সা নদা পপা | দনা র্সনা দপা |
আআ ০০ ০০ আ ০ ০ আআ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

0 + 0 + 0
মপা দনা র্সর্সা | নদা মপা দনা | মপা দনা, মপা | দনা, মপা দনা | মপা দনা দপা |
০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

\+ 0 + 0 + 0 +
দদা পমা জ্ঞঋা | সা । পদা | র্সা । । | । । । | । দদা র্সা | দদা র্সা দদা | র্সা । । |
০০ ০০ ০০ আ ০ বহিঁ জাঁ ০ ০ ০ ০ ০ ০ বহিঁ জাঁ বহিঁ জাঁ, বহিঁ জাঁ ০ ০

(তেহাইযুক্ত বোলতান)

0 + 0 + 0 +
। । ঋা | না র্সা না | দা পা । | পা মপা পা | পা পা পা | পা দা । |
বো ০ জাঁ হাঁ ০ ০ র হে ০ ঔ র তু ম র তি যাঁ ০ ০

0 + 0 + 0
পা মা জ্ঞা | মজ্ঞা মা জ্ঞা | জ্ঞমা পা মা | জ্ঞঋ । সা | । । সা |
চ লো ০ কা ০ ০ হে ০ ০ কো ঝু ০ টী ০ ০ ব

\+ 0 + 0
পা । । | । । । | । । । | । । । ||
না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

কেন হাহাকার ধ্বনি নিখিলের

শ্রীমহাদেব রায়

খর নিদাঘের দিবা অবসানে
কুহু কেকারবে মানে পরাজয়,
মেঘ বরাসনে তব অভিযানে
চির মিলনের নব অভিনয়।

শুনি ধ্বনি ও তোমার চরণের
যত ব্যথাতুর ভুলে তনু-মন,
হেরি দ্রুত লয় শুভাগমনের
কাঁপে আশা-ভরা হিয়া ঘনে-ঘন

কত অতীত দিনে সুখ-সাধ
হিয়া মথি উঠে স্মৃতি-যাতনায়
কত শত মিলনের মধু-স্বাদ
জাগে বেদনা-মিশানো বাসনায়।

নব মাধুরী-মাখানো নীলাকাশ
রচে বিভীষিকা ঘন-আঁধারে,
আজি আলোকে-আঁধারে আশা-ত্রাস
জাগে প্রিয়ার মানস অভিসারে।

চির দীনতার ব্যথা-যাতনায়
চির বিরহীর প্রেম-পুণ্যে,
আজ সুধা মিটাইতে পিপাসায়
চির পূর্ণ তুমি কারুণ্যে।

চির অকৃপণ দান-মহিমায়
দাও ভরি সারা হিয়া অখিলের,
তবু চির বিরহের বেদনায়
কেন হাহাকার ধ্বনি নিখিলের?

চীনা কম্যুনিষ্টদের উপর বোমাবর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে একটি এফ-৮০ "শুটিং ষ্টার" মার্কিন জেট বিমানের যাত্রা

আমেরিকার ফোর্ট ওয়ার্থে এসেম্ব্লি লাইনের উপর বি-৩৬ অতিকায় বোমারু বিমান
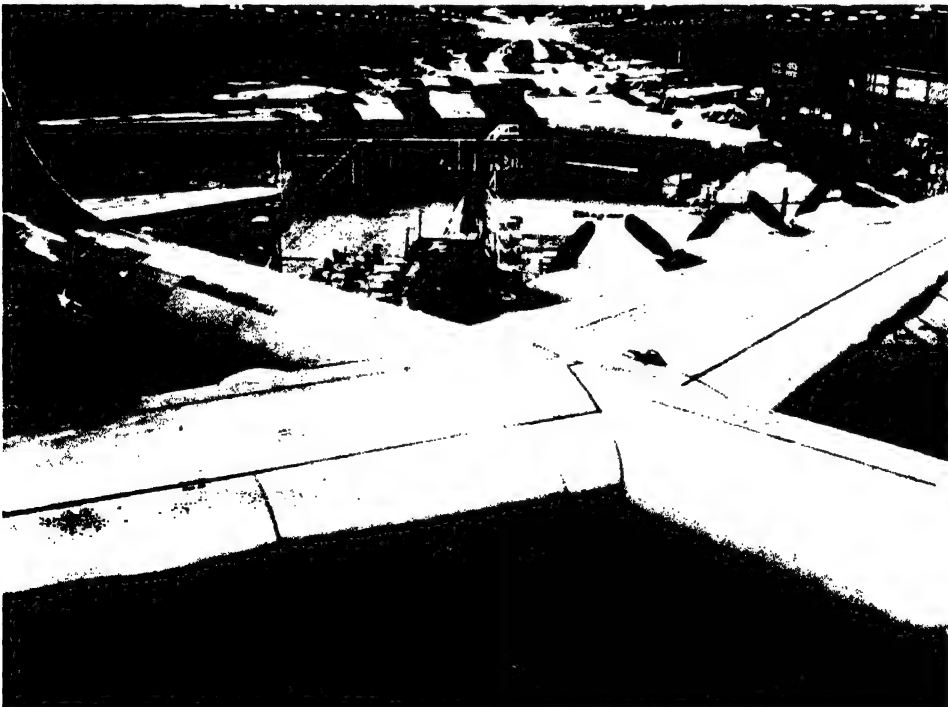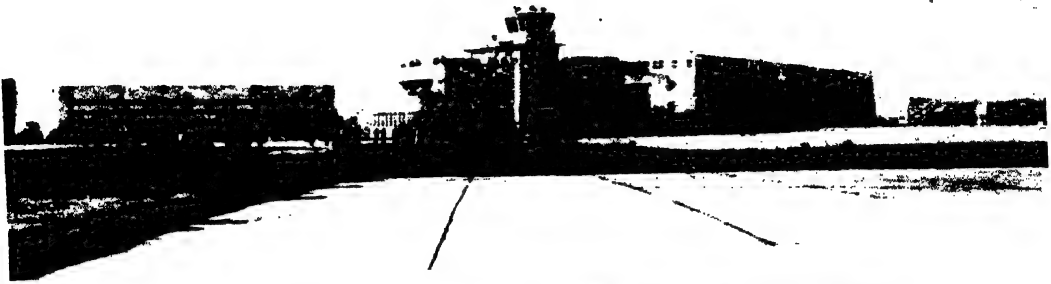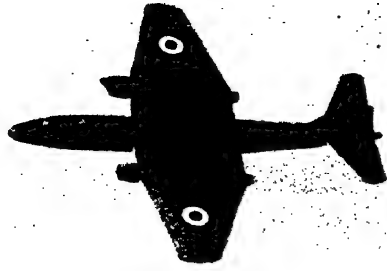
আমেরিকার বাল্টিমোরে উড্ডীয়মান একটি ব্রিটিশ জেট বোমারু বিমান
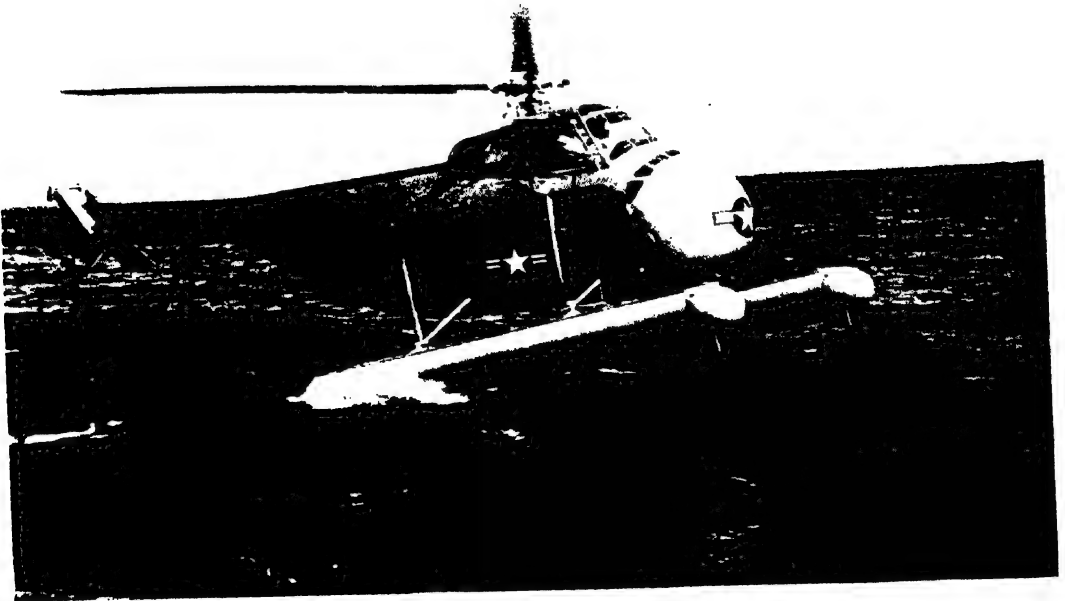
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এইচ-১৯ উভচর সিকরস্কি হেলিকোপ্টার

মৃগতৃষ্ণিকা

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

বিগত মহাযুদ্ধ আরম্ভের পর, যখন ব্রিটেন মহা বিপদগ্রস্ত তখন এদেশে যুদ্ধের জন্য সামরিক বিমানবাহিনীতে লোক লওয়া হয়। সে সময় কয়েক মাসের মধ্যে ১৭,০০০ যুবক ঐ বিভাগে ভর্ত্তি হইবার জন্য আবেদন করে, এবং তাহাদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৪০ জন ছিল বাঙালী। ব্রিটিশ সামরিক বিভাগের মতলব ছিল অন্যরূপ সুতরাং তাহারা সামান্য দুই-এক শত যুবক ভর্ত্তি করিয়া ক্ষান্ত হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যে কয়টি বাঙালী যুবক উক্ত বিভাগে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় তাহারা বিশেষ কৃতিত্বের সহিত প্রমাণ করে যে বিমান বিভাগে বাঙালী যুবকের কার্য্যদক্ষতা ও সাহস অন্য যে কোন জাতি অপেক্ষা কম নহে। ঐ কারণে পরে যখন আবার বিমান বিভাগে এ দেশীয় যুবক লওয়া হয় তখন পুনর্ব্বার বহু বাঙালীকে লওয়া হয় এবং তাহারাও বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়া বাংলার গৌরব রক্ষা করে।

কোরিয়া রণাঙ্গনের নিকটে একটি উড্ডীয়মান হেলিকোপ্টার

নৌ-বিভাগেও পদস্থ কর্ম্মচারী হিসাবে বাঙালীর খ্যাতি আছে, কেননা পূর্ব্বেকার দিনে কয়েকটি বাঙালী যুবক ঐ বিভাগে দক্ষতা ও সাহসের সহিত কর্ত্তব্য পালন করিয়া ক্রমে উচ্চপদ পাইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতের সামরিক নৌ-বিভাগ অতি স্বল্প আয়তনের, কিন্তু যাহা আছে তাহার মধ্যে উচ্চপদে কয়েকজন বাঙালী আছেন। তাঁহারা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে নৌ-বিভাগে বাঙালীর যোগ্যতা যথেষ্ট আছে। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে বাঙালী নৌ-বিভাগে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কাজ চালাইতে সক্ষম।

কোরিয়ার আকাশে উড্ডীয়মান চারিটি মার্কিন এফ-৮৬ "সেব্‌র" জঙ্গী বিমান

সাধারণ সৈন্যের পর্য্যায়ে পদাতিক হইতে গোলন্দাজ ও বর্ম্মশকট পর্য্যন্ত সকল বিভাগে বাঙালী এখনও উচ্চপদে আছে এবং সম্প্রতি অনেক চেষ্টার পর নিম্নতর পর্য্যায়েও কতকগুলি যুবক ভর্ত্তি হইয়াছে। যেখানে দৈহিক শক্তির বিশেষ প্রয়োজন, দেখা গিয়াছে যে, উপযুক্ত শিক্ষা ও ব্যায়াম অভ্যাস করিবার পর বাঙালী সেখানেও কৃতকার্য্য হইতে সক্ষম। বর্ম্মশকট চালনায় ও গোলন্দাজীতে বাঙালীর কিছু সুখ্যাতিই হইবার কথা কেননা সেখানে বুদ্ধি বিবেচনা ও শারীরিক ক্ষমতা উভয়েরই সমতা প্রয়োজন, এবং সে হিসাবে বাঙালী কাহারও নীচে যায় না।

মোটামুটি একথা বলা চলে যে সামরিক কার্য্যে বাঙালী কোনও বিশেষ দৈহিক দোষে অসমর্থ বা অযোগ্য নহে। হইতে পারে অন্য কোনও কোনও প্রদেশের যুবক দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বাঙালী যুবককে ছাড়াইয়া যায়, গড়পড়তায় হয়ত তাহাদের শতকরা ৬০।৭০ জনই সৈন্যবিভাগের উপযুক্ত হয়, বাঙালীর মধ্যে হয়ত শতকরা ২৫।৩০ জন দাঁড়ায়। কিন্তু আজিকার দিনের সামরিক অভিযানে শারীরিক ক্ষমতাই একমাত্র গুণ নহে। প্রয়োজন কষ্টসহিষ্ণুতা, সাহস ও যুদ্ধবিক্রম, এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজন রণচাতুর্য্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

কোরিয়ার ভারতের ফিল্ড এম্বুলেন্স ইউনিটের কর্ম্মিগণ একজন আহত ব্রিটিশ সৈনিককে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে

বিগত মহাযুদ্ধে উত্তর আফ্রিকায় জার্ম্মানীর যে "আফ্রিকা কর্পস" (Afrika Korps) নামক দুর্দ্ধর্ষ সেনাদল রোমেলের অধিনায়কত্বে প্রচণ্ড যুদ্ধবিক্রম দেখায়, যাহাদের হটাইতে বহু গুণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ও যুদ্ধাস্ত্রে গরিষ্ঠ মিত্রসেনা হিমসিম খাইয়া যায়—এমন কি কয়েকটি যুদ্ধে ভীষণভাবে পরাজিত হয়, তাহাদের সম্পর্কে একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ সমর-সমালোচক লিখিয়াছে :

"শারীরিক দৈর্ঘ্যে প্রস্থে তাহারা আশ্চর্য্য কিছু ছিল না, বরং সে বিষয়ে আমাদের লোকজন অপেক্ষা কিছু কমের দিকেই ছিল। কিন্তু তাহারা ছিল কঠোর দেহযুক্ত যুবকের দল, পূর্ণভাবে শিক্ষিত এবং সমরকুশল।"

অথচ এই দল কয়েক গুণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ইংরেজ (পরে মার্কিন) সৈন্যকে ভীষণভাবে ঘায়েল করিয়া দুই বৎসরেরও উপর সমানে লড়িয়া যায়। সুতরাং আজকালকার যুদ্ধে লম্বা চওড়া শরীর ও পালোয়ানের শক্তির প্রয়োজন এতটা নাই যতটা আছে অদম্য যুদ্ধস্পৃহায় এবং কঠোর কষ্টসহিষ্ণুতার। বস্তুতঃপক্ষে ধৈর্য্য ও বীর্য্য এই দুই গুণই যোদ্ধার প্রধান অস্ত্র হিসাবে গণ্য চিরদিন ছিল ও এখনও আছে। বাঙালী যুবকের অভাব প্রধানতঃ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার, অন্য যাহা কিছু অভাব আছে সব দূর করা যায় ব্যায়াম ও শিক্ষায়। ইহা কোনও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আমি লিখিতেছি না, ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ বঙ্গীয় রক্ষীদলের সম্পর্কিত তথ্যে আমরা পাই।

তবে কেন বাংলার ছেলে সামরিক বৃত্তিতে পশ্চাৎপদ হয়? ইংরেজের আমলে আমরা বলিতাম যে ব্রিটিশ

কোরিয়ার পুষাণ রেলওয়ে ষ্টেশনে বন্দী কম্যুনিষ্ট সৈন্যদের বিশ্রাম ও জলপান

সরকার বাঙালীকে বঞ্চিত করিয়াছে যুদ্ধবিদ্যা ও শস্ত্রশিক্ষার ক্ষেত্রে। আজও শুনি পঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশীয়দিগের চক্রান্তে বাঙালী যুবক অফিসার পদে প্রবেশ করিতে অশেষ বাধা পায়—এবং এই অভিযোগ মিথ্যা নয় তাহাও আমরা জানি। কিন্তু উত্তর দেশীয়, তথা মহারাষ্ট্র, মান্দ্রাজ ও রাজপুতানার অধিবাসিগণ বলেন, সৈন্যদলে শুধু উচ্চপদেরই উমেদার বাঙালী যুবক। সাধারণ সৈন্য যে অঞ্চল ও যে প্রদেশ হইতে আসে তাহাদের অধিনায়ক ও সেনাধ্যক্ষের দলও উচিতমত সেখান হইতেই আসা প্রয়োজন। রণাঙ্গণে লড়িবে লক্ষ লক্ষ পঞ্জাবী, উত্তর প্রদেশীয়, মহারাষ্ট্রীয়, রাজপুত, মান্দ্রাজী ও গুর্খা আর তাহাদের চালক হইবে বাঙালী গুজরাটি ও পার্শী ইহা কি করিয়া সম্ভব হয়?

এ কথার উত্তর দেওয়া কঠিন। ইহার বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার নাই। তবে শুনি যে যুদ্ধ শিক্ষায় ও সামরিক বৃত্তিতে আগ্রহ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙালী যুবকদিগের মধ্যেই

অধিক আছে। ভারতীয় সেনাদলের সাধারণ সেনার বৃত্তিতে তাহাদের ভরণপোষণ সম্ভব নহে, কেননা তাহারা উচ্চতর মানের জীবিকায় অভ্যস্ত। উত্তম কথা। তবে তাহারা টেরিটোরিয়াল বা রক্ষীদলের ন্যায় বাহিনীতে প্রবেশ করিয়া সামরিক শিক্ষা লয় না কেন? বিদেশে এখন সকল যুবককেই এবং সোভিয়েটে রুশিয়ায় যুবতী-দিগকেও বাধ্যতামূলক ভাবে সামরিক শিক্ষা লইতে হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বে যখন অনেক দেশে সামরিক বৃত্তি পরিপূর্ণ ভাবে স্বেচ্ছামূলক ছিল তখনও বহু দেশে সুপ্রসিদ্ধ নাগরিক বাহিনী ছিল, যাহাতে অসংখ্য মধ্যবিত্ত ও অল্পবিত্ত নাগরিক স্বেচ্ছায় সাময়িক ভাবে যোগদান করিয়া সামরিক শিক্ষা লাভ করিত। বিগত দুই মহাযুদ্ধে

কোরিয়ার ওয়াসগোয়ান নগরের বাসিন্দাদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন

ঐরূপ শিক্ষিত নাগরিক সৈন্যের শৌর্য্যবীর্য্যের অতি উজ্জ্বল পরিচয় জগৎ পাইয়াছে। ইংরেজ নাগরিকবাহিনীর মধ্যে 'অনারেবল্ আর্টিলেরী কোম্পানী' জাতীয় কয়েকটির গৌরব এখন সামরিক ইতিহাসে প্রখ্যাত হইয়াছে।

আমাদের দেশেও এখন ঐরূপ নাগরিকবাহিনীর স্থাপনা হইয়াছে ও তাহার বিস্তারের চেষ্টাও চলিতেছে। কিন্তু সে বিষয়ে সাধারণ যুবক শ্রেণীর উৎসাহের কোনও পরিচয় আমরা বাংলায় পাইতেছি না। উত্তর প্রদেশে রাষ্ট্রীয় রক্ষীদল স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ৪।৫ লক্ষ যুবক উহাতে ভর্ত্তি হইবার আবেদন জানায় এবং ক্রমে ক্রমে উহাতে প্রায় ৭ লক্ষ যুবক ভর্ত্তি হয়। শেষে অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য সংখ্যা এখন কমাইবার চেষ্টা চলিতেছে। আর বাংলায়? অশেষ চেষ্টার পর এই কয় বৎসরে কয়েক হাজার যুবকমাত্র রক্ষীদলে যোগদান করিয়াছে এবং তাহাও অনেক প্রকার সাধ্যসাধনার ফলে!

তাহার পর বিমান বাহিনীর কথা। ঐ বাহিনীতে ভূমিস্থ দল ও উড্ডুক দল দুইয়েরই যেরূপ বেতন, ভাতা ইত্যাদির পরিমাণ তাহাতে কোনও মধ্যবিত্ত বাঙালীর ছেলের অসঙ্কুলান হইবার কথা নহে। কেরাণী জীবনে কলম পিষিয়া যাহা অর্জ্জন করা সম্ভব উহাতে সর্ব্বক্ষেত্রেই তাহার চেয়ে অধিক পাওয়া যায়—উপরন্তু সামরিক শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানের গুণে সকল দিকেই উন্নতি হয়। অন্য সকল প্রদেশ—এমন কি মাদ্রাজ হইতেও হাজার হাজার যুবক উহাতে ভর্ত্তি হইয়াছে, কিন্তু বাঙালী কোথায়?

কোরিয়া যুদ্ধে আহত একজন মার্কিন সৈনিকের দেহে রক্ত সঞ্চার

বিমানবাহিনীর নির্ম্মাণ হইতে চালনা ও তত্ত্বাবধান পর্য্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই বাঙালী যুবকের কৃতিত্ব দেখাইবার এবং যশ ও অর্থ অর্জ্জনের সুযোগ রহিয়াছে। আজকাল বিমানবাহিনীতে অসংখ্য নূতন ও অভিনব আবিষ্কার হই-তেছে, বিমান-যন্ত্রনির্ম্মাতা হইতে সুদক্ষ এয়রোনটিক ইঞ্জি-নীয়র পর্য্যন্ত কর্ম্মীকারিগর ও কর্ম্মাধ্যক্ষের প্রয়োজন ক্রমেই বাড়িয়াই চলিতেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তো বাঙালীর খ্যাতি ছিল একদিন। আজ বিমান-বিজ্ঞানে বাঙালী কোথায়? শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে, জেট্-প্লেন, হেলিকপ্টার, ষ্ট্রাটোস্ফিয়রে চালিত শব্দাপেক্ষা দ্রুতগামী বিমান, র‍্যাডার, জাইরোস্কোপ চালক ইত্যাদ
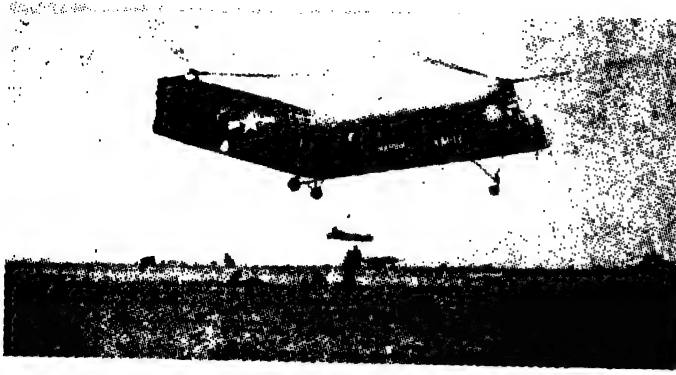
একটি মার্কিন হেলিকোপ্টার কর্তৃক যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের উদ্ধার কার্য্য প্রদর্শন

সম্বন্ধে কয়জনের জ্ঞান বা কৌতূহল আছে? রুশ সোভিয়েটের বিমান নির্মাতা মিকোয়ান যে M. I. G. জেট বিমান নির্মাণ করেন তাহার এঞ্জিন কি ভাবে গঠিত সে বিষয়ে কয়জনের জানিবার ইচ্ছা আছে? অথচ এই বাংলাদেশেই এক-একবার রব উঠে "যুদ্ধ চাই যুদ্ধ চাই!" যুদ্ধ করিবে কে ও কি দিয়া তাহার খবর কেহই জানে না।

এই "যুদ্ধ চাই, যুদ্ধ চাই" কলরব সম্পর্কে গত বৎসরে যাহা এই পত্রিকার বিবিধ প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছিল সেই সম্পর্কে একজন লেখক ভিন্ন পত্রিকায় কূপমণ্ডুক-যুক্তির হাস্যকর অবতারণা করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন, মিথ্যাকে সত্য ও কালোকে সাদা। তিনি এখন জীবিত নাই, সুতরাং তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও যুক্তির সমালোচনা এখানে অবান্তর। তবে এই মাত্র বলা প্রয়োজন যে, যে দেশে ঐরূপ প্রবন্ধ কোনও সুপরিচিত পত্রিকায় স্থান পায় সে দেশের লোকের সামরিক ব্যাপারে জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি সত্যই অতি শোচনীয়। আমাদের জানা প্রয়োজন যে ঋষি নারদ দ্বন্দ্ব-কোলাহল বাধাইতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন কিন্তু যুদ্ধে খ্যাতি তাঁহার ছিল না, ছিল স্বল্পভাষী ক্ষত্রচূড়ামণি শ্রীরামচন্দ্রের, অর্জ্জুনের ও ভীষ্মের, যাঁহারা সম্মুখ সমরে অগ্রসর হইয়া শত্রুনিধন করিতেন। সুতরাং "যুদ্ধ চাই, যুদ্ধ চাই" বলিয়া চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিলেও আমাদের খ্যাতি-প্রতিপত্তি বাড়িবে না, বরং কমিবে।

কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নাই যে, বাংলা ও বাঙালীর যে অবস্থা এবং এই খণ্ডিত প্রদেশের যেরূপ পরিস্থিতি, তাহাতে "বাঘ, বাঘ" বলিয়া ডাকিতে থাকিলে একদিন বাঘ আসিবে নিশ্চয়। কেননা শত্রুপক্ষ ক্ষান্ত নাই এবং তাহাদের নেতৃস্থানীয়েরা আমাদের বাক্যবাগীশ ও তর্কচূড়ামণিগণের ন্যায় ভুয়া গলাবাজীতে কালক্ষয় করিতেছে না এবং "পরস্মৈপদী" নিজ কার্য্যোদ্ধারের বৃথা চেষ্টা করিতেছে না।

আমরা চোখের সামনে দেখিতেছি যে, পৃথিবীর সকল ঐশ্বর্য্যের চৌদ্দ আনার অধিকারী মার্কিন দেশকেও নিজের সন্তানকে বলি দিতে হইতেছে কোরিয়ার রণক্ষেত্রে, তাহার ক্ষাত্র ধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে এবং সেই সঙ্গে দরিদ্র চীন আপনার লক্ষ লক্ষ সন্তানকে আহুতি দিতেছে ঐ যজ্ঞের অনলে। সেই সমরাঙ্গনে ধনী ও দরিদ্র দুইয়েরই সন্তান কি দৃঢ়চিত্তে সকল দুঃখ কষ্ট বিপদ তুচ্ছ করিয়া যুঝিতেছে তাহা বুঝিবার ক্ষমতাও কি আমাদের আছে? "যুদ্ধ চাই" বলিলে তাহার পণ কি ভাবে দিতে হয় কোরিয়ার রণক্ষেত্র তাহারই নিদর্শন। অন্য দিকে আমরা ইহাও দেখিলাম যে, পরস্পর পরস্পরের সৈন্যবল ও অস্ত্রবলের অপেক্ষায় থাকায় বিরাট আরব লীগ কি ভাবে ক্ষুদ্র ও মুষ্টিমেয় ইস্রায়েলের রণবলের নিকট পরাস্ত ও অপদস্থ হইল। অথচ আমাদের মেকী চাণক্যের দল দেশের লোককে বুঝাইতেছেন যে, পরমুখাপেক্ষী হইয়া তর্কবিতর্কে কালক্ষয় করাই আমাদের একমাত্র পথ।

আগেই বলিয়াছি, সামরিক শিক্ষায় বা সামরিক কার্য্যক্রমে বাঙালীর দৈহিক কোনও অযোগ্যতা নাই। সেই সঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, শিক্ষা ও সামাজিক পরিবেশের দোষে আমাদের মধ্যে যথেষ্ট মানসিক দুর্ব্বলতা আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইল, আলস্য ও নিয়মানুবর্ত্তিতায় বিরাগ। বাঙালী ছেলে সর্ব্বক্ষেত্রেই হটিয়া যাইতেছে এই দুই দোষে এবং সকল ব্যাপারেই আমাদের অযোগ্যতার প্রধান কারণ এই দুই দোষ। এই দুই দোষ যে আমাদের আছে তাহা আমরা সকলেই জানি, নহিলে ঐ দোষকে গুণ প্রমাণ করার চেষ্টা যে যত করিয়াছে তাহার লোকপ্রিয়তা ততই বাড়িয়া যায় কেন?

আমরা এখন যে অবস্থায় আছি ইহা ধ্বংসের শেষ সীমার মুখে। আমাদের পরবর্ত্তী যে অধিকারী ও অধিকারিণীর দল আজ উদ্দাম গতিতে নিজের, জাতির ও দেশের পরকাল অতলে ডুবাইতে উদ্যত, তাহাদের

সাবধান করার কি কেহই নাই? পথ তো ক্রমেই বন্ধুর হইতে বন্ধুরতর ও মরুময় হইয়া চলিতেছে, এখন কঠোর কায়ক্লেশ ও নিদারুণ কৃচ্ছ্রসাধন ব্যতীত যে তাহাদের উদ্ধারের পথ নাই ইহা তাহাদের কে বুঝাইবে? অযোগ্য পথপ্রদর্শকের দোষে মরুপথের যাত্রীদল মৃগতৃষ্ণিকার লক্ষ্যে ছুটিয়া শেষে যেরূপ শকুনি গৃধিনী ও শিবাদলের কবলে যায়, এই অপরিণতমস্তিষ্ক যুবক-যুবতী ও কিশোর-কিশোরী ঠিক সেই ভাবেই চলিয়াছে অতি ভয়ানক পরিণামের মুখে!

আত্মসংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতা—যাহা "বিনয়" (discipline) শব্দের প্রকৃত সংজ্ঞা—বরণ করিয়া লইলে বাঙালী তরুণ-তরুণীর অসাধ্য কিছুই নাই এ কথা আমরা শত উদাহরণে প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছি। অন্য দিকে উত্তেজনাপূর্ণ উচ্ছৃঙ্খলতার যে রক্তিম মদিরা-স্রোত আজ সাময়িকপত্রের পাতায় পাতায় ও স্বার্থসর্ব্বস্ব ভাগ্যান্বেষী দলের কথায় কথায় বহিয়া চলিয়াছে, তাহা যে কি ভীষণ হলাহল তাহা দেশের বর্ত্তমান অবস্থাই প্রমাণ করিতেছে।

দুইটি ৫৯-এক পেলার মার্কিন জেট বিমান কর্ত্তৃক বিমানবাহী জাহাজে অবতরণের পূর্ব্বে পেট্রল নিঃসরণ

কর্ম্মক্ষেত্রে বা যুদ্ধক্ষেত্রে ধর্ম্মের পথ ও পৌরুষের পথ যে কি তাহা জানিবার জন্য আমাদের মস্কৌ বা ওয়াশিংটনে যাইবার প্রয়োজন নাই, দেশের শত সহস্র ঋষি মুনি মহাজন সে পথ অতি সরলভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। আমরাই কর্ম্মবিমুখ, বিলাসলালসাগ্রস্ত হইয়া সে পথ ছাড়িয়া ফাঁকি দিয়া স্বার্থসিদ্ধি করিতে চেষ্টিত হইয়াছি। যাঁহাদের দূরদৃষ্টি আছে তাঁহারা বুঝিতেছেন এরূপে বিপথগামী হওয়ার পরিণাম কি, কিন্তু তাঁহাদের কথা এখন অরণ্যে রোদন মাত্র। এখন "ইজম্" প্রচারের যুগ, এ যুগের বাংলায় তপস্যারও প্রয়োজন নাই, ক্ষাত্রযজ্ঞেরও আয়োজন নাই, সুতরাং উদ্দাম গতিতে, দাসত্ব বরণ করিতেই আমরা চলিয়াছি! এবং এই ভবিষ্যতের দাসত্ব হইবে প্রকৃত ক্রীত-দাসের অবস্থা, যখন প্রত্যেক পুরুষ হইবে সম্বিৎহীন আজ্ঞা-বহ ভৃত্য, প্রত্যেক নারী হইবে পরের সেবাদাসী। তখন আমরা বুঝিব যে নির্ব্বোধ বা শঠ নেতার প্ররোচনায় "ইয়ে আজাদী ঝুটা হয়" বলিয়া হেলায় যাহা হারাইয়াছি তাহার প্রকৃত মূল্য কি ছিল।

ভ্রম সংশোধন

১

আষাঢ়-সংখ্যায় প্রকাশিত "দামোদর মুখোপাধ্যায়" প্রবন্ধে একটি ভুল রহিয়া গিয়াছে। দামোদরের গ্রন্থাবলী অংশে (পৃ. ২২৪) ১৩ সংখ্যক পুস্তক "আয়েসা"র নাম বর্জ্জনীয়; প্রকৃত-পক্ষে উহা ১৮৯৫ সনে বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২

সংখ্যা	পৃষ্ঠা	পাটি	পংক্তি	হইবে না	হইবে
আষাঢ় ১৩৫৯	২৭৮	২	১১	সকাল বেলা	বিকাল বেলা
„	„	„	১৩	মেঘলা	পরদিন মেঘলা

মৃত্যুঞ্জয়

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

কে ভাবিয়াছিল যে মৃত্যুনের ইহাই হইবে পরিণতি! মানুষ নিজেকে বোঝে না, অপরকেও বুঝিতে চাহে না—অথচ সবকিছুই বুঝিয়াছে মনে করিয়া খুশী হইয়া উঠে। মৃত্যুনকেও বুঝিয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছিল সকলে, তাহার জীবনের শেষ দিনটাও কি ভাবে কাটিবে তাহারও একটা মোটামুটি চিত্রও মনের মধ্যে আঁকিয়া ফেলিয়াছিল সবাই। মৃত্যুন নিজেও হয়ত তাহা বিশ্বাস করিয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় হইতে মৃত্যুন এবং তাহা হইতে মেতা পর্য্যন্ত নামিয়া আসিতেও সে দ্বিধা করে নাই। যাহার যাহা খুশী তাহা বলিয়া ডাকিলে তাহার আপত্তি করিবার আছেই বা কি? ডাকাটাই ত আসল।

কিন্তু সেই মৃত্যুনেরই সীমারেখা যে এমন করিয়া টানা হইয়া যাইবে তাহা কে অনুমান করিতে পারিয়াছিল? যে সকলের শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা বিশ্বাস-অবিশ্বাসকে সমান ভাবে গ্রহণ করিত তাহার অকস্মাৎ এরূপ হইলই বা কি করিয়া! সকলের জানাকে অতিক্রম করিয়া সে কি তবে নিজেকে জানিয়া বসিয়াছিল।

পড়াশুনাকে সেলাম বাজাইয়াই সে আসিয়াছে চিরকাল। জীবনটাকে লইয়া কিছুমাত্র নাড়াচাড়া করিবে না বলিয়াই বোধ করি সে স্থির করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু জীবন এই অশ্রদ্ধার মূল্য আদায় করিয়া লইল। সেই মূল্য দিয়া সে নিজেও তৃপ্তি পাইয়াছিল কিনা তাহা জানিয়া লইবার সুযোগ কাহারও হয় নাই।

আঠার বৎসর বয়সেই আসিয়াছিল জীবনের প্রতি এই অবজ্ঞা। এই সময়েই কলেরায় পর পর মারা যায় তাহার বাবা, ছোট বোন আর বড় ভাই। বাকী থাকে কেবল তাহার মা। কিন্তু বেশী দিন তাহাকেও পড়িয়া থাকিতে হয় নাই। কিছু দিনের মধ্যেই প্রৌঢ়া বিধবা কঠিন টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়। পনের দিন মৃত্যুর সহিত একক লড়াই করে মৃত্যুন কিন্তু চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত হয়।

এই পনেরটা দিনের মধ্যে সে একবার মাত্র সাহায্য-ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল প্রতিবেশী হরিকাকার নিকটে। অর্থ সে চাহে নাই, চাহিয়াছিল শুধু রাত্রিজাগরণের জন্ত লোক।

ক্লান্ত শুষ্ক মুখে বার দিনের দিন সে হরিকাকার নিকটে আসিয়া বলিয়াছিল, মায়ের কাছে জাগবার জন্তে দু'দিন কোন ব্যবস্থা করে দিতে পারেন কাকা?

অত্যন্ত চিন্তাযুক্তভাবে হরিকাকা জবাব দিয়েছিলেন, "তাই ত বাবা, কষ্ট তোমার খুবই হচ্ছে। কিন্তু কি জান, একে রোগী—তায় রাত জাগা! রোগকে আমার কেমন ভয় তা তো জানই, তার ওপর রাত জাগলে শরীরের অবস্থা যে···" তার পর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া চিন্তিত মুখ তুলিয়া বলিয়াছিলেন, "তাই ত, কি করি বল ত?"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিয়াছিল, বিশুদা যদি দুটো দিন চালিয়ে দিতে পারেন—

কথাটা সে শেষ করিতেও পারে নাই। যেটা অনুরোধ এবং যে ক্ষেত্রে অনুরোধ রক্ষিত না হইবার সম্ভাবনাই বেশী সেক্ষেত্রে কথা স্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ করিয়া বোধ হয় বলাও যায় না। তথাপি সেই অর্দ্ধেক বলার মধ্যেই সম্পূর্ণকে অতিক্রম করিয়াও অনেক কথাই যে নিহিত থাকে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশও নাই। কিন্তু না বুঝিতে পারাই যাহার পক্ষে সুবিধাজনক সে বুঝিতে যাইবে কোন্ প্রয়োজনে? হরিকাকাও কিছু বুঝিলেন না। নিজে যদি-বা বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন ত পুত্র বিশ্বনাথকে আর সেদিকে ঠেলিয়া দিবেন কোন্ বুদ্ধিতে? হাত বাড়াইয়া তাই নিজেই তিনি পুত্রকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, ও কি থাকতে পারবে বাবা, ও নিজেই ছেলেমানুষ, রোগ-রোগীর কিছুই জানে না—তার ওপর বৌমা বড় ভয়কাতুরে। তুমি বরং গোবিন্দ বা কানাইকে বলে দেখ।

বলিয়া সে আর কাহাকেও দেখে নাই। অভিমান হইয়াছিল বৈ কি? বিশুদাদা ছেলেমানুষ হইলেও তাহাকে বাধ্য হইয়া সেই আঠার বৎসর বয়সেই রোগ এবং রোগীর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাও বেশী দিন নয়, তিন দিন পরেই মাতা তাহাকে ছাড়িয়া গেল—সন্তানের ক্লেশ জননী বোধ করি আর দেখিতে পারিতেছিল না। অসহ্য অভিমানে মৃত্যুন হয়ত গৃহত্যাগ করিয়াই যাইত—গৃহ সম্বন্ধে অত্যধিক সচেতনতাই যে গৃহত্যাগের মূল কারণ তাহাও হয়ত সে ভুলিয়া বসিত। কিন্তু এইবার তাহাকে রক্ষা করিলেন অসীম শক্তিশালী অদৃশ্য মৃত্যুদেবতা। মাতার মৃত্যুর সাত দিনের মধ্যেই মারা গেলেন হরিকাকা। রোগকে ভয় পাইয়া তাহা হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা তাহার সফল হইল না, রাত না জাগিয়াও শরীরটা তাহার টিকিল না। মৃত্যুনের ঘনীভূত অভিমান গলিয়া একেবারে জল হইয়া যাওয়ায় সে মুক্তি পাইয়া গেল। গৃহত্যাগের আর কোন প্রয়োজনও তাহার চক্ষে পড়িল না।

কিন্তু তাহার পর হইতেই সমবয়সী বন্ধুদের নিকট মূর্ত্তিমান ভয়ের কারণ হইয়া উঠিল সে। কখন যে কাহার ঘাড়ে

চাপিয়া বসিবে তাহা কে বলিতে পারে! সকলেই সদা শঙ্কিত। তাহার জন্ত কোন আড্ডাই ঠিক ভাবে জমাইয়া বসা যায় না। তাসের আড্ডাই হোক্ আর সঙ্গীতের জলসাই হোক্, তাহার নিকট একই কথা। মূর্ত্তিমান ধূমকেতুর মতই আসিয়া বলিয়া বসিত, উঠে পড় সব, এই মাত্র রাজেনের বুড়ী পিসিমা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে—চিতার আগুনে তাকে গরম করে আসি চল।

কথার ধরণটাও যেন কেমন হইয়া গেছে, মায়া দয়া বলিয়া কিছুই আর নাই—জগৎটাই লোপ পাইয়া গেছে হয়ত।

তাহার কথার পর বসিয়া থাকিবারও উপায় ছিল না। এক দিন বৃন্দাবন প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিল, এই ত মরেছে রে বাবা, একটু কাঁদুক না বাড়ীর সকলে।

পাশার ছক টান মারিয়া তুলিয়া দিয়া সে উত্তর দিয়াছিল, জ্যান্ত মানুষকে যে চিরকাল জ্বালিয়েছে তার পর মৃতদেহটা চটপট্ চিতার আগুনে জ্বালানোই ভাল। ওটা নিয়ে মড়াকান্না আর কেন? তবু তোমার কথা মনে থাকবে, বৌদির বিশ বছরেই যখন চারটে বাচ্চা, তখন ও কিছু দিনের মধ্যেই মরবে ধরে রাখ—সে সময় দু' দণ্ড প্রাণ খুলে কান্নার সময় দেব তোমায়; কিন্তু আপাততঃ চল, এ মৃতদেহটার এতটুকু রস-কসও নেই যে ওর জন্তে কাঁদার কারণ ঘটবে।

এমনি করিয়াই চলিয়াছিল।

বন্ধুরা আশা করিয়াছিল যে মৃত্যুনের নেশা এক দিন ফুরাইবে এবং তাহার পর হইতেই পাশা-দাবার আড্ডায় আর ধূমকেতুর আবির্ভাব হইবে না। কিন্তু সে আশা ব্যর্থ করিয়া দিল ওই পিছটানহীন ছেলেটা। দুই-তিনটা বৎসর কাটিয়া গেলেও সে অবিচলিত ভাবেই নিজের অকেজো ব্যাপারে লাগিয়া রহিল। রোগীসেবাকেন্দ্র প্রভৃতি আরও দুই-একটা উপসর্গও বরং দেখা দিল।

এই সেবাকেন্দ্র স্থাপনের দিন বৃন্দাবন ঠাট্টা করিয়া বলিল, রোগীগুলোকে যদি সারিয়েই তুলবে তবে আর আগুন লাগাবে কিসে?

মৃদু হাসিয়া তাচ্ছিল্যভরে মৃত্যুন উত্তর দিল, ঘাবড়ে যেও না বৃন্দাদা, আমাদের খপ্পর ছেড়ে যাবে কোথায় ওরা? মরবার আগে থেকেই হাতের মুঠোয় ভরে রাখা ভাল—আমরা হচ্ছি গিয়ে যমদূতের মাসতুতো ভাই।

মাসতুতো ভাই-ই বটে! রোগ কঠিন হইলেই তাহাদের ডাক পড়ে এবং তাহার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হয় না। রোগীর শেষকার্য্য সমাধা করিয়া হরিধ্বনির সহিত তাহারা ফিরিয়া আসে। ক্রন্দনের রোল মৃত্যুনকে কাতর করিতে পারে নাই—এক ফোঁটা অশ্রুও তাহার পড়ে না। মাতার মৃত্যুর পর সেই এক দিনেই বোধ করি সে নিঃশেষে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল।

নৃশংস বলিয়াই সর্ব্বত্র তাহার নাম রটিয়া গেল। কোন্ মৃত স্বামীর শবদেহ আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া রহিয়াছে সতবিধবা যুবতী স্ত্রী, কোন্ মৃত শিশুকে সবলে বক্ষে ধরিয়া রাখিয়াছে তাহার মাতা সে সংবাদ ঝড়ের বেগে আসিয়া পড়ে মৃত্যুনের কাছে। তাহার নিকট এই সংবাদ পৌঁছাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যও অবশ্য খুবই সরল, বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে হইবে তাহাকেই। সংবাদবাহকের দিকে একবার মাত্র চাহিয়া দেখে মৃত্যুন, কখনও বা চাহিয়াও দেখে না। হন্ হন্ করিয়া সে আগাইয়া যায়। মৃতদেহের গতি হয়। তরুণী বধূ, প্রৌঢ়া মাতার মন বিষাইয়া উঠে, দেশশুদ্ধ লোক দৃঢ়কণ্ঠে বলে, পাষণ্ড, নির্দ্দয় রাক্ষস।

এই নির্দ্দয় পাষণ্ডের সঙ্গে পথ চলাও সম্ভব নয়। পথের মাঝেই হয়ত নামিয়া পড়িবে, সঙ্গীকেও টানিয়া নামাইবে। বিরক্ত হইয়া প্রশ্ন করিলে একদিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিবে, দেখছ না রাস্তার ওপর লোকটা পড়ে আছে - ওর একটা গতি না করলে চলবে কেন সন্তোষদা।

আশ্চর্য্য দৃষ্টিশক্তি; যে পথ দিয়া সে যাইবে সে পথের উপর অমনি করিয়া কাহারও পড়িয়া থাকিবার উপায় নাই। যাহার মৃত্যু হইয়াছে তাহাকে শ্মশান পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইবে, যে শান্তিতে মরিবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল তাহার শান্তি ভঙ্গ করিয়া হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে। এমনি সব অমানুষিক কার্য্য করিলে কি মানুষ বাঁচে! সৌভাগ্যের বিষয় যে তাহার মত ছন্নছাড়া জীবন সকলের নহে, তাহার ন্যায় অযথা ব্যয় করিবার মত সময়ও কাহারও নাই। তাই রূঢ় কণ্ঠে সন্তোষ হয়ত বলিয়া বসে, ও থাকগে পড়ে।

মৃত্যুন শুধু উত্তর দেয়, ওই উলঙ্গ দেহটাও যে মানুষেরই সন্তোষদা!

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকা যায় না তখন। সর্ব্বস্ব যেন তাহার পথে পড়িয়া আছে। কিন্তু তথাপি সময়ের অপব্যয় করাইয়া ক্ষতি ত সে করিলই। ইহা কি কম নৃশংসতা! সত্যই পাষণ্ড মৃত্যুন।

বিধবা করুণাময়ী অসুস্থ। সাত আট বৎসরের এক শিশু-কন্যা ব্যতীত তাহার আর কেহ নাই। তাহার সেবার ভারও অতি সহজেই আসিয়া পড়িল মৃত্যুনের উপর। দরিদ্র করুণাময়ী সেবা শুশ্রূষা পাইয়া একেবারে বর্ত্তাইয়া গেল। তাহার মত অভাগিনীও রোগে দুই ফোঁটা ওষুধ পাইবে এ যেন তাহার ধারণাতীত ছিল। কিন্তু সেই কল্পনাতীত সামগ্রীও মিলিয়া গেল 'পাষণ্ড' মৃত্যুনের কৃপায়। মৃত্যুর সময়েও ঝাঁঝালো তিক্ত ঔষধ না খাওয়াইয়া কি ছাড়িবে সে। তথাপি করুণাময়ীর

সে যেন পরম শান্তি—চক্ষের জলও আর বাধা না মানিয়া অজস্র ধারে গড়াইয়া পড়ে। কৃতজ্ঞতা জানাইতেও সে পারে নাই প্রথম কয়েকটা দিন—ভাষাই যে জোগায় নাই। যেদিন ভাষা জোগাইল সেদিন মৃত্যুন আসিতেই সে মৃদু কণ্ঠে বলিল, গরীবকে এত দয়া কেন ঠাকুর ?

করুণাময়ী নীচজাতীয়া আর মৃত্যুন ব্রাহ্মণসন্তান। জাতির গণ্ডীর কথা মৃত্যুনের কোন দিন মনে থাকে না—মানুষের বৃহত্তর গণ্ডীটা জাতের গণ্ডী একেবারে মুছিয়া দিয়াছে। কিন্তু রূঢ়তা বোধ হয় তাহার কণ্ঠে কায়েমী হইয়া বসিয়াছে, কর্কশ স্বরে সে বলিল, মরার পর স্বর্গে গিয়ে ভগবান বলে যে জীবটা আছে তাকে জিজ্ঞাসা করো বাপু।

সেই রূঢ় উত্তর শুনিয়াও করুণাময়ী ভুল করিল না। সে চক্ষু বুঁজিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া শুধু একবার বলিল, স্বর্গ ! তারপর চোখ মেলিয়া মৃত্যুনের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, তোমার কথা মিথ্যে হবে না ঠাকুর, তুমি দেবতা। আমার স্বর্গলাভই হবে। তা না হলে এ সময়ে তুমিই বা আসবে কেন !

মৃত্যুন বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিল, এই মরেছে, আবার কাব্য করে দেখ।

কোন জবাব না দিয়া করুণাময়ী বলিল, মেয়েটার জন্তেই ভাবনা ঠাকুর, আমার মৃত্যুর পর ওকে তুমি দেখ।

মেয়েটা করুণাময়ীর পাশে আর একটা শয্যায় ঘুমাইয়াছিল। অপরিষ্কার, শতছিন্ন শয্যা। তৈলহীন রুক্ষ মাথা—একটা বালিশে জড়সড় হইয়া কুঁকড়াইয়া শুইয়া আছে। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে এমনি ভাবেই থাকিতে হইবে। সেইদিকে একবার চাহিয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া মৃত্যুন বলিল, ওর জন্তে আর ভেবে কাজ নেই—ও ঠিক ধুঁকতে ধুকতেই মরতে পারবে।

আর কোন কথাই বলে নাই বিধবা—বোধ হয় তাহার আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী মিলিয়া গিয়াছিল। কামনার তৃপ্তির পর এই শেষ মুহূর্ত্তে আর কিছু চাহিবার থাকেও না। তাই বোধ হয় করুণাময়ী আর বাঁচিল না, শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়া গেল মৃত্যুনের চক্ষের সম্মুখেই। মৃত্যুনের তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, অমন কতই ত নিত্য মরিয়া যাইতেছে। এই সব নরনারী হয় ত কেবলমাত্র মরিবার সুখের আশাতেই বাঁচিয়া থাকে। ঐ একটা সময় মানুষের স্কন্ধে অথবা সৎকার-সমিতির গাড়ীতে তবু চাপা যায়। সেই ভাবেই করুণাময়ীর শেষক্রিয়া সম্পন্ন করিল মৃত্যুন, কিন্তু তাহার সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারিল না। বোকা মেয়েটা অবুঝের মত ক্যাল্ ক্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া যেন তাহাকে নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করিল। বন্ধনহীন মৃত্যুনের জীবনে একটা গ্রন্থি পড়িল বোধ হয়। মেয়েটার দিকে চাহিয়া সে বলিল, যাবি আমার সঙ্গে ?

মেয়েটা কোন উত্তর দিল না, কেবল উঠিয়া দাঁড়াইল, যেন কলের পুতুল বনিয়া গিয়াছে।

বিরক্ত হইয়া মৃত্যুন বলিল, থাকবি ত থাক এখানে।

বালিকা নিঃশব্দে বসিয়া পড়িল।

না:। ইহার সহিত পারিবার উপায় নাই। কিন্তু মৃত্যুনেরও দায় পড়িয়াছে ; তাহাকে ছাড়িয়া গেলে সে হাঁপ ছাড়িয়াই বাঁচিবে। কোন্ প্রয়োজনে সে উহাকে সঙ্গে লইবে ? আশ্রয় দান ? পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ত লক্ষ লক্ষ নরনারী আশ্রয়হীন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বালিকা স্থির হইয়া বসিয়া আছে দেখিয়া মৃত্যুন বাহির হইয়া গেল। কিন্তু বেশীক্ষণ সে বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেও পারিল না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে পুনরায় করুণাময়ীর গৃহে ফিরিয়া আসিল। মেয়েটা তখনও সেই একই ভাবে বসিয়া আছে দেখিয়া সে নিতান্ত বিরক্তিভরেই তাহার একটা হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে নিজের গৃহের দিকে লইয়া চলিল।

সেই হইতেই বাতাসী তাহার গৃহের দ্বিতীয় অধিবাসিনী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মেয়েটা বড়ই বোকা। স্নান করাইয়া না দিলে স্নান হয় না, খাওয়াইয়া না দিলে খাওয়া হয় না। বাতাসীর মাথা খাইয়াছে করুণাময়ী। কিন্তু তাহাতে কোন আপত্তি ছিল না মৃত্যুনের যদি না সে মরিয়া জ্বালাইয়া যাইত। বিপদ বাধাইয়া গিয়াছে বিধবা। এত সময় কোথায় মৃত্যুনের ? ওইটুকু সময়ের মধ্যেই দুই চারি জনকে ইহলোকের ফটক পার করাইয়া দেওয়া যায় যে !

তাহার সমবয়সী বন্ধুরা কিন্তু কিছু বিশ্রাম পাইয়াছে। তাস-পাশার আড্ডা বেশ জমাইয়া বসিতে পারে। বাতাসী তাহাদের অনেকখানি সময় দিয়াছে, বাঁচিয়া থাকুক বাতাসী। কিন্তু তাহার বাঁচিয়া থাকাও শক্ত। বোকা মেয়েটা কেবলই ধমক খায়। বন্ধুরা বাতাসীর পক্ষ লইলে তাড়া করিয়া আসে মৃত্যুন—বাতাসীর বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে মুখ খিঁচাইয়া ওঠে। বিপর্য্যয়কাণ্ড বোধ হয় ইহাকেই বলে।

বিশ্বম্ভর অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। তাহার বড় মেয়ে অসুস্থ, কিন্তু তথাপি সে অনেকদিন পর্য্যন্ত মৃত্যুনদের কোন সংবাদ দেয় নাই। মৃত্যুনের দেহে যমের কিছু অংশ আছে বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। যমদূতদের সঙ্গেই নাকি তাহার মিতালি। যমরাজার যে কাজটুকু অদৃশ্য সেটুকু সমাধা করে তাহার দূতেরা আর যেটুকু দৃশ্য সেটুকু শেষ করে মৃত্যুন। কিন্তু রোগী যদি বেয়াড়া হইয়া উঠে এবং অনেক দিন ধরিয়া ক্রমাগতই ভুগিতে থাকে তবে তাহাকে কতদিন আর নিজেরা সামলানো যায়। বিশ্বম্ভর তাই এক দিন ধীরে ধীরে মৃত্যুনের

সেবাসঙ্ঘের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। গুটিকয়েক যুবক বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে—মৃত্যুন উপস্থিত নাই।

চারি দিকে একবার চঞ্চল দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বিশ্বম্ভর বলিল, আমার মেয়েটা ক'দিন থেকে বড় ভুগছে, আমরা ক্লান্ত—তোমাদের ওপর তার ভার দিতে এসেছি।

কিছুমাত্র নূতন কথা নয়, সেবাসঙ্ঘের কাজও তাহাই। ছেলেদের সম্মতি পাইয়া বিশ্বম্ভর আস্তে আস্তে বলিল, কিন্তু একটা কথা আছে বাপু, মৃত্যুনকে আমার বড় ভয়—ওকে যেন নিয়ে যেও না। ও গেলে মেয়ে আমার কিছুতেই বাঁচবে না।

সেবাসঙ্ঘের সভ্যেরা বিস্মিত হইয়া বলিল, বলেন কি, সে-ই ত সঙ্ঘের সব। আমরা শুধু তার কথামত চলি। সে যাকে ঠিক করে দেবে সে-ই যাবে।

মাথা চুলকাইয়া বিশ্বম্ভর বলিল, তাকে না হয় না-ই বললে। তোমরাই লোক ঠিক করে দাও—আমি পয়সা খরচ করতেও রাজী আছি।

দলের একজন বলিল, তা হয় না—এমন নিয়ম আমাদের নেই।

বিশ্বম্ভর খিঁচাইয়া উঠিল, মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, নিয়ম নেই? কিন্তু তোমাদের ওই নিয়মের দায়ে ঠেকে ত আর মেয়েটাকে মারতে পারব না। ও ছোঁড়ার নাম করতেও ভয় হয়, যমদূত ওর মধ্যে বাসা নিয়েছে। তা না হলে রোগীর মুখের দিকে চেয়ে অমন সোজা হয়ে কি কেউ বসে থাকতে পারে! ঘুম নেই, ঢুলুনি নেই—রক্ত শুষছে ত শুষছেই। থাকগে সেবা। বিশ্বম্ভর বাহির হইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াই চমকিয়া গেল। কখন যে মৃত্যুন ঘরের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা কেহ জানিতেও পারে নাই।

প্রৌঢ়ের সমস্ত কথাই শুনিয়াছিল মৃত্যুন। পরোক্ষে এবং চাপা কণ্ঠে এই কথা অনেকেই বলিয়াছে, কিন্তু এমন স্পষ্ট করিয়া এরূপ কঠিন কথা সামনাসামনি আর কোন দিন কেহ বলে নাই। সমস্ত শরীর তাহার কাঁপিতেছিল। এত সহজে বিশ্বসংসারকে অবহেলা করা সম্ভব নহে—তাহা প্রতিনিয়তই চারি দিক হইতে চাপিয়া ধরিতেছে বিরাট বাহু মেলিয়া।

মুহূর্তের জন্য বিশ্বম্ভর একেবারে পাথরের মূর্তিতে পরিণত হইয়া গেল। পর মুহূর্তেই হাত জোড় করিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে সে বলিল, কিছু মনে করো না বাবা, মেয়েটাকে আমি বড় ভালবাসি—ওকে বাঁচতে দাও। আর কোন কথা না বলিয়া প্রায় ঝড়ের বেগে সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

সমস্ত ঘরটা থম্ থম্ করিতে লাগিল। একটা কথাও আর কাহারও কণ্ঠ দিয়া বাহির হইবে বলিয়া মনে হইতেছিল না। কিন্তু প্রথমেই কথা কহিল মৃত্যুন, বলিল, বিশ্বম্ভর বাবুর বাড়ীতে তোমরা নিয়মিত যেও।

একজন থামিয়া থামিয়া বলিল, তু-মি?

ঘরের আবহাওয়াটা হাল্কা করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে জোরে জোরে হাসিয়া মৃত্যুন উত্তর দিল, শেষ ডাক যখন আসবে তখন আমি ত আছিই। মৃত্যুদূতের হিসেব নিয়েই আমার নাম হয়েছে মৃত্যুঞ্জয়—মৃত্যুর হাওয়া আছে আমার ভেতর, আমার স্পর্শ বাঁচিয়ে চলো।

অপর সকলেও অনাবশ্যক জোর দিয়া হাসিয়া উঠিল। একজন ফোঁড়ন দিয়া বলিল, তাই ত আমরাও রোগা হয়ে যাচ্ছি। দৃষ্টিটা একটু কম দিও ভায়া।

গৃহে আসিয়াই মৃত্যুন বাতাসীকে লইয়া পড়িল। তাহার কান ধরিয়া বলিল, ভাল করে খেতে পারিস্ না হতভাগী—রোগা ইঁদুরটি হয়ে যাচ্ছিস্ যে!

বাতাসী কাঁদিল না, অজ্ঞাতসারেই অতটুকু বালিকার মুখ দিয়াও বাহির হইয়া আসিল, শুধু খেলেই কি মোটা হয়?

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় দূরে সরিয়া গেল মৃত্যুন—দূরে দাঁড়াইয়াই চাহিয়া রহিল মেয়েটার দিকে। সত্যই অনেক রোগা হইয়া গিয়াছে সে। ধুঁকিতে ধুঁকিতেই একদিন সে মরিয়া যাইবে—করুণাময়ী বৃথাই তাহার উপর ভার দিয়া গিয়াছে। পরমুহূর্তেই ছুটিয়া গিয়া উহার হাত ধরিয়া জোরে টান মারিয়া সে বলিল, যা, বেরিয়ে যা এখান থেকে—কেন মরতে আছিস্ এখানে?

বালিকার চক্ষু ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। সেই নির্বোধ বালিকার মধ্যে বোধ হয় ঈষৎ বুদ্ধির সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু কোন কথাই সে বলিল না, গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য সে ধীর পদক্ষেপে দরজার দিকে আগাইয়া যাইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ স্থিরভাবে মৃত্যুন তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিল। বালিকা দরজার নিকটবর্তী হওয়ামাত্র সে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। চক্ষের জল আর বাধা মানিল না—আপন মনেই রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, মা, মা আমি মৃত্যুন নয়, আমি মৃত্যুঞ্জয়।

বিশ্বম্ভরের কন্যা বাঁচিয়া গেল। সেদিন সঙ্ঘের ঘরে এক রাশ খাবার ও ফল লইয়া আসিয়া মৃত্যুনকে লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বিশ্বম্ভর বলিল, তোমার জন্যেই নিয়ে এসেছি বাবা—তুমি তৃপ্ত হলেই মেয়ের আমার মঙ্গল হবে।

কে একজন উচ্চ হাস্যের সহিত বলিয়া উঠিল, যা বলেছেন, ও বার নি বলেই ত বেঁচে গেল মেয়েটা।

মৃত্যুন ছাড়া সকলেই হাসিয়া উঠিল। আহার্য্য পাইলেই ছেলেরা খুশী—তাহারা উৎসাহের সঙ্গে আহারে লাগিয়া গেল, কিন্তু মৃত্যুন কিছুই মুখে দিতে পারিল না। একজন তাহাকে

একটা ঠেলা দিয়া বলিল, চালাও না, একেবারে ঘ্যানঘ কেন?

শিরোপিতের তায় জাগিয়া উঠিয়া মৃত্যুন উত্তর করিল, নাঃ, এখানে খাব না, বাড়ী নিয়ে যাব। বাতাসী একলা আছে, উঠি। একটা পুঁটুলীতে কিছু মিষ্টি ও ফল লইয়া সে বাহির হইয়া গেল।

নিতান্ত অন্যমনস্কের মতই সে পথ চলিতেছিল। বিশ্বম্ভরের মেয়েটা সত্যিই বাঁচিয়া গেল ত! সে যায় নাই বলিয়াই কি! তাহার দৃষ্টির মধ্যে···। না, সে ভাবিতে চায় না। চলিতে চলিতে একটু ঘুরপথে ঘোষালদের গৃহের সম্মুখে আসিয়াই সে একেবারে চমকিয়া উঠিল। ক্রন্দনের রোল! তবে কি ঘোষালদের অসুস্থ ছেলেটা মরিয়াই গেল! থমকিয়া দাঁড়াইয়া ফিরিয়া চাহিতেই মণি ঘোষাল তাহাকে দেখিয়া ফেলিল, দেখিয়াই উচ্চ ক্রন্দনের স্বরে বলিয়া উঠিল, ওরে মেভারে, তুই যেদিন এসেছিলি সেদিনই বুঝেছিলাম অরুণ আমার আর বাঁচবে না রে। তার পর কতকটা শান্ত কণ্ঠেই বলিল, এবার বাকী কাজটাও সেরে ফেল—খেয়েছিস্ যখন তখন ভাল করেই খা।

মৃত্যুনের মুখ হইতে সমস্ত রক্ত কে যেন শুষিয়া লইল। কিন্তু বেশীক্ষণ সে দাঁড়াইয়া থাকিতেও পারিল না। জীবনে এই প্রথম সে শ্মশানযাত্রার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিল। নিজে সাধিয়া যে এতদিন শবদেহ টানিয়া বেড়াইয়াছে সেই আজ দুই হাতে কান চাপিয়া দ্রুত স্থানত্যাগ করিয়া গেল। হাতের পুঁটুলিটা খসিয়া পড়িল পথের উপর, ফলগুলি গড়াইয়া গেল এদিক-ওদিক, সন্দেশগুলি মাটিতে দলা পাকাইয়া গেল।

দ্রুতপদে সে গৃহে ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়াই দেখিল সেই অবেলায়ও শয্যায় শুইয়া আছে বাতাসী। তাহার গায়ে হাত দিতেই সমস্ত রক্ত জল হইয়া গেল মৃত্যুনের—বালিকার দেহ যেন পুড়িয়া যাইতেছে। স্নেহস্পর্শ গায়ে লাগিতেই বালিকা চক্ষু মেলিয়া চাহিল—চক্ষু দুইটা টক্‌টকে লাল হইয়া উঠিয়াছে।

তার পর কয়েক দিন ধরিয়া অনবরত পরিশ্রম করিতে লাগিল মৃত্যুন। সহকর্মীরাও সহায়তা করিতে লাগিল যথেষ্ট—কিন্তু মুহূর্তের জন্যও তাহাকে বালিকার শয্যাপার্শ্ব হইতে সরাইয়া লইয়া যাইতে পারিল না।

সাত দিন কাটিয়া গিয়াছে, বালিকার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া উঠিতেছিল। বালিকার মৃদু কম্পিত ঠোঁট দুইটার দিকে স্থির নেত্রে চাহিয়া বসিয়া আছে মৃত্যুন—শিয়রের দিকে মিটি মিটি জ্বলিতেছে একটি প্রদীপ। বাহিরের অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। সেইখানে অনেকে বসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলিতেছে।

চারি দিকে যেন একটা কিসের রহস্য ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে—মৃত্যুলোকের স্পর্শ লাগিয়াছে বোধ হয় সবার মনে। স্থির চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া মৃত্যুন ভাবিতেছিল বাতাসীর কথা—করুণাময়ীর কথা। ভুল করিয়াছে করুণাময়ী, তাহার গচ্ছিত সম্পত্তি বোধ হয় আর রক্ষা করা গেল না।

অকস্মাৎ বাহিরে বিশ্বম্ভরের কণ্ঠ শোনা গেল। কাহাকে লক্ষ্য করিয়া সে যেন বলিল, মেয়েটাকে বাঁচাতে হলে ওকে সরিয়ে নাও ওখান থেকে। দেখছ না কেমন ধীরে ধীরে রক্ত শুষে নিচ্ছে—ওর ভেতরে আছে মৃত্যুর হাওয়া।

বিশ্বম্ভরের স্বর চাপা হইলেও স্পষ্ট। প্রত্যেকটি কথাই মৃত্যুনের কানে আসিয়া বাজিল। তাহার সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মৃত্যুঞ্জয় তবে সে নহে, মৃত্যুদূত হইয়াই আসিয়াছে পৃথিবীতে। সে থাকিলে কি তবে পৃথিবী বাঁচিবে না? পৃথিবীই বাঁচুক—বাঁচুক ভীত, ত্রস্ত মানুষ।

সহকর্মীদের বাতাসীর নিকট বসাইয়া বেড়াইবার উদ্দেশ্যে একা বাহির হইয়া গেল মৃত্যুঞ্জয়। মাথা ঠাণ্ডা হইবে মনে করিয়া সহকর্মীরা খুশী হইল। অন্ধকার রাত্রি পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল অন্ধকারের পথিককে। পৃথিবী কত অন্ধকার-ই না আনিয়া দিতে পারে!

কাশ্মীর : গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তসমূহ দ্বন্দ্বে আহূত

দাদা ধর্ম্মাধিকারী

আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ

সংস্কৃতে একটি অতি প্রসিদ্ধ কথা আছে, তাহা এই : অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ বিনষ্ট হয়, আর সন্তুষ্ট হয় রাজা। এই বচনে এ কথাই পরিব্যক্ত করা হইয়াছে যে, নিজ রাজ্যবিস্তারে রাজার কখনও সন্তুষ্ট হইতে নাই। প্রতিনিয়ত নূতন নূতন প্রদেশ নিজ রাজ্যভুক্ত করার চেষ্টা তাহার নিরন্তর করা চাই। যে রাজা তাহা না করেন তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কোন এক ব্যক্তির রাজ্যাকাঙ্ক্ষা যেমন তাহাকে নিত্য নূতন নূতন প্রদেশ জয় করিতে প্রেরণা দেয়, তেমনি রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়সমূহের রাজ্যলিপ্সাও তাহাদিগকে নূতন নূতন দেশ অধিকার করিতে প্রেরণা দেয়—ইহার নাম "সাম্রাজ্যবাদ"। কোন এক ব্যক্তির নিজ দেশের উপর প্রভুত্বকে রাজ্য বলে, আর কোন এক দেশের অপর দেশের উপর প্রভুত্বকে সাম্রাজ্য বলে। এই রাজ্যলিপ্সা যখন কোন দেশের জনগণকে পাইয়া বসে তখন তাহারা অন্য দেশের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চাহে, আর উহাকে ঐ দেশের বিমুক্তিকরণ বলা হয়। উহাতে যাহাদের বিমুক্তিকরণ করা হয় তাহাদের মতামত নির্দ্ধারণের কোন কথা নাই।

পাকিস্থানের বনিয়াদ

কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্থানের মনোবৃত্তি ও নীতি বরাবর এইরূপই রহিয়াছে। অবাস্তব সম্প্রদায়বাদের ভিত্তিতেই পাকিস্থান রাজ্য রচিত। যে মুসলমান সে আমাদের, সুতরাং যেখানে মুসলমান সংখ্যায় অধিক, সে প্রদেশও আমাদের—এরূপ সহজ সরলই তাহাদের তর্কশাস্ত্র। তাই পাকিস্থানের কথা—কাশ্মীর আমাদের, কেননা সেখানে মুসলমান সংখ্যায় বেশী। ওখানকার লোকেদের মতনির্ণয়ের আবার অপেক্ষা কি? উহাকে ভারতবর্ষের অন্যতম অংশ মনে করা আগাগোড়া অন্যায়।

সম্প্রদায়বাদীদের পাঁয়তারা

সম্প্রদায়বাদীদের তর্কশাস্ত্র উহাদের সুবিধা অনুসারে বদলাইয়া থাকে। যেখানে মুসলমান সংখ্যায় বেশী, সে প্রদেশ ত তাহাদেরই, কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে যেখানে কোন একজন মুসলমানের বা মুসলমান-সমুদয়ের প্রভুত্ব, সে প্রদেশের উপরও তাহারা নিজেদের দাবি চালাইয়া থাকে। জুনাগড়, হায়দরাবাদ, ভুপাল যদি পাকিস্থানভুক্ত না হইয়া থাকে ত তাহাতে পাকিস্থানের কোন দোষ নাই। পাকিস্থানী মনোবৃত্তিসম্পন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সত্ত্বেও সাফল্যলাভ হয় নাই। তাহাদের দিক হইতে চেষ্টার কোনই ত্রুটি হয় নাই। চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি সাফল্যলাভ না হইয়া থাকে ত তাহাদের কি দোষ? যে সকল মুসলমানের উপর ভারতরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ আনীত হইয়াছিল তাহারা পর্য্যন্ত পাকিস্থানে আশ্রয় পাইয়াছে। এবংবিধ সম্প্রদায়বাদের গতি বড়ই বিচিত্র ও নিগূঢ় হইয়া থাকে। আজিও যদি ভারতের কোন অংশে মুসলমানরা অধিক সংখ্যায় গিয়া বসবাস করিতে থাকে, আর পাকিস্থান সেই অংশকে নিজের বলিয়া দাবি করে, এবং তথাকার মুসলমান জনগণও উহাতে সম্মতি দেয় ত আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

"ইউ নো" : শব্দার্থের টাঁকশাল

প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে এই খণ্ড মহাদেশ একতার ভাবনাসূত্রে বাঁধা রহিয়াছে। সময় সময় ইহাতে অনেক রাজ্য ছিল, কিন্তু অনেক রাষ্ট্রের কল্পনা কচিৎই করা হইয়াছে। সম্প্রদায়বাদী মুসলমানের সংখ্যাধিক্য হেতু এবংবিধ যে দেশ তাহাও বিভক্ত হইয়া গেল, এবং একটি নূতন সম্প্রদায়বাদী রাজ্য গঠিত হওয়ার ফলে ঐ রাজ্যের সরকার ও জনগণ যে-কোন প্রশ্নকেই সম্প্রদায়বাদের চোখে দেখিতে লাগিল, তাই কাশ্মীরে ভারতের সৈন্য রাখা পাকিস্থানের দৃষ্টিতে আক্রমণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, আর কাশ্মীরের অধিবাসীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার পরোয়া না করিয়া তথায় পাকিস্থানী ফৌজের যাওয়া হইতেছে কাশ্মীরের স্বাধীনতা-সংরক্ষণ। তাই না বেনিগল নরসিং রাওকে ইউ.এন.ও-তে বলিতে হইয়াছে, 'এই পরিস্থিতিতে শব্দের অর্থ বড় দ্রুতগতিতে বদলাইয়া থাকে। হামলা, চড়াও, আক্রমণ যখন আমি করি তখন উহা বিমুক্তিকরণ, আর তুমি রক্ষার নিমিত্ত সহায়তা কর ত সে হইতেছে আক্রমণ।'

পাকিস্থানের আসল ভয়

অন্য সব দেশীয় রাজ্যের ন্যায় ইংরেজ আমলে কাশ্মীর ভারত-রাজ্যের অন্যতম অঙ্গ ছিল। ইংরেজ চলিয়া যাওয়ার পরে পাকিস্থান আলাদা হইয়া গেল; আর ধরিয়া লওয়া হইল যে দেশীয় রাজ্যসমূহ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারী হইয়াছে। পাকিস্থানের অবশ্যই ইচ্ছা ছিল যে কাশ্মীর তাহার অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বেচ্ছায় হইবে এই বিশ্বাস না থাকায় উহার উপর চাপ দেওয়ার জন্য অকস্মাৎ বিদ্রোহ করাইল ও আক্রমণ করিল। আত্মরক্ষার নিমিত্ত কাশ্মীরের মহারাজা ভারত-সরকারের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। অমনি ভারত-সরকার সাহায্য করিতে পারেন না, তাই মহারাজা কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করিতে রাজী হইলেন। কাশ্মীরের অধিবাসীদের নেতা ছিলেন শেখ আবদুল্লা। তিনি প্রথম হইতেই কাশ্মীরকে ভারত-রাষ্ট্রভুক্ত করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তদনুসারে কাশ্মীর ভারতরাষ্ট্রের অংশ হইয়া

গেল, কিন্তু তাহা হইলেও তথাকার অধিবাসীদের এই স্বাধীনতা রহিয়াছে যে ইচ্ছা করিলে তাহারা পাকিস্থানভুক্ত হইতে পারিবে। কিন্তু ইহার জন্ত চাই শান্তি। শান্তির আবহাওয়াতেই মাত্র লোকে স্বাধীনভাবে নিজ মত ব্যক্ত করিতে পারে, কিন্তু সম্ভবতঃ পাকিস্থানের মনে এই ভয় রহিয়াছে যে কাশ্মীরী মুসলমান পাকিস্থানের পক্ষে ভোট দিবে না। তাই পাকিস্থান কাশ্মীরে কৃত্রিম প্রভাব সৃষ্টি করিয়া রাখিতে চাহে। আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি (গ্যারাণ্টি) সে দিল না। তবুও অল্পসংখ্যক মাত্র ভারতীয় সৈনিকের উপস্থিতি পর্য্যন্ত তাহার কাছে অবাঞ্ছনীয় মনে হইতেছে, কিন্তু নিজ রাষ্ট্রের সেনা তথায় রাখিতে তাহার আপত্তি নাই। নিজপক্ষে মতদান করাইবার জন্যই যে এই সব পাঁয়তারা ইহা হইতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। ইহাই কাশ্মীরের ঝগড়ার বড় কথা, আর ইহাই সব কলহের মূল।

সম্প্রদায়বাদের দৃঢ় প্রতিকার

ইহাতে ভারতের রাজ্য-তৃষ্ণার প্রশ্নই উঠে না। কাশ্মীরের প্রতিনিধিরা সূচনাতেই যদি ভারতের বদলে পাকিস্থানের সামিল হওয়া পছন্দ করিতেন, আর তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারত জোর-জবরদস্তি করিয়া কাশ্মীর-রাজ্যে প্রবেশ করিত তাহা হইলে অন্য কথা ছিল। কিন্তু আজ ত এক প্রকার কাশ্মীরীদের সম্মতিক্রমেই ভারত নিজ রাজ্যের অংশই সংরক্ষণ করিতেছে। আক্রমণ ত ইহা নয়ই, অতিক্রমণও নহে, ভারতের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পাকিস্থানের সন্দেহ করা 'উল্টা···কোতোয়ালকে শাসানো'র ন্যায়; অতএব পাকিস্থানের বিবাদে নিজ নীতি হইতে ভারতের এক চুল নড়াও সমীচীন হইবে না। গণতন্ত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণের বিধিসমূহ পুরাপুরি পালন করার পরে ভারত যাদৃশ বিচার-বিবেচনার সহিত পদক্ষেপ করিয়াছে, তাহাতে তাহা প্রত্যাহার করার প্রশ্নই উঠে না। দৃঢ়ভাবে সম্প্রদায়বাদের প্রত্যুত্তর দেওয়া প্রগতিশীল রাষ্ট্রমাত্রেরই কর্তব্য। ভারতের পক্ষে কাশ্মীরের প্রশ্ন সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন নহে, তাহা আসলে গণতন্ত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সংরক্ষণের প্রশ্ন; অতএব সেখানে সঙ্কোচ অথবা ইতস্ততঃ করিবার কোনই অবসর নাই।*

* 'সর্ব্বোদয়ে'র সৌজন্যে।

বাইশে শ্রাবণ

শ্রীবিভা সরকার

এসেছে শ্রাবণ বিরহী শ্রাবণ
শূন্য শ্রাবণ আজি,
গুমরি গুমরি ধরণীর বুকে
রোদন উঠেছে বাজি।
সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতায়
প্রকৃতি-মায়ের আলো নিভে যায়,
আর্ত্ত হিয়ায় সারা দেশবাসী
রাতের আঁধারে কাঁদে।
হারাল কি তারা বড় প্রিয়জন,
কেবা কেড়ে নিল অন্তর ধন?
মরণ-বিজয়ী মৃত্যুঞ্জয়ে
মহাকাল বুঝি সাধে?
নহে নহে নহে, এ মহা মিথ্যা,
মৃত্যু তোমার নাই,
অনন্ত পথ হয়েছ যাত্রী
অমৃতের গান গাই।
সে যে অবিনাশী নাহি তার ক্ষয়
মহাকালজয়ী সে জ্যোতির্ম্ময়
জীবন-মরণ এক হয়ে যায়
ডুবিল মাটির রবি।

যে চির অমর নাহি যার জরা,
কীর্ত্তি যাহার বিস্ময়ভরা,
উদয়-অচলে উদ্ভাসি আলো
জাগে সেই রবি কবি।
মহৎ পিতার যোগ্য পুত্র,
মহতী তোমার আশা,
সবার লাগিয়া হে মহাসাগর
বুকভরা ভালবাসা।
পেলে যত তুমি দিলে তার বেশী
আমরা অবুঝ তবু প্রত্যাশী
সাগরের বুক করি মন্থন
আরও কিছু যদি পাই,
কৌতুকে তুমি হাসিছ হেলায়,
হে মহামানব এ কোন্ খেলায়,
কোথা হতে পেলে অগাধ এ প্রেম?
তুলনা ত এর নাই।
নিবিড় মমতা হৃদয়ে তোমার
ধরণীর ধূলি লাগি,
এরই মঙ্গলে পরম পথিক
ছিলে কি একেলা জাগি?

ঘন দুর্য্যোগ আঁধার রজনী
কণ্টকময় হয়েছে সরণী,
জ্ঞান-দীপখানি জ্বালিয়া যতনে
একেলা পথিক চলে।
জনে জনে তব রাখি-বন্ধন,
দু'হাতে বিলায়ে অন্তর ধন
বার বার দিলে অভয় বচন
জনতার কোলাহলে।
আসন তোমার জনগণ-মনে
চিরতরে পাতা যোগী,
মহালক্ষ্মীর হে বরপুত্র,
রাজভোগে নহ ভোগী।
প্রণমি তোমায় রাজার কুমার,
বাঁধনি কোথাও ঘর আপনার,
এ সারা ভুবনে ছুটিয়া বেড়ালে
কোন্ মহাধন খুঁজি?
তুষার-শুভ্র হিমালয় সম
বিরাট যে তুমি, নমো নমো নমঃ,
ধূলি-ধরণীতে নিজ মহিমায়
অমৃত পেয়েছ বুঝি।
মহিমা তোমার যেন হিমালয়
দূর হতে পূজা করি।
কঠিন কঠোর ও পাষাণ বুকে
জন্মিল গিরিদরী।
ঘন অরণ্যে আঁধার গুহায়
নির্ঝরিণীর স্রোতে ছুটে যায়
তোমার হৃদয়-হিমাদ্রি হতে
প্রেমের অঝোরা ধারা,
গহনে বিজনে আপনার মনে
খেলা করি' করি' কুঞ্জ-কাননে
কাকলি-মুখর বন-উপবনে
গুঞ্জিত মনোহরা।
মরু-মরীচিকা করিল চকিত
তব নয়নের আলো,
মর্ত্ত্য-ধূলির কলুষ-কালিমা
ভাসাতে কি নীর ঢালো?
পথ বন্ধুর দেখি সম্মুখে
জেগেছে কি ভয় নির্ভয় বুকে?
তবুও থামে নি চরণ তোমার
এগিয়ে যেতেই জানো।

হে নীলকণ্ঠ, ধরণী-দুলাল
দু'হাতে সরালে যত জঞ্জাল,
নিবিড় মমতা হৃদয়-উৎসে,
শুধুই অমৃত দানো।
বন্ধন-মাঝে মুক্ত পুরুষ
সব পেয়ে সবহারা,
সবাকার তুমি পরম আপন
অফুরান প্রাণধারা।
পেয়েছ সকলি তবু নাই কিছু,
ভাসিয়া চলেছ মহাকাল-পিছু,
চির-বসন্তে হে চির-নবীন,
নহ কারো প্রত্যাশী।
হে বিরাট, তব মহিমা অপার
ক্ষুদ্র জনের নহে লভিবার,
সংসারে তব মহাবন্ধন
তবু চির সন্ন্যাসী।
দূরের বন্ধু হে মরণজেতা,
সীমাহীন বিস্ময়ে
অতি চুপে চুপে প্রাণে পেতে চাই
সম্ভ্রমে ভয়ে ভয়ে।
তুমি শুধু হাস মৃদু মৃদু হাসি,
ক্ষমাশীল চোখে ওঠে উদ্ভাসি
কি অগাধ প্রেম ঘন আশ্বাসে,
তবুও যে ভয়ে মরি,
দেবতা-পূজায় দেব কোন্ ফুল,
আকুলি উঠেছে প্রাণের দুকূল'
মানস-কুসুম এনেছি কুড়ায়ে
দুই অঞ্জলি ভরি।
ভরিয়া নিলে কি যাবার বেলায়
হে কবি সোনার তরী,
জীবন-ফসল দু'হাতে কুড়ায়ে
ধরণীর ধনে ভরি?
এ কোন্ অসীমে যাত্রা তোমার,
পাড়ি দিতে গেলে কোন্ পারাবার,
বলে যাও কবি, ক্ষোভ কিছু নাই
জীবনের জয় গানে,
কোটি প্রাণ হতে উঠিয়া প্রণাম
ঊর্দ্ধে উঠিছে, গাহি তব নাম
আমি তারই সাথে জুড়ি দুই কর
শ্রদ্ধায় নত প্রাণে।

“পার্সিফোন”

শ্রীশঙ্কর বসু

উঁচু পাহাড়ের উপর একটি পার্ক—সবুজ গাছ আর লতায় ফুলে সাজানো। সেই পার্কের মাঝে অব্জারভেটরী। সতকোটা বড় বড় লাল মৌসুমী ফুলগুলিকে দেখাচ্ছিল আগুনের শিখার মত। শোভা তাদের অপূর্ব্ব। অব্জারভেটরীর চূড়ায় এক দেবীমূর্তি—নৈশ আকাশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, কাঁধে তাঁর বাহনটি। ঝক্‌ঝকে সাদা অব্জারভেটরীর গায়ে একটু নীলের আভাস পাওয়া গেল দিনের শেষে ম্লান গোধূলিতে। চারিদিক ঘিরে নিঃসঙ্গ নীরবতা—মনে হ'ল মাত্রা আর একটু বাড়লে বোধ হয় ঐ মহামৌনতা বাস্তবে রূপ নিয়ে জমাট বেঁধে ছড়িয়ে পড়বে ম্যাগ্নোলিয়ার পাতায় পাতায়। পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ছিল ঢেউয়ের পর ঢেউ—বিরামহীন তাদের ছল ছল শব্দ নীচে থেকে উপরে এসে চারদিকের স্তব্ধতাকে আরও নিবিড় করে দিলে বলে বোধ হচ্ছিল।

অতিকায় এক টেলিস্কোপ—দেখাল যেন এক জঙ্গী জাহাজের দীর্ঘ, ঊর্দ্ধমুখী কামানের মত। একটু একটু করে ঘুরে, থামল শেষে আকাশের বুক লক্ষ্য করে। টেলিস্কোপটির কাচের এক প্রান্তে ঝিকমিক্ করে উঠল তারার মালা—অপর প্রান্তে প্রতিফলিত হ'ল এক ভদ্রলোকের কেশবিরল মাথা। তিনি সোভিয়েট সর্ব্বোচ্চ বিজ্ঞান-পরিষদের সদস্য, অনেকগুলি জ্যোতির্বিজ্ঞান সমিতির সভ্য—অধ্যাপক আলেক্সী কুব্লাজব।

এইখানে ক্রিমিয়ার এই ছোট মানমন্দির থেকে অধ্যাপকের বিবিধ আবিষ্কার ও সিদ্ধান্ত, তাঁর প্রবন্ধ, পরীক্ষার ফলাফল, রবিরশ্মির গোপন তথ্য আর রহস্য সব কিছুরই বিবরণ পাঠানো হ'ত জগতের সর্ব্বত্র। আর এই উঁচু পাহাড়ের উপর উঠে আসত বুড়ো জুকিম—ডাকপিওন—যে অধ্যাপকের প্রায় সমবয়সী। সে নিয়ে আসত মোটা মোটা ভারী ভারী পার্শেল, চিঠি—তাদের গায়ে সাগরপারের দূর বিদেশের ডাকঘরের ছাপ, আর বিচিত্র ডাক-টিকিটের সমাবেশ—দেখলে মনে হয় এ যেন কোন বীরশ্রেষ্ঠের বহু বিজয়ের মালা।

“গুড্ মর্নিং প্রোফেসার”—হাসিমুখে অভিনন্দিত করত জুকিম উপরে উঠবার সময়। চওড়া সিঁড়ির ধাপে ধাপে বসানো ফুলের টব—সূর্য্যের আলোয় চোখ ঝলসে যেত—ঐ সিঁড়ির সাদা রঙে। “এই নিন—দেখুন ইজিপ্ট্ থেকে আবার কি এল। বোধ হয় তারা নূতন কোন নক্ষত্র খুঁজে পেয়েছে, নয়তো পুরাণো কোন একটাকে হারিয়েছে।”

ডাকপিওন জুকিম ও বিখ্যাত পণ্ডিত আইভ্যান ছাড়া এই পাহাড়ের উপর কেউ কখনও আসত না। মাসান্দ্রায় দ্রাক্ষা-চাষ সম্পর্কীয় লাইব্রেরীর কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন আইভ্যান। কদাচিৎ বছরে একবার কি দু'বার পাহাড়ের উপরকার মানমন্দিরে উপস্থিত হতেন তিনি। বহুদিন পর দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু মিলতেন একান্ত আগ্রহে। তাঁদের সামনে থাকত পান-পাত্র, ভিতরে তার ক্রিমিয়ার অথবা মাসান্দ্রার অনেক—অনেক দিনের পুরাণো মদ—প্রতিটি সুধাবিন্দু যার সজীব হয়ে উঠত রঙ্গে, রসে, কৌতুক আর অধীর আনন্দে। নেশার রঙ্গীন পরশ লাগত দু'জনের—তাই একজন অন্যকে মাতিয়ে তুলতে চাইতেন এই বলে—“এইবার বল আলেক্সী—স্বীকার কর যে এ রকম তুমি কিছুই কোন দিন খাও নি”—

“আর তুমিও আইভ্যান এই সমারোহের মাঝে এই তারা, চাঁদ, আলো, গ্রহে ভরা সভায় বস নি ত কোন দিন—হাঁ—শুধু তোমার জন্য আমার এই উদ্যোগ আয়োজন—”

মাঝে মাঝে প্রোফেসার কিছু দিনের ছুটি নিতেন; সেই ছুটিই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র বিলাস। এই সময় তিনি পাহাড় থেকে নেমে আসতেন নীচের শহরে ছুটি কাটাবার জন্য—জায়গাটা ছিল স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। সারা বছরের একটানা পরিশ্রম থেকে মুক্তি পেয়ে বিশ্রামের জন্য এখানকার বিভিন্ন স্বাস্থ্যনিবাসে দলে দলে উপস্থিত হ'ত কারখানার ফোরম্যান, এরোপ্লেনের ডিজাইনার। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ এবং খেলোয়াড়রাও মিলত এখানে। এসে জুটত সুদূর কাম্স্কাট্কার শিকারীরা, হারপুন্ ছোড়ায় যারা সুদক্ষ; আসত কাজাকস্থানের অভিজ্ঞ সব লোক—পশুপালনের খ্যাতি যাদের সুদূরবিস্তৃত। অগণিত এই নারী ও পুরুষ তাদের মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে চেয়েছিল স্বর্ণযুগের পৃথিবী—স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, অভিনবত্বে ভরা। তাদের সুসম্বদ্ধ কাজের ভিতর আভাস পাওয়া যেত তিমির রাত্রির শেষে রবিকরোজ্জ্বল প্রভাতের। কৃষ্ণসাগরে জাগত ঢেউ তাদের প্রশংসায়। সাগরের তীরভূমি জুড়ে স্বাস্থ্যান্বেষীরা মেতে উঠত রৌদ্র উপভোগে। অসংখ্য সাদা উপলখণ্ডে ভরা সাগরতট। যাকে দেখে মনে হ'ত মহাকালের যাদুর পরশ পেয়ে উজ্জ্বল, মসৃণ হয়েছে সে বিশেষ করে এই সমাগত অতিথিদের জন্য।

ষাট পেরিয়ে গেলেও প্রচুর উৎসাহ ছিল অধ্যাপকের। সাঁতার দিতে পারতেন তিনি অক্লান্তভাবে। ঢেউ কাটিয়ে এগিয়ে যেতেন দূরে গত দশ বছরের নোঙ্গর ফেলা ভাঙ্গা বজরাটি ছাড়িয়ে—জলের উপরে তাঁর মাথাটি শুধু চক্‌চক্ করত আর তীরে ফিরে আসত তাঁর বিদ্রূপ-মাখানো কণ্ঠস্বর—“নও জোয়ানের দল। এই বুড়োর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেতে চাও

কেউ ?" এই রকম একটি অলস সন্ধ্যায় জনতার মাঝে অধ্যাপককে দেখা যেত তাঁর মোটা বেতের ছড়ি হাতে। মাংসের সুতীব্র গন্ধ আর বাজনার মৃদু রিনঝিন্ ভেসে আসত ছোট ছোট পাম ভোজনশালা থেকে। এদের যে-কোন একটিতে যেতে ভালবাসতেন অধ্যাপক, আশ মিটিয়ে বেশ আপ্ রুচি-খানা তার পর বসে বসে গল্পকরা—মাঝে মাঝে এক চুমুকে এক পেগ—ভাল লাগত তাঁর।

ছুটি ফুরালে পাহাড়ের উপর ফিরে গিয়ে তাঁর সহকারীদের বলতেন অধ্যাপক খুশির সুরে—"হাঁ, ছুটি আমার কাটল ভালই—আর জান ত এ বছর ভারী আমুদে লোক সব এসেছে ঐ নীচে। যা হোক এস আমরা গ্রহনক্ষত্র নিয়ে পড়ি—ওদের দেখিয়ে দিই আমাদের শক্তির রূপ।"

কিছুকাল ধরে ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন অধ্যাপক—একটা চাপা উত্তেজনার ছাপ লেগে থাকত তাঁর মুখে সারাক্ষণ। আর এই উত্তেজনার সূচনায় সকলেই বুঝত কোন নূতন আবিষ্কারের কথা বৈজ্ঞানিকের মনে পড়েছে—বোধ হয় এবার আবিষ্কারের সময় আসন্ন। এই বিষয় নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন তাঁর বন্ধু আইভ্যান এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছিলেন অধ্যাপক একটু রহস্যের হাসি হেসে—"পার্সিফোন হে!···আমার মনে এখন শুধু তারই কথা···।"

ক্রিমিয়ায় সে বছরের সেই স্বপ্নমধুর দিনগুলি···উন্মনা পৃথিবী তিল তিল করে রূপ নিয়ে নিখুঁত হয়ে দেখা দিলে বোধ হয় সব পেয়েছির দেশে···আকাশে তারার মালা দুলে দুলে উঠত—কত নীচু—বোধ হয় নৌকার দাঁড় দিয়ে ছোঁয়া যেত তাদের। তাঁর কাজের পক্ষে সবই যেন একান্ত অনুকূল—খুসীমনে হাতে হাত ঘষতেন প্রোফেসার। কিন্তু জুনের এক রাতে হঠাৎ কুণ্ডলাকার ধোঁয়া এসে লুকিয়ে ফেলল তারাগুলিকে দৃষ্টিপথ থেকে। কৃষ্ণসাগরস্থ নৌবহরের যুদ্ধ-জাহাজগুলি এগিয়ে গেল দূরের পানে ঢেউ ঠেলে পুরোদমে—আক্রমণের জন্ত প্রস্তুত ছিল তারা। তাদের পিছনে ফেলে যাওয়া ধোঁয়ার কুণ্ডলী মিলিয়ে গেল দিগ্বলয়ের সীমা-রেখার পারে।

টেলিস্কোপে চোখ ছিল অধ্যাপকের। তার কাঁচের উপর ছায়া পড়ল অনেকগুলি জার্মান বিমানের—তাদের পাখায় মুছে গেল জ্যোতির্বিদের উদার আকাশের ছবি—কেঁপে উঠল অতিমাত্রায় স্পন্দন-চঞ্চল মাধ্যাকর্ষণ যন্ত্র, মানমন্দিরের সব নীচের তলায় বিশেষ যত্নে রাখা—ক্ষতি হ'ল যন্ত্রটির।

খবরের কাগজ মারফত জার্মানদের নৃশংস আক্রমণের বিবরণ পড়ে ঘৃণাভরে মন্তব্য করলেন প্রোফেসর—"কি হৃদয়হীন অমানুষ ওগুলো—ওদের মত আর কিছু পৃথিবীতে এর আগে দেখেনি কেউ—ভাবতে লজ্জা হয় যে ১৯২৬ সালে ড্রেসডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রবন্ধ পড়ে শুনিয়েছিলাম এদের।"

অবজারভেটরীর ভিতর টেলিস্কোপের সাহায্যে নিজের কাজ চালিয়ে গেলেন অধ্যাপক নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে, বিপদের দিনে বৈজ্ঞানিকের প্রকৃত গুণের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর অধ্যবসায় থেকে—সাধারণের কল্যাণের জন্ত একমনে কাজ চালিয়ে যাওয়ার মধ্যে। একবার তিনি পাহাড় থেকে নেমে গিয়েছিলেন নীচে—শূন্ত বাড়ীগুলি পার হয়ে সহরের জনবিরল পথ দিয়ে ঘুরেছিলেন তিনি। মৃদু বাতাসে ঘরের পর্দা দুলে দুলে উঠেছিল—কোথাও কোন লোক ছিল না—ভরা বসন্তে তাঁর মনে হয়েছিল, চারদিক শুধু শীতের দিনের নিঃস্ব রিক্ততায় ভরা।

আবার পাহাড়ে ফিরে গেলেন প্রোফেসার—প্রথম যার দেখা পেলেন তাকেই ডেকে বললেন, আর্দ্র স্বরে "একবার ভাবত! বয়সে তরুণ সেই সব ছেলেদের কথা—যারা আসত তাদের ছুটির দিনে নীচেকার ঐ বড় বড় বাড়ীর ঘরে ঘরে, আজ তারা ট্রেঞ্চের ভেতর বসে; যতটুকু জানা আছে—তাদের অনেকেই হয়ত আর ফিরবে না কোন দিন।"

ইতিমধ্যে যুদ্ধ ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে লাগল। জার্মান ট্যাঙ্ক ছুটল আস্কানিয়ার সংরক্ষিত বনভূমির উপর দিয়ে। আহত হরিণগুলির মৃত্যু হ'ল বনের ভিতরেই। বিস্ময়ভরা তাদের চোখের কোণে জল রইল লেগে। বনের পাখীরা এসে বসল নিশ্চিন্তে কামানের উপর। জার্মানরা আরও কাছে উপস্থিত হ'ল। রাতের বেলা রকমারি আলো সাগরের উপর জ্বল জ্বল করতে লাগল।

অধ্যাপককে এক সময়ে জানিয়েছিলেন আইভ্যান যে, মাসান্দ্রা লাইব্রেরীর প্রাচীন ও বহুমূল্য সব নথিপত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বাটুমীতে। তাই বহু যুগের বৈচিত্র্যের স্মারক হিসাবে সেরা সেরা রং বেরঙের মদ জাহাজে করে সশস্ত্র পাহারায় নিয়ে যাওয়া হ'ল অন্তত্র। যাতে যুদ্ধের শেষে জয়-উৎসবের দিনে সকলের মনে থাকে তাদের যাদুমন্ত্রের কথা।

মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি অপসারণের কাজে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল। প্রকাণ্ড রিফ্র্যাক্টরটির বিভিন্ন অংশগুলি খুলে আলাদা করে নেওয়া হ'ল ও সাবধানে পাঠানো হ'ল, যাতে তার বহুমূল্য কাঁচগুলি জখম না হয়। কারণ ঐ কাঁচগুলি ছিল বহু সুদক্ষ কারিগরের অনেক পরিশ্রমের ফল। ছেড়ে যাবার যখন সময় এল তাঁর সহকারীদের ডেকে বললেন প্রোফেসার যে তাঁর অন্ত কোথাও যাবার ইচ্ছা নেই। তিনি জানালেন যে মানমন্দিরে ছোট রিফ্র্যাক্টর নিয়ে তাঁর কাজ

তিনি চালিয়ে যাবেন—পার্সিকোমের ফেরার জন্ত উদ্যোগ-আয়োজন শেষ করতে। কোনও বিরুক্তি করল না তাঁর সহকারীরা—কারণ তারা জানত প্রোফেসারকে তাঁর সঙ্কল্প থেকে টলানো অসম্ভব—সে চেষ্টা করাও মূর্খতা। আক্রমণের সঙ্কেত জানিয়ে বাজল সাইরেণ—পাহাড় থেকে পাহাড়ে উঠল তার প্রতিধ্বনি, বৃহৎ পক্ষীর একটি দলের মত দেখাল জার্মান বিমানগুলিকে। নীচে নেমে এসে গাছের একটু উপর দিয়ে উড়তে লাগল তারা। বোমা পড়ল বেশ কিছুক্ষণ। ধোঁয়া আর ধুলো ঢেকে দিল সারা শহরটিকে।

প্রোফেসারের সঙ্কল্পের কথা জানতে পেরে তাঁর বন্ধুরা সদলবলে হাজির হ'ল পাহাড়ের উপরে। তরুণ বৈমানিক সব—নৌবহরের অধীনে কাজ করত তারা—কাছেই ছিল তাদের ঘাঁটি। কতদিন কতবার তাদের বুঝিয়েছিলেন প্রোফেসার গ্রহনক্ষত্রের কথা—আকাশের ইতিহাস। বেপরোয়া এই ছেলেগুলি তাদের হাইড্রোপ্লেন শুদ্ধ নেমে আসত একেবারে জলের বুকে—তারপর হ'ত ঢেউয়ের উপর মাতামাতি। সাগরের জল তোলপাড় করে প্রোফেসারের সঙ্গে সাঁতারে পাল্লা দিত তারা। সেই ঘোঁটাটির কম্যাণ্ডার—সুগঠিত পেশীবহুল তার দেহ, চোখ দুটি শান্ত—হেঁকে বললে, অন্ত কোথাও আপনাকে যেতে হবেই প্রোফেসার—

আমি তা পারি না—ঠোঁটের কোণ কামড়ে ধরে একটু রাগের সঙ্গেই উত্তর দিলেন অধ্যাপক। ওটা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য—চিন্তিত ও উত্তেজিত থাকলে মনের খবর লুকাবার জন্ত মাঝে মাঝে অধৈর্য্য হয়ে উঠতেন তিনি।

এখানে থাকলে মারা পড়বেন—তবুও বোঝাতে চাইল কম্যাণ্ডার—আর তখন জবাবদিহি করবে কে?

আর একটি ছেলে এগিয়ে এল—জাহাজে চড়ে সাগর পার হতে ভরসা হচ্ছে না? বেশ বলুন এক লহমায় প্লেনে করে পৌঁছে দিচ্ছি। ভয়ের কোনও কারণ নেই—সাবধানে বেশ যত্নের সঙ্গে আপনাকে আমরা নামিয়ে দিয়ে আসব—চাই কি আপনার কিছু বইও আমরা নিয়ে যেতে পারি।...

'আমার বিশ্বাস করুন প্রোফেসার। এ আপনার ভাল লাগবেই'—জানাল তৃতীয় জন—'আর একবার হলেই দেখবেন আপনি তখন সকল সময় আমাদের সঙ্গে কাজ করতে চাইবেন।'

হেসে উঠলেন অধ্যাপক—না হে তা হয় না—আমার জায়গায় আরও বেশী পরিমাণ বোমা নিয়ে যেতে পার। আমার মত বুড়োর জন্ত জায়গা নষ্ট করার চেয়ে তাতে অনেক বেশী কাজ হবে না কি? না—আমি এখানেই থাকব—থাকতে হবে আমাকে বুঝেছ তোমরা—না থেকে কোন উপায় নেই···।

তাঁর টেবিলের টানা খুলে একটা গুটানো কাগজ বার করে ছেলেদের দেখালেন প্রোফেসার। কাগজখানির বয়স অনেক হয়েছিল—প্রমাণ পাওয়া গেল তার হলুদহোঁয়া ফিকে রঙে। প্রাচীন লাটিন ভাষায় তার উপর কি সব লেখা। কাগজের তলার দিকে আঁটা ছিল এক গোছা রেশম যার উপর মোটা মোটা শিলমোহরের ছাপ। অতীত সাক্ষী এই কাগজটির দিকে সশ্রদ্ধ চক্ষে তাকাল বৈমানিকেরা।

'এখানে যা লেখা আছে তার অনুবাদ আমি পড়ে শোনাচ্ছি। তা হলে তোমরা বুঝবে কেন আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে পারব না। এই দলিল আমার কাছে আছে, অনেক—অনেক বছর ধরে। আমার গোটা জীবন এরই সঙ্গে বাঁধা। একটু কেসে গলা সাফ করে আরম্ভ করলেন প্রোফেসার—দূরের থেকে ভেসে এল কামানের গর্জন—

"অনাগত সুদূর বিংশশতকের মধ্য ভাগের ১৯৪১ সনের অধিবাসী বিজ্ঞানশাস্ত্রানুধ্যায়ী বন্ধুবর সমীপেষু—

হে মহীয়ান্,

করুণাময় ঈশ্বর ও মহিমার্ণব সম্রাটের নাম স্মরণ করিয়া বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে সবিনয়ে এই সংবাদ আপনাকে নিবেদন করিতেছি। আমাদিগের পরিচয়ের অবকাশ মিলিবে না—দুর্জ্জের কাল উভয়ের মাঝে প্রায় সার্দ্ধ দুই শতাব্দীর ব্যবধান রচনা করিবে। গতকল্য—১৬৯৬, তারিখ জুলায়ের সপ্তদশ দিবসে—পূর্ব্বাকাশে আণ্ড্রোমিডা নক্ষত্রমণ্ডলীর সান্নিধ্যে লম্বমান এক আলোকরেখা আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। তরবারির আকৃতিবিশিষ্ট ঐ জ্যোতিঃপুঞ্জ মহাশূন্তে ভ্রাম্যমাণ দুইটি গ্রহকে সম্পূর্ণ রূপে অবলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। এতৎসম্পর্কে সবিশেষ গবেষণার ফলে উক্ত রেখাটি বিরাট একটি ধূমকেতুর পুচ্ছরূপে প্রতীয়মান হইল। পর্য্যবেক্ষণে রত থাকিয়া মানমন্দিরের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অবশেষে উক্ত ধূমকেতুর শীর্ষদেশ আবিষ্কার করিলাম।"

বিগত শতাব্দীর লুপ্তপ্রায় ভাষায় রচিত এই অদ্ভুত চিঠির প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল বৈমানিকেরা। তেজোদৃপ্ত ঐ তরুণের দল দাঁড়িয়েছিল মানমন্দিরের গগনস্পর্শী গম্বুজের নীচে, আকাশভরা তারাগুলি ঘিরে রেখেছিল তাদের। দেয়ালে ছিল ছবি ওদের পানে তাকিয়ে থাকা—কেপলার, আর টাইকো ব্রাহের; বোধ হয় শতাব্দীর পার থেকে বস্তুত এই স্বর শুনছিলেন তাঁরা।

"প্রচুর হিসাবনিকাশের ফলে"—পড়ে চললেন অধ্যাপক—"এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে অত্ত হইতে দুই শত পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষান্তে মৎকর্তৃক পার্সিকোম নামে অভিহিত এই ধূমকেতু কক্ষপথে তাহার প্রদক্ষিণকার্য্য সমাধা করিবে। এবং ইহার ফলে—" এইখানে একটু থেমে তাঁর বন্ধুদের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হানলেন অধ্যাপক—"এবং ইহার ফলে ধূমকেতু পার্সিকোম ১৯৪১ সনে পুনরায় দৃষ্টিগোচর হইবে।

অতএব মহানুভব রাজাধিরাজ ও জগদীশ্বরের নামে শপথ করিয়া, সর্ব্বকালের সর্ব্বমানবের আশা-আকাঙ্ক্ষার কলগুঞ্জনের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া আমার অসম্পূর্ণ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে, হে অজ্ঞাত সহকর্ম্মী, আপনাকে বিনীত অনুরোধ করিতেছি। পার্সিফোনের গতিবিধির যথাযোগ্য তথ্যানুসন্ধান হেতু আপনার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের সর্ব্বত: প্রয়োগ কামনায় আপনাকে সাদরে আহ্বান জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

প্রচারক ডার্কেল কর্ণেলিয়াস

প্রবলপ্রতাপ রাজরাজেন্দ্র কর্ত্তৃক নিযুক্ত জ্যোতির্ব্বিদ। অদ্য ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাইয়ের সপ্তদশ দিবসে উজ্‌বাক্ শহরে এই পত্র রচিত হইল।"

কাগজের উপর থেকে চোখ তুলে বন্ধুদের পানে জিজ্ঞাসার ভঙ্গীতে তাকালেন প্রোফেসার। কঠিন, নীরস স্বরে, যেন কোন এক বক্তৃতার শেষে, প্রশ্ন করলেন তিনি—"কেউ কিছু বলবে ?"

"ব্যাপারটা খুব পরিষ্কার"—উত্তর দিলে কম্যাণ্ডার—"তবে দুঃখের কথা এই যে আপনার ধূমকেতুটি বড় অসময়ে দর্শন দিচ্ছে...আচ্ছা যদি আপনি স্থগিত রাখেন পার্সিফোনের চরিত-কথা কিছু দিনের জন্য ?"

"ধূমকেতুরা সময় আর সাগরের মত মানুষের কোন ধার ধারে না"—একটু হেসে জবাব দিলেন অধ্যাপক—"অতিরিক্ত রকমের সময়ানুবর্ত্তী তারা। বহু বৎসর বহু পরিশ্রম করে নিশ্চিতরূপে জেনেছি যে ডার্কেলের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত। আগামী কয়েক রাত্রির মধ্যেই পার্সিফোনের উদয় হবে আর তা দেখা যাবে মাত্র আকাশের এক প্রান্ত থেকে। আজ এখনই যদি আমি চলে যাই সেটা বৈজ্ঞানিকের উপযুক্ত কাজ হবে না— ভীরু মূঢ়ের যোগ্য আচরণ হবে। মনে কর তোমাদের উপর কোনও কাজের ভার দেওয়া সত্ত্বেও তোমরা সেটি এড়িয়ে গেলে—দুটিই একই ধরণের ব্যাপার নয় কি ?

'সবই বুঝলাম'—জানাল কম্যাণ্ডার ধরা ছোঁওয়া না দিয়ে —"ধূমকেতু না হয় ধূমকেতুই হ'ল। কিন্তু জানেন ত জার্ম্মানরাও কিছু ছেড়ে কথা বলে না। আপনি কে বা কি করেন তারা কানাকড়ি মূল্যও তার দেবে না।"

'নিপাত যাক জার্ম্মানরা'—হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন প্রোফেসার, 'যা হবার হোক, আকাশের বুক থেকে গ্রহনক্ষত্র ছিনিয়ে নিয়ে জার্ম্মানীতে পাঠিয়ে দিতে পারবে না ত তারা। মুষ্টিমেয় অত্যাচারীর উৎপাতে সুবিশাল বৈজ্ঞানিক জগৎ কিছুমাত্র বিচলিত হবে না। অচিরে ধূলিকণার মত মিলিয়ে যাবে তারা ইতিহাসের পাতায়। জান তোমরা এ সম্বন্ধে মহামতি গ্যেটের উক্তি—"মৃত্যুর নিশ্বাস ঘনগম্ভীর আকাশের গায়ে লাগবে না কোন দিন।"

বন্ধুদের বারণ অগ্রাহ্য করে প্রোফেসার কুবলাজত থেকে গেলেন তাঁর ছোট রিফ্র্যাক্টরটিকে সঙ্গী করে। তার পর কয়েক দিন কেটে গেল। গুলীবর্ষণ চলল ছোট শহরটির পথে পথে—প্রত্যেকটি বাড়ীর দেয়াল ভরে গেল তার চিহ্নে। কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধ ঐ বৈজ্ঞানিক নিপুণ সৈনিকের মত দৃঢ়পদে হেঁটে যেতেন অভিশপ্ত শহরের ভিতর দিয়ে। এল তারা বসন্তের সবচেয়ে সেরা দিন। প্রকাণ্ড সব প্রজাপতি বড় বড় লাল ফুলের উপর ঘুরে বেড়াতে লাগল। আলোর পাগল ভীমরুল আর মৌমাছিতে খণ্ডযুদ্ধ হ'ল কিছুক্ষণ। ম্যাগ্নোলিয়া থেকে ভেসে এল মিঠেকড়া গন্ধ। কিন্তু রডোডেন্‌ড্রন্ ও লতাগুচ্ছের আড়ালে আহত লোকেরা ক্লান্ত চরণে এগিয়ে চলতে লাগল, রক্ত-মাখা ব্যাণ্ডেজ সব চেপে ধরে।

জীবনে এই এক বার, এই প্রথম বার পৃথিবীকে প্রোফেসারের কঠিন, কঠোর বলে মনে হ'ল। সেই সন্ধ্যায় জার্ম্মানরা শহরটি দখল করলে। একজন অফিসারের অধীনে ছয় জন জার্ম্মান সৈন্য প্রবেশ করলে বড় ঘরে—যেখানে আলোর নীচে যন্ত্রের সামনে বসে এক মনে কাজ করে চলেছিলেন প্রোফেসার।

বলি ও বুড়ো এখানে কি করছ তুমি—প্রশ্ন করলে অজাতশ্মশ্রু এক জার্ম্মান।

আরে ও বসে বসে তারা গোণে—দেখতে পাচ্ছ না ? ভারী গলায় উত্তর দিলে জার্ম্মান অফিসার। নিতান্ত একটা অশ্লীল কথা উচ্চারণ করেছে এই রকম ভাব প্রকাশ পেল তার বলার ভঙ্গীতে।

এই সড়বড়ে থুড়থুড়ো এখান থেকে সরে পড় দেখি চট্‌পট্ —কানে গেল আমার কথা ?

ঘুরে দাঁড়িয়ে উত্তর দিলেন প্রোফেসার তাঁর কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে—আমি একজন বৈজ্ঞানিক—উপস্থিত আমি এক অতি প্রয়োজনীয় কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি। আমার কাজে বাধা না দিতে আপনাকে অনুরোধ করি আর আপনার লোকগুলোকে ঘর ছেড়ে এই মুহূর্ত্তে চলে যেতে দয়া করে আদেশ দেবেন কি ?

আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধা দেখ লোকটার—বিস্ময়াহত অফিসারের মুখ দিয়ে বেরুল অস্ফুট গুঞ্জন। কেপলারের ছবির দিকে চোখ পড়ায় সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে—এই, টুপী মাথায় ও লোকটা কে ?

উনি কেপ্‌লার, উত্তর দিলেন প্রোফেসার—বিখ্যাত জার্ম্মান জ্যোতির্ব্বিদ। গ্রহ-উপগ্রহের চলাফেরার মধ্যে একটা নিয়ম আছে সেটা উনিই সবপ্রথম আবিষ্কার করেন। কেপ্‌-লারের ল অফ মোশান বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রেরই পরিচিত।

রাবিশ—ক্ষণমাত্র দ্বিধা না করে ব্যঙ্গচ্ছলে বলে উঠল অফি-সার—তারার মত একান্ত অসার সব জিনিস নিয়ে মাথা ঘামায় নি কোন জার্ম্মান কোনদিন। এই বলে তুড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে ছেড়ে

দিলে তার হাতের সিগারেট। তার স্বদেশবাসী জগদ্বরেণ্য বৈজ্ঞানিকের ছবির বাঁ চোখে গিয়ে লাগল সেটা। অজাতশ্মশ্রু ছোকরাটা ইতিমধ্যে তার টমিগান তুলে ধরে গুলী ছুঁড়তে লাগল ছোট রিফ্র্যাকটরটিকে লক্ষ্য করে।

কত শিল্পীর কত সাধনার ধন দামী কাচের লেন্সগুলো গুঁড়িয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল দেখে প্রোফেসার বুঝলেন তাঁর সকল আশার সমাধি রচনা হয়ে গেল এই সঙ্গে। রাগে, ক্ষোভে তাঁর চোখে জল এল। পাছে তাঁর চোখের পাতা ওঠানামা করে তাঁর অজ্ঞাতে, পাছে প্রকাশ পায় তাঁর মনের খবর—নিজেকে তাই সংযত করে নিলেন তিনি। ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঁচকে অফিসারের কাছে গিয়ে ধীরোদাত্ত স্বরে জার্ম্মান ভাষায় তিনি বললেন—ভদ্রমহোদয়গণ! আপনারা যে অমানুষ এ সন্দেহ আমার বরাবরই ছিল। কিন্তু বর্ব্বরতার যে চরম দৃষ্টান্ত আপনারা দেখালেন স্বপ্নেও তা আমি কখনও ভাবি নি।

এক নিমেষের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেল অফিসারটি এই আকস্মিক অগ্ন্যুদগারে—পরমুহূর্ত্তেই তার পিস্তলের বাঁট দিয়ে সজোরে ঘা দিলে প্রোফেসারের মাথায়। তার পায়ের কাছে মাটিতে ছিটকে পড়লেন প্রোফেসার—রক্তে রাঙা হয়ে গেল তাঁর চুল।

ঐ অপদার্থটাকে ছুঁড়ে ফেলে দাও বাগানে—গর্জ্জন করে উঠল অফিসার। অসহ্য জ্বালায় জ্ঞান হারিয়ে ছুটে গেল সে টেবিলের দিকে, ডার্কেলের লেখা সেই দলিলখানি নিয়ে ছিঁড়ে, পিষে, পায়ের তলায় গুঁড়ো করে দিলে।

প্রায় তখন মধ্যরাত্রি হবে—জ্ঞান ফিরে পেলেন প্রোফেসার—কে যেন তাঁকে ঠেলছে। দেখলেন পার্কের ঘাসের উপর শুয়ে আছেন তিনি। তামাক-পাতার গন্ধ এল নাকে। অন্ধকারে গাছগুলিকে দেখাচ্ছিল ঠিক বড় বড় জয়ধ্বজার মত। বুড়ো পিওন জুকিম ঝুঁকে পড়ে তাঁর মাথায় ওষুধ লাগাচ্ছিল। "প্রোফেসার, এইবার আস্তে আস্তে পালাই চলুন"—কানে কানে বলল জুকিম—"নীচে আমার নৌকো তৈরি আছে। আমাদের লোক আছে যেখানে সেই দিকে আমরা যাব। যারা আমার শেষ সম্বল অত সখের মাথার টুপীটা পর্য্যন্ত ছিনিয়ে নিয়ে পালায়, কি জানবে তারা বিজ্ঞানের, কি বুঝবে তারা অঙ্ক আর গবেষণার কথা? এদের বর্ণনা করার ভাষা নেই কোন অভিধানে। জানেন আপনার বন্ধু আইভ্যানের কি অবস্থা তারা করেছে?"

সংক্ষেপে তাঁকে জানাল জুকিম—মাসাণ্ড্রার লাইব্রেরির কার্য্যাধ্যক্ষ আইভ্যানের উপর কি অত্যাচার করেছিল জার্ম্মানরা, কিভাবে শেষ অবধি গুলী করে মারল তাঁকে। তার অপরাধ হয়েছিল এই যে, সেলারের চাবী যেখানে ছিল, দেশ-বিদেশ থেকে অনেক যত্নে অনেক বছর ধরে সংগ্রহ করা নানা রকমের মদ—সেই সেলারের চাবী জার্ম্মানদের হাতে সঁপে দিতে অস্বীকার করেন তিনি। তাই সেলারে যাবার সিঁড়ির উপর আইভ্যান নিহত হন। এর কিছুক্ষণ পরেই একটি সোভিয়েট ক্রুজার থেকে গোলার পর গোলা এসে পড়ে সেই সব সেলারের উপর। মাটির নীচে ঐ ঘরগুলি থেকে মাসাণ্ড্রার সুপেয় সব বহুদিনের মদের দুর্ব্বার এক স্রোত বইল সাগরের বুকে—আইভ্যানের রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় তাদের রঙে রঙ মিশালো গিয়ে একটু একটু করে।

এক ঘণ্টা পর জার্ম্মানদের অনাচারে পর্য্যুদস্ত ছোট শহরটি ছেড়ে একটি নৌকা চলল বহু দূরে। বুড়ো পিওন দাঁড় বেয়ে চলেছিল। নৌকার ভিতর শুয়েছিলেন প্রোফেসার। উপরে তাঁর অসীম উদার আকাশ। বুঝি মর্ত্ত্যের যুদ্ধের ঢেউ সেখানেও পৌঁছাল। সন্ধানী আলোর নীলাভ রেখা মত্ত মাতালের মত ঘুরে ঘুরে উপরে উঠল—কত দূর-দূরান্তের গ্রহতারা ছোঁয়া গেল নাকি ওদের হাতে? বিমানবিধ্বংসী কামানের গোলা আকাশের এদিকে সেদিকে সিঁদুর ঢেলে দিচ্ছিল।

অফুরন্ত আলোর মেলা—সাতরঙা রামধনু—রঙের সাজি—আগুন জ্বালাল ঊর্দ্ধলোকে—ছড়িয়ে গেল দিকে দিকে দাবানলের মত। হঠাৎ খালি চোখে দেখা প্রায় দুঃসাধ্য এমনি ক্ষীণ আলোর ঝলক আকাশের বুক চিরে দেখা দিলে। প্রায় দু'শ পঁয়তাল্লিশ বছর পরে ঠিক সময়ে তার আবর্ত্তন শেষ করে ফিরল পার্সিফোন। রাতের সমারোহের মাঝে ঐ ধূমকেতুকে চেনা প্রায় অসাধ্য ছিল বললেই হয়। ম্লান হাসি খেলে গেল প্রোফেসারের ঠোঁটে, বহুযুগের পথচাওয়া তাঁর অতিথিকে পেয়ে—সম্ভবতঃ একমাত্র তিনিই দেখেছিলেন পার্সিফোনকে।

প্রোফেসারকে নিয়ে যাওয়া হ'ল এক সামরিক হাসপাতালে। আন্তরিক যত্ন ও সেবায় তিনি সেরে উঠতে আরম্ভ করলেন। এইখানে তাঁর পুরানো বন্ধুরা এল তাঁকে দেখতে—তরুণ সেই বৈমানিকেরা। পোশাক পরে সব রকমে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল তারা দূরপাল্লায় পাড়ি দেবার জন্য। এক ঘণ্টার মধ্যেই তাদের যাওয়ার কথা ছিল, কনষ্টান্জার উপর আক্রমণ চালাতে।

তাদের বিদায় নেবার সময় হ'ল। দুই হাতে ভর দিয়ে একটু উঠে বললেন প্রোফেসার তাদের উদ্দেশে—"ফেল বোমা জার্ম্মানদের উপর। আঘাতের পর আঘাত কর ওদের, আক্রমণের পর আক্রমণ। মনে রেখো যে রক্ষা করতে চলেছ তোমরা ধ্বংস ও অভিশাপের কবল থেকে শুধু রুশদেশকে নয়, অগণিত গ্রহ-তারা-নীহারিকাকে—যাদের উপর নিত্যকালের সব মানুষের অধিকার। হাজার যুগের দেশবিদেশের বৈজ্ঞানিক তোমাদের আশিস পাঠাচ্ছে। ভাবীকালের অনাগত বিজ্ঞান-পূজারীরা তোমাদের প্রেরণা যোগাবে আমি জানি। অটুট থাক তোমাদের শক্তি—যাত্রা তোমাদের সফল হোক।

দুর্জ্জয়! নির্ভীক! প্রীতি আর ভালবাসা জানালাম তোমাদের।" —বলতে বলতে তাদের পানে চেয়ে প্রোফেসারের চোখে জল গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু আজ তাঁর লজ্জা ছিল না। কারণ এ হ'ল আনন্দাশ্রু—তৃপ্তিতে ভরে গেল তাঁর মন। প্রাণে জাগল সাড়া—পৃথিবীতে তবে এখনও এ রকম বেপরোয়া সাবাস জোয়ান ছেলেরা বেঁচে আছে যাদের উপর সব ভার ফেলে দিয়ে ধূমকেতুরা আসা-যাওয়া করবে অবাধে, যাদের অমিত সাহস আর অসীম শক্তির উপর নির্ভর করে খেলে যাবে কচি ছেলের দল পরম নির্ভয়ে—জয় তাদের হবেই সুনিশ্চিত।*

* একটি রুশ গল্পের অনুবাদ।

রবীন্দ্রনাথের 'শান্তং শিবমদ্বৈতম'

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

সম্প্রতি ভারতরাষ্ট্র বিশ্বভারতীর ভার গ্রহণ করেছেন। প্রতিষ্ঠানটি ছিল আন্তর্জাতিক। জাতীয় রাষ্ট্রের হাতে তার নিয়ন্ত্রণ ন্যস্ত হ'ল। এতে বৈষয়িক দিক, বিশেষ করে এটির আর্থিক দায়িত্ব পাকা ভিত পেলে, এমন আশা করা অন্যায় হবে না। কবিকে বার্ধক্যে পর্যন্ত এই অর্থাভাব মেটাতে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হাতে ঘুরতে হয়েছিল। তাঁর ধ্যান-জ্ঞান-রচনার আরও অনেক সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল। তিনি বিশ্বভারতীর বৈষয়িক বেদীতলেই তা আহুতি দিয়েছিলেন। মানব-সংস্কৃতি তার ফলে একদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু বিশ্বভারতীর প্রসার এবং নিরাপত্তাবিধানই ছিল তাঁর শেষজীবনের প্রধান চেষ্টা। এই চেষ্টা করাকে তিনি ক্ষতি বলে গণ্য করেন নি। কিন্তু আজকের পথের চেষ্টার কথা সেদিন তাঁর একবারও মনে হয় নি। সাহায্য চেয়েছেন তিনি সকলেরই কাছে; ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র সকলের সাহায্য ও সহযোগের দ্বারাই বিশ্বভারতীর মিলন-সাধনা হবে সার্থক, সেই তো সমন্বয়ের পথ, কিন্তু তার জন্য কোথাও সে বাঁধা পড়বে কোন সুবিধার আশায়, একথা কবি ভাবেন নি কস্মিন্‌কালেও। বিশ্বভারতী বিশ্বজনের। তাঁর একার সাধনায় তিনি যে সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন তাকে সকলের সম্পদ করে সকলের হাতে তুলে দিয়ে যাবার মধ্যেই তিনি দেখেছিলেন তাঁর সার্থকতা। ভারতের জাতীয় রাষ্ট্র কবির আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখবেন, এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও একটি আশঙ্কা থেকেই যায়। দেশের পরিচালক রাষ্ট্র নানা সময়ে নানা মতের হতে পারে। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মানতে গেলে বিশ্বভারতীও কি নানা সময়ে নানা মত ও দলের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে? তখন কবির আদর্শ রক্ষা পায় কি করে?

কবির পথ ছিল রাষ্ট্রনিরপেক্ষ। এমন কি, কোন বিশেষ ধর্মের মুখাপেক্ষীও তিনি ছিলেন না। যার যেটুকু দেবার, যার থেকে যেটুকু নেবার, সে দেওয়া-নেওয়া ঘটত যার-যার নিজেরই গরজে। বাধ্যবাধকতার প্রশ্নই ওঠে নি। আজও যে সে প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এমন নয়। তবে রাষ্ট্রসংস্রব ঘটায় সে প্রশ্ন একদিন ওঠা বিচিত্র নয়, বিশ্বভারতীর বাস্তব সত্তা এইটুকু সম্ভাবনার মধ্যে এসে দাঁড়াল, তা বলতেই হবে।

কবির অবর্তমানে অন্য কারও একার বা সঙ্ঘগত সবার চেষ্টার মধ্যেও কবির ব্যক্তিত্বের অভাব মেটে নি; প্রতিভা-পূরণের তো কথাই ওঠে না; পরিশ্রম বা পরিচালনাশক্তিরও তেমন পরিচয় বহুকাল হয়তো দুর্লভই থাকবে। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে নানা সাময়িক পরিবর্তন ঘটবে। সেই ফাঁকে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কবির আদর্শের মৌলিক কোন পরিবর্তন বিশ্বভারতীতে যাতে না ঘটে, সেই দিকে সকলেরই অবহিত থাকা কর্তব্য।

২

সার্বভৌমত্বই যে রবীন্দ্রনাথের প্রধান আদর্শ ছিল, তা বিশ্বভারতীর আদর্শ ঘোষণা-পত্রের প্রথম সূত্রটিতেই জানা যায়। তাতে লেখা আছে:

"To study the Mind and Man in its realisation of different aspects of truth from diverse points of view."

কারও সত্যকেই কবি বাদ দেন নি; এমন কি স্পষ্টই বলেছেন, পরস্পর বিরুদ্ধ দিক থেকেও সত্যের পরিচয় পাবার জন্যই তাঁর এই বিশ্বভারতীর স্থাপনা।

এর পরে কবি বলেছেন, সব কাজই চলবে এক পরম সত্তার নামে; তাঁর পরিচয় কোন বিশেষ নামে নয়, মূর্তিতে নয়—কবি বলছেন তিনি একটি শক্তি মাত্র, সে শক্তি শান্ত, শিব, অদ্বৈত,—এই তাঁর পরিচয়।

শুধু বিশ্বভারতীর আদর্শ নয়, কবির জীবন ও বাণীর আদর্শকে কবি সুস্পষ্ট দেখেছিলেন একটি সংক্ষিপ্ত বাণীরূপে—"শান্তং শিবমদ্বৈতম্"-এ। পঁয়তাল্লিশ বছর পূর্বেকার ঘটনা।

১৩১৩ সনে শান্তিনিকেতনে উপাসনার সময় একদিন কবি এই শব্দ কয়টির ব্যাখ্যায় বলেছিলেন :

"জ্ঞানে কর্মে ও প্রেমে শান্তকে শিবকে ও অদ্বৈতকে উপলব্ধি করিবার একটি পর্যায় উপনিষদের 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' মন্ত্রে কেমন নিগূঢ়ভাবে নিহিত আছে, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখ।

প্রথমে শান্তম্। আরম্ভেই জগতের বিচিত্র শক্তি মানুষের চোখে পড়ে।...শক্তির মধ্যে তিনি নিয়মস্বরূপ, তিনি শান্তম্। অতএব এই সমস্ত শক্তিকে শান্তির মধ্যে সংবরণ করিয়া জানাই মানুষের জীবনের সর্বপ্রথম কাজ।

পরে শিবম্। সংযমের দ্বারা শক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই তবে কর্ম করা সহজ হয়।...আত্মপরের শতসহস্র সম্বন্ধের অপরিসীম জটিলতার মধ্যে কে সামঞ্জস্য করে? মঙ্গল। শান্তি না থাকিলে জগৎ-প্রকৃতির প্রলয়, মঙ্গল না থাকিলে মানব-সমাজের ধ্বংস। তাঁহার শান্তস্বরূপকে জ্ঞানের দ্বারা ও তাঁহার শিবস্বরূপকে শুভকর্মের দ্বারা মনে ধারণা করিতে হইবে। প্রথমে ব্রহ্মচর্য, পরে গার্হস্থ্য, প্রথমে শিক্ষার দ্বারা প্রস্তুত হওয়া, পরে কর্মের দ্বারা পরিপক্ক হওয়া। প্রথমে শান্তং, পরে শিবম্।

তারপরে অদ্বৈতম্।...মঙ্গল কর্মের সাধনায় যখন কর্মের বন্ধন ক্ষয় হইয়া যায়, অহঙ্কারের তীব্রতা নষ্ট হইয়া আসে, যখন আত্মপরের সমস্ত সম্বন্ধের বিরোধ ঘুচিয়া যায়, তখনই নম্রতা দ্বারা ক্ষমার দ্বারা করুণার দ্বারা প্রেমের পথ প্রস্তুত হইয়া আসে। তখন অদ্বৈতম্। তখন সমস্ত সাধনার সিদ্ধি, সমস্ত কর্মের অবসান।

...আমাদের সমস্ত জ্ঞানের দ্বারা যেন শান্তকে জানিতে পারি, আমাদের সমস্ত কর্মের দ্বারা যেন শিবকে দেখিতে পাই, আমাদের সমস্ত প্রেমের দ্বারা যেন অদ্বৈতকে উপলব্ধি করি।"

কবির এই আদর্শের সাধনস্থলই হচ্ছে শান্তিনিকেতন। এই মন্ত্রের শব্দ-বিন্যাসের ক্রমপর্যায়ের সঙ্গে সাধনার ক্রম-বিকাশের পর্যায়টিরও একটি সুন্দর সাদৃশ্য আছে। রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে শান্তিনিকেতনে প্রথমে শিক্ষার পত্তন হয় ১৯০১ সনে। সেটি ছিল ব্রহ্মচর্য বিত্যালয়ের পর্ব। তারপরে ১৯২২ সন। বিশ বছর পরের ঘটনা। বিত্যালয়-স্তর পেরিয়ে গেল। পরিণত বয়সের সাধনা প্রসারিত হ'ল বিশ্বভারতীতে। তখন শুধু সেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই পড়ে না, বয়স্ক পণ্ডিত এবং কর্মীরাও মিলেছেন এসে দলে দলে। বিভিন্ন বিভাগে গবেষণা, শিল্পচর্চা ও জনসেবায় তাঁরা রত। শিবম্-এর কর্ম-সাধনা তখন রূপ পেয়েছে। এই রূপ দিতে গিয়েই কবির জীবনও এসে পড়েছে শেষ সীমায়। তখন তিনি নিজে সাধনার যে স্তরে পৌঁছেছেন, তাঁর কাছে সত্যের যে রূপটি প্রকাশ পেয়েছে, সেটি অদ্বৈতের স্তর—এক কথায় সেটি হচ্ছে —"সোঽহং"। এ বিষয়ে কবির "মানুষের ধর্ম" গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্রনাথের শেষ কথা—এই "সোঽহং"। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাধনার ধারার ইতিহাস পর্যায়ক্রমে বহন করে "শান্তং শিবমদ্বৈতম্"-ই। কবি বলেছেন, সমগ্র বিশ্বসত্তাকে উপলব্ধির একটি পর্যায় নিগূঢ় ভাবে নিহিত আছে এই মন্ত্রটিতে। পরম স্তর অদ্বৈতবোধে উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ আমাদের কর্মজীবনের শেষ সীমা অবধি, কবির 'বিশ্বভারতী'র প্রসার; কবির 'সোঽহং'-কে উপলব্ধির সেটি কর্ম-সোপান, কিন্তু শেষ সোপান নয়। সেখানকার পক্ষে 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্'-এর মত মন্ত্রটি সাধন-শৃঙ্খলার পরম্পরা রক্ষা করে।

কিন্তু এই কথাটিকেই কর্তৃপক্ষ প্রথমে বর্জন করলেন। এর ফল ভাল কি মন্দ, সে সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হচ্ছে, বলা চলতেও পারে। তবে কর্তৃপক্ষ যে আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এই মন্ত্র বর্জন দ্বারা তাঁরা সেই প্রতিশ্রুতিতেই ধরিয়ে দিলেন সন্দেহ, আপাতত ফল দেখা যাচ্ছে এইটুকু। কারণ মন্ত্র বর্জন আর কিছু করে নি, করে রাখল একটি নজির স্থাপন। এই নজিরের পথে ছোট বড় অনেক কিছু বর্জন বা সংযোজন কালের ধারায় ঘটতে পারে।

শোনা যায়, বেধেছে ধর্মমতে। ভারতরাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ। উপনিষদের মন্ত্র সাম্প্রদায়িকতার ছায়াবাহী। এজন্য সংবিধানে আদর্শগত কাজগুলিকে স্থান দিয়ে ভাষাটুকুকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আপাত উদ্দেশ্য সাধু। কারণ সার্বভৌমত্ব রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, সার্বভৌমত্বের প্রসার কল্পেই এই বর্জন ঘটেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে ওঠে, রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌমত্বের অর্থ বা রূপটি কি। এটি কি বৈশিষ্ট্য বর্জন করে সার্বজনীনতার পরিপোষক?—এগুলি জানবার বিষয়। কবির জীবিতকালে বিশ্বভারতীর ঘোষণাপত্র থেকে তিনি ত এ মন্ত্র বর্জন করেন নি। যে-দেশে, যে-ভাষায় স্বাভাবিক ভাবে যে-বাণী উদ্গত হয়েছে, তাকে নির্বিচারে সাম্প্রদায়িকতার কোঠায় ফেললে, রবীন্দ্র-সাহিত্য এবং মূল রবীন্দ্রনাথকেও বিশেষ দেশের বিশেষ জাতের মানুষ বলে বাদ দিতে হয়। ভারত-ঐতিহ্য এড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে যাওয়া সম্ভবপর নয়। শাস্ত্রবাণী হলেও, তার ভিতর দিয়ে যদি উদার এবং যথাযথভাবে আদর্শের কথাটি ব্যক্ত হয়ে থাকে তবে তার সংরক্ষণই ছিল শ্রেয়ঃ। গ্রীক লাটিন ফরাসী ভাষার বিশেষ বচনগুলি ইংরেজী সাহিত্যে সচরাচরই মিলে; তাদের বিশেষ বিশেষ অর্থ অভিধানে আছে বাঁধা। তা জেনে নিয়েই গ্রন্থাদি পড়তে হয়। সেখানে না বাধলে, এখানেও সুস্থ বুদ্ধিতে কোথাও বাধবার কথা নয়। ভারতরাষ্ট্রেও হয়তো সেদিকে বাধে নি। কারণ তার ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শের শিরোভূষণ—"সত্যমেব জয়তে"—এই বাণী। সেটিও

তো শাস্ত্রবাণী এবং দেবভাষাই। তা হলে বাধবার কথা দেখা যায়, বাণীটিতে নিহিত ঈশ্বরবাদ নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের আস্তিক্যবুদ্ধি নিরীশ্বরবাদীকেও কোনোদিন বর্জন করেনি। কিন্তু কবির পক্ষ থেকে কিছু বর্জিত না হলেও, পাছে এই মন্ত্রের জন্যই কবির সার্বভৌমিকতা পৃথিবীর কোথাও বাধা পায়—সেটুকু সম্ভাবনার সূত্র দূর করবার জন্যই হয়তো আসলে কর্তৃপক্ষের এই সতর্কতা। তাঁদের প্রয়াসের আন্তরিকতা অনুভবযোগ্য। কিন্তু তাঁদের বুদ্ধিতে হিতে বিপরীত না ঘটে। সতর্কতার পথই সাম্প্রদায়িকতার বোধ ও দাবিকে না জাগিয়ে তোলে। সাম্প্রদায়িকতার একটা নূতন শুচিবাই এর থেকে প্রশ্রয় না পায়।

যা হোক, একালে যা করা হ'ল, তার ফল অতঃপর এ-কালে বা কালে-কালেই ফলবে। রবীন্দ্রনাথের যুগে রবীন্দ্রনাথ কি করেছেন, এখন সেটির সম্যক্ পরিচয় পেতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের হাতে ধর্মমতের প্রশ্নেই যখন তাঁর 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্'-এর ছেদ ঘটল, তখন তাঁর এই ধর্মবোধ সম্বন্ধে আমাদের কোনো অস্পষ্টতা না থাকে, এটাই সর্বাগ্রে দেখা দরকার। আদর্শের বিশুদ্ধি রক্ষায় সকলের পক্ষেই সে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

৩

ধর্মে যখন চরম রকমের গ্লানি ঘটে, তখন নূতন ধর্ম-স্থাপনের প্রয়োজন হয়। ধর্ম যখন প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানে পরিণত হয়, তখন তার মধ্যে প্রাণসঞ্চারের ব্যাকুলতা জাগে। রবীন্দ্রনাথ যেমন এই ব্যাকুলতারই একটি প্রকাশ, তেমনি একটি সমাধানও তাঁরই মধ্যে দেখা গেছে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের যে সংযোগ,—এইটিকেই তিনি ধর্মরূপে স্বীকার করেছেন। কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে খ্রীষ্টান—এই সব প্রশ্ন তাঁর মনে বড় হয়ে জাগে নি, বরং যাঁরা নিজ নিজ আনুষ্ঠানিক ধর্ম ব্যক্তিগত জীবনে পালন করেও মানুষের সঙ্গে মানুষের শাশ্বত সম্পর্ককেই বড় করে দেখেছেন, তাঁদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল আন্তরিক।

সংসারের সবকিছুর ঊর্ধ্বে থেকে সূর্যের মত সংসারকে আলোকিত করবার জন্য আছে ধর্ম। ধন, মান, সুখভোগের পরিচয়ে তার পরিচয় নয়, তার পরিচয় হচ্ছে চরিত্রে, জীবনের ভাবদৃষ্টির উজ্জ্বলতায়। সেই দৃষ্টির আলোতে স্নাত উদ্ভাসিত হয়ে চলবে ব্যবহারিক যত নীতি। সে সব রীতিনীতি আচার-ব্যবস্থা সকলেরই চরম লক্ষ্য থাকবে—মানুষের মিলন; বহুর মধ্যে ব্যক্তিকে উত্তীর্ণ করে দিয়ে তবে পাবে সে সার্থকতা।

বিবাদ-বিসম্বাদ ধর্মের মূল প্রেরণা নিয়ে কোথাও বাধে নি, যত বেধেছে তার নীতি বা তন্ত্রের প্রয়োগ ও প্রচার নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "মনে রাখা দরকার, ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিস নয়। ও যেন আগুন আর ছাই। ধর্মতন্ত্রের কাছে ধর্ম যখন খাটো হয় তখন নদীর বালি নদীর জলের উপর মোড়লি করিতে থাকে।...ধর্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না করো তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারো কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দয় ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁৎ করিয়া না মানো তবে ধর্মভ্রষ্ট হইবে।...ধর্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ, সে যে-ঘরেই জন্মাক পূজনীয়, ধর্মতন্ত্র বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যত বড় অভাজনই হোক মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র।"—(কালান্তর)

বৃষ্টির জল স্বচ্ছ নির্মল, কিন্তু মাটিতে পড়লেই তার বিশুদ্ধি যায় ঘুচে। ডোবা-পুকুর নদীনালার বিশেষ বিশেষ আধারে পড়ে বিকৃতি তার বাড়ে কমে। চিরকালই তেমনি প্রেরণাতে থাকে ধর্মের অকৃত্রিম আদর্শের রূপ—ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা দেয় তার বিশেষ বিশেষ বাস্তব বিকৃতি।

মূল ধর্মের নীচেই রয়েছে স্থূলতর বাস্তব প্রয়োজনে সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবস্থাতন্ত্র বা আচার-বিচারের উপধর্মগুলি। বাস্তব অবস্থার উপর যুক্তি, তর্ক, মতভেদ, গাণিতিক গণনা, ভোট—কত কি রয়েছে এই সব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। দেশের ঐতিহাসিক ঘটনাধারা, ভৌগোলিক সংস্থান এবং খাদ্যাখাদ্য, আবহাওয়ার উপরও তার নীতিবৈচিত্র্য নির্ভর করে। মানুষের এই সব ব্যবস্থাতে যতই খুঁটিনাটি এবং ত্রুটি থাক্, মূলে সবই সেই ধর্মপ্রেরণার সঙ্গে সঙ্গত হয়ে চলবে, তবেই প্রমাণ হয় তার মূল্য; তবেই হয় সবদিকে মঙ্গল।

মূল ধর্মের মান এখনও প্রত্যেক ধর্মে ঠিকই আছে। কিন্তু নানা দেশ ও সমাজের উপধর্মগুলি তার কাছে পৌঁছাতে পারছে না। পৌঁছবার চেষ্টাই চলছে সেই কত না পথে।

পৃথিবী যত দিন একান্তভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও সমাজে সীমাবদ্ধ ছিল, কৃত্রিম ও অকৃত্রিম যে উপায়েই হোক, তত দিন উপধর্মের আধিপত্য চলতে পেরেছে, বাধা পায় নি কোথাও। পরে দেখা গেল, বিস্তৃততর পৃথিবীর আদান-প্রদানে বেধে গেল তাদের মধ্যে প্রবল সংঘাত। এই সংঘাতে পৃথিবী জর্জর। সংঘাত যেখানে নেই সেখানেও জানা নেই—কবে কোন্ অছিলায় নিদ্রিত সর্প ফণা তুলে উঠবে। মূল ধর্মের বিশুদ্ধির প্রতি তত দৃষ্টি নেই, উপধর্ম বনাম যত 'ইজ্‌ম্'-এর দ্বন্দ্ব নিয়েই সবাই রণে মত্ত। এখন কারো ধর্ম মন্ত্রে তন্ত্রে, ভাতের হাঁড়িতে; কারো ধর্ম কোর্‌বানি আর কল্‌মাতে; এ ছাড়া আরও ধর্ম আছে—জাতীয় রক্তের শুদ্ধি রক্ষায়, গণতান্ত্রিক সনদে, শ্রেণী-সংগ্রামিক নববিধানে।

এই করে দিনে দিনে সমাজের আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি

ক্রিয়াকাণ্ড এবং আন্দোলনগুলিই এখন ধর্মের স্থান অধিকার করে বসেছে। এমন কি, প্রত্যেক ধর্ম পরিচিত হচ্ছে রাষ্ট্রিক, সামাজিক উপধর্মের নামে। রবীন্দ্রনাথ সেদিকে না গিয়ে, ধর্মসাধনার নূতন একটি ইঙ্গিত করলেন সাংস্কৃতিক যোগের দিকে। ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, শিক্ষা—নানাবিধ বিষয়ের চর্চা এ পথের ক্রিয়াকাণ্ড।

কিন্তু শুধু জ্ঞান-সঞ্চয়, জ্ঞান-বিস্তার বা তার আনুষঙ্গিক নানা কর্ম করাই ধর্মসাধনার সব নয়। ধর্মের প্রধান সার্থকতা মানবপ্রীতিতে। কবি তাঁর 'ধর্ম' গ্রন্থে 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' রচনাটিতে বলছেন: "আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার মূলেই জ্ঞানে-অজ্ঞানে সেই অদ্বৈতের সন্ধান রহিয়াছে। অদ্বৈতই আনন্দ।

এই যিনি অদ্বৈতং, তাঁহার উপাসনা করিব কেমন করিয়া? পরকে আপন করিয়া, অহমিকাকে খর্ব করিয়া, বিরোধের কাঁটা উৎপাটন করিয়া, প্রেমের পথ প্রশস্ত করিয়া।··· শিক্ষাতেও সমাপ্তি নয়, কর্মেও সমাপ্তি নয়। কেনই বা শিখিব, কেনই বা খাটিব? একটা কোথাও তো তাহার পরিণাম আছে। সেই পরিণাম অদ্বৈতম্। তাহাই নিরবচ্ছিন্ন প্রেম, তাহাই নির্বিকার আনন্দ।"

সাধারণত নিজের প্রতি মমত্ব-বোধ থেকেই আমরা স্বার্থের পূজা করি। নিজের বেদনা দিয়েই পরের বেদনা বুঝা আমাদের উচিত ছিল। এই সহজ যুক্তির পথ ছেড়ে স্বার্থ যেখানে বিকৃতির পথে ধাবিত, সেখান থেকেই সংসারের যত কিছু বিদ্বেষবিরোধের সৃষ্টি। কিন্তু শুধু যে পরের স্বার্থেই আমরা বিমুখ তা নয়, নিজের স্বার্থ সম্বন্ধেও আমরা অনেকে জড়তায় আলস্যে উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকি। একের কাছে অন্যের স্বার্থের স্বীকৃতির জন্যই বাধে সংগ্রাম। কিন্তু মনে রাখা চাই, সে স্বীকৃতি পরের কাছেই শুধু নয়, নিজের কাছেও দরকার, কারণ আমাদের নিজেদের কাছে নিজেদের প্রকৃত স্বার্থের বোধ জাগ্রত ও সুস্পষ্ট নেই বলেই দশ জনের নির্বুদ্ধিতার সুযোগ নিয়ে এক জনের স্বার্থবুদ্ধি অত্যুগ্র হয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা আনছে। সকলের স্বার্থ ও নিজের স্বার্থের সমন্বয়—সমস্যা দু'মুখো। কাজও দু'মুখো চলা দরকার। কোন সমস্যাই ছোট নয়।

স্বার্থের স্বীকৃতি চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথও। সে স্বার্থ নিজের এবং পরের। তাঁর আহ্বান মানব-বোধের কাছে। তিনি সাংস্কৃতিক পথের ঐতিহাসিক দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখাচ্ছেন, মানুষের আদরের জিনিস হয়ে কালের দরবারে যা টেকে, তা বৈষয়িক প্রভুত্ব হিংসা-দ্বন্দ্ব-খ্যাতি নয়, আত্ম-উদাসীন বা আত্মসর্বস্ব স্বার্থ, এ দুয়ের কোনটাই নয়; টেকে মানব-বোধের বিষয়গুলি। মানুষকে দূর কালের দূর দেশের মধ্যে দেখে দেখে সেই বোধ যে কেমন করে জেগে উঠে, নিজের ক্ষেত্রে তার একটি দিনের উপলব্ধির কথা, কবি লিখেছিলেন শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে। "খ্যাতিভোলা দিন" এই শিরোনামযুক্ত পত্রখানি ১৩৪৭ সনে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছে।

কবির খ্যাতিভোলা এই বেদনাবোধের প্রসার হলে জীবনের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবে। বৈষয়িক ব্যবস্থা-নীতি ও আচরণ সেই অনুযায়ীই সংশোধিত হবে। তা স্বার্থদ্বন্দ্বহীন হবে, চিরকালের সর্বলোকের স্বার্থের জিনিস হবে। তখনই সবকিছু সত্য ও স্বাভাবিক পরিণতির পথ পাবে। তখন সকলের মধ্যে যে মন্ত্রের উপলব্ধি জাগবে, সেইটিই কবির মতে সত্য-ধর্মের মন্ত্র "সোঽহং"। বর্তমানেরই জীবনযাত্রাকে সমবেদনায় স্নিগ্ধ ও সম্পূর্ণ করে তোলবার জন্য পুরাকালের প্রতি এই যে ঐতিহাসিক দৃষ্টি-অনুশীলন, এইটিই ছিল কবির বিচিত্র সাধনপথের শেষদিক্‌কার একটি ইঙ্গিত।

৪

এই চিন্তা ও কর্মগত পটভূমিকার উপর রেখেই রবীন্দ্রনাথের "শান্তং শিবমদ্বৈতম্"-এর সাধনাকে দেখতে হবে। তা হলে হয়তো বুঝা অনেকটা সহজ হবে, কি উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্বভারতী গড়েছিলেন এবং কি অর্থেই বা তার আদর্শঘোষণা-পত্রে কবি লিখেছিলেন:

"And with such ideals in view to provide at Santiniketan aforesaid a centre of culture where research into and study of the religion, literature, history, science, and art of Hindu, Buddhist, Jain, Islamic, Sikh, Christian, and other civilisations may be pursued along with the culture of the West, with that simplicity in externals which is necessary for true spiritual realisation, in amity, good fellowship and co-operation between the thinkers and scholars of both Eastern and Western countries, free from all antagonisms of race, nationality, creed or caste, and in the name of the one Supreme Being who is Santam, Shivam, Advaitam."

এই মন্ত্রটি মহর্ষিদেব উপনিষদ্ থেকে আহরণ করে তাঁর উপাসনা পদ্ধতিতে সমাধানের মন্ত্রের শেষ পঙ্‌ক্তি রূপে রেখেছিলেন—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি
শান্তং শিবমদ্বৈতম্।

এই মন্ত্রে তাঁর আরাধনা যেন পূর্ণতালাভ করেছে। শান্তিনিকেতনে তাঁর সাধনা-বেদীর ঊর্ধ্বে তিনি সেইজন্যই লিখিয়েছিলেন এই মন্ত্র।

তার পরে এক দিন এল মহর্ষির সেই শান্তিনিকেতন আশ্রমে রবীন্দ্রনাথের হাতে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার ক্ষণ। মনে কি ব্যাকুলতা ও চিন্তাভার নিয়ে কবি সেদিন এ কাজে

অগ্রসর হয়েছিলেন, বার বার সে কথা আমাদের স্মরণীয়। তাঁর মনের তখনকার অবস্থাটি প্রকাশ করে একখানি পত্রে তিনি লিখছেন :

ওঁ

প্রীতিসম্ভাষণমেতৎ

অনেক দিন পরে আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আশ্রমে আপনার অভাব আমরা বিশেষভাবে অনুভব করিয়া থাকি — কিন্তু আপনার স্থান এখনো পূর্ণ হয় নাই।

এখানে আমাদের কর্মক্ষেত্র পূর্ব্বের চেয়ে আরও অনেক বিস্তীর্ণ হইয়াছে সে কথা শুনিয়াছেন। হয়ত দুঃসাহসের কাজ করিয়াছি — বিশেষত আমার এই কাজে দেশের লোকের সম্মতি ও সহায়তার কোনও সম্ভাবনা নাই। তাই দেখিতেছি আমার ভাগ্যে দুঃসাধ্য সাধনের প্রয়াস মৃত্যুর পূর্ব্বে বিরামের কূলে আসিয়া উত্তীর্ণ হইবে না।

অবকাশমত কখনও কখনও আশ্রমে আসিয়া যদি দেখা দিয়া যান তবে আমরা সকলেই আনন্দলাভ করিব। ইতি ৬ বৈশাখ ১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

প্রীতিসম্ভাষণমেতৎ

অনেক দিন পরে আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। …এখানে আমাদের কর্মক্ষেত্র পূর্ব্বের চেয়ে আরও অনেক বিস্তীর্ণ হইয়াছে সে কথা শুনিয়াছেন। হয়ত দুঃসাহসের কাজ করিয়াছি—বিশেষত আমার এই কাজে দেশের লোকের সম্মতি ও সহায়তার কোনও সম্ভাবনা নাই। তাই দেখিতেছি আমার ভাগ্যে দুঃসাধ্য সাধনের প্রয়াস মৃত্যুর পূর্ব্বে বিরামের কূলে আসিয়া উত্তীর্ণ হইবে না।

অবকাশ মত কখনও কখনও আশ্রমে আসিয়া যদি দেখা দিয়া যান তবে আমরা সকলেই আনন্দলাভ করিব। ইতি ৬ বৈশাখ ১৩২৮। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পত্রখানি শ্রীযুক্ত প্রমোদারঞ্জন ঘোষকে লিখিত।

প্রমোদাবাবু তখন কুচবিহার স্কুলের শিক্ষক। ইতিপূর্বেই কবির আহ্বানে তিনি শান্তিনিকেতনের শিক্ষকমণ্ডলীতেও একবার যোগদান করেছিলেন। মধ্যে কিছুদিন অন্যত্র ছিলেন। সেই সময় এ চিঠি লেখা। শান্তিনিকেতনের সেবাতেই তাঁর বাকী কর্মজীবন কেটেছে : অধ্যাপনার সঙ্গে কবির জীবদ্দশায় এক সময় তিনি স্কুলবিভাগের অধ্যক্ষ এবং আশ্রমসচিবের দায়িত্বও পালন করেন। তার আগে থেকেই কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্মসচিব ছিলেন। আজও তাঁর উপরেই পড়ল প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় গুরু দায়িত্ব।

কবির "প্রয়াস মৃত্যুর পূর্বে বিরামের কূলে আসিয়া উত্তীর্ণ হয়নি",—এতদিনে তা উত্তীর্ণ হওয়ার পথে এল।

শুধু রাষ্ট্রের উপর বা ব্যক্তিবিশেষের স্কন্ধে ভার দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে নিশ্চিন্ত থাকলে চলবে না, তাদের সাহায্যার্থে সকলকেই তৎপর হতে হবে। বিশ্বভারতীর আদর্শ, কর্ম-ব্যবস্থা, আর্থিক ভিত্তি, কর্মী ও শিক্ষার্থী, সকল বিষয়ই দেখবার আছে। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু নয়, এটি একটি আশ্রম, কবির আদর্শ-সাধনপীঠ। সুতরাং এর দায়িত্ব বহু রকমের। দেশবাসীকে সারাক্ষণই মনে রাখতে হবে তাদের প্রতি কবির সেদিনকার উদ্বেগপূর্ণ বাণী।

যদি একটু হাঁফ ছাড়বার অবকাশ কোন দিকে আজ ঘটে থাকে, তবে সেই অবকাশে আমরা যেন ভাবি, এক দিন এ প্রতিষ্ঠানের জন্য কবি কি করে গেছেন। খুঁটিয়ে তার ইতিহাস এখনই উদ্ধারের প্রয়োজন। সে ইতিহাসকে সামনে রেখে তার ধ্যানের মধ্য দিয়ে কবির সৃষ্টিপ্রেরণা ও কর্মনৈপুণ্য যদি একটুকু মনে সঞ্চারিত হয়, তবে তার থেকেই ভবিষ্যতের পথ আমাদের সুগম হবে।

বীরভূমে উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন কার্য্য

শ্রীঅমলেন্দু মিত্র

বীরভূম জেলার আয়তন ১৭৫৩ বর্গমাইল। ইহার ভূমির পরিমাণ ১১২১৯০ একর। এই জেলার অধিকাংশ স্থানেই ভাল ধান্যের আবাদ হয় এবং ইহা শিল্প-প্রধান অঞ্চল। চাষবাসেরও সুব্যবস্থা আছে এবং ধান-চালও প্রচুর পরিমাণে হয়। প্রকিওর-

অফিসারের সঙ্গে আলোচনারত কয়েকটি উদ্বাস্তু-ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট ও প্রাইমারী শিক্ষকগণ

মেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের বাৎসরিক হিসাব থেকে এর সত্যতা প্রমাণিত হবে :

	ধান			চাল		
	মণ	সে:	ছ:	মণ	সে:	ছ:
১৯৪৭...	৭৪৩৩৪	১০	৮	২২৬৬৩৮২	৬	৮
১৯৪৮...	৩৭০৮৯০	১০	১২	১৯০২০০৯	২৩	৪
১৯৪৯...	৮২৪৬১৬	০	১২	২০৩২১৭১	৮	২
১৯৫০...	৮৫৮৩০২	১৫	৪	১৫২৫১৮২	৭	০
১৯৫১(এপ্রিল)	৫৬৭৪৬৫	২৩	৪	৭৯৪৭৪৮	২০	১২

অন্যান্য জেলার ন্যায় সরকার এই জেলায়ও ইউনিয়ন বোর্ড পরিকল্পনা অনুযায়ী উদ্বাস্তুদের পাঠাতে মনস্থ করলেন। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এই যে, ইউনিয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে উদ্বাস্তুগণ গ্রামে গ্রামে সরকারের সহায়তায় বাসগৃহ নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক ব্যবসায় ইত্যাদি সুরু করবে।

এই পরিকল্পনা গ্রহণের পর বীরভূমে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগ প্রথম খোলা হয় ১৯৫০-এর আগষ্ট মাসে। এখন ১৪টি থানায় মাত্র ১০ জন এডিসনাল রিহেবিলিটেশন অফিসার, একজন ডিষ্ট্রিক্ট রিহেবিলিটেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে কাজ করছেন। সারা জেলায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উদ্বাস্তুগণের তত্ত্বাবধান-কার্য্যে এই কয়জন অফিসার বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন।

সরকার জুলাই মাস থেকে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট ৩০৫০ উদ্বাস্তু-পরিবারকে বিভিন্ন সময়ে ছয় বারে স্পেশ্যাল ট্রেনযোগে বীরভূমের ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত পল্লী অঞ্চলে প্রেরণ করেন। প্রত্যেককে এক সপ্তাহের রেশন সহ পাঠানো হয়েছিল।

প্রথম প্রথম প্রেসিডেণ্ট ও প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকগণ সরকারকর্ত্তৃক পুরস্কৃত হবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে উদ্বাস্তুদের আহার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থার জন্য উঠে পড়ে লেগে যান।

কিন্তু দুঃখের কথা অধিকাংশক্ষেত্রেই উদ্বাস্তুদের সুখ-সুবিধার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে পাঠানো হয় নি। তাদের অসহায় করুণ অবস্থা দেখলে মন বিচলিত হয়। প্রায়নগ্ন, ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত, রোগগ্রস্ত উদ্বাস্তু নরনারীর অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় তা বলে শেষ করা যায় না। কোনবার কর্ত্তৃপক্ষ মাত্র ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে জানিয়েছেন যে, উদ্বাস্তুদের পাঠানো হ'ল। কিন্তু হঠাৎ টেলিগ্রাম পেয়ে সমস্ত রেল ষ্টেশনে সর্ব্ব-বিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয় না এবং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টগণের নিকট সংবাদ পৌঁছাতে দেরি হয়। এমন সমস্ত অজ পাড়া-গাঁ আছে, যেখানে সপ্তাহে একবার মাত্র ডাক বিলি হয়।

উদ্বাস্তুগণকে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ষ্টেশনে ষ্টেশনে নামিয়ে দিয়ে যান। স্পেশ্যাল ট্রেন গন্তব্যস্থলের দিকে ছুটে চলে। আর উদ্বাস্তুগণ অচেনা ষ্টেশনে পড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় বসে থাকতে বাধ্য হয়।

ক্ষেত্রবিশেষে কিছু দিন আগে অবশ্য সংবাদ পাঠানো হয়। সেদিন ষ্টেশনে ষ্টেশনে মোতায়েন করা হয় অফিসারগণকে এবং উদ্বাস্তুদের খাবার-দাবার আয়োজনও হয়তো করা হয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত স্পেশ্যাল ট্রেনেরই হয়ত আগমন হ'ল না। কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ অব্যবস্থার দরুন বিভ্রাটের চূড়ান্ত হয়। কত অনাবশ্যক খরচ এতে হয়! প্রেসিডেণ্টগণ গরুর গাড়ী ভাড়া করে এসেছিলেন—তার ভাড়া, শিক্ষকগণের পাঁচ টাকা হিসাবে পুরস্কার, চৌকিদারের মাথাপিছু এক টাকা হিসাবে পুরস্কার, জনপ্রতি উদ্বাস্তুগণের ৮০ আনা খাবারের খরচ ও অফিসার-গণের যাতায়াতের খরচা সমস্তই জলে যায়।

ওদিকে উদ্বাস্তুগণ আসার পরই নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সকল স্থানে সরকারী চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। তার উপর সরকারপ্রদত্ত এক সপ্তাহের রেশন তিন দিনে শেষ

হয়ে যায়। উদ্বাস্তুগণ নিঃস্ব ও সম্বলহীন হয়ে পড়ে। জেলা আপিস থেকে পুনঃ পুনঃ টেলিগ্রাম, রেডিও ও লোক পাঠিয়েও উদ্বাস্তুগণের পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা এক মাস বা ততোধিক কালের পূর্ব্বে করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু তারা খায় কি? সরকার ইউনিয়ন বোর্ডে পাঠিয়েই খালাস। দায়িত্ব এসে পড়ে জেলা অধিকর্ত্তার ঘাড়ে। এই ভাবে বিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়ে ১৪৫০টি পরিবার স্থানত্যাগ করে। অবশ্য বহু ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্টগণ নিজেদের চেষ্টায় অনেক দিন ধরে উদ্বাস্তুদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে আসছেন।

গোপালপুরে উদ্বাস্তু-বসতি ও বাগান
(বর্ত্তমানে পরিত্যক্ত)

উদ্বাস্তুগণের দুরবস্থা বাস্তবিকই অবর্ণনীয়। তাদের দুর্দ্দশা দেখে 'মর্নিং পোষ্ট' থেকে অমৃত বাজার পত্রিকায় উদ্ধৃত একটি পত্রের কতকগুলি কথা মনে পড়ে। কমিউনিষ্ট নীতি গ্রহণে অনিচ্ছুক রুশদিগের প্রতি কিরূপ আচরণ করা হ'ত, জনৈক বন্দীর নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশ থেকে তা বুঝতে পারা যাবে :

. . . . . . "On what definite charge we have been sent to exile we do not know. Last July they came to our village and simply gave us order that every living soul must be on the train in twenty minutes. We could not take anything with us. We did not know where they were taking us, for how long, or why. It was to Siberia they took us and the sufferings of the journey are beyond description. In this Siberian village we live in Barracks. We are all weak and we know what that word means. All men and women must work from early morning to late at night. Our wages in every day a plate of vegetable soup without meat and half a pound of stale sour bread. We are all famishing here. There were in this area about 7000 families but we are dying off at about an average of ten a day etc., etc. . . . "

যাক, আবার আমাদের উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। যারা রয়ে গেল তাদের জন্ম অফিসার ও প্রেসিডেণ্ট-গণ জমিদারের নিকট থেকে অতি অল্পমূল্যে, অল্প সেলামীতে বা বিনামূল্যে অনাবাদী ব্রহ্মডাঙ্গা অর্থাৎ বাসোপযোগী জমি সংগ্রহ করার চেষ্টায় তৎপর হয়ে উঠলেন। সুফল যে একেবারেই না ফলল তা নয়। জমিও জোগাড় হ'ল। তবে অধিকাংশই বিস্তীর্ণ জলহীন কঙ্করময় ডাঙ্গা। সকলে মিলে মিশে সে সমস্ত জায়গায় গৃহনির্ম্মাণ করলে এক একটি ছোট বস্তী তৈরি অবশ্যই হতে পারত। কিন্তু উদ্বাস্তুগণ এমন অধৈর্য্য হয়ে উঠেছিল যে রাতারাতি একটা বন্দোবস্ত না

সিউড়ি থানায় সৎসঙ্গ কলোনি

হলেই নয়। সরকার তাদের আগমনের দিন থেকে আরম্ভ করে তিন মাস পর্য্যন্ত পরিবারপিছু ৪০৲ টাকা হিসাবে খয়রাতি দান দিতে সুরু করে জানিয়েছেন, এর মধ্যে বাড়ী তৈরি করে নিতে হবে, তার জন্য দেওয়া হবে ৫০০৲ টাকা ঋণ। বাড়ী তৈরি হলে ব্যবসায়, চাষবাস গরু কেনা প্রভৃতির জন্য দেওয়া যাবে আরও ৫০০ শত টাকা। কাপড়, জামা, প্যাণ্ট, ফ্রক, সাড়ী, ব্লাউজ, কম্বল, দুধ প্রভৃতিও সরবরাহ করা হ'ল—তবে বড় দেরিতে।

কিন্তু টাকা বাঁচাবার দিকে উদ্বাস্তুদের লক্ষ্য নেই। তারা নিজেরা পরিশ্রম না করে, মজুর নিযুক্ত করে বাড়ী তৈরি সুরু করলে, আর ঋণের টাকা ভেঙে দেনার খরচ করতে লাগল। অভাব, দৈন্য, প্রয়োজন সবারই আছে। তাতে টাকা পেলে খরচ করার প্রলোভন সংবরণ করা অনেকের পক্ষেই কঠিন। উদ্বাস্তুগণের হাতে গৃহনির্ম্মাণের ঋণ নগদ হিসাবে না দিলেই বোধ করি তাদের অধিকতর কল্যাণ হ'ত। কারণ ঋণ গ্রহণ করা সত্ত্বেও অনেকে গৃহ নির্ম্মাণ সমাপ্ত না করে স্থানান্তরে চলে গেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রবঞ্চনা এবং প্রতারণার কথাও জানা গেছে। এই ভাবে জন-সাধারণের অনেক অর্থ সরকার-পক্ষের অব্যবস্থার ফলে নষ্ট

হয়েছে। এই জেলা থেকে 'ইউনিয়ন বোর্ড পরিকল্পনায়' ২,৯৩,২৭৭ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ঋণ গ্রহণ করে যারা স্থান ত্যাগ করেছে তাদের সংখ্যা ১৩৪ জন।

এই সমস্ত অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন, সহায়হীন, ভগ্নহৃদয়, শোকসন্তপ্ত উদ্বাস্তু মাত্র ৫০০ টাকা গৃহনির্ম্মাণ-ঋণ নিয়ে কি করবে তা ভেবে দেখবার কথা। কিই বা হবে ৫০০৲ টাকা ব্যবসায় ঋণ নিয়ে? নূতন করে পুনর্ব্বাসন কি এতই সহজ! বড় বড় সরকারী দপ্তরে বৈদ্যুতিক পাখার নীচে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তা বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক
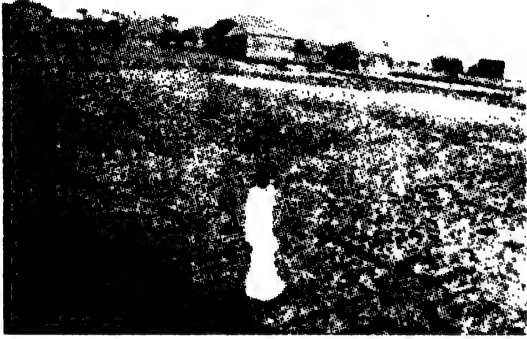
সৎসঙ্গ কলোনির আর একটি দৃশ্য

সময়ই কার্য্যকরী হয় না। যেমন আমরা দেশের বড় বড় কর্ণধারগণের লাঙল হাতে ছবি দেখি সরকারী প্রচার-বিভাগের চলচ্চিত্রে। কিন্তু আমরা বেশ বুঝতে পারি এ একটা লোকদেখানো জিনিস (show) মাত্র। তা না করে আসল কার্য্যক্ষেত্রে এসে মন্ত্রিগণ যদি দর্শন দিতেন, যদি আগ্রহের সহিত দেখতেন পুনর্বাসন কাজের কতদূর কি হ'ল তবে হয়ত বা সুফল ফলত।

পাঁচড়া ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট নিজে জমিদার। তিনি তাঁর খাস জমিতে (ঢেঁড়ার ডাঙ্গা) ৩০টি পরিবারকে বিলিয়ে জেলা আপিসে নিজে উদ্যোগী হয়ে সত্বর ঋণ মঞ্জুর করণান্তর নিজ তত্ত্বাবধানে প্রত্যেকের বাড়ী নির্ম্মাণ করে দিলেন আর সবাইকেই নিযুক্ত করলেন নানা কর্ম্মে। কেউ জমিতে, কেউ দোকানে, কেউ খেজুর, তাল প্রভৃতি গাছের গুড় তৈয়ারী কাজে নিযুক্ত হ'ল। এক এক জন বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ হয়ে উঠল। মেয়েরা ঘরে ঘরে ঢেঁকিতে ধান ভানে, নানা কাজকর্ম্ম করে, অভাব কমেছে। নিকটে পাঁচড়া ষ্টেশন, জলাশয়ের অভাব নেই। কিন্তু তারা এরূপ যত্নে নির্ম্মিত গৃহগুলি পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে গিয়ে অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয় দিয়েছে।

ইউনিয়ান বোর্ড পরিকল্পনায় এই জেলায় ১৬,৫৫০ টাকা জমিক্রয় ঋণ ও ২,৩৭,৫০০ টাকা গৃহনির্ম্মাণ ঋণ গত বৎসর পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছে এবং যতদূর জানা যায় এখন পর্য্যন্ত ৩৫০ খানি নবনির্ম্মিত বাড়ীতে ১৫০টি উদ্বাস্তু পরিবার স্থায়ী ভাবে বাসা বেঁধেছে এবং আরও কতকগুলি বাড়ী নির্ম্মিত হচ্ছে। সরকারী প্রচার-বিভাগ জানিয়েছেন এই পরিকল্পনায় ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত মোট ৬১১৬টি পরিবারকে সারা পশ্চিম বাংলার ছয়টি জেলায় বসানো হয়েছে।

সাধারণ পরিকল্পনা—এই পরিকল্পনায় নেওয়া হয়েছে সেই সব উদ্বাস্তুকে যাঁরা চাকুরী, ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষে এদেশে বাস করেছেন বটে, কিন্তু বঙ্গ-বিভাগের ফলে যাদের সব সম্পত্তি পাকিস্থানে চলে গিয়েছে। এঁদের সংখ্যা এই জেলায় আনুমানিক প্রায় ১০,০০০। এঁদেরও ঋণ দেবার ব্যবস্থা সরকার করেছেন—গৃহনির্ম্মাণ ও ব্যবসায়-ঋণ। গ্রামাঞ্চলে গৃহনির্ম্মাণে ৫০০ টাকা ও ব্যবসায়ের জন্য ৫০০ টাকা। শহর অঞ্চলের জন্য ১০।১৫ হাজার টাকা দেবার ব্যবস্থাও আছে। এই জেলা থেকে ১৯৪৯-৫০ সালে এই পরিকল্পনায় ১,৩৯,২১৬ টাকা ও ৫০-৫১ সালে ৬৬,৯৫২ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

এই পরিকল্পনায় একটা মস্ত বড় গলদ আছে। কোন কোন পূর্ব্ববঙ্গের লোক হয়ত ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বে সেখানে বাস করতেন। তার পর কার্য্যোপলক্ষে সেখানকার পাট তুলে দিয়ে পশ্চিম-বাংলায় গৃহাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক সচ্ছলভাবে দিন কাটাচ্ছেন। বর্ত্তমানে কেউ কেউ বেশ প্রতিপত্তিশালী জমিদার শ্রেণীভুক্ত। তাঁরা এই সাধারণ পরিকল্পনার সুযোগে প্রচুর ঋণ গ্রহণ করছেন। এ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য নির্দ্ধারণ করা দুরূহ ব্যাপার। দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরও প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। এই সমস্ত নানা কারণে উদ্বাস্তু-সমস্যা রীতিমত জটিল আকার ধারণ করেছে, ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রকৃত উদ্বাস্তুগণ, তাদের শোচনীয় দুরবস্থার প্রতিকার হচ্ছে না। কতকগুলি বেসরকারী-উদ্বাস্তু-কল্যাণ সমিতিও স্থাপিত হয়েছে। তাদের কোন কোনটিতে নানাপ্রকার দুর্নীতি ও প্রতারণার কথা জানতে পারা যাচ্ছে।

উপরোক্ত পরিকল্পনায় কয়েকটি সুষ্ঠু পুনর্বাসন-কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে। যথা—করিধ্যা সৎসঙ্গ কলোনী। এটি সৎসঙ্গ সমিতির একটি শাখা। সিউড়ী সদরের দুই মাইল দূরবর্ত্তী এক বিশাল ডাঙ্গায় তারা উত্তমরূপে বসতি স্থাপন করেছে। এখানে ১৩২টি পরিবার আছে। সকলেরই বাড়ীতে কূপ, বাগান ও কৃষিকার্য্যের যন্ত্রপাতি আছে। সবাই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছেন। গত ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৬০টি পরিবারকে ২৯৫০০ টাকা গৃহনির্ম্মাণ ঋণ, ১৫ পরিবারকে ৪৪০০ টাকা ব্যবসায় ঋণ, ১৪ পরিবারকে ৭০০০ টাকা কৃষি-ঋণ ও ১৬টি

পরিবারকে জমি-উন্নয়ন প্রভৃতি কার্য্যের জন্ম ৩৫০০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

সিউড়ী থানায় অনুরূপ একটি কলোনীর নির্ম্মাণকার্য্য সুরু হয়েছে সরকার থেকে জমি সংগ্রহ করে। হাটজান বাজার, ফতেপুর ও খুসনাভোড় প্রভৃতি স্থানে কলোনীর কাজ সুরু হয়েছে। রাজনগর থানায় ৫৭·২২ একর জমিতে একটি কলোনী শীঘ্র তৈরি হবার পরিকল্পনা চলছে।

জে. এন. দাস স্কীম—রামপুর হাট মহকুমায় রতনপুর গ্রামের জে. এন. দাস মহাশয় একজন বড় জমিদার। তিনি সরকারকে প্রচুর জমি বন্দোবস্ত দেবার ও কন্ট্রোল দরে চাল সরবরাহ করবার প্রতিশ্রুতি জানান। তাঁর কথামত সরকার ৫৪টি পরিবারকে উপযুক্ত তাঁবু ও একজন অফিসারসহ সেখানে পাঠালেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর জমিদারীর অব্যবস্থার ফলে পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী হয় নি।

মুরাদিতে গাছতলায় তাঁতের কাজে রত একজন তন্তুবায়

ঋণ, দান, খয়রাতি, সাহায্য প্রভৃতির মোটামুটি হিসাব :—

১৯৪৭-৪৮এ উদ্বাস্তুদের ভরণপোষণের কোন ব্যবস্থা এই জেলায় ছিল না।

১৯৪৮-৪৯-এ ৭০০০৲ টাকা ১৪টি উদ্বাস্তু-পরিবারকে গৃহ-নির্ম্মাণ ঋণ ও ২৫০০৲ টাকা দুই জন ডাক্তারকে চিকিৎসা-ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে।

২৩ জনকে ১৭৫১৲ টাকা তিন মাস ধরে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। ৭৫০৲ টাকা ২৭ জন উদ্বাস্তু-ছাত্রকে দেওয়া হয়েছে।

১৯৪৮-৪৯ ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফি বাবদ ৯১৫৲ টাকা ২১ জন ছাত্রকে দেওয়া হয়েছে।

১৯৪৯-৫০

কি প্রকার ঋণ দেওয়া হয়েছে	ব্যক্তি বা পরিবার সংখ্যা	ঋণের অঙ্ক
গৃহনির্ম্মাণ	১৮০	৮০৫৫০৲
গরুবাছুর ক্রয়	৪৩	১৬৩০০৲
ব্যবসায়	৩৩	১২৯৭৫৲
ডাক্তারি	৪	১৬৫০৲
ওকালতি	১	৬০০৲
মোট	২৬১	মোট ১ ১২০৭৫

দান (রিলিফ)	ব্যক্তি	
নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্ম	৫৪	২৪৩০৲
মাহিনা ও পরীক্ষার ফি বাবদ	৪২	২২৪৯৲
ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদের	২৩	৫৬১৲
চাষীদের খোরপোষ	২৪৯	১১৫৬১৲
দুরবস্থাপন্নকে	৬৬	৮৪০৲
মোট	৪৩২	মোট ১৭৬৪১৲

১৯৫০-৫১

কি প্রকার ঋণ	পরিবার-সংখ্যা	টাকার অঙ্ক
গৃহনির্ম্মাণ	৬২১	২৪০,৪০০৲
জমিক্রয়	৩৬৭	১৮৫৬৭৲
ব্যবসায়, গরু বাছুর ক্রয়, চিকিৎসকগণকে ঋণদান—সাধারণ পরিকল্পনায়	৪৫১	১২১,০৭৫৲
দান		
সাধারণ পরিকল্পনায়	৮৩৪ জনকে	৪৫৯০৲
ইউনিয়ন বোর্ড ..	২০০৪৫ ,,	৮১৩৪২৲

"ডি" টাইপ ক্যাম্প পরিকল্পনা :

বীরভূমে ৭টি ক্যাম্প তৈরি হয়েছে। সাঁইথিয়ার সন্নিকটে মুরাদি (১৭৪·৭৫ একর), বালসুণ্ডা, উত্তর তিলপাড়া, উত্তর বামনি গ্রাম ও বোলপুরের নিকট কালিকাপুর, দ্বারকানাথপুর ও তাঁতারপুর ক্যাম্প। মুরাদিতে ১৩১টি পরিবার, বালসুণ্ডায় ৪০টি পরিবার, বামনি গ্রামে ৩৭টি পরিবার ও তিলপাড়ায় ১৮৫টি পরিবার এসেছে। দ্বারকানাথপুর, কালিকাপুর ও তাঁতারপুরে শীঘ্রই উদ্বাস্তু-পরিবার পাঠানো হবে। আপাততঃ ৫ জন ক্যাম্প সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আছেন। সরকার তাঁবু দিয়েছেন। উদ্বাস্তুগণ তাঁবু খাটিয়ে বাস করছে এবং সরকারের লোক জমি অধিকার বিধি প্রয়োগ করে এই সকল পরিবারকে জমি বিলি করছেন ও সঙ্গে সঙ্গে গৃহনির্ম্মাণ ঋণ বাবদ ৫০০

টাকা হিসাবে দেওয়া হচ্ছে। কণ্ট্রোল দরে গৃহনির্ম্মাণের দ্রব্যাদিও সরবরাহ করে তাদের পুনর্ব্বাসন-কার্য্য অনেকখানি এগিয়ে আনা হয়েছে। এর পর ব্যবসায় বা কৃষি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ঋণ দেওয়া হবে। মোটমাট খয়রাতি (Cash dole) হিসাবে গত মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছে ১৫৯৫৯৲ টাকা। গৃহনির্ম্মাণাদি ঋণ দেওয়া হয়েছে ৬৩,৭৫০৲ টাকা; ২৯৩টি পরিবারকে (কাউকে ৫০০৲ টাকা, কাউকে বা ২৫০৲ টাকা (এক কিস্তি হিঃ)।
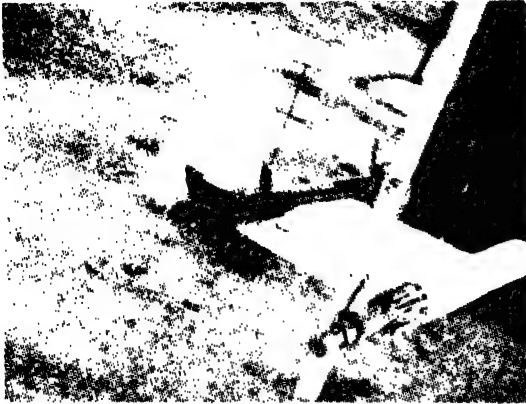
মুরাদিতে তাঁত বোনায় রত একজন স্ত্রীলোক

এই ক্যাম্প পরিকল্পনাটি কিয়ৎপরিমাণে কার্য্যকরী হবে বলে মনে হয়। কারণ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের তত্ত্বাবধানে উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বসতি কার্য্য সহজসাধ্য হওয়ার সম্ভাবনা। মুরাদি বাল-সুণ্ডার পুনর্ব্বাসন-কার্য্য বেশ সন্তোষজনক বলা চলে।

তবে গলদ কি নেই? তা নিশ্চয়ই আছে। মুরাদি প্রভৃতি স্থানগুলি হচ্ছে ময়ূরাক্ষী নদীর তীরবর্ত্তী বালুকাময় ভূমিতে। নদীতে বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে জল থাকে না। দুই মাইলের মধ্যে পানীয় জল বা ভাল পুষ্করিণী নাই। টিউব ওয়েল কয়েকটা বসানো হয়েছে কিন্তু ফল সন্তোষজনক হয় নি। সহসা কলেরা বসন্তের প্রাদুর্ভাবে কয়েকটি পরিবারের সর্ব্বনাশ হয়ে গিয়েছে।

মুরাদি কথাটির অর্থ, মরা+দিহি—দিধি—দি=মুরাদি। এ স্থানে নরকঙ্কাল, নরমুণ্ড প্রভৃতির ছড়াছড়ি দেখে প্রথমে উদ্বাস্তুগণ ভীত হয়ে পড়েছিল। বস্তুত: এটা একটা নদী-তীরবর্ত্তী পরিত্যক্ত শ্মশান।

তবে সুখের বিষয়, এত দুরবস্থায়ও কয়েক ঘর তাঁতি-পরিবার বেশ গ্যাঁট হয়ে বসেছে মুরাদি অঞ্চলে। তাদের কণ্ট্রোল দরে সুতা দেওয়া হয়েছে। এখন ঘরে ঘরে অবিশ্রাম তাঁতের একটানা শব্দ উঠছে।

ওদিকে সরকার ক্যাম্প-কর্ম্মচারিগণের চাকুরীর মেয়াদ দু-এক মাস মঞ্জুর করে চুপচাপ বসে থাকেন। মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে কর্ম্মচারীরা মাহিনা অভাবে দুর্গতি ভোগ করতে থাকেন। জনৈক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ১৫ দিন প্রায় অনশনে থাকতে বাধ্য হলেন। পয়সার অভাবে বাইরে খেতে পারেন না—একটা দিয়াশলাই কেনবার মত পয়সাও নেই। সরকারের নিকট ক্রমাগত লেখালেখি করা হ'ল, টেলিগ্রাম পাঠানো হ'ল—কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সেই ক্যাম্পে উদ্বাস্তু-দের পাঠানো হ'ল এক সপ্তাহের রেশনসহ। ব্যস, তার পর তাদের তিন মাস ধরে যে খয়রাতি দেবার ব্যবস্থা আছে সে টাকা মঞ্জুরের কোন সংবাদ নেই। উদ্বাস্তুগণেরও অবস্থা অন-শনপ্রপীড়িত ক্যাম্প-কর্ম্মচারিগণের অনুরূপ হয়ে দাঁড়াল। অব-শেষে বহুদিন পর সরকারের চৈতন্য হ'ল। সরকার পাঠালেন ২০০ শত তাঁবু ও তার আনুষঙ্গিক আসবাবপত্র। সেগুলি মাল-গাড়ী থেকে খালাস করবার সঙ্গে সঙ্গেই সরকারী আদেশ এল ওগুলি পুনরায় বুক করে ফেরত পাঠাতে হবে। এর পর আবার সরকার তিলপাড়ার ক্যাম্প সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে দুই জন আমলাসহ পাততাড়ি গুটিয়ে ফিরে আসতে হুকুম দিয়েছেন। বামনিগ্রামের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তিলপাড়ার ভার গ্রহণ করবেন। বামনিগ্রাম সাঁইথিয়া ষ্টেশন থেকে তিন মাইল দূরবর্ত্তী, তিল-পাড়া আরও দু'মাইল দূরে। পায়ে হেঁটে ছাড়া যাতা-য়াতের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। সুতরাং বামনিপাড়ার কর্ম্ম-চারিগণের পক্ষে তিলপাড়ার ভার নেওয়া অসম্ভব। তিল-পাড়ার উদ্বাস্তুগণ সর্ব্বাপেক্ষা দুরবস্থাগ্রস্ত। তার উপর আবার এই ব্যাপার। এই দারুণ গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে কর্ম্মচারী ও উদ্বাস্তুগণ জেলা অফিসে অবিরাম যাতায়াত করতে করতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন।

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থায় অর্থব্যয়ের দিক থেকে হয়ত সরকারের কার্পণ্য নেই, কিন্তু নানা ত্রুটির জন্য কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে না এবং প্রকৃত উদ্বাস্তুদের আশানুরূপ কল্যাণও সাধিত হতে পারছে না।

কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি মনে করেন যে হাজার হাজার উদ্বাস্তু আসার ফলে তাদের চাকুরী ব্যবসায় ইত্যাদি ব্যাপারে যথেষ্ট অসুবিধা ঘটছে। অশিক্ষিত ও মজুর শ্রেণীর লোক মজুরী কমে যাবার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়। মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে মজুরীর হার কমে আসতে বাধ্য। ওদিকে আবার সংখ্যা-লঘুগণ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার আশঙ্কা করে। দিন দিন তাই এই উদ্বাস্তু-সমস্যা জটিলতর আকার ধারণ করছে।

এ বৎসর বীরভূমে ধানচালের অবস্থা খারাপ। তার উপর বহুসংখ্যক উদ্বাস্তুর আগমন হয়েছে। তথাপি সরকারের প্রোকিওরমেণ্ট বিভাগ প্রচুর ধান চাল সংগ্রহ করে বীরভূমের বাইরে চালান দিলেন। ইউনিয়ন বোর্ড পরিকল্পনাটিও আশানু-রূপ সুফল প্রসব করছে না। দেশ হতে বিতাড়িত হয়ে উদ্বাস্তুরা প্রথমে কোন ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়, সরকার যতদিন কোন

গ্রামে না পাঠাতে সক্ষম হন ততদিন তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু সেখানে যাবার পর অনেকের মধ্যে কর্ম্ম-বিমুখতা পরিলক্ষিত হয়। তারা খেটে খেতে চায় না। এই মনোবৃত্তি যেন কোন উদ্বাস্তুকেই পেয়ে না বসে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

মাত্র ৫০০ টাকায় কি ধরণের বাড়ী তৈরি হয় তা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন; ছয় মাস সে বাড়ীতে বাস করার পর সেটি বাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে। হয়েছেও তাই। মাত্র কয় মাস আগের তৈরি বাড়ীগুলি ভগ্ন জীর্ণদশায় পতিত হয়েছে। মেরামতক'র্যে প্রতিটি বাড়ীর পিছনে আরও শ'দুই টাকার প্রয়োজন। সুতরাং প্রত্যেককে মাত্র ৫০০ টাকা গৃহনির্ম্মাণ ঋণ পেলে উদ্বাস্তুদের বাসস্থান-সমস্যার সমাধান হয় না। এর উপর আবার সরকারপক্ষ অবিরাম তাগাদা দিচ্ছেন অতি সত্বর বাড়ী তৈরি করে নিতে, জানিয়েছেন যে, শীঘ্র তাঁরা ক্যাম্প বন্ধ করে দেবেন, আর ভরণ-পোষণ করবেন না ইত্যাদি। এই জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে বলে প্রতীতি হয়। মুরাদি ব্যতীত অপরাপর ক্যাম্পে

উত্তর বামনিগ্রাম ক্যাম্প অঞ্চল

এগ্রিকালচার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হওয়ার আশা সুদূরপরাহত বলে মনে হয়—কারণ জলাভাব।

স্পেনের আমেরিকা লুণ্ঠন—ইউরোপে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি

শ্রীসতীন্দ্রমোহন দত্ত

[প্রথমেই একটি ব্যক্তিগত কথা বলিয়া রাখি। পূর্ব্বে যে-সকল পুস্তক পড়িতাম ও তাহাদের যে অংশ পাঠে আগ্রহ হইত বা পাঠ করা আবশ্যক মনে হইত তাহার হুবহু নকল বা নোট রাখিয়া দিতাম এই আশায় যে, ভবিষ্যতে এই সম্বন্ধে আরও কিছু পড়িয়া শুনিয়া শিক্ষিত সাধারণকে আমার চিন্তা ও পরিশ্রমের ফলাফল জানাইব। এক্ষণে নানা কারণে বিশেষ করিয়া "প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত" হইতে হওয়ায় ও স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু সে আশা পরিত্যাগ করিয়াছি। আমার নকল ও নোটের অনেকগুলি হারাইয়া গিয়াছে বা পোকায় কাটিয়াছে। যেগুলি উদ্ধার করিতে পারিয়াছি তাহা হইতে এই সংক্ষিপ্ত তথ্যবহুল নোটটি প্রকাশিত করিলাম—আশা ইহা অপর কাহারও কাজে লাগিতে পারে। —লেখক।]

আমরা পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজের ভারত লুণ্ঠনের কথা প্রায়ই বলিয়া থাকি; কিন্তু সুলতান মামুদ সোমনাথ লুণ্ঠন করিয়া কত সোনা-দানা লইয়া গিয়াছিল তাহার হিসাব রাখি না, আলোচনাও করি না, পাছে মুসলমানেরা অসন্তুষ্ট হয়। স্পেনকর্তৃক আমেরিকা লুণ্ঠনের হিসাব নিয়ে দিলাম।

ইংরেজী ১৪৯২ সালে কলম্বস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়। তাহার পর স্পেন আমেরিকার বিভিন্ন অংশ আক্রমণ করে। সেই সেই দেশ হইতে সোনা রূপা লুণ্ঠিত হইয়া স্পেনে, তথা ইউরোপে চালান হয়। এই সোনা রূপা লুঠের পরিমাণ ই. জে. হ্যামিলটন *American Treasure and the Price Revolution in Spain, 1501—1650* নামক পুস্তকে (ম্যাসেচুসেটসের কেমব্রিজ হইতে ১৯০৪ সালে প্রকাশিত) দেওয়া আছে।

স্পেনে আমদানী সোনা-রূপার হিসাব স্পেনের মুদ্রা পেষোয় দিয়ে দেওয়া হইল। এক পেষোয় ৪২'৩ গ্রাম রূপা বা ৬৩৪'৫ গ্রেন বা ৩'৮ ভরি।

বৎসর	পেষো
১৫০৩—১৫০৫	৩৭১,০৫৫
১৫০৬—১৫১০	৮১৬,২৩৭
১৫১১—১৫১৫	১,১৯৫,৫৫৪
১৫১৬—১৫২০	৯৯৩,১৯৭
১৫২১—১৫২৫	১৩৪,১৭১
১৫২৬—১৫৩০	১,০৩৮,৪৩৮
১৫৩১—১৫৩৫	১,৬৫০,২৩২
১৫৩৬—১৫৪০	৩,৯৩৭,৮৯২
১৫৪১—১৫৪৫	৪,৯৫৪,০০৬

১৫৪৬—১৫৫০	৫,৫০৪,৭১২
১৫৫১—১৫৫৫	৯,৮৬৫,৫৩২
১৫৫৬—১৫৬০	৭,৯৯৮,৯৯৯
১৫৬১—১৫৬৫	১১,২০৭,৫৩৬
১৫৬৬—১৫৭০	১৪,১৪১,২১৬
১৫৭১—১৫৭৫	১১,৯০৬,৬১০
১৫৭৬—১৫৮০	১৭,২৫১,৯৪২
১৫৮১—১৫৮৫	২৯,৩৭৪,৬১২
১৫৮৬—১৫৯০	২৩,৮৩৭,৬৩১
১৫৯১—১৫৯৫	৩৫,১৮৪,৮৬৩
১৫৯৬—১৬০০	৩৪,৪২৮,৫০১
১৬০১—১৬০৫	২৪,৪০৩,৩২৯
১৬০৬—১৬১০	৩১,৪০৫,২০৭
১৬১১—১৬১৫	২৪,৫২৮,১২১
১৬১৬—১৬২০	৩০,১১২,৪৬০
১৬২১—১৬২৫	২৭,০১০,৬৭৯
১৬২৬—১৬৩০	২৪,৯৫৪,৫২৭
১৬৩১—১৬৩৫	১৭,১১০,৮৫৫
১৬৩৬—১৬৪০	১৬,৩১৪,৬০২
১৬৪১—১৬৪৫	১৩,৭৬৩,৮০৩
১৬৪৬—১৬৫০	১১,৭৭০,৫৪৮
১৬৫১—১৬৫৫	৭,২৯৩,৭৬৭
১৬৫৬—১৬৬০	৩,৩৬১,১১১

মোট :—৪৪, ৭৮, ২০, ৯৫১ পেষো বা ১৭০, ১৭ লক্ষ ভরি রূপা, অথবা ২১২'৬ লক্ষ সের বা ৫'৩ লক্ষ মণ রূপা।

যদি গড়পড়তা তৎকালীন সোনার মূল্য রূপার ১২ গুণ ধরি তাহা হইলে ৫০৭ লক্ষ ৪০,০০০ আউন্স সোনা আমেরিকা হইতে স্পেনে আসে। এই সোনার পরিমাণ কত তৎসম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে হিসাব শুধু অঙ্কে বা ভরিতে দিলে হইবে না।

স্পেনের বন্দরে এই সময়ে কত জাহাজ আমেরিকা হইতে আসিত তাহা সি. এইচ. হার্ডিঙ্গের *Trade and Navigation between Spain and the Indies in the time of the Hapsburgo* নামক পুস্তক (পৃ. ৪৪৭) হইতে তুলিয়া দিলাম :

বৎসর	জাহাজের সংখ্যা	বৎসর	জাহাজের সংখ্যা
১৫০৬	৩৪	১৫৩১	৮৭
১৫০৭	৫১	১৫৩২	৮৪
১৫০৮	৬৭	১৫৩৩	৯৭
১৫০৯	৪৭	১৫৩৪	১২১
১৫১০	২৭	১৫৩৫	১২৮
১৫১১	৩৪	১৫৩৬	১৫১
১৫১২	৫৪	১৫৩৭	৭০
১৫১৩	৬১	১৫৩৮	১০৪
১৫১৪	৭৬	১৫৩৯	১১৬
১৫১৫	৬৩	১৫৪০	১২৬
১৫১৬	৫২	১৫৪১	১৩৯
১৫১৭	৯৪	১৫৪২	১৫০
১৫১৮	৯৮	১৫৪৩	১২৮
১৫১৯	৯২	১৫৪৪	৭৬
১৫২০	১০৮	১৫৪৫	১৩৫
১৫২১	৬৪	১৫৪৬	১৪৪
১৫২২	৪৩	১৫৪৭	১৫৮
১৫২৩	৫৪	১৫৪৮	১৬২
১৫২৪	৭০	১৫৪৯	১৭৪
১৫২৫	১১০	১৫৫০	১৫৭
১৫২৬	৯৬	১৫৫১	১৬২
১৫২৭	১০৯	১৫৫২	১২৫
১৫২৮	৭২	১৫৫৩	৭৯
১৫২৯	১০৪	১৫৫৪	২৭
১৫৩০	১১২	১৫৫৫	১০৯

ডবলিউ জেকব ইংরেজী ১৮৩১ সালে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত *An Historical Inquiry into the Production and Consumption of Precious Metals* নামক পুস্তকে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ইংরেজী ৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে চলতি সোনা রূপার পরিমাণ ৩৩,৬৭৪,২৫৬ পাউণ্ড ছিল। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মধ্যযুগে এই পরিমাণের বিশেষ তারতম্য হয় নাই। তিনি লিখিয়াছেন :

"That no very great increase or decrease in the stock of precious metals occured during these centuries (between the time of the Norman Conquest and that of the discovery of America); or it may be presumed that the supply from the mines was nearly equal to the consumption by friction on the circulation, and to that portion which had either been lost from being buried in the ground and not found again, or that had been lost by shipwrecks."

ইউরোপে ৩৩,৬৭৪,২৫৬ পাউণ্ড পরিমিত মুদ্রা চালু রাখিতে হইলে ৮৫ লক্ষ আউন্স সোনার প্রয়োজন। ইংরেজী ১৮৫০ সাল হইতে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত খনি হইতে যে পরিমাণ সোনা উত্তোলিত হইয়াছে তাহার শতকরা ৫৬ ভাগ ডলারে বা গিনিতে কিংবা মোহরে পরিণত হইয়াছে বলিয়া ওয়ারেন এবং পীয়ার্স'ন *Gold and Prices* নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন। সুতরাং আমরা যদি ধরিয়া লই যে ইউরোপে

মধ্য যুগের শেষে ১৫০০ সালে ১৭০ লক্ষ আউন্স সোনা চালু ছিল ত অন্যায় বা অসঙ্গত হয় না।

কিন্তু আমেরিকা হইতে লুণ্ঠিত স্বর্ণের পরিমাণ ৫০৭ লক্ষ ৪০ হাজার আউন্স। ইহার ফলে ইউরোপে তথা স্পেনে দ্রব্যমূল্যের হার বৃদ্ধি হয়।

এই প্রসঙ্গে সক্তবীয়ারের হিসাবটি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি হিসাব করিয়াছেন যে ইউরোপে এই সময়ে নিম্নলিখিত তালিকা মত সোনা জমিতে লাগিল :

বৎসর	সোনা—আউন্সে
১৫০ —	৩,২৭,০০০
১৫২৫—	৮৯,৮০,৬৮৫
১৫৫০—	২,৫২,০৮,৬৯৮
১৫৭৫—	৫,২৬,৬৮,৮০৮
১৬০০—	৮,৫৫,২৯,০২৮
১৬২৫—	১১,৯০,৫৯,৫৮৮
১৬৫০—	১৪,৭৫,৬২,২২৮

হ্যামিল্টন স্পেনে দ্রব্যমূল্যের একটি তালিকা দিয়াছেন। আমরা সেইটি উদ্ধৃত করিলাম। এই সঙ্গে ইংলণ্ডের বুসেল প্রতি গমের দর কত তাহার (ইংরেজী ১২৬০ সাল হইতে ১৯৩০ পর্য্যন্ত) প্রায় ৭০০ বৎসরের হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল।

দেখা যাইবে যে, ১৫০০ সালে স্পেনে যে দ্রব্যমূল্য ছিল ১৬৫০ সালে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৬ গুণ হইয়াছে। ইংলণ্ডেও তদ্রূপ গমের দর ১৫০০ সালে ১৭'১ হইতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ১৬৫০ সালে ১৩৪'৫-এ দাঁড়াইয়াছে—অর্থাৎ গমের দর প্রায় ৮ গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

বৎসর	মূল্য-সুচিকা	বৎসর	মূল্য-সুচিকা	বৎসর	মূল্য-সুচিকা
১৫০১	৩৩.২৬	১৫৫১	৬৯.৪০	১৬০১	১৪৩.৫৬
১৫১১	৩৯.৭৮	১৫৬১	৮৬.৮৩	১৬১১	১২৭.৯২
১৫২১	৪৬.৪৮	১৫৭১	৯৭.৫৩	১৬২১	১৩৩.৩৯
১৫৩১	৫৭.০৬	১৫৮১	১০৩.৯৫	১৬৩১	১৫৮.৯৪
১৫৪১	৫৬.০২	১৫৯১	১১২.৭৩	১৬৪১	১৭০.৭৫

ইংলণ্ডে গমের দাম ১২৬০-১৯৩০ দাম আমেরিকার সেণ্টে

বৎসর	দাম	বৎসর	দাম
১২৬০	১৪'৫	১৬১০	১০১'৩
১২৭০	১৬'২	১৬২০	১০৮'২
১২৮০	১৬'৪	১৬৩০	১১৯'৯
১২৯০	১৬'৫	১৬৪০	১১৮'৮
১৩০০	১৫'৭	১৬৫০	১৩৪'৫
১৩১০	১৭'৯	১৬৬০	১৩৭১
১৩২০	২৭'৪	১৬৭০	১১৪'১
১৩৩০	১৬'৪	১৬৮০	১১৫'০
১৩৪০	১৩'২	১৬৯০	১০৪'৯
১৩৫০	১৮'৮	১৭০০	১২৩'২
১৩৬০	১৯'৮	১৭১০	১২১'৮
১৩৭০	২৩'৮	১৭২০	৯৭'০
১৩৮০	১৬'০	১৭৩০	১০৩'৩
১৩৯০	১৩'৯	১৭৪০	৯৯'২
১৪০০	১৭'৬	১৭৫০	১০৭'৩
১৪১০	১৫'৮	১৭৬০	১০৭'৩
১৪২০	১৭'১	১৭৭০	১৩৭'৬
১৪৩০	১৭ ৫	১৭৮০	১৫৩'৭
১৪৪০	১৯'০	১৭৯০	১৪৩'৮
১৪৫০	১৭'০	১৮০০	২২৮'৩
১৪৬০	১৫'৯	১৮১০	২৮৪'৫
১৪৭০	১৬'৪	১৮২০	২০৯'১
১৪৮০	২০'২	১৮৩০	১৮৪'৬
১৪৯০	১৬'৬	১৮৪০	১৭২'৯
১৫০০	১৭'১	১৮৫০	১৫৬'৭
১৫১০	১৫'১	১৮৬০	১৬৩'২
১৫২০	১৯'৬	৮৮৭০	১৬৫'৮
১৫৩০	২৪'৮	১৮৮০	১৩৬'৮
১৫৪০	২৪'৫	১৮৯০	৯৩'১
১৫৫০	৪০'৩	১৯০০	৮৩'৮
১৫৬০	৪৫'২	১৯১০	৯৭'৮
১৫৭০	৪১'১	১৯২০	১৮৮'৫
১৫৮০	৫২·০	১৯৩০	১০৮'৪
১৫৯০	৬৩ ৬	—	—
১৬০০	১০০'৬	—	—

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের তথ্য সম্বন্ধে এইরূপ অনুসন্ধান বা গবেষণা বড় একটা দেখা যায় না। শুনা যায় যে, ধুমঘাট পরগণার মহারাজা প্রতাপাদিত্যের আমলের জমা-বন্দীর কাগজপত্র টাকীর রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্ত্তৃক উক্ত পরগণা ক্রীত হওয়ার সময় অবধি বর্ত্তমান ছিল। এখন কি হইয়াছে বলিতে পারি না। প্রজার সংখ্যা নাকি ১৩ গুণ বাড়িয়াছিল—ইহা অবশ্য আমার শুনা কথা। এইরূপ পুরাতন জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্র হইতে অনেক আঞ্চলিক তথ্য বিশেষজ্ঞগণ সংগ্রহ করিতে পারেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সম্বর্দ্ধনা

বিগত ১০ই আষাঢ় বিশ্বভারতী সঙ্গীত সমিতির উদ্যোগে কলিকাতাস্থ বিচিত্রাভবনে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হয়। এতদুপলক্ষে বিশ্বভারতী সঙ্গীত সমিতি ইন্দিরা দেবীকে যে মানপত্র প্রদান করেন, নিম্নে তাহা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল—

আর্য্যা,

…যে কুলে আপনার জন্ম ও লালনপালন সে কুল পবিত্র; যে কালে আপনার উদ্ভব, গতি ও স্থিতি সেও বাঙালীর ব'লে নয়—ভারতেরই জাতীয় জীবনে পুণ্য পুনরুজ্জীবনের কাল; যে-কিছু আশা আদর্শ কল্পনা উদ্যম উদ্দীপনা ও কর্ম্মানুষ্ঠানের পরিবেশে আপনার জীবনের রবিচন্দ্রতারাখচিত দিনরাত্রিগুলি অতিবাহিত—যার সঙ্গে চিরদিনই আপনার অব্যবহিত যোগ—সেও মহৎ, সুন্দর, দূরপরিণামী—কাজেই আজ বলে নয়, 'আজি হতে শতবর্ষ পরে'ও তার মঙ্গলময় প্রভাব অবশ্যম্ভাবী।

দুই কুলের বাঁধনে যেমন স্রোতস্বিনীর প্রবাহ ও পরিচয়, দুই কুলের বাঁধনে তেমনি নারীর। সেই উভয় কুলই আপনার বরণীয় ও স্মরণীয়; বিশেষ ক'রে আমরা স্মরণ করি ও বরণ করি আজ এই দুই কুলের আশ্রয়ে অলক্ষ্যগামিনী মৃদুকল্লোল-ভাষিণী শুশ্রূষাবাহিনী আপনার জীবনপ্রবাহকে।…

ভুবনবরেণ্য রবীন্দ্রনাথের আপনি স্নেহভাগিনী, পরিবার-বিশেষে জন্মলাভের ঘটনাচক্রেই নয়, চরিত্রগুণেও বটে। সেই অতুল স্নেহের দান যা-কিছু পেয়েছেন ভোগের দ্বারাই আপনি তা নিঃশেষ করেন নি; আত্মনিবেদনের দ্বারাই গ্রহণ করেছিলেন বলে স্বতঃই আবার তা সর্ব্বজনকে বিলিয়ে দিতে পেরেছেন। রসের যে অলৌকিক উৎকর্ষ, সুরকল্পনার যে অভাবনীয় ঐশ্বর্য্য রবীন্দ্রপ্রতিভার সার, তারই নিরলস ধারা অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক পথ অতিক্রম করে আজও আপনার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত; নানা দিগ্‌দেশাগত তৃষিতজন আজও সেখানে অঞ্জলি পূর্ণ ক'রে নিয়ে তৃপ্ত হয়, ধন্য হয়। গ্রহণে আপনার যেমন অপ্রমাদী, দানেও আপনার তেমনি শ্রান্তি নেই, শেষ নেই।

আপনাকে আমরা কি সম্মান, কি অভিনন্দন দিতে পারি। আপনি যে আছেন আমাদের মধ্যে, আমরা আপনাকে জেনেছি, আপনার প্রতিভায় একটি বরণীয় ও স্মরণীয় যুগকে বিশেষভাবেই জেনেছি ও চিনেছি, আর আপনিও আমাদের স্নেহস্মিত দৃষ্টিপাতে স্বীকার করেছেন—তারই কৃতার্থতা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদনের এ কেবল একটি উপলক্ষ্য-রচনা।

অভিনন্দন পত্রের উত্তরে ইন্দিরা দেবী নিম্নোদ্ধৃত প্রতিভাষণ প্রদান করেন:

আজকে আমার জন্য আপনারা এত বড় আয়োজন করেছেন দেখে আমি আশ্চর্য্য, আনন্দিত এবং কিঞ্চিৎ লজ্জিত বোধ করছি। কারণ কিসের জন্য এত সমারোহ, তা ভেবে পাওয়া শক্ত। তবে আদর যত্ন যখন যেখানে পাওয়া যায়, সব সময়েই ভাল লাগে—তা অকারণেই হোক আর সকারণেই হোক। বরং অকারণে পেলে বেশী ভাল লাগে, কারণ উপরি পাওনার প্রতিই মানুষের লোভ বেশী। আমরা সকলেই যদি কেবল নিজের যোগ্যতার পরিমাপেই সমাদর পেতুম, তাহলে বড়ই দুরবস্থায় পড়তে হ'ত।

আমি কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ আছি বলে নিজের মুখে আপনাদের আমার মনোভাব জানাতে পারলুম না বলে বড় দুঃখিত। নিমন্ত্রণ-পত্রখানা অসুখের আগে একবারমাত্র চোখ বুলিয়ে দেখেছিলুম। তার থেকে ঠিক বুঝতে পারি নি এ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা কে। তারপরে শুনেছি যে বিশ্বভারতীর সঙ্গীত-সমিতির পক্ষ থেকে এই আয়োজন। অবশ্য ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চ্চা করে আসছি এবং স্বরলিপিও করেছি। কিন্তু সে ঘরের মেয়ে ঘরের কাজ হিসেবে করেছি। তার জন্য যে এত ধুমধাম বা ধন্যবাদ দরকার তা কখনও মনে করি নি। তখন বিশ্বভারতীর জন্মও হয় নি। সেই কাজই বিশ্বভারতীর জন্য করলে যে পরের কাজ করা হয় তা এখনও মনে করি নে। কেননা বিশ্বভারতীও তাঁরই স্থাপিত। বস্তুতঃ কি শান্তিনিকেতনে কি কলকাতায় ঘরে বাইরের এ যে দুটি ধারা—একদিকে পারিবারিক জীবনযাত্রা এবং আর একদিকে বিশ্বভারতীর কাজকর্ম—সমান্তরালে চলেছে বলে আমি যেটুকু কাজ করতে পারি তা বেশ সহজে ও মনের সঙ্গে করি। এখানেও এই যে জোড়াসাঁকোর বাড়ীর পাশেই গ্রন্থনবিভাগ অবস্থিত এতে করেই সব কাজ বেশ সুসমঞ্জস ও সরস বোধ হয়। নয়তো কেবলমাত্র একটানা কাজ হয়তো শুষ্ক এবং একঘেয়ে লাগত। এ সূত্রে সঙ্গীতসমিতি, স্বরলিপি-সমিতি ও গ্রন্থনবিভাগের সদস্যদের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ সংস্রবে এসেছি তাতে পরকেও আপন করবার সুযোগ পেয়েছি। তাঁদের সকলের অমায়িক ব্যবহারে পরিশ্রমকে পরিশ্রম জ্ঞান করি নি। মাঝে মাঝে তাঁদের উপর রাগ না করেছি তা নয়, কিন্তু তাঁরা নিজেরাই সাক্ষী দেবেন যে সে রাগ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নি। এ স্থলে তাঁদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

রবীন্দ্রসঙ্গীত এক বিরাট প্রতিভার একাংশ মাত্র হলেও নিতান্ত সামান্য অংশ নয়। এবং বোধ হয় তাঁর প্রিয়তম অংশ। এই সঙ্গীতসুধা পরিবেশনের যে মহৎ ভার গ্রন্থন-বিভাগ স্কন্ধে নিয়েছেন তাঁরা বাঙালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র। আজকাল আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের চাহিদা এবং আদর বাড়ছে দেখে আহ্লাদ হয়। এখনও তাঁর সঙ্গীতের প্রকাশ ও প্রচার-ঘটিত কত গবেষণা, কত কাজ বাকী আছে তা ভাবলে মনে হয় যেন কোনকালে শেষ হবে না। আমি অনেক সময় মজা করে বলি যে আমার জীবনের যতদূর পর্য্যন্ত দেখতে পাই যেন সামনে এক বিস্তীর্ণ স্বরলিপির মরুভূমি পড়ে রয়েছে, তার মাঝে মাঝে রেফ ও হসন্তের কাঁটাগাছ। অন্ততঃ আমি তো শেষ দেখে যেতে পারব না। তাই আশা ও আশীর্ব্বাদ করি আমার সহকারিগণ তাঁদের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবেন এবং বৃহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন করতে পারবেন।

প্রাচীন ভারতে নারী—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা। পৃঃ ১২৭। মূল্য দুই টাকা।

ইহা একটি অতি মূল্যবান্ গ্রন্থ। ইহার প্রত্যেক পৃষ্ঠা গ্রন্থকারের সুগভীর পাণ্ডিত্যের প্রভায় সমুজ্জ্বল। গ্রন্থকার বৈদিক সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী কালের কাব্য, নাটক, ইতিহাস, ব্যাকরণ, কামশাস্ত্র এবং সর্ব্বোপরি স্মৃতিশাস্ত্র হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য, আর্য্য এবং দ্রাবিড় জাতির দেশাচার প্রভৃতি উৎস হইতেও উপাদান আহরণ করিতে বিরত হন নাই। গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট উক্তিসমূহের মূলে যে সকল শাস্ত্রীয় বচন আছে অনেক স্থলে সেগুলি উদ্ধৃত করিয়া তিনি পাঠকের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। অতি সহজ ও সরল ভাষার জন্য গ্রন্থখানি সুপাঠ্য হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থে যে সকল তথ্যের সমাবেশ করা হইয়াছে এখানে তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যুগে যুগে আমাদের দেশে নারীদিগের শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং ব্যক্তিগত ও সমাজগত অধিকারে কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে গ্রন্থকার তাহা সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া তিনি বিবাহ ও উত্তরাধিকার বিষয়ে নারীর স্থান কোথায় তাহা আলোচনা করিয়াছেন।

এস্থলে গ্রন্থের সামান্য দু'একটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বোধ হয়। গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য হইতে আরও ভূরি ভূরি প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিতেন। তিনি যে বৌদ্ধ যুগের উল্লেখ করিয়াছেন (পৃঃ ২২, ২৪) প্রকৃতপক্ষে তাহার অস্তিত্ব নাই। বাৎস্যায়ন তাঁহার কামসূত্রে নাগরকের স্ত্রীর দৈনন্দিন জীবনের যে সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন আলোচ্য গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। একই প্রতিপাদ্য বিষয় একাধিক অধ্যায়ে আলোচিত হওয়ায় কোনও কোনও স্থলে পুনরুক্তি দোষ হইয়াছে। সহমরণ প্রথার বিদেশ হইতে আমদানির সপক্ষে এবং কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে প্রমাণ দিয়াছেন (পৃঃ ২৪, ৭৬) তাহা নিতান্তই অসম্পূর্ণ।

এই গ্রন্থ সুধীজনসমাজে যে বিশেষ সমাদর লাভ করিবে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল

বঙ্গসাহিত্যে নারী—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ।০।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা মোটেই উল্লেখযোগ্য ছিল না। সেকালে স্ত্রী-শিক্ষা সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ গৃহস্থ-পরিবারে স্ত্রীলোকদের বিদ্যাশিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু মিশনরীদের চেষ্টা ও যত্নে কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারলাভ করিতে থাকে। ব্রজেন্দ্রবাবু গ্রন্থের গোড়ার দিকে সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন এবং কি ভাবে কখন বঙ্গমহিলা রচিত সর্ব্বপ্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয় তাহার উল্লেখ

করিয়া ক্রমশঃ যে সব বঙ্গমহিলা গ্রন্থরচনাদ্বারা সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম, পরিচয়, গ্রন্থের নাম, প্রকাশের তারিখ, বিষয়বস্তুর পরিচয়, সংক্ষিপ্ত জীবনকথা ইত্যাদি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। বঙ্গমহিলা-রচিত সর্ব্বপ্রথম পুস্তক 'চিত্তবিলাসিনী' কাব্য হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কালের লেখিকাদের নাম ও পরিচয় পর্য্যন্ত সযত্নে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গোড়ায় দিকের কৃষ্ণকামিনী, বামাসুন্দরী, হরকুমারী, রামসুন্দরী প্রভৃতির কথা বলিয়া—উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের স্বর্ণকুমারী, প্রসন্নময়ী, জ্ঞানদানন্দিনী, শরৎকুমারী, মোক্ষদায়িনী, মানকুমারী, গিরীন্দ্রমোহিনী, হিরন্ময়ী, সরলা দেবী, প্রিয়ম্বদা, কামিনী রায় প্রভৃতি মহিলাকবি ও লেখিকাগণের বিষয় এবং সাহিত্যক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর মহিলাকবি ও লেখিকাগণের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। লেখিকাদের নামের যে তালিকা দিয়াছেন তাহাতেও যত্ন এবং পরিশ্রমের পরিচয় পরিস্ফুট।

ব্রজেন্দ্রবাবু প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিয়াছেন—"এই ক্রমোন্নতির জের আজও পর্যন্ত অব্যাহত আছে। বঙ্গসাহিত্যে মহিলার দানের আয়তন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, কাব্য ও কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে কেহ কেহ স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন।" সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই দানের পরিমাণ যে আরও বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবী হইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে নারীদের যে অভিযান ব্যাপকতা লাভ করিতেছে তাহারও ইতিহাস লিখিতে পারিবেন।

বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে "বঙ্গসাহিত্যে নারী" ও "সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী" এই দুইখানি পুস্তকে যে প্রামাণিক ইতিহাস পাই, তাহা হইতে এই কথাই মনে হয় যে, স্ত্রী-পুরুষ সমাজ-শরীরের দুইটি অঙ্গ, উভয়ের সম্মিলিত দানেই জাতীয় প্রতিভা ও শক্তির বিকাশ করে। সাহিত্যের দিক দিয়া, বুদ্ধি ও হৃদয়ানুভূতি এবং সমাজের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে সাহিত্যসৃষ্টিতে নারীদের সাধনা সার্থকতালাভের পথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথ দেশবাসীর কাছে সাহিত্যক্ষেত্রে নারীর এই দানের কথা উপস্থিত করিয়া বাংলাসাহিত্যের প্রভূত কল্যাণসাধন করিলেন। বাংলাসাহিত্যে বর্ত্তমান কাল পর্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান মহিলাগণের দানের কথাও এই পুস্তকে সযত্নে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পুস্তিকাতে ২৩ খানা অতি সুন্দর হাফটোন্ চিত্র আছে। মুখপত্রে রহিয়াছে স্বর্ণকুমারী দেবীর একখানি অতি সুন্দর ছবি। প্রমাণ-পঞ্জী হিসাবে এই গ্রন্থ দুখানি অমূল্য বলা যায়। এমন নিখুঁত ও নির্ভুল সন তারিখ ও বিবরণ সম্বলিত বই বাংলাসাহিত্যে বিরল এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

'বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়' এই অতি প্রয়োজনীয় পুস্তিকা দুইখানি প্রকাশ করিয়া বাংলাসাহিত্যের গবেষকদের সামনে একটা নূতন পথ খুলিয়া দিয়াছেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পুরাণপ্রবেশ—শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, ২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৬। ডবল ক্রাউন অক্টেভো, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩০৬। মূল্য ছয় টাকা।

ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসু বিখ্যাত মনোবিৎ। তিনি এক দিকে যেমন আধুনিক বিজ্ঞান অন্যদিকে তেমনি গীতা ও উপনিষদের চর্চ্চা করিয়াছেন। পুরাণ আলোচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ তাই তাঁহার পক্ষে একান্ত সহজসাধ্য হইয়াছে। না জানিয়া পুরাণের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিবার মনোবৃত্তি অনেকের আছে, গিরীন্দ্রশেখরের আলোচনা শ্রদ্ধাপূর্ণ। শ্রদ্ধা সত্যানুসন্ধানে সহায়তা করে। পুরাণ অর্থে পুরাবৃত্ত। শতবর্ষ পূর্ব্ব পর্যন্ত পুরাণ এই অর্থেই ব্যবহৃত হইত। আধুনিককালে অস্পষ্ট ধারণার বশে ইতিহাস শব্দটি পুরাণের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। 'মাইথোলজি' বলিতে যাহা বুঝায় পুরাণ সেইরূপ অলীক কাহিনীর সমষ্টি নয়। 'হিষ্টরি'র মত দেশ ও কালে বিধৃত অতীত-বৃত্তান্তই পুরাণের বিষয়বস্তু। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত পুরাণের এই পঞ্চ লক্ষণ। ইহার মধ্যে মন্বন্তর কালনির্দ্দেশ করে। এই কালনির্ণয় এতই গুরুত্বপূর্ণ যে বলিতে গেলে এই সুবৃহৎ গ্রন্থের সমগ্র প্রথমার্দ্ধ ইহারই বিচারের সহিত কোন না কোন রূপে সংশ্লিষ্ট। পৌরাণিক কালমাপনা, যুগনির্ণয়, মন্বন্তর, ইতবৃত্তীয় যুগনির্ণয়, পুরাণে কালনির্দ্দেশ, কৃষ্ণজন্মকাল, বিভিন্ন রাজগণের কালনির্দ্দেশ, পর্য্যায়কাল বিচার, পৌরাণিক কালনির্দ্দেশ বিচার, অর্ব্বাচীন রাজগণের কাল, সপ্তর্ষিযুগনির্ণয়, নন্দাভিষেককাল, যুগক্ষয়, সারণী ও নির্দ্দেশ—এই কয়টি অধ্যায় কালনির্ণয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে। অন্যান্য অধ্যায়ের নাম—পুরাণের স্বরূপ, পৌরাণিক কল্পনা, পৌরাণিক প্রমাদ, পুরাণ মহাপুরাণ উপপুরাণ, আদিপুরাণ পুরাণসংহিতা, ইতিহাস কাব্য পুরাণসংরক্ষণ, প্রামাণ্যবিচার, বিদেশীয় পক্ষপাত, পৌরাণিক অত্যুক্তি বিচার, পুরাণের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। গ্রন্থকার যুক্তিবাদী। কালনিরূপণের এই বিচার দৃঢ় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসের সাহায্য না লইয়া পুরাণ ও প্রচলিত পঞ্জিকা হইতে নন্দাভিষেককাল ৪০১ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ বলিয়া তিনি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ মতে ১০১৫ বৎসর পূর্ব্বে পরীক্ষিৎ জন্ম এবং পরীক্ষিৎ-জন্মকালেই ভারতযুদ্ধ। পুরাণের নির্দ্দেশ অনুসারে তিনি কৃষ্ণ-জন্মকালেরও নির্ণয় করিয়াছেন। গ্রন্থকার দৈবযুগ, পিতৃযুগ এবং লঘু লৌকিক যুগ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি ধর্ম্মযুগ মাত্র। যুগনির্ণয় না করিতে পারিলে পৌরাণিক কালনিরূপণ অসম্ভব। এই দিক দিয়া আচার্য্য গিরীন্দ্রশেখরের গবেষণা একান্ত মৌলিক।

পুরাণ ঐতিহাসিক তথ্যের আধার, কল্পিত কাহিনীর সমাবেশ মাত্র নয়। সাধারণের ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। পুরাণে অতিরঞ্জন বা অলৌকিকের অবতারণা নাই এমন নয়। তাহা অত্যন্ত স্পষ্ট, কিন্তু অনর্থক নয়। পৌরাণিক অতিরঞ্জন কতকগুলি বিশেষ নিয়মের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট। রাম একাদশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহার অর্থ

করিয়াছিলেন। এইরূপ সকল ক্ষেত্রেই 'সহস্র' একাদশ বৎসর রাজত্ব উপলক্ষণ প্রয়োগ। গৌরবে যেমন বহুবচন হয়, ইহা অনেকটা সেইরূপ। গ্রন্থকার এই সূত্র ও নিয়মগুলি বলিয়া দিয়াছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্কার আমাদের মনকে এমনি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে যে পুরাণের আলোচনা করিতে আমরা ভয় পাই, লজ্জা পাই। বিদেশী পণ্ডিত পার্জিটর এবং আমাদের দেশের ডক্টর জয়সোয়াল ও আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় পুরাণ লইয়া গবেষণা করিয়াছেন। ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর পুরাণের উপর যে নূতন আলোকপাত করিয়াছেন সে আলোকে অনেক অজ্ঞাত বিষয় স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের পণ্ডিতমণ্ডলীর চিত্ত কতকটা অসাড়, এই গ্রন্থে বিধৃত পুরাতনের নব আবিষ্কার তাঁহাদের মনে যথেষ্ট সাড়া জাগাইতে পারে নাই। কয়েক বৎসর হইল "পুরাণপ্রবেশে"র প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। আগ্রহ সত্ত্বেও অনেকে ইহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এই গবেষণামূলক গ্রন্থখানির পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়া সুবিবেচনার কাজ করিয়াছেন।

কবি সার্ব্বভৌম—শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী। ৯৩।১, বহু-বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা।

"মংপুতে রবীন্দ্রনাথ" লিখিয়া মৈত্রেয়ী দেবী রবীন্দ্র-অনুরাগী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কবি ও কবির রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার তাঁহার আছে। "কবি সার্ব্বভৌম" বইখানি পড়িলেই বুঝা যায়, শুধু কবির সহিত নয়, কাব্য হোক গদ্য হোক, রবীন্দ্র-রচনার সহিত তাঁহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ। কবিকে নিকট হইতে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন বলিয়াই তিনি বলিতে পারিয়াছেন, "তাঁর কাব্য আর জীবনে যে কোন পার্থক্যই নাই, রবীন্দ্রকাব্য যে রবীন্দ্রজীবনেরই প্রতিচ্ছবি এ

কথা বার বার মনে হতে থাকে।" তিনি যখন বলেন, "কোন ব্যস্ততা নেই তাড়া নেই, একটি অনায়াস ছুটির স্বচ্ছন্দতা নিয়ে তিনি সর্ব্বদা খুসী হয়ে খেলা করে কাজ করতেন...কিছুই তাঁর উপর বোঝা হয়ে চাপতে পারত না," তখন কর্ম্মী রবীন্দ্রনাথের প্রশান্তির ছবিটি মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। কবি ও জীবন, বিশ্বমানব, তিন ভঙ্গী, শান্তিনিকেতন, অবনীন্দ্রনাথ, উৎসব, আবৃত্তি, সমন্বয়-সাধনা, রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা, রবীন্দ্রনাথের অহিংসা, জাতীয় জীবনে প্রভাব প্রভৃতি ষোলটি প্রবন্ধ পুস্তকে আছে। গ্রন্থের নামকরণেই প্রকাশ—প্রবন্ধগুলি কবি-সম্পর্কিত। লেখিকা বলিতেছেন, "তিনি আপনাকে ধরা দিতে পারতেন নানা লোকের কাছে নানা ভাবে...সেই জন্য তাঁর চার পাশে বহু ভিন্নরুচির মানুষ যাদের নিজেদের মধ্যে কোন মিল ছিল না তারাও সমান আকৃষ্ট হয়ে একত্র হত...যে মানুষ যেমন তিনি তার সঙ্গে তেমনি হয়েই মিলিত হতে পারতেন।" 'রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ' প্রবন্ধে পাই, "রবীন্দ্রনাথের কোন রচনাই বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন নয়।...বিশ্ব ও মানব সত্যের যে রূপ তাঁর চিন্তায় প্রকাশমান তা প্রবল যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গদ্যে এবং উপলব্ধির আনন্দ-মথিত হয়ে পদ্যে প্রকাশিত।" সব প্রবন্ধ সমান গুরুত্বপূর্ণ না হইলেও রচনার দরদী মন এবং আলোচনার চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু লেখিকা যেখানেই ব্যক্তি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কথা বলিয়াছেন সেখানেই আলোচনার মধ্য দিয়া কবি আপনার কোন না কোন অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

অনুশীলন সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—শ্রীজীবনতারা হালদার, এম্. এস্‌সি লিখিত। পৃঃ ২৫।

লেখক এই সমিতির নেতা পরলোকগত সতীশচন্দ্র বসুর জীবনকথা বিবৃত করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিয়া এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে সতীশচন্দ্রই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন; পি. মিত্র (ব্যারিষ্টার) ও তাঁহার অন্যান্য সহকর্ম্মী সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সতীশচন্দ্রের সহায়ক মাত্র ছিলেন। এই ধারণার সত্যাসত্য পরীক্ষাসাপেক্ষ। আশা করি, বাঙালী গবেষকমণ্ডলী অনুশীলন সমিতির প্রকৃত ইতিহাস প্রণয়নে সাহায্য করিবেন। উপকরণাদি এখনই দুর্লভ হইয়া পড়িতেছে; কালের প্রভাবে সেই ধ্বংসলীলা আরও শোচনীয় হইবে। এই ইতিহাস লিখিতে গিয়া শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী (মহারাজ) ও শ্রীনলিনীকিশোর গুহের লিখিত ইতিবৃত্তকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আরও অনেকের লেখা অমুদ্রিত আছে। এই সকল সংগ্রহে তৎপর হওয়া প্রয়োজন। পুলিনবিহারী দাস স্মৃতি-সমিতির সভ্যবৃন্দ এই বিষয়ে মনোযোগ দিবেন আশা করি।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

যোগবলে রোগ-আরোগ্য—স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী। উমাচল প্রকাশনী, ৫৮।১।২ কে, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। ৩১৭ পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ টাকা।

যৌগিক ব্যায়াম সম্বন্ধে গ্রন্থকারের দুই খণ্ড পুস্তক ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। যৌগিক প্রক্রিয়া দ্বারা কিরূপে নানা রোগ আরোগ্য করা যায় গ্রন্থকার তাহা আলোচ্য পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন। পুস্তকখানি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে যোগশাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ অনুসারে দেহতত্ত্ব ও রোগনিদান সংক্ষেপে বর্ণিত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অজীর্ণ, অম্লরোগ, অর্শ, আমাশয়, ইত্যাদি বাষট্টি প্রকার রোগের কারণ, বিস্তৃত বিবরণ, চিকিৎসা ও পথ্যাদির কথা আলোচিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়ামাদি যৌগিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগবিধি এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ঔষধের অপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা এবং পঞ্চম অধ্যায়ে অসুস্থ যৌনজীবন ও আদর্শ দাম্পত্য-জীবন ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়ামের যে বিবরণ গ্রন্থকারের পূর্ব্বপ্রকাশিত 'সহজ যৌগিক ব্যায়াম' পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে তদাতিরিক্ত কিছু বর্ত্তমান পুস্তকে পাওয়া যায় না। আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়ামের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত ও জটিল হইয়াছে, এবং যৌনবিষয়ের বর্ণনায় শ্লীলতার সীমা রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যোগবিদ্যাকে বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করিলে আধুনিক শিক্ষিত মনের উপযোগী হইত।

প্রসিদ্ধ বাঙালী মাধবদাসের মারাঠী শিষ্য স্বামী কুবলয়ানন্দ আধুনিক যোগবিজ্ঞানের প্রবর্ত্তক। দুঃখের বিষয়, স্বামী শিবানন্দের গ্রন্থে স্বামী কুবলয়ানন্দের নাম পর্য্যন্ত উল্লিখিত হয় নাই।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

শিক্ষাতত্ত্ব—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ডিপ্লোমা ইন্ টিচিং (লণ্ডন), ওরিয়েণ্ট লংম্যান্স, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ ১৯৫০। পৃষ্ঠা ২৩৭; মূল্য পাঁচ টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানি বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ স্যার পার্সি নানের "এডুকেশন: ইট্‌স্ ডাটা এণ্ড ফার্ষ্ট প্রিন্সিপল্‌স" গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। অধ্যাপক নান্ শিক্ষার্থীর অন্তঃপ্রকৃতি ও মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার বুদ্ধি ও ব্যক্তিসত্তা এক কথায় সমগ্র

M.B.SIRKAR & SONS
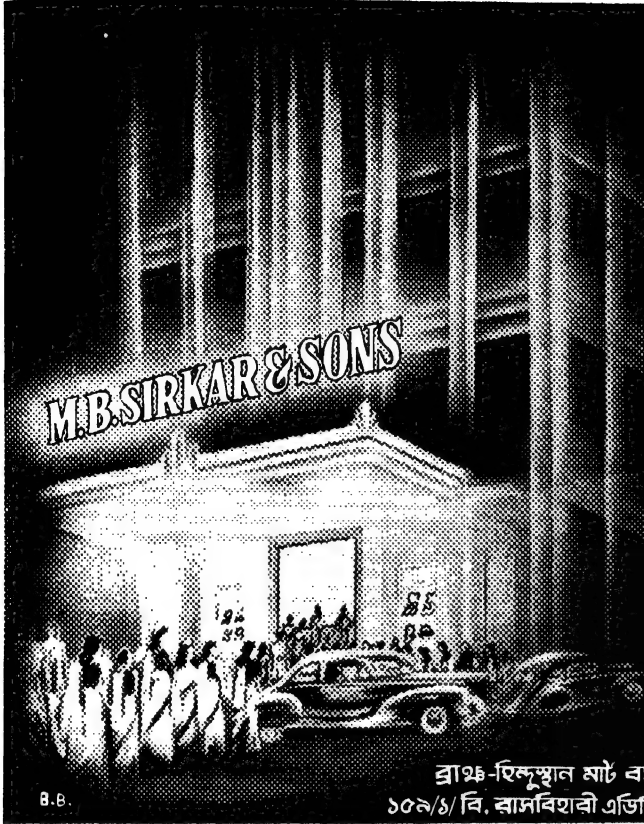
আমাদের নূতন শোরুম
এবং কারখানা
১৬৭ সি ১৬৭ সি/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা। আমাদের পুরাতন
শো-রুম এবং কারখানা,
১২৪ ১২৪/১, বহুবাজার ষ্ট্রীটের
বিপরীত দিকে, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট
ও বহুবাজার ষ্ট্রীটের সংযোগস্থল

এম.বি.সরকার এণ্ড সন্স

প্রখ্যাত গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্মাতা
হীরক ব্যবসায়ী

ফোন, বি, বি, ১৭৬১
গ্রাম:-ব্রিলিয়্যান্টস্

ব্রাঞ্চ-হিন্দুস্থান মার্ট বালিগঞ্জ
১৫৯/১/বি, রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা

B.B.

একমাত্র আমরাই দিই আরোগ্যের গ্যারাণ্টি

* বাত * কুষ্ঠ * ঋতুবন্ধ
* অর্শ * ধবল * জন্মনিয়ন্ত্রণ * শূলরোগ
* হাঁপানী * স্ত্রীরোগ * যৌনব্যাধি * রক্তচাপ

৫০ হাজার 'নারীর কথা' বিনামূল্যে বিতরণ

পাহাড়পুর ঔষধালয়

হেড অফিস—১০৩বি, ডাক্তার লেন, কলিকাতা—১৪

কলিকাতা শাখাসমূহ:
- সিটি শাখা—৬৮, হ্যারিসন রোড
- ভবানীপুর শাখা—৩১, রসা রোড
- শ্যামবাজার শাখা—ট্রাম ডিপোর উত্তরে

ডাকের পত্রাদি হেড অফিসে লিখিবেন।

Important To Advertisers.

Our
PRABASI *in Bengali,* **MODERN REVIEW** *in English and* **VISHAL BHARAT** *in Hindi*—

These three monthlies are the best mediums for the publicity campaign of the sellers.

These papers are acknowledged to be the premier journals in their classes in India. The advertiser will receive a good return for his publicity in these papers, because, apart from their wide circulation, the quality of their readers is high, that is, they circulate amongst the best buyers.

Manager,
The Modern Review Office
120-2, UPPER CIRCULAR ROAD, CALCUTTA 9

জীবনবিকাশের মূল তথ্যগুলির উপর যেরূপ সুস্পষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার গভীর মননশীলতার পরিচয় সুপরিস্ফুট।

বাংলাভাষায় মনোবিজ্ঞানের পরিভাষা খুব বেশী নাই; যেগুলি আছে তাহাও শিক্ষিত-সাধারণের প্রায় অপরিচিত। এরূপ ক্ষেত্রে অধ্যাপক নানের দুরূহ পুস্তকের অনুবাদ করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় সৎসাহস ও জ্ঞাননিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে অনুবাদ অত্যন্ত কঠিন এবং দুর্বোধ্য হইয়াছে। আমরা মূল পুস্তকের সহিত আদ্যোপান্ত মিলাইয়া দেখিয়াছি। আমাদের বক্তব্য এই যে, মূল গ্রন্থের মত অনুবাদ-গ্রন্থখানিও হাল্কাভাবে পড়িয়া হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নয়; তবে ধৈর্য্য সহকারে পাঠ করিলে শ্রম সার্থক হইবে।

কোন পুস্তক অনুবাদ বা অবলম্বন করিয়া লিখিতে গেলে অনুবাদককে একটি লক্ষ্য স্থির করিয়া লইতে হয়। হয় যথাসাধ্য মূলানুগ অনুবাদ কিম্বা মূলের ভাবের বিস্তারসাধন করিয়া সহজবোধ্য করা এই দুইটির মধ্যে একটি পন্থা অনুসরণ করা উচিত। আলোচ্য পুস্তকে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় আংশিকভাবে উভয় পন্থাই গ্রহণ করিয়াছেন: মূল পুস্তকের কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়াছেন, কিছু নূতন সংযোগ করিয়াছেন, 'মানসিক মান' শীর্ষক একটি সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, গীতার শ্লোক ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। মূল ইংরেজী গ্রন্থ পাঠ না করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন না কোন্ অংশ অধ্যাপক নানের লেখা—কোনটুকু-বা অনুবাদকের সংযোজনা। অধ্যাপক নানের উক্তির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় বলিয়া অনূদিত গ্রন্থেও তাঁহার বক্তব্য যথাযথ থাকা বিধেয়। অনুবাদকের বক্তব্য বরং বন্ধনীরেখার দ্বারা চিহ্নিত করিয়া রাখা চলে।

বর্ত্তমানে বাংলাভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষণ শিক্ষাদান চলিতেছে। শুধু সেজন্যই নয়, বাংলাভাষার পরিপুষ্টি ও সমৃদ্ধির জন্যও নানাবিষয়ক বিদেশী উৎকৃষ্ট গ্রন্থসমূহের অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। 'শিক্ষাতত্ত্ব' ট্রেনিং কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিকট আদৃত হইবে।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

অধিবাস—শ্রীরণজিৎ চৌধুরী। সারস্বত মন্দির, ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

পরিচয় দিতে গিয়া শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বলিয়াছেন, "লেখকের শ্রদ্ধা আছে, নিষ্ঠা আছে, আন্তরিকতা আছে। কাঁচা বয়স ও কাঁচা হাত হইলেও সাধনার দ্বারা শ্রীমান্ একদিন সুলেখক হইতে পারিবে, এ ভরসা করা যায়।" কবিতাগুলি পড়িয়া তাঁহার মন্তব্য যথার্থ মনে হইল। কোথাও চাতুরি বা অযথা বাহাদুরি দেখাইবার চেষ্টা নাই মনের কথাগুলি সহজ সৌন্দর্য্য লইয়া দেখা দিয়াছে।

সিদ্ধির পথ—শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার। যুগবার্ত্তা পাবলিশিং হাউস। ৪৭, পটলডাঙা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

জীবনে উন্নতিলাভের উপায় সম্বন্ধে পাঁচটি প্রবন্ধে লেখক আলোচনা করিয়াছেন—'সাধনা', 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি', 'সময়ের সদ্ব্যবহার', 'লক্ষ্যের অনুসরণ', জীবিকার উপায়'। কৃতী ব্যক্তিদিগের জীবন হইতে দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট এবং সরস করিয়াছেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সংখ্যা-বিজ্ঞানের অ, আ, ক, খ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ। ওয়েষ্ট বেঙ্গল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা। পৃঃ ১৫০। মূল্য চার টাকা।

বাংলাভাষায় সংখ্যাবিজ্ঞান সম্বন্ধে এইটি বোধ হয় একমাত্র বই। ভারতে সংখ্যাবিজ্ঞানের গুরুত্ব স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর হইতে ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে। সরকারী প্রকাশনার আয়তন এবং তন্নিবদ্ধ তথ্যের পরিমাণও ক্রমবর্দ্ধমান। এই সব তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণে সংখ্যাবিজ্ঞানের মূলতত্ত্বের জ্ঞান অপরিহার্য্য।

আলোচ্য বইখানিতে সংখ্যাবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব প্রাঞ্জল ভাষায় নিভুর্ল ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। লেখকের যুক্তি অনুসরণের জন্য উচ্চতর গণিতের জ্ঞান প্রয়োজন হয় না। এ সম্পর্কে বিশেষভাবে "কোরিলেশন"-বিষয়ক অধ্যায়ের উল্লেখ করা যেতে পারে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

অরুণ-বহ্নি—শ্রীশান্তি দাশ। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য আড়াই টাকা।

শ্রীযুক্তা শান্তি দাশ কুমারী নাম—শ্রীশান্তি ঘোষ রূপে বাংলাদেশে বিপ্লবকর্ম্মের জন্য দীর্ঘ বিংশতি বৎসর যাবৎ পরিচিত হইয়া আছেন। ১৯৩০ সনের আইন অমান্য আন্দোলনের পূর্ব্ব হইতেই মুক্তিকামী এক দল যুবক ভারতবর্ষে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইবার পরই ইঁহারাও সক্রিয় হইয়া উঠেন। ইঁহাদের কার্য্যকলাপ আজ আর কাহারও অবিদিত নাই। স্কুল-কলেজের ছাত্রীরাও এই দলে আসিয়া যোগদান করেন। কুমিল্লার বালিকা-বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর পঞ্চদশ বর্ষীয়া কিশোরী ছাত্রী শ্রীমতী শান্তি ঘোষ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। শ্রীমতী সুনীতি চৌধুরীর সঙ্গে তিনি ১৯৩১ সনের ১৪ই ডিসেম্বর কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টিভেন্সকে হত্যার ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া পড়েন এবং উভয়ে বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৩৭ সনের নূতন ভারত-শাসনের ফলে বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়; বাংলার মন্ত্রীসভা মুসলমানপ্রধান হইলেও মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টাযত্নে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে রাজবন্দী ও আইনে দণ্ডিত বন্দীগণ একে একে কারামুক্ত হন। শ্রীমতী শান্তিও কারামুক্ত হইলেন। আলোচ্য পুস্তকখানিতে লেখিকা শৈশবাবধি এই সকল বিচিত্র কাহিনী অতি মনোরম ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিভিন্ন অধ্যায়ের নামকরণেও বৈশিষ্ট্য আছে। রাত্রির তপস্যা, লক্ষ্যভেদ, পিঞ্জরে বিহঙ্গ, বাধা-বন্ধনহীন প্রাণ—এই সকল অধ্যায়ে কারাবাসের পূর্ব্বে ও পরে এবং কারাবাসকালের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নানা লোকের সঙ্গে আলাপ-আলাপন কত কথাই না সংক্ষেপে সংযত ভাবে বলা হইয়াছে। বইখানি বিপ্লব আন্দোলনে নারীর যোগাযোগের একখানি সুন্দর চিত্র।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

দেশ-বিদেশের কথা

নরসিংদাস বাংলা পুরস্কার, ১৯৫০

ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস-এর ডিরেক্টর কলিকাতা-নিবাসী শ্রীনরসিংদাস আগরওয়ালার প্রদত্ত তহবিল হইতে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতা প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের মারফত বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান এবং সাহিত্য-বিষয়ক পুস্তক-প্রণেতাদের উৎসাহ প্রদানার্থে 'নরসিংদাস বাংলা পুরস্কার' নামে একটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। এক হাজার টাকা মূল্যের এই পুরস্কার পর্য্যায়ক্রমে সাহিত্য এবং বিজ্ঞান উভয় বিষয়ক গ্রন্থের জন্ত প্রদত্ত হইবে। ১৯৫১ সালের পুরস্কার নির্দ্ধারিত হইয়াছে সাহিত্যের জন্ত। পুরস্কার ঘোষণার বৎসরে যে লেখকের মুদ্রিত গ্রন্থ 'সিলেক্‌সন্ কমিটি' কর্ত্তৃক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাঁহাকেই উক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে। কমিটি ১৯৫০ সালের ৩০শে জুনের অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতে দুই বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য-বিষয়ক পুস্তকের প্রণেতা ও প্রকাশকদিগকে—১৯৫১ সালের ৩১শে জুলাইয়ের পূর্ব্বে, এক-একটি মুদ্রিত পুস্তকের ৮খানি করিয়া কপি পাঠাইবার জন্ত অনুরোধ জানাইয়াছেন। পুস্তকসমূহ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার টি. পি. এস. আয়ারের নিকট প্রেরিতব্য।

শ্রীমমতা চৌধুরী

এ বৎসর মজঃফরপুর 'কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশন' নামক প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পরীক্ষায় ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম হইয়া শ্রীমমতা চৌধুরী সম্মানের সহিত ডিপ্লোমা পাইয়াছেন।

গত ছয় বৎসরের মধ্যে বহু শত পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থিনীর মধ্যে কেহ এই ডিপ্লোমা লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। বিহার রাজ্যে শ্রীমতী চৌধুরীই সর্ব্বপ্রথম এই কলেজ হইতে সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করিলেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন কৃতী গ্রাজুয়েট; চারু এবং কারু শিল্প ও ললিতকলায় পারদর্শিনী। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক বিভিন্ন সংস্থার সহিত ইনি সংশ্লিষ্ট আছেন। ইনি মজঃফরপুরের বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীপরেশ চৌধুরীর পত্নী।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের লেখা

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধাবলী দুই খণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছেন। সেইরূপ তাঁহারা উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব মহাশয়ের লেখাও সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তাহার কিয়দংশ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে অনেকগুলিই সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে একখানির সন্ধান এখনও পাওয়া যাইতেছে না। পুস্তিকাখানির নাম "ব্রহ্মামৃত। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব।" প্রবাসীর কোন পাঠক এখানি সংগ্রহ করিতে সাহায্য করিলে সাহিত্য-পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন বাঙালী পাঠকমণ্ডলীও একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষের চিন্তাধারায় অভিষিক্ত হইবার সুযোগ পাইবেন।

ডক্টর নলিনীমোহন সান্যাল

৯০ বৎসর বয়সে এই শিক্ষাবিদ্ দেহরক্ষা করিয়াছেন। জ্ঞানের সাধনায় তিনি সমগ্র জীবন কাটাইয়াছিলেন, বাংলা ভাষায় তামিল সাহিত্যের পরিচয় দিয়া তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বাংলাদেশের নানা সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করিয়া প্রায় ৩০ বৎসর কাল

অবসর যাপন করতঃ প্রার্থিত লোকে চলিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

সুরেশচন্দ্র রায়

৭০ বৎসর বয়সে সুরেশচন্দ্র রায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। সুরেশচন্দ্র ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সহযোগী ঢাকানিবাসী বঙ্গচন্দ্র রায়ের পুত্র। "প্রচারক"-জীবনের অভাব-অভিযোগের মধ্যে তিনি বর্দ্ধিত হন। শিকান্তে পিতার সম্পাদিত ইংরেজী পত্রিকায় তাঁহার সাংবাদিক জীবনের হাতেখড়ি হয়। তারপর সরকারী রাজস্ব বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করিয়া ১৯৩৭ সালে বাংলা দেশের কৃষি-শিল্প বিভাগের সহকারী সেক্রেটারীর পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তখন হইতে তিনি পুনরায় প্রথম যৌবনের সাংবাদিকতার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। "নববিধান" ও "ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার" পত্রিকায় তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত।

যজ্ঞেশ্বর ঘোষ

৮১ বৎসর বয়সে শিক্ষাব্রতী যজ্ঞেশ্বর ঘোষ মরজগৎ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন চুঁচুড়া বাণীমন্দির হাই স্কুলের পরিচালক সমিতির সভাপতি রূপে এই বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে তিনি বহুদিন কাজ করিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক এই শিক্ষাব্রতীর বিয়োগে আমরা ব্যথিত হইলাম। তিনি ১৯২০ সালে বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তদবধি তিনি নানাভাবে ঐ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সেবা করিয়াছেন। কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ ঢাকুরিয়ার অধিবাসী রূপে ব্রজেন্দ্রনাথ সেই অঞ্চলের উন্নতিকল্পে অকুণ্ঠ পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

এস. ওয়াজেদ আলী

প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী মুসলমান এস. ওয়াজেদ আলি, বি. এ (ক্যান্টাব), বার-এ্যাট-ল সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ হইতে অবসর গ্রহণের পরে তিনি নানা রোগে ভুগিতেছিলেন।

ওয়াজেদ আলি ১৮৯০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর হুগলী জেলার বড়তাজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পরিবার ব্যবসাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। বাল্যকালে ওয়াজেদ

এস. ওয়াজেদ আলী

আলিকে মক্তবে ও তারপর গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি করা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর উচ্চশিক্ষা লাভার্থ তাঁহাকে আলীগড় এম-এ-ও কলেজে (বর্ত্তমানে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত) প্রেরণ করা হয়। তিনি তথায় কৃতী ছাত্ররূপে পরিচিত হন এবং ১৯১০ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। তৎপর তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন এবং সেখান হইতে বি-এ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯১৫ সালে ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে আইন-ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৯২৩ সালে ওয়াজেদ আলি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। তিনি সেই পদ হইতে ১৯৪৫ সালের শেষভাগে অবসর গ্রহণ করেন। ওয়াজেদ আলি বিচারকরূপে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় একজন বিশিষ্ট লেখক হিসাবে সাহিত্যক্ষেত্রে ওয়াজেদ আলি সুপরিচিত। তাঁহার লিখিত 'ভবিষ্যতের বাঙালী' পুস্তকখানি বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীগৌরাঙ্গচরণ সোম

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

[সম্বলপুরের গোপালজী মন্দিরের মূর্ত্তি হইতে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃত্তিপ্রাপ্ত দশ জন ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীর বোম্বাই হইতে আমেরিকা যাত্রা

ভারতবর্ষে খাদ্য-সম্ভার প্রেরণের জন্য মার্কিন জাহাজের প্রস্তুতি

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫১শ ভাগ
১ম খণ্ড } ভাদ্র, ১৩৫৮ { ৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকার

স্বাধীনতার চারি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। এই চারি বৎসরে দেশের উন্নতি অবনতি কি হইয়াছে তাহার বিচারে বাগ্‌বিতণ্ডা চতুর্দ্দিকেই শুনা যায় সুতরাং সে বিষয়ে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। এখন সর্ব্বপ্রধান বিচার্য্য বিষয় এই যে, দেশের লোকের স্বাধীনতা সম্পর্কে যোগ্যতা বৃদ্ধি—বা তাহার বিপরীত—কতটা হইয়াছে। দেশের মাটি, দেশের শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি, এই সকলের উন্নতি যদিই-বা কিছু হয়, সে সবই ব্যর্থ হইতে বাধ্য যদি না দেশের লোক স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ কি তাহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়।

দেশের লোক এই প্রথম স্বাধীনতা অর্জ্জন করে নাই। ইতিহাসের অপব্যাখ্যার ফলে ব্রিটিশরাজ আমাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিয়া গিয়াছে যে, আমাদের দাসত্ব আরম্ভ হয় খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকে এবং তাহার পর ইংরেজের দেশত্যাগ পর্য্যন্ত অনবচ্ছিন্ন দাসত্বই এদেশে চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসের সাক্ষ্য তাহা নহে।

মোগল সাম্রাজ্যের অবসান ইংরেজের হাতে নামেমাত্র হইয়াছিল। বস্তুতঃ পক্ষে তাহার বহু পূর্ব্বে দক্ষিণ ও পশ্চিমে মহারাষ্ট্র সঙ্ঘ ও উত্তরে শিখরাজ মোগল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাইয়াছিল। এই কারণেই বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইংরেজের ভারত সাম্রাজ্য লাভ হইয়াছিল মারাঠা ও শিখদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ও বিস্তৃত সংগ্রাম-অভিযানের ফলে, মোগল বা পাঠানের বিরুদ্ধে নয়। পলাশীর যুদ্ধ বা টিপু সুলতানের ধ্বংস ঐ সকল অভিযানের তুলনায় নগণ্য ব্যাপার। ভারতের একচ্ছত্র সিংহাসনের অধিকারে ইংরেজের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল মহারাষ্ট্রীয় সঙ্ঘ এবং ব্রিটিশ আমলে ইংরেজের বিরুদ্ধে শেষ স্বাধীনতার সশস্ত্র যুদ্ধের নেতা ছিলেন মহারাষ্ট্রীয় নানা সাহেব। মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব-রবি অস্তাচলে গিয়াছে তাহার বহু পূর্ব্বে, যখন মাহাদজী সিন্ধিয়া মোগল সম্রাটকে প্রতীক্ মাত্র রাখিয়া দিল্লীর শাসনদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এই বিষয়টি দিল্লীর ব্যবস্থাপক সভায় উঠে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন মুসলিম লীগ সদস্য সিদ্দিকি তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন এই বলিয়া: "আমরা শুধু চাই যে ইংরেজ সরকার ভারতের শাসনদণ্ড যাহাদের হাত হইতে লইয়াছেন তাহাদেরই হাতে উহা প্রত্যর্পণ করুন।" এই কথার সঙ্গে সঙ্গে এক জন মহারাষ্ট্রীয় সদস্য উঠিয়া বলেন, "আমি এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি" এবং শিখ সদস্য সর্দ্দার সন্ত সিং বলেন, "আমিও অতি আনন্দের সহিত এই প্রস্তাবের সমর্থন করি।" ইংরেজ সদস্যগণের উচ্চ হাস্য শুনিয়া সিদ্দিকি হতভম্ব হইয়া বসিয়া পড়েন; তাঁহার ধারণাই ছিল না যে, ঐ প্রস্তাবের অর্থ ভারতের রাজছত্র মারাঠা ও শিখের হস্তে দেওয়া।

আমাদের জানা প্রয়োজন যে ঐ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ মহারাষ্ট্র-সঙ্ঘ ও দুর্দ্ধর্ষ শিখরাজ স্বাধীনতা রাখিতে পারে নাই কেন। কারণ যাহা তাহা ত ইতিহাসের পাতায় পাতায় রক্তাক্ষরে লিখিত আছে। ঐ দুই শক্তিই দেশের বা দশের কথা ভুলিয়া স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করিয়াছিল, দেশের সাধারণ অধিবাসীও স্বাধীনতার অর্থ বুঝে নাই, বুঝিয়াছিল ব্যক্তিগত স্বার্থ মাত্র, এবং সেই কারণে ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদ্বয়ের সাহায্য করিয়াছিল সকলপ্রকারে। তাহারা ভাবিয়াছিল উহারা অনাচার দূর করিয়া বন্ধুভাবে দেশশাসনে সাহায্য করিবে, বুঝে নাই যে তাহারা রক্তশোষক রূপে দেশের দণ্ড-মুণ্ডের অধিকারী হইয়া বসিবে। এককথায় তাহারা বুঝে নাই স্বাধীনতার মূল্য কি, পণ কি ও তাহার রক্ষার ব্যবস্থাই বা কি প্রকার।

মারাঠা ও শিখ তো শস্ত্রবলে কয়েক যুগ স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিতে পারিয়াছিল। আজিকার দিনে ইতিহাসের চক্র দ্রুততর ঘুরিতেছে এবং সেই কারণে এই সামান্য চারি বৎসরেই আমরা ঐ ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছি। তাহার কারণ আমাদের দেশের সুশিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেরই মনে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে ধারণা অস্পষ্ট। দলগত, গোষ্ঠীগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থের বিষ আমাদের সকলেরই অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে উপরন্তু আছে ক্ষমতা এবং অর্থের লালসা ও অত্যধিক

হিংসা-বিদ্বেষ। সেই কারণেই দেশের উচ্চতম অধিকারীবর্গ হইতে নিম্নতম নাগরিক পর্য্যন্ত সকলেই উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত। ধর্ম্মাধিকরণের অধিকারীবর্গের মধ্যেও এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা বুঝিয়াছেন শুধু ছাপার অক্ষরের অর্থ মাত্র এবং তাহার ব্যাখ্যায় পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতেই তাঁহারা ব্যস্ত, তাহাতে দেশ রসাতলে যাইবে কিনা সে চিন্তার তাঁহাদের অবসর নাই। নিম্নতম অধিকারীদিগের তো কথাই নাই।

স্বাধীনতা বলিতে আমরা বুঝিয়াছি স্বেচ্ছাচার এবং স্বাতন্ত্র্য বলিতে বুঝিয়াছি স্বার্থসিদ্ধি ও পরের অনিষ্ট করা। পথে-ঘাটে বাজারে-বৈঠকে ঘরে-বাহিরে ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ আমরা অহোরাত্র পাইতেছি। পথের মাঝখানে বাস্ দাঁড়ায়, যাত্রীর দল প্রশস্ত রাজপথের অর্দ্ধেক ছাইয়া দাঁড়ায়, ইহাতে সমস্ত অঞ্চলের যানবাহনের গতি মন্থর হইয়া দশ জনের স্বার্থে সহস্র জনের স্বার্থহানি হয়, কে বুঝিবে? দলগত স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য দশ জন চোরকে পারমিট দিয়া দশ হাজারের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়, কে বুঝাইবে? নিজের পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য হাজার ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিয়া অন্যায় প্রশ্ন পরীক্ষায় দিলে অধর্ম্মাচরণ হয়, কাহাকে বলিবেন? আইনের ফাঁকে চোরা-কারবারী বা ঘুষখোরকে ছাড়িয়া দিলে অনাচারের অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়, কে শুনিবে?

সম্মুখে নির্ব্বাচনের পর্ব্ব। নির্ব্বাচনের ডঙ্কা বাজিলে সত্য-মিথ্যার বালাই থাকে না। সুতরাং দেশের লোকের আরও বিভ্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক। তবে উপায়? উপায়, দলগত ছাপ অগ্রাহ্য করিয়া, যোগ্য লোকের সন্ধান, নির্ব্বাচন ও প্রতিষ্ঠা করণ। যদি স্বার্থের লোভে বা অহেতুক উত্তেজনার বশে আমরা তাহা না করি তবে ইতিহাসের চক্র পুনরায় ঘুরিবে। দেশে মাৎস্যন্যায় দেখা দিবে, পরে দাসত্ব।

৪ঠা জুলাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবসের ১৫০ বার্ষিকী উৎসব হইয়াছে। "স্বাধীনতা" দিবস উপলক্ষে আমেরিকার সংবাদপত্রগুলি স্বাধীনতার অঙ্গীকার মুদ্রিত করিয়া থাকে, উহার তলায় নাম স্বাক্ষরের স্থান থাকে। জনসাধারণ ঐ সকল অঙ্গীকারের তলায় নিজেদের নাম স্বাক্ষর করিয়া "ইণ্ডিপেণ্ডেন্স" হলে পাঠাইয়া দিয়া থাকে। তথায় উহা প্রদর্শিত ও রক্ষিত হয়।

ঐ অঙ্গীকারে থাকে :

"আমি একজন স্বাধীন আমেরিকান,
আমি নির্ভয়ে আমার মতামত ব্যক্ত করিতে পারি,
আমার খুশীমত উপায়ে ভগবানের আরাধনা করিতে পারি,
যাহা আমি ভাল বলিয়া মনে করি তাহা সমর্থনের অধিকার আমার আছে,
যাহা আমি অন্যায় বলিয়া মনে করি তাহার বিরোধিতার অধিকার আমার আছে,
যাহারা আমাদের দেশ শাসন করেন তাঁহাদের নির্ব্বাচনের অধিকার আমার আছে,
আমার নিজের জন্য এবং সমুদয় মনুষ্য সমাজের জন্য এই স্বাধীনতার আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিবার অঙ্গীকার আমি করিতেছি।"

এই অঙ্গীকারের শেষে "সমুদয় মনুষ্য সমাজের" উল্লেখ কেন রহিয়াছে সে কথা যদি আমরা বুঝি এবং সম্যক্ ভাবে গ্রহণ করি তবেই আমাদের পরিত্রাণ নতুবা নহে। নিজের স্বার্থে অন্যের স্বাধীনতা খর্ব্ব না করিতে যদি আমরা শিখি তবেই ঐ শেষ অঙ্গীকার রক্ষা পায়।

ওয়ার্কিং কমিটি হইতে নেহরুর পদত্যাগ

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এবং কেন্দ্রীয় ইলেকশন বোর্ড হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে কংগ্রেসে একটি প্রথম শ্রেণীর সঙ্কট দেখা দিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কিদোয়াই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। প্রথমবার তিনি পদত্যাগ করিয়া পরে উহা প্রত্যাহার করেন কিন্তু তাঁহার চিঠিপত্রে কংগ্রেস-সভাপতি সম্বন্ধে কোন কোন মন্তব্যে আপত্তি হওয়ায় তাঁহাকে মন্ত্রিসভা ছাড়িতে বাধ্য করা হয়। পণ্ডিত নেহরু ইহাকে তাঁহার কার্য্যে কংগ্রেস-সভাপতির হস্তক্ষেপ বলিয়া মনে করিতে পারেন। অতঃপর ওয়ার্কিং কমিটি এবং নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারিয়েট পুনর্গঠন করিতে হইবে বলিয়া নেহরু [illegible] করেন। কংগ্রেসের দুর্নীতি দূর করিতে হইলে কংগ্রেসে বাহিরের ভাল লোকদের আনিতে হইবে বলিয়া নেহরু মনে করেন এবং বাঙ্গালোরে সে চেষ্টাই তিনি করিয়াছিলেন। তাঁহার এই চেষ্টা কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ত্তাদের অনেকে ভাল চোখে দেখেন নাই কারণ ইহাতে তাঁহাদের খুব অসুবিধা হইবে। বর্ত্তমানে যে দল কংগ্রেস দখল করিয়া রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে শেষোক্ত শ্রেণীর লোকই বেশী। ইহা ছাড়া এই বিরোধে কংগ্রেসের পুরানো ঐতিহ্যও কম দায়ী নহে। স্বাধীনতার আগে কংগ্রেস পার্টি আইনসভা এবং মন্ত্রিসভার উপর পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করিত। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব অধিকার করিবার পর হইতেই মন্ত্রিসভা এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলির মধ্যে তীব্র বিরোধ আরম্ভ হয়। তবে ওয়ার্কিং কমিটির সর্ব্বোচ্চ প্রাধান্য তখনও খর্ব্ব হয় নাই। ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারি বোর্ড মন্ত্রিসভাগুলির উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। সর্দ্দার প্যাটেলের জীবদ্দশায় এই বিরোধ বাধিয়াছে, কিন্তু বেশী দূর গড়াইতে পারে নাই। কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিরোধের সংবাদ প্রকাশিত হইলে প্যাটেল এবং নেহরু দুই জনেই উহার প্রকাশ্য প্রতিবাদ করিয়াছেন। এখনকার মত নেহরু-দল এবং প্যাটেল-দলের মধ্যে প্রকাশ্য বিবৃতি-যুদ্ধ তখন ঘটিতে পারে নাই। সর্দ্দার প্যাটেল কংগ্রেস এবং গবর্ণমেণ্ট

ইঁহারাই উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার জীবিতকালে ভিতরে ভিতরে মতভেদ হইলেও প্রকাশ্য বিরোধ হয় নাই। সর্ব্বোপরি গান্ধীজীর জীবিতকালে সর্ব্বসময়েই তিনি রাশ টানিয়া রাখিয়াছিলেন। নেহরু ও প্যাটেলের মধ্যে আদর্শগত প্রভেদ ছিল, কিন্তু তাহা কখনও প্রকাশ্যে ফাটিয়া পড়ে নাই। সর্দ্দার প্যাটেলের মৃত্যুর পর তাঁহার দল ট্যাণ্ডনজীকে সম্মুখে রাখিয়া কংগ্রেসের প্রাচীন ধারা ফিরাইয়া আনিতে চাহিতেছেন। ওয়ার্কিং কমিটি মন্ত্রিসভায় হস্তক্ষেপ করিবে, কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনিবে না ট্যাণ্ডন-দল ইহাই চাহিতেছেন। অর্থাৎ তাঁহারা মন্ত্রিসভার উপর পার্টির পূর্ণ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক। প্রধানমন্ত্রী এই অবস্থা মানিয়া লইতে চাহিতেছেন না। বোম্বাই, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরা প্রধানমন্ত্রীর কাজে ওয়ার্কিং কমিটি মারফত হস্তক্ষেপ করিতে থাকিবে এই অবস্থা নেহরুর পক্ষে মানিয়া লওয়া সহজ নয়। এই অবস্থা যাহাতে না আসে তাহার জন্য তিনি ট্যাণ্ডনজী কংগ্রেস-সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবার পর হইতেই ওয়ার্কিং কমিটির বাহিরে থাকিতে চাহিতেছেন। অনেক অনুরোধ-উপরোধে তাঁহাকে ওয়ার্কিং কমিটিতে আনা হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে ওয়ার্কিং কমিটিতে থাকিয়া মন্ত্রিসভার উপর উঁহার অপ্রতিহত প্রাধান্য তিনি মানিয়া লইতে পারিতেছেন না। ঐ সম্বন্ধে এখনও কোন সঠিক এবং বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই, পাওয়াও যাইতেছে না। এই অবস্থায় কোন পক্ষ সম্বন্ধেই কোন নিশ্চিত মন্তব্য করা অযৌক্তিক হইবে। যখন আমরা দেখিতেছি যে, দুই পক্ষেরই মন্তব্যে অযৌক্তিক ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয় রহিয়াছে তখন ইহার বিস্তারিত বিচার স্থগিত রাখাই সমীচীন।

রাজপথে দুর্ঘটনা

রাজপথে দুর্ঘটনা নিবারণ পুলিসের অবশ্য কর্ত্তব্য। কলিকাতার রাস্তায় নোটিশ টাঙ্গাইয়া দুর্ঘটনা বন্ধ করিবার চেষ্টা হইতেছে। ফুটপাথ ছাড়িয়া রাস্তায় হাঁটা এক শ্রেণীর লোকের বদভ্যাস এবং ইহা নিন্দনীয় ও অবশ্যপরিহার্য্য। কিন্তু দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ ইহা নহে। বাস এবং লরী-গুলি দুর্ঘটনার আসল হেতু। লোক চাপা দেওয়া তো সামান্য ব্যাপার, ট্রামের সঙ্গে ধাক্কা লাগাইয়া প্রাণহানি ঘটানো ইহাদের নিকট কিছু নয়। কয়েক মাসের মধ্যে রসা রোড হাজরা রোডের মোড়ে, ষ্ট্রাণ্ড রোডে, চৌরঙ্গিতে এবং সেদিন শিয়ালদহে সার্কুলার রোডে এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে এবং লোক মরিয়াছে। রাস্তা পারাপারের সুযোগ করিয়া দেওয়া, পথচারীদের যথাসম্ভব ফুটপাথ দিয়া চলিতে বলা ভাল; কিন্তু সমস্ত উৎসাহ উহাতেই নিবদ্ধ করা উচিত নহে। পুলিস যে নোটিশ টাঙ্গাইয়াছে তাহাতে লেখা আছে যে নির্দ্দিষ্ট স্থান দিয়া যাহারা রাস্তা পার হইবে তাহারাই কেবল protected by law—অর্থাৎ অন্য স্থানে কেহ চাপা পড়িলে তার জন্য কেহ দায়ী নহে। আইনের এই ব্যাখ্যা ঠিক হইয়াছে কিনা আমরা তাহা জানিতে চাই। লরী এবং বাস ট্রাফিক পুলিসের অযোগ্যতার দরুন আইন ভঙ্গ করে। ইহারা কতদূর বেপরোয়া হইতে পারে হরিশ মুখার্জ্জি রোডের মোড়ে কর্ত্তব্যরত ট্রাফিক পুলিসকে ধাক্কা মারিয়া তার মৃত্যু ঘটাইয়া পলায়ন এবং সেদিন জি. পি. ওর নিকটে লোক চাপা দিয়া পলায়মান লরী ধরিতে গিয়া দুর্ঘটনা তার দৃষ্টান্ত। বাসগুলি আজকাল কিছুতেই রাস্তার পাশ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইবে না, ট্রাম লাইনের উপর দাঁড়াইয়া যাত্রী তুলিবে ও নামাইবে। দুর্ঘটনার ইহা একটি মস্ত কারণ। আর এক কারণেও আজকাল দুর্ঘটনা বাড়িয়াছে। ট্রাম হইতে যাত্রী উঠা-নামার সময় পিছন হইতে কোন গাড়ী আসিবে না, কলিকাতার পুলিস কমিশনারের এইরূপ আদেশ আছে। চৌরঙ্গিতে এই প্রকার একটি দুর্ঘটনার পর আদেশটি খুব কঠোরতার সহিত প্রযুক্ত হইত। আজকাল ইহা একেবারে আমলে আনা হয় না। কিছু দিন আগে সার্কুলার রোডে এরূপ ঘটিয়াছিল। সেদিন তো গবর্মেণ্ট হাউসের সম্মুখেই ঘটিয়াছে। দুর্ঘটনা কমাইবার জন্য কেবল পথচারীদের উপর চাপ দিয়া সকল উৎসাহ খরচ না করিয়া বাস লরীগুলিকে সর্ব্বাগ্রে আইন মানিয়া চলিতে শেখানো দরকার। লরীর 'গবর্ণর' বাঁধিয়া দেওয়ার নিয়ম আছে কিন্তু ইহাদের দৌড়ের রকম দেখিলে কাহারও গবর্ণর বাঁধা আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। এইগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করা দরকার। ট্রাম ষ্টপে গাড়ী থামিলে পিছনের গাড়ী দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিবার নিয়মও কঠোরভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে।

ট্রেনে রাহাজানি

চলন্ত ট্রেনে মেয়েদের কামরায় বা প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর ছোট কামরায় ঢুকিয়া রাহাজনি বড় বেশী আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমটা হাওড়া ষ্টেশনেই ইহা হইতেছিল, কয়েকদিন আগে রাণাঘাটেও হইয়াছে। দিল্লী এক্সপ্রেস হাওড়ায় ঢুকিবার আগে উহাতে চোর ঢুকিবার চেষ্টা করে। একটি ঝিলের ধারে রহস্যজনক ভাবে গাড়ী থামিয়া যায়। আবার চলিতে আরম্ভ করিলে ট্রেনের খালাসীর পোশাক-পরা একটা লোক মেয়েদের গাড়ীর পাদানিতে উঠিয়া পড়িয়া যাওয়ার ভান করিয়া দরজা খুলিতে বলে। কামরায় ঐ ট্রেনের গার্ডের স্ত্রী ছিলেন। গার্ড তাঁহাকে কোন কারণেই দরজা খুলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারা দরজা খুলিলেন না। লোকটা তখন জানালার ধারে উপবিষ্টা একটি যাত্রিণীর ব্যাগ ধরিয়া টান মারে এবং তাঁহারা উহার স্বরূপ বুঝিতে পারেন। চেন টানা হয় কিন্তু গাড়ী অনেক দূর গিয়া থামে। লোকটা উধাও হয় এবং পুলিস যথারীতি ভুল লোক ধরিয়া উপস্থিত করে। ইহার কয়েক দিন পরেই বোম্বাই মেলের কুপে গাড়ীতে এই

ব্যাপার ঘটে এবং শ্রীমতী আশালতা চট্টোপাধ্যায় নাম্নী একটি মহিলা যাত্রী ইহাতে প্রাণ হারান। দুইটি লোক পাদানিতে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দেওয়ার জন্য কাকুতি-মিনতি করিতে থাকে এবং টিকিট দেখায়। কুপে গাড়ীতে শ্রীমতী আশালতা এবং তাঁহার ভাসুর-পুত্র একটি যুবক ছিলেন। শ্রীমতী আশালতা রেলওয়ে অফিসারের স্ত্রী, তাঁহাকে দরজা না খোলার কথা বলিয়াও দেওয়া হয় কিন্তু টিকিট দেখানোতে তিনিও বিভ্রান্ত হন এবং দয়াপরবশ হইয়া দরজা খোলেন। লোক দুইটা ঢুকিয়াই ছোরা বাহির করে। দুই জনেই আহত হন এবং ছেলেটি চেন টানে। শ্রীমতী আশালতার আঘাত মারাত্মক হয়, বর্দ্ধমান হাসপাতালে তিনি মারা যান। এই দুই ঘটনার আগেও হাওড়ার ট্রেনে এরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে, তবে কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। হাওড়া ষ্টেশনে যাত্রীদের জিনিষপত্র চুরি যাওয়া এবং ভিড়ের মধ্যে মেয়েদের গলার সোনার হার ছিনাইয়া লইয়া পলায়ন করার সংবাদ প্রায়ই পাওয়া যায়। মালগাড়ী হইতে চুরি এমন কি মালগাড়ী ভাঙিয়া জিনিষ বাহির করার সংবাদও প্রায়ই আসে। মাস দুই আগে একটি কনেষ্টবল এক দুর্বৃত্তকে ধরিতে গিয়া ছুরিকাহত হয় এবং প্ল্যাটফর্ম্মেই মারা যায়। এই ব্যাপারে রেল-পুলিসের শৈথিল্য ত আছেই, রেলের পাবলিক রিলেশন অফিসাররাও তাঁহাদের দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না। আজ-কাল হাওড়া ষ্টেশনে গার্ল গাইড রাখা হইয়াছে, ইঁহারাই বা কি করেন তাহাও বুঝা দুষ্কর। এই সমস্ত ঘটনা বড় গাড়ীতে হয় না, ছোট গাড়ীতেই হইয়া থাকে। ছোট গাড়ীর সংখ্যা খুব কম। এই কয়টি গাড়ীতে ঢুকিয়া বিশেষ ভাবে মেয়েদের সাবধান করিয়া দেওয়া ইঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। কেন দরজা খোলা উচিত নয় তাহা জানিলে হয়ত শ্রীমতী আশালতা প্রাণ হারাইতেন না। কত রকমে এই দুর্বৃত্ত দল দরজা খোলাইবার জন্য ধাক্কা দিতে পারে তাহা ঐ কয়টি কামরার মেয়েদের জানাইয়া দিলে এরূপ ঘটনা বন্ধ হইতে পারে। পাবলিক রিলেশন অফিসারদের এইরূপ কামরাগুলিতে একটু বিস্তৃত নোটিশ লটকাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। দরজা-জানালায় লোহার শিক দিয়া দরজার শাটার বন্ধ করিয়া এবং ভিতরে ছিটকিনির ব্যবস্থা করিয়া অনেকটা সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে, কিন্তু যাত্রীরা দুর্বৃত্তদের সংবাদ না জানায় ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না। সংবাদপত্রগুলিও এই ব্যাপার লইয়া আন্দোলন না করায় লোকে আসল রহস্য জানিতে পারিতেছেন না। রেলওয়ে পুলিসের শৈথিল্য অমার্জ্জনীয়। হাওড়ায় কাঙ্গালী দল নামে পরিচিত এক দুর্বৃত্ত দল এই সমস্ত চুরি ডাকাতি খুন করিতেছে ইহা ষ্টেশন-সুদ্ধ লোকে জানে, জানে না কেবল পুলিস। পুলিসের এই সমস্ত অজ্ঞতার অর্থ লোকে খুব ভাল করিয়া বোঝে। ব্যাপারটা ইন্সপেক্টর-জেনারেলের কানে গিয়াছে, কিন্তু তিনি যথেষ্ট সতর্কতা এখনও অবলম্বন করিতে পারেন নাই। আমাদের মতে অবিলম্বে হাওড়া রেল-পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং জি-আর-পি থানার সমস্ত কর্ম্মচারীকে বদলী করিয়া নূতন লোক পাঠাইয়া জোর তদন্ত করিলে দুর্বৃত্ত দল ধরা পড়িতে বিলম্ব হইবে না। একটি উপযুক্ত এস-পি এবং থানায় দুইটি ভাল অফিসার হইলেই কাজ হইবে এবং এই কয়টি ভাল লোক পুলিসে নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। আমরা শুনিতেছি রেলওয়ে বিভাগের অধিকারিবর্গ এই ব্যাপারে পুলিসকে বাধা দিতেছেন, কেননা তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বে হাত পড়িতে পারে। ইহা যদি সত্য হয় তবে তাঁহাদেরও শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

কালেকটিভ ফার্ম্ম

ভারতবর্ষে ফসলবৃদ্ধি আন্দোলনের জন্য অনেক টাকা খরচ হইতেছে, কিন্তু মূলে কতকগুলি গলদ রহিয়া যাইতেছে বলিয়া ফল হইতেছে না। ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্র ফসল বৃদ্ধির উপযোগী নহে, কালেকটিভ ফার্ম্ম গঠন করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ না করিলে ফসল বৃদ্ধি আশানুরূপ হইবে না। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ চিনয় সম্প্রতি রাশিয়া ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন; রাশিয়া কিভাবে কালেকটিভ ফার্ম্ম গঠন করিয়াছে, তাহার জন্য কি কি কাজ করিয়াছে তিনি তাহার একটি বিবরণ দিয়াছেন। ডাঃ চিনয় বলিতেছেন যে ১৯২৭ সালে কালেকটিভ ফার্ম্ম গঠনের চেষ্টা প্রথম আরম্ভ হয়। গবর্মেণ্ট সকলের আগে কারখানাগুলিকে কৃষির যন্ত্র নির্ম্মাণের আদেশ দেন। আমাদের দেশে ৯৬২ সালে ডাঃ গ্রেগরী এই কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু তদনুসারে কাজ হয় নাই। রুশ গবর্মেণ্ট ললিতকলাবিদ্ ও সাহিত্যিক-দের গ্রামে ফসল বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য পাঠাইয়া দেন। ইঁহারা গ্রামে গিয়া মুরুব্বীয়ানা না করিয়া নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়া কালেকটিভ কার্ম্মের উপযোগিতা এবং কৃষির উন্নতির বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াগুলি তাহাদের মনের মধ্যে গাঁথিয়া দেন। ডাঃ চিনয়ের মতে সর্ব্বাগ্রে কৃষকদের ফসল বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা দরকার। ঐ সঙ্গে ফসল বৃদ্ধির যে সমস্ত অন্তরায় গ্রামে রহিয়াছে তাহা দূর করিতে হইবে। কালেকটিভ ফার্ম্ম যাহারা গঠন করিয়াছে রুশ গবর্মেণ্ট তাহা-দিগকে বিনাসুদে ঋণ দিয়াছেন। সরকারী খরচে কূপ ও পুকুর কাটাইয়া দিয়াছেন। আমাদের কৃষকেরা বীজ, বলদ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সবকিছুর জন্য অর্থের অভাব অনুভব করে। সেচের ব্যবস্থা অধিকাংশ স্থলেই নাই।

ডাঃ চিনয় গবেষণার প্রয়োজনীয়তার উপর খুব ঝোঁক দিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন যে, রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক গবেষক এবং ক্ষেতের কৃষকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে

এবং ইহার ফল খুব ভাল হইতেছে। আমাদের দেশে কৃষি-গবেষণাগার আছে, কিন্তু তাহার বিবরণ অতিশয় কঠিন ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। কৃষক ত দূরের কথা, শিক্ষিত লোকদের পক্ষেও উহা দুরধিগম্য। দেশীয় ভাষায় গবেষণার ফল কৃষকদের বুঝাইয়া দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আমাদের দেশে হয় নাই। আমেরিকাতেও গবেষণাগার ও কৃষকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। আমাদের দেশে এতদুভয়ের মধ্যে গভীর পার্থক্যস্বরূপ আমলাতান্ত্রিক দন্তপূর্ণ হাফপ্যাণ্ট বিদ্যমান। রাশিয়ায় বৈজ্ঞানিকরা কৃষকদের সঙ্গে বসিয়া তাহাদের সমস্যাগুলি ধীরভাবে শুনেন এবং তার সমাধান করিয়া উহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেন। আমাদের দেশ এখনও ইহা কল্পনা করিতেই পারে না।

বাঁকুড়ায় সেচ-পরিকল্পনা

"বাঁকুড়া দর্পণ" পত্রিকার ৬ই শ্রাবণ সংখ্যায় নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্যটি প্রকাশিত হইয়াছে :

"আকাশমুখী একফসল-বিশিষ্ট আমাদের জেলার বড় বড় জলসেচের পরিকল্পনার দিকে বাংলা সরকার দেখিতেছি দৃষ্টি দিয়াছেন। আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে বিড়াই ও শুভঙ্করের দাঁড়ার কার্য্য বেশ অগ্রসর হইয়াছে। বিড়াই নদীর ২৫০ ফুট লম্বা জলোচ্চক (পাকা বাঁধ) নির্ম্মিত হইয়াছে; ফলে প্রায় ২৭ হাজার বিঘা জমি জল পাইবে। রামসাগর, দামোদরবাটি, তেলিবেড়িয়া প্রভৃতি স্থানের জলাশয়হীন জমিগুলি এবার জল পাইবে। শুভঙ্করের দাঁড়ায় যাহাতে সকল সময়ে সেচের জন্য জল পাওয়া যায় সেইজন্য কাঁটাবাঁধে ১৩ কোটি কিউবিক ফুটের একটি বড় জলাধার নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে প্রায় ১৮ হাজার বিঘা জমি জল পাইবে। শুনিলাম সেচবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় শ্রীভূপতি মজুমদার মহোদয় আগামী আগষ্ট মাসে আসিয়া উপরোক্ত জল সরবরাহের ব্যবস্থাগুলি উন্নয়ন করিবেন। আমরা জেলাবাসীর পক্ষ হইতে সেচবিভাগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।"

দীঘি-পুষ্করিণীর সংস্কার

পশ্চিমবঙ্গের সেচ-বিভাগ গ্রাম্য দীঘি-পুষ্করিণীর সংস্কার কার্য্যে অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেছেন। সেই সাহায্যের পরিমাণ গত বৎসরে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ছিল, চলতি বৎসরে তাহা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কার্য্যে হাত দিয়া সরকারকে অনেক জটিলতার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। দীঘি-পুষ্করিণী কেবল যে ভরাট হইয়াছে, তাহাই নয়। ইহাদের অনেকগুলি ধান ক্ষেতে পরিণত হইয়াছে। এই সঙ্কটের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসানসোলের 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার ৭ই শ্রাবণ সংখ্যায় একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমস্যার সমাধান না হইলে গ্রামে পানীয় জল ও কৃষির জন্য জল যোগানো সহজ হইবে না। ইহা দেশব্যাপী লোকবৃদ্ধির ফল, কৃষকের লোভের দণ্ড :

"উখরা গ্রামের চতুষ্পার্শ্বে ধান জমি ও দো-জমির মাঝখানে যে সমস্ত ছোট ও বড় সেয়াতের পুষ্করিণী উখরা ষ্টেটের খাসে ছিল সেইগুলি অধুনা উখরা ষ্টেট উপযুক্ত জমা পণে বিলি-বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকেই পুষ্করিণীগুলি বন্দোবস্ত লইয়া কেহ কেহ বুজাইয়া জমি করিলেন, কেহ-বা অর্দ্ধেকটি পুষ্করিণী রাখিয়া অর্দ্ধেকটি জমি করিতেছেন। এইরূপে জমির সেয়াত ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া যাইতেছে। এ দিকে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর চাষীদিগকে অধিক ফসল ফলাইবার জন্য উৎসাহ দিতেছেন, সেয়াতের পুষ্করিণী কাটাইয়া নানাপ্রকার বীজ সার প্রভৃতি সরবরাহ করিয়া চাষীদিগকে সাহায্য করিতেছেন। জানা গেল যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ধান্য উৎপাদন প্রতিযোগিতায় চাষীদিগকে পুরস্কার দিবেন। কিন্তু হায়! পুরুষানুক্রমে যে সকল পুষ্করিণীর সেয়াত চাষীরা পাইয়া আসিতেছে তাহা যদি এইরূপে ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া যায় তবে প্রচুর ধান্য ফলান দূরের কথা, যাহা হইতেছিল তাহাও হইবে না।"

কাশিয়াড় খাল পরিকল্পনা

পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাট হইতে প্রকাশিত "আত্রেয়ী" (মাসিক) পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় আমাদের একটি মন্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। উপরোক্ত মন্তব্যের শেষ কয়টি কথা সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে, টাকা লইবার জন্য "উৎসাহী" কর্ম্মীর অভাব নাই। কিন্তু তার সদ্ব্যবহার করার বুদ্ধি ও সহজ শক্তির অভাবই দেখা যায় সর্ব্বাধিক সমবায় সমিতিগুলির বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া :

"উল্লিখিত শিরোনামায় 'আত্রেয়ী'র চৈত্র সংখ্যায় আমরা একটি বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলাম। গত জ্যৈষ্ঠ (১৩৫৮) সংখ্যায় বাংলার বিখ্যাত মাসিক "প্রবাসী" তাহা হুবহু উদ্ধৃত করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—মন্তব্য পাঠ করিয়া মনে হয় স্থানীয় নাগরিকবৃন্দ রাষ্ট্রের দিকে তাকাইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। আমাদের নিশ্চেষ্টতার প্রতি প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত হানিয়া আমাদের দুর্ব্বলতাকে সুকৌশলে প্রকাশ করিবার প্রয়াস এই মন্তব্যে ব্যক্ত হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের মধ্যে প্রবাসীর বক্তব্য—যে জেলায় কাশিয়াড় খালের ন্যায় এরূপ একটি বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ খাল যদি রাষ্ট্রের সাহায্যলাভ না পাওয়ায় ব্যর্থ হইয়া যায় এবং অপরদিকে জেলাবাসী রাষ্ট্রের দিকে তাকাইয়া নিশ্চেষ্টভাবে যদি বসিয়া থাকেন তবে তাহা লজ্জার বিষয়।

কাশিয়াড় খালের উভয় তীরে যে সব সৌভাগ্যবানের জমি পড়িয়াছে তাঁহারা একটু সচেষ্ট হইলে মাত্র ২৮ মাইল

দীর্ঘ কাশিয়াড় খালটিকে সংস্কার ও মাঠে জল সেচনের ব্যবস্থা করা কঠিন কাজ নয়। যে কোন একজন উৎসাহী জোতদার বা কর্মী যদি এই কার্য্যে সেবার মনোবৃত্তি লইয়া অগ্রসর হন তবে তিনি অনায়াসে সংশ্লিষ্ট জমির মালিকগণকে একত্রিত করিয়া, 'সমবায় জল সেচন ও কৃষি উন্নয়ন সমিতি' গঠন করিয়া উহার মারফতে আশাতীতরূপে কাজ করিতে পারেন। জনগণের চেষ্টায় যদি এরূপ উন্নয়নমূলক সমবায় সমিতি গঠিত হয় তবে রাষ্ট্রীয় সরকারের নিকট হইতেও যথোপযুক্ত অর্থ ঋণ হিসাবে পাওয়া যাইবে। সর্ব্বার্থসাধক সমিতিগুলি মারফত সরকার যথেষ্ট অর্থ ঋণ হিসাবে দান করিতেছেন; কেবল ঋণ গ্রহণ করিবার মতো উৎসাহী যোগ্য কর্ম্মীর প্রয়োজন।"

এই প্রসঙ্গে "গ্রাম সেবা" পত্রিকার ৮ই আষাঢ় সংখ্যার সংবাদটি প্রণিধানযোগ্য:

"বজবজের উপকণ্ঠে আলিপুর খালের সংস্কার স্থানীয় গ্রামাঞ্চলের লোক দ্বারা হইয়াছে। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই খাল দিয়া ভাগীরথীর জল বহিত। পরে পলি জমা হইয়া একেবারে বুজিয়া যায়, এখন গ্রামবাসীদের দ্বারা উন্নতিকর বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এই ভাবে দেশবাসী যদি নিজেরাই সংস্কারের চিন্তা করে ও সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করে তাহা হইলে বাংলাদেশে শীঘ্রই কৃষির উন্নতি বিধান করা হয় একথা বলা যায়। ইহার জন্য গ্রামবাসীদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।"

মরুভূমির শস্য-শ্যামল মূর্ত্তি

"আমেরিকান রিপোর্টার" নামক একখানি মার্কিনী প্রচার-পত্র (দৈনিক) আছে। উহার বাংলা সংস্করণের ৯ই শ্রাবণ সংখ্যায় মার্কিন মুলুকের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের কোন মরুভূমিকে কি করিয়া শস্য-শ্যামলা ক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছিল, তার একটা বিবরণ আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েটরাষ্ট্র এরূপ কার্য্যে অগ্রণী। তাহাদের সাফল্য নানা দেশের লোককে উৎসাহিত করিতেছে। সেই উদ্দেশ্যেই আমরা এই বিবরণটি উদ্ধৃত করিলাম:

"ফসল হবার মত উর্ব্বরাশক্তি আছে প্রচুর, অথচ জলের অভাবে উষর মরুভূমির মত পড়ে আছে দীর্ঘকাল, এমনই এক বিরাট অঞ্চল হ'ল ক্যালিফোর্নিয়ার দক্ষিণাংশের মধ্য উপত্যকা। এত বড় একটা বিরাট এলাকা অনাবাদী পড়ে থাকবে, হয়ে উঠবে না শস্যশ্যামল, তা হতেই পারে না আমেরিকায়। তাই টেনেসি উপত্যকা পরিকল্পনার মত মধ্য উপত্যকা পরিকল্পনা করা হ'ল এই অঞ্চলকে বারিসিঞ্চিত করবার উদ্দেশ্যে। পয়ঃপ্রণালী, কুল্যা, জলনিরোধক বাঁধ নির্ম্মাণের কাজ সুরু হ'ল এই পরিকল্পনা অনুসারে। এটা চৌদ্দ বছর আগেকার কথা। এই পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থাও করতে হবে বলে ঠিক হ'ল।

চৌদ্দ বছরের কায়িক ও মানসিক শ্রম আজ সার্থক হয়েছে। পরিকল্পনা অনুসারে সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ১লা আগষ্ট আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ সুরু হবে সেখানে। শত-সহস্র কৃষক গোটা ক্যালিফোর্নিয়ার মধ্য উপত্যকায় আজ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠেছে।

বারো লক্ষ চল্লিশ হাজার একর জমি এখন থেকে আর জলের অভাবে ফেটে চৌচির হয়ে থাকবে না বা পিপাসার্ত্ত চাতকের মত মেঘবারির আশায় ঊর্দ্ধমুখ হয়ে চেয়ে রইবে না। পাঁচ শ' মাইল দূর থেকে জলস্রোত বেয়ে আসবে এখানে, ফলফুলের বাগান ও শস্যের ক্ষেত হবে জলসিঞ্চিত।

১লা আগষ্ট এরই উৎসব প্রতিপালিত হবে কৃষকদের ঘরে ঘরে। দশ দিন ধরে চলবে এই উৎসব। পরিকল্পনাটি সুরু করেছিল ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্য। কিন্তু যখন বুঝা গেল, এর গুরুত্ব শুধু ক্যালিফোর্নিয়ার কাছেই নয়, গোটা জাতির কাছে রয়েছে এর আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তা, তখন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারই এর ভার গ্রহণ করলেন। পরিকল্পনার জন্য ইতিমধ্যেই ব্যয় হয়ে গেছে ৪০ কোটি ডলার (২০০ কোটি টাকা)।

ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের ট্র্যাসিতে ৪ঠা আগষ্ট তারিখে যে উৎসব হবে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাতে যোগ দেবেন। ট্র্যাসিতে স্থাপিত হয়েছে এক বিরাট পাম্পিং ষ্টেশন। স্যাক্রামেন্টো নদী থেকে এই পাম্পিং ষ্টেশনের সাহায্যে জল তোলা হবে দুই শত ফুট উপরে, সেখান থেকে সেই জল খালের মারফত চালান দেওয়া হবে পাঁচ শত মাইল দূরে।

যুক্তরাষ্ট্রের জমি পুনরুদ্ধার 'ব্যুরো' বলেছেন, মানুষের ইতিহাসে মানুষেরই প্রচেষ্টায় জলসেচের এত বিরাট ব্যবস্থা আর কোনও দিনই দেখা যায় নি।"

ধান দিলে কাপড় পাবে

কাঁথির "দেশপ্রাণ" পত্রিকার ৫ই আষাঢ় সংখ্যায় উপরোক্ত শিরোনামায় নিম্নলিখিত তথ্য ও মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের এই সহযোগী কি চান তাহা বোধগম্য নয়। যে কারণেই হউক বস্ত্রাভাব দেখা দিয়াছে। তার সংশোধন সময়সাপেক্ষ। তত দিন এই ব্যবস্থা না চলিতে দিলে কাহারও উপকার হইবে না। কেবল গালাগালি দিলে অনাচার বা অবিচার নিঃশেষ হয় না। এই প্রলোভন দেখাইতে হয় কেন, তৎসম্বন্ধে একটু গবেষণা করিলে "দেশ-প্রাণ" পত্রিকায় এরূপ দায়িত্বহীন উক্তি প্রকাশিত হইত না। ধান সংগ্রহ করা হয় যাহাদের জন্য তাহাদের কথাও ভাবা উচিত:

"বর্ত্তমান কংগ্রেসী সরকার খাদ্য সংগ্রহের নূতন ফন্দী আঁটিয়াছেন। কাঁথি মহকুমার কয়েকটি স্থান হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে,

১০/০ মণ ধান্যে—	১ খানি ধুতি বা	১ খানি শাড়ী
২৫/০ "	২ "	২ "
৪৫/০ "	৩ "	৩ "
৭৫/০ "	৪ "	৪ "
১০০/০ "	৫ "	৫ "
১৩৫/০ "	৬ "	৬ "
১৭০/০ "	৭ "	৭ "
২০০/০ "	৮ "	৮ "
৩০০/০ "	১০ "	১০ "

এই হিসাবে ধুতি বা শাড়ী দেওয়া হইবে। একদিকে বস্ত্র সঙ্কটের জন্য দেশবাসী অর্দ্ধনগ্ন; অন্যদিকে সেই কাপড়ের এক অংশ খাদ্য বিনিময়ে দিবার সরকারী নীতি দেখিয়া ইহাই মনে হইতেছে যে, যখন ধ্বংসের মুখে কোন রাষ্ট্র চলে তখন তাহার সর্ব্ব বিষয়ে বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে। ইহা যে শুধু বুদ্ধিভ্রংশের সূচনা তাহা নহে, ইহাতে মানুষকে প্রলুব্ধ করিয়া পেটের খাবার কাড়িয়া লইবার অতি কুৎসিত মনোবৃত্তিই প্রকাশিত হইয়াছে। কংগ্রেস শাসন যে কিরূপ কুশাসনে পরিণত হইয়াছে ইহা তাহার একটি নগ্ন চিত্র।"

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ

"বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুলটিকে মেডিক্যাল কলেজে পরিণত করা চলিতে পারে কিনা তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন সেই কমিটির সদস্যগণ বাঁকুড়ায় আগমন করিয়া পরিদর্শন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়া সম্মিলনীর মেডিক্যাল কলেজ সম্পর্কে উদ্যোগ আয়োজন ও আর্থিক সংস্থান সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত বিষয় আলোচনা করেন। সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষ প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজের জন্য আবশ্যক গৃহাদি আরম্ভ করিয়াছেন—এনাটমি-হলটি জুন মাসের মধ্যেই সম্পন্ন হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। সম্মিলনী প্রায় দুই লক্ষাধিক টাকার যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয় করিয়াছেন। এমতাবস্থায় মেডিক্যাল কলেজ আরম্ভ করিবার অনুমতি না পাওয়া গেলে সম্মিলনীর প্রায় বার লক্ষ টাকার সম্পত্তি ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং বর্ত্তমানে যে দুই লক্ষাধিক টাকার আসবাবপত্র ক্রয় করা হইয়াছে তাহাও নষ্ট হইয়া যাইবে। আশার কথা, আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিলাম পরিদর্শন কমিটির সভ্যগণ সব দেখিয়া শুনিয়া খুশী হইয়াছেন।"

বাঁকুড়ার "প্রচার" পত্রিকার ২০শে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় উপরোক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যটি প্রকাশিত হইয়াছে। "প্রবাসী" পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় "বাঁকুড়া দর্পণ" পত্রিকার মন্তব্য প্রকাশ করা হয়। এই সমস্ত হইতে বুঝা যায় যে, বাঁকুড়া জেলার গণমত মেডিক্যাল কলেজ সম্বন্ধে 'একদিল'; ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিমণ্ডলীর অবোধ্য নীতির বিরুদ্ধে সংগঠিত। আমাদের দুই জন সহযোগী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুনয়-বিনয় করিতেছেন তাঁহাদের মেডিক্যাল কলেজটিকে রক্ষা করিবার জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক তিন জন সন্তুষ্ট হইলেই চলিবে না। মন্ত্রী-মণ্ডলীর উপর তাঁহাদের কোন প্রভাব আছে কি? প্রকৃত সাহায্য আসিবে বাঁকুড়াবাসীর আত্মশক্তির পরিচয়ে, তাঁহাদের সঙ্ঘবদ্ধতায়।

পশ্চিমবঙ্গে কুষ্ঠরোগের প্রাবল্য

পৃথিবীতে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ লক্ষ স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত। তন্মধ্যে প্রায় দশ লক্ষ ভারতবর্ষে দেখা যায়। ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ।

পশ্চিমবঙ্গের কুষ্ঠরোগের সেবাকার্য্যের জন্য ১৯২৭ সালে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাদের কর্ম্মের ফলে রোগটা কতদূর প্রশমিত হইয়াছে তাহার হিসাব সংগ্রহ করা কঠিন।

একটি হিসাবে দেখিয়াছি যে, পশ্চিমবঙ্গের দুই লক্ষ রোগীর মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছোঁয়াচে। ইহাদের চিকিৎসার জন্য মাত্র সাতানব্বইটি সাময়িক চিকিৎসালয় (clinic) বিদ্যমান; প্রায় দশ-পনর হাজার রোগী এই সব চিকিৎসালয়ে প্রতি বৎসর চিকিৎসিত হইতে আসে।

রোগীকে আশ্রয় দিবার চিকিৎসালয়ের সংখ্যা মাত্র সাতটি, তাহাদের জন্য খাট বিছানার সংখ্যা মাত্র সাত শত ষোলটি। অথচ প্রয়োজন পঞ্চাশ হাজার। এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র একটি সরকারের সাহায্যে পরিচালিত; তিনটি খ্রীষ্টান প্রচারকমণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিচালিত; তিনটি স্থানীয় জনসেবীবৃন্দ কর্ত্তৃক পরিচালিত।

এই হিসাবদৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রকর্ত্তৃক এই রোগের বিরুদ্ধে অভিযান আরও ব্যাপক হওয়া উচিত এবং রাষ্ট্রের বড় যে সমাজ তাহা আরও সজাগ হওয়া উচিত।

গ্রামোন্নয়নের উদ্যোগ

বাদুড়িয়া থানার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত রুদ্রপুর হাট খোলায় সম্প্রতি এক বৈঠকে এই থানার বিভিন্ন গ্রামকে কি ভাবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করা যায় এবং বেকার সমস্যার সমাধান করিয়া গ্রাম্য জীবনকে কি করিয়া প্রকৃত কল্যাণপ্রসূ করিয়া তোলা যায় সে সম্পর্কে কয়েকটি পরিকল্পনার পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে। শীঘ্রই জনসাধারণকে এই বিষয়ে উৎসাহ প্রদানের জন্য এবং পরিকল্পনাটিকে বাস্তব রূপ দিতে একটি বড় সভা আহ্বান করা হইবে। এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পাইলে আমরা সুখী হইব।

ভারতের উন্নয়নে আমেরিকান ফ্রেণ্ডস্ সার্ভিস কমিটি

ভারতের জনস্বাস্থ্য, কৃষি ও শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নে সাহায্য করিবার জন্য আমেরিকান ফ্রেণ্ডস্ সার্ভিস কমিটি আর একটি পরিকল্পনা লইয়া কার্য্যে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আমরা এই সেবা-কার্য্যের সাফল্য কামনা করি।

ভারত সরকারের অনুরোধে এই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়; উহার মেয়াদ তিন বৎসর। উহাতে যে অর্থ ব্যয় হইবে তাহার একটা বড় অংশ প্রদান করিবে মার্কিণ কারিগরী সহযোগিতা সংগঠন। স্বল্পোন্নত এলাকার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবেই উক্ত অর্থ প্রদত্ত হইবে।

আমেরিকার ফ্রেণ্ডস্ সার্ভিস কমিটি এবং রাষ্ট্রবিভাগের কারিগরী সহযোগিতা সংগঠনের (Technical Co-operation Administration) মধ্যে সম্প্রতি যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহার ফলে যে সকল কার্য্যে ইতিমধ্যে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে তাহা চালাইয়া যাইবার এবং ঐ সকল কাজকে আরও সম্প্রসারিত করিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে।

১৯৪৭ সাল হইতে ফ্রেণ্ডস্ সার্ভিস কমিটি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী পিফা ও রাঘবপুরে সমবায় প্রথায় উন্নয়নমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া আসিতেছে। গ্রামবাসীরা যাহাতে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা উন্নয়ন ও শিশুকল্যাণ প্রভৃতি কার্য্য পরিচালনা করিতে পারে সে বিষয়ে তাহাদের সাহায্য করাই কমিটির উদ্দেশ্য।

চতুর্থ দফা চুক্তি অনুসারে ভারতে অন্যান্য যে সকল কার্য্য চলিতেছে নূতন চুক্তি অনুসারে ফ্রেণ্ডস্ সার্ভিস কমিটির কাজও তদনুরূপ হইবে। হোরেস হোমসের পরিচালনায় ভারতীয় কারিগরদের সহযোগিতায় ভারতের তিনটি অঞ্চলে যে কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন কার্য্য চলিতেছে দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ফ্রেণ্ডস্ সার্ভিস কমিটি ১৯৪২ সাল হইতে ভারতে কার্য্য করিতেছে। কমিটি প্রথমে দুর্ভিক্ষের সময়ে শিশুদের জন্য খাদ্য, ঔষধ এবং এক লক্ষ ডলার মূল্যের দুগ্ধ প্রেরণ করে। পরে সেবাকার্য্য অপেক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার ভিত্তিতে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার উপর কমিটি বেশী জোর দেয়।

ফ্রেণ্ডস্ সার্ভিস কমিটির অধিকাংশ কর্ম্মীই স্বেচ্ছাসেবী বলিয়া কমিটির তহবিলের বেশীর ভাগই পুনঃসংস্থাপন কার্য্যে ব্যয়িত হইতে পারে। কমিটির যে সকল কর্ম্মী বিদেশে কার্য্য করিয়া থাকেন তাঁহারা মাত্র মাসোহারা পাইয়া থাকেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে কমিটি স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যাপারে ভারত, পাকিস্থান, ইস্রাইল প্রভৃতি দেশে কারিগরী সাহায্য প্রদান করে। জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে কমিটি সকলের প্রতিই সমভাবসম্পন্ন।

নিয়ার-ঈষ্ট ফাউণ্ডেশন, বেরুতের মার্কিণ বিশ্ববিদ্যালয়, লাইবেরিয়ার বুকার ওয়াশিংটন ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সহিতও অনুরূপ চুক্তি সম্পাদন করা হইয়াছে।

বারাসাত-বসিরহাট রেলওয়ে

ভারত-সরকার প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার বারাসাত-বসিরহাট রেলওয়ে কোম্পানীর পরিচালক-বোর্ডের ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া নূতন পরিচালক-বোর্ড গঠন করিয়াছেন।

নূতন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যানবাহন দপ্তরের ডাইরেক্টর জেনারেল শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ নিযুক্ত হইয়াছেন এবং মার্টিন কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার ও চীফ এ্যাকাউণ্টেণ্ট এবং চীফ ইন্সপেক্টর অব রেলওয়েজ সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

এই বোর্ডের প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু একটা ব্যবস্থায় আমরা ভরসা রাখিতে পারি নাই। সরকারী যানবাহন বিভাগের দুই বৎসরের কর্ম্মপন্থায় কোন উন্নতি আমরা দেখি নাই। সামান্য বিষয়—বাসের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ। ট্রাম কোম্পানী ও সরকারী বাস তাহা করিতে পারিতেছে না। অথচ বেসরকারী বাস পরিচালকেরা তাহা করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহা এই দুই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কলঙ্ক। এইরূপ একটা ছাপ বহন করিয়া নূতন কাজের উপর আমরা ভরসা করিতে পারি না।

ভাগচাষ-বোর্ডে ভাগচাষীগণের দুর্দ্দশা

ভাগচাষীগণের উপকারের জন্য যে ভাগচাষ-বোর্ডের সৃষ্টি হইয়াছে সেগুলির মধ্যে ভাগচাষীগণ নিম্ন প্রকারের অসুবিধা ভোগ করিতেছেন :

(১) এক জোতদারের অধীনে অনেক ভাগচাষীর একই অভিযোগ হইলেও পৃথক পৃথক দরখাস্ত করিবার নিয়ম থাকায় অনেক অর্থ অপব্যয় হইতেছে।

(২) দূরবর্ত্তী অঞ্চল হইতে ভাগচাষীগণকে শহরে অবস্থিত ভাগচাষ-বোর্ডে কেস চালাইবার জন্য যাতায়াত, খাওয়া খরচ ও সাক্ষী আনয়নের জন্য অনেক টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে।

(৩) ভাগচাষ-বোর্ডের কোরাম না হওয়ায় কেসগুলির দিন পড়িয়া যাইতেছে এবং ঐ জন্য গরীব ভাগচাষীগণকে যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে।

(৪) ভাগচাষ-বোর্ডের পৃথক আপিস ও কর্ম্মচারী না থাকায় রায় পাইতে বিলম্ব ঘটিতেছে ও হয়রানি ভোগ করিতে হইতেছে।

(৫) চাষের পূর্ব্বে সমুহ আপত্তির বিচার করা সম্ভব হইতেছে না বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে বিরোধ বাড়িয়া যাইতেছে।

(৬) ভাগচাষী ও জোতদার প্রতিনিধি জনসাধারণের নির্ব্বাচিত না হইয়া কংগ্রেস-মনোনীত হওয়ায় অনেকক্ষেত্রে

দলীয় নীতি দ্বারা বিচারকে প্রভাবিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। এই সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

খাদ্যোৎপাদন পাঁচ দফা দশশালা পরিকল্পনা

গত ১৩ই শ্রাবণ তারিখে কোয়েম্বাটুর নগরীতে ভারত-রাষ্ট্রের খাদ্যমন্ত্রী "ভারতীয় কৃষি-গবেষণা সম্প্রসারণ পরিষৎ" ও "গবেষণা বোর্ডের" এক যুক্ত অধিবেশনে একটি দশশালা পরিকল্পনা পেশ করেন। এই বিষয়ে যে সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছে তাহা এইরূপ :

(১) ৪৮০ লক্ষ একর সেচ-ব্যবস্থাযুক্ত জমিতে অধিকতর প্রচেষ্টার চাষ; (২) নূতনভাবে চাষের জন্য ১০০ লক্ষ একর পতিত জমি উদ্ধার; (৩) ১০০০০০ গ্রামে ভূমিসেনা সংগঠন; (৪) প্রতি বৎসর ৬০০০০ প্রজনন-ষাঁড় ব্যবস্থা; (৫) বাৎসরিক বনমহোৎসব সাহায্যে আরও ৩০ কোটি বৃক্ষ উৎপাদন।

কল্পনাধীনে কাজ করিতে চান, রেজেষ্ট্রীকৃত বীজোৎপাদন প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্য্য করিতে পারিবেন এবং ভারতীয় কৃষি প্রতিষ্ঠানের পরিষদ ইহাদের কার্য্য তদারক করিবেন।

গো-সম্বর্দ্ধন সম্পর্কে যে দশ বৎসরের পরিকল্পনা আপনাদের সম্মুখে পেশ করিয়াছি, তাহার দুই দিক আছে :—(১) গো-মড়ক নিবারণ; (২) প্রতি বৎসর ৫০০০ প্রজনন-ষাঁড় উৎপাদন। এই পরিকল্পনার প্রথমাংশ সম্পাদনের জন্য ইজ্জৎনগরের পশু চিকিৎসা গবেষণাগারের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা হইতেছে।

শ্রীমুন্সী বলেন, রাজস্থানের মরুভূমির প্রসার বৃদ্ধি নিবারণের উদ্দেশ্যে একটি বৃক্ষোৎপাদন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে। শীঘ্রই এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হইবে।

পরিকল্পনা কমিশন এই কার্য্যসূচীর অধিকাংশ তাঁহাদের পঞ্চবার্ষিকী তালিকার মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন।

কৃষি সম্প্রসারণের দেশব্যাপী প্রচেষ্টা আরম্ভ করিবার জন্য গবেষণা কর্ম্মচারী ও অন্যান্যদের নিকট অনুরোধ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রথমতঃ উন্নতশ্রেণীর বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও ইহার বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ কর্তৃক একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতেছে। যে সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এই পরি-কল্পনার সঙ্গে সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক তাহাদেরও একটা বিশেষ স্থান ইহাতে থাকিবে।

খাদ্য সম্বন্ধে এইরূপ পরিকল্পনা এই প্রথম নয় বা শেষও নয়। কিন্তু খাদ্য-শস্যের অভাব যেন দেশের বুকে অনড় হইয়া যাইতেছে এবং সেই অভাবের পাথর সরাইবার জন্য যে দুর্জ্জয় সঙ্কল্প ও প্রবৃত্তির প্রয়োজন তাহার আবির্ভাবের জন্য আর কত কাল আমাদের বসিয়া থাকিতে হইবে?

পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী ও অচ্ছ্যুৎ-শ্রেণী

ভারতরাষ্ট্রের পক্ষে "আদিবাসী" ও "অচ্ছ্যুৎ"-শ্রেণীর উন্নতি একটা দায় হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় আড়াই কোটি নরনারী এই সমস্যার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে জড়িত। ইতিহাস বলে যে এই সব অধিবাসীর পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যসভ্যতার দাপটে বন-জঙ্গলে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। অথচ তাঁহারা অনেকে ছিল আর্য্যপূর্ব্ব যুগে দেশের রাজা, ভূস্বামী এবং মেরুদণ্ড। জানি না কোন্ বিশ্ববিধানের নির্দ্দেশে তাহাদের সন্তানসন্ততিগণ আজ মূক ও ম্লান; কিন্তু তাহাদের জীবন, এবং তাহাদের দুর্দশার কথা জগৎও বেশী জানে না বা জানিতে চেষ্টা করে না।

এক শত বৎসর পূর্ব্বেও ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় তাহাদের স্থান উচ্চ ছিল না; তাহাদের উন্নতির সুযোগ প্রচুর ছিল না। ইংরেজ শাসক তাহাদের উন্নতির কথা মুখে বলিয়াছিল অনেক, কাগজপত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছিল বিস্তর তথ্য। কিন্তু আদিবাসী অঞ্চল হইতে সে কেবলমাত্র তাহার শিল্প-বাণিজ্যের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ করা ছাড়া ঐ অঞ্চলের উন্নতির জন্য আর কোন কার্য্য করে নাই। খ্রীষ্টান মিশনরীরা তাঁহাদের জন্য স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি খুলিয়াছেন; তাহাও প্রধানতঃ নিজেদের ধর্ম্মাবলম্বীদের সংখ্যা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে।

তবুও ইংরেজের সংগৃহীত তথ্যাদি আমাদের উপকারে আসিয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া আমরা আদিবাসী শ্রেণীর ইতিহাসে অতীতের ও বর্ত্তমানের দুরবস্থার কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছি। ভারতবর্ষে সর্ব্ববিধ সংস্কার-চেষ্টার অন্তরে যে প্রেরণা ছিল এই সব অঞ্চলেও তাহার স্পর্শ নব জাগৃতি আনয়ন করিয়াছিল, তাহার কল্যাণে গান্ধীজী আদি-বাসী সমস্যাকে সর্ব্বভারতীয় সমস্যার সঙ্গে গ্রথিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

এই সব কথাই বাংলা "হরিজন" সম্পাদক শ্রীযুক্ত রতনমণি চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়া আদিবাসী ও অচ্ছ্যুৎ সম্মেলনে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন গত জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৮ তারিখে। তাহার মধ্যে নূতনত্ব না থাকিতে পারে; কিন্তু এই সব কথা দিনের পর দিন আমাদের কানে না বাজিলে আমাদের হৃদয় উন্মুখ হইবে না, আমাদের বুদ্ধি স্বচ্ছ হইবে না। নূতন ভাব ও সংস্কার মানব চরিত্রে প্রবর্ত্তন করিতে হইলে, এরূপ পুনরুক্তির প্রয়োজন আছে। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ সেই অতি অল্পসংখ্যক কথা বার বার শুনাইয়া গিয়াছেন।

রতনমণিবাবু এই উপলক্ষে আদিবাসী ও অচ্ছ্যুৎ-শ্রেণীর মধ্যেও যে অচ্ছ্যুৎ-মার্গ বর্ত্তমান তাহার উল্লেখ করেন। এখন উচ্চ শ্রেণীর মনের মধ্যে বিরোধিতার ভাব নাই বলিলেই হয়। এই কু-প্রথা আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে যেসব শ্রেণী তাহার ফলে তাহারা অপমানিতের জীবন যাপন করে। বর্ত্তমানে এই সব

শ্রেণীর মধ্য হইতেই তাহাদের উন্নতির ধারকবৃন্দকে বহির্গত হইতে হইবে। তবেই তাহারা আত্মবিশ্বাসলাভ করিবে। দুনিয়ার চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিশ্বমানবের অনুরূপে নিজেদের জীবন সার্থক ও সমৃদ্ধ করিতে পারিবে। ইহাই এই যুগের বিধান।

এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিবরণটি আমাদের মন্তব্যের পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। বীরভূম জেলার ক্ষৌরকার পাখু ভাণ্ডারী বনমালী দাসের মাথার চুল ছাঁটিতে এই বলিয়া অস্বীকার করে যে, সে (বনমালী) নিম্নজাতীয় লোক। বনমালী সিউড়ির মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে পাখুর বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া জানায় যে, পাখু ১৯৪৮ সালের পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক অসুবিধা দুরীকরণ আইন ভঙ্গ করার অপরাধে অপরাধী হইয়াছে। পাখুর পক্ষ হইতে বলা হয় যে, স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রে নাগরিকগণকে বৃত্তি সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং কোন ব্যক্তির ক্ষৌরকার্য্য করা বা না করা তাহার ইচ্ছাধীন। পাখুর পক্ষে ইহাও বলা হয় যে, পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক অসুবিধা দুরীকরণ আইনটি ভারতীয় শাসনতন্ত্রের বৃত্তি স্বাধীনতা বিধানের বিরোধী; সুতরাং উহা অগ্রাহ্য। এই আইনের প্রশ্নটি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং জেলা জজের আদালত হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে শেষ সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরিত হয়। হাইকোর্ট সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক অসুবিধা দুরীকরণ আইনটি ভারতের শাসনতন্ত্র বিরোধী নহে, কারণ উহা দ্বারা আলোচ্য মোকদ্দমায় ক্ষৌরকারের বৃত্তির ক্ষেত্র সঙ্কুচিত না করিয়া বরং প্রসারিত করা হইয়াছে, অর্থাৎ হিন্দু ক্ষৌরকার যাহাতে সকল হিন্দুর ক্ষৌরকার্য্য করিতে পারে, সেই ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। হাইকোর্ট আরও নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, বনমালী দাসকে ক্ষৌর না করিয়া পাখু পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক অসুবিধা দুরীকরণ আইন ভঙ্গ করিয়াছে। এখন জেলা-মেজিষ্ট্রেটের আদালতে এই অপরাধে পাখুর বিচার হইবে।

হিন্দু সমাজের অন্তর্গত বর্ণভেদ ও সামাজিক অসাম্যের দিক হইতে এই মামলাটি নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য এবং শাসনতন্ত্রের অন্তর্গত বৃত্তি সংক্রান্ত অধিকারের দিক হইতেও স্মরণযোগ্য। এই পাপ দূর না হইলে হিন্দু সমাজ বর্ত্তমান যুগে অপাংক্তেয় হইবার যোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গে অস্পৃশ্যতা নিবারণ

পশ্চিমবঙ্গে অস্পৃশ্যতার অত্যাচার মাদ্রাজ প্রদেশের তায় এতটা উৎকট নয় এরূপ একটা সন্তুষ্টির ভাব বাঙালীর মনে বিরাজমান। কিন্তু যাঁহারা ভিতরের কথা জানেন, তাঁহারা এই ভাবের সমর্থন করিতে পারেন না। হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা ত জগতের শ্লেষের বিষয় হইয়াছে। কিন্তু মুসলিম সমাজে "মাইমল" প্রভৃতি শ্রেণী যে অপাংক্তেয় তাহা তত সুবিদিত নয়। হিন্দু সমাজের নেতৃবর্গ রামমোহন রায় হইতে মোহনচাঁদ গান্ধী পর্য্যন্ত সকল সমাজ-সংস্কারক এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে নিজেদের জীবনে নিজেদের সমাজের বিচার আহ্বান করিয়া তার বিরুদ্ধে সামাজিক মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ ত আমাদের অপমানিত জীবনের কথা কহিতে গিয়া বিধাতার রুদ্র রোষের কথা বলিয়াছেন। "বিধাতার রুদ্র-রোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে—ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান—অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।" আবার—"যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,—পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।…সেই নিম্নে নেমে এসো, নহিলে নাইরে পরিত্রাণ।"

কবির এই জ্বালা সংস্কারকের ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া নির্দ্দেশ দিয়াছে—সকলেই আমরা হরিজন, সকলেই আমরা মেথর—এই বোধ না জাগিলে ব্যষ্টির ও সমষ্টির "পরিত্রাণ" নাই। এইভাবে জনমত গঠিত হইয়াছিল বলিয়াই ভারতরাষ্ট্রে আইন করিয়া অস্পৃশ্যতা দণ্ডনীয় হইয়াছে এবং ভারত-রাষ্ট্রের অঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ এই বিষয়ে পশ্চাৎপদ নয়। ১৯৪৮ সালে "পশ্চিমবঙ্গ হিন্দু-সামাজিক-অযোগ্যতা-অপসারণ বিল" আইন সভায় আলোচিত ও গৃহীত হয়। কলিকাতা গেজেটের ১১ই নবেম্বর সংখ্যায় রাজ্যপালের সম্মতিলাভের বার্ত্তা ঘোষিত হয়। তদবধি এই আইন নানাভাবে, নানাক্ষেত্রে অনুসৃত হইতেছে। এই সম্পর্কে একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে; তাহার কর্ম্মকর্ত্তা আছেন। তাঁহার সৌজন্যে আমরা প্রচার বিভাগের একখানি পুস্তিকা পাইয়াছি। তাহার মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতি যে অস্পৃশ্যতার বিরোধী তৎসম্পর্কে বর্ত্তমান যুগের কবি, সংস্কারক ও প্রবর্ত্তকবর্গের বাণী উদ্ধৃত আছে।

প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন

গত ৫ই শ্রাবণ তারিখে কলিকাতা ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসন গৃহে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক বিভালয়সমূহের শিক্ষকবর্গের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন প্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এবং অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন চব্বিশ পরগণা জেলা বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

দুই জনের বক্তৃতায়ই বর্ত্তমান শিক্ষার নানাবিধ সমস্যার আলোচনা হইয়াছে। ব্রিটিশ আমলের প্রারম্ভে যে ১ লক্ষ গ্রাম্য পাঠশালা ও মক্তব ছিল, সেই চিত্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গত ১ শত বৎসরের শৈথিল্যে ক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সব কথার মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই। আমাদের অভাব হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াও তাহা মিটাইবার উপায় সম্বন্ধে আমরা একমত হইতে পারিতেছি না।

গান্ধীজী প্রবর্ত্তিত বনিয়াদি শিক্ষা লইয়া যে তর্কের বান ডাকিয়াছে তাহা প্রশমিত না হইলে আমাদের মঙ্গল নাই। সমাজ-ব্যবস্থার মূল আদর্শ স্থির না হইলে উপায় সম্বন্ধে তর্ক ত অনিবার্য্য। এই সম্মেলনের পূর্ণ বিবরণ পাঠ করিলে তাহা আমাদের গ্রামের শিক্ষাব্রতীরা কি চান তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

এই সম্পর্কে একটা বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। কেন আমাদের দেশীয় শিক্ষার ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িল তাহা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। বিদেশী শাসকবর্গ তাহাদের নিজের প্রয়োজনে তাহা ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল, নতুবা সেই শিক্ষার ব্যবস্থা যুগোপযোগী ছিল না বলিয়াই শুকাইয়া গেল, তৎসম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই। যে গ্রামীণ সভ্যতার বাহক ও ধারকরূপে প্রাচীন শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, বিদেশী শাসনের আগমনের পূর্ব্বেই কি তাহা দুর্ব্বল ও অকেজো হইয়া পড়ে নাই?

আমরা কথায় কথায় বলিয়া থাকি যে, আমাদের প্রাচীন সভ্যতা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতির সেবা করিয়াছিল; সেইজন্যই আমাদের পণ্ডিত ও মৌলবী "কৌপীনবন্ত" হওয়ার আদর্শ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। এই গর্ব্বের মধ্যে বর্ত্তমান শিক্ষকবর্গের নানাবিধ অভাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার যে অভ্যাসের সৃষ্টি হইয়াছে তৎপ্রতি একটা শ্লেষ আছে। আমরা বলিতে চাই—প্রাচীন ব্যবস্থা জাতির শিক্ষককে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছিল; আজ যদি আমাদের সমাজ বা রাষ্ট্র অন্ত ব্যবস্থায় তাহা করিতে পারে, তবে এই অভিযোগ শুনিতে হয় না। রাষ্ট্রের পরিচালকবর্গেরও ধৈর্য্য নষ্টের কারণ উপস্থিত হয় না।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন বিশেষ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় ৫৫০ জন শিক্ষক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে দুইটি বেশী উল্লেখযোগ্য। (১) মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের অনুরূপ একটি প্রাথমিক শিক্ষাবোর্ড স্থাপন; শিক্ষক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি প্রাথমিক শিক্ষাবোর্ড সমগ্র প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে সুসংগঠিত করার কার্য্যে সহায়তা করিতে পারে। (২) প্রাথমিক শিক্ষকগণের বেতনের যে হার দাবি করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধীয়। শহরে ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের ৭০৲—১১০৲ এবং সাধারণ শিক্ষকের ৬০৲—১০০৲ মাসিক বেতন অনেক সওদাগরী আপিসের পিয়ন ও বেয়ারাদিগের বেতন অপেক্ষা বেশী নহে। গ্রাম্য অঞ্চলের শিক্ষকদের জন্য বেতনের হার কম করিয়া ধরা হইয়াছে। বেতন ও অন্যান্য বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবি দেশের জনসাধারণের সমর্থন পাইবার যোগ্য। সম্মেলন নজর প্রস্তুত করিয়াছেন যে, "১৯৫২ সালের জানুয়ারীর পূর্ব্বে যদি কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের দাবিগুলি মানিয়া না লন, তবে তাঁহারা একটা দিন স্থির করিয়া অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য ধর্ম্মঘট চালাইবেন।" ধর্ম্মঘটের প্রস্তাব ছাড়া আমরা অন্য দুইটি প্রস্তাব সমর্থন করি। নিষ্ঠাবান অভিজ্ঞ গ্রাম্য শিক্ষকের উপর জাতির শিক্ষা নির্ভর করে। তাঁহাদের সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে। ইহা রাষ্ট্রের অবশ্য কর্ত্তব্য।

কলিকাতার জাহাজঘাটার শ্রমিকমণ্ডলীর পুণ্য কাজ

কলিকাতার জাহাজঘাটার শ্রমিকমণ্ডলীর অসহযোগ ও নানাবিধ সমাজ-বিরোধী কাজের কথাই সচরাচর আমরা শুনিয়া থাকি। গত মাসে মার্কিণ মুলুক হইতে খাদ্যশস্যের আগমন উপলক্ষে এইরূপ ঘটনার বিবরণ কলিকাতার তথাকথিত "বামপন্থী" সংবাদপত্রে ফলাও করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল। কিন্তু এই সংবাদটি চাপিয়া যাওয়া হইয়াছিল যে গত মে মাসের দারুণ রৌদ্রতপ্ত সময়ে—মে মাসের ১লা হইতে ২০শে পর্য্যন্ত বিশেষতঃ কলিকাতার জাহাজঘাটার শ্রমিকবৃন্দ ১ লক্ষ টন (প্রায় ২৭ লক্ষ মণ) খাদ্যশস্য বিদেশী জাহাজ হইতে নামায়। আশঙ্কা হয় যে শ্রমিকদের বর্ত্তমান অসহযোগী মনোভাবের সময় তাহারা হয়ত এই খাদ্যশস্য নামাইতে অস্বীকার করিবে। তাহা হইলে বিহার রাজ্যে অন্নাভাব আরও ভয়াল রূপ গ্রহণ করিত। কিন্তু শ্রমিকবৃন্দের কর্ত্তব্যজ্ঞানের ফলে তাহা হয় নাই। ঐ ১ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের প্রায় ৯০ হাজার টন বিহারে পাঠানো হয়। এই তথ্যটির আরও বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

কোরিয়ার পুনর্গঠন ও রাষ্ট্রপুঞ্জ

কেশিয়ং শহরে রাষ্ট্রপুঞ্জবাহিনীর মুখপাত্রগণ ও উত্তর কোরিয়ার কম্যুনিষ্ট সরকারের প্রতিনিধিবর্গ আলাপ-আলোচনা চালাইতেছে, কোরিয়া যুদ্ধের একটা সমাধানের জন্য। বর্ত্তমানে অনিশ্চিত "যুদ্ধ-বিরতি" চুক্তি একটা আছে। তাহা স্থায়ী শান্তিতে পর্য্যবসিত হয় এই কামনা সকলেই করিতেছেন।

ঠিক এই সময়েই নিম্নলিখিত সংবাদটি সময়োপযোগী হইয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে একটা অবান্তর ব্যাপার মনুষ্য সমাজে, যদিও তাহা ইতিহাসের বেশীর ভাগ পৃষ্ঠা অধিকার করিয়া আছে। কোরিয়ার পুনর্গঠনে যে অর্থ ব্যয় করা হইবে তাহা সার্থক হউক।

১লা জুলাই হইতে যে বৎসর আরম্ভ হইবে সেই বৎসর রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী কর্তৃপক্ষ কোরিয়া সাধারণতন্ত্রের জনসাধারণকে

সাহায্য দানের জন্য ১১২,৩০০,০০০ ডলার ব্যয় করিবেন বলিয়া আশা করেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সামরিক কর্তৃপক্ষ কোরিয়ার অসামরিক অধিবাসীদের সাহায্য প্রদান করিতেছেন। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এইভাবেই চলিতে থাকিবে। উহার পর কম্যুনিষ্ট-অধ্যুষিত দেশের পুনর্গঠনের ভার গ্রহণ করিবে রাষ্ট্রপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠিত কোরিয়া পুনর্গঠন প্রতিষ্ঠান (Korean Reconstruction Agency)।

কিছুদিন পূর্ব্বে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান বৈদেশিক সাহায্যের জন্য প্রায় ৩২০ কোটি টাকা (৮৫০ কোটি ডলার) প্রদান করিতে মার্কিণ কংগ্রেসকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। উহার মধ্যে কোরিয়া পুনর্গঠন প্রতিষ্ঠানকে ১১২,৫০০,০০০ ডলার প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। এইভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক উক্ত প্রতিষ্ঠানকে দেয় মোট অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১৬২,৫০০,০০০ ডলার। কোরিয়ার দীর্ঘমেয়াদী সাহায্য পরিকল্পনার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ ২৫,০০০ কোটি ডলার তুলিবার চেষ্টা করিতেছে।

এই বৎসর ১লা মে পর্য্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়ার জনসাধারণের সাহায্যের জন্য মোট প্রায় সাড়ে আট কোটি ডলার প্রদান করিয়াছে।

উহা ছাড়া আরও বহু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কোরিয়ার সাহায্যের জন্য প্রায় ৩০ লক্ষ ডলার প্রদান করিয়াছে। বহু দেশ নানাপ্রকার দ্রব্যাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছে। থাইল্যাণ্ড এক কোটি টাকারও অধিক চাউল দিয়াছে আর ভারতবর্ষ দিয়াছে দশ লক্ষ ডলারেরও অধিক ঔষধ।

লেনিন-ষ্টালিন প্রসঙ্গ

"লৌহ যবনিকার" অন্তরালের কথা কিছু কিছু বাহির হইয়া পড়িতেছে কম্যুনিষ্ট রাজনীতিক বা লেখকের ঝগড়াঝাটির অবসরে। বাংলাদেশের দুই জন কম্যুনিষ্ট চিন্তানায়ক এই বিষয়ে আমাদের অনেক নূতন কথা শুনাইতেছেন। শ্রীমানবেন্দ্র রায় একজন; অন্য জন রবীন্দ্রনাথের পরিবারের শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানবেন্দ্র রায় "যুগান্তর" পত্রিকার প্রতি রবিবাসরীয় সংখ্যায় তাঁহার কম্যুনিষ্ট জীবনের আরম্ভের কথা পল্লবিত করিয়া বলিতেছেন। সৌম্যেন্দ্র ঠাকুর "যাত্রী" শিরোনামাযুক্ত আত্মচরিতে প্রায় সেই সময়েরই লেনিন-ষ্টালিন প্রসঙ্গের কথা বলিতেছেন "চতুরঙ্গ" নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায়।

সৌম্যেন ঠাকুর মস্কোতে কয়েকজন ভারতীয় কম্যুনিষ্টকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার অনুমতি লাভ করেন। বীরেন চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং ভারতীয় বিপ্লবজগতে সমধিক প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন। ভারতীয় বিপ্লবের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার যোগস্থাপন করিবার উদ্দেশ্য লইয়া বীরেন চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের মতামত জানাইয়া লেনিনকে একখানি পত্র লেখেন। উত্তরে এই খসড়ার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া লেনিন একখানি পত্র লেখেন; তাহাতে একটা "নির্দ্দিষ্ট দিনে" দেখা করিবার অনুরোধ বা অনুজ্ঞা ছিল। সেই চিঠি বার্লিনে থাকিতে বীরেন চট্টোপাধ্যায় সৌম্যেন ঠাকুরকে দেখান।

কিন্তু ভুপেন দত্ত, লোহানী, অ্যাগনেস স্মেড্‌লী এই দলে ছিলেন। লোহানী বাঙালী মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের ছেলে; পাবনা সিরাজগঞ্জ ছিল তাঁহার দেশ। ব্যারিষ্টার হইবার জন্ত বিলাতে যান। তাহা হইল না। "তরোয়ালের মতন ধারালো" বুদ্ধি; ফরাসী, জার্মান ও রুশীয় ভাষায় তাঁহার অধিকার—সব "গুণ" তাঁহার ব্যর্থ হইয়া গেল একটি "মহৎ দোষে"। চরিত্রে যে "নির্লোভ অনমনীয়তা" থাকিলে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে সার্থকতা লাভ করা যায়, তাহা ছিল না "কমরেড" লোহানীর। ফলে সে হইয়া পড়িল রুশীয় দলাদলির হাতের পুতুল।

বীরেন চট্টোপাধ্যায় মস্কো গেলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে লেনিনের সঙ্গে দেখা করিবার জন্ত "থিসিস" লিখিলেন। কিন্তু দেখা করা আর হইল না—মানবেন্দ্র রায়ের মুরুব্বি বরোদিনের কৌশলে। ভারতীয় বিপ্লবীবৃন্দের প্রতিনিধিরূপে একজনকে খাড়া করার প্রয়োজন ছিল রুশীয় নেতৃবর্গের। তার এক বৎসর পূর্ব্বে কম্যুনিষ্ট ইণ্টার-ন্যাশনাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরাধীন ভারতের একজন প্রতিনিধিও নেই তাতে "এটা কেমন সোয়াস্তি দিচ্ছিল না বলশেভিক নেতাদের।" সেইজন্ত বরোদিন মানবেন্দ্র রায়কে লইয়া আসিলেন মেক্সিকো হইতে রাশিয়ায় এবং তাঁহার নাম ব্যবহার করিয়া, বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের "থিসিস" বাতিল করাইয়া মানবেন্দ্র রায়ের থিসিস গ্রাহ্য করাইয়া লইলেন; নিজের রাজনীতিক প্রতিষ্ঠার আর এক ধাপ উপরে উঠিলেন।

এই জাতি বিরোধের সব কথা বুঝা সহজ নয়। সৌম্যেন ঠাকুরের ভাষায় বলিতে হয়—"বৈপ্লবিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক গতিতে কূটনীতির কারসাজি ও চক্রান্তের নমুনা এই প্রথম নয়।" এই কথাটা ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের মনে রাখা ভাল; প্রয়োজন হইলে তাঁহারা সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে হাত মিলাইতে পারেন; তার উদাহরণ আমাদের বর্ত্তমান ইতিহাসে অনেক আছে এবং মানবেন্দ্র রায়ের মত বিপ্লবী চিন্তানায়ক এইরূপ চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত। এই কূটনৈতিক ছলাকলার কথা "চতুরঙ্গ" পত্রিকার কার্ত্তিক-পৌষ (১৩৫৭) সংখ্যায় ১৬৭, ১৭০,১৭১ ও ১৭৬ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়। সৌম্যেন ঠাকুর লোহানীর পরিচয় দিবার সঙ্গে সঙ্গে "টিভেল" নামক একজন "কমরেডের" নাম করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, "লোহানীর রুশীয় সংস্করণ হচ্ছেন টিভেল"—লোভী, "অভ্রভেদী সুবিধাবাদের অবতার"। সেই টিভেল ছিলেন কম্যুনিষ্ট

ইন্‌টার-ন্যাশন্যাল প্রতিষ্ঠানের "কর্তা" জিনভিয়েভের সেক্রেটারী।

"...লেনিনের মৃত্যুর পরে পাছে ট্রট্‌স্কি বলশেভিক দলের আর সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্ণধার হন এই ভয়ে সুচতুর ষ্টালিন জিনভিয়েভ আর কামেনেভকে নিয়ে দল পাকান ট্রট্‌স্কির বিরুদ্ধে। একলা ষ্টালিনের সাধ্য ছিল না ট্রট্‌স্কিকে সরিয়ে দেবার। লেনিনের অন্তরঙ্গ সহকর্ম্মী হিসেবে জিনভিয়েভ আর কামেনেভের যে খ্যাতি ছিল, ষ্টালিনের সে খ্যাতি থাকার কোনই কারণ ছিল না, কেননা ষ্টালিন কোনো দিনও লেনিনের অন্তরঙ্গ সহকর্ম্মী ছিলেন না।" তার পর ট্রট্‌স্কি-রূপ পথের কাঁটা সরাইয়া ষ্টালিন লাগিয়া গেলেন জিনভিয়েভ ও কামেনেভকে সরাইবার কাজে। এই কাজে টিভেল হইলেন ষ্টালিনের হাতের পুতুল, আর মানবেন্দ্র রায় হইলেন টিভেলের হাতের পুতুল যার ফলে তিনি স্থান পাইলেন কম্যুনিষ্ট ইন্‌টার-ন্যাশন্যালে। কিন্তু টিভেলের সুখ বহু দিন স্থায়ী হয় নাই। "সহকর্ম্মী-হন্তারক হিসেবে পৃথিবীর ইতিহাসে যার জুড়ি নাই সেই চরম বিশ্বাসঘাতক ক্ষুদে বিশ্বাসঘাতককে বকশিশ দিল হাতে হাতে। তার সেক্রেটারী-গোষ্ঠীর মধ্যে টিভেলকে ভর্ত্তি করে দিল ষ্টালিন। ইতিহাস কিন্তু কখনো ভোলে না তাকে যার কাছে সে ঋণী। দু' চার বছর বাদেই টিভেলের কাছে তার ঋণ শোধ করল ইতিহাস। ষ্টালিনের আদেশেই মরল টিভেল ঘাতকের গুলিতে।" মানবেন্দ্র রায়ের ভাগ্য ভাল। তিনি দু' চার বৎসর কম্যুনিষ্ট ইন্‌টার-ন্যাশন্যালে সহকারীর কর্ত্তৃত্ব করিয়া ষ্টালিন-নীতির বিরোধী হইয়া উঠিলেন। থিসিসের পর থিসিস লিখিলেন, যাহা তাঁহার রাশিয়ার রাষ্ট্র-বিপ্লবের ইতিহাসের অঙ্গ হইয়া আছে। কিন্তু তাঁহাকেও শেষে রাশিয়া ত্যাগ করিতে হইল।

টিভেলের পর সেক্রেটারী হইলেন বৃদ্ধ পিয়াৎনিস্‌কি। তিনি ভারতীয় কম্যুনিষ্ট দলের সংখ্যা জানিতে চাহিলেন সৌম্যেন ঠাকুরের নিকট। "টেবিলের উপর ভারতীয় কমিউ-নিষ্ট পার্টির যে পুস্তিকাটি পড়েছিল সেটার দিকে দেখিয়ে বললুম তাঁকে যে ভারতবর্ষে যে কয় জন কম্যুনিষ্ট আছে তাদের...ঐ পুস্তিকাতেই আছে, তিনি নিশ্চয়ই তা দেখে থাকবেন। পিয়াৎনিস্‌কি একেবারে নির্বাক হয়ে গেলেন। ...তারপরে বললেন—ভারতবর্ষে মাত্র আট-দশটি কম্যুনিষ্ট? বললুম—অবস্থাটা প্রায় তাহাই।...অনেক হাতড়ে কম্যু-নিজমের যে খুদকুঁড়োটুকু সংগ্রহ করেছি, তা নিজেদের পক্ষেই যথেষ্ট নয়, অন্যদের মধ্যে বণ্টন করব কোন্ সাহসে? পিয়াৎনিস্‌কি বললেন—রায় তো আমাকে বলেছিলেন যে কয়েক হাজার কম্যুনিষ্ট তৈরী হয়েছে ভারতবর্ষে? বললুম —মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর সেই কয়েক হাজার কম্যুনিষ্টদের কোথায় কোন পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে রেখেছেন তিনিই বলতে পারেন, আমরা তাদের কোন খবর জানি না।" এই বিবরণ পাঠ করিলে একটা কথা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও সৌম্যেন ঠাকুর সত্য কথা বলিয়া মস্কোর যুদ্ধে মানবেন্দ্র রায়ের নিকট হারিয়া গেলেন। কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের সংখ্যা ফাঁপাইয়া দেখাইলেন বলিয়া মানবেন্দ্র রায়ের হাতে জয়মাল্য তুলিয়া দিলেন।

আর একটা উদ্ধৃতি দিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ আপাততঃ শেষ করিব। "...একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে আসছে যারা অনেক দিন ধরে তাদের সেই অধিকারে হাত পড়লে কেপে ওঠা ত স্বাভাবিকই।...এই একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখবার খেলা যে শুধু জমিদার আর কলওয়ালা করে তাহা নয়; রাজনীতির ক্ষেত্রে কালো, ফিকে লাল, লাল সব রঙের রাজনৈতিক পেশাদারেরা একচেটিয়া অধিকারের জন্য যে কি জঘন্য লোলুপতার সঙ্গে পরস্পরে লড়তে পারে তার প্রমাণ তো অতীতের রাজনৈতিক ইতিহাস বারে বারে দিয়েছে। আর এ বিষয়ে সর্ব্বকালের রাজনৈতিক মল্লিরকে ম্লান করে দিয়েছে ষ্টালিন।"

এই থিসিস হইতে কেবল একটিমাত্র সিদ্ধান্তে আসা উচিত যে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজনীতিক কোলাহল, এই কালো, লাল, ফিকে লালের পতাকার ঠোকাঠুকি "ইতিহাসের গতির" (historic necessity) সাক্ষ্য দেয়। বামপন্থী রাজনীতিক ঢক্কা-নিনাদের কোন অর্থ নাই। যাহা হইবার তাহাই হইতেছে। দুঃখ করিবার অধিকার মানুষের নাই; কম্যুনিষ্ট নীতি অবলম্বন ও অনুসরণ করিয়া বিচার করিবার অধিকার সে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

গান্ধীগ্রাম সেবাশ্রম

পূর্ব্ববঙ্গের বরিশাল জেলার বেবাজ-কলসকাটি গ্রামে এই আশ্রম অবস্থিত। শ্রীসতীন্দ্রনাথ সেন ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ঢাকা নগরীর "সোনার বাংলা" পত্রিকার ১৫ই আষাঢ় সংখ্যায় এই আশ্রমের নানাবিধ গঠনমূলক কর্ম্ম-প্রচেষ্টার একটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধের একটি চুম্বক আমরা দিয়ে দিলাম :

কলসকাটি একটি বিখ্যাত বন্দর, ইহার আশেপাশে প্রায় বার-তের জন প্রতাপশালী জমিদার বাস করিতেন। আজ তাঁহারা ছন্নছাড়া, গৃহহারা। সেইজন্যই আজ ঐ অঞ্চলে গঠনমূলক কার্য্যের প্রয়োজন। পল্লীগ্রামের রাস্তা-ঘাটের মত বেবাজ-কলসকাটির রাস্তা অনেক দিন সংস্কার হয় নাই। আশ্রম-জীবনের প্রারম্ভেই এই দীর্ঘ রাস্তাটি কয়েক শত টাকা ব্যয়ে নূতন করিয়া ফেলা হইয়াছে। গ্রামবাসী চাঁদা তুলিয়া তাহা শোধ করিবেন বলিতেছেন। কিন্তু তাহা এখনও করা হয় নাই এবং রাস্তাটি জেলা বোর্ডের দায়িত্বে হইলেও তাঁহারা

বৎসরের পর বৎসর নির্ব্বিকারভাবে ইহার দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন।

কলিকাতা প্রবাসী ছাত্রবৃন্দ এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়া সব ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই পশ্চিমবঙ্গে, তথা ভারতরাষ্ট্রে বাস করিবেন স্থির করিয়াছেন। কিন্তু গ্রামের মায়া দুর্নিবার। সেই নিঃস্বার্থ, প্রায় শেষ সেবা দ্বারা তাঁহারা জন্মভূমির প্রতিকর্ত্তব্য পালন করিয়া গেলেন। পূর্ব্ববঙ্গের দুর্ভাগ্য যে এমন কর্ম্মীবৃন্দের সেবা হইতে সে নিজেকে বঞ্চিত করিল।

"গান্ধীগ্রাম সেবাশ্রমের বিরাট দীঘির কচুরীপানা এঁরা স্বেচ্ছায় সাফ করে দেবার ব্রত নিয়েছেন। এঁদের এই সংকল্প ও কার্য্যের প্রচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য।

উন্নত প্রক্রিয়ায় কৃষির আয়োজন আছে। সর্ব্বদা গ্রামের হিন্দু-মুসলমান তা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছে ও অনুপ্রাণিত হয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রভূমিতে তার প্রয়োগে উৎসাহিত হচ্ছে। পোলট্রি পালনের চেষ্টা চলছে।

চার থেকে তের বৎসর বয়স্ক চব্বিশটি ছেলেমেয়ে বনিয়াদি বিদ্যালয়ে আছে। একটি মুসলমান ছেলে, বাকী সব হিন্দু। আশা করা যায় এখন হয়তো কতক মুসলমান ছেলে-মেয়ে আসতে পারে। শিক্ষক দুই জন।

১৯৪৮ সালে এই বিদ্যালয়ের প্রথম প্রতিষ্ঠা। দাঙ্গার পর বন্ধ ছিল। গত চৈত্র মাস থেকে আবার চালু করা হয়। পূর্ব্বে যারা প্রাক্-বনিয়াদি পর্য্যায়ে ছিল, আজ তারা প্রথম শ্রেণীর পর্য্যায়ে। তা ছাড়া পূর্ব্বে ছেলেমেয়েদের অনেকেই দাঙ্গার পর অভিভাবকদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে।

"সপ্তাহে সপ্তাহে ছেলেমেয়েদের মধ্য থেকে বিভিন্ন কর্ম্মের দায়িত্ব দিয়ে কাকেও ডাক্তার, কাকেও নায়ক, কাকেও সেবক নিযুক্ত করা হয়। নিজেরাই ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচন করে; কিন্তু বিশেষ বিশেষ কাজের বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব সম্পর্কে ছেলেমেয়েরা খুব অবহিত থাকে। নায়কত্ব লাভের জন্ত নিজেদের জীবন যাপনকে সুসংযত ও সুশিক্ষিত করতে সর্ব্বদা প্রয়াস রাখে, ডাক্তার পদ প্রাপ্তির জন্ত স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য রাখে, সেবক সেবকত্ব লাভের গুণ ও শক্তি লাভের প্রয়াস করে। এর ভিতর ভাল হবার প্রতি-যোগিতা করে, প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ না ক'রে। কেননা প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক নষ্ট হলে ভোট পাওয়া যাবে না—এ চিন্তা সকলেরই থাকে।

অস্পৃশ্যতার মনোভাব অত্যন্ত তীব্র ছিল। অভিভাবক হতে সংক্রামিত সংস্কার। বর্ত্তমানে অনেকটা আলগা ভাব এসেছে।"

পূর্ব্ববঙ্গের মুসলিমের ক্ষোভ

ঢাকার "ইমরোজ" (আজ—Today) নামক মাসিক পত্রিকা আমরা কালেভদ্রে প্রাপ্ত হই। পূর্ব্ববঙ্গের প্রাক্তন অর্থ-সচিব জনাব হামিদ উল চৌধুরী নাকি এই পত্রিকার পৃষ্ঠ-পোষক। সেইজন্ত আমরা এই পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে অল্পবিস্তর গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকি।

আজ আর ইহা অবিদিত নাই যে, পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষিত সমাজ, মুসলিম বা হিন্দু সমাজ, করাচীর কর্তৃপক্ষের রীতি-নীতিতে ক্রমশঃ অতিষ্ঠ হইয়া পড়িতেছেন। বাংলা ভাষার উপর যে অত্যাচার উর্দ্দু ভাষাভাষী রাষ্ট্র-নায়কেরা করিতে-ছেন তার বিরুদ্ধে পূর্ব্ববঙ্গের জনমত জমাট বাঁধিতেছে। "ইমরোজের" গত জ্যৈষ্ঠ মাসের মন্তব্যাদি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সেইজন্ত তাহা ভারতরাষ্ট্রের নাগরিকবর্গের জানিয়া রাখা প্রয়োজন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মতিগতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা রাষ্ট্রের প্রতি অপ্রীতির ভোতক। "ইমরোজ" বড় দুঃখে এই মন্তব্য করিয়াছেন। আমরা "ইমরোজের" দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি:

"এবারকার নজরুল জন্মবার্ষিকীর একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। খোদ করাচী ও লাহোরেও এই জন্মবার্ষিকী প্রতি-পালিত হয়েছে যদিও প্রবাসী বাঙালীদের উদ্যোগেই। এর একটা সার্থকতা আমরা বেশ দেখতে পাচ্ছি। বাঙালী মুসলমান তাঁদের হীনবিরতা (Inferiority complex) ভাব একটু একটু করে কাটিয়ে উঠছেন। পাকিস্তানের অন্ত ভাষাভাষীর চেয়ে যে তাঁরা কোন অংশেই হীন নন, তাঁদের ভাষা যে অন্য কোন ভাষার চেয়ে কম নয়, এই বোধটা যেন তাঁদের মধ্যে ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। বাংলা ভাষাকে অন্‌ইসলামীয় বলে নস্যাৎ করতে চেষ্টা করে বাংলা ভাষাভাষীদের মনে যে হীনমন্যতা, ও উর্দ্দু ভাষাভাষীদের মধ্যে অহেতুক বাংলা ভাষার প্রতি ঘৃণার যে উদ্রেক হচ্ছিল, তারও আস্তে আস্তে অবসান হবে।

পশ্চিম পাকিস্তানবাসীদের বাংলা ভাষার প্রতি অহেতুক ঘৃণার কারণ বোঝা দুষ্কর। পত্রান্তরে প্রকাশ লাহোর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাংলাভাষা পড়ান বন্ধ করা হয়েছে; অন্যপক্ষে সংস্কৃত চলছেই। লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ পাকি-স্তানের পূর্ব্ব বাংলা বলে একটি অংশ আছে এবং সেখানকার লোকদের ভাষা যে বাংলা একথা জানেন না, এমন মনে করবার সত্যি কারণ নেই। বাংলাভাষা সম্বন্ধে তাঁরা বিশেষ ভাবেই অজ্ঞ এ কথা মেনে নিলে তাঁদের শিক্ষাবিদ্ হিসাবে উপযোগী মনে করবার কোন কারণই থাকতে পারে না। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েই যখন নানা দেশের ভাষা শিখানর ব্যবস্থা হচ্ছে তখন লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা বর্জন সত্যিই বিস্ময়কর ব্যাপার। এ যদি সত্যি হয় তা হলে বুঝতে হবে পাকিস্তানের এক বিরাট্ অংশে অহেতুক অন্য অংশের প্রতি বিদ্বেষবীজ বপন করা হচ্ছে; দুই অংশের সহজ মেলা-মেশার মধ্যে একটা বিরাট্ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হচ্ছে। একে কোন দিন সুষ্ঠু বা সৎ বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে না।"

আসাম রাজ্য ও উদ্বাস্তু

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবু শ্রীপ্রকাশ আসামে গিয়াছিলেন। সেই রাজ্যের উদ্বাস্তু সমস্যা সহজে সমাধান হইতেছে না, এই অভিযোগ চলিতেছে। সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার দায়িত্ব লইয়া তিনি প্রেরিত হন। রাজ্যের গবর্ণর ছিলেন তিনি প্রায় তিন বৎসর। আশা করা যায় যে, আসাম মন্ত্রিমণ্ডলীর ভাবগতিক তিনি জানেন, তাঁহাদের বাঙালী-বিদ্বেষ সর্ব্বজনবিদিত। বাবু শ্রীপ্রকাশ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরূপে কি দেখিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু তিনি আসাম মন্ত্রিমণ্ডলী ও আসাম জনসমাজের প্রশস্তি গাহিয়াছেন। ইহা নিছক ভদ্রতাপ্রসূত বলিয়া মনে করি।

আমরা এই বিরোধ ও বিদ্বেষের অবসান দেখিতে চাই। সেই জন্য "যুগশক্তি" পত্রিকার ৭ই আষাঢ় সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্য সমর্থন করি :

আসামে আগত বাঙালী উদ্বাস্তুগণ প্রথম দিকে আসাম সরকার এবং অসমীয়া জনসমাজের কোন কোন অংশ হইতে যে ব্যবহারই পাইয়া থাকুক না কেন, ইহা এখন অস্বীকার করার উপায় নাই যে সহস্র সহস্র উদ্বাস্তু আসাম রাজ্যের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং স্থানীয় জনসাধারণ ও অনেক ক্ষেত্রে আসাম-সরকারেরও নানাপ্রকার সাহায্য ও সহানুভূতি তাহারা পাইতেছে। এই অবস্থায় বাঙালী উদ্বাস্তু এবং অসমীয়া জনসাধারণ ও আসাম সরকারের মধ্যে অনর্থক তিক্ততা বাড়াইয়া কাহারও কোন লাভ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না।

উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন আজ এক সর্ব্বভারতীয় জটিল সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। আসামে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য সরকারী ভাণ্ডার হইতে যাহা খরচ হয়, তাহার প্রায় সাকুল্যই কেন্দ্রীয় সরকার দিতেছেন। কাজেই এই অর্থব্যয় কতটুকু সার্থক হইতেছে এবং সমস্যা সমাধানের জন্য আর কি কি পন্থা এখানে অবলম্বন করা যাইতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে তদন্ত করা নিশ্চয়ই আবশ্যক। এজন্য কাহারও মনঃক্ষুণ্ণ হওয়া বা অপমানিত বোধ করার কি কারণ থাকিতে পারে ?

রেল ষ্টেশনের নামে বাংলা অক্ষর

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে, বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে প্রভৃতির ষ্টেশনের নাম বাংলা অক্ষরে ছিল, যেমন ছিল ইংরেজীতে। গত যুদ্ধের "ব্ল্যাক-আউটের" সময় প্রায় সব ষ্টেশনের নামের ফলক সরাইয়া লওয়া হয়। শান্তি প্রতিষ্ঠার পরে নামের ফলক আসে ; কিন্তু বাংলা অক্ষর ফিরিয়া আসে না।

এই বিষয়ে বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি আন্দোলন করিতে থাকেন। পুরুলিয়া রামচন্দ্রপুর হইতে প্রকাশিত "সংগঠন" পত্রিকার ১০ই আষাঢ় সংখ্যায় নিম্নলিখিত মন্তব্য করা হইয়াছে। তাহা পাঠে বর্ত্তমান অবস্থা বুঝা যায়। যে সংশোধন করা হইয়াছে নীতির দিক হইতে তাহা কিন্তু গ্রহণীয় নয় :

"ই-আই-আর, ও বি-এন-আর রেল লাইন পত্তনকাল হইতে ষ্টেশনগুলির নামও গাড়ীতে এবং অন্যত্র বাংলা অক্ষরে লিখিত হইত। স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের এলাকার বাহিরে রেল ষ্টেশনগুলির নামফলক হইতে বাংলা অক্ষর মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। ইহাতে বঙ্গভাষাভাষী যাত্রী বিশেষতঃ মহিলা তীর্থযাত্রীগণের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। সাত কোটি বাঙালী নরনারী সমগ্র উত্তর ভারতে যাতায়াত করে এবং রেলের আয়ের বহুল অংশ যোগায়। ভারত ও বাংলা ভাগের পর বহু বাঙালীকে সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া থাকিতে হইয়াছে। তাহাদের মেয়েরা ইংরেজী বা হিন্দী জানে না, তাহাদের সুবিধার জন্য বাংলা হরফে ষ্টেশনের নামফলকে লিখিবার জন্য নিখিল-ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি তিন বৎসর আন্দোলন ও আবেদন করিয়া আসিতেছেন।

রেল-কর্ত্তৃপক্ষ সম্পাদক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষকে প্রথমে জানান যে এই অপকার্য্য করা হইয়াছে বিহার ও উত্তর প্রদেশের রেলের পরামর্শ কমিটির উপদেশ মত, বাংলা উঠাইয়া হিন্দী, উর্দ্দু ও ইংরেজীতে লিখিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি রেল কোম্পানীকে যাত্রীদের সুবিধা দেখিবার জন্য এবং রেলের মত সাধারণের মঙ্গলজনক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি বা ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদ (লিংগুইষ্টিক ইম্পিরিয়ালিজম) প্রবর্ত্তন না করিতে অনুরোধ জানান।

সম্প্রতি ই-আই-আরের জেনারেল ম্যানেজার জানাইয়াছেন বিহারের সেই সব অঞ্চলের ষ্টেশনে বাংলা অক্ষর ব্যবহার হইবে যেগুলিতে বাংলা ভাষা জানা যাত্রীর সমাগম বেশী হইবে। ইহা যদিও মন্দের ভাল, কিন্তু এই নির্দ্দেশ যথাযথ পালিত হয় নাই। বাংলা ভাষাভাষিগণকে সমবেত কণ্ঠে এই অধিকার রেল-কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে দাবী করিতে হইবে যাহাতে সাঁওতাল পরগণার ও মানভূম জেলার ষ্টেশনগুলি ও ছোটনাগপুরের ষ্টেশনে বাংলা অক্ষর যেখান হইতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা পুনরায় লিখিত হয়।

উক্ত সমিতি প্রধান প্রধান তীর্থ ও জংশন ষ্টেশনের নাম (যথা গয়া, কাশী, গোমো, পরেশনাথ, পাটনা, মোকামা, মোগলসরাই, বেনারস, এলাহাবাদ, কানপুর, টুণ্ডলা, দিল্লী, হাতরাস) বাংলা অক্ষরে লিখিবার যে দাবী ও অনুরোধ করিয়াছেন তাহা বাঙালী মাত্রেই সমর্থন করিয়া থাকে।"

নিউজ-প্রিণ্টের অভাব

সংবাদপত্র পরিচালক ও সাধারণ পাঠকবর্গ কাগজের অভাবে পীড়িত হইতেছেন। সেই পীড়া উপশম করিবার

উদ্দেশে ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় প্রচারবিভাগ নিম্নলিখিত বিবৃতিটি প্রকাশ করিয়াছেন :

"একমাত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত সমগ্র পৃথিবীতেই আজ নিউজ-প্রিন্টের দারুণ অভাব দেখা দিয়াছে। সংবাদপত্রগুলির আকার হ্রাস করা হইয়াছে এবং মূল্যও বৃদ্ধি করা হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পৃথিবীর মোট নিউজ-প্রিন্ট উৎপাদনের শতকরা ৬০ ভাগ একমাত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অথচ ১৯৪৯ ও ১৯৫০ সালে পৃথিবীর নিউজ-প্রিন্ট উৎপাদন ও চাহিদার পরিমাণ প্রায় সমান সমান।

কানাডার নিউজ-প্রিন্ট এসোসিয়েশন পৃথিবীর যে সকল দেশে নিউজ-প্রিন্ট উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হয় তাহাদের সকলের হিসাব লইয়া যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহা হইতেই পৃথিবীর নিউজ-প্রিন্ট উৎপাদনের শক্তি, উৎপাদন ও চাহিদার একটা আভাস পাওয়া যাইবে।

(হাজার টন হিসাবে)

	প্রাক্-যুদ্ধ	১৯৪৯	১৯৫০
উৎপাদন শক্তি	১০,৬৭০	১০,১৫১	১০,৪৭৬
উৎপাদন	৮,১৪৯	৯,০৮৬	৯,৩৯১
চাহিদা	৮,১৪৮	১০,৩০৬	১০,৬০৪

নিউজ-প্রিন্টের বিশেষত্ব

সাধারণ কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্ত ভারতে অনেকগুলি কাগজের কল রহিয়াছে। কিন্তু নিউজ-প্রিন্টের জন্ত ভারতকে সম্পূর্ণভাবে বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। দুই বৎসর আগে ভারতের নিউজ-প্রিন্টের চাহিদা ছিল ৫৭,৬৩৮ টন এবং তাহার মূল্য ছিল ৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। ১৯৫১ সালে চাহিদার পরিমাণ ৬০ হাজার টন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে এবং ১৯৫৬ সালে চাহিদা দাঁড়াইবে ১ লক্ষ টন।

সাধারণ কাগজ ও নিউজ-প্রিন্টের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এইরূপ। শুধু যন্ত্রের সাহায্যে কাঠ গুঁড়া করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করা হয় এবং তাহা হইতে কাগজ প্রস্তুত করা হয়। কোন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয় না। কাঁচা মাল অপচয়ের পরিমাণও শতকরা মাত্র ১০ ভাগ। ইহার জন্ত যে কল কারখানার প্রয়োজন হয় তাহার মূল্যও কম এবং উৎপাদন-ব্যয়ও কম। উৎপন্ন কাগজও সস্তা হয়, তবে তাহা টেঁকসই হয় না।

অপর দিকে রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে মণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহা হইতে সাধারণ কাগজ তৈরি করা হইয়া থাকে। এই কাগজ খুব শক্ত ও টেঁকসই হয়। কিন্তু ইহার জন্ত খুব মূল্যবান কলকারখানার প্রয়োজন হয়। ইহাতে কাঁচামাল অপচয়ের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ এবং উৎপাদন-খরচও খুব বেশী।

পঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের দেবদারু গাছগুলির হিসাব লইয়া দেখা গিয়াছে যে, নিউজ-প্রিন্ট প্রস্তুতের জন্ত প্রতি বৎসর ১ লক্ষ ৮০ হাজার টন দেবদারু কাঠ পাওয়া যাইবে। দেবদারু বনগুলির ব্যবস্থা করিবার জন্ত নূতন পরিকল্পনা রচনা করা হইবে এবং প্রতিটি বিভাগের জন্ত একটি করিয়া নিউজ-প্রিন্ট মণ্ডল গঠন করিতে হইবে।

একটা মোটামুটি হিসাব ধরিয়া দেখা গিয়াছে যে, ভারতে প্রস্তুত নিউজ-প্রিন্টের মূল্য হইবে টন প্রতি ৭৫০৲ টাকা। অথচ বর্ত্তমানে আমদানী করা কাগজের মূল্য টন প্রতি ১ হাজার টাকা। কিন্তু আর্থিক লাভের দিকটাই বড় আকর্ষণ নহে। নিউজ-প্রিন্টের জন্ত ভবিষ্যতে আর বিদেশের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইবে না। জানা গিয়াছে যে, বিশ্ব 'খাদ্য ও কৃষিসঙ্ঘে'র কারিগরি সাহায্য পরিকল্পনা অনুসারে একজন বিদেশী বিশেষজ্ঞের সাহায্য পাওয়া যাইবে। তিনি ভারতের দেবদারু-সম্পদের হিসাব লইয়া নিউজ-প্রিন্ট শিল্পে তাহার প্রয়োগ সম্পর্কে পরামর্শ দিবেন। ইহা ছাড়াও নিউজ-প্রিন্ট প্রস্তুত সম্পর্কে ব্যবহারিক শিক্ষা লাভের জন্ত দুই জন শিক্ষার্থীকে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতে প্রেরণ করা হইবে।"

পল্লী-প্রাণ

এই নামের একখানি পত্রিকা গত বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য নিম্নোদ্ধৃত বাক্যের মধ্যে পাওয়া যায়। আমাদের সহযোগীর সাফল্য কামনা করি :

"মেদিনীপুরের নিভৃত পল্লী-অঞ্চল থেকে 'পল্লী-প্রাণের' আবির্ভাব হলেও, এ জেলার পল্লী-কীর্ত্তি অগৌরবের নয়। মঠ-মন্দির-মসজিদ-গড়-দুর্গ, রাজবংশ, জমিদারবংশ, প্রধান প্রধান ব্যক্তির কাহিনী কিংবদন্তী-তথ্য কেবল এই জেলার নয়, সমস্ত বাংলাদেশের মর্য্যাদা দান করেছে। বিস্মৃতির গর্ভ থেকে এ সবের উদ্ধার করে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে পরিবেশন করাও এই পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য।

"সামাজিক অনাদর যাদের দূরে ঠেলে ফেলে রেখেছে 'পল্লী-প্রাণ' তাদের বুকে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলুক ও সেই শক্তিবলে তারা সমাজের আদরণীয় হয়ে উঠুক। যারা জীবনে বহির্জগতের ভাবধারা ও জ্ঞানালোকের সংস্পর্শে আসতে পারে নি 'পল্লী-প্রাণ' তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করে তুলুক বাহির বিশ্বের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করবার জন্ত। যারা আত্মবিস্মৃত ও নিশ্চেষ্ট 'পল্লী-প্রাণ' তাদের প্রেরণা জোগাক্, পথ দেখাক্।

"যিনি সত্যম্, শিবম্, সুন্দরমের প্রতীক, যিনি জগতের শক্তি ও শান্তির আধার, তিনি আমাদিগকে কর্ত্তব্যের বন্ধুর পথে অবিচলিত রেখে দেশবাসীর কল্যাণ-সাধনে নিয়োজিত রাখুন—প্রার্থনা করি।"

রামমোহন রায়ের পূর্ব্বপুরুষ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পূর্ব্বপুরুষের বিশুদ্ধ নামকীর্ত্তন একসময়ে বাল্যশিক্ষার অন্তর্ভূত ছিল। আমাদের বাল্যকালেও 'নামশ্লোক' পাঠ করার রীতি একেবারে লোপ পায় নাই। বর্ত্তমান বিপ্লবাত্মক যুগে প্রাচীন রীতি মাত্রই বিজাতীয় বিদ্বেষের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে—তাহা শুভই হউক আর অশুভই হউক। ফলে, আমরা এক স্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, শিক্ষিত পুত্র পিতার নামও শুদ্ধাকারে পরিজ্ঞাত নহেন। কুল-পরিচয়াদি বিষয়ে প্রশ্ন করাই এখন অনেক স্থলে বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজ আমলে ভারতের আদি মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বপুরুষের বিবরণ এযাবৎ একজন মাত্র লেখক শ্রদ্ধাসহকারে সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—রামমোহনের জ্ঞাতিবংশীয় প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি মহাশয়।* ৫০।৬০ বৎসর পরে তাঁহার লেখা সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করা আবশ্যক হইয়াছে। আমরা সংক্ষেপে রামমোহনের পিতৃকুল ও মাতৃকুলের পরিচয় যথাসম্ভব বিশুদ্ধভাবে প্রধানতঃ কুলপঞ্জী হইতে সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছি।

১। পিতৃকুল

রামমোহন আত্মজীবনীতে† লিখিয়াছেন :

"My ancestors were Brahmans of a high order and, from time immemorial, were devoted to the religious duties of their race down to my fifth progenitor, who about one hundred and forty years ago gave up spiritual exercises for worldly pursuits and aggrandisement."

রামমোহনের ভাষা এ স্থলে প্রণিধানযোগ্য। বুঝা যায় তাঁহার বংশের কীর্ত্তিকথা "স্মরণাতীত যুগ" হইতে প্রচলিত ছিল। রামমোহনের সাবধান লেখনী হইতে এরূপ আপাতদৃষ্টিতে নিরর্থক উক্তি কি করিয়া বাহির হইতে পারিল তাহার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা সূত্রাকারে সূচিত হইল। বঙ্গদেশে এবং পরে মিথিলায় "কুলশাস্ত্র" নামে (মিথিলায় "পঞ্জীপ্রবন্ধ" নামে পরিচিত) একটি পৃথক্ শাস্ত্র প্রাচীনকাল হইতে পৃথক্ আচার্য্য দ্বারা রচিত ও রীতিমত পঠন-পাঠন দ্বারা প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে। সমাজে এই কুলশাস্ত্রব্যবসায়ী আচার্য্যদের—ঘটক এবং পঞ্জীকারদের—মর্য্যাদা অন্যান্য শাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপকদের অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। ভারতবর্ষের অন্যত্র এইরূপ শাস্ত্র এবং তদ্ব্যবসায়ী উচ্চশ্রেণীর আচার্য্য ছিল কিনা সন্দেহ—তদ্বিষয়ে গবেষণা হওয়া আবশ্যক। কুলশাস্ত্রের মূল বিষয়-বস্তু হইল, সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের পারিবারিক ও সামাজিক ইতিহাস, যৎপাঠে সৎসম্বন্ধের প্রেরণাদ্বারা সামাজিকদের চরিত্রবল সুঘটিত ও অক্ষুন্ন থাকিতে পারিত। বঙ্গদেশে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের কুলগ্রন্থসমূহ প্রাচীনকাল হইতে ধারাবাহিক ভাবে লিখিত ও রক্ষিত হইয়াছে। বিক্রমপুরের পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে বীরভূমের পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ঘটকদের নিকট শত শত বিপুলায়তন হস্তলিখিত কুলপঞ্জী পাওয়া যাইত। নগেন্দ্রনাথ বসু তাহাদের এক বিপুল সংগ্রহ করিয়াছিলেন—পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিশীল শিক্ষিত সমাজের মারাত্মক উপেক্ষাবশতঃ তাহা এক্ষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় অন্তর্হিত হইয়া রহিয়াছে। মুদ্রিত কুলগ্রন্থগুলি প্রায় সমস্তই ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ। রামমোহনের ঊর্দ্ধতন পুরুষের নামমালা যে দুইটি প্রামাণিক বলিয়া পরিগৃহীত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে (সম্বন্ধনির্ণয়, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৫৯৮, ৩য় সং, পৃ. ৭৪৫ এবং বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম ভাগ, ১ম অংশ, ২য় সং, পৃ. ২৫৬) তাহা ভ্রমশূন্য নহে—উভয় গ্রন্থকারই মূল কুলপঞ্জী পরীক্ষা করিয়া দেখিলে অনায়াসে তাহা সংশোধন করিতে পারিতেন। বুঝা যায় নগেন্দ্রনাথ বসু কুলশাস্ত্র স্বয়ং খুব কমই পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং লালমোহন বিদ্যানিধিও সম্যক্ পরীক্ষা করার অবসর পান নাই।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের ইতিহাসে তিনটি সুনির্দ্দিষ্ট যুগের পরিকল্পনা করা যায়। (১) প্রথম যুগ আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়ন হইতে বল্লালসেন কর্ত্তৃক 'কুলাকুলপরীক্ষা'-পূর্ব্বক নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন। এই আদিযুগের যৎকিঞ্চিৎ প্রামাণিক বিবরণ কেশবসেনের ও দনুজমাধবের সভাস্তার "এড়ুমিশ্রে"র কারিকায় পাওয়া যাইত, কিন্তু উক্ত কারিকার প্রথমাংশ মাত্র (৪৩ শ্লোক) আবিষ্কৃত হইয়াছে

* নব্যভারত, ১৩০৩, পৃ. ২৮২-৩ ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-রচিত রামমোহন জীবনীর চতুর্থ সংস্করণ, পরিশিষ্ট, পৃ. ৬৯৩-৬ দ্রষ্টব্য। মহেন্দ্রনাথ (১২৬১-১৩১৯ সাল) স্বয়ং রামমোহনের দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকিশোরের বৃদ্ধপ্রপৌত্র ছিলেন। যথা, রামকিশোর—নবকিশোর—শ্রীনাথ (১২০১-১২৪৫ সাল)—গোপীনাথ (১২৩৪-১২৭৭ সাল)—মহেন্দ্রনাথ। তিনি তাঁহার পিতৃদেবের ইচ্ছানুসারে কুলশাস্ত্রের আলোচনায় ও "বংশাবলি" নামক পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত ঐ পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। কুলশাস্ত্র আলোচনাদ্বারাই তিনি নিজ বংশের নামমালা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে রোহিণীকান্ত মুখোপাধ্যায়-রচিত "কুলসারসংগ্রহে" (২য় খণ্ড, ১২৯০, পৃ. ১৫৯) সর্ব্বপ্রথম রামমোহনের বংশলতা বিশুদ্ধ ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল।

† এই আত্মজীবনী রামমোহনের লেখা কিনা কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

এবং আমরা সম্যক্ পরীক্ষা করিয়াছি। এড়ুমিশ্র লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করিয়া খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রামাণিক লেখানুসারে গৌড়াধিপতি "আদিশূর" কান্যকুব্জের অন্তর্গত "বিশিষ্টবিপ্রনিলয় কোলাঞ্চদেশ" হইতে (৩৭ শ্লোক) স্বকীয় সভাশোভা বর্দ্ধনের জন্য পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিয়া (গঙ্গাতটে) গৌড়দেশে "কামটী" প্রভৃতি পঞ্চগ্রাম অর্পণ করিয়াছিলেন। পুত্রেষ্টি যাগ, পঞ্চকায়স্থ আনয়ন প্রভৃতি কথা ঘুণাক্ষরেও এড়ুমিশ্রের কারিকায় পাওয়া যায় না—পরে কল্পিত এই সকল কথা অমূলক এবং কৃত্রিম বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। দ্বিজপঞ্চকের প্রথম নাম "ক্ষিতীশ" (১৫ শ্লোক) শাণ্ডিল্যগোত্র রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের আদিপুরুষ বটে এবং তিনিই প্রথম কান্যকুব্জ হইতে গৌড় দেশে আসিয়াছিলেন। রাঢ়ীয় সমাজের সমস্ত কুলপঞ্জীতে সর্ব্বমান্য শাণ্ডিল্যগোত্রের বংশধারা ও কুলবিবরণ সর্ব্বপ্রথম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উক্ত ক্ষিতীশের উর্দ্ধতন (কান্যকুব্জবাসী) ৩.৪ পুরুষের নামও অনেক গ্রন্থে পাওয়া যায়—প্রামাণিক এড়ুমিশ্রের কারিকা ও ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলীর এতদংশ অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত থাকায় তাহার প্রামাণ্যে সংশয় রহিয়াছে। বল্লালী আদিকুলীন "মহেশ্বর" উক্ত ক্ষিতীশের অধস্তন একাদশ পুরুষ। যথা, ক্ষিতীশ—ভট্টনারায়ণ—আদিবরাহ—বৈনতেয়—সুবুদ্ধি—বিবুধেশ—গাউ—গদাধর—গহস—শকুনি—মহেশ্বর (সম্বন্ধনির্ণয়—বংশাবলী, পৃ. ২: নগেন বসু পৃ. ১৩৮)। প্রমাণস্বরূপ আমাদের হস্তগত একটি প্রাচীন কারিকাংশ উদ্ধৃত হইল:

শ্রীমদাদিবরাহস্য সুতোঽভূদ্বৈনতেয়কঃ।
সুবুদ্ধিস্তস্য তনয়ো বিবুধেশস্ততোঽভবৎ।
তস্য পঞ্চ সুতা জাতা আয়ুর্গাউসুতিক্ককাঃ।
বীরশ্চ হংসনামা চ তত্রায়ুরনপত্যকঃ।
হংসঃ পিত্রা পরিত্যক্তো বীরো দেশান্তরং গতঃ।
হাকুচশ্চ নিধো জহ্নুর্গদাধরভগীরথৌ।
ষষ্ঠঃ সুরেশ্বরশ্চাপি গাউকস্য সুতা ইমে।
গদাধরসুতাঃ পঞ্চ গহসোঽনন্তভূধরাঃ।
রহণো বাভসশ্চাপি, গহসস্য সুতাবুভৌ।
শকুনিশ্চ বিঠোকশ্চ প্রতিগ্রাহী বিঠো ততঃ।
শকুনেশ্চ সুতাবেতৌ শ্রীজাহ্লন-মহেশ্বরৌ।

এই কারিকার প্রারম্ভে এবং অন্যান্য বহু গ্রন্থে (তন্মধ্যে বল্লালচরিত অন্যতম) পাওয়া যায়, ভট্টনারায়ণই আদিশূর কর্ত্তৃক গৌড়ে আনীত হইয়াছিলেন। ইহা নিশ্চিতই প্রমাণবিরুদ্ধ কথা এবং তত্তদ্‌গ্রন্থের প্রামাণ্যে সংশয় উৎপাদন করে। আদিবরাহ "বন্দ্যঘটী" গ্রামনিবাসী ছিলেন অর্থাৎ বাড়ুয্যেদের বীজী পুরুষ। এতদ্ভিন্ন আদিযুগের এই সকল পুরুষ নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে—তাঁহাদের সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কথা জানা যায় না। যাঁহারা এই ভট্টনারায়ণকে বেণীসংহার নাটকের রচয়িতা বলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। বেণীসংহারকর্ত্তা কাশ্মীরনিবাসী ছিলেন।

(২) দ্বিতীয় যুগ বল্লালের সময় হইতে মেলসৃষ্টি ও দেবীবরকর্ত্তৃক মেলবন্ধন পর্য্যন্ত। এই সময় হইতে প্রত্যেক কুলীনের (শ্রোত্রিয়াদির নহে) পারিবারিক বিবরণ ও বংশধারা অতি বিশুদ্ধ ভাবে নানাগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হইল ধ্রুবানন্দ মিশ্ররচিত "মহাবংশাবলী"। নানাবিধ ছন্দোবদ্ধ এই গ্রন্থের একটি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ সংস্করণ "মহাবংশ" নামে নগেন বসু ১৩২৩ সনে মুদ্রিত করিয়াছিলেন—প্রকৃতপক্ষে "মিশ্রগ্রন্থ" নামে পরিচিত এই গ্রন্থ ধ্রুবানন্দরচিত দুইটি পৃথক্ গ্রন্থের—"সমীকরণসার" ও "মহাবংশাবলী"র—সংমিশ্রণ বটে। লক্ষ্মণসেনের অভিষেক কালে সম্বন্ধাদির অতি সূক্ষ্ম বিচারদ্বারা কুলীনদের শ্রেষ্ঠতার নির্ণয় হয় এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমকক্ষ কুলীনদের নামনির্দ্দেশ আনুষ্ঠানিক ভাবে সাধিত হয়। ইহারই নাম "সমীকরণ" অথবা Peerage। ধ্রুবানন্দের শেষ সময় পর্য্যন্ত অন্যূন ৩০০ বৎসর মধ্যে ১১৭টি সমীকরণ হইয়াছিল। রামমোহনের তৎকালীন প্রত্যেক পূর্ব্বপুরুষ সমীকরণভুক্ত শ্রেষ্ঠ কুলীন ছিলেন এবং প্রত্যেকের কুলবিবরণ ধ্রুবানন্দ মনোহর কারিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা সমীকরণসংখ্যা মুদ্রিত মহাবংশ হইতে নির্দ্দেশ করিতেছি:

মহেশ্বর—২য়	সমীকরণ	(পৃ. ২)	লক্ষ্মণসেনের সভাসদ্ ছিলেন।
তৎপুত্র মহাদেব—৪র্থ	"	(পৃ. ৪)	ঐ ঐ।
তৎপুত্র দুর্ব্বলি—৭ম	"	(পৃ. ৭)	•প্যাবসথীঃ স্থলে •প্যাবসথী শুদ্ধ পাঠ।
তৎপুত্র সঙ্কেত—১৩শ	"	(পৃ. ১৩)	•রাতককৃতী ও ভাতি শুদ্ধ পাঠ।
তৎপুত্র উৎসাহ—২০	"	(পৃ. ১৯)	উৎসাহবন্দ্যজস্তার্ত্তি• পঠনীয়।
তৎপুত্র রঘুপতি—৩২	"	(পৃ.৩৫ ৬)	
তৎপুত্র নিত্যানন্দ—৫০	"	(পৃ. ৬১)	
তৎপুত্র শ্রীবর(=বরাই)৭১	"	(পৃ.৮৮-৯)	চট্টজো ভৈরবোঽস্তার্ত্তিঃ শ্রীবরস্ত••• শুদ্ধ পাঠ।
তৎপুত্র গোবিন্দ মিশ্র—৮৩	"	(পৃ. ১১২)	
তৎপুত্র কমল মিশ্র—১০০	"	(পৃ. ১৩৬)	কারিকার পাঠ বহু স্থলে অশুদ্ধ।

কমল মিশ্রের পুরা নাম "কমললোচন" (পৃ. ১১২)। বরাই 'বরদানন্দে'র অপভ্রংশ নহে।

সঙ্কেত "বৃহদ্বাজালপাশ"-গ্রাম নিবাসী ছিলেন, তদবধি বন্দ্যবংশের এই শাখা বৃ বাজালপাশী নামে পরিচিত। বাজালপাশ গ্রাম মুরসিদাবাদ অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বলিয়া কেহ কেহ লিখিয়াছেন। নিত্যানন্দের কন্যাবিবাহে "সুরাই-মেলে"র সৃষ্টি। ঘটনাটি এই, পূতিতুণ্ডবংশীয় "সুরাই ঘটকসিংহ" (মহাবংশ পৃ. ৯৯) প্রথমতঃ অন্যপূর্ব্বা বিবাহ

করেন, যে কন্যার বিবাহ নিত্যানন্দের পুত্র সর্ব্বানন্দের সহিত হওয়ার কথা ছিল। "ইতিমধ্যে নিত্যানন্দকন্যা চং নরেন্দ্রমিশ্রে লইতেছিল কাড়িয়া আনিলেক অতএব বং নিত্যানন্দ দুষ্ট হইলেন অধিবাসযুক্তা কন্যা রহিল। সা কন্যা বিবাহ সুরাইতে হইল। অতএব সুরাই পাতিত্ত দোষে স্খলিতঃ। পশ্চাদমুং নৃসিংহ ··ক্ষেম্য বংশ্রীকান্ত—এই নৃসিংহ বংশ্রীকান্ত লইয়া স্বনামে মেল করিলা সুরাই।" (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ২১০২ সংখ্যক কুলপঞ্জী পুথির ৫৭৯।১ পত্র।) পরে সুরাই ভাঙ্গিয়া "ছায়ানরেন্দ্রী" মেল হইয়াছিল (ঐ)। উভয় ঘটনাই দেবীবরের বহু পূর্ব্বে হইয়াছিল। মেল অর্থ সামাজিক দল বা party—পরস্পর বিবদমান এই সকল দলের মধ্যে বিরোধ মিটাইয়া দেবীবর নূতন ব্যবস্থানুসারে 'মেলবন্ধন' করিয়া সমাজের সংহতি রক্ষা করিয়াছিলেন। দেবীবরকে যাঁহারা প্রাণ ভরিয়া গালি দিয়া আসিতেছেন তাঁহারা মেলসৃষ্টি ও মেলবন্ধনের মূল তত্ত্ব বিন্দুমাত্রও অবগত নহেন। পক্ষান্তরে, অনেক শিক্ষিত লোকও অবগত নহেন যে, শুধু মেল উল্লেখ করিয়া বংশের পরিচয় দেওয়া হয় না—বহুকাল বিলুপ্ত একটা সামাজিক দলের অন্তর্ভুক্তি মাত্র সূচিত হয়। রামমোহনের বংশের পরিচয় "বং বুং বাং নিত্যানন্দ প্রং"। সুরাই-মেলের একটি অংশের নাম "বাণভাগ"। গোবিন্দ মিশ্র চট্টবংশীয় বাণের সহিত কুলসম্বন্ধ করিয়া তদ্ভুক্ত হইয়াছিলেন। কারণ, "চং বাণের কন্যা বং চতুর্ভুজ বলাৎকার করিলেক, চং বাণের স্ত্রী ব্যস্ততা হইয়া অস্ত্রাঘাত করিলেক, চতুর্ভুজ ত্যাগ করিলেক কন্যোপরি অস্ত্রাঘাত হইল কন্যা বধ হইল" (ঐ, ৪০।১ পত্র)।

(৩) তৃতীয় যুগ মেলবন্ধনের পর হইতে ইংরেজ আমলের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত। এই সময়ের প্রত্যেক পুরুষের বিস্তৃত কুলবিবরণ হস্তলিখিত কুলপঞ্জীতে সুপ্রাপ্য (ঐ, ৪০-৪২ পত্র দ্রষ্টব্য)। আমরা নামমালা মাত্র উপাধিসহ উদ্ধৃত করিতেছি। কমল (লোচন) মিশ্র—রমানাথ "মিশ্র" (রামনাথ নহে)—সুন্দরাচার্য্য—পরশুরাম "চক্রবর্ত্তী"—শ্রীবল্লভ রায়—কৃষ্ণচন্দ্র রায়—ব্রজবিনোদ রায়—রামকান্ত রায়—রামমোহন। রামমোহনের fifth progenitor পরশুরাম এবং তিনিই প্রথম "রায়" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি প্রভৃতি অনেকে একথা লিখিয়াছেন। ইহা ভ্রমাত্মক, শাস্ত্রানুসারে fifth progenitor অর্থ "বৃদ্ধপ্রপিতামহ" অর্থাৎ শ্রীবল্লভ এবং তাঁহার ও তাঁহার ভাইদেরই সর্ব্বপ্রথম "রায়" উপাধি কুলপঞ্জীতে যথাযথ লিপিবদ্ধ আছে। গোবিন্দ হইতে পরশুরাম পর্য্যন্ত পাঁচ পুরুষ উপাধিধারী পণ্ডিত ছিলেন। রামমোহনের লেখানুসারে প্রায় ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীবল্লভ সরকারী কাজ গ্রহণ করেন—তৎকালে পরশুরাম অতিবৃদ্ধ অথবা মৃত ছিলেন মনে করার কারণ আছে। কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ জ্ঞাতিভ্রাতা মুরসিদাবাদ দরবারের উচ্চ পদাধিকারী "ভবানন্দ রায়ে"র* সুপারিশে বর্দ্ধমানরাজ জগৎ রায়ের অধীনে খানাকুল কৃষ্ণনগরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তদুপার্জ্জিত ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তির তায়দাদ হইতে (হুগলী কালেক্টরীর ১৯২০ সংখ্যক তায়দাদ দ্রষ্টব্য) জ্ঞাত হওয়া যায়; "জগৎ রায় ও কিত্তিচন্দ্র রায়" কৃষ্ণচন্দ্র রায় ও ব্রজবিনোদ রায়কে রাধানগর প্রভৃতি গ্রামে ২৩৬৷৷৪ ভূমি দান করিয়াছিলেন। ১২০৯ সালে নিমানন্দ প্রভৃতি ৭ ভ্রাতাই জীবিত থাকিয়া ঐ ভূমির দখলকার ছিলেন। ১২৪৩ সনের ১১ অগ্রহায়ণ (১৮৩৬ খ্রী.) নিষ্কর বাজেয়াপ্তির মোকদ্দমায় যে সকল মূল্যবান্ দলিল দাখিল হইয়াছিল তাহা হইতে কিছু কিছু নূতন সংবাদ জ্ঞাত হওয়া যায়। ইংরেজ আমলে ১১৯৩ সনে (ইংরেজি তারিখ দেওয়া আছে ৩১।৭।১৭৮৬ খ্রী.) ঐ ব্রহ্মোত্তর ব্রজবিনোদের নামে "নয়া সনন্দ" (পার্শি ও বাঙ্গলা ভাষায় লেখা) দ্বারা পুনঃপ্রদত্ত হইয়াছিল। লক্ষ্য করার বিষয়, বংশের অনেকেই সুদীর্ঘজীবী ছিলেন—ব্রজবিনোদ ১১৯৩ সনেও জীবিত ছিলেন এবং সম্ভবতঃ ঐ সনই "কোজাগরী পূর্ণিমা তিথি"তে স্বর্গত হইয়াছিলেন। তাঁহার নামীয় একটি ছাড়পত্রের অবিকল অনুলিপি এখানে প্রদত্ত হইল :

শ্রীশ্রীহরিঃ

পরগনে ভুরশীট্ট ও পরগনে মণ্ডলঘাট ও জাহানাবাদ
ও চন্দ্রকোণা ও মনোহরশাহী ও বায়ড়া ও শমরশাহী ও বালিয়ায় মোকর্দ্দম
ও কর্ম্মচারিযুচরিতেযু লিখনং কার্যনঞ্চা আগে শ্রীব্রজবিনোদ রায় দিগর
জাহির করিলা ইহার পীতা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ব্রহ্মত্তর জমী পরগনা মজকুরের
মৌজেহায় ২৩৬৷৷৪ দুই শও ছত্তীষ বিঘা চৌদ্দ কাটা আছে তাহার দরখাস্ত
দাখিল হইল শন ১১৪৮ শালের পূর্ব্ব ছাড়ি চিটা মাফীক ভোগ তজবিজ করিআ
জমি বহাল করা গেল দরখাস্তীর নকল ১৪৫ নম্বরে দাখিল হইল অতএব
ভোগ প্রমাণ জমীর কশল ছাড়িয়া দীবে ইতি সন ১১৭১ সাল
১৯ কার্ত্তীক

জগৎ রায় ও কীর্ত্তিচন্দ্রের রাজত্বকাল যথাক্রমে ১০৯৯—১১০৯ ও ১১০৯—১১৭৫ বঙ্গাব্দ (প্রচলিত ইতিহাসাদিতে ভুল তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে)। কৃষ্ণচন্দ্রের অভ্যুদয়কাল উভয় রাজার সময়ে পড়িয়াছিল সন্দেহ নাই। ব্রজবিনোদ

* গোবিন্দ মিশ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পরমানন্দের বংশধর। নামমালা যথা, পরমানন্দ - রামানন্দ (মহাবংশ পৃ. ১৩৫)—শিবানন্দ—মহেশ—মদনগোপাল—লক্ষ্মীনারায়ণ—ভবানন্দ রায়। কৃষ্ণচন্দ্রের 'রায়রায়ান্' উপাধি প্রবাদ কিম্বা কুলপঞ্জী দ্বারা সমর্থিত হয় না। 'কুলসারসংগ্রহে' (পৃ. ১৪৪-৬৩) 'বরাই'প্রকরণ বিস্তৃতভাবে মূল কুলপঞ্জী হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল।

প্রায় ১০০ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন ধরিলে কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম প্রায় ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে অনুমান করা যায়। সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহ পরশুরামের জন্ম ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই হইয়াছিল সন্দেহ নাই। অপর দিকে কমল মিশ্রের কারিকায় ধ্রুবানন্দ তৎপুত্র রমানাথ প্রভৃতির নামোল্লেখ করিয়াছেন (মহাবংশ, পৃ. ১৩৬—বিশুদ্ধ পাঠ হইবে "রমানাথো যত্নঃ কৃষ্ণো বলাইর্বনমালিকঃ)। কমল মিশ্রের পরে আরও ৮ সমীকরণ হইয়াছিল এবং ধ্রুবানন্দের গ্রন্থরচনাকাল আমরা ১৫০০—২৫ খ্রী. মধ্যে নির্ণয় করিয়াছি (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৮, পৃ. ১১০-১১)। সুতরাং রমানাথের জন্ম নিম্নতমকল্পে ১৫০০ খ্রী. ধরিয়া এবং ৪০ বৎসরে এক পুরুষ ধরিয়া পরশুরামের জন্ম হয় ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে এবং রামমোহনের উক্তি নিঃসন্দেহ তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত হয় নাই।

রামমোহনের পূর্ব্বপুরুষগণ বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। তন্মধ্যে একটি অজ্ঞাতপূর্ব্ব সম্বন্ধ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কমল মিশ্রের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র "বনমালী" অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার বিবরণে লিখিত আছে "শেষে কন্যা ঘণ্টাশ্রীনিবাশেন নীতা নাশ" (পরিষদের ২১০২ সংখ্যক পুথির ৪২।২ পত্র)। ঘণ্টা বলিতে সাবর্ণ গোত্র "ঘণ্টেশ্বরী" নামক শ্রোত্রিয়বংশকে বুঝায় এবং শ্রীনিবাস ঐ বংশীয় বিখ্যাত গৌড়ীয় বৈষ্ণব শ্রীনিবাসাচার্য্য ঠাকুর বটে। বুঝা যায়, মহাপ্রভুর সময়ে কিম্বা কিছুকাল পরেই রামমোহনের বংশে বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুরাগ জন্মিয়াছিল। প্রসিদ্ধ কুলীন হইয়া অপুত্রক বনমালীর পক্ষে শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনা এবং শ্রীনিবাসাচার্য্যের কালনির্ণয়ে এই নবাবিষ্কৃত তথ্যের বিশ্লেষণ আবশ্যক হইবে।

রামমোহনের বংশপরিচয়ে কোন কোন প্রবাদবচন এক্ষণে সংশোধনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আমরা দুই-একটির উল্লেখ করিতেছি। রামকান্ত রায়ের কুলভঙ্গকারী বিবাহ ব্রজবিনোদের "অন্তিম"কালে ঘটে নাই, অনেক পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল। রামমোহনের জন্মের অনেক পরেও ব্রজবিনোদ জীবিত ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পুরোহিত স্বয়ং নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুর হইতে পারেন না—তাঁহার পুত্র কি পৌত্রদের মধ্যে কেহ ছিলেন।* নারায়ণ ঠাকুর বিখ্যাত গ্রন্থকার ছিলেন, তৎকৃত একটি ব্যাকরণগ্রন্থ "ধাতু-রত্নাকর" ঠিক ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। তাঁহার সর্ব্বশেষ রচনা "স্মৃতিসার" নামক ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্রন্থমধ্যে ১৬০১ শকাব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (৩।২ পত্রে) এবং মলমাসপ্রকরণে ১৬০৩ শকাব্দে (১৬৮১ খ্রী.) ক্ষয়মাস "ভবিষ্যতি" বলিয়া উল্লিখিত আছে (৬১ পত্র)—সুতরাং এই গ্রন্থ নিঃসন্দেহ ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল এবং প্রবাদ অনুসারে ইহা অসম্পূর্ণ রাখিয়া নারায়ণ পরলোকগত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ প্রতিলিপি বস্তুতঃ আমরা কোথাও দেখি নাই। কৃষ্ণচন্দ্র রায় যৎকালে এ অঞ্চলে আগমন করেন তৎকালে বস্তুতঃ নারায়ণ জীবিত ছিলেন না। চৌধুরীদের কুলগুরুবংশীয় "হরিচরণ তর্কপঞ্চানন" নারায়ণের শ্বশুর (কিম্বা শ্বশুরভ্রাতা) ছিলেন—তিনিও কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অভ্যুদয়কালে জীবিত ছিলেন না। তাঁহার কোন বংশধরই কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রেরিত হইয়া থাকিবেন। নারায়ণ ঠাকুর স্মৃতিসার-গ্রন্থের প্রারম্ভ শ্লোকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন তাঁহার এই গ্রন্থ "বংশীরায়-সভাবরে" রচিত হয়। বংশী রায়ের পুত্র অনন্তরাম প্রকৃতই কৃষ্ণচন্দ্রের সমকালীন ছিলেন ধরা যায়।

২। মাতৃকুল

রামমোহন আত্মজীবনীতে যে ভাষায় মাতুলবংশের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার প্রতি আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা যেন এ স্থলে প্রকট হইয়া পড়িয়াছে এবং পিতৃকুলের অনতিশ্রেষ্ঠ সামাজিক ও বৈষয়িক সম্পদ্ অপেক্ষা তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলে যে পরমতত্ত্বের উপাসক শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক গুরু-সম্প্রদায়ের প্রতি গভীর অনুরাগ লুক্কায়িত ছিল তাহা অন্তিমকালে উচ্ছ্বাসের সহিত বিবৃত করিয়া গিয়াছেন:

> "But my maternal ancestors, being of the sacerdotal order by profession as well as by birth, and of a family than which none holds higher rank in that profession have up to the present-day uniformly adhered to a life of religious observances and devotion, prefering peace and tranquillity of mind to the excitements of ambition, and all the allurements of worldly grandeur."

---

* রামমোহনের সহিত জ্ঞাতিদের বিবাদকালে রায়বংশের পুরোহিত যিনি সাক্ষ্যদান করেন তাঁহার নাম ছিল "রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য" (সাহিত্যসাধক চরিতমালার জীবনী, ২য় সং, পৃ. ২৩ পাদটীকা)। তাঁহার নাম "কুলসারসংগ্রহে"র পঞ্চম খণ্ডে (২৯৭, পৃ. ৩৫৮) নারায়ণ ঠাকুরের বংশাবলীতে পাওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণের পিতা রামানন্দ বিদ্যাভূষণ ও তৎ-সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। রাধাকৃষ্ণের প্রপিতামহ কৃষ্ণদেব সুতরাং রামমোহনের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্রের সমকালীন ছিলেন। কৃষ্ণদেব নারায়ণ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র এবং পিতার ন্যায় একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ছিলেন—তাঁহার একাধিক স্মৃতিনিবন্ধ আমরা নানাস্থানে দেখিয়াছি। তিনিই প্রথম রায়বংশের পৌরোহিত্য স্বীকার করেন বলিয়া অনুমান করা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, নারায়ণ ঠাকুর কৃষ্ণনগরে "মহেশ পঞ্চাননে"র কন্যা বিবাহ করেন—মহেশ "সপ্তশতী" কুলিড্যাল-বংশীয় ছিলেন বলিয়া বহু কুলপঞ্জীতে

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের প্রধানতঃ চারিটি বৃত্তি ইংরেজ আমলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল—গুরুতা, যাজন, শাস্ত্র-ব্যবসায় ও বিষয়কর্ম্ম। ইংরেজ শাসনে বিজাতীয় আদর্শের প্রতিঘাতে বিষয়কর্ম্ম ব্যতীত ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তিত্রয়ের ঘোরতর অবনতি ঘটিয়াছে। বাংলাদেশের সর্ব্বত্র শত শত গুরুতা ব্যবসায়ী সম্ভ্রান্ত পরিবার বিদ্যমান-ছিল এবং প্রত্যেক পরিবারে উচ্চশ্রেণীর সাধক ও সিদ্ধ মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া অধ্যাত্মজীবনের আদর্শ সমাজে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। রামমোহনের সময়েও বাংলাদেশের গুরুতাব্যবসায়ী পরিবারসমূহের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁহার মাতুলবংশ—শ্রীরামপুর-চাতরার "দেশগুরু" ভট্টাচার্য্য বংশ। রামমোহন-বর্ণিত বিষয়-বৈরাগ্য এই বংশে বোধ হয় অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কারণ, ঢক্কানিনাদে আত্মপ্রতিষ্ঠার এই যুগেও কোনও মুদ্রিত গ্রন্থে এই বংশের বিবরণ আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। পশ্চিমবঙ্গের শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায় (ইংরেজ শাসনে যাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে) প্রায়শঃ চাতরার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন—খানাকুল সমাজের নায়ক নারায়ণ ঠাকুর বংশ, ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন গোষ্ঠী, নৈহাটীর ভট্টাচার্য্য বংশ প্রভৃতি। যে কারণে প্রতিভাশালী পণ্ডিতগণ ইঁহাদিগকে দীক্ষাগুরুপদে বরণ করিয়া ছিলেন তন্ত্রোক্ত-সাধনার সাফল্য-সূচক সে সকল বৃত্তান্ত আমরা জানিতে পারি নাই। কেবল হস্তলিখিত কুলপঞ্জীর সাহায্যে এই সম্ভ্রান্তবংশের একটি নামমালা আমরা সংকলন করিয়া দিলাম।

রামমোহনের পূর্ব্বপুরুষ কমল মিশ্র ১০৯ সমীকরণের কুলীন ছিলেন। ঐ সমীকরণভুক্ত ৯ জন কুলীনের মধ্যে বাৎস্যগোত্র কাঞ্জীবংশীয় "রামভদ্রাচার্য্য" একজন। তাঁহার কারিকা (মহাবংশ, পৃ. ১৩৬) আমরা বিশুদ্ধ পুথি হইতে সংশোধন করিয়া লিখিতেছি :

> কাঞ্জীশ্রীরামভদ্রস্ত লভ্যঃ কমলমিশ্রকঃ।
> বলাইরুচিতো বন্দ্যঃ, রমানাথোপানন্তকঃ।
> তৎসুতৌ ভুবি বিখ্যাতৌ কাঞ্জীকুলপ্রতিষ্ঠিতৌ ॥

এই রামভদ্র আদিকুলীন কানু অথবা কৃষ্ণের অধস্তন দশম পুরুষ। যথা, কানু (মহাবংশ, পৃ. ৩)—চন্দ্র (পৃ. ৫)—তেয়ী অর্থাৎ ত্রিলোচন (পৃ. ৮)—জনো (পৃ. ১৩-৪)—তপন (পৃ. ২১)—কৌতুক (পৃ. ৪০)—নরোত্তম (পৃ. ৬৮)—কৃষ্ণ (পৃ. ৯২)—প্রজাপতি (পৃ. ১১৫)—রামভদ্র। রামভদ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুরুষোত্তম বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বিখ্যাত সনাতন গোস্বামীর গুরু (বিষ্ণুদাস) বিদ্যাবাচস্পতির কন্যা বিবাহ করিয়া কুলভঙ্গ করেন ("বিদ্যাবাচস্পতেঃ কন্যা বৃঢ়া চ পুরুষোত্তমৈঃ", পৃ. ১১৫ বিশুদ্ধ অন্যত্র (পরিষদের ২১০২ সংখ্যক পুথির ৬০৮-৯ পত্র, পাঠান্তর "আনন্দাচার্য্য") দৃষ্ট হয়। রামমোহনের পূর্ব্বপুরুষ কমল মিশ্রের সহিত রামভদ্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লক্ষ্য করা আবশ্যক। বহু পূর্ব্ব হইতেই উভয় বংশে আদানপ্রদান চলিয়াছিল।

অনন্তাচার্য্যের দুই পুত্র, "চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী" ও গৌরীকান্ত (বংশাভাব)। "চন্দ্রশেখরো বং কমল মিশ্রস্য দৌহিত্র" (জয়ন্তীপুরের কুলপঞ্জী ৫১৭ পত্র)। তিনি "বং ন্যায়বাগীশ চক্রবর্ত্তী"র কন্যা বিবাহ করিয়া কুলভঙ্গ করেন। তাঁহার ৭ পুত্রের মধ্যে অনেকের বংশ ধলচিতা প্রভৃতি নানাস্থানে বিদ্যমান আছে। জ্যেষ্ঠপুত্র "শ্রীবল্লভ তর্কালঙ্কারে"র একমাত্র পুত্র "শিবরাম সিদ্ধান্ত" এবং তৎপুত্র "গোপাল পঞ্চানন"। গোপাল সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, একটি পুথিতে লিখিত আছে "অয়ং ব্রাহ্মণ পুণ্যাত্মা।" (পরিষদের পুথি ৬১২।১ পত্র)। তিনিও "নিকষে" কন্যাদান করিয়াছিলেন এবং খোড়গাছী, বোদখানা ও মহেশপুরে সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। হুগলী কালেক্টরীর ৩৫২৮১ নং তায়দাদ দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় চাতরার "গোপাল পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য' ২২৮॥৪ কাঠা পরিমাণ ভূমি ব্রহ্মোত্তর পাইয়াছিলেন এবং ১২০৯ সনে তাহার দখলকার ছিলেন তদীয় পৌত্র দেবীচরণ বিদ্যাবাচস্পতি ও প্রপৌত্র গুরুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য। গোপালের তিন পুত্র রামনাথ তর্কবাগীশ, নারায়ণ ন্যায়বাগীশ ও শ্যাম বিদ্যালঙ্কার। এই শ্যাম বিদ্যালঙ্কারই রামমোহনের মাতামহ ছিলেন ও অপুত্রক ছিলেন। লক্ষ্য করা আবশ্যক, কমল মিশ্রের দৌহিত্রবংশোদ্ভব রূপে শ্যাম বিদ্যালঙ্কার ব্রজবিনোদ রায়ের ভ্রাতৃসম্পর্কিত ছিলেন। রামনাথের পাঁচ পুত্র—নীলকণ্ঠ, রামভদ্র, রামশঙ্কর, রামরাম ন্যায়ালঙ্কার ও বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্ত, সকলেই নিঃসন্তান। কেবল বিষ্ণুরামের দত্তকপুত্র রামদাস বিদ্যালঙ্কারের অধস্তন বংশধারা বিদ্যমান আছে। নারায়ণের দুই পুত্র দেবীচরণ বিদ্যাবাচস্পতি ও কৃষ্ণচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত। কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র গুরুপ্রসাদ নিঃসন্তান। দেবীচরণের ধারা বিদ্যমান আছে।

উপসংহারে বক্তব্য, অদ্য প্রায় ১০০ বৎসর যাবৎ ঘটক-সম্প্রদায় ও কুলশাস্ত্রের আলোচনা লোপ পাইয়াছে; অথচ শত শত পরিবারের বংশাবলী মুদ্রিত হইয়াছে ও হইতেছে এবং তন্মধ্যে বহু স্থলে কৃত্রিম বস্তু প্রামাণিক বলিয়া চলিতেছে। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, স্বয়ং ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, আশুতোষ ও রামানন্দ প্রভৃতির পূর্ব্বপুরুষের নামমালা যাহা মুদ্রিত হইয়াছে তাহাও ভ্রমশূন্য হয় নাই, অন্যের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। ইহা কল্যাণকর বিষয় নহে

ভূমি-ক্ষয় ও "বনমহোৎসব"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

ভূমি-ক্ষয় বর্ত্তমানে জগদ্ব্যাপী সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। আমেরিকা, এশিয়া এবং আফ্রিকায় এই সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে; ইউরোপের স্থানে স্থানেও এই সমস্যা দেখা দিয়াছে। আফ্রিকার ভূমি-ক্ষয় সম্বন্ধে জেনারেল স্মাটস্ বলেন, "ভূমি-ক্ষয়ই এই দেশের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সমস্যা, যে-কোন রকমের রাজনীতি অপেক্ষা বৃহত্তর।"*

দক্ষিণ ভারতের পদুকটাই ষ্টেট দরবারের মতে ভূমি-ক্ষয় নিবারণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতি অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজন।

প্রধানতঃ দুই প্রকারে ভূমি-ক্ষয় ঘটিয়া থাকে; বাতাস এবং জলস্রোতের প্রকোপের ফলে। আমাদের দেশে দ্বিতীয় কারণের গুরুত্বই বেশী। তবে স্থানে স্থানে বাতাসের ফলে ভূমি-ক্ষয়ের পরিমাণ কম নহে। আমেরিকায় বাতাসের প্রকোপে ভূমি-ক্ষয়ের পরিমাণ খুবই অধিক। ষ্টুয়ার্ট চেজের *"Rich Land Poor Land"* নামক পুস্তকে এই কাহিনীটি আছে—নেব্রাসকারের একজন বৃদ্ধ কৃষক ধূলা-ঝড়ের (dust storm) সময় তাহার দ্বারমণ্ডপে বসিয়াছিল। তাহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, সে এত গভীর মনোযোগের সহিত কি দেখিতেছে, সে উত্তর দিয়াছিল কানসাস্ কৃষি-ক্ষেত্রসমূহ কেমন এক-একটি করিয়া উড়িয়া যাইতেছে সে তাহাই গণনা করিতেছে।

জলের প্রবল স্রোতের ফলে ভূমি-ক্ষয় ধীরে ধীরে সংসাধিত হয়। প্রথমে জমির উপরিভাগের একটি পাতলা স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তখন অধিকাংশ লোকের গোচরে ইহা পড়ে না। ক্রমশঃ স্তরের পর স্তর ধৌত হইয়া যায়, পরে এক ফুটের কাছাকাছি মাটি ধৌত হইয়া যাইবার পর এমন একটি স্তর পাওয়া যায় যাহাকে আমেরিকাবাসিগণ 'শক্ত স্তর' বলে; এই স্তরকে সম্পূর্ণরূপে অনুর্ব্বর বলা যায়। ইহাতে কিছুমাত্র "গাছের খাদ্য" থাকে না। ক্রমশঃ জলস্রোতের ফলে প্রথমে অসংখ্য নালার (gullies) সৃষ্টি হয়; পরে এই সকল নালা আঠার-কুড়ি ফুট পর্য্যন্ত গভীর হইয়া যায়। আমাদের দেশে অনেক স্থানেই এই ভাবে গভীর নালার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার ফলে অনেক স্থানেই প্রস্তরাকীর্ণ ভূমির উদ্ভব হইয়াছে। পদুকোটাই ষ্টেটে এই দুই প্রকারেরই উদাহরণ আছে।

* "Erosion is the biggest problem confronting the country; bigger than any politics."

"স্বাভাবিক ভূমি-ক্ষয়" (natural erosion) যে ঘটিতেছে না, তাহা নহে; কিন্তু মানুষের দোষে কি ভাবে ভূমি-ক্ষয়ের সূত্রপাত হয় তাহার একটি উদাহরণ পদুকোটাই ষ্টেটের ভূমি-ক্ষয়ের ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়। ষ্টেটের রেসিডেণ্ট ষ্টেটের অরণ্য, বন, জঙ্গল ইত্যাদির উচ্ছেদ করিয়া আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বৰ্দ্ধিত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। ১৮২৬ সালে গবর্ণরের এই সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে রাজা তাঁহাকে জানাইলেন যে, অরণ্য, বন, জঙ্গল প্রভৃতির উচ্ছেদ সাধন প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে; চাষ-আবাদ চলিতেছে; কোন কোন স্থানে "পাতলা জঙ্গল" (thin wood) এখনও কিছু কিছু আছে। ইহার ফলে বর্ত্তমান সময়ে পদুকোটাই ষ্টেটের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ:

It is not too much to say that, unless effective measures are taken to check erosion in our State, within a measurable time—it may be a century, it may be more, or less—a very large part of the high grounds, such as are common in the Alangudi and Tiriumayyam talukas...will have been reduced to a desert of bare and eroded rock, scarred by horrifying ravines, incapable of supporting any form of life,—human, animal or vegetable; while all the tanks will have been silted up, and most of the cultivable lands destroyed by the deposit of infertile soil.

ইহার মোটামুটি তাৎপর্য্য এই যে, যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভূমি-ক্ষয় নিবারণের জন্য কোন প্রকার কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন না করা হয়, তাহা হইলে ষ্টেটের উচ্চ ভূমির অধিকাংশ পরিমাণ মরুভূমিতে পরিণত হইবে; কোন প্রকারের জীব (মানুষ, জন্তু, জানোয়ার, উদ্ভিদ) উহার উপর বৰ্দ্ধিত হইতে পারিবে না। জলাশয়সমূহ বুজিয়া যাইবে এবং আবাদী অধিকাংশ জমি অনুর্ব্বর মাটির দ্বারা নষ্ট হইয়া যাইবে।

অনেকের ধারণা, জলস্রোতের সঙ্গে যে মাটি ধুইয়া আসে এবং জমিতে সঞ্চিত হয় তাহা সকল ক্ষেত্রেই উর্ব্বর পলিমাটি। ইহাও সত্য যে, মিশরের নীল নদী এবং চীন দেশের বহু বড় বড় নদীর স্রোতের সঙ্গে যে পলিমাটি ধুইয়া আসে তাহা জমির উর্ব্বরতা শক্তি বাড়ায়। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে এই মাটি উর্ব্বরা নহে। জ্যাকস্ এবং হোয়াইট তাঁহাদের *The Rape of the Earth* নামক পুস্তকে এইরূপ বলেন:

The water breaks down the transported soil-

crumbs into their constituent particles of sand, silt and clay, thereby destroying most of the characteristic soil properties and fertility, so that even when the eroded particles are re-deposited on cultivable land, they have lost much of their productive capacity.

অর্থাৎ, জলের স্রোতে প্রবহমাণ মাটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। ইহার ফলে মাটির উর্ব্বরাশক্তি বহুল পরিমাণে নষ্ট হয়। এইরূপ মাটি যখন জমিতে সঞ্চিত হয় তখন তাহার উৎপাদিকা-শক্তি খুবই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

গো-মহিষাদি পশুকর্তৃক চালিত যানের চাকার দ্বারাও ভূমি-ক্ষয় ঘটিয়া থাকে। লর্ড হেলী আফ্রিকার ভূমি-ক্ষয় সম্বন্ধে বলেন যে, যেখানে ভূমি-ক্ষয়ের সূত্রপাত হইয়াছে, সেখানকার রাস্তায় গো-মহিষ প্রভৃতির যানের চাকার দ্বারা প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগভীর নালার সৃষ্টি হয়, পরে ঐ সকল নালা গভীর খাতে পরিণত হয়।

'বন-মহোৎসব' আরম্ভ হইয়াছে এবং এখনও চলিতেছে। বৃক্ষরোপণ বা বন-মহোৎসবের আবশ্যকতা আছে; কিন্তু এলোমেলো ভাবে বৃক্ষরোপণের বিশেষ সার্থকতা নাই। তবে ইহাতে ব্যক্তিগত কিছু লাভ হইতে পারে অর্থাৎ কেহ দু-একটা ফলের গাছ রোপণ করিলে তিনি নিজে উপকৃত ও লাভবান হইবেন। সেইরূপ কেহ কেহ নিজের উপকারের জন্য দুই-একটা জ্বালানি কাঠের গাছ রোপণ করিতে পারেন। কিন্তু সমষ্টিগত উপকারের জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনার প্রয়োজন।

ভূমির ক্ষয় নিবারণ করিয়া অনুর্ব্বর জমিকে উর্ব্বর করাই বন-মহোৎসব বা বৃক্ষ-রোপণের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং এ সম্পর্কে কার্য্যকরী উপায় অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। এই সম্বন্ধে গত ১৬ই আষাঢ়ের "খাদ্য উৎপাদন" পত্রিকায় 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'-এর সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কর্তৃপক্ষের বিশেষ ভাবে প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। তিনি লিখিয়াছেন

> 'বনমহোৎসব' একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠানে দাঁড়াইয়াছে। বাংলাদেশে বনমহোৎসবের সার্থকতা কি? কলিকাতা মহানগরীতে লাট ভবনে, বিস্তীর্ণ পার্কে বা বিদ্যালয়ের হাতায় মধ্যে বৃক্ষরোপণই কি বনমহোৎসব, না ইহার অতিরিক্ত আর কিছু? এই উৎসব দ্বারা বাঙালী জাতির যদি সত্যিকার উপকার সাধন করিতে হয় তাহা হইলে শহরের পরিবর্ত্তে পল্লীর দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে। আবার তরুলতায় সমাকীর্ণ পল্লী অঞ্চলে নয়, যেখানে জলাজমির প্রাচুর্য্য বা যেখানে জমি ঊষর এবং ক্ষয়প্রাপ্ত সেই সব স্থলে এই উৎসব প্রতিপালিত হইলেই তবে ইহার সার্থকতা।
>
> এই প্রসঙ্গে আমি দুইটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে পারি। লাহোরের সন্নিকট জলাজমিতে বড় বড় ইউকেলিপটাস বৃক্ষ জন্মাইয়া ও অঞ্চল উঁচু এবং কর্ষণোপযোগী করা হইয়াছে। গত ১৯৩৬ সন হইতে এই পনর বৎসরের মধ্যে কানপুর-টুণ্ডলা রেলপথের দুই ধারের প্রশস্ত ঊষর জমিতে বাবলা ও পলাস বৃক্ষ রোপণ করাইয়া এবং এগুলি যথারীতি বাড়িতে দিয়া ঐ অঞ্চলকে উর্ব্বর করিয়া তোলা হইয়াছে। বাংলাদেশে জলা ও ঊষর জমির অভাব নাই; এ সকল জমিতে জল নিকাশ ও উর্ব্বরতার বৃদ্ধির পক্ষে উক্ত রূপ পন্থা অবলম্বন সমীচীন কিনা, সুধীজনে তাহা বিবেচনা করিবেন। বনমহোৎসব পালনের সময় জনসাধারণ এবং কর্তৃপক্ষ কার্য্যকরী পন্থা অনুসরণ করিবেন আশা করি।

বাবুইয়ের বাসা

শ্রীকালিদাস রায়

বার বার ছিঁড়ে পড়ে, উড়ে যায় ঝড়ে,
তবুও বাবুই পাখী পুনঃ বাসা গড়ে।
নৈরাশ্যে কাতর নয় দু'হাতেরো তরে,
শোক সে ত করে নাকো বসি শাখা 'পরে।
শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, নাই তার ক্ষোভ,
নাই তার কুলায়ের আরামেরো লোভ।
কুলায় থাকিতে সে ত জলে ভিজে মরে,
বার বার তাহে বাসা তবু তাই গড়ে।
দু'দিনের তরে তার কেন তবে বাসা?
শুভ্রচ্ছদ-তলে রাজে ভ্রূণরূপে তার সব আশা
ও বাসায়। তারি তরে বার বার করে যাওয়া-আসা।
মাতৃধর্ম্ম পালনের তরে এ কি তবে
যার মাঝে সে বিহঙ্গ-জীবনের সার্থকতা লভে?

বিধাতার অভিসন্ধি এ কি সৃষ্টিধারা রাখিবার?
বাবুই-'করণ' শুধু কিছু নাই কর্তৃত্ব তাহার?
তারো চেয়ে ঢের গূঢ় কথা,—
এখনো যে ডিম্ব শুধু তার তরে কিসের মমতা?
ক'দিনের তুচ্ছ সে জীবন,
তার তরে রহিয়াছে তরুশাখা, অনন্ত গগন।
তার তরে নয় এই বাসা,
সর্ব্বজীব পুষে বুকে অমৃত-পিপাসা।
বীজরূপে অমরতা ভ্রূণমাঝে বাসায় আসীন
ডিম্ব হ'তে ডিম্বান্তরে সেই ধারা চলে চিরদিন।
ক্ষুদ্র পাখী পোষে সেই আশা,
অমরত্ব তরে পাখী বার বার গড়ে তার বাসা।

বন্দী যারা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১২

সমস্ত চেতনার ফাঁকে একটি চিন্তা স্পষ্ট হয়ে প্রবল হয়ে উঠছে। সেটি কিছুতেই মন থেকে সরে যাচ্ছে না। লেখাপড়ার ফাঁকে, অবসর মুহূর্ত্তে, খাবার সময়ে, নিদ্রার পূর্ব্বে মনকে অহরহ খোঁচা দিচ্ছে। যে করে হোক স্বাবলম্বী হতে হবে। নিজের চেষ্টায়—নিজের শক্তিতে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে না পারলে মনের গ্লানি ঘুচবে না। সত্যই ত পৃথিবীতে কারও কর্ত্তব্যের দায়ে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে চিরজীবন বেকার থাকতে পারে না কেউ। যে পারে তেমন ভাবে গলগ্রহ হয়ে থাকতে তার পৌরুষে সন্দেহ আসা স্বাভাবিক। স্বকৃত উপার্জ্জনের আনন্দ—সে যে কি আনন্দ তা প্রভাত মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছে। নিজের আশার সমাধি রচনা করেও পরের মুখে যেটুকু হাসি ফুটানো যায়—তার আলোয় জীবনের পথ বহু দূর পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত হয়—সেই পথে অতঃপর এগিয়ে যাওয়াও সহজ।

কেন—চেষ্টা করলে কি ছোট মত কাজ কিছু করা যায় না? টুইশানি যদি নাই জোটে—স্বাধীনবৃত্তিতে নিজের অভাব-অনটন মিটিয়ে সে কি বিদ্যা অর্জ্জনের পথ প্রশস্ত করতে পারে না?—কত দৃষ্টান্তই ত স্মৃতিপথে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

এই ত সেদিন—দীপাদের বাইরের ঘরে বসে গল্প করছে—এমন সময় ওদের খবরের কাগজ সরবরাহকারী ছেলেটি একতাড়া কাগজ নিয়ে দাঁড়াল হাসিমুখে। বরাদ্দের কাগজখানি টেবিলের উপর রেখে অনিমেষকে বললে, স্যার একটি নিবেদন আছে।

অনিমেষ বললে, নিবেদন!—

আজ্ঞে হাঁ—কাল থেকে আমি আর হয়তো আসতে পারব না—তাই।

মানে?

মানে—ছেলেটি ঘাড় নীচু করে বললে, একটা চাকরী পেয়ে গেলাম—

চাকরী—কোথায়?

বেঙ্গল সেক্রেটারীয়েটে—মাইনেটা ভাল বলে লোভে পড়ে গেছি স্যার। নিয়েছি চাকরীটা।

সে কি—ওখানে ত গ্র্যাজুয়েট ছাড়া—

গেলবার পাস করেছি। এম-এটা ভাবছি আর পড়ব না। কি হবে পড়ে—ব্যাক করবার লোক না থাকলে কত দূরই বা এগুতে পারি!

অনিমেষ বিস্মিত হয়ে বললে, তুমি খবরের কাগজ বিক্রী করে পড়া চালিয়ে যাচ্ছ!

কি করব স্যার—উপায় ত নেই। সকালে ঘণ্টা দুই এই কাজ—বৈকালে এক ঘণ্টা একটি টুইশানি—কোন রকমে চলে যাচ্ছে। যাই হোক স্যার কাগজ আপনি ঠিকমত পাবেন। বলে ডাকলে, কিশোর, এদিকে এস।

ওরই মত আধময়লা হাফসার্ট গায়ে—মালকোঁচা মারা খালি পা—এক কিশোর ছেলে ঘরে ঢুকল অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে। ছেলেটির মুখখানিতে দারিদ্র্যের ছাপ—দু' হাতে গোছা-করা অনেকগুলি কাগজ। হাত জোড়া বলে—ছেলেটি ঈষৎ মাথা নামিয়ে অনিমেষদের প্রণাম করলে।

এই কিশোর কাল থেকে আপনাদের কাগজ দেবে। ঠিক সময়েই দেবে। এও ম্যাট্রিক দিয়েছে এবার—আরও কিছু দূর পড়তে চায়।

প্রভাত সম্ভ্রম-মাখানো বিস্ময়ে বহুক্ষণ চেয়েছিল ছেলে দুটির দিকে। অত্যন্ত সাধারণ ছেলে—খবরের কাগজ ফিরি করে জীবিকা অর্জ্জন করে যারা তাদের চেয়ে কোন অংশে উজ্জ্বল নয়। এদের সম্বন্ধে তার ধারণাটা ছিল অন্য রকম। এদের উপর শ্রদ্ধা ত নয়ই—বরং অবজ্ঞার ভাবই পোষণ করেছে এতকাল। এরা সমাজের কতটুকুই বা! নিজের উদরপূর্ত্তি করে—বৃহৎ এক সংসারের বোঝা চাপিয়ে যায় সমাজের উপর। জাতির দারিদ্র্য হয়তো এই কারণেই বেড়ে চলেছে···

আজ ছেলে দুটি অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ওরা পরিশ্রমের মর্য্যাদা বহন করে অনেক উপরে উঠে গেছে। ওরা পর-শ্রমজীবী নয়—পর-অন্নভুকও নয়। ওরা পথ চলবার কালে সঞ্চয় করেছে পাথেয়—সেই পাথেয়ে অতিক্রম করছে দীর্ঘ পথ। হয়তো সেই কারণেই পথের ক্লান্তি ওদের অভিভূত করতে পারে নি—ভুয়া-মর্য্যাদা বোধে—নিজেদের বিব্রত বা বিপদগ্রস্ত করে নি। এ কাজ প্রভাতও ত এতকাল করতে পারত।

উৎসাহে উঠে বসল সে। হাঁ—এ কাজ এখনও সে করতে পারে। কিসের লজ্জা? কেন দ্বিধা?

ফুটপাথের উপর খান কয়েক মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা বিছিয়ে একটি ছেলে বসেছিল। প্রভাত এসে বসলে তার সামনে। কথাটা সোজাসুজি পাড়তে লজ্জা হয় বই কি। ও একখানা মাসিক পত্রিকা তুলে নিলে। সেখানার কয়েক পাতা উল্টে—আর একখানা তুলে নিলে। সেখানা রেখে আর একখানায় হাত দিয়েছে—বিক্রেতা যুবক বললে, কোন পত্রিকা খুঁজছেন স্যার?

পত্রিকা! এক মুহূর্ত থেমে সমস্ত সঙ্কোচ জয় করে প্রভাত বললে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব—কিছু মনে করবেন না ত!

যুবক বললে, বলুন।

এই—কাগজপত্র বিক্রী করে কি রকম উপায় হয়—মানে আপনার উপার্জ্জনের কথা আমি জানতে চাইছি না—

জানলেনই বা! ছেলেটি হাসিমুখে জবাব দিলে। যাঁরা আপিসে কাজ করেন তাঁদের মাইনের কথা জিজ্ঞাসা করা হয়তো অভদ্রতা—

প্রভাত অপ্রতিভ হয়ে বললে, মাপ করবেন আমায়—

না না, এতে মাপ করবার কথা কিছু নেই—আমরা এতে কিছু মনে করি না। তবে সব ক্ষেত্রে সত্যি কথা হয়তো সবাই বলতে পারেন না। তবু কি জানেন স্যার—যাঁরা চাকরী করেন তাঁরা আয়টা বলেন বাড়িয়ে—হয়তো মান-মর্য্যাদা বাঁচাতে—আমরা যারা খবরের কাগজ বেচি ছোটমত ষ্টল সাজিয়ে বসি—পানের দোকান কি চায়ের দোকান—কি লণ্ড্রি খুলি—আমরা কমিয়ে বলি ইন্‌কামের কথা। কে জানে স্যার কে কোন বেশে আসেন—ইন্‌কাম ট্যাক্স বলে একটি ভয়ের ব্যাপার ত আছে! বলে ছেলেটি হাসতে লাগল। প্রভাতও হাসলে।

হাসির মধ্য দিয়ে ওরা পরস্পরের নিকটে এল। প্রভাত বললে, সকালে ঘণ্টা দুই যদি এ কাজ করি আমার কত উপার্জ্জন হতে পারে?

সে বলা মুশকিল স্যার। কামাই করা—যে যার কৃতিত্বে। এই কাজে আগে কি কম বাধা ছিল? একচেটে অধিকার নিয়ে যারা কায়েম হয়ে ছিল তাদের হাতে মার পর্য্যন্ত খেতে হয়েছে—গাল অপমান ত নিত্য পাওনার মধ্যে! আমরা হটি নি তাই টিকে আছি। এক শ' খানা কাগজ কাটাতে পারলে আপনার দৈনিক আয় হবে তিন টাকার উপর—শতকরা পঁচিশ টাকা কমিশন।

প্রভাত বললে, আমায় ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?

নিশ্চয়। কাল ভোরবেলা আসবেন, আপনাকে ডিস্‌ট্রি-বিউটারের কাছে পরিচয় করিয়ে দেব। আপনি যেখানে থাকেন সেখানেও অন্ততঃ পঞ্চাশখানা কাগজ কাটাতে পারবেন না?

সঙ্কোচ কেটেও কাটতে চায় না। এই কাজ পরিচিত মহলে করা সম্ভব কি? ওদের গলিতে কাগজ বয়ে বেড়ানো —সবাই অবাক হয়ে ভাববে—লেখাপড়া শিখে প্রভাতের এমন মতিগতি কেন হ'ল! প্রতি বাড়ীতে কাগজ বগলে করে সাধ্য-সাধনা—ভাবতেই কানের ডগা গরম হয়ে উঠছে—মাথার মধ্যে কে যেন হাতুড়ি ঠুকছে সজোরে। নিকট ও দূরের আত্মীয় প্রতিবাসী সবাই বিকারভরা দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে প্রভাতের দিকে, সবাই আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে—কিংবা মনে মনে হাসছে—বলছে, দেখ দেখ একবার ছেলেটির মতিগতি! পাস করে চাকরি নিলে না—পাঁচ জনের খোসামুদি করে বেড়াচ্ছে—দোরে দোরে।

ভাবতে ভাবতে ও গোলদীঘিতে এসে বসলে। না—পরিচিত মহলে এ কাজ ও করতে পারবে না। তবে মনে ওর জোর আছে—এই কাজ ও করবেই। যেখানে চেনা আত্মীয় নাই তেমন জায়গায় ও যাবে। সেখানে ওকে নিয়ে কারও মাথাব্যথা নাই। সমুদ্রের কূলে—নামহারা অসংখ্য বালুরাশির মধ্যে—একটি বালুকণা যদি ঢেউয়ের তাড়নায় সহসা উৎক্ষিপ্ত হয়ই—সেই অসংখ্য বালুকারা বিস্ময় বোধ করে না—প্রতিবাদ করে না। নামহারাদের দল বৃদ্ধি করে সে তাদের গোত্রেই অস্তিত্ব লোপ করে দেয়।

এই তো গোলদীঘিতে অসংখ্য ফেরিওলা—অসংখ্য প্রকারের জিনিস ফেরি করে বেড়াচ্ছে। ওদের পায়ের জড়তা নাই—কণ্ঠের স্বরে লেশমাত্র অস্পষ্টতা নাই। ওদের চোখের সামনে—পরিচিত—অর্দ্ধপরিচিত—ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ লোকেরাও হয়ত একাকার হয়ে মুছে গেছে। ওদের দৃষ্টিতে ক্রেতারূপী মানুষরা ভিড় জমিয়েছে—ওরাও স্বচ্ছন্দ গতিতে—সহজ স্বরে বিক্রেয় জিনিসের গুণগান করে সহজেই চলে যাচ্ছে জনতার মধ্য দিয়ে।

বাবু—আনন্দবাজার নেবেন—আনন্দবাজার। চার পয়সায় আনন্দবাজার।

চার পয়সায়! প্রভাত বিস্ময়ে প্রশ্ন করলে, কমিশন বাদ দিয়ে তোমার থাকবে কি?

কি করব স্যার—এই চারখানা কাগজ আবার আপিসে ফেরত দিতে যাব—মজুরি পোষাবে কেন স্যার?

পাশে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। তিনি হেসে বললেন, খুব পোষাবে মজুরি—কাগজখানা ক' হাত ফিরল হে?

ছেলেটি উত্তর না দিয়ে কাগজ নিয়ে চলে গেল।

প্রভাতের বিস্ময় কাটে না দেখে ভদ্রলোক বললেন, এক-খানা কাগজে পাঁচ আনা উশুল করাও আশ্চর্য্য নয় মশায়—দশটি হাত ফিরলেই—ব্যস। ভাঁজ না ভেঙে—এক ঘণ্টার মধ্যে তিন খানা কাগজ পড়ি মশাই—ছ'টা পয়সা নগদ নিয়ে যায়। সে কাগজগুলো কি আর বিক্রী হয় না—না কম পয়সায় বেশী কাগজ পড়বার বুদ্ধি একা আমিই ধরি! জানা চাই মশায়—জানা চাই—খেলতে জানলে কাণা কড়ি নিয়ে খেলা যায়।

হো-হো করে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সে হাসির রেশ প্রভাতের কানে লেগে রইল।

শোবার সময় ও ভাবলে, বৈজ্ঞানিকরা যে বলেন পারি-পার্শ্বিকের প্রভাবে গড়ে ওঠে প্রাণী—জীবন ধারণের তাগিদে ওদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন হয় নিয়ন্ত্রিত—এটা অত্যন্ত সত্য

কথা। জিরাফের অস্বাভাবিক দীর্ঘ গ্রীবার মধ্যে যে তত্ত্বই নিহিত থাক—উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে মানুষকে অনেক উপায় এবং অনুপায় বেছে নিতে হয়ই। একখানি আট পয়সার ভাষ্য মূল্যের কাগজকে হাত ফিরিয়ে চার আনায় দাঁড় করানোর মধ্যেও এই নীতি সক্রিয়। বহু পোষ্যভারগ্রস্ত মানুষই এই ভাবে উদ্ভাবন করেছে আয় বৃদ্ধির পথ—নিজেকে এবং আশ্রিতদের বাঁচাবার জন্ত।

ঘুম আসবার আগে প্রভাতের সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেল।

তখনও ভোরের আলো ভাল করে ফোটে নি—সুনয়নী কলতলায় সবেমাত্র নেমেছেন—প্রভাতের ঘরের দুয়ার খোলার শব্দ হ'ল। জামা কাপড় পরে প্রভাত বেরিয়ে আসছে।

একি—ভোরবেলায় কোথায় চললি তুই?

আসছি। হাঁ দেখ—আমার জন্ত চা রেখ না—আসতে হয়ত দেরী হবে।

কিন্তু—

এসে বলব—

কে জানে বাপু আজকালকার ছেলেদের ধরণ। ওরা আপন হয়েও থাকে পরের মত। আমাদের কালে এসব রীত ছিল না। আপন মনে গজ গজ করতে লাগলেন সুনয়নী।

প্রায় দশটার সময় প্রভাত ফিরে এল। ওর মুখখানি শুকিয়ে গেছে—চুলগুলি রুক্ষ এলোমেলো—মনে হচ্ছে হাওয়ার প্রতিকূলে অনেকখানি পথ হেঁটে এসেছে।

রান্নাঘর থেকে সুনয়নী দেখলেন ওর মূর্ত্তি। লক্ষ্মীকে ডেকে বললেন, লক্ষ্মী—প্রভাতকে জিজ্ঞেস কর ও চা খাবে কিনা। ওর জন্ত চা করা আছে—তা হলে গরম করে দিই।

না—চা খাব না।

লক্ষ্মী ঘরে ঢুকে বললে, কোথাও চা খেয়ে এসেছ বুঝি? ওকি একরাশ কাগজ কেন—বলে কৌতূহলভরে এগিয়ে এসে সেগুলি নাড়তে লাগল—আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতী, অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড···ব্যাপার কি বড়দা—লাইব্রেরি খুলবে বুঝি?

হুঁ—এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়া দেখি।

জল এনে দিয়ে লক্ষ্মী বললে, সত্যি—এত কাগজ কি হবে?

কাগজের ব্যবসা করছি যে। লক্ষ্মীর বিস্ময় কাটে না দেখে প্রভাত হেসে ফেললে। বললে, দূর বোকা—বুঝতে পারলি নে? এইগুলি বিক্রী করে—

কাগজ বেচবে তুমি? ওই হকারদের মত হেঁকে হেঁকে।

ক্ষতি কি। তবে হাঁকটা ঠিক গলা দিয়ে বেরুচ্ছে না রে—তাই এত কাগজ জমে গেল।

সত্যি? না—বড়দা না—এ কাজ তুমি করবে কেন? লক্ষ্মীর কণ্ঠে অনুনয়।

প্রভাত বললে, মান খোয়া যাবে? আমাদের মান ম-স্ত বড় নয় রে?

লক্ষ্মী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, কেন নয়—মান বুঝি শুধু টাকা-পয়সায়?

প্রভাত বললে, হুঁসিয়ার আছিস বটে—চোখ তোর খোলা নেই। যাই হোক—শোন একটা গল্প।

না—এ কাজ তুমি করবে কেন—আমি বলছি মাকে।

লক্ষ্মীর হাত ধরে প্রভাত বললে, লক্ষ্মী বোনটি—এ কথা যদি বলিস আমাকে বাড়ী ছেড়ে পালাতে হবে। কেন জানিস, আমি পড়তে চাই আরও—চাকরি আর পড়া একসঙ্গে তো হয় না—বাবাও কিছু যোগাতে পারবে না পড়ার খরচ—আমি চাইও না তা। এই করে কত ছেলে বি-এ, এম-এ পাস করে কত টাকা উপার্জ্জন করছে। তোকে একটা গল্প বলছি শোন।

সুনয়নীও ঘর থেকে হেঁকে বললেন, দুটিতে মুখোমুখি হয়েছ, কি গল্প জুড়ে দিয়েছ। খাওয়া-দাওয়ার পাট সেরে আমাকে একটু রেহাই দাও—তারপর যত পার পেট খুলে গল্প করো।

প্রভাত বললে, তুই ঠাঁই করগে—আমি চট করে নেয়ে নিই। কিন্তু খবরদার—এ কথা যেন ফাঁস করিস নে।

হাঁ—তোমার সব কথা ফাঁস করে বেড়াই কি না। যাতে তোমার অসম্মান হয়—

হাঁ—যাতে সম্মান হয়—সে কথাগুলি অবশ্য প্রচার করার দোষ হয় না।

যাও।

ওরে শোন—মহাভারতে আছে—যুধিষ্ঠির অভিশাপ দিয়েছিলেন স্ত্রীজাতিকে যে তাঁরা যেন কোন গোপন কথা অপ্রকাশ রাখতে না পারেন।

জানি গো—জানি—তোমার আর ব্যাখ্যানাতে কাজ নেই। চটপট নেয়ে নাও—নইলে বকুনি খাবে মা'র কাছে।

প্রথম দিনের অভিজ্ঞতায় প্রভাত বুঝলে—এ ভাবে কাজ করা সম্ভব নয়। পরিচিতের সান্নিধ্য এড়িয়ে কাগজ বিলি করায় সময় নষ্ট হয় অনেকখানি। আর অপরিচিত জায়গায় কাগজের নাম হাঁকলেই শুধু চলে না—টাটকা মজাদার ও চমৎকার খবর বেছে নিয়ে রসাল ভাষায় সাহায্যে সেগুলি প্রচার করাও চাই। কেউ কাগজ কেনে যুদ্ধের উত্তেজনা উপভোগ করতে—কেউ খেলার ভক্ত, সিনেমার বিজ্ঞাপনে চোখ বুলিয়ে আনন্দলাভ করে এমন পাঠকের সংখ্যাও কম নয়। শেয়ার মার্কেট আর রেস—এদের পৃষ্ঠপোষকও যথেষ্ট। আদালতের বিচিত্র কাহিনী আজকাল সংক্ষিপ্ত হয়েছে—কিন্তু পার্টি পলিটিক্সের ভাষণে ও প্রতিবাদে সংবাদপত্র ভরে উঠছে।

সর্ব্বোপরি ভারত-বিভাগের উত্তেজনা ও স্বাধীনতালাভের আনন্দ—নিতান্ত মিতব্যয়ীকেও একখানি সংবাদপত্র কিনতে বাধ্য করাচ্ছে। কিন্তু কাগজের বিক্রয় নির্ভর করে—সংবাদ পরিবেশনের দক্ষতার উপর। কোন কোন কাগজের প্রচার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। মুশকিল এই—সেই কাগজগুলিই নূতন বিক্রেতার ভাগ্যে কম পড়ে।

সে যাই হোক—কাগজ বিক্রয়ের এই লজ্জা প্রভাত কিছুতেই কাটাতে পারছে না। এ কাজ হীন কাজ নয় ও মনে মনে বিশ্বাস করে—তবু কিছুতেই প্রাণের সাড়া পায় না কেন? কাগজের তরীতে যে লেখক-গোষ্ঠী স্থান পেয়েছেন, সুযোগ ঘটলে তাঁদের পাশে প্রভাতও কি একটু ঠাঁই পেত না? ওর স্পর্শকাতর বৃত্তিতে কেবলই আঘাত বাজছে—এ কাজ লেখকের নয়—লেখকের নয়। লেখক আর যাই হোন জীবন ধারণের জন্ত পানের দোকান খুলতে পারেন না—আনাজ মাথায় করে হাটে বসতে পারেন না—কাগজের হকারি কিংবা ইন্সিওরেন্সের দালালিও তাঁদের জন্য নয়। তাঁরা বলেন, শুধু অন্নে মানুষ বাঁচে না—অন্নের চেয়ে মূল্যবান জিনিস আছে যা জাতিকে গৌরবের শিখরে তুলে দেয়—সভ্যতা ও সংস্কৃতির অমৃতধারা পান করিয়ে অমর করে তোলে—অনন্ত কালপ্রবাহে নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে বাঁচিয়ে তুলে দেয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায়—সেই অমূল্য জিনিস পরিমাণে যে যতটুকুই দিক—সে কেন জীবনের জঞ্জাল বাড়াতে এই স্থূল আহার আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে মরবে অনর্থক!

বৈকালে কাগজগুলি নিয়ে সে আবার বার হ'ল। কতকগুলি কাটল—বাকিগুলি ফেরত দিলে বণ্টনকর্ত্তাকে। তিনি ওর যথাবিহিত করবেন।

হিসাব করে দেখলে—দশ আনা লাভ হয়েছে। লাজুক মুখচোরা ছেলের প্রথম একটি দিনের উপার্জ্জন—মন্দ কি?

১৩

দেখতে দেখতে পনেরোই আগষ্ট এসে গেল। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন শোণিত-কলঙ্কহীন স্বাধীনতার কথা ইতিপূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হয় নি। দু'শো বছরের শোষণে ও শাসনে অভ্যস্ত জাতি প্রথমটা বুঝতেই পারে নি—এ ভাবের ঘোষণালব্ধ স্বাধীনতার মূল্য কতটুকু—আর বরণই বা তার কেমন হবে!

বিস্তীর্ণ কলকাতার আর কোন অংশ প্রত্যক্ষ না করেও প্রভাতদের গলিটাকে দেখলে মনে হবে—স্বাধীনতার মূর্ত্তিটা অন্ততঃ ছায়াময় নয়। শব্দে ও শোভায় ইতিমধ্যে সেটি কায়ালাভ করছে। এই গলির প্রাসাদের সজ্জাটা রাজকীয় হলেও পলস্তরা-খসা নোনাধরা দেওয়ালের বাড়ীগুলিকে তার পাশে বেমানান বোধ হচ্ছে না। কাগজের বা কাপড়ের তে-রঙা নিশানে আলসে থেকে বনিয়াদ পর্য্যন্ত মুড়ে দেওয়া হয়েছে—প্রত্যেক বাড়ীর আলসেতে কিংবা চিলে কোঠার ছাদে বাঁশ-বাকারি বা অন্ত কোন বস্তুর আশ্রয়ে খদ্দর বা রেশমের তিন-রঙা পতাকা তোলবার ব্যবস্থা হচ্ছে। পতাকা উত্তোলনের সঙ্গে বন্দেমাতরম্ বা জনগণমন অধিনায়ক সঙ্গীত হবে—তার তালিম চলছে। এ ছাড়া স্বরবর্দ্ধক যন্ত্র উদগীরণ করছে এতদিনের নিষিদ্ধ বাণী ও গানগুলিকে। রাত বারোটার পর শঙ্খ-ঘণ্টা বাজনিনাদে স্বাধীনতা ঘোষিত হবে—তোপধ্বনি হবে বারংবার। খুব ভোরে প্রভাত-সঙ্গীত আর পতাকা উত্তোলন। বাড়ীর কোন সম্মানীয় ব্যক্তি পতাকা উত্তোলন করবেন।

অনন্ত বললেন, আমি বাপু পতাকা-টতাকা তুলতে পারব না।

পাড়ার ছেলেরা বললে, তা কি হয় জ্যেঠামশাই—যে যার বাড়ীতে পতাকা তুলতেই হবে, আর এ সম্মান বাড়ীর কর্ত্তাদের ছাড়া আর কাউকে দেওয়া ঠিক নয়।

কিন্তু আমার যে ভোর বেলার ঘুম ভাঙে না। সারা রাত ছটফট করে ওইটুকু সময় যদি না ঘুমোই অসুখ করবে যে।

তবু ছেলেরা বললে, এ কাজ আপনাকেই করতে হবে। আপিস, ঘুম কিংবা অসুখ কোন কিছুরই দোহাই আমরা মানব না। ভাবটা এই—এতে যদি জীবনান্ত হয়, তাও কি গৌরবের নয়?

আসল বাধা কোনখানে সে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এরা তো জানে না খাস সরকারী আপিসের চাকরি অনন্তর।

লাল মুখো গোরা আর ফ্যাকাসে রঙের ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে কাজকারবার—একটু এদিক ওদিক হলেই...ছেলেরা বলছে বটে, স্বাধীনতা দিয়েই ওরা এদেশ ছেড়ে চলে যাবে আর আসবে না। কথাটা বিশ্বাস করার মত নয়।

এক ফাঁকে অনন্ত চলে এলেন পাশের বাড়ীর ভবসিন্ধু বাবুর কাছে। উনিও তো একটি সদাগরী আপিসের বড়বাবু, যথেষ্ট দায়িত্বশীল মানুষ। উনি কি করবেন না-করবেন জেনে আসা ভাল।

ভবসিন্ধু বললেন, তুমিও যেমন—একটু আমোদ করতে চায় করুক না!

এতে দায় দোষ নেই তো? শুষ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করলেন অনন্ত।

আরে না, না! রাত বারোটায় কোথায় কি ঘটল—সে খবর টুকে রাখবার দায় তো ভারি! তা ছাড়া, কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিস ফিস করে বললেন, এই যুদ্ধে ইংরেজ ভারি কাহিল হয়ে পড়েছে—দেনায় মাথায় চুল বাঁধা আমেরিকার কাছে। তারই জন্ত—

ও: তাই বলুন ! এ অনেকটা সম্পত্তি বাঁধা দেওয়া গেছ—

ভবসিন্ধু হেসে বললেন, যাও—যাও পতাকা তোল গে। ঝাঁকিয়ে জয় হিন্দ্ বলবে।

সাহস পেয়ে ফিরে এলেন অনন্ত। বললেন, শুধু নিশেন উড়িয়ে মনো মনো করে স্বাধীনতার পুজো সারলে তো চলবে না—মালা আনাও, চন্দন ফুল জোগাড় কর আর জোগাড় কর ভাল খাবারের।

সুনয়নী বললেন, মাসের আজ কত তারিখ সে হিসাব আছে কি ?

আরে রেখে দাও তোমার হিসাব—এমন একটা সমারোহ ব্যাপার জীবনে আর আসবে ! এ জিনিস দেখেছেন আমাদের বাবা ঠাকুরদাদারা ? উৎসাহের আতিশয্যে ছেলে প্রভাতকে ডেকে বললেন, ইচ্ছে তো করে বন্ধুবান্ধব পাঁচ জনকে ডেকে খাওয়াই—

প্রভাত বললে, আজ কে আর নিমন্ত্রণ রাখতে আসবে বলুন—এ উৎসব তো আপনার একার নয় !

সুনয়নী বললেন, তা ছাড়া রেশনের চাল ! নেমন্তন্ন করবার সাধ-আহ্লাদ মেটাবার যো রেখেছে কিনা সরকার !

অনন্ত বললেন, এই বার দেখবে—নিজেদের রাজ্য হলে আমাদের আর ভাবনা থাকবে না। যত খুসী খাও পর সাধ-আহ্লাদ কর কেউ চোখ রাঙাতে নেই।

সুনয়নী অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললেন, কাউকে বোধ হয় আর চাকরি করতেও হবে না !

অনন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, ঠাট্টা নয়, যখন হবে দেখ—তখন বলবে—

দু'জনের তর্কের মাঝখানে ছেলেরা কখন সরে পড়েছে। অনন্ত ক্রোধের ধারাটা অনুপস্থিত প্রভাতের উপর চাপাতে চেষ্টা করলেন, দেখলে আক্কেল তোমার ছেলের ! সুরুৎ করে সরে পড়লে—কেন বছরকার দিন বাজারটা কি করে আনা যেত না !

সুনয়নী বললেন, অন্যের বাজার পছন্দ হবে তোমার ? যাও—নিজেই যাও—আপিসের তাড়া ত নেই।

বাক্স খুলে একখানা পাঁচ টাকার নোট বার করে দিলেন।

সকাল বেলায় দেখা গেল—গলির চেহারাটাই গেছে বদলে। রাতারাতি এতও আয়োজন করেছে ছেলেরা ! তিন রঙের কাগজের শেকলে গলিটায় যেন মাকড়সার জাল বোনা হয়েছে। অবশ্য তিন রঙের শিকল না হলে মনে হ'ত—ইংরেজরা যা চায়—তারই ছবি দু'শো বছরের দাবিয়ে-রাখা মনের কল্পনায় বুঝি মূর্ত্ত হয়ে উঠল। গৃহ-অলিন্দে যে নিশান বাতাসে পত্ পত্ করে উড়ছে—তারই ঘোষণায় বোবা গলিটা হয়েছে বাঙ্ মুখর। স্বরবর্দ্ধক যন্ত্রের মারফতে সে-কাল এ-কালের যত কিছু আইন-বর্জ্জনীয় রেকর্ডগুলি গর্জ্জন করে উঠছে—তার ফাঁকে উঠছে জয় হিন্দ্—বন্দেমাতরম্ ধ্বনি—তার বিরাম মুহূর্ত্তে কোন নিষিদ্ধ বই থেকে চলছে পাঠ—সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতাও।

সুনয়নী একবার বললেন, তোমাদের স্বাধীনতা এল বটে—আমাদের সুখটুকু গেল। একটু যে পা ছড়িয়ে বসে দু'দণ্ড সুখ-দুঃখের কথা বলব—

অনন্ত বললেন, সুখ-দুঃখের কথা মানেই তো পরনিন্দা পরচর্চ্চা—সে যত না হয় ততই মঙ্গল।

সুনয়নী বললেন, কি আমার সাধু পুরুষ রে ! নিজেদের আপিসের সাহেবদের বড়বাবুদের মুণ্ডপাত কর যখন সে বুঝি—

অনন্ত বললেন, আজ ঝগড়া নয়—কাদা ছোড়াছুড়িও নয়, এক কাপ চা দিতে পার।

তোমাদের কি—ফুর্ত্তির প্রাণ, স্বাধীনতা দিবস—আপিসের ছুটি ! আমাদের ছুটি আছে ? আমাদের স্বাধীনতা বলে কোন জিনিস আছে—?

অনন্ত কি বলতে যাচ্ছিলেন—বাধা দিলেন সুনয়নী, যাও—সকাল সকাল ছুটি খেয়ে—আমার ছুটি দাও। তবু বুঝব—

অনন্ত বললেন, সকাল সকাল দু'বেলার সেরে রাখ—সন্ধ্যের আলো দেখতে বেরুব।

যে আলো ঘরে জ্বলছে—তাই দেখে দেখে চোখ ঠিকরে গেল—আবার পথের আলো ! সুনয়নী ঠোঁট উল্টে হাসলেন।

ওগো মা, ছাদের ওপর উঠেছিলে কি ? উঠে দেখে এস বড় বাড়ীটা—কি সুন্দর সাজিয়েছে ! শুনলাম ফ্ল্যাগটার দামই নাকি পঞ্চাশ টাকা।

চক্ষু বিস্ফারিত করে সুনয়নী বললেন, বল কি—পঞ্চাশ টাকা !

অনন্ত তৃপ্তির হাসি হাসতে লাগলেন, হেঁ—হেঁ চাট্টিখানি কথা নয়—বুঝেছ ?

প্রভাতের মনে পড়ল—আজ অপরাহ্নে সমিতির সাহিত্য-সভার উদ্বোধন হবে। উদ্যোগ-আয়োজন কতদূর কি হ'ল—সে খবর নিতে হবে ভূপতির কাছ থেকে। ভূপতি জানে সব—অথচ স্বাধীনতা-দিনের উৎসবে মত্ত হয়ে কোথায় ঘুরছে, কে জানে।

ভূপতিদের বাড়ীর দিকে ও চলল। মাঝ পথে ভূপতির সঙ্গে দেখা। ভূপতিও ওর খোঁজে আসছিল। প্রভাতকে দেখে ও চেঁচিয়ে উঠল, এই যে প্রভাত—আমিও তোর খোঁজে চলেছি।

প্রভাত হেসে বললে, মহৎ লোকেরা একই চিন্তা করেন। সাহিত্যসভার কথাটা মনে আছে তা হলে।

সে তো বিকেলে—ভুলব কেন। যাকে যা বলবার সব ঠিক করা আছে—। আজকের জন্য কাউকে তো সভাপতি পাওয়া গেল না। চুনোপুঁটি সবাই মেতেছেন মানান জায়গায় সভা নিয়ে।

তা হলে—

আরে নাই বা হ'ল ধুমধাড়াক্কা হৈ-হৈ—প্রথম সভাটা আমাদের স্থায়ী সভাপতিকে নিয়েই বসুক। সে ব্যবস্থা ঠিক করা আছে। কিন্তু আমার মুশকিল হয়েছে অন্য রকম। একবার যাবি আমাদের বাড়ীতে ?

বিশেষ কোন দরকার আছে ?

নিকটে সরে এসে অনুচ্চ কণ্ঠে ভূপতি বললে, বাবা কিছুতেই মত করছেন না আর পড়াতে। বলেন, হাতের কাছে চাকরি যখন একটা পাওয়া যাচ্ছে—সেটা না নেওয়া মূর্খতা। আজ এমন দিনেও ওঁর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়ে গেল।

বেশ ত। অন্যমনস্কভাবে প্রভাত উত্তর দিলে।

তা হলে—তুমি কেন ঠিক করেছ চাকরি করবে না ?

সে একটা কারণে। প্রভাত হাসলে, পণ্ডিত নেহরুর আত্মজীবনী পড়েছ তো ? ছেলে বেলা থেকে মনে ওঁর ঘৃণা কেন জন্মাল।

জীবনে ও জিনিসটা অনায়াসে বাদ দেওয়া চলে। কিন্তু যাদের চাকরি ছাড়া আর কোন উপায় নেই—তাদের চলে কি প্রতিজ্ঞা করা—চাকরি নেব না কারও ?

প্রভাত হাসিমুখে বললে, প্রতিজ্ঞা ঠিক নয়—এমনি সাধারণ ঘৃণাবশতঃ—হয়ত খেয়ালই—

না প্রভাত, অন্য কাউকে বুঝিও ও কথা। কিন্তু একটা কথার জবাব দাও তো। আমাদের মত গৃহস্থ ঘরের ছেলেদের বেশী পড়েই বা লাভ কি—সেই চাকরী যখন নিতেই হবে।

নিজের কথা নিজেই কাটছ—ভূপতি।

হাঁ—তোমার প্রতিজ্ঞার কথা ভাবলে—ওইটিই খালি মনে হয়। সেই সংসার যখন নিষ্কৃতি দেবেই না আমাদের, তখন যত শীঘ্র সংসারের সাহায্যে আসা যায় ততই কি মঙ্গল নয় ?

প্রভাত একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল ভূপতির দিকে। একটি নিশ্বাস সন্তর্পণে বুকের মাঝে টেনে নিয়ে বললে, হাঁ আমরা তাই ভাবি বটে। তবু এক একবার মনে হয় এতেই কি মঙ্গল হচ্ছে আমাদের! কি উন্নতি করছি আমরা সংসারের ? কোন রকমে কলম চালনা করে সংসার বজায় রাখার দায়িত্ব নিয়ে কোন্ পথে এসে দাঁড়ালাম সে হিসাবটা নিয়েছি কি কখনও ? আজ আমাদের মত হয়ছাড়া লক্ষ্মীছাড়া শ্রেণী তুমি একটিও খুঁজে পাবে না ভূপতি। জীবনের কোন নীতিতে আমাদের বিশ্বাস নেই—

ভূপতি বললে, তাই তো বলছি—চাকরি আমি নেব না। তুমি বুঝিয়ে বলবে চল বাবাকে।

কিন্তু চাকরি না নিলে আর কি করবে সেটা ভেবে রেখো—

ভূপতি সহসা প্রশ্ন করলে, তুমি কি করবে ?

আমি ? একমুহূর্ত চুপ করে রইল প্রভাত। করবে সে একটা কিছু চাকরি ছাড়া—মানে সরকারী আপিসে দশটা পাঁচটায় বাঁধা মাইনের চাকরি ছাড়া নিশ্চয় একটা কিছু করবে। যাতে জীবনের সার্থকতা আসে—যাতে দেশের গৌরব ক্ষুণ্ণ না হয়—সব চেয়ে বড় কথা নিজের কাছে নিজে যাতে খাটো হয়ে না যায়। কিন্তু সে জিনিসটা কি সে স্পষ্ট জানে না। স্পষ্ট করে বলা সম্ভবও নয়। পৃথিবীতে কতই তো দৃষ্টান্ত রয়েছে। অনুকূল পরিবেশে কোনটি যে তার জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবে সে কথা বলা চলে না এই মুহূর্তে। তবে দশটা পাঁচটায় জীবনীক্ষয়কর সাধনা নয় এই মাত্র সে জানে।

এখনও কিছু ঠিক করি নি ভাই। অত্যন্ত মৃদুস্বরে কথা ক'টি উচ্চারণ করে একটা নিশ্বাস সে বুকে টেনে নিলে।

ভূপতি বললে, সত্যি প্রভাত, আমাদের সামনে কোন পথ নেই—কোন দৃষ্টান্তও নেই। সুযোগ সুবিধা কিছুই আমাদের লভ্য নয়—কলেজে পড়বার সময় আমরা যা ভাবি সংসারের চাপ আমাদের ঠেলে নিয়ে যায় তার বিপরীত দিকে। যাই হোক, আজ একবার যেও।

গিয়ে লাভ নাই—ব্যাপারটা মোটামুটি সে বুঝতে পারছে। ভূপতির বৃদ্ধ পিতা অবসরমুখে পৌঁছেও কাজের জের টেনে চলেছেন শুধু প্রাণধারণের গ্লানিতে। দুটি মেয়ের বিয়ে দিতে ভিটে তুলে দিয়েছেন মহাজনের হাতে—তিনটি ছেলেকে মানুষ করে অর্থাৎ আপিসে বাহাল করে সংসারে সচ্ছলতা আনবেন এ আশা বহুজনের কাছে অসংখ্যবার প্রকাশ করেছেন। সেই আশাটুকুকে সম্বল করে ষাটের ধারে পৌঁছেও তিনি দু' মাইল দীর্ঘপথ হেঁটে চাকরি বজায় রাখছেন—সেই আশাতেই দেনার সমুদ্রে ভাসতে ভাসতেও কূলে পৌঁছবার দৃঢ় প্রতীতি রাখেন।

একবার তর্ক করেছিল প্রভাত। তিনি ঈষৎ বিরক্ত হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, কেরাণীর ছেলে কেরাণী হবে না তো কি লাটসাহেব হবে! বটের বীজে বট গাছই হয়।

সেকথা অস্বীকার করা যায় না—কিন্তু বট গাছও তো সবগুলি আকারে এক নয়। ভাঙা বাড়ীর কাটলে কোকরে জন্মে—কোন রকমে অসংখ্য শিকড় মেলে রসহীন ইট চুণ সুরকি থেকে রস গ্রহণের চেষ্টায় শীর্ণ হয়ে বেঁচে থাকা—আর অবারিত জমিতে উর্ব্বরা মৃত্তিকার আশ্রয়ে আলো-হাওয়ায় বাধাবন্ধহীন প্রসারে বিরাট বনস্পতির আকার

দেওয়া এক নয়। জন্মের মলগায় জীবনের অন্ধুর যে আকার নেয়—কর্মের সাধনায় ও অনুকূল পরিবেশ-সৃষ্টিতে তাকে সম্পূর্ণ পৃথক রূপ দেওয়া কঠিন নয়।

নিজের বাড়ীতেও প্রভাতের প্রতিবেশটি ভিন্নতর জীবন যাপনের অনুকূল নয়। ভূপতির বাবার মত তার বাবাও দুঃখ মোচনের আশা পোষণ করেন। সন্তানের দুঃখ মোচন নয়—নিজের শেষ জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য। সন্তানকে সংসারে পৌঁছে দেবার চেষ্টাই হয়ত কর্ত্তব্য বলে ঘোষিত হয়—কিন্তু সন্তানের মধ্যে নিজের অক্ষম বৃত্তিগুলিকে পরিপালন করার লালসা…এই হ'ল মধ্যবিত্তের আশার চরম ফল। সন্তান ভিন্ন মুখী হলে পিতার আক্ষেপ সরবে প্রচারিত হয়—সন্তান সংসারকে টেনে তুলতে না পারলে—পিতা দোষ দেন বর্ত্তমান কালকে—দোষ দেন নিজ অদৃষ্টকে—এবং সন্তানকেও। সংসার—সংসার! প্রকাণ্ড একটা আবর্ত্ত রচনা করে—জীব-সৃষ্টির এমন পরিহাসময় দৃষ্টান্ত—জীবনকে পঙ্কিল করে তুলছে না কি? ক্রমশঃ

চিত্রকূট ধাম

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

চিত্রকূটে আমি দুই বার বেড়াইতে যাই। এক বার ১৯৪৯ সালে ১৬ই অক্টোবর (বাংলা ২৪শে আশ্বিন ১৩৫৬)। আর দ্বিতীয় বার গিয়াছিলাম ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫১ (১২ ফাল্গুন ১৩৫৭ সাল)। প্রথম বার এবং দ্বিতীয় বারের কথা প্রসঙ্গতঃ এক সঙ্গেই বলিব। দুই বারেই কয়েক জন করিয়া সঙ্গী ছিলেন।

সন্ধ্যার গাড়ীতে এলাহাবাদ ছাড়ি। শীত তখনও বেশ আছে, তবে গ্রীষ্মের আভাস কিছুক্ষণের জন্য দুপুরে আসিয়া তপ্ত পরশ বুলাইয়া দেয়। গাড়ী ছাড়িলে আর একটু শীত বোধ হইল। আবছায়ার মত আধো আলো আধো অন্ধকারে গাড়ী চলিল। ঠিক ৯-৩০ মিনিটের সময় পৌঁছিলাম মাণিকপুর জংশন-ষ্টেসনে। দুই বৎসর পূর্ব্বে মাণিকপুর ষ্টেশনের কোন বিশেষত্ব ছিল না—না ছিল আলো, না ছিল ভাল বিশ্রামঘর, না ছিল দীর্ঘ প্ল্যাটফরম। কিন্তু এইবার দেখিলাম যেন আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের স্পর্শে সব বদলাইয়া গিয়াছে—সর্ব্বশ্রেণীর যাত্রীদের সুন্দর ও বিস্তৃত বিশ্রামগৃহ, সুদীর্ঘ প্ল্যাটফরম, জলের কল, খাবারঘর, সর্ব্ববিধ সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা।

ঢং ঢং ঢং গাড়ীর ঘণ্টা পড়িল। মাণিকপুর হইতে ঝাঁসীর গাড়ী ছাড়িল। গাড়ীতে উঠিলাম। চিত্রকূটের দুই এক জন পাণ্ডাও সঙ্গী হইল—কিন্তু আমাদের পাণ্ডার যে প্রয়োজন হইবে না সেকথা বলিলেও তাহারা সঙ্গ ছাড়িল না। তবে ইহারা পাণ্ডার ভৃত্য, 'প্রাণটা ওষ্ঠাগত' করিবার মত ছিল না। মাণিকপুরের পর বাহিলপুরুয়া নামে একটি ছোট ষ্টেশন, তার পরই কারভি। এখানে আমরা নামিলাম। ইহার পরের ষ্টেশনের নাম চিত্রকূট। সাধারণতঃ চিত্রকূটযাত্রীরা কারভি হইতেই চিত্রকূট যান, কেননা এই ষ্টেশনে ট্যাক্সি ও বাস মেলে এবং ঘন ঘন গাড়ীর সময় যাত্রী লইয়া যাতায়াত করে। এজন্য অধিকাংশ যাত্রী কারভিতেই নামে এবং এখান হইতে সীতাপুর যায়।

রাত্রিতে ষ্টেশনের বিশ্রামাগারে সঙ্গীগণসহ গিয়া আশ্রয় লইলাম। দূরে ও নিকটে পাহাড়—শীত বেশ পড়িয়াছে, একেবারে কনকনে শীত। ভিতরে খান-দুই আরাম-কেদারা, দুখানা ভাঙা চেয়ার, একটা ড্রেসিং টেবিল। গেল বার এসব কিছুই দেখি নাই। এইবার একটু উন্নতি হইয়াছে। আমরা শুইয়া পড়িয়াছি, একটু ঘুমও হইয়াছে এমন সময় কোট-প্যাণ্টপরা একটি পঞ্জাবী যুবক প্রায় বারো-তেরো জন প্রৌঢ়া, কিশোরী ও তরুণীসহ প্রবেশ করিলেন। মহিলাদের জন্য স্থান করিয়া দিয়া বাহিরে পিতা-পুত্র বেঞ্চে ও আরামকেদারায় দেহ এলাইয়া দিলাম। শীতের হাওয়া বেগে বহিতেছিল, আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়া রাত কাটাইলাম। আমরা চিত্রকূট আশ্রমের বন্ধুবর ডক্টর ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে পত্র দিয়াছিলাম, তিনি পত্র পাইলে আমাদের এ দুর্ভোগ ভুগিতে হইত না—রাত্রিতেই চিত্রকূট আসিতে পারিতাম।

সকালে দেখিলাম, বহু তীর্থযাত্রী চিত্রকূট দর্শনে সমবেত হইয়াছেন। কারভি হইতে সীতাপুরে ট্যাক্সি ও বাস্ দুই-ই যায়। আমরা সর্ব্বসমেত আট জন লোক, কাজেই বাসেই চলিলাম। একটা আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যেখানে প্রতিদিন শত শত যাত্রীর সমাগম হয়, সেখানকার কি বাস্, কি জীপ সবই ভীতিজনক। বাসে বসিবার সরু কাঠ মাত্র পাতা—তাও ধূলিভরা, ট্যাক্সিও একেবারে ঝরঝরে। সেই বাসে করিয়াই চলিলাম চিত্রকূট-সীতাপুরের দিকে। কারভিতে থানা, স্কুল, বাজার, দোকানপাট আছে। এখানে মাহ-

মাংসের আমদানী হয়। দোকানগুলি অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন—পথ ধূলিভরা। বাস ও ট্যাক্সির ধোঁয়া ও ধূলা দোকানের খাদ্যদ্রব্যাদিতে উড়িয়া আসিতেছে। বাস ছাড়িতে খানিকটা দেরী হইয়া গিয়াছিল। কারভি হইতে দেড় মাইল পথ উঁচুনীচু—এইভাবে উঠানামা করিতে করিতে, গায়ে গায়ে ধাক্কা খাইতে খাইতে উঠিয়া পড়িয়া চলিলাম। সম্মুখে পাইলাম ক্ষীণতোয়া মন্দাকিনী নদী। বাসে বসিয়াই নদী পার হইলাম। নদীর উপর এক পাশে যে সেতুটি তৈরী হইতে দেখিয়াছিলাম, তাহার নির্ম্মাণকার্য্য তখনও শেষ হয় নাই। নদীর ঢালু পার হইতে উপরে উঠিতে হইল। বুঝি বাস্ এখনই নীচে পড়িয়া যাইবে। কোনরূপে বীর হনুমানজীর নাম স্মরণ করিয়া বিপদ উত্তীর্ণ হইলাম। বাস্ ভাল রাস্তায় পড়িল। এই পিচঢালা ভাল রাস্তাটি বাঁদা পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। পথের দুই দিকে মাঠ, মাঠের প্রান্ত সীমায় দূরে দূরে শ্যামলশ্রী গিরিমালা, নীল বনানী। পথের কোথাও কোথাও ভগ্ন মন্দির, ইন্দারা, পুকুর, পাশে বস্তী—কৃষক-পল্লী। বাঁদার পথ ধরিয়া চার মাইল অতিক্রম করিলে পাইলাম বাঁ দিকে সীতাপুরের পথ। কাঁচা রাস্তা। উঁচুনীচু এই বিশ্রী দুর্গম পথ ধরিয়া অবশেষে সীতাপুর আসিয়া পৌঁছিলাম। সীতাপুরের পথে প্রথমে পড়িল রাণীপুর—ছোট একটি বাজার। সীতাপুর বাসের আড্ডায় পাণ্ডারা যাত্রী ধরিতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমরা বলিলাম, "ডাক্তারবাবুর বাড়ী যাইব।" তাই বিনা আপত্তিতে আমাদের ছাড়িয়াদিলেন।

আমরা শহরের দিকে চলিলাম। ছোট শহর। একটি মাত্র পথ। পথ পাথরে বাঁধানো। দুই পাশে বাড়ীঘর, বাজার ধর্ম্মশালা, স্কুলঘর, ডাকঘর। শহরের মধ্যে কয়েকটি বেশ বৃহৎ ও সুন্দর ধর্ম্মশালা আছে। প্রথম বার মন্দাকিনীর পারে একটি ধর্ম্মশালার আশ্রয় লইয়াছিলাম। এইবার বন্ধুবর ডাঃ ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী "চিত্রকূট আশ্রমে" উঠিলাম। আমরা এখানে পরম সমাদরে গৃহীত হইলাম। জিনিষপত্র রাখিয়া একটু বিশ্রাম করিলাম এবং চা ও প্রচুর পরিমাণ জলযোগে তৃপ্ত হইয়া চলিলাম দেব-দর্শনে। মহিলারা 'পুণ্যলোভাতুরা', তাই তাঁহারা খাবার জন্য ততটা ব্যস্ত হইলেন না। সঙ্গী মণিবাবু ও তাঁহার বন্ধু শ্রীমান্ চন্দ্রশেখর দুই জনই মহা ব্যস্ত পুরুষ। তাঁহারা সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিলেন এক দিনের মধ্যে যাহা দেখা যায়, তাহা দেখিয়াই আবার সন্ধ্যার গাড়ীতে এলাহাবাদ ফিরিবেন।

মন্দাকিনী-তীরে চিত্রকূট

কাজেই তাঁহাদের ব্যস্ততা ছিল সমধিক। চিত্রকূট বাঁদা জেলার অন্তর্গত একটি মৌজা। তীর্থস্থান বলিয়া প্রতিদিন যাত্রীসমাগমে স্থানটি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে।

শহরে সরু পথ। পাথরে বাঁধান—উঁচুনীচু। দুই দিকে বাড়ীঘর ধর্ম্মশালা দোকান। কিছুদূর গেলেই রাস্তাটি অনেকটা নামিয়া একেবারে মন্দাকিনী-তীরে গিয়া পড়িয়াছে। মন্দাকিনী নদীর পাড় হইতে দেখা যায়- পরপারে শ্যামল পাহাড়ের সারি চলিয়াছে—নীল ঘন বনশ্রেণী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্নানার্থী পুরুষ ও নারীরা মন্দাকিনীর জলে স্নান করিতেছে, শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিতেছে। পাণ্ডা-পুরোহিতেরা মন্ত্র পড়াইতেছেন। সর্ব্বত্র যেন একটা কর্ম্মব্যস্ততা। মন্দাকিনীর জল নীলাভ স্বচ্ছ সুপেয় ও শীতল। স্নানে শরীর স্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল হয়। মন্দাকিনী-তীরের পাষাণ-পথটি সুপ্রশস্ত ও সুগঠিত। তাহার দক্ষিণ দিকে পর্ব্বতোপরি অনেকগুলি দেবমন্দির শোভা পাইতেছে। এক শ', দেড় শ' এইরূপ প্রস্তর-সোপান বাহিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। আমরা উপরে উঠিলাম। বালক ও মহিলারা মনের আনন্দে সোপানের পর সোপান অতিক্রম করিয়া মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা একে একে শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণের মন্দির, ভরতের মন্দির, সূর্য্যমন্দির, বুড়া হনুমানের মন্দির দেখিয়া স্থির করিলাম—শ্রীকামদগিরি দেখিব। সে সঙ্কল্প করিয়া নীচে নামিয়া পথ ধরিলাম।

নির্ম্মল আকাশ। দীপ্তিমান্ সূর্য্য। রৌদ্রের দীপ্তিতে মন্দাকিনীর নীলাভ জল জ্বলিতেছে। মন্দাকিনীর তীরে সুন্দর সুন্দর ঘাট। কোনটির নাম মঠকুল্যাব, কোনটির নাম রামঘাট, কোনটি রাঘব-প্রয়াগ, কোনটি বা সর্ব্বঘাট নামে পরিচিত। মন্দিরের সংখ্যাও কম নয়। শ্রীবালাজীকী

মন্দির, ঘুড়ো হনুমানজী, পর্ণকুটি, যজ্ঞবেদী—তুলসীদাস। তুলসীদাসের মন্দিরে তাঁরই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত—সুন্দর মূর্ত্তি। একজন পূজারী 'রামচরিত মানস' পাঠ করিতেছিলেন। তারপর বরামঠ, চরণার মন্দির, পুরাণি লঙ্কা, সুধার বিন্দু, প্রমোদবন, ভজনরাম প্রভৃতি কত মন্দির, কত আখড়া মন্দাকিনীর এপারে ওপারে যে আছে—সব মন্দির দেখা ও পর্য্যবেক্ষণ করা বড় সহজ নয়।

চিত্রকূটের পার্ব্বত্য শোভা—দূরে হনুমানধারা পর্ব্বত

আমরা এইবার চলিলাম শ্রীকামদগিরি দর্শনে। মন্দাকিনীর তীর দিয়া পথ চলিয়াছে এবং পয়স্বিনী নদীর ডান দিক্ দিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে—উচুনীচু পথ। শ্রীকামদগিরির দূরত্ব প্রায় চার মাইল। এই পথে আমরা চলিলাম। কণীবাবুর ভৃত্য হইল আমাদের পথ-প্রদর্শক।

তখনও বেলা দশটা হয় নাই। সূর্য্যালোকের প্রখরতা বেশ অনুভব করিতেছিলাম। চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছিলাম—পর্ব্বতশ্রেণী সার বাঁধিয়া প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া। ঘন বিটপীলতায় পূর্ণ বলিয়া দূর হইতে গাঢ় সবুজ দেখাইতেছিল। বিস্তৃত অরণ্যভূমি—বন্য পশু ও হরিণযূথের বিচরণ-ক্ষেত্র। ঝরণা বহিয়া চলিয়াছে, ঊর্দ্ধে নির্ম্মেঘ নীলাকাশে বিহঙ্গেরা উড়িতেছে—গাছের ডালে ডালে বসিতেছে—মধুর সুরে কূজন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে মন সুদূর অতীতে চলিয়া গেল। দেখিলাম—পিতৃসত্য পালনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে চলিয়াছেন।

মনে পড়ে ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে নিশিযাপন করিয়া তাঁহার নির্দ্দেশমত চিত্রকূটের উদ্দেশে শ্রীরামচন্দ্র যাত্রা করিয়াছেন। ভেলায় যমুনা পার হইলেন এবং মহর্ষি ভরদ্বাজের নির্দ্দেশিত পথে চিত্রকূট চলিলেন। বসন্তকাল সমাগত। বিকশিত পুষ্পসকল মাটিতে ঝরিয়া পড়িয়া নিবিড় বনতলে কুসুমশয্যা রচনা করিয়াছে। পলাশ গাছে লাল পলাশ ফুল আগুনের মত জ্বলিতেছে—আর অদূরে শোভা পাইতেছে বিহঙ্গকাকলিকূজিত হস্তিযূথবিচরিত সুউচ্চ চিত্রকূট গিরি। পর্ব্বতের এই অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র মুগ্ধ হইলেন এবং প্রিয়তমা সীতাকে বলিলেন :—'প্রিয়তমে ওই দেখ, নির্জ্জন অরণ্যে মনুষ্যের চিহ্নমাত্র নাই—বিল্ববৃক্ষ ও ভল্লাতক বৃক্ষ ফল ও পুষ্পভারে অবনত হইয়াছে। এই নির্জ্জন বনে আমরা নিশ্চিন্ত মনে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিব।' মহর্ষি বাল্মীকি চিত্রকূট গিরির যে মনোরম বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা এখানে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত তাহার অনুবাদ দিলাম। রামচন্দ্র সীতাকে বলিতেছেন :

"ওই দেখ তরু 'পরে, ফুল রাশি থরে থরে
শোভিছে প্রদীপমালা সম,
শিশির গিয়েছে ব'লে যেন তারা কুতূহলে
প'রেছে মালিকা মনোরম।
হেথায় ভেলার বন, বিল্ব-তরু অগণন
ফলভারে অবনতকায় ;
কে করিবে উপভোগ ? এ কাননে নাহি লোক
ফলে ফলা বিফলে হেথায়।
ওই দেখ গাছে গাছে কেমন ঝুলিয়া আছে
মধুক্রম মধুমক্ষিকায় ;
ডাহুক ডাকিছে জলে, শিখি কেকারবছলে
উত্তর দিতেছে যেন তায়।
আপনি ঝরিয়া ফুল ঢেকেছে বিটপী মূল—
রচিয়াছে ফুলের আসন ;
ফিরে করী দলে দলে, বিহগের কল কলে
চিত্রকূট মুগ্ধ করে মন।"

সেই চিত্রকূট, অতীতের চিত্রকূট—ঋষিদের তপোবন-শোভিত চিত্রকূট—এখন জনাকীর্ণ হইলেও চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ইহা মনোরম। চিত্রকূট শহর যেখানে বিদ্যমান তাহাই প্রাচীন চিত্রকূটগিরি এবং চারিদিকের গিরিশ্রেণীও সেই নামেই পরিচিত, যদিও বিভিন্ন শৃঙ্গ বিভিন্ন তীর্থরূপে পরিগণিত।

ক্রমে আমরা শ্রীকামদগিরির পাদমূলে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই পর্ব্বত পরিক্রমা করিতে হয়। পর্ব্বতের বেড় প্রায় ৪ মাইল। ঘোড়া বা ডুলিতে প্রদক্ষিণ করা চলে। পাহাড়ের নীচে শ্রীকামদনাথের মন্দিরে শ্রীকামদনাথকে দর্শন করিলাম। মূর্ত্তিটি একটি মস্তকমাত্র—প্রস্তরনির্ম্মিত। পাহাড়ের চারিদিকে অগণিত দেবমন্দির। কোথাও রাম-সীতার মন্দির, কোথাও ভরতকুণ্ড, ভরতমন্দির, এই ভাবে পাহাড়ের চারিদিকেই

মন্দির, কুণ্ড, ধর্ম্মশালা আখড়া, বিদ্যামন্দির প্রভৃতি আছে। প্রথম দিন কামদগিরি প্রদক্ষিণ করিবার নিয়ম আছে। দ্বিতীয় দিন পূর্ব্বদিকে বারো মাইল প্রদক্ষিণ করিতে হয়। সে পথে কোটি তীর্থ, দেবাঙ্গনা, সীতা রসুই এবং হনুমানধারা দর্শনবিধি। আমি প্রথম বারেই হনুমানধারা গিয়াছিলাম। তৃতীয় দিবস দক্ষিণ দিকে পরিক্রমা—প্রমোদবন, জানকীকুণ্ড, কটিকশিলা ও অনুসূয়াজী, চতুর্থ দিন—গুপ্ত গোদাবরী, কৈলাস পরিক্রমার রীতি, পঞ্চম দিন ভরতকূপ, বারসৈয়া, ইত্যাদি পর্য্যটন ও পরিক্রমণ করিলে চিত্রকূটভ্রমণ সার্থক হয় এবং তীর্থযাত্রীর পুণ্যসঞ্চয় হয়।

প্রথমবার আমি শ্রীমান্ রবি, লোহিত ও মোহিত মন্দাকিনী পার হইয়াই হনুমানধারা দেখিতে গিয়াছিলাম। নদী অতিক্রম

অজানা বন্ধু

করিয়া কাঁকরভরা পথে চলিয়াছিলাম—খালি পায়ে যাওয়ার বিষময় ফল আমরা বিশেষ ভাবেই পাইয়াছিলাম। কাঁটা ও বিবিধ গুল্ম, তারপর উঁচুনীচু শিলাকীর্ণ পথ পদে পদে বাধার সৃষ্টি করিতেছিল। চিত্রকূট হইতে পথের দূরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল। পাহাড়ে উঠিবার পাথরের সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি বেশ চওড়া ও উঁচু। শুনিলাম মোট ৩৬৫টি সিঁড়ি। পাহাড়ের উচ্চতা হাজার, দেড় হাজার ফুটের বেশী হইবে বলিয়া মনে হয় না। উপরে উঠিয়া শরীর শীতল হইল। মধুর বাতাস, ঝরণার সুমধুর কলধ্বনি। সেই সুশীতল পানীয়ের সঙ্গে খোয়া খা ক্ষীর খাইয়া সজীব হইয়া উঠিয়াছিলাম। পাহাড়ের শীর্ষদেশ

শ্রান্ত পথিক—পর্ব্বত-পাদমূলে

অনেকটা সমতল। চারিদিকের দৃশ্য পরম রমণীয়। হনুমান-ধারার জলধারা পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গ হইতে আসিয়া ঝর ঝর ঝম্ ঝম্ রবে ঝরিয়া পড়িতেছে। এখানেও হনুমান ও রামসীতার মন্দিরে পুরোহিত আছেন, থাকিবার বাড়ী আছে এবং ধর্ম্মশালাও আছে। অনেক তীর্থযাত্রী এখানেও রাত্রিবাস করেন, তবে সেইরূপ দুঃসাহস অনেকে করেন না। ফিরিবার পথে বনের ভিতর হইতে একটি লোক আসিয়া আমাদের দলে মিশিল, নানাভাবে সে আমাদের সেবা করিয়াছিল। চিত্রকূটে পৌছিয়া মন্দাকিনীতীর হইতে সে আশ্চর্য্যভাবে অদৃশ্য হইল। আমরা তাহাকে আমাদের সঙ্গে খাইতে বলিয়াছিলাম, পয়সার কথা বলিয়াছিলাম, কিন্তু সে যে কোথায় গেল ডাকাডাকি করিয়াও সন্ধান মিলিল না। কে এই অজানা বন্ধু, তাহার পরিচয় অজানাই রহিল।

কশীবাবুর নিকট হইতে আমরা যেরূপ আদরযত্ন পাইয়াছিলাম তাহা জীবনে ভুলিবার নয়। চিত্রকূটের প্রতি কশীবাবুর এইরূপ মায়া এবং স্থানীয় লোকেদের প্রতি তাঁহার এমনি ভালবাসা যে, নিজ বাটীর অর্দ্ধাংশে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সরকারের হাতে দিয়াছেন। একজন

এম-বি ডাক্তার দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক। তাঁহার পুণ্যবতী স্ত্রীর নামে এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের নামকরণ হইয়াছে।

চিত্রকূট ভ্রমণে যাঁহারা আসিবেন, তাঁহারা যেন অন্ততঃ এক সপ্তাহকাল থাকিতে পারেন, সেরূপ ব্যবস্থা করিয়া আসিবেন—নতুবা সর্ব্বত্র পরিক্রমণ সম্ভব হইবে না, শুধু ক্লেশই সার হইবে।

এলাহাবাদ ফিরিয়া চলিলাম। সুন্দর রাত্রি—বন ও পাহাড়-পর্ব্বতের গা ঘেঁষিয়া গাড়ী চলিল। চারিদিক যেন হাসিতেছিল। রাত্রি সাড়ে দশটায় বাড়ী ফিরিলাম। চিত্রকূট হাঁপানির ঔষধের জন্য প্রসিদ্ধ। অনেক যাত্রী হাঁপানির ঔষধের জন্যও সেখানে যান। কমীবাবুও হাঁপানির ঔষধ দেন। স্থানটি খুবই স্বাস্থ্যকর। দুগ্ধ ঘৃত সুলভ ও খাঁটি। জানকীকুণ্ডের জল স্বাস্থ্যান্বেষীদের পক্ষে উপকারী। অনেকে স্বাস্থ্যের সন্ধানে এখানে আসেন। যাঁহারা শিকারপ্রিয় তাঁহাদের কাছে এই স্থান অতীব আকর্ষণীয়।

চিত্রকূটের রমণীয় দৃশ্য আমার মনের উপর এমনি একটা প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে—মনে হয় সুযোগ পাইলেই সেখানে ছুটিয়া যাই। এমনি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক স্থান চিত্রকূট। চিত্রকূটের সঙ্গে মহাকবি তুলসীদাসের পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত। তাঁহার সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে।

শ্যামলী

শ্রীগোপাললাল দে

ফুলের গন্ধে মনে প'ড়ে গেল মোর,
হায়রে কেমনে তোমারে রয়েছি ভুলে!
চোখে এসে লাগে হারানো দিনের ঘোর,
ছায়াছবি হেরি স্বপন-নদীর কূলে।
এমনি সেদিন আবেক ছায়ায় ভরা,
কিছুবা আলোর কিছুবা কালোর ধরা,
হাতছানি দিয়ে ডেকেছ কতনা ছলে
ওগো শ্যামকুন্তলে,
গ্রাম-সীমানার বনপথখানি বেয়ে,
কোন ভুলে গিয়ে দাঁড়াতাম নদীকূলে।
তুমি নিয়ে গেছ আনমনা পথিকেরে
দূরে প্রান্তরে বৈশাখী রোদে ভরা,
করঞ্জা আর কুড়চি বাবলা ঘ'রে
পথের ধুলারে করিয়াছে সাঙ্করা;
পুকুরের ধারে রাঙচিত্রার বেড়া,
আরেকটু গেলে মেহেদীর সারে ঘেরা,
ঘুতকুমারীর অবরোধ পার হলে
ভীরু মন পায় ছাড়া,
অলস দহনে আমের কুঞ্জবনে
বন-মা'র স্নেহে হৃদয় হইত হারা।

নূতন পাতায় শালবন গেছে ছেয়ে,
প্রভাতে ঊষার সোনার স্বপন মেখে,
সারাদিন ফেরে গ্রামের কাজল মেয়ে
ফুলের স্তবক পত্রপুটেতে ঢেকে;
শাখায় শাখায় সোনালী রূপালী পরী,
ফুলে ফুলে দুলে অলি রব ঝর্ঝরি,
অজানা গন্ধে ভ্রমর হারাল দিশা,
কুসুমিত কাননে,
রামধনু-রঙা প্রজাপতি মাতোয়ালা,
মিতালি পবনে কুহু জাগে ক্ষণে ক্ষণে।
সন্ধ্যা-সায়রে কেরে ওরা? খেলে হোরি!
ঘাটে তোলা মেয়ে গাগরি ভাসালো জলে;
এখনি হারাবে বনবীথিকার সারি,
দিগন্ত-আঁখি তাই বুঝি ছলছলে?
কাননের খেলা সাঙ্গ হয়েছে বুঝি?
পাখীরা ফিরিছে সাঁঝের কুলায় খুঁজি;
সহসা একি এ? উদয়-আকাশ হাসে
কার শুভ আগমনে;
কারে রাখে আর কারে দেখে?—দুটি আঁখি;
চকিত চমকে হারাই যে সুস্বপনে।

ভারতের জাতীয়তা ও শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীমতিলাল রায়

১

শ্রীঅরবিন্দ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে চন্দননগরে আসিয়াছিলেন। ৪ঠা এপ্রিল, ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পণ্ডিচারী গমন করেন। জাতীয়তার ঋষি বাংলাদেশ হইতে প্রস্থান করিলেও ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারই নির্দ্দেশে বাংলায় বিপ্লব-কর্ম্ম পরিচালিত হইত। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তিনি "আর্য্য" পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাখানির সম্পাদক হন তিনি স্বয়ং, মঁসিয়ে পল রিশার এবং তদীয় পত্নী মাদাম রিশার। এই আর্য্য পত্রিকাখানির প্রকাশের পর হইতেই তিনি আমাকে বিপ্লবের পথ হইতে ফিরাইয়া অধ্যাত্ম-ভিত্তির উপর সংগঠনের পথে অগ্রসর হইতে নির্দ্দেশ দেন এবং ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্টের পর হইতে তিনি আর্য্য পত্রিকার সম্পাদন-ভারও পরিত্যাগ করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকেই মঁসিয়ে পল রিশার শ্রীঅরবিন্দের সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং কিছুদিন তিনি আমার সহিত চন্দননগরে বাস করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ হইতে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগষ্টের শ্রীঅরবিন্দকে আমি অনুভব করিয়াছি এবং তাঁহার কথা লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাহা সত্য তাহা পরিপূর্ণ রূপে ব্যক্ত না হইলে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে অনেক সত্য তথ্য অনাবিষ্কৃত থাকিয়া যাইবে।

শ্রীঅরবিন্দের জীবন চারি পর্ব্বে বিভক্ত করা যায়। তাঁহার বাল্য-জীবন ও কৈশোর-জীবন, তাঁহার স্বদেশীযুগের নেতৃজীবন, ১৯১০ হইতে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার সাধন-জীবন ও তৎপরে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাঁহার একান্ত অধ্যাত্মজীবন বা অতিমানস-জীবন। তাঁহার প্রথম তিনটি যুগপর্ব্বের ইতিহাস জানি। ১৯২৬ হইতে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্রীঅরবিন্দের যে জীবন তাহার প্রকাশ-কেন্দ্র মীরা দেবী। তিনিই পণ্ডিচারী আশ্রমের মাতারূপে শ্রীঅরবিন্দের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। এই যুগের কথা আমার পক্ষে বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

শ্রীঅরবিন্দ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন স্বনামপ্রসিদ্ধ ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ। তিনি আই-এম-এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রভূত ধনোপার্জ্জন করেন। কোন্নগরে এখনও তাঁহার বাস্তুভিটা বিদ্যমান আছে। কৃষ্ণধনবাবু সর্ব্বতোভাবে পাশ্চাত্ত্যের প্রভাবে আচ্ছন্ন ছিলেন, পুত্রগণেরও তদনুযায়ী চরিত্রগঠনের জন্য আমরণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্য পক্ষে তাহার বিপরীত সাধনায় শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। রাজনারায়ণ বসুর দান বাঙালী জাতি কোন দিন বিস্মৃত হইবে না। যখন বাঙালী জাতি পাশ্চাত্ত্য ভাব-মদিরায় এক প্রকার উন্মাদ, সেই সন্ধিযুগে সেই প্রচণ্ড বন্যা প্রতিরুদ্ধ করিয়া রাজনারায়ণ বসুই জাতিকে হিন্দুত্বের অমৃত-রসায়ন পরিবেশন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতার বুকে অনুষ্ঠিত হিন্দুমেলার সহিত তাঁহার সম্পর্কের পরিচয় যাঁহারা রাখেন তাঁহারাই এই কথা স্বীকার করিবেন। রাজনারায়ণ বসুকে আমরা শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ বলিয়াই শুধু গর্ব্ব করি না। সে-যুগে হিন্দু জাতীয়তার গৌরব তাঁহারই জীবনে পরিস্ফুট হইয়াছে। কৃষ্ণধনবাবু যেমন এক দিকে তাঁহার সন্তানদের পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে গড়িতে চাহিয়াছিলেন, অন্য দিকে রাজনারায়ণ বসু ভারতের জাতীয়তার জনকরূপে শ্রীঅরবিন্দের জীবনে অসাধারণ প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিলেন। আমরা শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে এইজন্য বাহ্যতঃ অনেক সময়ে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার গভীর প্রভাব দেখিলেও প্রাচীন ভারতের মর্ম্মপ্রেরণায় তাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা উদ্বুদ্ধ হইতে দেখিয়াছি, সে কথা পরে বলিব।

কৃষ্ণধনবাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রসহ তৃতীয় পুত্র শ্রীঅরবিন্দকে দার্জ্জিলিঙের কন্‌ভেণ্টে বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। ইংরেজী হাবভাবের সহিত পরিচয় করিয়া তাঁহার সন্তানেরা যাহাতে সম্পূর্ণরূপে ইংরেজী ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেদের চরিত্র গড়িয়া তুলিতে পারে, ইহাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য; কিন্তু মাতামহের রক্তধারার অনুপ্রেরণা শ্রীঅরবিন্দের জীবনে ক্রমেই লীলায়িত হইয়া উঠিল। রাজনারায়ণ বসুর উদ্দীপনায় যে জাতীয় সভা স্থাপিত হয় তাহার উদ্দেশ্য ছিল—"হিন্দুদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করা, হিন্দুদিগের জাতীয় ভাব উদ্দীপন করা এবং সাধারণতঃ হিন্দুদিগের উন্নতি সাধন করা।" শ্রীঅরবিন্দ কৃষ্ণধনবাবুর চেষ্টা সত্ত্বেও পরিপূর্ণরূপে সাহেব হইতে পারিলেন না। কিন্তু মাতামহের প্রভাবই তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে আমরা বিশেষ ভাবে মূর্ত্ত হইতে দেখি। দার্জ্জিলিঙের কন্‌ভেণ্টে থাকিয়া শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজী ভাষা খানিকটা অধিগত করিলেন বটে, কিন্তু মাতৃভাষার সহিত একপ্রকার সম্পর্কশূন্য রহিলেন। বিধাতার অব্যর্থ বিধানে তাঁহার জীবনের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হইল

একটি স্বপ্নে। দার্জ্জিলিঙের কন্‌ভেণ্টে থাকিয়া তিনি এক রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন—এক কৃষ্ণকায় বিরাট মূর্ত্তি তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং নিকটে আসিয়া সেই বিরাট পুরুষ শাণিত ছুরিকা উত্তোলন করিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিতে চাহিতেছে। এই কৃষ্ণকান্তি পুরুষের দিকে চাহিয়া তিনি নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে করিলেন। বালকের ক্রন্দনশব্দে অভিভাবিকা 'নানে'রা ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু এই দিন হইতে শ্রীঅরবিন্দের চরিত্রে অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখা গেল। তাঁহার বাল্যকালোচিত ক্রীড়া-কৌতুকাদি এই দিন হইতেই বন্ধ হইয়া গেল। তিনি সর্ব্বদা এই ভীম-কান্তি পুরুষের সন্ধানে ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিতেন। তাঁহার মনে হইত এই অন্ধকারময় পুরুষ তাঁহাকে হত্যা করিবে। তিনি সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন। এই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের হস্তোত্তোলিত ছুরিকা কোনমতেই বুক পাতিয়া লইবেন না এই দৃঢ় সঙ্কল্পে তিনি এই বয়স হইতেই চিন্তাশীল হইয়া পড়িয়াছিলেন।

তারপর ইংলণ্ডে আসিয়া ম্যাঞ্চেষ্টারের ড্রুয়েট সাহেবের বাড়ীতে তাঁহার নূতন পাঠজীবনের আরম্ভ। পিতামহীর সহিত তিনি প্রতিদিন গীর্জ্জায় উপাসনায় অভ্যস্ত হইলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার জীবনে ধর্ম্মানুরাগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু পাদ্রীর নিকট উপাসকমণ্ডলীর প্রতি-দিন পাপ স্বীকারোক্তি তাঁহার মনকে পীড়িত করিত। তাঁহার মুখেই ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শুনিয়াছি—তিনি এই গল্পটি অতিশয় কৌতুকের সহিত করিতেন—একদিন পাদ্রীরা তাঁহাকে পাপ স্বীকার করিতে বলায় তিনি কি যে বলিবেন খুঁজিয়া পাইলেন না। পরিশেষে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, চার্চ্চটি বহু দূরে থাকায় তিনি প্রতিদিন তথায় উপস্থিত হইতে পারেন না—অতএব তিনি অপরাধী। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বিগলিত ধারায় তিনি ক্রন্দনরত হইলেন। পাদ্রীরা তাঁহাকে কোলে লইয়া আদর করিতে করিতে বলিলেন, এই বালকের প্রার্থনায় প্রতি অসাধারণ অনুরাগ। সকলেই সেদিন শ্রীঅরবিন্দের প্রশংসায় মুখর হইলেন। বাল্যকালে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে এই কথাগুলি বলায় তিনি সেই যাত্রা নিষ্কৃতিলাভ করেন। ম্যাঞ্চেষ্টারের পড়া সমাপ্ত করিয়া শ্রীঅরবিন্দ লণ্ডনে আসিয়া সেণ্ট পল স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। পিতার যথারীতি আর্থিক সাহায্য প্রেরণের অনবধানতায় এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের অর্থ-কৃচ্ছ্রতার মধ্যে কঠোর জীবনযাত্রার ইতিহাস আমি তাঁহার মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছি, তাহা "গল্পভারতী"তে প্রকাশ করিয়াছি। এই সকল কথার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজনবোধে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম।

তিনি তরুণ বয়সে "রিভোণ্ট অব ইসলাম" গ্রন্থ পাঠ করিয়া অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার উদ্দীপনা পান। ইহা ছিল তাঁহার প্রিয় গ্রন্থ। তিনি সেণ্ট পল স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া কেম্‌ব্রিজের আই-সি-এস্ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। ভাগ্যের পরিহাসে যে বীচক্রফ্‌ট সাহেবের আদালতে তিনি ভবিষ্যতে আসামীরূপে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই বীচক্রফট সাহেব ছিলেন তাঁহার সহপাঠী এবং প্রত্যেক পরীক্ষায় শ্রীঅরবিন্দ তদপেক্ষা উচ্চ স্থান অধিকার করিতেন। বীচক্রফ্‌ট সাহেব এই সময়ে অধ্যয়ন ব্যাপারে শ্রীঅরবিন্দের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

অনেকেই মনে করেন শ্রীঅরবিন্দ অশ্বারোহণ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ায় আই-সি-এস্ উপাধি লাভ করেন নাই, কিন্তু একথা সত্য নহে। আমি স্বয়ং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের স্বমুখনিঃসৃত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন:

"অশ্বারোহণ পরীক্ষা দিবার প্রভাবে আমি তন্ময় হইয়া যাই। এই সময়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় দুইটী স্বপ্ন দেখি, প্রথমে বৃটেনের ভাগ্যলক্ষ্মীর সাক্ষাৎকার পাই। ভারত-সম্রাটের সিংহাসনের দিকে আমি অগ্রসর হইতে চলিয়াছি। হাসিতে হাসিতে তিনি আমায় অনেক শুভবাণী প্রদান করেন। তারপরই দেখি ত্রিশূল হস্তে এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব। তিনি ভারত-সংস্কৃতির মন্ত্র দিয়া আমায় উদ্বুদ্ধ করেন। আমি ইহারই বাণী শ্রেয়ঃ করিয়া লই। অশ্বারোহণ পরীক্ষায় আমি অনুপস্থিত থাকি। ইহার জন্য মেজদাদার তিরস্কার, কটন সাহেবের কটু ভর্ৎসনা অনেক সহিতে হইয়াছে।"

শ্রীঅরবিন্দ আই-সি-এস্ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়ার কারণ তাঁহার অকৃতকার্য্যতা নহে, পরন্তু যাহা ঈশ্বর-বিধান, তাহাই তিনি অনুবর্ত্তন করিয়া ভারতকে ধন্য করিয়া-ছেন।

শ্রীঅরবিন্দ আরও দুই বৎসর কেম্‌ব্রিজে থাকিয়া "ক্লাসিক্‌স ট্রাইপজ" পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হই-লেন। এই দুই বৎসরকাল তিনি শুধু পড়া লইয়াই ব্যস্ত থাকেন নাই। স্বপ্নে সেই সন্ন্যাসীর দর্শনলাভের পর হইতে তিনি ভারতের সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য ভারত সম্বন্ধে যে-কোনও গ্রন্থ পাইতেন তাহাই পড়িয়া শেষ করিতেন।

তিনি কি জন্য জন্মিয়াছেন, তাহার কারণ তাঁহার নিকট এইরূপে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ভারতের বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্ম-বিষয়ক এবং শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির গ্রন্থগুলিও অধ্যয়ন করি-লেন। দক্ষিণেশ্বরের কথা তাঁহার কানে আসিল। তিনি মনোযোগের সহিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সকল কথা তৎ-কালে প্রকাশিত হইত তাহা পাঠ করিতেন। তিনি আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণের নামও শুনিলেন। তাঁহার বাণীও মর্ম্মগত করি-লেন। এই সময় নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) রাম-কৃষ্ণের মহিমা প্রচারের উদ্যোগ করিতেছিলেন মাত্র।

শ্রীঅরবিন্দ এই সকল সংবাদ মর্ম্ম দিয়া গ্রহণ করিতেন। তাঁহার মনে হইত ভারতের তত্ত্ব শুধু একজনের জীবন দিয়া প্রকাশ হইবে না। অন্ততঃ শত জন ভারত-সংস্কৃতির মহিমা প্রচারে যদি একান্ত তৎপর হয়, তবেই ভারত জগৎ-সভায় তাহার সত্য অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। তিনি ভারত সম্বন্ধে যতই চিন্তা করেন, ততই একপ্রকার চেতনা হারাইয়া অনুভব করেন, কে যেন তাঁহার অন্তরবীণায় অনাহত ঝঙ্কার তুলিয়া বলিতেছে—"অরবিন্দ তুমিই ভারত-সংস্কৃতির কর্ণধার। তোমাকেই ভারতের মহাবাণী প্রচার করিতে হইবে।"

শ্রীঅরবিন্দ ভারতের শাস্ত্র সম্বন্ধে মেকলের মন্তব্য নিরর্থক মনে করিয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ভারত-সংস্কৃতির যত গ্রন্থ ছিল সবই তিনি একে একে নিঃশেষ করিলেন। অন্তরে প্রজ্জ্বলিত হোমানল যেন তাঁহাকে ভারতের সত্য আবিষ্কারে ক্রমেই অধিকতর অনুপ্রাণিত করিল। তিনি এক প্রকার উন্মাদের ন্যায় এই সময়ে ভারতে প্রত্যাগমনের সুযোগ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। কেম্ব্রিজে পাঠ শেষ করিয়াই তাঁহার ভারত অভিমুখে যাত্রা করিবার প্রবল ইচ্ছা হইল। তিনি পিতাকে 'কেবল' করিয়া ভারতে প্রত্যাগমনের জন্য অর্থাদি প্রার্থনা করিলেন। শ্রীঅরবিন্দ পিতাকে গ্রীণ্ডলে কোম্পানীর নিকট অর্থ প্রেরণের কথা জানাইলেন। প্রতিদিন অর্থপ্রাপ্তির আশায় এই কোম্পানীর আপিসে শ্রীঅরবিন্দ যাতায়াত করিতে লাগিলেন। জাহাজ ছাড়িল, কিন্তু কৃষ্ণধনবাবুর অর্থ আসিয়া পৌছিল না। শ্রীঅরবিন্দ নিরাশ হইলেন না, ভারতের ধ্যানমগ্ন হইয়া তিনি সময় অতিবাহন করিতে লাগিলেন। গ্রীণ্ডলে কোম্পানীর একটি জাহাজ এই সময় জলমগ্ন হয়। কৃষ্ণধন-বাবু তাঁহার পুত্রগণ এই জাহাজেই আগমন করিবেন এইরূপ ধারণায় অধীর হইয়া পড়িলেন। গ্রীণ্ডলে কোম্পানীও তারের উত্তর দিয়া জানাইল তাঁহার পুত্রগণ ঐ জাহাজেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। কৃষ্ণধনবাবু এই সংবাদে শোকে একেবারে সংজ্ঞাহারা হই-লেন। তাঁহার সংজ্ঞা আর ফিরিয়া আসিল না।

শ্রীঅরবিন্দ যথাসময়ে পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইলেন। তিনি ভারতাত্মার বাণীমূর্ত্তি রূপে দেশে ফিরিবেন—এই চিন্তায় তাঁহার তনুমনপ্রাণ এ সময়ে এমনই ডুবিয়া থাকিত যে, পিতার মৃত্যুবার্ত্তায়ও তাঁহার চোখে-মুখে কোনরূপ শোকচিহ্ন প্রকাশ পাইল না। তিনি যেন এই সমস্ত ঘটনা হইতেই আপনার স্বরূপ-চৈতন্যকে লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন ভারতের জন্যই তাঁহার জন্ম। তিনি খাঁটি ভারতবাসী রূপে ভারতের ঋতময় ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। এই সময়ে তাঁহার অন্তরে বাহিরে এই প্রস্তুতিই চলিতেছিল। তিনি ভারতের মানচিত্র সম্মুখে রাখিয়া কোথায় গিয়া কি রূপ কর্ম্মক্ষেত্র নিরূপণ করিবেন এই চিন্তায় ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি স্থির করিলেন সর্ব্বাগ্রে বোম্বাই প্রদেশেই তিনি কর্ম্ম করিবেন। কিন্তু ভারতের ভাগ্যদেবতা তাঁহাকে বাংলাদেশেই কর্ম্ম সুরু করিবার নির্দ্দেশ দিলেন। তিনি সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বাংলার গঙ্গাতটে ভারত-সংস্কৃতির জয়-পতাকা প্রোথিত করিবেন। তাঁহার এই ধারণা দৃঢ় হইল যে, পবিত্র বঙ্গদেশই তাঁহার কর্ম্মভূমি হইবে এবং ভাগীরথীতটবর্ত্তী হুগলী জেলাই হইবে তাঁহার কর্ম্মকেন্দ্র। সমগ্র বঙ্গের মধ্যে আবার এই সুরধুনীপ্লাবিত হুগলী জেলাকেই তিনি বাংলার হৃদয়ভূমি বলিয়াছেন। তিনি এই কথা পুনঃ পুনঃ আমাদের শুনাইয়াছেন—"হুগলী আমাদের বাংলার হৃৎপিণ্ড, আর সমগ্র ভারতের হৃদয়ভূমি আমাদের এই বাংলাদেশ।" বাংলার এই পবিত্র তীর্থ-ক্ষেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গের নূপুর-নিক্কণ শুনিয়াছি, হালিসহরে রামপ্রসাদের কণ্ঠে মাতৃনাম ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছে। এই দেশই রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি, এই ভাগীরথী-তীরে কেশবচন্দ্রও জন্মিয়াছিলেন। কামারপুকুরে ঠাকুরের জন্ম-পরিগ্রহ, দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার কীর্ত্তিধ্বজা। এই ভাগীরথীতীরেই স্বামী বিবেকানন্দের মঠ প্রতিষ্ঠা। ১৮৯১-৯২ খ্রীষ্টাব্দেই শ্রীঅরবিন্দের এই সিদ্ধ ধারণা—বাংলাই হইবে ভারতের তীর্থ। সেকথা নিঃসংশয়েই আমরা কি গ্রহণ করিব না?

শ্রীঅরবিন্দ ভারতে ফিরিবার জন্য অতিষ্ঠ হইয়া উঠি-লেন। তিনি ২০ বৎসর বয়ঃক্রমকালেই আপনাকে চিনিয়া লইলেন। এই সময় হইতেই শ্রীঅরবিন্দ নিজের জীবন সম্বন্ধে চিন্তাধারাকে বিদায় দিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের নিয়ামক তিনি ছিলেন না, কিন্তু ঈশ্বর ভিন্ন কেহ তাঁহাকে পরিচালিত করিতেও পারিত না। তিনি কোন এক তৃতীয় হস্তের সঙ্কেতেই এই সময় হইতে চলিতে আরম্ভ করেন। নিদারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতার যুগে ঈশ্বর-নির্ভরতার আশ্রয়ে লণ্ডনেই তিনি ধৈর্য্যসহকারে বাস করিয়াছিলেন। এই বিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালেই তিনি এই তৃতীয় শক্তির সঙ্কেতলাভ করিলেন। তিনি তৃতীয় শক্তিরই হস্তে যখন সম্পূর্ণরূপে নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন, সেই সময়ে কটন সাহেব আসিয়া বরোদার গাইকোয়াড়ের সংবাদ দিলেন। তিনি কটন সাহেবের পরিচয়পত্র লইয়াই বরোদার মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গাইকোয়াড় শ্রীঅরবিন্দকে তাঁহার পার্স্যন্যাল সেক্রেটারী করিতে মনস্থ করিলেন।

বেতন জিজ্ঞাসা করায় অরবিন্দ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পরামর্শ করিয়া জানাইবেন এই কথা বলিয়া বিদায় লইলেন। বড়ভাই বিনয়বাবু ছিলেন অতি অমায়িক লোক। শ্রীঅরবিন্দের প্রয়োজন অতি সামান্য; দুই শত টাকা বেতন হইলে চলিয়া যাইবে, এই কথা বলায় শ্রীঅরবিন্দও গাইকোয়াড়কে এই কথাই জানাইলেন। বরোদার রাজা হাসিলেন। তিনি দুই শত টাকায় একজন আই-সি-এস্‌কে কর্মচারী রূপে পাইয়াছেন এই কথা কৌতুকভরে বরোদার প্রধান সচিবকে জানাইলেন।

শ্রীঅরবিন্দ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২১ বৎসর। তখন কে জানিত শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে যে আগুন ধূমায়িত তাহা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে সারা ভারতে। কে জানিত বাংলার গঙ্গাতীরে জাত এই শিশুও কৃষ্ণধনবাবুর যত্নে ও অধ্যবসায়ে মানুষ হইয়া পিতার অভিলাষ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া বাংলার রত্ন-প্রদীপ রূপেই পরিচিত হইবেন! কে জানিত সেদিন শ্রীঅরবিন্দ ভারত-ঋষির নির্দ্দেশে, ভাগবত শক্তির সঙ্কেতে আপনাকে নবজাতির নরদেবতা রূপে গড়িয়া তুলিবেন? তাই না রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দকে বলিয়াছিলেন, "স্বদেশাত্মার বাণীমূর্ত্তি তুমি"। কে জানিত সেদিন "বন্দে-মাতরমে"র পাতায় পাতায় ভারত-জাতীয়তার অগ্নি-বৃষ্টি করিয়া অতঃপর তিনি ইংরেজের কারাগারকে তীর্থে পরিণত করিবেন? কে জানিত "ধর্ম্মে" ও "কর্ম্মযোগিনে"র ছত্রে ছত্রে স্বদেশ-জননীর বাণী এমন সুমধুর রবে মূর্চ্ছনা তুলিবে? "আর্য্য" পত্রিকার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় গীতার ভাষ্য, বেদের মর্ম্মবাণী, দিব্য-জীবনের পরিচয় দিয়া তিনি ভারতের প্রাচীন আত্মসম্বিৎ ফিরাইয়া আনিবেন? আমি শ্রীঅরবিন্দের প্রথম জীবন-পর্ব্বের ইতিহাসটুকুই এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। ইহার পর ১৮৯৪ হইতে ১৯১০, তারপর ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনে ভারতের জাতীয়তাই বিগ্রহমূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই কথা সহৃদয় পাঠকপাঠিকাদের বারান্তরে শুনাইবার প্রয়াস করিব।

আমার মৃত্যু

শ্রীঅজিতকুমার বসু

আমার মৃত্যুশয্যা!...

বিছানার চারপাশ ঘিরে জড়ো হয়েছে নিকট-আত্মীয়েরা, এমন কি, এমন অনেক মুখ দেখছি, এ বাড়ীতে যাদের পদার্পণ ঘটে কদাচিৎ। দু-তিন জন অন্তরঙ্গ বন্ধুও এসেছে।

আমি সকলের মুখের দিকে মাঝে মাঝে ক্যাল্‌ ক্যাল্‌ করে তাকিয়ে দেখছি! দেখছি, সবারই প্রায় চোখ ছলছল করছে।

স্ত্রী বসে মাথায় হাত বুলাচ্ছে, আর বাঁ হাতে শাড়ীর আঁচল দিয়ে মাঝে মাঝে চোখ মুছে নীরব অশ্রু দমন করবার নিষ্ফল চেষ্টা করছে।...নগেন রয়েছে আমার সামনেই বসে। নগেন আমার প্রথম সন্তান। তার পাশে রয়েছে ছোট একটা ঘটিতে গঙ্গাজল। প্রয়োজনমত মুখে ঢেলে দেবে।

বরেন আমার ছোটবেলার বন্ধু। সেও এসে বসে আছে—সকলের চেয়ে স্থির ও ধীর তার মূর্ত্তি। মৃত্যু সম্বন্ধে অন্ত সকলের যে রকমই মতামত থাকুক না কেন, তার মত একেবারে অন্ত ধরণের, কারণ সে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। নীরবে সে আমার চোখ দুটির দিকে চেয়ে আছে, যেন সেগুলোর নির্ব্বাপিত অবস্থা লক্ষ্য করবার জন্ত—কোন কথা নেই মুখে। কোন আবেগ নেই, নেই কোন উচ্ছ্বাস।

মৃত্যু সম্বন্ধে বহু তর্ক-বিতর্ক হয়েছে বরেনের সঙ্গে। সে বলে, মৃত্যুই সবকিছুর শেষ—তার পরে আর কিছুই নেই। দেহ ও আত্মা পৃথক্‌ কিছু সত্তা নয়; ও বলে, চার্ব্বাক নাকি বলেছেন, দেহই আত্মা। তাই যদি হয় দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার হয় লোপ। আরও ওর মুখে শুনেছি, যত দিন পর্য্যন্ত মানুষের একটা ইন্দ্রিয়ও সক্রিয় থাকে, তত দিনই জীবনের অস্তিত্ব থাকে—যখন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই অচল হয়ে পড়ে, তারই নাম আমরা দিয়েছি মৃত্যু।

আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে কেবলই বরেনের কথাগুলো মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। যদি বরেনের কথা সত্য না হয়, যদি আত্মা বলে পৃথক কোনকিছুর অস্তিত্ব থাকে, তা হলে মৃত্যুকে ভয় পাবার বিশেষ কিছুই নাই। কারণ মৃত্যুর পরে ব্যোম থেকে ঈথরে, ঈথর থেকে বাতাসে ভাসতে ভাসতে আমার অমর আত্মা মানুষের চিরবাঞ্ছিত পৃথিবীতে এক একবার ছুঁ মেরে যেতে পারে। তাতেও খানিকটা যেন তৃপ্তি আছে।

সহসা আমার মনে হ'ল, কেমন করে জানি না—হয়ত মৃত্যু সন্নিকট বলে—বরেনের কথা সম্ভবতঃ মিথ্যা। হিন্দু-শাস্ত্রের গোড়ার কথাই ত মানুষের আত্মা! পণ্ডিতদের মুখে এই কথাই ত শুনেছি বারে বারে, দেহটা কিছুই নয়—একদিন না একদিন এর ধ্বংস আছেই, কিন্তু আত্মা—সে শাশ্বত!...এই

সমস্ত নমস্ত পণ্ডিত ঋষিদের কথা কি মিথ্যা হতে পারে? বরেনের আধুনিক তত্ত্ব নিশ্চয়ই কোথাও গোঁজামিল দিয়েছে!

মনে যেন অনেকটা সাহস ফিরে পেলাম। বরেনের উপরে খানিকটা রাগ হ'ল। নিজে নাস্তিক হয়ে চিরটা কাল কেবল আমাদের ভাঁওতা দিয়ে এসেছে!

আসন্ন মৃত্যুর ছায়ায় কত তুচ্ছ ঘটনাই স্মৃতির দুয়ারে ঘা দিতে লাগল—যেন একটার পর একটা ভেসে আসতে লাগল মানস-নয়নের সামনে চলচ্চিত্রের ছবির মত।

মাকে হারিয়েছি ছোটবেলায়। পিতৃস্নেহের স্নিগ্ধ ছায়ায় বেড়ে উঠেছি তরুলতাটির মত। এই স্নেহময় আবরণের ভেতরেও অকারণ স্বার্থপরতা ও ঈর্ষার হল্‌কা এসে মনকে মাঝে মাঝে বিমুখ করে দিয়েছে সংসারের প্রতি। তখন ও সমস্ত বোঝবার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু পরে বুঝেছি কাকা-কাকীর বাহ্যিক ব্যবহার যতই সহৃদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ হোক না কেন, আসলে সেগুলো ছিল ছদ্মবেশ মাত্র। এমনি আবহাওয়াতেই আমরা, মাতৃহীন বালক-বালিকারা, মানুষ হয়েছিলাম—এক দিকে বিদেশ থেকে প্রেরিত পিতার উপার্জিত অর্থ ও স্নেহ, অপর দিকে চিনি-মাখানো কুইনাইনের মত কাকা-কাকীর ভালবাসা।

কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে কলেজে পাঠ্যাবস্থায় কাল্পনিক প্রেম জেগে উঠল প্রাণে, যেন কচি কিশলয় মানস-তরুতে বিকশিত হয়ে উঠল। নতুন স্বপ্ন বাসা বাঁধল কল্পলোকে, মনের প্রতিটি রন্ধ্র সঞ্জীবিত হয়ে উঠল অকল্পিত রঙে রসে। কিন্তু কোন মেয়েকে প্রেমনিবেদন করতে পারলাম না। সেটা আমার জীবনের ব্যর্থতা কি না আজও বুঝে উঠতে না পারলেও তাতে মনের দিক থেকে কোন ক্ষতি হয়েছে বলে বুঝতে পারি নি। কল্পনায় অনেককিছুই আমি পেতাম এবং কল্পনা অনেক সময়ে আমার কাছে বাস্তবের চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিত। কাব্য হ'ল আমার সঙ্গী, শয়নে ও স্বপনে। তখনই কোথায় যেন পড়েছিলাম—

"Death! to be happy thou art terrible
But how the wretched love to think of thee,
Oh thou true comforter, the friend of all
Who have no friend beside!"

আজ পরপারে যাত্রাকালে কবির নাম আর মনে আসছে না।...রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাও আজ এই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে আমার স্মৃতিতে স্পষ্ট হয়ে জেগে উঠছে—

"ওরা আমার পরাণখানি
সম্মুখে তার দিব আনি,
শূন্য বিদায় করবো না তো উহারে
মরণ যেদিন আসবে আমার দুয়ারে।
* * *
যা কিছু মোর সঞ্চিত ধন
এতো দিনের সব আয়োজন
চরম দিনে সাজিয়ে দিব উহারে
মরণ যেদিন আসবে আমার দুয়ারে।"

...চিন্তার স্রোতে বাধা পড়ল। চমকে উঠলাম—সিঁড়ির উপরে ধুপ্ ধুপ্ করে ভারী পায়ের শব্দ এবং তার সঙ্গে তীক্ষ্ণ কান্নার সুর—"ওমা-গো, কি হ'ল গো! সোনার ভাই আমার কোথায় গেল গো!"—গলার স্বর শুনেই বুঝলাম, আমার দিদি।—কে যেন বাইরে থেকে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, "চেঁচিও না, চুপ কর—এখনও কিছু হয় নি, জ্ঞান আছে।"

দিদি এসে বসল আমার মাথার কাছে। স্নেহময়ী দিদি আমার! আমার চেয়ে চার বছরের বড়, কিন্তু যেন আমার মা! কাকা-কাকীর স্বার্থপর সহানুভূতির ছায়া থেকে আমাদের রক্ষা করবার জন্ত সর্ব্বদাই সতর্ক।...দিদি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আমার পতিব্রতা স্ত্রীর দিকে এমন এক কটাক্ষ হানলে, যেন আমার আসন্ন মৃত্যুর জন্ত ঐ অসহায়া নারীই দায়ী। এটা কিন্তু আমার ভাল লাগল না! —রমার প্রতি কারও অনাদর, অবহেলা বা ভর্ৎসনা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি নে।

আহা, রমার মুখের দিকে যেন তাকানো যায় না! কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো উঠেছে ফুলে, মৃত্যুপথযাত্রীর শিয়রে দিবারাত্র বসে বসে শরীর হয়েছে শীর্ণ, কত দিন বোধ হয় স্নান করবার পর্য্যন্ত অবসর হয় নি, চুলগুলি রুক্ষ ও বিবর্ণ। চিরদিন মুখটি বুঁজে সবই সহ্য করেছে। সংসারে অভাব-অনটনও গেছে মাঝে মাঝে এবং সেটা আমারই অক্ষমতার জন্ত, কিন্তু লাঞ্ছনা-ভোগ করতে হয়েছে তাকে। আশ্চর্য্য আমাদের বাঙালীর সংসার! রমার দিকে তাকিয়ে বারে বারে মনে হতে লাগল শরৎ চন্দ্র নারীকে যে "সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি" আখ্যা দিয়েছিলেন, তিনি অতিরঞ্জিত কিছু করেন নি।

...স্মৃতি যেন ক্রমশঃ ঝাপ্‌সা হয়ে এল। কানে এল, দিদি উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে নগেনকে বলছে, "দে, দে বাপের মুখে একটু গঙ্গাজল দে।"—এই স্বর ভেসে এল যেন বহু দূর থেকে।

চারিদিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকাতে লাগলাম। সকলেই দেখি, যথাসম্ভব উদ্গত অশ্রু সংবরণ করবার চেষ্টা করছে। তবুও থরথর কোঁস্ কোঁস্ শব্দ হচ্ছে জোর করে ক্রন্দনের বেগ রুদ্ধ করবার চেষ্টায়। চেয়ে দেখলাম, আমার ছোট ভাইয়ের —আমার চেয়ে দু' বছরের ছোট—চোখ দুটোও জবাফুলের মত লাল হয়ে উঠেছে। বরেন কেবল শান্তভাবে আমাকে সান্ত্বনা-বাক্য শুনাবার চেষ্টা করছে। বললে, "ভয় নেই, একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর দেখি।"—আর ঘুম! এ ঘুম একবার এলে আর কি জেগে উঠব?—তবু বরেনের কথাকে অগ্রাহ্য

করতে পারলাম না, হাজার হোক, সে আমার বাল্য-সখা, আমার কৈশোর-সাথী আর যৌবনের সহচর। চোখ বুঁজলাম।

চোখের সামনে ভেসে উঠল রমার উদাস মূর্ত্তি, তার বৈধব্য-বেশ। তেইশ বছরের লাবণ্যময়ী তরুণীর নিরাভরণ শুভ্র অঙ্গ আবৃত হয়ে রয়েছে শুভ্র থানধুতিতে। যেন নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি।···রমাকে কোন দিন ভালবেসেছি বলে মনে পড়ল না। চিরদিন স্নেহই করেছি এবং স্নেহের বশে তার যা প্রাপ্য তাকে দিয়েছি অকুণ্ঠিতচিত্তে। তার বেশী আমার কাছ থেকে সে কিছু পেয়েছে বলে মনে হয় না।···বিয়ের পরেই তাকে দেখে মনে হ'ত বুঝি তাকে ভালবেসেছি, কিন্তু কিছুদিন পরেই মনে হ'ল মিথ্যা—মিথ্যা সে ভালবাসা। সকলের মুখেই শুনি নানারকম ভালবাসার কথা, আমার কাছে ঐ শব্দটা যেন হেঁয়ালি মনে হয়। আজও 'ভালবাসার' অর্থ আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি, এই নিয়ে মনের মধ্যে দ্বন্দ্বও হয়েছে বহু —কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় নি। আমার কাছে ভালোবাসা অর্থাৎ প্রেমের একটি অর্থ মনে হয়েছে—যখন একটি হৃদয়ের পূর্ণ বিকাশ হয় আর একটি হৃদয়ে, যখন অন্তরের প্রতিচ্ছবি আর একটি অন্তরের উপর প্রতিফলিত হয়ে তার নিজস্বতাকে ডুবিয়ে দেয়, যখন একটি মনের দীপশিখা আর একটি মনকে সমভাবে প্রজ্জ্বলিত করে—এক কথায় ভিন্ন দুটি দেহ থাকা সত্ত্বেও একটি হৃদয় যখন সম্পূর্ণরূপে আর একটি হৃদয়ে বিলীন হয়ে যায়, তখনই প্রেমের হয় জন্ম। তাই···

···উঃ, মাথাটা ভয়ানক ঝিম্ ঝিম্ করছে, শরীর ক্রমশঃ হয়ে আসছে অবশ। আর বোধ হয় বেশীক্ষণ নয়! পর-লোকের ঢেউ এসে ইহলোকের স্মৃতি যেন মুছে দিতে লাগল।

কাছাকাছি রেডিওতে গান হচ্ছে, তার সুর ক্ষীণভাবে এসে কানে প্রবেশ করছে—

"হে মহামরণ, হে মহাজীবন
লইনু শরণ।"···

আহা, কি গানই রচনা করে গেছেন কবি! প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল! ধন্য কবি তুমি, ধন্য রবীন্দ্রনাথ! মরতে যদি হয়ই, এমনই গান শুনতে শুনতেই মৃত্যুকে বরণ করব।···

ধীরে ধীরে চোখ খুলে সামনেই দেখলাম বিমলাকে, আমার শয্যা থেকে অদূরে দাঁড়িয়ে ছল্ ছল্ চোখে তাকিয়ে রয়েছে আমার মুখের দিকে। টকটকে লাল সিঁদুর শোভা পাচ্ছে তার সীমন্তে; গভীর উদ্বেগের ছায়া তার মুখে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে—তা সত্ত্বেও তারুণ্যের জোয়ার উপ্‌চে পড়ছে তার সর্ব্ব অঙ্গে। ঠোঁট দুটি থেকে থেকে থর থর করে কেঁপে উঠছে—প্রবল চেষ্টায় সে যে অশ্রু সংযত করে রেখেছে তার অবস্থা দেখলেই বেশ বুঝা যায়। বড় মায়া হ'ল; মনে মনে বললাম, বিদায় বিমলা!

বিমলা রমার ছোট বোন, তার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। তার আচার-ব্যবহার, কথার ভঙ্গী সত্যই এক দিন আমার মন জয় করেছিল। তখন ভেবেছিলাম রমাকে ত ঠিক ভালবাসতে পারলাম না, কিন্তু বিমলাকে পেয়েছি। বিমলাই আমাকে জয় করেছে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সমস্ত আশা পণ্ড হয়ে গেল, মনের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে দেখলাম সে যা ছিল তাই আছে। প্রেমের একটি রেখাও সেখানে আঁচড় কাটতে পারে নি। তবুও এ কথা আমি অস্বীকার করব না যে, বিমলার প্রতি আমার কোথায় যেন একটা দুর্ব্বলতা জেগে উঠত যখন তখন। তার চঞ্চল দেহভঙ্গিমায়, তার সজীব মনের পরশে, তার অনিন্দ্যসুন্দর কটাক্ষে যেন নূতন এক প্রাণের উৎসের সন্ধান আমি পেয়েছিলাম, এমনিভাবে আর কোন মেয়ে আমার চোখে ধরা দেয় নি। তা সত্ত্বেও আমার মনে সে প্রেমের শিখা জ্বালাতে পারল না, জ্বালিয়ে রাখল প্রীতির স্নিগ্ধ প্রদীপ।

ইশারায় ডাকলাম বিমলাকে। এগিয়ে এসে আমার পাশে বিছানার উপর বসে আমার মুখের কাছে ঝুঁকে মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "কিছু বলবেন?"

আমি বললাম, "হাঁ, সেই গানটা গাও ত—'সম্মুখে শান্তির পারাবার'।"—কিন্তু কেউ আমার কথা শুনল না, কেউ আমার ভাষা বুঝল না, কারণ যে কথা আমি স্পষ্ট উচ্চারণ করেছি বলে মনে হ'ল, আসলে তা আমার কণ্ঠ থেকে নির্গত হয় নি।

দিদি আমার মাথায় হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "বিমলাকে কিছু বলবি?"

আমি বিমলার হাতদুটো চেপে ধরে আবার আমার মনের কথা ব্যক্ত করলাম, কিন্তু ফল একই হ'ল। দেখলাম, রমা এবারে ফুঁপিয়ে উঠল। আমারও চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল গালের উপর, আর এতক্ষণের জমানো অশ্রু শতধারা হয়ে বিমলার চোখ থেকে নেমে এল—তার তপ্ত ফোঁটা আমার হাতের উপরে টপ্ টপ্ করে ঝরে পড়ল।··· ছোট ঘরখানির প্রতিটি কোণ থেকে কান্নার রোল ভেসে উঠল···।

আমি চীৎকার করে উঠলাম, "আমি যাব না, আমি যাব না—তোমাদের ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।"

"না না, কোথায় যাবি, এই ত আমরা সকলেই রয়েছি এখানে।"—পিতার কণ্ঠস্বর।

···চোখ খুলে দেখলাম, আমি শুয়ে রয়েছি হাসপাতালের একটা কেবিনে। পাশে রয়েছেন আমার পিতা—রমা মাথার কাছে বসে বাতাস করছে, পায়ের কাছে বসে রয়েছে তাই ও বিমলা।

···এ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ অপারেশন করাতে এসে ক্লোরো-ফর্মের মাদকতা যে আমার মনে কি অদ্ভুত প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, আজ ভাবলে কেবল হাসিই পায়।

প্রাচীন কালের গ্রন্থাগার

শ্রীবিমলকুমার দত্ত, এম্-এ

বর্ত্তমান যুগে গ্রন্থাগার বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় প্রাচীন কালের সুসভ্য জাতিসমূহের মধ্যে ঠিক সেরূপ গ্রন্থাগার ছিল কিনা বলা কঠিন। তবে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, প্রাচীন এসিরিয়া, ব্যাবিলন, মিশর, গ্রীস, রোম, ভারত ও চীনদেশে বর্ত্তমান যুগের মতই বিরাট গ্রন্থাগারসমূহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভাষা বা অক্ষর প্রচলনের বাঁধাবাঁধি ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত গ্রন্থ বা গ্রন্থাগারের কোন প্রশ্নই ছিল না। সেযুগে মানুষ সাধারণতঃ আদিম চিত্রশিল্পের সাহায্যে এবং আভাসে ইঙ্গিতে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান করিত। সেজন্ত অক্ষর-প্রচলন ইতিহাসের মূল অনুসন্ধান করিলে চিত্রাক্ষরের মধ্য দিয়া অক্ষর-বিবর্ত্তনের ইতিহাসটি নজরে পড়ে। পেপিরাস, তালপাতা বা ভূর্জ্জপত্র ব্যবহারের বহুপূর্ব্ব হইতেই পাথর বা পোড়া মাটির উপর লিখিবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ইহা ব্যতীত চীনের হোনান প্রদেশে আবিষ্কৃত সাং যুগের (১৩-১৪শ খ্রীঃ পূঃ) কতকগুলি পুরাবস্তুর সহিত অক্ষরযুক্ত অস্থি-খণ্ডগুলি প্রমাণ করে যে, পাথর ও মৃত্তিকা ব্যতীত অস্থির উপরও লিখিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল।* কাগজ বা অনুরূপ কোন পদার্থের আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যাপক ভাবে গ্রন্থ বা গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠার রীতি ছিল না। সে কারণ ইহা রাজ-প্রাসাদ কিংবা ধর্ম্মগৃহসমূহের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিত।

১০৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে টাইলুন নামক জনৈক ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম কাগজ আবিষ্কার করেন। অরেল ষ্টাইনের মতে টাইলুন জীর্ণ বস্ত্রাংশ, গাছের ছাল এবং পশুলোমের সাহায্যে কাগজ প্রস্তুত করেছিলেন।† কাগজের ইংরেজী প্রতিশব্দ—পেপার এবং পেপিরাস গাছ হইতে কাগজ তৈয়ারী হয় বলিয়া "পেপার" কথার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন মিশরের পুইয়েমেরী কবরগাত্রস্থ চিত্র হইতে (১৪৫০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ) পেপিরাসের চাষ ও তাহা হইতে কাগজ প্রস্তুত করণের বিশেষ ইঙ্গিত পাওয়া যায়।‡ ভারত, গ্রীস ও আরবদেশ যে চীনের নিকট হইতে কাগজ প্রস্তুতকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, সে যুগে (৩২০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ) ভূর্জ্জ, তাল এবং পত্রম্ এই তিনটি দ্রব্যের উপর লেখাপড়ার যাবতীয় কাজ সমাধা হইত।* সম্ভবতঃ ৭ম শতাব্দীতে ভারতে প্রথম কাগজের প্রচলন সুরু হয়, কিন্তু ব্যাপকভাবে নয়।† ৮ম এবং ১১শ শতাব্দীর শেষভাগে যথাক্রমে আরব ও গ্রীসদেশে কাগজের ব্যবহার চালু হয়।‡

এসিরিয়া ও ব্যাবিলনের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারে স্যর এইচ. লেয়ার্ড ও বোটার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে নিনাভে নগরীর খননকার্য্যের ফলে স্যর লেয়ার্ড এক প্রাচীন গ্রন্থাগারের সন্ধান পান। নিনাভে নগরীর উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত এক প্রাসাদের কয়েকখানি ঘর ত্রিভুজাকৃতি অক্ষরে লিখিত ক্ষুদ্র মৃত্তিকা-স্তূপে পরিপূর্ণ ছিল। ইহারা আকারে এক ইঞ্চি হইতে এক ফুট পর্য্যন্ত। এই মৃত্তিকা-স্তূপগুলি ছিল অসুরবাণী পালের গ্রন্থাগার। প্রায় বিশ হাজার অনুরূপ মৃত্তিকা-স্তূপ পাওয়া গিয়াছে এবং সেগুলি ধারাবাহিক ভাবে সাজানো। নিপ্পুরে যে গ্রন্থাগারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতেও দেখা গিয়াছে যে, বইগুলি সব আগুনে পোড়ানো মৃত্তিকা-স্তূপ বা মাটির টালী। একটির পর একটি সযত্নে রক্ষিত, যেন পুঁথির এক এক-খানি পাতা। এই নিপ্পুরেই খ্রীঃ পূঃ ১১৮২ অব্দে বেল-এর মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

প্রাচীন মিশরে খ্রীষ্ট-জন্মের প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে বহুসংখ্যক লিপিকার রাজাদেশে রাজার জীবনী ও সমসাময়িক ঘটনাবলী লিখিয়া রাখিবার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ব্যাবিলনের যুগে হেলিওপোলিশ ছিল বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র। সেকালে মন্দিরে মন্দিরেও ধর্ম্মগ্রন্থাদি নকল করিবার জন্ত লেখক নিযুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। মিশরে আবিষ্কৃত পুরাবস্তুসমূহের মধ্যে লেখক বা লিপিকারের যে সম্পূর্ণ ও সুন্দর মূর্ত্তিটি দেখা যায় তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।§ এডফু নামক নগরীতে যে প্রাচীন গ্রন্থাগারের সন্ধান পাওয়া

---

* *Migration of Paper from China to India.* P. K. Gode. P. 209. (Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona).

† *Vide* his report on his Explorations in Central Asia called—Serindia. (Sec. 4, Chap. XVIII, pp. 771-7).

‡ In the tombs of Puyemere (1450 B.C.) there are paintings of Papyrus Harvest. These pictures show how the stalks were pulled up in the marshy lakes, tied up into bundles and carried ashore. The beginning of the paper-making is also taking place, for the figure to the right is peeling off the hard exterior coating from one of the stalks. (Egyptian wall paintings of XVIII and XIX Dynasties—*Metropolitan Museum of Art,* New York, 1930).

* Kautilya's *Arthasastra* : Sham Sastry's translation, pp. 108, 1929.

† *I-tsing's Record* (671-695). Translated by J. Takakusu, Oxford, 1896.

‡ *Journal of the American Oriental Society,* June, 1941.

§ *Outline of the History of the World* by Davies, p. 22 of 1937 Ed.

গিয়াছে তাহা মন্দিরের একটি গৃহে রক্ষিত এবং মন্দিরের প্রাচীরে গ্রন্থাগারের সম্পূর্ণ পুস্তক-তালিকাটি উৎকীর্ণ ছিল। মিশরের নানা স্থানে এইরূপ মন্দিরে রক্ষিত গ্রন্থাগার এবং ইহা ব্যতীতও দ্বিতীয় পিরামিডের প্রতিষ্ঠাতা খাফরার এবং সম্রাট খুফুর (IV Dynasty) গ্রন্থাগারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

সম্রাট ওসিমান্দিয়াসের গ্রন্থাগার মিশরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়া জানা যায়। উক্ত গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুরাতন লিপিটিতে গ্রন্থাগারটির যে সুন্দর নামকরণ ছিল তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, সেযুগে গ্রন্থাগারগুলিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা হইত। ডিওডোরাসের অনুবাদ অনুযায়ী উক্ত প্রাচীন লিপিটির অর্থ "Dispensary of the Soul" অথবা "আত্মার চিকিৎসালয়।" ওসিমান্দিয়াস সম্রাট দ্বিতীয় রামসেস ব্যতীত অপর কেহই নন (১৩০০-১২৩৬ খ্রী: পূ:)। উক্ত গ্রন্থাগারটি পশ্চিম থেবেসে রামসাউস্ নামক স্থানে রক্ষিত ছিল। এমেন এম হাপ্ট উক্ত গ্রন্থাগারের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। গ্রন্থাগার ব্যতীত বহু রাজদপ্তরখানার সন্ধান পাওয়া যায়। অনুরূপ একটি রাজদপ্তরখানায় বিখ্যাত টেল-এল-আমরণের লিপিগুলি (১৩৮০-১৩৬৫ খ্রী: পূ:) আছে। পারসীক আক্রমণে প্রাচীন মিশরের বহু গ্রন্থাগার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, আবার কতকগুলি হইতে পুথিপত্রাদি পারস্যে আনা হয়।

প্রাচীন কালের গ্রন্থাগার-প্রতিষ্ঠা আন্দোলন সম্পর্কে গ্রীসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে, পিসিসট্রেটস্ নামক এক ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম গ্রীসে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। আউলুস সেলুসের নিজের লেখা হইতে জানা যায় যে, ৬০০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে তিনি একটি সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরে জরথুষ্ট্র কর্ত্তৃক উহা পারস্যে নীত হয়। জেনোফোন যে ইউথিডেমুসের গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতেন তাহা তাঁহার নিজের লেখা হইতে প্রমাণিত হয়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সংগ্রাহক হিসাবে ইউক্লিড, ইউরিপিডাস, এরিষ্টটল ও প্লেটোর নাম উল্লেখযোগ্য। এরিষ্টটলের গ্রন্থাগার বহু স্থান ঘুরিয়া অবশেষে রোমে আনীত হয়।

প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারসমূহ বিশেষ প্রসিদ্ধ। টলেমী ফিলাডেলফুসের রাজত্বকালে নানাভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে উৎসাহিত করা হয়। তিনি নানা দেশ হইতে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া বিশেষ ভাবে তৈয়ারী একটি গ্রন্থাগারে সেগুলি রাখিবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী সম্রাট টলেমী ইউ এর গেটেশ বিদেশী বণিক ও রাজদূতগণ যে সমস্ত পুস্তক সঙ্গে করিয়া আনিতেন তৎসমুদয় নিজস্ব গ্রন্থাগারে রাখিবার জন্য বলপূর্ব্বক বাজেয়াপ্ত করিতেন। পুস্তকাধিকারীকে বাজেয়াপ্ত পুস্তকের আসলখানি রাখিয়া একখানি নকল দেওয়া হইত।

আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারসমূহের মধ্যে ব্রুকিয়াম ও সেরাপিয়াম নামক স্থানের গ্রন্থাগারদ্বয় বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ব্রুকিয়ামে ৪৯০,০০০ ও সেরাপিয়ামে ৪২,৮০০ খানি পুস্তক ও পুথি রক্ষিত ছিল বলিয়া জানা যায়। সীজার যখন আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের জাহাজসমূহে অগ্নিসংযোগ করেন তখন কোনক্রমে উক্ত গ্রন্থাগার দুইটির মধ্যে বড়টি অগ্নিকাণ্ডের ফলে ভস্মীভূত হয়। ইহার পর হইতে সেরাপিয়ামের গ্রন্থাগারটি প্রধান গ্রন্থাগার হিসাবে গণ্য হইত, কিন্তু পরে এণ্টনি উক্ত অগ্নিকাণ্ডের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাঁহার পারগামাসের গ্রন্থাগারটি ক্লিওপেট্রাকে দান করিয়াছিলেন। ক্লিওপেট্রার পরেও বহু দিন পর্য্যন্ত বিখ্যাত গ্রন্থাগার-কেন্দ্র হিসাবে আলেকজান্দ্রিয়ার যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল, কিন্তু ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে সেরাসিনদের আক্রমণে আলেকজান্দ্রিয়া চিরতরে বিনষ্ট হয়।

রোমের সমৃদ্ধিকালে সেখানেও কতিপয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারের সন্ধান পাওয়া যায়। রোমের রাজারা অধিকৃত রাজ্যের সম্পত্তির সহিত গ্রন্থাগারগুলিও স্বদেশে আনয়ন করিতেন। ১৬৭ খ্রী: পূ: এমীলাস পলাস মেসিডোনিয়া এবং ৮৬ খ্রী: পূর্ব্বাব্দে সুলা এথেন্স হইতে লুণ্ঠিত সম্পত্তির সহিতও উক্ত স্থান দুইটির গ্রন্থাগারগুলিকে নিজ নিজ দেশে আনয়ন ও প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাট অগাষ্টাস রোমে সর্ব্বপ্রথম সাধারণের ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া জানা যায়। অগাষ্টাসের পর টাইবেরিয়াসও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। রাজানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে "উলপিয়াস" গ্রন্থাগার বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহা উলপিয়াস ট্রজান কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত গ্রন্থাগারে রাজকীয় যাবতীয় দলিলপত্রাদি রাখা হইত। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরও পোপ এবং অন্যান্য ধর্ম্মযাজকগণ বিরাট আকারের বহু গ্রন্থাগার গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

প্রাচ্য দেশসমূহের মধ্যে প্রাচীন চীন ও ভারতে গ্রন্থের বা পুথির যথেষ্ট সমাদর ছিল। অন্যান্য প্রাচীন সুসভ্য দেশের ন্যায় ভারত ও চীনে পুথিপত্র, লিখন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্য ধর্ম্মের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। চীনদেশে প্রাচীনকালে সাধারণ পুস্তকাগার ছিল কি না তাহা সঠিক ভাবে জানা যায় না, তবে প্রত্যেক রাজদরবারে, সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণের গৃহে ও ধর্ম্মমন্দিরে গ্রন্থশালা রাখার বিশেষ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২২০ শতাব্দীতে চীন সম্রাটকর্ত্তৃক গ্রন্থাদি সংগ্রহের প্রচেষ্টা হইতেই প্রথম গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়। সিয়াও-উ ১৩০-৮৬ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ কালের মধ্যে পুথিপত্র সংগ্রহ করিয়া একত্র রাখিবার সুব্যবস্থা করেন। লিউ সিয়াং নামক জনৈক পণ্ডিত ৮০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে সর্ব্বপ্রথম উক্ত গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিযুক্ত হন। ভারতের সহিত যোগসূত্র স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে চীনে পুথিপত্র নকল করায়, ভারতীয় হইতে চীনা

তাহার অনুবাদ করার এবং সেই সকল পুথি সযত্নে ও সুশৃঙ্খলায় রাখার প্রচেষ্টা নানাভাবে বৃদ্ধি পায়। হানদের রাজত্বকালে চীনে ভারতীয় সাহিত্যের বিশেষ প্রভাব বিস্তার লাভ করে। প্রায় ১৪০০ ভারতীয় গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। অনুবাদকদিগের মধ্যে "চা-চিয়েন" ও কুমারজীবের নাম উল্লেখযোগ্য। চা-চিয়েনের অনূদিত "অবদান শতক", "সুখাবতী" ও "মাতঙ্গপুত্র" প্রভৃতি পুস্তক বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ ও জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে।

চীনে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের সুপ্রচলনের অন্যতম প্রধান কারণ ঐ দেশে সর্ব্বপ্রথম কাগজ ও ছাপার আবিষ্কার।* সর্ব্বপ্রথম ছাপা পুথির সন্ধান চীন দেশেই পাওয়া যায় এবং উহা ৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে।† ইহা বৌদ্ধ-সূত্র সংক্রান্ত একখানি পুথি।

প্রাগৈতিহাসিক যুগকে বাদ দিলে ভারতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বেদের যুগই সর্ব্বপ্রাচীন। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোয় আবিষ্কৃত পুরাবস্তসমূহের মধ্যে নানা প্রকার শীলমোহরে অক্ষরের প্রচলন দেখা যায়, কিন্তু আজিও সে যুগের কোন ধারাবাহিক গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বৈদিক যুগ ছিল শ্রুতি ও স্মৃতির যুগ, সে কারণ গ্রন্থ বা পুথি-পত্রের প্রয়োজন সেযুগে আদৌ ছিল না। ম্যাক্সমূলারের মতে সূত্রের শেষ যুগে সম্ভবত: ভারতে লিখন-ব্যবস্থার প্রথম প্রচলন হয়।‡

ভারতের ইতিহাসে বৌদ্ধযুগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিস্তার, প্রচার ও ভারতের বাহিরে তাহা প্রসারলাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও দর্শনসংক্রান্ত তথ্যগুলি লিখিয়া রাখিবার প্রয়োজন প্রবল ভাবে দেখা দিল।

প্রাচীন ভারতে তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিখ্যাত পুথি-শালা ছিল তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। চীনা পর্য্যটক ফা-হিয়েন ও ইৎসিংয়ের বা ইচিং-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, সে সময়ে পাটলিপুত্র, তাম্রলিপ্ত ও নালন্দায় উন্নত ধরণের বিরাট পুথিশালাসমূহ ছিল। ইহাদের মধ্যে নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের "রত্নোদধি" নামক পুথিশালার নাম সর্ব্বাগ্রে করিতে হয়। তিব্বতের ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায়, তিনটি প্রকাণ্ড অট্টালিকায় পুথিশালাটি রক্ষিত ছিল। অট্টালিকা তিনটির নাম যথাক্রমে—রত্নসাগর, রত্নোদধি ও রত্নরঞ্জক। পুথিশালার সমগ্র অঞ্চলটি ধর্ম্মগঞ্জ নামে সুপরিচিত ছিল। একমাত্র "রত্নরঞ্জক" গৃহটি নয় তলাবিশিষ্ট ছিল। ইহা হইতে সমগ্র পুথিশালা অঞ্চলটির বা সমস্ত ধর্ম্মগঞ্জের একটি আঁচ করা সম্ভব। কোন স্বার্থপর ভণ্ড সাধুর প্ররোচনার ফলে পুথিশালাটি অগ্নিকাণ্ডে বিনষ্ট হয়। ডক্টর রাধাকুমুদ মুখো-পাধ্যায়ের *Ancient Indian Education* নামক পুস্তকে উক্ত অগ্নিকাণ্ডের যে বিবরণ আছে তাহা উদ্ধৃত করা গেল:

"After the Turuskha raiders had made incursions in Nalanda, the temples and the chaityas there were repaired by a sage, named Mudita Bhadra. Soon after this, Kukutasiddha, minister of the king of Magadha, erected a temple at Nalanda and while a religious sermon was being delivered there, two very indigent Tirthika mendicants appeared. Some naughty young novice monks in disdain threw washing water on them. This made them very angry. After propitiating the sun for twelve years, they performed a *yajna*. Fire sacrifice and threw luring embers and ashes from the sacrificial pit into the Buddhist temples. This produced a great conflagration which consumed Ratnodadhi."

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীলা নামক পুথিশালা দুইটি বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। প্রথমটি বিহারের এক শহরে ও দ্বিতীয়টি গঙ্গার উত্তর তীরে বিক্রমশীলা নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। প্রথমোক্তটি বক্তিয়ার খিলজীর দ্বারা ভস্মীভূত হয়। বিক্রমশীলা ও বাংলার জগদ্দল বিহারের পুথিশালা দুইটি ঐ একই ভাবে বিনষ্ট হয়। মুসলমানদের আক্রমণে যখন সমস্ত পুথিপত্র নষ্ট হইতে সুরু হইল তখন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা কিছু কিছু মূল্যবান পুথি সঙ্গে লইয়া নেপাল, তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশে চলিয়া গেলেন।

ভারতে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার আন্দোলনে জৈনদিগের দানও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুজরাট ও কাথিয়াওয়াড়ে জৈন সন্ন্যাসীদের আবাস-সংলগ্ন বহু পুথিশালা ছিল। পত্তন, সুরাট, কাম্বে ও আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানের গ্রন্থাগারসমূহ "জৈন-ভাণ্ডার" নামে খ্যাত। পত্তনের জৈন-ভাণ্ডার সম্পর্কে অধ্যাপক পিটারসন লিখিয়াছেন:

"I know of no town in India and only a few in the world which can boast of so great a store of documents of such venerable antiquity. They would be the pride and jealously guarded treasures of any University library in Europe."

১১শ, ১২শ ও ১৩শ শতকে কুমারপাল ও বাস্তপাল প্রভৃতি বিচক্ষণ সম্রাটদের সাহায্যে এবং উৎসাহে জৈনধর্ম্ম ও জৈনগ্রন্থ পঠন-পাঠনের নানাপ্রকার সুব্যবস্থা হয়। আলাউদ্দিনের আক্রমণের ফলে গুজরাটের জৈনেরা সমস্ত পুথিপত্র সহ যশলমীরে পলায়ন করেন। এখনও সে সকল স্থানে বহু পুথির সন্ধান পাওয়া যায়।

---

* *The Invention of Printing in China and Its Spread Westward*, by Thomas Francis, New York, 1931.

† Seligman's article on "The Roman Orient and the Far East." Smithsonian Report, 1938, pp. 568.

‡ *Ancient Sanskrit Literature* by Maxmullar, Panini office, Allahabad, pp. 257.

প্রাচীন কাল হইতে ভারতের বিভিন্ন ধর্মমন্দিরে কিছু কিছু পুথিপত্র রাখার ব্যবস্থা রহিয়াছে। রাজসাহী, ময়মনসিংহ, পাবনা, ত্রিহুত, মহীশূর, বারাণসী প্রভৃতি স্থানের মঠমন্দিরে রক্ষিত ধর্মপুস্তক-সংগ্রহগুলির কথা উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন ভারতে জ্ঞান বিতরণের উপর কিরূপ গুরুত্ব আরোপ করা হইত তাহার কথঞ্চিৎ আভাস নিম্নপ্রদত্ত মনুর শ্লোকটি হইতে পাওয়া যাইবে:

যো দদ্যাৎ জ্ঞানমজ্ঞানম্,
কুর্য্যাৎ ধর্ম্ম দর্শনম্;
স কৃৎস্নাং পৃথিবীং দদ্যাৎ,
তেন তুল্যং ন তদ্ ভবে।

মালাবারের লৌকিক সংস্কার

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

মালাবার এক বিচিত্র দেশ। ইহার উৎপত্তি-রহস্য অতীব বিচিত্র। কথিত আছে, ভগবান পরশুরাম এই জনপদের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পাপক্ষালনের জন্য তিনি ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদানের সঙ্কল্প করেন। এতদুদ্দেশ্যে ভার্গব জলধিপতি বরুণ-দেবকে কিঞ্চিৎ ভূমির ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে বরুণদেব আরব সাগরকে কিছু পরিমাণ ভূমি ছাড়িয়া দিতে আদেশ দেন। সাগর তাঁহার আদেশ অপৌণে প্রতি-পালন করেন। ফলে বর্ত্তমান মালাবারের উৎপত্তি হয়। ইহা উত্তরে গোকর্ণম্ হইতে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পশ্চিম প্রান্ত আরব সাগরের জলরাশি দ্বারা বিধৌত এবং কোয়েম্বাটোর, কুর্গ ও মহীশূরের কিয়দংশ পূর্ব্ব-সীমা নির্দ্ধারণ করিতেছে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে এই কিংবদন্তীর মধ্যে পুরাতত্ত্বের কিছু আভাস পাওয়া যায়। এক কালে কন্দাদিকোদম্ গিরিমালার সানুদেশ পর্য্যন্ত আরব সাগর বিস্তৃত ছিল বলিয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন। কালক্রমে প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ভূ-স্তরের পরিবর্ত্তনে আরব সাগরের জলদেশের কতক অংশ ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। এই নবগঠিত ভূ-খণ্ডই মালাবার নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। ভাষা-বিজ্ঞানীরা বলেন, 'কদালাদিকোদম্' শব্দের অপভ্রংশ হইতেছে কদাদি-কোদম্। ইহার অর্থ—সমুদ্র-বিধৌত। এই ভূভাগে সামুদ্রিক জীব-জন্তুর বহু 'ফসিল' আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, পূর্ব্বে এই স্থানে সমুদ্র ছিল।

মালাবারের স্থানে স্থানে বহু প্রাচীন অট্টালিকা, কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল প্রাচীন নিদর্শনের সঠিক তারিখ নির্ণয় করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। সাধারণের বিশ্বাস, দৈত্যগণ এগুলির নির্ম্মাতা। এই দানবেরা প্রকাশ্য দিবালোকে বাহির হয় না, সর্ব্বদা লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করে। রাত্রিকালে তাহাদের কাজ সুরু হয় এবং রাত্রির অবসানে উহার পরি-সমাপ্তি ঘটে। দৈত্যপ্রধান তাহাদের দৈনন্দিন কর্ম্মসূচী নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। যে-কোন নির্দ্দিষ্ট কাজ প্রভাতের পূর্ব্বেই শেষ করিতে হয়। যদি কোন কাজ এক রাত্রির মধ্যে নিষ্পন্ন না হয় তবে উহা অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। কর্ম্মরত কোন দানব মনুষ্যের দৃষ্টিপথে পতিত হইলে কার্য্য হইতে তৎক্ষণাৎ বিরত হয়।

মালাবারের পাহাড়-পর্ব্বত সম্বন্ধে এক করুণ কাহিনী প্রচলিত আছে। সাধারণের বিশ্বাস, এই সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশে ভূত-প্রেত দৈত্য-দানা বসবাস করিয়া থাকে। একদা মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন কতিপয় গুণী ব্যক্তির অনিষ্টসাধন করিবার চেষ্টা করায় তাঁহারা উহাদিগকে মন্ত্রবলে প্রস্তরীভূত করেন। মালাবারে অনেক সময় রাত্রিতে বিভিন্ন স্থানে আলো জ্বলিতে দেখা যায়। তত্রত্য লোকেরা এই আলো অত্যন্ত ভয়ের চোখে দেখিয়া থাকে। একজাতীয় ভূত-প্রেতের মুখ-গহ্বর হইতে নাকি এই আলোক-কণা বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে। এই ভূত-প্রেতসমূহ মৎস্যশিকার করিয়া জীবনধারণ করে। এই প্রেত-যোনিরা অন্যান্য সগোত্রীয়দের মত রাত্রির অন্ধকারে স্ব স্ব আবাসস্থল হইতে নৈশ-অভিযানে বহির্গত হইয়া থাকে; কিন্তু মানুষের সাড়া পাইলেই ইহারা অদৃশ্য হইয়া যায়। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আলোচনা করিলে দেখা যায়, এই আলোকমালা আলেয়া ভিন্ন আর কিছুই নয়। কারণ মেঘলা অথবা কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রিতেই এইগুলি সচরাচর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

মালাবারের অধিবাসিগণ অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু। ইহাদের ধারণা সকল প্রকার সংক্রামক রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেন কালীমাতা। তাঁহার বহু কন্যা আছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে ইঁহাদের অপরিসীম প্রভাব এবং এই সকল স্থানে কালীমাতার নির্দ্দেশক্রমে ইঁহারা স্বীয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া

থাকেন। কোন অঞ্চলে কলেরা এবং বসন্ত মহামারীরূপে দেখা দিলে তথাকার অধিবাসীরা এই দেবীগণকে আবাহন করিয়া থাকে। তাঁহারা এক স্থানে সম্মিলিত হইলে যথাযোগ্য পূজা-অর্চ্চনার বন্দোবস্ত হয়। পূজায় তুষ্ট হইলে দেবীগণ মহামারী দূরীকরণে নিজেদের সম্মিলিত তেজ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এইভাবে স্থানীয় অধিবাসিগণ ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি বসন্তরোগে আক্রান্ত হইলে সেই এলাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বিশেষ অর্ঘ্য প্রদান করা হয়। তখন দেবী একজন পুরুষ প্রতিনিধির দেহে ভর করিয়া রোগীর গৃহে উপনীত হন। লোকটির পরিধানে লাল রঙের কৌপীন এবং কটিদেশে একটি ধাতব কোমর-বন্ধ; কোমর-বন্ধের সঙ্গে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ঘণ্টা ঝুলিতে থাকে। তরবারি হস্তে লম্ফঝম্প ও চীৎকার করিয়া বসন্তের অপদেবতাকে সে বিতাড়িত করিয়া দেয়। কালীমাতার দৈনন্দিন পূজা আদিগল নামক অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোকের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়।

কালীমাতার বাৎসরিক উৎসব 'ভরনী' নামে খ্যাত। ইহা প্রতি মার্চ্চ অথবা এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পুণ্যলোভাতুর হাজার হাজার যাত্রী এই উৎসবে যোগদান করে। এই পর্ব্ব উপলক্ষ্যে বহু মোরগ দেবীর বেদীমূলে বলি দেওয়া হয়। লোকের বিশ্বাস, মোরগী-বলির সংখ্যার উপর যাত্রীগণের পুণ্যসঞ্চয়ের মান যথেষ্ট নির্ভর করে। এই ভরনী উৎসবের আর একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। কোন ব্যক্তি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইলে তাহার আত্মীয়স্বজন দেবীর নিকট মানত করে। ইহাকে 'তুলাভরম্' অনুষ্ঠান বলে। অবশ্য বৎসরের অন্য সময়েও ইহা পালন করা হয়। তুলাদণ্ডের এক দিকে রোগী এবং অপর দিকে সোনা স্থাপন করিয়া দেবীর সম্মুখে ওজন করা হয়। ওজন করার পর জিনিসগুলি দেবীর চরণে উৎসর্গ করা হয়। ভরনী-দিবসের পূর্ব্বদিন যাত্রীদলকে তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। কারণ এই দিবস হইতে মন্দিরদ্বার সপ্তাহকাল বন্ধ থাকে।

দৈত্যরাজ মহাবলীর রাজত্ব মালাবারের জাতীয় জীবনের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস—এইরূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত। দেবগণ দানবপতির প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। মহাবলীকে রীতিমত শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তাঁহারা বিষ্ণুকে অনুরোধ করেন। দেবগণের আকুল আবেদনে ভগবান বামনরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। ইহা বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার। তিনি একদিন মহারাজাধিরাজ মহাবলীর সকাশে উপনীত হইলেন। বামনরূপী ভগবানের অপরূপ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া দৈত্যরাজ তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইলেন। অধিকন্তু বামনের মনোমত প্রার্থিত বস্তু প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ হইলেন। তখন ছদ্মবেশী বিষ্ণু স্মিতহাস্যে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করিলেন। তৎক্ষণাৎ মহাবলী তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। কি আশ্চর্য্য! দেখিতে দেখিতে বামনের ক্ষুদ্রদেহ বিরাট আকার ধারণ করিল। উপস্থিত জনগণ পরম বিস্ময়ে দেখিল,

গুণীকর্তৃক ভূত বিতাড়ন

ত্রিপাদ ভূমি পূরণ করিতে আরও কিছু ভূমির প্রয়োজন। অগত্যা মহাবলী স্বীয় মস্তকে ভগবানের তৃতীয় চরণ ধারণ করিয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন। ভগবান দৈত্যরাজকে পাতালে পাঠাইলেন। কিন্তু প্রজারঞ্জক রাজাকে হারাইয়া সমস্ত জনপদবাসী শোকে অভিভূত হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। ইহাতে দয়াপরবশ হইয়া বামনরূপী ভগবান মহাবলীকে প্রতি বৎসর একবার করিয়া স্বরাজ্যে আসিবার অনুমতি প্রদান করেন। দৈত্যরাজের পুনরাগমন সাধারণতঃ আগষ্ট অথবা সেপ্টেম্বর মাসে হইয়া থাকে। তাঁহার এই আগমন উপলক্ষ্যে সমস্ত জনপদ উৎসবানন্দে মুখরিত হইয়া উঠে। পাঁচ-ছয় দিনব্যাপী এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভূতপূর্ব্ব রাজার প্রতি ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ নাচ-গান, ভোজ, ক্রীড়াকৌতুক প্রভৃতি উৎসবের আয়োজন হয়। এই অনুষ্ঠান মালাবারে 'ওনাম উৎসব' নামে প্রসিদ্ধ।

ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারি মাসে পুষ্পধন্বার (মদনদেবের) মৃত্যু-উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর 'তিরুবতির' উৎসব প্রতিপালিত হইয়া থাকে। ইহা মেয়েলী উৎসব। পুরুষগণ ইহাতে যোগদান করেন না। এই উৎসব মাত্র একদিন স্থায়ী হইয়া থাকে।

অপদেবতা কুট্টিচ্চটন

পুরাণে বর্ণিত আছে, দেবাদেশে মহেশ্বরের ধ্যান ভঙ্গ করিতে গিয়া হরকোপানলে মদন ভস্মীভূত হন। তদবধি অনঙ্গ নামে তিনি পরিচিত হন। এই বিষাদপূর্ণ ঘটনা 'তিরুবতির' উৎসবের মধ্য দিয়া প্রতি বৎসর নবরূপে উজ্জীবিত হইয়া উঠে। নির্দ্ধারিত দিবসের এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতেই প্রাথমিক অনুষ্ঠানপর্ব্ব সুরু হয়। প্রতিদিন ভোর চারটার সময় প্রত্যেক নায়ার-রমণী শয্যাত্যাগ করিয়া পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গমন করে। পুকুরের জলে শরীর ডুবাইয়া সকলে এক সঙ্গে মিলিত কণ্ঠে বিচিত্র সুর-লয়-তান সমন্বিত সঙ্গীত গাহিতে আরম্ভ করে। গানের সুরের তালে তালে বাঁ হাতের তালুতে ডান হাত দিয়া জলের উপরিভাগে তাহারা যুগপৎ আঘাত করিতে থাকে। এই সঙ্গীত অনঙ্গদেবের করুণকাহিনী অবলম্বনে গীত হয়। উষার আগমনে তাহারা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সাধ্যানুসারে প্রসাধনে রত হয়। প্রসাধনান্তে তাম্বুল-রাগে ওষ্ঠাধর রঞ্জিত করিয়া ঝুলনখেলায় মত্ত হয়। ইহা উঞ্জিল্লল নামে খ্যাত।

উৎসবের নির্দ্ধারিত দিবসে প্রাতঃস্নানের পর স্ত্রীলোকেরা নামমাত্র জলযোগ করিয়া থাকে। দ্বিপ্রহরে বিরাট ভোজের আয়োজন হয়। তাহার পর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নাচ-গান হৈ-হল্লোড় চলিতে থাকে। উক্ত দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বিবাহিত প্রত্যেক নায়ার পুরুষকে স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইতে হয়। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী।

চতুর্থী তিথিতে চন্দ্র দর্শন করা অত্যন্ত দুর্লক্ষণ—এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত। এই তিথিতে গণপতি চন্দ্রের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করেন। তাঁহার কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তি, বিশেষ করিয়া বিশাল লম্বোদর সকলের হাস্যোদ্রেক করিয়া থাকে। বিশেষতঃ ইনি অত্যন্ত উদরপরায়ণ। ইহার সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। উক্ত তিথিতে কোন এক বিরাট ভোজে তিনি যোগদান করেন। ভোজনান্তে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। তখন পৃথিবী জ্যোৎস্নাস্নাত। ভোজনে উদর এত স্ফীত হইয়াছিল যে তিনি ভাল করিয়া পথের বস্তু লক্ষ্য করিতে পারিতে-ছিলেন না। চলিতে চলিতে হঠাৎ এক স্থানে পড়িয়া গিয়া তিনি শরীরে আঘাত পাইলেন। এই সময় আকাশে একমাত্র চন্দ্রই বিরাজমান ছিলেন। গণপতির পতনে চন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ইহাতে গণপতি নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত মনে করিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া চন্দ্রকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন যে, কোন ব্যক্তি এই তিথিতে চন্দ্র দর্শন করিলে সমাজে তাহাকে কলঙ্কিত জীবন যাপন করিতে হইবে। তদবধি সর্ব্বসাধারণ এই ভয়াবহ পরিণতির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সর্ব্বপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকে।

যাদুবিদ্যা এবং ডাকিনীমন্ত্রের যথেষ্ট প্রচলন এখনও মালাবারে দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলির ভালমন্দ উভয় দিক আছে। প্রথমোক্ত মন্ত্র-তন্ত্রগুলি ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের একচেটিয়া এবং শেষোক্তগুলি প্রধানতঃ নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। যাদুবিদ্যা যথাযথ করায়ত্ত হইলে অসাধ্য সাধন করা যায়—জনসাধারণের এইরূপ বিশ্বাস। কিন্তু ক্রমশঃ লোকের ধারণা এই বিষয়ে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে একমাত্র নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ইহার প্রভাব বেশী দেখা যায়।

কুট্টিচ্চটন (Kuttichchattan) নামক অপদেবতার অসীম ক্ষমতার কথা শোনা যায়। ইহার গায়ের রং মিশ-কালো। কুট্টিচ্চটন শব্দে বালক-সয়তানকে বুঝায়। এই অপদেবতাকে মন্ত্রশক্তি দ্বারা বশীভূত করিয়া গুণীরা স্বকার্য্য সাধন করিয়া থাকে। বালকদের ন্যায় ইহারা নাকি পেটুক, তাই গুণীরা ইহাদের রীতিমত খাদ্য-পানীয় দ্বারা পরিতুষ্ট করিতে চেষ্টা করে। এই বিষয়ে ত্রুটি হইলে ইহারা গুণীর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে। ইহারা ব্যক্তিবিশেষের উপর বিরক্ত হইলে তাহার বাসগৃহের উপরিভাগে অনবরত ঢিল ছুঁড়িয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তোলে। এতদ্ব্যতীত গৃহে অগ্নিসংযোগ, আহার্য্যবস্তু নষ্ট এবং পানীয় জল দূষিত করিয়া থাকে। ইহারা তুষ্ট হইলে গৃহে চোর-ডাকাত প্রবেশ করিতে সাহসী

হয় না। এই অপদেবতাদের দোসর গুলিকানও (Gulikan) ইহাদেরই মত ভয়ঙ্কর। গুলিকানের গলা লম্বায় প্রায় এক গজ। ইহার লকলকে জিহ্বা এবং বীভৎস মুখাবয়ব দেখিলে অতি বড় বীর পুরুষেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

আপাতদৃষ্টিতে কাকের দুইটি চক্ষু দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহার মাত্র একটি চোখের মণি। এই সম্বন্ধে নিম্নোক্ত জনপ্রবাদ সুপ্রাচীন কাল হইতে মালাবারে প্রচলিত। শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থ অনুজ লক্ষ্মণ ও পত্নী সীতাদেবী-সহ চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে গমন করেন। দণ্ডকারণ্যে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারা তথায় বসবাস করিতে থাকেন। শ্রীরামচন্দ্র বন্য জন্তু শিকার করিয়া আনিতেন। ইহা দ্বারা তাহাদের দৈনন্দিন আহার্য্যের সংস্থান হইত। মাংস যাহাতে পচিয়া না যায় তজ্জন্য রৌদ্রতপ্ত করা হইত। মাংসের লোভে কাকের দল তথায় ভিড় জমাইত। একদিন সীতা-দেবীর রক্তকমল সদৃশ পদপল্লবকে মাংস-খণ্ড মনে করিয়া কাক কঠিন চঞ্চুর দ্বারা আঘাত করিতে থাকে। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীরামচন্দ্র শরাঘাতে কাকের একটি চোখের মণি নষ্ট করিয়া ফেলেন। অবশেষে শ্রীরামচন্দ্র দয়াপরবশ হইয়া বর দেন, প্রয়োজনানুসারে কাক এক চক্ষু হইতে অপর চক্ষুতে অক্ষত মণিটি সঞ্চালিত করিতে পারিবে।

বজ্র, বিদ্যুৎ এবং মেঘের দেবতা হইলেন দেবরাজ ইন্দ্র। কতিপয় দানব তৎকর্তৃক বারি-বর্ষণের কার্য্যে নিয়োজিত। এই দানবগণের মস্তকের উভয় পার্শ্বে বিরাট আকারের দুইটি শৃঙ্গ বিরাজিত। সমস্ত গ্রীষ্মকাল তাহারা জল-সংগ্রহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। পৃথিবী হইতে মুখে করিয়া তাহারা এই জলরাশি স্বর্গে বহন করিয়া লইয়া যায়। বর্ষার আগমনে এই সঞ্চিত জল মুখে ভরতি করিয়া তাহারা পৃথিবীতে উদ্গীরণ করিয়া থাকে। এই বারিবর্ষণের কালে দানবদের পরস্পরের শৃঙ্গে মাঝে মাঝে ঘর্ষণ হইয়া থাকে; ইহাতে যে স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হয় তাহাই বিদ্যুৎ। এ সম্বন্ধে আর একটি কাহিনী আছে। দেবরাজ ইন্দ্র দানব-অনুচরদের প্রতি কোন কারণে ক্রোধান্বিত হইলেই স্বীয় তরবারি সবেগে ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতে থাকেন। কোষমুক্ত তরবারি তীব্র আলোক বিকীরণ করিতে থাকে। এই আলোর ঝলকানিই বিদ্যুৎরূপে প্রকাশ পায়। বজ্রাঘাতে কোন বৃক্ষ দগ্ধীভূত হইলে ভয়ভক্তি মিশ্রিত হৃদয়ে তাহারা সেই বৃক্ষটির সংরক্ষণের সুবন্দোবস্ত করিয়া থাকে। এই দগ্ধীভূত বৃক্ষে দেবতার আরোপিত হয়।

কুট্টিচ্চট্টনের দোসর গুলিকান নামক অপদেবতা

পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং ভাবধারার সংস্পর্শে মালাবারের অধিবাসীদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু দেশের অভ্যন্তরভাগে জনসাধারণের জীবনযাত্রা-প্রণালী আজও কুসংস্কার দ্বারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

রাজনগর

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

৫

দেবানন্দ পিতার সঙ্গে থাকিয়া এক মফস্বল শহরের জেলা স্কুলে পড়িত। সেই স্কুলের ড্রিল মাষ্টার ছিলেন সতীশ রায়। উপরের ক্লাসের ছাত্র দেবানন্দ ড্রিল মাষ্টারকে তেমন গ্রাহ্য করিত না। ড্রিল মাষ্টার নীচের ক্লাসের ছাত্রদের সারবন্দী ভাবে দাঁড় করাইয়া ড্রিল করাইতেন। বড় ছেলেদের মধ্যে অনেককে জিমনাষ্টিক শিখাইতেন। ড্রিল বা জিমনাষ্টিক কোনটির প্রতি দেবানন্দের আকর্ষণ ছিল না। তাহার স্বগ্রাম রাজনগরে আগে ভদ্রঘরের ছেলেদের মধ্যে যে কুস্তি ও লাঠি-খেলা শিখিবার রেওয়াজ ছিল তাহা এক রকম উঠিয়া গিয়াছিল। ক্লাসের অধিকাংশ ছেলের মত পেশী ফুলাইবার জন্য ব্যায়াম করাকে দেবানন্দ হাস্যকর মনে করিত। গুণ্ডার মত শরীর তৈয়ারি করিবার জন্য ব্যায়াম করা ভদ্রলোকের ছেলের মানায় না...এই রকমের ধারণা তখন প্রচলিত হইয়াছিল গ্রাম ও শহরের ভদ্রমহলে। সতীশ রায় লোকটিও ছিলেন একটু পাগলাটে ধরণের। তাহার ধরণধারণ, বেশভূষা দেখিয়া আমোদ লাগিত। হেড মাষ্টারকে দেখিলেই তিনি দাঁড়াইয়া মিলিটারী কায়দায় 'স্যালুট' করিতেন। একবার স্কুলে ইন্‌স্পেক্টর আসিলে তিনি মালকোচা দিয়া কাপড় পরিয়া মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া হাজির। তাঁহার ড্রিল করাইবার কায়দা, ফৌজী চালচলন ও "ইওর অনার" সম্বোধন শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর খুব সন্তুষ্ট হইলেন।

স্কুলের স্পোর্টস্ আরম্ভ হইবার দেরি নাই। টিফিন পিরিয়ডে ড্রিল মাষ্টার কয়েকজন ছেলেকে প্যারালাল বারের কসরৎ, লং জাম্প, হাই জাম্প শিখাইতেছিলেন। কয়েকজন ছেলে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। দেবানন্দও ছিল তাহাদের মধ্যে। সে তাকাইয়া রহিয়াছিল মাষ্টারের দিকে। শুধু গেঞ্জি গায়ে মাষ্টার ছেলেদের শিখাইতেছিলেন। তাঁহার হাত ও বুকের পেশী ফুলিয়া উঠিয়াছে—সতেজ, দৃপ্ত ভঙ্গী। মাষ্টার ছেলেদের তালিম দিতে দিতে দেবানন্দের দিকে লক্ষ্য করিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা দেবানন্দ বাড়ীতে পড়া করিতেছিল, পিতার ডাক শুনিয়া বাহিরের ঘরে আসিল। দেখিল মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া মালকোচা দিয়া কাপড় পরিয়া ড্রিল মাষ্টার আসিয়াছেন, তাহার পিতার সঙ্গে কথা বলিতেছেন। জীবানন্দ বলিলেন—ড্রিল মাষ্টার মশায়কে চেন বোধ হয়। উনি বলছেন, তুমি জিমনাষ্টিক শিখলে যত্ন করে শেখাবেন।

মাষ্টার বলিলেন—ইয়েস স্যর, এমন ভাল করে শেখাবো যে ছয় মাস পরে আপনি ছেলেকে আর চিনতে পারবেন না। আমাকে বিশ্বাস করুন। লেখাপড়ায় ওর মাথা আছে, জিমনাষ্টিকে তাগদ বাড়বে।

জীবানন্দ হাসিয়া বলিলেন—ছেলেকে চিনতে পারবো না এমন শরীর তৈরি করে দেবে এই গ্যারান্টি দিচ্ছ মাষ্টার?

মাষ্টার ফৌজী স্যালুট করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—গ্যারান্টি দিচ্ছি স্যর।

তারপর সহজভাবে একটু হাসিয়া বলিলেন—আমি একজন সামান্য ড্রিল মাষ্টার স্যর, কিন্তু ডাকুন আপনার হাবিলদার রাম অবতার সিং আর জমাদার গোলাম কাদেরকে। তারা কুস্তির প্যাঁচ, বক্সিং কি পাঞ্জায় আমায় হারাতে পারলে আমি সাত হাত মেপে মাটিতে নাকে খৎ দেব।

জীবানন্দ হাসিলেন। বলিলেন—তারা তোমাকে কাপ্তেন ড্রিল মাষ্টার সাহাব বলে, জানো?

মাষ্টার বলিলেন—ঠাট্টা করে বলে। কাপ্তেনের কুস্তির একখানা প্যাঁচ দেখলে রামলোচন, রামভজন, রাম অবতারের তালু শুকিয়ে উঠবে।

জীবানন্দ সংক্ষেপে বলিলেন—দেবু জিমনাষ্টিক শিখতে চায়, আমার কোন আপত্তি নেই। ওর শরীর একটু মজবুত হওয়া দরকার। তুমি কথা বলে দেখ ওর সঙ্গে।

মাষ্টার আর একবার স্যালুট করিলেন জীবানন্দকে। দেবানন্দকে বলিলেন—একটু বাইরে এস আমার সঙ্গে।

দুই জনে জীবানন্দের বাসা ছাড়িয়া রাস্তায় পড়িল। একটু দূরে মাঠের ওপারে জেলা স্কুলের হিন্দু হোষ্টেল, সেখানে মাষ্টার থাকেন। মাঠের মাঝামাঝি গিয়া ড্রিল মাষ্টার বলিলেন—এস, এখানে বোস। তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করি। দুই জন বসিলে মাষ্টার বলিলেন—তোমার নামটা ত খুব গালভরা, দেবানন্দ। আনন্দমঠ পড়েছ?

দেবানন্দ—পড়েছি।

মাষ্টার—ভক্তিযোগ পড়েছ?

—কার লেখা? নাম শুনি নি।

—স্বামী বিবেকানন্দের কোন বই পড়েছ?

—না।

—টডের রাজস্থান?

—না।

—রমেশ দত্তের মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত পড়েছ?

—না।

—তবে আর কি পড়েছ? আনন্দমঠ পড়ে কি মনে হয়েছে?

দেবানন্দ চুপ করিয়া রহিল। বয়স কম হইলেও এই কথা তাহার মনে উদিত হইল যে, পুলিস সাহেবের ছেলে হইয়া ড্রিল মাষ্টারের কাছে হঠাৎ কি করিয়া বলে যে, সন্তানের দল গড়িয়া ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করিতে ইচ্ছা করে তাহার।

ড্রিল মাষ্টার উত্তর না পাইয়া বলিলেন—তোমার মনের কথা আমি বুঝেছি। আনন্দমঠে অনেক কথা আছে যা তোমার বোঝবার বয়েস হয় নি। দুটি কথা তোমার জানা দরকার। মা যা ছিলেন সেই অবস্থায় আমাদের আবার তাঁকে দেখতে হবে। সেই কাজটি করতে হলে শরীরগঠন ও ব্রহ্মচর্য্যপালন করতে হবে। তুমি জিমনাষ্টিক কর না, বোধ হয় ভাবো শুধু চিন্তা করলেই সব কাজ হবে। তা হয় না। দেশের কাজ যারা করতে চায় তাদের সকলের আগে দরকার শক্তি অর্জ্জন করা। ব্যায়াম চাই, ব্রহ্মচর্য্য চাই।

দেবানন্দ ড্রিল মাষ্টারের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল। এই রকম একজন উঁচুদরের লোককে সে সামান্য ড্রিল মাষ্টার বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছে এতদিন। ইনি কত পড়িয়াছেন, কত ভাবিয়াছেন। পথের হদিস পাইবার জন্য এই রকম একজন লোকের অভাব সে কতদিন যাবৎ অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছে। তাহার মন আশ্বাসে ও শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল।

নম্র স্বরে সে বলিল—আমাকে কি করতে হবে আপনি বলে দিন স্যর।

ড্রিল মাষ্টার হাসিয়া তাহার মাথায় ও পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। বলিলেন—ঠিক ধরেছি, কেমন নয়? ভাবি ঐ রকমের চোখ, ঐ রকমের চাহনি, সে কি অন্য পথের পথিক হতে পারে?

কিছুক্ষণ পরে বলিলেন—এখানে তোর মত আরও কয়েকটি ছোট ভাই পেয়েছি আমি। তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। তাদের কাছ থেকে অনেক কথা জানতে পারবি। কয়েকখানা বই পড়া দরকার। কাল হোষ্টেলে আমার ঘরে যাবি, বই দেবো। আজ বাড়ী যা, তোর বাবা ভাববেন। কাল থেকে জিমনাষ্টিক আরম্ভ করবি।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ড্রিল মাষ্টার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেবানন্দ একটু ইতস্ততঃ করিয়া তাহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল। সে জানিত ড্রিল মাষ্টার কায়স্থ। ভাবিল, সতীনদাকে আজ হইতে গুরুর আসনে বসাইলাম, গুরুর আবার জাতি কি? দেবানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইলে ড্রিল মাষ্টার দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

স্কুলে পড়িবার সময় হইতে সতীন রায়ের মনে প্রবল ধর্ম্মভাব ছিল। তখন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যুগ। এক শ্রেণীর কিশোর ও যুবকদের মধ্যে একটা আলোড়ন আসিয়াছিল—সেই ধরণের আলোড়ন যাহা গতানুগতিক জীবনের বন্ধন হইতে মুক্তি খোঁজে। ফলে কেহ কেহ গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে লাগিল। একটু অসাধারণত্বের ছাপ যে সব ছেলের মনে ছিল তাহাদের সম্মুখে তখন আর কোন পথ খোলা ছিল না। এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার আগে সতীনও গৃহত্যাগ করিয়া পলাইল। কোনও সঙ্ঘে যোগ না দিয়া গেরুয়া লইয়া সে বাংলার বাহিরে চলিয়া গেল। অভিপ্রায় হিমালয়ে গিয়া সদ্গুরুর সন্ধান করিবে, যোগ ও তিতিক্ষা অভ্যাস করিবে। বৎসর দুই হিমালয়ের নানা অঞ্চলে, বহু তীর্থে ঘুরিবার পরে নাসিকের কাছে দুর্গম স্থানে এক সাধুর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। সাধুর নাম কেশবানন্দ গিরি, তিনি মহারাষ্ট্রের লোক।

কেশবানন্দ গিরির প্রভাবে সতীনের জীবনের ধারা একেবারে বদলাইয়া গেল।

কেশবানন্দ অষ্টনামী সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী। কিশোর বয়সে পিতামাতার সঙ্গে পাণ্ডহারপুরে বিঠলবার মন্দিরে পূজা দিতে গিয়া এক মাতাজীর মুখে তুকারামের ভজন শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যান। বিঠল তাঁহার মনপ্রাণ অধিকার করিয়া বসিলেন। পিতামাতা পুত্রের ধর্ম্মোন্মাদনা দেখিয়া, পাছে সে গৃহত্যাগ করে এই ভয়ে সেই অল্প বয়সেই তাঁহার বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন। পুত্র ইহার আভাস পাইয়া পলায়ন করিলেন। হাঁটিতে হাঁটিতে পাণ্ডহারপুরে বিঠলবার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে সেই মাতাজীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শুনিলেন তিনি হরিদ্বারে চলিয়া গিয়াছেন, আগামী বৎসর আবার পাণ্ডহারপুরে ফিরিতে পারেন। কেশবানন্দের সুন্দর চেহারা, মিষ্ট গলা ও ভগবদ্ভক্তি এক কোঙ্কনী সাধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহাকে মাতাজীর সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া ঘুরিতে দেখিয়া সাধু বলিলেন—তুমি আমার আখড়ায় থাকিয়া সাধনভজন কর। আগামী বৎসর মাতাজীর সঙ্গে দেখা হইবে। কিছু দিন বাদে সাধু যখন আখড়া ছাড়িয়া তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইলেন তখন কেশবানন্দকে তিনি সঙ্গে লইলেন।

কেশবানন্দ ক্রমে সাধুর পরিচয় পাইলেন। তিনি গার্হস্থ্য জীবনে চিৎপাবন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণ ও পেশোবা বংশের দূর আত্মীয় ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাঁহার পিতামহ তাঁতিয়া টোপীর দলে থাকিয়া ইংরেজের সঙ্গে লড়িয়াছিলেন। ধরা পড়িয়া তাহার ফাঁসি হয়। ইংরেজেরা তাঁহাকে লাথি মারিয়া মারিয়া অবমাননা করে। তারপর উলঙ্গ করিয়া এক তেঁতুল গাছের ডালে ঝুলাইয়া দেয়। তাঁহার মৃতদেহ শকুনিতে খাইয়াছিল। তাঁহাকে ফাঁসি দিবার পরে তাঁহার গ্রামের বাড়ীতে হানা দিয়া তাঁহার স্ত্রী ও বালক-

পুত্রকে ধরিবার চেষ্টা করে। স্ত্রী ইঁদারায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করেন, পুত্র পলাইয়া যায়। বহুদিন নানা জায়গায় লুকাইয়া থাকিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া বিবাহ করিয়া সংসারী হন। সাধু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। বাল্যকাল হইতে পুত্রের মনে পিতা দুইটি জিনিস বদ্ধমূল করিয়া দিবার চেষ্টা করেন—অত্যাচারী ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও মারাঠা জাতির লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা। ছেলেকে তিনি বলেন—সংসারধর্ম তোমাকে করিতে হইবে না। তোমার কর্তব্য হইবে দেশে দেশে ঘুরিয়া জাতির মধ্যে এই দুইটি বিষয় প্রচার করা। ছেলেকে তুলাজপুরে লইয়া গিয়া অম্বাভবানীর কাছে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। পিতার নির্দেশমত পুত্র প্রথম যৌবনেই সন্ন্যাস লইয়া মহারাষ্ট্র দেশের তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া হিন্দুধর্মের নব অভ্যুদয়ের বাণী প্রচার এবং মারাঠাজাতির অধঃপতনের ও ফিরিঙ্গীর অত্যাচারের কাহিনী গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি পিতার নির্দেশ পালন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন ছিল স্বভাবতঃ কোমল, মমতাশীল ও গভীর ভক্তিপ্রবণ। প্রাণের টানে তিনি বার বার পাণ্ডহারপুরে বিঠলের কাছে ফিরিয়া আসিতেন।

সাধুর বয়স হইয়াছিল। তাঁহার অবর্তমানে পিতার নির্দিষ্ট কাজ চালাইতে পারে এইরূপ একজন উপযুক্ত শিষ্যের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তাই কেশবানন্দকে পাইয়া তিনি তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিলেন না।

তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তিনি তুলাজপুরে অম্বাভবানীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে সেখানে মাতাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়া গেল। কেশবানন্দ মাতাজীকে পাইয়া ঐ সাধুর সঙ্গ ছাড়িলেন। যেন হারানিধি পাইয়াছেন এমনি তাঁহার উল্লাস। সাধু একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন। ভবানীর পূজা করিয়া তিনি মাকে মনের অভিলাষ বড় কাতরভাবে জানাইলেন। ধ্যান করিতে বসিয়া তিনি দেখিলেন, অম্বাভবানীর মূর্তি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া মাতাজীর মূর্তি ধারণ করিল। তিনি চমকিত হইলেন। তাঁহার কর্তব্য শেষ হইয়াছে জানিয়া তিনি তুলাজপুর ত্যাগ করিলেন। নাসিকের কয়েক মাইল দূরে বিখ্যাত বৌদ্ধ আমলের গুহাগুলির কাছে কুটীর তৈয়ারী করিয়া তিনি সেখানে সাধন-ভজনে বাকী দিনগুলি অতিবাহিত করিবেন স্থির করিলেন।

মাতাজী কেশবানন্দকে সঙ্গে লইয়া মহারাষ্ট্রের প্রত্যেকটি বিখ্যাত দুর্গ, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রত্যেকটি স্থান দেখাইলেন। ছত্রপতি শিবাজী, তাঁহার গুরু রামদাস ও পেশোবাদিগের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি দেখাইলেন, মারাঠা জাতির শৌর্য্য-বীর্য্য ও পরাক্রমের কাহিনী শুনাইলেন। হরিদ্বার হইতে কেদারবদরী পর্য্যন্ত নানা তীর্থ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ঘুরিলেন। নানা সম্প্রদায়ের সাধুদের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন। অবশেষে দেহরক্ষা করিবার আগে হরিদ্বারের গিরি সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু নিরঞ্জনানন্দের হাতে তাঁহাকে সঁপিয়া দিলেন।

সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা লইয়া কেশবানন্দ প্রথম কয়েক বৎসর সাধন-ভজনে কাটাইলেন। কিন্তু সাধুজী ও মাতাজী যে বীজ তাঁহার মনে বপন করিয়াছিলেন তাহা ক্রমে অঙ্কুরিত হইল। নিরবচ্ছিন্ন সাধন-ভজন ছাড়িয়া তিনি প্রচার আরম্ভ করিলেন; হিন্দুধর্মের গ্লানি দূর করিয়া কি উপায়ে উহার প্রাচীন গরিমা পুনরুদ্ধার করিতে হইবে ইহাই হইল তাঁহার প্রচারের বিষয়। ছত্রপতি শিবাজীর সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী হিন্দু স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের কথা ওজস্বিনী, মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিতে করিতে তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। বলিতেন, এই স্বপ্ন সফল করিতে হইবে, ইহার প্রতিবন্ধক চূর্ণ করিতে হইবে। শ্রোতৃবর্গকে জিজ্ঞাসা করিতেন—কে ইহার প্রতিবন্ধক জান? একটু থামিয়া নিজেই উত্তর দিতেন—প্রতিবন্ধক দুশমন ফিরিঙ্গী, শয়তান ফিরিঙ্গী। ইহার পর গীতার ব্যাখ্যা করিয়া ধর্মযুদ্ধ ও নিষ্কাম কর্মের মহিমা কীর্তন করিতেন।

ধীরে ধীরে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুধর্মের নূতন ব্যাখ্যা কিছু কিছু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল ও কেশবানন্দ গিরির নাম ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। মহারাষ্ট্রে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক অংশের মধ্যে তাঁহার অনুরাগী ভক্তের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। ইঁহারা নাসিক, পুনা, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে বহু মেলার অনুষ্ঠান ও সমিতি গড়িতে আরম্ভ করিলেন। মেলায়, সমিতিতে ছোরা ও তরবারি-চালনা শিক্ষা দেওয়া হইত, হিন্দু স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার বাধা অপসারণের সঙ্কল্প গ্রহণ করা হইত, সনাতন হিন্দু সংস্কৃতির প্রচার করা হইত। গণপতি-উৎসব ও শিবাজী-উৎসবের প্রচলন করিয়া মেলার অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল।

কাজ সুরু হইয়াছে দেখিয়া কেশবানন্দ গিরি নাসিকের কাছে তাঁহার পরিচিত সেই সাধুর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সাধুর তখন অন্তিম সময়। কেশবানন্দকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি শান্তিতে দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার আশ্রমে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কেশবানন্দ সাধন-ভজনে নিযুক্ত হইলেন।

ইহার কিছুকাল পরে বোম্বাইয়ে প্লেগের হাঙ্গামা উপস্থিত হইল। কেশবানন্দ গিরির শিষ্যসম্প্রদায়ের আদর্শ ছিল অত্যাচার বন্ধ করিবার জন্য সশস্ত্র প্রতিরোধ করিতে হইবে, হিন্দু স্বরাজ্যের প্রতিবন্ধক সশস্ত্র অভিযানের সাহায্যে দূর করিতে হইবে। এই প্রচারের ফল ফলিল র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্ট হত্যায়।

কেশরী কাগজে সরকারী ব্যবস্থার সমালোচনাপ্রসঙ্গে তিলককে লইয়া যখন গোলযোগ চলিতেছিল তাহার কিছু পরে সতীশ নাসিকের কাছে কেশবানন্দ গিরির আশ্রমে উপস্থিত হইল। তরুণ বাঙালী সন্ন্যাসী সতীশকে

পাইয়া, আশ্রমে যে অল্প কয়েকজন ভক্ত ছিলেন তাঁহারা উৎফুল্ল হইলেন। সতীন হঠযোগ শিখিবার জন্ত আশ্রমে আসিয়াছে শুনিয়া তাঁহারা হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, 'তোমাকে একেবারে ঠিক জায়গা বাংলাইয়া দিয়াছে লোকে। আরে ভাই, হঠযোগ পরে হইবে, এখন ত কর্ম্মযোগে কিছু তালিম লও।' আনন্দমঠের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় ছিল। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের খ্যাতি তখন ভারতময় প্রচারিত। বরোদা কলেজের বাঙালী অধ্যাপক অরবিন্দ ঘোষের নাম অনেকের পরিচিত। বাংলার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিবার জন্ত সতীনকে তাঁহারা উপযুক্ত পাত্র স্থির করিলেন।

শিবাজী ও গণপতি উৎসবের তাৎপর্য্য, মেলা এবং সমিতির মধ্য দিয়া হিন্দু জাতীয়তার চর্চ্চা, প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুশীলন, শারীরিক শক্তিচর্চ্চার প্রয়োজন, হিন্দু স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গ্রহণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে সতীনকে তাঁহারা উপদেশ দিলেন। ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিতে ঐক্যবদ্ধ হিন্দু ভারতের এমন উজ্জ্বল, গরিমাময় চিত্র, তাঁহারা সতীনের সম্মুখে ধরিলেন যে সে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইল। এ ধারণা তাহার মনে বদ্ধমূল হইল যে, জীবনে সাধনা করিয়া লাভ করিবার মত বাস্তবিক কোন অভীষ্ট থাকিলে তাহা হইতেছে অতীত দিনের গৌরবময় হিন্দু জাতীয়তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ছত্রপতি শিবাজীর মধ্যে একবার হিন্দুভারতের পুনর্জ্জীবন লাভের উদ্যম দেখা গিয়াছিল তাহা সফল হয় নাই। শেষে ফিরিঙ্গীরা উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছিল। আজ আবার নূতন উদ্যম আরম্ভ করিবার সময় আসিয়াছে।

যে সঞ্জীবনী আদর্শের অভাবে সতীন এবং তাহার মত আরও অনেকে সে সময়ে ধর্ম্মসাধনার পথে পা দিয়াছিল, অপ্রত্যাশিত ভাবে সেই আদর্শ চোখের সম্মুখে দীপ্তিমান হইয়া উঠিল।

সতীন বয়সে বালক, তাহার উপর স্কুলের গণ্ডী ছাড়ায় নাই। সে জানিত না যে, মহারাষ্ট্রে এই নব জাগরণের বহুদিন পূর্ব্বে তাহার নিজের প্রদেশে এই জাগৃতি আসিয়াছিল, ফল্গুর মত তাহার প্রবাহ বাঙালীর জীবনাদর্শের মধ্যে লুকাইয়া ছিল। ব্যায়াম ও ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দেশবাসীর ভিতরে জাতীয়ভাব উদ্বোধনের জন্ত হিন্দু মেলার অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছিল ১৮৬৭ সনে, কংগ্রেস স্থাপিত হইবার বহু পূর্ব্বে। জাতীয় চিত্র ও শিল্প প্রদর্শনী, জাতীয় সঙ্গীত, ক্রীড়া, আমোদ-প্রমোদ, ব্যায়াম, কথকতা, জাতীয় সাহিত্য ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনা, জ্ঞানী, গুণী এবং সকল শ্রেণীর লোকের সমাবেশের মধ্য দিয়া দেশবাসীর মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করিবার জন্ত গ্রীসের অলিম্পিক ক্রীড়ার আদর্শে প্রতি বৎসর হিন্দু মেলার অনুষ্ঠান হইত। স্বাস্থ্য ও সাহস বৃদ্ধি করিবার জন্ত ব্যায়াম-বিভালয় স্থাপিত হইয়াছিল। হিন্দু মেলায়, কুস্তি, লাঠি ও তরবারি চালনা, ঘোড়ায় চড়া, নৌকা বাচের প্রতিযোগিতা হইত। এই হিন্দু মেলার আদর্শ হইতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশভক্ত কর্ম্মকারেদের উদ্ভব হয়। তারপর সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি হয়।

এ সব সতীনের জানিবার কথা নহে। হিন্দু মেলা শুধু ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার কাজ করিয়াছিল, এই নূতন আন্দোলন গোড়াতেই বীজ বপন করিয়া তাহার কাজ আরম্ভ করিল।

কেশবানন্দ গিরি স্বয়ং সতীনকে দীক্ষা দিলেন নূতন মন্ত্রে, তাহার ভবিষ্যৎ কাজের ধারা সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন। ভাবী হিন্দু স্বরাজ্যের প্রতীক গৈরিক পতাকাকে অভিবাদন করিয়া সতীন দীক্ষা লইল।

প্রায় দুই বৎসরকাল আশ্রমে থাকিয়া শিক্ষা সমাপনান্তে কেশবানন্দের আদেশে গৈরিক বস্ত্র ত্যাগ করিয়া সতীন দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিল এমন সময় চতুর্ভুজ দত্ত নামে একটি যুবক আশ্রমে উপস্থিত হইল। সতীন দেখিল এই লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ যুবকটি আশ্রমের অনেকের পরিচিত। শুনিল সে পঞ্জাবের মণ্টেগোমারী জেলার অধিবাসী। লেখাপড়া জানা, রীতিমত পণ্ডিতলোক। বিলাত হইতে পাস করিয়া আসিয়া কলেজে চাকুরী করিত, হঠাৎ আর্য্যসমাজে যোগদান করিয়া চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস দয়ানন্দ সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণের অবতার। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন কাথিয়াবাড়ের লোক, দয়ানন্দও তাহাই। একজন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে গীতা প্রকাশ করিয়াছিলেন সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝাইবার জন্ত, আর একজন একই উদ্দেশ্যে সত্যার্থ-প্রকাশ রচনা করিয়াছেন। সনাতন ধর্ম্মের সকল গ্লানি দূর করিয়া উহার পূর্ব্বগৌরব ফিরাইয়া আনিতে হইবে, উহার সকল প্রতিবন্ধক অপসারিত করিতে হইবে। তাহার মতে ভারতবর্ষ আর্য্যজাতি ও আর্য্যধর্ম্মের দেশ। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। ভারতবর্ষে অন্ত কোন ধর্ম্মের স্থান নাই। যাহারা এদেশে বাস করিতে চাহে তাহাদের এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে অথবা সরিয়া পড়িতে হইবে। যে ধর্ম্ম ভারতবর্ষে জন্মায় নাই তাহার কোন স্থান নাই এই দেশে। চতুর্ভুজ দত্ত বলিত, ভারতবর্ষে সনাতন ধর্ম্মের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে রাষ্ট্রীয় শক্তির মুখাপেক্ষী না হইয়া আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে। বিধর্ম্মী ও বিদেশীর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র এই কাজে বাধা দেওয়া ছাড়া সহায়তা করিবে না। সুতরাং বিদেশী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিতে হইবে।

কেশবানন্দ গিরির সম্প্রদায়ের হিন্দু স্বরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার আদর্শের সঙ্গে চতুর্ভুজ দত্তের আদর্শের মিল ছিল। এইজন্ত কেশবানন্দের সম্প্রদায়ের সঙ্গে সে যোগাযোগ রক্ষা করিত।

সতীনকে বাঙালী জানিয়া ও তাহার কাহিনী শুনিয়া আগ্রহ করিয়া সে তাহার সঙ্গে আলাপ করিল। বলিল,

বিলাতে তাহার কয়েক জন বাঙালী বন্ধু ছিল। খুব বুদ্ধিমান তাহারা। বাঙালীদের আশ্চর্য্য মস্তিষ্ক ও উৎসাহ দেশের কাজে লাগাইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে। কেশবানন্দ সতীনকে দীক্ষা দিয়াছেন শুনিয়া চতুর্ভুজ খুব আহ্লাদিত হইল। বলিল, তোমার ঠিকানা দাও, বাংলা মুলুকে গেলে তোমার সঙ্গে দেখা করিব।

তাহার কাছে সতীন ইউরোপীয় পলিটিক্সের হালচালের অনেক খবর শুনিল। সে বলিল, রুশের সঙ্গে ইংরেজের একটা গোলমাল বাধবার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে। কুর্জ্জন সাহেব তাই তিব্বতে, কাবুলে, পারস্যে মিশন চালাচালি করছে। আফগান-আমীরের 'বেটা' ইনায়েত উল্লা খাঁকে নিয়ে দহরম মহরম করছে। কিন্তু দেখবে রুশের সঙ্গে নিজে না লড়ে হয়ত জাপানকে লাগিয়ে দেবে। হাড় শয়তান এই ইংরেজ জাত, বরাবর নিজের লড়াইটা অপরকে দিয়ে করিয়ে নেবার কাজে হাত পাকিয়েছে।

সতীন তাহার উগ্র ইংরেজ-বিদ্বেষ এবং সাধারণভাবে ইউরোপীয়দের প্রতি বিদ্বেষের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইল। ইউরোপকে এত ঘৃণা ও বিদ্বেষের চোখে কোন ভারতবাসী যে দেখিতে পারে তাহা আগে তাহার জানা ছিল না।

মাথায় নূতন চিন্তা ও অন্তরে নূতন আদর্শ লইয়া সতীন ঘরে ফিরিয়া আসিল। সে সন্ন্যাস লইবে বলিয়া গেরুয়া পরিয়া যখন গৃহত্যাগ করিয়াছিল তখনও তাহার মনে গভীর ভগবদ্ভক্তি অপেক্ষা সন্ন্যাস-জীবনের পবিত্রতা, অনাসক্তি ও আদর্শনিষ্ঠার প্রতি আকর্ষণ ছিল বেশী। গেরুয়া ছাড়িয়া ঘরে ফিরিবার পর তাহার মনে ভগভক্তির স্থান অধিকার করিল দেশভক্তি। জন্মভূমি ভারতবর্ষের মূর্ত্তিকে সে যেন জীবন্তরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছে, হিমালয়ের ঘন অরণ্য যেন তাঁহারই মস্তকের অবিন্যস্ত কেশভার, চরণযুগল লীলাচ্ছলে মহাসাগরের বুকে প্রসারিত করিয়া অবস্থিত তাহার মাতৃভূমি স্বর্ণবর্ণা, উজ্জ্বল, জীবন্ত দেবীপ্রতিমার মত তাহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিতা হইলেন। এই সাকার মাতৃ-মূর্ত্তির উপাসনার ফলে ত্যাগী সতীনের চরিত্র অপূর্ব্ব মাধুর্য্য-রসে ভরিয়া উঠিল।

প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পর সতীনের পিতৃবিয়োগ হইল। পরীক্ষায় পাস করিলেও অর্থাভাবে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া তিনি ড্রিল মাষ্টারের কাজ লইলেন সরকারী স্কুলে। স্বাস্থ্য তাহার বরাবর ভাল। নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাসের ফলে চমৎকার শরীরের গঠন ও অপরিমিত শক্তিসঞ্চয় হইয়াছিল। ছেলেদের শরীর-চর্চ্চায় অনুরাগী করিয়া তুলিবেন, তাহাদের চরিত্রগঠনে সহায়তা করিবেন, দেশভক্তির বীজ তাহাদের কিশোর-মনে বপন করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাদিগকে দেশকর্ম্মী করিয়া তুলিবেন এই লক্ষ্য লইয়া তিনি ড্রিল ও জিমন্যাষ্টিক মাষ্টারের কাজ বাছিয়া লইয়াছিলেন।

তাঁহার বদলির চাকুরী। যেখানে তিনি বদলি হইয়া যাইতেন সেখানেই তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া ভাবপ্রবণ ছেলেদের একটি দল গড়িয়া উঠিত। স্কুলের বাহিরে এই সব ছেলে তাঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকিত, তাঁহার নির্দ্দেশিত পথে চলিতে চেষ্টা করিত, তাঁহাকে গভীরভাবে ভালবাসিত। ছেলেদের হৃদয়ের কোমল স্থানটিতে মৃদু আঘাত করিয়া নিজের দিকে আকৃষ্ট করিবার বিশেষ দক্ষতা ছিল তাঁহার। তাই দুর্দ্দান্ত ছেলেরাও তাঁহার সংসর্গে আসিয়া আশ্চর্য্য রকমে বদলাইয়া যাইত। শহরের ছেলেদের অভিভাবক সম্প্রদায় এজন্য সতীন মাষ্টারের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। ইঁহাদের এবং স্কুলের উপরওয়ালাদের সঙ্গে আচরণের একটা পৃথক রীতি ছিল ড্রিল মাষ্টারের। আপনার আসল রূপ লুকাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি পোশাক-পরিচ্ছদে, বাহিরের চালচলনে ও কথাবার্ত্তায় খানিকটা অদ্ভুত ও হাস্যকর হইবার রীতি অনুসরণ করিতেন। এ যেন একটা ছদ্মবেশ তাঁহার। ছেলেদের সঙ্গে ব্যবহার ছিল অন্য রকমের। নিজের দলের ছেলেদের সঙ্গে তিনি স্নেহশীল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সমবয়স্ক বন্ধুর মত আচরণ করিতেন।

দেবানন্দের পিতা বদলি হইয়া আসিলে সে জেলাস্কুলে ভর্ত্তি হইবার পর হইতে মাষ্টার তাহার উপর লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, ছেলেটি একটু দাম্ভিক ও অমিশুক হইলেও তাহার চোখেমুখে এমনি একটা বৈশিষ্ট্যের ছাপ ছিল যাহা সহজে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি নিজের মনে মন্তব্য করিয়াছিলেন, ছেলেটিকে ভাল আধার বলিয়া মনে হয়, ইহাকে ছাড়া হইবে না। ব্যায়ামরত ছাত্রদের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে দেবানন্দকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি তাহাকে দলে টানিয়া লওয়া স্থির করিয়া ফেলিলেন।

দেবানন্দ সহজে ধরা দিল। তখন তাহার বয়স চৌদ্দ-পনর বৎসর। আনন্দ মঠ পড়িয়া তাহার বন্ধু ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিয়া সে সন্তান-দল গড়িয়া ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করিবার খেলা খেলিত। বড় হইয়া সে সত্যানন্দের মত সন্ন্যাসীর দল গড়িবে, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ইংরেজকে দেশ হইতে তাড়াইবে, গভীর অরণ্যের মধ্যে বিরাট এক মন্দির গড়িয়া মাতৃমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবে, এই সব কল্পনা তাহার মাথায় খেলিত। ইন্দ্র ছাড়া তাহার এই সব কল্পনার কথা আর কেহ জানিত না। তাহার সহপাঠীদের মধ্যে এমন কেহ ছিল না যাহার কাছে মনের কথা বলে। মধ্যে মধ্যে সে ভাবিত গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে কোন সন্ন্যাসীর আশ্রমে। তারপর দল গড়িয়া কাজ আরম্ভ করিবে। কিন্তু পিতামাতার প্রতি তাহার গভীর ভালবাসা ছিল, ইন্দ্রকেও সে ভালবাসিত। ইহাদের সকলকে ছাড়িয়া যাইবার কল্পনায়, তাহার মন পুরা-পুরি সায় দিত না।

মনের অবরুদ্ধ আবেগে সে এমন একটা অবস্থায় আসিয়া-

ছিল যখন সামান্য প্রলোভনে সে কুসংসর্গে মিশিয়া যাইতে পারিত। এমন সময় সতীন মাষ্টার তাহাকে বাঁচাইলেন।

ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিয়া সতীন তাহার মনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়া লইলেন। তার পর বলিলেন, সব ঠিক হয়ে যাবে ভাই, কিন্তু তোমার এখনকার কাজ আপনাকে গড়ে তোলা। আপনাকে উপযুক্ত না করতে পারলে কি করে অত বড় কাজ করবে?

দেবানন্দ বলিল, আমাকে উপযুক্ত করে তুলুন। মাষ্টার বলিলেন, তুলব বৈ কি। ঐ ত আমার কাজ ভাই। কিছুদিন আমার কথামত চল দেখি। তার পর বলিলেন, ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে উঠে ১০৮ বার মাতৃনাম জপ করবে, কালী, ভবানী, দুর্গা যাঁর নাম খুশী। তার পর করবে ডন বৈঠক। ব্যায়াম-শেষে বিশ্রাম করে স্নান করবে। স্নান করে গীতার পাঁচটি করে শ্লোক রোজ মুখস্থ করবে। তার পর স্কুলের পড়াশুনা। আমি দুখানা বই দিচ্ছি; Smile's Self-help ও Blackie's Character। রোজ বই দুখানার কিছু কিছু পড়বে। বিকেলে স্কুলে ব্যায়াম করবে, আমি দেখিয়ে দেব। আমার সঙ্গে বিকেলে বেড়াবে, তখন আলোচনা হবে। শোবার আগে রোজ ডায়েরী লিখবে। তার পর ভারতমাতার ধ্যান করবে কিছুক্ষণ।

Self-help ও Character শেষ হইলে অশ্বিনীকুমার দত্তের ভক্তিযোগ, বিবেকানন্দের কর্ম্মযোগ, ভাববার কথা, টডের রাজস্থান, সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস, মারাঠা ও শিখ-জাতির ইতিহাস পড়া আরম্ভ হইল। গীতার কয়েকটি অধ্যায় ইতিমধ্যে মুখস্থ হইয়া গেল। নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে দেবা-নন্দের চেহারা ফিরিয়া গেল।

ছেলের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া জীবানন্দ একটু বিস্মিত হইলেন। ড্রিল মাষ্টার তাহার কথা রাখিয়াছে বটে; কিন্তু যেভাবে সে দেবানন্দের মত ছেলেকে প্রভাবিত করিয়াছে তাহা ত সাধারণ ড্রিল মাষ্টারের কর্ম্ম নয়। এখনও পথে ঘাটে দেখা হইলে ড্রিল মাষ্টার তাহার অদ্ভুত পোশাকে ফৌজী স্যালুট করে, তাহার পেটে যে এত বিদ্যা আছে কে জানিত।

ছেলেকে ডাকিয়া পাঠ্য পুস্তক ছাড়া কি কি বই পড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, সতীনের সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন। দেবানন্দ পিতাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিত, কিন্তু তাহার মনে হইল সতীনদার সম্বন্ধে সকল খবর দেওয়া অনুচিত। ড্রিল মাষ্টার সম্বন্ধে পিতার প্রশ্নের সে ভাসা ভাসা উত্তর দিল। কি কি বই পড়ে খুলিয়াই বলিল। পুত্র অসৎ সংসর্গে না যায় এইটুকুই জীবানন্দের জানিবার ছিল। যে উত্তর পাইলেন তাহাতে এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত বোধ করিয়া আর কিছু বলিলেন না।

সতীনকে কেন্দ্র করিয়া ছেলেদের যে ছোট দলটি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাদের মধ্যে দেবানন্দ ও আরও দুই-চারিটি ছেলে চিন্তাশীল প্রকৃতির ছিল। তাহারা জানিত যে তাহাদের বর্ত্তমান শিক্ষাদীক্ষা ভবিষ্যতে কোন বৃহত্তর কর্ম্মের জন্য প্রস্তুতি। এই বৃহত্তর কর্ম্ম কি ধরণের হইতে পারে সে সম্বন্ধে কাহারও সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। কয়েকজন একটা দলভুক্ত হইয়া সাধারণ হইতে আলাদা আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিতেছে—এই বোধটুকু লইয়া তাহারা সন্তুষ্ট ছিল। বাকী ছেলেদের প্রকৃতিতে ছিল ধর্ম্মপ্রবণতা। সতীনদার প্রবর্ত্তিত নিয়মকানুন তাহাদের ধর্ম্মজীবনের উৎকর্ষসাধক এইরূপ মনে করিয়া তাহারা সেগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে মানিয়া চলিত। প্রচলিত দেবদেবীর অর্চ্চনা তাহাদের মনে কোন সাড়া জাগাইত না, তাহারা চাহিত নূতন কোন ঠাকুরদেবতা। অন্তরের গভীর ভক্তিপ্রবণতার দরুন কাহাকেও প্রাণ ঢালিয়া ভক্তি করিবার জন্য ইহারা উন্মুখ, এই আত্মসমর্পণের পথ ভিন্ন অন্য পথে তাহাদের প্রাণের স্ফূর্ত্তি হইত না। সতীন ইহাদের জন্য তাহার গুরু কেশবানন্দ গিরির পূজার ব্যবস্থা করিল। কেশবানন্দ হইলেন ইহাদের নূতন ঠাকুর।

এতগুলি বিভিন্ন চরিত্রের ছেলে একত্র মিলিয়াছিল সতীনের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে, তাহার চরিত্রে যে নূতন একটা আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা প্রতিফলিত হইত তাহার প্রেরণায়। ছেলেরা সতীনদার শিষ্য বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিত। সেবাপরায়ণতা, লোকের আপদে বিপদে সাহায্য করিবার আগ্রহ, শহরের দুষ্ট প্রকৃতির লোকেদের দমন করিবার সাহসের জন্য ইহারা সতীন মাষ্টারের দল বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত ছিল। পড়াশুনা, বিচারবুদ্ধি, গাম্ভীর্য্য ও সাহসের জন্য দেবানন্দ তাহার অপেক্ষা অধিকবয়স্ক ছেলেদের ডিঙাইয়া দলের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিল। সতীন স্থির করিল এবার দেবানন্দকে তাহাদের সম্প্রদায়ের আসল উদ্দেশ্যের কথা জানাইবে।

কিন্তু সে অবকাশ আসিবার আগেই দেবানন্দের পিতার বদলির আদেশ আসিল। এই আদেশের কথা দেবানন্দ যখন শুনিল তখন উহা বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত মনে হইল। সে অত্যন্ত দমিয়া গেল। পিতার কাছে একবার মৃদুভাবে প্রস্তাব করিল, সে এখানকার হোষ্টেলে থাকিয়া লেখাপড়া করিবে। জীবানন্দ এ প্রস্তাবে রাজী হইলেন না।

সতীনের কাছে এই বদলির আদেশের কথা বলিবার সময় দেবানন্দের চোখে জল আসিয়া পড়িল। তাহার চোখে জল দেখিয়া সতীন তাহাকে বুকে জড়াইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল —আমার এত দিনের শিকার—এই ফল হ'ল দেবু? সতীনদাকে ছাড়তে হবে বলে কান্না? একটু গম্ভীর হইয়া সে বলিল—এত দিন ধরে কি গীতা মুখস্থ করলে ভাই? কোন মানুষের প্রতি আসক্তি রাখতে নেই আমাদের। আমাদের

লক্ষ্য আদর্শকে কর্ম্মে রূপ দেওয়া। যে মন্ত্রে তোমাকে দীক্ষা দিয়েছি, তোমার কাজ হচ্ছে সেই মন্ত্র চারদিকে যত বেশী লোকের মধ্যে সম্ভব ছড়িয়ে দেওয়া। নূতন জায়গায় নূতন কাজের ক্ষেত্র পাবে। এর চেয়ে সুখবর কি আছে?

দেবানন্দ রুদ্ধস্বরে বলিল—কিন্তু আমার শিক্ষা ত শেষ হয় নি দাদা।

সতীন তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—তোর শিক্ষা শেষ হবার বেশী বাকী নেই রে। যেটুকু বাকী আছে তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আয় বোস।

দুই জনে বসিল। সতীন বলিল—কাজের লোক নানা জায়গায় রয়েছে। তারা ধীরে ধীরে জমি তৈরি করছে নানা প্রক্রিয়ায়। কাজটা ত সোজা নয় ভাই। মরা দেশকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে, জাগিয়ে তুলতে হবে। কত শতাব্দী ধরে আমরা মরে আছি। ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী অধিকার করে মুসলমানরা এদেশে কায়েম হয়ে বসল। এর প্রায় দু'শ বছর আগে থেকে হিন্দুস্থানে ইসলামের পতাকা ওড়াবার কল্পনা নিয়ে তারা ধীরে ধীরে এগুতে থাকে এদেশের দিকে। রাজা জয়পালের সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য ক্রমে টুকরো টুকরো হয়ে ধ্বসে পড়তে লাগল। কাবুল গেল, জালালাবাদ গেল, পেশোয়ার গেল, শেষে গেল লাহোর। লাহোর নেবার পৌনে দু'শ বছর পরে দিল্লী তাদের দখলে গেল। পাঁচ শ বছর পরে মারাঠারা যখন হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্যোগ-আয়োজন করছে, সাগরপার থেকে ইংরেজরা তখন উড়ে এসে জুড়ে বসল। সাত শ বছর ধরে আমরা গোলামি করছি। শিক্ষায়, চরিত্রে, আশা-আকাঙ্ক্ষায় আমাদের গোলামির ছাপ। আমরা অমানুষ হয়ে গেছি। পরবশতার কাদা স্তরে স্তরে শক্ত হয়ে বসেছে আমাদের মনে ও চরিত্রে। এই স্তর যা দিয়ে ভাঙতে গেলে আমরা ব্যথায় ককিয়ে উঠি, হাত পা ছুঁড়ে, চিৎকার করে, গালাগাল দিয়ে আমরা বাধা দিই, শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বলি কাদা আমাদের সনাতন অঙ্গরাগ। মুখে যা আসে তাই বলে যারা ভাঙতে চায় তাদের বিদ্রূপ করি, ভৎর্সনা করি, সমালোচনা করি। তাই ধীরে নরম জায়গা বেছে নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে, বহু কষ্টে কাজের লোক তৈরি করতে হচ্ছে। দু'-চার বৎসরের মধ্যে এই পরিশ্রমের ফল দেখতে পাবে লোকে।

সতীন থামিল, কিছুক্ষণ কি ভাবিল। তারপর বলিল—তুই যেখানে যাচ্ছিস সেখানে একজন কাজ করছেন। হয়ত ভগবানের ইচ্ছা তাঁর হাত দিয়ে তোর শিক্ষা শেষ হবে। ওখানে গিয়ে পাথরতলা পাড়ায়—দেবেন পণ্ডিত মশায়ের আশ্রমে যাবি। আমার কাছ থেকে যাচ্ছিস বলবি।

দলের সকলের কাছে বিদায় লইয়া দেবানন্দ পিতার সঙ্গে চলিয়া গেল। ক্রমশঃ

খাদ্যসঙ্কটে ছানার জলের ক্যালসিয়াম

অধ্যাপক শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত

খাদ্যসঙ্কট ও অর্থনৈতিক সঙ্কট যখন মানুষের জীবনীশক্তিতে ভাঙন সৃষ্টি করে চলেছে—সে সময়েই পুষ্টিকর খাদ্যের নির্ব্বাচন, খাদ্যগুণবিশিষ্ট ফেলে-দেওয়া-জিনিষকে আহার্য্য রূপে গ্রহণ করা এবং পরিপূরক খাদ্য সংগ্রহ ও সন্ধানের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। রক্তশূন্যতা, ক্যান্সার, রিকেট, যক্ষ্মা প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি আজ দেশবাসীর মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। খাদ্যগুণ সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং খাদ্যনির্ব্বাচনের অক্ষমতা এর জন্যে যতটা দায়ী, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ততটা নয়। খাদ্যে খনিজ পদার্থ এবং ভিটামিনের অভাবই এই শ্রেণীর রোগ উৎপত্তির প্রধান কারণ। দেহের পুষ্টিসাধনে খনিজ পদার্থগুলি বহুবিচিত্র কাজ সম্পন্ন করে। দেহগঠন ও পুষ্টিবিধানে যে ধাতুটি সবচেয়ে বেশী ক্রিয়াশীল তার নাম ক্যালসিয়াম। আজকাল যে-কোন রোগেই ডাক্তারেরা ক্যালসিয়াম ইনজেকশন নিতে বলেন। আমাদের প্রাত্যহিক আহার্য্যে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ খুব কমই থাকে, তাই সহজলভ্য ক্যালসিয়াম-ঘটিত খাদ্য নির্ব্বাচন করতে গিয়ে আজকাল পুষ্টিবিজ্ঞানীদের নজর পড়েছে ছানার জলের উপর। প্রতিদিন হাজার হাজার মণ ছানার জলের অপচয় ঘটছে। কি ভাবে এই জল থেকে খাদ্যরূপে ক্যালসিয়াম আহরণ করা যায় সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার জন্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। কিন্তু তার আগে দেহগঠনে ক্যালসিয়াম ধাতুটি কি ভাবে কাজ করে থাকে সে সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন।

দেহের উপাদানে ক্যালসিয়াম

আমাদের দেহে ১·৫ থেকে ২·২ শতাংশ ক্যালসিয়াম রয়েছে—এর শতকরা ৯৯ ভাগই অস্থিতে সঞ্চিত—বাকি এক ভাগ নরম পেশী এবং তরল জলীয় পদার্থে মিশে আছে। এই ক্যালসিয়ামের অনেকটা অংশ ফসফরাসের সঙ্গে একত্রীভূত হয়ে কেলাসিত ফস্‌ফেটরূপে অস্থি ও দাঁতে বর্ত্তমান। এই ক্যালসিয়াম আমাদের দেহের বহুমুখী বিচিত্র কার্য্য-প্রণালীর

ধারক ও বাহক। সংক্ষেপে এর কাজগুলোকে আমরা বর্ণনা করতে পারি নিম্নলিখিত রূপে :

(১) দেহের অস্থিমজ্জার গঠন

(২) রক্তকে জমাট করে দেওয়া : দেহের কোন স্থান কেটে গেলে সেখান থেকে রক্ত ক্ষরণ হয়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সেই রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়, কারণ যেখানটা কেটেছে সেই কাটা মুখে কিছু রক্ত জমে গিয়ে নির্গমনপথ বন্ধ করে দেবার জন্যই আর রক্ত বের হতে পারে না। রক্তের এই জমাট বাঁধা বা কোয়াগুলেশন-ক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম-পরমাণুর অস্তিত্ব একান্ত প্রয়োজনীয়।

(৩) মাংসপেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ : ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড কেটে নিয়ে দেখা গেছে যে, তার স্পন্দন থেমে যাবার পর সেটিকে যদি ক্যালসিয়াম লবণজলে ডুবিয়ে রাখা যায়, তা হলে সেই কাটা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন আবার সুরু হবে, কিন্তু জল থেকে তুলে নিলেই আবার থেমে যাবে। ক্যালসিয়াম-লবণ রক্তে বিদ্যমান থেকে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণে সহায়তা করে বলেই হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ঘটে থাকে, অবশ্য এই কার্য্যে সোডিয়াম এবং পটাসিয়াম লবণও কতকটা সাহায্য করে থাকে।

(৪) স্নায়ুমণ্ডলীর প্রদাহ নিয়ন্ত্রণে এবং পরিপাক-ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও রক্তে খাদ্যের সারাংশ শোষণকার্য্যে নিযুক্ত দেহের জলীয় পদার্থগুলির চলাচল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এই ক্যালসিয়াম।

(৫) ফুসফুস থেকে মাংসপেশীতে অক্সিজেন সরবরাহ এবং পেশী থেকে কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড চালান দেওয়ার কাজেও ক্যালসিয়াম কিছু সহায়তা করে থাকে।

দেহের গঠন ও বৃদ্ধি সাধনই ক্যালসিয়ামের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কাজ। দেহে যে পরিমাণ ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষিত হয়ে থাকে তার অনেকটা আবার বৃক্ক ও অন্ত্রের নিঃসরণী-পথ দিয়ে প্রতিদিন বেরিয়ে যায়, কাজেই খুব বেশী পরিমাণ ক্যালসিয়াম খাদ্যের সঙ্গে গ্রহণ না করলে দেহে ক্যালসিয়াম সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। দেহের উদ্বৃত্ত ক্যালসিয়াম অস্থিগুলিকে পুষ্ট ও দৃঢ় ভাবে গঠন করে, তা ছাড়া অস্থির আষ্টেপৃষ্ঠে বেল্টের মত বাঁধন বা ট্রেবেকিউল (trabeculae) তৈরি করে তাকে ঘাতসহ ও দৃঢ়তর করে থাকে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব হলে এবং তাতে ক্যালসিয়ামের প্রাচুর্য্য না থাকলে রক্ত ও নরম মাংসপেশীতে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ক্রমশঃ কমতে আরম্ভ করবে, ফলে অস্থিতে সঞ্চিত অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম রক্ত ও পেশীতে চলে আসবে এবং ক্যালসিয়ামের অভাব পূরণে সাহায্য করবে। এই ধাতুটির অভাবে দেহের অস্থিগঠন পূর্ণতা লাভ করে না, ফলে শিশুদের মধ্যে দেখা দেয় রিকেট বা অস্থিবাত রোগ। অনেক সময় ভিটামিন ডি প্রয়োগে এই রোগ সারে—পরীক্ষায় জানা গেছে যে, এই ভিটামিন খাদ্য থেকে ক্যালসিয়াম শোষণে সহায়তা করে দেহের ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসকে ভিটামিন অস্থির দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, কাজেই অস্থির বৃদ্ধির কার্য্য ব্যাহত হয় না। ক্যালসিয়ামের অভাবে অস্থি-যক্ষ্মাও দেখা দিতে পারে। এটি অতি সাঙ্ঘাতিক ব্যাধি, হাড়ের ভেতরটা ঝাঁঝরা করে দেয়। দাঁতের ক্ষয়ও ক্যালসিয়াম অভাবের একটা লক্ষণ। এই ক্যালসিয়ামের অভাবে দেহের স্বাভাবিক রোগ-প্রতিষেধক শক্তিও হ্রাস পায়।

দেহগঠনে ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন-মাত্রা

মানুষ ও জীবজন্তুর দেহগঠনের তাগিদে প্রতিদিন কতটা ক্যালসিয়াম প্রয়োজন হয়, বিভিন্ন খাদ্য-গ্রহণ পরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা তার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করেছেন। আমাদের দৈনন্দিন ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন তাদের হিসাবে এইরূপ ধরা পড়েছে :

বয়স				ক্যালসিয়ামের দৈনিক মাত্রা
৯	বৎসর পর্য্যন্ত বালক			১ গ্রাম
১০-১২	"	"	"	১·২
১৩-২০	"	"	"	১·৪
১৩-১৫	"	"	বালিকা	১·৩
১৬-২০	"	"	"	১·৪৫ "

সাধারণ ভাবে নির্দ্ধারণ করা হয়েছে যে, দেহের প্রতি সের ওজনে ·০০১৪ গ্রাম ক্যালসিয়াম আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন। অন্তঃসত্ত্বা নারীর পক্ষে কিছু বেশী ক্যালসিয়াম দরকার হয়, কারণ গর্ভস্থ শিশুর দেহগঠন প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত মাতৃদেহের ক্যালসিয়াম শোষিত হয়ে থাকে। কাজেই তখন তাদের বেশী করে ক্যালসিয়াম-ঘটিত খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। প্রতিদিন তাদের ১·৫ গ্রাম ক্যালসিয়াম দরকার হয়—স্তন্যদুগ্ধ-ক্ষরণ কালে এর পরিমাণ দু' গ্রামেরও বেশী বাড়াতে হয়।

বিভিন্ন খাদ্যে ক্যালসিয়াম

দেহে ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত বিভিন্ন রোগের কথা স্মরণ রেখে প্রচুর ক্যালসিয়াম-ঘটিত খাদ্য আমাদের গ্রহণ করা উচিত। দার্জ্জিলিং প্রভৃতি শীতপ্রধান অঞ্চলে প্রচণ্ড শীতের সময় অনেকের হাতপায়ের আঙুল ও কান ফুলে যায়, কেটে রক্ত পড়ে। অনেক চিকিৎসক বলেন, দেহের ক্যালসিয়ামের ঘাটতির সঙ্গে নাকি এই রোগের সম্পর্ক রয়েছে। কাজেই আমাদের খাদ্য-তালিকায় ক্যালসিয়ামের পরিমাণের উপর নজর রাখা কর্ত্তব্য। আমাদের প্রতিদিনের আহার্য্য—ভাত, ডাল, শাকসব্জী ও মাছ থেকে নাকি মাত্র ·২ গ্রাম ক্যালসিয়ামের সংস্থান হয়ে থাকে, আমাদের প্রয়োজনের মাত্র ৪ ভাগের ১ ভাগ। সাধারণ খাদ্যের ক্যালসিয়ামের পরিমাণ

সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ জ্ঞান না থাকলে এই ঘাটতি পূরণে আমরা সচেষ্ট হতে পারি না। বিভিন্ন খাদ্যে এর পরিমাণের তালিকা নীচে দেওয়া হ'ল :

খাদ্য	ক্যালসিয়ামের শতকরা পরিমাণ	খাদ্য	ক্যালসিয়ামের শতকরা পরিমাণ
গোদুগ্ধ	·১২	গুড়	·২৫
ছাগ-দুগ্ধ	·১২	কমলালেবু	·০৩
মেষ দুগ্ধ	·১৮	সয়াশিম	·২৫
মাতৃদুগ্ধ	·০২	তুমুর	·০৫
ডিম	·০৬	কলা	·০১
চাউল	·০৭	খেজুর	·০৭
গম	·০৬	বাঁধাকপি	·০৫

ছানার জলের খাদ্য গুণ

ক্যালসিয়ামের অভাব পূরণ করতে হলে দুধ ও প্রচুর শাকসব্জী আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকাভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের দেশে গড়ে বাৎসরিক দুগ্ধ উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৬৭৫০ লক্ষ মণ—এর তিন-চতুর্থাংশই ঘি ও অন্যান্য দুগ্ধজাত খাদ্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। মাত্র একচতুর্থাংশ আমরা পানীয় রূপে পেয়ে থাকি। এদেশে মাথাপিছু দৈনিক দুগ্ধ গ্রহণের পরিমাণ হিসাব করলে দাঁড়ায় ২ আউন্সেরও কম। কিন্তু পুষ্টিবিজ্ঞানীরা পূর্ণবয়স্কের পক্ষে অন্ততঃ ৮ আউন্স এবং শিশুর জন্যে ১৬ আউন্স দৈনিক দুগ্ধ পানের বিধান দিয়ে থাকেন। অন্যান্য দেশে এর পরিমাণ যথাক্রমে ২০ ও ৩৫ আউন্স। এদেশে অর্দ্ধেকেরও বেশী লোকের ভাগ্যেই দুধ জোটে না এবং অন্য কোন খাদ্য দিয়েও ক্যালসিয়ামের এই ঘাটতি পূরণ করা হয় না। দুধ থেকে তৈরি ছানা বের করে নিয়ে অনেক রকমের মিষ্ট দ্রব্য তৈরি করা হয়ে থাকে। কিন্তু ছানার জল ময়রারা নির্ব্বিচারে ফেলে দিয়ে থাকে। যাদের ভাগ্যে দুধ জোটে না, তাদের এই জল পেলেও কিছু কাজ হয়—নিতান্তপক্ষে ঘোলও যদি না জোটে। নীচের তালিকা থেকে দেখা যাবে যে ছানার জলেও বেশ খানিক সার পদার্থ এবং ক্যালসিয়াম বিদ্যমান রয়েছে :

উপাদান শতাংশ	দুধ	ছানা (নিংড়ানো)	ছানার জল
জল	৮৭·৪	৪৪·৭	৯৫
ফ্যাট (চর্ব্বি)	৩·৮	২৭·৪	·৮
দুগ্ধ-শর্করা (Lactose)	৪·৭	৪·৩	৪·১
প্রোটিন	৩·৫	৩২·৩	·২
ক্যালসিয়াম	·১১৮	·০৮২	·০৭৮

বাজার থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন স্থানের ছানার জলের রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে সেই জলের প্রতি আউন্সে ১৮·৬ থেকে ৩৯ মিলিগ্রাম পর্য্যন্ত ক্যালসিয়াম বর্ত্তমান থাকে। বাংলাদেশে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩৪০০০ মণ ছানার জলের অপচয় হয়ে থাকে। দৈনিক প্রায় ২৪৩ মণ ক্যালসিয়াম এই ছানার জলের সঙ্গে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এই ফেলে-দেওয়া ছানার জল থেকে ক্যালসিয়াম আহরণ করা নিতান্তই প্রয়োজন।

ছানার জলের ব্যবহার

ছানার জল সকলের নিকট সহজলভ্য না হলেও যেসব অঞ্চলে দুধ থেকে প্রচুর ছানা তৈরি হয়ে থাকে সেই সকল অঞ্চলে এই জলকে খাদ্যরূপে বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। বর্দ্ধমান-আসানসোল এবং হাওড়া তারকেশ্বরের সকালের দিককার ট্রেনে দেখা যায় প্রচুর ছানা ঝুড়ি ঝুড়ি চালান যাচ্ছে—ট্রেনের প্রায় প্রত্যেকটি কামরাই এই ছানাতে ভর্ত্তি। ছানার জলটা ফেলে দিয়ে গোয়ালারা এই ছানা বাজারে বিক্রি করে দেয় ময়রাদের কাছে। ডায়ারী কার্য্যে সাধারণ দুধ, ঘনীভূত দুধ, বা গুঁড়ো দুধ তৈরি করা হয়—ছানা সম্ভবতঃ এসব কার্য্যে তৈরি করা হয় না, তবে পনির যারা তৈরি করে, তারাও ছানার জল ফেলে দিয়ে থাকে। এই ছানার জলকে অত্যন্ত কম চাপে বাষ্পীভূত করে শুকিয়ে ফেললে যে গুঁড়ো পাওয়া যাবে—তাতে প্রধানতঃ দুগ্ধ-শর্করা, ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য খনিজ লবণ বিদ্যমান থাকবে—সেটা গুঁড়ো দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া চলতে পারে। লজেন্স চকোলেট বা বিস্কুট যারা তৈরি করে তাদের ফ্যাক্টরী যদি ছানাপ্রস্তুতকারকদের আবাসস্থলের কাছাকাছি থাকে, তা হলে তারা এই জল কিনে নিয়ে, তাকে কিঞ্চিৎ ঘন করে চকোলেট ইত্যাদিতে অনায়াসেই ব্যবহার করতে পারেন। এই জলকে নির্বীজ করে নিয়েও দুধের মত নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে চালান দেওয়া যেতে পারে।

ময়রার দোকানে যদি ছানার জল বিক্রির জন্যে মজুদ রাখা হয় তা হলে সাধারণ গৃহস্থেরাও তা সংগ্রহ করতে পারে। তবে বিক্রির সুবিধা পেলে ময়রারা এই জলে নিশ্চয়ই ভেজাল দেবে, শহর বা পল্লীর পৌরসভাকে তখন এদিকেও নজর দিতে হবে। অত্যন্ত সহজ উপায়ে এই ভেজাল ধরার উপায় বের করতে হবে। গৃহস্থেরা এই জল কিনে নিয়ে ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিলে আর রোগের ভয় থাকবে না। রান্নার কাজে সাধারণ জল ব্যবহার না করে—এই ছানার জলে রান্না করা যেতে পারে। ডাল, মাছ, শাকসব্জী এই জলে সিদ্ধ করে রান্না করলে, মনে হয়, এই ভাবে তৈরি খাদ্যগুলো খেতে বিস্বাদ লাগবে না—আমাদের দেহে কিছু সস্তা ক্যালসিয়ামও সংগৃহীত হবে। স্যালাড তৈরিতে কাঁচা সব্জীর সঙ্গে ভিনিগারের বদলে এই জল অতি চমৎকার ক্রিয়া করবে। এই ছানার জলে খাদ্য-ইষ্টের চাষ করা খুবই অল্প ব্যয়সাধ্য। ইষ্ট-প্রস্তুতকারকগণ পাইকারী হিসাবে প্রচুর ছানার জল সংগ্রহ করে, তাতে ইষ্টের 'কালচার' করতে
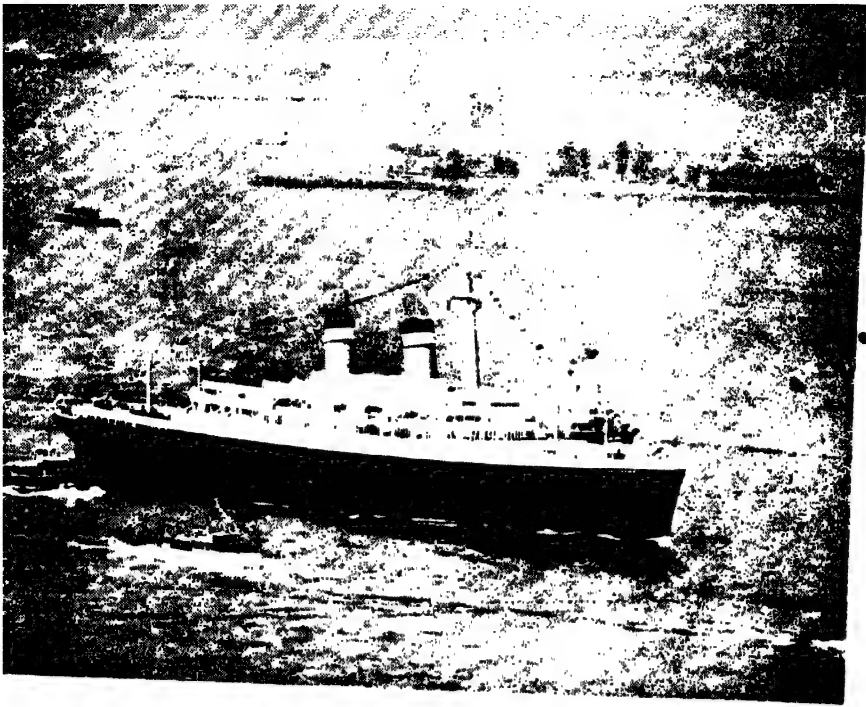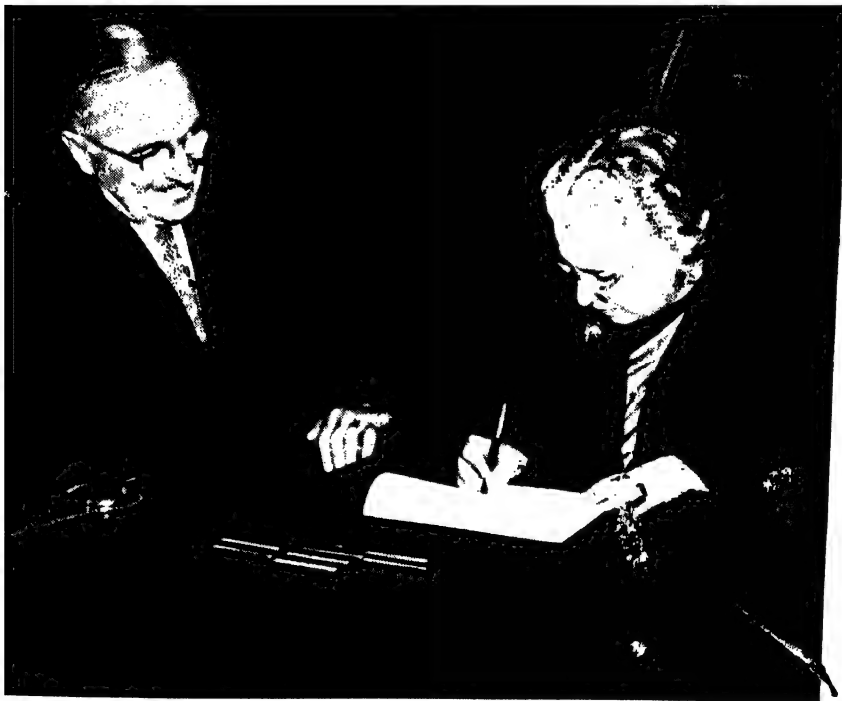
... অদূরে (ঃ্ঠ) অফ্ লিবার্টি

ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেণ্ট টু্ম্যানের সমক্ষে খাদ্য-ক্রয় চুক্তি স্বাক্ষর-রত
শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

দুর প্রাচ্য মার্কিণ বিমানবাহিনীর নূতন কম্যাণ্ডার জেনারেল ওয়েল্যা

বিমানবাহিনী ভিনব এক্স- জট মান
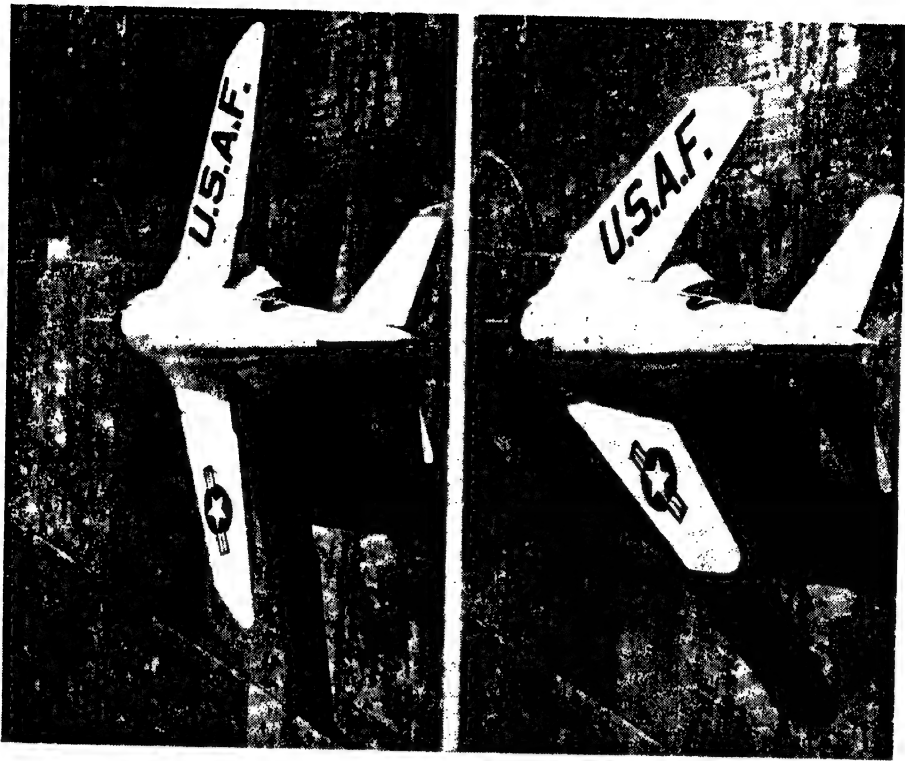
পারেন। ও তো ইষ্টের আজকাল প্রচুর ব্যবহার হচ্ছে নিরামিষ জাতীয় প্রোটিন খাদ্যরূপে। যথেষ্ট পরিমাণে এই ইষ্ট তৈরি করা আমাদের দেশে আজ নিতান্তই দরকার—ছানার জল হবে এই ইষ্ট-চাষের একটি মাধ্যম। আর একটি কথা মনে হবে যে—ছানার জলের সঙ্গে আবশ্যকমত অজৈব লবণ এবং নাইট্রোজেন-ঘটিত খাদ্য মিশিয়ে যদি তাতে তুলোর বীজ থেকে সংগ্রহ করা Ashbya gossipium নামক ছত্রাকের চাষ করা যায়, তা হলে রিবোফ্লেভিন বা ভিটামিন বি নামক পদার্থটি এই কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা সম্ভব হতে পারে। এই ভিটামিনটি দেহের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এর অভাবে পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যাঘাত, স্নায়ুমণ্ডলীর অবসাদ, দুর্বল চক্ষু ও চর্মরোগ ইত্যাদি দেখা দেয়। রিবোফ্লেভিন তৈরির কার্য্যে ছানার জল নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন।

ছানার জল ফেলে দিয়ে আমরা প্রতিদিন যথেষ্ট পরিমাণ সহজলভ্য ক্যালসিয়ামের অপচয় ঘটাচ্ছি। এই জিনিসটিকে খাদ্যরূপে ব্যবহার এবং অন্যান্য খাদ্যপ্রস্তুতিতে ব্যবহারের উপযুক্ত পন্থা আবিষ্কার করার জন্যে এদেশের নিউট্রিশন্যাল ল্যাবরেটরীগুলির অবিলম্বে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন।

কবি ভর্ত্তৃহরি

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

আধ্যাত্মিক সাহিত্য ভারতের চিরন্তন সম্পদ। এ দেশের জলবায়ু পর্ব্বত মাটির সহিত উহা জড়িত। এই আধ্যাত্মিকতার কবি যে কত প্রাচীনকাল হইতে এদেশে আবির্ভূত হইয়াছেন তাহা বলা কঠিন। "শ্রুতি"র যুগ হইতে যে তাঁহারা মানুষকে শান্তির বাণী বিলাইয়া আসিয়াছেন তাহা নিশ্চিত। কত কবি যে কত সময়ে আবির্ভূত হইয়া ভারতের বায়ুকে আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ করিয়া গিয়াছেন, গ্রন্থের বিলোপে ও ইতিহাসের অভাবে তাহা নির্ণয় করা একরূপ অসাধ্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধে একজন কবির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

কালিদাসাদির ন্যায় যোগী-কবি ভর্ত্তৃহরি সম্বন্ধে নানা গালগল্প প্রচলিত আছে। তিনি উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা ছিলেন, তিনি রাজসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, স্ত্রীর দুশ্চরিত্রতার বিষয় অবগত হইয়া তিনি সংসার ত্যাগ করেন, তিনি বিক্রমাদিত্যের হস্তে নিহত হন—এইরূপ গালগল্পের অভাব নাই।

ভর্ত্তৃহরির সময়ও অনিশ্চিত। তবে বর্ত্তমান কালের পণ্ডিতেরা গবেষণা করিয়া যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহাতে মনে হয় খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের কাছাকাছি কোন সময়ে তাঁহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। এক্ষণে কালিদাসের সময় খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষ ভাগ বলিয়া সাধারণতঃ ধরা হইয়া থাকে—গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের আমল। ইহা ঠিক হইলে ভর্ত্তৃহরিকে তাঁহার অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী বিবেচনা করিতে হয়।

অধ্যাপক বেঙ্কট রমণ তাঁহার *Sankaracharya, the Great and His Successors in Kanchi* নামক পুস্তকে অনেক গবেষণার পর খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের শেষ দিকে সম্ভবতঃ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইলে শঙ্করাচার্য্য ও ভর্ত্তৃহরির মধ্যে সময়ের ব্যবধান খুব বেশী নহে। প্রতিকূল প্রমাণের অভাবে আমরা এই মত গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারি।

শঙ্করাচার্য্য ছিলেন গোবিন্দ ভাগবতপদ নামক এক ব্রহ্মজ্ঞানীর শিষ্য। এই গোবিন্দ ভাগবতপদ একজন বড় বৈয়াকরণও ছিলেন। তিনি পতঞ্জলির মহাভাষ্যের পুনঃপ্রচলন করেন। এরূপও কথিত আছে যে, এই গোবিন্দের অপর নাম ছিল চন্দ্র এবং ভর্ত্তৃহরি এই চন্দ্রেরই পুত্র (অথবা শিষ্য)। এরূপ কাহিনীও আছে যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি বর্ণের চারি কন্যাকে চন্দ্র বিবাহ করিয়াছিলেন এবং ভর্ত্তৃহরি তাঁহার শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র।

এই সকল কুহেলিকার মধ্য হইতে সত্যোদ্ধার এক প্রকার অসম্ভব। তবে এটা ঠিক যে, ভর্ত্তৃহরি প্রাচীন কালের একজন বড় কবি ও যোগী ছিলেন এবং বৈরাগ্যশতক, নীতিশতক ও শৃঙ্গারশতক নামক তিনখানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন যাহা এখনও বিদ্বৎসমাজে আদৃত ও প্রসিদ্ধ। তিনি হরিকারিকা নামক ব্যাকরণগ্রন্থেরও প্রণেতা বলিয়া গণ্য, কিন্তু এ গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত যোগীর দল এখনও পশ্চিমাঞ্চলে গান গাহিয়া বেড়ায়।

ভর্ত্তৃহরির শতক তিনখানি ফরাসী, লাটিন, জার্ম্মান ও ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে ইংরেজী ভাষায় এগুলির কতকাংশের পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হইয়া প্রচুর সমাদর লাভ করিয়াছে। মহারাষ্ট্র ভাষায় গ্রন্থত্রয়ের সুন্দর অনুবাদ আছে এবং তাহা ঐ অঞ্চলে বিশেষ সমাদৃত। আরও কোন কোন স্থানে ঐরূপ অনুবাদ থাকা সম্ভব, কিন্তু বাংলা দেশে দুঃখের বিষয় এই পুস্তকগুলি যথেষ্ট পরিমাণে

পরিচিত ও সমাদৃত নহে। অনুবাদ না আছে এমন নয়, তবে প্রচলন তেমন বেশী দেখা যায় না, অথচ বাংলা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ভাষা।

আমরা একণে গ্রন্থ তিনখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। নাম হইতেই বুঝা যাইতেছে একখানি বৈরাগ্য বিষয়ক, একখানি নীতিবিষয়ক এবং অপরখানি শৃঙ্গার বিষয়ক গ্রন্থ। কথা উঠিতে পারে; বৈরাগ্য ও নীতি লইয়া যিনি ব্যস্ত তিনি আবার শৃঙ্গারশতক লিখিতে গেলেন কেন? কেহ কেহ অনুমান করেন তিনি প্রথম জীবনে শৃঙ্গারশতক লিখিয়া পরে বৈরাগ্যশতক ও নীতিশতক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ হইতেই দেখা যাইবে এরূপ অনুমান যুক্তিসহ নহে। নীতিশতকের ৭৭ সংখ্যক শ্লোকে আছে:

বৈরাগ্যে সংচরত্যেকো নীতৌ ভ্রমতি চাপরঃ।
শৃঙ্গারে রমতে কশ্চিদ্ভুবি ভেদাঃ পরস্পরম্।

অর্থাৎ—কেহ বৈরাগ্যে সঞ্চরণ করে, কেহ নীতিতে ভ্রমণ করে, কেহ শৃঙ্গার-রসেই আনন্দ পায়, পৃথিবীতে পরস্পর ভেদ আছে। তাই কবি তিন রকমেরই গ্রন্থ রচনা করিলেন। বাস্তবিক সেকালে কামশাস্ত্র প্রচলিত শিক্ষণীয় শাস্ত্রগুলির অন্যতম ছিল। শঙ্করাচার্য্যকেও নাকি এক সময়ে অসম্পূর্ণ শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য কামশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। ভর্ত্তৃহরির শৃঙ্গারশতকেও স্থানে স্থানে বৈরাগ্য ও নীতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা অসম্ভব নহে যে যোগী হইবার পূর্ব্বে তিনি সাহিত্য হিসাবে তিনখানি গ্রন্থই লিখিয়াছিলেন।

ভর্ত্তৃহরির কোন কোন শ্লোক শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত মোহমুদ্গরের শ্লোক স্মরণ করাইয়া দেয়। মোহমুদ্গরে পাই—

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডং।
করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডং।

বৈরাগ্যশতকের ষোড়শ শ্লোকে আছে—

ভিক্ষাশনং তদপি নীরসমেকবারং
শয্যা চ ভূঃ পরিজনো নিজদেহমাত্রম্।
বস্ত্রং জীর্ণপটখণ্ডনিবদ্ধকন্থা
হা হা তথাপি বিষয়ান্ ন পরিত্যজন্তি।

ইহার অনুবাদ করা যাইতে পারে—

নীরস ভিক্ষান্ন, তাও জোটে একবার,
ভূমিশয্যা, নিজ দেহ মাত্র পরিবার,
জীর্ণ বস্ত্রে গাঁথা কন্থা তাহাই বসন,
হায় রে, বিষয় তবু নাহি ত্যজে জন।

৭ম শ্লোকে কবি বলিতেছেন—

অমীষাং প্রাণানাং তুলিতবিসিনীপত্রপয়সাম্
কৃতে কিং নাস্মাভির্বিগলিতবিবেকৈর্ব্যবসিতম্।
যদাঢ্যানামগ্রে দ্রবিণমদনিঃসংজ্ঞমনসাম্
কৃতং বীতব্রীড়ৈর্নিজগুণকথাপাতকমপি।

অনুবাদ—

এই যে জীবন সব
বারিসম পদ্মপত্রোপরে—
ত্যজিয়া বিবেক মোরা
কিবা না করেছি এর তরে?
করেছি পাতক মোরা
আত্মগুণ করিয়া প্রকাশ
লজ্জা ত্যজি, ধনমত্ত
জ্ঞানহীন ধনীদের পাশ।

ইহার প্রথমাংশ মোহমুদ্গরের—

নলিনীদলগতজলমতিতরলং
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলং

স্মরণ করাইয়া দেয়। অপরাংশে দেখা যায় ধনী ও স্তাবকদিগের মধ্যে চিরাচরিত পদ্ধতি বহুকাল হইতে একরকমই চলিয়া আসিতেছে।

কবির নীতিশতকের ২য় শ্লোকটি এই—

যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা
সাপ্যন্যমিচ্ছতি জনং স জনোঽন্যসক্তঃ।
অস্মৎকৃতে চ পরিতুষ্যতি কাচিদন্যা
ধিক্ তাং চ তং চ মদনং চ ইমাং চ মাং চ।

ইহার অনুবাদ—

সদা চিন্তা যার তরে
বিরক্ত সে আমার উপর,
চাহিছে সে অন্য জনে,
অন্যে পুনঃ আসক্ত সে নর।
অপর যা কেহ মোরে
তুষ্ট তরে চাহে পুনরায়,
ধিক্ নারী, ধিক্ নরে
ধিক্ কামে, তারে ও আমায়।

এই কবিতা কবির নিজ পরিবারের কোন ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ নাই। কবি সাধারণ নরনারীর কথাই বলিয়াছেন মনে হয়। অন্যান্য অনেক কবিতায় দেখা যায় যাহা সাধারণ নরনারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কবি তাহা উত্তম পুরুষের প্রমুখাৎ ব্যক্ত করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত কবিতা দুইটি কবির নিজ জীবনের ঘটনা বিবৃত করিতেছে এরূপ ভাবিবার কোন কারণ নাই। বৈরাগ্য শতকের ৫ম শ্লোক—

উৎখাতং নিধিশঙ্কয়া ক্ষিতিতলং ধ্মাতা গিরের্ধাতবো
নিস্তীর্ণঃ সরিতাং পতির্নৃপতয়ো যত্নেন সন্তোষিতাঃ।
মন্ত্রারাধনতৎপরেণ মনসা নীতাঃ শ্মশানে নিশাঃ
প্রাপ্তঃ কাণবরাটকোঽপি ন ময়া তৃষ্ণেঽধুনা মুঞ্চ মাম্।

অনুবাদ—

রতন মিলিবে আশে
    ক্ষিতিতল করেছি খনিত,
গিরি হতে ধাতু সব
    অনলে করেছি বিগলিত,
সাগরে দিয়াছি পাড়ি
    নৃপগণে তুষেছি যতনে,
কেটেছে শ্মশানে নিশা
    একমনে মন্ত্রের সাধনে,
পাই নাই কাণাকড়ি
    ওগো তৃষ্ণে, কখন কোথায়,
এবে তুমি ছাড়হ আমায়।

ষষ্ঠ শ্লোক—

খলোল্লাপাঃ সোঢ়াঃ কথমপি তদারাধনপরৈ-
র্নিগৃহ্যান্তর্বাষ্পং হসিতমপি শূন্যেন মনসা।
কৃতশ্চিত্তস্তম্ভঃ প্রতিহতধিয়ামঞ্জলিরপি
ত্বমাশে মোঘাশে কিমু পরমতো নর্ত্তয়সি মাম্।

অনুবাদ—

দুষ্টের সেবায় থাকি
    কোনরূপে কদর্য্য ভাষণ
সয়েছি তাদের আমি,
    করি অশ্রু অন্তরে ধারণ,
হাসিয়াছি শূন্য মনে,
    রুদ্ধ করি মনোবৃত্তি যত,
অজ্ঞান মানব-পাশ
    করযোড়ে রহিয়াছি কত।
তবু আশা, বৃথা আশা, কেন
    নাচাইছ মোরে তুমি হেন?

শৃঙ্গারশতকে কেবল যে কন্দর্পের জয়গানই আছে তেমন নহে, ইহাতে যুবকদিগকে সতর্ক করিয়াও অনেক কথা বলা হইয়াছে—

৮ম শ্লোকে কবি স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে বলিতেছেন—

জল্পন্তি সার্দ্ধমন্যেন পশ্যন্ত্যন্যং সবিভ্রমম্
হৃদয়ে চিন্তয়ন্ত্যন্যং প্রিয়ঃ কো নাম যোষিতাম্।

অনুবাদ—

কারো সনে বাক্যালাপ,
    সবিভ্রমে চাহে অন্য পানে।
হৃদয়ে চিন্তয়ে অন্যে,
    নারীর কে প্রিয় কেবা জানে?

ভর্তৃহরির কবিতায় তাৎকালিক সামাজিক প্রথা ও আচার-ব্যবহারের অনেক আভাস পাওয়া যায়। সমাজের উচ্চ স্তরে দম্ভ, দরিদ্রের হীন অবস্থা, তান্ত্রিকতা-সাধন, বৈরাগ্যের উচ্চাদর্শ এ সমস্ত আছে। সময়ভেদে রুচির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু মনুষ্যচরিত্রের বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

অজানার দান

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

মানুষে বেসেছি ভাল, এই শুধু মোর পরিচয়।
যাঁহারে হইলে জানা সব জানা হয়ে যায় শেষ
তাঁহারে হয় নি জানা, সে একের পাইনি উদ্দেশ,
অনেকের খোঁজে মোর কেটে গেছে অনেক সময়।

মাটির পৃথিবী এই, আনন্দ ও বেদনার গড়া,
দুঃখ ও বিচ্ছেদ আছে, আছে তবু সুগভীর স্নেহ,
সে স্নেহ মুছিয়া দেয় সব দ্বিধা, সকল সন্দেহ,
সুখভরা, দুঃখভরা—ভালবাসি এই বসুন্ধরা।

মানুষের তরে কত মানুষের আকুলি-বিকুলি!
অত্যাচারে বার বার জর্জ্জরিত হ'ল এ সমাজ,
জীবন আহুতি দিয়া মানুষ বুঝেছে তার লাজ,
অপূর্ব্ব তাহার ত্যাগে ধন্য হ'ল ধরণীর ধূলি।

সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তের বর্ণে হ'ল বিরঞ্জিত প্রাণ,
মানুষ দেখেছে তাই সে-উদয় সে-অস্ত সুন্দর,
ধরণীর শ্যাম আর আকাশের নীল মনোহর,
প্রকৃতি সৌন্দর্য্যময়ী, মানুষ রচিল তার গান।

আছে পুণ্য, আছে পাপ, এই তার ভাগ্যের বিধান,
একান্ত নির্ম্মল শুভ্র অকলঙ্ক নহে তার মন,
পরিপূর্ণ-বর্ণহীন কালো নয় তাহার জীবন,
আলো-ছায়া-সমাবেশে বিচিত্র সে চিত্রের সমান।

সীমার পিছনে ছুটে অসীমের করিনি সন্ধান,
কালো দুটি চোখে আমি দেখিয়াছি অনন্তের আলো,
জ্বেলেছে মনের দীপ, সে আলো লেগেছে বড় ভালো।
আকাশে করিনি আমি অপরূপ প্রাসাদ নির্ম্মাণ।

আমার কবিতা যদি, ওগো বন্ধু, ভাল লাগে কারো,
সেই অনুরাগে কিছু নাহি কি আমার অধিকার?
সৃষ্টিরে বাসিলে ভালো সে পূজা কি নহেকো স্রষ্টার?
জীবন সার্থক হোক, ভালবাসো ভালবাসো আরো।

মানুষের তরে আমি রচিয়াছি মানুষের গান,
মাটির পরশ লভি' সে গান পেয়েছে সব সুর,
তুমি যে আমারি ঘরে, হে দেবতা, নহ তুমি দূর!
আমার মাঝারে আমি পেয়েছি যে অজানার দান।

শিক্ষার সমস্যা

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

শিক্ষাবিদ্‌দের সম্মেলনে এরূপ একজন সাংবাদিকের স্থান কোথায়—একথাটির জবাব আগে দেওয়া দরকার। সাংবাদিকও এক প্রকার লোক-শিক্ষক। আপনারা স্কুল কলেজের শিক্ষাবিদ্‌বৃন্দ বালক-বালিকাকে, যুবক-যুবতীকে পিটিয়া মানুষ করিতে চান। সাংবাদিক সমাজকে পিটিয়া থাকেন। এই কর্ত্তব্য আমাদের যৌবনে—সুরেন্দ্রনাথ, মতিলাল, বিপিনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধব, অরবিন্দ, শ্যামসুন্দর প্রভৃতি বাঙালী প্রধানবৃন্দ ও বালগঙ্গাধর তিলক, সুব্রহ্মণ্য আয়ার কর্ত্তৃক আচরিত হইতে দেখিয়াছি। সেই যুগে সাংবাদিকের বৃত্তি জীবনের একটি কর্ত্তব্য (misson) বলিয়া গ্রহণ করিতে শিখিয়াছিলাম, জীবিকা উপার্জ্জনের উপায় (profession) বলিয়া নয়। সেই যুগের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে এখনও পারি নাই। সেইজন্য লোক-শিক্ষকবৃন্দের এই সভায় উপস্থিত হইতে সাহস পাইয়াছি।

১১৫ বৎসর পূর্ব্বে মেকলে এই দেশের জন্য শিক্ষার একটা আদর্শ স্থির করিয়া দেন; শিক্ষার মাধ্যমে পরদেশী শাসকবর্গ ভারতবর্ষে কিরূপ মানুষের বিবর্ত্তন দেখিতে চান তাহা স্পষ্ট ভাষায় নির্দ্দেশ করিয়া দেন। রক্তে ও রঙে হইবে ভারতবাসী তারা, কিন্তু ভাব ও চিন্তায় তারা হইবে ইংরেজ। এই আদর্শ সংস্কারপন্থী ভারতবাসী মনে-প্রাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন; আপদ্ ধর্ম্ম বলিয়া রক্ষণশীল শ্রেণীও তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন 'ইয়ং বেঙ্গল', 'ইয়ং বোম্বাই'—নবীন বাঙালী, নবীন বোম্বাইওয়ালা। মেকলের শিক্ষানীতির কল্যাণে যাঁহারা শিক্ষিত হইবেন তাঁহাদের চিন্তাধারা চুয়াইয়া (filter) নিম্ন স্তরের সমাজকে সরস ও ফলবান করিবে—এই আশা বিদেশী শাসকবর্গ ও আমাদের দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ মনের কোণে পোষণ করিতেন।

তার পর হইল তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ নগরী তাহাদের কেন্দ্রস্থল। এই শিক্ষার দৌলতে যে শ্রেণীসমূহের উৎপত্তি হইল, তারা ২৫ বৎসরের মধ্যে শিক্ষার আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা লইয়া তর্ক আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন; ইংরেজের সঙ্গে ঝগড়াও আরম্ভ করেন। মহারাষ্ট্র দেশের এই অসন্তুষ্ট শ্রেণীর মুখপত্র ছিল 'নিবন্ধ-মালা' নামক পত্রিকা। এই পত্রিকাখানি 'বঙ্গদর্শন' যে বৎসর প্রকাশিত হয়, সেই বৎসরে পুনা নগরীতে আবির্ভূত হয়। মারাঠি বন্ধুবর্গের নিকট শুনিয়াছি যে, 'নিবন্ধ-মালা'র সম্পাদক বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপলুনকর প্রথম যৌবনে শিক্ষা বিভাগে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। তাঁরা আরও বলিয়াছেন যে, 'বঙ্গদর্শন' বাঙালী সমাজে যে নবজাগৃতি, নবীন সমালোচনার (new criticism) প্রবর্ত্তন করে, 'নিবন্ধ-মালা' মহারাষ্ট্রে তাহাই করিয়াছিল। বলবন্ত গঙ্গাধর তিলকের জীবনচরিতে দেখিতে পাই ঐ গ্রন্থের লেখক নরসিংহ চিন্তামন্ কেলকর, বিষ্ণুশাস্ত্রীকে অভিনন্দন করিতেছেন মহারাষ্ট্রে নবজাতীয়তার উদ্বোধক বলিয়া। বলবন্ত রাও তাঁহার যোগ্য উত্তরসাধক।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ২৫ বৎসরের মধ্যে এই যে অসন্তুষ্টি তাহার দাপটে ১৮৮২ সালে একটি শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত হয়। স্যার উইলিয়ম হাণ্টার ছিলেন তার সভাপতি। তার পর আমিই দেখিলাম তিনটি শিক্ষা-বিষয়ক কমিশন—র‍্যালে (Raleigh) কমিশন, স্যাডলার কমিশন ও রাধাকৃষ্ণণ কমিশন। আমার দেখা প্রথমটি নিযুক্ত করেন জবরদস্ত বড়লাট কার্জ্জন। তাঁর বিদ্যার অভিমান ছিল মাত্রাহীন। তাঁর দেশ-কাল-পাত্রের জ্ঞান ছিল না। থাকিলে তিনি এমন করিয়া খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া পাগল করিতেন না বাঙালীকে। তাহাতে শাপে বর হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের প্রারম্ভ হইতে যে নবজাতীয়তার উত্তাল তরঙ্গ দিকে দিকে সঞ্চারিত হয় তাহার ঢেউ সর্ব্বভারতীয় শক্তিলাভ করিয়া ইংরেজের রাষ্ট্রশক্তিকে ভারত ছাড়া করিয়াছে। স্যাডলার কমিশন বড়লাট চেম্‌সফোর্ডের আমলে নিযুক্ত হয়, আর রাধাকিষ্ণণ কমিশন নিযুক্ত করেন স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রিসভা—পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে যে মন্ত্রি-সভা ইংরেজের হাত হইতে দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন।

এই কমিশন-ত্রয়ের প্রস্তাবসমূহ আমি আলোচনা করিব না। র‍্যালে কমিশন ও স্যাডলার কমিশনের আলোচনা করিতে গেলে রীতিমত গবেষণা করিতে হয়। রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের প্রস্তাব লইয়া এইখানে উপস্থিত শিক্ষাবিদ্‌গণ আলোচনা করিবেন। লাট কার্জ্জনের কমিশন যখন তার সিদ্ধান্ত প্রকাশিত করিলেন তখন আসমুদ্র হিমাচল পরিবেষ্টিত এই মহাদেশ প্রতিবাদে উদ্বেলিত হইয়াছিল। এই প্রতিবাদ হইতেই আমাদের যুগের ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে হাতে-খড়ি আরম্ভ হয়। রাষ্ট্রের সঙ্গে শিক্ষার সম্বন্ধের কথা তখনই কিছু কিছু

বুঝিতে আরম্ভ করি এবং ইংরেজের কল্পিত শিক্ষিত ভারতবাসী ভারতবর্ষের মনের মানুষ হইতে পারেন না, এই কথার অর্থ তখনই বুঝিতে পারিলাম। কার্জন কমিশনের সিদ্ধান্তসমূহের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়িয়া উঠে তার আলোকে আমাদের এই অনুভূতি ও বোধ জাগ্রত হয় যে বিলাত ও ভারতবর্ষের মধ্যে একটা আদর্শ ও স্বার্থের বিরোধ বর্ত্তমান। এই মানসিক পরিবর্ত্তনই আমাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের জনয়িত্রী। তার কল্যাণে আমাদের আদর্শ বদলাইল, আমাদের নীতি ও কর্ম্ম-পদ্ধতি বদলাইল। নূতন মন ও দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আমরা জগতের ঘটনাবলীর বিচার করিতে শিখিলাম। কিন্তু রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের সিদ্ধান্ত আমাদের সমাজে কোন আলোড়নের সৃষ্টি করে নাই। কেন?

৪৫ বৎসর পূর্ব্বের এই অভিজ্ঞতা লইয়া শিক্ষক না হইয়াও আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবার সাহস সংগ্রহ করিয়াছি। মেকলের উদ্দেশ্য কি ছিল তাহা আপনারা জানেন। সেই উদ্দেশ্য আপনারা ব্যর্থ করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন এবং আপনাদের নূতন আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্যই আপনারা এখানে সমবেত হইয়াছেন। পরদেশী আদর্শ ও স্বার্থকে আপনাদের দেশের শক্তি পরাজিত করিয়াছে। কিন্তু আপনাদের মধ্যেই কি সকল দ্বন্দ্বের অবসান হইয়াছে? পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর আদর্শ নাগরিক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক মণ্ডলীর নিকট অস্পৃশ্য, হিন্দু মহাসভা কর্ত্তৃক পরিত্যাজ্য। সেইরূপ ভারতীয় সাম্যবাদী ও ভারতীয় কম্যুনিষ্ট ভিন্ন আদর্শ ও পদ্ধতির অনুসরণ করিতেছে। তর্ক বাঁচাইবার জন্য এই কথাও মানিতে প্রস্তুত আছি যে, সকলেরই আদর্শ এক, মত এক; পথ মাত্র ভিন্ন। এই ভিন্ন ভিন্ন পথের দ্বন্দ্ব কিছুতেই মিটিতেছে না। এই অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে ইংরেজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও আমাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব—এই দুই দ্বন্দ্বের প্রকৃতি প্রায় এক এবং কোন কোন দিক হইতে বিচার করিয়া বলা যায় যে সমগ্র বিশ্বে আজ যে আদর্শ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব চলিতেছে তার গোড়ায় হইল আদর্শ মানব ও নাগরিক সৃষ্টি সম্বন্ধে মতভেদ ও পথভেদ।

এই দুই দ্বন্দ্ব মিটাইবার জন্যই আপনারা এই স্থানে সমবেত হইয়াছেন। আমি আগন্তুক রূপে আসিয়া বিশেষজ্ঞদের নিকট সাধারণ মানুষের ভাবনা-চিন্তার নানা কথা নিবেদন করিলাম। একটা কথা ভুলিয়া যাইবেন না—আপনারা সকলেই স্বাধীন ভারতের জীবনে যুগোপযোগী আদর্শ ও উপায় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু যে কোটি কোটি নরনারীকে পুনর্গঠিত করিবার দায়িত্ব আপনারা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন তাদের নানা সংস্কার আছে, তাদের কল্পনায় নানা আদর্শ ও উপায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

গত ১২৫ বৎসরের শিক্ষার ফলে আপনাদের অনেকের মন এরূপ সংস্কার হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। এই সংস্কৃত মন ও বুদ্ধির আলোকে সমস্যার বিচার করিতে গিয়া কোটি কোটি নরনারীর—আপনাদের স্বদেশীয়দের—সংস্কারের প্রতি যোগ্য সম্মান দেখাইতে না পারিলে দুর্ভাগ্যের সীমা-পরিসীমা থাকিবে না। সেইজন্য মনে করি যে দেশের অধিকাংশের সংস্কারাবলী সংস্কৃত ও পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। হিটলার-লেনিন-ষ্টালিন দেখাইয়াছেন কত অল্প সময়ের মধ্যে কোটি কোটি নরনারীর চিন্তা, ভাব ও আদর্শ বদলাইয়া দেওয়া যায়। সেই উপায় আপনারা অবলম্বন করিতে পারেন। তাহা উপযুক্ত মনে না করিলে, ভারতবর্ষের মানব-প্রকৃতিকে বদলাইতে ভারতীয় জনগণের সম্মতি ও স্বীকৃতি চাই। সেই সম্মতি ও স্বীকৃতি কি করিয়া লাভ করা যায় তাহাই হইল ভারতবর্ষের সমস্যা সর্ব্বক্ষেত্রে।

মানব-মনের নিশ্চেষ্টতা, গতানুগতিক পথে চলিবার প্রবৃত্তি প্রবল। সেই নিশ্চেষ্টতার উপর আঘাত করা যায় নাৎসি ও কম্যুনিষ্ট কুঠার লইয়া। নাৎসি চেষ্টার ফলাফল আমরা দেখিয়াছি। কম্যুনিষ্ট চেষ্টার বয়স মাত্র ৩৩ বৎসর। অন্ততঃ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের ঠিকুজিতে তাহাই দেখিতে পাই। এই চেষ্টার ফলাফল—চূড়ান্ত ফলাফল—বিচার করিবার সময় হয় নাই। একটা নূতন অভ্যাস আয়ত্ত করিতে কত বৎসর লাগে ও তাহাকে স্বভাবে পরিণত করিতে কত কাল আবশ্যক, তাহা জানিলে আমাদের সংস্কার-চেষ্টা সহজ হইবে। সকল সংস্কার-চেষ্টার উদ্দেশ্য নূতন অভ্যাসের সূচনা করা, সেই অভ্যাসকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বভাবে গ্রথিত করা। বর্ত্তমান যুগে এই চেষ্টা রামমোহন রায়ের সময় হইতে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী পর্য্যন্ত সকল লোক-সংগঠকবৃন্দ করিয়াছেন। ধর্ম্মের সংস্কার, সমাজের সংস্কার, শিক্ষার সংস্কার—সকল সংস্কার-চেষ্টার মধ্যে দেখিতে পাই নূতন অভ্যাসের প্রবর্ত্তন। মানবের সর্ব্বাঙ্গীণ জীবনের উন্নতির মূলে নিহিত থাকে নূতনের আগমন অথবা পুরাতনের বিবর্ত্তন; পুরাতন আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে নূতনের সন্ধান ও প্রতিষ্ঠা। আপনারাও সেই চির-পুরাতন, চির-নূতনের সন্ধানে বহির্গত হইয়াছেন। আপনাদের যাত্রা-পথ নির্ব্বিঘ্ন হউক। আপনাদের সন্ধান সার্থক হউক।*

---

* রামমোহন লাইব্রেরীর "পাঠচক্রে" পঠিত

মধ্যবিত্ত

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

পরিমল সংসার-সমুদ্রের একজন যাত্রী। কালের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। কঠিন দারিদ্র্যের চাপে ভরা যৌবনে শক্তির উন্মেষ হইতে পারে নাই। নীচের তলায় পায়রার খোপের মত যে ঘরটিতে সে বাস করে উহা একটি তিনতলা বাড়ীর নিম্নাংশ। বাসন-কোসন, বাক্স-পেঁটরা, ভাঁড়ারের সামগ্রী, জামা-জুতা, সায়া-সেমিজ, বিছানা-পত্র, চুলের-দড়ি, কচি ছেলের কাঁথা প্রভৃতি রকমারি দ্রব্যে ঠাসা যেন ছোট-খাটো একটি গুদামঘর। চলিতে গেলে পায়ে জড়াইয়া যায়, কোনটি বা 'ঠুন্' করিয়া বাজিয়া উঠে। বিছানা বিছাইলে দাঁড়াইবার ঠাঁই হয় না। দাঁড়াইতে গেলে বিছানা গুটাইয়া রাখিতে হয়। বাহিরের আলো বাতাস ভিতর পর্য্যন্ত পৌঁছায় না। গজ-পরিমিত সঙ্কীর্ণ একটি গলি-পথে এই বাড়ীটা। গাড়ী-ঘোড়ার ঘড়ঘড়ানি—হাঁক্-ডাক্ এ সকল বড় কানে আসে না। পশ্চিমের চাঁদ নীলার বিছানার উপর আসিয়া লুটাইয়া পড়ে না। কোনও পক্ষী-শাবক জানালার কবাটে বসিয়া ঠোঁট দুলাইয়া নীলার মর্ম্মকথা শুনে না। ধূপ-ধুনার গন্ধে গৃহখানা সুমিষ্ট হইয়া উঠে না।

ঘর বলিতে ঐ একখানা। উহার সম্মুখের বারাণ্ডায় ছিটে বেড়ায় ঘেরা এক টুক্‌রা অপরিসর জায়গায় নীলার হাল-চটা চুল্লীটা পড়িয়া থাকে। নীলা সেখানে বসিয়া তাহার উপর হাঁড়ি চাপায়। বাটনা বাটিতে বসিলে পিছনটা দেওয়ালে আঘাত খায়। চলিতে ফিরিতে গেলে সাত বার ঘটির জল উল্‌টাইয়া পড়ে। দেওয়ালের কালি-ঝুলি কাপড়ে মাখিয়া যায়। জলে জঞ্জালে পায়ের নীচুটা সপ সপ করে। ইহাকে পাক্‌শালা বা পক্বশালা যাহা বলিতে হয় বলুন, এইখানেই নীলার অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তির প্রকাশ। পরিমল দোর-গোড়ায় খাইতে বসে, নীলার উঠিয়া দাঁড়াইতে হয় না। উনুনের মুখে বসিয়া বসিয়াই হাতা কাটিয়া স্বামীর পাতে ঝোল্-ঝাল্ ঢালিয়া দেয়।

ঘর আর উপঘর এই দুই লইয়া নীলার সংসার—স্বপ্নরাজ্য। এই রাজ্যে বসিয়া কল্পনায় সে আকাশের চাঁদ দেখে—মহুয়ার গন্ধ পায়—বন-ময়ূরের কেকাধ্বনি শুনে—সে আর এক ভুবন দেখে। ইহাই নীলার কাব্যময় বাসভবন।

তিনতলা বাড়ীটার খোপে খোপে এক একটি গৃহস্থ বাস করে। নীচের তলায় জল-পায়খানা একটি—জলের কলও একটি। এই দুই জায়গায় সর্ব্বদাই লোকের ভিড় আর চার্ব্বখঁচুনী। তিনটি তলা ডিঙাইয়া ছাদের অধিকার পাওয়া মদ মানুষের কথা। উপরের ভাড়াটেদের কাছে নীচের তলার ওরা কৃপার পাত্র।

নীলার বিছানাপত্র রৌদ্রের মুখ দেখে না, ভিজা কাপড় ঘরের মধ্যে বাতাসে শুকায়। টানা দড়ির উপর দু-একখানা কাপড় আধ-মেলা করিয়া দিলে পরিমলের চোখে নীলার নীল চোখ ঢাকা পড়িয়া যায়।

বিছানার উপর বসিয়া পরিমল ঢুলিতেছিল। গরমে ছারপোকার কামড়ে আর নেংটি ইঁদুরের দৌরাত্ম্যে রাত্রে ঘুম হয় নাই। ভাঙা একখানা তালপাতার পাখা টানিতে টানিতে হাত ব্যথা হইয়া গিয়াছে। ঘুমের আবেশে ঢলিয়া পড়িবার মত হইতে নীলা বলিল—"বাজার নেই।"

সকল দিন সে বাজার-হাট করে না, উনুনে হাঁড়ি চড়িলেই যথেষ্ট মনে করে। কিন্তু ছপ্পর ফুঁড়িয়া টাকা পড়িয়া ঘরের মেঝের উপর 'খৈ-খরাণি' হোক্ এরূপ রঙীন কল্পনাও মাঝে মাঝে তার মনে ওঠে। নীলার কথায় সচেতন হইয়া বাজারের থলিটা খুঁজিয়া পাড়িয়া সে হাতে তুলিয়া লইল।

অন্নবস্ত্রের অভাবে ভরা যৌবনে পৌরুষ হারাইয়া কিরূপ ভয়াবহ রূপ তাহার হইয়াছে দেখিলে বিশ্বজগৎ হতচকিত হইয়া পড়িবে। বলিষ্ঠ মনের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। কাহাকে দুটি স্পষ্ট কথা শুনাইয়া দেয়, গলায় সে জোর পর্য্যন্ত নাই। মাথায় এক ঝাঁকা চুল—রুক্ষ, দেহ ভারাক্রান্ত। পেটের চামড়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। চক্ষু দুটি নিস্তেজ, গায়ে খড়ি উড়িতেছে। আপিসে যাইবার একখানি কাপড় সযত্নে সে পাট করিয়া রাখে, পরনের খানা জীর্ণ, মলিন, শতছিন্ন, অপরিসর, হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত কোঁচা। কে তাহার এ দশা করিল? কেন তাহার এমন অবস্থান্তর ঘটিল? আত্মবিকাশের কালে কেন তাহার তিলে তিলে এমন আত্ম-হত্যা ঘটিতেছে? পরিপূর্ণ জীবনানন্দ উপভোগ করিবার জন্য কেন সে নিজেকে কাজে লাগাইতে পারিতেছে না? কেন সে দিন দিন এমন নৈরাশ্যে ভাঙিয়া পড়িতেছে? আজ কে বা এ প্রশ্ন করে, আর কে বা তাহার জবাব দেয়? সকলেই কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে, পথ কেহ দেখায় না।

মাসের শেষ—ভাঁড়ের তলায় তেলের তলানি পড়িয়াছে। নীলা গামছায় দেহ ঢাকিয়া রাঁধিতে বসে, পরিমল চাহিয়া চাহিয়া দেখে। এ অসম্বৃত চেহারা দেখিতে দেখিতে পরিমলের চোখের দীপ্তি ম্লান হইয়া যায়। এ মাসে খরচ-পত্র খুব আঁট-সাঁট করিয়া সে চলিতেছিল নীলাকে একখানি কাপড় আনিয়া দিবে বলিয়া, কিন্তু ঐ অজ শিশুটি টাইফয়েড বাধাইয়া সমস্তই মাটি করিয়া দিল। নীলার সাধ-আহ্লাদ কথঞ্চিৎ মিটাইবার

জত যখন সে উঠিয়া দাঁড়াইতে যায় তখনই ঘরের এই অপোগণ্ড ক'টি একটা না একটা গোলযোগ বাধাইয়া বসে। এইরূপে মাতৃঋণ ইহারা পরিশোধ করিতেছে। আবার একটি কচি শিশু নীলার বক্ষ আলোকিত করায় দুধের একটা বাড়তি খরচও আসিয়া গিয়াছে।

পরিমল বাজারে চলিয়াছে। পায়ে ছেঁড়া চটি, গায়ে শতছিদ্র গেঞ্জি।

বাজারের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িতে চোখে পড়িল গহর মিঞা শাকপাতাড়ি বিক্রয় করিতেছে। তাহার পার্শ্বে তের-চৌদ্দ বৎসরের একটি ছেলে দেশী কুলের ভাগা দিয়াছে। গহর বলিতেছে—ওরে মমতাজ! দাঁড়ে তুলে বিক্রী কর, ভাগা দিয়ে আর কডা পয়সা কামাবি?

মমতাজ বলিল, কুল ত দাঁড়ে বিক্রী হয় না, লোকে নেবে ক্যানে?

গহর বলিল, বোকাডা! পেট ভরাতে গেলি নিতি হ'বে, যাবেন কোথায়? আমিই এই বাজারে পুঁইয়ের ডগা সব্ব-পেথম দাঁড়ে তুলি। সেকন্দর বললে—কর্‌ছ কি মিঞা, শাক-পাতাড়ি দাঁড়ের ওজনে নেবে কেডা? ভাখ ছোঁড়া, এখন তাই বহডা হ'য়ে গেছে। ফিকিরফন্দী কি আর সকলের মাথায় গজায় রে ব্যাটা? একজনের মাথা খুলে বের হয় আর সংক্রামিক ব্যাধির মত সারা দেশে তার ছোঁয়াচ লাগে।

পরিমল সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, এখন কেবল দাঁড়েই চিনেছ মিঞা? শাকপাতারি কচুকুমড়ো আমড়া-আমসি কিছুই আর বাদ রাখলে না। আবার কুলের কৌলীন্য বৃদ্ধি করছ। দুধ দই মরা পেটে সয় না, শেষটা কুলের ঝোলে মুখ ডুবুই, এবার দেখি কুলহারাও করছ; তার চেয়ে আমাদের শূলে চড়িয়ে দাও।

গহর মিঞা আসলে লোকটি মন্দ ছিল না। রসে মজে ভগবানই ভূত সাজিয়া বসিয়াছেন; ইহাদের আর কথা কি! গহর কহিল, আমাদের শুধু গালিগালাচ করবেন, বাঁধা কপির চির খেয়েছেন? বটির চির? পাঁচ সের ওজনের একটা টাইট বাঁধা কপি মুলতের দিনে চার গণ্ডা পয়সায় বিকিয়েছে, আর এখন বটির চিরে তা'র দাম আড়াই টাকা। এই সকল দেখে শুনেই ত শিখি বাবু।

পরিমল বলিল, তাই শেখো। কালোবাজার আর চোরা-বাজার এই দুই বাজারের লোকেরাই শিখে পড়ে মনিষ্যি হয়ে গেল। এরাই গদার ইলিশ খায়, বিড়ি সিগারেট টানে, টেড়ী বাগায়, হাতে ঘড়ী বাঁধে, সিনেমাও দেখে। কলম টানার মধ্যে লেখাশিখির কিছুই নেই, বাপু!"

বেলা বাড়িয়া উঠিতেছিল। আপিস আছে। গহর বলিল, বাবু, পুঁইডাঁটা নেন। চার আনা দাম বিকোচ্ছে, আপনি দু আনা দেন।

পরিমল হাসিয়া কহিল, তুমি ত দয়া দেখালে। ওর সঙ্গে কাঁকড়া কি কুচো চিংড়ি না হলে মজবে না। কাঁকড়া এখন আর ফকীরের ছিন্ন ঝুলিতে এসে ওঠেন না। কুচো চিংড়ির সের দ' সিকে। একটা তরকারিতে কত আর খরচ করব? তার চেয়ে কচুর ডাঁটা দাও। পদ্মকচু নয়, তিনি আবার কচু-চূড়ামণি—জলো কচুর ডাঁটা। এক-ঘেঁটে চিজ—স্বয়ংসম্পূর্ণ। ওর সঙ্গে আর পাঁচফোড়ন দরকার হবে না। আপিসের বড়বাবুরা আবার 'কচু খাও' বলে নিত্য গালি পাড়েন, তাঁদের কথার সঙ্গেও মিল থাকবে।

গহরের নিকট হইতে কচুর ডাঁটা এবং আরও দুই একটি অত্যাবশ্যক দ্রব্য কিনিয়া লইয়া ভিড় ঠেলিয়া ফটকের কাছে আসিয়া সে দেখিল, ফুটা থলি দিয়া কচি আমড়াগুলি গলিয়া পড়িতেছে। এক টুকরা কাগজ কুড়াইয়া লইয়া ছিদ্রের মুখে ঠাসিয়া দিয়া সে ফটক অতিক্রম করিল। নীলার গায়ে আজ আবার সে গামছার আবরণ দেখিয়া আসিয়াছে, উহা সে ভুলিতে পারিতেছিল না। রাস্তা পার হইবার সময় একখানা জিপ্ গাড়ীর তলায় চাপা পড়িবার উপক্রম হইল। একটি ভদ্রলোক তাহাকে টানিয়া লইয়া কাড়া কাটাইয়া দিলেন।

বাড়ীর নিকট আসিয়া দেখে মহা বিভ্রাট। বাড়ীওয়ালা সরু গলিটার মধ্যে দাঁড়াইয়া বিষম হম্বিতম্বি জুড়িয়া দিয়াছে। তাহাকে উঠাইয়া দিবার জন্য আজ দু'মাস নির্লজ্জের মত তিনি তাহার পিছনে লাগিয়া রহিয়াছেন। বাড়ীভাড়া বৃদ্ধি করিবার যে অনুদার নীতি সর্ব্বত্র চলিতেছে তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তিনিও বেশ ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছিলেন। যাহাদের তিনি তাড়াইতে পারেন নাই পরিমল তাহাদের একজন।

পরিমল আসিয়া ঘরে ঢুকিতে নীলা কহিল, এত দেরি করলে, কখন কি রাঁধব? কি দিয়ে বা পাতে ভাত দেব?

পরিমল জিজ্ঞাসা করিল, কি রেঁধেছ?

কি আর রাঁধব। কি ছিল যে তাই রাঁধব? তোমার দেরি দেখে ডালায় একটা শুটকো বেগুন ছিল, তাই সেঁকে রেখেছি।

পরিমল কহিল, আবার কি? ওই বেশ হবে।

নীলা কহিল, বাড়ীওয়ালার সঙ্গে দেখা হ'ল?

গলিতে দাঁড়িয়েই ত গর্জ্জাচ্ছে। বললাম, হাতের বোঝাটা নামিয়ে আসি।

নীলা বলিল, যার মাটি নেই, তার কিছুই নেই। বেদের টোল ফেলে সারাজীবন ঘুরে' মরতে হ'বে। খুঁজে পেতে একটা গাছতলা দেখ; সেইখানে গিয়ে বসি। কি গালি-গালাজ! রোজ রোজ এ আর সহ্য হয় না।

আওয়াজ কানে আসিল, পরিমলবাবু।

পরিমল কহিল, ওই।

সে বাহির হইয়া আসিল। আসিয়াই বলিল, আশ্রয় একটা না পেলে বাড়ী ছাড়তে পারছি নে। উপায় নেই। বাড়ীর চেষ্টায় আদা-জল খেয়ে লেগে গেছি, যে লোকের ভিড় আর আপনাদের যে রকম অরাজকতা বাড়ী মিললেও টাকায় মিলছে না। যদি ধৈর্য্য না থাকে আদালত করুন গিয়ে। আমার আপিসের সময় হয়েছে, কথা বলবার অবসর নেই।

বাড়ীওয়ালা কহিল, এই কথা ?

হাঁ, এই কথা। আর একটা কথা, যেমন আছি, তেমনি থাকি। এখন বুঝে দেখুন।

যে পরিমল সাত চড়ে কথা কয় না তাহারও মুখে আজ এই কথা।

বাড়ীওয়ালা বলিল, মাসের ভাড়া যোটাতে পারে না যে সে দেখায় আদালতের ভয়। আচ্ছা··· বলিয়া গজ গজ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

পরিমল বিষণ্ণ মুখে ঘরে আসিতে নীলা বলিল, এত তাড়াতাড়ি মিটল যে ?

পরিমল বলিল, মেটে নি। আদালত করতে বলে দিলাম।

আশঙ্কা ও উদ্বেগে নীলা অস্থির হইয়া উঠিল। বলিল, সে কি ? তুমি তাঁকে রাগিয়ে দিলে ? আপিসের পরে গিয়ে ওঁর রাগ থামিয়ে এস। আদালত করার পয়সা আমাদের জুটবে না। চারদিক দিয়ে আমাকে আর পাগল করে তুলো না।

পরিমল হাসিল। বলিল, ভাত বাড়ো। কলের জল সরে গেল বুঝি ! চৌবাচ্চায় ত জল নেই, লেট হয়ে গেল, আজ আবার অদৃষ্টে বকুনি আছে।

খাইতে বসিয়া সে কহিল, ছেলেটার ওষুধ আনা হ'ল না, ডাক্তারের খাতায় অঙ্ক মোটা হয়ে গেছে। আমাকে দেখে কাল মুখ খুলে গেল। দিলীপের কাছে যদি কিছু পাই, বিকেলে এসে ওষুধ আর তোমার জন্ত একখানা কাপড় আনতে হবে।

নীলা বলিল, কাপড়ের এখন আমার দরকার নেই। ভদ্র-সমাজে বের হও, তুমি আগে তোল বদলাও। ছেঁড়া কাপড়-জুতো পরে পথে বের হও, আমার ভাল লাগে না।

এমন সময় আপিসের সাজে দিলীপ আসিয়া ঘরে ঢুকিল। নিকটের একটি বাড়ীতে থাকে সে। উভয়ে একই অঞ্চলের দুইটি বিভিন্ন আপিসে চাকরি করে। একসঙ্গে যাতায়াতও করে। পরিমলের ভাতের থালার দিকে লক্ষ্য করিয়া সে কহিল, বৌঠাকরুণ, বেগুনপোড়া দিয়ে ভাত দিলেন, আর কিছু রাঁধেন নি ?

পরিমল কহিল, কি আর রাঁধবে। গরীবের ভাগ্যে পচা পুঁটি আর মরা শাক। মাছ মাংসের খবর ত জানিস। খাই ভাতা ময়ূরের কাথ। 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে কড়ায় জল ঢেলে গিন্নীরা কাঁপিয়ে বাড়িয়ে তোলেন। পাতে পড়লে বাস ডাকে, দে সাঁতার—দে সাঁতার। আজ আর তাও জোটে নি। বাচ্চা তেঁতুলের ঝোলটা রোজই খাই। সারা ভাদ্রমাস খেলে নাকি ম্যালেরিয়ায় ধরে না। আজ দেখি ভাগা দিয়েছে চারখানা দু'পয়সা। মেছুনিদের তাড়া খেতে মাছের ধারে বড় একটা ঘেঁসিনে। বড় মেয়েটা আবার মাছের ভক্ত। বলে, আঁশটের গন্ধ আন নি, বাবা : বলি, সে যে দুর্গন্ধ, মা। বলে, তা হোক, ঐ গন্ধে গো-গ্রাসে ভাত তোলা যায়। দু'একদিন যা আনি, তেলের কড়ায় চড়লে তখন আর মাছ থাকেন না, হন খণ্ড। কি আর খাই বল। একে ত কাঁকরের চালে প্রাণান্ত, তাই সাহস করে পচার পটিতে যাই নে, ওষুধপত্রই জুটবে না। ওল কচুতে গলা না ধরুক, দর শুনলে চোখে আঁধার ধরে। পটল পেকে যখন মিটোল হয় তখন যা দু' একটা খাই। উচ্ছে এখন রাজতক্তে। মুলো কুমড়োর ধারে গেলে পোকামাকড় ভেবে কুলো বাজিয়ে তাড়া করে। হাতখানেক করে দুখানা লাউ কি কুমড়োর ডাঁটা ছোটার বাঁধতে পারলেই চারটে পয়সা ; তা পোকাই হোক আর পাকাই হোক। ঘরে একটা 'চাঁ্যা' 'চোঁ' জন্মেছে, তাই পেছনের দরজা দিয়ে এক বেটা গোয়ালা খানিকটা জল ঢেলে দিয়ে যায়, ফিরে দেখি নে ভয়ে, পাছে ভাগ বসাতে লোভ জন্মে। লোকের মুখে ত আর আইনকানুন নেই। সেও এক মুঠো টাকা পাবে। আজ দু'দিন এল না, বোধ করি দুধ বন্ধ করলে।

খাইয়া উঠিলে নীলা টিফিনের কৌটাটি আনিয়া দিল। পরিমল তাহা রুমালে বাঁধিয়া লইল।

রাস্তার পুলিসের নির্দেশ পালন করিতে গিয়া বাসখানা বিলম্ব করিয়া ফেলিল। আপিসে হাজিরা-বই সহি করিতে গেলে বড়বাবু ঘড়ির দিকে তাকাইলেন এবং তাহাকেও চাহিয়া দেখিতে ইঙ্গিত করিলেন। পরিমল দেখিল, দু' এক মিনিট নয়, আধ ঘণ্টা লেট হইয়া গিয়াছে। মুখ কাঁচুমাচু করিয়া সে কহিল, "কি করব, স্যার, বাড়ীওয়ালা আজ আবার এসে মারমুখো হয়ে, পড়ল।"

এটি সওদাগরি আপিস নয়, সরকারী আপিস যেখানে রাজশক্তির ক্রীড়া চলে। বড়বাবু মিষ্টভাষী দরদী মানুষ। জনসাধারণের মঙ্গলের জন্ত ইঁহার প্রাণের আবেগ এত বেশী যে, নিজের কর্ম্মের সীমানার গণ্ডীর মধ্যে ইনি আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারেন না। শুধু কাজকর্ম্ম লইয়াই সম্পর্ক নয়, আপিসের বড় ছোট সকলেরই হাঁড়ি-হেঁসেলের খবর লইয়া সকলকে বুঝিয়া দেখিতে তিনি চেষ্টা করিতেন। সকল বিষয়েই

মুখখানা সর্ব্বদা প্রসন্নতায় ভরিয়া আছে। একবার নয়, বিশ বার উপদেশ দিয়া অধীনস্থ কর্মচারীকে তিনি সংশোধন করিয়া তুলেন। কেহ হুজুর মত হাত জোড় করিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়ায় ইহা তিনি আদৌ চাহেন না। মানুষ মানুষের কাছে এরূপ করিবে ইহা তাঁহাকে আঘাত করে। ইনি চাহেন সকলে খোলা মনে মনের কথা ব্যক্ত করুক। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন তিনি নাকি আপিসের 'ওম' নষ্ট করিতেছেন এবং অবান্তর কথা লইয়া আপিসের সময় নষ্ট করিয়া চলিতেছেন। উহা দুষ্ট লোকের কথা। বিজ্ঞ লোকেরা বলেন, পুরাতন বড়কর্ত্তারা যত বেশী উগ্র মূর্ত্তি দেখাইয়াছেন কাজ তত পান নাই। চেয়ারে বসিয়া খাতাপত্র নাড়া-চাড়া করিয়াও কাজে ফাঁকি দেওয়া যায়। কিন্তু ইঁহার আচরণ এমনই সহৃদয়তাপূর্ণ যে, কেহই ইঁহাকে ফাঁকি দেয় না, অথচ ইঁহার অমায়িক ব্যবহার পাইয়া কৃতার্থ হইয়া যায়।

পরিমলকে তিনি যেন একটু অতিরিক্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। একবার তাঁহার একটি মেয়ের বিবাহে পরিমলকে কাজকর্ম্মের সাহায্যে আহ্বান করিয়া এরূপ ঘটিয়াছিল যে, ক্রমশঃ ক্যাসবাক্সটি পর্য্যন্ত তাহার হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। একটি পয়সাও এদিক-ওদিক হয় নাই।

বাড়ীওয়ালার সহিত পরিমলের মনকষাকষি চলিতেছে একথা তিনি আগেও দু' একবার তাহার মুখে শুনিয়াছিলেন। তিনি পরিমলকে কাছে পাইয়া বলিলেন, "লোকের ঝাঁটা লাথি না খেয়ে একটু জমিজায়গা কর্, পরিমল।"

পরিমল কহিল, "কি করে করব, আপনারাই ত করতে দেবেন না কিছু।"

"কেন?"

পরিমল বলিল, "গান্ধীজী বলতেন, অন্নবস্ত্র আর আশ্রয় এই তিন হলেই স্বরাজ হ'ল। তবেই হ'ল রাম-রাজত্ব। দেশ স্বাধীন হবার পর তাই মনে আশা জেগেছিল। কিন্তু ওই রাজ-তক্তখানাই হ'ল সর্ব্বনেশে। যে এটির উপর চড়ে বসবে তারই হবে মিলিটারী মেজাজ। আইনের বেড়াজালে পড়ে ভাড়াটেরা 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' রব ছাড়ছে। বাড়ী যে করব—পঁচিশ টাকার এক কাঠা জমির দাম পঁচিশ হাজার টাকা। এমন কেউ চেকার নেই যে এদের লোভ সংযত করে।"

বড়বাবু বলিলেন, "কলকাতার আশেপাশেও অনেক জমি-জায়গা আছে। দর সস্তা, সেখানে গিয়ে বাড়ী-ঘর কর্, থাক্ না'।"

পরিমল বলিল, "আর অবাঙালীরা এখানে বাড়ীর উপর বাড়ী তুলুক—ভাড়া খাটিয়ে ভুঁড়ি মোটা করুক। যার এক-খানা বাড়ীতে প্রয়োজন মেটে তাকে দশখানা বাড়ীর জায়গা দিলে গান্ধীজীর রামরাজ্য কোন দিনই গড়ে উঠবে না। খড়দ, কেলেদ, ডুমুরদ. অভাগাদের স্থান কোন দহেই হবে না। সেখানে চার শ পাঁচ শ টাকা কাঠা। ক'টা লোক দিতে পারে সে টাকা?"

বড়বাবু বলিলেন, "কলমপেষা ছাড়, বাপু! ব্যবসা-বাণিজ্য কর, লক্ষ্মীকে ঘরে এনে তোল। যত টাকাই কাঠা হোক তোরাও সে টাকা দিতে পারবি।"

মুখ শুষ্ক করিয়া পরিমল কহিল, "চ্যাটাই পেতে শুই সকালে উঠে গায়ের ধুলো ঝাড়তে কয়েক মুহূর্ত্ত কেটে যায়। গুরুতর একটা ব্যাধিতে পড়লে যমে মানুষে টানাটানি—মাঝ-খানে আর ঔষধপত্র নেই। ঘরের ওরা যখন শুনিয়ে দেয় মেয়ে উঠেছে কলাগাছ হয়ে তখন চোখে দেখি সর্ষের ফুল। ছেলেগুলোর মাইনে জোটাতে পারা যায় না, কোনটা টানে বিড়ি—কোনটা উড়োয় ঘুড়ি। ব্যবসা-বাণিজ্য করব তার মূলধন কোথায়? পান-সিগারেটের দোকানের মত যদি পুঁজি-পাটা যোগাড় হ'ল ঘরওয়ালা সেলামীর টাকা হেঁকে পলকে প্রলয় ঘটিয়ে দেয়। অথচ কলম-পেষা জাতি বলে কেউ আমাদের গালি পাড়তে ছাড়বেন না। একখানা হাত-পাখা ভেঙে গেছে, গরমে নেয়ে ঘেমে উঠি। আর একখানা আজও কিনতে পারি নি। ওরা এখন চুলী ধরাতে নেড়ে-চেড়ে তাকে মর্য্যাদা দেয়। একটা মেটাতে আর একটা এসে মাথা-চাড়া দিয়ে ওঠে।" একটু পরে সে আবার বলিল, "এবার আমরা একটা যুক্তি ঠাউরেছি।"

বড়বাবু বলিলেন, "কি যুক্তি?"

পরিমল কহিল, "আমরা কেরাণীরা মিলে একটা পৃথক বাসভূমির দাবি করব। যদি এই কৌশলে মাথা গুঁজবার ঠাঁই হয়।

বড়বাবু করুণ নেত্রে তাহার মুখের দিকে তাকাইলেন। এই খায়—এই পরে—আর এই অবস্থায় থাকে, ইহারাই মধ্য-বিত্ত। বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিভা জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ছন্দ, শক্তি সামর্থ্য বল বিক্রম তেজ সবই ত ইহাদের ছিল। জীবনের সজীব প্রবাহধারা সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া লয় পাইয়া যাইতেছে। শান্তি নাই—স্বস্তি নাই—শৃঙ্খলা নাই—ইহারাই মধ্যবিত্ত। সজোরে একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া তিনি বলিলেন, "কিন্তু ঘোষের স্থান—চাটুয্যের স্থান—কেরাণীর স্থান—এত 'স্থান' গঠনের স্থান হবে না, পরিমল। একটি 'স্থান' দিতে গিয়েই রক্তের ধারা নেমে দেশ ভেসে গেছে।"

পরিমল কহিল, "তবে আর মাথা রাখবার ঠাঁই হ'ল না। আপনারা হ্রস্ব দুগ্ধ সৌধ-বাংলো জরি-বেনারসীর মধ্যে থাকুন, আমরা পরের লাথির তলায়, তোলা উনুনে সজনের পাতা, নটে শাক সেদ্ধ করে খাই আর কাটখোট্টা হয়ে উঠি।"

চারিদিকের হুড়োহুড়ির শব্দে বড়বাবু ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, টিফিনের ঘণ্টা বাজিয়াছে।

বাহিরের যে সিঁড়ির কোণটিতে বসিয়া পরিমল টিফিন খায় তথায় আসিয়া কৌটাটি খুলিতে দুখানা আধ-পোড়া রুটি বাহির হইয়া পড়িল। আজ দু'দিন কোলের ছেলেটির মুখ জুটিতেছে না, উহাই হয়ত নীলার মনের মধ্যে জাঁকিয়া বসিয়া ছিল তাই সে রুটি দুখানা ধরাইয়া ফেলিয়াছে।

স্বর্গ ও নরক

শ্রীললিতমোহন রায়

অধিকাংশ হিন্দুরই বিশ্বাস যে, পুণ্যাত্মারা মরিয়া স্বর্গে ও পাপীরা নরকে যায়। পাশ্চাত্যের লোকেরাও অনুরূপ বিশ্বাস পোষণ করেন কিনা তাহা বলিতে পারি না। তবে তাঁহাদিগের সাহিত্যে—"Heaven—kingdom of God" এবং Hell—kingdom of Devil" এই কথাগুলির প্রয়োগ বিরল নহে। ইসলামিক সাহিত্যে "জন্নত" (স্বর্গ Heaven বা Paradise—পরদেশ?) এবং "দোজখ্" (নরক) শব্দ দুইটি পাওয়া যায়। চীনাদের মধ্যেও এই বিশ্বাস প্রচলিত যে, স্বর্গে তাঁহাদের দেবতারা বাস করেন। মনীষী উইলিয়াম এফ্. ওয়ারেন তাঁহার 'প্যারাডাইস ফাউণ্ড' (*Paradise Found*) নামক গ্রন্থে স্বর্গ সম্বন্ধে চীনাদের বিশ্বাসের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

জাপানী ভাষাতেও "স্বর্গ" এই শব্দটির সমার্থক শব্দ রহিয়াছে। জাপানীরা স্বর্গকে "তেনজিকু" ও স্বর্গবাসিগণকে "তেনজিকুজিন্" বলেন। পূর্বে উঁহারা ভারতবর্ষকে "তেনজিকু" এবং ভারতবাসীকে "তেনজিকুজিন্" বলিয়া অভিহিত করিতেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জগতের অধিকাংশ লোকই স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্বে আস্থাবান্। এই বিশ্বাসের মূলে কোন সত্য নিহিত আছে কিনা, উহারই সন্ধানে এক্ষণে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি। আমাদের বেদ, উপনিষদ, মহাভারত, পুরাণ এবং উপনিষদের সারাৎসার গীতা প্রভৃতি গ্রন্থে স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্বের কথা যেমন লিপিবদ্ধ আছে, তেমনি আছে উহার অনস্তিত্বের কথা।

বেদ বলেন :

বাজি অসি বাজিনে মা সুবেণী: সুবিত: স্তোমংসুবিতো দিবং জা:।

সুবিতো ধর্ম-প্রথমানু সত্যা সুবিতা-দেবান্ত্ সুবিতোহনু পন্থ ॥৩।৫৬ সূ

ঋগ্বেদ, ১০ম।

ইহার রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত বঙ্গানুবাদ এই—হে পুত্র, যেরূপ স্তব করিয়াছিলে তদ্রূপ উত্তম স্বর্গে যাও।

কৃষ্ণ যজুর্বেদ বলিতেছেন :—সুবর্গায় লোকায় দর্শ পূর্ণমাসৌ ইজ্যেত।

লোকসকল স্বর্গলোকপ্রাপ্তির জন্ত 'দর্শ' ও 'পূর্ণমাস' নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলিয়াছেন :

"স্বর্গংলোকং যজমানায় আপায়ানি"

অর্থাৎ—আমরা যজমানের স্বর্গপ্রাপ্তির উপায় বিধান করিতে চাহি।

কঠোপনিষদে নচিকেতার মুখে উক্ত হইয়াছে :

"স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি
ন তত্র ত্বং, ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বা অশনায়াপিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥"১২। প্রথম বল্লী,

অর্থাৎ—স্বর্গলোক ভয়হীন, জরাহীন, মৃত্যুহীন, ক্ষুধাতৃষ্ণা-বর্জিত স্থান। শোকদুঃখবর্জ্জিত প্রাণী তথায় আনন্দে থাকে।

মহাভারত বলেন :

"ইমং ব: ক্ষত্রিয় দ্বারং স্বর্গয়াপাবৃতং মহৎ।
পচ্ছধ্বং তেন শক্রস্য ব্রহ্মণ: সহলোকতাম্॥" ৮।৮৭অ ভীষ্মপর্ব্ব।

অর্থাৎ—ক্ষত্রিয়গণ সম্মুখ-সমরে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাইয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদিগের স্বর্গগমনের উদ্ঘাটিত মহৎ দ্বার; তুমি সেই দ্বার দিয়া ইন্দ্রলোক বা ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত একত্রে বসবাস কর।

অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রোৎসাহিত করিবার জন্ত গীতাকার শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন :

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষসে মহীম্"।

৩৭,২অ. গীতা।

অর্থাৎ—হে অর্জ্জুন! কেন চিন্তা করিতেছ, যদি সম্মুখসমরে প্রাণ যায় তাহা হইলে তুমি সেই পুণ্যের বলে দেহান্তে স্বর্গলাভ করিবে। আর যদি জয়লাভ কর, পৃথিবী ভোগ করিবে।

নরক সম্বন্ধে গীতাকার বলিতেছেন :

(১) "সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্ত চ।
পতন্তি পিতরোহেষাং লুপ্ত পিণ্ডোদক ক্রিয়া:॥"

৪১।১ম-অ গীতা।

(২) "উৎসন্নোকুলধর্ম্মানাং মনুষ্যানাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥৪৩।১ ঐ

স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব বিষয়ক এই সকল উদ্ধৃতি হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, জীবকুল মৃত্যুর পর নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে স্বর্গ ও নরকে যায়, এই ভাবধারা বেদাদি গ্রন্থে অনুস্যূত রহিয়াছে। এইবার আমরা স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রতিকূল মতের অবতারণা করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইব যে, শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে স্বর্গ ও নরকে যাওয়ার কথা যেমন লিপিবদ্ধ আছে তেমনি ইহাও উল্লিখিত আছে যে, মানুষ মরিয়া স্বর্গ বা নরকে অথবা অন্য কোন্ স্থানে যায় তাহা অবিজ্ঞেয়। ঋগ্বেদের ঋষিরা বলিয়াছেন, "হে পুত্র! যেরূপ স্তব করিয়াছিলে তদ্রূপ উত্তম স্বর্গে যাও।" তাঁহারাই আবার সংশয়াপন্ন হইয়া বলিয়াছেন :

"যত্তে ভূতঞ্চ ভব্যঞ্চ মনোজগাম দূরকম্।" ১২।৫৮ সূ, ১০ মণ্ডল।

অর্থাৎ—হে সুবন্ধো, যদি তোমার আত্মা (মন) যাহা হইয়াছে, যাহা হইবে, এমন কোন অজ্ঞাত দূরবর্ত্তী স্থানে যাইয়া থাকে তাহা হইলে আমরা......।

এখানে 'যত্তে' শব্দের প্রয়োগ থাকাতেই বুঝা যাইতেছে যে, মানুষের মৃত্যুর পর যে কি অবস্থা হয় তাহা বৈদিক ঋষিরাও সম্ভবতঃ সঠিক অবগত ছিলেন না। মৃত্যুর পর জীবের কি গতি হইয়া থাকে উপনিষদ্-যুগের সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ পর্য্যন্ত তাহা অবগত ছিলেন কিনা সন্দেহ। আমরা এখানে কঠোপনিষদ্ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

"যেয়ংপ্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥"২০-১ম বল্লী

অর্থাৎ—হে যম, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, জীবাত্মা বলিয়া কোন বস্তু বিদ্যমান নাই। কেহ বলেন, জীবাত্মা আছে, মৃত্যুর পর জীবাত্মা বিদ্যমান থাকে। তৃতীয় বরপ্রদানে যদি করুণা হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর পর জীবের কি গতি হয় সেই বিষয়ে জানিতে ইচ্ছা করি। ইহাই আমার তৃতীয় বর প্রার্থনা।

যম বলিলেন :

"দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতংপুরা নহি সুবিজ্ঞেয় মণুরেষ ধর্ম্মঃ।
অন্যংবরংনচিকেতো বৃণীষ মামোপরোৎসী রতি মা
সৃজৈনম্॥" ২১।ঐ

অর্থাৎ—হে নচিকেতঃ! মানুষ মরিলে কি হয় ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতারাও এ বিষয় বহু সন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারাও এ সম্বন্ধে অণুমাত্র তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই; সুতরাং আমি এ সম্বন্ধে আর তোমাকে কি উপদেশ দিব, তুমি আমার নিকট অন্য বর প্রার্থনা কর।

নচিকেতা বলিলেন :

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন
সুবিজ্ঞেয়মাত্থ।
বক্তা চাস্যত্বাদৃগ্ন্যো ন লভ্যো নান্যো বরস্তুল্য এতস্য
কশ্চিৎ॥"২২।১ বল্লী

অর্থাৎ—হে মৃত্যো! দেবতারা বহু চেষ্টা করিয়াও যে বিষয়ে কোন তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, তুমি নিজেও যাহা অবিজ্ঞেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ, আর কোন্ ব্যক্তি আমাকে সে বিষয়ে উপদেশ দান করিবেন? আর আমি এই বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ও প্রষ্টব্য বলিয়া মনে করি না।

মৃত্যুর পর জীবের যে কি গতি হয়, তাহা যে অবিজ্ঞেয়, উক্ত ভাবদ্যোতক গীতার একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ২য় অধ্যায়ের ২৮ শ্লোকে বলিয়াছেন :

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥"

হে ভারত! ভূতসকল আদিতে অব্যক্ত। মধ্যে ব্যক্ত (প্রকাশিত) এবং নিধনেও অব্যক্ত (অপ্রকাশিত)।

এতক্ষণ আমরা বেদ, উপনিষদ্, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থাদির উক্তিগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে, ঐ সকল গ্রন্থে স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্বের অনুকূল এবং প্রতিকূল উভয়বিধ মতই বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু যদি বিবেক, যুক্তি ও বিজ্ঞানের তৌলদণ্ডে ওজন করা যায় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে স্বর্গ ও নরকের অনস্তিত্বের দিকের পাল্লা ভারী হয়। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ যে চতুর্ব্বিধ প্রমাণের কথা আমাদের শাস্ত্রে আছে তন্মধ্যে কোনটিরই সাহায্যে প্রমাণ করা যাইতে পারে না যে, স্বর্গ ও নরক আছে বা ছিল।

এইবার আমরা অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইব যে, স্বর্গ ও নরক ঐহিক—ইহলোকে মানুষের মনেই ইহাদের অস্তিত্ব—পরলোকে নহে।

শুক্রনীতি বলিতেছেন :

ভূমৌ যাবৎ যস্য কীর্ত্তি স্তাবৎ স্বর্গে স তিষ্ঠতি।
অকীর্ত্তিরেব নাস্ত্যোঽস্তি নরকো দিবম্॥৩।৪অ ৩ প্রকরণ।

এই পৃথিবীতে মানুষের যত দিন সুখ্যাতি ও সুযশ থাকে, তিনি তত দিন স্বর্গে বাস করেন। আর অকীর্ত্তির নামই নরক। ইহা ছাড়া পরলোকে কোনও স্বর্গ ও নরক নাই।

মহর্ষি জৈমিনিও তাঁহার পূর্ব্বমীমাংসা গ্রন্থে পরলোকে স্বর্গের অস্তিত্ব বিষয়ে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :

"স স্বর্গঃ স্যাৎ সর্ব্বান্ প্রতি অবিশিষ্টত্বাৎ" ১৫।৩পা।৪অ

বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন :

"মনঃ প্রীতিকরঃ স্বর্গো নরকস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।
নরকঃ স্বর্গ সংজ্ঞে বৈ পাপপুণ্যে দ্বিজোত্তম॥"৪২।৬অ
২অংশ বিষ্ণুপুরাণ।

কোন সৎকার্য্য করিলে মনে যে আত্মপ্রসাদ বা নির্ম্মল প্রীতির উদ্রেক হইয়া থাকে তাহার নামই 'স্বর্গ-সুখ'।

আর অসৎ কার্য্য করিলে মনে যে আত্মগ্লানির উদ্রেক হয় তাহারই নাম 'নরক'।

ইহাই হইল আসল কথা। বিষয়বিমূঢ় প্রকৃতিপুঞ্জকে পাপ হইতে নিবৃত্ত রাখিবার জন্ত পরলোকেও 'স্বর্গ' ও 'নরকের' কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র। তাই মুগ্ধবোধপ্রণেতা বোপদেব বলিয়াছেন :

"ঐহিকো নরক: স্বর্গ ইতি মাত: প্রচক্ষতে।"

হে মাত:! স্বর্গ ও নরক সকল ঐহিক, ইহা ঋষিরা বলিয়া থাকেন।

খ্রীষ্টান পাদ্রীরা যে বলেন— "ঈশ্বরের যে বিশেষ স্থান তাহার নামই স্বর্গ" (Kingdom of God)—ইহার মূলে কোন যুক্তি নাই। কেননা সে স্থানটি নিশ্চয়ই একটি সীমাবদ্ধ স্থান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সেই পরিমিত স্থান, মহান্ ও অপরিমেয় ঈশ্বরের অধিষ্ঠানক্ষেত্র ইহা সম্ভবপর নহে। বিশেষত: যিনি জীবের জীবন, সর্ব্বব্যাপী, তাঁহার আবার একটি পৃথক স্থান থাকা যুক্তির কথা নহে।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিবে, এই যে রক্ষণশীল হিন্দুগণের ধারণা যে, বেদমাতা গায়ত্রী মন্ত্র ও সন্ধ্যাবন্দনাদি মন্ত্রে উল্লিখিত ভূ, ভুব, স্ব, মহ:, জন, সত্য এবং তপ লোক সকল শূন্যে অবস্থিত বস্তু, ইহার মূলে কি কোন সত্য নিহিত নাই? ভূ, ভুব, স্ব প্রভৃতি লোকসকল শূন্যে অবস্থিত অলৌকিক বস্তু নহে, স্বয়ং বেদ ও হিন্দুর অন্তান্ত শাস্ত্র তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরাও এখানে সপ্রমাণ করিব যে 'স্বর্গ' বা 'স্বর্লোক' অথবা "সুবর্গম্" (Heaven) আমাদের এই সসাগরা ধরার অংশবিশেষ—ভৌম ও পাদগম্য। 'নরক' এই স্বর্লোকের অংশমাত্র। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন :

"ভৌমা হেতে স্মৃতা স্বর্গা:"। ৪৮।২অ।২অংশ।

অর্থাৎ—দেবগণের বাসভূমি এই স্বর্গ ভৌম।

বায়ুপুরাণ বলিতেছেন :

তত্র স্বর্গ পরিভ্রষ্টা জায়ন্তে হি নরা সদা।

ভৌমং তদপি হি স্বর্গং তত্রাপি চ গুণোত্তমম্। ৪১।৪৫অ

এই ভৌম ও পাদগম্য স্বর্গে ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র ও বিষ্ণু বহু দক্ষিণা দান করিয়া যজ্ঞ করিতেন। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে আছে :

"তত্র ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ শক্রশ্চাপি সুরেশ্বর:।

সমেত্য বিবেধৈর্যজ্ঞৈ র্যজন্তেঽনেকদক্ষিণৈ:। ১১।৬অ

ভীষ্মপর্ব্ব।

অর্থাৎ—সেই মেরুপর্ব্বতে ব্রহ্মা, শিব ও দেবরাজ ইন্দ্র অনেক দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞ করেন।

যুধিষ্ঠির পঞ্চভ্রাতে হরিদ্বারের স্বর্গদ্বার দিয়া এই ভৌম স্বর্গেই গিয়াছিলেন। অর্জ্জুন সশরীরে স্বর্গে যাইয়া পাঁচ বৎসর তথায় অবস্থান করেন এবং ইন্দ্রের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞেও অর্জ্জুন সসৈন্যে স্বর্গে যাইয়া স্বর্গ হইতে করগ্রহণ করিয়াছিলেন।

হিমালয়-পত্নী মেনকা গৌরীকে বলিয়াছিলেন :

"পিতু: প্রদেশাস্তব দেবভূময়"। কুমারসম্ভব।

হে গৌরি! তোমার পিতার এই দেশসকল দেবভূমি বা স্বর্গ।

সায়ন অথর্ব্ববেদের ভাষ্যে বলিয়াছেন :

"হিমবচ্ছির: প্রদেশ এষ স্বর্গভূমিরিতি প্রসিদ্ধি" ।৪৩১পৃ. ৪র্থ খণ্ড।

হিমালয় পর্ব্বতের শীর্ষদেশই স্বর্গভূমি এইরূপ প্রসিদ্ধি। মহাভারতের আদিপর্ব্বের ১২শ অধ্যায় পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কুন্তী ও মাদ্রীকে সঙ্গে লইয়া পাণ্ডু "ব্রহ্মলোকে" ব্রহ্মার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন।

আমরা বেদের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, ভারতীয় বণিকেরা পণ্যদ্রব্য লইয়া স্বর্গের প্রজাপতি (প্রজানাং অধিপতি) ইন্দ্রের নিকট বিক্রয় করিতে যাইতেন। চরকসংহিতার সূত্রে উল্লিখিত রহিয়াছে যে, একবার তদানীন্তন ভারতের অধিবাসীবৃন্দ নানা রোগে আক্রান্ত হইলে ঋষিরা রোগ হইতে নিষ্কৃতিলাভের কোন উপায় না দেখিয়া স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্রের শরণ লইতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। ভরদ্বাজ ঋষি যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ঋষিরা তাঁহাকেই ইন্দ্রপুরীতে পাঠাইয়া দিলেন। ভরদ্বাজ ঋষি স্বর্গে গিয়া ইন্দ্রকে আশীর্বচনে সংবর্দ্ধিত করিয়া ঋষিদিগের কথা জ্ঞাপন করিলেন এবং কি প্রকারে প্রাণিগণ রোগমুক্ত হইতে পারিবেন তাহা জানাইলে ইন্দ্র ভরদ্বাজকে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপিত করিলেন। কঠোপনিষদে আছে যে গৌতম ঋষির বংশজাত নচিকেতা স্বর্গ বা পিতৃলোকের রাজা যমের নিকট সশরীরে গিয়াছিলেন, এই কথা জানিবার জন্ত যে, "মানুষ মরিলে কি হয়?" ইহা ব্যতীত, শাস্ত্রে বর্ণিত "দেবাসুর সংগ্রামের" কাহিনী পাঠ করিলে দেখা যায় যে, এই ভৌম স্বর্গের তদানীন্তন অধিবাসীরা পরস্পর হিংসা, দ্বেষ ও ঈর্ষা দ্বারা পরিচালিত হইয়া কাটাকাটি মারামারি করিতেন। ফলে, দেব উপাধির নরগণ—দৈত্য, দানব, পিশাচ কর্ত্তৃক প্রথমে পরাজিত হইয়া প্রিয়তম "জন্মভূমি" স্বর্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। স্বর্গভ্রষ্ট দেবতারাই এই ভারতভূমিতে বসবাস ও অন্নসংস্থানের জন্ত আগমন করেন।

দ্বাদশ আদিত্যের সর্ব্বকনিষ্ঠ বিষ্ণুর নেতৃত্বে দেবগণ সামগান করিতে করিতে এই ভারতে আসিয়াছিলেন। এখানে প্রসঙ্গত: যজুর্ব্বেদের মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিলাম :

"পৃথিব্যাং বিষ্ণু ব্যক্রংস্ত গায়ত্রেণ ছন্দসা

অস্মাৎ অন্নাৎ অস্মৈ প্রতিষ্ঠায়ৈ।"

অর্থাৎ—বিষ্ণু গায়ত্রী ছন্দে গান করিতে করিতে পৃথিবী (পৃথুলের বা পৃথুর রাজ্য বলিয়া ভারতের আর এক নাম "পৃথিবী") বা ভারতে আগমন করেন। বিষ্ণু দেবগণের বাসস্থান সংগ্রহের জন্যই ভারতে আগমন করেন। পরে দেবগণ মহাপরাক্রমশালী বিষ্ণুর অধিনায়কত্বে দৈত্য, দানব, পিশাচ প্রভৃতিকে পরাজিত করিয়া স্বর্গরাজ্য পুনরধিকার করেন।

প্রাচীন সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, মনুষ্য-সমাজে প্রথমে মাতার নাম হইতে উপাধির (surname) প্রচলন হয়। পরবর্তীকালে পিতার নাম হইতে বংশগত 'উপাধির' সৃষ্টি হয়। স্বর্গে যে সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল তাহাকে দেব ও দৈত্যদানবগণের সংগ্রাম এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। পরবর্তীকালে দেবগণ (সুরগণ) এই দানবীয় শক্তি বা সভ্যতাকে পরাজিত করিয়া স্বর্গরাজ্য পুনরধিকার করিয়াছিলেন। সুরগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া দৈত্যদানবগণ "অসুর" শব্দে পরিচিত হয়।

যে স্বর্গের দেবতারা দৈত্যদানবগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং বাধ্য হইয়া এই ভারতভূমিতে আগমন করেন সেই স্থান শূন্যে অবস্থিত পারলৌকিক স্থান নহে। এই ভূমণ্ডলের কোন্ অংশ সেই পবিত্র স্থান? এই প্রশ্নের উত্তর বেদজ্ঞ উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার রচিত প্রসিদ্ধ "মানবের আদি জন্মভূমি" গ্রন্থে এবং ঋগ্বেদের "প্রকৃতার্থ বাহিনী টীকায়" দিয়াছেন। আমি এখানে "মানবের আদি জন্মভূমি" গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিতেছেন:

"ইহা ছাড়া স্বর্গের আর একটি নাম বেদে অমৃত বলিয়া বিবৃত। কেননা স্বর্গ সকল অতীব স্বাস্থ্যকর ছিল। অমৃত শব্দের অর্থ "Sanitoriam"। অর্থাৎ যে স্থানের লোকসকল অকালে মরিত না ও মরে না। অস্মিন্ দিবঃ অমৃতাঃ অকৃণ্বন্" ১০।৭২।২ম ঋগ্বেদ। ইন্দ্রাদি দেবগণ দিব্‌কে অমৃত অর্থাৎ অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

"হে অমৃতলোকবাসী দেবগণ। তোমরা শ্রবণ কর।" দেবতারা সমগ্র স্বর্গভূমিকে পাঁচটি অমৃতে বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে কিম্‌পুরাবর্গ বা ত্রিবিষ্টপ প্রথম অমৃত।"

"অগ্নেরয়ং মনামহে চারু দেবস্য নাম প্রথমস্য অমৃতানাং।" ২।২৪।১ম

আমরা প্রথম অমৃতের দেবতা অগ্নিদেবের চারু নাম উচ্চারণ করিব।"

অনুসন্ধিৎসুগণ উক্ত গ্রন্থের ২৬৭ হইতে ২৭০ পৃ. পর্য্যন্ত পাঠ করিলে আরও চারিটি "অমৃতের" বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারিবেন।

'ফের যদি ফিরে আসি'

(আল্‌ফা অফ্ দি প্লাউ)

অনুবাদক—শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

['নিউস্ ক্রনিকল্' পত্রিকার দপ্তরে বসে 'আল্‌ফা অফ্ দি প্লাউ' ছদ্মনামের আড়ালে বিংশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ ইংরেজ সংবাদ-সাহিত্যিক নিজেকে অমর করে রেখে গেছেন। আসল নাম তাঁর এ. জি. গার্ডিনার। 'বেলা-উপল'—'পেব্‌ল্‌স্ অন্ দি শোর্', 'ঝরাপাতা'—'লীভ্‌স্ ইন্ দি উইণ্ড্' প্রভৃতি তাঁর সুবিখ্যাত প্রবন্ধের বই। এটি তাঁর 'অন্ লিভিং এগেন্' প্রবন্ধের অনুবাদ।]

এই সেদিন লণ্ডনের এক ক্লাবের ধূমপানের ঘরে কয়েকজন ভদ্রলোক আহারান্তে আগুনের ধারে বসে গল্প-গুজব করছিলেন, তাঁরা সবাই জীবনে বেশ উন্নতি করেছেন। একজন নামজাদা উকিল, আর একজন রাজনীতিক, নাম তাঁর ঘরে ঘরে শোনা যায়, আর ছিলেন এক প্রসিদ্ধ যাজক ও জনৈক সাংবাদিক। বহু বিষয়েই কথা চলছিল, শেষটায় এসে পড়ল সুপরিচিত সেই প্রশ্ন: 'ইচ্ছামত চলবার ক্ষমতা থাকলে তুমি কি আবার এ জীবন কাটাতে চাইতে?' প্রায় সমবেত উত্তর হ'ল, 'না।'—একটিমাত্র ব্যতিক্রম ছিল; এবং বলে রাখা ভাল যে সে ব্যতিক্রম যাজক ভদ্রলোক নন। অধিকাংশের মত তিনিও এ নাটঘরে একবার এসেই সন্তুষ্ট। আর একবার আসবার বাসনা তাঁর নেই।

আমার বোধ হয় প্রশ্নটি সারা মানবজাতির মতই সনাতন। আর উত্তরটিও পুরাতন, এবং আমার মতে, আমাদের ঐ ধূমপানাগারের উত্তরেরই সদৃশ। এ প্রশ্ন মধ্যবয়সের পূর্বে জাগে না, কারণ যৌবনের ভাবনাগুলি থাকে অতি, অতি দীর্ঘ আর জীবন তখন বহুদূর সম্প্রসারী, মনে হয় সীমাহীন; তাই তার পুনরাবর্তনের কথা মনেই আসে না। শুধু যখন গিরিপথের শিখরে ওঠা যায়—তারপরে সুরু হয় অবতরণপর্ব; উপত্যকায় দেউলচূড়ায় নেমে আসে আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া, যাত্রাপথের শেষ

ভেসে ওঠে দৃষ্টিপটে, তখনই এই প্রশ্ন জাগে ঠোঁটের কোণে, অনাহূত। আর এ উত্তরের অর্থ নয় যে, অভিযান নিষ্ফল হয়েছে; শুধু এই: এ পথ হয়েছে সুদীর্ঘ, বন্ধুর, পথিকের চরণ হয়েছে বিক্ষত আর বিশ্রামের কল্পনা বড়ই মধুর। প্রকৃতি এমনি করেই আমাদের সাধারণ ভাগ্যের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া করিয়ে দেয়। তার শিশুকে সে প্রাণের শোভা-যাত্রা দেখিয়ে দিয়েছে, এখন শুধু একটু মাটির সম্পত্তি দিয়ে যেতে চায় উত্তরাধিকার রূপে:

'তাদের রসনা তুমি তৃষাতুর করেছ—
পরাক্রম, আধিপত্য
সব দুঃখ, সব সুখ, উধাও মহিমা
সকল সৌন্দর্য আর ভাস্বর ভাণ্ডার,
অস্ফুট নীহারিকার তরে; শেষে যেন
একমুষ্টি ধূলিভরে পরিপূর্ণ হয়ে
বলে, আর চাহিনেকো কিছু।'*

সত্যি, 'আর চাহিনেকো কিছু'। নশ্বরতার এই রায় আমরা বিনা অনুযোগে মেনে নিই—এমন কি এও চাই না যে, সম্ভব হলে তার বদল হোক্।

তবে এ প্রশ্নটি সেই আর এক মূঢ় প্রশ্নের সঙ্গে মিশিয়ে ফেললে চলবে না যে, 'জীবনটা বাঁচার যোগ্য কিনা?' ধূম-পানঘরের সেই দল এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে—যদি কোন জবাব দিতে তাঁরা কেয়ার করতেন—তৎক্ষণাৎ হেলায় বলতেন, 'নিশ্চয়।' তাঁদের সবারই কাছে জীবন এক বিরাট, অপরূপ অভিযান; তাকে তাঁরা লাভবান্, ফলবান্ করে তুলেছেন; তার একটি মুহূর্তও, তার বিচিত্রবর্ণ অভিজ্ঞতার এক কণাও তাঁরা ছাড়তে রাজী নন। সমস্ত সুস্থচিত্ত লোকের বেলায়ই এ কথা খাটে। হয়তো কোনও অবসাদের মুহূর্তে আমরা আমাদের জন্মদিনকে ধিক্কার দিতে পারি; কিন্তু সে ধিক্কার আমাদের ঠোঁটের কোণেই যায় মিলিয়ে। ডীন সুইফ্‌ট্ হয়তো তাঁর জন্মদিনে শোকসূচক অনুষ্ঠান করতেন; কিন্তু মানুষকে যে ঘৃণা করে, সে লোক জীবনকে সহনীয় মনে করবে কি করে? আমাদের সহানুভূতির পরিমাণই যে জীবনে আমাদের আনন্দের পরিমাপ।

যারা জীবনকে একেবারে মূল্যহীন করে দেখে, তারাও 'আপন বাঁচা'তে খুব সতর্ক। এই সেদিন আমার এক বন্ধু বলছিল সে কি করে এক লেখকের সঙ্গে একটা দিন কাটিয়েছিল—লেখকটি তাঁর বইয়ে এক শোকাত্মক মতবাদ প্রকাশের জন্যে প্রখ্যাত। সকালবেলায় নাকি সেই লেখক ঘোষণা করলেন যে, এমন একটি দিনও যায় না, যেদিন তাঁর মনে একথা না উদিত হয় যে, তিনি জন্ম না নিলেই ভাল করতেন; আর বিকেলবেলায়ই তাঁর পালের নৌকাঘটিত কি একটা গণ্ডগোলে তিনি ডুবে মরবার এক চমৎকার সুযোগ পেয়েও প্রায় করুণ এক আকুলতার সঙ্গে সে সুযোগ বর্জন করলেন এবং আমার মনে হয় তবু তিনি কায়মনে বিশ্বাস করে চলছেন যে, তাঁর জন্ম না হলেই ভাল ছিল। শুধু শিশুরাই মিথ্যা খেলার জগতে বাস করে না।

না; একবার এ পথে এসে আমরা আনন্দিত। শুধু আর একবার এ পথে যাত্রার কল্পনাতেই আমরা একটু নিরুদ্যম বোধ করি, একটু থমকে যাই। কখনও হয়তো কাউকে জবাব দিতে শুনবেন, 'হ্যাঁ, রাজী আছি, যদি এ জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি ফিরে পাই।' অর্থাৎ, 'হ্যাঁ, যদি আনন্দের যে সব সিধে রাস্তা এবার ফস্‌কেছি, সেগুলি নিশ্চিত খুঁজে পাই।' কিন্তু তাতে আমাদের প্রশ্নকে খেলো করে ফেলা হয়। তাতে চাওয়া হয়, যেন জীবন হবে না এক অপরূপ রহস্য, যার প্রতিটি দিন

'একটি তোরণ যার পরপার হ'তে
উঁকি দেয় অজানা জগৎ';*

বরঞ্চ হবে শতকরা তিন টাকা সুদের বেশ নিরাপদ বিনিয়োগ, যাতে আমি টাকা গচ্ছিত রাখতে পারি বেশ ফূর্তি করতে পারব বলে নিশ্চিত হয়ে—শুধু আলো, কোনও ছায়া নেই।

কিন্তু এ চুক্তি অনুসারে জীবন হয়ে উঠত এক নীরস পুতুলনাচের শবযাত্রা। জীবনের অনিশ্চয়তা সরিয়ে নিন, তার যাদুও চলে যায়। সে যেন ক্রিকেট খেলতে নামা হচ্ছে যত খুশী 'রাণ' তুলবার নিশ্চয়তা নিয়ে। এ রকম অসঙ্গত চুক্তিতে রাজী হয়ে কেউ উইকেটের দিকে যেতে চাইবে না। প্রথম বল—এই আমি আউট হয়েও যেতে পারি, আবার টিকে গিয়ে এক শ রাণও তুলে আসতে পারি (অবশ্য এমন বীরত্ব আমি যে কখনও দেখিয়েছি, তা নয়)—বলেই ত আমি এক রোমাঞ্চকর দুঃসাহসের অনুভূতি নিয়ে পায়ে প্যাড্ চড়াই। তেমনি প্রতিটি প্রত্যূষ সেই প্রথম সৃষ্টিদিবসের বিস্ময় নিয়ে উদয় হয় বলেই ত জীবন একটা শেষহারা গল্পের মত মোহময়।

তা ছাড়া অভিজ্ঞতা আমাদের সহায় হবে কেমন করে? স্বভাবই ত নিয়তি। ঐ ক্যাকাসে গাল আর ঘোলাটে চোখ নিয়ে ফিরে এলে যুগযুগান্তের অভিজ্ঞতাও তোমায় ব্যর্থতা থেকে বাঁচাতে পারবে না।

না, বাঁচতে যদি হয়, ত আগের মত অজানা সর্তেই জীবন বাঁচার যোগ্য হতে পারে। যেমন ভাবে এসেছিলাম, তেমনি ভাবেই আসতে হবে—অনন্তের গর্ভ থেকে ক্ষণিক অভিযানের

* ভিক্টোরীয় যুগের কবি ফ্রান্‌সিস টম্‌সনের 'এন্থেম্ টু আর্থ' বা 'বসুন্ধরার গান।'

* টেনিসনের 'ইউলিসিস্' কবিতা

পাহাড়রূপে। আর সে অভিযান যতই চিত্তাকর্ষক হোক না কেন, আমাদের মন তার বিপক্ষেই সায় দেয়। কারণ আমরা জানি যে, যা কিছু জীবনকে প্রিয় করে তোলে, তা সবই মিলিয়ে যাবে এই পুরোনো তীর্থের সঙ্গে, বিজড়িত সহস্র স্মৃতির সঙ্গে, পুরোনো দিনের সেই চেনা মুখের সঙ্গে। আর আবার এসে নূতন পরিচয় পাতাবার, নূতন পথে চলবার কল্পনাটাই কেমন বিশ্বাসঘাতকতা বলে বোধ হয়। হোম্‌স্* একদা একটি কবিতা লিখেছিলেন 'স্বর্গে বসে বাড়ীর জন্যে মন কেমন করা' নিয়ে। কিন্তু বাড়ীতে বসে বাড়ীর জন্যে মন কেমন করা আরও দুঃসহ—সেই পুরোনো স্মৃতির প্রেতভূমিতে ঘুরে বেড়ানো আর সকলকিছুর মধ্যে সেই চেনা হাওয়ার কাঁপন জাগানোর চেষ্টা! নূতন মিতালি পাতাব হয়তো; কিন্তু সে আর ঠিক তেমনটি হবে না। হয়তো আরও ভাল হবে; কিন্তু ভাল বন্ধু তখন আমরা চাইব না; কাঁদব শুধু হারানো সখাদের জন্যে।

'ম্যাটেরহর্ণ' পাহাড় সম্বন্ধে গীডো রে-র একখানি মহৎ গ্রন্থ আছে। তার একটি সুন্দর অংশ এ উপলক্ষ্যে আমার মনে আসছে মানানসই বলে। তিনি ঐ পাহাড়ে চড়তে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে তাঁর চোখে পড়ল সেটির নীচের একটা ঢালুতে সেই প্রদোষের আলোয় এক পলিতকেশ বৃদ্ধের মূর্ত্তি। সে বৃদ্ধ হুইম্‌পার*—ম্যাটেরহর্ণ-বিজেতা বৃদ্ধ হুইম্‌পার সন্ধ্যার আলোয় ওখানে দাঁড়িয়ে অনিমেষে চেয়ে আছেন তাঁর যৌবনে জয় করা বিরাট্ পাহাড়ের দিকে। পর্ব্বতারোহণের দিন তাঁর ফুরিয়েছে, আর গিরিবিজয়ের সাধ নেই মনে। তাঁর দিন শেষ হয়ে এসেছে, এখন শুধু দূরে দাঁড়িয়ে, স্মৃতিভারবদ্ধ, নিঃসঙ্গ হয়ে, যুদ্ধের গৌরব নবীনদের হাতে, উত্তোগীদের হাতে ছেড়ে দিয়েই তিনি তৃপ্ত। তার একটি স্মৃতি থেকেও তিনি বঞ্চিত হতে চান না—এক বিজয়মুহূর্ত্তের সেই নিদারুণ অভিজ্ঞতা ছাড়া। কিন্তু যদি তাঁকে প্রশ্ন করা যেত, সেই উধাও মহিমা আর ভাঙ্গা তারার জন্যে আজও তিনি তৃষাতুর কিনা, তিনি শুধু বলতেন, 'চাহিনেকো আর।'

* অলিভর ওয়েন্‌ডেল্ হোম্‌স্ (১৮০৯-১৮৯৪), সুবিখ্যাত মার্কিন কবি ও প্রবন্ধকার।

* এডোয়ার্ড হুইম্‌পার (১৮৪০-১৯১১) আল্‌প্‌স্ অভিযানের পুরোধা।

প্রবাসীর আম

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

বিবর্ণ দিনের সাঁঝে বর্ণালীর আভা খুঁজিলাম;
কোথা রস কোথা স্বাদ আনন্দের শান্ত পরিণাম।
বর্ষণ ক্লান্তিতে ভরা রিক্ত সিক্ত হিয়া
অগোচরে উঠিল কহিয়া,—
তিক্ত জীবনেরে ভুলি রসনারে দিব কিছু দাম
যদি পাই আম।

বিশীর্ণ হতাশ সাঁঝে হেথা নাহি কোন আম্রফল,
প্রবাসীর তুচ্ছ সাধ তাও ত নিষ্ফল;
শুধু দিনযাপনের ক্ষুদ্র হানাহানি
ব্যস্ততাতে যেথা নিত্য বাণী
ম্লান রহে সেথা স্বর্গসুধা—
বঞ্চিতা বসুধা।

সন্ধ্যান্তেই নন্দনের গোপন সন্ধান
লয়ে এল প্রেয়সীর দান,
লয়ে এল অমৃত বারতা,
মোর কানে কানে তার আপনার কথা;
অসীম সরস
মুমূর্ষু চিত্তেরে দিল শাশ্বত হরষ

ওরে মোর অমৃত আস্বাদ,
তোরে কি ভুলিয়া ছিনু দিনগত জীবন বিষাদ-
সিন্ধুকূলে? অন্তমনে কি রে
পরাণ সমীরে
আহ্বান করি নি নিতি মোর দীন গেহে
পরম সস্নেহে?
চাহি নি সাজাতে তারে মন্দার-মালায়,
হেরিতে তাহারে স্মিত হৃদয় দোলায়?
তোরে কি ভুলিয়াছিনু জীবনের দীন পরাজয়ে
আপনারে ক্ষুন্ন করি' তিলে তিলে ক্ষয়ে?
অন্ধকারে আত্মাহুতি মাঝে
যে দীনতা গোপনে বিরাজে
সে কি ঢেকে দিয়েছিল মোর শ্রেষ্ঠ সব
অন্তরের পুণ্য মহোৎসব?
চরম নিরাশা ক্ষণে প্রেয়সীর পরম পরশ
নিয়ে এল অমরার রস,
এড়াইয়া মলিন সংসারে
সুদূরের চিরজ্যোতি হারে,—
আনন্দ-সায়র মাঝে প্রস্ফুটিত প্রেমশতদল
এ অমৃত ফল।

বিবর্ত্তনে কামতা-রাজ্য

শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র বিশ্বাস (সান্যাল)

ইতিবৃত্ত

দেশবিভাগের পর, সম্ভবতঃ কাশ্মীর ও হায়দরাবাদের পরই কোচবিহারের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি বেশী করিয়া পড়ে। কোচবিহার প্রাচীন কামতা-রাজ্য হইতে উদ্ভূত বলা যায়।

মহাভারতের যুগ হইতে ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আসামের কামরূপ (প্রাচীন প্রাগ্জ্যোতিষপুর) রাজ্যের বিস্তৃতি ও তাহার শাসকশ্রেণীর বহু বার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে খেণবংশীয় (খাণবংশীয়) কতিপয় নৃপতি কামরূপ রাজ্যে আধিপত্য করেন। খেণ-নৃপতিদের কুলদেবী 'কামতা' বা 'গোসানী মাতার' (ভগবতীর) নামানুসারে কামরূপরাজ্যের নামকরণ হয় 'কামতা রাজ্য' এবং রাজধানীর নাম হয় 'কামতাপুর'।* উক্ত রাজ্যের নৃপতিগণ অভিহিত হইতেন কামতেশ্বর (কান্তেশ্বর) নামে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাংশে, আনুমানিক ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গাধিপতি সুলতান হোসেন শাহ্ কর্ত্তৃক কামতারাজ্য আক্রান্ত হইলে তদানীন্তন কামতেশ্বর নীলাম্বর পরাজিত ও নিরুদ্দিষ্ট হন। মহারাজ নীলাম্বর পরাজিত হইবার পর কামতা রাজ্য কয়েক বৎসর একপ্রকার অরাজক অবস্থায় ছিল। তৎকালে বিভিন্ন ভুঁইয়াগণ রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশের উপর প্রভুত্ব করিতেন। ঐ সময় আসামের গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত ধুবড়ী হইতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল উত্তরে—বর্ত্তমান কোচবিহার শহর হইতে প্রায় ষাট মাইল উত্তর পূর্ব্বে, চিকনা নামক স্থানে হরিদাস বা হারিয়া মণ্ডল নামে একজন 'কোচ-দলপতি' দ্বাদশটি পরিবারের উপর প্রভুত্ব করিতেন। ইনি কোচবিহার রাজবংশের আদিপুরুষ বলিয়া খ্যাত। ইঁহার সহিত হাজো নামক এক সর্দারের 'মেচ' অথবা 'কোচ' জাতীয় দুই কন্যা জীরা ও হীরার বিবাহ হয়। হীরার গর্ভে শিশু ও বিশু নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দুই ভাইয়ের মধ্যে বিশুই প্রতাপশালী হইয়া উঠেন এবং ধীরে ধীরে ভুঁইয়াদের বশীভূত করিয়া নিজের অধিকার বিস্তার করিতে থাকেন।

অল্পকাল মধ্যেই বিশু কামতারাজ্যের সমুদয় ভুঁইয়াকে পরাজিত করিয়া নিজেকে পশ্চিম কামরূপের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন (১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দ)। বিশ্বসিংহের রাজধানী প্রথমে চিকনাতেই অবস্থিত ছিল ; পরে সেখান হইতে বর্ত্তমান কোচবিহারের ষোল মাইল উত্তর-পূর্ব্বে হিঙ্গলাবাস নামক স্থানে রাজধানী স্থাপিত হয় এবং কিয়ৎকাল পরে রাজধানী পুনরায় স্থানান্তরিত হইয়া কামতাপুরে নীত হয়। বিশ্বসিংহের বহুসংখ্যক মহিষী ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নৃসিংহনারায়ণ, দ্বিতীয় নরনারায়ণ (মল্লনারায়ণ). এবং তৃতীয় শুক্লধ্বজ (চিলা রায়)। কথিত আছে, জনৈক ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে বিশ্বসিংহ বসন্তরোগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ)। পিতার ব্যবস্থানুযায়ী নৃসিংহনারায়ণ জ্যেষ্ঠ হইলেও রাজত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য পাঙ্গা'র (রংপুরের) সম্পত্তিলাভ করিয়াছিলেন। কাজেই ঘটনাচক্রে তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা নরনারায়ণ হইলেন কামতারাজ্যের অধীশ্বর (১৫৪০ খ্রীঃ)। নরনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তৃতীয় ভ্রাতা শুক্লধ্বজকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই ছিলেন বিশেষ বিচক্ষণ ও অসীম সাহসী। দুই ভাইয়ের চেষ্টায় রাজ্যের আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মহারাজ নরনারায়ণের আমলে কামতারাজ্য বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করিয়া একটি বিশাল রাজ্য হইয়া উঠে।

নরনারায়ণের রাজধানী কোথায় ছিল সঠিক জানা যায় নাই। নিরাপত্তার জন্য তাঁহাকে প্রায়ই রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে হইত। ইঁহার রাজত্বকালে রাজ্যের বহু সংস্কার সাধিত হয়। নারায়ণী মুদ্রা ইনিই প্রবর্ত্তন করেন। কালাপাহাড় কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত কামাখ্যাদেবীর মন্দির ইনি পুনঃ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং মন্দিরাভ্যন্তরে নিজের ও ভ্রাতা শুক্লধ্বজের দুইটি প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপন করেন। ১৫৮৭ সনে নরনারায়ণের মৃত্যুর পর মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৫৮৭-১৬২১ খ্রীঃ)। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের আমলে, সম্ভবতঃ মুসলমান আক্রমণের ভয়ে রাজধানী গৌহাটির চৌদ্দ মাইল উত্তর-পশ্চিমে 'হাজো'তে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। ইঁহার আমল হইতেই কামতারাজ্যের আয়তন দ্রুত সঙ্কুচিত হইতে থাকে। পরবর্ত্তী মহারাজা বীরনারায়ণের সময়ে (১৬২১-১৬২৬ খ্রীঃ) রাজধানী বর্ত্তমান কোচবিহারের তিন মাইল পশ্চিমে 'আঠারকোঠা'য় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহারাজ বীরনারায়ণের রাজত্বের অবসানে ১৬৯৬ সন পর্য্যন্ত পর পর চারি জন নৃপতি আঠারকোঠায় রাজত্ব করেন। ১৬৯৩ সনে মহীন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হইলে মহারাজ রূপনারায়ণ সিংহাসন লাভ করেন এবং রাজ-

* বর্ত্তমান কোচবিহারের ১৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গোসানীমারী নামক স্থানে এখনও গোসানী দেবীর মন্দির এবং প্রাচীন নৃপতিদের কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান—পূর্ব্বে এই স্থান কামতাপুর নামে আখ্যাত হইত।

ধানী আঠারকোঠা হইতে তোর্ষা নদীর পূর্ব্বতীরে গুড়িয়াহাটিতে (বর্ত্তমান কোচবিহারে) স্থানান্তরিত করেন। মহারাজ রূপনারায়ণ একুশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৭১৪ সনে পরলোকগমন করেন।

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যুর পর ১৭৭২ সন পর্য্যন্ত চারি জন স্বাধীন নৃপতি কোচবিহারে রাজত্ব করেন; ইঁহাদের মধ্যে রাজেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন শেষ স্বাধীন নৃপতি। মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণের অবর্ত্তমানে তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণের নাবালকপুত্র ধরেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে বসানো হয় (১৭৭২-১৭৭৫ খ্রীঃ)। মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণের নাবালকত্বের সুযোগ লইয়া ভুটিয়াগণ পুনঃ পুনঃ কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করিতে থাকে, অবশেষে ১৭৭২ সনে রাজধানী কোচবিহার অধিকার করিয়া লয়। নাজির দেও (প্রধান সেনাপতি) খগেন্দ্রনারায়ণ, বালক-মহারাজ ও রাজমাতাকে রংপুরে পাঠাইয়া দেন। রাজ্যোদ্ধারের নিমিত্ত নাবালক মহারাজের পক্ষে, ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে অনন্যোপায় হইয়া নাজির দেও বাংলার তৎকালীন শাসক ইংরেজ সরকারের (ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর) সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং ৪ঠা ডিসেম্বর ইংরেজের সহিত এক চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হন। এই চুক্তির ফলে ইংরেজদের সহায়তায় কোচবিহাররাজ্য ভুটিয়াদের কবল হইতে মুক্ত হয়, কিন্তু কূটচক্রী ইংরেজের হস্তক্ষেপে কোচবিহার রাজ্যের আয়তন ৩২০০ বর্গমাইল হইতে কমিয়া ১৩১৭ বর্গমাইলে দাঁড়ায়; ইহাতে রাজ্যের সৈন্যসংখ্যাও বহুল পরিমাণে কমিয়া গেল। এই চুক্তির অন্যতম সর্ত্ত হিসাবে কোচবিহার-রাজকে প্রতি বৎসর করস্বরূপ অর্দ্ধেক রাজস্ব* কোম্পানীকে দিতে স্বীকৃত হইতে হইয়াছিল।

বর্ত্তমান কোচবিহার ও প্রাচীন রাজধানীসমূহের মানচিত্র

ধরেন্দ্রনারায়ণের পর হইতে বর্ত্তমান মহারাজ পর্য্যন্ত আট জন নৃপতি কোচবিহারের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ এবং তাঁহার প্রপৌত্র (মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের পোষ্যপুত্র নরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র) মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের আমলে (১৭৮৩-১৮৩৯ খ্রীঃ) কোচবিহারের বিখ্যাত 'সাগরদীঘি' খনন করা হয় এবং দীঘির পশ্চিম তীরস্থ শিবমন্দিরটি নির্ম্মিত হয়। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ সাময়িক ভাবে রাজধানী প্রথমে ভেটাগুড়ি (বর্ত্তমান কোচবিহারের প্রায় দশ মাইল দক্ষিণে) ও পরে বলিয়াবাড়ীতে (কোচবিহারের চারি মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে) স্থানান্তরিত করেন। ব্রিটিশ পদ্ধতিতে রাজ্যশাসন ইঁহার আমল হইতেই সুরু হয়।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন একজন বিচক্ষণ নৃপতি। রাজকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনা করিবার জন্য ইনি সর্ব্বপ্রথম 'রাজ-সভা' (State Council) প্রতিষ্ঠা করেন। রাজ্যের নানাবিধ উন্নতিকল্পে ইনিই বাংলা ও অন্যান্য স্থান হইতে বিভিন্ন কার্য্যে পারদর্শী বহু লোক কোচবিহার রাজ্যে লইয়া আসিয়াছিলেন। যে সব কোচবিহার-হিতৈষী বাহির হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকালিকা দাস দত্ত মহাশয় সর্ব্বাগ্রগণ্য। মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের আমলে রাজ্যে কতকগুলি দাতব্য চিকিৎসালয়, কয়েকটি উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় ও একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কোচবিহার কলেজটি পূর্ব্বে অবৈতনিক ছিল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯০১ সালের নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত এখানে এম-এ এবং আইন পড়ান হইত—আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, শ্রীজয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি মনীষিগণ কোচবিহার কলেজে বহুকাল অধ্যক্ষপদে

---

* ইংরেজের সহিত কোচবিহার-রাজের সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হইলে, ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রংপুরের কালেক্টর মিঃ পার্লিং কোচবিহাররাজ্যের তৎকালীন রাজস্ব ১,৯৯,২০।/০ আনা নারায়ণী মুদ্রায় (বর্ত্তমান মুদ্রার হারে ১,৩৩,০০০ টাকা) অবধারিত করেন; দেয় কর ধার্য্য হয় ৬৭,৭০০৸৶০।
Settlement Report of Cooch Behar State (1913-27) p. 56—Sri Karali Charan Ganguli.

১০

অধিষ্ঠিত ছিলেন। উচ্চশিক্ষালাভের জন্য দূরদূরান্ত হইতে বিদ্যার্থিগণ এখানে আসিয়া ভিড় জমাইত।

মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের শৈশব অবস্থায় রাজ্য শাসনের ভার কর্ণেল জে. পি. হটন নামক জনৈক ইংরেজ কর্মচারীর (ভারত-সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত কমিশনার) হস্তে ন্যস্ত ছিল। কর্ণেল হটনের আমলে রাজ্যে মনুষ্যবিক্রয়ের প্রথা বিলুপ্ত হয়। কোচবিহারের বর্ত্তমান রাজপ্রাসাদটি মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের শৈশবে নির্ম্মিত। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মার্চ নৃপেন্দ্রনারায়ণ নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্ত্তক কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতিদেবীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯১১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর তিনি ইংলণ্ডে পরলোকগমন করেন। প্রজামণ্ডলী ও সর্ব্বসাধারণের কল্যাণের জন্য তিনি যে সকল মহৎ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, সেজন্য তিনি স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

কামতা বা গোসানী দেবীর মন্দির, গোসানীমারী

পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্তি

দেশ বিভক্ত হইবার পর কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ ব্যতীত যে সমস্ত দেশীয় রাজ্য ভারত ডোমিনিয়নে যোগদান করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল, কোচবিহার তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ভারত-সরকারের সহিত বহু পত্রবিনিময়ের পর শেষ সঙ্কট উপস্থিত হইবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে কোচবিহার-রাজ ভারতরাষ্ট্রে যোগদান করা সাব্যস্ত করেন। কিন্তু ভারতরাষ্ট্রে যোগদান করিয়াও পূর্ব্ব মনোভাব বজায় রাখিয়াই রাজ্যমধ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময়ে দেখা দিল রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষস্থানীয় অনেকের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির একটা তীব্র প্রতিযোগিতা। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের কাহারও কাহারও পৃষ্ঠপোষকতায় ও সক্রিয় সহযোগিতায় 'হিতসাধনী সভা' ও অন্যান্য ভুঁইফোড় রাজনৈতিক দল রাজ্যের মধ্যে সাধারণের স্বার্থবিরোধী নানারূপ কার্য্যকলাপ শুরু করিল; উপরন্তু তৎকালীন স্বৈরাচারী শাসনের ফলে রাজ্যে ঘোর অশান্তি দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইল রাজ্যময় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন।

জন্মদিনে মহারাজ শ্রীজগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর

এইরূপ অবস্থায় ১৯৪৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর ভারত-সরকার কোচবিহারের সমস্ত দায়িত্ব স্বহস্তে তুলিয়া লন এবং কোচবিহারকে 'চিফ কমিশনারে'র প্রদেশ রূপে পরিচালনার জন্য ইহার শাসনভার শ্রীভি. আই. নানজাপ্পা আই-সি-এসের উপর ন্যস্ত করেন। শ্রীনানজাপ্পা কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াই কোচবিহারের মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দেন এবং প্রাচীন রাজ্যশাসন-ব্যবস্থার বহু পরিবর্ত্তন সাধন করেন। কোচবিহারের ইতিহাসে ইহা এক স্মরণীয় ঘটনা।

জনসাধারণের দাবিতে এবং অবস্থার চাপে ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। ঐ দিন পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী শ্রীবিধানচন্দ্র রায় কোচবিহারে উপস্থিত থাকিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে ভারত-সরকারের নিকট হইতে আনুষ্ঠানিক ভাবে কোচবিহারের যাবতীয় ভার গ্রহণ করেন। সেই দিন হইতে কোচবিহার এক জন পৃথক জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে প্রেসিডেন্সি বিভাগের একটি স্বতন্ত্র জেলা রূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। কোচবিহারের শাসনভার পুনরায় অর্পিত হইল শ্রীনানজাপ্পার উপর। তদবধি কোচবিহারের সরকারী দপ্তর হইল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের দপ্তর।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত শ্রীনানজাপ্পা কোচবিহারের শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন। তিনি অতি অল্পকাল এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই তিনি অশক্ত কর্ম্মচারীদের রাজকার্য্য হইতে অপসারণ, বহু কর্ম্মদক্ষের পদোন্নতি বিধান, নিজ দায়িত্বে বিভিন্ন বিভাগে নূতন হারে বেতন ও 'মাগ্‌গি ভাতা' মঞ্জুর করানো, দেশদ্রোহী-

দের রাজ্য হইতে বহিষ্করণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ও একান্ত আবশ্যক পরিবর্তনগুলি অতি সহজে ঘটাইতে সমর্থ হন। কোচবিহারের শাসনব্যবস্থা এখনও বহু পরিবর্তনসাপেক্ষ, কিন্তু কোচবিহারে স্বল্পকাল অবস্থিতি সত্ত্বেও বিচক্ষণতা ও কর্মপটুতা দ্বারা তিনি কোচবিহারবাসীর কল্যাণসাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অনেকের অভিমত তিনি আরও কিছু-কাল এখানে অবস্থান করিলে রাজ্যের বহু জটিল সমস্যার সমাধান ত্বরান্বিত হইতে পারিত।
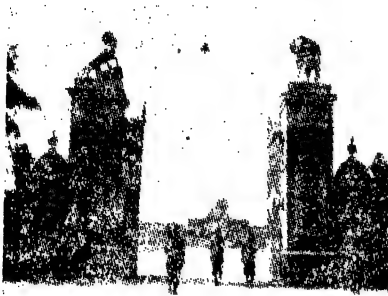
প্রাসাদ-তোরণ, কোচবিহার—দূরে অস্পষ্ট রাজ-প্রাসাদ দেখা যাইতেছে

ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবার পর কোচবিহারের বর্তমান মহারাজা ও রাজপরিবারের কি পরিণতি হইল তাহা জানার জন্য জনসাধারণের কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ১৯৪৯ সালের ২৮শে আগষ্ট কোচবিহারের মহারাজার সহিত ভারত-সরকারের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাহাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিবার সর্তস্বরূপ মহারাজ যে সব বিষয়ের অধিকারী থাকিবেন, তাহা লিখিত ভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই চুক্তির বিষয়বস্তু একটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। চুক্তিতে ভারত-সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর করেন দেশীয় রাজ্য দপ্তরের সম্পাদক শ্রী ভি. পি. মেনন এবং মহারাজার পক্ষে স্বাক্ষর করেন তিনি নিজেই। চুক্তির সর্তাবলী হইতে দেখা যায়, যাহাতে মহারাজা এবং রাজপরিবারের স্বার্থ পুরাপুরি রক্ষিত হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রাজপ্রাসাদ, প্রাসাদ-সংলগ্ন বিস্তীর্ণ ভূমি এবং বাড়ীগুলি চিরকাল সংরক্ষিত থাকিবে শুধু মহারাজ এবং রাজ-পরিবারের ব্যবহারের জন্য, উহাতে দান-বিক্রয়ের অধিকার কাহারও থাকিবে না। স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির কতক-গুলি রাখা হইয়াছে দান বিক্রয়ের ক্ষমতাসমন্বিত অবস্থায় মহারাজার অধিকারে।* মহারাজ, রাজপরিবার এবং রাজ-কর্মচারীবৃন্দের ব্যয় বাবদ প্রতি বৎসর আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। অবশ্য ইহার কিছু অংশ সর্তাবদ্ধ। 'মহারাজা' পদবী এবং অন্যান্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবার ক্ষমতা আইনসঙ্গত ভাবে রাজপরিবারের মধ্যে বংশপরম্পরায় রক্ষিত থাকিবে। চুক্তিতে সরকারী সৈন্যদ্বারা রাজপ্রাসাদ পাহারা দিবার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করা হইয়াছে। চুক্তির সর্তগুলি পূর্ব্বাপর বিচার করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আসলে রাজ্য হস্তান্তরিত হয় নাই, হইয়াছে শুধু শাসন-পদ্ধতির পরিবর্তন।

সংস্কারের পথে

কোচবিহার রাজ্য আয়তনে (আয়তন ১৩১৮·৩৫ বর্গ-মাইল) তেমন বৃহৎ না হইলেও ইহার শাসনতন্ত্রের জটিলতার অভাব ছিল না। একমাত্র বৈদেশিক দপ্তর ভিন্ন ভারত সরকারের অনুরূপ প্রায় সকল বিভাগই কোচবিহারের শাসন-

প্রাসাদের অপর একটি দৃশ্য
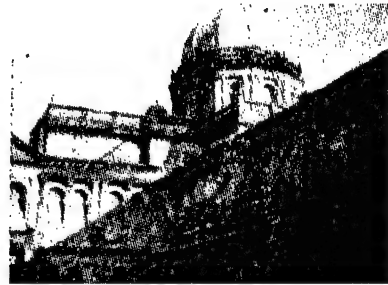
ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা ব্যতীত কোচবিহারের নিজস্ব কতকগুলি শাসনতন্ত্রও প্রচলিত ছিল। রাজ্যের প্রধান শাসনকর্তা

* সংক্ষেপে ইহার মধ্যে পড়ে দার্জ্জিলিং-এর ২৮খানা বাড়ী এবং সেখানকার কিছু ভূমি, কলিকাতার প্রাসাদ এবং তৎসংলগ্ন ৮৫·১২ বিঘা জমি, কোচবিহারের ৬খানা বাড়ী এবং জমি ১২৭১৮·৫৬ বিঘা, মোটরগাড়ী ১৭খানা, ২খানা বিমান, অলঙ্কার ও সজ্জাসহ ২৪টি হাতি ও ১৬টি ঘোড়া 'শিকার সংস্থা'র সমুদয় জিনিসপত্র (ইহাতে শিকারের সরঞ্জাম ছাড়াও গবর্ণর এবং বিশেষ সম্মানী ব্যক্তিদের ভোজসভার যাবতীয় তৈজসপত্র রক্ষিত আছে; শিকারের সরঞ্জামের মধ্যে নানা ধরণের ৩৫টি তাঁবু বিশেষ উল্লেখযোগ্য); তোশাখানার মূল্যবান দ্রব্যাদি (ইহাতে রক্ষিত আছে বিভিন্ন পর্ব্বে ব্যবহারের জন্য প্রায় ২০ মণ ওজনের রৌপ্য ও এক মণ ওজনের স্বর্ণ নির্ম্মিত জলচৌকি, থালা, আলবোলা, আতর দান প্রভৃতি নানাবিধ সৌখিন দ্রব্য)। এই সমস্ত ছাড়াও রাজ্যের মধ্যে বিনা শুল্কে বিমান অবতরণ, শিকার প্রভৃতি বিষয়ে মহারাজ এবং রাজ-পরিবারের ব্যক্তিদিগকে বহু প্রকার সুবিধা দেওয়া হইয়াছে।

ছিলেন স্বয়ং মহারাজা।* রাজকার্য্য পরিচালনায় মহারাজাকে সহায়তা করিত একটি 'রাজ-সভা' ও একটি 'ব্যবস্থাপক সভা'। মহারাজাই ছিলেন উভয় সভার সভাপতি। মহারাজা ব্যতীত চারি জন মন্ত্রী ও কতিপয় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন পরিষৎ দুইটির সভ্য। সাধারণ দপ্তর, রাজস্ব দপ্তর, সৈন্য-সংক্রান্ত দপ্তর, হুজুর দপ্তর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে উভয় পরিষদের কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। প্রত্যেক প্রাদেশিক প্রধান বিচারালয়ের (High Court) মত কোচবিহারের রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল একটি প্রধান বিচারালয়; প্রধান

'মন্ত্রণা-ভবন', কোচবিহার

বিচারপতি এক জন 'অবস্তন বিচারপতি'র (Puisne Judge) সহায়তায় প্রধান বিচারালয়ের কার্য্য পরিচালনা করিতেন। জেলার দেওয়ানী আদালতের কাজের জন্য প্রধান বিচারপতির অধীনে নিযুক্ত ছিলেন এক জন পৃথক দেওয়ানী ও দায়রা জজ; ফৌজদারী বিচারের ভার ছিল এক জন 'ফৌজদারী আহিলকার' (Magistrate)-এর উপর ন্যস্ত। সদর ও অন্যান্য মহকুমার বিচারকার্য্য করিতেন রাজস্ব-সচিবের অধীন এক বা একাধিক 'নায়েব-আহিলকার' (Collector/Dy. Magistrate)। ভারত-সরকারের ন্যায় কোচবিহার সরকারেরও ছিল স্বতন্ত্র আবগারী বিভাগ, বনবিভাগ, রপ্তানি-শুল্ক বিভাগ ও আয়কর বিভাগ। রাজ্যে পৃথক 'বাণিজ্য সভা', 'পাবলিক সার্ভিস কমিশন' প্রভৃতি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংস্থাও ছিল।

শ্রীনানজাপ্পা বদলি হইবার পর কোচবিহারের এইরূপ জটিলতাপূর্ণ শাসনপদ্ধতি সংস্কারের দায়িত্ব ন্যস্ত হইল শ্রীকরুণাকান্ত হাজরা আই-সি-এসের উপর। এই সময় হইতে দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার ন্যায় কোচবিহারও হইল ডেপুটি কমিশনার শাসিত জেলারূপে পরিগণিত, শ্রীহাজরার পদের নাম হইল 'ডেপুটি-কমিশনার'। বিচারবিভাগের লোক হইলেও তিনি বিশেষ বিচক্ষণতা ও সাফল্যের সহিত পূর্ব্ব শাসনপদ্ধতির সংস্কারসাধন করিয়া নূতন ধারায় উহা প্রণালীবদ্ধ করিতে লাগিলেন। কোচবিহারের পুরাতন শাসনতন্ত্রে প্রচলিত বহু সংজ্ঞা বিলুপ্ত করিয়া সে সব স্থানে প্রবর্ত্তিত করা হইল ভারতের প্রথানুযায়ী নাম। হাইকোর্ট এবং তৎসংশ্লিষ্ট কতকগুলি পদ কিছুকাল পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়া-

কলেজ, কোচবিহার

ছিল, এখন শুধু 'অনুগ্রহ-উকীলদের'* নূতন জেলাতে স্বীকার করিয়া লওয়া হইল একটা মামুলি অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া। যতদূর সম্ভব কর্মচ্যুত না করিয়া পূর্ব্বের কর্মচারীদিগকে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। যাঁহারা অবসর পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলেন, উপযুক্ত মাসোহারাসহ তাঁহাদিগকে কার্য্য হইতে বিদায় দেওয়া হইল। রাজ্যের 'হিসাব পরিদর্শন বিভাগ' (Finance and Audit Department) বিলুপ্ত করিয়া উহাকে যুক্ত করা হইল পশ্চিমবঙ্গের মূল হিসাব বিভাগের সহিত। পূর্ব্বে কোচবিহারে 'বিক্রয়কর' আদায়ের প্রথা ছিল না, বর্ত্তমানে এই জেলায় প্রবর্ত্তিত হইল বিক্রয়কর সংগ্রহের প্রথা; কিন্তু 'দোকান কর্মচারী আইন' অনুযায়ী দেড় দিন দোকান বন্ধ রাখার প্রথা এখনও এখানে প্রচলিত হয় নাই।

কোচবিহার-রাজের বহু খাসের সম্পত্তি ছিল; তাহার মধ্যে কিছু পরিমাণ ছিল অনাবাদী। খাসের সম্পত্তির কিরূপ বন্দোবস্ত এবং কিরূপে তাহার সর্ত্ত সংরক্ষিত হইবে তাহা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

সমস্ত দিক হইতে কোচবিহারকে অন্যান্য জেলার সমকক্ষ করিতে সরকারের এখনও দীর্ঘ সময় লাগিবে সন্দেহ নাই।

* একমাত্র ভারত-সরকারের সহিত যোগাযোগ রক্ষার্থে মহারাজাকে 'ইষ্টার্ণ ষ্টেট এজেন্সি'র পলিটিক্যাল এজেন্টের শরণাপন্ন হইতে হইত।

* কোচবিহার রাজ্যে কতকগুলি 'অনুগ্রহ-উকীল' ছিলেন'—ইঁহারা মহারাজের সৃষ্ট; ইঁহাদের কাহারও আইন সম্বন্ধে কোন 'সনন্দ পত্র' না থাকা সত্ত্বেও মহারাজা নানা কারণে অনুগ্রহ করিয়া ইঁহাদিগকে রাজ্যে আইনজীবী হইবার অনুমতি দিয়াছিলেন; তদবধি ইঁহাদের নাম 'অনুগ্রহ-উকীল।'

আভ্যন্তরীণ অবস্থা

কোচবিহার রাজ্য জলপাইগুড়ি, রংপুর ও গোয়ালপাড়া জেলা দ্বারা পরিবেষ্টিত। জেলার উত্তর সীমানার কোন কোন স্থান হইতে হিমালয় পর্ব্বতমালা মাত্র ত্রিশ মাইলের মধ্যে অবস্থিত। এখানকার ভূমি সমতল ও বালুকা-মিশ্রিত (দো-আঁশলা)। স্থানে স্থানে গভীর অরণ্য (জেলায় মোট অরণ্যের পরিমাণ ২০ বর্গ মাইল) ও বিল রহিয়াছে। বনাংশে শিকার উপযোগী ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার, বন্য মহিষ, বন্য শূকর, হরিণ, হস্তী প্রভৃতি বহু প্রকার জীব-জন্তু বাস করে। মহারাজা কর্ত্তৃক এই সব অরণ্য শিকার উপলক্ষে সংরক্ষিত হইত। রাজ্য-মধ্যে পাহাড় নাই; কিন্তু বহু পাহাড়িয়া নদী এই জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। তন্মধ্যে তিস্তা (ত্রিস্রোতা), জলঢাকা (ইহাই

পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ হইতে কোচবিহারের শাসন-ক্ষমতা গ্রহণ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী শ্রীবিধানচন্দ্র রায়ের কোচবিহার এরোড্রোমে অবতরণ। বামে কুমার গৌতম নারায়ণ এবং দক্ষিণে সপত্নী শ্রীনানজাপ্পা

স্থান বিশেষে মানসাই, সিঙ্গিমারি বা ধরলা নামে অভিহিত হইয়া থাকে), তোর্ষা, কালজানী, রায়ডাক ও গদাধরই প্রধান। নদী এবং বিলগুলিতে স্বল্প পরিমাণে মৎস্য পাওয়া যায়। জেলায় পুষ্করিণী আছে বহু, পূর্ব্বাপর মৎস্য বিভাগ থাকা সত্ত্বেও এই জেলায় মৎস্যের মূল্য অত্যধিক। এখানে প্রায় সমস্ত বৎসর ব্যাপী প্রচুর পরিমাণে বারিপাত হয়। বারিপাতের বাৎসরিক গড় প্রায় ১৫৫ ইঞ্চি, বৃষ্টির পরিমাণ অত্যধিক বলিয়াই বোধ হয় এখানকার গরম অন্যান্য স্থানের তুলনায় কম। নানা জাতীয় বৃক্ষরাজি ও পুষ্পসম্ভারে এই জেলার প্রকৃতি রহিয়াছে সুসজ্জিতা। জেলার জলবায়ু স্বাস্থ্যনিবাস তুল্য না হইলেও নিন্দনীয় নহে। এদেশীয়দের প্রকৃতি আপাতদৃষ্টিতে নিতান্ত নিরীহ ও সরল মনে হইলেও বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসী অপেক্ষা ইহারা কর্ম্মঠ বা তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন নহে।

শ্রীনানজাপ্পা সমভিব্যাহারে প্রধান-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রায় ও কোচবিহারের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ

সদর লইয়া এই জেলায় পাঁচটি মহকুমা (কোচবিহার, দিনহাটা, তুফানগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা ও মেখলীগঞ্জ)। জেলার প্রধান সহর কোচবিহার। কোচবিহার সহরটির আয়তন বর্ত্তমানে চারি বর্গমাইলেরও অধিক। সহরটির বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা, হাসপাতাল, মদনমোহন ঠাকুরবাড়ী প্রভৃতি সমস্তই যেন একটা নক্সা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত। সহরের ঠাকুরবাড়ীতে কালী, তারা, মদনমোহন, ভবানী প্রভৃতি বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ভবানী দেবীর নাম হইতে কোচবিহারের আর এক নাম হইয়াছে ভবানী-গঞ্জ। জেলা সহর ব্যতীত অপর কোন মহকুমা সহরে পৌর-সভা নাই; প্রত্যেক মহকুমা সহরে 'নগর-সমিতি' (Town Committee) নামক একটি প্রতিষ্ঠান পৌর-সভার কার্য্য পরিচালনা করে।

কোচবিহার হইতে তুফানগঞ্জ ও দিনহাটা মহকুমার কিয়দংশ ব্যতীত জেলার অন্যান্য অংশের পথ অতিশয় দুর্গম। বর্ষায় জেলার অধিকাংশ অঞ্চল প্রধান শহর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এই জেলার গ্রামগুলি বাংলার অন্যান্য গ্রামের ন্যায় ঘন বসতিযুক্ত নহে। সাধারণতঃ নিজ নিজ অধিকার-ভুক্ত এলাকা লইয়া গ্রামবাসীরা জেলার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া বসবাস করে। গ্রামগুলির অধিকাংশ অধিবাসীই অনুন্নত এবং প্রায়ই নিরক্ষর। জেলার প্রাচীন অধিবাসীরা রাজ-বংশী নামে খ্যাত। মহারাজ জিতেন্দ্র নারায়ণের আমলে মাথাভাঙ্গা মহকুমার শ্রীপঞ্চানন সরকার রাজ্যময় এক আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া রাজবংশীদিগকে পরিচিত করিয়াছেন ক্ষত্রিয় রূপে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আদম সুমারি হইতে দেখা যায়

রাজ্যের মোট অধিবাসী-সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার। সেই সময় সহরগুলির মোট অধিবাসী-সংখ্যা ছিল মাত্র পঁচিশ হাজার, তন্মধ্যে কোচবিহার সহরে ছিল ষোল হাজার।
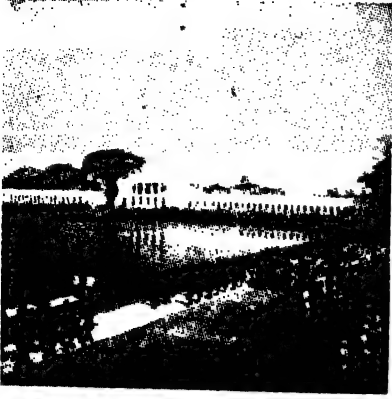
কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হইবার দিন (১লা জানুয়ারী, ১৯৫০) সাগরদীঘির (বর্ত্তমানে শহীদ স্কোয়ার) তীরে একটি সরকারী অনুষ্ঠানের দৃশ্য

অর্থনৈতিক দিক হইতে কোচবিহারকে সচ্ছল বলা যায়। রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া শেষের দিকে এক কোটী চারি লক্ষ দাঁড়াইয়াছিল। রাজ্যের সর্ব্ববিধ বন্দোবস্তের জন্যই উচ্চহারে খাজনা দিতে হইত। কোচবিহার রাজ্যের শেষ প্রধান মন্ত্রীর আমলে রাজধানীসংলগ্ন খাসের জমির রাজস্ব বিঘা প্রতি দুই শত পঞ্চাশ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে, ইহা ব্যতীত জমির জন্য সেলামী দিবার ব্যবস্থাও রহিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বোচ্চ খাজনা দিয়াও কোন প্রজার চিরস্থায়ী স্বত্ব ছিল না, যে কোন প্রজাকে বিনা ক্ষতিপূরণে উচ্ছেদ করিবার অধিকার ছিল মহারাজের। এই কারণে সমর্থ হইলেও লোকেরা বাড়ীঘরের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিত না।

রাজ্যের আয়ের পরিমাণ অধিক হইলেও জনকল্যাণকর কার্য্যে ইহার অতি অল্প অংশই ব্যয় করা হইত। এই সেদিন পর্য্যন্ত রাজ্যে মোট হাই স্কুলের সংখ্যা ছিল সাতটি এবং মোট মধ্য ইংরেজী ও মধ্য বাংলা স্কুলের সংখ্যা ছিল মাত্র বারটি। এগুলি ষ্টেট কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত।

বিগত কয়েক বৎসরে কোচবিহারে চারিটি নূতন হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বালিকাদের মধ্য ইংরেজী স্কুল দাঁড়াইয়াছে ছয়টিতে। কিন্তু অদ্যাবধি জেলায় বালিকাদের হাই স্কুল রহিয়াছে মাত্র একটি, যদিও প্রত্যেক মহকুমাতেই ন্যূনপক্ষে আর একটি করিয়া বালিকাদের হাই স্কুল চলার সুযোগ রহিয়াছে। জেলা শহরে বালিকাদের একটি স্বতন্ত্র কলেজ চলিবারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। স্থানীয় স্কুল বিভাগ হইতে জানা যায়, বর্ত্তমানে গ্রামাঞ্চলে বহু প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জেলায় একটি গুরুট্রেনিং স্কুল এবং অনেকগুলি মাদ্রাসা ও মক্তব রহিয়াছে। জেলার উন্নতিকল্পে সরকার এবং জনসাধারণের উদ্যোগে বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে অবিলম্বে অধিকসংখ্যক হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন।*

(আগামীবারে সমাপ্য)

* প্রবন্ধে ব্যবহৃত আলোকচিত্রসমূহ কোচবিহার পপুলার ষ্টোর্স কর্ত্তৃক গৃহীত।

এখানে

শ্রীঅমলেন্দু দত্ত

এখানে কেবল ক্ষণভঙ্গুর কাচের সাজানো ঘর,
ম্লান কম্পিত ক্ষণেক জ্বালানো আশার দেয়ালী মালা;
ফসল-পোড়ানো মাটি এখানের বন্ধ্যা অনুর্ব্বর,
শেষ নেই তবু আগাছাগুলোর জন্ম নেবার পালা!
জীবন এখানে মন্থরগতি, প্রবাহ নাহিক তার,
বিচিত্রতার আভাস কোথাও খুঁজেই যে মেলা ভার—
তবু বাঁচিবার টানা-পোড়েনে তো দিনগুলো বয়ে যায়,
এতোটুকু নেই সময় কাহারো একতিল ভাববার!
আরো বিস্ময়: মোদের বুকের পাঁজর খসিয়ে কারা,
আমাদেরই হৃৎপিণ্ড-শোণিতে টকটকে লাল ইটে
গগনচুম্বী প্রাসাদ-শিখরে বিলাসে আত্মহারা,
আমরা কেহবা ছেড়ে দিয়ে আসি সাত পুরুষের ভিটে।
আবার কাহারো রাত কাটে হায় মুক্ত গগন তলে,
হয়তো বা কারো ঘরের চালের জোটে না দু'মুঠো খড়;
চিরদারিদ্র্য ভয়াল মুরতি, আগুন দু'চোখে জ্বলে—
আর সে দহনে পুড়ে গেল মন, দেহ হ'ল জরজর!
এখনো রয়েছে শাস্ত্রের ভয় মোক্ষ কামনা ঢের,
তেত্রিশ কোটি দেবতায় পূজি কাটে তো এখানে কাল,
আচারে বিচারে নিষ্ঠা প্রবল, বিধি মানে শাস্ত্রের,
ধর্ম্মেরে দূরে পরিহরি তাই পূজি তার কংকাল!
তবুও খানিক নবীন আশার আলোক এখানে চোখে,
ধূসর মরুভূ তার মাঝে যেন শ্যামলিমা ওয়েসিস;
মোদের দেবতা স্বর্গে নহে তো—এখানে মর্ত্ত্যলোকে,
সারা পৃথিবীর মানুষের মাঝে পাবো তাঁর স্নেহাশীষ!
এখানেও হ'ল সংগ্রাম সুরু দানবের সাথে এবে,
নূতন দিনের রাঙা সূর্য্যের আলোক-বন্যা আসে;
নবযাত্রার আয়োজন হেথা, মোটেই যদি না ভেবে,
জানি রথ তার দুর্গম পথও তরে যাবে অনায়াসে।

প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীঅচ্যুতনাথ রায় চৌধুরী

এই পাষাণপুরীর কারাগার হইতে অন্ততঃ একটি মাসের জন্ত মুক্তি পাইবে জানিয়া অমর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

এ স্থানে প্রথম আগমনের দিনের কথা অমরের স্পষ্ট মনে পড়ে। আম্বালা ট্রেনিং ক্যাম্পে শিক্ষা সমাপন করিয়া সেদিন মধ্যরাত্রে সে ডিমাপুর ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। রাত্রিটা কাটাইতে হইল রেষ্ট-ক্যাম্পে। ক্ষুধায় পেটে আগুন জ্বলিতেছে। রেষ্ট-ক্যাম্পের পাচক তাহার রেশন-টিন রুটি আর ডালে ভরিয়া দিল। কি পরিতৃপ্তির সহিত সেদিন সে সেই রুটি কয়খানা খাইয়াছিল!

১৯৪১ সালের মে মাস। মণিপুরের পথ ধরিয়া বর্ম্মা-প্রত্যাগত আশ্রয়প্রার্থীরা দলে দলে আসিয়া ডিমাপুরে জড়ো হইতেছে। বাঙালী, মারাঠী, মাদ্রাজী ভারতের সকল প্রদেশের সকল শ্রেণীর লোক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া এক বস্ত্রে স্ত্রীপুত্র-কন্যাসহ জন্মভূমির উদ্দেশে পদব্রজে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ আসিতে পারিয়াছে, কেহ পথের পাশে চিরবিশ্রাম লাভ করিতেছে। অমর আপিসের কাজ শেষ করিয়া ষ্টেশনের নিকট বেড়াইতে আসে। দূর হইতে সে এই হতভাগ্যদের পানে চাহিয়া থাকে।

এক মাদ্রাজী ভদ্রলোক তাঁহার দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিতে থাকেন। মান্দালয়ের এক ব্যাঙ্কে তাঁহারা আট জন একত্রে কাজ করিতেন। মান্দালয়ের পতনের পরে তাঁহারা ভারতভূমির দিকে রওনা হইলেন। দিন যায়, সপ্তাহ কাটে, মাস ফুরাইয়া আসে, পার্ব্বত্যভূমি শেষ হয় না। সঙ্গের খাদ্য-বস্তু ফুরাইয়া গেল। মাঝে মাঝে বহু মাইল ব্যবধানে আশ্রয়-প্রার্থীদের রাত্রিবাসের জন্য কয়েকটি চালা নির্ম্মিত হইয়াছে। এক দিন সন্ধ্যায় তাঁহারা একটি চালায় আশ্রয় লইলেন। পরিশ্রমে, বুভুক্ষায় সকলে কাতর। পরদিন প্রভাতে সবাই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু শ্রীনিবাসন্ আর ঘুম হইতে উঠিল না। সেই লোকালয়হীন পার্ব্বত্যভূমিতে একটি চালার নীচে শ্রীনিবাসনকে চিরনিদ্রায় শায়িত রাখিয়া বাকী সাত জন তাঁহাদের দুঃখের অভিযান আরম্ভ করিলেন। সেই সাত জনের মধ্যে আজ ডিমাপুরে মাত্র একজন আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

প্ল্যাটফর্ম্মের এক প্রান্তে একটি বাঙালী মহিলা সাহায্য-সমিতির একজন স্বেচ্ছাসেবককে আপনার দুঃখের বর্ণনা শুনাইতে থাকেন। উত্তরব্রহ্মের এক শহর হইতে অপর বহু ব্যক্তির সহিত টামুর পথে তিনি স্বামী, পুত্র এবং কোলের একটি মেয়ে লইয়া আসিতেছিলেন। দুধের অভাবে মেয়েটিকে পথেই ফেলিয়া আসিতে হয়। স্বামী অসুস্থ ছিলেন; তিনি পরিশ্রম এবং অনাহার সহ্য করিতে পারিলেন না। অবশেষে সঙ্গে ছিল শুধু তাঁহার উপযুক্ত পুত্র সত্যেন। টামু পৌঁছিবার কয়েক দিন পূর্ব্বে—মহিলাটি আর কিছুই বলিতে পারেন না। শ্রোতৃবর্গের চক্ষু সজল হইয়া উঠে।

একটি মাস অমর এই ভিড় দেখিয়া, এই কাহিনী শুনিয়া কাটাইল। তাহার পরে আসিল তাহার বদলির সংবাদ। কোহিমায় গিয়া তাহাকে কাজ করিতে হইবে।

নিশান্তে অমর যাত্রা করিল। কনভয় চলিয়াছে। এক-মুখো পথ। তখন এই পথ ছিল ছোট। ডিনামাইটের কাজ সবে আরম্ভ হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন ফটকে উত্তর এবং দক্ষিণগামী কনভয় পরস্পরকে অতিক্রম করিত। সেপথ এখন কত বিস্তৃত হইয়াছে। ডিনামাইট দিয়া পাহাড় ভাঙিয়া-চুরিয়া সেই সরু পথটি এখন আপনাকে তিন গুণ বিস্তৃত করিয়া পূর্ব্বসীমান্তের সরবরাহের বৃহত্তম পথে পরিণত হইয়াছে।

বর্ষাকাল। নাগাপাহাড়ে ঢল নামিয়াছে। বামে পর্ব্বত-মালা; সম্মুখে ক্রমোচ্চ পথটি পাহাড়ের গায়ে আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। বহুনিম্নে এক পর্ব্বত-নির্ঝরিণী উপলগুলিকে বেষ্টন করিয়া, কখনও আপন প্রবাহে তাহাদের ডুবাইয়া আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। দক্ষিণ এবং বাম হইতে বহু নির্ঝর তাহার বুকের উপর আসিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে। ঊর্দ্ধে চলিয়াছে মেঘের খেলা। দূরের নীলশৃঙ্গ-গুলিতে স্থানে স্থানে শুভ্র মেঘ লাগিয়া রহিয়াছে। কোহিমা পৌঁছিতে বেলা নয়টা বাজিয়া গেল।

এই কোহিমায় সে চারি বৎসর কাটাইয়াছে। কখনো মাও, ইম্ফল, প্যালেল অথবা টামুতে তাহাকে বদলি করিয়া দিয়াছে; আবার একটি মাস যাইতে না যাইতে কোহিমায় ফিরাইয়া আনিয়াছে। কোহিমার ইংরেজরা তাহাকে খুব পছন্দ করে। তাহার মধুর ব্যবহারে তাহারা অত্যন্ত প্রীত। তাই তাহাকে আর কোথাও বদলি করিলে তাহারা তাহাকে ফিরাইয়া আনে। ফিরিয়া আসিলে তাহাকে সিগারেট দেয়। কত প্রকার খাদ্যপূর্ণ টিনের কৌটা তাহাকে দিয়া যায়—বিস্কুট, ফল, মাখন, পনির, আরও কত কি। তাহারা চলিয়া গেলে অমরের মনে হয়, সে যেন এক তীর্থস্থানের ভিক্ষুক, যাত্রীরা অনুকম্পা-পরবশ হইয়া তাহার ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। ভিক্ষুক নহে ত কি? সারা সকাল পরিশ্রম করিয়া মধ্যাহ্নে যখন তাহারা মেসে ফিরিয়া যায়, কয়েকখানা রুটি এবং একটা তরকারি ছাড়া ত তাহাদের আর কিছুই দেওয়া হয় না।

তাহারা যে ভারতীয়। ইহাই ত আই-ও-আর'দের রেশন। কোনও দিন কোনো ভারতীয় অফিসার তাহাদের অতিথি হইলে উপরওয়ালাদের নিকট হইতে তাহারা বি-ও-আর'দের রেশন লইয়া আসে; একটু বেশী করিয়াই আনে। বহুদিন পরে মেসের লোকেরা সেদিন একটু ভালমন্দ খায়। যুদ্ধের কাজে যোগ দিবার দিনের কথা অমরের মনে পড়িয়া যায়। হেয়ার ষ্ট্রীটে একটি আপিসে দরখাস্তের কাগজপত্র আনিতে গিয়া অমর বিপরীত ফুটপাথ হইতে প্রার্থীদের ভিড়ের পানে তাকাইয়াছিল। কেমন করিয়া সে এই ভিড়ের মধ্যে পথ করিয়া তাহার নিজের জন্য একখানা কাগজ চাহিয়া আনিবে? দূরে ষ্ট্র্যাণ্ড রোড হইতে এক ভদ্রলোক ভারতবাসীদের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সাহায্য করিতে নিষেধ করিয়া বক্তৃতা করিতে করিতে সেদিকে আসিতেছিলেন। অমর তাঁহার পানে একবার তাকাইল, একবার সম্মুখের জনতার পানে চাহিল। আপিসের বাতায়নপথে তখন দরখাস্ত করিবার কাগজ বিলি হইতেছে। একদল ভিক্ষুক যেন একে অপরকে অতিক্রম করিয়া একটু করুণা আদায়ে ব্যস্ত। ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের ভদ্রলোকটি আপন বক্তব্য প্রচার করিতে করিতে ডালহাউসি স্কোয়ারের অপর প্রান্তে চলিয়া গেলেন। অমর সেদিন শুধু দূর হইতে তাকাইয়া চাতুরিপূর্ণ জনতার প্রতিদ্বন্দ্বিতাটুকু দেখিল। ইহার এক সপ্তাহ পরে একদিন প্রভাতে তাহার মেস হইতে সহপাঠী প্রতুলকে যেদিন পুলিসে ধরিয়া লইয়া গেল সেদিন অমর স্থির করিয়াছিল সে আর যাহাই করুক, যুদ্ধে যাইবে না। কলিকাতাতেই কিছু একটা যোগাড় করিয়া লইবে। কিন্তু আরও দুই মাস চেষ্টা করিয়া সে কিছুই সংগ্রহ করিতে পারিল না। দেশ হইতে মা পত্র দিলেন দুই দিন হইতে তিনি অনাহারে আছেন; অমরের বোনটিকে আগামী কল্য কি খাইতে দিবেন স্থির নাই। একটা প্রবল বন্যার অমরের সকল সঙ্কল্প সেদিন তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল।

এই চারি বৎসর পাষাণপুরীর কারাগারে থাকিয়া দেশের বিষয় কত কথাই সে শুনিয়াছে। একটা দুর্ভিক্ষ নাকি দেশে হইয়া গিয়াছে। বাড়ীতে এ সম্বন্ধে কত কথা সে লিখিয়াছে, কিন্তু কোনও সঠিক উত্তর পায় নাই। যে উত্তর আসিয়াছে সেন্সর আপিস হইতে তাহা এমন ভাবে কাটিয়া দিয়াছে যে অর্দ্ধেক কথা অমর বুঝিতে পারে নাই। বিশেষ কোনও সংবাদপত্রও তাহারা পায় না। যেদিন মন খারাপ হইয়া উঠে ডেপুটি কমিশনারের বাড়ীর পাশ দিয়া মাও-র পথ ধরিয়া অপরাহ্নে অমর হাঁটিতে আরম্ভ করে। গাড়ীর পর গাড়ী যাইতে থাকে, আসিতে থাকে। কি দ্রুত চলে এই গাড়ীগুলি। সেদিন তাহার সম্মুখে একখানা গাড়ী মোড় ঘুরিবার সময় হঠাৎ পাহাড়ের গা বাহিয়া একেবারে নীচে গিয়া পড়িল। অপর খানকয়েক গাড়ীর আরোহীরা গাড়ী থামাইয়া নীচে নামিয়া উক্ত গাড়ীর যাত্রীদের উদ্ধার মানসে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ড্রাইভারের মৃতদেহ বহু চেষ্টায় উপরে আনা হইল। বাকী যাত্রীদের অধিকাংশ মুমূর্ষু। তাহাদের মৃত্যুপাণ্ডুর মুখচ্ছবি আর সেই করুণ আর্ত্তনাদ কি অমর জীবনে কোনোদিন ভুলিতে পারিবে?

যেদিন অতিবৃষ্টিতে পাহাড়ে ধস নামে, এই সদ্যনির্ম্মিত পথের একাংশ মাটির মধ্যে বসিয়া যায়, মিলিটারি ইঞ্জিনিয়াররা সকল সরঞ্জাম লইয়া ছুটিয়া আসে, রাত্রে তাঁবুর মধ্যে বসিয়া অমর দেখে দূরে নাগাপাহাড়ের ব্যাপক প্লাবন, ঝড়ের প্রচণ্ড দাপট অবহেলা করিয়া আলো জ্বালিয়া পুরাদমে পথ-সংস্কারের কাজ চলিতেছে। নাগাশ্রমিকেরা সারা রাত্রি জাগিয়া মাটি বহিয়া আনিতেছে। সীমান্তের সরবরাহ যে-কোনো প্রকারে যে কোনো মূল্যে চালু রাখিতে হইবে। প্রভাতে উঠিয়া অমর দেখে সেই প্রকাণ্ড ফাটলকে মাটি দিয়া ভরিয়া ফেলিয়াছে। তাহার উপর প্রকাণ্ড লোহার জাল পাতিয়া নূতন পথ প্রস্তুত হইতেছে। দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে পুনরায় কনভয় চলিতে সুরু করে।

আর যেদিন সাইরেন বাজিয়া উঠে, দূরের মেঘমুক্ত আকাশ গতিশীল কৃষ্ণবিন্দুতে ভরিয়া যায়, পাইনবীথির নীচে ট্রেঞ্চের মধ্যে বসিয়া অমর ঐ কৃষ্ণবিন্দুগুলির পানে তাকায়—একটা, দুইটা, তিনটা, দশটা, কুড়িটা—সমস্ত আকাশ কৃষ্ণবিন্দুতে ভরিয়া গিয়াছে। ঘর্ঘরশব্দে কানে যেন তালা লাগে। তাহারা কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়; অল-ক্লিয়ার বাজিয়া উঠে। পরের দিন অমর পরম্পরায় শুনিতে পায় অভিযানকারীরা ইম্ফলের উপকণ্ঠে এরোড্রোমে বোমা বর্ষণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে; আর কোথাও কিছু করে নাই। তাহার সহকর্ম্মী বিহারী ভদ্রলোকটি তাহাকে গোপনে ডাকিয়া একখানা কাগজ দেখান—একখানা রঙিন ছবি। এক ইংরেজ-দম্পতি ভোজে বসিয়াছে; টেবিলের উপর বিবিধ খাদ্যদ্রব্য সাজানো, অদূরে একটি ভারতবাসী বুভুক্ষু দৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিয়া আছে। বিহারী ভদ্রলোকটি অমরকে দেখাইয়াই ছবিখানি জামার ভিতরের পকেটে লুকাইয়া ফেলেন। গতকল্য এ রকম অনেক ছবি নাকি উপর হইতে ছড়াইয়া গিয়াছে।

মধ্যাহ্নে খানকয়েক রুটি এবং অর্দ্ধসিদ্ধ কলায়ের ডাল গলাধঃকরণ করিতে করিতে অমরের সেই ছবিখানির কথা মনে পড়িয়া যায়।

চারিটি বৎসর সে ত এখানে এইভাবে কাটাইয়াছে। এই যুদ্ধ তাহাকে সাহেব সাজাইয়াছে, তাহার শূন্য পকেট পূর্ণ করিয়াছে, তাহার মাতা ও ভগিনীর অনশন নিবারণ করিয়াছে। চারিটি বৎসরের পরে সে দেশে ফিরিয়া যাইবে,

তাহার মায়ের কাছে, তাহার মায়ের কোলে। একটা মুক্তির আনন্দে অমরের মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

অমর প্রত্যূষে জাহাজ হইতে তারপাশা ষ্টেশনে নামিল। ভিড় এড়াইয়া একখানা নৌকা ঠিক করিয়া সে বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

পদ্মা পূর্ব্বের মত বহিয়া চলিয়াছে। দূরে একখানা সৈন্যবাহী জাহাজ জল তোলপাড় করিয়া চাঁদপুরের দিকে চলিয়া গেল। নৌকা একটি খালে প্রবেশ করিল।

অমরের কাছে সকলই নূতন, সকলই মধুর বোধ হইতে লাগিল। দুই তীরের জনপদ বনভূমি স্নিগ্ধ ছায়া, ভরা নদী, দূরের ভাসমান ঐ বিসর্জ্জিত প্রতিমাখানি, সকলই তাহার নিকট এক স্বপ্নময় দেশের বস্তু বলিয়া মনে হইতে লাগিল। দূরে ও কোন্ ঠাকুর বিসর্জ্জন দিয়া গিয়াছে? বিদেশে থাকিয়া থাকিয়া সে দেশের সকল কথা ভুলিতে বসিয়াছে।

ও কোন্ ঠাকুরের প্রতিমা বলতে পার মাঝি? ঐ যে ভাসছে, রঙ ধুয়ে গেছে, খড়িমাটি এখনো মোছে নি।

মাঝি কিছুক্ষণ তাকাইয়া কহিল, "ওটা প্রতিমা নয় কর্ত্তা, ওটা মড়া।"

মড়া!

এটা সাধনপুর গ্রাম। সাধনপুরে খুব মড়ক লেগেছে। কেউ হয়ত পোড়াতে পারে নি, জলে ফেলে দিয়েছে।

অমরের প্রতিমা তখন অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। জলের উপর উপুড় হইয়া তাহা ভাসিতেছে; সকল শরীর শাদা হইয়া গিয়াছে; মস্তকে কেশের কোনও চিহ্ন নাই। কোনও নিপুণ শিল্পী চক্ষুদান করিবার পূর্ব্বে যেন প্রতিমাখানি বিসর্জ্জন দিয়া গিয়াছে।

ঐ যে মাঝি আর একটা, ঐ যে আরও একটা। কত লোক মরেছে এখানে?

এই বাঁকটা পেরিয়ে গেলে আর এ সব থাকবে না কর্ত্তা; আর সামান্য একটু পথ। আপনি ভিতরে গিয়ে বসুন।

মাঝির ক্ষিপ্র চালনায় নৌকা দ্রুত ছুটিতে লাগিল। অমর নৌকার ছইয়ে হেলান দিয়া অপস্রিয়মাণ শবগুলির পানে চাহিয়া রহিল।

সম্মুখের বাঁকে কয়েকটি ধীবর মাছ ধরিতেছিল। মাছ বিশেষ কিছুই উঠিতেছিল না। মাঝে মাঝে তাহারা জাল হইতে গোলাকার শ্বেত পদার্থবিশেষ বাছিয়া ফেলিতেছিল। অমর জিজ্ঞাসা করিল "ওগুলি কি জিনিষ মাঝি?"

ওগুলি মানুষের মাথা, কর্ত্তা। তেসরা সালে দুর্ভিক্ষে অনেক লোক মরেছিল। এখনও জাল ফেললে এদিকে অনেক সময় মড়ার মাথা ওঠে।

কত লোক মরেছিল?

তার কি লেখাজোখা আছে? না খেয়ে, অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে, জ্বরে, মহামারীতে দেশ উজাড় হয়ে গিয়েছিল। আপনি যেখানে থাকেন সেখানে এ সব হয় নি?

অমরের গ্রামখানি দূর হইতে দেখা যাইতেছে একটি নীল রেখার মত। আর খানিকটা পরেই সে গ্রামের উপকণ্ঠে গিয়া পৌঁছিবে। প্রভাত-কিরণে দুই পাশের ধান ও পাটের ক্ষেতে মৃদু হিল্লোল খেলিয়া যাইতেছে। নৌকার গলুইয়ে তরঙ্গাঘাতে ছল্ ছল্ শব্দ হইতেছে। প্রকৃতি যেন একটা আনন্দোৎসবে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই শান্তিময় উৎসবে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিতে অমর উৎসাহে অধীর হইয়া উঠিল; কিন্তু সাধনপুরের বাঁকে যে কাহিনী তাহার সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার অব্যক্ত বেদনা পরমুহূর্ত্তে তাহার সারা মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। ধীবর দুইটিকে তখন দিগন্ত রেখায় দুইটি কৃষ্ণবিন্দুর মত দেখা যাইতেছে।

গ্রামে কঙ্কালসার মানুষের জনতা দেখিয়া, ফুড কমিটির সম্মুখে তাহাদের কলহ-কোলাহল শুনিয়া অমরের ছুটিটা কাটিতে লাগিল। আরও একটা কথা অমর শুনিয়াছে। তাহারা আসিতেছে। নাগাপাহাড়ের অপর প্রান্তে ব্রহ্মের উত্তর-সীমান্তে তাহারা সুযোগের প্রতীক্ষায় আছে। সময় হইলেই তাহারা আসিবে। তাহারা আসিবে সেই পথ দিয়া যে পথে হতভাগ্যের দল সকল সম্পদ পিছনে রাখিয়া বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে প্রিয়জনদের হারাইতে হারাইতে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া ডিমাপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। তাহাদের কথা আলোচনা করিতে করিতে এই কঙ্কালসার জনতা বুভুক্ষা ভুলিয়া যায়। তাহাদের চক্ষু আশায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

ডাক আসিবার সময়টিতে পোষ্ট-আপিসের সম্মুখে একটু ভিড় জমিয়া উঠে নূতন সংবাদের প্রতীক্ষায়। সেদিন খবর আসিল ক্যালেওয়ার উত্তরে এক পার্ব্বত্য নদী পার হইয়া শত্রু-সৈন্য টামুর পথে আসিতেছে। সেদিন অমরও একখানা টেলিগ্রাম পাইল। তাহার বাকি ছুটিটুকু নাকচ হইয়াছে। অবিলম্বে তাহাকে কর্ম্মে যোগ দিতে হইবে।

অমর রওনা হইল।

নাগাপাহাড়ে আবার ঢল নামিয়াছে। গিরি-নির্ঝরিণীগুলি সফেন নৃত্যে ছুটিয়া চলিয়াছে। দক্ষিণ হইতে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ আসিয়া সমগ্র কোহিমা ঢাকিয়া ফেলে; কুয়াশায় পথের রেখা অদৃশ্য হইয়া যায়।

শত্রু-সৈন্য উখরুল অধিকার করিল। বৃষ্টি বাড়িয়া চলিল। সেদিন রাত্রে কি ভীষণ ঝড়; কি অশ্রান্ত বর্ষণ! নিবিড় অন্ধকারে তাঁবুর মধ্যে শুইয়া শুইয়া অমরের মনে হইতে লাগিল আগামী প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইলে বুঝি এই কোহিমাকে আর কেহ দেখিতে পাইবে না; এই অশ্রান্ত প্লাবনে সকল কিছু ধুইয়া মুছিয়া বুঝি একাকার হইয়া যাইবে।

পরের দিন ইম্ফল হইতে ডাক আসিল না। এই দুর্য্যোগের সুযোগ লইয়া তাহারা কাংলাটঙ্গির নিকট একটি পোল হাত-বোমা দিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। ইম্ফল চতুর্দ্দিক হইতে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে। অমরদের আপিসের লাল টুপি পরা সাহেবটির মুখ আজ অত্যন্ত গম্ভীর। তাহার হাসির মধ্যে সেই স্বচ্ছন্দ আনন্দটুকু নাই। যাইবার সময় বলিয়া গেল, ভয় করিও না বাবু। দুই দিনের মধ্যে আমরা এই জাপানী ইঁদুরগুলিকে খেদাইয়া দিব।

সাহেব চলিয়া গেলে বিহারী ভদ্রলোকটি অমরের কাছে আসিলেন। তাহার কানে কানে বলিলেন, "ইঁদুর নয়, বাঘ; জাপানী নয় একেবারে খাঁটি দেশী—বাঙালী, পঞ্জাবী, মারাঠী, মাদ্রাজী, সব রকমের।

অমর শুধু একটু হাসে। তাহার মন চলিয়া যায় দূরে, বহু দূরে, কোহিমার এই পর্ব্বতশ্রেণী পার হইয়া, মাওর উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া, ইম্ফলের শালভূমি পিছনে রাখিয়া নাগাপাহাড়ের শেষ প্রান্তের জনপদগুলিতে। সেখানকার মৃত্তিকা তাহাদের পদচিহ্নে ধন্য হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু ইঁদুরের উৎপাতে মাওর পথটিও এক দিন বন্ধ হইয়া গেল। ভারতীয় কর্ম্মচারীদের সরাইয়া ডিমাপুরে লইয়া আসা হইল। সেদিন অমরের কি আনন্দ। তাহারা আসিতেছে। চিরনিদ্রায় শায়িত শ্রীনিবাসন্ এবং সত্যেনকে সান্ত্বনার বাণী শুনাইয়া দেশের কঙ্কালসার হতভাগ্যদের আশার বাণী শুনাইতে তাহারা আসিতেছে। সেই বিজয়ী দলের অগ্রদূত রূপে সে এই শুভ সংবাদ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার মন আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল।

ডিমাপুরে আসিয়া অমরের বিশেষ কোনও কাজ নাই। মণিপুর রোডের দুই পার্শ্বে বিভিন্ন বিভাগের শিবির পড়িয়াছে। দূরে পুরাকালে যেখানে হিড়িম্বা রাক্ষসীর ডেরা ছিল, একদল সৈন্য সেখানেও শিবির স্থাপন করিয়াছে। সর্ব্বত্র একটা থমথমে ভাব। এই বুঝি তাহারা আসিয়া পড়িল।

অপরাহ্ণে মিলিটারি পুলিস গোপনে প্রত্যেককে সঙ্কেতশব্দ জানাইয়া গেল। তাহারা অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের কয়েকজন গুপ্তচরও নাকি ধরা পড়িয়াছে। যে-কোনো সময় তাহারা অদূরের পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া ডিমাপুর আক্রমণ করিতে পারে। মিলিটারি পুলিস পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে এই সঙ্কেতশব্দটি বলিতে হইবে।

মণিপুর রোড দিয়া ট্যাঙ্কের শ্রেণী চলিয়াছে। তাহাদের চক্রঘর্ষণে নৈশ আকাশ মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। সরবরাহ লইয়া কনভয় চলিয়াছে।" কিন্তু একটি গাড়ীও ত ফিরিয়া আসিতেছে না।

ডেপুটি কমিশনারের বাংলা তাহারা অধিকার করিয়াছে। সমগ্র পার্ব্বত্য পথে তাহারা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রাত্রি প্রভাত হইলে বুঝি ডিমাপুরের মৃত্তিকাও সগর্ব্বে তাহাদের পদচিহ্ন ধারণ করিবে। ব্যাকুল প্রতীক্ষায় অমর সারা রাত্রি বিনিদ্র যাপন করিল।

পূর্ব্বাকাশ রক্তিম হইয়া উঠিল। দূরের বনভূমি স্পষ্টতর হইল। কোন পাখীর ডাক শোনা যায় না। সমরায়োজনের প্রথম পর্ব্বে পক্ষিকুল এই বনভূমি ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল।

কর্ণেল সাহেব আসিয়া জানাইলেন কোহিমা পর্য্যন্ত পথটুকু নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছে; সমগ্র নাগাপাহাড়ও বিপদমুক্ত হইবে। শীঘ্র তাহাদের রওনা হইতে হইবে। আর কোনও ভয় নাই। সকলের সঙ্গে অমরও সাহেবের কথাগুলি শুনিল।

দিন দুই পরে তাহাদের কনভয় যাত্রা করিল। প্রভাতপবনে মাঝে মাঝে কোথা হইতে গলিত শবের পূতিগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। ঘাসপানি, জুবজা, পিফিমা পার হইয়া কনভয় কোহিমার উপকণ্ঠে আসিয়া পৌঁছিল—এখানে তাহাদের নূতন তাঁবু খাটান হইয়াছে।

অমর কয়েকটি বাঁক পার হইয়া তেমাথার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দক্ষিণে ডেপুটি কমিশনারের বাড়ীর কোনও চিহ্ন আর নাই; তাহা এখন সমাধিক্ষেত্রে পরিণত। বামে ডাকবাংলোটির দেয়ালগুলি ধ্বংস হইয়াছে। অর্দ্ধদগ্ধ কাঠামোর উপরে টিনগুলি কোন প্রকারে আটকাইয়া আছে। আর অদূরে পাহাড়ের নীচে টেকনিক্যাল স্কুলের ধারে যে অসামরিক পোষ্ট-আপিসটি ছিল তাহা শুধু একটি ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। সমগ্র কোহিমা ভস্মীভূত। সম্মুখে জেলপাহাড়ের গায়ের পাইন গাছগুলিও প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষণে পুড়িয়া ঝলসিয়া গিয়াছে; শুধু তাহাদের অর্দ্ধদগ্ধ গুঁড়িগুলি এই ধ্বংসলীলার সাক্ষ্যস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে।

বিহারী ভদ্রলোকটি অমরের পিছু পিছু আসিয়া কখন তাহার পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, "কি দেখছেন বাবুজি?"

"তারা এসেছিল, তারা চলে গেছে", অমর উত্তর দিল।

"তারা এমনই এসে থাকে বাবুজি", বিহারী ভদ্রলোকটি কহিলেন। "তাদের অভিযান এই ত প্রথম নয়। দেশে অন্যায়ের প্রাদুর্ভাব হলে তারা আসে। আমাদের ধর্ম্ম আমাদের একথা বলে আর আমরা তাই বিশ্বাস করি।"

অমরের মন তখন চলিয়া গিয়াছে বহুদূরে নাগাপাহাড় অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মদেশের গিরিনির্ঝরিণীর কূলে কূলে সেই বীরদের কাছে। শত কাকুতি, শত আকুতি লইয়া সে তাহাদের জানাইতেছে—তোমরা আসিও বীরেরা, আবার আসিও। তোমরা আসিও এই অন্ধকার দেশে আলোর বর্ত্তিকা লইয়া।

তোমাদের পথ চাহিয়া মুমূর্ষু জনতা তিমির-রজনী যাপন করিতেছে। তোমাদের কথা স্মরণ করিয়া আজিও তাহাদের করিষ্ণু দৃষ্টি আশার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। তোমরা আসিও তাহাদের জন্ত অনন্ত আশার বাণী লইয়া। তোমাদের চরণপাতে এদেশের মৃত্তিকা আবার পুণ্যময় হইবে; অন্ধকার পূর্ব্বাশা রক্তিম হইয়া উঠিবে।...

কোহিমা আজ শান্ত। মেঘমুক্ত আকাশ হইতে অজস্র কিরণমালা কোহিমায় ছড়াইয়া পড়িতেছে। অময় দূরের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বিহারী ভদ্রলোকটিও অময়ের সঙ্গে দূরের পানে চাহিয়া রহিলেন।

প্রশ্ন

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

১

জাগিছে প্রশ্ন—ঘন কালো মেঘে আবরিল কেন দিক?
কেন হতাশায় হৃদি ভরে যায়, বিফল সাধনা সব?
স্বপন রহিল স্বপনেতে ঢাকা, সুর-বাঁশরী নীরব,
ব্যর্থ ব্যথায় সেদিনের আশ চেয়ে থাকে অনিমিখ।
বীরের দর্প শূন্তে মিলায় বিলায় গর্ব্ব ফাঁকা,
জাগিয়া দানব নাচে তাণ্ডব নির্ম্মম আসুরিক,
মন্থনে শুধু ওঠে হলাহল, তারি সবে মাগে ভিখ,
অমৃতের আশা—এ যেন ক্ষণিক জলেতে লিখন আঁকা।
দেবালয়ে আজ কেহ আসিয়াছে? পূজার পূজারী কই?
আলিপন কেহ আঁকে অঙ্গনে? ফুল কি ফুটিল গাছে?
শঙ্খ বাজিলে শুনেছ কাহার অন্তর নাচিয়াছে?
সত্য-শিবের সাধনা করে কি শুভ সুন্দর মন?
তারি সঙ্গীতে ভরে কি আজিকে আকাশের কোনো কোণ?
কোথা হতে কোথা নিয়ে এলে আজি মুগ্ধা ছলনাময়ী?

২

এ যেন উষর মরুর প্রান্তে বন্ধ্যার হাহাকার
জাগিয়া বেড়ায়, শুনেছ কি তাহা শুনেছ পাতিয়া কান?
ধরণীর শ্যাম কুঞ্জ-কাননে চলে তারি অভিযান,
ত্বরিত পক্ষ মেলিয়া পলায় সচকিত মেঘভার।
দেবতার সাজে এ কে আসিয়াছে হাতে লয়ে তার দান—
তপ্ত-শোণিত-লালসায়-ভরা কামনা সে বাঁচিবার।
রৌদ্র-দগ্ধ উষ্ণ-শ্বাসে ধূসরিত বালুকার
নিস্ফল ক্রোধে এ যেন ভীষণা প্রেতিনীর অভিমান।
এ মহাশ্মশানে শবাসন আছে, কোথা সন্ন্যাসী কই?
ধূ ধূ প্রান্তরে মরীচিকাসম এ কাহার আহ্বান
মানুষের দ্বারে গাহে বারে বারে আলেয়ার জয় গান?
হিংসায় ক্রূর দ্বেষ-জর্জ্জর শয়তান হলো জয়ী,
গৃধ্নু নরের কঙ্কাল যত তারি পিছে ধাবমান।
কোথা হতে কোথা নিয়ে এলে আজি মুগ্ধা ছলনাময়ী?

৩

আজো দেখিলাম তমাল-শীর্ষে প্রভাতে সোনালী মেলা;
হাস্ত-মুখর শিশুর কণ্ঠে দেবতা গাহিল গান,
মাতার বক্ষে পীযূষ-ধারায় নেমে আসে ভগবান,
প্রিয়ার হাসিতে অশ্রুরাশিতে অভিমান-ভরা খেলা
কণ্টকে-ঘেরা সংসার-মাঝে উজলিয়া তোলে পথ।
মায়া-স্বপ্ন সম এ কি সব মিছে, সকলি চাতুরি ছল,
তরল-গরলে অহমিকা শুধু মেলিয়া রহিবে দল?
অন্ধ-কারায় গুমরিবে এই ধরার ভবিষ্যৎ?
মানুষের মাঝে মানুষেরে খোঁজে কোথায় তাহারা কই?
অমৃত-পিয়াসী বাসনায় রাঙা কই সে সাধনা আর?
মঞ্জুল-বনে ফিরিবে না ফিরে অলিরা বারম্বার?
মুখরিয়া দিক গাহিবে না পিক, চিত্ত যে সংশয়ী!
পাষাণ-কারায় মিছে করাঘাত, খুলিবে না বুঝি দ্বার!
কোথা হতে কোথা নিয়ে এলে আজি মুগ্ধা ছলনাময়ী?

৪

মানুষে মানুষ বেসেছিল ভালো, করেছে আলিঙ্গন,
সে কথা ভাবিতে ভরে ওঠে মন, আশা চেয়ে রয় পথে,
ভবনে ভবনে সুরলোক পুন নামিবে স্বর্ণ-রথে,
তারি ভরসায় নিশি-তারকায় খুঁজিছু শুভক্ষণ।
আসে নাই প্রিয়। ঝঞ্ঝা ঘনায়, সমীরণে ওঠে শ্বাস,
চরণ বাড়ায়ে মানুষের পিছে নগরাজ এলো ধেয়ে,
শকুন-শিশুর কোলাহলে তাই আকাশ ফেলিল ছেয়ে,
পক্ষ-পাথার সন্তরি ওঠে এ কিসের উচ্ছ্বাস!
অঞ্জলি ভরা হৃদয়ের সাড়া তবুও মিলিল কই?
শ্মশান-শিবায় কহে ইসারায় পৃথিবীর উৎসবে—
চিতার আগুনে বুকের আগুন জ্বালিয়া লইতে হবে,
মানুষের গৃহ পুড়ে হবে ছাই, তবে ত মানুষ-জয়ী,
মহৎ উদার সব কামনার নির্ব্বাণ সেথা লভে!
আকাশ-পথের যাত্রী কোথায় চলেছে ছলনাময়ী!

আলোচনা

"নিম্নবঙ্গের দুইটি আদিম দেবতা"

শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল

গত আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্তের 'নিম্নবঙ্গের দুইটি আদিম দেবতা' শীর্ষক প্রবন্ধ সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। অন্যতর দেবতা 'বারাঠাকুরে'র আলোচনাপ্রসঙ্গে কালিদাসবাবু লিখিয়াছেন—"বর্ত্তমানে ঐ দেবতাটিকে লোকে দক্ষিণরায় নামেও অভিহিত করে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে দক্ষিণরায়ের সহিত উঁহার কোন সংস্রব নাই। কারণ দক্ষিণরায় হইলে একই আকারে নির্ম্মিত উঁহার দুইটি মূর্ত্তি এবং বিভিন্ন বারা নাম থাকিত না। এতদ্ভিন্ন উঁহা যদি দক্ষিণরায়রূপে সুন্দরবনের দেবতা হইবে তাহা হইলে উঁহার অনুরূপ দেবতা অন্যান্য দেশে থাকিবে কেন?"

দক্ষিণরায়ের সহিত বারাঠাকুরের পার্থক্য দেখাইতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"ঐ মূর্ত্তিগুলি (দক্ষিণরায়ের) একাকী এবং উঁহাদের হস্তে কোথাও তরবারি ও বন্দুক, আবার কোথাও তীরধনুক আছে।"

নিছক এই যুক্তিতে দক্ষিণরায় হইতে 'বারাঠাকুর'কে পৃথক করা চলিবে না। চব্বিশ পরগণার বসিরহাট হইতে আট মাইল দূরে ভেবিয়া গ্রামে দক্ষিণরায়ের মন্দির আছে। উহার অভ্যন্তরে দুইটি দণ্ডায়মান নরমূর্ত্তি দক্ষিণরায় ও কালুরায় রূপে পূজিত। এখানে পূজার কিছু বিশেষত্ব আছে। স্থানীয় "দে" উপাধিধারী কায়স্থগণই ইহার পূজারী। বিবাহিত পুরুষ ছাড়া আর কাহারও পূজাধিকার নাই। মন্দির-দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত রাখিতে হয়, যেহেতু প্রচলিত সংস্কার এই যে, দক্ষিণরায় রাত্রে ব্যাঘ্রে আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে বিচরণ করেন। মূর্ত্তি দুইটি আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া ইহার পূজারীগণ দাবি করেন।

পক্ষান্তরে একটি মাত্র মুণ্ড বারাঠাকুররূপে নিম্নবঙ্গের বহু স্থানে পূজিত হইতে দেখা যায়। ইহা 'দক্ষিণদারের বারা' এবং 'রায়ের বারা' নামেও পরিচিত।

রায়মঙ্গল ছাড়া কবিকঙ্কণ চণ্ডী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ), শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী-সম্পাদিত বলরাম কবি-শেখরের কালিকামঙ্গল প্রভৃতি প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্যেও 'বারা' শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। চিন্তাহরণবাবু 'বারা' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'ঘট'। কাহারও কাহারও মতে 'বারা' শব্দের অর্থ—চারিদিক বেষ্টিত ঈষৎ উচ্চ বেদী। 'বার' শব্দের সহিত ইহা সংপৃক্ত। 'বার' শব্দ প্রাচীন বাংলায় প্রচুর পাওয়া যায়—অর্থ সভা। এই শেষোক্ত মতই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। কোথাও কোথাও পূজাস্থল খেজুরপাতা দিয়া ঘিরিয়া 'বারাঠাকুরে'র পূজা করা হয়, কালিদাসবাবুও একথা বলিয়াছেন।

'দক্ষিণদার' (বারাঠাকুরের অপর নাম) অপেক্ষা 'দক্ষিণরায়' বা 'দক্ষিণেশ্বর'ই বারাঠাকুর যে দক্ষিণদেশের রক্ষক, সেই অর্থ বেশী দ্যোতনা করে। রায়মঙ্গলের কবি কৃষ্ণরাম একাধিক বার ইঁহাকে 'দক্ষিণের রায়' অর্থাৎ দক্ষিণদেশের রাজা বলিয়াছেন।

'বারাঠাকুর' বা দক্ষিণরায় কোথাও শিবের ধ্যানে, কোথাও বা গণেশের ধ্যানে পূজিত হন। কোথাও কোথাও আবার নিম্নে প্রদত্ত বাংলা ছড়া আবৃত্তি করিয়া তাঁহার পূজা হয়।

> "চন্দ্রবদন চন্দ্রকায়
> শার্দ্দূলবাহন দক্ষিণরায়।
> ঢাল তরোয়াল টাঙ্গি হস্তে
> দক্ষিণরায় নমোঽস্তুতে॥"

কৃষ্ণরামদাস, কবিকিঙ্কর নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির 'রায়মঙ্গলের পুঁথি' এই প্রসঙ্গে কর্ত্তব্য।

অপর দেবতা 'বাবাঠাকুর' সম্পর্কে কালিদাসবাবু লিখিয়াছেন —"উঁহার পূজারী ব্রাহ্মণ উঁহাকেও শিবের পুত্র বলিয়া পরিচয় দেন এবং পঞ্চানন্দ নামে অভিহিত করেন।" ইহা সত্য, কিন্তু পঞ্চানন্দের বিভিন্ন মূর্ত্তি আছে। চব্বিশ পরগণায় বাবাঠাকুরের পাশেই তাঁহাকে অশ্বারূঢ় অবস্থায় দেখিতেছি। তাঁহার প্রণাম-মন্ত্রও তাই—"তুরঙ্গবাহন দেব পঞ্চানন্দ নমোঽস্তুতে" সর্ব্বত্রই তাঁর পায়ে খড়ম। মেদিনীপুরে ঘাটাল মহকুমায় তাঁর কেবল মুণ্ডই মাত্র; মাথায় উষ্ণীষ। কলিকাতায়ও প্রায় অনুরূপ মূর্ত্তি আছে। বারাঠাকুরের নীচে 'পেঁচো' এবং দুই পাশে বষু ও টক্কার নামে তিনটি অসুরাকৃতি মূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। ধ্যানে ইঁহাকে "ব্যাধিমায়ীশ্বরং দেবং" বলা হইয়াছে। রূপরাম চক্রবর্ত্তীর (সপ্তদশ শতক) 'ধর্ম্মমঙ্গলে' পঞ্চানন্দের উল্লেখ আছে। 'পঞ্চাননমঙ্গলে'র কয়েকখানি পুঁথিও পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ ইঁহাকে উপদেবতা বলিয়াও মনে করেন। গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় দক্ষিণরায়ের আলোচনাপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা নীলিমা মণ্ডল মুণ্ডপূজার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

বাংলার তথা ভারতের লৌকিক দেবতাদের সম্বন্ধে সার্থক আলোচনা করিতে গেলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা আবশ্যক।

ভারতীয় চিত্রকলায় অতি আধুনিকতা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

ভারতীয় চিত্রকলার আদি যুগ থেকে আজও পর্য্যন্ত মানুষ তাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে আসছে। যুগে যুগে নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়েও তার নিদর্শন আমরা পাই—অজন্তার রূপকর্ম্মে, বৌদ্ধ, রাজপুত, মোগল প্রভৃতি চিত্র-শৈলীতে। অবশ্য মোগল আমলের চিত্রের চেয়ে অজন্তার প্রাণবান চিত্রের ভাবসমৃদ্ধিই চক্ষে ধরা পড়ে বেশী। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই সব মহান্ শিল্পীদের নামধাম আমাদের কিছুই জানা নেই। কিন্তু বর্ত্তমান সভ্যতার হাটে অতিআধুনিক শিল্পীদের নামের বহুল প্রচার রীতিমত একটা ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিদেশী চিত্রকলার আওতায় এসে দেশীয় চিত্রকলার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। দেশীয় ভাষাকে বর্জ্জন করে সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি করা যায় না। যদি তা হ'ত তো রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তিও প্রতিভাশূন্য হয়ে পড়তেন। আধুনিক সমালোচকের মুখে একটা কথা শুনতে পাই যে, বিদেশী আঙ্গিকের সঙ্গে এদেশের চিত্রকলার কোন তুলনাই হয় না। তাদের মতে আর্ট নাকি শিল্পীর টেকনিকের উপরই নির্ভর করে—তা পাশ্চাত্যের হোক আর প্রাচ্যের হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। সেই জন্য দেশ আজ অতি আধুনিক নিকৃষ্ট চিত্রের বন্যায় ভেসে যেতে বসেছে। এটা জাতির দুর্ভাগ্য বললে অত্যুক্তি হয় না।

তবে একথা বলা আবশ্যক যে, বিদেশী শিল্পের অনুকরণকেই এত দিন আমরা সার করেছিলাম। সেই মোহগ্রস্ত অবস্থা হয়ত আমাদের কাটত না, যদি না অবনীন্দ্রনাথ এসে ভারত-শিল্পের বিরাট মহিমা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে তুলতেন। তিনিই প্রথম দেশীয় শিল্পকলার একটা বিশিষ্ট স্থান দেখিয়েছেন। অথচ এককালে তাঁর চিত্রকলার জন্য কত অবমাননাই না তাঁকে সইতে হয়েছিল! ধীরে ধীরে ঐকান্তিক সাধনার ফলে রূপের মাধ্যমে অরূপকে প্রকাশ করাই হয়ে দাঁড়াল ভারত-শিল্পের প্রাণ! আজ তাঁরই গুণগ্রাহী শিষ্যেরা সে শিল্পের স্থান দিয়েছেন আধুনিক ভাবধারার মধ্য দিয়ে। ভারতীয় চিত্র-কলায় পূর্ব্বে বিশিষ্ট টেকনিকের কোন নামগন্ধ পাওয়া যায় না। শুধু রেখা-বিবর্জ্জিত সুষ্ঠু গঠনপ্রণালীর উপর নির্ভর করে চিত্ররচনা করা হ'ত। তাঁদের চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যের স্বাভাবিক রূপধর্ম্মই আমাদের আকৃষ্ট করে।

ইউরোপ একদিন শিখিয়েছিল, প্রকৃতিকে হুবহু নকল করাই আর্ট। আবার একালের Pablo, Picasso প্রভৃতি শিল্পীরা দেখাচ্ছেন যে, প্রকৃতিকে যত প্রকারে বিকৃত করা যায় সেইটাই হ'ল যথার্থ আর্ট। এক সময় ইউরোপীয়েরা নিজেদের ভারগ্রস্ত শিল্পীজীবনকে ত্যাগ করে কিছুকাল পূর্ব্বে নিগ্রো চিত্রকলার পক্ষপাতী হয়ে পড়ে। ফলে মাতিস্ প্রভৃতি শিল্পীদের চিত্ররচনায় আশ্চর্য্য সৃষ্টি সম্ভব করেছে। এ যুগে Black and white প্রভৃতিতে রেখা অঙ্কনের সহজ ব্যাপ্তি ঘটেছে। আজকের দিনে এর কদর এত বেশী যে, বর্ণাঙ্কিত চিত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অবশ্য আমরা দেখতে পাই যে চৈনিক শিল্পের মধ্যে এই ভাবটা পরিস্ফুট। তাদের চিত্রকলায় বর্ণের কোন সংস্রব নেই বললেই চলে। দেশীয় প্রথায় চিত্রকলায় নূতন নূতন অধ্যায় তারা রচনা করতে পেরেছে। সেইজন্য চৈনিক শিল্পকে বর্ত্তমান শিল্পকলার মধ্যমণি বলা হয়।

প্রত্যেক দেশ যেমন নিজস্ব ভাবধারার ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে তেমনি ভাবে আমাদের দেশের শিল্পীরা যদি দেশের ঐতিহ্য মেনে নিয়ে আধুনিক শিল্পকলা সৃষ্টি করতে পারেন সেইটাই ভারতীয় চিত্রকলার রূপান্তর বলে গণ্য হবে। জাপানে এক সময় এই ভাবটা প্রকাশ পেয়েছিল। বিদেশী আর্টের হাত থেকে দেশের শিল্পকলাকে উদ্ধার করেছিলেন কাউণ্ট ওকাকুরা, হিরোসিগে, হকুসাই প্রভৃতি শিল্পীরা। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের দেশে স্বদেশীয় শিল্পের কোন মূল্য নেই। আছে বিদেশী আর্টের মূল্য। সেই আর্ট যে কি চীজ্ তা উপলব্ধি না করে আর্ট বলতেই আমরা অজ্ঞান! আসল কথা হচ্ছে আমাদের দেশে আর্টগ্যালারীর বড়ই অভাব। যা আছে তাও মোটেই আশানুরূপ নয়।

অনেকে মনে করেন, আর্ট হচ্ছে ধনী লোকের বিলাস। বর্ণের আভিজাত্য যখন নারীর দেহসৌষ্ঠবকে বৃদ্ধি করে তখনই তাঁদের চিত্রসৃষ্টি সার্থক হয়। অথচ ভারতীয় চিত্রশৈলীর নিগূঢ় বর্ণপ্রয়োগ বা রেখার Sympathy তাঁদের মত অতি আধুনিকের কাছে স্থান পায় না। তাঁরা নাকি শিল্প জগতের হোমরা-চোমরা হয়েও এদেশের কলালক্ষ্মীর ত্যাজ্যপুত্র! বিদেশী চিত্রকলার অনুসরণ কতখানি হীনতার পরিচায়ক তা কি আর বলতে হয়!

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতীয় কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিকদের মত ভারতীয় শিল্পীদের বিশ্বের কাছে কি কিছু দেবার নেই? ভারতবর্ষকেও ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অগ্রসর হতে হচ্ছে। আজ এ-ও নূতন পদ্ধতিকে অবলম্বন করছে। তাতে কি এদেশের ভাগ্যে কোন সুফল দেখা দিয়েছে? হয়ত বলতে পারেন, দেশে যে প্রতি বৎসর ব্যাপক ভাবে নানা চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় তাতে করে দেশের শিল্পকলার মান ত বাড়ছে? অথচ শিল্প-চর্চ্চা নিয়ে এত বিরূপ সমা-

লোচনা হয় কেন? একথা বলা যায় যে, বর্ত্তমান ছবি-জগতের হৈ চৈ ও হুড়াহুড়ির মধ্যে কলা-রসিকেরা ঠিকমত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পান না। তাঁদের দৃষ্টি রয়েছে ভাবী-কালের শিল্পীদের প্রতি, যারা সত্যিকারের দাবি নিয়ে ভারতের সেই প্রাচীন শিল্প-ধারাকে রক্ষা করতে পারবে। আজ বিশ্বব্যাপী আলোড়নের আভাস দেখা যাচ্ছে—নবীন ভারত তার স্বকীয় ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত না হয়ে ভাবীকালের দিকে দৃষ্টিপাত করে চিত্র রচনা করুক।

অহঙ্কার কোথায়

শ্রীতারকনাথ নাথ

যদি ভগবান আছেন বলিয়া বিশ্বাস করি তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হইবে তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও আমাদের আদর্শস্থল। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবেই, কাহারও সাধ্য নাই তাহার প্রতিরোধ করে। তিনি সকল অভাবের ঊর্দ্ধে। তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী। সকলের প্রতি তিনি নিরপেক্ষ বিচার করেন। কাহারও অন্যায় তিনি সহ্য করেন না। মানুষের সৎকার্য্যের তিনি পুরস্কার দেন এবং অন্যায় কর্ম্মের শাস্তি দেন। কোন ব্যক্তি জীবনে অর্থ, যশ, পদগৌরব কিংবা অন্য কোনও সম্পদের অধিকারী হইলে বুঝিতে হইবে ইহা তাঁহার প্রতি ভগবানেরই দান। ভগবদিচ্ছায় তিনি সেই সম্পদ হইতে যে-কোনও মুহূর্ত্তে বিচ্যুত হইতে পারেন, তাহা ইচ্ছামত ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। প্রায়ই দেখা যায়, অদৃষ্টের পরিহাসে কোটিপতি ফকির হইতেছেন, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান পাগল হইতেছেন, স্বাস্থ্যবান জীর্ণশীর্ণ হইতেছেন এবং আজ যিনি দেশের সর্ব্বত্র সম্মানিত, কাল তিনি সেই দেশের লোকের দ্বারাই ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত। মানুষের এই অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত হইতেছে ভগবানের দ্বারা। অতএব যে সম্পদ আমরা নিজেদের ইচ্ছামত ধরিয়া রাখিতে পারি না, যাহার পাওয়া ও থাকা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের ইচ্ছাধীন তাহা আমরা নিজের বলিতে পারি না। যাহা আমাদের নিজের নয় তাহার জন্য আমরা অহঙ্কার করিতে পারি না।

অনেক নির্ব্বোধ ও মূর্খ ব্যক্তি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন, কিন্তু অনেক বুদ্ধিমান শিক্ষিত ব্যক্তি বহু চেষ্টা সত্ত্বেও নিজের গ্রাসাচ্ছদনের সংস্থান করিতে পারেন না। কত অযোগ্য কিংবা অল্প যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি উচ্চপদে সমাসীন হইতেছেন অথচ তদপেক্ষা অনেকাংশে যোগ্যতর ব্যক্তি বেকার অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছেন। ইহাতে বুঝিতে হইবে আমাদের উন্নতি স্বকীয় কৃতিত্বের জন্য নয়, বস্তুতঃ তাহা ভগবানের করুণার জন্য। সুতরাং তাহাতে আমাদের অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই।

অহঙ্কার মানুষকে ঘৃণা করিতে শেখায়। ইহার জন্য ধনী দরিদ্রকে, শিক্ষিত অশিক্ষিতকে, গুণবান গুণহীনকে, প্রভু ভৃত্যকে ও শক্তিমান্ দুর্ব্বলকে অবজ্ঞা করে। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ভগবান আমাদের যাহাকে যেরূপভাবে সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন আমরা সেইরূপভাবে সৃষ্ট হইয়াছি, আমাদের যাহাকে যেরূপ অবস্থায় রাখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন আমরা সেইরূপ অবস্থায় আছি। ইহাতে আমরা কেহ কাহাকেও অবজ্ঞা করিতে পারি না। মানুষ হিসাবে আমরা সকলেই সমান। মানুষকে মানুষ বলিয়া স্বীকার না করা মানুষের মস্ত বড় অপরাধ।

আমাদের এই জীবন ক্ষণস্থায়ী। এই মুহূর্ত্তেই হয়ত তাহা শেষ হইয়া যাইবে। তখন যাহার জন্য অহঙ্কার তাহা কি আমাদের সঙ্গে যাইবে? আমাদের রূপ, স্বাস্থ্য, শক্তি, সামর্থ্য কি আমাদের নিজস্ব? তাহা হইলে আমরা সে সকল আজীবন অটুট রাখিতে পারিতাম। বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা হ্রাস পাইত না। পার্থিব সকল সম্পদই তুচ্ছ, কারণ তাহা নশ্বর। আমরা পৃথিবীতে আসিয়াছি এই পার্থিব সম্পদের মোহে অন্ধ হইয়া থাকিবার জন্য নয়, পরন্তু আমাদের অবিনশ্বর আত্মার কল্যাণসাধনের জন্য। অতএব এরূপ সম্পদের জন্য অহঙ্কার করা মূঢ়তা মাত্র।

আমরা যদি সত্যই ভগবানের করুণালাভ করিতে চাই তাহা হইলে আমাদের মনের সমস্ত অহমিকা ত্যাগ করিতেই হইবে। যদি ভগবানকে আরাধনার সময় আমাদের কাহারও মনে জাগে যে আমি শিক্ষিত কিংবা অভিজাত কিংবা জ্ঞানী অথবা সাধনমার্গে আমি অগ্রসর হইয়াছি, অতএব অন্য অনেকের অপেক্ষা আমি শ্রেষ্ঠ, তাহা হইলে ভগবান অলক্ষ্যে থাকিয়া আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া হাসিবেন, আমরা তাঁহার দয়া পাইব না। যদি ভগবানের চরণে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়া বলিতে পারি যে "হে প্রভো, আমি ভক্তিহীন, নীচাদপি নীচ, সকলের অধম, আমার কিছুই নাই, তুমি আমায় নাও," তবেই তিনি আমার দয়া করিবেন।

আমি কে? কোথা হইতে এই পৃথিবীতে আসিলাম?

আবার মরণের পরে কোথায় যাইব? কেই বা আমায় আনিল, আবার কেই-বা লইয়া যাইবে? এই কয়টি প্রশ্নের উত্তর মনের ভিতর অনুসন্ধান করিলে অহঙ্কারের কোন হেতু পাওয়া যাইবে না।

কোনও ব্যক্তি অপর কাহারও অপেক্ষা নিজেকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া তাঁহার নিকট অহঙ্কার প্রদর্শন করিতেছেন, সেই সময়ে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি যদি তাঁহাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন তাহা হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তির অহঙ্কার থাকে কোথায়? প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভাবা কর্ত্তব্য যে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিও পৃথিবীতে আছেন।

কোনও ব্যক্তি নিজেকে কোনও বিষয়ে অপরের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিবেচনা করিয়া তাঁহার নিকট গর্ব্ব করিতেছেন। কিন্তু সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি হয়ত অন্য বিষয়ে তাঁহার অপেক্ষা উচ্চে। সেক্ষেত্রে প্রথমোক্ত ব্যক্তির অহঙ্কার করা ভ্রম। মানুষের মনের ভিতর কি সম্পদ লুক্কায়িত আছে তাহার সম্যক্ পরিচয় কি আমরা বাহির হইতে পাই?

মানুষ যত বড়ই হউক না কেন, তাহার অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই। অদৃষ্টের নিকট তিনি যে কত অসহায় ও দুর্ব্বল তাহা কল্পনাও করা যায় না। পরাক্রান্ত গ্রীক ও রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। মহা পরাক্রমশালী সিজার, নেপোলিয়ন ও হিটলার—যাঁহারা এক সময়ে ক্ষমতা ও গৌরবে আমাদের আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও দম্ভ চূর্ণ হইয়াছে। যাঁহারা অহঙ্কার করেন তাঁহাদের দর্প যে ভগবান কি ভাবে এবং কোন্ মুহূর্ত্তে চূর্ণ করিবেন তাহা তাঁহাদের জ্ঞানের অতীত।

অহঙ্কার পৃথিবীতে যত অশান্তি আনিয়াছে মানুষের আর কোন দোষ তাহা পারে নাই। এক রাষ্ট্র যদি ক্ষমতাগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া অপর রাষ্ট্রের প্রতি অন্যায় ব্যবহার না করে তাহা হইলে পৃথিবীতে যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠে না। রাষ্ট্রের যাঁহারা কর্ণধার তাঁহারা যদি পদাধিকার-গর্ব্বে প্রজাপুঞ্জের দুঃখ-দুর্দ্দশা উপেক্ষা করিয়া নিজেদের খুশীমত রাজ্যশাসন না করেন ত দেশের মধ্যে বিক্ষোভের সঞ্চার হয় না। এক পরিবারের মধ্যে কর্ত্তা যদি কর্ত্তৃত্বের অহঙ্কারে সংসারে কাহারও প্রতি অবিচার না করেন তো সাংসারিক শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। ধনী যদি দরিদ্রকে, শিক্ষিত যদি অশিক্ষিতকে, প্রভু যদি ভৃত্যকে এবং শক্তিমান যদি দুর্ব্বলকে অহঙ্কারবশে অবজ্ঞা না করেন তাহা হইলে দেশের মধ্যে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিবে সন্দেহ নাই।

"রামমোহন ও পাঁচকড়ি-রচনাবলী"

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বাংলা ক্লাসিক্স্ প্রকাশে গত কয়েক বৎসর যাবৎ বিশেষ তৎপর হইয়াছেন। আমরা বর্ত্তমানে ইহার দুই খণ্ড সমালোচনার্থ পাইয়াছি। রামমোহন গ্রন্থাবলী সাত খণ্ডে প্রকাশিত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান খণ্ড লইয়া এ যাবৎ তিন খণ্ড বাহির হইল। এই খণ্ডে "ব্রাহ্মণ-সেবধি, পাদরি-শিষ্য সংবাদ" মুদ্রিত হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায়কে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসক বলিয়াই আমরা জানি। কিন্তু আলোচ্য খণ্ড পাঠ করিলে স্বতঃই বুঝা যাইবে, তিনি সাধারণ হিন্দুধর্ম্মের বিষয়ও কিরূপ শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করিতেন। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা 'সমাচার দর্পণে' হিন্দুদের পৌত্তলিক বলিয়া নিন্দা করিয়া লেখনী পরিচালনা করিতে থাকেন। তখন একেশ্বরবাদী রামমোহন ইহার প্রতিবাদে অগ্রসর হন। তিনি 'ব্রাহ্মণ সেবধি' প্রকাশ করিয়া ইহার সমুচিত জবাব দেন। সম্ভবতঃ ইহার তিন সংখ্যা বাহির হয়। হিন্দুরা যে আরবের কোরেসী বা প্রাচীন গ্রীকদের মত মূর্ত্তিপূজক নহেন তাহা তিনি পরিষ্কার করিয়াই বুঝাইয়া দেন। মূর্ত্তি বা পুত্তলিতে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতঃ হিন্দুরা পূজা করিয়া থাকেন, মূর্ত্তি বা পুত্তলিকে তাঁহারা কখনও ঈশ্বর বা দেবতা জ্ঞান করেন না। 'পাদরি-শিষ্য সংবাদে' চীনাদের মধ্যে খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচার ও তাহাদের মুখ দিয়া ইহার ব্যাখ্যা করানো বড়ই কৌতুকজনক। শতাধিক বর্ষ পরে এখনও ইহা পাঠে আমরা কৌতুক অনুভব করি।

রামমোহন-গ্রন্থাবলীর আলোচ্য খণ্ডে আমরা হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ রীতি-প্রকৃতির যে আভাস পাই, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলীতে তাহার অনেকটা স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের পরিচয় ইতিপূর্ব্বে আমরা প্রদান করিয়াছি। আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমাংশে 'প্রবাহিণী' হইতে সন্দর্ভনিচয় উদ্ধৃত (পৃ. ১-৩৪০), দ্বিতীয়াংশে 'নায়কে' প্রকাশিত রচনাসমূহ স্থান পাইয়াছে। ভূমিকায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন-কথা সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে।

বর্ত্তমান খণ্ডে স্মৃতিকথা, ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজনীতি, রাজনীতি, বাংলা-সাহিত্য —প্রধানতঃ এই সকল বিষয়ের প্রবন্ধ ও নিবন্ধ উক্ত দুইখানি সাময়িক পত্র হইতে সংকলন করা হইয়াছে। বাঙালী জাতিকে সম ক্ বুঝিতে হইলে, আমরা কি ছিলাম কি হইয়াছি, তৎসম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিতে হইলে এই সকল রচনা বার বার পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাচীন সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে অপূর্ব্ব দখল, অন্তর্দৃষ্টি সহকারে বিভিন্ন বিষয়ের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, চিত্তবিমোহনকারী ভাষা ও পরিপাটি প্রকাশভঙ্গী—সকলে মিলিয়া এক-একটি রচনাকে যেন এক-একটি ইন্দ্রিয়গোচর সুষমামণ্ডিত বস্তুতে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে।

'স্মৃতিকথা'য় বঙ্কিম, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, ভূদেব, কেশবচন্দ্র ও শিশির-কুমারকে স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে এমনভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে, প্রত্যেকটিই যেন একটি চিত্ররূপে আমাদের নিকট ধরা দিয়াছে। 'রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী' সম্বন্ধেও একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার বিজ্ঞান ও দর্শনের বিভিন্ন তথ্যমূলক রচনাদির বৈশিষ্ট্যের কথা লেখক বর্ণনা করিয়াছেন। 'স্মৃতিসভা', 'সম্মেলনের সখ' ও 'সাহিত্য-সম্মিলন' এই তিনটি সন্দর্ভের প্রতিও পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। শেষোক্ত সন্দর্ভে বাংলা-সাহিত্য, বাঙালী জাতির (এবং তাহার সঙ্গে, বলা বাহুল্য লেখকেরও) যে কত প্রাণের জিনিষ তা যেন জীবন্ত হইয়া আমাদের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আসিয়া গিয়াছে। তিনি যেন বাঙালীর প্রাণের কথাকেই একটা স্পষ্ট রূপ দিয়া ফেলিয়াছেন। আমার কথা, আমার সাধ, মাটি নিবি গো, আশা পথে, জয় রাধেকৃষ্ণ, গোড়ার কথা, না এদিক না ওদিক্, সেকাল আর একাল মনন-সাহিত্যের এক একটি অনুপম সৃষ্টি।

পূজা পার্ব্বণ, আচার অনুষ্ঠান, ব্রত-আচরণ দ্বারা বাঙালী জাতি অন্যান্য প্রদেশ হইতে বিশিষ্টতা অর্জ্জন করিয়াছে। ইহার মূলে ধর্ম্মবিষয়ে, হিন্দু-ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াও, তাহার স্বকীয়তা। বাংলার সমাজ সংগঠনেও ইহার প্রভাব যথেষ্ট। হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয়ে বঙ্গদেশে তন্ত্র ও বৈষ্ণব মতের প্রাবল্য ঘটিয়াছিল। আবার তন্ত্র সুপ্রাচীন হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযানী শাখার দ্বারা পরবর্ত্তীকালে ইহা কম নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। প্রধানতঃ তন্ত্র ও বৈষ্ণব মতের প্রাবল্যহেতু বাংলাদেশে যেরূপ সামাজিক উদারতা পরিদৃষ্ট হয়, ভারতবর্ষের কুত্রাপি তাহা দেখা যায় না। বাংলার নিজস্ব তন্ত্রের প্রতি তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় বিরূপ মনোভাব পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছেন, বাঙালীর অধঃপতনের মূলে তন্ত্রের কুৎসিত আচার আচরণ। কিন্তু আলোচ্য খণ্ডে তন্ত্রবিষয়ক প্রবন্ধাবলী—বাংলার তন্ত্র, তন্ত্রে মূর্ত্তিপূজা, তন্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য, তন্ত্রের দেহতত্ত্ব, তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব, পঞ্চম'কার আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া দিবে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তন্ত্র সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা হওয়া একান্ত আবশ্যক। বঙ্গভাষায় এরূপ পুস্তকাদি নিতান্তই অপ্রতুল বলিয়া আমাদের ধারণা। বাঙালীর সমাজগঠন, পূজাপদ্ধতি, চিন্তাপ্রণালী—এক কথায় বাঙালী জাতির 'genius' বা ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে, বাঙালীর তন্ত্রসাধনা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আমরা যে আত্মবিস্মৃত জাতি তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আত্মবিস্মৃতি আত্ম-প্রত্যয়ের পক্ষে ভীষণতম বাধা। আত্ম-প্রত্যয় লাভ হইলেই তো আমরা সবল সুস্থ শক্তিমান্ হইতে পারিব।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার পূজা-পার্ব্বণ, ব্রতাচরণ সম্পর্কে নানা

প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। জামাইষষ্ঠী, বসন্তপঞ্চমী, শিবরাত্রি, শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা, উল্টা রথ, মহালয়া, কালীয়দমনের যাত্রা, শ্রীশ্রীবাসন্তী পূজা, শ্রীশ্রীগন্ধেশ্বরী পূজা প্রভৃতির মধ্যে বাঙালীর 'genius' বা ধর্ম্মের বহুল পরিচয় আছে। মদন-তত্ত্ব, জপ ও কীর্ত্তন, শিব ও শক্তি, শাস্ত্র-শাসন, ভক্তি-তত্ত্ব, ভক্তি ও আসক্তি, কাম ও মদন প্রভৃতি রচনায়ও হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থাদির নির্য্যাস আমরা পাই। ভগবান রামকৃষ্ণ, ব্রাহ্মণ-জাতি, শ্রীশ্রীরামচন্দ্র, শ্রীশ্রীহনুমান, পঞ্চকন্যা, শুকদেব—এ সকল প্রবন্ধে আমরা একাধারে যেমন ধর্ম্মকথা শুনিতে পাই তেমনি নানা ঐতিহাসিক চিত্রও আমাদের নজরে পড়ে। গ্রন্থকার এই সমুদয়ের আলোচনায় বাংলার পুঁথি ও অষ্টাদশ পুরাণের দিকে আমাদের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন। পুরাণ-চর্চ্চা আমরা তেমনভাবে করিতেছি না, প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিপত্র ঘাটিতেছি না বলিয়া তাঁহার কত আক্ষেপ। সুখের বিষয়, বাঙালীর এবং হিন্দুজাতির সমাজেতিহাসের এই সকল মূল উপাদান ইদানীন্তন কালে কিছু কিছু সংগৃহীত, পরীক্ষিত ও অনুশীলিত হইতেছে এবং তাহার ফলও আমরা প্রবন্ধ ও পুস্তকাকারে কিছু কিছু পাইতেছি।

'নায়কে'র সম্পাদকরূপে গ্রন্থকার প্রধানতঃ রাজনীতি লইয়াই ইহাতে আলোচনা করিয়াছিলেন। সমসাময়িক রাজনীতি ও সমাজসংস্কারমূলক প্রবন্ধাদিতেও যথেষ্ট নূতন কথা আমরা পাই, এই সকলের মধ্যে চিন্তারও খোরাক মিলে। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক এবং মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে তিনি ভারত-উদ্ধারের দুই মহাসাধক প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের অভিনব ব্যাখ্যাও আমাদের চিত্তে বিশেষ ভাবে দোলা দেয়। তখন যে 'জলতরঙ্গ' ভারতবর্ষে সমুত্থিত হইয়াছিল তাহা রোধ করিবার শক্তি কাহারও ছিল না, এমন কি ব্রিটিশ সিংহেরও নয়। গ্রন্থকার এই জল-তরঙ্গকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন এবং মহাত্মা গান্ধীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, "তোমারই শঙ্খনাদে আমাদের অনাদি ও সনাতন তুষার-বিস্তার গলিত করিয়া এই অভিনব জলতরঙ্গ জাতির সকল পর্ব্ব ভেদ করিয়া সমতলে আসিয়া খেলা করিতেছে। তোমারই শঙ্খনাদের আহ্বানে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ নর-নারী কণিকারূপে প্রবময়ী হইয়া নবগঙ্গার সৃষ্টি করিয়াছে!" রাজনীতির মধ্যে না পড়িলেও, পাঁচকড়ির রসাল-তত্ত্ব সত্যই রসাল। আম্রের কুলপরিচয়ও পাঁচকড়ির প্রসারিত দৃষ্টি এড়ায় নাই।

বিভিন্ন পত্র-পত্রীতে ছড়ানো বাংলা-সাহিত্যের এই অমূল্য রত্নরাজিকে অন্তরাল হইতে সর্ব্বজনসমক্ষে আনিয়া দিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বাংলাভাষীর সত্যই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। বাংলা-সাহিত্যের যে দুর্দ্দৈব উপস্থিত তাহাতে এই সকল সুচিন্তিত, সারগর্ভ, আত্মপ্রত্যয়মূলক রচনা যতই প্রকাশিত হয় জাতির পক্ষে ততই মঙ্গল।*

---

* রামমোহন গ্রন্থাবলী—(৫ম খণ্ড) পৃ ৩৮। মূল্য ১৲।
পাঁচকড়ি-রচনাবলী (২য় খণ্ড) পৃ ।৵০+৪০২। মূল্য ৬৲।
সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৬।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র—অনুবাদক, ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক। জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড। ১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথমভাগ—পৃষ্ঠা ১৵০+২৬৫, মূল্য ৬৲।

দ্বিতীয়ভাগ—পৃষ্ঠা ৷৵০+২৮৮, মূল্য ৬৲।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র সংস্কৃত সাহিত্য-সাগরের একটি মহার্ঘ্য রত্নস্বরূপ। ইংরেজী ১৯০৯ সনে মহীশূরের পণ্ডিত ডক্টর শ্যাম শাস্ত্রী সর্বপ্রথম ইহা প্রকাশিত করেন। ইহার পূর্ব্বে এই গ্রন্থের নামটি মাত্র জানা ছিল এবং এই গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশসমূহের সহিতই শুধু পণ্ডিতমণ্ডলী পরিচিত ছিলেন। ডক্টর শ্যাম শাস্ত্রীর এই আবিষ্কার কেবল সংস্কৃত সাহিত্যের নহে, বিশ্ব-সংস্কৃতির ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। পার্থিব বা অপারমার্থিক বিষয়ে লিখিত এই বৃহৎ গ্রন্থকে একজন প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত গ্রন্থ না বলিয়া 'গ্রন্থাগার' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের কয়েকটি পাঠ অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে কোনটিই সম্পূর্ণ নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। লেখকের মতে আরও কয়েকখানি হস্ত-লিখিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেলে তৎসাহায্যে এই গ্রন্থের পাঠশুদ্ধি ঘটিতে পারে। এরূপ অমূল্য গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া অনুবাদক যে পাণ্ডিত্য, অধ্যবসায় এবং মাতৃভাষার প্রতি যে অনুরাগের পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য তিনি সমগ্র বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতা-ভাজন। আক্ষরিক অনুবাদ করিলে ইহা কেবল দুর্বোধ্যই হইত না, হয়ত পাঠের এবং বুঝিবার পক্ষেও অনুপযোগী হইত, কিন্তু অনুবাদক তাহা না করিয়া সুন্দর ভাষায় ইহাকে সুপাঠ্য এবং সুবোধ্য করিয়াছেন।

প্রথমেই গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয় লইয়া বিভিন্ন মতের বিচার আছে। এক দল বলেন ইহা মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্য বা চাণক্য অথবা বিষ্ণুগুপ্তের প্রণীত নহে, ইহা পরবর্ত্তীকালে তাঁহার কোন শিষ্য বা শিষ্য-মণ্ডলীর রচনা। ডক্টর বসাক এই মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহা চাণক্যেরই রচনা এবং খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে প্রণীত। এই সম্পর্কে ডক্টর বসাক গ্রন্থের অবতরণিকায় প্রমাণাদি দ্বারা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন তাহাই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, এই গ্রন্থে প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ কোনও রাজ্যবিশেষে প্রচলিত অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতির ব্যাখ্যা অথবা সেগুলি যে-কোন কালে এবং যে-কোনও স্থানে সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা বিষয়ে প্রয়োজনীয় আদর্শস্বরূপ রীতিনীতির কথা, তাহা লইয়া নানা মত থাকিলেও বাস্তবের ভিত্তিতেই যে গ্রন্থখানি রচিত, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই, তবে রাষ্ট্রনীতির মধ্যে কিছু আদর্শের অনুপ্রেরণা থাকা আশ্চর্য্য নহে।

প্রাচীন রাষ্ট্রনীতি আলোচনা করিলে জানিতে পারি যে যুগযুগান্ত ধরিয়া ভারতের ইতিহাস বিচিত্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন সময়ে এদেশে রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতি বা বর্ণতন্ত্র ও কুলস্বামিক রাজ্যের শাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমানকালের সামাজিক সংবিৎ বা চুক্তি (the theory of social contract) সম্বন্ধে যে থিওরি তাহাও পুরাকালের শাস্ত্রবিদ্গণের অজ্ঞাত ছিল না। প্রাচীন অর্থশাস্ত্রবিদ্গণ রাজ্যকে (State বা Body-Politic) সপ্তাঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র—রাজতন্ত্র এবং রাজ্যেরই বিভিন্ন বিষয় লইয়া লিখিত। রাজার কর্ত্তব্য প্রজার হিতসাধন। চাণক্যের 'রাজা' সচিবগণের উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করেন—'সচিবায়ত্ত রাজতন্ত্র'। চাণক্যের ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও সমাজ প্রতিষ্ঠিত। কৌটিলীয় রাজনীতিতে গূঢ়পুরুষ বা গুপ্তচর নিয়োগের অভিনব ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। কি ভাবে প্রাচীন ভারতে রাজ্যশাসন হইত তাহার একটি সম্পূর্ণ ও সুন্দর চিত্র অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়। ইহা হইতে জানা যায় যে, সেযুগে লবণের কারবার রাজসরকারের একচেটিয়া ব্যাপার ছিল। তখনকার পৌরপ্রতিষ্ঠানের প্রধান অধিকারীর স্থান বর্ত্তমান কালের মেয়রের সহিত তুলনীয়। সেকালে দানপ্রথা ছিল, বিধবা-বিবাহও প্রচলিত ছিল। বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রচলন অল্পস্বল্প থাকিলেও তাহা খুব সহজসাধ্য ছিল না—যখন স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি দ্বেষ বা বিরাগ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইত কেবল তখনই মোক্ষ বা ছাড়াছাড়ি বিহিত বলিয়া বিবেচিত হইত। পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থশাস্ত্রবিৎ শুক্র (উশনাঃ) এবং বৃহস্পতিকে কৌটিল্য বার বার প্রণাম জানাইয়াছেন। চাণক্য পূর্ব্বসূরিদের মধ্যে মনু, বৃহস্পতি, উশনাঃ, পরাশর ও আম্ভির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ব্বাচার্য্যগণের মত উদ্ধৃত করিয়া তিনি নানা স্থানে উহা খণ্ডন করিয়াছেন এবং নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

এই বিরাট্ অনুবাদ-গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তিনটি অধিকরণ স্থান পাইয়াছে, যথা: বিনয়াধিকারিক—প্রথম অধিকরণ, অধ্যক্ষপ্রচার—দ্বিতীয় অধিকরণ, ধর্ম্মস্থীয়—তৃতীয় অধিকরণ। বিনয়াধিকারিক একবিংশ অধ্যায়ে, অধ্যক্ষ-প্রচার ষট্ত্রিংশ অধ্যায়ে এবং ধর্ম্মস্থীয় বিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড দ্বাদশটি অধিকরণে বিভক্ত। উভয় খণ্ডেই গ্রন্থের শব্দনির্ঘণ্ট দেওয়া হইয়াছে। ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে প্রদত্ত প্রাচীন দণ্ডনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে পারিভাষিক শব্দের অভিধানও বিশেষ মূল্যবান।

স্বাধীন ভারতকে নানা বিষয়ের জন্য প্রাচীন ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইতেছে। আজ প্রাচীন ভারতের যাবতীয় শাস্ত্র সম্বন্ধে ব্যাপক ভাবে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এমতাবস্থায় বর্ত্তমান পুস্তকের প্রকাশ বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রবিদ্ চাণক্যের গ্রন্থ হইতে স্বাধীন ভারত নূতন আলোক লাভ করিতে পারিবে। এই গ্রন্থ ছাত্র, গবেষক, ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রনীতিবিদ্ সকলের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী। ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ম্যালেরিয়ায় মরতে বসেছিলাম...

'প্যালুড্রিন'ই আমাকে বাঁচালো...

কারবারের কাজে আমি সেবার মফস্বলে গিয়ে ম্যালেরিয়ার হাতে কী নাকালটাই না হয়েছিলাম। দিনের পর দিন সে কী অসহ্য জ্বর আর যন্ত্রণা! সেরে ওঠবার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। শেষটায় এক বন্ধুর পরামর্শে রোজ একটি করে 'প্যালুড্রিন' খেতে শুরু করলাম। তিন চার দিনেই জ্বর ছেড়ে গেল, দেহে যেন নতুন প্রাণ এল। সেই থেকে প্রতি রবিবার খাবার পর একটি করে 'প্যালুড্রিন' খেয়ে আসছি। ম্যালেরিয়াও আর হয়নি।

* ১ আনায় ১টি বড়ি

ইম্পিরিয়্যাল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

IX-P 138 BEN

কিনু গোয়ালার গলি—শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ। দিগন্ত পাবলিশার্স। ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা—২৯। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

কিনু গোয়ালার গলি কথা-সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। ইহাতে তিনি যে মৌলিকত্ব ও চরিত্রচিত্রণ-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর।

কলিকাতার একটি অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে 'পাশাপাশি চারটে শরীর গলে কি গলে না' এমন গলি কিনু গোয়ালার গলি। কাহিনীর যবনিকা উত্তোলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি, গলির মুখে দোকানে দরজার আড়ালে টিমটিমে একটা আলো জ্বালাইয়া গলির আদি ও অকৃত্রিম বাসিন্দা কর্ম্মরত প্রমথ পোদ্দারকে—"ঘাম ঝরছে, রোমাকীর্ণ নগ্ন বুক, গরাদের ওপরে রাখা কুৎকুতে দুটি চোখ, চাপ্টা নাক সামান্য বেরিয়ে এসেছে বাইরে, শুধু জিভটা লক লক করলেই চিত্রটি সম্পূর্ণ হয়।"

কিনু গোয়ালার গলি যেন কোন্ অদৃশ্য দুর্নিবার আকর্ষণে বিচিত্র প্রকৃতির নরনারীকে আপন কুক্ষির ভিতরে টানিয়া আনে—৬ নং বাড়ীতে প্রথমে আসেন একদা অভিজাত পল্লীর বাসিন্দা, রেসখেলায় সর্ব্বস্বান্ত শিবব্রতবাবু স্ত্রী পুত্র পুত্রবধূ আর তরুণী কন্যা নীলাকে লইয়া, তার পর আসে সাহিত্যিক মণীন্দ্র আর তার স্ত্রী শান্তি, শেষ পর্য্যন্ত কবি ইন্দ্রজিৎও এই বাড়ীতে আসিয়া শান্তির পক্ষপুটচ্ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ওদিকে পাশের বাড়ীতে আসিয়া জোটে নার্স শকুন্তলা আর তার সঙ্গিনী গীতা ললিতা মীনা প্রভৃতি সেবিকারা—শকুন্তলার সঙ্কল্প এই গলিতে একটি সেবা-সত্র খোলা। ক্রমে ক্রমে কিনু গোয়ালার গলির ভিতরে নবাগত কয়েকটি প্রাণীকে কেন্দ্র করিয়া প্রণয়-বিরহ-মিলন-ব্যভিচারের স্রোত বিচিত্রভাবে আবর্ত্তিত হইতে থাকে, রচিত হয় 'নূতন পালাগান'। ইন্দ্রজিৎকে লইয়া শান্তি মাতিয়া উঠে খেলার নেশায়। তাহার মোহপাশ হইতে ইন্দ্রজিৎকে উদ্ধার করিতে গিয়া নীলা হয় তাহার প্রতি প্রণয়াসক্ত—ঈর্ষার আগুন তিল তিল করিয়া তাহার অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করিতে থাকে।

নিরানন্দ নিরালোক গলির মধ্যে বাঁচিবার সঞ্জীবনীমন্ত্র নাই, আছে মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ। এই ধূমধূলিপূর্ণ পঙ্কিল গলি তিল তিল করিয়া এই কয়টি প্রাণীর আত্মাকে পিষিয়া মারে। কিন্তু ইহার অক্টোপাশ-বেষ্টনী হইতে যেন তাহাদের নিষ্কৃতি নাই—এই গলিকে তাহাদের মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু এই গলির মুখে যেদিন শেষ রাত্রে ঘটনাচক্রে দুই দিক হইতে দুখানি ট্যাক্সি হইতে নামিয়া মুখোমুখি দাঁড়াইল শান্তি আর মণীন্দ্র সেই দিন এই অভিশপ্ত গলি যে তাদের কোন্ স্তরে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে, স্বামী স্ত্রী উভয়েই তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিল। "এই গলি আমাদের শেষ করে ফেলেছে শান্তি ....বাঁচতে হলে এ গলি ছাড়তে হবে!" মণীন্দ্রের এই কয়টি কথায় ফুটিয়া উঠিল শুধু তার নিজের নয়, এই গলির বাসিন্দা সব কয়টি নর-নারীর অন্তরের আকুল আকুতি।

প্রথমে কিনু গোয়ালার গলি ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেল মণীন্দ্র ও শান্তি, তারপর একে একে অন্যেরা তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে লাগিল। শেষে এই গলিরও বিলুপ্তির দিন আসন্ন হইয়া আসিল। ইহার উপর পড়িল ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের নজর। শুধু জরীপের কি একটা আশ্চর্য্য কৌশলে প্রমথ পোদ্দারের দোকানখানি বাঁচিয়া গেল।

আশ্চর্য্য নৈপুণ্যের সহিত লেখক কাহিনীটি বর্ণনা করিয়াছেন। মনে হয় মহানগরীর এমনি কোন সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর দিয়া যাইবার সময় অভিশপ্ত বিকৃত জীবনের টুকরোটাকরা ছবি আমরাও যেন প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিনু গোয়ালার গলি যেন একটি জীবন্ত সত্তা,·পায়রার খোপের মত ইহার প্রতিটি গৃহে যত সব অনাচার পাপ আর ব্যাধির বীজ সঞ্চিত। যে কয়টি পাত্র-পাত্রীর চরিত্র লেখক আঁকিয়াছেন, তাহাদের সকলেই সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবনের স্বাদ হইতে বঞ্চিত—জীবন এখানে পঙ্গু, মনুষ্যত্ব এখানে ধূলিলুণ্ঠিত। উপন্যাসের বহু স্থানে লেখকের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বজ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছি। নীলার জীবনের শোচনীয় ট্র্যাজেডি মনকে বিচলিত করে।

কিন্তু লেখকের সব চেয়ে বেশী নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে প্রমথ পোদ্দারের চরিত্র সৃষ্টিতে। সে গলির 'অজরামর আত্মা'—এই গলির সমস্ত নীচতা, সঙ্কীর্ণতা, বীভৎসতা, ক্রূরতার প্রতীক। এই গলিতে যা ঘটে কিছুই তাহার দৃষ্টি এড়ায় না। প্রমথ পোদ্দার এবং গলি যেন একই অভিন্ন এবং অবিচ্ছেদ্য সত্তা—একটিকে

ছাড়া অপরটিকে কল্পনা করা যায় না। গলি ছাড়িয়া সবাই যখন চলিয়া যাইতে লাগিল, প্রমথ তখনও নির্ব্বিকারভাবে নিজের কুঠরিতে বসিয়া সেই দৃশ্য দেখে—যেন মড়ক লাগার দৃশ্য গলির নাভিশ্বাস উঠিয়াছে, ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে তার হৃৎস্পন্দন-শব্দ। কিন্তু প্রমথর সঙ্গে গলির আজন্মের গলা-গলি—গলির মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে তাহাকে আঁকড়াইয়া রহিবে। তাই কাহিনীর যবনিকা-পতনের পূর্ব্বে দেখি, রাত্রে গলি প্রায় জনশূন্য হইয়া আসিয়াছে, আর প্রমথ বাহিরে দাঁড়াইয়া দোকানে তালার পর তালা লাগাইতেছে—মুখে তাহার বিচিত্র হাসি। দৃশ্যটি একেবারে জীবন্ত বলিয়া ভ্রম হয়, প্রমথর শরীরী উপস্থিতি যেন অনুভব করিতে পারা যায়। এই চরিত্র-সৃষ্টিতে লেখক যে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা আমাদের চমক লাগাইয়া দিয়াছে। বাংলা-সাহিত্যে প্রমথ পোদ্দারটি একটি অভিনব সৃষ্টি।

লেখকের রচনা-শৈলী চমৎকার, প্রকাশভঙ্গী অনবদ্য, ভাষারও একটা রূপ আছে। কিন্তু তিনি প্রমথ পোদ্দারকে এ পাড়ার 'আদিবাসী' বলিয়া উল্লেখ করিয়া ভুল করিয়াছেন। আদিবাসী কথাটা হালে তৈরি পারি-ভাষিক শব্দ—আদিম অধিবাসী বা aboriginal tribes বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

নতুন চাঁদ—কাজী নজরুল ইস্‌লাম। নুর লাইব্রেরী পাবলিশার। ১২ ১, সারেং লেন, কলিকাতা। মূল্য দু' টাকা আট আনা।

নজরুলের কবিতাগুচ্ছ সম্পূর্ণ নবকলেবর নিয়ে নূতন সংস্করণে আত্মপ্রকাশ করল। বইখানির প্রচ্ছদপট আকর্ষণীয় ও বাঁধাই

মনোরম। এই কাব্যগ্রন্থে মোট বিশটি কবিতা আছে, প্রত্যেকটি কবিতা অগ্নি-আভায় দীপ্ত।

নজরুল বিদ্রোহের বাণী-মূর্ত্তি কিংবা হয়তো তিনি বাণীর বিদ্রোহ-মূর্ত্তি। নজরুলের কাব্য-সরস্বতীর হাতের বীণায় যে সুরটি সবচেয়ে উচ্চগ্রামে তা বিদ্রোহের সুর। তাই তিনি "বিদ্রোহী" কবি। তাঁর প্রেমের কবিতায় তিনি আবেগদীপ্ত যৌবনের দূত। তাঁর "নতুন চাঁদ" তো চির-যৌবনের জয়গান। চিরকালের 'নৌজোয়ান'কে এমনভাবে আর কেউ ডাক দেয় নি বাংলা-সাহিত্যে। 'দুর্বার যৌবন', 'আজাদ' প্রভৃতি সবগুলিতেই সেই একই সুর বেজে উঠেছে।

'উঠরে চাষী', 'ঈদের চাঁদ', 'কৃষকের ঈদ'-এ কবি নজরুলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে আর এক তাণ্ডব সুর। সমাজের অসাম্য শ্রেণীভেদ, শাসন আর শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। এই কবিতাগুলি পড়লে বুঝা যায় কেন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েও নজরুল "শিকলভাঙার" গান গেয়েছিলেন।

ওমর খৈয়ামের 'সাকী' আর চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির 'রাধা' কেমন করে এক হয়ে মিলে গেল নজরুলের কাব্যে ভাবলে বিস্ময় লাগে। তাঁর ভাষার মধ্যেও রয়েছে অজস্র আরবী ফার্সী সংস্কৃতের মণিমুক্তা ছড়ানো—সেগুলি ঝলমল্ করে তুলেছে তাঁর কবিতাকে।

শ্রী

আঁধারে আলো (২য় প্রবাহ)—১৭৬ পৃষ্ঠা, মূল্য দুই টাকা এবং টোটকা—৩২ পৃ, মূল্য বারো আনা। উভয় গ্রন্থ আলোকদাতা "ভাই" প্রণীত এবং ১২।১, কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন, কলিকাতা—২৬ হইতে শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গ্রন্থদ্বয়ে পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণাশ্রিত বিশিষ্ট সাধক কামাপুকুর-নিবাসী নৃপেন্দ্রনাথ যে, যিনি "ভাই" নামেই প্রসিদ্ধ, তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনায় দিব্য অনুভূতিপূর্ণ বাণীসমূহ পরিবেশিত হইয়াছে। প্রথমটিতে মানুষের দুঃখনিবৃত্তির উপায় হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীঅরবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন পর্য্যন্ত চব্বিশটি আধ্যাত্মিক আলোচনা স্থান পাইয়াছে। প্রত্যেকটি আলোচনাতেই মানুষ কিভাবে জড়জগতের প্রলোভনমুক্ত হইয়া ঊর্দ্ধমুখী, চৈতন্যাভিমুখী হইয়া দিব্যজীবনের অধিকার লাভে ধন্য হইতে পারে সেই বিষয়ে আন্তরিক ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে। এক স্থলে লেখক বলিতেছেন—"দেশের ও দশের যখন ভাল হবে, তখনই হাওয়াটা ঠিক হবে। যখন দেখব চারিদিকে মানুষ কোমর বেঁধে 'কর্ম্মের, সময়ের, চিন্তার ও বাক্যের সদ্ব্যবহার করতে উঠে পড়ে লেগে গেছে, তখনই বুঝব দেশের সুদিন এল বলে।"

দ্বিতীয়টিতে আছে অনায়াসে ঐহিক দুঃখ-নিবৃত্তির সংক্ষিপ্ত উপদেশাবলী। আমি আমার এই অহমিকা ছাড়িয়া সর্ব্বপ্রকারে 'আমি তোমার' হইয়া বিরাটের অতল আনন্দ-সিন্ধুতে ডুবিবার কৌশল অনুরাগী-জন ইহাতে পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কোরিয়া ভ্রমণ—শ্রীরামনাথ বিশ্বাস। ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড, ২১, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা—৯। মূল্য ১৲।

এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় 'দ্বিচক্রে কোরিয়া ভ্রমণ' নামে, 'যখন কোরিয়া সাম্রাজ্যবাদী জাপানের কুক্ষিগত ছিল এবং মদগর্ব্বী জাপান কোরিয়ার ভাষা, রীতিনীতি ও সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ জাপানী ছাঁচে ঢালিয়া একটি বিজিত জাতির স্বাধীন সত্তার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটানোর অপচেষ্টা চালাইতেছিল। কোরিয়াকে কেন্দ্র করিয়া তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হইবে বলিয়া অনেকেই আশঙ্কা করিতেছেন। কোরিয়া আজ বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। গ্রন্থকার উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে আত্মঘাতী যুদ্ধের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত যোগ করিয়া বর্ত্তমান তৃতীয় সংস্করণটিকে সময়োপযোগী করিয়াছেন। লেখক সাইকেলে কোরিয়ার প্রসিদ্ধ নগরসমূহ ও গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া এই দেশের অন্তর্নিহিত ভাবধারা লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন যে, এই সুপ্রাচীন সুসভ্য জাতির প্রাণশক্তি বিলুপ্ত হয় নাই, অধুনা ধনতান্ত্রিক আমেরিকার প্রভাবাধীনে শতধাবিচ্ছিন্ন হইয়াও কোরিয়াবাসিগণ মরণজয়ী চীনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া জনগণের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতেছে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

দেশ-বিদেশের কথা

বীরাঙ্গনা সংসদে সাহিত্যিকের সম্বর্দ্ধনা

গত ৯ই আষাঢ় বরাকর বীরাঙ্গনা সংসদের উদ্যোগে শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সাহিত্যিক কালীপদ ঘটকের সম্বর্দ্ধনার জন্য একটি সভার অনুষ্ঠান হয়। উদ্বোধন-সঙ্গীত ও সভাপতি বরণের পর কালীপদ বাবুকে মহিলা সমিতির পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়, সংসদের জনৈক সদস্যা অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীমতী কিরণ-সুধা দাস, বার্ণপুর-কুলটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীনিত্যানন্দ দাশগুপ্ত ও বীরাঙ্গনা সংসদের সম্পাদিকা শ্রীঅমিয়া দেবী, সাঁওতালী জীবন লইয়া লিখিত কালীপদবাবুর সর্বজনপ্রশংসিত উপন্যাস 'অরণ্য-কুহেলী' সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সম্বর্দ্ধনার উত্তরে কালীপদবাবু সংসদের সদস্যাগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং 'অরণ্য-কুহেলী' প্রসঙ্গে ভারতের আদিবাসী-সমাজ সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি সাঁওতাল-ভীল-কোল-হো-মুণ্ডা-ওঁরাও-গন্দ্-পাহাড়িয়া প্রভৃতি ভারতের আদিম অধিবাসীদের জীবনধারার কথা আলোচনা করেন এবং হো-বিদ্রোহ, টানা-ভগৎ-আন্দোলন, কোল-বিদ্রোহ ও সাঁওতাল-বিদ্রোহ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করেন। ভারতের আড়াই কোটি আদিবাসীকে সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনে ঠিকমত কাজে লাগাইতে পারিলে তাহারা যে জাতির সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে সে কথাও তিনি দৃঢ়তার সহিত উল্লেখ করেন এবং এ বিষয়ে দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় ও সাহিত্যিকগণকে অবহিত হইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানান।

সভাপতি শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কথা-সাহিত্যিকের সম্বর্দ্ধনার এই আয়োজনে আনন্দ প্রকাশ করেন ও বীরাঙ্গনা সংসদের সভ্যাগণকে ধন্যবাদ জানান। অতঃপর তিনি 'অরণ্য-কুহেলী' উপন্যাস ও দেশের আদিবাসী-সমাজ সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে ভারতের আর্য্য ও অনার্য্য উভয় জাতির ধারাবাহিক পরিচয় এবং তাহাদের সম্মিলন ও সংমিশ্রণ ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় একটি জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। এই সঙ্গে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি ও কৌতুকাভিনয়ে কুমারী অনুপা দাস, গীতাঞ্জলি ব্যানার্জ্জি, অর্চনা ব্যানার্জ্জি, মায়া চক্রবর্ত্তী, সন্ধ্যারাণী বসু, স্বপ্না ভট্টাচার্য্য, বেলা দত্ত প্রমুখ শিল্পিগণ যোগদান করেন।

গয়াতীর্থ সেবাশ্রমের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী

পুণ্যতীর্থ গয়াধামে তীর্থযাত্রিগণকে নিরাপদ আশ্রয়দান, তীর্থকৃত্য সম্পাদন, শিক্ষাবিস্তার, জনসেবা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ গয়াতীর্থ সেবাশ্রম ও যাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠা করেন। গত ১৩৫৭ সালে উক্ত কেন্দ্রের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী নিম্নরূপ :

আলোচ্য বর্ষে সেবাশ্রমে ২২৯১৩ জন তীর্থযাত্রীকে আশ্রয়-দান এবং তীর্থকৃত্য সম্পাদনে সহায়তা করা হয়। বিপন্ন যাত্রীদের পাথেয় দ্বারা সাহায্য এবং অনেক দুঃস্থ ব্যক্তিকে নিয়মিত খাদ্যসরবরাহ করা হয়। দাতব্য চিকিৎসালয়ে মোট ১২৪১৪ জন রোগী চিকিৎসিত হয়। আলোচ্য বর্ষে পূর্ব্ববঙ্গের ৩৫টি উদ্বাস্তু-পরিবারকে যাত্রীনিবাসে আশ্রয়দান করিয়া আহার্য্য, বস্ত্র, ঔষধ, পথ্য ও দুগ্ধাদি সরবরাহ করা হয়। উক্ত বৎসরে ২টি বিরাট হিন্দুধর্ম্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সঙ্ঘের তীর্থ-কেন্দ্রসমূহের যাত্রীনিবাসগুলির সংস্কারসাধন করা আশু প্রয়োজন। সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষ সর্ব্বসাধারণের নিকট আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন জানাইতেছেন। যে-কোন সাহায্য সম্পাদক, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, কলিকাতা-১৯ এই ঠিকানায় সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

যুবরাজ উইলিয়ম ও মার্শাল পেঁতা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দুই জন নেতা দুই তিন দিনের ব্যবধানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত ৬ই শ্রাবণ মার্শাল পেঁতা শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করেন আর জার্ম্মান যুবরাজ পরলোকগমন করেন তাহার কয়েক দিন পূর্ব্বে। তাঁহাদের মৃত্যুতে ইউরোপের

ইতিহাসে এক বিয়োগান্ত নাটকের যবনিকা পতন হইল। যুবরাজের পরাজয় ঘটে ১৯১৮ সালের নবেম্বর মাসে; মার্শালের পরাজয় হইয়াছিল ১৯৪০ সালের জুন মাসে। পেঁতা ভার্হুন দুর্গ রক্ষা করিয়া জার্মানীর পরাজয় সম্ভব করিয়াছিলেন; ১৯৪০ সালে হিটলারের নিকট নতি-স্বীকার করায় সেই গৌরবরশ্মি একেবারে ম্লান হইয়া যায়। ইহা অদৃষ্টের পরিহাস। ইহার জন্য দায়ী ফরাসীদের জাতীয় জীবনে সংহতির অভাব। সেই দৌর্ব্বল্যের সুযোগ হিটলার লইয়াছিলেন এবং পেঁতা "অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" এই নীতি অনুসরণ করিয়া ফরাসী জাতিকে নিজের ঘর গুছাইতে আর একটু অবসর দিলেন, যদিও ইহার দরুন তাঁহার নিজের দুর্নাম হইল। জাতির স্বার্থে এইরূপ আত্মবলিদান বিরল।

রাজা আবদুল্লা

গত ৩রা শ্রাবণ মুসলমান আততায়ীর হস্তে ট্র্যান্স জর্ডানের রাজা আবদুল্লা নিহত হইয়াছেন। মসজিদে যাইবার কালে উহার চত্বরেই তাঁহাকে হত্যা করা হয়। এই নৃশংস ব্যাপারে আরবজাতির প্রায় ৫.৬ কোটি নরনারীর মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

রাজা আবদুল্লা এই অঞ্চলে ইংরেজের স্বার্থের রক্ষক ছিলেন। তাঁহাদের আনুকূল্যেই ১৯১৯ সালের পরে তিনি ট্র্যান্স জর্ডানের রাজা হইয়াছিলেন। এবং গত ত্রিশ বৎসর তাঁহাদের স্বার্থের সঙ্গে ট্রান্স জর্ডানের ভাগ্য জড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাৎসরিক প্রায় ২।৩ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া ইংরেজ গ্লাব পাশার অধীনে "আরব লিজিয়ন" সৃষ্টি করে এবং এই বাহিনীর সাহায্যে ইংরেজ এক দিকে সদ্যজাগ্রত আরব-জাতীয়তাকে ও অন্য দিকে ইজরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকে প্রতিরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। শেষোক্ত চেষ্টা সফল হয় নাই। অপরটি যে কতকটা ব্যাহত হইয়াছে, তাহার জন্য আবদুল্লা ততটা দায়ী নন, যতটা দায়ী মিশরের রাজপরিবার। তাঁহাদের স্বপ্ন ছিল নীলনদীর উপকূলে খলিফা-পদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এই আকাঙ্ক্ষার মোহে আরবীয় সংহতি তথা বিশ্ব-মুসলিম (Pan-Islam) সংহতি বলি পড়িয়াছে। রাজা আবদুল্লার হত্যায় তাহা আরও পরিস্ফুট হইবে। বর্ত্তমানে চারিটি দল পরস্পরের বিরুদ্ধে বিবাদ করিয়া আরবীয় স্বার্থের হানি করিতেছে। প্রথম, রাজা ইবনে সাউদ, যিনি(মক্কামদিনার অধিকার বলে) অনেকটা প্রভাব অর্জন করিয়াছেন; দ্বিতীয়, রাজা আবদুল্লা ও ইরাকের রাজবংশ—যাঁহারা হাসেম-পরিবারের নেতা বলিয়া পরিচিত; তৃতীয়, মিশরের রাজপরিবার এবং চতুর্থ, সিরিয়া-লেবাননের গণতন্ত্র। এই তথ্য মনে রাখিলে আরবের বিবিধ জটিল ব্যাপার অনুধাবন করিতে কষ্ট হইবে না।

হরিশঙ্কর পাল

কলিকাতা নগরীর একজন শ্রেষ্ঠ নাগরিক সম্প্রতি ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। হরিশঙ্কর পালের জীবন তাঁহার পিতা বটকৃষ্ণ পালের আদর্শে গঠিত হয়; তাঁহার মৃত্যুতে বাঙালী-সমাজ একজন কৃতী পুরুষকে হারাইল এবং বাঙালী ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় হারাইল এমন একজনকে যাঁহার স্থান পূরণ করিতে সময় লাগিবে।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোম্পানীর নামের সঙ্গে সততা জড়িত হইয়া আছে। সেই পরিবারের দানে যেমন তাঁহাদের স্বশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তার হইয়াছে, তেমনি সমগ্র বাঙালী-সমাজও তাঁহাদের অর্থানুকূল্যে নানাভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার পরিবারের লোকেরা হরিশঙ্করের আরব্ধ কর্ম্মধারা অব্যাহত রাখিলে তাঁহাদের পারিবারিক প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

কালীকৃষ্ণ রায়

গত ৫ই শ্রাবণ খ্যাতনামা অলঙ্কারশিল্পী কালীকৃষ্ণ রায় তাঁহার ২৪৭ চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থ ভবনে চৌষট্টি বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি পৈত্রিক জহরৎ ব্যবসায় অবলম্বন করেন। সুবিখ্যাত হ্যামিলটন কোম্পানীর অন্যতম কণ্ট্রাক্টর হিসাবে কালীকৃষ্ণ বাবু বহু দেশীয় রাজন্য এবং ভূম্যধিকারীর কাজ করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন। নব নব অলঙ্কার পরিকল্পনায় তাঁহার সমকক্ষ বিরল। সাধুতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য ব্যবসায় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁহার সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি যে শুধু প্রসিদ্ধ শিল্পী ও ব্যবসায়ী ছিলেন তাহা নয়, তাঁহার প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা এবং সাহিত্যানুরাগও ছিল। "বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ" এবং "রবিবাসরে"র তিনি সদস্য ছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ম্মানুরাগ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তিনি মিষ্টভাষী, সদালাপী, সচ্চরিত্র, বন্ধুবৎসল এবং গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন।

ভ্রম-সংশোধন

গত আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত রঙীন চিত্রখানির নাম 'হাল্‌কা হাওয়া' স্থলে 'কুহেলিকা' পড়িতে হইবে।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা